মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার

(রজত খণ্ড)

মনোজ বসুর
শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার

॥ রজত খণ্ডের সূচী ॥

বন কেটে বসত (উপন্যাস)
মানুষ গড়ার কারিগর (উপন্যাস)
সেই গ্রাম সেই সব মানুষ (উপন্যাস)

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৬০

প্রকাশক : নন্দিতা বসু
গ্রন্থপ্রকাশ,
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : ব্রজলাল চক্রবর্তী,
মহামায়া প্রেস,
৩০।৬।১, মদন মিত্র লেন,
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

আলোক চিত্র : মোনা চৌধুরী

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, বাংলা সাহিত্যের আমি একজন সাধারণ পাঠক মাত্র। বিশেষণ যোগ করলে 'রুচিশীল' বলতে পারেন আমাকে। সুতরাং, বড় বড় দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা যে ভূমিকা বা সম্পাদকীয় লেখেন, সেই পথ পরিহার করে একজন পাঠক তথা প্রকাশকের দৃষ্টিতে এই পশ্চাৎপটের অবতারণা। সুধী পাঠকগণ আশাকরি এই নতুন প্রচেষ্টায় অখুশী হবেন না।

বঙ্গাব্দ ১৩০৮ সালের ৯ই শ্রাবণ (ইংরেজি ১৯০১ সালের ২৫শে জুলাই) যশোহর জেলার ডোঙ্গাঘাটা গ্রামের (বর্তমান বাংলাদেশ) বিখ্যাত বসু পরিবারে মনোজ বসুর জন্ম। কৈশোর বয়স থেকেই লেখক হওয়ার স্বপ্ন। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন প্রায় চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু শত প্রলোভনেও সাহিত্য-সাধনা ত্যাগ করেন নি। লেখকের ভাষায় শুনুন :

"লেখার দুর্মতি কি করে এলো শুনুন সেই গল্প। বাবা অল্প-সল্প লিখতেন। ঠাকুরদাদার হাতের লেখা বড় কেতাব অতি শৈশবে দেখেছি—নিজের রচনা অথবা অন্যের কেতাব নকল করা—সঠিক বলতে পারব না। লেখার বীজ ছিল অতএব রক্তের মধ্যেই।"......

"......অভাব-দুঃখের মধ্যে ফেলে বিধাতাপুরুষ বিস্তর মেহনত করেছিলেন বীজটুকু নিঃশেষ করে দিতে। পারেন নি। মনের তলে চাপা ছিল। সুযোগ এতটুকু পেয়েছে কি অঙ্কুরোদ্গম্।"

দীর্ঘদিন যাবৎ প্রকাশক আর পাঠকদের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের রুচি ও চাহিদা পাল্টাচ্ছে। বেশির ভাগ পাঠকই (পাঠক বলতে পাঠক-পাঠিকা উভয়কেই বোঝানো হচ্ছে), যশস্বী কথাশিল্পীদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি সংগ্রহে আগ্রহী। তার প্রমাণ, এখন থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার বিখ্যাত গল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনীর চাহিদা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। নিঃসন্দেহে গত কয়েক বছরে "বইমেলা", লেখক-পাঠক-প্রকাশককে অনেক কাছে নিয়ে এসেছে।

প্রথমেই আসা যাক লেখকের কথায়। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাংলা সাহিত্যের আমি একজন একনিষ্ঠ পাঠক ও সেই সঙ্গে প্রকাশক। সেকালের যশস্বী কথাশিল্পীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে যাঁদের লেখা আমাকে আজও সম্মোহিত করে রাখে, তাঁরা হলেন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রবোধকুমার সান্যাল, সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশ্য, সবচেয়ে কাছের প্রিয় লেখক হলেন, আমার বাবা মনোজ বসু। এর পরবর্তী যুগে যাঁদের কথা মনে আসছে, তাঁরা হলেন—সমরেশ বসু (কালকূট), নারায়ণ স্যান্যাল, শীর্ষ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায় ও বুদ্ধদেব গুহ। আরও অনেক শক্তিমান লেখক ছিলেন ও আছেন। স্থানাভাবে তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

লেখকরা সাধারণতঃ লেখেন সৃষ্টির আনন্দে। পাঠকদের কথা চিন্তা করে নয়।

গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে যশস্বী লেখকদের যত বই বেরিয়েছে, তার অনেক বই-ই আজ বিস্মৃতপ্রায়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, সেকালের লেখকদের বেশ কিছু সংখ্যক বই, বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর গুণে। আর এখানেই জাত কথাশিল্পীর সার্থকতা। স্বভাবতই রুচিশীল পাঠকরা বরণীয় লেখকদের স্মরণীয় বইগুলি সংগ্রহ করতে উৎসাহী।

এবার আসা যাক পাঠকদের কথায়। এঁদের শতকরা আশিভাগ মধ্যবিত্ত। বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এঁরাই। বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে ক'জনের পক্ষেই বা আর বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। বহু পাঠকের কাছে আমি শুনেছি (বিশেষতঃ বইমেলায়) যে তাঁরা সারা বছর অল্প অল্প করে টাকা বাঁচান, বইমেলায় পছন্দসই বই কেনার জন্য। প্রতিবছর বইমেলায় আসেন, বই বাছাবাছি করে জড়ো করেন। কিন্তু, সবগুলো আর কেনা হয়ে ওঠে না—বাজেটে ঘাটতি পড়ে যায়। পছন্দ করা বই থেকেই আবার কিছু বই বাদ দেন। অনেকে প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা, পরের বছর বইগুলো এই দামে পাবো তো?'

একজন সৎ প্রকাশক (ভুলতে পারি না আমি একজন পাঠক ও বটে) হিসাবে উত্তর দিতে ইচ্ছে করে—'নিশ্চয়ই পাবেন', কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করতে পারি না। কেন না, প্রতিবছর যে ভাবে কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ও বিজ্ঞাপনের খরচ লাগামছাড়া হয়ে বাড়ছে, সেখানে পরবর্তী মুদ্রণে একই দাম রাখা অসম্ভব। প্রকাশক এখানে একেবারে অসহায়। বাংলা বইয়ের বাজার ইংরেজি বা হিন্দি বইয়ের তুলনায় অনেক ছোট। একটা ইংরেজি বা হিন্দী বই যেখানে দশ-বিশ হাজার ছাপা হয়, বাংলা বই সেখানে সাধারণতঃ এক-দুই হাজার। দাম কমানোর একটা রাস্তা বেশি বই ছাপানো। কিন্তু এটা সম্ভব নয়, পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে, নামী-দামি বইগুলোর একত্র সংকলন। এতে বাঁধাই ও বিজ্ঞাপন খরচ কম হয়। তবে, সেই সঙ্গে লেখক ও প্রকাশকের সহযোগিতা দরকার। অর্থাৎ, লেখক সামান্য সম্মানমূল্য নেবেন এবং প্রকাশক ও নামমাত্র লাভ রাখবেন।

আমাদের প্রকাশনায় এ ধরণের প্রচেষ্টা কয়েকটা করা হয়েছে। পাঠকরা ও যথেষ্ট সাড়া দিয়েছেন। সেজন্য এবার পরিকল্পনা করেছি, প্রবীন কথাশিল্পী মনোজ বসুর "শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার" প্রকাশ করার। লেখক দীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বছরের সাহিত্য জীবনে বহু আলোচিত বিখ্যাত উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছেন। 'শ্রেষ্ঠ' বই বিচার করা খুবই দুরূহ। সেজন্য, যে সব বই পাঠক-সমালোচক—একবাক্যে সকলের প্রশংসা পেয়েছে, শুধুমাত্র সেগুলিকেই একত্রে সংকলিত করছি। উদ্দেশ্য মনোজ বসুর "শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার" কে তাঁর অগণিত পাঠক-পাঠিকার হাতে অবিশ্বাস্য কম দামে পৌঁছে দেওয়া।

প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠার বই, দু'খণ্ডে (সুবর্ণ খণ্ড ও রজত খণ্ড) প্রকাশ করা হচ্ছে পাঠকদের সুবিধার জন্য। কারণ, বিরাটাকার একখণ্ড হাতে নিয়ে পড়া কষ্ট সাধ্য। এটা শুধু আমার মত নয়—বহু পাঠকেরও এই মত। এই রচনা সম্ভারের বিখ্যাত বইগুলি প্রত্যেকটি আলাদা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে—যার এখনকার মোট দাম প্রায় ১৫০ টাকা। দু'খণ্ডের সুলভ মূল্য রাখা হচ্ছে ৯০ টাকা (প্রতি খণ্ড ৪৫ টাকা)। এছাড়া এককালীন বিশেষ গ্রাহক মূল্যও থাকছে। একটা কথা বলা দরকার, রচনা সম্ভারের অন্তর্ভুক্ত বইগুলির কোনটিকেই সংক্ষেপিত করা হয়নি।

॥ সুবর্ণ ও রজত খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয় ॥

চলিত প্রথা অনুযায়ী ১ম ও '২য় খণ্ডের পরিবর্তে 'সুবর্ণ' ও 'রজত' খণ্ড নামকরণের একমাত্র কারণ, প্রতিটি খণ্ডই স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং, পাঠক তাঁর সুবিধামতো দু'টি খণ্ড একত্রে সংগ্রহ না করে, তাঁর নিজের পছন্দমতো প্রথমে একটি ও পরে আর একটি খণ্ড সংগ্রহ করতে পারেন। ধাতু হিসাবে স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষা মূল্যবান হলেও, সাহিত্য গুণাগুণ বিচারে আমার মতে দু'টি খণ্ডই সমকক্ষ। আশা করি, সুধী পাঠক আমার সঙ্গে একমত হবেন। আর একটি কথা! "শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভারে" স্থানাভাব হেতু আরও কয়েকটা বিখ্যাত বই বাদ দিতে হয়েছে, যেগুলি অনায়াসেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবি করতে পারে বিষয়বস্তুও রচনাশৈলীর গুণে। সে-জন্য ইচ্ছে রইল ভবিষ্যতে আর এক খণ্ড প্রকাশ করার। যদি কখনো সেই খণ্ড প্রকাশিত হয় সেটা হবে 'হীরক খণ্ড'। অর্থাৎ, LAST BUT NOT THE LEAST.

সুবর্ণ খণ্ড

নিশিকুটুম্ব (১ম ও ২য় পর্ব) :—

এই বিখ্যাত উপন্যাসের পুস্তক মুদ্রিত রচনাকাল ১৯৪১ (বঙ্গাব্দ ১৩৪৮)। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যের সেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। "চৌষট্টি কলার একতম 'চৌরবিদ্যা' যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে—বাংলা, ভারতীয় এবং বোধহয় পৃথিবীর সাহিত্যেও মনোজ বসু তার প্রথম নজির দেখালেন।" এই বিখ্যাত উপন্যাস ১৯৬৬ সালে ভারতের সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক "একাদেমি পুরস্কার" পেয়েছে, একথা প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু একটা নেপথ্য কথাও জানাই। এই উপন্যাস সম্পূর্ণ করতে লেখকের প্রায় ২-৩ বছর সময় লেগেছিল। 'চৌরশাস্ত্র' ও নানান তথ্য যোগাড় করতে লেখককে বহু জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। একটি ঘটনা মনে আছে। বহু পুরোণো 'চৌরশাস্ত্রের' কিছুটা (এশিয়াটিক সোসাইটিতে) পাওয়া গেল। কিন্তু এত পুরোণো যে হাতে নিলে পাতাগুলো গুঁড়ো হয়ে যায়। তখনকার পরিচালক মহাশয় অন্যান্য সহযোগীর সাহায্যে 'মাইক্রো ফিল্ম' তুলে দিলেন। লেখক তার মধ্য থেকে অমূল্য রত্নের সন্ধান পেলেন।

ভুলি নাই :—(১৯৪৩)

স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যে ক'জন সেকালের যশস্বী কথাশিল্পী জড়িত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মনোজ বসুও একজন। এই রাজনৈতিক উপন্যাস দিয়ে লেখকের ঔপন্যাসিক জীবন শুরু। আর প্রথম আবির্ভাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। আজ বিয়াল্লিশ বছর পরেও তার অপ্রতিহত গতি এই বইয়ের ৩৪তম সংস্করণে--যেটা বাংলা সাহিত্যের যে কোন লেখকের পক্ষেই ঈর্ষণীয়। 'ভুলি নাই' কল্পনা নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা রক্তাক্ত দলিল। কুন্তলদা, রাণী, আনন্দকিশোর, নিরুপমা, সোমনাথ, মায়া ও মল্লিকা প্রত্যেকেই সত্য ও জীবন্ত। এক সাক্ষাৎকারে লেখক বলেছিলেন :

"কুন্তল চক্রবর্তী", চারু ঘোষ প্রমুখ সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের কথা ক'জনই বা জানে। ইংরেজের কড়া শাসন চলেছে তখন। আমার চেষ্টা হল, 'কুন্তল' নামটা অন্ততঃ লোকে জানুক। 'ভুলি নাই' লিখলাম, বইটা বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। একবার ট্রেনে

চড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দৌলতপুর স্টেশনে (বর্তমানে বাংলাদেশ) শুনতে পেলাম, এক যুবক বলে উঠল, কুন্তলদা, ছুটিলিন তোমাদের—ছুটিলিন। 'ছুটি নাই' এর প্রথম কথা। আমার উদ্দেশ্য পূরেছে, অতএব ভারি আত্মতৃপ্তি পেলাম।"

চীন দেখে এলাম (১ম ও ২য় পর্ব) :—

স্বাধীনতার পর ভ্রমণ সাহিত্যে (বিশেষতঃ বিদেশ ভ্রমণ) এরকম জনপ্রিয় গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্যে সম্ভবতঃ বিরল। ১৯৫২-তে এই বইয়ের প্রথম প্রকাশ। লেখক সবে চীন থেকে ফিরেছেন। একটি মাসিক পত্রিকায় 'চীন দেখে এলাম' বেরুচ্ছে। চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দুটো-তিনটে করে বিভিন্ন সংস্থা থেকে নিমন্ত্রণ। সকলে নতুন বিপ্লবী চীনের সম্বন্ধে মনোজ বসুর স্বভাব সুলভ গল্প বলার ভঙ্গীতে শুনতে চান—জানতে চান। ভ্রমণ সাহিত্য যে নিছক গল্প বলার ভঙ্গিতে কত আকর্ষণীয় হতে পারে, 'চীন দেখে এলাম' বাংলা সাহিত্যে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হাজার হাজার পাঠক ও জ্ঞানী গুণী সমালোচকদের সঙ্গে একমত হয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫২-৫৪) তিন বৎসরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুস্তক হিসাবে "নরসিংহ দাস পুরস্কার" দিয়ে সম্মান জানালেন লেখককে।

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প :—

গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে মনোজ বসু ছোট গল্প লিখছেন। আনুমানিক তিনশ'র কাছাকাছি গল্প এ যাবৎ লিখেছেন। ডঃ ভূদেব চৌধুরি (শান্তিনিকেতনের বাংলা বিভাগের প্রধান) চার খণ্ডে তাঁর গল্প সমগ্র সম্পাদনা করেছেন অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে। সুতরাং, এই সংকলনে কোন গল্পগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, এটা একটা বিরাট সমস্যা। স্বর্গীয় কথাশিল্পী নরোয়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনোজ বসুর 'শ্রেষ্ঠ গল্পের' (বর্তমান সংস্করণ) তালিকা করে যান। লেখক নিজে দু'-একটা অদল বদল করেছেন। অতএব, সবচেয়ে সহজ পথ ধরলাম। 'শ্রেষ্ঠ গল্পে'র বর্তমান সংস্করণটি হুবহু অন্তর্ভুক্ত করলাম। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচকদের মতে, তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-মনোজ বসু, এই তিন কথাশিল্পীর গল্পে ধরা আছে মাটি, মানুষ, জল আর জঙ্গল নিয়ে জীবনের আলপনা।

॥ রজত খণ্ড ॥

বন কেটে বসত :—

সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস লিখেছেন মনোজ বসু। জলজঙ্গল (১৩৫৮) ও বন কেটে বসত (১৩৬৮)। লেখকের ভাষায় —"গ্রাম আমার সুন্দরবন অঞ্চল থেকে দূরবর্তী নয়।—কাঠ কাটতে মধু ভাঙতে জীবিকার নানাবিধ প্রয়োজনে লোকে বনে যায়, বাঘ-কুমির সাপের কবলে পড়ে—তার মধ্যে কত জনে আর ফেরে না। জনালয় থেকে বিচ্ছিন্ন, বনবিবি ও বাঘের সওয়ার গাজি-কালুর রাজ্য রহস্যময় সুন্দরবন ছোটবেলা থেকে আমার আকর্ষণ করত। সুন্দরবন নিয়ে দুটো উপন্যাস (জলজঙ্গল, বন কেটে বসত) ও কতকগুলো গল্প লিখেছি আমি। কোন কোন অংশ একেবারে বনের ভিতরে খালের উপর নৌকোয় বসে লেখা।"—

বাদাবন প্রকৃতির বিচিত্র লীলাভূমি। বাদা অঞ্চলের মানুষের বসতি স্থাপনের পেছনে আছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গ্লানিময় জীবন-সমস্যা। কিন্তু তাতেও

নিস্তার নেই এই সব ছিন্নমূল মেহনতী মানুষের। 'বন কেটে বসত' উপন্যাসের শেষাংশে লেখক সমাপ্তি রেখা টানেন নি। সেটা সম্ভবও নয়। কারণ, এই সব মানুষেরা শুধু বন কেটে বসত বানায়। কিন্তু টিকতে পারে না। ঠেলা খেয়ে আরও গভীরে বনাঞ্চলে চলে যায়, নতুন জায়গার সন্ধানে—অথৈ কালাপানির সামনে। জগন্নাথের মত সরল, নির্লোভ লোকেরা মিলেমিশে বন কেটে বসত নির্মাণ করে। তারপর লোভী, স্বার্থপর মানুষের দল এসে তাদের উৎখাত করে সব কিছু ভোগ করে। 'বন কেটে বসত' বাদার মানুষের সুখ-দুঃখের বাস্তব কাহিনী—বাদাবনের ইতিহাস। বিভিন্ন চরিত্রকে, বিশেষতঃ গগনকে অনুসরণ করে পাঠক বাদারাজ্যে নিজের অজান্তেই চলে আসেন। যখন ঘোর ভাঙে, তখন পাঠক দেখেন—সামনে অথৈ কালাপানি। আর এখানেই লেখকের এই দুর্লভ উপন্যাস রচনার সার্থকতা।

মানুষ গড়ার কারিগর :—

নিম্নমধ্যবিত্ত একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের সন্তান তিনি। কৈশোর থেকে লেখক হওয়ার সাধ। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম করে নিজেকে যে ক'জন লেখক বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মনোজ বসু নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অনেকগুলি লেটারসহ ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করলেন। শুনলে অবাক হবেন অংকে তিনি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতেন। বিজ্ঞান পড়ার সাধ ছিল। স্বপ্ন দেখতেন ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনীয়ার হবেন। কিন্তু একদিকে চরম দারিদ্র্য ও অন্য দিকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে কয়েক বছর পরে (১৯২৪) বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। কিন্তু এর পর দারিদ্র্যের জন্য পড়া বন্ধ করতে হল। আরম্ভ করলেন শিক্ষকতার কাজ মাত্র তেইশ বছর বয়সে। সাহিত্যচর্চার সঙ্গে পাশাপাশি চলল স্কুলপাঠ্য বই লেখা পেটের দায়ে। দীর্ঘ একুশ বছর ধরে কঠোর সংগ্রাম এবং শিক্ষক জীবনের নানা অভিজ্ঞতা তাঁকে এই উপন্যাস রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে। লেখকের ভাষায়—

"আমি একটা বই লিখতে চাই ইস্কুল নিয়ে। খানিকটা আক্রোশ নিয়ে বইকি। ···কলেজে পড়া সেরেই ঢুকি, বেরিয়ে এলাম তখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছি। যৌবনের প্রতিটি মধুভরা দিনমানের অপমৃত্যু ঘটেছে কলকাতার একটি ইস্কুলের চতুঃসীমার মধ্যে। ছিলাম জনৈক সাধারণ মাস্টার।···মাইনে চল্লিশে শুরু—বিশ বছর পরে··· আশি ধরো-ধরো করেছি।···বিদ্যাগার বলব না, মানুষ গড়ার কারখানা। নিচের ক্লাসের মেশিনের ভিতরে ছেলেগুলোকে ফেলে ধাপে ধাপে নানান ক্লাস ঘুরিয়ে একদিন তৈরি মাল বাজারে ছেড়ে দেওয়া। আমি জনৈক কারিগর ছিলাম সেই কারখানায়।··· মহামতি কত চাণক্য ও চার্চিল দিবানিদ্রাটা দুপুরের ক্লাসে সেরে নিয়ে রাত্রে ও সকালে গুপ্ত-অধ্যাপনা অর্থাৎ প্রাইভেট ট্যুইশানিতে ছুটোছুটি করেন, দুর্ধর্ষ কত হিটলার কলে-কৌশলে কারখানার কর্তা হয়ে বসে কারিগরবর্গকে নাস্তানাবুদ করেন—পরিচয় পেলে চমৎকৃত হবেন।"

'মহিম মাস্টার'কে সামনে রেখে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ উৎঘাটন করাই লেখকের উদ্দেশ্য। সেকালের একটি বিশিষ্ট পত্রিকা 'শিক্ষক' এই উপন্যাসকে 'আঙ্কল টমস কেবিন' এর সমগোত্রীয় সর্বকালের উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

সেই গ্রাম সেই সব মানুষ :—

"তোমরা ছিলে। ত্রিভঙ্গ স্বাধীনতার তাড়নায় বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে।

এরপর লেখক তাঁর এই অভিনব উপন্যাস শুরু করছেন,

"যবনিকা তুলছি। এই শতকের প্রথম পাদ। মানুষেরা সেই সময়ের। গ্রামের চেহারা ভিন্ন।"

বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা এই বই সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা করেছেন, সেখানে আমার মতো একজন নগণ্য পাঠকের কলম ধরাই বাতুলতা। তাই সে চেষ্টা না করে তাঁদের দু'-তিনজনের মতামত তুলে ধরছি।

ডঃ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের প্রধান)

···একাসনে বসে পড়ে ফেলার বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ···এটি শ্রীযুক্ত বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস, এবং আমার মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। শুধু তারই বা কেন, সাম্প্রতিক উপন্যাসের পয়লা সারির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, মনোজ বসু মহাশয় প্রবীণ নবীন সকলকে ম্লান করে দিয়েছেন। এই কথাগ্রন্থখানি বিলীয়মান গ্রামীণ জীবনযাত্রার একখানি 'সাগা' গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।···এতদিন যে অন্ধকূপের মধ্যে ছিলাম, এবার বহতা ধারার মধ্যে এলাম। মানসিক রুচির স্বাদ ফেরাবার জন্য শ্রীযুক্ত বসুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই উপন্যাস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একালের বাংলা কথাসাহিত্যে একক মহিমায় বিরাজ করবে এবং অল্পকালের মধ্যেই এটি চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা পাবে।

ডঃ অমলেন্দু বসু

···এ কাহিনীতে একটা মহাকাব্যোচিত, এপিক-সঙ্গত বিশালতা, গভীরতা, সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতার রূপ ধরা পড়েছে, এ কাহিনীতে একই কালে সংহত ও উচ্ছলিত, মায়াবী আলোর স্নিগ্ধ রহস্যময় এবং রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের সর্বপ্রকট প্রকাশ্যতা। কাহিনী মহাকাব্যোচিত হলেও তাঁর কাহিনীকথনের করণ-কৌশল মহাকাব্যপ্রকরণের চেয়ে অনেক বেশি জটিল, বিচিত্র এবং (স্বভাবতঃই) আধুনিক। এই কাহিনীতে বহু বিচিত্র শিল্পের প্রকরণ আশ্চর্য নম্রতায় সম্মিলিত হয়েছে: কাব্য, গল্পরীতি, চিত্রশিল্প, সঙ্গীতশিল্প—সবই যেন মনোজ বসুর সৃজনীকল্পনায় জড়িয়ে গেছে হয়তো তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতসারে।

ডঃ ভূদেব চৌধুরী (বিশ্বভারতী, বাংলা-বিভাগের প্রধান)

পদে পদেই মনে হয়, আজীবন স্বপ্নিল ভালোবাসার অঞ্জলিপুটে ধরে হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ জীবন-মহিমার বেদীতলে শিল্পী মনোজ বসু যেন নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারলেন মুক্তির নিশ্বাস নিলেন এই মহাগ্রন্থে। 'মহাগ্রন্থ' বলছি আকার বা প্রকারের কথা ভেবে নয়, নিভৃত অন্তরঙ্গ জীবন-মহিমার স্পর্শে অভিভূত হ'য়ে থাকতে হয় বইটি পড়ার পর!

০ ০ ০ ০

সবশেষে সুধী পাঠকের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন আমার এই পরিকল্পনা ও সম্পাদনার ত্রুটিগুলি মার্জনা করেন। আমার বাবা শ্রীমনোজ বসুর "শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার" (সুবর্ণ খণ্ড ও রজত খণ্ড) পাঠকদের হাতে স্বল্প মূল্যে তুলে দিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আর এর সার্থকতা তখনই যখন মনোজ বসুর অগণিত পাঠক-পাঠিকা এই শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভার পড়ে আনন্দ পাবেন।

মনীষী বসু

বন কেটে বসত

(উপন্যাস)

মনোজ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

এক

ফুটো ঘর। বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে না পড়তে ঘরের মধ্যে প্যাচপেচে কাদা। মেজ শালা নগেনশশী এসেছে এক বৃষ্টির দিনে। শ্বশুরবাড়ি গ্রামের ভিতরে—ভিন্ন পাড়ায়। তাদের অবস্থা ভাল। কুটুম্ব হওয়া সত্ত্বেও তাই সে কথা শোনাতে ছাড়ে না।

গরুর গোয়ালও যে এমনধারা হয় না। কি রকম করে থাক তোমরা?

গগন বলে, ভালকেমনকে দালানকোঠা দেখে দিলে না কেন বোনের বিয়ে?

পুরুষমানুষ তার পেটে বিদ্যে আছে—এই সব দেখে দিয়েছিলাম। আমরা দিই নি, বাবা দিয়ে গেছেন। বাইরে থেকে খুঁটে আনতে না পারলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়। একটুখানি নড়ে বসবে না তো ভগবান হাত-পা দিয়েছেন কি জন্যে?

ব্যাস, ভাই ঐ যে খেই ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল, বউয়ের মুখে উঠতে বসতে সেই ধুয়ো। ভাল ঘরবাড়ি চাই, ভাল পোশাক-আশাক, ভাল খাওয়াদাওয়া। বাচ্চা ছেলে-পুলে নেই এখন ঘরে, কিন্তু আজকে না থাক আসবেই দু-দিন পরে। আর তোমার ঐ বোন—ওর পরিণাম ভাবতে হবে তো একটা। না, ভাইয়ের বাড়ি দাসীবৃত্তি-চেড়ীবৃত্তি করে চিরকাল এমনি কাটবে?

গগনের ছোটবোন চারুবালা। বিধাতাপুরুষ চেহারা দিয়েছেন, কিন্তু কপালে সুখ দিলেন না। বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতে কপাল পুড়িয়ে ভাইয়ের বাড়ি ফিরে এল। তখন না হয় বোঝবার বয়স ছিল না—শ্বশুর-বাড়ির জেলখানা থেকে ছাড় পেয়ে মহাস্ফূর্তিতে ফিরেছিল। কিন্তু এখন ভরভরন্ত যৌবনে সমস্ত বুঝে-সমঝেও সেই ছেলেমানুষের ভাব। কড়ে-রাঁড়ী বলে খাওয়ার বাছবিচার নেই—খাওয়া নিত্য-দিন কে দেখতে যায় রান্নাঘরে ঢুকে? কিন্তু পর-রুচি পরনে। সরু-পাড় ধুতি পরে চারুবালা, সোনার পাতে বাঁধানো দু-গাছা শিঙের চুড়ি দু-হাতে। বিধবার সাজসজ্জা যা-কিছু এই।

আর একটা মেয়ে ছিল এমনি কড়ে-রাঁড়ী। পালবাড়ির পদ্মবালা। ক্রোশ দেড়েক দূরের এক গাঁয়ে অম্বিক নামে একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে ছিল। বরের বয়স তখন পঞ্চাশের উপর, পদ্মবালার দশ। কিন্তু উপায় কি? ওদের সমাজে মবলগ পণ লাগে বিয়ে করতে। কন্যাপক্ষকে দিতে হয়। হাটে হাটে হাঁড়িকলসি বেচে যা রোজগার—সংসারখরচের পর ক'টা পয়সাই বা জমানো যায় বিয়ের জন্য? তবু তো কনের বয়স কম বলে খাঁইও অনেক কম। ডাগর হলে পণের অঙ্ক শুনে ছিটকে পড়তে হত।

দশ বছরের মেয়ে—অম্বিক ভেবেছিল, আর পাঁচটা ছ'টা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। পঞ্চাশ বছর সবুর করেছে, আর এই সামান্য সময় পারবে না? হিসাবে ভুল ছিল না, বউ ক'টা বছরের মধ্যে ডাগরডোগর হয়ে উঠল। রোগা ডিগডিগে মেয়েটাকে গড়ে পিটে বিধাতা যেন নতুন করে সৃষ্টি করলেন। যে দেখে তার নজর ফেরে না। অম্বিক তখন নেই। সারা শীতকাল হাঁপানির টান টানত, টানের মধ্যে একদিন চোখ উলটে পড়ল।

এই চারুরই গতিক। সকলে হায়-হায় করত। শ্বশুরবাড়ির লোক একদিন গরুর-গাড়ি করে পদ্মবালাকে ভাইয়ের বাড়ি তুলে দিয়ে গেল। কিন্তু এখানেও টিকতে পারে না। লোকে কুনজর দেয়। ভাজও সংসারের ভারবোঝা ননদকে দু-

চক্ষে দেখতে পারে না। ঝগড়ার চোটে পালবাড়ির ঘরের চালে কাক বসে না। তিতবিরক্ত হয়ে পদ্মবালা আবার বেরুল কোন এক গাঁয়ে দূরসম্পর্কের আত্মীয়-বাড়ি।

বছর পাঁচ-ছয় পরে এবারে পদ্মবালা ক'দিন ভাইয়ের বাড়ি এসেছিল। আরে সর্বনাশ, পদ্মবালা কী বলছ—নাম পালটে গেছে, পদ্মিনী। ঝকমকে চেহারা—সেই কাল মেয়ের রং এখন ফেটে পড়ছে। পরিচ্ছন্ন ছিমছাম—বড়ঘরের মেয়ে বললে নিতান্ত বেমানান হবে না। আর কী খাতিরটা করছে সেই কলহপর ভাজ-ঠাকরুন! থালায় ভাত বেড়ে পাশে বাটি সাজিয়ে সর্বক্ষণ পাখা করছে পদ্মিনীর সামনে বসে। করবে না! ভাজের জন্য কলকাপাড় শাড়ি নিয়ে এসেছে, ভাইপোর মুখ দেখল সোনার পঁইচে দিয়ে—

নাকি, সে শহরের কোন হাসপাতালে নার্স হয়ে আছে। মাস গেলে রমারম টাকা। সে শহর কোথায় কে জানে? কিন্তু টাকার মানুষ হয়ে এসেছে, সেটা চোখে দেখা গেল।

সেই থেকে গগন আর বিনোদিনী বলাবলি করে, চারুর এমনি কোন ব্যবস্থা হয় না! চারুবালাও নিশ্চয় মনে মনে ভাবছে তাই। পদ্মবালার চেয়ে সে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে। সাহস-হিম্মত আছে। বড় হরপের বাংলা বই বানান করে দু-পাতা চার-পাতা পড়ে যেতে পারে। কিসে কম?

আবার এক কাণ্ড হল! মিত্তিরদের বাগের পুকুরে চারুবালা চান করতে নেমেছে। চারিদিকে গাছপালা, রোদ পড়ে না, জলটা খুব ঠাণ্ডা থাকে। সেই জন্য আসে এত দূরে। শিষ দিচ্ছে ওদিককার গাছের উপর থেকে। ছাতারে-পাখীর আওয়াজের মতো। চারু চকিত একবার দেখে নেয়। না, কিছু নয়। গলা ডুবিয়ে কাপড়ের প্রান্ত জলে ভাসিয়ে থাবা দিয়ে দিয়ে কাচল। ছাতারে-পাখী আরও ক'বার ডেকেছে। ভিজে কাপড় ও গামছা গায়ের উপর জড়িয়ে সপসপ করতে করতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ—ওরে বাবা, খুন করল রে! চারু টিপিটিপি এসে চষাক্ষেতের ঢিল কুড়িয়ে দমাদম ছুঁড়ছে গাছের মাথায়। দু-চারটে লেগেছেও ছোঁড়াটার গায়ে—আর্তনাদ করতে করতে সে গাছ থেকে নামল। চেঁচামেচিতে মানুষজন এসে পড়ে। চারুবালা কোমরে আঁচল জড়িয়ে মল্লবেশে দাঁড়িয়ে। হাঁপাচ্ছে উত্তেজনায়। ছোঁড়া চোঁচা দৌড় দিল। যাচ্ছে-তাই করছে সকলে তাকে। চারুবালাকেও ছাড়ে না: ডবকা ছুঁড়ী—তোরই বা আক্কেলটা কি! একা একা বাগের পুকুরে এসেছিস, পাঁচ-সাত মরদে মিলে মুখে কাপড় পুরে যদি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেত!

এরপরে ঝিনি-বউ যেন ক্ষেপে গেল। পৈতৃক ভিটাবাড়ির উপর নির্বিরোধী মানুষটা শান্তিতে রয়েছে, নিতান্তই অসহ্য যেন তার। তার এবং চারুরও। ননদ-ভাজ এক-দলে। গগনকে পথে বের না করে ছাড়বে না, এই যেন পণ করে বসেছে: বেরিয়ে পড়। শহরে-বাজারে টাকা উড়ে বেড়ায়, চাকরি-বাকরি করে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে এস। বোনের একটা গতি কর। মাথার উপরে এমন দায়—দাউ-দাউ করে মাথায় তো আগুন জ্বলবার কথা! সে মানুষ ভুড়ুক ভুড়ুক করে হুঁকো টানে কেমন দাওয়ায় নিশ্চিন্ত বসে?

ধিকিধিকি করে চলে তবু দিনকাল। শেষটায় একদিন দুত্তোর—বলে কাঁধে [illegible]

কাজে হাতা নিয়ে গগন [illegible] [illegible] ভাল এল, [illegible] [illegible]—[illegible] নিয়েই বেরিয়েছে। চার ক্রোশ দূরের গাঁয়ে। [illegible] [illegible] দু-শ [illegible] করে পয়সা করেছেন, পৈতৃক ভিটেতে দালান দিচ্ছেন।

গগন লেখাপড়া জানে বলে সুরাহা হয়ে গেল। সে হল সরকার। মিস্ত্রিমজুরের হাজিরা রাখে, মালমশলার ব্যবস্থা করে। সদ্য-গেঁথে-তোলা একটা কামরার ভিতর হাতবাক্স সহ আস্তানা করে নিয়েছে। গাঁথাই হয়েছে শুধু, মাটির মেজে, দেয়ালে চুনবালির জমাট ধরানো হয় নি— রাঙা রাঙা ইটের দাঁত বেরুনো। হোক গে, পাকা-দালানে তবু জীবনে এই প্রথম বসবাস। সকালে রোদ না ওঠা পর্যন্ত গড়ায়। ছাদের দিকে চেয়ে মনে মনে তারিফ করে, বাঃ বাঃ, বৃষ্টি-বাদলায় ভুবন রসাতলে গেলেও এক ফোঁটা জল গায়ে লাগবে না। বছর বছর খড় দেওয়ার হাঙ্গামা নেই। একবার গড়ে তুলতে পারলে জীবনভোর নিশ্চিন্ত। জীবনই নয় শুধু, নাতিপুতি তস্য নাতি—পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে আরামের বসত।

মাসান্তে মাইনের টাকা পেলে খোরাকির জন্য সামান্য কিছু রেখে বিনোদিনীর কাছে দিয়ে আসে। ননদ-ভাজে মিলে চালাচ্ছে ওরা বেশ। হিসেব আছে। ঘর ছেয়ে ফেলেছে—চালের নতুন খড় সোনার মতন ঝিকমিক করে। গগনকে, দেখা যাচ্ছে, সংসারে কোন দরকার নেই—তার রোজগারের টাকাটা পেয়ে গেলেই হল। গগন বিনে ওদের দিব্যি চলে যায়।

বাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেল। শানাই বাজল একদিন, দোরগোড়ায় কলাগাছ-মঙ্গলঘট বসল, পুজো-আচ্চা হল। গণবাবুরা পৈতৃক মাটির-ঘর ছেড়ে পাকা-দালানে উঠলেন। গগনের মাইনেপত্র চুকিয়ে বখশিশ বাবদে আরও পাঁচ টাকা ধরে দিলেন। বুড়ো বাবুকে গগন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু, এখনই কেন ? ভোজ-টোজ খেয়ে তার পরে চলে যেও।

পাকা-দালানে বসবাসের মেয়াদ অতএব আরও ক'ঘণ্টা বাড়ল। খাওয়া শেষ হতে রাত দেড়টা দুটো। তখন আর কোথায় যাবে ? বাকি রাতটুকু— ভিতরে জায়গা হল না আজ, বাড়ির লোক ও আত্মীয়-কুটুম্বরা এসে পড়েছেন—গগন একটা মাদুর পেতে নিল রোয়াকের উপর। মেঘ উঠল আকাশে, ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি হল না, বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু বিষম মশা। কোঁচার কাপড় খুলে গায়ে চাপিয়ে দিল, তাতে যত দূর ঠেকায়।

বাড়ি যাওয়ার আগে গঞ্জটা ঘুরে বউয়ের জন্য মন্দির-পাড় শাড়ি আর বোনের জন্য ভেলভেট-পাড় ধুতি কিনে নিল। যেন আকাশের চাঁদ উঠানে এসে পড়েছে, এমনি ভাব দেখাচ্ছে বিনোদিনী। চাকরি খতম—কথাটা বলি-বলি করেও বলা যায় না। জানে, খাতিরযত্ন উবে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। দু-পাঁচ দিনের ছুটিতে এসেছে, এমনি ভাব দেখাচ্ছে। হাতে পয়সা থাকতে থাকতে একদিন নগেনশশীকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এল। পকেটে টাকা ঝনঝনিয়ে হাটে গিয়ে গোলমাছ কেনে। নগেনও দেখি আর এক মানুষ—হেসে হেসে কথা বলে, দু-পাঁচটা কথার ফাঁকে মিষ্টি সুরে জামাইবাবু ডেকে নেয় একবার।

সেই তো দাদা সেই তো দিদি তেঁতুলতলায় ঘর—
তখন কেন দিতে দিদি হাতে চেপে সর ?

গগন নগেনের সঙ্গে সমান তালে হাসে, আর নিশ্বাস চেপে নেয়। টের না পেয়ে যায় যে চাকরিটা নেই।

কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গিয়েও ছুটি ফুরোয় না, তখন আর কিছু চাপা থাকে না। গগনবাবুদের গ্রামও অঞ্চল-ছাড়া নয়। একটা বর্ষা খেয়ে চালের সোনার বরণ খড় ইতিমধ্যে কটকটে কালো। ননদ-ভাজের পরনের কাপড় কোন্ কালে ছিঁড়ে গেছে। বাইরের আমদানী নগদ টাকা একবার ওরা হাতে পেয়েছে, বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে—আর শুনবে না। আবার লেগেছে: বাইরে যাও, রুজি-রোজগার করে আন। পাড়াসুদ্ধ লেগে গেল। শ্বশুরবাড়ির শুধুমাত্র নগেনশশী নয়—শাশুড়ী, তিন শালা, শালাজ, তাদের ছেলেপুলেরা অবধি এসে টিপ্পনী কাটে। কাছাকাছি বিয়ে করতে নেই—গগন ঠেকে শিখছে। বিনি-বউ তো মারমুখী হয়ে ওঠে এক এক সময়: জোয়ানবুবো মানুষ—অক্ষম অথর্ব নও। মেয়েমানুষের আঁচল ধরে থাকতে লজ্জা করে না তোমার?

কাজ বললেই পাওয়া যায় কোথা? শহরে গেলেই চাকরি—কুচো-চিংড়ির মতো চাকরির ভাগা দিয়ে রাখে—কার কাছে শোন যত বাজে কথা! কত দিকে খোঁজখবর নিচ্ছি, জান না তো!

এর মধ্যে আবার চারু এসে পড়ে। ভাইয়ে-ভাজে কথা, তার মধ্যে ছোট বোন। বলে, বেরিয়ে পড় দাদা। কত বড় দুনিয়া, মানুষ কাঁহা-কাঁহা মুলুক করে বেড়াচ্ছে। কাজ পাচ্চেও তো মানুষে—চাকরি জুটিয়ে কে তোমায় ঘর থেকে ডেকে নিয়ে যাবে?

গগন মরীয়া হল অবশেষে। সবই শত্রু। বউ পরের মেয়ে, তার কথা ধরি নে—মায়ের পেটের বোনটা অবধি। দেশছাড়া করবার জন্য যারা কোমর বেঁধে লেগেছে, সে-ও তাদের মুখদর্শন করতে চায় না। যাবেই সে চলে।

পাঁজি দেখাতে গেল আচায্যি ঠাকুরের বাড়ি। উৎকৃষ্ট দিন হওয়া চাই। রুজি-রোজগারের চেষ্টায় অঞ্চলের বাইরে একেবারে অজানা বিদেশে যাচ্ছে, গগনের কোন পুরুষে যা করে নি। তখন ক্ষেত-ভরা ধান, বিল-ভরা মাছ, গোয়াল-ভরা দুধাল গাইগরু। হায় সে সেকাল—ভাবেও নি পিতৃপুরুষেরা, কোন এক কালে এ বংশের মানুষের ঘর ছেড়ে বেরুতে হবে। সেই দুরদৃষ্টই যখন হল—অতি উৎকৃষ্ট রকমের দিনক্ষণ বেছে দিন ঠাকুর মশায়, অচিরে যাতে বড়লোক হয়ে টাকার আণ্ডিল নিয়ে আবার বাড়ি ফিরে পায়ের উপর পা রেখে কাটাতে পারি বাকি জীবন।

নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দর দিন বছরের মধ্যে ক'টাই বা। তা হোক, গগনের খুব তাড়া নেই। একটা দুটো মাস দেরিই যদি হয়, কী করা যাবে! দুনিয়ার কে চায় অদিনে অক্ষণে বেরিয়ে মারা পড়তে? অবশেষে মলমাস ব্যহস্পর্শ মঘা অশ্লেষা সংক্রান্তি পহেলা ইত্যাদি বাদ দিয়ে যোগিনীর অবস্থান ও তিথি-নক্ষত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাবপত্র করে দিন একটা সত্যিই বেছে দিলেন আচায্যি ঠাকুর। দিন নয়, রাত্রি—সন্ধ্যার পরে সাতটা-পাঁচ থেকে আটটা-বিয়াল্লিশ অবধি মহেন্দ্রযোগ। তিথিটা ত্রয়োদশীও বটে। ঐ সময়ের মধ্যে যাত্রা করতে হবে। মিত্তিরবাড়ি দেয়াল-ঘড়িতে টং-টং করে সাতটা বাজলে চারু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে: এইবার, এইবার—খারাপ সময় পড়ে যাবে এর পরে। হাতের মুঠোয় বেলপাতা নাও দাদা। দুর্গা-দুর্গা-দুর্গা—

দুর্গা নাম স্মরণ করে গগন চৌকাঠ পার হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজায় একঘটি জল, আমের পল্লব। মনটা হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, চোখে জল আসে। সত্যিকার আপন-জনেরা স্বর্গে চলে গেছেন—মা নেই, বাপ নেই। বোনও মনে মনে নিজেরটাই ভাবছে। পদ্মবালা থেকে আবার এক পদ্মিনী হবে—তাই সেই ধান্দায় বেরিয়ে পড়ুক। বিদেশে দূর করে দেবার জন্য একমাত্র বোন অবধি কোমর বেঁধেছে।

হায় সংসার, হায় রে টাকা !

রাত্রিবেলা যায় আর কোথায় ! তিন ক্রোশ এখান থেকে পাকা রাস্তা, সেই রাস্তায় বাস চলাচল করে। ভোর থাকতে রওনা হয়ে পয়লা-বাস ধরবে। বাসে সদর অবধি। সদর থেকে তার পরে যে জায়গা কপালে লেখা আছে। যমালয়ও হতে পারে। খুব সম্ভব সেইটাই। দুনিয়ায় টাকাপয়সা সকলের বড়। টাকার জন্যেই তাকে তাড়াচ্ছে। হ্যাঁ, তাড়িয়ে দেওয়া বইকি ! মেয়েলোক বলে ওরা দিব্যি ঘরবসত করবে, পুরুষ হয়েছে বলেই তাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে হবে এদেশ-সেদেশ। এই যাচ্ছে, আর আসবে না কোন দিন। তাই হোক ভগবান, ফিরে যেন না আসতে হয়।

যাত্রা করে আর ঘরের মধ্যে ঢোকা চলবে না। তাহলে যাত্রা ভেঙে গেল। রাত-টুকুর মতো গগন দাওয়ায় শুয়েছে। ঘুম আসে না, শুয়ে পড়ে আইঢাই করে। আকাশ-পাতাল ভাবে। কমবয়সী দু-জন মেয়েলোক—বিনি-বউয়ের বয়স বেশী নয়, চারু তো আরও ছেলেমানুষ—নিঃসহায় পড়ে থাকছে। নগেনশশী বারংবার বলেছে, কী জন্যে এখানে পড়ে থাকবে, আমাদের বাড়ি গিয়ে উঠুক যত দিন না তুমি ফিরে আসছ। বিনি চারু দু-জনেই—চারুও বোন আমাদের—বোনদের দু-বেলা চাট্টি ভাত দিতে পারব, তার জন্য আটকাবে না।

কিন্তু চারুর বিষম জেদ : পাড়ায় এত মানুষ রয়েছে—একা আমরা কিসে ? ভরতের মা বুড়ী থাকে, তার উপর ভরত এসে রাত্রিবেলা শোবে। অন্য মানুষ লাগবে না। দরকার বুঝি, তখন ও-বাড়ি যাব।

নগেনের আড়ালে বলে,বউদি না-হয় যাক চলে। বড়মানুষের বোন—এখানে পড়ে পড়ে কষ্ট করবে কেন ? রাত্রিবেলা আমি মিত্তিরবাড়ি গিয়ে শোব। প্রাণ যায় সে-স্বীকার, ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি উঠব না। নগনা-খোঁড়া লোক সুবিধের নয়।

মোটের উপর এ সম্পর্কে পাকাপাকি কিছু হল না। গগন বেশী কিছু বলে না। বলতে গেলে ধরে নেবে, কোন এক ছুতো খুঁজে যাওয়াটা পণ্ড করার তালে আছে। এই নিয়ে বচন ঝাড়বে। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী রক্ষাকালী-মায়ের পাদপদ্মে ভরসা করে রেখে যাচ্ছে, যা হবার হোক গে।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। আঃ উঃ—করে বার কয়েক। মাগো—বলে অস্ফুট একটু আর্তনাদ। ঘরের মধ্যে বিনোদিনীও ঘুমোয় নি, তক্তাপোশে নড়াচড়ার শব্দে বোঝা যায়। বিনি বলে, কি হল ?

কিছু না, একটু জল দিতে পার ?

ঘেরোয় জল ভরে নিয়ে বিনি বাইরে এল। ঢক-ঢক করে গগন সমস্তটা জল টাকরায় ঢেলে দেয়। জল খেয়ে মুখ মোছে কাপড়ের প্রান্তে। নিশিরাত্রে চাঁদ উঠেছে, নারিকেলগাছের ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়েছে উঠানে। বউকে বলে, বসো না একটুখানি, বসে পড় এই মাদুরে। যাত্রা নষ্ট হবে না তুমি একটুখানি বসলে।

বিনি বলে, ঘুম ধরেছে, বসতে পারছি নে।

গগন সকাতরে বলে, বসো, কাল আর এসব কিছু বলতে যাব না।

বসে পড়ল বউ। এত করে বলছে, না বসে পারে কেমন করে ? কথাবার্তা কিছু নয়। বিয়ের পর এই পাঁচ বছরে এত কথা বলেছে যে মাঝরাতে ঘুম কামাই করে বলবার মতন কিছু নেই। কথা বলে আর মায়া বাড়াবে না। অবহেলাই দেখাবে বেশী করে, তাতে যদি পৌরুষে লাগে।

চুপচাপ একটুখানি বসে হাই তুলে বিনি-বউ উঠে দাঁড়াল : শুই গে।

ঘরে ঢুকে বিনি দরোর বন্ধ করছে। গগন বলে, খিল দিও না গো—

বিনি ব্যঙ্গের সুরে বলে, ভারি যে মরদ! ভূতের ভয়?

এবারে গগন গর্জন করে ওঠে : দাও, দরজা দাও তুমি। খিল আঁট।

তাকমন্দ জবাব না দিয়ে বিনি-বউ তক্তাপোশে উঠল। গগন বলে, দিলে না খিল? খিল না দাও তো দিব্যি-দিলেশা দেব।

বিনোদিনী বলে, চেঁচিও না। ও-ঘরে চারু আর ভরতের মা। ওরা শুনতে পাবে।

না, মরদের খোঁটা যখন দিয়েছ, খিল তোমায় দিতেই হবে। চলে যাচ্ছি—তখন আর কিসের লাজ-ভয়, কিসের মায়াদয়া?

ঘরের ভিতরে সাড়াশব্দ নেই।

গগন বলে, ঘুমুলে ছাড়ব না। ঘরে ঢুকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তুলে দরজা দেওয়াব।

এবারে জবাব আসে : ঐ ভয়েই তো খিল এঁটে দিচ্ছিলাম। খিল না দিলে ঢুকে পড় আবার যদি। তা তুমি পার, যাত্রাটা ভেঙে যায় তাহলে। রক্ষে পাও।

চেহারা মিষ্টি-মিষ্টি হলে কি হয়, বিনির কথায় বিষম ধার। ঘরে গিয়ে আবার ওর আঁচলের তলে যাব, সেই জন্যেই নাকি খিল আঁটছিল। চলে যাবার ক্ষণে এত বড় কথাটা মুখে আটকাল না বউর।

গগন বলে, দাও বলছি দুয়োরে খিল। না দিলেও ও-চৌকাঠ এ জন্মে আর মাড়াচ্ছি নে। আজ নয়, কোন দিন নয়। কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে মরলেও নয়। গাঁড়ারের গোঁ, আর মরদের গোঁ।

কান্নাকাটি ও মাথা খোঁড়াখুঁড়ির ভবিষ্যতে যত বড় আশঙ্কাই থাকুক, আপাতত ও-তরফ নিঃশব্দ। সংসারের নিকুচি করেছে।

আরও খানিকটা এপাশ-ওপাশ করে গগন উঠে বসল। তামাকের পিপাসা পেয়েছে। তামাকের ভাঁড় দাওয়ায়। গোয়ালে মশা তাড়ানোর জন্য সাঁজালের আগুনও আছে। কিন্তু হুঁকোকলকে ঘরের মধ্যে। যাত্রা করবার মুখে এক ছিলিম খেয়েছিল তক্তাপোশের উপর মৌজ করে বসে ; খাওয়া অন্তে তক্তাপোশের পায়ার পাশে বেড়ায় ঠেসান দিয়ে রেখেছিল। হুঁকো বিহনে হাতের চেটোয় কলকে বসিয়ে অবশ্য টানা চলে। কিন্তু কলকেরও অভাব। এদিক-ওদিক ঘুরে দেখল অতিরিক্ত কলকে যদি পড়ে থাকে কোথাও। নেই।

পাষণ্ড বিনিকে ডেকে তুলে সে কলকে চাইবে না, প্রাণ গেলেও না। দরকার নেই তামাক খাওয়ার।

উঠানের পূর্ব দিকে পুকুর। ভিটেয় মাটি তুলে তুলে পুকুর মতো হয়েছে। খেজুরগুঁড়ির ঘাট, টোকা পেণ্ডলায় জল ঢাকা। ঘাটের সামনেটায় তিনখানা বাঁশ তিন পাশে বেঁধে পেণ্ডলা আটকানো। ঘাটে নেমে গগন মাথায় ঘাড়ে আচ্ছা করে জলের ঝাপটা দিল। দেহ শীতল হোক, ঘুম আসুক। ঘুম, ঘুম, ঘুম। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগের রাতে দাওয়ার উপর মনের মতন একখানা ঘুম দেবে। দুনিয়ার কাউকে সে চায় না,, কারো জন্য কোন মাথাব্যথা নেই...

আদিম মানুষ গোষ্ঠী ছেড়ে বেরুল—সে-ও রাত কাটিয়েছিল এমনি বিনিদ্র ভাবে? খাদ্য মেলে না, বেরুতেই হল। যে ভূমিটুকু জনার মধ্যে, তার বাইরেও

চতুর্দিক রহস্যময়। কত ভাবনা বেদনা চেনা গাঁও ছাড়তে! গগনও চেয়ে থাকে। তার পরিচিত এই অঞ্চলটির বাইরে কী আছে। মানুষ থাকে, না জন্তু-জানোয়ার? হয়তো বা আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়ে, পাতাল থেকে তুফান ওঠে। ভূমিকম্পে ফেটে চৌচির হবে যে জায়গায় সে পা ফেলবে। কী যে হবে, ঘরে বসে কে সঠিক বলতে পারে?

আবার শুয়ে পড়ে ঘুমের চেষ্টা করছে। একটু যদি তন্দ্রার ভাব এসেছে, কত রকম স্বপ্ন! যেন বোধন-গাছ থেকে দৈত্য নেমে এসে টুঁটি ধরে উঁচু করে তুলেছে তাকে। ছুঁড়ে দিচ্ছে দূর-দূরান্তরে। আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠত—ভাগ্যিস তত দূর হয় নি—ঘুম ভেঙে বিনি তা হলে আবার কোন এক ক্ষুরধার উক্তি ঝাড়ত বসত। কানের ভিতর রি রি করে জ্বলত অবশিষ্ট রাত্রিটুকু।

না—ঘুমুলে যদি এমনি স্বপ্ন আসে, তার চেয়ে জেগে থাকাই ভাল। কতই বা রাত আছে, জেগে বসেই রাতটুকু কাটাবে। হাওয়া দিয়েছে, শীত ধরে উঠল। একটা কাঁথা-টাঁথা হলে ভাল হয়। কিন্তু চাওয়ার জো নেই—মনে ভাববে, ছুতো করে বিনিকে বাইরে ডাকছি।

মানুষ না পাখী! কেবলই ওড়া, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না।

জেগে রয়েছে, তবে একটা-দুটো কথা না বলে পারে কি করে! মনের চিন্তা কথায় ফুটে উঠেছে। গগন কথা বলে বলে ভাবছে।

পাখী বই কি! সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যে, রাত দুপুরে এই দাওয়ার উপর।

খিল-খিল করে হাসি ফেটে পড়ল দক্ষিণের ঘর থেকে। চারু হাসছে। জেগে আছে তাহলে চারু? কিংবা এক ঘুম ঘুমিয়ে হয়তো এইমাত্র জেগে উঠল। মায়ের পেটের বোন কিনা—মায়া-দয়া আছে। আর এদিকে আর একজনকে দেখ, গগনকে বাইরে সরিয়ে দিয়ে বড্ড জুত হয়েছে নিরুপদ্রবে ঘুমোনোর।

চারু বলে, দাদা কি বলছ একা-একা?

হাওয়া দিয়েছে, শীত ধরেছে বড্ড। জেগে আছিস যে চারু, ঘুম হচ্ছে না?

চারু বেরিয়ে এল। বললে, ভরতের মা আসে নি—যাত্রা শুনতে গিয়ে আসলেই বুড়ী হয়তো ঘুমিয়ে আছে। একা একা ভয় করছে, তুমি দাদা দক্ষিণের ঘরে যাও। ঘরের মধ্যে শীত করবে না। আমি বউদির সঙ্গে শুয়ে পড়ি।

যুক্তি ভাল। দক্ষিণের ঘরে একজন কারো থাকারও দরকার। গগন গিয়ে শুয়ে পড়লে। ও-ঘরে শুলে যাত্রা ভাঙবে না।

চারু এদিকে ঘুমন্ত বিনোদিনীর গা ঝাঁকাচ্ছে: শুনছ, শিগগির ওঠ বউদি।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বিনি বলে, কি রে?

একবার চল দক্ষিণের ঘরে। ভরতের মা আসে নি। মাচার উপর হাঁড়ি-ভাঁড়-গুলো ঢকঢক করছে।

বিনি বলে, ইঁদুর। আমসত্ত্বের গন্ধে ঐ উঁচুতে উঠে পড়েছে। বিড়ালগুলো কোন কাজের নয়।

ইঁদুর কি অন্য-কিছু, কেমন করে বলি। হেরিকেন জ্বালতে পারছি নে। দেশ-লাইটা নিয়ে চল একবার। দেখে আসবে।

আমসত্ত্ব নিয়ে বিনোদিনীরও উদ্বেগ খুব। ঘুম-চোখে হন্তদন্ত হয়ে দক্ষিণের ঘরে ঢুকেছে—পোড়ারমুখী চারু অমনি বাইরে থেকে ঝনাৎ করে দরজায় শিকল তুলে দিল।

কি রে ?

চারু খিল-খিল করে হেসে বলে, তোমার তক্তাপোশে আমি আরাম করে শুই গো। রাত দুপুরে হাঁকডাক করতে যেও না। ডেকে সাড়াও পাবে না।

চারু, ওরে বজ্জাত, দুয়োর খোল বলছি—

গগন প্রসন্ন মুখে তড়পাচ্ছে : না, কারো এখানে এসে দরকার নেই। বেশ তো আছি। একাই থাকব।

দুই

গগন বেরিয়ে পড়ল। রক্ষাকালীতলা গ্রাম-সীমানায়। জোড়া বট-অশ্বত্থ—মূলবৃক্ষ বটের দু-পাশে অশ্বত্থের দুই প্রকাণ্ড ডাল ভূমির সমান্তরে ঝুরির উপরে ভর দিয়ে আছে। যেন দুই হাতে গ্রাম আগলে রয়েছেন দেবী। গ্রাম ছেড়ে মাঠের রাস্তা এইবার। তার আগে দেবীস্থানে গগন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে : তোমার পায়ে রেখে যাচ্ছি। ফিরে আসি কিনা কে জানে—করুণা রেখো মা-জননী অবলা মেয়েলোক দুটোর উপর।

কোথায় কাজকর্ম, কী কায়দায় যোগাড় হবে—কিছুমাত্র জানা নেই—দুনিয়া এক অথই দরিয়া। সদরে একমাত্র জানা মানুষ ভবসিন্ধু গণ—তাঁর বাসায় গিয়ে উঠল।

একটা কাজকর্ম করে দিন উকিলবাবু। গাঁয়ে পড়ে থেকে চলে না। আপনাকে ছাড়া জানি নে, তাই এসে পড়লাম।

ভবসিন্ধু শুনে বললেন, কাজ কি সস্তা হে? লেখাপড়া জান না, কি কাজ করবে তুমি ?

গগন অবাক হয়ে বলে, কী বলেন, জানি তো লেখাপড়া। আপনার বাড়িতেই কত লেখাপড়ার কাজ করেছি।

ভবসিন্ধু হাসলেন : বানান করে দুটো বাংলা কথা লিখলেই লেখাপড়া জানা বলে না। কত বি-এ এম-এ ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। উকিলের মুহুরী—তা-ও আজকাল ম্যাট্রিক পাশের নীচে নিচ্ছে না।

গ্রামের মধ্যে গগনের খাতির। গোটা গোটা অক্ষরে পাতার পর পাতা সে লিখে যেতে পারে, বাধে না। চিঠি পড়াতে আসে কত লোক। খত-হ্যাণ্ডনোট লেখাতে আসে। যখন বয়স খুব কম ছিল, নতুন বিয়ের মেয়েরা প্রেমপত্র লেখাতে আসত গগনের কাছে। কিন্তু কী নির্মম শহুরে বাসিন্দা এঁরা। চিরকালের প্রতিষ্ঠা এক কথায় চুরমার করে দিয়ে ভবসিন্ধু গণ তাকে মুর্খ বলে দিলেন।

তবু কিন্তু আশ্রয় দিলেন বাসায় : এসে যখন পড়েছ, দু চারদিন থেকে চেষ্টা-চরিত্র করে দেখ। আমিও দেখি। দেশের মানুষ তো বটে। তার উপরে কর্মচারী ছিলে আমাদের।

একটু ভেবে বললেন, বার-লাইব্রেরির বুড়ো দপ্তরীটা মরে গেছে। লোক নেবে। বলে-কয়ে দেখব ওদের।

মফস্বল উকিলের বাসা। বাইরে বড় চৌরিঘরে তক্তাপোশ পেতে ফরাস পাতা। উকিলবাবুর সেরেস্তা। এক পাশে দেশী মিস্ত্রির কাঁঠালকাঠে-গড়া চেয়ার ও টেবিল—সেটা উকিলবাবুর জন্যে, মুহুরী দু-জন হাতবাক্স কোলে করে ফরাসে বসে। মক্কেলরাও ওঠা-বসা করে ফরাসের উপর। রাত্রিবেলা সেরেস্তার কাজকর্ম সেরে ভবসিন্ধু ভিতর-

বাড়ি চলে যান। হাতবাক্স ও কাগজপত্র সরিয়ে নেয় ফরাস থেকে ; সারি সারি বালিশ পড়ে। মক্কেলরা অনেকে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে পড়ে এসে এখানে।

গগনও আছে। রোজ রোজ হোটেলে খাওয়ার পয়সা কোথা ? সে থাকে উকিলবাবুর বাসায়, শোয় ফরাসের এক পাশে। বার-লাইব্রেরির কাজটার জন্য ভবসিন্ধুকে তাগিদ দেয়। তিনি হবে-হবে করেন : লোক নেয় নি এখনো। বার কর্তার ব্যাপার তো—কবে নেবে কিছু বলা যায় না। সেই ভরসায় গগন চুপ করে থাকতে পারে না। অহরহ কাজের ধান্দায় ঘোরে। রাত্রিবেলাও বিরাম নেই। পাশে যারা শুয়ে আছে তাদের বলে, চাকরির খবর দিতে পারেন মশায়রা কেউ ? অচল অবস্থা, ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

মনোহর নামে একদিন এক মক্কেল এল। শোনা গেল ডাক্তার। শাঁসালো ব্যক্তি, ভবসিন্ধুর খাতির দেখে বোঝা যায়। হোটেলে যেতে দিলেন না তাকে—কিছুতে নয়। সন্ধ্যাবেলা কাছারি থেকে ফিরে এসে ভবসিন্ধু গগনকে বাজারে পাঠালেন অতিরিক্ত কিছু মাছ কিনে আনবার জন্য। মনোহরের বিছানাও বাইরের ফরাসে বটে, কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে তাঁর জন্য ফরসা চাদর ও মশারি আসে। গগন পরিপাটি করে চাদর পেতে মশারি টাঙিয়ে দিল। তার পর যথারীতি দরবার করে : কোন একটা চাকরি-বাকরি যদি দেন জুটিয়ে—

মনোহর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিচয় নিল। উল্লসিত হয়ে বলে, আরে, স্বজাতির ছেলে তুমি। চল আমাদের কোকিলবাড়ি, আলবৎ চাকরী করে দেব। একলা একঘর আছি ওখানে, আর সমস্ত ভিন্ন জাত। যেদিন মরব, মড়া বয়ে নেবার চারটে লোক হবে না। অজাত-কুজাত কাঁধে করে ঘাটে নেবে। সেইজন্যে ঠিক করেছি, স্বজাতের মানুষ পেলে ঘর বেঁধে জমি-জিরেতের ব্যবস্থা করে দেব। গুরুঠাকুরের যত্নে রাখব। তা যেতে চায় কি কেউ ? পেটে না খেয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে থাকবে, চেনা অঞ্চলের বাইরে তবু নড়ে-চড়ে দেখবে না।

বড় বেশী আগ্রহ দেখাচ্ছে। গগন তাতে ঘাবড়ে যায়। কত দূরে—কোন্ অজানা জায়গা না-জানি। বলে, কোন্ পথে কী ভাবে যেতে হয় বলেন দিকি।

যাওয়ায় কিছু কষ্ট বটে। কিন্তু কষ্ট ছাড়া কেষ্ট মেলে না। বলি, আমি গিয়ে পড়েছিলাম কেমন করে ? এখন তো ভাল। কত মানুষ গিয়ে ঘর বেঁধেছে, গ্রাম বসে গেছে। গ্রাম কোকিলবাড়ি, পরগনে রামচন্দ্রপুর, থানা শোলাডাঙা। সমস্ত চিহ্নিত একেবারে। ডাঙার উপর বাঁধা রাস্তা, জলের উপর নৌকো-ডিঙি—

মনোহর যখন গিয়ে বসতি পত্তন করে, সে কী অবস্থা ! বাঘের ডাক শোনা যেত। সন্ধ্যা হলে বউকে ছেড়ে দাওয়ায় বেরুনোর জো নেই, বউ কেঁপে মরে। এখন লোকজনে গমগম করে মনোহরের ডাক্তারখানা। দিন পালটে গেছে। আরও যাবে—সবুর কর না পাঁচটা-সাতটা বছর।

বলে, চক-মেলানো দালান দেব—ইট কাটাচ্ছি এবারে। তারই কয়লার যোগাড়ে এসেছিলাম। এসে পড়েছি তো উকিল মশায় নিলামে দুটো গাঁতি ডেকে দিলেন। কাজকর্ম চুকে গেল, পরশুদিন ফিরে যাচ্ছি। তা আমার সঙ্গেই চল না কেন। আমি তো হেঁটে যাব না। মনোহর ডাক্তার পায়ে হাঁটবে, সে কেমন। নৌকো নিয়ে নেব, যে ভাড়াই লাগুক। সে-ভাড়া নেপিছোপ লোকে দিয়ে উঠতে পারবে না। সমস্তখানি পথ আমার সঙ্গে দিব্যি নৌকোয় চলে যাবে।

গগন চুপ করে থাকে। শহর জায়গা ছেড়ে এক কথায় অমনি যায় কেমন করে? নিজের চাকরিই শুধু নয়, বোনের দায় ঘাড়ের উপর। হাসপাতালের নার্স হোক কিংবা যা-ই কিছু করুক বোনের কাজ শহরের উপর। নার্স হওয়ার কায়দাটা কি—কত জনকে জিজ্ঞাসা করল, কেউ কোন হদিস দিতে পারে না।

মনোহর বলছে, গিয়ে দেখই না হে! আমরা সেই গিয়ে পড়লাম—বাইরের মানুষ দেখবার জন্য হাঁপিয়ে উঠতাম মাঝে মাঝে। মানুষ দেখতে চলে গেছি কুমির-মারির হাট অবধি। হাট আর কি—তখন গাঙের ধারে খান দেড়েক চালাঘর। হাটের সময় কিছু দোকানপাট আর খদ্দেরপত্তর এসে জমত। তাই দেখবার জন্য যেতাম। নৌকো জোটে নি তো কাদা ভেঙে খাল সাঁতরে চলে গেছি। সেই কুমিরমারি এখন গিয়ে দেখ গে। আমাদের বাজার কলকাতা। ভাতের হোটেল অবধি খুলেছে সেখানে। তা শোন, আমার নিজেরই একজন ভাল লোকের দরকার। পুরোনো কম্পাউন্ডার প্রায় সমস্ত শিখে জেনে নিল। পুরো ডাক্তার হয়ে কবে বেরিয়ে পড়ে! স্বজাতির ছেলে তোমায় পেলে আমি আস্তে আস্তে তার জায়গায় বসিয়ে দেব।

লোভনীয় প্রস্তাব বটে, কিন্তু চারুবালার কি করা যায়? বোনের সমস্যা যাকে তাকে খুলে বলা চলে না। গৃহস্থঘরের মেয়ে গাঁয়ে পড়ে থেকে উপোস করুক অথবা কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি করুক—এসব বরঞ্চ ভাল, কিন্তু শহরে গিয়ে কাজকর্ম করবে অনেকে তাতে নাক সিঁটকায়, কাজ নিয়ে একবার দাঁড়িয়ে যেতে পারলে তখন অবশ্য আলাদা কথা। গগন বলে, আমি পরে যাব ডাক্তারবাবু। পথটা ভাল করে বাতলে দিয়ে যান। উকিল-লাইব্রেরিতে একটা চাকরির কথা হচ্ছে, হেস্তনেস্ত না হলে যেতে পারছি নে।

আদ্যোপান্ত শুনে মনোহর বলে, ভারি তো চাকরি! উকিল মশায়দের তামাক সাজা, আর জলের গেলাসটা কি আইনের বইখানা এগিয়ে দেওয়া। কম্পাউন্ডারির চেয়ে বেশী মানের হবে সেটা?

তবু ধরুন, দশটা ভাল লোকের সঙ্গে শহর জায়গায় থাকা। এর পরে ভাল কিছু জুটতে পারে। অন্যের জন্যেও জোটানো যায়।

মনোহর ক্ষেপে গেল: শহর আর শহর—ওই তো মরণ হয়েছে মানুষের। ঝাঁকে ঝাঁকে শহরে এসে মরবে আলোর পোকার মতন। বলি, আছে কি শহরে? গাদা গাদা পোড়া ইট—রসকষ যা-কিছু হাজার লক্ষ মানুষ আগেভাগে শুষে মেরে দিয়েছে। বাঁদুড়চোষা আমের আঁঠি দেখেছ, সেই জিনিষ।

মনোহর একা ফিরে গেল। গগনকে পথ বুঝিয়ে দিয়ে যায়: শহরের নেশা কাটুক, তারপরে গরজ বোঝ তো যেও চলে। কোকিলবাড়ি। কোকিলবাড়ি ডাক্তারবাবুর নাম করো, যে না সে-ই দেখিয়ে দেবে।

কথাটা ভবসিন্ধুর কানে উঠল। অবাক হয়ে তিনি বলেন, গেলে না তুমি—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিলে? ডাক্তারের ময়লা কাপড় আর তালি-দেওয়া জুতো দেখে ঘাবড়ে গেলে, কিন্তু দক্ষিণ দেশের চালচলন ওই। আমাদের মতন দুটো-চারটে উকিল-হাকিম মনোহর ডাক্তার নগদ টাকায় কিনে রাখতে পারে।

অন্তঃপুরেও গিয়ে থাকবে কথাটা। উকিল-গিন্নীর মুখ বেজার। শোনা গেল, রাঁধুনি-বামুনকে বলছেন, কদ্দিন পড়ে পড়ে খাবে জিজ্ঞাসা করো তো। নিখরচার হোটেলখানা পেয়েছে। আমাদেরও হয়েছে, দেশের লোক বলে চক্ষুলজ্জায় কিছু

বলতে পারি নে।

অন্তরাল থেকে শোনা অবধি গগন কিছুতে গিন্নীর মুখোমুখি হয় না। চক্ষুলজ্জা টেবাৎ যদি কাটিয়ে ওঠেন, সোজাসুজি বলে যেন যদি ঐ কথাগুলো? সকলের খাওয়াদাওয়া মিটে গেলে ভৃত্য নিমাই ও বামনঠাকুরের সঙ্গে একপাশে সে কলাপাতা পেড়ে বসে। শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, খোয়াঘুরিতে দেরি হয়ে যায়। লাইব্রেরির চাকরি তো হয়েই আছে ষোলআনা। আরও তিন-চার জায়গায় কথাবার্তা চলছে। একটা না একটা গেঁথে যাবে নির্ঘাৎ। তোমাদের মায়া কাটাব এবারে নিমাই। বড্ড ভাল লোক তোমরা।

নিমাইয়েব সত্যি সত্যি কেমন টান পড়েছে গগনের উপর। বাবুদের জলখাবার থেকে দু-পাঁচখানা লুচি সরিয়ে রাখে ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ফাঁক মতন বের করে খায়। গগনকে কাছাকাছি পায় তো বলে, কলাবনে যাও দিকি একবার। ভাব কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? বলছি, গরজ আছে—যাও না।

রান্নাঘরের পিছনে কলাবন। লুচি-মোহনভোগে দলা পাকিয়ে হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে বলে, হাঁ করে কি দেখ, গিলে ফেল তাড়াতাড়ি। সব সুদ্ধ গালে ভরে দাও। কে কোন্ দিকে দেখে ফেলবে।

ভালবাসা না থাকলে এমন হয় না।

অনেক দিন বাড়ি-ছাড়া—মাঝে মাঝে গগনের মন বড্ড খারাপ হয়ে পড়ে। যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কোন্ মুখ নিয়ে যায়? কত জনকে বলল, একটুকু আশা দেয় না কেউ। ভরসা এখন উকিল-লাইব্রেরির কাজটা। এখনো লোক নেয় নি, লাইব্রেরির কেরানীবাবুর কাছ থেকে জেনে এসেছে। এটা যদি হাত-ছাড়া হয়, সর্বশেষ তখন মনোহর ডাক্তার। সেই দূর আবাদ-অঞ্চলে পয়সাকড়ির হয়তো মুখ দেখবে, কিন্তু চারুবালার সুব্যবস্থা কোন দিন হয়ে উঠবে না।

খোর হয়েছে। গগন এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়ায়, রাত্রি করে বাসায় ফেরে বাড়ির লোকের খাওয়াদাওয়া মিটে গেলে। ঘুরতে ঘুরতে আজ বাজারের দিকে এসে পড়েছে। আধেলার বিড়ি কিনে একটা সবে ধরিয়েছে, কোন্ দিক দিয়ে নিমাই এসে হাত পাতে: প্রসাদ দাও দাদা।

দুটো টানও দেয় নি, ছিনিয়ে নিল মুখের বিড়ি। নিজের মুখে পুরে ফকফক করে টানছে।

গগন বলে, কাজকর্ম ছেড়ে এখন কি করতে বাজারে এলি?

বাবুর হুঁকোর নলচে ভেঙে গেল। মক্কেল এসে পড়েছে, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া না দিলে হবে না। এখুনি হুঁকো কিনে নিয়ে যাবার হুকুম।

হাসল খানিক হি-হি করে। গগনের হাত ধরে টানে: চল না, পছন্দ করে দেবে একটা ভাল জিনিস?

হুঁকো ওদিকে কোথা?

নিমাইয়ের হাসি বেড়ে যায়: কতকগুলো মাল দেখাব। চলে এস।

প্রথমটা বুঝতে পারে নি, সোজা পথ ছেড়ে ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ঢুকতে যায় কেন। খারাপ পাড়া—এই সন্ধ্যাবেলাতেই পাড়াগাঁয়ের রথের মেলার মতো ভিড়। চাদরে মুখ ঢেকে হনহন করে গলিতে ঢুকে পড়ছে অনেকে। একটা পানের দোকানের কাছে পাঁচ ছ'টা মেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কোন মজাদার কথায় হি-হি করে হাসছে। এদের দু-জনকে দেখছে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে।

নিমাই ফিসফিসিয়ে বলে, বামনঠাকুর রাত্রে বাসায় যায়। সে বাসা এই পাড়ায়। গোলাপীর বাড়ি। টাকাপয়সা ঠাকুর কী-ই বা দিতে পারে—গোলাপীর সে পিরীতের মানুষ। সন্ধ্যারাত্রে গোলাপী তাই যন্দুর পারে রোজগার করে নেয়। এতক্ষণে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, দেখিয়ে দেব।

কিন্তু গোলাপীর বাড়ি যাওয়ার আগে আর এক আশ্চর্য দেখা হল। পাকা দালান, বাড়িটা নতুন। রোয়াকে জোরালো পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে। আর যত দেখে এল, সে তুলনায় এ বাড়ির মেয়েগুলোর ধরন কিছু আলাদা ; বেশভূষায় বোঝা যায় স্বচ্ছল অবস্থা।

চমক লাগে গগনের : তুমি পদ্মবালা না ?

পদ্মবালা চোখ তুলে দেখে। এক মুহূর্তে ছাই মেড়ে দেয় তার মুখের উপর। পালিয়ে যাচ্ছে ভিতরে।

খুড়ি পদ্মবালা তুমি কেন হতে যাবে—পদ্মিনী। এই তোমার হাসপাতাল, নার্সগিরি এই গলির ভিতরে।

পদ্মবালা মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে : মর মুখপোড়া! কাকে কী বলছিস ?

পাক দিয়ে পিছন ফিরে ফরফর করে সে চলে গেল। উজ্জ্বল পেট্রোম্যাক্সের আলো পড়ে মুখের উপর। তিলমাত্র সন্দেহের হেতু নেই।

নিমাই হাসছে : চেনাজানা বুঝি—আপনার লোক ? চল না, ভিতরে গিয়ে আলাপ-সালাপ করে আসি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আচমকা অমন ডাকতে নেই। লজ্জা পেয়ে যায়।

ঘৃণায় রি-রি করছে গগনের সর্বদেহ। বলে, উঁহু, ভুল করেছিলাম। কতকটা এই রকম দেখতে সে মেয়েটা। চল, বেরিয়ে পড়ি।

কোন রকমে গলিটুকু কাটিয়ে বাজারের মধ্যে পড়লে সে বাঁচে। ভবসিন্ধুর সঙ্গে একদিন চারুবালার কথা হয়েছিল। নার্সের কাজে ঢোকানো যায় কিনা। ভবসিন্ধু বললেন, নার্স হওয়া কি চাট্টিখানি কথা! ঐটুকু বিদ্যেয় কী হবে ? কত বলে পাশ-করা মেয়ে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে।

সেই সময় পদ্মবালার কথা মনে এসেছিল। তার তো অক্ষর-পরিচয়ও ছিল না। উকিলবাবুই কিছু করতে চান না—হাবিজাবি বলে পাশ কাটাচ্ছেন। কিন্তু পদ্মবালাকে দেখবার পর আজ ভাবছে, লম্বা লম্বা কথা বলে গাঁয়ের মানুষের কাছে যারা পশার বাড়ায়, না-জানি তাদের কতজনার রোজগার এমনিধারা পদ্মবালার গলিতে!

ক'দিন পরে বোধকরি অন্তঃপুরের তাড়া খেয়ে ভবসিন্ধু গণ গগনকে কাছারিঘরে ডেকে পাঠালেন।

কী হল তোমার ?

গগন ভবসিন্ধুকে পালটা প্রশ্ন করে, সেই কাজটার কী হল উকিলবাবু ? আশায় আশায় দিন গণছি।

ভবসিন্ধু বলেন, বার লাইব্রেরির সেইটা তো ? এখন বিশ বাঁও জলের নিচে। সে কাজ তোমারই হবে, তার কোন স্থিরতা নেই। হবেই না, ধরে নিতে পার। মনোহর ডাক্তার বলে গেছে—আমি বলি, মিছে ঘোরাঘুরি না করে তার সেই কোকিল-

বাড়ি গিয়ে পড় তুমি।

গগন বলে, আপনি কিন্তু কত ভরসা দিয়েছিলেন।

তখন কি জানি এত দূরে? কুড়ি টাকা মাইনে, তার জন্য দু-কুড়ি তিন-কুড়ি দরখাস্ত পড়ে গেছে। হাকিমরা অবধি সুপারিশ করে পাঠাচ্ছেন। এই পোড়া দেশে কোন রকমের পিত্যেশ রেখো না। দুটো টাকা আমার ফী—তা দেখ, কাছার খুঁটে টাকা বেঁধে মক্কেলে হাত চিত করে আধ্‌খুলি বের করে।

গগনেরও বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। কী দরকার পরের গলগ্রহ হয়ে শহর জায়গায় পড়ে থাকা! বোনেরও সুরাহা হচ্ছে না। বরঞ্চ গাঁয়ে-ঘরে মুখ থুবড়ে মরুক, এমন শহুরে রোজগারের ধান্দায় কোন মেয়ে বেরিয়ে না আসে। ভবীসিন্ধু বললেন, এখানে এই দেখছ, আর উত্তর অঞ্চলে—অনেক উত্তরে আছে কলকাতা শহর। শহরের রাজা কলকাতা। যত বড় জায়গা, তত মানুষের কষ্ট। মানুষ কিলবিল করে পোকা-মাকড়ের মতো। মাথার উপর আচ্ছাদন নেই, পথে পড়ে রাত কাটায়। দিনমানে টেঁড়িক বাহারে কিন্তু টের পেতে দেবে না। হরি-মটর খাবে আর লারেলাপ্পা গাবে। তাই বলি, উত্তর মুখো নয়—যাবে তো দক্ষিণে মুখ ফেরাও। নাবালের ভাঁটি অঞ্চলে আছে কিছু এখনো। যত নামবে তত ভিড় কম। খাটো নজর মানুষের, ঐসব দূরের জায়গা দেখতে পায় না। যাতায়াতের কষ্ট, তাতেই আরও মঙ্গল। মুখের অন্ন এদেশ-সেদেশ চালান হয়ে যেতে পারে না। উপস্থিত একটা জায়গা তো পেয়ে যাচ্ছ—মনোহর ডাক্তারের কোকিলবাড়ি।

তিন

কতদূরে সেই কোকিলবাড়ি, কতক্ষণ লাগবে না জানি পেঁছিতে!

রেলের পথ দু-ঘণ্টার। তারপর থেকে পায়ে হাঁটা চলেছে। হাঁটছে অবিরত। গাঙ-খালের ঠাসবুনানি। দশ পা ডাঙায় হাঁটে তো বিশ পা জলে। কোথাও পায়ের পাতা ডোবে, কোথাও হাঁটু-জল, আবার কোনখানে সাঁতার কাটতে হচ্ছে দস্তুরমতো। ভয়টা জলে নয়, কাদায়। নোনা কাদা—প্রেমকাদা যার নাম। আঠার মতো চটচটে। পায়ে লেপটে যায়, এক একখানা ওজনে আট-দশ সের হয়ে দাঁড়ায়। জলের মধ্যে অনেকক্ষণ রগড়ে রগড়ে সেই পা আবার সচল করে নিতে হয়। নতুন জায়গায় যাচ্ছে বলে গগন পরনের কাপড়-জামা ধবধবে ফর্সা করে এনেছে। সতর্ক হয়ে চলেছে, তবু জলে ভিজে কাদা মেখে এমন চিত্তবিচিত্র অবস্থা।

কোকিলবাড়ি কোন্ পথে, ও ভাই?

একজনে বলে ডাইনে। পরক্ষণে যাকে পাওয়া গেল, সে বাঁ-দিক দেখিয়ে দেয়। পথ মানে ঘাসবনের মধ্যে মানুষ-গরুর অস্পষ্ট চলাচলের চিহ্ন—ঠাহর করে দেখতে হয়। জ্যোৎস্না পেয়ে তিন পহর রাতে হাঁটনা শুরু করেছে। তখন থেকে এমনি চলছে।

একজনে ভ্রুভঙ্গি করে বলে, কে জানে বাপু, কোথায় তোমার কোকিলবাড়ি? হাত পঞ্চাশেক বন হাসিল করে খান পাঁচ-সাত চালাঘর তুলে দেদার গ্রাম বসিয়ে গেছে। নামের তো মা-বাপ নেই—কাক-কোকিল যা হোক একটা নাম গছিয়ে দিলেই হল।

কী করে খোঁজ পাই, উপায় বাতলে দাও ভাই। ঘুরতে ঘুরতে পায়ে ব্যথা ধরে গেল।'

ভেবেচিন্তে লোকটা এক বুদ্ধি দিল: এদ্দূর এসে পড়েছ তো সটান কুমিরমারি গিয়ে ওঠ। এক মুশকিল, চিত্তাখালির কাদা ভেঙে উঠতে হবে।

কাদা তো সারা পথ ভাঙছি।

সে কাদা আর চিত্তাখালিতে আসমান-জমির তফাত। খালি, চিত্তাখালির নাম শোন নি? চিত্তাখালির মাটি, দুই ঠ্যাং আর লাঠি। শুধু দুখানা ঠ্যাঙে হয় না, লাঠির ঠেকনা লাগে। কিন্তু তা বলে উপায় কি? এদিগরের যত মানুষ হাটঘাট করতে কুমিরমারি যায়। হাটের দোকানীরা কোকিলবাড়ির খোঁজ দিতে পারবে।

বলেছে ভাল। কুমিরমারি গিয়ে পড়লে নির্ঘাত উপায় হবে। খিদে পেয়েছে, জল-টল খেয়ে খানিকটা জিরিয়ে নেবে হাটখোলায় বসে। হনহন করে চলেছে গগন। বেলা দুপুর হতে চলল। সামনে প্রকাণ্ড বিল। বিলপারে সাদা টিনের ঘরের মতো দেখা যায় বটে।

উৎসাহ ভরে আরও জোরে চলল। বিলের মধ্যে দূরত্বের সঠিক আন্দাজ আসে না। হাটখোলা কাছেই মনে হচ্ছে, অথচ যত হাঁটে পথের আর শেষ নেই। পথ বেড়ে যাচ্ছে যেন পায়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আলপথে যেতে যেতে এক সময়ে আলের শেষ হয়ে গেল। দুস্তর কাদা। যত দূর নজর চলে, কালো ক্ষীরের সমুদ্র হয়ে আছে। এরই নাম চিত্তাখালি? লেখাপড়াজানা গগনের মনে সহসা এক গবেষণার উদয় হয়: কাদা পার হওয়ার সমস্যা ছাড়া মন থেকে অন্য সকল চিন্তা খালি হয়ে যায়, তাই কি জায়গার এই নাম?

থমকে দাঁড়াল সেই নিঃসীম কাদার কিনারে। পাশে খাল—খালের ধারে ধারে চলে এসেছে অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ কে-একজন বলে উঠল, হুজুর হেঁটে হেঁটে চলেছেন —কী সর্বনাশ!

গগন খালের দিকে তাকাল। রংচঙে বোট একটা। বোট কিংবা সবুজ রঙের টিয়াপাখি। বোটের গলুইটা লাল করেছে, টিয়াপাখির ঠোঁটের যে রং। উড়ছে না সবুজ টিয়া, খালের জলে ভেসে ভেসে যাচ্ছে। ভাসতে ভাসতে কখন কাছে এসে পড়েছে।

আসুন, হুজুর, চটের মুখে বোট ধরছি। উঠে আসুন।

গগন অবাক হয়ে বলে, আমায় বলছ?

আপনি ছাড়া আবার কাকে। পথের মানুষ চৌধুরীবাবুর বোটে ডেকে তুলব?

নিতান্তই পথের মানুষ গগন হকচকিয়ে যায়। খালি বোট যাচ্ছে। দু মাথায় দু'টি মাত্র প্রাণী—একজন হালে বসেছে, বোটে অন্যজনের হাত। ঘস্‌ঘস্‌ করে বোট কিনারায় লাগল।

কাছে এসে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে গগন বলে, তোমাদের তো চিনতে পারছি নে বাপু।

হালের লোকটা জবাব দিল। বিনয়ের অবতার। ঝুঁকে পড়ে বুকের মাথায় ঠেকিয়ে বলে, অধীনের নাম জগন্নাথ বিশ্বাস। ও হল বলাই—বলাইচন্দ্র কয়াল। আমরা কি চিনবার মতো লোক! সে হলেন আপনারা—ত্রিভুবন একডাকে চিনে ফেলে।

ভুল করে কোন্ খাজে-খাঁ ভেবে বসেছে গগনকে। মজা মন্দ নয়। হাঁশিয়ে গেছে হাঁটতে হাঁটতে। পায়ে কোথা পা কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে। আর চিত্তাখালির কাদা —সামনে যতদূরে দেখা যাচ্ছে, অনন্ত অপার। এই নৌকো নিশ্চয় ঠাকুর মিলিয়ে দিলেন। উঠে পড়া যাক তো এখন, চিত্তাখালি পার হওয়া যাক। কাদা পার হয়ে তখন নেমে পড়া যাবে।

উঠতে গিয়ে একটা কথা মনে হল। খালি বোট যাচ্ছে—হয়তো মোটা রকম ভাড়ার প্রত্যাশা রাখে। ভাড়া ধরবার সময় এই রকম আমড়াগাছি করে থাকে মাঝিরা। কথাবার্তা আগেভাগে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। বাড়ি থেকে সামান্য যা-কিছু এনেছিল, ভবসিন্ধুর বাসায় খোরাকি না লাগলেও এটা-সেটায় ফুঁকে গেছে প্রায় সমস্ত। নামবার মুখে দুই মরদে যদি চেপে ধরে, কিছুই জায়গায়, তখনকার উপায়টা কি?

হেসে রসিকতার ভাবে গগন বলে, পকেটে যকেয়া সেলাই কিন্তু ভাই। ভাড়া-টাড়া দিতে পারব না।

জিভ কেটে জগন্নাথ বলে, ছি-ছি, এটা কী বললেন হুজুর! ভাড়া খাটতে যাবে অনুকূল চৌধরী মশায়ের শখের বোট! ভাড়া কি বলেন—বকশিশ বাবদ সিকি পয়সা হাত পেতে নিয়েছি, টের পেলে ছোট চৌধুরিমশায় কেটে কুচি কুচি করে ফেলবেন। বিষম একরোখা। টাকাপয়সা কিছু নয়—একটা নিবেদন শুধু হুজুর, দেখা তো হবেই, দেখা হলে আপনার ছোট মামাকে বলবেন, চিত্তাখালি থেকে জগা বিশ্বাস তুলে নিয়ে এসেছিল। মনিব শুনে খুশী হবেন।

বোটে উঠে একগাল হেসে যখন বলে, বলব—নিশ্চয় বলব।

যে সে লোক নয় এখন গগন—অনুকূল চৌধুরি নামে বাদা অঞ্চলের কোন লাট-বেলাট, তারই সাক্ষাৎ ভাগিনেয়। চলুক তবে তাই, যতক্ষণ না চিত্তাখালি পার হয়ে যাচ্ছে। আরও বেশি চলে তো কুমিরমারি অবধি চলুক। ভুলটা তারপরে প্রকাশ হয়ে গেলে আর তখন ক্ষতি হবে না। গগনের কী দোষ, সে কোন কথা বলতে যায় নি। ওরাই দেখে বড়লোকের ভাগনে বলে ধরে নিয়েছে। নিজ অঙ্গের দিকে একবার তাকাল—চেহারাটা ভাল সত্যিই। তা তো সেই শেষ রাত থেকে জলে কাদায়, মাথার উপরের কড়া রোদে হটর-হটর করে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

জমিয়ে বসে গগন গল্পগুজব করছে: ছোট হোক, যা-ই হোক—বোটখানা কিন্তু খাসা হে!

একগাল হেসে জগন্নাথ বলে, এই দেখুন, আপনিও ধরতে পারেন নি হুজুর। এই নৌকো নিয়ে সেবারে আঠাশ নম্বর লাটে আপনারা হরিণ মারতে গিয়েছিলেন। রং করে ভিতরে কুঠুরি বানিয়ে চেহারা আলাদা হয়ে গেছে।

আবার বলে, আমিও তো সেবারে ছিলাম। দেখুন দিকি আর একবার ঠাহর করে, চেহারার আদল পান কিনা।

নিয়ে যাচ্ছেই এ রকম তোয়াজে, মনে সন্দেহের ভাবটুকু রেখেও কাজ নেই। জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে গগন বলে ওঠে, তাই তো বটে! হ্যাঁ ঠিক। ছোটমামার সবচেয়ে পেয়ারের মানুষ ছিলে তুমি। এখনো সেই রকম নাকি?

জগন্নাথ হাতদুটো যুক্ত করে হেঁ-হেঁ করে: তা হুজুরে বলতে নেই—নেকনজরে আছি বটে একটু। তিনি কিন্তু চৌধুরিমশায় নেই, বাড়ি চলে গেছেন। মূলতলায়

পেঁছে দিয়ে এই ফিরে যাচ্ছি।

হেঁটে হেঁটে এতক্ষণ গগন এই সব আবাদ-জায়গার ধাপান্ত করছিল, নৌকোর উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে এখারে মনে হচ্ছে—না, যাত্রা শুভই বটে। মা কালী সকল দিক আটিঘাট বেঁধেই করুণা করছেন। মুখে চুকচুক করে গগন বলে, ইস, বড্ড মুশকিল হল তবে তো! কী করা যায়? কোকিলবাড়ি চলে যাই তবে। কোকিল-বাড়ি জান তোমরা—মনোহর ডাক্তারের যেখানে আস্তানা? ডাক্তারের সঙ্গে বড্ড খাতির আমার।

ধলাই নামে সেই দাঁড়ের ছোকরা বলে ওঠে, বুঝতে পারলে জগা, রাঙাবাড়ি বেচে বেচে লাগ হয়ে গেল—মনোহর ডাক্তার সে-ই বটে। তাদের বাড়ির মাদাটা—হ্যাঁ, কোকিলবাড়িই বটে।

জগন্নাথ সগর্বে বলে, কোকিলবাড়ি খুব জানি হুজুর। জগা বিশ্বাস জানে না, এ পাইতক্কে এমন জায়গা নেই।

গগন বলে, তবে আর কি! কোন্ পথে যাবার সুবিধা, ভাল করে বুঝিয়ে দাও। কুমিরমারি নেমে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব।

জগন্নাথ প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বলে, সেকেন, কুমিরমারি কি জন্য ছাড়তে গেলাম? হাতে কুড়িকুষ্ঠ-মহাব্যাধি হয় নি তো—গাঙে খালে দিনরাত ঘুরি। একেবারে সেই কোকিলবাড়ির ঘাটে নামিয়ে দিয়ে আসব। হুজুরের খাতিরের ডাক্তার। এদিগরে ডাক্তার বড় কম—আলাপ-সালাপ করে আসব ডাক্তারমশায়ের সঙ্গে।

গগন আপত্তি করে: না জগন্নাথ, অত কষ্ট কেন করতে যাবে, কোন দরকার নেই। এতখানি পথ চলে এসেছি—দিব্যি ওটুকু যেতে পারব।

তা বলে হেঁটে যাবেন আপনি—আপনার ছোটমামা মশায় তবে পুষছেন আমাদের কোন্ কর্মে?

ফিক করে হেসে জগা বলে, হাঁটবার ইচ্ছে হয়েছে হুজুরের, বুঝতে পেরেছি। অমন যে চিন্তাখালি সেখানেও পা দিয়ে পরখ করতে যাচ্ছিলেন। নৌকোর পাল্কিতে ঘুরে ঘুরে অরুচি ধরেছে। তা হয় ও-রকম, সন্দেশ খেয়ে খেয়ে শেষটা একদিন মুড়ি খেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভাগনেকে পথের উপর নামিয়ে চলে গেছি—ছোটবাবু জানলে তো আস্ত রাখবেন না। তার কোন উপায়?

নাছোড়বান্দা। মনিবের বিষম অনুগত জগন্নাথ বিশ্বাস—কোকিলবাড়ি অবধি নিয়ে সে যাবেই। গগন নানারকমে নিরস্ত করবার চেষ্টা করছে। কথাবার্তার মধ্যে কুমিরমারি এসে গেল। দূরে থেকে যে কয়েকটা টিনের ঘর দেখা যাচ্ছিল—বাদাবনের কলকাতা হয়েছে যেখানকার নাম।

গগন চেঁচিয়ে ওঠে: ঘাটে লাগাও। এইখানে নেমে পড়ি।

জগন্নাথ বলে, নামতে হবে তো বটেই। বেলা চড়ে গেছে—চাট্টি সেখা নিতে হবে। উৎকৃষ্ট হোটেল খুলেছে গদাধর ভটচাজ্জি।

ভাতের হোটেলের কথা মনোহর ডাক্তারও বলেছিল বটে! শেষরাত্রি থেকে হেঁটে হেঁটে গগনের খিদে পেয়েছে। ভাতের নামে নাড়ির মধ্যে চনমন করে ওঠে। কিন্তু সম্বলের বিষয়ে চিন্তা করে মুখ শুকোয়। পয়সাকড়ি যা আছে, চার পয়সার মুড়ি-বাতাসা চিবানো যায় বড় জোর। কিন্তু অত বড়লোকের ভাগনে হয়ে মুড়ি খাবে কেমন করে এদের চোখের সামনে? ছিনেজোঁকের মতো লেপটে আছে—হাত ছাড়িয়ে সরে পড়বে, তারও কোন উপায় দেখা যায় না।

গগন ঘাড় নেড়ে বলে, কোকিলবাড়ি খবর দেওয়া আছে। কোন না দশখানা আকারি বেঁধে বসে রয়েছে তারা। এখানে হোটেলের হাঙ্গামা করতে গেলে তাদের আয়োজন বরবাদ হয়ে যাবে।

জগন্নাথ বিপন্ন কণ্ঠে বলে, সে তো বুঝলাম হুজুর। কিন্তু অত পথ উপোস করিয়ে নিয়ে গেলে ছোট চৌধুরিমশায় আমায় কি বলবেন? খালি পেটে অতখানি পথ পেরেও উঠবেন না আপনি। শিকারের সময় দেখেছি তো—নাওয়াখাওয়ার একটু এদিক-ওদিক হলে মূর্ছা যাবার গতিক হত।

আরও জোরে দিয়ে বলে, সে হবে না হুজুর। যা হোক দুটো মুখে দিয়ে যেতে হবে। বাজারের হোটেল শুনে ঘাবড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যে লোকের ভাগনে আপনি, গদাধর আলাদা বন্দোবস্ত করে দেবে।

নিরুপায় গগন স্পষ্টাস্পষ্টি বলে ফেলে এবারে: বুঝতেই পারছ জগন্নাথ। বাড়ির সঙ্গে ইয়ে মানে ঝগড়াঝাটি করে তো আসা। তৈরি হয়ে বেরুই নি।

জগন্নাথ হেসে বলে, এই জন্যে হুজুর বুঝি তা-না না-না করছিলেন। এ আমাদের ফুলতলা নয় যে পাতা ছেড়ে উঠেই পয়সা গণতে হবে! রাস্তা বাঁধার লোক-জন বিস্তর এসে পড়ল তো গদাধর শালা গলায় পৈতে ঝুলিয়ে হোটেল খুলে দিয়েছে। কী খাতিরটা করবে, দেখতে পাবেন। আচ্ছা, এক কাজ হোক। দিতে যাবেন তো গদাধর ভটচাজ্জিকে পাঁচটা টাকা বকশিশ বলে। বলেই দেখবেন না! সব বেটার টিকি বাঁধা চৌধুরিবাবুদের কাছে। তাঁর ভাগনেকে খাইয়ে টাকা নেবে, এত বড় তাগত এদিগরে কারো নেই।

ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে জগন্নাথ হোটেলের দিকে ছুটল। গদাধরকে গিয়ে বলে, কী দরের লোক এসে পড়েছেন, ঘাটে গিয়ে দেখ। চৌধুরিগঞ্জের মালিকমশায়দের সাক্ষাৎ ভাগনে। মাতুলগোষ্ঠী যেমন, ভাগনেরাও তেমনি—হাত ঝাড়লে পর্বত। হোটেল খোলা তোমার সার্থক হল ভটচাজ। যাও, খাতিরযত্ন করে এনে বসাও।

হাটবারে জমজমাট, অন্যদিন কুমিরমারির হাটখোলায় মানুষজন নিতান্তই গোণা-গুণতি। বাঁধা দোকান পাঁচ-সাতখানা। এই নাবাল অঞ্চলে চৌধুরিগঞ্জের নাম কে না শুনেছে? কোন এক মেছো-চক্কোত্তি নিজ হাতে বোঠে বেয়ে মাছের কারবার করে রাজ্যপাট বানিয়ে রেখে গেছেন ছেলেপুলেদের জন্য। অতুল ঐশ্বর্য। সবুজ-বোট চেপে তাঁদের আত্মীয় কুমিরমারির মতন জায়গায় নামলেন। আহারাদিও আজ এখানে। বাদা অঞ্চলের চাষাভুষো ফকির-বাওয়ালি ব্যাপারি-মহাজনের চলাচল। রাস্তার কাজে ইদানীং কুলি-মজুরও এসে পড়েছে অনেক। সেইখানে এবারে—আসল বড়মানুষের পা পড়তে শুরু হল। রাস্তা বাঁধা শেষ হবার আগেই। শুধু গদাধর ভটচাজ কেন, যে শুনেছে সে-ই চলে যায় গাঙের ঘাটে।

কাপড় ও ছিটের কামিজের কাদা গগন ইতিমধ্যে খানিকটা জলে ধুয়ে নিয়েছে। কিন্তু কামিজের কাঁধের কাছটায় ছেঁড়া। গামছার পুঁটলিতে চটিজুতা ও ধোপদস্ত উড়ানি। উড়ানি কাঁধের উপর দিয়ে জড়িয়ে দিল। চটিজোড়া পায়ে পরেছে। ব্যস, ষোলআনা ভদ্রলোক। অনুকূল চৌধুরির ভাগনে নেহাত বেমানান নয় এখন। ভদ্রলোক হয়ে গগন গলুয়ের কাছে বোটের পাটাতনের উপর বসে পা নাড়ছে।

জগন্নাথ ফিসফিস করে ঘাটের মানুষদের বলছে, বড়লোকের খেয়াল রে ভাই। বউঠাকরুনের সঙ্গে ঝগড়া করে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছেন। শোন, ইয়ে হয়েছে—মিহি বাদশাভোগ চাল যে চাই। তার উপরে হুজুর হজম করতে পারেন না।

অনেকেই সায় দেয় ঃ বটেই তো ! কত বড়লোকের আগমন !

সত্যি, ভাবনার ব্যাপার। ভাবনাটা একলা গদাধরের নয়, কুমিরমারি যত জন আস্তানা গড়েছে, দায় এখন সকলের। চিনিবাস রাখিমালের কারবার করে, নতুন গোলা বেঁধেছে হাটখোলার পাশে। থাকে তো তারই কাছে থাকবার কথা। কিন্তু সে ঘাড় নেড়ে দিল ঃ ক'টা বাদশা আছে এ মুলুকে যে বাদশাভোগ গুদামজাত করে রাখব ? মেয়েটা পেটরোগা বলে দু-চার সের পুরানো সীতাশাল রেখে দিই। তাতে চলে তো বল।

জগন্নাথ চুপচাপ ভাবে, হাঁ-না কিছু রায় দিচ্ছে না।

গদাধর সকাতরে বলে, কষ্টেসৃষ্টে নাও চালিয়ে একটা বেলা। চালটা না হয় একটু বেশী করে ফুটিয়ে দেব।

অনুরোধে পড়ে রাজি হতে হয় জগন্নাথকে। বলে, তাই না হয় হল। কিন্তু তোমার হোটেলের বারমিশালি তরকারিতে হবে না। বাছাগোছা জিনিস হুজুর একটু-আধটু মুখে দেন। একাদশীর জোয়ার গোন—গাঙে তো এখন ভাল গলদা-চিংড়ি পড়ছে।

গদাধর তটস্থ হয়ে বলে, জেলেপাড়ায় এখুনি লোক যাচ্ছে।

চিংড়ি ছাড়া মোটা ভেটকি-ভাঙান যদি পাওয়া যায়, ছেড়ে আসে না যেন।

নথ-পরা আদরমণি আধঘোমটা টেনে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। হাত নেড়ে গদাধরকে কাছে ডেকে বলে, গোয়ালারা এসে বাথান দিয়েছে। তোমার ঐ লোকের কাছে ফেরো দিয়ে দিচ্ছি, ঘি-মাখন যা পায় একটু নিয়ে আসুক।

ঘরোয়া পরামর্শ হলেও আদরের কথা জগন্নাথের কানে গেছে। বলে, গব্যটা শুধু আগে হলে চলবে না তো—আগে পিছে উভয় দিকে চাই। বাথানে যাচ্ছে তো ফেরো নয়, বড় দেখে ঘটি দাও একটা। দুধও নিয়ে আসবে। দুধ মেরে ক্ষীরের মত করবে। ঘন-আঁটা না হলে হুজুর বমি করে ফেলেন।

কণ্ঠস্বর নিচু করে, বোটের উপর গগন অবধি না গিয়ে পৌঁছয় এমনি ভাবে বলে, দামের জন্য কিছু নয়—জিনিস সাচ্চা হয় যেন। এসব মানুষের কি এখানে পা পড়বার কথা ? বউঠাকরুনের সঙ্গে বচসা করে নিতান্ত যাকে বলে পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস—

গদাধর ইতস্তত করে কেশে একবার গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে, আমাদের নিজেদেরও ভাল ভাল চার-পাঁচ খানা পদ—তার উপরে এতগুলো হচ্ছে। বলি, নষ্ট হবে না তো ? বড়লোকেরা আমাদের মতন নন, ওঁদের পেটে জায়গা কম।

জগন্নাথ হেসে বলে, পেট ওঁর কি একার—আমাদের নেই ? পথে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে বড়লোকেরা যেখানে যাবেন, আর দশ-বিশটা পেট সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। পেট-গুলোর নয়তো চলবে কিসে ? যা বললাম, তাড়াতাড়ি করে ফেল ভটচাজ ! জিনিস পড়ে থাকলে গুনাগারি তোমায় তো দিতে হচ্ছে না।

তা বটে—বলে গদাধর নির্ভাবনায় আয়োজনে চলল।

নদীর খোলে বোটের উপরের গগনকে এবারে জগন্নাথ ডাকছে ঃ হোটেলওয়ালা তো কোমর বেঁধে লেগে গেল। নামবেন নাকি হুজুর ? ভাটা শুরু হয়ে গেছে, এর পরে কিন্তু বিষম কাদা ভাঙতে হবে। নেমে এসে ঘুরে ফিরে দেখে বেড়ান জায়গাটা।

হেলতে দুলতে—বড়লোকের যেমনধারা হওয়া উচিত—গগন বোট থেকে ডাঙায় নামল। উদারভাবে বলে, কেন এত সব হাঙ্গামায় গেলে জগন্নাথ ? কোকিলবাড়িতে তো

রান্নাখানা হয়ে আছে—

শোনে না যে। গদাধর ঠাকুর একা নয়—গঞ্জের সবশুদ্ধ একজোট হয়েছে।

মজা যখন জমেছে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত। গগন বলে, পরিচয় দিতে গেলে কি জন্যে ?

আমি কিছু বলি নি। বোট দেখে ধরে ফেলল। বাজে মানুষ কী আর সবুজ বোটে চড়ে বেড়ায় ?

হাসতে লাগল জগন্নাথ। আবার বলে, কথা ঠিক, বাড়াবাড়ি করছে ওরা। কিন্তু এখন আর বলে কি হবে ? না খেয়ে ছাড়ান পাবেন না। তাই বলি, আপসে চান-টান করে তৈরি হয়ে নিন।

গদাধর-হোটেল। গদাধর শানার মুড়ি-বাতাসার দোকান ছিল কুমিরমারিতে, ফুলতলার ছোটবাবু খোদ অনুকূল চৌধুরি হোটেলের মতলবটা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। চৌধুরিগঞ্জে যাবার পথে রাত্রিবেলা বেগোনে পড়ে এইখানে নৌকো চাপান দিয়েছিলেন। গদাধরের দোকানে উঠে পাথরের থালায় চিঁড়ে ভিজিয়ে কলা ও বাতাসা সহযোগে ফলার করছেন। আর দেখছেন চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। হাটবার—হাট তখন ভেঙে গেছে। অনুকূল বললেন, চিঁড়ে-বাতাসা ছেড়ে ভাতের হোটেল করলেই তো বেশ হয় গদাধর।

বছর চার-পাঁচ আগেকার কথা। সেই তখনই কুমিরমারির ওদিকটা পুরোপুরি হাসিল হয়ে গেছে। এক ছিটে জঙ্গল দেখা যায় না কোন দিকে কোথাও। গঞ্জ দ্রুত জমে উঠছে। একটা পুকুর হয়েছে—মিঠা জল। জলের নাম দূরদূরান্তর ছড়িয়ে গেছে। এই পুকুরই বড় আকর্ষণ জমে ওঠার। দেখতে দেখতে পাঁচ-ছখানা বাঁধা-দোকান হয়ে গেল গাঙের কুল ঘেঁষে। সপ্তাহে দু-দিন হাট—রবিবার আর বুধবার। সেদিন ঝাঁকা ভরতি মালপত্র এনে আরও অনেকে দোকান সাজিয়ে বসে। বাদা অঞ্চলের লোকজন আসে হাট করতে, এবং খাবার জল নিয়ে যেতে। বিস্তর ধান-চাল ওঠে, এবং হাঁসের ডিম। ডাঙা অঞ্চলের পাইকারে কিনে বোঝাই করে নিয়ে যায়। মাছও ওঠে অল্প-স্বল্প।

গাঙের জোয়ার-ভাটা অনুসারে চলাচল—কোন্ হাটবারে কখন এসে পৌঁছতে হবে, ঠিক-ঠিকানা নেই। বিকালবেলা হাট—ভোর থেকে এ-দল সে-দল এসে পড়েছে গাঙের গোন-বেগোন অনুযায়ী। এক প্রহর রাত্রে হাট ভাঙে, তার পরে সারা রাত্রি কারো কারো নৌকো বেঁধে বসে থাকতে হয় গোনের অপেক্ষায়। হাটের আগে ও পরে দেখা যাবে, তিনটি মাটির ঢেলার উনুন বানিয়ে এদিকে ওদিকে ভাতের হাঁড়ি চেপে গেছে, কলাপাতায় ফেনসা-ভাত ঢেলে লোকে হাপুস-হুপুস করে খাচ্ছে। গদাধরের দোকানে বসে চিঁড়ে খেতে খেতে অনুকূল চৌধুরি হাটুরে মানুষের রান্না-খাওয়া দেখছিলেন।

কুমিরমারি থেকে নতুন রাস্তা যাবে দুর্গম বাদাবনের দিকে। মাপজোক হয়ে গেছে, ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে এইবার ঠিকাদার ও লোকজন এসে পড়ল। রাস্তাটা হয়ে গেলে আর কি—কুমিরমারি ষোলআনা শহর। গদাধর শানাও রাস্তার ঐ দলবলের সঙ্গে এসেছে। সঙ্গে স্ত্রীলোক। আদর বলে তাকে ডাকে—আদরমণি কখনো-সখনো। এমন অনেক আসে। সমাজের তাড়া খেয়ে এই সব নতুন জায়গায় জোড়ে এসে ঘর বাঁধে। হাতে কিছু পয়সাও আছে—রাস্তার কাজে না খেটে গদাধর চিঁড়ে-মুড়ি-

বাতাসার দোকান করে বসল। গদাধর বাতাসা কাটে, আদর মুড়ি ভাজে খাকির খোলায়। অল্পস্বল্প বিক্রি—জমছে না, যা আশা করা গিয়েছিল তেমন কিছু হল না। এমনি সময় একদিন অনুকূল চৌধুরি এসে বুদ্ধি দিলেন—হোটেল খোল গদাধর। ভাল চলবে। মুড়ি-বাতাসা লোকে জলখাবার হিসাবে খায়। ক'টা নবাব-বাদশা আছে কুমিরমারিতে যে দু-বেলা দু-পাতড়া ভাতের উপরে আবার মুড়ি চিবোতে বসবে। মুড়ি না ভেজে ভাত তরকারি রান্না কর। অতগুলো উনুন বসবে না আর তখন, সবাই এসে হোটেল থেকে তৈরি ভাত খেয়ে যাবে।

গদাধরও যে দু-একবার ভাবে নি এমন নয়। ইতস্তত করে বলে, জাত-বেজাতের মানুষ রয়েছে, আমার রান্না খাবে কে? মাইনে দিয়ে রসুই-বামুন নিয়ে আসব, সে হল অনেক কথার কথা।

তা সত্যি, বামুন আনতে গেলে পোষাবে না। অনুকূল বলেন, তুমি কি জন্যে আর শানা থাকতে যাবে? ভটচাজ্জি—গদাধর ভটচাজ্জি। বাদা জায়গা—বামুন হবার খরচা মবলগ এক আনা। এক ফোঁটা পৈতের দাম। চারটে পয়সা খরচ করে বামুন হয়ে যাও। মানখেলার মতন কেউ এখানে তোমার গাঁইগোত্রের খবর নিতে আসবে না।

ভেবেচিন্তে তার পরে গদাধর হোটেল খুলেছে। পৈতে ঝুলিয়ে আগেই বামুন হয়ে গিয়েছিল। মালিক ও পাচক গদাধর, এবং ঝি হল আদর। বসত ঘরখানা রান্নাঘর। খাওয়ার জায়গার অসুবিধে নেই, হাটখোলায় অনেক চালা। ঠিক হাটের সময়টা কে আর খেতে আসছে? তেমন যদি কারো তাড়া থাকে, রান্নাঘরের দাওয়ায় মাদুরটাকে বসিয়ে দেবে! বুদ্ধিটা সত্যি ভাল। রাঁধা ভাত-ব্যঞ্জন পেয়ে হাটুরে মানুষ বর্তে যাচ্ছে। রাঁধাবাড়ার আলস্যে কেউ কেউ চিঁড়ে-মুড়ি খেত গদাধরের দোকান থেকে। এখন পয়সা ফেললেই ভাত—ভাতের বড় কিছু নেই—সেই সব মানুষ মনের আনন্দে পাতা পেতে বসে। হাটবার দুটোয় হোটেল খুব ভাল চলে। গোড়ার দিকে তো যোগান দিয়ে পারত না, ভাত ফুরিয়ে যেত, তাই নিয়ে মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামার গতিক। এখন উনুন বাড়িয়েছে, বড় হাঁড়ি কিনেছে।

নিত্যদিনের বাঁধা-খদ্দেরও হয়েছে কিছু। তারা দোকানদার। হাত পুড়িয়ে রান্না করা কী ঝকমারি—হোটেল চালু হয়ে সে দায়ে বেঁচে গেছে। খেতে খেতে উচ্ছ্বাস ভরে হাসে: আর কি, কুমিরমারি সত্যি এবারে শহর জায়গা হয়ে উঠল। পয়সা ফেললেই হাতে-গরম ভাত-তরকারি। একটা কেবল বাকি আছে—লম্বা টিনের ঘর তুলে বায়স্কোপ চালিয়ে দেওয়া। তা হলেই চৌধুরিবাবুদের ফুলতলা। সেটাও বাকি থাকবে নাকি? রাস্তাটা হয়ে যাক, খোয়া ফেলে পাকা-রাস্তা হোক মোটরগাড়ি চলাচল করুক, তখন দেখতে পাবে।

গদাধরের মনে মনে ভয়। রাস্তা যেদিন হয় হোকগে, তাড়াতাড়ি নেই—বরঞ্চ যত দেরী হবে ততই ভাল গদাধর-হোটেলের পক্ষে। ধীরেসুস্থে দীর্ঘ ছন্দে চলুক রাস্তার কাজ। দশ বছর বিশ বছর জন্ম জন্ম কেটে যাক। রাস্তা হয়ে যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা হয়ে গেলে আরও কত ভাল হোটেল খুলবে, তার মধ্যে গদাধর ভটচাজ্জির কি দশা হবে বলা যায় না। আপাতত এই বেশ আছে ভাল।

পাকা মাথা ছোটবাবু অনুকূল চৌধুরির—মোক্ষম বুদ্ধি দিয়ে গিয়েছিলেন, গদাধর দু-পয়সা করে খাচ্ছে। এত দিন পরে তিনি না হন তাঁর ভাগনে মশায় হাজির হলেন সবুজ-বোট চড়ে। বড়লোকের পায়ের ধুলো পড়েছে গদাধর-হোটেলে।

খাতিরযত্ন করতেই তো হবে।

খাওয়া সমাধা হল। আয়োজন অতিশয় গুরু। দক্ষিণে গাঙের দিকে রান্নাঘরের দাওয়া আছে একটা। চাদর ও তাকিয়া দিয়ে বড়লোক-মানুষের জন্য বিশেষ ভাবে ফরাস করে দিয়েছে। আহারান্তে গগন সেখানে গড়িয়ে পড়ল। গাঙে পুরো ভাটা তখন। বোট অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে রেখেছে। বিস্তর কাদা ভেঙে সেখানে পৌঁছতে হয়। সে তাগত নেই এখন গগনের। দাওয়া অবধি আসতেই কষ্ট হচ্ছে, খাওয়ার আসনের উপর গড়াতে পারলে ভাল হত। ফরাস পেতে দিয়ে গঙ্গাধর পরিপাটি করে তামাক সেজে আনল। দুটো টান দিতে চোখ জড়িয়ে আসে। তাড়া কিছু নেই—ভাটা গিয়ে জোয়ার আসবে, তবে তো রওনা। জোয়ারে কূলের উপর বোট এসে লাগবে, জগন্নাথ এসে ডাকবে সেই সময়। জুতো খুলতে হবে না, চটি পায়ে ফটফট করে গগন সোজা গিয়ে নৌকায় উঠবে। ততক্ষণে আরামে ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

সবুজ-বোট ওদিকে খুলে দিয়েছে। ভাটা তো ভাটাই সই। টেনে দাঁড় মার রে বলাই, বাঁক ঘুরে ওই বানতলার কাছ বরাবর গিয়ে পড়ি।

কুমিরমারি দেখতে দেখতে আড়াল হয়ে গেল। এই বারে এতক্ষণে তারা হাঁপ ছাড়ে। জগন্নাথ বলে, দুপুরটা নিরম্বু উপোস যাবে ভেবেছিলাম। তা বেশ জবর জুটে গেল। কপালে আছে ঘি না খেয়ে করি কি!

হেউ উ বলে, পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে আবার একটা পান মুখে দিল। হোটেল থেকে একমুঠো খিলি তুলে এনেছে আসবার সময়।

বলাই বলে, আক্কেল বলিহারি ছোট চৌধুরির। উজোন টেনে এত কষ্ট করে ঘাটে পৌঁছে দিলাম, তা দু-আনার পয়সাও হাতে দিয়ে গেল না যে মানুষ দুটো অবেলায় চাট্টি মুড়ি কিনে খাবে।

জগন্নাথ বলে, চাকরিই যে আমাদের নৌকো বাওয়া। মুড়ির পয়সা বাড়তি দিতে যাবে কেন রে?

বলাই বলে, বয়ারখোলার তৈলক্ষ মোড়লকে দেখেছিস—জোতদার মানুষ, হুটহাট করে ঘোড়ার পিঠে চেপে বেড়ায়। সে-ও, দেখেছি, দূরদুরান্তর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এনে তার পরে দানাপানি দেয়, ডলাইমলাই করে।

জগন্নাথ সংক্ষেপে বলে, ঘোড়া আর মানুষে!

যা-ই বলিস জগা, ছোট চৌধুরিমশায়ের টাকা থাকলে কি হবে—লোকটা আস্ত চামার।

জগন্নাথের এখন ভরা পেট। বলাই যত রাগ করে, তত তার মজা লাগে। বলে, অনুকূল চৌধুরি না হোক ভাগনে এসে তো আকণ্ঠ খাইয়ে দিল। তবে আর রাগ পুষে রাখিস কেন!

বলাই বলে, আর এটাই বা কী হল! নতুন মানুষ আসছে, তার কোন্‌ দোষ? মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়! ক্ষিধেয় নাড়িতে পাক দিচ্ছিল, বলি-বলি করেও তোকে তখন বলতে পারলাম না। গদাধর ওকে এমনি ছাড়বে না। ঘুম ভেঙে উঠে মানুষটা কী বিপদে পড়বে দেখ ভেবে।

জগন্নাথ নির্বিকার কণ্ঠে বলে, পড়ুক গে। জামা-জুতো চড়িয়ে বরপাত্তর সেজে আসছে। কাদায় পা ফেলতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। দু-পাঁচ বছর বাদে হয়তো

দেখছি, এই নতুন মানুষ আবার এক অনুকূল চৌধুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাবালে নামছে তো এইটুকু আক্কেলসেলামি দেবে না!

বলাইর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে হেসে ওঠে। বলে, সেঁটেছিস খুব বেশী। হাত খেলাবার জো নেই বুঝতে পারছি—দাঁড় তুলে বসে ধর্মকথা শোনাচ্ছিস। কুমিরমারির কেউ এসে পড়তে পারে। আর খানিকটা টেনে দে, তার পরে ওসব শুনব।

চার

আসার মুখটায় যেমন হয়েছিল, এই বিদায় বেলাতেও গদাধর ভটচাজের একলার ব্যাপার রইল না। কুমিরমারি গঞ্জের তাবৎ বাসিন্দাই প্রতারিত হয়েছে এমনি ভাব। সকলেই মারমুখ। অশেষ কান্নাকাটি করে এবং চটিজুতা ও গায়ের ছিটের কামিজ বন্ধক দিয়ে তবে ছাড় হল। তবে কোকিলবাড়ির সঠিক খোঁজ পাওয়া গেল বটে। এবং রাঙাবাড়ি-খ্যাত মনোহর ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে বলেই এত অল্পে নিষ্পত্তি হয়ে গেল। কড়ার রইল, টাকা প্রতি মাসিক এক আনা হারে সুদসহ ঋণ শোধ করে এক বছরের মধ্যে জুতাকামিজ খালাস করে নিয়ে যাবে। নয়তো অন্যের কাছে বিক্রি হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

উঃ, কোকিলবাড়ি কি এখানে! আবার শেষ রাত্রে বেরিয়েছে—হেঁটে হেঁটে কুল পায় না। অবশেষে পেঁছানো গেল। যা বলে ছিল মনোহর—পুরো মানষেলা এলেকা। বাদাবন সরে গিয়ে দেড়-দু-দিনের পথ এখান থেকে। মানুষ এসে পড়ে বন একেবারে শেষ করেছে।

হাত ঘুরিয়ে মনোহর দেখাচ্ছে; পুকুর কাটবার সময় মোটা মোটা সুঁদরে-গাছের গুঁড়ি উঠেছিল। অনেক পোড়ানো হয়ে গেছে, আরও গাদা-করা হয়েছে ঐ দেখ।

পশার করেছে বটে ডাক্তার মনোহর। গোড়ায় হোমিওপ্যাথি মতে দেখত, এখনও তাই। তবে, রাঙা-বড়ি বের করার পর থেকে এদেশ-সেদেশ নাম পড়ে গেছে। জ্বর সারবে অব্যর্থ। জ্বরের ওষুধ আরও অনেক আছে—কিন্তু রাঙা-বড়ির বিশেষত্ব, সেবনান্তে আপনি ভাত তো খাবেনই, আচ্ছা করে স্নান করবেন, ডাব ও তেঁতুল-গোলা খাবেন—জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে পালবে। তবে সব অবস্থায় রাঙা-বড়ি চলবে না, ডাক্তারের দেখেশুনে বিধান দিতে হয়। জ্বর ভিন্ন আরও নানান ব্যাধি রয়েছে। মনোহর ডাক্তারের তাই আহার-নিদ্রার সময় নেই। নিয়ম করেছে, তিরিশটা করে রোগী দেখবে সকালবেলা। আর, পুরানো রোগী তো আছেই—তাদের বাদ দেওয়া যায় কেমন করে? রাত থাকতেই রোগীরা লাইন দেয়। শীত নেই, বর্ষা নেই। শেষ রাতে ঘুম ভাঙলে দেখতে পাবেন, উঠানে নেবুতলায় পুরুষের ভিড়। মেয়ে-রোগীরা দাওয়ার উপর উঠে বসেছে—তাদের আলাদা ব্যবস্থা। কম্পাউন্ডার হরিদাস দাঁতন করে মুখ ধুয়ে এই মোটা খেরো-বাঁধানো খাতা নিয়ে এসে বসে: যে যেমন এসেছ, পর পর নাম বলে যাও। রোগীর নাম টুকে তাদের একে-একে ডাক্তারের কাছে হাজির করে দেবে। শিশি হাতে করে এসেছে সকলে—ডাক্তার কাগজে ওষুধের নাম লিখে দিচ্ছে, সেই মত ফোঁটা ফেলে জল ঢেলে শিশির গায়ে দাগ কেটে বিদায় করবে। আর রাঙা-বড়ি হলে তো কথাই নেই, প্রকাণ্ড কৌটো রাঙা-বড়িতে ভরতি—চারটে-ছটা করে দিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রজাপাটক দু-চারজন এল তো তাদের নিয়ে বসতে হবে।

ডাক্তারের হাত খালি হলে এর উপর ডাক্তারি বিদ্যার পাঠ নেওয়া আছে। হরিদাস নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসত পায় না।

গগনের খাতির-যত্ন বিশেষ রকমের। সকলের পাশাপাশি ঠাঁই—তার মধ্যে কেবল মনোহর আর গগনের ভাত মোচার মতন সঁচাল করে বাড়া, বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন। খেতে খেতে দেমাক করে মনোহর বলে, দেখছ ব্যাপার। আমার বিদ্যের ছিটেফোঁটাও যদি নিতে পার, টাকা বাক্সপেঁটরায় ধরবে না। দালান দিচ্ছি, জান। এই সব কাঁচা-ঘর একটাও থাকবে না, দোতলা পাকা-দালান উঠবে। কত করলাম এই ক'টা বছরের মধ্যে! জমি জিরেত বিষয়আশয়। সুমুখ-দুয়ারে পাছ-দুয়ারে দুটো পুকুর। পৈতৃক কী ছিল—আড়াই বিঘের ভিটেবাড়ি। আর কিছু নয়। দুটো তালগাছ চোদ্দ সিকেয় বিক্রি করে হোমিওপ্যাথি বাক্স কিনলাম। সেই বাক্স বগলে নিয়ে ভিটের মুখে লাথি মেরে ডিঙি ভাসিয়ে দিলাম। এইখানটা এসে চড়ায় ডিঙি আটকে গেল। আটকেছে তো নেমে পড়ি এখানে। যত-কিছু দেখতে পাও, সেই চোদ্দ সিকের বাক্স থেকে সমস্ত। মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম কর তুমি, দিয়ে দেব বিদ্যের খানিকটা। হরিদাস যেমন ডাক্তার হয়ে চলে যাচ্ছে। আরে, পাতে ভাত নেই—এই লতিকা, চাট্টি ভাত দিয়ে যা গগনকে। দুধ কাঁঠাল রয়েছে, ভাত না হলে কি দিয়ে খাবে?

বড় মেয়েকে ডাকল। কিন্তু ভাত নিয়ে এল মেয়ে নয়—মনোহরের বউ। মনোহর খিঁচিয়ে ওঠে: কেন, সে গেল কোথায়? সেই নবাবনন্দিনী? তুমি যাও, তোমায় কে ডেকেছে?

বউ থমকে দাঁড়াল একটু। তার পরে ফিরে গেল ভাতের থালা নিয়ে। দীর্ঘ ঘোমটা। গিন্নীবান্নি মানুষের এতদূর ঘোমটা—গগনের কী রকমটা লাগে। এদিকে রেওয়াজ হয়তো এই। তখন মেয়ে এসে ভাত দিল—কালো কালো মেয়ে, মোটাসোটা গড়ন।

কাজে ডাকলে সাড়া দিস নে কেন? কোথায় থাকিস?

নতুন লোকের সামনে খিঁচুনি খেয়ে মেয়ে চটে গেছে: বুঝব কেমন করে যে আমায় ডাকছ?

হরিদাস বলে, লতিকা বলে কখনো তো ডাকেন না ডাক্তারবাবু। সেইজন্যে বুঝতে পারে নি।

মনোহর বলে, মেয়ের ডাকনাম ভুতি। ওর দিদিমা দিয়েছিলেন। তা বিয়ে-থাওয়ার বয়স হল ভুতি-ভুতি ভাল শোনায় না। লতিকা বলে ডেকো তোমরা, বুঝলে? হরিদাস, তুমিও ডাকবে।

খাওয়ার পরে ডাক্তারখানা অর্থাৎ বাইরের ঘরে গিয়ে মনোহর বসল। গগনকে খাতির করে ডাকে, এস—

ডিবেয় করে পান দিয়েছে, কপ-কপ করে গোটা কয়েক মুখে ফেলে দিল। গগনের দিকে ডিবে এগিয়ে দেয়: খাও, পান খাও। গড়গড়ার উপর কলকে বসিয়ে দিয়ে গেছে, ভুড়ুক-ভুড়ুক করে টানছে। একটা বেঞ্চিতে রোগীরা বসে, সেটার উপর গগন বসে পড়েছে।

মনোহর বলে, ওই তক্তাপোশ হরিদাসের। এখানে শোয়। প্রায় ডাক্তার হয়ে উঠেছে সে। তুমিও হবে। সোনাব্যাং ঐ যে থপ-থপ করে লাফায়, গোড়ায় ছিল ব্যাঙাচি। গোড়ায় সকলে কম্পাউণ্ডার থাকে, আমিও ছিলাম। তুমি হলে স্বজাতি —আমার ঘরের ছেলে বললেই হয়—তোমার জন্য সব করব। কিন্তু তার আগে

ঘোড়ার কাজকর্মগুলো শিখে নাও মন দিয়ে।

গগন কৃতার্থ হয়ে বলে, যেমন-যেমন বলবেন তাই আমি করব। দোষ-ঘাট হলে মাপ করে নেবেন। ঠিক আমি শিখে নেব।

বাইরের ঘরের এক পাশের দাওয়া বেড়ায় ঘিরে কামরা বানিয়েছে। মনোহর বলে, ঐ ঘরে থাক আপাতত। ষোলআনা ডাক্তার হয়ে হরিদাস চলে যাবে। তখন তুমি খাস ডাক্তারখানায় গিয়ে উঠবে ওর ঐ তক্তাপোশে। সে যাক গে, পরের কথা পরে। কষ্ট করে এসেছ, খানিকটা গড়িয়ে নাওগে। কাজকর্ম আস্তে আস্তে বুঝে-সমঝে নিও।

ডাক্তারের ঘোড়া উঠানের ধারে ঘাস খেয়ে বেড়ায়। সামনের দু-পা দড়ি দিয়ে শক্ত করে ছাঁদা, ছোটবার উপায় নেই, বেশীদূরে যেতেও পারবে না। বিকালবেলা মনোহর বলে, এদিকে রাস্তাঘাট নেই, ঘোড়া বিনে ডাক্তারের এক মিনিট চলে না। ডাক্তারি করবে তো ঘোড়ায় চড়া শিখে নাও, ঘোড়ার সঙ্গে ভাব-সাব কর। ভারী বজ্জাত ঘোড়া, ভাবের লোক না হলে মানুষের মতন খাড়া দাঁড়িয়ে পিঠের সওয়ার ফেলে দেয়। কী রোগা হয়ে গেছে দেখ। এই ক'টা মাস ঘোড়ার বড় কষ্ট, ক্ষেত-খামারে নামতে দেয় না। ধান কাটা হয়ে গেলে তখন আর হাঙ্গামা নেই, ঘাস খেয়ে খেয়ে গতরে ডবল হয়ে যাবে। এখন এমন অবস্থা, প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা শক্ত।

দূরের দিকে আঙুল দেখায়। বিলের নিচু অংশে জল জমে থাকে বারমাস, চাষ-বাস হয় না; চেঁচোঘাস আর কলমি-দামে ছেয়ে আছে। ওখান থেকে এক বোঝা দু-বোঝা করে যদি কেটে নিয়ে এস বাবা, অবোলা জীব খেয়ে বাঁচবে। আর ঐ যা বললাম, কী রকম অনুগত হয়ে পড়বে দেখো ক'দিনের মধ্যে।

পাঁচ

অতএব ডাক্তারি-শিক্ষার সর্বপ্রথম ধাপ হল, এক-কোমর জলে দাঁড়িয়ে বোঝা বোঝা চেঁচোঘাস ও কলমির দাম কেটে এনে ডাক্তারের ঘোড়ার সঙ্গে ভাব জমানো। তাই সই। কষ্ট নইলে কেষ্ট মেলে না। গগন ভেবেচিন্তে দেখছে, ডাক্তারি কাজই সব চেয়ে ভাল তার পক্ষে। শিখে নিতে পারলে আবার গিয়ে বাড়িতে চেপে বসা যায়। চেনা জানা যত প্রতিবেশী—বিনিবউ, চারুবালা। বাড়ীর উপর বসে স্বাধীন ব্যবসা—গোলাম নই কারো। ইচ্ছে হলে বেরুলাম—নয়তো বলে দিলাম, আজ হবে না, রোগীকে চেল্লাচেল্লি করতে মানা করে দাও, কাল-পরশু যেদিন হোক যাব।

একেবারে নতুন অঞ্চল। বাড়ি ছেড়ে বেশী দিন বাইরে থাকা অভ্যাসও নয়। প্রথম রাত্রে গগনের ঘুম হচ্ছে না ভাল, ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে। বিনির কথা মনে পড়ে। কি করছে এখন এই নিশিরাত্রে? কী আবার—অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে ননদ-ভাজে। চারুর মনটা সত্যি ভাল, অন্যের ব্যথাদুঃখ বোঝে। আসার আগের রাত্রে, দেখ না, কী কাণ্ডটা করল—চালাকি করে বিনি-বউকে ঢুকিয়ে দিল ঘরে। বড্ড বেহায়া কিন্তু, দাদা-বউদিকে নিয়ে মস্করা করতে বাধে না। আহা, এমন আমুদে মেয়ে—তার এই কপাল! বোনের কথা ভাবলে চোখে জল এসে যায়। আচ্ছা, বিনি-বউ একবার যা বলে ফেলেছিল—এই রকম দূর-অঞ্চলে চারুকে এনে কুমারী মেয়ে বলে বিয়ে দিলে হয় কেমন? চারুর ঘরবর হল, সুখশান্তি হল—এর চেয়ে আনন্দের কথা কী! চারুর জন্যই যা, নইলে বিনি-বউয়ের জন্য একটুও সে

ভাবে না। অমন নিষ্ঠুর মেয়েমানুষে যে চুলোয় ইচ্ছে যাক—চুলোয় যাবার অবশ্য কোন আশঙ্কা নেই, বেজুত বুঝলে গিয়ে উঠবে বড়লোক ভাইদের বাড়ি।

হঠাৎ চমক লাগে। পাতা খড় খড় করছে বেড়ার ওদিকে। আমতলায় শুকনো পাতা পড়ে কাঁড়ি হয়ে আছে, তার উপরে কী যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। শেয়াল ঠিক —ঘর-কানাচে রাত্রিবেলা শেয়াল এসেছে কোন-কিছু খাবার লোভে। শেয়াল না কেঁদো, না অন্য কোন জন্তু? ফাঁক-ফাঁক বাখারির বেড়া—উঠে বসে গগন বেড়ায় চোখ রাখে। জন্তু নয়, মানুষ—খুব সন্তর্পণে পা টিপে যাচ্ছে। হলে কি হবে—শুকনো পাতায় পা পড়লেই খড়মড়িয়ে ওঠে। দু-তিনটে আমগাছ ওদিকে, তার আড়ালে মানুষটাকে আর দেখা গেল না। নতুন জায়গায় এসেছে ভয়ে গলা কাঠ, আওয়াজ বেরোয় না। আওয়াজ করেই বা কী হবে অনেকক্ষণ জেগে রইল, আর কোন শব্দসাড়া নেই।

পরদিন সেই গল্প করছে হরিদাসের সঙ্গে: ঘুম ভেঙে গেল কম্পাউন্ডার বাবু। আমতলায় কী চলাচল করছে। ভাবলাম শেয়াল—

হরিদাস আরও ভয় ধরিয়ে দেয়: শেয়াল কী বলছ ভায়া, জায়গা খারাপ, এই শীতকালে বড়-শেয়াল অবধি ধাওয়া করে। আসল মানুষখেগো। সুন্দরবনের তল্লাট থেকে মানুষের গন্ধে গন্ধে চলে আসে গাঙ-খাল পার হয়ে।

গগনের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আরে সর্বনাশ, এ কোন্ জায়গায় এসে পড়ল কাজের ধান্দায়। খানিকটা যেন নিজেকেই সাহস দেবার জন্য ঘাড় নেড়ে বলে, জন্তু জানোয়ার নয়, সে আমি ঠাহর করে দেখেছি। মানুষ।

তবে চোর। ডাকাতও হতে পারে। ঐ যে বললাম, সর্ব রকম গুণ আছে এই পোড়া জায়গার। ডাক্তারের টাকাপয়সা আছে, খুব রটনা কিনা—বদ লোকে তাই হাঁটাহাঁটি করে। সেইজন্যে, দেখ না, রোগী মাথা ভেঙে মরলেও সন্ধ্যের পর ডাক্তার বেরোয় না কিছুতে।

গগনও তাই ভাবছে, যে লোক এসেছিল, মন্দ মতলব নিশ্চয় তার। লোক যদি সাচ্চা হবে, তবে পা টিপে টিপে আলগোছে অমন চলবে কেন?

নতুন লোক গগনকে হরিদাস উপদেশ দিচ্ছে: একটা কথা শুনে রাখ। রাত্রি-বেলা কখনো ঘরের বাইরে যাবে না। জন্তু হোক মানুষ হোক, কে কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কিছু বলা যায় না।

গগন বিষম দমে যায়। একটু চুপ করে থেকে ভয়ে ভয়ে বলে, এমন যদি ঠেকে যাই—না বেরিয়ে উপায় নেই? অসুখবিসুখ হয়েছে ধর, বেরুতেই হবে—

তেমন ক্ষেত্রে ডাকহাঁক করে আলো-টালো নিয়ে - কিন্তু দুয়োরে খিল এঁটে লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে থাকাই ভালো মোটের উপর।

গগন বোঝা বোঝা ঘাস কেটে আনে। ঘোড়ার পিঠে চড়ছেও দু-এক কদম। ডাক্তারির অভ্যাস করে নিচ্ছে এমনি ভাবে, ঘোড়ার সঙ্গে ভাব জমছে। ডাক্তারের ছেলেমেয়ের সঙ্গে এবং গিন্নীর সঙ্গেও ভাব জমাবার চেষ্টায় আছে। পৌষ-সংক্রান্তির মেলার সময় কুমিরমারি গিয়ে সামান্য সম্বল যা আছে তাই থেকে চুলের ফিতে, টিনের বাঁশি, গোটা দুই পুতুল এবং গিন্নীর পান খাওয়ার জন্য এক পোয়া মতিহারি তামাক কিনে আনল। কেউ কিছু বলবার আগেই শুকনো বাঁশ চেলা করে রান্নাঘরের দাওয়ায় রেখে আসে, রাঁধতে বসে গিন্নী ভিজে কাঠের জন্য কষ্ট না পায়। ফলও

দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু। মনোহর একদিন এই মোটা ডাক্তারি বই বের করে দিল, তার পরিশিষ্টে পাতা কুড়িক ধরে ওষুধের তালিকা। ছাপা বাংলা অক্ষরেই বটে, কিন্তু বিদঘুটে যত নাম। মনোহর বলে, ওষুধের নামগুলো জলের মতন মুখস্থ করে ফেল দিকি। তার পরে শিখিয়ে দেব কোন্ অসুখে কোন্‌টা খাটে।

উঠে পড়ে লাগল গগন। হরিদাস মিটিমিটি হাসে। সুবিধে করতে পারছে না, হাসিটা তাই ব্যঙ্গের মতো ঠেকে গগনের কাছে। দুপুরবেলা না গড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেঁচিয়ে দশ-পনেরটা নাম মুখস্থ করে ফেলল—খানিক বাদে ছাপার উপর হাত চাপা দিয়ে ধরে দেখে, সমস্ত বেমালুম সাফ হয়ে গেছে মন থেকে। মনোহরকে এ সমস্ত জানাতে সাহস হয় না—হয়তো বলবে, তোমার দ্বারা ডাক্তারি হবে না, সরে পড় তুমি। হরিদাসের সঙ্গে খাতির হয়েছে—চুপি চুপি তাকে বলে কী করা যায় কম্পাউণ্ডার-বাবু, মাথায় যে কিছু রাখা যাচ্ছে না? ইপিকাক-বেলেডোনা-একোনাইট—এত সমস্ত যদি মনে থাকবে, তবে তো জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যেতাম।

হরিদাস হেসে বলে, কদ্দিন হল? মাঘে এসেছ, আর এটা হল গে বোশেখ। সবে চার মাসে পড়েছে। বিদ্যেটা এত সোজা হলে কেউ আর রোগী থাকত না, ঘরে ঘরে সব ডাক্তার হয়ে যেত।

গগন বলে, চার মাস বলে কি, যা ব্যাপার, চার বচ্ছরেও তো ওর একটা পাতা মুখস্থ হবে না।

হরিদাসের হাসি বেড়ে যায়: তবে শোন, আমি এই আড়াই বছর সাগরেদি করে করে শেষটা সার বুঝে নিয়েছি। চিকিচ্ছে দুরকমের—এক হল পড়ে শুনে লক্ষণ বিচার করে ওষুধ দেওয়া। আর এক রকম—বাক্সের ভিতর ফুটোয় ফুটোয় ওষুধের শিশি সাজানো, রোগী দেখে তার পরে বাক্সের ডালা একটুখানি তুলে মহাত্মা হ্যানি-ম্যানের নাম ভক্তিভরে স্মরণ করে হাত ঢুকিয়ে দেবে বাক্সের ভিতরে। যে ছিপির উপরে আঙুল পড়ল, সেই শিশি থেকে ফোঁটা দাও। ঠিক লেগে যাবে। তোমার কিছু ভাবতে হবে না, যে মহাপুরুষের নাম নিলে ভাবনা-চিন্তা বিবেচনা তিনি সব করছেন। এইটেই খুব চালু আজকাল। যত দেখতে পাও, বেশির ভাগ এই মতের ডাক্তার।

সহসা চারিদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বলল, ওষুধ বটে রাঙা-বড়ি। ওরই ধান্দায় ঘুরছি রে ভাই, নয়তো কবে এদ্দিন ডাক্তার হয়ে বসতাম। কি কি সব গাছগাছড়া দিয়ে বানায়—কুনিয়ানটা মেশায় জানি। কিন্তু ভারী খড়েল, কাউকে কিছু বলবে না। নিজের হাতে সমস্ত মিশাল করে, ভুতি বেটে দেয়। ঘরের দুয়োর-জানলা এঁটে ওষুধ বানায়। কাউকে ঢুকতে দেয় না, বউকেও না—ঐ এক ভুতি। ভুতিটা জানে সমস্ত।

রাঙা-বড়ির তত্ত্ব মনোহর সদয় হয়ে শিখিয়ে দেন তো ভালই—কিন্তু হোমিওপ্যাথির যে দ্বিতীয় পদ্ধতি শোনা গেল, তার পরে গগন আর ডরায় না। জয় মহাত্মা হ্যানিম্যান,—এটা সে খুব পারবে। আড়াই বছরে হরিদাস কিন্তু অঢেল শিখে ফেলেছে। মনোহর নাম বলা মাত্র এক বাক্স ওষুধের মধ্যে দরকারী ওষুধটা বের করে ফেঁটা ফেলে দেয় চট করে বের করে, তিলেক দেরি হয় না। এর উপরে আছে হোমিও-বিজ্ঞান বই। হরিদাস অতএব প্রথম পদ্ধতিতেও অপারগ হবে না। কোন্ ডাক্তার এর অধিক জেনে চিকিৎসায় নামে?

গগনেরও কিছু উন্নতি হয়েছে ইতিমধ্যে, দু-চার পয়সা হাতে আসছে। মনোহর ভারী সদয়। আষাঢ়-শ্রাবণে তাবৎ অঞ্চল জলে ভরে যায়। ঘোড়ার চেয়ে নৌকার

চলাচল বেশী সেই সময়টা, রোগীর বাড়ি থেকে নৌকো আসে ডাক্তার নিয়ে যাবার জন্য। মনোহর একা যায় না কখনো। একা না বোকা—কত রকমের বিপদ ঘটতে পারে। কম্পাউন্ডার সঙ্গে নিয়ে যায়। আগে হরিদাসকে নিত, এখনো নেয়—মাঝে মাঝে এখন হরিদাসের বদলে গগনকে নিয়ে যায়। হরিদাস রাগ করেঃ ওকে নিয়ে যাচ্ছ, ও কি করবে ডাক্তারবাবু ?

মনোহরের উপর কথা বললে সে খুব চটে যায়। বলে, তুমিই বা কি করে থাক ? শিশি বের করে ফোঁটা ফেলা—সেটা আমিই করে দেব। দু-আনা চার-আনা না পেলে ও-ই বা পড়ে থাকে কোন্ আশায় ? ষোলআনা লোভ করতে নেই, কিছু ভাগ ছাড়তে হয়।

হরিদাসও সেটা বুঝে দেখেছে বোধ হয়—তার পর থেকে আর কিছু বলে না। গগন অতএব যাচ্ছে মাঝে মাঝে কম্পাউন্ডার হয়ে। কম্পাউন্ডারের কাজ ঘাট থেকে রোগীর বাড়ি অবধি ওষুধের বাক্স পেঁছে দেওয়া, এবং ফেরত নিয়ে আসা। নিজের ভিজিট নেবার পরে ডাক্তার বলে, কই, কম্পাউন্ডারের ভিজিট ? এক সিকি—বাঁধা রেট। এমনি ভাবে যা আসে, সেটা নিতান্ত হেলাফেলার নয়।

ছয়

পয়সা বড় খারাপ জিনিস। যেন পোকা—মুঠোর মধ্যে কুটকুট করে কামড়ায়। মুঠো খুলে ছুঁড়ে না দেওয়া পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। গগনের অন্তত সেই রকম মনে হয়।

কুমিরমারি গঞ্জ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র পয়সা খরচের জায়গা। এবং বাইরের অচেনা অজানা মানুষজন দেখবার জায়গা। পরিচিত ঘরবাড়িটুকুর মধ্যে ঘোরাফেরা করে এক এক সময় মন তার হাঁপিয়ে ওঠে। হাটবার দেখে কোন এক হাটুরে নৌকোয় চেপে বসে তখন। হাটুরে নৌকো একরকম উড়িয়ে নিয়ে কুমিরমারি হাজির করে।

গঞ্জটা হল জনপদের মানুষে ও আবাদের মানুষের মোলাকাতের জায়গা। আবাদের মানুষ যায় কাপড়চোপড় ডালকলাই ও শখের দশটা জিনিস সওদা করতে। আর গাঁ-গ্রামের মানুষ এসে জোটে আবাদের ধানচাল ও মাছ—এবং জঙ্গলের গোলপাতা, গরান কাঠ, মধু ইত্যাদি আমদানি হয় বলে। এই কুমিরমারিতে গগনের দুর্গতি—জামা-জুতো বন্ধক দিয়ে বেরুতে হল। বন্ধকী জিনিস পড়ে আছে আজও গদাধরের কাছে। সেদিককার ছায়াও মাড়ায় না গগন। হোটেলের পাওনা সেই চার টাকা ছ' আনা সুদে-আসলে এতদিনে বোধ হয় টাকা দশেকে দাঁড়াল। চেষ্টাচরিত্র করে গগন যে শোধ যে না করতে পারে এমন নয়। কিন্তু জুতো-জামা নিতান্তই বাহুল্য এ অঞ্চলে। বর্ষায় একহাঁটু কাদা, শুকনোয় একহাঁটু ধুলো—জুতো পরে ঘোরে কোন জায়গায় ? জুতো এক আপদ বিশেষ—বাঁ-হাতটা আটকে থাকে জুতো বওয়ার কারণে। জামা পরলেও মুশকিল—লোকে চোখ বড় বড় করে তাকায়, হাসি-ঠাট্টাও করে অনেক সময় মুখের উপর। টাকাপয়সায় ধনী বয়সে প্রবীণ মনোহর ডাক্তারের মত কেউ হলে অবশ্য আলাদা কথা। সাধারণ লোকের আদুল গা, শীতের সময় একটা গায়ের কাপড় কিংবা কাঁথা-কম্বল যা-হোক কিছু। অকারণে জুতো-জামার বোঝা বয়ে বেড়ানোয় মানুষ বড় নারাজ।

কুমিরমারি গিয়ে গগন হাটের মধ্যে চক্কোর দিয়ে বেড়ায়। জিনিসপত্তর দরাদরি করে। চার-পাঁচটা ঝড়খেলার দল আসে, তাদের ওদিকটা ভিড় খুব। গগনও তার

মধ্যে গিয়ে বসে পড়ে। খেলায় হেরে যায়, দু-চার আনা জেতেও কচিৎ কদাচিৎ—স্ফূর্তিতে সেই পয়সায় এটা-ওটা কিনে আনে। একবার আলতা এনে দিল ভুতিকে। ভুতি কার সঙ্গে বলছিল যেন আলতার কথা—বর্ষা কেটে গেল, চারিদিক খটখটে হবে, পায়ে কাদা লাগবে না, আলতা পরে বেড়ানোর সময় এইবার। তাই এক শিশি আলতা কিনে আনল।

রোগীর বাড়ি যাওয়ার দরুন ক'টা হাট কামাই গেছে। তার পরে গগন গিয়ে শুনল, ফড়ের আড্ডায় কোথাকার এক জোয়ান-ছোকরা এসে তাজ্জব খেলা খেলছে। আগের হাটে এসেছিল, এ হাটেও এসেছে। সে এমন খেলা, চোখে পলক ফেলবার উপায় থাকে না। কোন্ ঘরে গুঁটি ধরলে অবধারিত জয়, গুঁটিই যেন কানে কানে বলে দেয় তাকে। জিতছে, জিতছে—সকলের গাঁটের কড়ি একাই প্রায় জিতে নেয়। গুণজ্ঞান জানে ঠিক।

দূর! গুণজ্ঞান না হাতি—হাতের কায়দা-কৌশল। দেখতে হয় তো ব্যাপারটা কি!

বিষম ভিড়। ভিড় ঠেলে বিস্তর কষ্টে কাছাকাছি গেল। গিয়েই বেরিয়ে চলে আসে। সেই শয়তানটা—জগন্নাথ। খাতির করে সবুজ-বোটে তুলে এনে এই কুমিরমারির উপরে বোকা বানিয়ে রেখে গেল। কম নাকালটা হতে হয়েছে! আজকে হয়তো হাসবে জগা ফ্যা-ফ্যা করে। জগার নজরে না পড়ে—ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে হাটুরে নৌকোয় চড়ে বসল। যখন ছাড়বার ছাড়ুকগে নৌকো। ছইয়ের মধ্যে সে লুকিয়ে বসে আছে।

সেদিন নয়, কিন্তু দেখা হয়ে গেল তিন-চার হাট পরে। কুমিরমারি হেন জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বায়স্কোপের দল এসেছে। টিকিট কেটে গগনও ঢুকে পড়ে। খেলা ভাঙল, হাট তার অনেক আগে ভেঙে গেছে। গাঙের ঘাটে এসে দেখে—সর্বনাশ, সাথীদের এত করে বলে গিয়েছিল, তা সত্ত্বেও গোন পেয়ে নৌকো নিয়ে তারা চলে গেছে। একলা মানুষের ভাড়া-করা নৌকো নয়—একের জন্য সকলে অসুবিধা ভোগ করবে কেন?

শেষ চেষ্টা হিসাবে তবু সে ঘাটের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। যত নৌকো বাঁধা রয়েছে, সকলকে জিজ্ঞাসা করে, কখন ছাড়বে—কোন্ কোন্ দিকে যাবে তোমরা মাঝি? অন্ধকারে নৌকোর কাড়ালের দিকে কে-একজন বসে গোপীযন্ত্র সহযোগে দেহতত্ত্বের গান ধরেছে। শোনবার মত গলা বটে! ঘরে ফিরবার এত উদ্বেগ—তা সত্ত্বেও থমকে দাঁড়িয়ে শুনছে গগন।

গান থামিয়ে গায়ক ডাক দিল, দাঁড়িয়ে কেন বড়দা, উঠে এসে ভাল হয়ে বস।

চিনেছে এবার—জগন্নাথ। শয়তানটার ক্ষমতাও অনেক। মরি মরি, কী গান গাইছে! মন হরণ করে নেয়। কিন্তু ক্ষমতা যা-ই থাকুক, ও-লোকের সঙ্গে আর নয়। মুখ ফিরিয়ে গগন হনহন করে চলল। জগাও নাছোড়বান্দা। গোপীযন্ত্র ফেলে এক লাফে ডাঙায় পড়ে পিছু নিয়েছে।

কী হল ও বড়দা? দাঁড়াও। সেদিন ফড়খেলার ওখানে এক নজর দেখলাম। বেরিয়ে চলে গেলে। আজও ছুটেছ। আমায় চিনতে পারছ না?

গগন দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, চৌধুরির ভাগনে হলাম আমি। হুজুর বলে ডাক ছাড়বে! বড়দা বললে চিনি কেমন করে?

জগা বলে, উঁহু, বড়দা-ই তুমি। পয়লা দিন সাজগোজ দেখে ভেবেছিলাম কে না

কে। গায়ের জঞ্জাল ফেলে হালকা হয়ে আজকে কেমন ঘোরাফেরা করছ। এখন আপনার মানুষ, আর কোন গোলমাল হবে না।

এক-গাল হেসে বলে, ছোটভাইয়ের বজ্জাতি মনে বুঝি গিঁঠ দিয়ে রেখেছ। পেটের ক্ষিধের লোকে মানুষ খুন করে ফেলে। সেদিন কিন্তু খাইয়েছিল বড্ড ভাল। কিছু মনে কর না বড়দা।

খপ করে হাত জড়িয়ে ধরল। টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। গগন আপত্তি করে না। শীতের অন্ধকারে নিরাশ্রয় ঘুরে বেড়াচ্ছে, নৌকোর উপরে এর চেয়ে মন্দ হবে না।

কোথায় যাচ্ছ এখন বড়দা? হাটে কি করতে এসেছিলে?

গগনের কাছে আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনে বলে, আমাদের নৌকো ঘাট ছেড়ে নড়বে না এখন দশ-বারটা দিন।

গগন রাগ করে বলে, নড়লেও যাচ্ছি কিনা তোমার নৌকোয়! মরে গেলেও না। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে।

জগন্নাথ বলে, কেন লজ্জা দাও বড়দা। বললাম তো, বড়দা বলে চিনতে পারি নি তখন। কোন হুজুর-টুজুর ভেবেছিলাম। আপন বলে বুঝি নি—ভেবেছিলাম পর-অপর কেউ। কী করলে রাগ যায়, সেইটে বল। পা জড়িয়ে ধরব?

সত্যি সত্যি পা ধরতে যায়। লোকটা পাগল। বলে, সেদিন খালি বোট ছিল—ষোলআনা নিজের এক্তিয়ারে। চৌধুরিগঞ্জে নেমে ছোটচৌধুরি বোট ছেড়ে দিল। ফুলতলায় ওদের বাড়ি—বলে, বোট বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়। তাই যাচ্ছিলাম। চৌধুরির কাজ ছেড়ে দিয়ে এবার বাদাবনের কাজ ধরেছি। বাদা থেকে আসছি। কোথাও নড়বার জো নেই—এক-হাট দু-হাট এখন এই ঘাটে বসে থাকতে হবে। গোল-পাতা কেটে এনেছি, আধাআধি তার বাকি। মধুও আছে কিছু। এইগুলো সারা হয়ে গেলে সোজা দক্ষিণে আবার বাদায় পাড়ি ধরব। তা নৌকোর গরজ কি বড়দা, পথ তো আট-দশ ক্রোশ—সকালে উঠে চরণ-তরী চালিয়ে দিও, পহর খানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

নৌকোর কর্তাব্যক্তি কেউ নয় জগন্নাথ—হালে বসে, বাদায় নেমে কুড়ুল হাতে জঙ্গলে ঢুকে যায়। কাজের গুণে তার খাতির খুব, সকলে কথা শোনে। বাসন ধুচ্ছিল বলাই গলুইতে বসে, জগার সেদিনের সেই সঙ্গী। তাকে বলল, হাঁড়িতে ভাত আছে বলাই, বড়দার জন্যে হবে চাট্টি? হুঁ, ভাত রেখে দেবে এরা তেমনি পাত্তর বটে! যা-কিছু রান্নাই হয়, পেটে পুরে নিশ্চিন্ত। মাটির জিনিস বলে হাঁড়ি-মালসাগুলো শুধু বাদ রেখে দেয়। বড়দা, রাঁধাবাড়া আসে তোমার—ভাতে-ভাত দেবে চাপিয়ে?

গগনের রাগের শান্তি হয়েছে। বলে, এই রাতে উনুন ধরিয়ে কখন কি হবে—রান্নার ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই।

তবে মুড়ি মধু আর ঘটি দুই জল খেয়ে গড়িয়ে পড় একখানে।

নৌকোর পাটাতনে জগন্নাথের পাশাপাশি শুয়ে সে রাত্রে অনেক কথাবার্তা হল। ছোকরার মাথায় পোকা আছে—এমনি কিন্তু ভাল, সদালাপী। বলে, বড়দার কী করা হয়, সেটা তো শুনলাম না।

ডাক্তারি শিখছি। লিখতে পড়তে জানলে এই বিপদ—ঘরবাড়ি ছেড়ে চাকরির তল্লাসে বেরুতে হয়। তখন আর লাঙলের মুঠো ধরা যায় না। লাঙলে পেটের ভাত

জোটেও না আজকাল, সঙ্গে এটা ওটা করতে হয়।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল গগন। বলে, আমি ভেবেচিন্তে এই পথে এলাম ভাই। স্বাধীন ব্যবসা। ডাক্তার হতে পারলে আবার গিয়ে ভিটেয় চেপে বসব - বিদেশ-বিভুঁয়ে হা-পিত্যেশ করে বেড়াতে হবে না।

জগন্নাথ হেসে বলে, দাদা বলেছি, গুরুলোক তুমি এখন। বলাটা ঠিক হচ্ছে না—কিন্তু খুঁটোয় বাঁধা গরু তোমরা। ভিটে বেড় দিয়ে চক্কোর মার। আরে, বেরিয়েছ তো আবার কেন সেই খোপে ফিরবে? ডাঙারাজ্যে মানুষ কিলবিল করে। জায়গা-জমি টাকা-পয়সা সকলে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। একটা রোগী হল তো আট ডাক্তার আট দিক থেকে শকুনের মত খুবলে খুবলে খাচ্ছে কী করবে তার মধ্যে গিয়ে? বুঝি শোন বড়দা ডাঙার দেশ নয় - ভাঁটি ধরে তরতর করে নেমে যাবে গাজির নাম নিয়ে। এইটুকু মাত্তর এসেছ—আরও নাম। অনেক দূর নেমে যাও। কত বড় দুনিয়া! মানুষজন এখনো সেদিকে জমতে পারে নি—তুমি গেলে তুমিও দিব্যি জমিয়ে নেবে। ভাত-কাপড়ের ভাবনা ভাবতে হবে না।

গল্প করছে সেই বাদা অঞ্চলের। ক্ষুধার্ত মানুষ গিয়ে পড়ে জঙ্গলে। জঙ্গল ভরা ভরে দেয়। সুঁদুরি পশুর বাইন গরান—কাঠ কত রকমের! গোলপাতা। ঘষা কাচের রঙের মধু-ভরা চাক। জলে জাল ফেলেছ তো মাছের ভারে টেনে তুলতে পারবে না।

বাদাবন মায়া জানে। দু-বার চার-বার গিয়েছ কি নেশা ধরে যাবে। তখন আর রোজগারের ধান্দায় নয়—যেতেই হবে তোমাকে, না গিয়ে উপায় নেই। বুড়োথুত্থুড়ে ব্যওয়ালি—ঘর উঠোন করতেও কষ্ট হয়—সেই মানুষটারও দেখবে বাদার নামে কোটরের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। এপারে ওপারে ঘন সবুজ বন, পাড় ভাঙছে, ঝপাঝপ কুমির নেমে পড়ছে জলে, চরের উপর হরিণ চরছে, ডালে ডালে বানর, বাঘ হামলা দিয়ে ওঠে কোথাও কোনদূরের বনান্তরালে, স্রোত ডেকে চলেছে কলকল আওয়াজে। সাদা লাল গেরুয়া নানান রঙের পাল ফুলিয়ে নৌকোর বহর যাচ্ছে—তারই একখানারে সওয়ারী হয়ে যাবার জন্যে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করবে তোমার বুকের ভিতরটা।

আর একদিন গগন এমনি কুমিরমারি গিয়েছিল। ফিরে আসছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। এমন আগেও হয়েছে—ঘাটে পেঁছিতে বেশী রাত্রি হয়ে গেল তো নৌকোয় পড়ে থাকে, সকালবেলা বাড়ি যায়। বড়-গাঙে টান বিষম। তরতর করে ছুটছে হাটুরে নৌকো। বাঁক ঘুরে হঠাৎ এক স্টীমার এসে পড়ল একেবারে সামনে। স্টীমারের এটা নিয়মিত পথ নয় কালে-ভদ্রে কদাচিৎ বাঁক ঘুরে গিয়ে ওঠে দোখালায় কোন কারণে জল খুব কমে যায় যদি। আজও তাই হয়েছে। নৌকো আরও সব যাচ্ছে—সার্চলাইট পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে দাঁড়ি-মাঝি সকলের। ঢেউ উঠল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো, সামাল-সামাল পড়ে গেছে, প্রাণপণে বাইছে দূরে সরিয়ে নেবার চেষ্টায়। এমনি সময় বিষম জোরে এক বোঝাই সাওড়-নৌকোর সঙ্গে ঠোকাঠুকি। আলোয় ধাঁধা লেগেগেছে, কিছু দেখা যায় নি। হৈ-হৈ রব উঠল। তক্তার জোড় খুলে গেছে, কলকল করে জল উঠছে। তবু রক্ষা, মানুষজন জখম হয় নি কেউ। চরও আছে একটা অদূরে। খানিকটা বেয়ে কাছাকাছি নিয়ে এসে ঝপাঝপ সকলে জলে পড়ে নৌকো টেনেটুনে সেখানে নিয়ে তুলল।

জলকাদা মেখে ভিজে কাপড়ে দু ক্রোশ ভেঙে গগন নিশিরাত্রে বাড়ি-চলে আসে। প্রাণ যেতে বসেছিল, তখন কেমন যেন ঘোরের মধ্যে ছিল, বাড়ির কাছে এসে ভয়-ভয় করছে। কত জনকে বলল, বাড়ি অবধি এগিয়ে দাও—তা সবাই এখন নিজের ঘরে পেঁছিতে ব্যস্ত, পরোপকারে প্রবৃত্তি নেই। ঠাট্টা করে বলে, গাঁয়ে উঠে যে বরপাত্তর হয়ে গেলে। লণ্ঠন ধরে দিয়ে আসতে হবে নাকি?

বাড়ির উঠানে আমতলার অন্ধকারে গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে মানুষ একজন। মেয়ে-মানুষ—মেয়েমানুষের মতন কাপড়চোপড় পরা। রাতদুপুরে মেয়েমানুষ ওখানে কি করছে—পেত্নী? গায়ে কাঁটা দিয়েছে। কোন দিকে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সে দাওয়ায় উঠে পড়ল। তালা খুলে কামরায় ঢুকে আলো জ্বালল। ধড়ে প্রাণ আসে এতক্ষণে। বাইরের-ঘরের বেড়ায় ঘা দিচ্ছে: ওঠ একবার কম্পাউণ্ডারবাবু, উঠে এস।

কী ঘুম রে বাবা! বেড়া ভেঙে ফেলবার মতো করেছে, তবু সাড়া দেয় না।

তখন আলো নিয়ে নিজেই বেরিয়ে আসে। বাইরের ঘরের দরজা ঝাঁকাঝাঁকি করবে। হরিদাসকে ঘটনাটা বলার দরকার, না বলে সোয়াস্তি পাচ্ছে না। দরজা ভেজানো আছে—কী ব্যাপার, হাত দিতেই খুলে গেল। হরিদাস নেই, বিছানা খালি।

হরিদাস তক্ষুনি এসে পড়ল। দেখেছে নিশ্চয় গগনকে তার ঘরে ঢুকতে। কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় না। হরিদাস নিজে থেকে বলছে, দেখে ফেলেছ তাতে ক্ষতি নেই। নিজের লোক তুমি, তোমায় সব খুলে বলতাম। ভুতিকে আজ বাইরে ডেকে নিয়ে এসেছিলাম।

অতএব মেয়েটা হল ভুতি। এবং হরিদাসও ছিল, তাকে সে দেখতে পায় নি। খুব অন্তরঙ্গ সুরে হরিদাস বলে, ভুতিকে ধরে রাঙা-বড়ি আদায়ের ফিকিরে আছি। মনোহর ডাক্তারের মতলব ভাল নয়, সে কিছু দেবে না। রাঙা-বড়ির লোভে তিন বচ্ছর বেগার খেটে মরছি, নয় তো কোনকালে ডাক্তার হয়ে বসতাম। ইদানীং খুব তোয়াজ করছি ভুতিটাকে। আরে, তুমি যে মতলবে তরল-আলতা চুলের কাঁটা কিনে দাও, ঠিক তাই। প্রায় পটিয়ে এনেছি। বলছে তো দিয়ে দেবে আমায় সমস্ত। কিন্তু খবরদার ভাই, কেউ টের না পায়, মুখাগ্রে আনবে না এসব ব্যাপার। আমি রাঙা-বড়ি পেলে তোমাকেও শিখিয়ে দেব। একা খাব না, দিব্যি করে বলছি।

শুয়ে শুয়ে আজ আর গগনের ঘুম আসে না; ভাবছে এইসব। রাত-দুপুরে মেয়েটাকে ঘরের বার করে এনেছে—শুধু মাত্র রাঙা-বড়িই তার কারণ? ঐ কুরূপ-কুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে তা ছাড়া আর কী ব্যাপার থাকতে পারে। মতলব করে খাতির জমাচ্ছে। খাতির যে জমেছে, আমতলার ঐ রকম আলসে বসে থাকার ভঙ্গিতে বোঝা গেল।

কী দায় পড়েছে, কাকে কি বলতে যাবে? কোন-কিছু দেখে নি গগন, কিছু জানে না, এই বেশ। হরিদাসকে মাঝে মাঝে তাগাদা দেয়, কম্পাউণ্ডারবাবু, কদ্দূর?

হরিদাস বলে, এখন না তখন করছে কেবলই। ঘড়েল মেয়ে—বাইরে ন্যাকা-বোকা দেখ, আসলে তা নয়। তবে আমিও ছাড়ন-পাত্তর নই।

রাতবিরেতে ডেকো না অমন করে। খারাপ দেখায়।

দিনমানে নিরিবিলি পাই কোথা? লোকের মধ্যে এসব কথা হয় না—

থেমে গিয়ে হরিদাস হঠাৎ খলখল করে হাসে: বলি, আর-কিছু ভাবলে নাকি? ঐ তো একরত্তি মেয়ে, কালকুটি পাথরের বাটি—আমি এক আধবুড়ো মানুষ তার

সঙ্গে পিরীত করতে যাব ? তবে হ্যাঁ, অথরে-সবরে দেখাতে হয় একটু গদগদ অবস্থা। বলে দিক না ওবুধটা—যেদিন থক্কুনি বলবে, তার পরে দেখতে পাবে হরিদাস আর নেই, হরিদাস হাওয়া।

বলেই কথা ঘুরিয়ে নেয়ঃ তোমার সঙ্গে কথার খেলাপ হবে না—তোমার বলে-কয়ে ফয়শালা করে তবে এ জায়গা থেকে নড়ব। মনে সন্দেহ রেখো না ভায়া। চোখ মেলে চুপচাপ তুমি শুধু দেখে যাও।

অধিক দেখবার সময় হল না। মাসটাও কাটে নি। মনোহর ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিল কোন্ দিকে। খটাখট খটাখট জোর কদমে এসে উঠানে লাফিয়ে পড়ল।

ঘরে আছ হরিদাস ? শোন এদিকে—

বেলা দুপুর। হরিদাস স্নান করে এসে ডাক্তারখানার ভিতর টেরি কাটছিল। রান্নাঘর থেকে ডাকাডাকি করছে, এইবারে খেতে যাবে। মনোহরের আহ্বানে চিরুনি ফেলে পুলকিত হয়ে বেরিয়ে এল। জরুরি ডাক আছে নিশ্চয় কোথাও, যেতে হবে ডাক্তারের সঙ্গে। প্রাপ্তিযোগ আছে অতএব।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে হরিদাস বলে, যেতে হবে ডাক্তারবাবু ?

হ্যাঁ, দূর হয়ে যেতে হবে—

ঠাস করে চড় কষে দিল তার গালে। বলে, এখনই—এই দণ্ডে।

তাজ্জব ব্যাপার। হরিদাস জোয়ান-পুরুষ—গায়ে-গতরে আছে দস্তুরমত। সেই লোককে চড় মারল এক তালপাতার সেপাই মনোহর। মার খেয়ে হরিদাস কেন্নোর মতো গুটিয়ে গেছে।

বেরিয়ে যা বলছি—জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী, ফেরেব্বাজ—

তীরবেগে মনোহর ডাক্তারখানায় ঢুকে গেল। হরিদাসের টিনের তোরঙ্গ ছুঁড়ে দিল ঘরের ভিতর থেকে। ডালা খুলে কাপড়চোপড় উঠোনের ধুলোয় ছড়িয়ে গেল। বাবু-মানুষ হরিদাস—কিন্তু বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত করে না, একটি কথা বলে না, কুড়িয়ে আবার সমস্ত তোরঙ্গের ভিতর রাখে।

গগন আজ ঘাস কাটতে গিয়েছিল, বোঝা ফেলে ঘাম মুছতে মুছতে দাঁড়াল। সদর উঠান—এদিক ওদিক থেকে আরও লোক এসে জুটেছে। মনোহর হুঙ্কার দিয়ে উঠলঃ জটিরাম ভড় তোর মামা ?

মাথা ঝাঁকিয়ে হরিদাস বলে ওঠে, না তো—

ফের মিথ্যে কথা ?

ছুটে যায় মনোহর তার দিকে। তারপর এত মানুষ দেখেই বোধকরি সামলে দাঁড়ায়। সকলের দিকে চেয়ে বলে, সিরাজকাটি রোগী দেখতে গিয়েছি—লোকটা এসে খাতির জমায়। রোগীর কি রকম আত্মীয়, অর্ধেক ভিজিট দিতে চায়। বলে, হরিদাস এলে তাকে দিয়েই বলাতাম। আমার ভাগনে—আপন ভাগনে।

হরিদাশ বলে, মিথ্যে কথা—

কিন্তু গলায় জোর নেই, মিন-মিন করে বলল। মনোহর বলে, মিথ্যে ? থাক তবে সন্ধ্যে অবধি। সন্ধ্যের দিকে জটিরাম রোগীর খবরাখবর নিয়ে আসবে। দশের মধ্যে তখন মুকাবেলা হবে। তোর চোদ্দপুরুষের খবর বলে দিল—বেশ, মিথ্যে হয় তো বেঁচে গেলি। সত্যি হলে পিটিয়ে তক্তা করব বাড়িসুদ্ধ গ্রামসুদ্ধ মিলে।

গগনকে বলে, আটকে রাখ বাবা, শয়তানকে যেতে দিও না। গোলমাল করে তো

খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখবে। আসুক সেই জটিরাম।

কিন্তু হরিদাসের কানেই গেল না আর কোন কথা। তোরঙ্গ হাতে উঠে দাঁড়াল। জটিরামের আসা অবধি থাকবে কি—রান্নাঘরের দাওয়ার ভাত বেড়ে দিয়েছে, তারও দু-গ্রাস খেয়ে গেল না। নিরম্বু বিদায় হল ঐ অত বেলায়।

মনোহর হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে: জাত ভাঁড়িয়ে ছিল আমার কাছে। আমি যেমন সোজা মানুষ, যে যা বলে বিশ্বাস করি। রান্নাঘরে উঠেছে, একসঙ্গে খেয়েছি-দেয়েছি, হুঁকো টেনেছে—জাতজন্ম একেবারে নিকেশ করে দিয়ে চলে গেল।

তখন সকলে বোঝাচ্ছে: বুঝদার লোক তুমি ডাক্তার, জাত নিয়ে অমনধারা কর কেন? বামুনের ছেলে মুরগি মেরে বেড়াচ্ছে, পৈতে খুলে ধোপার বাড়ি কাচতে দেয়—জাতজন্ম ক'জনের আছে জিজ্ঞাসা করি।

মনোহর অধীর হলে, কারো না থাক আমার আছে, আমি ষোলআনা মানি। গঙ্গায় ডুব দিয়ে পাপ ধুয়ে আসব, গোবর খাব, ঠাকুরমশায়রা যে বিধান দেন সেই মতো প্রাচিত্তির করব।

হরিদাস বিদায় হল। আরও কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে মনোহর গগনের দিকে চেয়ে বলল, রোগীর নাম লিখতে লেগে যাও কাল সকাল থেকে। আমায় তো জান, অত ভোরবেলা উঠতে পারি নে। নামগুলো লিখে তুমি চলে যেও, পরের যত কিছু আমি করব। পারবে না?

গগন ঘাড় নাড়ল। কী ভেবেছে মনোহর তার সম্বন্ধে, ক'টা নাম লিখতেও পারে না! অদৃষ্ট ভাল, দেখা যাচ্ছে। ধাঁ করে উন্নতি। এর আগে যারা এসেছে, হরিদাসের কাছে শোনা, ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে এগুতে হয়েছে তাদের।

নাম লিখে রোগীর খাতা ডাক্তারের হাতে দিয়ে গগন ছুটোছুটি করে নাবালে নামল। বেলা হয়ে গেছে, রোদ চড়চড়ে হয়েছে এর মধ্যে। ফাঁকা বিলে রোদের ভিতর দাঁড়িয়ে ঘাস কাটতে কষ্ট হয়। ধান কাটা হয়ে গেছে, ডাল-কলাই তোলাও প্রায় শেষ, আর কয়েকটা দিন গেলে এড়াকাল—অর্থাৎ গরু-ছাগল (ঘোড়া ক'জনেরই বা আছে!) ইত্যাদি ছেড়ে দিতে পার। মাঠে মাঠে অবাধে তারা চরে বেড়াবে, ঘাস কেটে মাথায় বয়ে এসে খাওয়াতে হবে না। এই ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে মাস কতকের মতন নিশ্চিন্ত।

সাত

সেই প্রথম দিনই। মুঠো খুলতে দেরি হয় তো কপাল খুলতে দেরি হয় না।

ঘাসের বোঝা ফেলে ঘাম মুছতে মুছতে গগন দাওয়ায় এসে উঠল। বাইরের রোগী দেখে মনোহর সেই মাত্র ফিরেছে। গগনের দিকে চোখ তুলে সবিস্ময়ে বলে, খাসা হাতের লেখা হে তোমার। আমরা অমন পারি নে! কদ্দুর পড়েছ?

গগন বলে, মাইনর ইস্কুলে তিনটে ক্লাস পড়েছিলাম। তারপরে আর হয়ে উঠল না।

ভাল লেখাপড়া জান তুমি। হাতের লেখা মুক্তোর মতন, একটা বানান ভুল নেই। হরিদাসের হিজিবিজি পড়তে কালঘাম ছুটে যেত। তা শোন, ঘোড়া দেখতে হবে না আর তোমার। মাহিন্দার রাখব। হরিদাসের কাজকর্ম পুরোপুরি নিয়ে নাও। যেটা না পারবে বুঝিয়ে দেব। করতে করতেই মানুষে শেখে।

কপাল ছিল পাথর-চাপা—পাথরখানা হঠাৎ সরে গেছে। আবার ক'দিন পরে মনোহর বলে, লতিকাকে একটু-আধটু পড়িয়ে দিও। বেশ লিখতে পড়তে পারে, নিজের চেষ্টায় শিখেছে। নতুন পাঠশালা হয়েছে—কিন্তু অত বড় মেয়ে যায় কি করে, গেলে নিন্দে হবে। তোমায় পেয়ে ভাল হল, বানান-টানানগুলো দেখে দিও। তাতেই হবে।

সন্ধ্যার পরে একেবারে কাজ থাকে না। হেরিকেন হাতে ঝুলিয়ে ভুতি এল। নিজে আসে নি, ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিয়েছে। হেরিকেন মাটিতে রেখে মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। গগন অস্বস্তি বোধ করে। বলে, বইটই কোথা? খাতা লাগবে দুটো একটায় অঙ্ক, আর একটায় হাতের লেখা।

অত বড় মেয়েকে 'তুমি' বলতে বাধো-বাধো ঠেকে, আবার ছাত্রীকে 'আপনি' বলাও চলে না। মহা মুশকিল। খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভুতি বসে পড়ল তক্তাপোশের এক পাশে। মুখে কথা নেই। খানিকক্ষণ কাটল। লণ্ঠনের আলোয় ভুতিকে নেহাত মন্দ দেখায় না। আধ-অন্ধকারে ঘরে সোমত্ত মেয়ের সঙ্গে কাঁহাতক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকা যায়! লোকেও তো ভাল দেখবে না।

গগন বলে, বইটই কী আছে আনা হোক। শুধু শুধু কী পড়া হবে?

বার দুই তিন এমনি বলল তো ভুতি উঠে চলে গেল। সেদিনের পড়া এই অবধি।

পরের দিনও প্রায় এই। তার পরের দিনও। একে পড়াবে কী মাথামুণ্ডু! আরও ক'দিন পরে হাঁ-না এই গোছের একটা দুটো কথা বেরুল। হচ্ছে—আশা হয়েছে। পাতা ভরে হাতের লেখাও নিয়ে এল একদিন: করে র-ফলার আঁকড় উপরমুখো? ওটা তো তয়ে র-ফলা হ্রস্ব-উ করে এনেছ। আঁকড় উল্টো করে দাও লতিকা।

বার বার বুঝিয়ে দিচ্ছে! তবু মাথায় ঢোকে না। ফের ভুল করে লিখবে। মাথায় ঢুকছে না, না অন্য কোন ব্যাপার? এত বার বলার পরেও ঠিক একই ভুল।

সারা দিনের খাটনির পর ক্লান্ত ডাক্তার বড়-ঘরে শুয়ে পড়ে, একজনে গা-হাত-পা টিপে দেয় এই সময়। ছেলেপুলেরা সব ঐ দিকে, গিন্নী রান্নাঘরে। হঠাৎ দেখল, ভুল করে ফেলে ভুতি টিপে টিপে হাসছে গগনের দিকে চেয়ে।

বড় মেয়ে ভুতি, তার নিচে পঞ্চানন অথবা পঞ্চা। পরদিন গগন পঞ্চাকে ধরে জিজ্ঞাসা করে, পাঁচ-তেরোং কত বল্ দিকি? পাঠশালে গিয়ে দু-বার ক-ব-ঠ করলেই হল? তোর দিদি এসে পড়তে পারে, তুই পারিস নে? ধারাপাত নিয়ে আসবি।

পঞ্চার কিছু হচ্ছে না, সামান্য তেরোর ঘরের নামতাও জানে না—মনোহরের কাছে এই সব বলে ব্যবস্থাটা পাকা করে নিল। ভুতি একা নয়, ভাই-বোনে একসঙ্গে আসে। তার পরে চলল এই। পঞ্চার ছোট দুর্যোধন—প্রথম ভাগ, অ-আ, ক-খ শিখছে—মা বলল, একবার দু'বার পড়িয়ে দিলেই হয়ে যাবে। দুর্যোধনের পরে হল মেয়ে—
—শঙ্করী; স্লেট-পেন্সিল নিয়ে সে এল। যা কিছু বলবার পঞ্চাই বলে,—ভুতি মুখ ফিরিয়ে থাকে। বলে, শঙ্করী হাঁড়ি-কলসি আঁকবে স্লেটে, ওকে কিছু বলতে হবে না মাস্টারমশায়। খানিক লেখালেখি করে খেতে যাবে তার পরে। শঙ্করীর পর নারাণ। পঞ্চা বলে বসে থাকবে এখানে। মা তাই বলেছে। রান্নাঘরে বড্ড জ্বালাতন করে।

গগনের ধৈর্য থাকে না। বলে, জ্বর আসবে না?

এর নিচেও আছে। ঠিক কত্তগুলো, এত দিনের মধ্যেও গগন হিসাব বলতে পারে না। ভুতি মুখ ফিরিয়ে ছিল—তারই মধ্যে ঠাহর হল, মুখ টিপে টিপে হাসছে সে যেন। বোঝ ঠেলা এখন—ভাবখানা যেন এই। আর এই নারাণ—চার বছরের বাচ্চা হলে কি হয়, তিলেক নিষ্কর্মা থাকা তার কুষ্ঠিতে লেখে না। শতরঞ্চিতে কালি ঢালছে, কলম দিয়ে খোঁচাচ্ছে গায়ে, বই ছিঁড়ে মুখে পুরেছে—সামাল-সামাল পড়ে যায়।

একদিন পণ্ডাকে একলা পেয়ে গগন জিজ্ঞাসা করে, যত ভাইবোন তোমরা আসছ, তোমার মা-ই পাঠাচ্ছেন।

হ্যাঁ—

মিথ্যে বলছ। পাঠায় ভুতি। মায়ের নাম করে পাঠায়।

পণ্ডা বলে, দিদি লাগায় গিয়ে মায়ের কাছে। শঙ্করী বজ্জাতি করে, দুর্দ্দ পড়ে না। মা তখন বলে, ধরে নিয়ে যা, পড়তে বসিয়ে দিগে!

তারপর পণ্ডা নিজের বেদনাও ব্যক্ত করে: আমার নামে মাস্টারমশায়, দিদিই বোধহয় আপনার কাছে লাগিয়েছিল।

গগন স্বীকার করে নেয়: হ্যাঁ, ভুতিই তো বলল, পণ্ডা নামতার কিছু জানে না। নইলে আমি কী করে টের পাব বল।

কারসাজি অতএব টের পাওয়া গেল। ছেলেপুলের পড়া হল না হল, গিন্নীর তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। মূলে রয়েছে ভুতি। ভাই বোন এনে জোটাচ্ছে—তাল-গোলে সময় কেটে যাবে, নিজের উপরে চাঁপ পড়বে না। আবার মনে হয়, শোধ নিয়ে নিচ্ছে না তো? পণ্ডাকে গগন এনে জুটিয়েছিল—তাই যেন জব্দ করছে: কত পড়াতে পার পড়াও, কতদূর ক্ষমতা দেখা যাক। নাঃ, অজ পাড়া-গাঁয়ের মেয়ে হলে কি হয়—শয়তানী বুদ্ধি ষোলআনা আছে। বিনির কথা মনে পড়ল। মেয়ে মাত্রেই শয়তান। চারুও—তার নিজের বোন বলে কি ছেড়ে কথা কইবে?

একদিন এক রোগী হরিদাসের কথা তুলল। দূরে যায় নি সে, গাঙের ওপারে এক গাঁয়ে ডাক্তার হয়ে বসেছে। লোকটা বলে, বড্ড খাঁই হরিদাস ডাক্তারের। এক টাকা নিয়ে মাস দুই ওষুধ দিল। জ্বর যায় না, আবার বলে টাকা। কী করা যাবে—পুরো টাকা নয়, আধুলি দিলাম একটা। চলল মাস খানেক। বিকাল হলেই নাড়িতে জ্বর পাওয়া যায়, বন্ধ হচ্ছে না। হন্দমুন্দ দেখে এই পার হয়ে এসেছি। জোলো ওষুধে কাজ হবে না ডাক্তারবাবু, রাঙা-বড়ি দেন আপনি।

কথাবার্তা হচ্ছিল মনোহরের সঙ্গে। গগন ফোড়ন দিয়ে ওঠে: দেড় টাকায় তিন মাস চালাল, তাতেও তোমার মন ওঠে না। শিশিতে শুধু সাদা জলে ভরে দাগ কেটে দিলেও তো পোষায় না।

মনোহর মৃদু হেসে গগনের দিকে তাকায়। রোগীরা চলে গেলে বলছে, হরিদাস ভাবে, বড্ড লায়েক হয়ে গেছে। কিছু না, কিছু না। বাজে-লোকের কাছে আমি আসল বিদ্যে ছাড়ি নে। ভুয়ো শিখিয়েছি, সব ভাঁওতা। ডাক্তার না কচু হয়েছে। কচু হয়েছে। চালিয়ে যাক আর কিছু দিন, তখন সবাই টের পেয়ে যাবে। যে রোগী এমনি ছ-মাস বাঁচত, ওর ওষুধ পড়লে এক মাসও টিঁকবে না।

বলতে বলতে গগনকেই নালিশ মানে: তুমিই বল না, যা ভাঙিয়ে রুজিরোজগার

সেটা দানছত্র করে দিলে আমার দিন চলবে কিসে? নাবালক এক গাদা ছেলেপুলে, কবে তারা মানুষ হবে ঠিক-ঠিকানা নেই। এই যে খেয়াঘাট পার হয়ে গিয়েই ডাক্তার হয়ে বসেছে, খাঁটি বিদ্যে জানা থাকলে রক্ষে ছিল!

গগন ঘাড় নেড়ে বলে, ঠিক—

তখন মনোহর সমাদর করে পাশের জায়গা দেখিয়ে দেয়ঃ দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, বস। তুমি হলে ঘরের ছেলে। রোগীর সামনে আমি ডাক্তার, তুমি কম্পাউন্ডার। রোগীপত্তর না থাকলে তখন আবার কি! শোন, বুড়ো হয়ে গেছি, পট করে মরে যাব—পেটের বিদ্যে নষ্ট হয়ে না যায়। শিখিয়েই যাব একজনকে। ছেলেরা বড় হয়ে শিখে নেবে, অত সবুর সইবে না। তবে কথা হচ্ছে, বিনা সম্পর্কের বাজে-লোকের জন্য আমি কিছু করি নে, আত্মীয় হতে হবে সেইজনকে। আমার জামাই হলে ডিস্পেনসারিটা তার হয়ে যাবে। আর দেশজোড়া এত বড় পশার।

আরও বিগলিত কণ্ঠে শুধায়, বড় ভাল ছেলে তুমি। হ্যাঁ বাবা, কে কে আছেন তোমার, বল দিকি শুনি?

এ সুযোগ গগন ছাড়বে না। বিনা দ্বিধায় সে বলল, কেউ নেই—

মনোহর উদাস ভাবে বলে, তা হোক, আমার তাতে আপত্তি নেই। ছেলে দেখেই যখন মেয়ে দেওয়া। তবে, বাবা, এই বড় সংসার টানতে হয়—তেমন কিছু রাখতে পারি নে। বাচ্চাকাচ্চা একপাল—আরও মেয়ে আছে পার করতে হবে। ক'খানা ইট খাড়া করে যাব ভিটের উপর, আমি অন্তে ওরা যাতে মাথা গুঁজে থাকতে পারে। এই অবস্থায় বুঝতে পারছ নগদ পণ আপাতত দিতে পারছি নে।

গগন আপত্তি করে ওঠেঃ দিচ্ছেন বইকি! অমন সোনার বিদ্যে দিয়ে দিচ্ছেন, টাকা-পয়সা সোনা-রুপো তার কাছে ছার। আপনার রাঙা-বড়ি বানানো শিখিয়ে দেবেন, আর মেয়ে দেবেন। আর আমি কিছু চাই নে।

মনোহর খুব হাসেঃ হ্যাঁ, বলেছ ঠিক! চিরজীবন ধরে বছর বছর পণের শতগুণ আদায় করবে। নগদ টাকা কদিন থাকে? আমার বাবা দশটা টাকাও নগদ রেখে যান নি। কথা পাকা রইল তবে। শুভ কাজ চোত মাসে হবে না, তা হলে বোশেখে।

রান্নাঘরে পেঁছে গেছে কথাটা। ভাতের পাতে এখন ঘন-আঁটা দুধ, এবং রাত্রিবেলা মাছের মুড়ো। ভুতি আজ পড়তে এল না, অন্যগুলো এসেছে। পণ্টা আপনা থেকে বলে, দিদি আর পড়বে না। তার বিয়ে কিনা!

গগনের লজ্জা হল বোধহয়। ছাত্রকে তাড়া দেয়, থাক থাক, ওসব কে জিজ্ঞাসা করছে তোমার কাছে? অঙ্কগুলো হয়েছে কিনা তাই বল।

কৌতূহলও জাগে—কী সব কথাবার্তা চলেছে না জানি ওদের নিজেদের ভিতরে! কতক্ষণ পরে হঠাৎ বলল, বিয়ে কবে?

কার সঙ্গে বিয়ে, সে-কথা স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করতে বাধে।

পণ্টা বলে, বোশেখ মাসে। দিদি খুব কান্নাকাটি করছে, মার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি। বলছে কি জানেন মাস্টারমশায়—

বলতে বলতে থেমে গেল।

কি বলছে?

পণ্টা বলে, আপনি আমার উপর রাগ করবেন।

গগন বলে, সে কী, বলছ তুমি দিদির কথা—তোমার উপর রাগতে যাব কেন?

ফুর্তি যখন আর পড়ছে না, তার উপরে রাগ করেও কিছু করতে পারব না।

পঞ্চারও হয়েছে—কথাগুলো ফুটছে পেটের ভিতরে, না বলে সোয়াস্তি নেই: দিদি বলছে, ঘোড়ার ঘাস মাথায় করে বয়ে আনত—ঘাস-কাটা বর আমি বিয়ে করব না। বড্ড কাঁদছে।

গগন মনে মনে আগুন হল। পৌরুষে ধিক্কার লাগে। আস্পর্ধা বোঝ, কালো-কটকটে এক মেদের ঢিবি—মানুষ যেন হা-পিত্যেশ করে মরছে তোমার জন্য! অপ্সরা-কিন্নরী হলেই বা কি—ঘরজোড়া আমার বিনি রয়েছে। রাঙা-বড়ি শিখে নিই আগে ডাক্তারের কাছে—আমার জবাব সেইদিন।

ঘাস কাটার জন্য আলাদা লোক রাখা হয়েছে। রান্নার কাঠকুটো সে-ই দেয়। ধোপদুরস্ত জামা গায়ে গগনের এখন কম্পাউণ্ডারের কাজ। তা-ও পুরোপুরি নয়। ভোরবেলা রোগীর ফর্দ করে রোগীগুলো ডেকে ডেকে মনোহরের সামনে হাজির করে দেওয়া। ওষুধের ফোঁটা ফেলতে দেয় না মনোহর, সে কাজটা নিজে করে। নামই জান না—কোন ওষুধ দিতে কি দিয়ে বসবে বাবা, সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কাজ তো এই। আর সন্ধ্যার পরে পড়ানোর নামে ছেলেপুলেদের দঙ্গল নিয়ে একটুখানি বসা। গগন বলে, কিছুই করতে দেবেন না তো জানব শিখব কি আকাশ থেকে? হরিদাস যা করত, তা-ও তো দেন না। শুয়ে বসে বাত ধরে গেল।

মনোহর অমায়িক কণ্ঠে বলে, হরিদাস আর তুমি! তোমার হাতে ধরে শেখাব আমি বাবা। ঝেড়েমুছে সমস্ত দিয়ে দেব, আলাদা বলে কিছু রাখব না। রাঙা-বড়ি অবধি। চোত মাসটা অকাল, এখন কিছু করতে নেই। জীবন ভোর তো খাটতে হবে, এই ক'টা দিন কাটালেই না হয় শুয়ে বসে।

বোঝা যাচ্ছে, সাত পাক ঘোরা সমাধা না হওয়া পর্যন্ত সেয়ানা ডাক্তার কিছুই দেবে না। হরিদাসকে যা দিয়েছে, তা-ও নয়। টালবাহানা করে কাটাবে। বৈশাখ পড়ল। নাছোড়বান্দা গগন মরীয়া হয়ে তাগিদ লাগিয়েছে: অকাল তো কাটল। ওষুধ বলে দিন, আমি ফোঁটা ফেলতে লেগে যাই।

সহসা সেই ভয়-দেখানো কথা: ওষুধের ক'পাতা মুখস্থ হল বল দিকি? কাল ধরব। সবই তো সাদা জল—নাম না শিখলে ওষুধে ওষুধে তফাতে ধরবে কি করে?

তার পরেই মোলায়েম কণ্ঠে বলে ওঠে, বোশেখ তো পড়ে গেল বাবা। পাঁজি দেখিয়ে একটা তারিখ ঠিক করে ফেলা যাক। কি বল?

গগন বলে, বোশেখ আমার জন্ম-মাস।

মনোহর ঘাড় নেড়ে বলে, জন্ম-মাসে তো বিয়ে হবে না। তবে জষ্ঠি। এক মাসে কী যায় আসে! দিন দেখে এখন থেকে উদ্যুগ-আয়োজনে নামা যাক। তুমিও ইদিকে ওষুধ-ওষুধ করে ব্যস্ত হয়ে পড়ছ।

গগন বিরস মুখ করে বলে, জষ্ঠিতেও হবে না। জ্যেষ্ঠ ছেলে আমি কিনা বাপের।

মনোহর মুখ তুলে তাকাল। মুখে তাকিয়ে কী যেন পড়ছে। কঠিন কণ্ঠে বলল, হবে। গোড়ার বার দিন বাদ দিয়ে নিতে হয়। মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়ে পড়ছে—বোশেখে না হল তো জষ্ঠিতেই আমি পাত্রস্থ করব।

বারটা দিন বাদ দিয়ে, তেরই নয়—চোদ্দ তারিখে মধ্যম রকমের দিন বেরুল। শুভকর্ম ঐ দিনে। আর ঐ তাড়া খাওয়ার পর থেকে গগনের এমন ভাব, দিনক্ষণ

ঠিক হয়ে যাওয়ায় কৃতকৃতার্থ হয়েছে সে যেন। বৈশাখে বাধা হওয়ায় মরমে মরে ছিল, চোদ্দই জ্যৈষ্ঠ কবে আসবে, যেন সে আর ধৈর্য ধরতে পারছে না।

মনের সঙ্গেও গগন বোঝাপড়া করে নিচ্ছে। কেন, দোষটা কিসের? এক বউ থাকতে বিয়ে করা ঠিক নয়, এ নিয়ম আজকালই শুধু উঠছে। বরবাড়িতে যাদের কায়েমি বসবাস, তাদেরই পোষায় এসব। ঘর-উঠোন বাক্স-তক্তাপোশ জমিজিরেত গরুবাছুর সমস্ত যেমন ঠিক থাকে, তেমনি থাকে বউ; চাষবাস খাওয়া-ঘুম এক-বউ, বউয়ের পরিচর্যা সমস্ত ধরা-বাঁধা, সকাল বেলায় আকাশে সূর্য ওঠার মত। বিনি-বউ আছে ঘরবাড়ি জুড়ে, বাড়ি যখন যাবে তখন তার কথা। এত দূরে এখানে ভূতি, রাঙা-বড়ি এবং মনোহর ডাক্তারের পশারের খানিকটা—এই সমস্ত নিয়ে সে জমজমাট হয়ে থাকবে।

বিয়ের আয়োজন চলছে। জামাতা বাবাজীবনের রোগীর ফর্দ এবং ওষুধের নাম মুখস্থ তো আছেই—অবরে-সবরে ফোঁটা ফেলে রোগীর ওষুধ দিতেও দিচ্ছে। ভূতি পড়ে না, সামনেই আসে না, এক বাড়িতে থেকে ক্বচিৎ-কদাচিৎ তার দেখা মেলে।

হঠাৎ একদিন বিকেলের দিকে এদিক-ওদিক চেয়ে চুপিসাড়ে ভূতি ডাক্তারখানায় ঢুকল। হরিদাস যাবার পরে তক্তাপোশে গগনের জায়গা। দুপুরের লম্বা ঘুম দিয়ে সবেমাত্র গগন চোখ মেলেছে—

মাস্টারমশায়!

মাস্টারমশায় বলে ডাকছে দেখ ন্যাকা মেয়ে। বলে, আপনার চিঠি এসেছে মাস্টারমশায়।

চিঠি, অ্যাঁ—আমার নামে?

ভূতি বলে, তাই তো বলছি। আপনার কেউ কোথাও নেই, চিঠি তবে কে দিল বলুন তো?

কথার ধরন ইঙ্গিতপূর্ণ। গগন থতমত খেয়ে বলে, দেখি—

খামের চিঠি হাতে দিল। বিনি-বউর চিঠি, না পড়েই বুঝেছে।

গগন বলে, খাম ছিঁড়ল কে?

বাবা। পিওন তাঁকে এনে দিল—পড়ে তিনি বিছানার নিচে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেলেন। আমি চুরি করে এনেছি। আপনার বউ দিয়েছে চিঠি। কী অন্যায়, খবরবাদ দেন নি কেন? এ-বাড়ি থেকে লেখা যায় না, কেউ দেখে ফেলবে—তা কুমিরমারি গঞ্জে তো যান, সেখানে গিয়ে চিঠি ছাড়তে পারতেন।

মনোহর শুধু নয়, মেয়েটাও আদ্যন্ত পড়ে এসেছে। বলে, আহা, কম কষ্ট করেছে ঠিকানার জন্য! কোন্‌ ভবসিন্ধু উকিলের কাছে লিখে লিখে—শেষটা তিনি ঠিকানা জানিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে চিঠির উপর ভাসা-ভাসা দৃষ্টি বুলিয়ে গগন দেখছে, ব্যাপার ঠিক তাই। উকিল ভবসিন্ধুর নাম অবধি ঠিকঠাক বলছে, চিঠি পড়ে পড়ে ভূতি মুখস্থ করেছে নাকি? এখন সে আর ছাত্রী নয়—ফিক করে হেসে বলে, বউ আপনাকে বড্ড ভালবাসে। নামটাও ভাল—বিনোদিনী। আপনি কিন্তু পাষাণ—জলজ্যান্ত অমন বউ, তাকে একেবারে মুছে দিলেন। বউ রয়েছে বোন রয়েছে—আর বাবাকে বলে দিলেন, আপন-জন কেউ নেই।

গগন সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, চিঠি পড়ে কিছু বললেন তোমার বাবা?

বলবার সময় হল কোথা? রোগীর এখন-তখন অবস্থা—লোক এসে দাঁড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে ছুটলেন। যা বলবার বলবেন ফিরে এসে। অত ভাঁড়িয়ে ছিল বলে হরিদাসের খোয়ারটা দেখলেন না? মিথ্যে কথায় বাবা ক্ষেপে যান।

স্বজাতি জেনে ভুতির সঙ্গে হরিদাসের বিয়ের কথা হচ্ছিল। হরিদাস খুব রাজী। অর্থাৎ বিয়ের নামে রাঙা-বড়ি আদায়ের ফিকির। গগন আগে এতসব জানত না, হরিদাস চলে যাবার পরে এর তার কাছে শুনেছে। গগনেরও ঠিক তেমনি ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে—জলজ্যান্ত বউয়ের কথা বেমালুম চেপে গিয়ে জামাইভোগে আছে। মনোহর ফিরে এলে কী কাণ্ডটা হবে, ভাবতে সেহরক্ত হিম হয়ে যায়। অঞ্চলের মানুষ ভিড় করে এসে দেখবে—হরিদাসের তো চড়চাপড়ের উপর দিয়ে গেছে, তার কন্দুর কি হয় কে জানে। বিনি-বউর শত্রুতা এখানেও তাড়া করে এসেছে। 'বহুদিন যাবৎ সংবাদাদি না পাইয়া আমি পাগলিনীপ্রায় হইয়াছি—' ওহো-হো, উথলে উঠেছে প্রেম-দরিয়া! সংবাদ শব্দের অর্থ ধরে নিতে হবে এখানে টাকা। টাকা না পাইয়া পাগলিনীপ্রায়। বিদেশময় যেন টাকা ছড়ানো—কুড়িয়ে কুড়িয়ে মনিঅর্ডার করলে হল। হত অবশ্য তাই, রাঙা-বড়ি কোন গতিকে যদি জানা যেত। হরিদাস পারল না—গগনেরও কপালে নেই, বোঝা যাচ্ছে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, ভুতির চোখ দুটোয় হাসি। বড় বড় দু-চোখে হাসলে ভারী সুন্দর দেখায়। হেসে হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, মিছে কথা, মিছে কথা—পিওন চিঠি দিয়ে গেছে আমার হাতে, আমি পড়েছি, বাবা দেখেন নি এখনো। বউয়ের নাম-ঠিকানা টুকে নিয়েছি। বাবা এলে বলব, নিজে একবার গিয়ে দেখে এস, বউ ঐ একটাই—না আরো দু-চারটে আছে।

গগন ব্যাকুল হয়ে বলে, ঐ একটা। উঁহু, তা-ও নয়, তা-ও নয়, ত্যাগ করে চলে এসেছি। সেই জন্যে কিছু বলি নি। এখন তুমিই শুধু ভুতি। চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলছি, ডাক্তারবাবুকে কিছু বলো না।

খপ করে তার হাত জড়িয়ে ধরল। বলে, সে বউ হল রাক্ষুসী। টাকা ছাড়া জানে না। তুমিই সব, দুনিয়ার মধ্যে তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই লতিকা।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভুতি খর-খর করে চলে গেল! এমন ভাল ভাল কথার ফলটা কি হল বোঝা যায় না। ভয় ঘোচে না। জিনিসপত্র সামান্য যা আছে, বোঁচকা বেঁধে ফেলে তাড়াতাড়ি। গোলমাল বুঝলেই দেবে দৌড়। হরিদাসের মত মার খাবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যাবেই বা কোথা? বিনি-বউয়ের উপর ইদানীং মনটা নরম হয়েছিল। কিন্তু চিঠির যা সুর, খালি হাতে গিয়ে সুবিধে হবে না সেখানে। হায় রে, এই হয়েছে দুনিয়ার গতিক। তাড়া খেয়ে খেয়ে পথের কুকুরের মতন ঘোরা। নিজের বউ-বোনেরও মন কিনতে হবে টাকা বাজিয়ে। এ-ও এক সওদার ব্যাপার। জগৎময় সওদা।

যাই হোক, ভুতি খুব ভাল—সে বলে দেয়নি। মনোহর যথারীতি হেসে হেসে কথা বলছে।

গগন একদিন বলে, আচ্ছা লতিকা, রাঙা-বড়ি জান তুমি সত্যি?

ভুতি বলে, দুজনে শুধু জানি—আমি আর বাবা। আর জানতেন বাবা যে গুরুর কাছ থেকে শিখেছিলেন। তিনি মারা গেছেন।

গগন বলে, বোশেখের অর্ধেক হয়ে গেল, পুরো মাসও নেই। উঃ, এক একটা

দিন এক বছর বলে ঠেকছে। দিন যেন নড়তে চায় না।

ভূতি হেসে বলে, দিন একেবারে পাখি হয়ে উড়ে যাচ্ছে। মোটে দাঁড়ায় না। কত তাড়াতাড়ি যে এসে গেল!

দুজনায় হঠাৎ বড্ড ভাব জমে গেছে। ফাঁক পেয়েছে কি এক জায়গায় জুটেছে। ফিসফিস-গুজগুজ—হেসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। শহুরে নায়ক-নায়িকাকে ছাড়িয়ে গেল ওরা যে!

হেনকালে ওলাবিবি হাজির হলেন গ্রামে। অনুগ্রহ ছড়াতে শুরু করেছেন। ওলাউঠা অর্থাৎ কলেরা। এর বাড়ি ভেদবমি, ওর বাড়ি ভেদবমি—মরলও দু-একটা। বড্ড দেরি পেঁছুতে—অন্যান্য বছর ফাল্গুনে শেষ না হতেই জমে যায়। নতুন ধান-চাল ওঠায় খাওয়ার অত্যাচার আছে, তার উপর মাঠঘাট শুকিয়ে মিঠাজলের টান পড়ে। ডাক্তার-কবিরাজে অবশ্য এই কারণ দেখান—লোকে কিন্তু জানে, ওলাবিবি এই সময়টা রাজ্যপাট ঘোরার মানসে বেরিয়ে পড়েন। এবারে ফাল্গুনে চুপচাপ, পুরো চৈত্রটা কেটে গেল, বৈশাখেরও এতদিন হয়ে গেছে—মনোহর দস্তুরমত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল: এ তল্লাটের কথা ভুলে মেরে দিলেন নাকি বিবিঠাকরুন? অবশেষে দুটো-পাঁচটা খবর আসে। নিতান্তই ছিটেফোঁটা—তবে আশা করা যাচ্ছে, মরশুম আস্তে আস্তে জমবে। ডাক্তার-কবিরাজ-ফকির-গুণীনের দিন আসছে, দু হাতে তখন রোজগার। ক্ষেতের ধান উঠে গিয়ে গোলা-আউড়ি ভরতি—পয়সা খরচায় আপাতত মানুষের কৃপণতা নেই। গুজবও উঠছে নানা রকম। যাত্রা শুনে ফিরছিল কারা গ্রামান্তর থেকে। চাঁদের আলোয় দেখল, ঝাঁকড়া-মাকড়া-চুল অস্থিসার-চেহারা এক বুড়ী কুঁজো হয়ে লাঠি ঠুক-ঠুক করে বাঞ্ছারাম হাজরার বাড়ির হুড়কোর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সাড়া পেয়ে বুড়ী ঘাড় তুলে তাকাল। একটি লহমা—তারই মধ্যে দেখা গেল, আগুনের গুলির মত চোখের ঢেলা দুটো বিঘূর্ণিত হচ্ছে তাদের দিকে। বুড়ী যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর ভোর রাত্রেই বাঞ্ছারামের ভেদবমি, সন্ধ্যার আগে শেষ। বুঝে নাও তবে। তিনি এসে গেছেন।

গ্রাম খুব জেঁকে ওঠে ক'দিনের মধ্যে। সন্ধ্যার পর হরি-সংকীর্তনের দল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। এবাড়ি-সেবাড়ি থেকে আগে এসে জানিয়ে যায়, হরির লুঠ আজকে আমাদের ওখানে। সংকীর্তনের দল গ্রাম পাক দিয়ে এসে সেই বাড়ি আসর করে বসে। অনেক রাত্রি অবধি হরিনাম করে হরির লুঠ কুড়িয়ে দল ভেঙে যে যার বাড়ি যায়। আবার পরের সন্ধ্যায়। গুণীনের দল এসেছে, তাদের প্রক্রিয়া ভিন্ন, গভীর রাত্রে অদ্ভুত ভয়াবহ কণ্ঠে মন্ত্র আউড়ে গ্রাম-বন্ধন করে বেড়ায়। হাতে বড় বড় ধুনোচি—ধুনো ছুঁড়ে দেয় ধুনোচির আগুনে, আর দপ-দপ করে জ্বলে ওঠে। ওলাবিবি কিংবা অন্য যে কেউ হোক, সাধ্য কি চুপিসাড়ে গাঁয়ে ঢুকবে। মন্ত্র পড়ার চেঁচামেচিতে আর কিছু না হোক লোকের সাহস বেড়ে গেছে। প্রথম ক'টা দিন বড্ড মুষড়ে পড়েছিল, সে ভাব এখন আর নেই।

ঢাকঢোল বাজিয়ে গাঁওটি-পুজো হল ঠাকরুনতলায়। যে যেমন পারে চাঁদা দিয়েছে, কেউ বাদ পড়বে না, তা হলে তার উপরে দোষ রয়ে গেল। আর এক গোপন পুজো নিশিরাত্রে হাজরাতলায়—কোন্ তারিখে সেটা হবে, কেমন তার উদ্যোগ-আয়োজন, কাকপক্ষী কাউকে জানতে দেওয়া হয় না। দু-চারটি মাতব্বর মাত্র জানে, জিজ্ঞাসা করলে সাফ বেকবুল যাবে: ক্ষেপেছ, অন্যের সর্বনাশ করে গ্রাম বাঁচাব? সেই গ্রামের লোক যেদিন উল্টো শোধ নিয়ে যাবে তাদের হাজরা-পুজো দিয়ে?

না না—ওসব কিছু নয়। কেউ কিন্তু বিশ্বাস ধরে না, চোখ টেপাটেপি করে—সঠিক তারিখটা জানা যায় কেমন করে ?

এমনি দিনে মনোহরের ডাক্তারখানা ঘরে এক আজব মানুষের আবির্ভাব। দীর্ঘদেহ মানুষটি, মাথায় জটা। শতেক লোকের মধ্যেও আলাদা ভাবে নজরে পড়বে। অন্য কিছুতে না হোক, পোশাকের জন্য। লাল চেলি পরনে, উড়ানিও লাল রঙের। এক গাদা কড় ও রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ও বাহুতে। কপালে বুকে ও বাহুতে সিঁদুরের ফোঁটা। চোখও রক্তবর্ণ। কথা বললে ভকভক করে গাঁজার গন্ধ আসে। সেই মানুষ হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

সিকি দাও একখানা।

ভিক্ষুক নয়। আধেলা, বড় জোর এক পয়সায় ভিক্ষুক তুষ্ট। বলতে হবে তা হলে রাজ-ভিক্ষুক। পুরো সিকি-অর্থাৎ আট গণ্ডা আধেলা তার দাবি। এমন হুঙ্কার দিয়ে বললেন যে না বলতে সাহস হয় না।

বলেন, আমার আজকের দিনের সেবা। সেবার ভাগ্য যার তার হয় না। তোমার উপর আজ কৃপা করলাম।

হাত নেড়ে তাড়া দিচ্ছেন ঃ শিগ্‌গির দাও। পুজো আচ্চা বিস্তর, দেরি করিয়ে দিও না।

অসহায় গগন হাতবাক্স হাতড়ায়। এ-কোণ ও-কোণ খুঁজে পেতে শুষ্ক মুখ তুলে বলে, হল না ঠাকুরমশায়।

কত হল ?

গগন বলে, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সাতটা পয়সা এই—

তাই তো !

একটুখানি ভেবে ঠাকুর বলেন, দশ দুয়োরে মাগি নে আমি। একদিন একটা জায়গায়। এক কাজ কর—ভাণ্ডার খালি থাকতে নেই—একটা রেখে ছ-পয়সা আমায় দিয়ে দাও। ঐ ছ-পয়সার মতন সেবা হবে।

পয়সা হাতে নিয়ে হঠাৎ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, অভাবের মধ্যে আছ—কাজের সুবিধা হচ্ছে না বুঝি ?

সমবেদনার আভাস পেয়ে গগন ঘাড় নাড়ল ঃ ডাক্তারবাবুর সাগরেদি করি। দুটো-চারটে পয়সা যে হয় না, তা নয়।

ঘর কোথায় তোমার ?

গগন গ্রামের নাম বলল। ঠাকুর প্রশ্ন করে অঞ্চলটার পরিচয় নিয়ে নিলেন। তার পর খিঁচিয়ে ওঠেন ঃ মানখেলা ছেড়ে সরে এলে তো মাঝপথে গিঁঠে আটকে আছ কেন ? আরও নাম, নেমে চলে এস নাবালে।

সে কোথায় ?

দরিয়ার কাছে, বাদার জঙ্গলে। মা-লক্ষ্মী ভাণ্ডার জমিয়ে রয়েছেন। বাক্স হাতড়ে একটা সিকি পাও না, আর সে জায়গায় এক পাক দিয়ে এলে আঁজলা-ভরা টাকা। দু-হাতের আঁজলা ভরে ছাপিয়ে যাবে।

মনোহর এসে পড়ে। ঠাকুরকে দেখে দৃষ্টি প্রখর হল ঃ কী মহেশ ঠাকুর, এসে গেছ তক্কেতক্কে ? গগনের সঙ্গে কি তোমার ? সিকি দিচ্ছি, চলে যাও। এদিকে নজর দিতে এস না।

থলে সিঁক বের করে এগিয়ে ধরল। মহেশ তাকিয়েও দেখেন না: আজ নয়, আজকের সেবার যোগাড় হয়ে গেছে। আগে পেলে তোমাকেই কৃপা করতাম ডাক্তারবাবু।

বেরিয়ে চলে গেলেন। মনোহর বলে, সেবা হল গাঁজার, ভাত জুটুক না জুটুক নেশাটা চাই ঠাকুরের।

গগন জিজ্ঞাসা করে, কে উনি?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মনোহর দু এক কথায় পরিচয় দিল: মহেশ নাম। শুধু মহেশ কেউ বলে না—ক্ষ্যাপা মহেশ। বাউলে মানুষ। কোথায় থাকে কি বৃত্তান্ত কেউ জানে না। কিন্তু পুজোর ঢাকে কাঠি পড়লে ঠিক এসে যাবে। এই যেমন এসেছে। নাকি কালী-সাধনা করে, অন্তর্যামী—

সঙ্গে সঙ্গে দু-হাতের বুড়ো আঙুল আন্দোলিত করে বলে, কচু—কচু! হাটে হাটে স্বলুকসন্ধান নিয়ে ফেরে। বোকাসোকা মানুষ পেলে ভুজুংভাজাং দিয়ে বাদায় নিয়ে যায়। একেবারে কাঁচাবাদায়। সেসব মানুষের পনের আনা আর ফেরে না। নরবলি দেয়, না বাঘের মুখে নৈবেদ্য সাজিয়ে ধরে, বলা যায় না। আজকে বুঝি তোমার কানে ফুসমন্তর দিচ্ছিল? খবরদার, ওকে আমল দিও না।

ডাক্তার-কবিরাজের ওষুধ, হরি-সংকীর্তন, গুণীনের কেরামতি অথবা ক্ষ্যাপা মহেশের গাঁজা পোড়ানো ও তড়বড় করে মন্ত্র পড়া—যে কারণেই হোক, ওলাবিবি বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। রোগী কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ওলাওঠার ক্ষেত্রে মনোহর কখনো একা যাবে না। পাড়ার মধ্যে হলেই বা কি! গগন সর্বদা সঙ্গে। ভিজিট ডবল। এই ক'দিনে গগনেরও হঠাৎ কপাল খুলে যায়। দিনে চার-পাঁচ টাকা—লাটসাহেবের রোজগার আর কি! কিন্তু স্থায়ী হল না—খড়ের আগুন একটুখানি দপ করে উঠে যেমন নিভে যায়।

বড়-গুণীন দেমাক করে, যায় কি এমনি-এমনি, গুঁতোয় পড়ে বিদেয় হল। বললাম, না যাস তো হারামজাদী জিওলগাছে বেঁধে জল-বিছুটি দেব। চলে যাবি একেবারে গাঙ পার হয়ে, ফাঁক বুঝে আবার ফুড়ুৎ করে ঢুকে পড়তে না পারিস।

কিন্তু অনেকেই ভাবছে, ওসব কিছু নয়—আসলে বোধহয় হাজরাপুজোর গুণ। গ্রামের বাইরে পোড়ো জায়গায় নানান গাছগাছালির মধ্যে হাজরা ঠাকুরের নামে এক সাঁড়াগাছ—গাছের গোড়ায় সদ্য সিঁদুর-লেপা, এদিক-সেদিক কলার খোলা ছড়ানো—এইসব থেকে বোঝা যায়, হয়ে গেছে গোপন পুজো। এ পুজো চুপিসাড়ে হয়—দু-চার জন উদ্যোক্তা ছাড়া কাউকে জানতে দেওয়া হয় না। ভিন্ন গাঁয়ের লোক কানা-ঘুষো শুনে তক্কেতক্কে ঘোরে, পুজো পন্ড করে দেওয়া—অন্ততপক্ষে, উৎসর্গের পাঁঠা তাদের তল্লাটে না যায় সেই ব্যবস্থার জন্য। পুজোর শেষে কালো পাঁঠার গলার খানিকটা কেটে তাড়িয়ে দেওয়া হয়—পাঁঠা ছোটে, রক্তের ফোঁটা ঝরতে ঝরতে যায়। মন্ত্রের জোরে ওলাবিবিকেও ছুটতে হবে পাঁঠার সঙ্গে সঙ্গে। গাঙ দক্ষিণে—সেই গাঙ পার করে পাঁঠা তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি এবার। শুকনো ধানক্ষেত ভেঙে পাঁঠা নৈর্ঋত কোণ বরাবর গেছে। শোনা গেল, মহামারীতে উজাড় হচ্ছে সেদিক।

মনোহর কাষ্ঠহাসি হেসে বলে, ভালই হল অল্পের উপর দিয়ে সরে গেলেন। আমার মেয়ের বিয়ে, বিস্তর খাটাখাটনি—এই তালে পড়ে থাকলে হত কেমন করে? চলে গেছেন বলে তো চিরকালের মত ছেড়ে যান নি। বছর বছর আসছেন—এবারের

শোধ সামনের বারে পূষিয়ে নেবেন। রোগপীড়ে আছে, আমরাও আছি—কিছুই বাপ্‌ চুকেবুকে যাচ্ছে না। চিরকাল ধরে চলেছে, চলবেও। এবারে সংক্ষেপ হয়ে সুবিধাই হল আমার পক্ষে।

গগনকে বলে, কাজকর্ম কমে গেল যখন, চল বাবা একদিন হাটবার দেখে কুমিরমারি গঞ্জে যাই। জামাই যা, ছেলেও তা। কুমিরমারি কতবার গিয়েছ তুমি, সমস্ত জানাশোনা, দেখেশুনে ওখানে যদ্দুর পাওয়া যায় সওদা করা যাক। সেই ভাল হবে, চল।

মনোহর ডাক্তার হাটুরে নৌকোয় যাবে না, তার আলাদা নৌকো। কুমিরমারি গিয়ে এক দোকানে গদিয়ান হয়ে বসল। হাট করতে এসে পুরনো রোগী অনেকে ভিড় জমিয়েছে। পরিচয় পেয়ে দোকানদার মুহুর্মুহু পান-তামাক যোগাচ্ছে। গল্প জমে গেছে খুব।

দেরি হয়ে যাচ্ছে, অথচ লোকের হাত এড়িয়ে ওঠা যায় না। মনোহর তখন গগনকে বলে, তা আমায় আর লাগছে কিসে? তোমাদের পছন্দে আমার পছন্দ! ফর্দ রয়েছে, দেখেশুনে কেনাকাটা করে নৌকোয় তোলগে।

কিন্তু বিয়ে হেন শৌখিন ব্যাপারের জিনিসপত্র আবাদের হাটে কোন দোকানদার আনতে গেছে, আর কী দেখাশোনা করবে তার মধ্যে গগন? ঘুরে ঘুরে সওদা হল ভোজের আটটা মিঠাকুমড়া, ছ-জোড়া লালপাড় শাড়ি-ধুতি, কম্বলের আসন ও টোপর। কী রকম যোগাযোগ—জগন্নাথও সেদিন কুমিরমারির হাটে। টোপর দেখে বুঝে ফেলল।

বর তুমি বড়দা? সর্বনাশ গো! এক বউ আছে বলছিলে যেন!

চুপ, চুপ! এদিক-ওদিক তাকিয়ে গগন বলে, এসব কথা মুখের আগায় এনো না। সে বউ মরে গেছে।

জগা বলে, ভালই তো! শিঙের দড়ি ছিঁড়েছে, দেদার চরে খাও এবারে। না বড়দা, তোমারে বিদ্যে আছে—ভেবেছিলাম, বুদ্ধিসাধ্যিও আছে। মন খারাপ হল তোমার গতিক দেখে।

হাট থেকে ফিরতে বেশ অনেকটা রাত্রি হয়েছে। গরম পড়েছে বিষম। চোর-ডাকাত জন্তুজানোয়ার কোথায় না আছে—হরিদাস মিছামিছি তার কাছে শতখান করে শুনেয়েছিল। উদ্দেশ্যও জলের মত পরিষ্কার—যাতে সে বাইরে না বেরোয়। জায়গাটার সম্বন্ধে এখন গগনের ভয় ভেঙেছে। শুধু এই জায়গা কেন, তাবৎ দুনিয়ার মধ্যেই বা ভয়ের কি আছে? বড় গরম সেদিন—খাওয়া-দাওয়া অন্তে ডাক্তারখানার দাওয়ায় কাঠির মাদুর বিছিয়ে গগন শুয়ে পড়ল। এই অবধি সকলে জানে…

সকালবেলা দেখা গেল, গগন নেই।

আট

গোড়ায় ভাবা গিয়েছিল আম কুড়াতে বেরিয়েছে শেষ রাত্রে। রাতে একটু ঝড়ও হয়েছিল। তলায় তলায় পাকা আম। বিধু কয়ালের বাগানে ফুলতলা থেকে কলমের চারা এনে পোঁতা। বাগানের ভারী নাম। বোল হওয়ার সময় থেকে বিধুর সতর্ক

নজর বাগানের দিকে। বাগান কাঁটা-তারে ঘেরা, তার উপর পাহারা মোতায়েন থাকে রাত্রিদিন। তবু পারবে তারা গগনের সঙ্গে? কাঁটা-তার হোক কিংবা পাহারাদার হোক, গগন মন করলে কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না। ভাবা গিয়েছিল, গেছে সেই কয়ালের বাগানে—কোঁচড় ভরতি আম নিয়ে ফিরবে। কিন্তু রোদ উঠে যায়, রোগীরা চেঁচামেচি লাগিয়েছে, গগনের দেখা নেই। বাড়ির হবু-জামাই কম্পাউণ্ডারি কাজ আপাতত না-ও যদি করে, ফিরে আসবে তো বাড়িতে! একবার মনে হল, আংটি গড়ানোর ব্যাপারে স্যাকরা-বাড়ি গেছে হয়তো। সে জায়গা ক্রোশ তিনেক দূরে। কথাও ছিল বটে, স্যাকরা নানা রকম পাথর এনে রাখবে, গগন গিয়ে পছন্দ করবে। মলিন মুখে মনোহর তাই বলছে সকলকে, দেখ সাতসকালে স্যাকরার কাছে গিয়ে বাবাজি বসে রয়েছে।

সেই স্যাকরার গ্রাম এবং আশপাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামে খোঁজ নেওয়া হল—কেউ কিছু বলতে পারে না। প্রথম দিনটা চেপেচুপে রেখেছিল—পরের দিন চাউর হয়ে গেল, পাত্র পালিয়েছে। পড়শীরা শুধায়: বরের কথা তো শোনলাম—ভুতিকেও দেখা যাচ্ছে না, সে কোথা গেল?

মনোহরের বউ বলে, আমার বাবা এসেছিলে, তিনি নাতনীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। বোঝ তো দিদি, হঠাৎ সমস্ত উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়ে মেয়ের লজ্জা হয়েছে। বাবা তাই বললেন, চল্ আমার সঙ্গে—গিয়ে দিন কতক থেকে আসবি।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? বিয়েথাওয়া করে দিব্যি গদিয়ান হয়ে ডাক্তারি চালাবে, রাঙা-বাড়ি লিখে নেবে—এত সমস্ত সুযোগ সত্ত্বেও হঠাৎ কেন সরে পড়ল, ভেবে পাওয়া যায় না। হতে পারে, শত্রুতা সেধেছে কেউ। হরিদাস হতে পারে, তার বাসনা ছিল মনোহরের জামাই হয়ে জাঁকিয়ে বসবার। দলবল জুটিয়ে মুখ বেঁধে ফেলে গুমখুন করল না তো মানুষটাকে? কিন্তু গগন দুর্বল নয়—টানাহেঁচড়ার চিহ্ন নেই, একেবারে টুঁ শব্দটি করল না, এতবড় একটা কাণ্ড কাকপক্ষীতে জানল না। পাড়াগাঁ জায়গায় এমনধারা হতেই পারে না।

কে-একজন বলল, পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এটা বরঞ্চ হতে পারে। বন থেকে নদী-খাল সাঁতরে মাঠ পাড়ি দিয়ে বাঘ এতদূরে আসতে পারে তো বাতাসে পাখনা ভাসিয়ে সোঁ-সোঁ করে জিনপরী চলে আসবে, কত বড় কথা! পরীর নজর পড়ার কথা শোনা যায় মাঝে মাঝে। সেবারে হল কি—সোনা টকারির মাঠে আসগর গাছি (খেজুরগাছ কেটে রস আদায় করে, আপনারা তাদের বলেন শিউলি; আমাদের এদিককার নাম গাছি) গাছে উঠে জিরানের রস পাড়ছে। নিচে ভাইপো দাঁড়িয়ে। হাতে রসের ভাঁড়, সেই অবস্থায় আসগর উধাও। ভাইপো উপর মুখো তাকিয়ে আর দেখতে পায় না: চাচা, চাচা গো! কোথায় কে? কাঁদতে কাঁদতে ছোঁড়া একলা বাড়ি ফিরে এল। ঠিক একটি মাস পরে তেমনি এক সকালবেলা পরীর কবল থেকে আসগর ছাড়া পায়। উড়িয়ে নিয়ে এসে—ঘর-বাড়িতে নয়—যে-খেজুর-গাছ থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই গাছের মাথায় আবার তাকে রেখে গেল। পুরো মাস পরে আসগর রসের ভাঁড় হাতে গাছ থেকে নেমে এসে বাড়ি ঢুকল। হরেক দৃষ্টান্ত আছে এমন। অতএব বিয়ের, তারিখ এসে যাচ্ছে, হেন অবস্থায় রাত্রিবেলা ভালমানুষে ঘুমিয়েছে, সকালবেলা আর নেই—কাউকে কিছু বলল না, কেউ টের পেল না—নিঃসন্দেহে এ জিনপরীর ব্যাপার। পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বিশেষ রকমের দোষ-অপরাধ না হলে পরীরা কারো মন্দ করে না—

খেলায় একটুকু। আশা করা যায়, আবার কোন্ সকালে দেখালে দেখা যাবে, দাওয়ায় কাঠির মাদুরের উপর গগন অঘোর ঘুম ঘুমোচ্চে। ডেকে ডেকে ঘুম ভাঙাতে হবে। বিয়ের তারিখের মধ্যেও সেটা হতে পারে। মেয়েকে অতএব দাদামশায়ের বাড়ি ফেলে রেখোনা ডাক্তার, বাড়ি এসে তৈরি হয়ে থাক।

এক হিসাবে বলা চলে, খানিকটা তাই। কালোকোলো মোটাসোটা ভুতিকে পরী বলা মুশকিল, কিন্তু উড়িয়েই নিয়ে গেল সে গগনকে। গগন ঘুমিয়ে আছে, ভুতি পা টিপে টিপে এসে ঝাঁকুনি দেয়। আচ্ছা মানুষ আপনি মাস্টারমশায়! ঘুম আসে কেমন করে বুঝি নে।

বোঁচকা তো বেঁধেই রেখেছে, ডাক্তারখানা থেকে সেটা বের করে এনে দরজা ভেজিয়ে নিঃশব্দে বেরুল। গগন আগে যাচ্ছে, ভুতি পিছনে। আমতলা দিয়ে যায় না, শুকনো পাতা পায়ের নিচে খড়মড়িয়ে উঠবে। কৃষ্ণপক্ষ, অন্ধকার বেশ ঘন—ভেবেচিন্তেই আজকের রাত ঠিক করেছে তারা।

গাঙের ধারে এসে গেল। ধর্মখেয়া। অর্থাৎ পয়সাকড়ি নেবে না পারাপারের জন্য। দশের হিতার্থে চকদার বড়লোক কেউ নৌকো কিনে পাটনী মাইনে করে রেখে দিয়েছে। এই নিশিরাত্রে পার করবার জন্য পাটনীর বসে থাকবার কথা নয়। কিন্তু খেয়ানৌকোটাও তো এপারে দেখা যাচ্ছে না। ঘাটের অভিসন্ধি খুঁজে দেখে, বোঝাই নৌকো কয়েকটা আছে। তারা পার করে দেবে না। পার করে দেবার কথা বলাও যায় না—মনোহর এদিককার জানিত লোক, পরিচয় টের পেয়ে গেলে বিপদ।

উপায়?

ভুতি কেঁদে বলে, উপায় একটা বের করুন মাস্টারমশায়। বেরিয়েই যখন পড়েছি, দেখাশুনো না করে ফিরব না। নৌকো না পাই, ঝাঁপ দিয়ে পড়ব এই গাঙে।

গাঙ বললে বেশী মান দেখানো হয়, আসলে বড় খাল একটা। তবে টান খুব, বিশেষ করে কোটালের কাছাকাছি এই সময়টা। কলকল করে জল ছুটে চলেছে। গগন থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল ভেবে নিল। বলে, ঝাঁপ না হয় আমিই দিচ্ছি। খেয়ানৌকো ওপারে—সাঁতরে পার হয়ে গিয়ে নৌকো নিয়ে আসি। যদি অবশ্য জোয়ারের টানে ভেসে না যাই, কুমির-কামটে না খেয়ে ফেলে।

আশঙ্কা মিছা নয়। ভুতি শিউরে ওঠে, তবু 'না' বলতে পারে না। যেতেই হবে ওপারের ঘাটে নৌকোর খোঁজে। নৌকো চাই। পার না হয়ে উপায় নেই।

রাঙা-বড়ি দেবে তো আমায়? তোমার কথার উপরে বেরিয়ে এলাম। গা ছুঁয়ে বল ভুতি, যেমন হরিদাস পাবে আমিও পাব তেমনি। মা কালীর দিব্যি করে বল। দেখ, এমনিই তো আমি পেয়ে যেতাম। রাঙা বড়ি শিখে, বিবেচনা কর, শ্বশুরের পুরো পশারটা নিয়ে রাজার হালে থাকতাম।

ভুতি বাধা দিয়ে বলে, থাকতে পারতেন না। বাবাকে বলে দিতাম আপনার বউয়ের কথা। জোচ্চুরি ধরা পড়ত। হরিদাসের দশা হত, হরিদাসের চেয়ে বেশী মারগুতোন খেতেন।

গগন, অন্ধকারে যতটা নজর পারা যায়, ভুতির দিকে চেয়ে বলে, যাকগে—সে পথ তো ছেড়েই এসেছি। আমিই বা কেন ঘর করতে যাব তোমার মন যখন হরিদাসের উপর? এই দেখ জীবনের মায়া করছি নে—তুমিও ধর্ম বুঝে কাজ করো।

নেমে পড়ল গাঙে, এবং জলস্রোতে পলকে অদৃশ্য। হাত-পা দাপাদাপির শব্দ আসছিল—দূরে চলে গিয়ে তারপর জলের ডাকের সঙ্গে সেই শব্দ মিলেমিশে গেল।

ভয় করছে ভুতির। এত লোভ ওষুধটা জানবার, এবং পয়সা রোজগারের? অন্ধকারের দূরের কিছু দেখা যায় না—পে'ছিল ওপারে কিংবা টানের মুখে ভেসে গেল, বোঝা যায় না। অনেকক্ষণ কেটে গেছে—ভুতি এক নজরে তাকিয়ে ওপারের দিকে। এমনি সময় দেখে, অন্ধকারে ছুঁচাল কি-একটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। আরও স্পষ্ট হল। নৌকোর আগা। খেয়ানৌকো নিয়ে এসেছে গগন।

নৌকোয় উঠে বসে ভুতি হাত বাড়িয়ে বলে, এই নিন মাস্টারমশায়। মুখে কি বলব, রাঙা-বড়ির যত কিছু বকাল, সমস্ত লিখে নিয়ে এসেছি। আপনি যা করলেন, জীবনে ভুলব না।

ভুতির হাতের মুঠোয় কাগজ। এতক্ষণে স্থির হয়ে বসে গগন বিড়ি ধরাল, দেশলাইয়ের আলোয় দেখে নেয় কাগজটুকু। লাল কালিতে লেখা দীর্ঘ একটা ফর্দ—এই এই মাপের এই সব জিনিস দিয়ে রাঙা-বড়ি তৈরি হয়।

ভুতি বলে, হরিদাসকে বলবেন না কিছু। সে রাগ করবে!

হরিদাস বলেছে বটে গগনকে শিখিয়ে দেবে—সেটা মুখের কথাই। কোন্ সুবাদে দিতে যাবে? কী এমন খাতির! মনোহর আর ভুতি ছাড়া দুনিয়ার মধ্যে আর যে জানবে সে হল হরিদাস। আর একজনকে শিখিয়ে কেন অকারণ প্রতিযোগী বাড়াবে? কিন্তু আছ কোথা কম্পাউন্ডারবাবু, তোমার আগেই সেই বস্তু এই দেখ মুঠোয় এসে গেছে।

গাঙ পার হয়ে চলেছে দুজনে। ফাঁকা মাঠে পড়ল। আকাশে তারা। আঁধারে এতক্ষণে চোখ রপ্ত হয়ে গেছে, দিব্যি পথ দেখা যায়। না দেখলেও অসুবিধা নেই, ভুতির সব মুখস্থ। আগে যাচ্ছে সে এখন। আর মুখে বলে বলে যাচ্ছে, আধ-ক্রোশটাক গিয়ে, মাস্টারমশায়, গাঙ থেকে খাল বেরিয়েছে। খালের কিনারা ধরে যেতে হবে দক্ষিণমুখো। বাঁশের সাঁকো পড়বে।

গগন বলে, গিয়েছ নাকি সেখানে?

ভুতি ঘাড় নাড়ে: গাঙ-পারে এই আমি প্রথম এলাম। যেতে কেন হবে? হরিদাস একরাত্রে এপার থেকে আমাদের পারে গিয়েছিল—

শিউরে উঠে গগন বলে, বল কি, অত মারধোরের পরেও আবার?

তাই বুঝুন। না দেখে থাকতে পারে না।

হরিদাস যেমন বলেছে, ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। খালের উপর সাঁকো। গ্রাম এদিকটায় দত্তগাঁতি—কোন দত্ত জমিজমা নিয়ে প্রথম ঘরবসত করেন বোধহয় এখানে। তেমাথার উপর খড়ে ছাওয়া দোচালা ঘর। হরিদাস ডাক্তার হয়ে নতুন এই ডাক্তারখানা বেঁধেছে। অদূরে এক সম্পন্ন গৃহস্থ-বাড়ি—চালের টিন ঝকমক করছে। আপাতত ঐ বাড়িতে আছে হরিদাস, ঐ টিনের ঘরে শোয়। ভুতি তেমাথা পথে ঘাসবনের উপর বসে পড়ল। গগন গিয়ে ও-বাড়ি থেকে হরিদাসকে ডেকে আনুক।

হরিদাসের সজাগ ঘুম। রোগী মনে করে ধড়মড় উঠে এল বাইরে। গগনকে দেখে অবাক।

রাত দুপুরে তুমি হঠাৎ?

এখানে নয়। চলে এস, ব্যাপার আছে।

খানিকটা এগিয়ে এসে বলে, ভুতি এসেছে।

হরিদাস অবাক হয়ে যায়: সে কি! সোমত্ত মেয়ে কোন্ বিবেচনায় এমনি সময় নিয়ে এলে?

তুমিই তো গোপনে গিয়ে পথ ঘাট বলে দিয়ে এসেছ।

গজর-গজর করতে করতে এল, কিন্তু ভুতির সামনে হরিদাস আর এক মানুষ। কণ্ঠ অতিশয় মোলায়েম করে বলে, কোন দরকার আছে লতিকা ? খবর পেলে আমিই তো যেতে পারতাম।

ভুতি বলে, কুল ছেড়ে এলাম তোমার কাছে।

সে কি, কেন ? ভাল ঘরের মেয়ে তুমি—আমিই বলে পরের বাড়ি মাথা গুঁজে আছি—থাকবে কোথা ? খাবে কি ?

ভুতি গোঁ ধরে বলে, ওসব আমি জানি নে। তুমি যেখানে আমি সেইখানে। আর আমি ফিরব না।

গগনকে ভুতি মাস্টারমশায় বলে—এসব প্রণয়ের কথা অতএব কানে শোনা উচিত নয়। ধাঁ করে সে খানিক পিছিয়ে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। আকাশ-পাতাল ভাবনা এসে গেল হঠাৎ মনে।

হরিদাস ডাক্তারখানার তালা খুলল। ভিতরে গেল ভুতিকে নিয়ে। কতক্ষণ কথা-বার্তা তার পর হরিদাস একা বেরিয়ে আসে।

ও যাবে না। তা থাকুক-দুচারটে দিন। মনোহর ডাক্তার নতুন এখন ভদ্রলোক হচ্ছে। মানীলোক হচ্ছে। মেয়ে আমার কাছে, খবর জানতে বাকি থাকবে না। মানের দায়ে সে-ই ছুটে এসে পড়বে।

গগন চিন্তিত ভাবে বলে, দেখ, মামলা-মোকদ্দমা করবে হয়তো। আমি সঙ্গে করে এনেছি, আমাকেও জড়াবে। ডেকে দাও ভুতিকে একবার—খুড়ি, লতিকাকে। একবার একটু দেখা করে আমার সঙ্গেই আবার ফিরে যাবার কথা। থাকতে চায় কি জন্য এখন।

যাবে না তো ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়াব নাকি ?

হাসে হরিদাস হি-হি করে। বলে, ভয় কিসের ? মান খুইয়ে মনোহর ডাক্তার ঘরের কেলেঙ্কারি কখনো থানায় বলতে যাবে না। যায় তো আমারও সমুচিত জবাব আছে।

হাসি থামিয়ে বলতে লাগল, জাতের বড়াই খুব। ভিনজাত হয়ে মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তাই অপমান করে তাড়াল। কিন্তু মনোহর নিয়ে এসেছিল ঐ যে ভুতির মা—সেই বা কোন্ ভটচাজ্জির মেয়ে শুনি ? পরের বউ ফোসলানি দিয়ে নিয়ে এল, বিয়েও তো করে নি, পালিয়ে বাদা অঞ্চলে এসে উঠল। এতকাল পড়ে ছিলাম—কোন্ খবরটা না রাখি ? হাটে-হাঁড়ি ভাঙতাম সেদিন—কিন্তু ভুতির মুখ চেয়ে কিছু করি নি। রাঙা-বড়ির লোভে।

একটু থেমে আবার বলে, ওসব কিছু ভাবি নে। কিন্তু তুমি কি করবে এবার গগন ? গাঙ পার হয়ে ফিরে যাবে ? টের পেলে ডাক্তার কিন্তু ছেড়ে কথা কইবে না। আমার মতন হবে। সেই সব ভেবেচিন্তে যেও।

গগনের হাতের মুঠোয় রাঙা বড়ির ফর্দ। হরিদাস জানে না। কাকে সে এখন পরোয়া করে! ঘাড় নেড়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমারও ঐ লতিকার কথা। বেরিয়ে পড়েছি তো আর যাচ্ছি নে। ডাক্তারি ধরব এবার, যা তুমি করছ। আচ্ছা, নৈর্ঋত হল কোন্‌টা ? দিক ঠিক থাকে না রাত্রিবেলা। ওলাবিবি নৈর্ঋতে গেলেন, আমিও যাই। মওকা ছাড়া হবে না।

হরিদাস সঙ্গে সঙ্গে চলল, বাঁধের উপর তুলে ভাল করে তাকে নৈর্ঋত কোন দেখিয়ে

দেবে। ভুতির মায়ের কথা চলছে। ব্রাহ্মণ-ঘরের বউ—কুল ছেড়ে মনোহরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। মনোহর তাই পুরুষমানুষের সামনে বউয়ের ঘোমটা খুলতে দেয় না। প্রায় তো বুড়ী হয়ে গেছে এখন—তবু সেই পুরানো অভ্যাস। পিরীতের ঝোঁকে ভুতিই সব পারিবারিক কথা বলে দিয়েছে হরিদাসকে।

হরিদাস বলে, অবাক হচ্ছ কেন, বাদার এই রীত। ঘরবসত ছেড়ে সহজে কে বনে আসতে চায়? আসে পেটের জ্বালায়। ফাটকের দুয়োর থেকে পিছলে এসে পড়ে কেউ কেউ—পুলিসের হাত এড়িয়ে। কেউ আসে সমাজের তাড়া খেয়ে। যতদিন বন থাকে ততদিন বেশ ভাল। পড়শি বাঘ-কুমির—জাত-জন্মের কথা কিসে উঠবে? বসত জমলে তখনই যত রকম বায়নাক্কা।

হাত তুলে দূরের পথ দেখিয়ে দেয়। ফিরে যাবে এবার হরিদাস। গগনের পিঠে থাবা মেরে সে তারিফ করে: বেশ করেছ ভাই। খপ্পরে এনে ফেলেছ, রাঙা-বড়ি না দিয়ে এবারে পারবে না। ওর বাপ শয়তানটা তিন বছর আশায় আশায় ঘুরিয়ে শেষটা ছুতোনাতায় তাড়িয়ে দিল। তোমা হতেই উপকারটা হল গগন। আমার যে কথা—ফাঁকি দেব না, রাঙা-বড়ি তোমাকেও বলব। খবরবাদ নিও মাঝে মাঝে।

গগন বলে, নেব বই কি! একদিন এসে তোমাদের সংসারধর্ম দেখে যাব।

সংসারধর্ম? একটু চুপ করে থেকে অন্ধকারে হরিদাস হেসে উঠল: আলকাতরার পিপের সঙ্গে সংসারধর্ম হয় না। বাজে ভাঁওতা তোমার কাছে দেব না। বেজাত বলে আমায় মারধোর করল। বলি, আমারও জাতজন্ম আছে একটা। জাতের দায় আজকে না থাক হবে- তো একদিন। টাকা-পয়সা হলে তখন হবে। সমাজ হবে, আত্মীয়কুটুম্ব সমস্ত হবে। সংসারধর্ম জমিয়ে বসে শেষটা ঐ মনোহর ডাক্তারের মত আঁকুপাকু করে মরি! বয়ে গেছে—অমন ন্যাকাচৈতন পাও নি আমায়।

গগনের কিন্তু ভাল লেগে গেছে ভুতিকে। একটু আগে ঐ যে যাত্রার ঢঙে বলছিল হরিদাসকে, তাতে যেন বেশী ভাল লাগল। বলে ছি-ছি, এই যদি মতলব রাতবিরেতে কি জন্য তবে পার হয়ে যাও? না দেখে থাকতে পার না—এই সব বলে বোকা মেয়েটাকে পাগল করে তোল?

হরিদাস হাসতে হাসতে বলে, কাজ হাসিল হয়ে যাক, তখন আবার ভিন্ন কথা বলব। বলাবলি কি—যেখানকার মেয়ে গাঙ পার করে রেখে আসব সেই জায়গায়।

ঘরে নেবে ওর বাপ?

আমারই বা কোন্ দায়! আমি আসতে বলেছি? বকুনি দিলাম, শুনলে তো নিজের কানে। মনোহর ডাক্তার অপমান করল আমায়, হাতে ধরে মারল, তার শাস্তি হবে না? ভগবান আছেন বুঝতে পারলে? দশের মধ্যে মুখ পুড়বে। এপার থেকে শুনতে পাব আমি, মজা দেখব।

এর পরে গগনের প্রবৃত্তি হয় না হরিদাসের সঙ্গে কথা বাড়াতে। হন হন করে এগিয়ে চলল। হাতের মুঠোয় ভুতির দেওয়া কাগজের টুকরো। চলল নৈঋ'তে—বলির পাঁঠার রক্তচিহ্ন ধরে ওলাবিবি যে তল্লাট উজাড় করতে করতে চলেছেন। ওলা-বিবির পিছন ধরে চলল। সে-ও কি কম ফ্যাসাদ! কত জায়গায় গিয়ে শোনে, হ্যাঁ—চলেছিল মহামারী একদিন-দুদিন, এখন থেমে গেছে। ওঝা বৈদ্য ইদানীং এমন করে লেগেছে, বিবিঠাকরুনকে এক জায়গায় তিষ্ঠাতে দেয় না, তাড়িয়ে তোলে। ওলাবিবি ছোটেন—মন্ত্রতন্ত্র ও ওষুধপত্র সহ তারাও ছোটে পিছনে। গগনও সেই

জঙ্গলের একজন। কাকে কদ্দুর? কিছু ঠিক নেই—দক্ষিণে যত নাবালে মানুষের বসতি পৌঁছেছে। ওলাবিবি যেখানে গিয়ে স্থির হয়ে দুটো দিন থাকবেন—এবং গগন হেন মানুষদের কিছু রোজগারের উপায় হবে। সে জায়গা যত দূরে হোক, যেতেই হবে।

খবরবাদ নিয়ে দেখছে, ওলাবিবি চলেছেন কিন্তু নৈর্ঋত কোণ কিংবা কোন বাঁধা পথ ধরে নয়। এগোন আবার পিছিয়ে আসেন, ডাইনে ঘোরেন কখনো, কভু বা বাঁয়ে। ইচ্ছে করে লুকোচুরি খেলছেন যেন। কিন্তু নতুন ডাক্তার গগনও হার মেনে ফিরে যাবার মানুষ নয়।

নয়

মাস কয়েক পরে গগনকে দেখতে পাচ্ছি কুমিরমারি গঞ্জে।

ডাক্তার হয়ে চেপে বসেছে। ঘুরে-ফিরে সেই কুমিরমারি—বাদার কলকাতা। ওলাবিবির পিছন ধরে এসে পড়েছে। বিবি-ঠাকরুনের আশীর্বাদও ছিল গোড়ার দিকে। নতুন ধানচালের সময়, ডাক্তার ডাকতে মানুষ দৃকপাত করত না। গোল-পাতার ঘর বেঁধে ফেলল গগন, তক্তাপোশ কিনল। এবং একটা ওষুধের বাক্সও আনল কলকাতা থেকে ভি-পি করে। ডাক্তারির কায়দাকানুন এবং ওষুধ আনানোর ঠিকানা জেনে এসেছে মনোহরের বাড়ি থেকে। শুধুমাত্র বাক্সই, ওষুধের আপাতত গরজ নেই। সে ব্যবস্থা করে এসেছে মনোহরের ডাক্তারখানা থেকে—পুঁটলিতে ভরে একগাদা হোমিওপ্যাথি শিশি এনেছে মূলধন হিসাবে। ওষুধের বাক্সের ছিদ্রে ছিদ্রে শিশি—ছিদ্রগুলো ফাঁকা রেখে আসে নি, মনোহর তবে তো টের পেয়ে যাবে। খালি শিশিতে দেদার জল ভরতি করে ঢুকিয়ে এসেছে। নিজের বাক্সেও সেই ব্যাপার। কতক খাঁটি ওষুধ, কতক সাদা জল। গোড়ায় কিছুদিন হাত পুড়িয়ে নিজে রান্না করে খেয়েছিল। একটু জমে যেতেই গদাধরের হোটেলে খায়। যেখানে সেই পয়লা দিন নাজেহাল হয়েছিল। এখন গলায় গলায় ভাব গদাধরের সঙ্গে। চোখ টিপে গদাধরকে জিজ্ঞাসা করে, পয়সা তো দেদার পিটছে। ক'ঘটি জমল, বল দিকি?

বিরস মুখে গদাধর ঘাড় নাড়ে: ঘটি দেখ তুমি! একটা পয়সা থাকে তো বাপের হাড়। দুটো হাটে চাল-ডাল আনাজপত্তর কিনি—সেই হাটখরচা জোটাতেই প্রাণান্ত।

সে কি? কাতারে কাতারে খদ্দের এসে খেয়ে যায়—

সত্যি কথা ডাক্তারবাবু। হাটবাজারের দুপুরে শুধু ভাতই রাঁধতে হয় পাঁচ-ছ বার।

হঠাৎ কথা থামিয়ে গদাধর বস্তার চাল দাঁড়িপাল্লায় মেপে ধামায় ঢালতে লাগল। এগুলো হাঁড়িতে চড়াবে এখন।

গগন বলে, বলি মাংনা তো কেউ খায় না। খেয়ে পয়সা দিয়ে যায়। তবে অনটন হবে কেন?

গদাধর ঘাড় লম্বা করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নেয়। বাসনের কাঁড়ি নিয়ে আদরমণি খালে নেমে গেছে। দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, নচ্ছার মাগী সব পয়সা খদ্দেরের কাছে হাত পেতে নিয়ে নেয়। হাটের সময় পয়সা চাইলে কৌটো সামনে এনে উপুড় করে, যত খদ্দেরই আসুক হাট-খরচা কিছুতে আর জমতে চায় না।

গগন বলে, হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না। রাত্রে কাজকর্ম চুকিয়ে সমস্ত দিনের সব জমাখরচটা লিখে রাখলে পার। এমন ফলাও ব্যবসা, তা কাগজের উপরে কোন দিন একটা কালির আঁচড় কাটতে দেখলাম না।

হুঁ—বলে গদাধর চুপ করে থাকে।

বাংলা লিখতে পড়তে পার তো ভটচার্জি ?

পারি খানিকটা। ক্ষণপরে আবার বলে, ক-খ-ঠ এক গাদা অক্ষর—হেরফের হয়ে যায় ডাক্তার, সমস্ত মনে থাকে না।

গগন হেসে বলে, বুঝতে পেরেছি। রাত্রে খেতে এসে আমি রোজ হিসাব ঠিক করে দিয়ে যাব। খাতা বেঁধে রেখো। তখন ঠাহর হবে টাকা যায় কোথায়। আদরকে বলতে পারবে।

কিন্তু এদিকে কী হল।

ওলাবিবি অল্প কিছুদিন কেরদানি দেখিয়ে একেবারে উধাও। এবারে কোন্ দিকে, পাত্তা মেলে না। লোকে বলে, মিলবেও না আর এখন, আগামী সনে নতুন ধান-চাল উঠলে আবার দেখা দেবেন। আপাতত ঠাণ্ডা।

গগনও ভাবছে, কাঁহাতক অমন রোগের পিছু তাড়িয়ে বেড়ানো যায়। রোগপীড়া একটা নয়। ওলাওঠা গেল তো আরও কত সব রয়েছে। আপাতত মন্দা বাজার হলেও দেখা দেবে সবাই সময়ক্রমে। স্থায়ী হয়ে বসেছে ডিস্পেনসারি সাজিয়ে, আর এখন নড়ছে না। কালে কালে মনোহর ডাক্তার হয়ে উঠবে গঞ্জের ভিতর। টাকাটা সিকেটা যা-কিছু পায়, কায়ক্লেশে নিজের খরচা চালিয়ে বাদবাকি বীনি-বউয়ের নামে মনিঅর্ডার করে। চিঠিও লেখে, মনের আশা চিঠিতে ব্যক্ত করে: কণ্টেস্মেণ্টে থাক ক'টা দিন, পশার জমে উঠুক, বেশী করে পাঠাব। হাতে কিছু জমলেই বাড়ি গিয়ে চারুবালা আর তোমাকে নিয়ে এইখানে ডিস্পেনসারির লাগোয়া বাসা করব।

আশার কথা লোকেও বলছে, সবুর কর কিছুদিন, আষাঢ়ে বর্ষাটা চেপে পড়তে দাও, জ্বরজারির ঠেলাটা দেখো। ক্রোশ তিনেক দূরের গাঁয়ে এক ফকির আছে, পোস্টাপিস সেখানে, গগন স্বচক্ষে দেখে এসেছে। পাঁচ পয়সা দক্ষিণায় ফুল-পড়া ও জল-পড়া দেন ফকির, সন্ধ্যাবেলা কুড়িয়ে এক ঘটি তামার পয়সা হয়ে যায়। কুমির-মারি ভাল হয়ে যাচ্ছে, ভদ্রলোকেরাও এসে বসত করবেন ক্রমশ। ভদ্রলোকের দেখা-দেখি সভ্যভব্য হবে অঞ্চলের যাবতীয় মানুষ। হাতের কাছে বিচক্ষণ গগন ডাক্তার থাকতে তখন আর ফকিরে জল-পড়া নিতে যাবে না, ওষুধপত্র খাবে। এই সমস্ত ভাবে গগন। আর কি, সেই যেমন লিখেছিল বীনি-বউকে—কণ্টেস্মেণ্টে কাটিয়ে যাও কিছুকাল, দিন এসে যাবে।

কিন্তু সুদিনে যে অবস্থাই ঘটুক—আপাতত ডিস্পেনসারি-ঘরে বিড়াল-ইঁদুর-আরশুলারই শুধু গতিগম্য। বীনি-বউর নামে টাকা গেল না এ মাসে। টাকা কি পাঠাবে, গদাধর-হোটেল না থাকলে দুবেলা খাওয়াই জুটত না। এমন হয়েছে, এক ছিলিম তামাক খেতে হলেও হোটেলে চলে যায়। হোটেলের হিসাবপত্র ঠিক করে দেয় রাত্রে, ঐ সঙ্গে নিজের খোরাকি বাবদ যা পাওনা হচ্ছে তারও একটা আলাদা হিসাব লিখে রাখে। বলে, কিচ্ছু ভেবো না গদাধর, পাইপয়সা অবধি শোধ করে দেব। এইসা দিন নেহি রহেগা। দুটো মাস যেতে দাও—এক রাস্তা-বাড়ি এক দিকে—
—তোমাকেই তখন দু-মাস ছ-মাসের আগাম টাকা দিয়ে দেব।

হা। এখন থেকেই রাঙা-বড়ি কালিয়ে রাখলে হয় শিশি ভর্তি করে। মনোহর ডাক্তার যেমন করত। বর্ষাকাল কেটে গিয়ে আশ্বিন—তখন তো আরো মজা। নতুন হিম পড়বে, খানাখন্দের আবদ্ধ শেওলা পচার দুর্গন্ধ, গায়ের উপর হাতটা বুলিয়ে আনলে কাদার মত মশা লেপটে আসবে। কম্প দিয়ে জ্বর আসবে তখন ঘরে ঘরে। তেমন-তেমন হলে কোথায় লাগেন মা ওলাবিবি! কোকিল-বাড়ি এলাকায় মধ্যে দেখেছে, গৃহস্থঘরে এক ঘটি জল এগিয়ে দেবার মানুষ থাকে না, কোঁকাচ্ছে সব কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

ভূতির দেওয়া কাগজের টুকরো অতএব বের করে ফেলল। কণ্টিকারি, বচ, হাতি-শুঁড়া, ভাদলার মূথা, স্বর্ণসিন্দুর—এমনি বাইশ-চব্বিশ দফা। এতগুলো বস্তু জোটানো সোজা নয়, নগদ পয়সায় কেনাকাটাও আছে। নিজের হাতে-গাঁটে যা আছে তাতে কুলায় না, তিন চার টাকা হাওলাত হল গদাধরের কাছে। ওষুধটা কোন রকমে একবার উৎরাতে পারলে তখন তো পায়ের উপর পা চাপিয়ে পয়সা লোটার ব্যাপার। ঝঞ্জাট ও খরচপত্রের হাজার গুণ উশুল হয়ে আসবে।

কিন্তু রঙই আসে না মোটে। মনোহরের রাঙা-বড়ি টকটকে জবাফুলের মত—রং দেখেই রোগী মেতে যায়, গালে তোলবার সবুর সয় না। আর এই বড়ি গগন রোদ্দুরে শুকাল, আগুনে সেঁকে দেখল—পোড়া মাটির মত চেহারা। হাঁদা মেয়ে বকালের নামগুলো দিয়েছে, পরিমাণ লেখে নি। সেই দোষেও হতে পারে। গুণাগুণ কি দাঁড়াল, জ্বরো রোগীর উপর পরখ না করে বলা যাবে না। এমন হতভাগা জায়গা—না-ই বা হল আষাঢ় মাস, এত লোকের মধ্যে কারো কি একটু গা গরম হতে নেই।

ভেবেচিন্তে একদিন দত্তগাঁতি-মুখো বেরিয়ে পড়ল। মুঠোখানেক বড়ি নিয়ে যাচ্ছে সঙ্গে করে, ভূতিকে দেখাবে। ভূতি কি বলে শোনা যাক। লোকসান নেই—আর কিছু না হোক, দুটো বেলার হোটেলের দেনা অন্তত বাঁচবে। ভূতি-হরিদাসের কী ভাবে চলছে, খবর নেওয়া কর্তব্যও বটে। ওষুধ বাগিয়ে নিয়ে বিদায় করে দিয়েছে নাকি ভূতিকে? কেমন লোক হরিদাস, তা-ই হয়তো করে বসেছে ইতিমধ্যে।

রাত্রিবেলা সেই একদিন ডাক্তারখানার দোচালা ঘর দেখে গিয়েছিল, তার পিছনে নতুন এক দাওয়া জুড়েছে। ছ্যাঁচা-বাঁশের বেড়ায় দাওয়া পরিপাটি করে ঘেরা। গগন গিয়ে ডাকে, কম্পাউণ্ডারবাবু আছ?

বলে ফেলেই মনে হল, কম্পাউণ্ডার নয় এখন। সংশোধন করে নেয়ঃ ডাক্তার-বাবু—

পিছনের দাওয়া থেকে সাড়া আসে, বলো। রোগী দেখতে বেরিয়েছেন। এখুনি এসে যাবেন, বসতে বলে গেছেন।

ভূতি বলছে। গগনকে সে এক সাধারণ রোগী ভেবে বসেছে।

গগন ডাক দেয়, এদিকে এস তুমি। চিনতে পারছ না, আমি মাস্টারমশায়।

উঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে ভূতি সামনে এল। গগন বলে, আছ কেমন? সেই তো জুড়ে-গেঁথে দিয়ে গেলাম। সুখশান্তি কেমন হল, দেখতে এসেছি।

ভূতি ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়লঃ সুখ আর শান্তি। তেমনি লোকের হাতে দিয়ে গেছেন কিনা! সুখশান্তি কপালে থাকবে তো এই চুলোয় মরতে আসব কেন?

এ তো জানা কথা। হরিদাস হয়তো রাঙা-বড়ি আদায় করে নিয়েছে ইতিমধ্যে, নিয়ে তার নিজমূর্তি ধরেছে। গগন বলে, ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে বুঝি? তা দেখ, দুটো হাঁড়ি এক জায়গায় রাখলে ঠোকর লেগে খনখন করে, দুটো মানুষের ঘরসংসারে খটাখটি বাধবেই কখনোসখনো।

এই সব নাকে-কাঁদুনি শুনবার জন্য এতদূরে হেঁটে আসে নি, কাজের কথা সকলের আগে। হরিদাস বেশী দূরে যায় নি, এখুনি এসে পড়তে পারে—জরুরী কথাবার্তা তার আগে সারতে হবে।

বলে, রাঙা-বড়ি বানালাম ভুতি, কিন্তু রঙ আসে না।

ভুতি মুখে আঙুল ঠেকিয়ে বলে, খবরদার, খবরদার! এ-মানুষ টের না পায়। তবে আমায় আস্ত রাখবে না।

হরিদাস ডাক্তারকে দাও নি আজও?

না। একটু থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, ওকে চিনি নে? যেটুকু বাকি ছিল, এর মধ্যে চিনে ফেলেছি। যেদিন দিয়ে দেব, তার পরদিনই চুলের মুঠি ধরে আমায় রাস্তায় তুলে দিয়ে আসবে। কাজ ফুরালে তখন ও-মানুষ কারো না।

হরিদাসের মনোভাব ভুতির কাছেও তবে অজানা নেই। ঝানু মেয়ে লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে হাতের মুঠোয় রেখেছে। কিন্তু এই খেলানো কত কাল চলবে? মরীয়া হয়ে উঠবেই এক সময়। চকিতে এত সব ভেসে যায় গগনের মনে। চুলোয় যাক, ওদের কথা ওরা ভাবুক গে—গগন যার জন্য এসেছে। বলে, অনেক রকম করে দেখলাম। রাঙা-বড়ি হলদে-হলদে থেকে যায়। তোমাদের বড়ি ঘোর রঙের, তেমনটি কিছুতে হয় না। তাই ভাবছি, মাপের যদি হেরফের হয়ে থাকে –

ভুতি দৃক্‌পাত না করে বলে, রাঙা-বড়ি না হল তো হলদে-বড়িই বলবেন। কাজ কী রকম হচ্ছে তাই বলুন।

পরখ হল কোথা? পোড়া জায়গায় মানুষগুলোর যেন পাথরের দেহ। হাঁচেও না কেউ ভুলে। সবাই বলছে, আষাঢ় থেকে নাকি কিছু কিছু হবে। আশায় গোছ-গাছ করছি।

ভুতি বলে, তাই করে যান। সময়ে দেখতে পাবেন। ম্যাজেণ্টা মিশিয়ে বাবা রং করত। কী দরকার, আপনার ওষুধের আলাদা নাম মাস্টারমশায়। ফিক করে হেসে বলে, গগন ডাক্তারের হলদে-বড়ি। বেশ শুনতে।

হরিদাস ফিরল। গগনকে দেখে ভারী খুশী। বলে, এসেছ তুমি? প্রায়ই ভাবি তোমার কথা।

ইঙ্গিতে টাকা বাজিয়ে দেখায়। চাপা গলায় বলে, ছাড় দিকি একটা। দুধ নিয়ে আসি।

গগন হকচকিয়ে গেছে।

লতিকাকে সেই দিয়ে গেলে। বাসা করেছি দেখ, রান্নাঘর বেঁধে ফেলেছি। আর এই হল ডাক্তারখানা, বৈঠকখানা—আর শয়নকক্ষও বটে। রাত্তিরবেলা ঝাঁপ ফেলে দিয়ে পাশাপাশি তিনটে বেঞ্চির খাট পড়ে এখানে। পেয়ারের মানুষ এসেছ, তোমায় পায়েস খাওয়াব। দুধ নিয়ে আসি বুনো পাড়া থেকে। এর পরে গোয়ালা এসে মাপ করতে বসবে, তখন আর মিলবে না।

পায়েস আমি ভাল খাই নে।

হীরদাস বলে, আমি খাই ! কুটুম্ব এসেছ, লতিকা যত্ন করে রেঁধেবেড়ে দেবে। তোমার নাম করে আমরাই সব খাব।

কলসি নিল হাতে, কলসি ভরতি করে দুধ আনবে। গগনকেও সঙ্গে নিয়ে বের হল। গেল ধুনোপাড়াতেই। আমাদের মধ্যে ধুনো নামে পরিচিত এই জাত সকলের চেয়ে পরিশ্রমী। লক্ষ্মীমন্তও বটে—উঠানে গোলা, গোয়ালে মহিষ-গরু। আরও হত মেয়েপুরুষ তাড়ি ও গাঁজিয়ার নেশায় অতিরিক্ত রকম আসক্ত না হত যদি। এক হাঁড়ি নিয়ে দুধ নয়, চাল কিনল গগনের টাকা দিয়ে।

বলে, দুধ না ঘোড়ার ডিম। অমনি বলতে হয়—খালি কলসি ফিরিয়ে নিয়ে বল দুধ পাও ! গেল না। একটা রোগী নেই বিশ দিনের মধ্যে। ভূতির জন্যে এবার ভাবি নে, বউ বলে, পেটের ভাত জোটাতে পারে না, সে মরদকে মেয়েমানুষ মানবে কেন ? দেখ ভগবান তোমায় পাঠালেন, নয়তো বিনি-অসুখে লঙ্ঘনে থাকতে হত আজ ! আজকাল বাড়ি বাড়ি ফিরি করতে শুরু করেছি : জ্বরজারি হয়েছে কারো—মাথা-ধরা, গা বমি-বমি ? বাড়ির উপর ডাক্তার পেয়েও কেউ রা-কাড়ে না। এক [illegible] শ্মশান-কার্তিকে পেয়েছিলাম। তোমাদের ওদিকে গতিক কি রকম বল দিকি।

গগন বিরস মুখে বলে, একটা মরশুম তুমি যাহোক কিছু করে নিয়েছ। আমার ওলাঠাকরুনের পেছনে ছোটাছুটি সার। ঠাকরুন খেলাতে লাগল। খবর শুনে ছুটলাম এক গাঁয়। গিয়ে দেখি ফুসফাস। নাকে-দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে। না পেয়ে এখন চেপে বসেছি কুমিরমারিতে। আষাঢ়ের ভরসায় আছি।

একটুখানি চুপ করে থেকে হরিদাস বলল, দেখ ডাক্তারি ব্যবসা এ দিগরে জমবে না। বাড়ন্ত লাউয়ে পোকা ধরে না। জঙ্গল কেটে মানুষের টাটকা ঘরবসত। পুরানো হয়ে খানিক হেজেপচে যাক, রোগপীড়ে তখন। রোগপীড়ে দেখগে ডাঙা অঞ্চলে, শহর-বাজারে। যতগুলো মানুষ, ততগুলো রোগ।

গগন বেজার মুখে বলে, ডাক্তারও তার দুনো। মারেও কেমন পটাপট। মানুষ না মশা—চটপট যে যত মেরে ফেলবে, তত তার কাছে ঘেঁষবে। তত তার পশার। সেই জায়গায় মাথা ঢোকানো তোমার আমার কর্ম নয় !

কয়েক পা গিয়ে নিরীহ ভাবে আবার বলে, আমায় রাঙা-বাড়ি বলে দেবে, মনে আছে সে কথা ? সেইজন্যে এলাম। মরশুম কি রকম দাঁড়াবে জানি নে, তবু তৈরী হয়ে থাকা।

আমায় বলে দিলে তবে তো বলব ! কিছু বের করতে পারি নি এদ্দিনে।

বল কি গো ?

খেলাচ্ছে। ঐ যা তুমি বললে—খেলানো হল ঠাকরুনদের রীত। কী তোমার ওলাঠাকরুন আর কী তোমার ভূতি-ঠাকরুন। আজ দেব কাল দেব করে কাটায়। বলে, এসে যাক মরশুম—ওষুধ বলতে আর বানাতে এক দিনের ওয়াস্তা। আসলে হল, আমার অসাক্ষাতে বাপের বাড়ির চর এসে ফুসকানি দিচ্ছে। টের পাই। মনোহর ডাক্তারের পয়সাকড়ি আছে, ছিলও আরামে। মন তাই টলমল করে।

গগন বলে, মেয়ে ঘরে নেবে মনোহর ডাক্তার ?"

হরিদাস বলে, কেন নেবে না, মেয়ের হয়েছে কি ! বয়সের দোষে একটু-আধটু পাক-ছাট সবাই দিয়ে থাকে। আবাদ জায়গা—খোঁজ নিয়ে দেখ, কোনও ঘরে বাদ নেই। এ তো কিছুই না—বনশ্রীরির কেদার আশের মেয়ে রঙ্গিণী পেটের বাচ্চা বাপ-মায়

কাছে রেখে থুয়ে-মুছে আবার ফের বরের ঘরে গিয়ে উঠল। গোময়-গঙ্গাজলে শুদ্ধ হয়ে সমাজের দশজন ডেকে পাতা পেড়ে খাইয়ে দিল—ব্যস। ভুতির বেলা তা-ও তো নয়।

গগন বলে, সেই যে বলেছিলাম—ভয় ছিল, মনোহর মামলা-মোকদ্দমা জুড়ে দেবে। আমি জড়িত আছি কিনা আবার। দেখছি, তোমার কথাই ঠিক।

হরিদাস ভ্রূভঙ্গি করে বলে, নিজের কুলের কথা সদরে নিয়ে ঢাক পেটাবে! ওরকম বেহায়া-বেলেল্লা ডাঙার মানুষ হতে পারে—আবাদ অঞ্চলে হয় না। মুশকিল হল, দুটো মন্তোর পড়ে ফুল ফেলে কাজটা পাকা করে নেব, সেটা কিছুতে হয়ে উঠছে না। বিয়েটা হয়ে গেলে নড়ানো আর সোজা হবে না।

গগন অবাক হয়ে যায়। কী কথাবার্তা এখন হরিদাসের মুখে! বলে, ষোলআনা বিয়ে করে ফেললে তুমি নিজেও তো আটক হয়ে গেলে। রাঙা-বড়ি নিয়ে দূর করে দেবে—তখন সেটাও আর সহজ হবে না।

উপায় নেই, শয়তান মেয়েটা আন্দাজে ধরে ফেলেছে। তা-না না-না করছে, বুঝলে না, পাকা সম্পর্ক না হওয়া পর্যন্ত মুখে রা কাড়বে না। ডাক্তার হয়ে বলেছি —এমন ওষুধটা মুঠোর ভিতর এসে ফসকে যাবে, সে-ও তো হতে দিতে পারি নে। পোড়া আবাদে বামুন পাওয়া যায় না। ধান-রোওয়া ধানকাটার জনকিষেন আসে ডাঙা অঞ্চল থেকে, দোকানদার আসে, গুরু আসে, ডাক্তার আসে—বামুন-পুরুত একজন কেউ আসে না। বিয়ের মন্তোর তা হলে আটকে থাকত এদ্দিন?

হরিদাসের মুখে আজ এই কথা! গগণের কৌতুক লাগে। আর এই মানুষটাই কী বলেছিল সেই রাত্রে। তার মানে রাঙা-বড়ি হাত করবার জন্য উতলা হয়েছে। ডাক্তারির গতিক দেখে বুঝেছে, ঐ বস্তু ছাড়া উপায় নেই। তারই জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত।

গগন বলে, আমাদের কুমিরমারিতে গদাধর বামুন আছে বটে, কিন্তু খাঁটি বামুন হবে না। শানা থেকে ভটচাজ্জি।

হরিদাস পরমোৎসাহে বলে, আছে নাকি? আগমবাগীশ-নিগমবাগীশ কোথা পাচ্ছ বুনো দেশে? পৈতে আছে তো? অং-বং দুটো-চারটে ছাড়তে পারলেই হল।

পৈতেটা নিতে হয়েছে, নয় তো হোটেল চলে না। মন্তোর পড়তে পারে না, হোটেল চালাতে মন্তোর-তন্তোরের গরজ কি?

হরিদাস এতেই রাজী। বলে, আহা, দু-চার কথা শিখে নিলেই হবে। নিত্য-কর্মের বই রয়েছে। উপরি রোজগার। পুজো-আচ্চা ব্রতসিন্নি কত জনে করতে চায়, পুরুতের অভাবে হয় না। একটা দিনের তরে পাঠিয়ে দিও তোমার বামুনকে। ভালমন্দ কত জাত হোটেলে খেয়ে যায়—বামুন বলে সবাই তো মেনে নিয়েছে। বামুন ছাড়া কী তা হ'লে? গিয়েই পাঠাবে।

দত্তপাতি থেকে গগন ফিরে এল। লোকসান। একবেলা যেমন ওখানে খেয়েছে, হরিদাসকেও দিয়ে আসতে হল পুরো একটি টাকা। রাঙা-বড়ি সম্বন্ধে ভুতি যা বলল, সেটাও কতদূর খাঁটি বোঝা যায় না। রাঙা-বড়ি নয়, চলুক তবে হলদে-বড়ি—গগন ডাক্তারের হলদে-বড়ি। টাকাটা সিকেটা যা যেখানে পায়, হলদে-বড়ির মকাল কিনে জড়ো করেছে। আষাঢ় মাস আসবে কবে—আকাশের দিকে তাকায় চাতক পাখীর

মতো, কবে নবীন মেম্বার হবে। জলে চতুর্দিক থইথই। কুমুদফুলের ফুটে আলো হয়ে আছে, কিন্তু শোভা দেখবার মানুষ কোথা? ঘরে ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে সবাই কোঁকাচ্ছে। ডাক শিগগির গগন ডাক্তারকে। আহার-নিদ্রার সময় নেই গগনের। এ-গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে হলদে-বড়ি প্রয়োগ করছে।

দশ

শুভ আষাঢ় এসে গেল। বৃষ্টিবাদলা হচ্ছে। জ্বরজারিও দেখা দিল। তেমন-কিছু নয় এখনো, গোণাগুণতি দুটো-পাঁচটা। আশা করা যাচ্ছে, জমে যাবে অচিরে। আশার বশে মানুষ ঘোরে, আশা না থাকলে বাঁচে কি নিয়ে? জ্বরের খবর পেলে গগন ডাক্তার উপযাচক হয়ে ওষুধ দিয়ে আসে। এমনি কায়দায় পশার জমাতে হয়। মনোহরের কাছে শুনেছে, তারও গোড়ার ইতিহাস এই। সে আবার, শুধুমাত্র ওষুধ নয়, পথ্যও মাংনা যোগাত। পথ্যের লোভেই বেশী রোগী আসত। ডাক্তারী ওষুধে তখন লোকের ধাতস্থ নয়, ডাক্তারের ব্যবস্থার ওষুধ সহজে কেউ খেতে চাইত না— এলোপ্যাথি ওষুধ বলত বিষ, হোমিওপ্যাথি জল। অনেক রোগী, শোনা গেছে, মনোহরের দেওয়া পথ্য খেয়েছে—ওষুধ ফেলে দিয়েছে গোপনে। তারপরে দিন ফিরল— গগন নিজ চোখেই দেখে এসেছে, রোগীকে অন্তর্জলীতে নামাচ্ছে, ডাক্তার ওদিকে ফীয়ের টাকা গুণে বাজিয়ে নিচ্ছে। পাইপয়সার ছাড় নেই। পসার একবার জমে গেলে তখন ঐ মূর্তি। এমন যে হলদে-বড়ি তাই গগন মাংনা দিয়ে বেড়াচ্ছে— দামের জন্য কিছু নয়, পরখ কর আগে। এক বড়িতেই বাপ-বাপ বলে জ্বর পালাতে দিশা পাবে না। ওঝার-মন্ত্রে যেমন ভূত-পেত্নী পালায়। রোগীরাও মোটামুটি বিশ্বাস করে এইরকম। ভাত বন্ধ এবং উৎকট তিতো ওষুধের ব্যবস্থা— এ সমস্ত যেন রোগকে বিপাকে ফেলে বিতাড়নের প্রক্রিয়া। রাঙা-বড়ি বা হলদে-বড়ির ব্যাপারে তা নয়।

দু হাতে হলদে-বড়ি বিলিয়েও কিন্তু কাজ দেখানো যাচ্ছে না। এক রাঙা-বড়িতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, সেখানে এক গণ্ডা হলদে-বড়ি গিলেও মাথা-ধরাটা যায় না। বড় বড় কথা আগে বলে ফেলে বেকুব হয়েছে। বদনাম রটে যাচ্ছে—গগন লোকটা কিছু জানে না, ডাক্তারির ভাঁওতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচ ক্রোশ দূরে ফকিরের থান অবধি খবর চলে যায়, গগনের ফেরত রোগী অতদূরে গিয়ে পড়ে। ফকির হাসেন খুব, হেসে উদার ভাবে বলেন, গগন ডাক্তার বলে কেন, সদরের সাহেব-ডাক্তার এসেও পারবে না। সে জ্বর নয় তোমাদের বাপু। শহরে বাজারে বাবুভায়েদের জ্বর হয়, দু-চার দাগ ডাক্তারী ওষুধ আর সেই সঙ্গে দশ রকম ভালমন্দ পথ্য খেয়ে মুখটা বদলে আবার খাড়া হয়ে বসেন। আমাদের এই যত বুনো-ওলের জন্যে চাই বাঘা-তেঁতুল। তোমাদের এ জ্বর আজকের নয়। রোদে পুড়ে জলে ভিজে ধান রুয়েছ,—জ্বর এসেছিল সেই সময়। আমি চেপেচুপে রেখেছিলাম, নয় তো ক্ষেতের কাজ বন্ধ হয়ে যেত। কাজ অন্তে এখন ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। কি করব বল, রোগপীড়ে চিরকাল কথা মানবে কেন? এবারে চিকিচ্ছেপত্তোর কর।

কেরামতি আছে কিছু সত্যিই। স্বচক্ষে দেখেছে অনেকে—বিচক্ষণেরা কার্য-কারণ ভেবেচিন্তে দেখুন। লাঙল ফেলে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষেত থেকে সোজা গিয়ে উঠল ফকির-বাড়ি: জ্বর এসেছে, বন্ধ করে দাও। ফকির খিঁচিয়ে ওঠেন: বন্ধ

করব কী রে, মামার বাড়ির আবদার ? তা আবদারই চলে ফকিরের থানে। কথাটা বা রীতিমত কলহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় ঃ জর বন্ধ করবে কেন, ক্ষেতখামারই তবে ঘাসবন হয়ে পড়ে থাকুক। সবসুদ্ধ উপোস করে মরি। তোমার কি—ফুল ফেললেই পাঁচ পয়সা—খাবেদাবে আর চোখ মেলে দেখবে লোকের দুর্গতি।

এতবড় অভিযোগে ফকিরও চটে গেছেন ঃ চটেমটে হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন ঃ বেশ—নিয়ে আয় তবে পানি। জর তাড়িয়ে দিচ্ছি। একটা মাসের করার। চাষবাস যত কিছু চুকিয়ে ফেলবি এক মাসে। তারপরে ঠেসে ধরবে—জরের চিকিচ্ছে সেই সময়।

জরের কাঁপুনির মধ্যে ফকিরের ঘাট-বাঁধা পুকুরে ডুব দিয়ে শুচি হয়ে ঘটি ভরে জল এনে রাখল, মন্ত্র পড়ে একটা ফুল ফেলে দেন ফকির। সকাল-বিকাল একণ-এক ভাঁড় জলে স্নানের ব্যবস্থা, স্নানের পর এক ঢোক ঐ ফুল-পানি। পথ্য পান্তাভাত ও তেঁতুল-গোলা। আগুনের মতো জর ঘাম দিয়ে শীতল হয়ে গেল। পরের দিন আর জর আসে না। এমন একটা-দুটো ব্যাপার নয়—রোজ রোজ ঘটছে, ফকিরের দালানকোঠা বাগবাগিচা গাঁতি-তালুক এমনি হয় না। জরের কিন্তু চিকিৎসা হল না, শুধুমাত্র তোলা রইল। ধান রোয়া অন্তে বর্ষাটা ভাল রকম চেপে পড়লে তখন জর শোধ তুলে নেবে। ঘরে ঘরে রোগীর কাতরানি, জলটুকু মুখে দেবার মানুষ নেই। সেটা ভালই। মাঠের কাজকর্ম চুকেছে, বাড়িতে শুয়ে বসে থাকত—না হয় জর হয়ে পড়ে রইল বিছানায়। ফকিরের চিকিৎসার নিয়মে ভাত খাওয়া যায়। ধান এখন গোলাআউড়ির তলায় এসে ঠেকেছে, ভাত বন্ধের ব্যবস্থা হলেই বরঞ্চ ভাল ছিল।

এইসব দিনের জন্যে গগন ওষুধ বানিয়ে রেখেছে। কোন-কিছু কাজে এল না। ধোঁকাবাজি করল ভুতি। মেয়েটাকে চাক-চাক করে কাটলেও রাগ যাবে না। তাকে আশ্রয় ধরে পেয়ারের মানুষের কাছে চলে এল—ভেলায় চড়ে নদী পার হবার মতন। আসল রাঙা-বড়ি দিয়ে দেবে হরিদাসকে। দেবে কেন, দিয়েছে এত দিনে। এমন ভরা ভরন্ত মরশুমে হরিদাস টালবাহানা শুনবে না, আদায় করে নিয়েছে নিশ্চয় এতদিনে। একদিন গিয়ে দেখে এলে হয় গতিকটা কি। ভুতিকেও দু-চার কথা শুনিয়ে আসা যায়। কিন্তু হলদে-বড়ির দরুন না হোক, হোমিওপ্যাথির ফোঁটা-ওষুধের কল্যাণে এক-আধটা রোগী আসে অবরেসবরে। মরশুমের মধ্যে দোকান ছেড়ে যায় কেমন করে ?

যেতে হল না, একদিন হরিদাসই নিজে এসে উপস্থিত। চেহারা কী হয়েছে—কতদিন যেন খায় নি ঘুমোয় নি, খুব এক শক্ত ব্যাধিতে ভুগছে। ক-মাস আগে দেখে এসেছিল একেবারে ভিন্ন রকম। বাড়ি বাড়ি ঘুরেও রোগী পায় না, তবু তখন রীতিমত তেল-চুকচুকে চেহারা। মনোহরের বাড়ি যা ছিল, তার যেন ডবল ফেঁপে উঠেছিল হরিদাস অভাব-অনটনের ঐ কয়েকটা মাসে। সেই মানুষ ধুঁকতে ধুঁকতে এসে উঠল।

ক্ষণকাল অবাক হয়ে তার মুখে চেয়ে গগন বলে, কী মনে করে হঠাৎ ? খবর কি ?

হরিদাস বলে খবর খুব ভাল। নির্ঝঞ্ঝাট হয়েছি—জান শয়তানী বিদায় হয়ে গেছে।

ছাঁৎ করে গগনের মনে পড়ে যায়, সেই যা বলেছিল হরিদাস—রাঙা-বড়ি শিখে নিয়ে ভুতিকে গাঙ পার করে ছেড়ে দিয়ে আসবে। তাই উচিত, যে রকমের বজ্জাত মেয়ে। বলে, আপনি বিদায় হল, না বিদায় করে দিলে ?

করতে হত তাই শেষ অবধি। চালাক মেয়েমানুষ তো—বুঝে-সমঝে আগে থেকে

সরেছে। রাঙা-বাড়ি জানেই না, মনোহর শালা কাউকে কিছু শেখাবার পাত্তোর। বুড়োর সঙ্গে সঙ্গেই ও-জিনিস লয় পাবে। মেয়েটা ভাঁওতা দিয়ে এসেছে এতকাল। মিথ্যে বলে ঠকিয়েছে। শেষে একদিন সমস্ত বলে ফেলল। সামলাতে না পেরে আমিও তম্বি করলাম খানিকটা।

গগন জানে, মুখের তম্বিই নয় শুধুমাত্র—চুলের মুঠি ধরে কি আর ঘুরপাক দেয় নি, ভুতির গায়ের উপরেও পড়ে নি কি দু-পাঁচটা? এসব না হলে জুয়াচুরির শাস্তিটা কি হল!

হরিদাস বলে, মেজাজটা আমার চড়ে গিয়েছিল। তবু একটা জবাব দিল না। নড়ে না চড়ে না, গুম হয়ে রইল পড়ে। সকালবেলা দেখি, নেই।

এবারে ভয় হল গগনের: গেল কোথা? বেঁচে আছে তো?

পাতিকাকের পাঁচটা প্রাণ। কাক কখনো সহজে মরে শুনেছ? যাবে আর কোন্ চুলোয়? বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেছে। বাপ নতুন অট্টালিকা বানাচ্ছে। অমন সুখ আর কোথা!

বলতে বলতে এই দুঃখের মধ্যেও হি-হি করে হেসে উঠল: আবাদ জায়গায় গঙ্গাজল মেলে না। তা বোধ হয় তুলসীপাতায় নোনা জল ছিটিয়ে বাড়ির মেয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছে।

হাসির চোটে কথাই যেন শেষ করতে পারে না। গগন মনে মনে সোয়াস্তি পায়। থাকগে থাক, নিজের জায়গায় গিয়ে উঠেছে—বাপ-মা ভাই-বোনের সঙ্গে মিলমিশ হয়েছে। মেয়েটার মুখের কথায় হুট করে রাত দুপুরে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল—ভারী অন্যায় কাজ, এই নিয়ে পরে পরে বিস্তর ভেবেছে। মনোহর জেলে পুরতে পারত এই অপরাধে। এতদিনে অপরাধের মোচন হয়ে গেল। আর এক আনন্দ, হরিদাসও পায় নি রাঙা বাড়ি। ঠকেছে দুজনেই।

তখন গগন অন্য কথা তোলে: অট্টালিকা বানাচ্ছে বললে—শোনা কথা, না দেখে এসেছ গাঙ পারে গিয়ে? হায় হায় হায়, মনোহরের এত সুখ, ডাক্তারি পয়সায় দালানকোঠা তালুক-মুলুক—আর এক কুমিরমারি দেখ মানুষজনে ছেয়ে গেল, পোড়া রোগপীড়াই কেবল পথ চিনে পৌঁছতে পারল না। একটা-দুটো ছিঁচকে রোগ—দশ-বিশ ভাঁড় ফকিরের পানি মাথায় পড়তেই গা ঠাণ্ডা।

হরিদাস বলে, রাস্তা বানাচ্ছে—হয়ে যাক আগে রাস্তাটা। আরও লোকজন আসুক, ব্যাপারবাণিজ্য হোক, টাকাপয়সা জমুক লোকের হাতে, রোগ না থাকলেও চিকিচ্ছের বাহার দেখো তখন। পয়সা থাকলে ভুতের বাপের শ্রাদ্ধ। জায়গাটা সত্যি ভাল বেছেছ তুমি। চেপে বসে থাক মনোহরের মত, ছুটোছুটিতে কিছু হবে না।

বলতে বলতে এক কথার মধ্যে ভিন্ন কথা: গিয়ে একদিন দেখে এস, মনোহর কত বড় বাড়ি ফেঁদেছে। স্বজাতি বলে তোমার সাত খুন মাপ, আমার মতন নয়। জীবনপাত করে খাটাখাটনি করলাম, জাতের দোষে সব নষ্ট।

গগন বলে, স্বজাত না কচু। যখন ছিল, তখন ছিল। মতলবের খাতির, সে তো জান সমস্ত। ঘর-জোড়া আমার সোনার বউ, ঐ মেয়ে যাচ্ছি আমি কাঁধে নিতে!

হরিদাস বলে, কেন, খারাপ কিসে মেয়েটা! এই তোমাদের হয়েছে—রং একটু চাপা বলে সকল গুণে অমনি গোল্লায় চলে গেল!

চাপা কি বল? আলকাতরার পিপে, তোমারই কথা—

কিন্তু ভিন্ন কথা আজকের হরিদাসের। বলে, তা সে যাই হোক, বিধাতাপুরুষ

দিয়েছেন, মানুষের কোন্ হাত আছে তার উপরে। গায়েন রঙটাই সর্বকিছু নয়।

ঠক মিথ্যেবাদী নচ্ছার মেয়ে, তোমার আমায় কাউকে তো রেহাই করে নি। রাঙা-বাড়ির লোভ দেখিয়ে নাকে-দাঁড় দিয়ে ঘুরিয়েছে।

হরিদাস এবারে রীতিমত রাগ করে ওঠে: তোমার তো ঘর-জোড়া বউ—খারাপ হোক, ভাল হোক, তা নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কিসের? রাত-দুপুরে একটা মেয়ে একলা চলাচল করতে পারে না, মাস্টারমশায় বলে ডাকে তোমায়—না হয় করেই ছিলে একটু উপকার, আমার কাছে পৌঁছে দিলে।

চুপ করে এক মুহূর্ত একটু ভাবল। আবার বলে, তার দিকটাও ভেবে দেখ। রাঙা-বাড়ির লোভ না দেখিয়ে কি করবে? রাঙা চেহারার হলে কত মানুষ ঢলে পড়ত। আমাদের পুরুষজাতটাই যে এমনি। এতদিন একসঙ্গে থেকে আমায় অবধি সন্দেহ করল মেয়েটা—যেন ওষুধের আশায় তার সঙ্গে ঘর-সংসার করেছি।

গগনের হাত চেপে ধরল ব্যাকুল ভাবে।

শোন, একবার এনে দিয়েছিলে, আর একবার দাও তাকে এনে। বলো, কিছু দরকার নেই, খালি হাত-পায়ে চলে আসুক। আমার যাবার জো নেই, ওপারে গেলে ঠ্যাং খোঁড়া করবে মনোহর। জাতের ঘরে ছাড়া মেয়ে দেবে না। তাই দেখ না—গাঁ-গ্রাম ছেড়ে অজাঙ্গ আবাদে এলাম, পোড়া জাত-বেজাতও সঙ্গে সঙ্গে এসে জুটেছে। ঝাঁটা মার। ভূতিকে এবারে পেলে, এই বলে রাখছি গগন, মানবেলার মধ্যে আর থাকব না। বাদাবনে পালাব। মানুষ নেই তো জাতের ঘোঁটও নেই সেসব জায়গায়।

সেই হরিদাস এমনি করে বলছে। সেদিনটা হরিদাস কুমিরমারি থেকে গেল। সারাক্ষণ মুখে এই সব কথা। অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে—বাড়া-ভাত ছাড়া মুখে রোচে না। নতুন দাওয়া বানিয়ে বেড়া ঘিরে দিল, ভূতি রাঁধাবাড়া করবে—দাওয়া হা-হা করছে, সেখানে ঢোকা যায় না।

গগন অবাক হয়ে হরিদাসের মুখে তাকায়। মেয়েমানুষ জাত কী মায়াবী! ধাপ্পা দিয়ে ভূতি এমন ঠকাল, তারই নাম করে আধ-বুড়ো হরিদাস চোখ মুছছে। ধর না বিনি-বউয়ের কথা—গগনকে এক রকম তাড়িয়ে বের করল বাড়ি থেকে, তবু সেই বউয়ের কথা সে ভাবে। মনোহরের জামাই হতে হতে ভেবেচিন্তে সামলে নিল, সে ঐ বিনি-বউয়ের জন্যেই।

বর্ষার সময়টা চারিদিকে জ্বরজারি। ফকিরবাড়ি দূরেও বটে। গগন ডাক্তারের চলে যাচ্ছে যাই হোক মোটামুটি। ভবিষ্যতের বিশেষ আশা—কার্তিকের শেষে নতুন ধান-চাল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লোকে আকণ্ঠ ঠেসে খাবে, ওলাবিবির শুভ আবির্ভাব আবার ঘটবে সেই সময়। এবং সেই মজুর মাস দুয়েক যদি টেনেটুনে রাখা যায়, তারপরেই মা-শীতলার অনুগ্রহ, বসন্তর মরশুম এসে যাচ্ছে। একটা দুটো বছর তালেগোলে চালিয়ে জনবসতি ঘন হয়ে পড়লে আর তখন রোগের অভাব থাকবে না।

কিন্তু ওলাওঠা চুলোয় যাক, সামান্য পেটের অসুখটাও হল না তিনটে কি চারটে প্রাণীর বেশী। সারা শীতকালটা মানুষজন এমন বেয়াড়া রকমের কুশলে থাকল যে পানি-পড়ার সেই ফকির অবধি কুটুম্ববাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। রোগপত্তোর নেই তো থান আঁকড়ে বসে থেকে কী মুনাফা। শীতকালের এই গতিক—গ্রীষ্মের সময় মানুষ এমনিতেই ভাল থাকে, আবার সেই বর্ষা অবধি হাঁ করে বসে থাকা। দু-দশ জনকে সর্দিজ্বরে ধরে যদি সেই সময়। তাহলে এই কমাস কি খেয়ে বাঁচে ডাক্তার? কি খাবে তার পরিবার-পরিজনে? বাতাস খেয়ে তো বাঁচতে পারে না। কোন্

বিধাতার কাছে এই সব নালিশ জানানো যায় ?

আরও মুশকিল, বার কয়েক টাকা পাঠিয়ে বাড়ির লোকের লোভ ধরিয়ে দিয়েছে। চিঠির পরে চিঠি আসে বিনি-বউয়ের কাছ থেকে। হস্তাক্ষর নগেনশশীর — মুন্সীবিদ্যাও তার, কথা সাজানোর কায়দা দেখে ধরা যায়। গগনের কুশল-সংবাদের জন্য আকুলি-বিকুলি। মোক্ষম কথাটা অবশ্য চিঠির সর্বনিম্নে—অবিলম্বে টাকা পাঠাও। বোনের নামের চিঠিতে সাড়া পাওয়া গেল না তো শেষটা নগেনশশী নিজেই সোজাসুজি চিঠি ছাড়তে লাগল। ধাপে ধাপে সুর চড়াচ্ছে। বিয়ে-করা পরিবারের সকল দায়ঝক্কি শ্বশুরবাড়ির উপর চাপিয়ে এ-বাজারে মানুষ চুপচাপ থাকে কেমন করে ? তার সঙ্গে ফাউ স্বরূপ কড়েরাড়ী বোনটা— চাল নেই চুলো নেই তা সত্ত্বেও দুনিয়ার মানুষকে কেঁচো-কেঁচোর মতন যে বিবেচনা করে। নিত্যিদিন এই ঝক্কি কে সামলাবে, কার এত ধৈর্য ?

চিঠি পড়তে পড়তে গগন নিশ্বাস ফেলে : বুঝি তো ভাই সব। গদাধরের হোটেলটা আছে তাই, নয়তো স্রেফ উপোস দিতে হত। বিদেশ-বিভুঁই অথই দরিয়া—একটু কূলের রেখা আজ অবধি নজরে ঠেকে না।

শেষ চিঠিখানায় শ্যালক মশায় ভয় দেখিয়েছেন : এমনিধারা নীরব থেকে রেহাই পাবে না। কুমিরমারি যত দুর্গমই হোক, পৃথিবীর বাইরে নয়। গগন চলে এসেছে তো তারাও আসতে পারে। হুড়মুড় করে সবসুদ্ধ এসে পড়বে একদিন।

সেই এক মহা আতঙ্ক। তার চেয়ে মাসে মাসে না হোক মাঝে মাঝে কিছু থোক টাকা পাঠিয়ে ও-তরফ ঠাণ্ডা রাখা উচিত। উচিত তো বটে, কিন্তু টাকা যেন ডুমুরের ফুল। একেবারে চোখে দেখা যায় না। দুনিয়াদারি ফাঁকা, সারবস্তু টাকা।

গদাধর শানা লোকটা ধারাপাতের শতকে জানত না। হাতে ধরে তাকে টাকা-আনা-পয়সার জমাখরচ রাখতে শেখাল গগন। গগনের শিক্ষায় খানিকটা বুঝসমঝ হয়েছে। হাটখরচার জন্য এখন দায়ে ঠেকতে হয় না। আগে যেমন কাতর হয়ে বলত—আর দুটো টাকা বের কর আদর। নয়তো আর হাটবার পর্যন্ত খদ্দের ঠেকানো যাবে না।

আদর ঝঙ্কার দিত : কোথায় পাব, টাকা আমি গড়াব নাকি ?

একটা টিনের কৌটোয় আদর পয়সাকড়ি রাখে। গদাধর বলত, দেখ খুঁজে পেতে কৌটোটা। তিন দিনে এত খদ্দের খেয়ে গেল, চারটে টাকাও হবে না ?

রাগে গরগর করতে করতে আদর কৌটো নিয়ে এসে সামনের উপর উপুড় করত : চোখ মেলে দেখ শানার পো। তোমার টাকা চুরি করে খেয়েছি নাকি ?

রাগ হলে তখন আর ভটচাজ নয়—পিতৃপুরুষের উপাধি শানা-শানা করে চেঁচায়। আবাদ জায়গা তাই রক্ষা—ডাঙা অঞ্চলে কোন উঁচু শ্রেণীর খদ্দেরের কানে গেলে গদাধরকে মেরে পৈতে ছিঁড়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিত।

এখন সঙ্কটের অবসান হয়েছে। আদরের মুখ চেয়ে থাকতে হয় না টাকাকড়ি সমস্ত লেখাজোখা থাকে। গদগদ হয়ে কতদিন গদাধর বলেছে, তোমারই বুদ্ধিতে ডাক্তার-দাদা। কি শুভক্ষণে এই জায়গায় পা পড়েছিল।

গগন রসিকতা করে : সেই পয়লা দিনের কথা বলছ নাকি ভটচাজ ? অনুকূল চৌধুরীর ভাগনেকে খাতির করে খাইয়ে তারপর সাঁঝের ঘোরে কষে দাম আদায় করে নিলে...

জিভ কেটে হেসে গদাধর বলে, পুরনো কথা তুলে কী জন্যে লজ্জা দাও ভাইকে ?

কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের অমায়িক সম্পর্ক সম্প্রতি একেবারে চাপা পড়ে গেছে। মুখ কালো গদাধরের। কলিকালের মানুষে—সুসময়ে সব ভুলে মেরে দিয়েছে। হোটেলের ভাত এদ্দিন কবে বন্ধ হয়ে যেত, কিন্তু শুধুমাত্র ডাক্তারী বিদ্যার সুচিন্তিত প্রয়োগের গুণে দুবেলা পাত পেতে মান-ইজ্জতের সঙ্গে খেয়ে যাচ্ছে। মুখ ফুটে গদাধরের কিছু বলবার তাগদ নেই, গগনই বরঞ্চ দু-চার দিন অন্তর বলে, নাঃ, যাই চলে এখান থেকে। ভাল লাগে না।

আদরমণি অমনি করকর করে ওঠে: শালার বেটা কিছু বলেছে বুঝি? দেখছ, ভাল আছি কদিন, খাচ্ছি-দাচ্ছি, অমনি চোখ টাটাচ্ছে। ডাক্তার চলে গেলে আমিও সঙ্গে সঙ্গে মরে যাব। ঐ যে মুক্তো হারামজাদী হাসন-মাজার নামে মুখ ঘুরিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে হাসে, ওকে তখন রান্নাঘরে এনে বাটনায় বসাবে। সেটা হচ্ছে না। সেরে দাও দিকি ডাক্তারবাবু, আগের মতন গতর হোক—ওদের কী খোয়ারটা করি, দেখে নিও তখন।

ভাগ্যিস আদর রোগী হয়েছে। এমনি নয়, ভেবেচিন্তে কায়দা করে ডাক্তার আদরকে রোগী বানিয়ে নিয়েছে।

শুকনো চেহারা কেন গো? চোখ রাঙা। জ্বরটর হয় নাকি?

গোড়ায় আদর উড়িয়ে দিত: দূর! সাতটা কুমিরে খেয়ে পারে না, শুকনো দেখলে তুমি কোন্ চোখে?

হুঁ, জ্বর হয়ে থাকে ঠিক তোমার। মুখের চেহারায় বলে দিচ্ছে। দেখি বাঁ-হাত। ঘুসঘুসে জ্বর ভাল নয় গো। ওষুধ খাও, ভাল হয়ে যাবে। জ্বর পুষে রাখতে নেই। কত কি হতে পারে—বদহজম, বুকে-পিঠে ব্যথা, শেষটা যক্ষায় গিয়ে দাঁড়ায়, ভকভক করে রক্ত ওঠে মুখ দিয়ে।

ঠিক সেইসব উপসর্গই দেখা দিতে লাগল, যেমন যেমন ডাক্তারের মুখে বেরিয়ে গেছে। হজমের গোলমাল, রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, বুকের মধ্যে দপদপানি, পিঠেও—হ্যাঁ, ব্যথা-ব্যথা করে। গগন ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে। রোগিণী কখনো ভাল থাকে, কোনদিন বা নিজেই ডান-হাত দিয়ে বাঁ-হাতের নাড়ি টিপে হাজির হয়: দেখ ডাক্তারবাবু, আজকেও বেগ হল যেন একটু। এত জায়গায় চিকিচ্ছে কর, বাসন-মাজার একটা ভাল লোক যোগাড় করে দাও দিকি, মুক্তো মাগীটাকে ঝেঁটিয়ে দূর করি। নয়তো আমায় তাড়াতাড়ি সেরে তোল—হাতে আমার কড়া পড়ে নি, আমি বাসন মাজব।

এমনি চলছে চিকিৎসা। গদাধর পাওনার তাগিদ করতে সাহস করে না, গগনের তবু ভয় যোচে না। কতদিন চালাবে এমন? আদরমণিই তো শেষটা অধৈর্য হয়ে উঠবে: এ ডাক্তার কোন কর্মের নয়, অন্য ডাক্তার আন। হয়তো বলবে, দত্তগাতির হরিদাসকে নিয়ে এস। কিংবা অনেক দূরের আরও বড় ডাক্তার—মনোহর। আর সেই সঙ্গে গদাধরের মুখে বচন বেরুবে: হাতে ধরে আমায় হিসাবপত্র শেখালে, নিজের হিসাবটা কর এইবারে ডাক্তার। এই ক'মাসে কত দাঁড়িয়েছে—ছোট্ট কারবার আমার চলে কি করে?

পোষ থেকে তিন-চারটে মাস হাট বড় জমে। এক রবিবার অমনি হাট লেগেছে। গগন তীর্থকাকের মত ডাক্তারখানায় ঝাঁপ তুলে বসে। যতগুলো দোকানঘর, লোক কিলবিল করছে সর্বত্র। খদ্দের ঠেকিয়ে পারে না। গগনের ঘর ফাঁকা।

এমনি সময় দুটি ছোকরা-মানুষ ঢুকে পড়ল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল একটি

অপরের কাঁধে ভর দিয়ে। বলে, ডাক্তারবাবু, পাখানা ভারী জখম হল—নাড়ানো যায় না। দেখ দিকি, কী হয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অকারণ কেরোসিন পোড়াতে মন যায় না, সেই জন্য আলো জ্বালে নি। গগন অন্যমনস্ক ছিল, ঘরবাড়ি ছেড়ে দূর অঞ্চলে নোনাজল খেয়েও কোন দিকে সুরাহা হচ্ছে না—ভাবছিল এই সমস্ত কথা। মুখ ফিরিয়ে অবাক। জগন্নাথ আর বলাই। খোঁড়াচ্ছে যে লোক, সে-ই হল জগন্নাথ। তারাও চিনল এবারে। জগন্নাথ বলে, বড়দা তুমি ডাক্তার হয়ে বসেছ? তবে আর কি! বলাইটা শোনে না, নাছোড়বান্দা হয়ে নৌকো থেকে টেনে নামিয়ে আনল। চিকিচ্ছে করে দাও দিকি তাড়াতাড়ি।

পয়সাকড়ি দেবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। দিলেও হাত পেতে নেওয়া হয়তো উচিত হবে না—তা সে যাই হোক, রোগী বটে তো! অনেকদিন পরে নতুন রোগী পেয়ে গগন ডাক্তার বর্তে যায়। খাতির করে সামনে বসিয়ে লক্ষণাদি জিজ্ঞাসাবাদ করছে। একেবারে নাবাল অঞ্চলেও ধান কাটা শেষ। ধানের নৌকো বিস্তর আসছে এখন হাটে—দূর-দূরন্তরের পাইকারেরা এসে ধান কিনে কিনে পাহাড়-প্রমাণ গাদা দেয়। এমনি এক-নৌকো ধান নিয়ে এসেছে জগন্নাথ আর বলাই। মহাজন আলাদা লোক—এরা শুধু নৌকো বেয়ে নিয়ে এসেছে, অন্য মরশুমে যেমন জঙ্গলের মালপত্র বয়ে বেড়ায়। জগন্নাথ হালে ছিল নৌকো হঠাৎ ঘোলায় পড়ে গিয়ে বানচাল হবার দশা।

সাংঘাতিক ঘোলা—ঋষিদহ সেই জায়গার নাম। গাঙের নিচে ঋষি ধ্যানে বসে আছেন, কার ক্ষমতা ঋষির মাথার উপর দিয়ে নৌকো নিয়ে যায়! কাছাকাছি গিয়ে পড়লেই জলের আবর্ত নৌকোর যেন কান ধরে শতপাক ঘুরিয়ে নদীর অতলে ঋষির পদপ্রান্তে নিয়ে ফেলবে।

জগন্নাথ বলে, ঋষিদহে গিয়ে পড়েছিলাম বড়দা—আঁধার রাতে ঠাহর করতে পারি নি। গিয়ে তখন ঋষির নামে মাথা খুঁড়ি নৌকোর গুড়োর উপরে: দোষঘাট নিও না বাবা। আর মরীয়া হয়ে প্রাণ-পণে হাল বাই। একেবারে তবু মাপ হল না। মড়াৎ করে হাল গেল দু-খণ্ড হয়ে, মুঠোর দিককার মাথাটা জোরে এসে পায়ে খোঁচা দিল। নেহাত পক্ষে চার আঙুল বসে গিয়েছিল, টেনে তুলতে রক্ত ফিনিক দিয়ে ছুটল। তখন নৌকো বাঁচানো দায়, এত সব তাকিয়ে দেখার ফুরসত হয় নি।

কুমিরমারি পৌঁছনোর আগেই পা ফুলে ঢোল। ডাক্তারও বসেছে এখানে, ঘাটে এসে শোনা গেল। বলাই জোরজবরদস্তি করে নামিয়ে এনেছে: মিছে কষ্ট পাবার গরজ কি? ওষুধপত্তোর করে নাও। আবার তো এত পথ ফিরে যেতে হবে।

জগন্নাথ বলে, কতখানি কি হয়েছে দেখ বড়দা। ভাল মলম-টলম যা আছে, বের কর।

গগন ডাক্তার প্রণিধান করে বলল, দর্শনী বাবদ কিছু নিচ্ছি না তোমার কাছ থেকে। ওষুধের দাম শুধু এক সিকি—নগদ পয়সায় যা কিনে আনতে হয়েছে। এক ডোজ আর্নিকা দিচ্ছি। খেয়ে ড্যাং-ড্যাং করে চলে যাও, ব্যথা থাকবে না।

জগন্নাথ আশ্চর্য হয়ে বলে, পা কেটে গেছে তা মুখে খানিক ওষুধ গিলতে যাব কেন?

হেঁ-হেঁ—করে বেশ খানিকটা টেনে টেনে হাসে গগন: এই তো হোমিওপ্যাথির মজা এইখানে। কাটা-ফোঁড়া নেই, মালিশ-ব্যান্ডেজ নেই—শুধুমাত্র এক দাগ

ওষুধে। সে ওষুধ তিতো নয়, মিষ্টি নয়, ঝাল নয়—এক ঢোক জল খেয়ে নিয়েছ এমনিধারা মালুম হবে। সেই জল ডেকে কথা বলবে, মহাত্মা হ্যানিম্যানের এমনি মহিমা।

জগন্নাথ বলে, এক ঢোক জল এক সিকি? তুমি বড়দা বুজরুকি করবার জায়গা পেলে না?

গগন বলে, গুণোগুণে হিসাব করে দেখ এক সিকি খরচায় তোমার যাবতীয় ব্যথা নির্মূল হয়ে যাচ্ছে।

অধৈর্য হয়ে জগন্নাথ বলে, দুত্তোর গুণোগুণে। মলম থাকে তো দাও। নেই? চল্ রে বলাই—ঘাটে নামবার মুখে আমায় একটু ধরে দিস। নৌকোর উপর বসে বসে যাব, হাঁটতে হচ্ছে না, খোঁড়া পা থাকলই বা দুটো-পাঁচটা দিন। তোর জন্যে ডাঙায় ওঠানামার এই ভোগান্তি।

বলাই বোঝাচ্ছে: ডাক্তারবাবু যখন বলছেন, খেলেই না হয় এক দাগ। জল বই তো নয়, খারাপ কিছু হবে না।

আরো চটে গিয়ে জগন্নাথ বলে, কষ্টের পয়সায় জল কিনব, জল বেচে বেচে লাল হবে আর একজনা। চল্, আমি এসব তালে নেই।

গগনও চটেছে। ভাবনার কুলকিনারা নেই, তার উপরে জল-বেচার বদনাম। বলে, কী রকম লাল হচ্ছি, চোখে দেখতে পাও না? সারা হাটে মানুষ থৈ-থৈ করছে, আমার ডাক্তারখানায় একটা মাছিও উড়ে বসে না। তা শোন, আশা করে তোমরা ডাক্তারখানায় ঢুকেছ—রোগী আমি কিছুতে ছাড়ব না। বড়দা বলে ডাক, সিকিপয়সাও লাগবে না, মাংনা ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে যাও। উপকার পাও তো পরের হাটে কিছু দিও যেও—দাম নিয়ে কিছু বলব না।

তখন নরম হয়ে জগন্নাথ বেঞ্চির উপর বসে পড়ল। গগন পরম আনন্দে ওষুধের বাক্স পাড়ে। জগন্নাথ ঘাড় নেড়ে বলে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন বড়দা? ওষুধ আমি খাব না। সেজন্যে বসি নি। আমি বলে কেন, জোলো ওষুধ কেউ তোমার কাছে খেতে আসবে না। সে এই হাটবারের দিনই মালুম পাচ্ছ। মানুষের গাদাগাদিতে কোন ঘরে সেঁদুনো যায় না, তোমার এখানে পা ছড়িয়ে বসে জমিয়ে আছি। শোন, মাথায় মতলব এল। একটা কাজ আছে, সে তোমার এই শিশিতে জল ভরে হা-পিত্যেশ বসে থাকা নয়। দুটো পয়সা আসবে। রাজী থাক তো বল।

পরম আগ্রহে গগন বলে, পয়সা আসে তো বল্ শুনি কোন্ কাজ—

জগা তার মুখের দিকে তীক্ষ্ম চোখে চেয়ে বলে, তুমি বিদ্বান মানুষ—উঁ। ডাক্তারি করছ, বিদ্যে অঢেল নিশ্চয়। তা হলে চল আমাদের সঙ্গে বয়ারখোলার আবাদে। আরও নাবালে, বাদাবনের মুখে। ডাক্তারি ছাড়ান দিয়ে গুরুগিরিতে লেগে যাও। ভাল গুরু পেলে পাঠশালা বসিয়ে দেব।

সবিস্তারে জেনে নেওয়া গেল। প্রস্তাবটা মোটের উপর ভেবে দেখা যেতে পারে। ভাল ফলন হয়েছে এবার বয়ারখোলায়। চাষীদের গোলা ভরতি, মনেও স্ফূর্তি বিষম। অতএব বিনা কাজের মরশুমে এখন খেয়াল হয়েছে, ছেলেগুলো বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছে, তাদের পাঠশালায় জুতে দেওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত গুরু যদি এসে বসেন, প্রত্যেক গৃহস্থ ধান-দুধ-মাছ তো দেবেই, এমন কি নগদ এক সিকি এক দুয়ানি হিসাবে মাসমাইনে দিতেও রাজী।

গগন বলে, ভেবে দেখি। এক কথায় হুট করে ছেড়েছুড়ে বেরুনো যায় না।

পরের হাটে আসছ তোমরা; ওষুধ খেলে না, ঐ পা নিয়ে আসবেই বা কী করে?

জগা বলে, ঠিক এসে যাব। পায়ে হেঁটে তো আসতে হবে না, হাতে নৌকো বাইব। পা যদি না-ই সারে, নৌকোয় আসতে বাধা কি? ভাবনা-চিন্তা যা করবার, এর মধ্যে সেরে রেখো বড়দা। আসব ঠিক তোমার কাছে। ছোট ভাই হয়ে ভাল বই মন্দ যুক্তি দেব না।

এ হল রবিবারের কথা। বুধবারের হাটে ঠিক আবার ধানের নৌকো নিয়ে জগা-বলাই এসেছে।

পা কেমন?

মন্দ থাকবে কেন? বয়ারখোলার আবাসে ডাক্তার নেই, ডাক্তারখানাও নেই। পাতামুড়োয় সেরে উঠেছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে জগা বলে, কি গো বড়দা, যাবার লক্ষণ দেখছি নে। ভাবনাচিন্তা শেষ হল না বুঝি?

গগন সংক্ষেপে বলে, হুঁ—

যাবে না? মর পচে তবে এইখানে। দেখরে বলাই, ধান মাপা ওদিকে সারা হল কিনা। হলেই নৌকোয় উঠে পড়ি।

গগন এদিক-ওদিক চেয়ে বলে, জোয়ার হবে সেই দশ দণ্ডের পর। তখন নৌকো ছাড়বে। সন্ধ্যের সময় নৌকোয় উঠে কি করবে?

গগনের দিকে চকিত দৃষ্টি মেলে জগন্নাথ বলে, নৌকো কখন ছাড়বে, তোমার অত সাত-সতেরো খবরে কি গরজ? যাবে না ঠিক করেছ—ব্যস খতম!

গগন মৃদুকণ্ঠে বলে, যাব—

যাবে তো গোছগাছ করেছ কই? আমি একরকম ভরসাও নিয়ে এসেছি, সোমবার থেকে পাঠশালা বসবে। তা দেখিয়ে দাও কোথায় জিনিসপত্তোর কি আছে। পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে আমরাই নৌকোয় তুলে নিচ্ছি।

গগন আঙুল তুলে চেঁচামেচি করতে মানা করে। জমিদারের দরোয়ান ঘরের ভাড়ার জন্য চেপে ধরবে এক্ষুনি। গদাধর ঠাকুর হোটেলের দেনার জন্য পথ আটকে দাঁড়াবে। জানাজানি হলে রক্ষে আছে, পঙ্গপালের মত ছেঁকে ধরবে সব। তার চেয়ে যেমন আছ,থাক চুপচাপ বসে। কাকপক্ষী না সন্দেহ করে। রাত দুপুরে নৌকো ছাড়বার মুখে হাতের মাথায় যা-কিছু পাও, সাপটে নিয়ে ভেসে পড়। সকালবেলা উঠে যত পাওনাদার মিলে বুক চাপড়াক আর হা-হুতাশ করুক—আমার এই কলা।

এগারো

ডাক্তারিতে ইস্তফা দিয়ে গগন গুরুমশায় হয়ে বসল। বয়ারখোলার গগন-গুরু। কুমিরমারি স্কুলতলা থেকে যত পথ, বয়ারখোলাও কুমিরমারি থেকে প্রায় তত। কত নাবালের দেশ—এই থেকে জুড়ে-গেঁথে বুঝে নাও। এর পরে আর আবাদ নেই, খালের ওপারে ছিটে-জঙ্গল। পুরোপুরি বনের এলাকা আরও কয়েকটা বড় গাঙ পার হয়ে গিয়ে।

এইখানে চতুর্দিকে ধানখেতের মধ্যে উঁচু মাদার উপরে পাঠশালা। ঘর হয়ে

ওঠে নি এখনো। কাঁচা গোলপাতা ও গরানের খুঁটি এসে পড়েছে—পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেলেই ঘর তুলে দেবে। আপাতত ফাঁকার মধ্যে কাঁটা বাইন-কেওড়ার একটু ছায়া মতন জায়গায় বিদ্যার লেনদেন হচ্ছে। শীতকাল বলে অসুবিধাও নেই। জগন্নাথ মোটের উপর কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে মন্দ নয়। বাঁধা চাকরি—কারো মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হয় না—মাস গেলে মাইনে। তাই বা কেন, ঘরে ধান উঠেছে—চাষীর সচ্ছল অবস্থা, মাসের শেষ হতেই হবে তার কোন মানে নেই—অত কষাকষির তারা ধার ধারে না। ছেলের বিদ্যাভ্যাসের দরুন যার এক কুনকে ধান দেবার কথা, আন্দাজ মত ধান ঢেলে দিয়ে গেল: হুঁ্যা—গুরুর দক্ষিণা, তার আবার মাপামাপি করতে যাচ্ছি! ইচ্ছে হয়, মেপে নাও তোমরা। গগনের দিক থেকেও মাপের তাগিদ নেই। চোখে দেখেই আন্দাজ হচ্ছে, মাপতে গেলে একের জায়গায় দেড়-কুনকে দাঁড়াবে। আর এই স্বাচ্ছন্দ্যের দিনে বিয়েথাওয়া পালাপার্বণ লেগে আছে—যখনই যা-কিছু হবে, গুরুমশায়ের জন্য ভারী মাপের সিধে। পালাগানের যেমন আসরই হোক, গুরুমশায়ের বিশেষ এক চৌকি।

তার পরে পাঠশালা-ঘর হয়েছে, ঘরের বেড়াও হয়ে গেছে। এবারে রান্নাঘর হবে গুরুমশায়ের জন্য, তার সাজসরঞ্জাম বানাচ্ছে। সকালের দিকটা দেড় প্রহর দু-প্রহর অবধি পাঠশালা চলে। বিকালেও বসবার কথা, কিন্তু সেটা বড় হয়ে ওঠে না—ছেলেপিলে এসে জোটে না, বাড়ির লোকের চাড় নেই। হাকিম হবে না, দারোগাও হতে হচ্ছে না—প্রাণপণে দু-বেলা কসরত করার গরজ কি? বিকালে আড্ডা বসে, দুটো-চারটে ছাত্র যা আসে তাদের লিখতে দিয়ে গল্পগুজবে বসে যায় গগন-গুরু।

এই পুরো পাতাটা আগাগোড়া শেলেটে লিখে দেখা। বেশ ধরে ধরে লিখবি। ভুলচুক না হয়, সাফাই লেখা হয় যেন।

বলে গগন জমিয়ে বসে। জগা বলাই প্রায়ই আসে, আরও সব মাতব্বররা আসে।
—কী কসাড় জঙ্গল ছিল এদিকটায়! উই যে বাবলা-চারাটা দেখা যাচ্ছে, জঙ্গল-হাসিলের মুখে—ঐ জায়গাতেই হবে—বাঘ এসে পড়েছিল হাড়ো সর্দারের উপর। হাড়ো তোমার আমার মতন নয়—পেল্লায় এক দৈত্য বিশেষ। তাকে কায়দা করা বাঘের পক্ষেও সহজ হল না। বাঘের তখন গতিক দাঁড়িয়েছে, কায়দা পেলে ছুটে জঙ্গলের ভিতর পালিয়ে যায়। কিন্তু বাঘ ছাড়লেও হাড়ো ছাড়বে না, রাগে টগবগ ফুটছে—তেড়ে গিয়ে বাঘের গায়ে কুড়ুল মারে। বাঘও থাবা মারছে, কামড় দেবার সাহস পায় না। যত মানুষ বাদায় খাটছিল, সব এসে জুটেছে—খালি হাত কারো নয়—কুড়ুল তো আছেই—লাঠিসোটা, বল্লম-সড়কি—বন্দুকও আছে একটা। কিন্তু কাজে লাগাতে পারছে না। বাঘে আর হাড়ো সর্দারে হুটোপাটি—বন্দুক কি বল্লম মারতে গেলে হাড়োরও গায়ে লাগে। ওরে হাড়ো সর তুই—ছেড়ে চলে যা, আমরা দেখছি। কিন্তু কে বা শোনে কার কথা! বাঘও বিপদ বুঝেছে, হাড়োকে টেনে ধরে আরো। দুটোয় গড়াতে গড়াতে শেষটা খালের জলে পড়ল। জোয়ারের টান—এখন এই দেখছ গুরুমশায়—তখন এমন টান, কুটোগাছি ফেলে দিলে দুই খণ্ড হয়ে যায়। সেই টানের মধ্যে জল তোলপাড় করছে দুটোয় পড়ে। সে এক দেখবার বস্তু। কাছাকাছি গিয়ে খুব সতর্ক ভাবে দেওড় করা হল। গুলি খেয়ে বাঘ এলিয়ে পড়ে। ডাঙায় উঠে হাড়ো সকলের উপর মারমুখী: এতক্ষণ ধরে এত কষ্টে আমি কায়দা করে আনলাম, কেন তোমরা শত্রুতা

সাথলে? বাঘ-শিকারের নামটা হয়ে গেল তোমাদের। সকলে মিলে বোঝাচ্ছে: বাঘ তুই-ই মেরেছিস হাড়ো, আর কেউ কিছু করে নি। মরা বাঘ নিয়ে গিয়ে সরকার থেকে বখশিশ নিয়ে আয় – অন্য কেউ দাবি তুলতে যাচ্ছে না। হাড়ো ঠাণ্ডা হয় না। তার তৈরি রুটি ভিন্ন লোকে ফয়তা দিয়ে গেল, বখশিশের টাকায় সে দুঃখ যায় না। বখশিশ নিয়ে আসবার ফুরসতও হল না—

বাঘের নখে-দাঁতে বিষ। খুব কাঁপিয়ে জ্বর এল হাড়োর, ব্যথায় সর্বাঙ্গ টনটন করছে, সে আবোল-তাবোল বকতে লাগল। দশ-বারোটা দিনের মধ্যে মারা গেল হাড়ো সর্দার। কত কাণ্ড এই জায়গায় হয়ে গেছে গুরুমশায়, এখানকার চেহারা দেখে কে তা ধরতে পারে!

লোকজন কম হলে দাবায় বসে যায় এক-একদিন। এ অঞ্চলে দাবার তেমন চলন ছিল না, গগনই দায়ে পড়ে শিখিয়ে নিচ্ছে। জগন্নাথকে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চুপচাপ অতক্ষণ এক ঠায় বসে একটা চাল দেওয়া তার ধাতে পোষায় না। এমন একটা বস্তু দাবা—যাতে বসলে লোকে আহার নিদ্রা ভুলে যায়, ছেলেকে সাপে কামড়েছে শুনে প্রশ্ন করে, কাদের সাপ?—তার ভিতর ঢোকানো গেল না জগন্নাথকে।

জগন্নাথ বলে, ফড় খেলবে তো বল বড়দা। দুটো পয়সা লাভের প্রত্যাশা যাতে। আমি তা হলে ছক-ঘুঁটির যোগাড় দেখতে পারি।

ছি-ছি—বলে গগন জিভ কাটে। জুয়াখেলা সমাজের উপর বসে চলে না। শহরে-বাজারে গিয়ে টুক করে একবার দুবার খেলে আসতে হয়।

জগন্নাথ রাজী নয় তো কী হবে? দাবার আসর তার জন্যে আটকে থাকে না। একজন ঐ গগন, আর একটি প্রাণী জোটাতে পারলেই জমে যায়। আশে-পাশে উঠকো মানুষ বসে জুত দেয়—এ বলে, বড়ে এক ঘর এগিয়ে দাও: উল্টো তরফের হয়ে একজন বলে, নৌকো চেপে দাও দাবার মুখে। এ-তরফের উত্তেজিত কণ্ঠ: দিয়েছ তো? হাত তোল। দেওয়া হয়ে গেছে, মেরে দাও নৌকো। গজ উঠবে না—কিস্তির চাপান। উঁহু, উঁহু—চাল ফেরত হবে না। তাই তো বললাম হাত তুলে নিতে। ঘুঁটি ছেড়ে দিলেই চাল পাকা—তারপরে ফেরত নেই।

এমনি সময় হয়তো কোন এক হতভাগা ছাত্র কাছে এসে দাঁড়াল। গগন খিঁচিয়ে ওঠে: রূপ দেখাতে এলি? খেলা দেখা হচ্ছে, উঁ—খেলার নেশা ধরেছে এই বয়সে? পিটিয়ে তক্তা করব। যা, মনোযোগ দিয়ে লেখ—

লেখা হয়ে গেছে গুরুমশায়। দেখাতে এসেছি।

কলম ধরতে না ধরতে হয়ে যায়, বেটা চতুর্ভুজ গণেশ হয়েছ? দেখি, কি হয়েছে—

রাগে গরগর করতে করতে ঐ খেলার মধ্যেই গগন-গুরু ঘাড় ফিরিয়ে দেখে। ছেলেটা পড়াশুনোয় মনোযোগী বলে ঠেকছে, উপর-উপর চোখ বুলিয়ে ত্রুটি ধরা মুশকিল। মনের রাগ মনের মধ্যে চেপে গগন বলে, হুঁ, দাঁড়িয়ে থাক, দেখছি।

আরও দু-চার চাল দেওয়ার পরে গগন অপর পক্ষকে বলে, রোসো দেখে দিই, ছোঁড়া সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলে পাক দিয়ে এদিকে ফিরে শেলেট টেনে নিল। সত্যিই ছেলেটা ভাল। কিন্তু এমন তো হতে দেওয়া চলে না। লেখার আগা-গোড়া বার দুয়েক চোখ বুলিয়ে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: লাইন এঁকেবেঁকে যায় কেন রে? গরুর পাল জল খেতে যেন পুকুর মুখো চলল। ছেলেটার ঘাড় নিচু করে ধরে

গুড়ুম করে পিঠের উপর এক কিল। বলে, আবার লেখ গিয়ে। ঠাণ্ডা মাথায় ধরে ধরে লিখবি। তাড়া নেই, লেখা নিখুঁত হওয়া চাই। যা—

ঐ একটা কিলেই পাঠশালা সুদ্ধ ছেলের শিক্ষা হয়েছে। নিঃশব্দে ধরে ধরে সবাই লিখছে। তাড়া নেই—একবার হয়ে গেলে আর একবার লিখতে পার আরও বেশীক্ষণ ধরে। না লিখলেও কেউ কিছু বলতে আসছে না। মোটের উপর শব্দসাড়া না হয়। কোন রকম ঝামেলা করো না, চাল ভুল হয়ে যাবে গুরু-মশায়ের।

রাত্রে এ হাঙ্গামাটুকু নেই। গানবাজনার আসর পাঠশালা-ঘরে। আসর কী আর —গগন জগা বলাই মোট এই তিন জন, আর শ্রোতা একটি দুটি যা আসে। পালা-বিহীন দুটো গান ও ঢোলকের বাজনা এমন কিছু নয় যার জন্যে কনকনে হিমরাত্রে মাঠ ভেঙে খাল পার হয়ে মানুষ জমবে। আসরেরও খুব যে বাঁধাধরা নিয়ম আছে, তা নয়। জগাদের নৌকো বাওয়ার কাজ, নৌকো নিয়ে বাইরে থাকল তো সেদিন আর হল না। তবে নেশা লেগেছে জগারও, ভর সন্ধ্যেয় না হোক দেড় পহর রাতের মধ্যে সে গগনের ওখানে পৌঁছবার চেষ্টা করে, অন্তত রীতরক্ষার মত এতটুকু যাতে একসঙ্গে বসা যায়। যাত্রার বিস্তর গান জগার জানা, গলাটুকুও চমৎকার। গগন সেই সব গান আদায় করবে জগার কাছ থেকে। কর্কশ হেঁড়েগলায় তার সঙ্গে তান ধরে। এ অত্যাচার জগা সহ্য করে পালটা গগনের কাছ থেকে ঢোলকের কিছু বোল তুলে নেবার লোভে। শিবচরণ বাইতির সাগরেদ নাকি গগন। শিবচরণ দেহ রেখেছে। বেশী কিছু নিতে পারেনি শিবচরণের কাছ থেকে—সামান্য দু-চারখানা গৎ, তার মধ্যে কোনটাই বাজার-চলতি নয়। সেই কটি জিনিস তুলে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত। তখন কার পরোয়া! গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে কে তখন আর পাঠশালা-ঘরে হাজির দিতে আসছে! কিন্তু গগনও তেমনি ঘড়েল। ডিপঢাপ করে ঢোলকে গোটা কয়েক চাটি দিয়ে ঘাড় নাড়েঃ না গো, জানি নে আমি কিছু। কালেভদ্রে কদাচিৎ ঢোলের চামড়ার উপর আগোছে আঙুল বুলিয়ে কাকাতুয়ার মত কথা আদায় করে চমক দিয়ে যায় একটুকু। তারপরে আবার সেই ন্যাকামির হাসিঃ কিছু জানি নে ভাই। ইংরেজি-বাংলা গাদা গাদা বই নেড়েচেড়েই জনম গেল। ও বিদ্যেয় ঢোকবার ফাঁক পেলাম কখন?

বাংলা বছর শেষ হয়ে বৈশাখ মাস এসে যায়। বৈশাখ পড়তে না পড়তে এবারে কালবৈশাখী। উঁহু কালবৈশাখী কেন, সে হল ঘণ্টা কয়েকের ব্যাপার। সন্ধ্যার দিকে মেঘ উঠল, আকাশ ছেয়ে গেল দেখতে দেখতে। তারপরে ঝড়—চড়-চড় করে মোটা মোটা ফোঁটায় বৃষ্টি। দু-চারটে গাছ উপড়াল, ঘরের চাল উড়ে গেল, গাঙের জলে তুফান উঠল। চলল এই কাণ্ড দু-ঘণ্টা। রাত দুপুর নাগাত দেখা যাবে, নির্মল আকাশে তারা ফুটেছে, স্নান করে উঠে স্নিগ্ধ হয়েছে যামিনী—এই একটু আগের তড়পানি, তিলেক তার চিহ্ন নেই। কিন্তু তিনদিন ধরে অবিশ্রান্ত একটানা এই দুর্যোগের নাম কালবৈশাখী কখনো নয়। বৃষ্টি চলেছে অবিরাম—কখনও টিপ-টিপ করে, কখনও বা মুষলধারে। আর বাতাস। দিন ও রাত্রির মধ্যে ক্ষান্তি নেই। বড় গাছ ছোট গাছ এমন কি গাছতলার ঘাস পর্যন্ত অবধি ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—সেটা ঠিক পেরে উঠছে না বলে বারবার নুইয়ে ধরছে দক্ষিণ-পশ্চিম মুখো। এই

বাতাসের মধ্যে উপযুক্ত বেড়া না থাকলে ঘরের ভিতরও টেকা যায় না। ঝড়ে-লণ্ডভণ্ড করে, বৃষ্টির ছাঁটে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। গগন-গয়ের ইতিমধ্যে ছোট্ট একটু রান্নাঘর বাঁধা হয়েছে, বেড়া দেওয়া হয়েছে তার, নইলে হাঁড়িকুড়ি শিয়ালে টেনে নিয়ে যায়। তাছাড়া খোলা মাঠের ফাঁকা হাওয়ায় উনুন ধরিয়ে রান্নাবান্নারও অসুবিধা। পাঠশালা-ঘরে বাইরের লোকের ওঠা-বসা—অনেকটা জায়গা লাগে। সে ঘরে বেড়া দেওয়া চলে না। দিলেও ছাত্র নামক হনুমানদলের দৌরাত্ম্যে সে বেড়া দশটা দিনও টিকবে না। ঝড়বাদলের মধ্যে গগন অতএব আশ্রয় নিয়েছে হাঁড়িকুড়ি ও উনুন বাদ দিয়ে ঐ রান্নাঘরের যে জায়গাটুকু বাকি থাকে সেখানটায়। কিন্তু মুশকিল জগাদের নিয়ে। ভাবা গিয়েছিল, দুর্যোগে তারা এসে পৌঁছুতে পারবে না। ঠিক উল্টো, এমন অবস্থায় উন্মত্ত নদীর উপর নৌকো বের করা চলে না, ষোলআনা স্ফূর্তি এখন তাদের, অহোরাত্র গগনের অতিথি হয়ে পড়ে আছে। নির্ভাবনায় গান-বাজনা করছে। ক্ষিদে পেলে রান্নাঘরে ঢুকে, গগনের কাঁথা-মাদুর সরিয়ে উনুনে চাল চাপিয়ে দেয়। আধসিদ্ধ হলে নামিয়ে গোগ্রাসে গেলে সেই-গুলো। গগনকে বলে, দেখছ কি বড়দা, কাঁসরে চাট্টি ঢেলে নিয়ে তুমিও বসে পড়। ঘুম পেলে ছাত্রদের মাদুর-চাটকোল যা-হোক কিছু বিছিয়ে তার উপর গড়িয়ে পড়ে। একা নয় জগন্নাথ, সর্বক্ষণের সাথী বলাইটা রয়েছে যথারীতি সঙ্গে। নিজে অতিথি, আবার বগলে আর এক অতিথি ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। জগা মরলে বলাইটাও বোধ-হয় এক চিতায় ওর সঙ্গে সহমরণে যাবে।

সকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার নয়, তবে বন্যাটা কমেছে একটু। বিকাল অথবা কাল সকাল নাগাত একেবারে ছাড়বে। গগন রান্নাঘরের অতি সঙ্কীর্ণ শয্যা ছেড়ে পাঠশালা ঘরে এল। এসে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। হাঁকডাক করে ঠেলে তুলল জগাকে। বলাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে।

এই তোদের শোয়া হয়েছে?

জগা বুঝতে পারে না, ঘুম-চোখে এদিক ওদিক তাকায়ঃ কি হল বড়দা?

জলের সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে পাঠশালা-ঘরে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সারারাত্রি স্নান করেছে। তবু ঘুম ভাঙে নি, ঠাহর পাচ্ছে না কোন্ মন্দটা হল কোন্ দিকে।

গগন বলে, পারিসও বটে। পয়সাকড়ি তো আসে হাতে। কোন জায়গায় একটা ঘর তুলে নিলে পারিস। নেহাত পক্ষে আমার ঐ রান্নাঘরের মত।

ভ্রূভঙ্গি করে জগা বলে, বাজে খরচ আমি করি নে। নৌকোয় নৌকোয় কাজ—নৌকোর ছই থাকে। আমার নৌকোয় না-ই যদি থাকল, যার নৌকোয় ছই আছে সেখানে চলে যাব। তা ছাড়া ইয়ারবন্ধু তোমরা কত জনে ঘরদোর বেঁধে আছ। তবে আর নিজে ঝামেলায় যাই কেন? বছর বছর তখন ঘর ছাও, মাটি তুলে ডোয়া-পোতা কর—দূর দূর! পিরথিমে এত মানুষের ঘর, তার মধ্যে নতুন ঘর যে তুলতে যায়, সে হল আহাম্মক।

রাগে গরগর করতে করতে গগন বলে, তোরা মানুষ নোস, গরু। গরুও এমন-ভাবে থাকতে পারে না, দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। ঘুম আসে এর মধ্যে—বলিহারি ঘুমের!

জগা আমলে নেয় না, ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। বলে, ঘুমোনো যাবে না, কী হয়েছে। অমন ক্ষীরোদ-সাগরের মধ্যে পদ্মপাতা মুড়ি দিয়ে নারায়ণ ঠাকুর ঘুমোন কি করে?

তাই, তাই। কলির নারায়ণ হলি তুই। জোড়েই আছিস—লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মী এবার কলিযুগে পুরুষ হয়েছেন। তোর ঐ বলাই।

দা-কাটা কড়া তামাক পর পর তিন-চার ছিলিমের পরে দেহ বেশ তেতে উঠেছে। গগন বাইরের দিকে ঠাহর করে দেখে বলে, আজকের পাঠশালা বন্ধ। ছেলেপুলে আসবে না।

জগন্নাথ সায় দেয়ঃ এত বড় ভন্নায় আসে কি করে?

গগন উগ্র হয়ে বলে, ইচ্ছে থাকলে পারে। তোমরা এস কেমন করে বল দিকি?

জগন্নাথ বলে, আমরা ফুর্তির লোভে আসি। অ-আ ক-খ'র কোন্ ফুর্তিটা আছে শুনি, কোন্ লোভে ছোঁড়াগুলো আসবে?

গগন হতাশ সুরে বলে, তাই দেখতে পাচ্ছি। বৃষ্টিবাদলায় আসবে না। আবার রোদের সময়ও আসবে না—চড়া রোদে হুজুরদেরও মাথা ধরে।

বলাই এতক্ষণের মধ্যে এইবার কথা বলল ঃ গোড়ায় পাঠশালায় নতুন মজা পাচ্ছিল। ভেবেছিল বিদ্যে শিখে কী না জানি হবে। এখন পুরোনো হয়ে আসছে। মালুম হচ্ছে, লেখাপড়া অত সোজা নয়। সবাই লেখাপড়া শিখে বাবু হয়ে যেত, হাল চষবার মানুষ থাকত না।

জগন্নাথ বলে, ভালই তো বড়দা। আমি বলি, ছেলেপুলে জুটে ঝামেলা না করে সে একরকম ভাল। বিচ্ছুগুলোর জ্বালায় দুপুরবেলা চোখের পাতা এক করতে পারতে না, বিকেলে এক-বাজি একটু দাবায় বসবে তাতেও শতেক ঝামেলা। নির্ঝঞ্ঝাটে বেশ আছ এখন।

গগন বলে, কিন্তু থাকা যাবে কদ্দিন? তিন বেলা ভুজ্জি যোগাবে কে? ছেলে-পুলে পাঠশালায় না এলে মানুষে ক'দিন আর মাইনেপত্তোর দেবে? এমনই কত বাকি পড়ে গেছে।

জগন্নাথ ভয় ধরিয়ে দেয় ঃ ছেলেপুলে এলেও আর মাইনে দিচ্ছে না।

গগন চমকে ওঠে ঃ কেন, কেন? শুনেছ নাকি কিছু? পড়ানো পছন্দ হচ্ছে না?

জগা বলে, কত বিদ্যাদিগ্‌গেজ আছে যে পড়ানোর ভালমন্দ ওজন করে বুঝবে? ধান এখন গোলার তলায় এসে ঠেকল, ছেলে পড়ানোয় পুলক ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ক'দিন পরে ক্ষেতে গোন পড়লে তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরেও একটা ছেলে এনে বসাতে পারবে না। গরু-ছাগল চরিয়ে বেড়াবে তারা, ক্ষেতে ক্ষেতে পান্তা বয়ে নিয়ে যাবে। পাঠশালা আবার শীতকালে ভুঁইক্ষেতে যদি ফলন হয়।

তবে? আমি কি করব তা হলে?

দাবা খেল। তার চেয়ে ঐ যে বললাম, ফড় খেল আর গানবাজনা কর। এত বড় আবাদে একটা মানুষের মতন দু-বেলা দু-মুঠো চাল জুটে যাবে। কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে দাও ক'টা মাস—কার্তিক-অঘ্রান অবধি।

উদ্বেগে গগনের মুখ শুকিয়ে যায় ঃ মানুষ একটা হল কিসে? তোদের মতন উড়ো-পাখি—বউ আছে, ঘর-সংসার রয়েছে। নিজে চাট্টি খেলে হল না, তারাও খাবে। বাড়িতে টাকা না পাঠালে কুরুক্ষেত্তোর বেধে যাবে।

চোখ বড় বড় করে জগন্নাথ বলে, এই মরেছে! কুমিরমারির সেই তাল ধরেছে? নাঃ, বউ তোমায় গুণ করেছে বড়দা! গুণদড়ি দিয়ে বেঁধে তারপরে বাইরে ছেড়েছে। এখানে এসেও চিঠিপত্তোর হাঁটছে বুঝি?

আসে বইকি একটা-দুটো চিঠি। আপন মানুষ থাকলেই আসবে। গোড়ায় গোড়ায় তো ভালই ছিলাম। টুকটুক করে পয়সা জমে যাচ্ছিল। দু-দশ টাকা বাড়ি পাঠিয়ে হালকা হয়ে নিতাম। তখন কি বুঝেছি, এই গতিক হবে?

গতিকের দেখেছ কি বড়দা? বর্ষাকাল সামনে। এখন তো ডাঙার উপর চলে ফিরে বেড়াচ্ছ। তখন আর মানুষ নও, পাতিহাঁসের মতন জল সাঁতরে বেড়াবে।

দুর্যোগের অবসানে জগন্নাথ ও বলাই খালে নেমে নৌকোয় চাপল। বিষম ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেল হতভাগারা। ভয় পাঠশালা বন্ধ হচ্ছে বলেই নয়, ভয় নগেনশশীর বোনকে। টাকা ঠিক মত পাঠালে মাস অন্তর চিঠি আসে, টাকার অনিয়ম হলে হপ্তায় হপ্তায়। আর বর্ষাকালের যে ব্যাপার শোনা গেল, তখন তো রোজ একটা করে চিঠি ছাড়বে। বোন অসমর্থ হলে ভাই নগেনশশী স্বয়ং কলম ধরবে। দুর্ভাগ্যক্রমে লেখা-পড়া শেখা আছে গগনের, চিঠি সে পড়ে ফেলে। চিঠির সারবন্দি অক্ষরগুলো ঝগড়ার মুখে গুল-মাজা কালো কালো দন্ত-কটমটির মতন। এমনিতে বিনি-বউ খারাপ নয়, চিঠি লিখতে বসেই মারমুখী হয়ে পড়ে। জগন্নাথ বিদ্রূপ করল বউয়ের কথা নিয়ে—কিন্তু গগনের সত্যি এক বিশ্রী স্বভাব, মনে সুখ এবং হাতে দু-পয়সা এলেই বাড়ির পরিজনের কথা মনে পড়ে যায়। ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে টাকা পাঠায়, নিয়ে আসার প্রস্তাবও করে। কুমিরমারিতে ঐ রকমটা হল, তাতে শিক্ষা হয় নি কিছুমাত্র। আবার যে রকম অবস্থা দাঁড়াচ্ছে—এই জায়গা থেকে বাস উঠিয়ে অপর কোন চুলোর সন্ধান নিতে হবে নাকি?

আচ্ছা, বর্ষা তো এসে যায়। পাঠশালা না-ই চলল, বর্ষার সময়টা লোকের অসুখ-বিসুখ নিশ্চয় হবে—ডাক্তারি আরম্ভ করে দিলে হয় কেমন? গগনের পুরোনো ব্যবসা। অসুবিধা আর কি, ওষুধের বাক্স সঙ্গেই আছে। এক টুকরো তক্তা যোগাড় করে নিয়ে তার উপর লিখে ফেলল: ডাক্তারখানা—ডাক্তার শ্রীগগনবিহারী দাস। পরিপাটি করে লিখে সেই সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিল পাঠশালা-ঘরের সামনে। লোকে দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে—কাছে এসে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, এটা কি লিখেছ গুরুমশায়?

গগন বলে, পণ্ডিতি করি, আবার ভাল ডাক্তারও আমি গো। রোগপীড়ের চিকিচ্ছে করি। ওষুধে ডেকে কথা বলে। তেতো নয় ঝাল নয়—দামেও সস্তা। নমুনা স্বরূপ এক এক দাগ খেয়ে দেখতে পার।

বাদা অঞ্চলের মানুষ—বাঘ-কুমিরকে ডরায় না, কিন্তু ওষুধের নামে ভয়। নমুনা কেউ পরখ করতে আসে না। বর্ষা নেমে গেল। চারিদিক জলে ডুবে আছে। দিনকে দিন জল বাড়ছে, ধানগাছ পাল্লা দিয়ে আরও উঁচু হয়ে মাথা তুলছে জলের উপর। ঢালাও সবুজ ক্ষেত। সবুজ সমুদ্রের মধ্যে মানুষের বসতিগুলো এক একটা দ্বীপ যেন। গগনের পাঠশালা-ঘরও সকলের থেকে আলাদা দ্বীপ একটুকরো। ছাত্র আসবে না, কিন্তু এক-আধটা রোগী যদি ধুঁকতে ধুঁকতে জল ভেঙে এসে ওঠে! শেষটা এমন হল, রোগী চাই নে, সুস্থসমর্থ মানুষে কেউ এসে দু'দণ্ড গল্পগুজব করে তামাক খেয়ে চলে যাক। হপ্তাভোর মানুষের মুখ দেখি নি। কী রকম জায়গা রে বাপু, তোমাদের দশজনের ভরসায় তোমাদেরই ছেলেপুলের মঙ্গলের জন্য পাঠশালা খুলে বসলাম, লোকটা বেঁচে রয়েছে কিংবা ফৌত হল—একটা দিনের তরে কেউ এসে খোঁজখবর নেবে না?

আসে কালভদ্রে জগন্নাথ। এবং তার রাতদিনের সাথী বলাই। খালের নৌকোর

বড় চলাচল নেই, ধান সব উঠে গেছে মহাজনের গুদোমে, চাষীর গোলায় অল্প চাট্টি চিটেছুবি নতুন ধান না ওঠা পর্যন্ত ঐ চিটেছুবি জেনেফুটে আধেক খেয়ে কাটাবে। এখন জগন্নাথের এ তল্লাটে কাজ নেই। আরও নাবাল অঞ্চলে নেমে গেছে। একেবারে বনের ধারে। এমন কি বনের মধ্যেও বলা যেতে পারে—আসল বাদাবন না হলেও ছিটে-জঙ্গল তো বটেই। মাছের নৌকোয় কাজ জগন্নাথের। সে হল ষণ্ডাগুণ্ডার কাজ, রামা শ্যামা রোগাপটকা মানুষে পারবে না। নৌকোয় মাছ তুলে দেবে প্রহর দেড়েক রাত্রে—তার আগে দেবে না। বাজারে মাছ গিয়ে উঠবে খুব তাড়াতাড়ি হল তো বেলা আটটায়। জলের মাছ বেশী আগে ডাঙায় তুললে পচে গোবর হয়ে যায়। গাঙের জোয়ার-ভাটা আছে, বাতাসের মুখড়-পিছন আছে। বেগোন হলে গুণ টানবে, মুখড় বাতাস হলে বোঠেয় দুনো জোর দিতে হবে বাতাসের শত্রুতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে। যদি দেখলে, নৌকো কোনক্রমে এগোয় না—তখন মাছের একটা ঝাঁকা মাথায় তুলে নিয়ে দাও ছুট ডাঙা-জল অপথ-কুপথ ভেঙে। ঘাম দরদর করে পড়ছে, কিংবা কাঁটাগাছে দেহ চিরে রক্ত বয়ে যাচ্ছে—তা বলে তিলেকের জিরান নেই। তোমার অসুবিধা শহরের বাবুভেয়েরা বুঝবেন না। সাতটায় বাজারে নামানো তো অসম্ভব এ জায়গার মাছ। আটটা নামাতে পার তো জোর কপাল বলে জেনো। কিন্তু আর বেশী দেরী দর তখন পড়তি মুখে। মাছ নরম হয়ে গেছে তখন. বাবুভেয়েরা হয়তো ডাল-ভাত হলে খেয়ে যে যার কাজে বেরিয়ে গেছেন—তোমার পচা মাছ শেষ অবধি কষ্টেসৃষ্টে সিকি দামে বিকোবে। কিংবা নর্দমায় ঢেলে দিয়ে খালি ঝাঁকা নিয়ে ফিরতে হবে। তোমার জীবন যাক বা থাকুক, মাছ কিছুতে নষ্ট না হয়। জগাই পারে সেটা, জগন্নাথকে ডাকাডাকি করে তাই ঘেরিদার সকলে।

মাছের কাজ কারবার সম্পর্কে গগনের কোন ধারণা নেই। বুঝিয়ে দিলেও বুঝবে না। গগনের উপর জগার টান পড়ে গেছে। সেই প্রথম দিন কুমিরমারি গদাধরের হোটেলে নাস্তানাবুদ হবার পর থেকেই বোধ হয়। হয়তো বা মনের অজান্তে অনুতাপ। এদিক দিয়ে নৌকো ফেরত যাবার মুখে জগারা নেমে খানিক আড্ডা দিয়ে যাবেই। এক-আধ বেলা থেকেও যায় কাজের তাড়া না থাকলে। জগা হল চলন্ত বিজ্ঞাপন ডাক্তার গগনচন্দ্র দাসের। যাকে যেখানে পায় হাঁকডাক করে বলে, শোন শোন, গগন গুরুমশায় ডাক্তার হয়েছেন—খুব ভাল ডাক্তার। দায়-দরকার পড়লে চলে যেও। গোড়া থেকেই ডাক্তার উনি, আমি জোরজার করে পাঠশালায় বসিয়েছি।

যত বলাবলি হোক, ফলের ইতরবিশেষ নেই। রোগী আসে না। জ্বরজারি যে হচ্ছে না, এমন নয়। কিন্তু লোকে কিছুতে ডাক্তারের কাছে আসবে না। ডাক্তার যেন যম। দরকারও হয় না, দেখা যাচ্ছে। ক'দিন চুপচাপ শুয়ে পড়ে থেকে তড়াক করে উঠে আপাদ-মস্তক তেল মেখে খালের জলে পড়ে। স্নানান্তে ভাতের কাঁসর নিয়ে বসে। এতেই জ্বর চলে যায়, ওষুধ খাবার দরকার পড়ে না। খুব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠারই বা কী এমন দরকার? ক্ষেতের রোয়া-নিড়ানো সারা হয়ে গেছে, কাজ-কর্ম নেই এখন, জলের ঠেলায় ঘরের বার হওয়া যাচ্ছে না মোটে। চুপচাপ বসে কোণ্টা-কাটা অর্থাৎ পাঠটাকুর দিয়ে পাটের সুতো পাকানো গরুর দড়ির জন্য, এবং তিন সন্ধ্যে তিন কাঁসর ভাত গেলা। ধান-চালের অনটন—রোগপীড়ের দরুন ঐ তিন সন্ধ্যে থেকে কিছু খাওয়া যদি বাদ যায়, সেটা ভাল বই মন্দ নয়।

দিন আর চলে না। অবশেষে জগা-ই আবার নতুন জায়গা বাতলায়। চল নাবালে, আরও নিচের দিকে। ভারী এক মজার ব্যবসা মাথায় এসেছে। ডাক্তারি

গুরুগিরি কোথায় লাগে! ক-খ-ঙ শিখেছ যখন, তোমায় গুছিয়ে নিতে সময় লাগবে না বড়দা। আমরা সবাই আছি সঙ্গে। ভাতের দায়ে চলে এসেছি মানুষের দুনিয়া থেকে—নির্ঝঞ্ঝাট কোথায় চাট্টি ভাত মেলে, না দেখে ছাড়ব না। তার জন্য যেখানে যেতে হয়, যাব। চল আরো নিচে।

গগন শুনল সবিস্তারে। এখন কোথায় কি—অন্ধকারের ভিতর ঢিল ছোঁড়ার শামিল। তবে, রোজগারের এক নতুন কায়দা বটে!

ঠেলতে ঠেলতে কোথায় নিয়ে চললি বল দিকি জগা? বনের দিকে এগোচ্ছি। আর এক বেলা গেলেই বোধ হয় কসাড় বাদাবন। মানুষের মুখ দেখব না সেখানে, জন্তু-জানোয়ারের বসত।

জগা বলে, জন্তু-জানোয়ার ভাল বড়দা। বাগে পেলে মুখে পোরে, মুখের গ্রাস কেড়ে খায় না। তা মানুষেও কি ছেড়ে দেবে ভেবেছ? সবুর কর দু-চারটে বছর। এই যেখানটা আছ, কী ছিল বল তো আগে? আসবার মুখে কান্নাকাটি পড়ে যেত, বাড়ির লোকে খরচ লিখে রাখত। এখন দেখ, পোকার মতন কিলবিল করছে মানুষ। জমিজিরেত আগে মাংনা দিয়েছে, নগদ টাকা ধরে দিয়েছে বাদা হাসিলের বাবদ। এখন এক এক বিঘের সেলামি শুনলে পিলে চমকে যাবে। দুনিয়ার উপর মানুষ এক কাঠা জমি ফালতু পড়ে থাকতে দেবে না। ভিড় না জমতে, তাই বলছি, আগে-ভাগে গিয়ে যন্দুর পার বাগিয়ে নিয়ে বসো।

জগা চলে গেছে আবার নাবালে। ক'দিন ধরে খুব ভাবনাচিন্তা করল গগন। একলা মানুষ—না রোগী, না ছাত্র—ভাবনার অনন্ত অবসর। হাতে কোন কাজকর্ম নেই—এরই মধ্যে একদিন জগার নৌকোয় উঠে দেখেই আসা যাক না আরও নিচে একেবারে দক্ষিণ অঞ্চলের হালচাল।

ত্রৈলোক্যের বাড়ি গিয়ে বলল, মাইনেকড়ি কেউ তো কিছু দিচ্ছে না। দিন চালানো মুশকিল। আমার একলার শুধু একটা পেট নয়। ঘরবাড়ি আছে, বখেড়া আছে ঘরবাড়িতে।

ত্রৈলোক্য বেকুব হয়। তারই উদ্যোগে ইস্কুল, সে হল সেক্রেটারি। বলে, কাঁচা কাজ করেছ গুরুমশায়। পৌষ-মাঘের দিকে একেবারে পুরো বছরের মাইনে টেনে নিতে হয়। নগদে সুবিধা না হল তো ধান। ভাল কাজে ধান চাইলে কেউ 'না' বলে না। সেই ধান কোন একখানে রেখে দিতে পারতে—খুঁচি মেপে আমার গোলায় রাখা যেত। তুমি যে শহুরে আইন খাটাতে গেলে, মাস অন্তর মাইনে। কাজ করে দিয়ে তার পরে টাকা। আবাদ রাজ্যে ভদ্দোর নিয়ম আমদানি করলে। বিপদ হল সেই।

হাঁক দিয়ে মাহিন্দারকে বলে, দু-খুঁচি ধান পেড়ে দিয়ে আয় পাঠশালে। গুরু-মশাইর খোরাকি।

আবার বলে, ধান চিবিয়ে খাবে না তো! দু-খুঁচি আলাদা করে মেপে ধান-সিদ্ধ চাপিয়ে দিতে বল। ভেনেকুটে চালই দিয়ে আসিস পরশু-তরশু লাগাত।

গগন বলে, চাল তৈরি করে রেখে দাও ত্রৈলক্ষ। ক'দিন পরে নেব। জগা বলছে নাবালে কোথায় সব মাছের ভেরি আছে, খুব নাকি মাছ পড়ছে। ঘুরে-ফিরে ক'টা দিন মাছ খেয়ে আসি।

বেশ, বেশ। ঘুরেই এস তাহলে। ফিরবার সময় খালি হাতে এস না, মাছ হাতে করে এস দু-চারটে।

বারো

দক্ষিণের নাবাল অঞ্চলে জল-নিকাশের ব্যবস্থা নেই। ধানের চাষ হবে না—হোক তবে মাছ। ধরণীর এক কাঠা ভূঁই মানুষ বাতিল বলে ছেড়ে দেবে না—যেখানে যা পাওয়া যায়, শুষে নেবে। জল করে লাভ বেশী ধানকরের চেয়ে। মুশকিল হয়েছে, অত দূরের মাছ তাজা রাখা যায় না। শহরে নিয়ে তোলবার আগে নরম হয়ে যায়। তবে বেশী দিন নয়—টানা-রাস্তা হচ্ছে কুমিরমারি থেকে। রাস্তাটা হয়ে গেলে তখন লরী-বোঝাই মাছের ঝোড়া ফুলতলায় নিয়ে ফেলবে। নৌকোয় লড়ালড়ি করতে হবে না সারারাত্রি।

জগন্নাথ সেই তল্লাটে নিয়ে যাচ্ছে গগনকে। দেখে আসা যাক। তারপর সুবিধা হয় তো ছোটখাটো এক ঘেরি বানাবে। আগে যারা এসেছে, তারা সব ছোট থেকেই বড়। জগন্নাথের মাথা বড় সাফ। বিদ্যেসাধ্যি থাকলে শহরে সে জজ-ম্যাজিস্টর হয়ে বসত। অত বিদ্যে না থাক, যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগটাও ভাল মতন শেখা থাকত যদি! স্বাধীন ব্যবসায়ে ঐটে বড় দরকার। মুখের কথা মুখে থাকতে চটপট হিসেব বলতে হবে: দু-টাকা সাত আনা, এক টাকা চোদ্দ পয়সা আর পোনে আট আনা—একুনে কত? তার থেকে সায়েরের খাজনা তিন ঝোড়ার দরুন তিন দুনো ছয় পয়সা বাদ দাও, দাঁড়াল গিয়ে কতয়? শ্লেট-পেন্সিল ধরলে হবে না। লহমার মধ্যে হিসাব মিটিয়ে খাতায় লিখে ফেলতে হবে। ছুটোছুটি করে ওদিকে মাছ তুলে ফেলেছে নৌকোয়। গোন বয়ে যায়, তীর হয়ে এখন নৌকো ছুটবে। হিসাবের জন্য বসে থাকলে হবে না।

গগন জগা আর বলাই চলল সেই বাদার প্রান্তে মেছোঘেরির তল্লাটে।

দূর কম নয়, পুরো একটা ভাঁটি—উঁহু, তারও কিছু বেশী। পুরো ভাঁটি বেয়ে গিয়ে তারপরে বড় দুটো বাঁক গুণ টানতে হয় বিশেষ ভাবে দেখে শুনে, জন্তু-জানোয়ারের চলাচল বুঝে। রাতের বেলা তো নয়ই। এক-বুক জল ভেঙে এক-হাঁটু কাদা মেখে বিস্তর দুঃখধান্দায় অবশেষে তারা কাঙালি চক্কোত্তির ঘেরিতে গিয়ে উঠল। নামে ভুল হল—কাঙালি চক্কোত্তির ঘেরি ছিল অনেক দিন—বছর আষ্টেক আগে। তার পরে হয়ে দাঁড়াল কাঙালিবাবুর ঘেরি। একেবারে হালফিলের নামকরণ চৌধুরীগঞ্জ। খোদ মালিকের নাম কাঙালিচরণ চক্রবর্তী। গোড়ায় রসুয়ে-বামুন হয়ে এসেছিলেন বনকরের এক কর্মচারীর সঙ্গে। মাইনে থেকে কিছু টাকা জমিয়ে ঘেরির বন্দোবস্ত নেন। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও নিজ হাতে ডিঙি বেয়েছেন, ভেসাল-জাল টেনেছেন। হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল এই সমস্ত কাজে। প্রাণ হাতে করে এত দুর্গম অঞ্চলে ক'জনই বা আসত তখন! জনালয়ের বহু দূরে দুর্দান্ত নদীকূলে ক্রোশের পর ক্রোশ জঙ্গলে ভরা জমি। জোয়ারবেলা জলে ভরে যায়, ভাটায় জল সরে গিয়ে কাদার সর পড়ে। বড় বাদা থেকে হরিণের পাল বেরিয়ে গাছের ঝরা পাতা ও কচি ঘাস খুঁটে খুঁটে খেয়ে যায়। দিনের পর দিন এমনি কাটত। কাঠ ও গোলপাতার নৌকো মাঝে মাঝে মন্থর ভাবে ভেসে যেত জঙ্গলের পাশ দিয়ে। মোম-মধু ভাঙার মউলরাই শুধু মরশুমের সময় ডাঙায় উঠে ছুটোছুটি করত, অন্য কেউ বড়-একটা নৌকো থেকে নামত না।

কাঙালিচরণ খাজনা করে নিলেন ছিটে-জঙ্গলের হাজার খানেক বিঘে। সেলামি নেই—মাংনা দিলে কেউ নিতে চায় না, তার সেলামি! খাজনাও নামে মাত্র—বিঘা প্রতি ছ-আনা আট আনা। তা-ও আপাতত নয়, বছর পাঁচেক পরে জমাজমি কারেম্ভ

হয়ে যাবার পর। এমনি অবস্থায় কাঙালিচরণ এক হাজার বিঘে জমি নিয়ে বাঁধবন্দি করতে লাগলেন। লোকে নানান কথা বলে, 'খাচ্ছিল তাঁতি বুনে—মরে তাঁতি গরু কিনে'। হাঁড়ি ঠেলে চক্কোত্তিঠাকুর ক'টা টাকা গেঁথেছিল, জঙ্গলে গ্রাস করে নিল সে-টাকা। জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়ে চক্কোত্তি ধান-চাষের ব্যাপারে গেলেন না অন্য দশজনের মত। মাছ জন্মাতে লাগলেন। চৈত্র-বৈশাখে বাঁধ কেটে নদীর জল তুলে দাও ঘেরের খোলে। নোনা জলের মাছ উঠল—ভেটকি ভাঙান পারসে চিংড়ি। বাঁধ বেঁধে ফেল তার পর। মাছ বড় হচ্ছে এবং বিক্রিও হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। পৌষ-মাঘ নাগাত ঘেরি শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাবে, দুটো চারটে খানাখন্দে কিছু জল—তার মধ্যে অল্পসল্প বাছাই মাছ রেখে দেবে বড় করবার জন্যে। ব্যবসায়ের মজা হল, যা-কিছু পাওনা-গণ্ডা ক'টা মাসের মধ্যে ষোল-আনা হাতে এসে যাচ্ছে। 'কয় শুভঙ্কর মজুত গোণো' —লাভ-লোকসান মজুত টাকা গণে হিসাব করে নাও। কাঙালির লোকসান হয় না—নিজ হাতে সর্বরকমের কাজ করে ঘাঁতঘোত বুঝে নিয়েছেন, নামই হয়ে গেছে মেছো-চক্কোত্তি। গোড়ায় যারা টিপ্পনী কাটত, দেখাদেখি তারাও অনেকে জঙ্গল জমা নিয়ে ঘেরি বানাচ্ছে। কিন্তু মেছো-চক্কোত্তির কাছে দাঁড়াতে পারে না। আগে যারা একবার জমিয়ে বসে যায়, পরবর্তী কালে এসে তাদের উপর টেক্কা মারা দায়। একটা বিশেষ অসুবিধা, ভোরবেলা—অন্তত পক্ষে আটটা বাজবার আগে, ফুলতলায় মাল পৌঁছে দেওয়া। সেটা হয়ে উঠল না তো ফুলতলার বাজারে দু-আনা সেরেও মাছ বিকাবে না। পচা মাছ নদীর জলে ফেলে দিয়ে বোঝা খালাস করতে হবে। কাঙালি-চরণ একেশ্বর হয়ে ছিলেন অনেকদিন—ঝোড়া ঝোড়া পচা মাছ গাঙে ঢেলে দিয়েও চকমিলানো প্রকাণ্ড বাড়ি তুলেছেন ফুলতলা শহরের উপর, শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করে-ছেন, মেয়েদের ভালো বিয়েথাওয়া দিয়েছেন, ছেলেপুলে ইস্কুল-কলেজে পাঠিয়েছেন, একটা-দুটো পাশও করেছে কেউ কেউ। বুড়ো কাঙালি বেঁচে আছেন এখন, কুঁজো হয়ে পড়েছেন, চলে ফিরে বেড়াতে পারেন না, চোখেও ঝাপসা দেখেন। ফুলতলায় গাঙের ধারে মাছের আড়ত আছে ওঁদের নিজস্ব, ভোরবেলা ঘোড়ার গাড়ি করে তাঁকে আড়তে নামিয়ে দিয়ে যায়, গদির উপর চুপচাপ বসে থাকেন তিনি! ছেলেরা—এমন কি চৌধুরিবাড়ির মধ্যে সব চেয়ে দক্ষ ছোটবাবু অনুকূল চৌধুরি অবধি ও-পথ ভুলেও মাড়ায় না। আড়তের ভার কর্মচারীদের উপর। কাঙালিচরণের আমলের দক্ষ পুরনো কর্মচারী আছে দু-চার জন, তারাই দেখাশুনা করে। চালু ব্যবসা যন্ত্রের মতো চলে, তার জন্য বিশেষ বুদ্ধি-বিবেচনার আবশ্যক হয় না। চলে সেইজন্য। ছেলেরা এখন নামযশের জন্য পাগল। মেছো-চক্কোত্তি কাঙালির নাম, তারা সেজন্য কৌলিক চক্রবর্তী উপাধি ছেড়ে চৌধুরি হয়েছে। আদালতে এফিডেভিট করেছিল এই মর্মে। যা ছিল কাঙালি চক্কোত্তির ঘেরি, এবং পরবর্তীকালে অবস্থা ভাল হয়ে যাবার পর কাঙালিবাবুর ঘেরি,—এখন সেই জায়গা চৌধুরিগঞ্জ। প্রতিষ্ঠাতার নামে কাঙালিগঞ্জ করবার কথা হয়েছিল, কিন্তু কাঙালি নামটার মধ্যেও সে-আমলের দুর্দিনের গন্ধ। কাঙালিগঞ্জ চলল না।

চৌধুরিগঞ্জের নিজস্ব অনেক নৌকো। তার কোনটা মেলে নি, কাছাকাছি অন্য ঘেরির ডিঙি চেপে এসেছে। বড় গাঙ থেকে খাল ঢুকে গেছে বাদায়—সেই এক খালের মুখে নামিয়ে দিয়ে ডিঙি চলে গেল। খালের ধারে ধারে হাঁটছে। জগা দেখিয়ে দেয়: ঐ তো—ঐ যে আলাঘর। দেখতে পাচ্ছ না?

গগন তাকিয়ে তাকিয়ে ঘর দেখার চেষ্টা করে। কোথায়? সমুদ্রের মতন দিকহীন খোলা জল। হাওয়া দিচ্ছে। বৃষ্টি হচ্ছে হয়তো বা হাত কয়েক দূরেই—ঠিক এ জায়গাটায় কিছু নেই। জলের উপর চড়বড় করে ফোঁটা পড়ছে। মনে হয়, বিস্তর মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে ওখানে। হঠাৎ—কী মুশকিল, বৃষ্টির পশলা গা-মাথা কাপড়চোপড় ভিজে-জবজব করে দিয়ে ছুটে পালায়। এক খেলা যেন।

এক-পেয়ে সরু আ'ল-পথ। ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলে গেছে, যেমন যেমন ফেলেছে তেমনি পড়ে আছে। জল আটকানোর জন্যে বাঁধ, জলের সঙ্গে মাছ যাতে বেরিয়ে না যায়। বাঁধের উপরে মানুষ হেঁটে বেড়াবে, এ ভাবনা কেউ ভেবে রাখে নি। অতএব হাঁটতে হলে দায়টা ষোলআনা তোমার নিজের। এঁটেলমাটি বৃষ্টিতে পিছল হয়ে আছে। দু-পায়ের দশটা আঙুল বাঁকিয়ে টিপে টিপে পথ এগুতে হয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে—জনালয় হলে অন্ধকার হয়ে যেত এতক্ষণ। ফাঁকা বলেই আলো। কিন্তু এই আলো কতক্ষণই বা! বাঁধের শেষ দেখা যায় না—যত দূর নজর চলে, দীর্ঘ অজগরের মত এঁকে বেঁকে পড়ে রয়েছে।

ক্লান্ত গগন জিজ্ঞাসা করে, আর কদ্দুর?

জগা বলে, এসে গেলাম বড়দা। উই যে আলা।

গগন রাগ করে বলে, খালের মুখে মাটিতে পা ছোঁয়ালাম, তখন থেকেই এক কথা চলছে তোমার।

নির্লজ্জ জগা দাঁত বের করে হাসে: বড়দা বলে মান্য করি, তোমার সঙ্গে দু-কথা বলব কেন?

ঘোর হয়ে আসে। এখন তবু পা টিপে যাওয়া যাচ্ছে। একটু পরে নজর চলবে না—তখন?

বলাই ওদিকে সতর্ক করে দেয়: বাঁ-দিকটাও নজর রেখো বড়দা। এমন-অমন বুঝলে ঝপাস করে ঘেরির খোলে লাফিয়ে পড়বে।

কেন, ওদিকে কী আবার? সভয়ে গগন বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে। জঙ্গল পুরো হাসিল হয় নি। বড় জঙ্গল নয়—ছিটে গাছপালা, গেঁয়ো-হেঁতালই বেশী। বড় জঙ্গলের আরম্ভ রশি দুই দূরে খালের ওপার থেকে। বিরক্ত হয়ে গগন বলে, চোখ তো সাকুল্যে একজোড়া। নজর বাঁধে রাখি, না জঙ্গলে।

বলাই হেসে বলে, আমি বলি কি জঙ্গলে রাখাই ভাল। কোটালে খালের পার ভেসে আছে। আঁধার হলে বড়-মিঞারা খাল সাঁতরে এপারে ডাঙায় বেড়াতে আসে। বাঁধে আর কী এমন—দু-পাচটা সাপ পড়ে থাকতে পারে। নোনা রাজ্যের সাপ বড্ড আলসে—গায়ে পা পড়লেও ফণা তুলবে না কষ্ট করে! ভাগতই নেই।

গগন বলে, সাপে ছোবল না-ই দিল, পা হড়কে বাঁধের নিচে পড়ি তো হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে যাবে। তার চেয়ে আপসেই নেমে যাই রে বাপু।

অপর দুজনে হি-হি করে হেসে ওঠে গগনের কাণ্ড দেখে। বাঁধ ছেড়ে ঘেরির খোলে গগন নেমে পড়েছে। ওপারের বাঘেরা বেড়াতে এসে উঁচু বাঁধের আড়ালে তাকে দেখতে পাবে না—তার আগে, পেরে ওঠে তো, জগা বলাই দুটোকে পেটে পুরে উদ্গার তুলবে। আলস্যে শয়ান সাপের পিঠে পা পড়বে না, পিছল বাঁধে পড়ে গিয়ে পা ভাঙারও শঙ্কা রইল না। হাসছে ওরা তো বয়েই গেল।

জগা বলে, জল ভেঙে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তোমার বড়দা। তা সাঁতরেই চল না এইটুকু পথ।

আর কদ্দরে গো ?

জগার সেই এক উত্তর ঃ ঐ যে আলা। সামনে।

সাঁতরে যাবারই গতিক বটে। কাপড়চোপড় আগেই ভিজেছিল বৃষ্টিতে, তাতে নতুন অসুবিধা কিছু নয়। হাঁটু-জল, কোমর-জল কোথাও, গলা-জলও এক জায়গার। এই জায়গাটুকু সত্যিই সাঁতার দিয়ে উঠতে হল। জগা-বলাই বাঁধে বাঁধে চলেছে, গগন ঘেরের খোলে জলের ভিতর দিয়ে। চলল—কতক্ষণ ধরে চলেছে এমনিধারা।

হঠাৎ জগা চেঁচিয়ে ওঠে ঃ আলো দেখতে পাচ্ছ না বড়দা ? ঐ—ঐ—

গগন খিঁচিয়ে ওঠে ঃ আর দেখাতে হবে না। অনেক হয়েছে। নিয়ে যাচ্ছ যমালয়ে তা জানি, চুপচাপ তাই নিয়ে চল। মড়ার উপরে খাঁড়ার খোঁচাখোঁচি করো না ?

জগা বলে, আচ্ছা দেখই না চোখ তাকিয়ে। আমি মিথ্যেবাদী, কিন্তু আলো তো মিথ্যে নয়। আলা না হলে বাদার মধ্যে জলুসের আলো জবালিয়েছে কে ?

গগন নজর তুলে দেখবার চেষ্টা করে। আলোর মতন বটে! অত নিচু থেকে ঠিক করে কিছু বলবার জো নেই। হ্যাঁ, আলাই।

জগা বলে, জল ভাঙছ কি জন্যে আর ? হাঁক দিলে এখারে পঞ্চাশ মরদ এসে পড়বে। উঠে এস বাঁধে। এসে দেখ।

তাই বটে। জোরালো আলো অনতিদূরে—সাধারণ কেরোসিনের টেমি-হ্যারিকেন নয়, হ্যাজাক জাতীয় আলো। এতক্ষণে একটুখানি হাসি গগনের মুখে ঃ এসে গেলাম তবে! আলা-আলা করছ সেই কখন থেকে। উঃ, মিথ্যে তোমার মুখে আটকায় না।

মিথ্যার জন্য জগা লজ্জিত নয়। আরও হাসে ঃ কত পথ এসেছে, মুঝতে পার নি। আলা না দেখালে তোমায় কি আনতে পারতাম বড়দা ? পথের উপরে বসে পড়তে। বিদ্যে শিখলে মানুষ বাবু হয়ে যায়। গায়ে পদার্থ থাকে না।

আলায় পেঁছে গেল অবশেষে। 'আলা' নাম কি আলর থেকে ? কিংবা আলোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে নামের ? একটা জোরালো আলো ঝুলবে আলার উঠানে। এই নিয়ম। বৃষ্টির জলে আলো খারাপ হয়ে না যায়, একটুকু আচ্ছাদনও আছে সেজন্য। অনেক দূর থেকে লোকে দেখতে পায় ঃ ঐ যে আলার আলো জবলছে। রাত্রিবেলা ডিঙি ও শালতি-ডোঙায় জাল বেয়ে বেয়ে মাছ মারে, ধরা হয়ে গেলে আলো লক্ষ্য করে সোজা পাড়ি ধরে—আলার উঠানে মাছ এনে ঢালবে। উঁচু জায়গার দরকার আলা বানানোর জন্য। যত যাই হোক, আলার জমিতে জল যেন না ওঠে। জুত মতন জায়গা না পেলে মাটি তুলে উঁচু করতে হবে। দু-তিনটা পুকুর অতি-অবশ্য চাই আলার সীমানার মধ্যে। ঐ পুকুরের মাটিতে উঁচু করে নাও জায়গা। উঠান খুব প্রশস্ত—উঠানের সামনে দুই চালের প্রকাণ্ড ঘর। ঘর বটে কিন্তু দেয়াল নেই। এক সারি খুঁটি, খুঁটির মাথায় পাড়। চাল দুটোর এক মাথা ঐ সব খুঁটি ও পাড়ের উপরে, অন্য মাথা ভুঁয়ে গিয়ে পড়েছে। ফাঁকার মধ্যে ঘর। অনবরত হাওয়ার ঝাপটা লাগে। বাতাস মাঝে মাঝে অতি প্রবল হয়ে ঝড় হয়ে দাঁড়ায়। দিনরাত এমনি হাওয়ার অত্যাচার। উঁচু ঘর হলে ভেঙে পড়বার ভয়। আলা সেই জন্যে ভুঁয়ের উপর মুখ থুবড়ে থাকে। মাচা তৈরি আছে—গেঁয়ো-গরানের শক্ত খুঁটি, তার উপর পুরোনো বাতিল পাটা, এবং তদুপরি পাঁচ-সাতটা মাদুরের অনন্ত শয্যা। যার যতটুকু ফুরসত হচ্ছে, গড়িয়ে নিচ্ছে মাচার মাদুরের

উপর। বালিশ ইত্যাদির বাজে বিলাসিতা নেই। শীতকালে অথবা বৃষ্টিবাদলা থাকলেই ঘরে শোওয়া, নইলে বাইরের উঠানে খালি পাটা বিছিয়ে মরদ জোয়ানেরা টপাটপ চিৎ হয়ে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

এই হল আলা। তিনজনে আলার উঠানে দাঁড়াল। এতক্ষণ ধরে জলকাদা ভাঙার পর শুকনো ভুঁয়ে পা দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। বেশ খানিকটা রাত রয়েছে। আলার লোকজন বড় ব্যস্ত এ সময়টা, মাছ এসে পড়ছে। মাছ এনে এনে ঢালছে উঠানের উপর। চারামাছ যেগুলো বেশ সজীব আছে, সেগুলো পুকুরে নিয়ে ফেলে। বাড়তে থাকুক এখন, শীতকালে ধরবে। অথবা এক-বছর দু-বছর পুকুরে রেখে বড় করবে। মাছ বাছাই হচ্ছে, মাছের গাদার চতুর্দিকে মরদেরা গোল হয়ে বসে। এক জাতীয় মাছ এক এক ঝুড়িতে। খাল অদূরে, মেছো নৌকো অনেক খালের ঘাটে। বড় নৌকো নয়, হালকা ডিঙ্গি। ঝুড়ি পরিপূর্ণ হচ্ছে, আর ডিঙ্গির উপর উঠে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। বোঠে হাতে চার-পাঁচ জন লাফিয়ে পড়ছে এক এক ডিঙ্গিতে। বোঁও করে পাক দিয়ে তীরবেগে ডিঙ্গি বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঝপঝপ ঝপঝপ জোয়ানদের লোহার হাতে বৈঠা বাওয়ার শব্দ বাতাসে অনেকক্ষণ অবধি কানে আসে।

জগাকে দেখে সকলে কলরব করে ওঠে: এই যে, জগা এসে গেছে। তবে আর কি! বড় ভেটকিগুলো বেছে এক ডালিতে তোল। জগা ঠিক নিয়ে পেঁাছে দেবে সাতটার মধ্যে। লগনসার বাজার, দর পাওয়া যাবে ভাল।

বড় আলোর লাগোয় ছোট এক কুঁড়ি। রান্নাঘর সেখান থেকে হাঁক আসে: ভাত নেমে গেছে জগা। খেয়ে যাবে তো বেড়ে দিই।

জগা ঘাড় নাড়ে: উঁহু—

অনিরুদ্ধ হল ম্যানেজার। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে, থাক থাক। খাটনি আছে, ভাত খেলে গতর ভারী হবে, বোঠে চলতে চাইবে না। না খেয়েই যাক, ফুলতলার ঘাটে সকালবেলা মিঠাই খাবে ভরপেট।

জগা প্রবল ঘাড় নেড়ে বলে, আজকে আমার বসা। কুটুম্ব সঙ্গে নিয়ে এলাম, আজ কোনখানে নড়ছি নে।

তাই তো, লগনসা যে কালকে! সাতটার মধ্যে ওরা কেউ পেঁাছে দিতে পারবে না। সে তাগত নেই কারো। তুমি হলে ঠিক পারতে। বসার দিনটা বেছে নিলে একেবারে লগনসা মুখে!

জগা বলে, কি করব। বড়দা এল, তাঁকে দেখানো শোনানো হবে না? মাস ভোর খাটছি, আপন লোক এলে একদিন যদি জিরান না পাই, তবে আর মানুষ রইলাম কই? জোয়ালের গরু হয়ে গেলাম।

এ কথার উপরে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। অনিরুদ্ধ এক ছোঁড়ার দিকে হাঁক দেয়, বড়দা মশায় দাঁড়িয়ে রইলেন, পুকুরঘাট দেখিয়ে দে, হাত-পা ধোয়া হলে আলাঘরে নিয়ে বসা। তামাক সেজে দে, খাতিরযত্ন কর। জগার বড়দা তো আমাদেরও বড়দা। কুটুম্ব মানুষ।

তেরো

মাছের ডিঙিগুলো বিদায় করে দিয়ে তখন অবসর। মানুষজন ভাত খেয়ে নিচ্ছে। রান্নাঘরে দু-জন-এক জন —ভাতের কাঁসর নিয়ে ফাঁকায় এসে বসে প্রায় সকলে। খাওয়া

আর কি—ভাত আর মাছ। তার উপর যেদিন ডাল পড়ল, সেদিন ফিস্টি-উৎসবের ব্যাপার। মাসে একদিন দু-দিন হয় এরকম। ডিঙি রওনা করে দিয়ে দেবার অবসর, রাতের ভিতর আর কাজকর্ম নেই।

উঁহু, ছিল না বটে কাজ, ইদানীং একটা হয়েছে। গাঁয়ে শহরে ছারপোকার মত মানুষ। জায়গা নেই, পেটের খাদ্যও নেই, মানুষ ছিটকে এসে পড়ছে দূর-দূরন্তর এই সমস্ত বাদাবনে। গগন এসে পড়েছে যেমন। ছ্যাঁচড়া মানুষও আসে অনেক। তারা চুরিচামারি করে। আলার মানুষ মাছ ধরা সেরে উঠে এলে, তারা চুপিসাড়ে জাল নিয়ে নামে সেই সময়। সেজন্য পাহারা দিতে হয়। জলের মাঝে মাঝে ছিটে-জঙ্গল, তারই আড়ালে-আবডালে চুপি চুপি শালতি ঢুকিয়ে বসে থাকে চোর ধরবার মতলবে। পাহারার কাজে সারারাত্রি ঘেরির মধ্যে কিছু লোক রাখতে হয়। পালা করে মানুষ জাগে। বাকি সকলের ছুটি।

লেখাপড়া-জানা মানুষে গগন—গাঁজাটা অতিশয় ঘৃণা করে। তাকে তামাক দিয়েছে। দা-কাটা তামাকে চিটাগুড়ে মাখা, সে তামাক গাঁজারই দোসর। জলে জলে বেড়ায়, বৈঠকখানায়-বসা বাবুভেয়ের আরামের তামাকে এদের চলে না। অতিরিক্ত রকমের তলোক, শীত তাড়ানো যায় যাতে। তামাক ও গাঁজায় মিলে দশ-বারোটা কলকে ঘোরে আলার উঠানে। রাতটা সুমুখ-আঁধারি, আকাশে মেঘ করেছে। হাতে হাতে কলকে ঘুরছে, টানের চোটে কলকের আগুন জ্বলে জ্বলে ওঠে। ঘেরির জলার উপর থেকে দেখবে, যেন জোনাকির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে। মাছের উগ্র আঁশটে গন্ধ। কলকল শব্দে জল পড়ছে অদূরে কোথায়। জোরে হাওয়া দেয় এক-একবার, নিঃসীম ঘেরির জল আছড়ে পড়ে আলার উঁচু ভুঁইয়ের চতুর্দিকে। পাথরের মতো কালো-রং কঠিন দেহ জোয়ান মরদগুলো তামাক খাচ্ছে ও গুলতানি করছে এখানে ওখানে ছড়িয়ে বসে। আলোর এক এক ফালি পড়েছে এর উপরে, তার উপরে। সমস্ত মিলে রহস্য-ভরা থমথমে ভাব। জলালয়ের বাইরে খালপারের নিঃশব্দ নিবিড় অরণ্যভূমির পাশে পরিচিত পৃথিবী থেকে পৃথক বিচিত্র এক জগৎ।

কলকে হাতে হাতে ঘোরে, আর আলাপ-পরিচয় জমে ওঠে। মানুষ পেয়ে ভারী খুশী, বাইরের মানুষের দুর্ভিক্ষ এখানে। অনিরুদ্ধ ম্যানেজার—চেয়ার-টেবিলের অফিস সাজিয়ে-বসা ম্যানেজার নয়। আলার ম্যানেজারকে দরকার মতন জাল বাইতে হবে শালতি-ডোঙায় ভেসে ভেসে, লোকজনের অভাব হলে রান্নার কাঠ কেটে আনবে জঙ্গল থেকে, কাঠ চেলা করবে, সময় বিশেষে রান্নার কাজেও লেগে পড়বে। এমনি ম্যানেজার। ম্যানেজার পদটা পেয়েছে কাগজে কলম বুলিয়ে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে মোটামুটি এক একটা কথা দাঁড় করাতে পারে, সেই শক্তির জোরে। চালান লিখে দেন কোন্ ডিঙিতে কত খোড়া কি রকমের মাছ যাচ্ছে। আলাতেও হিসাবের একটা নকল রাখে। আলার যাবতীয় খরচপত্র ম্যানেজারের হাত দিয়ে হয়, জমাখরচ রাখতে হয় তার। বাইরের মানুষ পেয়ে হঠাৎ আজ হাতে-স্বর্গ পেয়ে গেছে। জগা বড়দা বলে ডাকে, সেই সুবাদে গগন এখন সকলের বড়দা। ম্যানেজার বলে, তোমার পাঠশালা বন্ধ বড়দা—কাজকর্ম বন্ধ থাকলে আবাদের লোকে তো ফুলতলায় গিয়ে ফুর্তিফার্তি করে। তবু ভাল যে এই উল্টোদিকে অভাজন ভাইগুলোর দিকে পদধূলি পড়ল। কিন্তু একবার এসে শোধ যাবে বড়দা, মাঝে মাঝে যেন দয়া পাই।

যন্ত্রের ঠেলায় অস্থির। ক্ষিধের গগনের পেট চোঁ-চোঁ করে, রাঁধা ভাতও রয়েছে, কিন্তু খেতে দেবে না। আর সকলের যে ব্যঞ্জনে চলে, বিশেষ অতিথি এই বড়দার

সামনে পর্যন্ত সেই বস্তু ধরা যায় কেমন করে? ভাল ধরো নেই, তাহলে অবশ্য ভাবনার কিছু ছিল না।

ক্ষুধার্ত গগন বলে, কালকের দিনটাও আছি ম্যানেজার। কাল খাতির করো। কষ্ট হয়েছে, ঘুম ধরেছে আমার। যা রান্নাবান্না হয়েছে, তাই দিয়ে চাট্টি সেরে নিয়ে গড়িয়ে পড়ি।

সেটা কোন কাজের কথা নয়। সব কুটুম্বই বলে ঐ রকম। মাছের রাজ্য, ডাল না হল তো মাছই খাওয়াবে বেশী করে। ছোট মাছ কুটুম্বর পাতে দেবে কোন্ লজ্জায়? ঐ রাত্রে ঐ অন্ধকারের মধ্যে জাল নামিয়ে দিয়েছে আলার সংলগ্ন বড় পুকুরে। পাশখেওলা বাইছে তিনজনে। তিন-চার বছরে মাছ বেশ ওজনদার এখানে। নোনা মাছের রাজা হল ভাঙন—তৈলাক্ত মাছ, অতি সুস্বাদু। তারিফ করে বাবুরা ইলিশ খান, টাটকা ভাঙন খেয়ে দেখো—ইলিশ তার কাছে দাঁড়াতে পারে না। অনুকুলবাবুর বড় মেয়ের বিয়ে হবে এক-আধ বছরের মধ্যে, বড় পুকুরটায় ভাঙনমাছ জীইয়ে রাখা হচ্ছে—বিয়ের ভোজে শহুরে মানুষ পাকা ভাঙন খেয়ে তাজ্জব বনে যাবে! সেই পুকুরে ম্যানেজার জাল নামিয়ে দিল।

বলে, খাবে, তো খাবে শহরে বাবুরা। অনেক আছে। তা বলে আমরা পালন করছি—আমরা খেতে পাব না দুটো-চারটে? কুটুম্বর পাতে দেব না? পাঁচটা তুলবি রে গণে গণে। ছোট হলে ছেড়ে দিবি। দু-সের আড়াই সেরের কমে না হয়।

জগা বলে, অত কি হবে গো? তোমাদের সকলের খাওয়াই তো প্রায় হয়ে গেল।

অনিরুদ্ধ বলে, সকলের হয়ে গেছে, খেতে পাঁচজন বাকি আমরা। পাঁচটার কমে হয় কি করে? এই তোমরা তিনজন, আমি রয়েছি। আর রান্না করছে কালোসোনা, তারও ভালমন্দ খেতে শখ হয় বটে তো! সে বাদ পড়বে কেন?

অবাক হয়ে গগন বলে, হলামই না হয় পাঁচ জন। জন প্রতি আড়াই সের মাছের বরাদ্দ, শুধু মাছ খেলেও তো অতদূরে সাপটানো যাবে না।

রহস্যময় ভাবে অনিরুদ্ধ বলে, চোখেই দেখতে পাবে। দেখতে পেলে কেউ শুনতে চায় না। কিন্তু দেখেই যাবে বড়দা, মুখে কদাপি রা কাড়বে না।

পাঁচটা বাছাই মাছ উঠানের উপর আলোর সামনে এনে ফেলল। পুষ্ট চেহারা—লালচে আভা গায়ে, কাঁচা মাছ দেখেই মৎস্য-রসিকের জিভে জল ঝরে।

অনিরুদ্ধ কালোসোনার দিকে চোখ টিপে হাসতে হাসতে বলে, আবার কি—বন্দোবস্ত করে ফেল তাড়াতাড়ি। রাত হয়েছে, বড়দা খিদে-খিদে করছে।

গগন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। ঐ বড় বড় ভাঙন মাছের মুড়োগুলো কেটে নিল, এবং তার সঙ্গে সামান্য কিছু মাছ। কেটে নিয়ে মাছের বাকি অংশ ছুঁড়ে ফেলে দেয় এক দিকে।

অনিরুদ্ধ হাঁ-হাঁ করে ওঠে: অমন ধারা করলে হবে না তো কালো। কোটনামির লোকের অভাব নেই। রোসো—

কোদাল নিয়ে এল নিজেই। বটের চারা রয়েছে, ছায়া দান করবে চারা বড় হয়ে। সেই গাছের গোড়ায় কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ফেলল। গর্তের ভিতর মুড়ো বাদে সেই পাঁচটা মাছ—একুনে সের আট-নয় হবে তো ওজন—গর্তের ভিতর ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিল।

বিস্ময়ে গগনের চোখ কপালে উঠে গেছে। বলে, ওটা কি হল ম্যানেজার?

অনিরুদ্ধ বলে, ঐ তো শুনলে। পাঁচজন আমরা খাওয়ার মানুষ। কে মুড়ো

খাক, কে ল্যাজা খায়—অত বাছাবাছির গরজ কি ? সবাই মুড়ো পেলে মনে কারো দুঃখ থাকবে না। সেই ব্যবস্থা হল।

কিন্তু অতটা মাছ নষ্ট না করে কাউকে দিয়ে দিলে তো হত। নিজেদের না লাগে, আশপাশের ভেড়ির মানুষ আছে—

অনিরুদ্ধ জিভ কাটে : সর্বনাশ, খবর বাইরে যেতে দিতে আছে। যাদের দেবে, তারা খাবে আর টিপ্পনী কাটবে। এক-কান দু-কান হতে হতে শেষটা ফুলতলায় মনিববাড়ি চলে যাক ! কান-ভাঙানি লোকের অভাব নেই। অত হ্যাঙ্গামে কাজ কি। আমাদের রেওয়াজ হল, দরকারের বাড়তি কোন-কিছুর নিশানা থাকতে দিই নে।

কলকে শেষ হয়ে গিয়েছিল। অনিরুদ্ধ নতুন করে সেজে আগুন দিয়ে আনল রান্নাঘর থেকে। কয়েকটা সুখটান দিয়ে গগনের দিকে এগিয়ে দেয় ; খাও।

হুঁকো দিয়ে ফিকফিক করে হাসছে। গগন বলে, হাসছে কেন ? কি হল গো ?

অনিরুদ্ধ বলে, শোন তবে বড়দা। শীতকালে ছোটবাবু এয়ারবন্দুক নিয়ে এলেন পাখি মারতে। শখের বোট নিয়ে এসেছেন, বোটেই থাকেন। সে ক'দিন বড় কষ্ট আমাদের। নুন-ভাত—কুচো-চিংড়ি কয়েকটা নমো-নমো করে ছড়িয়ে দেওয়া তার উপর। ছোটবাবু দেখে ফেললেন : এই খাও নাকি তোমরা ?—আজ্ঞে, হুজুরের এক পাই লোকসান করে আমাদের মুখে ভাত উঠবে না। কুচো-চিংড়ি চালান যায় না, ভাতটা তাই আঁশটে করে নিই। ছোটবাবু বললেন, তা হোক তা হোক। আমাদের জন্যে পুকুর থেকে মাছ তুলছে, তারই দু-চার দাগা তোমাদের খোরাকি রেখে দিও। মনে মনে বলি, চক্ষুর আড়াল হও, গোটা পুকুর ডাঙায় তুলে ফেলব, টের পাও নি বাছাধন।

খুব খাওয়াদাওয়া হল। রাক্ষুসে খাওয়া। অনিরুদ্ধ জোড়হাতে বিনয় করে : কিছু না, কিছু না এক তরকারি আর ভাত। এত পথ কষ্ট করে এসেছ, খাওয়ার ব্যাপারেও কষ্ট পেয়ে গেলে।

ভাজা ঝাল ঝোল ও টক—আগেকার রান্না ছিল, আর অতিথির নামে নতুন করে যা-সব রান্না হল। মাছেরই সমস্ত—অতএব তরকারি একখানা বই দু-খানা বলবে না। মাছ-ভাত। রাত আর বড় বেশী নেই। চাঁদ উঠেছে ঘন কালো অরণ্যানীর মাথার উপর। বিপুল নিঃশব্দতা, মরা ধরিত্রী—কোনদিকে একটা কোন প্রাণী বেঁচে আছে, এমন রাত্রে তা মনে হবে না। তেপান্তরের প্রান্তে দপদপে ঐ আলো—জঙ্গল থেকে বড়-খাল পার হয়ে বাঘ যদি বেরিয়েও আসে, আলো দেখে এদিকটা ঘেঁষবে না। বাঘ বড় ভীরু, মানুষের চেয়ে অনেক বেশী।

বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু মেঘে ভরা থমথমে আকাশ। গুমট গরম, তার উপর গুরুভোজনের ফলে গগনের ঘুম হচ্ছে না। মাদুরের উপর এপাশ-ওপাশ করছে। একবারের এই খাওয়াতেই সে মজে গিয়েছে। জগার কথাটা মনে হচ্ছে : নগদানগদি তেমন না-ও যদি হয়, পেটে যা খাবে কোন জন্মে অমন খাও নি বড়দা। কথা ঠিক বটে। পেটের ধান্দায় বাঁধা ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরুনো। তা পরিবারের জন্যে না-ই হল তো নিজের পেটটা ঠেসে ভরানো যাক আপাতত। বাবুরা শহরে মজা লোটেন, আমাদের মজা দুর্গম এই বন-বাদাড়ে।

রোদ উঠবার আগে গগনের ঘুম ভাঙল। আর এদের তো দেখা যাচ্ছে রাত দুপুর এখন। কড়া রোদের মধ্যেও আলোটা জ্বলছে—রাতের অত জোরালো আলো

মিটমিটে দেখাচ্ছে এখন। গগন একা একটি প্রাণী জাগ্রত এত মানুষের আলার মধ্যে। যারা রাতের পাহারায় ছিল, তারাও কখন এসে উঠানে সারি সারি শুয়ে পড়েছে। ঘরে উঠানে ঘুমন্ত মানুষ গিজগিজ করছে। ঘরের ভিতরে ঘুমাক, সেটা কিছু অভিনব নয়। কিন্তু বাইরের রোদের ভিতর চেরা-বাঁশের প্যাটার উপরে নিঃসাড়ে পড়ে পড়ে আছে—দেখ তো নেড়েচেড়ে, ঘুমিয়ে আছে অথবা মরে গেছে কিনা!

ও জগা, ওরে বলাই—

ডেকেডুকে অন্তত দুটোকে যদি তোলা যায়। তা হলে বেরিয়ে পড়বে। ঘোরাঘুরি আছে অনেক, শলাপরামর্শ আছে। কিন্তু জাগিয়ে তোলার ব্যাপার সহজ নয় মোটেই।

প্রহর দেড়েক বেলায় একে দুয়ে আড়ামোড়া ভেঙে উঠতে লাগল। এইবার ওদের সকাল হচ্ছে। মাছের নৌকো সমস্ত রওনা করে দেবার পরে খাটনির বিরাম। সেটা যদি সন্ধ্যাবেলা বলে ধরা হয়, সকাল তবে এমনি বেলাতেই হবে। অনিরুদ্ধ উঠে বসল। চোখ মেলেই তার প্রথম কথা—কালোসোনাকে ডেকে বলছে, কুটুম্ব বাড়িতে, ডালের যোগাড় দেখিস রে কালো। বরাপোতায় চলে যা। খাঁড়ি-মুসুরি কিনে নিয়ে আয়।

কালোসোনার আলস্য ভাঙে নি। জড়ানো স্বরে বলে, গাঙ পার হব কিসে?

অনিরুদ্ধ খিঁচিয়ে উঠল: জাহাজ নিয়ে আসবে তোকে পার করার জন্যে। বলি, গামছা পরে পার হওয়া যায় না? না, বরাপোতার মানষে বলবে, চৌধুরিগঞ্জের কালোসোনা বাবু গামছা পরেছে। মান খোয়া যাবে।

বকুনি খেয়ে কালোসোনা ঠাণ্ডা। বলে, যাব—এখন কী তার! ডাল তোমার কুটুম্বর পাতে পড়লেই হল!

গগন জগা আর বলাই বেরিয়ে পড়েছে। সকালের দিকে আলার কাজকর্ম থাকে না, বিকাল থেকে আস্তেব্যস্তে শুরু হয়, সন্ধ্যার পর হুড়োহুড়ি। অনিরুদ্ধ তাই সঙ্গে যেতে চেয়েছিল: নিয়ে চললে কোথায় বড়দাকে? চল, দেখিয়ে শুনিয়ে আসি।

জগা বলে, ঘাটে যদি নৌকো পাই, জঙ্গলের ভিতরটাও ঘুরিয়ে আনব। কখন ফিরি ঠিক নেই। তুমি ম্যানেজার মানুষ—আলা ছেড়ে অতক্ষণ থাকবে কি করে?

অনিরুদ্ধকে নিরস্ত করে বাঁধের পথে তারা চলল। অনিরুদ্ধকে নেওয়া চলে না দশের মধ্যে। মতলবটা লেগে যায় তো চৌধুরিগঞ্জের স্বার্থহানি—অনিরুদ্ধ ম্যানেজার হয়ে আছে সেখানে। এদেরই নয় শুধু, যত ঘেরি এ-তল্লাটে সকলের। কাঙালির উন্নতি দেখে অনেকে এসে এই কাজে লেগেছে। কিন্তু কাঙালি আগে এসে জমিয়েছে বলেই তার মতন কেউ নয়। এই সব কথা হচ্ছিল খাল আর নদীর মোহানার কাছে সীমানার বাঁধে দাঁড়িয়ে। জগা হাত ঘুরিয়ে এপার-ওপার দেখায়। বাদাবনের ঠিক ওপার থেকেই একটানা সবুজ, তলায় শুলো আর কাদা। এ-পারে বাঁধের লাগোয়া সাদা চরের ফালি, নুন ফুটে ফুটে রয়েছে। তার পরেই ঝুপসি গাছপালা, চাঁদাকাঁটার ঝোপ। বন এপারেও—ছিটে-বন, জন্তু-জানোয়ার থাকে না—

জগা হেসে বলে, তবে চোর-ছ্যাঁচোড় বসে থাকে গাছপালার অন্ধকারে ঘাপটি মেরে। সাইতলা-সাইতলা বলছিলাম—ঐ সে জায়গা। ঐ বড় কেওড়াগাছ যেখানে। নিমাকির ভিটের উপরে কেওড়াগাছটা। খটখটে উঁচু জায়গা, দেবস্থান। বানে দুনিয়া ভেসে গেলেও ওখানে জল উঠবার হুকুম নেই। আলা তোলা যাবে ওরই আশেপাশে, দেবতার আশ্রয়ে থাকব। পছন্দ হয় কিনা বল এবারে।

গগন খুঁতখুঁত করে ঃ এইটুকু জায়গায় কী রকম ঘেরি হবে রে? ওরা যে এক এক সাগর ঘিরে রেখেছে।

বলাই বলে, ওরা কত কাল থেকে করছে- কত লোকজন, কত নৌকো। আড়তে ওদের গাদা টাকার কাজ-কারবার—

জগা বলে, আমরা হতভাগারা ওদের জাল টানি, নৌকো বাই, মাছের ঝোড়া মাথায় করে ছুটি, দোষঘাট হলে ঠেঙানি খাই, বেশি-কিছু হলে ঘাড় ধরে বের করে দেয় ঘেরির এলাকা থেকে। মানুষ এমন একজন দু-জন নয়। আর ঘেরিও শুধুমাত্র কাঙালি চক্কোত্তির একটি নয় অগুন্তি, বাদা এলাকা জুড়ে।

হাসতে হাসতে বলল, হয়ে যাক না—তখন গগন-গুরুর ঘেরিতে জুটবে এসে সকলে। টাকা না থাক, নাই বা হল মেলা জায়গাজমি, মানুষ বিস্তর পাবে বড়দা। মানুষের হিম্মৎ পাবে। আলা বেঁধে ফেল দিকি তাড়াতাড়ি এসে। আলা ঘিরে যত হতভাগা মিলবে সাদা চরের উপরে। আগে এসে যারা জমিয়েছে তারাও তো ছিল এক এক হতভাগা। বড়লোক হয়ে এখন আগের কথা ভুলে গেছে।

জগন্নাথ মতলবটা যা বলে, শিউরে উঠতে হয়। বাইরের ঠাট মেছোঘেরিরই বটে—ঘেরির মনিব গগন, কাঙালী চক্কোত্তির দোসর। আসল কাজটা কিন্তু সাধুজনের যোগ্য নয়। রামো, রামো! লেখাপড়া জানা গগন রাজী হতে চায় না।

জগা রেগে ওঠে ঃ লেখাপড়া না কলা শিখেছ বড়দা। ধর্ম-ধর্ম করে তো মুখ্যুরাই। বিদ্যেবুদ্ধি থেকেও লোকে যখন ধর্মের বুলি ছাড়ে—তক্ষুনি বুঝে নেবে, কথাবার্তা শুনে মুখ্যুর দলে ধর্মে মতি হবে, মতলব তার সেই। মুখ্যুদের দফা সারবার সুবিধা হবে বলে। অনেক দেখেশুনে বড়দা নজর খুলে গেছে। আর বুঝে নিয়েছি—বিদ্বানগুলোই হল আসল পাজি।

জায়গা পছন্দ করে চতুর্দিক ঘুরে-ফিরে দেখে তারা আলায় ফিরল। ইতিমধ্যে মুসুরির ডাল এসে গেছে বরাপাতা থেকে। এবং তৎসহ গোলআলু ও পোস্ত। সওদা করে এনে কালোসোনা পা ছড়িয়ে বসে তেল মাখছে। অনিরুদ্ধও একটু বেরিয়েছিল। জলের তোড়ে এক জায়গার বাঁধ ভাঙো-ভাঙো—মাটি দুর্লভ, ডাঙা-ডহর কেটে মাটি আনতে হবে নৌকোয় করে বয়ে। সে তো এক্ষুনি হচ্ছে না—পর পর দু-তিন সারি পাটা বসিয়ে এল জায়গাটায়। বাঁধ যদি স্যাৎ ভাঙে, মাছ বেরিয়ে যেতে পারবে না এতগুলো পাটার ফাঁক দিয়ে। আপাতত ঠেকিয়ে এল, পরে পাকাপাকি ব্যবস্থা। এই তাড়াহুড়োর মধ্যেও কুটুম্বর কথা মনে রয়েছে, ফেরার পথে পাড়া ঘুরে হাঁসের ডিম আনল কয়েকটা। কথা চলিত আছে—কুটুম্ববাড়ি গেলে যজ্ঞি, কুটুম্ব বাড়িতে এলেও যজ্ঞি। তা ধর—ডিম হবে, ডাল হবে, মাছ তো আছেই—যজ্ঞের আর খামতি রইল কোথায়? উঠানের উপর কালোসোনাকে দেখে বলে, এখনো রান্না চাপাস নি কালো?

কালোসোনা নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে বলে, চাপাব—এখন তার কি!

কতগুলো পদ হবে হিসাব করে দেখেছিস? উপর দিকে তাকিয়ে বলে, সূর্যি প্রায় মাথার উপরে। ঘড়ি থাকলে এগারোটা বারোটা বেজে যেত।

কালোসোনা আবার এক পলা তেল হাতে নিয়ে পেটে ঘষতে ঘষতে বলে, বাজুক গে। যে ক'টা বাজবার বেজে যাক, তার পরে ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডা হয়ে রসুইতে বসা যাবে।

বলতে বলতে চটে ওঠে ঃ সাত সকালে খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যারাত্রে পেট যখন চোঁ-চোঁ করবে, দেবে তখন আবার এক কাঁসর? তুমি হলে ম্যানেজার, ঠিকঠাক জবাবটা দাও,

তবে সকাল সকাল রান্না চাপায়।

জগা বলে, রেগো না কালোভাই, রান্না বেজ্ঞ্তে হবে। বড়দা মাস্টার মানুষ, টাইম-বাঁধা কাজ ওঁদের। খাওয়া ঘুম সমস্ত টাইমে চলে। একদিনের তরে এসেছেন, রাত্তিরেই আবার মাছের নৌকোয় চলে যাচ্ছেন। কষ্ট কর একটা দিন, কী আর হবে!

অতএব টাইমের মর্যাদা রেখে কালোসোনা সকাল সকাল রাঁধতে গেল। দুপুরের খাওয়াও বেশ সকাল সকাল সমাধা হল—পশ্চিমের জঙ্গলের মাথায় সূর্য তখনও জ্বলজ্বল করছে। গগনকে বিষম খাতির করল আলামুখ সকলে। মাছের নৌকো নিয়ে জগা-বলাই কাল যায় নি, আজকে যাচ্ছে। গগন সেই নৌকোয়। পথের মধ্যে তাকে নামিয়ে দেবে, রাত পোহালে হেঁটে সেখান থেকে চলে যাবে তার পাঠশালায়।

জোয়ারে ছেড়ে দিয়েছে নৌকো—অনিরুদ্ধ ম্যানেজার তখনও ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে, আবার আসবেন বড়দা। এমন ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এলে হবে না। এসে আট-দশ দিন থাকতে হবে কিন্তু এবারে।

আসবে তো বটেই। আট-দশটা দিন কেন—অনেকদিন, অনেক বছর। তখন কি এই রকম আপনি-আপনি করবে ওরা? খাতির করে খাওয়াবে? দাঁতে চিবাতে চাইবে বাগের মধ্যে যদি পেয়ে যায়।

মোহানার কাছে জগা একটুকু নৌকো রাখল : ঐ দেখে নাও বড়দা, সাইতলার কেওড়াগাছ। নিমকির ভিটে ওর নিচে। দেবস্থান। বানে দুনিয়া ভেসে গেলেও ওখানে জল উঠবার হুকুম নেই।

বাইরের লোক আছে নৌকোর, আর বেশী খুলে বলে না। জলের উপর থেকে জায়গাটা ভাল দেখা যাচ্ছে। আলা বাঁধবে ঐ নিমকির ভিটের উপর। আলা মানে আলয়—আলার পাশে থাকবে নিজের ঘর। বিনি-বউ আসবে, পোড়ারমুখী বোন চারু আসবে। বন কেটে বসত-ঘর। হেই ভগবান, সে ঘর ফেলে আর যেন কোথাও চলে যেতে না হয়।

চৌদ্দ

গাঙের নাম করালী। ভাটার সময়টা নিতান্ত লিকলিকে চেহারা। নিকানো আঙিনার মত লোনা কাদার উপর গাঙ যেন ঘুমিয়ে পড়ে। জোয়ারবেলা সেই গাঙের চেহারাটা দেখ। ভয় করবে। পাশখালি জলে ভরভরতি। জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি অবধি জল। এপারে ওপারে লোকে যত বাঁধ দিয়েছে, ছলাৎ-ছলাৎ করে থাবড়া মারে তার গায়ে। বাঁধ কমজোরি হল তো ঘেরির ভিতর জল ঢুকে পড়বে।

করালী থেকে খাল বেরিয়েছে। মোহানায় এই জায়গায় নুন তৈরি হত। নিমকির মোহানা বলে তাই কেউ কেউ। খালের ওপারের বড়-বাদায় জন্তু-জানোয়ারের বসতি। এপারে চর, চরের লাগোয়া ছিটে-জঙ্গল। খলসি কাঁকড়া চাঁদাকাটা গেঁয়ো এই সমস্ত গাছ। তারই প্রান্তে একটুকু ডাঙার উপরে বড় কেওড়াগাছের নিচে নিমকির লোকে সেকালে ঘর বানিয়েছিল। তারই ভিটে ঐ উঁচু ডাঙা। সেই ডাঙায় হাঁড়িকুড়ি-ভাঙা চাড়া ছড়ানো বিস্তর। কেওড়াগাছও সম্ভবত সেই আমলের। নৌকোয় যেতে দু চার বাঁক আগে থেকে গাছের মাথা নজরে আসে। মাঝি আঙুল তুলে নিশানা করে : ঐ যে, এসে গেলাম সাইতলা। ঐ সাইতলা থেকে হতে হতে চর ও জঙ্গলের সমস্ত জায়গাটা এখন হয়ে গেছে সাইতলা। খালের নাম সাইতলার খাল। কিছু দূরে চৌধুরি-ঘেরির

বাঁধের গায়ে গায়ে বাগদি-তিওর-কাওরা-মুনোয়া ঘর ঘেঁষে আছে, দিব্যি এক গাঁয়ের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারও নাম সাঁইতলা।

কাঙালি চক্কোত্তি জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়ে মেছোঘেরি করলেন। বাঁধ দিলেন কয়ালীর কুল ঘেঁষে। ডবল করে বাঁধ দিলেন—জলের তোড়ে একটা ভেঙে যায় তো পিছনের বাঁধ থাকবে, ঘেরির মাছ বেরুতে পারবে না। মেছোঘেরির পাশে অপ্রয়োজনীয় ভিটের ডাঙাটুকু বাঁধের বাইরে রইল। দেবস্থান করবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু বড়লোক হয়ে ফুলতলায় ঘরবাড়ি বানিয়ে সেখানকার বাসিন্দা হয়ে যাওয়ায় দেবস্থানের মতলব চাপা পড়ে যায়। কোথা থেকে এক সাধু এসে আস্তানা করলেন কেওড়াগাছের নিচে। সাধনভজন হত। বাদায় যাতায়াতের সময় নৌকো বেঁধে মাঝিমাল্লারা সিকিটা দুয়ানিটা প্রণামী রেখে সাধুর আশীর্বাদ নিয়ে যেত। কিন্তু বাঘে মুখে করে বোধ-করি সাধনোচিত ধামেই নিয়ে গেল সাধুকে এক রাত্রে। সাধু বা সাঁইয়ের আসন বলে সাঁইতলা নাম।

ম্যানেজার অনিরুদ্ধ যাবার সময় বলেছিল, আবার আসবেন বড়দা। এমন ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এলে হবে না, আট-দশ দিন থাকতে হবে এবারে এসে। যা চেয়েছিল তাই—এসে পড়ল গগন সত্যি সত্যি। আট-দশটা দিন কেন—থাকবে অনেকদিন, অনেক বছর। অতএব চুকিয়ে বুকিয়ে আসতে মল বয়ারখোলার ওদিক-টায়। মাঘ মাস অবধি দেরি হল সেই কারণে। বাড়ি বাড়ি তখন ক্ষেতের ধান উঠে গেছে, বয়ারখোলায় আবার সবাই বড়লোক। গগন-গুরুর গোয়াল না তো নতুন গুরু নিয়ে আসবে তারা—গোলা-আউড়িতে ধান বোঝাই, এখন কেউ পরোয়া করে না। ভাত থাকলে কাকের কোন অভাব আছে? যার কাছে যে মাইনে পাওনা ত্রৈলোক্য মোড়ল মধ্যবর্তী থেকে সমস্ত মিটিয়ে দিল। কিছু বেশীও ধরে দিল—বর্ষার সময়টা গুরুমশায় বড্ড কষ্ট পেয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ।

লেখাপড়া-জানা মানুষ গগন, তায় উকিল ভবসিন্ধু গণের বাড়ি কিছুদিন থেকে এসেছে। অতএব উপরের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে হুট করে এসে পড়তে পারে না। চৌধুরিদের বাড়ি এবং সদর-কাছারি ফুলতলা। আধা-শহর জায়গা। রেল আছে, ইচ্ছে হল তো কলকাতায় রওনা হও রেলগাড়ি চেপে। অথবা তরতর বাদার দিকে নেমে যাও নৌকোয়। ফুলতলায় সব চেয়ে বড় বাড়ি মেছো-চক্কোত্তির। আরে দূর, কী বললাম—মেছো-চক্কোত্তি বললে তো ক্ষেপে যাবেন এখনকার চৌধুরি-বাবুরা। ও নাম ছিল প্রথম যখন ব্যবসায়ের পত্তন হয়, কাঙালি যখন নিজ হাতে বোঠে বেয়ে মেছোনৌকো নিয়ে গাঙ-খাল করে বেড়াতেন। মেছো-চক্কোত্তি বলত তাঁকে সবাই। মেছো বিশেষণটা জুড়ে যাওয়ায় চক্কোত্তি উপাধিটাও দুষ্য হয়ে গেছে এখন। চক্কোত্তি ছেড়ে চৌধুরি হয়েছেন হালের বাবুরা। এমন কি কাঙালি নামটার মধ্যে সেকেলে দারিদ্র্যের গন্ধ—ঐ নাম কদাপি উচ্চারণ করো না বাবুদের সামনে।

বাদায় যাবার আগে গগন ফুলতলায় চৌধুরিবাড়ি গিয়ে হাজির হল : ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

পড়ে গেছে তহশিলদার গোপাল ভরদ্বাজের সামনে। গোপাল বলেন, উটকো লোকের সঙ্গে বাবুর দেখা হয় না। দরকারটা কি, বল আগে শুনি।

সমস্ত শুনে নিয়ে বললেন, বুদ্ধি ঠাউরেছ ভালই। বসো দাস মশায়। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে নেই। ঐ একটুকু ছিটে-জঙ্গল—বাঘ, অবধি গিয়ে পোষাতে

পারবে? আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে নাও, আমি ঠিকঠাক করে দেব।

গগন কাতর হয়ে বলে, কী দরের মানুষ আমি চেহারায় মালুম পাচ্ছেন। যার নেই মুলধন, সেই আসে বাদাবন। গায়ের এই জামাটা আগে কামিজ ছিল—হাতা ছিঁড়ে গিয়ে এখন হাত-কাটা ফতুয়ায় দাঁড়িয়েছে। পরনে এই ছেঁড়া-ন্যাকড়া—

লাটবেলাট কে তোমায় বলছে বাপু? ছোটবাবু অবধি খোঁজ করছিলে—তাই তো বলি, ষষ্ঠীপুজোর মুরোদ নেই, দুর্গাপুজো তোলার বাধ। ছেঁড়া-ন্যাকড়া থাকে তারই এক চিলতে দিয়ে যাও, সলতে পাকাব। পরে যেদিন শাল-দোশালা হবে, তারই একখানা গলায় জড়িয়ে দিও। দেওয়া তো একদিনে ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

হি-হি করে খানিকটা হেসে নিয়ে হঠাৎ হাসি থামিয়ে গোপাল বললেন, ছোটবাবুর নজরানা দশ আর এদিককার আমলান-খরচা কুড়ি—

তিরিশ? আরে সর্বনাশ, বার দশেক বিক্রি করে দেখুন আমায়, তাতেও তিরিশ উঠবে না।

ছোটবাবু অনুকূল চৌধুরির কাছে গোপাল গিয়ে বলেন, হুজুর, আমাদের এক নম্বর ঘেরির বাইরে বন কেটে নতুন ঘেরি বানাবে বলছে। গরুগিরি করে খেত, বাঁধ বাঁধার মজাটা জানে না। এক কোটালে বাঁধের সমস্ত মাটি ধুয়ে সাফ হয়ে যাবে। কাটিঘায়ে প্রাণটা দেবে, কিংবা বাঘের পেটে যাবে। সাধু-মানুষ মন্তোর দিয়ে রুখতে পারলেন না, সেখানে ঐ লোক যাচ্ছে সাউখুরি করতে।

আরও গলা নামিয়ে বলেন, আমাদের পক্ষে ভালই। বনের এক-কাটা হয়ে থাকবে, ঘেরিটাও চিহ্নিত হয়ে যাবে। আখেরের কাজে আসবে।

অনুকূল বলেন, যা করে করুক গে। কিন্তু লেখাপড়ার মধ্যে যাচ্ছি নে।

বটেই তো! গণ্ডগোল বাঁধিয়ে গরমেণ্টো শেষটা খেসারতের দাবি না তোলে, সেটা দেখতে হবে বইকি!

ছোটবাবু এসে দাঁড়ালে গগন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে পদতলে পাঁচ টাকার নোট একখানা রাখল। গোপালের আমলান-খরচার কন্দুর কি হল, প্রকাশ নেই।

সইতলার সত্যি মালিক কে, ঠিকঠাক বলা মুশকিল। কাঙালি চক্কোত্তি যখন বন্দোবস্ত নেন, নির্মাকর ভিটেটুকু ছাড়া বাকি সমস্ত গাঙের নিচে। চর পড়ে গিয়ে তার পরে ডাঙা বেরুল। জঙ্গল ঢেকে উঠল সেখানে। গাঙ ক্রমশ দূরে গিয়ে পড়েছে, কোটালের সময় ছাড়া বাঁধের গোড়ায় জল পেঁছায় না। দু-সারি বাঁধ নিরর্থক এখন। এই চরের উপর ভেড়ি বেঁধে গগন মেছোঘেরি বানাবে। চৌধুরিরা বাঁধ দিয়ে সীমানা ঘিরে নিয়েছিলেন, আর গাঙের মালিক হলেন খুদ গবর্নমেণ্ট। নতুন চর কার ভাগে পড়বে? চৌধুরির না গবর্নমেণ্টের—বুঝুন ওঁরা মামলা-মোকদ্দমা ও লাঠিবাজি করে। তত দিন হাত কোলে করে বসে থাকা চলে না। গগন তো ছোটবাবুকে বলে কয়ে দখল নিয়ে বসল। দখলই হল স্বত্বের বারোআনা—আইনে সেই রকম বলে। একবার চেপে বসতে পারলে, ব্যস, ওঠাবে কার বাপের সাধ্য?

তাই হয়েছে। চরের কিনারে ঝাঁকড়ামাকড়া গেঁয়োর শিকড়ের সঙ্গে ডিঙি এনে বাঁধল। ডিঙি জগন্নাথের। কিনেছে না আর কোন কায়দায় পেয়েছে—ওসব গোলমেলে কথা জিজ্ঞাসা কোর না। মোটের উপর, এই ডিঙির সম্বলে সে বাদার কাজকর্ম করে বেড়ায়। পোষা ঘোড়ার মত তার পোষ-মানা ডিঙি। বনকরের বাবুদের চোখের সামনে দিয়ে হাউইবাজির মতন সাঁ করে বেরিয়ে যাবে, অথবা ইঁদুরের

মস্ত জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়বে, ডিঙি যেন আপনা হতে তা খুঁজতে পারে। সেই ডিঙি সাঁইতলায় এনে বাঁধল। বাদার কাজে যাচ্ছে না আপাতত। সে হোক গে, এ-ও এক কাজ বটে তো—নতুন জায়গায় বড়দাকে নিয়ে এল, খানিকটা তার স্থিতি করে দেওয়া।

কাজ অনেক—জঙ্গল কাটা, মাটি ভেড়ি বেঁধে চর ঘিরে ফেলা, আলা বানানো। সমস্ত শীতকালের ভিতরে। বর্ষা নামবার আগে তো নিশ্চয়ই—চারিদিক ডুবে গিয়ে সারা অঞ্চলে তখন এক ঝুড়ি মাটি মিলবে না। চৈত্র-মাসেরও আগে—ষাঁড়াষাঁড়ি বানের আগে বাঁধের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। লোক লাগাবে বেশী করে।

বেওয়ারিশ এক চালাঘর আছে পাড়ার একদিকে। এমন অনেক পড়ে থাকে বাদা অঞ্চলে। যে লোক বেঁধেছিল, তার নাম পচা। সুবিধা পেয়ে সে অন্য কোথাও সরেছে। লোকে বলে এক স্ত্রীলোকের টানে। ঘরের মায়া করে বাদার মানুষ এক জায়গায় পড়ে থাকে না। মায়া করার বস্তুও নয় এই সব ঘর। খুঁটির উপরে দু'খানা মাত্র চাল। সেই ঢের—আলাঘর যত দিন না হচ্ছে সকলে মিলে সেখানে গিয়ে উঠেছে। শীতকাল বলে তিনদিকে গোলপাতার বেড়া দিয়ে নিলে, চালের উপরেও নতুন গোলপাতা ফেলল কয়েকটা। দিনমানে কাজেকর্মে বাইরে বাইরে থাকে, রান্নাবান্নাও ফাঁকার উপর। রাত হলে কেউ ডিঙিতে, কেউ বা চালাঘরে ঢুকে পড়ে। নতুন এসে গগনের ভয়-ভয় করে, বিশেষ সাধুবাবার ঐ পরিণাম শুনে। সাধু হলেও বাঘে রেহাই করল না। শুকনো কাঠকুটো জড় করে উঠানের উপর আগুন ধরিয়ে দেয়, আগুন জ্বলে সারারাত্রি। দু-রকমের কাজ হয়—আগুনের তাপে শীত কম লাগে, আর আগুন দেখে ভয় পেয়ে খালপারে বাদার জন্তুজানোয়ার এ-মুখে এগোয় না।

নিমাকির ভিটে দেবতার নামে আছে অনেক কাল থেকে, দেবস্থানই হোক ওখানে। গগনদের গাঁয়ের জাগ্রত রক্ষাকালী ঠাকরুন গ্রাম রক্ষা করে আসছেন। চারু আর বিনি-বউকে তাঁর পাদপদ্মে সঁপে রেখে এসেছে। এখানেও এরা কালীমায়ের দৃষ্টির উপর থাকবে। বট-অশ্বত্থ এ তল্লাটে নেই—ভিটের কেওড়া-গাছতলাই হোক তবে কালীতলা। ঐ কেওড়াতলায় ভক্তিভরে প্রণাম করে কিছু ছোঁচ-বাতাসা রেখে এসেছে। সুদিন আসে তো তখন নিরামিষ বাতাসা-ভোগ নয়, ঢাকঢোল বাজিয়ে পাঁঠা বলি দিয়ে তোমার পুজোর বন্দোবস্ত হবে মা-জননী।

আলার জায়গাও ঠিক হল। খালের কিনারে পাড়ার কাছাকাছি—চৌধুরির সীমানা পার হয়ে এসেই। মানুষের কাছে থাকতে হয়, দায়েবেদায়ে মানুষ কাজে লাগে। আবার জলের কাছে থাকতে হয়, মালপত্র বওয়াবয়ির তাতে কম হাঙ্গামা। আলা তোলার কাজ হচ্ছে আস্তেব্যস্তে। ডিঙি নিয়ে জগা আর বলাই বাদায় ঢুকে গরানের ছিটে ও গোলপাতা কেটে আনল। গরানের ছিটে চেঁচে-ছুলে রুয়ো বানাচ্ছে। বন কাটতে লেগে গেছে অনেকে, বারো-চোদ্দ খানা কুড়াল পড়ছে। কুড়ালের কোপে মড়মড় শব্দে গাছপালা ভুঁয়ে পড়ে। সমারোহ ব্যাপার। শুধু সাঁইতলা বলে কেন, অঞ্চল জুড়ে সাড়া পড়ে গেছে। ঘেরি হচ্ছে একটা নতুন। বাদার কাঠুরে-বাউলেরা খালের পথে যেতে আসতে কাণ্ডকারখানা দেখে। দাঁড় উঁচু বাওয়া বন্ধ করে দেখে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে।

উপর থেকে গগন হয়তো ডাকল, এস ভাই। নৌকো ধরে বসে যাও একটুখানি।

না দাদা, বন্ড তাড়া। আর এক দিন।

অথবা, পাড়েই ধরল নৌকো। কাদা ভেঙে উপরে উঠে এল। এই বাদাজায়গা জনপদের মত নয়। নতুন লোক দেখলে স্ফূর্তি হয় হাতের মুঠোয় স্বর্গ পাওয়ার মত। আলাপ-পরিচয় করে জমিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

বসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তামাক খাও। কি তামাক—বড়-তামাক চলবে তো?

গাঁজা নামটা যেখানে সেখানে বলা ঠিক নয়। ঘুরিয়ে এরা বড়-তামাক বলে। সেই লোকটার গাঁজা এখন পছন্দ নয়। ঘাড় নেড়ে বলে, আরে দাদা, যেমন বাস বেরিয়েছে তোমাদের ছোট-তামাকই তো বড়র বেহদ্দ।

খাটুনির মানুষেরা খাটাখাটনি করে। আর গুলতানি করে বসে বসে অন্য একটা দল। চালাঘরের মালিক পচাও একদিন এসে পড়ল কোথা থেকে। কানাকানি চলে, স্ত্রীলোকটা নাকি ভেগে পড়েছে। বাদা-অঞ্চলে হামেশাই এমন ঘটে।

তোমার ঘরে আস্তানা নিয়েছি পচা।

আমাকেও নিয়ে নাও তবে।

পচা রয়ে গেল। আরও কত মানুষের আনাগোনা নতুন চরের উপর। মানুষ না লক্ষ্মী কেউ হাসে: মাথা খারাপ এদের। একরত্তি চরের উপর কী ঘেরী বানাবে, আর ক'টা মাছ জন্মাবে! আবার কেউ বলে, হেসো না, ছোট থেকে বড়। কাঙালি চক্কোত্তির কোন ধনসম্পত্তি ছিল গোড়ার দিকে? ব্যবসা না-ই জমল, একটা ওঠা-বসার জায়গা তো হবে খালের মুখটায়! মা-কালীর থান হয়ে তো রইল!

ঘেরি বাঁধা হল। এবং ঘেরির কাজের যে রকম বিধি—চৈত্রমাসে বানের জল তুলে দিল ঘেরির খোলে। জলের সঙ্গে বালির মতন মাছের ডিম। ডিম ফুটে মাছ জন্মাবে, মাছ বড় হবে, সেই মাছ ধরে ধরে বিক্রি। ব্যবসাটা হল এই। জমতে কিছু সময় লাগে। অথচ কী আশ্চর্য, আষাঢ় পড়তে না পড়তে নতুন আলঘর বানানোর আগেই ভাঙা-চালার ভিতর টাকা বাজানোর টুংটাং আওয়াজ। শেষরাত্রে গগন দাস খেরো-বাঁধা খাতা খুলে রেজগি-পয়সা থাকে থাকে সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। বলি, কী ব্যাপার—আসল বাণিজ্যটা কি, ভাঙো দিকি একটু।

সমস্তটা দিন তুমি তাক করে আছ। কিছুই নয়। অলস নিষ্কর্মা কতকগুলো মানুষ জঙ্গল-কাটা চরের উপর আড্ডা দিচ্ছে, অথবা ঘুমুচ্ছে ছায়াচ্ছন্ন কালীতলায় পড়ে পড়ে। ভাত জোটায় কেমন করে, হ্যাঁ? আর সে ভাতও সামান্য ব্যাপার নয়—আহারের সময় একদিন নজর করে দেখো, বাড়াভাত বেড়ালে ডিঙিয়ে এপার-ওপার করতে পারে না।

দিনমানে এই। রাত্রিবেলা আলাদা এক চেহারা। যত রাত হয়, মানুষগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ঝোপে-জঙ্গলে লুকানো খেপলাজাল নিয়ে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে যেন পাখি হয়ে কে কোন্ দিকে সরে পড়ল। পাড়ার ভিতর থেকেও বেরিয়ে পড়ছে অমনি। যত অন্ধকার, ততই মজা। মরদগুলোর দু-চোখের মণি ধকধক করে জ্বলে যেন। অন্ধকার-সমুদ্রে ডুব-সাঁতার দিয়ে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওরা তো বেরিয়ে গেছে। আরও অনেকক্ষণ পরে মোটাসোটা চিক্কন চেহারার তিন-চারটে মানুষ কোথা হতে এসে মাদুর বিছিয়ে বসল। মাছের পাইকার। বৃষ্টিবাদলা হল তো চালাঘরের ভিতরে, না হলে খাল-ধারে নতুন বাঁধের উপর। তাড়াহুড়ো নেই—গল্পগুজব হচ্ছে, কল্কে ঘুরছে হাতে হাতে। আকাশে পোহাতি-তারা উঠল, ফিরে আসে এইবার মাছ-মারা লোকগুলো। মাছ মেরে নিয়ে আসে।

কেউ আনে খাল্‌ইতে, কেউ ডালায় ফেলে। যে জালে মাছ ধরেছে, কেউ বা সেই জালের সঙ্গেই জড়িয়ে নিয়ে আসে মাছ। গাছগাছালির আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল, কিংবা গাঙের খোল থেকে মাথা তুলে উঁচু বাঁধের উপর এসে দাঁড়াল। আগে ছিল না বুঝি এরা কেউ—আকাশ থেকে পড়ে গেল অথবা পরীতে উড়িয়ে এনে ফেলল, এমনিধারা মনে হবে।

মাছ-ধরা ব্যাপারটা যেন লুকোচুরি খেলা ঘেরিওয়ালাদের সঙ্গে। চৌধুরিগঞ্জের সঙ্গে বিশেষ করে। পাশাপাশি পাঁচটা ঘেরি ওঁদের—অকূল সমুদ্রের মালিক হয়ে বসে আছেন। অন্যলোকের ছিটেছাটা এদিকে সেদিকে, ছোট ব্যাপার নিতান্তই। ছোট ঘেরির মালিক হয়তো বা নিজে আলায় চেপে বসে আছে, দরকার মত নিজের হাতেই মাছ বাছাই করে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ওজনে বসে গেল! পরের উপর নির্ভর নয় বলে বাড়াবাড়ি রকমের পাহারা ঐ সব জায়গায়। মুশকিলটা বেশী যেখানে। গাঙ-খাল গবর্নমেণ্টের—জাল ফেলার কড়াকড়ি নেই। তবু মানুষ সেদিকে বড় ঘেঁষে না। অনেক খেটে অনেকক্ষণ জাল ফেলাফেলি করে তবে হয়তো যৎসামান্য উঠল। আর ঘেরির ভিতরে, বলা যায়, জিইয়ে-রাখা মাছ। জো-সো করে ফেলে দিলেই হল। বিফলে যাবে না। জাল টেনে তোলা দায় হয় কখনো-সখনো, মাছের ভারে জাল ছেঁড়ে।

চৌধুরিগঞ্জের আলায় সেই তো এক রাত্রির ব্যাপার দেখেছিলে। মাছের নৌকো রওনা করে দিয়ে লোকজনের ছুটি। দু-চার জনে ঘোরাঘুরি করে জলের উপর একটু নজর রাখে, এইমাত্র। গগনের দল ঘাঁটি করার পরে বন্দোবস্ত পালটে গেছে। রাত জাগতে হচ্ছে এখন দস্তুরমত, নানান দল হয়ে ঘেরিগুলো পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে। কাদা মেখে আছাড় খেয়ে বাঁধের উপর ঘুরছে কখনো। কখনো বা শালতি-ডোঙার জলের উপরে।

ওই—ওই দেখ এক বেটা শয়তান—

সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে পাহারার শালতি সেইখানে এসে পড়ল। কাকস্য পরিবেদনা। গাছের ফাঁকে ঘোলাটে জ্যোৎস্না পড়ে মনে হয়, একটা মানুষ লুকিয়ে আছে। সে এমন যে জায়গাটা পেঁছে শালতি থেকে নেমে এদিক-সেদিক ঘুরে দেখেও সন্দেহ যেতে চায় না। রাত দুপুরে জান কবুল করে ধাক্কি ঠেলা, সমস্ত বাজে হয়ে গেল। এর জন্যেও রাগ হচ্ছে মাছ-মারার উপর। কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে বসে থেকে এদের নিয়ে যেন খেলাচ্ছে।

সেটা নিতান্ত মিছা নয়, তক্কেতক্কে আছে মাছ-মারারাও। বেসামাল হয়েছ কি চমক লাগবে জাল ফেলার শব্দে। ছুটোছুটি করে পেঁছবার আগেই খেওন তুলে সরে পড়েছে। মাঝে মাঝে দ্বীপের মত থাকার জুত হয়েছে তাদের। কোন্ দ্বীপের জঙ্গলে ঘাপটি মেরে আছে, বুঝবে সেটা কেমন করে? পাশ কাটিয়ে হয়তো বা একেবারে দু হাতের ভিতর দিয়ে চলে গেলে—গেছ বেশ খানিকটা—নিঃসীম স্তব্ধতার মধ্যে ঝপ্‌পাস করে আওয়াজ। আওয়াজের আন্দাজে ফিরে গিয়ে হয়তো দেখবে, মাছসুদ্ধ জাল হাতে সেই লোক তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে সীমানার বাঁধের নিচে গিয়ে। সীমানার ওপার গেলে আর কিছু করবার নেই—কলা দেখাবে ঐখানটা দাঁড়িয়ে। বাদা অঞ্চলের অলিখিত আইন এই। মানুষ খুন করেও এলাকার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে বোধকরি গায়ে হাত দেওয়া চলবে না।

রাত দুপুরে হুল্লোড় এমনি। চোরের সঙ্গে গৃহস্থ পারে কখনো? অত বড়

জলাভূমির অন্ধিসন্ধি নখদর্পণে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। আর ও-পক্ষ ওৎ পেতে রয়েছে—কোন একখানে পাহারার কমজোরি দেখেছে কি অমনি গিয়ে পড়ল। ভোর-রাত্রি অবধি এমনি। হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল। পাহারাদাররা হাই তুলে আলায় ফিরল, শোবে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে। মাছ-মারারাও ফিরে আসে—গগন ও ব্যাপারীরা লণ্ঠন জেবলে পথ তাকিয়ে আছে তাদের। দর কষাকষি ব্যাপারীদের সঙ্গে। মোহানার মুখে জগা-বলাই-পচা-ডিঙি নিয়ে আছে। জোয়ার এসে গেল—অস্থির ডিঙি মাথা ঝাঁকাঝাঁকি করছে। টানের চোটে ডিঙি-বাঁধা দড়ি না ছিঁড়ে যায়। গোন বয়ে যায়, তাড়াতাড়ি কর হে তোমরা।—খুব তাড়াতাড়ি।

মাছ মারতে যে ক'জন বেরিয়েছিল, সবাই সব দিন যে ভরা জাল নিয়ে ফিরবে এমন কথা নয়। ঘেরির পাহারাদারে ধরে ফেলেছে হাতেনাতে। চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একটা দিন তো বটে। ধরতে পারলে শাস্তিটা বড় বিষম। শাস্তি বাদারাজ্যের বিধান অনুযায়ী। মারধোর নয়, থানা-পুলিস নয়—জালগাছি এবং সেদিনের মাছ কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে। এদের কিন্তু আগের দুটো পছন্দ। মার দিলে গায়ের উপর দিয়ে গেল—একটু না হয় গা-গতর ব্যথা হবে, আবার কি! থানা-পুলিস হলে আরও ভাল—পাকাঘরে রেখে ভরপেট খাওয়াবে। এই সমস্ত না হয়ে পেটের ভাত টান। জরিমানার পয়সা চুকিয়ে দিলে তবে জাল ফেরত মিলবে। রোজগার বন্ধ সেই ক'দিন। জরিমানার পয়সাই বা আসে কোথা থেকে? ধারধোর নেবে—কিন্তু বাদাবনে ক'টা খাঞ্জে-খাঁ বসত করে শুনি, নিজের খরচ-খরচা চালিয়ে তার উপর অন্যের সামাল দিতে পারে?

অতএব উপোস দাও, এবং হাত পেতে বেড়াও এর-তার কাছে। আগে ছিল এই ব্যাপার। গগন এসে পড়ায় দুর্ভোগের শেষ হয়েছে। গিয়ে মুখের কথাটি বল, খাতায় নাম লিখে সঙ্গে সঙ্গে অমনি জরিমানার পয়সা দিয়ে দেবে। জাল ফেরত এনে খুড়ো-হালদারের নাম নিয়ে আবার রুজিরোজগারে লেগে যাও। মাছ এনে তুলবে অবশ্য সইতলায়—গগন যে খাতা খুলেছে, সেখানে। তুলবে নিজেরই গরজে এমন দরদাম কে দেবে? কিনবার খদ্দেরই বা কোথা? নিয়মমাফিক বৃত্তির সঙ্গে এই আগাম-দেওয়া জরিমানার পয়সাও অল্পসল্প করে কেটে নেয়। মাছ-মারার গায়ে লাগে না।

বুদ্ধিটা দিয়েছিল জগা: ঘেরির মাছ বাড়তে লাগুক, কিন্তু ততদিনের উপায় কি বড়দা? চৌধুরিরা সিন্দুক খুলে রমারম খরচ করে। তোমার তো গুরুগিরির ঐ ক'টা টাকা সম্বল। এক কায়দা বলি, শোন। এই পথ ধর—

আচ্ছা মাথা বটে! পেটে বিদ্যে থাকলে জগা দারোগা-হাকিম হয়ে যেত। গাঙ-খালের মুখটায় ভাল একটু জায়গা করে বসা কেবল। ভোরের সময় কিছু দাদন ছেড়ে সন্ধ্যাবেলা ষোল আনা উসুল করে নেওয়া। আপাতত অস্থায়ী চালাঘরেই শুরু করে দিল। জমে আসছে দিব্যি। আলাঘর বাঁধা হয়ে গিয়ে এর মুখে ওর মুখে দুরদুরন্তর চাউর হয়ে পড়লে আরও জমবে। মেছোঘেরিতে আগে লোকে জাল ফেলত খাবার মাছের লোভে, বিক্রির মতলবে নয়। বিক্রি করতে হবে মানবেলায় নিয়ে গিয়ে—যেখানে লোকে পয়সা দিয়ে মাছ কেনে। অনেক দূরের ফুলতলা না হোক, কুমির-মারি অন্তত পক্ষে। দুটো-চারটে মাছ নিয়ে নৌকো করে গিয়ে খরচা পোষাবে কেন? ঘেরিওয়ালাদেরও মাথাব্যথা ছিল না এই সব মাছ-মারা নিয়ে। পেটে আর কতই বা খাবে! দু-পাঁচবার হৈ-হৈ করে পাহারাদারে রীতি রক্ষা করত। গগন খাতা খোলবার

পরে সেই শখের মাছ মারা এখন পুরোদস্তুর ব্যবসা। মাছ মারার মানুষও দিনকে-দিন বাড়ছে। সামাল-সামাল পড়ে গেছে সব ঘেরিতে। গালি-গালাজ করে গগনের নামে। শুধু গালি-গালাজে শোধ যাবে বলেও মনে হয় না, লাঠিসোটা নিয়ে এসে পড়তে পারে। রোগা টিমটিমে পচা, চিঁ-চিঁ করে কথা বলে। ডিঙি বাওয়ার কাজে রোজ নগদ পয়সা পেয়ে তারও প্রতাপ খুব। সে তড়পায়ঃ আসুক তাই। টের পেয়ে যাবে আদায় কেমন ঝাঁজ। আমরাও জানি লাঠি ধরতে। লাঠি কেন, বল্লম-সড়কি-কাতা ধরব।

জগা আরও রোখ বাড়িয়ে দেয়ঃ আর দেশী-বন্দুক। জালের কাঠি ভরে নিয়ে মার এক দেওড়ে, মানুষ কোন্ ছার—বড় বড় কুমির চার-পা মেলে চিত হয়ে পড়ে। বিলাতি ফঙবেনে বন্দুক কি করবে দেশী-বন্দুকের কাছে? কামারের কাছ থেকে বন্দুক গড়িয়ে আনব—অ্যাঁ, পচা?

গোড়ায় খোশামোদ করে ব্যাপারী আনতে হল। হতে হতে এখন চার-পাঁচ জন এসে জোটে। নিলামের মতন ডাকাডাকি হয়। এক সিকি—দেড় সিকি - যাকগে বাপু, দুই। তাতেও ছাড়বি নে? পায়রা-চাঁদা—তা কি হয়েছে? চাঁদি—রুপোও এত দামে বিকোয় না রে! আর আধখানা উঠতে পারি—এই শেষ। দিবি? অন্য এক পাশে হয়তো নিঃশব্দ ছিল এতক্ষণ। পুরোপুরি তিন বলে মাছগলো নিজের ঝোড়ায় সে ঢেলে ফেলল। গগন খাতায় লিখে নিচ্ছে। প্রতি ব্যাপারীর আলাদা ঝোড়া। দরদামে পটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মাছ ঝোড়ায় ঢেলে নেয়। সমস্ত ঝোড়া তুলে ফেল এবার ডিঙিতে। তাড়াতাড়ি, সময় বয়ে যায়। ব্যাপারীরা কেউ কেউ ডিঙিতে উঠে পড়ল। এখন আর পাল্লাপাল্লি নেই। এ ওকে বিড়ি দিচ্ছে, পান খাওয়াচ্ছে—গলাগলি ভাব। যত কেনাবেচা হবে, টাকা-প্রতি এক পয়সা বৃত্তি গগনের। হিসাব করে দেখ, কতয় দাঁড়াল। ডাক্তারি ও গুরুগিরির চেয়ে ভাল। খাতা আর সইতলার ঘেরি যত জমবে, তত আরো বেশী ভাল হবে।

বেচাকেনা সারা হতে পুবের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। সাঁ-সাঁ করে জল কেটে তীরের মতন ছুটেছে ডিঙি। জোরে—আরও জোরে। বারো-বেঁকির খাল—বাঁকের সংখ্যা বারো, নিতান্তই বিনয় বশে বলা হয়েছে। গুণতি করলে পঁচিশ-ত্রিশের কম হবে না। কাঁচামালের কাজকারবার—যত তাড়াতাড়ি নিয়ে পেঁছানো যায়। যে ঝোড়োখানায় দুটো টাকার কমে হাত ছোঁয়ানো যাবে না, পেঁছুতে দু-ঘণ্টা দেরি হয়ে যাক—আট আনা পয়সা দিয়েও নিতে চাইবে না কেউ তখন। মাছ হল এমনি বস্তু। এতগুলো বাঁক মেরে ঠিক ঠিক সময়ে মাল পেঁছে দেওয়া জগাই পারে শুধু। তাই তার খোশামুদি। তবু তো যাচ্ছে, বড় ঘেরিওয়ালাদের মতো ফুলতলার বাজার অবধি নয়—তার অর্ধেক পথ কুমিরমারি। মনোহরের বাড়ি থেকে পালিয়ে গগন যেখানে ডাক্তার হয়ে বসেছিল। কুমিরমারির অনেক উন্নতি—নতুন রাস্তার আগাগোড়া মাটি পড়ে গেছে। রাস্তা আরও খানিকটা টেনে শেষ হবে চৌধুরিগঞ্জ গিয়ে। খাল বাঁধা হচ্ছে দু-তিনটা। যেখানে বড় কাদা, ঝামা-ইটের খোয়া ফেলা হবে সে সব জায়গায়। বছরের কোন সময়ে মানুষ-জনের চলতে যাতে অসুবিধা না হয়। অনুকূল চৌধুরির তদ্বিরে সমস্ত হচ্ছে—ঠিকাদার তিনি। মাটি-কাটা কুলি বিস্তর এসে পড়েছে বাইরে থেকে, কুলি খাটানোর বাবুরা এসেছে। গদাধরের হোটেল ফেঁপে উঠছে দিনকে দিন—গদাধর নিজে ছাড়াও আলাদা এক রসুয়ে-বামুন রেখেছে, আর চাকর দু-জন। জগার ডিঙি ঘাটে লাগতে না লাগতে নিকারিরা এসে নগদ পয়সায় সমস্ত

মাছ কিনে নেয়। খুচরো বিক্রি তাদের—কতক বেচে ওখানেই গঞ্জের উপর বসে। কতক বা ডালিতে ভরে মাথায় বয়ে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তরের হাটে। ফুলতলার তুলনায় দর অবশ্য সস্তা। কিন্তু শেষ রাতে বেরিয়ে ফুলতলা পেঁছুতে, খুব তাড়াতাড়ি হলেও সন্ধ্যা হয়ে যাবে। চৌধুরিগঞ্জের মত সন্ধ্যারাত্রে বেরুবার উপায় তো নেই। তবে দর যতই সস্তা হোক, মাছ-মারাদেরও বিনি-পুঁজির ব্যবসা—লোকসান কিছুতে হবে না।

রাস্তার কাজ পুরোপুরি শেষ হতে দাও, এই কুমিরমারি গঞ্জই কী সরগরম হবে দেখো তখন। মোটরবাস চলবে—বাসের ভিতরে মানুষ, ছাতের উপরে মাছের ঝোড়া। সাঁ করে ছুটে দিল, সকাল হবার আগেই কুমিরমারি। কুমিরমারি থেকে জলপথে মোটরলঞ্চে চাপিয়ে দাও। চৌধুরিগঞ্জ এবং আর পাঁচটা ঘেরিদার যা করছে। ফুলতলার বাবুভেয়েরা দাঁতন করতে করতে বাজারে এসে দেখবেন, সাঁইতলা-ঘেরির মাছ এসে পড়েছে।

তিন পহর রাতে মাছ-মারাদের অপেক্ষায় ঝিমোতে ঝিমোতে গগন এই সমস্ত ভাবে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। দূর বলে তখন আর কিছু থাকবে না। জগাটা কাজ ছেড়ে দিয়ে যাব-যাব করে, জগা কিংবা কারও তোয়াক্কা করবে না আর তখন। হে মা কালী, বিস্তর লম্ফঝম্ফের পর অভাগা সন্তান বনে এসে পড়েছে, এইবারে স্থিতি হয় যেন। খেলিয়ে খেলিয়ে আর মজা করো না মা-জননী!

পনেরো

এখন বিনোদিনীর কষ্ট হয়, বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে রাত্রিবেলা।

চারুকে গোপন করে, সে যাতে টের না পায়। টের পেলে তামাশা করবে, তারপরে, বলা যায় না—নিজেই হয়তো কাঁদবে বউদিদির আড়ালে আবডালে। মানুষটাকে বাড়ি থেকে সরাবার জন্য কত হেনস্থা করেছে ননদ-ভাজে মিলে। যাবার ঠিক আগের রাত্রেও কথা শোনাতে ছাড়ে নি। চারুটা চালাকি করে তবু যা-হোক দক্ষিণের ঘরে নিয়ে পুরল। বিস্তর কৌশল পোড়ারমুখীর মাথার ভিতর। কোন মুলুকে মানুষটা উদাসীন হয়ে পড়ে আছে! আগে চিঠিপত্র লিখত: কত আশার কথা, ভালবাসার কথা। বিনিকে নিয়ে গিয়ে কোন এক দূরদেশের নতুন বাসায় তুলবে, সেই সব আনন্দের ছবি। চারুবালাকেও নিয়ে যাবে। কিছু জমি-জিরেত করে দেবে বোনের নামে—কারও প্রত্যাশী হয়ে যাতে না থাকতে হয়। ওই নাবাল অঞ্চলে জমিজায়গা প্রচুর, সেলামিও যৎসামান্য। কত এমনি ভাল ভাল কথা লিখে নাচিয়ে তুলত। আর ইদানীং 'ভাল আছি' এই খবরটুকু জানতেও আলস্য। ভুলে গেছে একেবারে। ভাবতে ভাবতে বিনোদিনীর বড্ড খারাপ লাগে, পেঁটরার তলায় সেরে-রাখা গগনের পুরানো চিঠি বের করে দেখে সেই সময়।

বিনোদিনীর বাপ নেই, ভাইরা সব আছে। অবস্থা বেশ ভাল। ভুঁইক্ষেত আছে, আর রাখি-মালের কারবার। ভাইগুলো অসুরের মতন খাটে—দিনের আলোর কণিকা থাকতে জিরান নেই, ঘোর হলে তবে বাড়ি ফেরে। তখন আর নড়ে বেড়ানো দূরের কথা—বসে থাকতেও মন চায় না, টান-টান হয়ে গড়িয়ে পড়ে। মেজ ভাই নগেনশশী হল খোঁড়া মানুষ, সে খাটনির কাজ পেরে ওঠে না। দেহের খুঁত ঈশ্বর কিন্তু আর একদিক দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন—বুদ্ধির হাঁড়ি মাথাটা। বিষয়সম্পত্তি সে-ই দেখে।

গ্রামের দশ রকম সমস্যায় নগেনকে সবাই ডাকে। জ্যেষ্ঠ রাজেনশশী বর্তমান থাকতেও নগেন কর্তা। ভালমানুষ রাজেন হেসে হেসে ভাইয়ের তারিফ করেঃ আর কিছু পারবে না তো করে বেড়াক মাতব্বরি। সেই জন্যে ছেড়ে রেখেছি। একটা মানুষকে দায়ে-বেদায়ে দশজনা ডাকছে, তাতে বাড়ির ইজ্জত।

নগেনশশী গগনের বাড়ি এসে প্রায়ই খোঁজখবর নেয়। কিছু ধানজমি আছে গগনের, গুলো-বন্দোবস্ত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষেতের ফলন যাই হোক, এই পরিমাণ ধান দিতে হবে বছর বছর। বেশী ফলন হলে বেশী চাই নে, কম হলেও নাকে কাঁদতে পারবে না এসে তখন। নগেন থেকে এই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে মধ্যবর্তী না হলে এত দূর হত না। এবং এখনো সে নিশ্চিন্ত নয়। কলিকালের মানুষ—লেখাজোখা যা-ই থাক, ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়ে না। বিশেষত অপর পক্ষে যখন অবলা দুই স্ত্রীলোক। ধমকধামক দেয় সে চাষীদের ডেকেঃ বেটা ভাবছ তা নয়। শুধু মেয়েলোক নয়, সর্বক্ষণ আমি রয়েছি পিছনে। সমস্ত জানি। ওদের কেন বলতে হবে, নিজে আমি দেখতে পাই। পিছনে পিঠের উপর ফতুয়ার নিচে বাড়তি একটা চোখ রয়েছে আমার। ছোট পালিতে ধান মেপে দিয়েছ ধনঞ্জয়, আর চিটে মিশিয়েছ! হ্যাঁ, পিঠের চোখে আমি সমস্ত দেখেছি।

লোকগুলো অবাক! জানল কি করে নগেনশশী, সে তো ছিল না সেই জায়গায়! মাপামাপি করে নিজেরা আউড়িতে তুলে দিয়ে এসেছে। বাড়ির লোকেরা রা কাড়েনি, তারা কিছু সন্দেহ করে নি। গুণজ্ঞান জানে নিশ্চয় এই নগেনশশী লোকটা, মুখে তাকিয়ে সমস্ত কেমন পড়ে ফেলতে পারে।

নগেন বলে, আট পালি ধান মাপে কম দিয়েছ শ্রীমন্ত। দিনে ডাকাতি। জমি-জমা খাস হয়ে যাবে কিন্তু, অন্য মানুষকে দিয়ে দেব। সেটা বুঝো।

গগনের বাড়ি জলচৌকি চেপে বসে হাসতে হাসতে নগেনশশী জাঁক করে গল্প করে, আর কপকপ করে পান চিবোয়। একদিন অমনি পান খাচ্ছে: কে পান সেজেছে?

চারু রান্নাঘর থেকে বলে, বউদি চান করতে গেছে। একশ গন্ডা লোক নেই; সে আপনি জানেন। সময় বুঝে আসেন এবাড়ি। এত বুদ্ধি রাখেন, আর কে পান সাজল সেটা কি জিজ্ঞাসা করে বুঝতে হবে?

চুনে যে গাল পুড়ে গেল—

গালের ভিতর দিকে পুড়েছে। সেটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। বাইরে পুড়লেই তো লজ্জা। লজ্জায় মুখ দেখান যায় না।

শুনে নগেনশশী হা-হা করে হাসে। বলে, বলেছ ভাল। ভিতরে পুড়েছে! পুড়েছে অনেক দূর গিয়ে।

যা-ই ভেবে বলুক, চারু তা বুঝেও বোঝে না। জবাবে সে ভিন্ন দিক দিয়ে যায়ঃ সেটা বুঝি। সেবারে সেই যে গরলগাছি গিয়ে জ্বালা নিয়ে এলেন, গরল শীতল হল না এতকালের ভিতর!

বাঁধুনি দিয়ে বলে এমনি চারু। কথার সূঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে। নগেনের শ্বশুর-বাড়ি গরলগাছি গাঁয়ে। বউ আনতে গিয়ে মুখ কালো করে ফিরে এল। বউ বলে, খোঁড়া বরের ঘর করব না। ভিতরে অন্য কোন্ ব্যাপার আছে, কে বলতে পারে? আছে কিছু নিশ্চয়। যুবতী বউ বরের ঘর করে না—পাড়াগাঁয়ে নানান কথা বৌয়ের সম্বন্ধে।

চারু বলে, সে গরল আজও শীতল হয় না। জ্বলুনিতে ছটফটিয়ে বেড়ান, পায়ের

অবস্থা তখন আর মনে থাকে না।

নগেনশশী চোখ পাকিয়ে বলে, তুমি আমায় পায়ের খোঁটা দিচ্ছ?

এত ঘন ঘন কেন আসেন আমাদের বাড়ি? খোঁড়া পায়ে কষ্ট হয়, সেই জন্য বলছিলাম।

বিনি হল মায়ের পেটের বোন—মন বোঝে না, তাই আসতে হয়। গগন-হতভাগা খোঁজ নেয় না, আমরাও নেব না—একেবারে তবে ভেসে যাবে নাকি?

এর পর আর জবাব আসে না। খুটখাট শব্দে চারু রান্নাঘরের কাজ করে যাচ্ছে।

নগেন গজর-গজর করে: খোঁড়া-খোঁড়া একটা রব তোলা হয়েছে। খোঁড়া মানে কি—বাঁ পাখানা একটু টেনে হাঁটি। সান্নিপাত-বিকায় হয়ে পায়ের শিরায় টান পড়ে গেল।

চারু হেসে ওঠে: আমি তো শুনেছি, কার পাছ-দুয়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ঢিল মেরে পা খোঁড়া করে দিল।

শুনবে বই কি। হয়তো চেখেই দেখেছিলে। একটু দরদ থাকলে এ রকম ঠাট্টা মুখ দিয়ে বেরুত না।

চারু কণ্ঠস্বর মৃদু করে বলে, কী জানি, লোকে তো বলে তাই। কিন্তু যা হবার হয়েছে, একটা পা ঠিক আছে এখনো। সেটা নিয়ে সামাল হয়ে চলবেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরঘুর করে বেড়াবেন না। আবার একটা বিয়ে করে ফেলুন।

বিনোদিনী এসে কাঁখের কলসী রান্নাঘরের দাওয়ায় নামালো। নগেনশশী দাওয়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, তোদের এখানে আর আমি আসব না বিনি। তোর ননদ যাচ্ছেতাই করে বলে। খোঁটা দেয়।

চারু বলে, বিয়ে করতে বলছি মেজদাকে।

বিনোদিনী বলে, তাতে কি অসাধ কারো? কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু সেই দজ্জাল মাগী হতে দেবে না। গরলগাছি থেকে শাসানি দিল মেয়েওয়ালার বাড়ি: দিক না বিয়ে, ঝেঁটিয়ে নতুন বউয়ের মুখ থ্যাবড়া করে দিয়ে আসব। সেই সব শুনে মেয়ের বাপ পিছিয়ে যায়।

ফিক করে হেসে চারু বলে, আমায় বিয়ে করুন না মেজদা। ঝাঁটাতে আসে যেন তখন। আমিও জানি ঝাঁটা ধরতে। কে হারে কে জেতে, দেখা যাবে।

স্তম্ভিত হয়ে যায় বিনোদিনী। বিধবা মেয়ে—মুখে আটকায় না কোন কথা!

ওরে হতচ্ছাড়ী, বিয়ের সাধ হয়েছে তোমার?

চারু আবার হেসে বলে, ঠাট্টা-বটকেরা। সত্যি কী আর বলেছি?

হাসছে, তবু কণ্ঠ কেমন ছলছল করে ওঠে। বলে, ঠাট্টার সম্পর্ক যে বউদি। কপাল পুড়েছে বলে একটা ঠাট্টার কথা বলতে দেবে না?

নগেনশশী চারুর পক্ষ নেয়: বকিস কেন বিনি? ঠাট্টা বই আর কি! সত্যি হলেই বা অবাক হবার কি আছে? ঘর-সংসারের সাধ কাঁচা বয়সে কার না হয় শুনি?

বকুনি দিয়ে বিনিরও হয়তো মনে মনে দুঃখ পোড়াকপাল করে এসেছে যে! অমন খাসা নন্দাই আমার, ঘরবাড়ি জায়গাজমি—অভাবটা কি ছিল। কি জন্যে আজ এমনভাবে পড়ে থাকতে হবে!

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছে নগেনশশী। চারুর দিকে আড়ে আড়ে তাকায়: মেয়ে বটে! এত কটুকাটব্য বলে পরক্ষণেই আবার বিয়ের কথা বলে তার সঙ্গে। ঠাট্টা হোক যা-ই হোক, বলল তো মুখ ফুটে। একটা জবাব না দিয়ে চলে যেতে পারে না।

বলে, হচ্ছে না বুঝি এ রকম বিয়ে? কিন্তু আমাদের পোড়া জাতে হবার জো নেই। ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে, সমাজে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবে না। সমাজ না থাকত, তা হলে কিসের পরোয়া?

বোল

মোহানার ধারে গগনের চালাঘর উঠে গেল। একরকম নিখরচায়। টাকা কয়েকের বাঁশ কিনে জলে ভাসিয়ে আনা হল পুবের ডাঙা-অঞ্চল থেকে। এর উপরে আজে-বাজে খরচা দু-চার টাকা। মাছের খাতা আরও জমেছে, মানুষজনের যাতায়াত বেড়েছে খুব। রাত্রিবেলা কাজের মানুষ আর দিনমানের আড্ডা জমাবার মানুষ। বৃষ্টি হলে ছোট ঘরে জায়গা হয় না। জায়গা হলেও খুব যে বেশী লাভ, তা নয়। বাইরের বৃষ্টি থেকে গেলেও ফুটো চালে টপ-টপ করে জল ঝরতে থাকে। সামনে ফের শীতকাল। রাত্রের কাজকর্ম এইটুকু ঘরের মধ্যে অসম্ভব। তখনকার উপায় কি? ব্যাপারী ও মাছ-মারারা সমস্যার কথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। গতিক বুঝে গগন একেবারে চেপে গিয়েছে। কানেই যায় না যেন ওদের কথাবার্তা, কোন রকম উচ্চবাচ্য নেই।

জগা-বলাইর মুখ থেকে বড়দা ডাক চালু হয়ে গেছে। রাধেশ্যাম একদিন স্পষ্টা-স্পষ্টি কথাটা তুলল: রুয়ো চেঁচে অর্ধেক সাজপত্তোর বানিয়ে অমনধারা ফেলে রাখলে বড়দা, আর কিছু হবে না?

খাতা লিখতে লিখতে গগন সংক্ষেপে বলে, হবে।

বর্ষা চলে গেল, খরার সময় এইবার। সাজপত্তোর শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে যাবে। উনুনে দিতে হবে, ঘরের কোন কাজে আসবে না কিন্তু।

গগন পাকা-হিসাবটা সতর্ক ভাবে এখন পাতড়া খাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে, ঢোকার সময় ভুলচুক হয়েছে কিনা। কেনাবেচার ভিড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি পাতড়ায় টুকে রাখে, দিনমানে ধীরেসুস্থে পাকা-খাতায় তুলতে হয়। দায়িত্বের কাজ, দশের সঙ্গে দেনাওনার ব্যাপার, হেরফের হলে ঝামেলায় পড়বে। অধিক বাক্যব্যয়ের ফুরসত কোথা এখন? তবু যা হোক একটু বিশদ করে গগন জবাব দিল, উনুনে দিতে হবে না, ঘরেই লাগবে।

হর ঘড়ুই একজন ব্যাপারী। গাঙপারে বরাপোতায় ঘর, হামেশাই পারাপার হওয়া মুশকিল। রাত্রিবেলা তো নয়ই। সন্ধ্যা-রাত্রেই তাই পার হয়ে এসে ফাঁকা চরের উপর বসে থাকতে হয়। ঘরের গরজ তারই সকলের চেয়ে বেশী। হর বলে, তুমি সাজসরঞ্জাম দিয়েছ, আমরা গায়ে-গতরে খেটে দিই। বল তো আজ থেকেই কোমর বেঁধে লেগে যাই বড়দা।

রাধেশ্যাম মাছ মেরে খাতায় তুলে দিয়েই খালে নেমে যায়। মুখ-আঁধারি থাকতে চান করে আসে। শৌখিন মানুষ। রাত্রে যে-মূর্তিতে জাল হাতে ঘেরি থেকে ওঠে, দিনের বেলা কাউকে তা দেখতে দেবে না। বউকেও না। সইতলার পাড়ার ভিতরে বাড়ি। জাল নিয়ে বাঁধের পথে টিপিটিপি বেরুবার সময় একটা পুঁটুলি খাতার চালা-ঘরে ছুঁড়ে দিয়ে যায়। ফিরে এসে মাছ নামিয়ে রেখে পুঁটলি নিয়ে খালধারে ছোটে। চান করে বাঁধের উপর উঠে পুঁটুলি খুলে চওড়া পাড় ধুতি পরে, গেঞ্জি গায়ে দেয়। সভ্যভব্য হয়ে মাথার চুল চিরুনি দিয়ে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে দু'ভাগ করে এলবার্ট-টেড়ি কাটতে কাটতে ফেরে। হর ঘড়ুয়ের কথা তার কানে গেল: চালাঘরটা উঠে যাক

এখানে বড়দা। সকলে মিলে লেগে পড়ে তুলে দিই।

রাধেশ্যাম পরমোৎসাহে হাঁ-হা করে ওঠে: তাই। ঘর শুধু বড়দারই হবে না, একা বড়দা সবখানি জায়গা জুড়ে থাকবে না। আমিও চৌপহর থাকব। জায়গা পেলে কে যাবে বাড়িতে মাগীর ক্যারক্যারানি শুনতে? এস, লেগে যাই। দশ জনের বিশখানা হাত লাগলে কতক্ষণ?

গগনের ভারী মনোমত কথা। খাতা থেকে মুখ তুলে হাসি-হাসি মুখ চতুর্দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, বেশ তো!

হাত বিশখানা কেন, কোন কোন দিন একসঙ্গে ত্রিশ-চাল্লিশ অবধি খাটছে। দেখতে দেখতে ঘর খাড়া হয়ে উঠল। বন ছাড়িয়ে মাথা উঁচু হল ঘরের। গাঙের দু-বাঁক আগে থেকে দেখা যায়। চৌধুরীগঞ্জের জলের উপর সালতিতে ভাসতে ভাসতেও সুস্পষ্ট নজরে আসে। বনের মধ্যে দেখা যায় ঐ ঘর—সাঁইতলার নতুন-আলা। চৌরিঘর, গোলপাতার ছাউনি—স্ফূর্তির চোটে একদিন জগা ধনকার-অঞ্চল থেকে এ-বছরের নতুন খড় কিনে ডিঙি বোঝাই করে আনল। খড়ে ঘরের মটকা মেরে দিল। কাঁচা রোদ পড়ে চিকচিক করে, ঘরের মটকা যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো।

এসব হল উপরের কাজ, দূর থেকে দেখা যায়। কাছে এসে দেখতে হয়—চরের জমির উপর পাহাড় বানিয়ে তুলেছে মরদেরা মাটি তুলে তুলে। বর্ষা যতই হোক—এমন কি ঘেরির বাঁধ ভেঙে বানের জল ঢুকে পড়লেও এই ভিটে ছাপিয়ে যাবে না। আস্ত আস্ত কাঠ পুঁতে একটা বেড়া দিয়ে বাদাবনের বড় জানোয়ার না-ই আসুক, ছিটে-জঙ্গলের মধ্যে কিছু থাকতে পারে তো।

বেড়া দেওয়ায় জগার ঘোরতার আপত্তি: আরে দূর, বড়দা যেন কী! ঘরের মধ্যে আমাদের সার্কাসের জন্তু বলে মনে হবে। কী জন্তু আছে খালের এপারে—বনবিড়াল কি-বুনো শুয়োর। কিংবা বড় জোর গোবাঘা। তা আমরা কিছু কম নাকি তাদের চেয়ে! অত ভয় কিসের গো?

গগন তার উত্তরে একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতা করে। লেখাপড়ার এই মজা—পেটে থাকলে ঝাঁক বেরুবেই সময়ে অসময়ে। বলে, বুঝিস নে জগা, জন্তুরাই লজ্জা পাবে মানুষ-জন্তুর কাণ্ডকারখানা দেখে। বেড়া দিয়ে তাই একটু অন্দর বানিয়ে নিচ্ছি।

মাছের খাতা নতুন-আলায় উঠে গেল, গগনের বসতঘরও সেখানে। জগা আর বলাই পুরানো চালাঘর দখল করে আছে। দিনমানের খাওয়া কুমিরমারিতে—গদাধর হোটেলের ভাত কিংবা চিঁড়ে-মুড়ির ফলার। রাত্রে চালাঘরের মধ্যে চাট্টি চাল ফুটিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। ভোররাত্রে উঠে আবার গিয়ে মাছের নৌকোয় বসতে হয়।

চালাঘরের উপর চাল রয়েছে, কিন্তু ছাউনি তেমন কিছু নেই। শোওয়ার পরে মনে পড়ে সে কথা, শুয়ে শুয়ে দিব্যি আকাশ দেখা যায়।

বলাই বলে, জগা, বনে চল একদিন। চাট্টি গোলপাতা কেটে আনা যাক।

জগা বলে, যাব। পচাও বলছিল। চাক কেটে কলসিখানেক মধু নিয়ে আসব। চাকের মরসুম এটা।

শীতের শেষ ফুটেছে চারিদিকে। ফুলে ফুলে আলো হয়ে আছে বনের এখানে-ওখানে, মৌমাছি উড়ছে। কিন্তু মরশুম শেষ হয়ে আসে। কত মউল, মধুর কলস ভরে বড়-গাঙ বেয়ে চলে গেল। এদের যাওয়ার উদ্যোগ হয় না, ফুরসতও নেই।

এক রাতে খুব বৃষ্টি। যা গতিক, চালের আচ্ছাদনে না থেকে কোন গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালে বৃষ্টি কম লাগত।

বলাই বলে, কতদিন থেকে বনে যাবার কথা বলছি, তুই তা কানে নিস নে।

জগা মুখ খিঁচিয়ে বলে, এই যে ঘোড়ার ডিমের চাকরি—কুমিরমারি মাছ পেঁছে দিতে হয়। চুলোয় যাকগে কামাই করব ক'টা দিন।

সে কথা শুনে গগন রাগারাগি করে: বল কি, মাছ পচে গোবর হবে, অত ক্ষতিলোকসান করবে তোমরা? উঠতি খাতায় বদনাম হয়ে যাবে, ব্যাপারী সব ভেগে পড়বে। তোমরা মতলব দিলে, সাহস দিলে, তবেই কাজে নেমেছি। যা বলেছ বলেছ, বারদিগর মুখে আনবে না অমন কথা। গোলপাতার গরজ, সে আর কঠিন কি! কুমিরমারি থেকে ফিরে এসেও দু-পণ দশপণ করে কেটে আনা যায়। না হয় কাউকে দিয়ে আমি কাটিয়ে এনে দেব।

বলছে কি শোন! অন্য মানুষ দিয়ে করাবে এই ছোট্ট একটুখানি কাজ। বনে যাওয়াতেই মজা। বন আর এই নতুন বসত—একটা খাল আছে শুধু মাঝখানে। বন এদের ভাণ্ডার। রান্নার শুকনো কাঠ চাই—বনে গিয়ে মটমট করে ভেঙে আন। মাংস খাবার ইচ্ছে হল তো হাতে দেশী গাদা-বন্দুক, থলিতে বারুদ আর জালের কাঠি নিয়ে ঢুকে পড় বনের ভিতর। কামারে লোহা পিটিয়ে তোফা বন্দুক বানিয়ে দেয়, বন্দুক এ তল্লাটে অনেকের ঘরে। পাশ-লাইসেন্স করতে বয়ে গেছে, এমনি রেখে দেয়।

মধু সংগ্রহ আপাতত হচ্ছে না, চাক খুঁজে খুঁজে বনের মধ্যে অনেক দূরে অবধি গিয়ে পড়তে হয়। কুমিরমারি থেকে ফিরে এসে রাতবিরেতে সে কাজটা হয় না। মরা গোনে একদিন জগা আর বলাই খানিকটা জল ভেঙে পায়ে হেঁটে আর খানিকটা সাঁতার কেটে ওপারের গোলঝাড়ে ঢুকে গোলপাতা কেটে রেখে এল। শুখোক পড়ে পড়ে, তারপরে একদিন নিয়ে আসা যাবে।

শুধু এই এক চালাঘর নয়, পাড়ার চেহারাটাই ফিরে গেছে। পোড়ো ঘর একটা নেই। নতুন ঘরও বাঁধছে ভিন্ন তল্লাট থেকে মানুষ এসে। মা-রক্ষাকালীর দয়া দেখা যাচ্ছে আশার অতীত। কাজের মানুষ বেড়েছে, অকাজের মানুষও আসছে ঢের। তামাকের খরচা হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে, কুমিরমারির হাটে হাটে তামাক কিনে আনে। এ ছাড়া অল্পসল্প বড় তামাকেরও ব্যাপার আছে, তার জন্য ফুলতলা অবধি যেতে হয়। আগেও লোকে মেছোঘেরিতে জাল ফেলত চুরিচামারি করে। অল্প জলে অগুন্তি মাছ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, চোখের উপর দেখে কোন মানুষ স্থির থাকতে পারে! দু-এক খেওনেই যে মাছ উঠত, তাতে নিজেদের খাওয়া হত, আর অক্ষম পড়শীদের দান করে দিত বাকিটা। গগন এসে চেপে পড়ার পরে মাছ মারা রীতিমত ব্যবসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাদের জাল ছিল না, জাল কিনে নিয়েছে। জাল ফেলতে জানত না, তারা শিখে নিয়েছে ইতিমধ্যে। শুধু কাঙালি চক্কোত্তির পাঁচটা ঘেরি নয়, এ অঞ্চলের যাবতীয় ঘেরির লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাতের পর রাত এই মজা চলছে জলের উপরে। কাঁহাতক পেরে ওঠা যায়! রাত দুপুরে ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে সালতি বাইতে বাইতে অথবা পায়ে হেঁটে হাঙরের দাঁতের মত তীক্ষ্ম হিমেল জল ভাঙতে ভাঙতে আঙুলে মটকে গালি দেয় গগন ও তার দলবলকে: কাঠি-ঘা হয় যেন হে মা বনবিবি? বাঘে যেন ওদের মুখে করে নিয়ে যায়। ডাকাতের

জল গিয়ে যেন পড়ে ওদের ওই নতুন বানানো আলায়।

চুপিসাড়ে একটা কথা চলেছে ঘেরিওয়ালাদের মধ্যে : দিনকে দিন অবস্থা সঙ্গিন করে তুলল—যে রকম ব্যাপার, সকল ঘেরির সব মাছই তো তুলে নিয়ে চালান করে আসবে। সাপ, বাঘ কিংবা ডাকাতের রূপে সুমতি হবে, ঠিক-ঠিকানা নেই। দৈব ভরসায় না থেকে নিজেদের লোকজন পাঠিয়ে ঐ বাবুয়ের বাসা ভেঙে আগুন দিয়ে এলে কেমন হয়? সমস্ত ঘেরির দায় আছে, আপদ-বালাই উৎসন্ন হয়ে যাক, এ তল্লাট থেকে।

এবারে এসে চেপে পড়ার পরেও গগন চৌধুরীগঞ্জের আলায় দু-একবার বেড়াতে গিয়েছে। সেই পয়লা দিনের মত না হলেও খাতির-যত্ন করত গোড়ার দিকে, পান-খাওয়াত। যতদিন যাচ্ছে, ভাল করে যেন কথাই কইতে চায় না চৌধুরির আলার মানুষ। গগনই বা কম যায় কিসে—যাতায়াত বন্ধ করে দিল।

হঠাৎ এক দিন অনিরুদ্ধ আর কালোসোনা পান চিবাতে চিবাতে এসে উপস্থিত। বিকালবেলা, লোকজন বেশী থাকে না এ সময়টা। যারা আছে, তাজ্জব হয়ে গেল। নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ নয়, চৌধুরিগঞ্জের মানুষ উপযাচক হয়ে চলে এসেছে। মতলবখানা কি—উৎকর্ণ হয়ে আছে সকলে।

কেমন আছ বড়দা? আগে তবু যেতে অবরেসবরে, সম্পর্ক ছেদন করে দিলে।

বেড়া ঘেঁষে মাচা বেঁধে নিয়েছে। হাতবাক্স ও খাতাপত্র নিয়ে গগন তার উপরে বসে। বাক্স-খাতা এক পাশে সরিয়ে শোয়ও রাত্রিবেলা গুটিসুটি হয়ে। গগন খাতির করে অনিরুদ্ধকে মাচার উপর নিজের পাশে বসাল।

দুঃখিত স্বরে অনিরুদ্ধ বলে, বিদেশী মানুষ ক'টি একখানে আছি। মুখ দেখা-দেখি বন্ধ হয়ে গেল, তাই আজকে চলে এসেছি।

গগন বলে, সময় পাইনে কাজের চাপে।

তাই তো শুনতে পাই। সবাই সেই কথা বলে—রৈ-রৈ করে চলছে কাজ-কর্ম।

গগন হেসে বিনয় করে বলে, লোকে ভালবাসে। আমাদের ভাল চায়, বেশী করে তাই বলে বেড়ায়। পরের সম্পত্তি আর নিজের বুদ্ধি কেউ তো কম দেখে না। তোমার কাছে বলতে কি, চলে যাচ্ছে টায়েটোয়ে। তবে আশায় রয়েছি। আশার পিছনে জগৎ ঘোরে। ঘরবাড়ি মানুষ-মানষেলা ছেড়ে বাদাবনের নোনা জল খাচ্ছি—একদিন হয়তো ভাল হবে। কুমিরমারির রাস্তাটা হয়ে গেলে লরী চলবে, ফুলতলা অবধি মাল পৌঁছানোর ভাবনা থাকবে না। দরও পাওয়া যাবে। অনেক লোক ঝুঁকবে তখন মাছের কাজে।

ঘাড় নেড়ে অনিরুদ্ধ তারিফ করে : টায়েটোয়ে চলে যাচ্ছে, কী বল বড়দা? খুব ভালই তো চলছে। আরও কত ভাল চলবে এর পর।

তাকিয়ে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ গগনের মুখের চেকনাই দেখে। ভাল ঠেকে না। এখনই এই। রাস্তা হয়ে গিয়ে বেশী লোক মাছের কাজে ঝুঁকবার পর বেশী বেশী মাছ আমদানি হবে মাছের খাতায়। নাদুসনুদুস ভুঁড়ি দেখা দেবে তখন গগনের, তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে থাকবে মাচার উপর, মাচা ছেড়ে ভুঁয়ের উপর নামবে না। সেই ভবিষ্যৎ সুদিনের কথা স্মরণ করে অনিরুদ্ধর প্রাণে জল থাকে না। ঘেরির সমস্ত মাছই তো তুলে নিয়ে আসবে গগনের দলবল। আলা সাজিয়ে বসে অনিরুদ্ধরা তবে কি করবে? আর সাঁইতলার এই নতুন-ঘেরি বেঁধে গগন আস্ত এক কায়দা

করে রেখেছে। শেষরাত্রে কেনাবেচার সময় হাতেনাতে এসে যদি ধর, এমন কি অনুকূলবাবু দারোগা-পুলিশ নিয়ে এসে পড়েন, বলে দেবে আমাদের নিজস্ব ঘেরির মাছ। বলবে, গাঙ-খাল থেকে যা ধরে আনে সেই মাছ যোগ হয়েছে নতুন-ঘেরির মাছের সঙ্গে। মাছের গায়ে তো লেখা থাকে না, কোন্ ঘেরি থেকে ক'টা তুলেছে। কি করবে কর তখন ঐ কৈফিয়তের পর।

মনের মধ্যে এই সব তোলাপাড়া করছে। গগনের খাতির করে দেওয়া পান চিবাতে চিবাতে তবু একমুখ হেসে বলতে হয়, বড়দা, মনে পড়ে সেই বলেছিলাম, চলে এস, বাদাবনে কারো অচল হয় না। কথাটা খাটল কিনা দেখ।

গগন গদগদ হয়ে বলে, ভাল মনে কথাটা বলেছিলে—ভালই করেছি তোমার কথা শুনে।

তারপর যে জন্যে এসেছে তারা। হাসুক আর ভদ্রতা করে যাই বলুক, মনের মধ্যে রি-রি করে জ্বলছে। কাল রাত্রের ঘটনা। বলে, এক কাণ্ড হল বড়দা। শয়তান কতকগুলো মানুষ কাল বিষম নাজেহাল করেছে। মাছের নৌকো রওনা হয়ে গেছে, পাহারায় বেরিয়ে গেছে আর সবাই। তিনজন মাত্র আছি আমরা আলায়। আমি আছি, কালোসোনা আছে, আর আছে কানা-ন্যাপলা—মুখের আধখানা নেই, সেই লোকটা। দু'জনে শুয়ে পড়েছি, ন্যাপলা তামাক টানছে বটগাছতলায় বসে বসে। সেই কুমিরে ধরার পর থেকে ন্যাপলার ঘুমটুম হয় না, তামাক খায় বসে বসে। সে এসে আমার গা ঝাঁকায়ঃ উঠে এস। মাছ-মারাদের কী সাহস বেড়েছে, সাঁকোর মুখে আলো নিয়ে এসে মাছ ধরছে ঐ দেখ। সত্যি সত্যি দেখতে পেলাম বড়দা, আলো জ্বলছে। যা গতিক এগুতে এগুতে তবে তো একেবারে আলার ঘাড়ের উপরে এসে পড়েছে। ন্যাপলা নিল সড়কি; আমি আর কালো লাঠি। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি—মোটামোটা সলতে-জ্বালা মাটির পিদ্দিম, ভেলা সাজিয়ে পিদ্দিম বেশ জুত করে রেখেছে। তাই বললাম ন্যাপলাকে, বুদ্ধি বটে তোর! আলো জেলে কেউ কখনো মাছ চুরি করতে আসে? কনকনে শীতে তুই আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে এলি, কোন্ দিকে দাঁড়িয়ে ওরা মজা দেখছে। ফিরে এসে বুঝলাম, শুধু মজা দেখাই নয়—বেকুব বানিয়ে কাজ গুছিয়ে গেছে তারা। আমরা সাঁকোর মুখে গিয়েছি, আলার খাসপুকুরে সেই ফাঁকে তারা জাল ফেলেছে।

গগন ফিকফিক করে হাসছিল। হেসে হেসে বলে, আন্দাজি ও-রকম বলা ঠিক হচ্ছে না ম্যানেজার। চোখে যখন কিছু দেখ নি।

কালোসোনা বলে, আমি দেখেছি। জাল নিয়ে দু'জন ছুটে বাঁধের এপাশে তোমাদের এলাকায় চলে এল। স্পষ্ট দেখলাম আমি। বাঁধে উঠলে তখন আর কী করা যায়! মাছ গিজগিজ করছে পুকুরে, তিন বছরের জিয়ানো ভারী ভারী মাছ। কত মাছ তুলেছে, ঠিক ঠিকানা নেই। ছোটবাবুর মেয়ের অন্নপ্রাশনে বড় মাছ পাঠাতে হবে, সেজন্যে পুকুরের পাটা তুলে ফেলা হয়েছিল আজকে। বেটারা সকল খবর রাখে।

অনিরুদ্ধ বলে, কোন দিন আমি আলা ছেড়ে নড়ি নে। কাল কেমন মেজাজ চড়ে গেল। কাঁচা ঘুম ভেঙে আমি সুদ্ধ বেরিয়ে পড়লাম।

হর ঘড়ুইর আজ কেনা-বেচা খারাপ। ডাকে হেরে গেছে, বেশী দর দিয়ে অন্য ব্যাপারী মাছ কিনে রওনা করে দিয়েছে। মনে দুঃখ তাই। বলে, শুনলে বড়দা? ঐ বড় ভেটকি দুটো, বেটারা বলে, গাঙ থেকে ধরেছে। গাঙের সোঁতায় দু-বছর

তিন-বছর ধরে অত বড় হল, কোনদিন কারো জালে পড়ল না। এ কী একটা বিশ্বাস হবার কথা? ভেটকি কোথায় ধরেছে, বোঝ এইখানে।

কালোসোনা ফস করে প্রশ্ন করে, বেটাদের নাম বল দিকি, শুনে নিই। বাদাবনে এত ধড়িবাজ কারা?

হর ঘড়ুই কী আবার বলে বসে, গগন চোখ পাকিয়ে পড়ে তার দিকে। অনিরুদ্ধর নজর এড়ায় নি। কালোসোনাকে সে তাড়া দিয়ে উঠল: তুই এক নম্বরের আহাম্মক। নাম বলতে যাবে কেন রে? ব্যাপার-বাণিজ্যের ভিতরের কথা কেউ বলে নাকি?

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে পান-তামাক খেয়ে অনিরুদ্ধ উঠল। গগন বলে, বাইরে যত শোন সেসব কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, আছি একেবারে খারাপ নয়। মানুষ-জন নিয়ে ফুর্তিফার্তির মধ্যে থাকা যাচ্ছে। সন্ধ্যার মুখে জগা-বলাই আর ব্যাপারীরা ফেরে। আরও সব এসে জোটে এদিক-ওদিক থেকে।

অনিরুদ্ধ হেসে বলে, আমরা সেটা আলা থেকেই মালুম পাই। গান আর ঢোলক-বাজনা—কী কাণ্ড রে বাবা! তবে একদিক দিয়ে ভাল হয়েছে, বাদার জন্তু আর-গাঙ পার হতে ভরসা পাবে না। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সোয়াস্তি বড়দা।

গগন বলে, এত বলি, রাত না পোহাতেই তো লড়ালড়ি লেগে যাবে। চোখ বুজে দু-দণ্ড সব গড়িয়ে নে। তা নিজেরা ঘুমোবে না, আমাদেরও চোখের দু-পাতা এক করতে দেবে না। ঐ যে জগা ছোঁড়াটা দেখ, বিধাতা ওর চোখে এক লহমার ঘুম দেয় নি। বলাই বলে, কুমিরমারি যাবার পথে বোঠে বাইতে বাইতে মধ্যিগাঙে ঘুমিয়ে নেয়।

অনিরুদ্ধকে গগন নিমন্ত্রণ করে: চলে এস মাঝে মাঝে। বিকাল বেলা এই সময়টা ফাঁকা থাকে, এটা বাদ দিয়ে অন্য সময় এস। সন্ধ্যার পরে তোমাদের কাজ, তখন আসা চলে না। সকালের দিকে এস—তখনও মানুষ আসে, রাতের মানুষজনও থেকে যায় কিছু কিছু। জগারা থাকে না বলে গানবাজনা হতে পারে না। ফড়খেলা হবে, সকালবেলা এস তোমরা। নেমন্তন্ন রইল।

এলও একদিন অনিরুদ্ধ। ফড় খেলল। হরতন-রুইতন-ইস্কাপন-চিড়ে চার রঙের ছক আছে, তার উপরে পয়সা ধরতে হয়। আর এক চৌকো ঘুঁটি আছে ঐ চার রঙের ছাপ-মারা; কৌটার মধ্যে সেটা নেড়েনেড়ে ছকের উপর চেপে ধরে। যে রঙটা উপরে পড়ল, জিত সেই রঙের। সেই রঙের ছকে যে পয়সা রেখেছে, তার ডবল গণে দিতে হবে; বাকি ঘরগুলোর পয়সা বাজেয়াপ্ত। এই হল মোটামুটি ফড়খেলা। পয়লা দিনই অনিরুদ্ধ পাঁচ আনা পয়সা জিতে গেল।

খেলা রাতের মানুষদের সঙ্গে—রাত থেকেই যারা আলায় পড়ে রয়েছে। রাতের মানুষ অর্থাৎ চোর, চুরি করে ঘেরিতে মাছ ধরে বেড়ায়। তবু কিন্তু চোর বলা চলবে না বাদা অঞ্চলের নিয়মে। ঘেরিদারদের পোষ্য এরা, দায়েবেদায়ে কাজে লাগে। শীতকালে বাঁধে নতুনমাটি দেবার সময় অনেক মানুষের দরকার। বর্ষার জলের চাপে বাঁধের নিচে ঘোগ হয়, জল চুইয়ে এদিক থেকে এসে ওদিকে বেরিয়ে যায়, অবহেলা করলে তলার মাটি ধুয়ে বাঁধ ধ্বসে পড়ে একদিন। মাটি মেলে না, তখন ডাকতে হয় সব মানুষ। নৌকো নিয়ে দূর-দূরান্তরের মাটি কেটে এনে ঘোগের মুখ আটকায়।

কিন্তু যখন মাটি-কাটার দরকার নেই, তখন কি করবে এরা? কি খাবে? আলার কাজকর্মে নিয়ে নেয় কয়েকটাকে। কিন্তু সে আর ক'জন! বাকি সবাই বাদা অঞ্চল

ছেড়ে চলে যাক, ঘেরির মালিকরা তা-ও চায় না। দরকারের সময় হাঁক দিলে তবে মানুষ মিলবে কোথা? অতএব কড়াতি-পড়াতি যা মেলে, তাই খেয়ে থাকুক ওরা। স্পষ্টস্পষ্টি চোখের উপরে নয়, অগোচরে রাতের কাজে পারে তো নিজেদের উপায় করে নিক। ঘেরির পাহারাদার তাড়া করে ঠিকই, তা হলেও প্রশ্রয়ের ভাব খানিকটা —শুধুমাত্র জালগাছি রেখে মানুষটাকে ছেড়ে দেওয়ার নিয়মে মালুম। কিন্তু আগে যা শুধুমাত্র পেটের খোরাকির ব্যাপার ছিল, গগনের দল এসে পড়ে এখন দস্তুর-মত ব্যবসায়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দিনকে দিন রোজগার বেড়ে যাচ্ছে মানুষের, লোভও বাড়ছে। সে বাড় এতদূর হয়েছে, আলার পুকুরে গিয়ে জাল ফেলল। হয়তো এদেরই ভিতরের কেউ, হেসে হেসে ফড় খেলছে যাদের সঙ্গে। হয়তো কেন, নিশ্চয় তাই। বাইরের লোকের বুকের পাটা হবে না আলার খাসপুকুরে গিয়ে জাল নামাতে।

পাঁচ আনা নগদ পয়সা জিতে নিয়ে অনিরুদ্ধ পরের দিন আবার এসেছে। তার পরের দিনও। দুটো দিন কামাই দিয়ে তারও পরে একদিন। সেদিন বলল, ছোট মনিব জরুরী তলব দিয়েছে কি জন্যে। রাতের বেলা মাছের নৌকোয় ফুলতলা সদরে চলে যাচ্ছি, ফিরে এসে দেখা হবে।

চলে গেলে গগনেরা হাসাহাসি করে। ভাগ্যিস তলব পড়েছে—শহরের আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করে শোকটা সামলে আসবে কতক। পয়লা দিনের মুনাফা পাঁচ আনা খেয়ে গিয়ে গাঁট থেকে আরও দশ-বারো আনা বেরিয়ে গেছে এই ক'দিনে। শোক সামান্য নয়।

ঠিক পরের দিন—দিন কেন, রাতই বলতে হবে, জগার ডিঙি ঘাটে বাঁধা তখনো—পাড়ার মধ্যে কলরব উঠল, অন্নদাসী ছুটতে ছুটতে এসে উঠল আলায়। অকথ্য গালি-গালাজ করছে চৌধুরীগঞ্জের আলার দিকে তাকিয়ে. আঙুল মটকে মটকে গালি দিচ্ছে। মুখের বাক্যে রাগের শোধ হয় না তো গোড়ালি দিয়ে দুম দুম করে লাথি মারছে মাটিতে। ঘরের মেজে যেন অনিরুদ্ধের মুণ্ড, তার উপরে লাথি ঝাড়ছে। লাথির চোটে গর্ত হয়ে গেল জায়গাটা, মুণ্ড হলে শতচুর হয়ে ছিটকে পড়ত।

গগন বলে, ঠাণ্ডা হও বউ। ধীরেসুস্থে বল, কি হয়েছে। রাধেশ্যামকে দেখলাম না, জাল কেড়ে নিল বুঝি? তার নিজের আসতে হবে, জাল ছাড়িয়ে আনার পয়সা আমি তার হাতে দেব। মারফাত এ সমস্ত হয় না।

বউ বলে, সে এল না। আমায় পাঠিয়ে দিল। লাজে মুখ দেখাবে না, গায়ে হাত দিয়েছে তার।

যে ক'জন হাজির আছে, তিড়িং করে লাফিয়ে দাঁড়াল। জগা ছিল ডিঙিতে—কানে গিয়েছে কি এক-ছুটে ডাঙার উপর। হেন অপমান কে কবে শুনেছে। গায়ে লেগেছে একলা রাধেশ্যামের নয়, গগনের ঘেরিতে যত লোকের আসাযাওয়া, সকলের। জগা বলে, চল তো যাই। কত বড় ঘেরিওয়ালা হয়েছে, দেখে আসি।

চুরি করে মাছ মারা যদি অন্যায়ও হয়, তবু হাতে মারার বিধি নেই। ভাতে মারে জাল আটকে রেখে। দু-চার বার ধরা পড়ার পরে শাস্তিটা বেশী—পুরো একদিন জাল আটক রাখবে, জরিমানার পয়সা দেওয়া সত্ত্বেও। এক দিনের রোজগার মাটি। এই তো অনেক—এর বেশী অন্য কিছু নয়। অতএব রাধেশ্যামকে যদি মেরে থাকে, অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে।

গগন কিন্তু গণ্ডগোল চায় না। বলে, হুটকো লোকের কাণ্ড। রাধেশ্যামেরও বাড়াবাড়ি বটে—মোটা মাছ পেয়ে লোভ লেগেছে, আলার পুকুরে আবার জাল ফেলতে গেছে। অনিরুদ্ধ তলব পেয়ে ফুলতলা চলে গেল। সে থাকলে অবিশ্যি এত দূর হত না। আসুক ফিরে, আমি গিয়ে যা হোক একটা বিহিত করে আসব।

অন্নদাসী করকর করে ওঠে ঃ মারল তো অনিরুদ্ধ নিজেই। কোন চুলোয় তলব হয় নি, মিথ্যে বলে তোমাদের ভাঁওতা দিয়েছিল।

বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। অনিরুদ্ধ এখানে বলে গেল সদরে ছোটবাবুর কাছে যাচ্ছে। শব্দ-সাড়া করে সে আর কালোসোনা উঠল গিয়ে মাছের নৌকোয়। এক বাঁক গিয়ে চুপিসাড়ে নেমে পড়েছে। পায়ে হেঁটে টিপিটিপি ফিরে এসেছে আলায়। কী করে নাম পেয়েছিল বোধহয় রাধেশ্যামের। অথবা সন্দেহ করেছে। কানা-ন্যাপলা ক'দিন খুব আনাগোনা করছে ঃ ম্যানেজার থাকবে না। ওই ফাঁকে জাল নিয়ে পড় রাধেশ্যাম, খোঁজদারির অর্ধেক ভাগ কিন্তু আমার। ন্যাপলাটা ঐ রকম কানে মন্তর না দিলে রাধেশ্যাম কক্ষনো আর যেত না। চক্রান্ত করে ফাঁদে নিয়ে ফেলল।

গগন বলে, আচ্ছা, এক্ষুনি যাচ্ছি আমি। আমি গিয়ে জাল খালাস করে আনি। জগা, নৌকো ছেড়ে এলে কেন গো? জল থমথমা হয়েছে, রওনা হবার যোগাড় দেখ।

জগা ঘাড় নাড়ে ঃ বলাই আর পচা যাক আজকে। হর ঘড়ুই কী দরকারে যাচ্ছে, সে-ও দু-টান বোঠে টেনে দেবে। বজ্জাত লোক, সঙ্গে থাকব।

এই মুশকিল! গিয়ে তো গরম গরম বুলি ছাড়বে, অমনি বেধে যাবে দস্তুরমত। গগন বোঝাতে যাচ্ছে ঃ মাথা গরম করো না জগা। খবরদার! যে সয় সে-ই রয়। ঘটনার শতেক গুণ হয়ে বাবুদের কাছে রটনা যাবে। ওরা ছুতো খুঁজছে। ছুতো পেলে আদালত অবধি গড়াতে পারে। আমাদের উঠতি ব্যবসায়ে চোট পড়বে, যা বলবার আমি বলব, তোমার মুখ বন্ধ। বুঝলে?

চৌধুরিগঞ্জের আলায় গিয়ে বলে, এটা কী হল অনিরুদ্ধ? বাদার দাঁত্যিদানোগুলো বিষম তড়পাচ্ছে, আমি যে আর সামাল দিয়ে পারিনে। পাকা লোক হয়ে এ তুমি কী করলে?

অনিরুদ্ধ বিচলিত নয়! যথারীতি খাতির করে মাদুর পেতে দিল ঃ বসো বড়দা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। জগন্নাথ, বসে পড়। তামাক খাও।

কালোসোনা কলকে ধরিয়ে আনে। তামাক খেতে খেতে কথা চলছে। গগন বলে, মারধোর করতে গেলে কেন? বন্দুর নিয়ম আছে, তার উপরে যাওয়া কি ঠিক?

অনিরুদ্ধ শান্তভাবে বলে, নিয়ম দু-পক্ষের বড়দা। নিয়মটা খাটবে ভেড়ির খোলে যখন ধরা পড়ে। ওরাই বলুক না, জাল কেড়ে নেওয়া শুধু নয়, আলায় সঙ্গে করে এনে তামাক খাইয়ে গল্পগাছা করে তবে ছেড়েছি। পরের দিন হাসতে হাসতে এসে জরিমানার সিকি জমা দিয়ে জাল নিয়ে গেছে। তা বলে আলার খাসপুকুরে আসে কোন্ বিবেচনায়? এটা হল গে বাড়ির পুকুর—এখানে জাল নামানো চোর-ছ্যাঁচোড়ের বৃত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল। তার বেলায় আমাদের নিয়ম নয়, থানা-দারোগার আইন।

জগা বলে, থানা নেই কোন্ মুলুকে। এর পর থানার দারোগা এসে ভেড়ি ঠেকাবে? খোলসা করে বল, আগাগোড়া শুনে যাই।

জগা গরম হচ্ছে দেখে গগন তাড়াতাড়ি বলল, থাকগে, থাকগে। কথায় কথা বাড়ে। জরিমানার সিকিটা নিয়ে জাল দিয়ে দাও অনিরুদ্ধ। আমরা চলে যাই।

জগা গর্জন করে উঠল : জরিমানা কিসের? রাধেশ্যামের গায়ে হাত দিয়েছে, সেটা মুফতে যাবে? এই জন্যে তোমার সঙ্গে এসেছি বড়দা, তোমায় আগলাব বলে। ঘেরি বানিয়ে তুমিও আস্তে আস্তে মেছোচকোত্তিদের মতন হয়ে যাচ্ছ। সোজা কথাটা বলে দাও। ওদেরও জরিমানা। জরিমানায় জরিমানায় কাটাকাটি ; জাল নিয়ে চলে যাচ্ছি। বারদিগর এমন হলে কিন্তু এত সহজে ছাড়ান পাবে না।

জগার এত কথার একটাও যেন অনিরুদ্ধর কানে যায় নি। গগনের দিকে তাকিয়ে বলে, জাল দেওয়া হবে না। সিকি কেন, আধুলি ধরে দিলেও দিতে পারব না। এত বড় একটা কাণ্ড—ছোটবাবুর কাছে খবর যাক, তাঁর কোন্ হুকুম হয় দেখি।

জগা বলে, হাত-পা কোলে করে তদ্দিন রাধেশ্যাম বসে থাকবে?

জগার কথার জবাব দেয় না অনিরুদ্ধ। গগন বলে, জাল আটকে রাখলে রুজি-রোজগার বন্ধ। খাবে কি তা হলে?

খাবে না। কাজটা করেছে কী রকম! উপোস দেবে।

উকিল ভবসিন্ধুর বাড়ি গগন থেকে এসেছে। এধারে সে একটু বাঁকা পথ ধরে : জালই ধরেছ তোমরা। মানুষ ধরতে পার নি। আলার বাইরে এসে রাধেশ্যামকে ধরেছ।

অনিরুদ্ধ বলে, মানুষ কি জালের দড়ি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকবে ধরা দেবার জন্য? দড়ি ফেলে দিয়ে মানুষ পালাল।

গগন কড়া হয়ে বলে, রাধেশ্যামকে বে-আইনি ভাবে মারলে। জাল ফেলেছিল অন্য লোক।

অনিরুদ্ধ আমল দেয় না। বলে, রাধেশ্যাম না-ই হল তো পূর্ণ ফেলেছে। পূর্ণ না হয় মল্লুক মিঞা। মোটের উপর দল নিয়ে কথা! দুটো দল হয়ে দাঁড়াল—একটা চৌধুরি তরফের, একটা নতুন-ঘেরির। নতুন-ঘেরির লোক অপকর্ম করেছে, নতুন-ঘেরির লোকের উপরে তার শোধ গিয়ে পড়ল।

গগন তাড়াতাড়ি জিভ কাটে : ছি ছি, কী রকম কথাবার্তা! পোকা-মাকড় আমরা—আমাদের নিয়ে আবার দল! চৌধুরি-বাবুরা রাজা মানুষ, এক এক রাজ্যি নিয়ে তাদের ঘেরি! বনের মধ্যে দু-হাত জায়গার উপর এক টুকরো চাল তুলে রাঙ্গণের চরণাশ্রয়ে পড়ে আছি, তাঁদের পাশাপাশি আমাদের নাম কোন্ বিবেচনায় করলে? নতুন-ঘেরির দলবেদল নেই, যে যাবে সে-ই বাপের ঠাকুর। ক'দিন গিয়েছ—আরও এস। আসাযাওয়া চলুক, তুমিও আমাদের।

এই বিনয়-বচন জগন্নাথের সহ্য হয় না। অধৈর্য হয়ে সে বলে, থানাই-পানাই ছাড় দিকে বড়দা। কথায় চিঁড়ে ভেজে না। দল আছে বই কি! ওদের দল, আমাদের দল—দল দুটোই। চল—চলে এস। জাল যখন মনিবের হুকুম ছাড়া দিতে পারবে না, এখানে বসে বসে তামাক পুড়িয়ে কি হবে?

গগনের হাত ধরে একরকম জোর করে টেনে আলা থেকে বেরিয়ে পড়ল। অনিরুদ্ধ তখন সকলকে ডেকে বলে, কড়া নজর রাখতে হবে আলার। সড়কিগুলো নতুন হাঁড়িতে ঘষে ধার দিয়ে রাখ। জগার ভাবভঙ্গি ভাল না। আগুনও দিয়ে যেতে পারে চুপিসাড়ে এসে। আমি বাপু একপাও আর আলা ছেড়ে নড়ছি নে। ঘেরির পাহারা কমজোরি হয় হোক, জন আষ্টেক তোমরা সর্বক্ষণ আলা ঘিরে চক্কোর দিয়ে

বেড়াবে। কালোসোনা, তুই সদরে রওনা হয়ে পড়। নৌকোর জন্য বসে থাকিস নে, নতুন রাস্তার পথে হেঁটে হেঁটে চলে যা। ভিটের পাশের অশ্বত্থগাছ আর বাড়তে দেওয়া যায় না। বলবি সেই কথা ছোটবাবুকে। সময় থাকতে উপড়ে ফেলুন, নয় তো শিকড় বসিয়ে আমাদেরই একদিন উচ্ছেদ করবে।

সতেরো

কালোসোনা সদরে চলে গেছে। আর এদিকে সেই রাত্রেই অনিরুদ্ধ আর পাহারার আটজন লোক হন্তদন্ত হয়ে গগনের আলায় এসে হাজির। অন্ধকার। গগন কেরোসিনের বাজে খরচ করে না। আলো জ্বলবে শেষরাত্রির দিকে আলার কাজকর্ম শুরু হবে যখন। আপাতত অন্ধকারের ভিতর সমারোহে গীতবাদ্য চলছে। জগার গলাটাই জোরদার—ঢপাঢপ ঢোলের সঙ্গত হচ্ছে, বাদ্য ছাড়িয়ে অনেক উপরে তার গলা। আলাঘরের বেড়া মাত্র একদিকে। আগে একটা কৌতূহল ছিল, জঙ্গলের একেবারে কিনারে এমন নিঃশঙ্ক ভাবে কী করে থাকে এরা? গান শুনে লহমার মধ্যে প্রশ্নের জবাব মিলে যায়। এ হেন তান-কর্তবের পরে জঙ্গলের কোন জানোয়ার গাঙ পার হয়ে আসতে ভরসা পাবে না। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে মানুষই কানে নিতে পারে কেবল। গায়ক-বাদক ছাড়াও অন্ধকারে বহু লোক শুয়ে-বসে গীতরসে মজে আছে। রসাবেশে ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ কেউ। গীতবাদ্যের ক্ষণেক বিরতি হল তো নাসাগর্জন অমনি কানে আসবে।

অনেকগুলো মানুষ বাঁধ থেকে নেমে উঠোনের দিকে আসছে। গগন তীক্ষ্নকণ্ঠে হাঁক দিয়ে ওঠে, কারা?

অনিরুদ্ধ বলে, আমরা বড়দা। রাধেশ্যাম ওমুখো হল না। তাই জাল দিতে এলাম।

গান-বাজনা বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। জগা বলে, সে কী কথা? জাল কাঁধে নিজে চলে এলে অনিরুদ্ধ—বলি অত বড় চৌধুরিগঞ্জ, তার একটা মানমর্যাদা নেই?

শুষ্ক হাসি হেসে অনিরুদ্ধ পরিহাসটা পরিপাক করে নেয়। বলে, এক দিনের ক্ষতি-লোকসান হয়ে গেল। আবার একটা দিন পড়ে থাকলে গরিব মানুষ মারা পড়বে।

হর বড়ুই ও অন্য ব্যাপারীরা ভিতরের কথা জানে না। গদগদ হয়ে হর তারিপ করে: ভাল, ভাল। আজকেই হয়তো বউ-ছেলেপুলে নিয়ে উপোস দিচ্ছে হতভাগা। গরিবের দুঃখ ক'জনে বোঝে অনিরুদ্ধ? তুমি ভাল লোক।

জগা বিদ্রুপের কণ্ঠে বলে, সে কি, ছোটবাবুর হুকুম এসে গেল ফুলতলা থেকে? একটা বেলার ভিতরে এল কেমন করে?

হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙে চাটি মারবে তাতে নূতনত্ব নেই। অনিরুদ্ধ গায়ে মাখে না। বলে, বিষম মুশকিলে পড়লাম বড়দা, আমাদের নৌকোটা পাওয়া যাচ্ছে না। আগে অত ঠাহর করে দেখিনি, জানি ঠিকই আছে। নয় তো ঘেরির মাছ ধরা বন্ধ করে দিতাম। যাবতীয় মাছ ডাঙার উপর তুলে ঢেলে-বেছে ঝোড়া ভরতি করে যখন নৌকোয় তুলতে যাচ্ছে, দেখা গেল—ঘাটে নৌকো নেই।

গগন আশ্চর্য হয়ে বলে, বল কি! দুই দাঁড়-বসানো সেই নৌকো তো! ঘাটে নেই তবে গেল কোথায়?

তাই যদি জানব, তোমার এখানে আসতে গেলাম কেন বড়দা? যেমন বরাবর

থাকে, শক্ত খ‍ুঁটোর সঙ্গে বাঁধা—

হঠাৎ জগার গর্জনে থতমত খেয়ে অনির‍ুদ্ধ চুপ করে গেল। জগা বলে তোমার নৌকোর খবর তুমি জানবে না—আমাদের কাছে জানতে এসেছ। কোনটা বলতে চাও শ‍ুনি—সরিয়েছি আমরা?

অনির‍ুদ্ধ বলে, রাগ কর কেন, আমি কি বলেছি তাই? যে জিনিস চাক্ষ‍ুস দেখা নেই, তেমন ছেঁড়া কথা অনির‍ুদ্ধ ম্যানেজারের ম‍ুখে বেরোয় না। বলছিলাম যে, নানান জায়গায় ঘোরাফেরা তোমাদের—বলাই ঘোরে, হর ব্যাপারী মশায় ঘোরেন—বলছিলাম, যদি ও'দের মধ্যে কারো নজরে পড়ে থাকে—

জগন্নাথ সটান জবাব দেয়ঃ নজরে পড়ে নি। তুমি যাও।

কিন্তু এক কথায় চলে যাবার জন্যে এই রাত্রে এতখানি পথ জাল ঘাড়ে করে আসে নি। গগনকে উদ্দেশ করে কাতর হয়ে সে বলে, মবলগ টাকার মাছ বড়দা। পচে গেলে বরবাদ হবে। বারো ছ্যাঁচড়ায় কাণ্ডকারখানা—প‍ুটপ‍ুট করে ঠিক গিয়ে বাব‍ুদের কানে পে'ৗছে দিয়ে আসবে। মোটা ফাইন সঙ্গে সঙ্গে।

খপ করে গগনের হাত জড়িয়ে ধরেঃ একেবারে শিরে-সংক্রান্তি। দেরির উপায় থাকলে অন্য কারো ভেড়ি থেকে চেয়েচিন্তে যা-হোক নৌকোর উপায় করা যেত। দিনমান হলে দ‍ূরান্তরে লোক পাঠিয়ে নৌকো ভাড়া করে আনতাম।

এরই মধ্যে চতুর্দিকে ম‍ুখ ঘ‍ুরিয়ে গলাতুলে একবার বলে নেয়, অন্ধকার ঠাহর করতে পারছি নে—ভালমান‍ুষের ছেলেরা রয়েছেন হেথা অনেকে—গা তুলে একটু আপনারা খোঁজখবর করে দেন যদি। এতগ‍ুলো ধারালো চোখ—কারো না কারো নজরে আসবে।

গগন বলে, তোমরাও তো রয়েছ অনেকে, তোমাদের নজরে পড়ল না? বানে ভেসে গেছে মাল‍ুম হয়। হয়তো বা ম‍ুল‍ুকের মধ্যেই নেই।

অনির‍ুদ্ধ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, ভেসে যাবার জো ছিল না বড়দা। ভেসে যায় নি, তোমার পা ছ‍ুঁয়ে বলতে পারি। ডাঙার খ‍ুঁটোর সঙ্গে কাছি করা। খালের মধ্যে বলাঝোপ—ঝোপের ভিতর নৌকো ঢুকিয়ে রাখা হয়। ঝড়-ঝাপটা যাতে না লাগে। দেখলাম, খ‍ুঁটো যেমন-কে-তেমন রয়েছে—

গগন বলে, বাঁধন তবে আলগা ছিল। কাছি কেমন করে খ‍ুলে গেছে।

আমিই বেঁধেছিলাম নিজের হাতে। অন্য কেউ হলে না হয় তাই ভাবতাম। খ‍ুলে যায় নি বড়দা, কেউ খ‍ুলে দিয়েছে।

জগা হি-হি করে হেসে ওঠেঃ তাই নাকি? আহা, কাকে মতিচ্ছন্নে ধরল গো! কোটালের টান—তবে তো কাঁহা-কাঁহা ম‍ুল‍ুক চলে গেছে তোমার নৌকো। কিংবা দহে পড়ে ড‍ুবেছে। কালীতলায় পাঁঠা মানত কর—তিনিই যদি জ‍ুটিয়ে-প‍ুটিয়ে দিয়ে যান।

কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে অনির‍ুদ্ধ বলে, পাঁঠার ম‍ুল্য পাঁচ সিকে। মানত-টানত কি—নগদ ফেলে দেব। এখানেই নগদ দিয়ে যেতে পারি মা-কালী যদি ঘাটের নৌকো ঘাটে হাজির করে দেন। কিংবা কোন্‌খানে আছে, স‍ুল‍ুকসন্ধান দিয়ে দেন একটা—

বলে জবাবের প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে। ওদিকে চুপচাপ। শলাপরামর্শ হচ্ছে অথবা কি করছে, অন্ধকারের ভিতর বোঝা যায় না কিছ‍ু। অবশেষে অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে, ও জগন্নাথ, শ‍ুনতে পেলে? আর দেরি হলে ফুলতলার বোট ধরা যাবে না। ওঠ। নিদেনপক্ষে ম‍ুখে বলে দাও একটা কিছ‍ু—

ক্ষণবিরতির পর জগা হঠাৎ গান গেয়ে ওঠে :

শুনগো আয়ান দাদা, জলে যেতে করি বাধা,
এমন অবাধ্য রাধা তবু জলে যায়।
কুল-মজানি রাজার মেয়ে, দাদা তুমি করলে বিয়ে,
ভাগ্নের বাসা কদমতলায়, জাতি রাখা দায়।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঢোল-বাদ্য। আর কত্তালের খচাখচ আওয়াজ। অনিরুদ্ধরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। উত্তাল আনন্দে গান চলেছে। আপাতত থামবার লক্ষণ নেই। মাথায় আগুন জ্বলছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শোনার সময় কোথা? হন্তদন্ত হয়ে অনিরুদ্ধ বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত রাত্রি চৌধুরিগঞ্জে কেউ ঘুমোয় নি। ঝোড়া ঝোড়া মাছ—অত টাকার মাল—চোখের উপর পচে যাচ্ছে, কোন-কিছু করবার নেই নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া। এ বনরাজ্যে ভাড়ার নৌকো হুকুম মাত্রেই মেলে না—কুমিরমারি অথবা আরও আগে চলে যেতে হবে। সময় বিশেষে সেই ফুলতলা অবধি। গোলপাতা কিংবা কাঠ কাটতে অথবা চাক ভাঙতে যারা আসে, তাদের ভারী ভারী নৌকো। সে সব নৌকো ভাড়ার নয়।

অনিরুদ্ধ অস্থির হয়ে বেড়িয়েছে—খাল ও গাঙের ধার ঘুরেছে বারংবার। গাছ-পালা জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে, চোখের ভুলে কী রকমটা মনে হয়েছে, ছুটে গিয়েছে সেই দিকে। নৌকো ভাসতে ভাসতে হয়তো বা এই জঙ্গলে আটকে আছে। অথবা রহস্যজনক উপায়ে এসে পেঁছিয়েছে। এত কান্নাকাটি করে বলে এল—মনে মনে করুণা হতে পারে ওদের। অকারণ ছুটোছুটি করেছে, আশাভঙ্গ হয়েছে বারংবার, অনুকুল-বাবুর কানে উঠলে কী কাণ্ড হবে সেই শঙ্কায় কেঁপেছে, শাপশাপান্ত করেছে গগন আর তার দলবলের সাতগুষ্টি ধরে। সারা রাত্রি কেটে গিয়েছে এমনি। সকালবেলা দেখা গেল, বাগদী-বুনো-তিওর, যারা এখানে-ওখানে ঘরবসত করে, একে দুয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে দিব্যি এক জনতা হয়ে দাঁড়াল।

রাত-জাগা রাঙা চক্ষু মেলে অনিরুদ্ধ হাঁক দেয়, কী—কী চাই তোমাদের! মজা দেখতে এসেছ?

সবে এই ভোরবেলা। রাতের ভিতরেই কেমন রটনা হয়ে গেছে, চৌধুরিগঞ্জের নৌকো সরিয়ে নিয়েছে। অঢেল মাছ পড়ে আছে আলার উঠানের উপর। মজা দেখতে আসে নি কেউ। এত মাছ পচিয়ে নষ্ট না করে বিলিয়ে দেবে নিশ্চয়। সামনে গিয়ে পড়লে খাবার মাছ নির্ঘাত মিলে যাবে, গাঙে-খালে ধরতে যেতে হবে না। সেই মতলবে এসেছে সব।

অনিরুদ্ধ চেঁচিয়ে ওঠে, চলে যাও বলছি। মানুষে শয়তানি করল তো কোন মানুষের ভোগে যাবে না, এর একটা মাছ। কাক-চিলের মুখে দেব। গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসব।—মুখের কথাই শুধু নয়। রাগের বশে সত্যিই গাঙে ঢেলে দিয়ে এল ঝোড়া ঝোড়া মাছ। নিজের আলার এতগুলো মানুষের জন্য দুটো-পাঁচটা রেখে দেবে, তা-ও প্রবৃত্তিতে এল না। দুপুরবেলা খেতে বসে শুধু ভাত—নুন আর তেঁতুল মেখে জল ঢেলে কোন গতিকে গলাধঃকরণ করল।

কিন্তু রোজ এত ক্ষতি সইবে না। ভাড়ার নৌকো ঘাটে নিয়ে এসে তবে এর পরে ঘেরির জলে জাল নামাবে। একটা দিনেই বিস্তর বরবাদ, বেশী দিন না চলে ব্যাপারটা।

অন্যের উপর ভরসা না করে অনিরুদ্ধ নিজেই ছুটেল তিন মরদ সঙ্গে নিয়ে। প্রহর-খানেক রাতের মধ্যে আজকেই নৌকো সহ ফিরবে, যত ভাড়া লাগে লাগুক। সে আর ঐ তিন মরদ মোট চার জনে ভাড়ার নৌকো তীরবেগে ছুটিয়ে আনবে।

যে যে-দিকের কথা বলছে, সেইখানে চলে গিয়েছে। সন্ধ্যার সময় অনিরুদ্ধ হতাশ হয়ে ফিরে গেল। সঙ্গের তিন জন চলে গেছে আরও এগিয়ে। নৌকো যোগাড় করে নিয়ে তবে তারা আসবে। অনিরুদ্ধের উপর আলার ভার। তার পক্ষে বেশী দূরে যাওয়া চলে না। রাত্রিবেলা আলায় তাকে থাকতেই হবে। বিশেষ করে, হালে যেরকম গতিক দাঁড়িয়েছে। নৌকো সরিয়ে দিয়েছে, আরও ওদের কী সব মতলব, কে জানে!

আলায় এসে সোয়াস্তি হল। কনস্টেবল এসে গেছে ইতিমধ্যে। দু-জন। ছোট-বাবু ব্যবস্থা করেছেন থানাওয়ালাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। তারা এসেই হাঁকডাক করে সিদে সাজিয়ে নিয়েছে। ঘি আর কোথায় মিলবে? বুনোপাড়ায় লোক পাঠিয়েছিল দুধের জন্য। সন্ধ্যাবেলা দুধও জোটানো গেল না। সকালে ঘোষ দুয়ে তারা দুধ পাঠিয়ে দেবে। অগত্যা ডাল আনিয়ে নিল বরাপোতা লোক পাঠিয়ে। কানা-ন্যাপলা আপাতত দামটা দিয়েছে, অনিরুদ্ধ এসে পড়লে তার থেকে নিয়ে নেবে। আর এদিকে মাছের তাগিদ দিচ্ছে কনস্টেবলরা, মছলি ধরেছে দেশ-ভুঁই ছেড়ে এই তল্লাটে আসার পর; মছলি বিহুনে এখন অন্ন রোচে না। হুকুম করছে আলার ঐ খাসপুকুরে জাল নামিয়ে দিতে। বাবুদের জন্য জিয়ানো মাছ—আলার মানুষ টাল-বাহানা করে—অনিরুদ্ধ আসুক, সে এসে যেমন বলে সেই রকম হবে, দায়িত্বটা তার উপরে পড়ুক। অনিরুদ্ধ এসে সকলকে এই মারে তো এই মারে। সরকারী মানুষের ভোগে লাগবে না তো বাবুরা পুকুর কেটে মাছ ছেড়ে রেখেছেন কি জন্য? করেছিস কি এতক্ষণ ধরে উজবুকগুলো? এখন মাছ ধরবি, সেই মাছ কোটা-বাছা হবে, রান্না চাপবে, তারপরে তো খাওয়া-দাওয়া! কি হবে বলুন হুজুররা, রাতটা কি ডালের উপর চলবে? সকালবেলা ঘেরির হোক পুকুরের হোক মাছে মাছে ছয়লাপ করে দেব।

হুজুররা ঘাড় নাড়েন। মুলতুবী ব্যাপারে একদম আস্থা নেই। রাত তা কি হয়েছে? রাত জাগতেই তো আসা। রাঁধাবাড়ায় না হয় রাতটুকু কেটে যাবে।

লাল রঙের মোটা চাল, সে বস্তু হাঁড়িতে চাপাবার পূর্বে জলে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিতে হয়। নয়তো সিদ্ধ হবে না। রান্না সমাধা হতে দেরি যখন হবেই আপাতত সেই ভিজা চালগুলো গুড় সহযোগে কড়মড় করে চিবিয়ে হুজুরদ্বয়ের ক্ষুধা-শান্তি হল। পরের কিস্তিতে চাল সিদ্ধ করে নিয়ে পাঁচটা তরকারির সঙ্গে মউজ করে হবে। খাসপুকুরে জাল নামাতে হল ঐ রাত্রে। মন ভাল নয়। কত টাকার মাল পচে বরবাদ হল দিনমানে আলার উপর, এই আবার এখনই ভোজ জমানোর স্ফূর্তি আসে না। কিন্তু সরকারী লোকে তা শুনতে যাবে কেন? মাছ ধরে রান্নাবান্না শেষ হতে আড়াই প্রহর। গুরু-ভোজন অন্তে বন্দুক ঘাড়ে বাঁধে বাঁধে টহল দেবার তাগত কোথায়? টহল না দিয়ে ঐ বন্দুক শিয়রে রেখে পড়ে যদি ঘুমোয়, তাতেও ক্ষতি নেই অবশ্য। চারিদিকে চাউর হয়েছে, চৌধুরিগঞ্জে কনস্টেবল মোতায়েন। মাছিটিও উড়ে আসবে না আর এ দিগরে।

পরের দিন কাটল। অনিরুদ্ধ আলা ছেড়ে নড়তে পারে না, কনস্টেবলের খেদ-

মধ্যেই চোপহর কেটে গেছে। সেই তিন মরদ আজও ফিরল না—তার মানে, নৌকো সংগ্রহ হয় নি। নৌকোয় চেপে ফিরবে তারা। ঘেরিতে জাল নামানো হয় নি—আরও একটা দিন অতএব বিনা কাজে কাটল। প্রচুর লোকসান। তার পরের দিনও ঠিক এমনি। তিনদিনের ভিতর একটা নৌকো জোটানো যায় না, এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। সারাদিন সবগুলো মানুষের পথ তাকিয়ে কেটেছে। সন্ধ্যার সময় দেখা গেল, সুদাম আসছে বাঁধের উপর দিয়ে। তিন মরদকে ছেড়ে এসেছিল, তাদের একটি। অনিরুদ্ধ ছুটে চলে যায় ততদূর অবধি।

কী কাণ্ড! মোটে ফিরিস নে তোরা। আমি ভাবছি, তোদের কুমিরে খেয়ে ফেলল, না দেশের সমস্ত নৌকো পুড়ে জ্বলে গেল একেবারে?

ঠিক তাই-ই বটে! এ-ঘাটে ও-ঘাটে, এ-বন্দরে ও-বন্দরে খোঁজা-খুঁজি করতে করতে শেষটা শহর ফুলতলা। আর ফুলতলায় গিয়েছে যখন, যাঁদের নুন খাচ্ছে তাঁদের একটু চরণধূলি না নিয়ে ফেরে কেমন করে! তাঁরাই আটকে রাখলেন: ভাড়া-করা নৌকোয় ভাল মতন কাজ হবে না, নৌকো ভাড়া করে চৌধুরিগঞ্জের কাজ-কারবার চালানো অপমানের কথাও বটে। অন্য কোন্ ঘেরির জন্য নতুন নৌকোয় আলকাতরা মাখাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি একটা-দুটো পোঁচ সেরে নৌকোটা দিয়ে দিলেন ছোটবাবু। আর দেখ গে, সেই নৌকোর গায়ে কাছি নয়, লোহার শিকল। তাতে মস্তবড় বিলাতী তালা। গাছের সঙ্গে শিকল জড়িয়ে তালা আঁটিবে, গাছ না কেটে কেউ নৌকো খুলে নিয়ে যেতে পারবে না। পইপই করে ছোটবাবু বলে দিলেন, খোঁটার সঙ্গে নৌকো বাঁধা আর নয়—মোটারকমের গাছ দেখে নিয়ে সেই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

অনিরুদ্ধ চেঁচিয়ে তোলপাড় করে: ওরে, কোথায় গেলি সব? জাল নামিয়ে দে এক্ষুনি। নৌকো এসে গেছে। তিন দিন হাত কোলে করে বসে আছিস। শালতিগুলো কোথায়, টেনে আলার নিচে নিয়ে আয়।

সুদামকে বলে, ওরা দু-জন নৌকোয় বুঝি! তা ভাল। কোন্ দিকে রেখে এলি নৌকো?

সুদাম বলে, বক্সার পাশে হরগোজা-বনের ঐখানটা গুঁজি মেরে বসে আছে। ঘাটে নিয়ে যাবে কিনা, জানতে এসেছি।

অনিরুদ্ধ বলে, কী ন্যাকার মতন বলিস! ঘাটে নয় তো ঐ ফাঁকার মধ্যে চোপহর চাপান দিয়ে থাকবে?

সেই তো বার্তা নিতে এলাম। চুরি হয়ে গেল কিনা ঘাট থেকে। এবারে কিছু হলে মুণ্ডু কেটে নেবে, বলে দিয়েছে ছোটবাবু।

সন্ধ্যে থেকে একজন কেউ নৌকোয় শুয়ে থাকবে। শুনে নাও তোমরা সকলে। ধর্মের ভরসায় আর নয়। আর ছোটবাবু যেমনটা বলেছেন, ঘাটের উপর বানগাছ—তার সঙ্গে শিকল জড়িয়ে তালা এঁটে দেবে। কোন্ হারামজাদা কি করতে পারে এবার দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে গলা খাটো করে বলে, ছোটবাবু আর কি বললেন রে সুদাম?

সুদাম বলে, রাত্তিরবেলা তুমি তো মাছের নৌকোয় যাচ্ছ চলে। জোর তলব। কালোসোনাকে দিয়ে হুকুম আগেই পাঠিয়েছেন। সে কিছু বলে নি?

বলবে না কেন! কিন্তু তুই আর কি শুনে এলি, তাই বল। মতলবটা কি—আমার কোন দোষ ঘাট? চোরে চুরি করে নিয়ে গেল, আমরা তার কি করব? তলব পাঠায় তবে কেন?

কথা বলতে বলতে সুদামের সঙ্গে অনিরুদ্ধ ঘাট অবধি চলে গেল। কোন্ গাছে শিকল জড়াবে, সেটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য। ঘাটে গিয়ে দেখে—কী আশ্চর্য, হারানো নৌকোটা গোলঝাড়ের আবছা আঁধারে এগোচ্ছে-পিছোচ্ছে, মাথা দোলাচ্ছে স্রোতের সঙ্গে। এবং কাছি-করা রয়েছে ডাঙার সেই খোঁটার সঙ্গেই। ফিরে এসেছে নৌকো। মানুষ হলে বলা যেত, পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যেমন-কে-তেমন ফেরত রেখে গেছে। কিন্তু গগনের আলায় গিয়ে এত যে কান্নাকাটি করে এল—সেই দিন ফিরলে ফুলতলা অবধি এতখানি জানাজানি হত না।

আঠার

বিনোদিনী ভাবনায় পড়েছে। ধান তো আউড়ির তলায় এসে ঠেকল। ক্ষেতেলরা নতুন ধান দিয়ে যাচ্ছে না। উপায় কি হবে? মেয়েমানুষ—চাষীপাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়তেও পারে না। একদিন দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল উর্ধ্ব মোড়লের সঙ্গে। ঐ পথের উপরেই সে করকর করে ওঠে: কেমন আক্কেল তোমাদের মোড়ল! তোমাদেরই দশজনের উপর ভরসা করে সে-মানুষ বিদেশ বেরুল। দুটো মেয়েলোক ভিটের উপর পড়ে আছি, তোমরা দায়েবেদায়ে দেখাশুনো করবে। সে পড়ে মরুক, হকের পাওনা নিয়েই টালবাহানা।

উর্ধ্ব বলে, অজন্মার বছর। সময়ে জল হল না, খরার টানে ধান শুকিয়ে চিটে। দিই কোত্থেকে মা?

কিন্তু পেট তা বলে মানে না। দশের বিচারে গেলে তারাও মানবে না। গুলো-বন্দোবস্ত নিয়েছ—যেবারে বেশী ফলন, সেবারে কি এক মুঠো ধান বেশী দিয়ে থাক?

সে তো সত্যি! দেখি, ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ষোল-আনা না হোক, কতক তো দিতেই হবে।

এমনি সব বলে উর্ধ্ব সরে পড়ে সামনে থেকে! বিনোদিনী জানে, পারতপক্ষে আর দেখা দেবে না। নগেনশশীও যাতায়াত ছেড়েছে। অনেক দিন তার দেখা নেই।

ভাইয়ের তল্লাসে বাপের বাড়ি গেল সে একদিন। বলে, সে মানুষ কোন্ মুলুকে গিয়ে পড়ে রইল, একখানা চিঠি লিখে খোঁজ নেয় না। তুমিও মেজদা ওপথ মাড়াও না, একেবারে ভুলে বসে আছ।

নগেনশশীর কণ্ঠ গদগদ হয়ে উঠে: মায়ের পেটের বোন, বত্রিশ পাক নাড়ির বাঁধন। ভোলা চাট্টিখানি কথা! কিন্তু কী করা যাবে! যা ননদখানা তোর—মারমুখী হয়ে পড়ে, অকথা-কুকথা শোনায়।

একটুখানি চুপ করে থেকে বলে, বলেছে কি জানিস? কুড়ালের উল্টোপিঠের ঘায়ে আমার ডান-পাখানাও জখম করে দেবে। এর পরে কোন্ সাহসে যাওয়া যায় বল।

হেসে উঠে বিনোদিনী সমস্ত ব্যাপার লঘু করে নিতে চায়: হ্যাঁ, পা ভেঙে দেবে! ঠাট্টার সম্পর্ক—ঠাট্টা করে কি বলল, অমনি তুমি ভয় পেয়ে গেলে।

ভয় পেতেই হয়। অতি নচ্ছার মেয়েমানুষ। কুড়াল না মারুক, বদনাম রটিয়ে দিতে কতক্ষণ। দশে আমায় মানে গণে, সেই জন্যে সামাল হয়ে চলতে হয়।

তারপর বলে, তা নাই বা গেলাম। দরকারটা কি শুনি? যেটারা ধান দিচ্ছে

না, এই তো ? আমি বলে দিয়েছি, আবার বলব। মাতব্বর কটাকে ডাকিয়ে এনে আচ্ছা করে কড়কে দেব একদিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিনি, তোদেরই বা হাঙ্গামা পোয়াবার দরকারটা কি ? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় কেন, বুঝতে পারি নে। সোজা চলে আয় আমাদের বাড়ি। আগে বলেছি, এখন আবার বলি। যদি ভাবিস, আমাদের ভাত কেন খেতে যাবি। কিন্তু ভাত আমাদের হল কিসে ? তোদেরই ধান-চাল ভেনেকুটে আমাদের বাড়ির উপর বসে খাবি। এখানে থাকলেও বর্গাদারেও বুঝবে, পিছনে লোকবল আছে। নিজেরা কাঁধে বয়ে পাওনা ধান শোধ করে দিয়ে যাবে। তাই বুঝিয়ে বল গে তোর ননদকে। দুটো সোমত্ত মেয়েমানুষ আলাদা পড়ে থাকিস, লোকেও সেটা ভাল দেখে না।

বাড়ি ফিরে বিনোদিনী সেই কথা বলে। চারু ঝেড়ে ফেলে দেয় : ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী তুমি চলে যাও ওখানে। আমি কোন্ সুবাদে যেতে যাব ?

বিনোদিনী ভয় দেখানোর ভাবে বলে, সত্যি যদি চলে যাই, থাকতে পারবি একলা ভিটের উপর ?

কেন পারব না ? আমারও ভায়ের ভিটে। কত জোর এখানে ! ভাই আমায় রেখে গেছে তার ভিটের উপর।

এর মধ্যে আবার এক অন্য উৎপাত। একদিন চারুবালা গোলায় সাঁঝ দেখাতে যাচ্ছে, টুক করে এক টুকরা মাটির ঢিল গায়ে পড়ল। তেঁতুলতলার দিক থেকে। ঝাঁকড়া-ডালপালা পুরোনো তেঁতুলগাছ বাড়ির বাইরে রাস্তার পাশে—ছোটবেলা ঐ তেঁতুলগাছের ভয়ে চারু সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরুত না, দায়েবেদায়ে বেরুতে হলে ওদিকে তাকাতে না চোখ তুলে। গাছের ডালে ডালে ভূত-পেত্নী ব্রহ্মদৈত্য হোঁদল-কুতকুতে যাবতীয় অপদেবতার চলাচল। বড় হয়ে ভূতের ভয় ভেঙেছে, কিন্তু ঐ গাছতলা থেকেই তো ঢিল এসে পড়ল।

আর ক'দিন পরে—ভূত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে—উঠানের আর ঘরের বেড়ায় দমাদম ঢিল পড়তে লাগল। সবে সন্ধ্যা গড়িয়েছে। কিন্তু মেঘলা আকাশের নিচে বড় অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। ভরত রাতে এসে দাওয়ায় শোয়, সেই ব্যবস্থা চলছে এখনও। রাতের খাওয়াটা এ-বাড়ি, সেইটে মুনাফা। কিন্তু তার এখনো আসবার সময় হয় নি।

দুই মেয়েলোক পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। মানুষজন এসে পড়ল। কি, কি হয়েছে ? ঢিল পড়েছে তো কি হল ? বজ্জাত লোকের উৎপাত।

ভরত এসে পড়লে পাড়ার মানুষজন চলে গেল। চোখ ঠেরে চাপা গলায় কেউ বলতে বলতে যাচ্ছে, ডবকা ছুঁড়ী ঘরে পুষে রেখেছে—ভূত-প্রেত তো নেমতন্ন করে ডেকে আনা। তা ছাড়া আবার কি !

সকালবেলা ওপাড়া অবধি রটনা হয়ে গেল। নগেনশশী হন্তদন্ত হয়ে এসেছে : আর জেদ করিস নে বোন। চল্ আমাদের বাড়ি।

বিনি চারুবালাকে ঠেস দিয়ে বলে, মানী ঘরের মেয়ে—ও কেন যাবে ? পায়ের বেড়ি ঝেড়ে ফেলে আমিই বা যাই কেমন করে ?

ভাগ্যিস ছিল না চারু। থাকলে কুরুক্ষেত্র বাধত। চারু আসছে দেখে নগেন তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ ধরে : ঊর্ধ্ব দেখা করে গেছে তো এসে ? আমি নিজে গিয়ে বলে এলাম।

নগেনশশীর উপর চারু কোন দিন প্রসন্ন নয়। আজকে আরও কি হয়েছে,

কথা পড়তে দেয় না, থরথরিয়ে বলে ওঠে : এই সর্বনাশ ! নিজে সেখানে গিয়ে পড়েছিলেন ?

নগেন নিজের বোনের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে : কথা শোন রে বিনি। অত করে তুই বলে এলি, বর্গাদারের বাড়ি নিজে চলে গেলাম। সেই জন্যে দোষ হয়ে গেল আমার ?

এদ্দিন এর-তার মারফতে বলে বলে পাঠাচ্ছিলেন, এবারে নিজ মুখে বলে এলেন : বউদির তাগাদায় কেউ কেউ যদিই বা দোমনা হয়েছিল, এর পরে এক চিটে ধান আর কেউ দেবে না।

নগেনশশী আর্তনাদ করে ওঠে : ও:, এত বড় কলঙ্ক আমার নামে ! আমার বোন উপোস করে মরবে—মানা করে দেওয়ার স্বার্থ কি আমার শুনি ?

হাসিমুখে সহজ কণ্ঠে চারু বলে, কায়দায় ফেলে আমাদের অন্দরে নিয়ে ফেলবেন। তার উপরে আরও কোন মতলব আছে কিনা ঠিক জানি নে—যাতে ধোপা-নাপিত বন্ধ হয় না, সমাজের লোকের সঙ্গে পাত পেতে খাবারও অসুবিধে ঘটে না।

প্রথমটা নগেনশশী তলিয়ে বোঝে নি। বুঝে তার পরে ফেটে পড়ল : শোন্, শুনলি তো বিনি ? এই জন্যে আসি নে তোদের বাড়ি।

চারু বলে, দিনমানে আসেন না, আসেন রাত্রে। বাড়ির ভিতরে আসেন না, আনাচে-কানাচে আসেন। ভূত হয়ে ঢিল-বৃষ্টি করেন।

নগেনশশী গর্জন করে ওঠে : কে বলেছে ?

মানুষ কেউ নয়—বলেছে, আপনার খোঁড়া পা। ভিজে মাটির উপর পায়ের দাগ—একখানা পা পুরোপুরি, আর এক পায়ের শুধু আঙুল। তাই তো দেখে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু শুনে রাখুন—

চোখ তুলে সোজাসুজি তাকায় নগেনের দিকে : ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না। দাদার মত চাই। তিনি যদি ও-বাড়ি গিয়ে থাকতে বলেন, তবেই।

এ কথায় নগেন নরম হয়ে গেল : কোথায় পাওয়া যাবে তাকে ? কুমিরমারি ছিল, সেখান থেকে বয়ারখোলা। তার পরে আর পাত্তা নেই।

চারু ভারী গলায় বলে, তাড়িয়ে তাড়িয়ে দাদাকে আমার জঙ্গলে নিয়ে তুলল। আমিও যাব চলে। মানুষের চেয়ে জঙ্গল ভাল।

বিনোদিনী সজল কণ্ঠে বলে, কাজ নেই টাকায়। ফিরে আসুক। না হয় এক বেলা খেয়ে থাকব সকলে মিলে। খোঁজ কর তুমি মেজদা।

চারু বলে, মন করলে খোঁজ নেওয়া যায়। কুমিরমারি বিলেত জায়গা নয়, যাওয়া যায় সেখানে। কেউ না যায় আমি বেরিয়ে পড়ব কাউকে কিছু না বলে। মেয়েমানুষ বলে মানব না। পুরুষে না পারে তো আমি খুঁজে বের করব আমার ভাইকে।

উনিশ

অনেক রাত্রি। জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মাছ-মারারা। নিঝুম চারিদিক। রাধেশ্যাম ছুটতে ছুটতে নতুন আলায় উঠে এসে ঝপ করে হাতের জাল ফেলে দিল। কাঁপছে ঠকঠক করে। গগন মাচার উপরে শুয়েছে, ব্যাপারীরা মেঝের এদিকে-সেদিকে। শব্দসাড়ায় জেগে উঠে কেউ তড়াক করে উঠে বসল, চোখ রগড়াচ্ছে কেউ বা অমনি শুয়ে শুয়ে।

কি সমাচার রাধেশ্যাম ? হল কি, ফিরে এলে কেন ?

রাধেশ্যাম বাইরের দিকে আঙ্গুল দেখায়। কী বলতে চাচ্ছে মুখ দিয়ে অপকার কথা বেরোয় না। বেড়ার একবারে কাছ ঘেঁষে চলে এল। ফিসফিসিয়ে অনেক কষ্টে বলে, বড়-শেয়াল ইদিক পানে ধাওয়া করেছে।

বাদাবনে শিয়াল নেই। বড়-শিয়াল হল বাঘ—বাঘের নাম করতে নেই, বড়-মিঞা বড়-শিয়াল ভোঁদড় এমনি সব নামের পরিচয়। ঘুমের লেশমাত্র নেই আর কারো চোখে। লাঠি রামদা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এখান-ওখান থেকে। লহমার মধ্যে সকলের সশস্ত্র। জ্যোৎস্না ফুট ফুট করছে, খাল-পারে বনের কাল কাল গাছপালা সুস্পষ্ট নজরে আসে। বাঘ নাকি এপারে আসছিল জোয়ারে জল সাঁতরে। ভাসানো মাথা দেখতে পেয়ে রাধেশ্যাম দৌড় দিয়েছে।

কিন্তু আসতে আসতে গেলেন কোন দিকে প্রভু ? পাখনা মেলে আকাশে উড়লেন ? না জোয়ারে গা ভাসিয়ে চললেন সুন্দরের মানবেলা মুলুকে ? সতর্ক চোখে সকলে বাঁধের দিকে তাকিয়ে। চোখের পলক পড়ে কি না পড়ে। কামরার দরজা খোলা। ঐটুকু ঘরে এত লোকের জায়গা হবে না। নয় তো ঢুকে পড়ত সকলে এতক্ষণ। দরজা তবু খুলে রেখেছে, সত্যি সত্যি বিপদ এসে পড়লে ওরই ভিতরে ঠাসাঠাসি হয়ে দরজা দেবে। বাঘের পার হয়ে আসা অবিশ্বাস্য কিছু নয়। হরিণ মারতে কিংবা মধু কাটতে ইচ্ছে হল তো আমাদের মানুষ বনে গিয়ে ঢোকে। বাঘও তেমনি মুখ বদলাতে কখনোসখনো ফাঁকায় চলে আসে। সুস্বাদু নরমাংসের কথা ছেড়ে দিন, আজেবাজে মাংসও সকল দিন জোটে না—জঙ্গলের জীবগুলো এমনি ত্যাঁদোড় হয়ে গেছে। পেটের পোড়ায় বাঘ তখন ভাঁটা সরে-যাওয়া চরের উপর চুনোমাছ ধরে ধরে খায়। ছাতু খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে, তারপর পোলাও-কালিয়ার লোভে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ একদিন।

কিন্তু বাঘ পার হয়ে এলে এতক্ষণে ঠিক বাঁধের উপর দেখা যেত। এমন জ্যোৎস্নার আলোয় চুপিসাড়ে কিছু হবার জো নাই। রাধেশ্যাম, কি দেখে এলি বল্ তো ঠিক করে—

হরি, হরি ! রাধেশ্যাম্ কোন সময় সকলের পিছনে গিয়ে বেড়া ঠেস দিয়ে বসে ঘুমুচ্ছে। মুখে ভকভক করছে গন্ধ। তাড়ি গিলেছে। জালে না গিয়ে বেটার ঘুমোবার গরজ ছিল আজকে। প্রায়ই হয় এমন আর বউয়ের সঙ্গে কোন্দল বেধে যায়। ভেবেচিন্তে আজকে এই বাঘের গল্প বানিয়েছে। এখন বেঁহুশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, মরবে কাল কাঠ-কাঠ উপোস দিয়ে।

পরের দিন ভোরবেলা। সূর্য ওঠে নি তখনো। মাছের ডিঙি রওনা হয়ে গেছে। কাজকর্ম সেরেসুরে গগন বনঝাউয়ের এক টুকরো ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করছে আলার উঠানে দাঁড়িয়ে। দেখা গেল, খালের ঘাটে শালতি-ভোঙা এসে লাগল। কে-একজন ডাঙায় নেমে এলো শালতি থেকে। শালতি ভেড়ির কাজ-কর্মে লাগে, বাইরের নদী খালে বড় বেরোয় না। স্রোতের মুখে পড়লে বিপদ আছে। দূরদূরান্তর কেউ শালতিতে যায় না। অতএব মানুষটা আসছে কাছাকাছি জায়গায়। কোন্ লাট-সাহেব হে—পায়ে না হেঁটে শালতি চেপে আসে ! কৌতূহল ভরে গগন তাকিয়ে রয়েছে।

কালো রং, রোগা-লিকলিকে দেহ, কাঁধের উপর ধবধবে উড়ানি। আসছে এদিকেই বটে। উঠানের উপর এসে চতুর্দিক একবার তাকিয়ে দেখে নিল।

জগন্নাথ তুমিই নাকি হে ?

গগন বলে, জগা কোথা এখন ? কুমিরমারি ছুটল নৌকো নিয়ে। আমার নাম শ্রীগগনচন্দ্র দাস।

আরে, তুমিই ঘেরিদার। কী মুশকিল—সেই একটুক্ষণের দেখা তো—গোড়ায় ধরতে পারি নি।

তারপর একগাল হেসে বললেন, আমি কে বল দিকি ?

গগন বলে, ভরদ্বাজ মশায়। ঘেরির বন্দোবস্ত আপনিই তো দিয়ে দিলেন। আপনাকে চিনব না ?

গোপাল ভরদ্বাজ চোখ ঘুরিয়ে চারিদিক ভাল করে একবার দেখে নিলেন। বললেন বেশ, বেশ ! বড্ড খুশী হলাম। যার বুদ্ধি আছে, ধুলোমুঠি থেকে সে সোনা খুঁটে বের করে। সেই কথা বলছিলাম ছোটবাবুকে। ছটাক খানেক চরের জঙ্গলে জমি নিয়ে তার উপর গগন দাস পেল্লায় সায়েব জমিয়ে বসেছে। যত রাজ্যের মাছ এসে পড়ছে।

গগন অবাক হয়ে বলে, সায়েব বলেন কাকে ? এ দিগরে কোন সায়েব আছে বলে তো জানি নে। চরের উপর সামান্য একটু ঘেরি দিয়ে বসেছি।

ভরদ্বাজ দরাজ ভাবে হেসে ওঠেন : ঐ হল। যার নাম চাল-ভাজা, তার নাম মুড়ি। নামে না হোক, কাজকর্ম তো সায়েবের। মাছের নৌকো যে কুমিরমারি ছুটল, সে নৌকোয় কি তোমার একলার ঘেরির মাছ ? ভাতার-ভাসুরের নাম জানি রে বাপু, মুখে বললেই তখন দোষ অর্সায়।

হাসতে হাসতে আলা-ঘরে ঢুকে বাখারির মাচার উপর চেপে বসলেন। মাছ কেনা-বেচার সময় গগন যেখানটা বসে চারিদিকে নজর ঘোরায়, ওজন ও দরদাম খাতায় টোকে।

বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ ভরদ্বাজ বলে ওঠেন, তামাক খায় কে ওখানে ? খাসা তামাক, দিব্যি বাস বেরিয়েছে। নিয়ে এস। হুঁকো লাগবে না, পরের মুখ-দেওয়া হুঁকোয় আমি খাই নে। ব্রাহ্মণের হুঁকো পাচ্ছই বা কোথা ? হাতের চেটোয় হয়ে যাবে। কলকেটা আন ইদিকে।

সকালবেলার পয়লা ছিলিম। অনেক মেহনতে গেঁয়োকাঠের কয়লা ধরিয়ে রাধেশ্যাম দুটো কি তিনটে সুখটান দিয়েছে, হেনকালে কলকে দেবার আবদার। তবে বাইরের মানুষ এসে চাচ্ছে, ধরতে গেলে অতিথি, তার উপরে জাত্যাংশে ব্রাহ্মণ—নিজেদের কেউ হলে সে কানে নিত না। নলচের মাথা থেকে কলকে খুলে দিয়ে অতিথিসেবা করতে হল।

গগন বলে, বুঝলাম। চৌধুরিগঞ্জে আসা হয়েছে মশায়ের। হু, আপনি তবে সেই মানুষ।

তাই। হাসেন আবার ভরদ্বাজ : তুখোড় বটে হে তুমি ! এসেছি কাল সন্ধ্যের সময়। এর মধ্যে সমস্ত খবর জেনে বসে আছ।

গোণাগুনতি জনমনিষ্যি—খবর উড়ে বেড়ায়, ধরে নিলেই হল। শুনলাম, অনিরুদ্ধের জায়গায় নতুন লোক এসেছে একজন ফুলতলা-সদর থেকে। তার পরে আপনাকে দেখছি, তবে আর বুঝতে আটকায় কিসে।

ভরদ্বাজ বলেন, খবর পেয়েছ ঠিকই দাস মশায়, কিন্তু পুরো খবর নয়। অনিরুদ্ধর জায়গায় আসি নি। বাবুদের ষোলআনা এস্টেটের তহশিলদার আমি। খালি পায়ে হাঁটতে পারি নে, মাটিতে পা ঠেকলে টনটন করে ওঠে। শুকনো এইটুকু পথ আসতে, দেখতে পাচ্ছ খালের মধ্যে শালতি নামাতে হল। আমি হেন মানুষ মেছোঘেরিতে পড়ে পড়ে নোনাজল খাব—খেপেছ নাকি হে! বাবুরাও তো ছাড়বেন না। আমা-বিহনে যাবতীয় ভুসম্পত্তি লাটে উঠে যাবে ওদিকে। দশ-বিশ দিন থেকে এদিককার একটা সুরাহা করে সদরের আমলা আবার সদরে গিয়ে উঠব। অনিরুদ্ধ রগচটা মানুষ কী নাকি গণ্ডগোল পাকিয়েছে তোমাদের সঙ্গে। জন্তু-জানোয়ারের রাজ্যে আছিস তো ক'টা মানুষ পড়ে, তার মধ্যেও বিবাদ-বিসম্বাদ! আমি এসেছি বাপু মিটমাট করতে। দোষঘাট যা কিছু হয়েছে, কিছু মনে রেখো না বাপসকল। মিলেমিশে ভাই-ভাই হয়ে সকলে থাক, এই কথা বলবার জন্য এদ্দুর অবধি চলে এলাম।

গগন তটস্থ হয়ে পড়ে: এ সমস্ত কী কথা! জুতোর কাদা হলাম গে আমরা, দোষঘাট কিসের আবার? চৌধুরি হুজুরদের আশ্রয়ে গাঙের উপর গেঁয়োবনের মধ্যে একটু ঘর তুলে নিয়েছি—অত বড় ঘেরি থেকে গুঁড়োগাড়া কিছু যদি ছিটকে এসে পড়ে, কোন রকমে ক'টা মানুষের পেট চলে যাবে।

মানুষটা কিন্তু আলাপ-ব্যবহারে খাসা। অথচ আগেভাগে লোকে কত রকম রটিয়েছিল? ছোটবাবু নাকি কিরে করেছে, রাতারাতি গগনের আলা ভেঙে গাঙের জলে ডুবিয়ে দিয়ে নৌকো-চুরি ও ক্ষতি-লোকসানের শোধ নিয়ে নেবে। গুণ্ডা পাঠিয়ে দিয়ে জগা ও গগনের গলা দুইখণ্ড করবে। এমনি কত কি! গোপাল ভরদ্বাজের সম্বন্ধেও শোনা যায়, অতবড় ডাকসাইটে দুর্দান্ত মানুষ তল্লাটের মধ্যে একটির বেশী দুটি নেই। অথচ সেই মানুষ, দেখ, সকলের মধ্যে জমিয়ে বসে কত ভাল ভাল কথা বলছে। লোক অনেক এসে জমেছে, কথা শুনছে সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে।

অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হল, বেলা হয়ে গেছে বিস্তর। তা সত্ত্বেও গল্প বোধহয় থামত না। কিন্তু খালের দিকে তাকিয়ে দেখেন, ভাটার টান ধরে গেছে। আর দেরি হলে অনেকখানি কাদা ভেঙে শালতিতে উঠতে হবে। নোনা কাদা—পায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে। তার উপরে ভরদ্বাজের ঐ শৌখিন ব্যাধি—কাদা-মাটি পায়ে ঠেকলেই পা টনটন করে উঠবে।

চলি তবে। জগন্নাথের সঙ্গে দেখা হল না। পাঠিয়ে দিও একবার আমাদের ওখানে।

বারংবার জগার কথা। গগন কিছু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, কেন তাকে কি দরকার?

নাম শোনা আছে, চোখে একবার দেখব। শুনেছি ছোঁড়া বড্ড ভাল। তোমার ডান হাত। একটু আলাপসালাপ করব, আবার কি?

উঠতে গিয়ে একটা ঝুড়ির দিকে নজর পড়ল। গোপাল বলেন, ঢাকা-ঢাকা ওগুলো চিত্রামাছ না?

উঁহু, পায়রা-চাঁদা।

ঐ হল। আবাদে তোমরা চাঁদা বলো, ডাঙা রাজ্যে আমাদের বাহারে নাম—চিত্রা। দিব্যি স্বাদ, রাঁধতে আলাদা তেল লাগে না। দাঁতে ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে মাখনের মত গলে যায়। আমাদের চৌধুরিগঞ্জের অত বড় ঘেরির মধ্যে এমন চিত্রা একটা পড়ে না।

রাধেশ্যাম বলে, এ মাছও ঘেরির নয়। ঘেরির মধ্যে এত বড় হতে বিস্তর দিন

লাগে। গাঙে খালে বেউটিজাল পেতে ধরেছে। বড়দাকে ঐ মাছ ক'টা একজনে খাবার জন্যে দিয়ে গেল।

গোপাল ভরদ্বাজ দাঁত মেলে হাসলেন গগনের দিকে চেয়ে: কথা বেরিয়ে পড়ল এই দেখ। বাইরের মাছও তোমার খাতায় বিক্রি হতে আসে। সায়েব বলা হবে কিনা, তা হলে বিবেচনা কর। গোখরো-কেউটেরা সাপ, আবার হেলে-ঢোঁড়ারাও সাপ। সে যাকগে—রোজগারের জন্য দুনিয়ার উপর আসা, দুটো পয়সা কোন গতিকে হলেই হল। এই, দাড়িওয়ালা কে তুই রে বাবা, ঝুড়িটা নিয়ে আয় ইদিকে, মাছগুলোর চেহারা দেখে যাই।

কাছে নিয়ে এলে গোপাল শতকণ্ঠে তারিপ করেন: বাগথালার মতন সাইজ। কী সুন্দর, যেন রাজপুত্তুর! দুটো-চারটে আমাদের ফুলতলা অবধিও না পেঁছিয় এমন নয়। কিন্তু পচে ঢোল হয়ে গিয়ে তখন আর পদার্থ থাকে না।

গগনকে অগত্যা বলতে হয়: মাছ ক'টা আপনি নিয়ে যান। মুন্দুক মিঞা, শালতিতে ঢেলে দিয়ে এস।

গোপাল না-না করে ওঠেন: সে কি কথা! ভাল বলেছি বলেই অমনি দিয়ে দেবে? তোমারা আশাসুখে রেখে দিয়েছ—

আমাদের কি অভাব আছে? আজকে না হল তো কাল। কাল না হয় তো পরশু। মাছ তো আসছেই।

গোপাল গদগদ কণ্ঠে বলেন, তবে দাও। চিত্রামাছ ভাল খাই আমি। তবে রাঁধুনী হল গে কালোসোনা—যা-ই এনে দাও, এক আস্বাদ। বলে কি জান, এক হাঁড়ি থেকে নামছে, একই হাতা-খুন্তি, রান্না-বাটনা একজনার হাতে—স্বাদ তবে দুই রকম হয় কেমন করে?

কুড়ি

কুমিরমারি মাছ নামিয়ে দিয়ে ডিঙি নিয়ে ফিরে আসতে বেলা গড়িয়ে গেল। গগন বলে, ফুলতলা থেকে ভরদ্বাজ এসেছে। অনিরুদ্ধের জায়গায়। লোকটার এত বদনাম শুনি, সে রকম কিন্তু মনে হল না। তোমার খোঁজে এই অবধি চলে এসেছিল। যেতে বলে গেছে।

জগা শুনে গেল মাত্র, কানে নিয়েছে কিনা বোঝা যায় না।

ক'দিন কাটে এমনি। হঠাৎ একদিন কালোসোনা এসে পড়ল: কই জগা, গেলে না?

জগা, ঘাড় নেড়ে বলে, কেন যাব না? দেবতা নিজে এসে ডেকে গেলেন—আলবত যাব। যেতেই হবে।

কবে?

যাব দু-চার দিনের মধ্যে।

ঠিক করে বলে দাও। আমার উপর হুকুম হল, সঠিক তারিখ নিয়ে আসিব।

জগন্নাথ বলে, আলায় পাঁজি নেই। তারিখ-টারিখ ঠিক থাকে না। ভরদ্বাজকে বলিস গিয়ে সেই কথা।

দেবতা-দেবতা করছিল, কিন্তু এবারের কথাগুলো ঠিক ভক্তজনোচিত হল না। আর অধিক উচ্চবাচ্য না করে কালোসোনা চলে গেল। তখন জগা হি-হি করে হাসে:

নাম আমার বস্ত চাউর হয়ে গেছে, নৌকো সরানোর দশটা ষোলআনা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। গেলে ঠিক মারবে।

বলাই বলে, মারের ভয় করিস তুই জগা।

তা বলে ওদের কোটে যাই কেন? নিয়ে গিয়ে হয়তো বা বলবে, পিঠে সরষের তেল মালিশ কর জগা, মারতে গিয়ে হাতে না লাগে। ক্ষমতা থাকে আমাদের কোটে এসে মেরে যাক!

ক'দিন পরে গোপাল আবার এসে পড়ে জগাকে ধরলেন। পায়ে মাটি ছোঁবার উপায় নেই বলে যথারীতি শালতি করেই এসেছেন। এবং যোগাযোগ ভালই—হর ঘড়ুইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন, তদুপলক্ষে বরাপোতায় গগন নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছে। জগাকে বলে গেল, আলার দিকে কড়া নজর রাখবি। কিংবা চালা-ঘরেই বা কেন—দিনমানটা আজ আলায় এসে শুয়ে থাক!

চৌধুরিদের সঙ্গে রেষারেষি—খুব সামাল হয়ে থাকার দরকার। এই গন্ডগোলের ব্যাপারে জগারও দায়িত্ব আছে। গগন নেই তো সে এসে চেপে পড়ল আলার মাচায়। মাচার উপরে চোখ বুজে অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নজর রাখছে।

এমনি সময় ভরদ্বাজ এলেন। . খবরবাদ নিয়েই এসেছেন নিশ্চয়। একগাল হেসে বললেন, এই যে, আজকে ঠিক ধরেছি। এমন লোহার শরীর—তুমি বাপু জগন্নাথ না হয়ে যাও না। সত্যি কিনা বল?

জগন্নাথ উঠে বসে নিদ্রারক্ত চোখ রগড়াচ্ছে। মাঝে একবার ঘাড় নেড়ে দিল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোপাল বলেন, গগন নেই কাউকে তো দেখছি নে। তা তোমার সঙ্গেই দরকার। ছোটবাবু তোমার কথা সমস্ত শুনেছেন।

জগা কঠিন হয়ে বলে, শুনবেন না কেন? অনিরুদ্ধ আড়ে-হাতে লেগেছে, না শুনিয়ে সে ছাড়বে? নৌকো নাকি সরিয়েছিলাম আমি। তা শুনে থাকেন ভালই। কারো চালে চাল ঠেকিয়ে আমি বসত করি নে।

গোপাল জিভ কাটেন: ছি ছি, নৌকোর কথা উঠছে কিসে? দোষ ষোলআনা অনিরুদ্ধর, এখন আজেবাজে বলে বেড়ালে কি হবে। কাছির আলগা বাঁধন ছিল কিংবা গাঁজার ঝোঁকে কাছি হয়তো মোটেই কষে নি। টানের মুখে নৌকো ভেসে গেল। নিজের দোষ ঢাকতে এখন নানান কথা বলছে। ছোটবাবু বোঝেন সবই, কাটা-কান চুলে ঢাকবে না।

অকারণে গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, চৌধুরিগঞ্জে কাজ করবে তো বল। নতুন নৌকো এসেছে গাঙের উপর, সে নৌকো রেলগাড়ি হয়ে ছুটবে। নৌকোর দায়িত্ব তোমার উপরে—তুমি কর্তা। কাজ এখানেও যা, সেখানেও তাই। বরঞ্চ মজা ওখানে। সন্ধ্যাবেলা রওনা হয়ে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। মাল পৌঁছে দিয়ে, ব্যস. তারপরে যা খুশি তুমি করে বেড়াও গে।

ঘাড় নেড়ে জগা এক কথায় সেরে দেয়: না

কেন, কি হল? লম্বা মাইনে রে বাপু। তিরিশ, ছোটবাবুকে বলেকয়ে না হয় পঁয়ত্রিশেই তুলে দেওয়া যাবে।

বেয়াড়া জগা তবু ঘাড় নাড়ে।

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, তবে কি? লাটসাহেবের মাইনে চাও না কি হে? এখানে তো মুফতের খাটুনি। খবর লুকোছাপা থাকে না, সমস্ত জানি।

জগা বলে, মুফতে কি জন্য হতে যাবে? দুবেলা খাই শুই, যা যখন দরকার পড়ে

নিয়ে নিই—

হীরে-জহরত কী খেয়ে থাক, সেটা অবশ্য জানি নে। তবে কোন্ পালঙ্কে শুয়ে থাক, সেটা এই চোখের উপর দেখছি আপন ভাল পাগলেও বোঝে। বিবেচনা করে দেখ, তিরিশটা দিন পুরলেই করকরে পঁয়ত্রিশখানি টাকা। তারপরে ধরগে, কুমির-মারি থেকে চৌধুরিগঞ্জ অবধি পাকা-রাস্তা হয়ে যাচ্ছে—বারোবেঁকির গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে না। মোটরলরিতে মাল চলাচল। ছোটবাবু উদ্যোগ করে দেখেশুনে রাস্তা বানাচ্ছেন—লরির লাইসেন্স তিনি ছাড়া কি বাইরের মানুষ পাবে? তখন মোটর ড্রাইভারি শিখে নিও। ভাল হয়ে কাজকর্ম করলে ছোটবাবুই ব্যবস্থা করে দেবেন, তোমায় কিছু করতে হবে না। মাইনে সঙ্গে সঙ্গে পঁয়ত্রিশ দুনো সত্তর। আর ঐ বাড়তেই থাকল। টাকার বাণ্ডিল দু-চার বছরের ভিতর।

জগা উদাসীনের ভাবে বলে, কী হবে টাকায়?

অ্যাঁ, সাক্ষাৎ ন্যাংটেশ্বর তুমি যে বাপু! বলে, টাকা দিয়ে কি হবে? ভু-সম্পত্তির খাতির-ইজ্জত ঘরবাড়ি সবই তো টাকার খেলা।

ঘরে আমার গরজ নেই।

চিরটা কাল ফুটো চালায় তালি দিয়ে থাকবে? ছি-ছি, আশা বড় করতে হয়। বিয়েথাওয়া করবে, ছেলেপুলে হবে, দশের একজন হয়ে জমিয়ে বসবে।

জগা রীতিমত চটে গিয়ে বলে, বেশ আছি মশায়। তুমি এমনধারা লেগেছ কেন বল দিকি? ঘরবাড়ি ছেলেপুলে বিয়ে থাওয়া চেয়েছি তোমার কাছে? ওই মাছের কাজও করছি নে আর বেশী দিন। বড়দার মত মানুষটাকে বুদ্ধি দিয়ে আমিই জঙ্গলে নিয়ে এলাম। তাই দায়িত্ব পড়ে গেছে, খানিকটা গোছগাছ করে দিয়ে সরে পড়ব। প্রাণ আমার ছটফট করছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। আজেবাজে কথার সময় নেই। এসে পড়বে মানুষজন, জমবে এইবার। তার আগে ডিঙিটা পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখতে হবে। রাত থাকতেই আবার ডিঙির কাজ। বাদামের এক পাশে খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, বার-সুঁইয়ের কয়েকটা ফোঁড় দিতে হবে জায়গাটায়। আর ঐ দেখ, খালপারে বড় জঙ্গলের দিক থেকে কালো মেঘ আকাশে উঠে আসছে। কালো মহিষের পাল বুঝি বাদাবন থেকে বেরিয়ে ডাঙা ভেবে আকাশ মুখো ধাওয়া করেছে। চরের উপর নয়, ঘরের মধ্যে বসতে হবে আজ সকলের। মনটা খারাপ হয়ে যায়, বদ্ধ জায়গায় বসে আরাম হয় কখনো?

নেমন্তন্নের পাট চুকিয়ে গগন কখন ফিরবে, ঠিক কি!' ফড়খেলা হয়তো হবে না। পয়সার ব্যাপার—গগন ছাড়া কাঁচা-পয়সা ছুঁড়ে দেবার তাগত ক-জনার? পয়সা ছোঁড়ে, যেন খোলামকুচি। গগন বিনে নিরামিষ গানবাজনাই আজকে শুধু।

গোপাল বলেন, খেলই না হে, আমরাও জানি। দেখ খেলে এক-দান দু-দান।

কত পয়সা নিয়ে এসেছ?

সে কি আর মুখস্থ রয়েছে বাপু?

গাঁজিয়া ঝেড়ে গুণে-গেঁথে সাড়ে না-আনা হল। গোপাল বলেন, ন-মাস ছ-মাসের পথ - বেশি আনতে যাব কেন? খেলেই দেখ না, এই পয়সা নিয়ে নাও জিতে। বুঝব ক্ষমতা। হুঁ, এই ন-আনার চৌগুণ গেঁথে সিকে পুরিয়ে যদি না ঘরে যাই, আমার নাম বদলে রেখো তোমরা।

জগা গা করে না: আর একদিন এস ভরদ্বাজ মশায়। ডাঙানি টাকা পাঁচেকের

নিয়ে এস অন্তত। ন-আনার চৌগুণ না করে পাঁচ টাকার চৌগুণ করে নিয়ে যেও। আর মা বনবিবির দয়ায় সেই পাঁচ টাকা আমরাই যদি জিতে নিতে পারি, জাঁক করে কিছু বলার মতন হবে।

খেলল না সে কিছুতে। গোপাল মনে মনে গরম হলেন। মাত্র সাড়ে ন-আনা সম্বল জেনে খেলতে চাইল না—অপমানই করা হল তাঁকে। আলা ছেড়ে তবু ওঠেন না। এসেছেন যখন, গগনের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া ঠিক হবে না। হোক না রাত্রি—শালতি সঙ্গে রয়েছে, ভাবনা কি? গান আরম্ভ হল ওদিকে। সঙ্গে ঢোলক আর খঞ্জরি। খোলও আছে। কীর্তন ধরল, সেই সময়টা খোল বেরুল। গোপাল শুনছেন চুপচাপ বসে। শেষে আর থাকতে পারেন না, বাহবা দিয়ে ওঠেন উচ্চ কণ্ঠে: বেড়ে গলা হে তোমার। প্রাণ পাগল করে দেয়—

জগন্নাথ বলে, যাত্রার দলে ছিলাম—অধিকারীর বিস্তর পিটুনি খেয়ে খেয়ে তবে হয়েছে। থাকবে না, গলায় তদ্বির হয় না—মাছের নৌকো বেয়ে বেয়ে গলার কিছু থাকে!

মনটা এক লহমা পিছনের দিকে চলে যায়। যাত্রার দল এসেছিল কোন্ অঞ্চল থেকে, গেয়ে খুব নাম করল। ছেলেমানুষ জগন্নাথ ধরেছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। গান শুনতে দু-তিন ক্রোশ চলে যায়। সমস্ত বায়না সেরেসুরে যাত্রার দল একদিন নৌকোয় চাপল। জগন্নাথও আর গ্রামে নেই। অনেকদূরে গিয়ে এলাকা পার হয়ে এক বাঁকের মুখে নৌকো ধরে আছে। পায়ে হেঁটে জগন্নাথ সেই অবধি চলে গেল। বন্দোবস্ত ছিল তাই। চেনা-জানা কারো নজরে পড়ে না যায়। তবে তো রক্ষা থাকবে না: দেখ, দেখ, পালিয়ে যাচ্ছে যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে। জোর করে নামিয়ে নিত তাকে, যাত্রাওয়ালাদের ধরে পিটুনি দিত। তাই সে কাঁচা বয়সে খাল-বিল জল-কাদার ভিতর দিয়ে চার-পাঁচ ক্রোশ ছুটতে হয়েছিল। গানের নেশা এমনি। কিন্তু আকাঁড়া চালের ভাত, পুঁই-কুমড়োর ঘ্যাঁট আর অধিকারীর মার-গুঁতোন অধিক দিন চালানো গেল না। নানান ঘাটের জল খেলে নোনাজলের বাদাবনে এখন। ছুটো-ছুটির মধ্যে গানবাজনা ক'টা দিনই বা হয়েছে। এই এখনই—গগনের সায়ের বসানো থেকে সন্ধ্যার পর যা হোক দশ জনে আয়েস করে বসা যাচ্ছে।

জগন্নাথ চুপ করে গেছে তো রাধেশ্যাম ঢোলকটা টেনে নিল। ঢপাঢপ ঢপাঢপ মোক্ষম কয়েকটা ঘা দিল ঢোলকের এদিকে ওদিকে। তারপর গান। চিরদিন সে একটা গান গেয়ে এসেছে—একখানা বই দুখানা জানে না। গান কে বেঁধেছে কেউ বলতে পারে না, রাধেশ্যাম ছাড়া অন্য কারো মুখে কস্মিনকালে শোনা যায় নি এ গান:

গোবিন্দনারায়ণ
চাষ দিচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন;
তামুক সেজে বলরাম সে ভুড়ুক-ভুড়ুক টানে।
ছিদাম বলে, কালিয়া দাদা,
চৌদিকে যে জবর কাদা,
পান্তাভাতের শালুকখানা বল্ রাখি কোয়ানে।

রাত বেশ হয়েছে। চারিদিক নিঝুম নিঃসাড়। কিন্তু যে-ই না রাধেশ্যাম গানের দুটো চারটে কথা উচ্চারণ করেছে, রৈ-রৈ রব উঠল পাড়ার মধ্যে। ভাঙা কাঁসরের মতন অন্নদাসীর কণ্ঠ—অকথা-কুকথা বলছে। নেহাত বাদা-জায়গা, ভদ্র-

জনের চলাচল নেই, আপনারা হলে তো দু-কানে আঙুল গুঁজে নারায়ণ নারায়ণ বলে উঠতেন। বউ পতিদেবতাকে লক্ষ্য করে বাছা বাছা বিশেষণ ছুঁড়ছে। রাধেশ্যামের ভাবান্তর নেই, নির্বিকারে গেয়ে যাচ্ছে। সমের মুখে এসে হঠাৎ থামল। ঢোলক নামিয়ে রেখে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল আলার উঠানে। দুম-দুম দুম-দুম মাটি কাঁপিয়ে দৌড়।

গোপাল ভরদ্বাজ এ তল্লাটে নতুন, কাণ্ডবাণ্ড দেখে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। তুমুল আর্তনাদ—পাড়ার ভিতর থেকে অন্নদাসী মর্মান্তিক চিৎকার করছে, বহু বিচিত্র সম্বন্ধ পাতাচ্ছে স্বামীর সঙ্গে। গুড়ুম-গুড়ুম কিল পড়ছে, আওয়াজটা দিব্যি ধরা যায়। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বউয়ের গালি তীক্ষ্ন হয়। মিনিট কতক পরে বোধকরি দম ফুরিয়ে গিয়েই ঝিমিয়ে আসে। আবার কিল। কিল ও গালি পর্যায়ক্রমে চলল বেশ খানিকক্ষণ। তার পরে দেখা যায় অন্ধকারে গজেন্দ্রগতিতে রাধেশ্যাম ফিরে আসছে। একটি কথা বলল না সে কারো সঙ্গে। ঢোল নামিয়ে রেখে দিয়েছিল—সেই ঢোল কোলের উপর তুলে নিল। গান যেখানটায় ছেড়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই কথা থেকে আবার শুরু করে দিল। জগা এতক্ষণ একেবারে চুপ হয়ে ছিল—বোঝা যাচ্ছে, এই রাধেশ্যামের ফিরে আসার অপেক্ষায়। গান মাঝখানে বন্ধ রেখে চলে গিয়েছিল, সেটা শেষ করে না দেওয়া অবধি অন্য কেউ ধরবে না, এই রেওয়াজ।

এখানকার এই প্রতিদিনের ব্যাপার। কিন্তু নতুন আগন্তুক গোপালের তাজ্জব লাগে। একবারে কিছু না বলে থাকতে পারেন না। ঐ গানের ভিতরেই জিজ্ঞাসা করলেন, মারমুখী হয়ে অমন ছুটে বেরুলে কেন ?

রাধেশ্যাম সঙ্গীতরসে মজে আছে, কণ্ঠে একবিন্দু জ্বালা নেই। একগাল হেসে বলল, রাগ করে এলাম মশায়।

সেটা আবার কি ?

রাগ বোঝেন না ? মাগী বড্ড বাড়িয়েছিল। লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছে। আপনি এতবড় একজন মানুষ, কী মনে করলেন বলুন তো। ক'টা কিল ঝেড়ে তাই ঠাণ্ডা করে দিয়ে এলাম। দু-চার দিন এখন ঠাণ্ডা থাকবে, সোয়ামি বলে মান্য করবে।

অন্যদিন হয়তো তাই হয়ে থাকে। আজ অন্নদাসীর কী হয়েছে—রাধেশ্যাম আবার গান ধরতে না ধরতে পুনশ্চ চিৎকার। গোড়ায় গোড়ায় যেমন হয়—রাধেশ্যামের ভ্রূক্ষেপ নেই, গানের গলা দ্বিগুণ চড়িয়ে দিল।

জগা কাছ ঘেঁষে এসে তার পিঠের উপর হাত রাখে: আর উঠিস নে রাধেশ্যাম। মেরেধরে আজ কিছু হবে না, বড্ড ক্ষেপে গেছে। ওসব কোন কথা কানে নিস নে।

এক লহমা গান থামিয়ে মুখ বিকৃত করে রাধেশ্যাম বলে, সমস্তটা দিন পেটে দানা পড়ে নি। অসুরের মতন গতরখানা—তিনবেলা তিন পাথর ফুস-মন্তরে উড়ে যায়। সেই মানুষের কাঠ-কাঠ উপোস।

গোপাল শিউরে উঠে বলেন, বল কি হে ?

রাধেশ্যাম বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, জলের নিচের মাছ—সব দিনই যে সুড়সুড় করে জালের তলে আসবে তার কোন নিয়ম আছে ? উপোসের কথা যদি বলেন, সেটা কি একলা ওর ? না, নতুন কোন ব্যাপার ? এই আমরা সব জুটেছি, পেটে টোকা দিয়ে দেখুন—কত জনে এর মধ্যে উপোসী। কোন্ কাজটা তার জন্যে আটকে রয়েছে বলুন।

তিক্ত কণ্ঠে আবার বলে, মাগীটারও কী স্বভাব! পরশু দেড় টাকা রোজগার হল। সীতাশাল চাল নিয়ে এল বরাপোতা পার হয়ে গিয়ে। কি না মোটা চালের ভাতে পেট গড়গড় করে। ঘি এল তিন আনার, পেঁয়াজ, কালজিরে, চাটনি হবে তার চিনি-কিসমিস। খাবার সময় জলে দেখি কর্পূরের বাস। কী ব্যাপার, কর্পূর আসে কেন রে? শেষমেশ নাকি চারটে পয়সা বেঁচেছিল, তাই দিয়ে কর্পূর কিনে জলে দিয়েছে। বুঝুন। সাক্ষাৎ উড়নচণ্ডী, পয়সা ইঁদুর হয়ে ওর গায়ে কামড় দিতে থাকে। খরচা করে ফেলে নিশ্চিন্ত।

বংশীধর ও-পাশ থেকে বলে ওঠে, উঁহু, ষোলআনা হল না। ভালমানষের মেয়ের ঘাড়ে সব দোষ চাপালে হবে না—আমিও বলি, পয়সা ঘরে রাখলে রক্ষে আছে? এমনি না দিল তো জোরজার করে কিংবা হাত সাফাই করে সেই পয়সা নিয়ে গিয়ে তুই নেশাভাং করবি। কাঁচা পয়সা রাখে তবে কোন্ ভরসায়?

মরুক গে উপোস করে। তবে কেন মরণ-চেঁচানি?

রাধেশ্যাম প্রাণপণ বলে এবার ঢোলে ঘা দিচ্ছে, বউয়ের ঝগড়া যাতে কানে না ঢোকে। চিৎকার যত, বাজনা তার বিস্তর উপরে। ঢপাঢপ ঢপাঢপ, ঢপাঢপ ঢপাঢপ। কানের পর্দা চৌচির হবার দাখিল।

যাঃ শালা, ঢোল ফেঁসে গিয়েছে।

আর কী আশ্চর্য, ওদিকেও যে ঝিমিয়ে গেছে একেবারে। খালি পেটে চেঁচিয়ে গলা কাঠ হয়ে হয়তো বা আর এখন আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

সলজ্জে রাধেশ্যাম বলে, ঢোলক আমার হাতেই ফাঁসল রে জগা। ছাউনি মগ্ন হয়েছিল, ঝোঁকের মাথায় হুঁশ ছিল না। তা তুই নতুন করে ছেয়ে নিয়ে আয় ফুলতলা থেকে। খরচা আমার থেকে নিয়ে নিস।

না, মেঘটা যেন গোলমাল করল না। শতখণ্ড হয়ে আকাশের এদিকে সেদিকে ভেসে বেরিয়ে গেল। কালো জঙ্গলের উপর চাঁদ। কী সর্বনাশ, আসর শেষ হয়ে গিয়ে কাজকর্মের মুখটায় চাঁদ এবারে আকাশে চেপে বসলেন। গগনের অনুপস্থিতিতে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন গোপালকে রাধেশ্যাম জিজ্ঞাসা করে, কোন্ তিথি আজ ভরদ্বাজ মশায়? চাঁদ কতক্ষণ আছে?

গগন নিমন্ত্রণ সেরে গাঙ পার হয়ে এই সময়ে এসে পড়ল।

কি গো, এখনো চলছে তোমাদের? কাজের সময় হয়ে গেল, খাওয়াদাওয়া করবে আর কখন? আমি খাব না, সে তো জানই।

জ্যোৎস্নার ক্ষীণ রশ্মি ঘরের মধ্যে। নজর পড়ল, গোপাল ভরদ্বাজের দিকে। গোত্রছাড়া হয়ে মাচার উপর বসে আছেন। তাঁকে দেখে কাজের কথাবার্তা আপাতত এগোয় না।

আপনি—ভরদ্বাজ মশায়? কতক্ষণ আসা হয়েছে? ভাল, ভাল, এইখানেই চাট্টি সেবা হোক তবে।

অর্থাৎ প্রকারান্তরে উঠতে বলা হচ্ছে তাঁকে। গোপাল না-না করেন: আমার জন্য পাকশাক ওদিকে হয়ে আছে।

রাত অনেক হয়েছে। যেতে তো অনেকক্ষণ লাগবে। তাই বলছিলাম, কাজ কি কষ্ট করে? যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে এইখানে গড়িয়ে পড়লে হয়।

গোপাল বলেন, উঁহু, বেরিতে কত কাজ আমার। শালতি সঙ্গে আছে। সাঁ করে চলে যাব। আমি উঠি।

গগন বলে, ভর জোয়ার—কোটালের মুখ। বাঁধের কানা অবধি জল উঠেছে। রাত্রে শালতিতে উঠতে যাবেন না। লগিতে মাটি পাবে না, একটু কাত হলে সামলে উঠতে পারবে না। এক কাজ কর বংশীশ্বর, শালতিতে উঠে কাজ নেই। ডিঙিতে করে তুই একেবারে আলায় তুলে দিয়ে আয়। বাঁধে ছেড়ে দিস নে। রাত্তিরবেলা উড়ো-কাল—আলায় তুলে দিয়ে তবে ফিরে আসবি।

আলো ধরে খুব খাতির করে ভরদ্বাজকে নিজের ডিঙায় তুলে দিয়ে গগন ফিরে এল। উঠানে এসে দাঁতে দাঁত রেখে বলে, শালা ওৎ পেতে ছিল। আমি এসে না তুলে দিলে রাতের মধ্যে নড়ত না। ঘাতঘোঁত বুঝে নিত, মানুষজন চিনে রাখত। বংশীশ্বরকে একেবারে আলায় তুলে দিয়ে আসতে বললাম, পথে ঘাটে না ছেড়ে দেয়। চাঁদ ডুবে যায়, আর বসে রয়েছ কেন তোমরা ?

অন্নদাসীর শাপশাপান্ত বন্ধ হয়েছে। পাড়া নিঃশব্দ। রাত ঝিমঝিম করছে। ভাটার টান ধরল বুঝি এইবার। বাদার জল কলকল করে খালে পড়ছে, সেই আওয়াজ। জন পাঁচ-সাত মরদ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল : থুড়ি বুড়ো-হালদার, মান রেখো বাবা, জাল টেনে তুলতে ঘাম ছুটে যায় যেন।

মাছ ধরবার আগে বুড়ো হালদারের নাম স্মরণ নেয়। তিনি সদয় হলে মাছ পড়ে ভাল। সে দেবতার বিগ্রহ নেই, পুজা-প্রকরণ কিছু নেই, পুরাণে পাঁজিতে কোন রকম তাঁর খবর মেলে না। তবু আছে নামটা। থুড়ি বলে মাটিতে থুতু ফেলে বেরিয়ে পড়ে মাছ-মারারা। বুড়ো-হালদার জলের মাছ তাড়িয়ে এনে জালে ঢোকাবেন। যদি ছিপ নিয়ে বসো, তোমার চারে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাল মাছ নিয়ে আসবেন। থুড়ি, থুড়ি, বুড়ো-হালদার !

একুশ

আর এদিকে ঢেকুর তুলে গগন দেখি মাদুর পাতবার উদ্যোগে আছে। ঠেসে এসেছে প্রচুর, খাড়া হয়ে বসে থাকবার তাগত নেই। জগা ও বলাই উঠে পড়ে পাড়ার মধ্যে তাদের চালাঘরের দিকে চলল। রান্না-খাওয়া এবারে। তার পরে চক্ষু বুজে পহর-খানেক পড়ে থাকা। হর ঘড়ুই শুধুমাত্র গগনকে নিমন্ত্রণ করল, ঘেরির মালিক বলেই সমাদর দেখাল। গগনকে ইতিমধ্যেই আলাদা নজরে দেখছে সবাই। এর পরে নতুন ঘেরি জমজমাট হয়ে উঠলে তখন গগন আর এক মেছো-চক্কোত্তি। জগা-বলাইয়ের সঙ্গে হর ঘড়ুই কতবার এক ডিঙিতে গিয়েছে। মুখে এত খাতির, কিন্তু তাদের বলল না। তা হলে আজকে রাত্রির হাঙ্গামাটা কাটানো যেত।

বলাই বলে, না-ই বা বলল, গিয়ে পড়লে ঠেকাত কে ? এই যে এসে গেছি ঘড়ুই মশায়। নেমন্তন্ন করতে তোমার ভুল হয়েছিল, তা বলে আমরা ভুল করব কেন ?

জগা বলে, মনে আমার উঠেছিল কথাটা। করতাম ঠিক তাই। ভরদ্বাজ এসে পড়ে গোলমাল করে দিল। তার উপরে বড়দা আমার উপরে আলার ভার দিয়ে গেল। চৌধুরিগঞ্জের ঐ শয়তানগুলোর মুখ মিষ্টি, মনে মনে ওরা কোন প্যাঁচ কষছে কে বলবে ?

বাঁধের উপর পড়ে ফিরে তাকায়। কী আশ্চর্য, হেরিকেন জ্বলছে এখনো। শুয়ে পড়েও আলো জ্বালিয়ে রাখে, বড়দা যে লাটসাহেব হয়ে উঠল। ঠাহর করে দেখে, উঁহু—শোয় নি এখনো, কী কতকগুলো কাগজ নিয়ে আলোর কাছে এসে পড়েছে। জরুরী বস্তু নিশ্চয়, দিনের আলো অবধি সবুর সইল না। কেরোসিন পুড়িয়ে পড়ে

নিতে হয়।

পেট মানে না, অতএব ঘরে এসে রান্নার যোগাড়ে বসতে হল। বিশেষ করে হর ঘড়ুইয়ের বাড়ির রকমারি আয়োজনের গল্প শুনে অবধি খিদে যেন বেশী বেশী আজকে। জগন্নাথ উনুন ধরাচ্ছে, বলাই চুপচাপ বসে। সর্বকর্মে সহকারী বলাই—কেবল এই রান্নার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে। রাঁধাবাড়া শেষ হবার পরেই তার কাজ—খাওয়া, এবং বাসনকোশন ধোওয়া। জগা যা-হোক কিছু জানে, কিন্তু বড় আলসেমি তার রান্নার ব্যাপারে। বাঘ বাদাবনে নয়, উনুনের ধারেই যেন। মানুষ কি জন্যে বিয়ে করে, জগা কখনোসখনো ভাবতে যায়। জলজ্যান্ত একটা মেয়েলোক ঘাড়ে তুলে নেয়, অপারগ হলেও থাকে আর নামানোর উপায় থাকে না। ভাবতে গিয়ে তখন এই রান্নার কথা মনে ওঠে। আগুনের তাপে বসে রান্নার ঝামেলা পুরুষ-মানুষের পক্ষে অসহ্য, মরীয়া হয়ে তাই মেয়েলোক বিয়ে করে বসে। লোকজন রেখে যে চলে না, তা নয়। শহরের হোটেলে দেখ গিয়ে, দশাসই জোয়ানরা রাঁধাবাড়া ও দেওয়া-থোওয়া করছে। শহরে কেন, কুমিরমারিতেই তো গদাধর শানা পৈতা ঝুলিয়ে ভটচাজ্জি হয়ে গদাধর আশ্রম বানিয়ে দিব্যি দু-পয়সা রোজগার করছে। তবে ঐ ব্যবস্থার মুশকিল, রাঁধুনি-পুরুষকে মাইনে দিতে হয় নগদ টাকা। এবং মাইনে-করা মানুষ হলেই কখনো আছে কখনো নেই। বিয়ে-করা পরিবার সম্পর্কে মাইনের ঝঞ্ঝাট নেই। এবং তারা কায়েমী বস্তু।

কাঁচা কাঠ কেটে রেখেছে জঙ্গল থেকে, ভাল রকম শুকোয় নি। উনুন ধরাতে গিয়ে হয়রান—পালা করে ফুঁ দিচ্ছে একবার জগা একবার বলাই। এমনি সময়, অবাক কাণ্ড, এতখানি পথ ভেঙে গগন এসে ঘরে ঢুকল।

কি করছ? অ্যাঁ, ভাতটাও চাপাও নি এতক্ষণে?

বলাই আশ্চর্য্য হয়ে বলে, শোও নি যে বড়দা, এত রাত্রে বাঁধের উপর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছ!

জগা বলে, পরের ভাত পেয়ে ঠেসে চাপান দিয়ে এসেছ, পেটের মধ্যে ফুটছে বুঝি? ভাত ঘড়ুইয়ের কিন্তু পেটটা যে নিজের, সেটা তখন মনে ছিল না।

গগন গম্ভীর। এসব রসিকতার জবাব না দিয়ে সে বলে, গায়ের জোর দিয়ে উনুন ধরানো যায় না রে! কায়দা-কৌশল আছে। কাঠ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উনুনের দফা নিকেশ করেছ—সর, আমি ধরিয়ে দিয়ে যাই।

কোন কাজে জগা অক্ষম, শুনলে অভিমানে লাগে। বলে, কাঁচা কাঠে উনুন ধরবে কি! বলাইর কাণ্ড, এক গাদা কাঁচা গেঁয়োকাঠ কেটে রেখেছে। আবার তা-ও বলি, বাদার মধ্যে খুঁজে খুঁজে শুকনো কাঠ কেটে আনব, ছুটিই বা পাচ্ছি কোথা? নৌকা বাওয়ার একদিনে তরে বিরাম নেই। ওসব হবে না বড়দা, ডিঙি একদিন কুমিরমারি না গিয়ে বাদার দিকে চালিয়ে দেব। মাছ পচলে নাচার। আগেভাগে বলে রাখছি, তখন দোষ দিতে পারবে না।

গগন তাড়াতাড়ি বলে, আমি বসছি। দেখবে এবারে কাঁচা কাঠ জ্বলে কি রকম দাউ-দাউ করে। ফুঃ ফুঃ—

খান কয়েক খামের চিঠি হাতের মুঠোয়। সেগুলো উনুনে দিল। ফুঃ ফুঃ—

ফুঁয়ের জোরে অথবা এই চিঠির ইন্ধনে উনুন এবারে ধরে গেল।

ফুরসত পেয়ে জগা জিজ্ঞাসা করে, চিঠি বুঝি বনগাঁ-পোতা থেকে নিয়ে এলে? এত চিঠি কে লিখল?

গগন বলে, গরজ বিনে কে কোন্ কাজ করে? যাদের গরজ তারাই লিখেছে। এত চিঠি এক দিনে আসে নি, বিস্তর দিন ধরে জমে ছিল বয়ারখোলার তৈলক্কের কাছে। হঠাৎ কোন্ খেয়াল হল, ঠিকানা কেটে এক সঙ্গে সব পাইয়ে দিয়েছে। তার পরে পিওনের ঝোলার মধ্যেই পড়ে আছে কত কাল। ঘড়ুইয়ের বাড়ি পিওনেরও নেমন্তন্ন, আজকে সে চিঠি দিয়ে দিল।

বলাই বলে, কষ্ট করে লিখেছে—সমস্ত উনুনে দিয়ে দিলে বড়দা? কি লিখেছে।

গগন বলে, কী এমন হীরে-মুক্তো যে প্যাঁটরা ভরে রাখতে হবে। পয়সা খরচ করে লোক চিঠি পাঠায় কি 'কেমন আছ ভাল আছি'র জন্যে? দুটো চারটে কথা পড়েই মাথা চনচন করে উঠল। স্থির থাকতে পারি নে। চলে এলাম শলাপরামর্শ করতে। আবার শাসানি দিয়েছে, টাকা না পাঠালে সব সুদ্ধ এসে পড়বে।

জগা ঘাড় নেড়ে বলে, ভয়ের কথা বটে।

বলাই অভয় দিচ্ছে: যাদা জায়গার পথ ঠিক করে যমরাজা আসতে পারে না, এখানে আসবে মানবেলার মেয়েছেলে! দূর!

গগন আলায় ফিরে গেছে। খেয়েদেয়ে বলাই-জগা গড়িয়ে পড়ল। এদের কাজ পোহাতি-তারা উঠবার পর। এখন যাদের কাজ, তারা সব বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পনের-বিশ মরদ বেরিয়েছে নানান দিকে। গগন নিঃশ্বাস ফেলে এক এক সময়: মূলধন থাকলে মাছ-মারার লোক পনের-বিশ থেকে পঞ্চাশে তোলা যেত। মাছের দরদাম করে ব্যাপারীরা তো ঝোড়ো-নৌকোয় তুলল—দামটা তখনই মাছ-মারাদের আগাম ফেলে দিতে হবে। কুমিরমারি মাছ বিক্রি হয়ে নৌকো ফেরত এলে সে টাকা আদায় হবে তখন। মবলগ টাকার ব্যাপার। টাকা বেশী থাকলে নৌকোও করা যেত আর একটা। পুরানো দিনকাল নেই বটে, তা হলেও কাঙালি চক্কোত্তির পথে এগুনো যায়, এখনো অনেকখানি দূরে। খালি হাতে আর খেল দেখিয়ে পারা যায়? আবার এরই মধ্যে চিঠির পরে চিঠি। বনে এসেও ত্রাণ নেই। কত জন্মের মহাজন যে খিনি-বউ! সাগরের নিচে ডুবে থাকলেও বোধকরি সাগর সেঁচে হিড়হিড় করে টেনে তুলত।

টিপিটিপি পা ফেলে সহিতলার পনের বিশ মরদ নানান দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু চৌধুরিগঞ্জ নয়—ছোট-বড় আরও সব ঘেরি রয়েছে নানান দিকে। যে জায়গায় যখন সুবিধা। হাতে খেপলা-জাল, কোমরে বাঁধা বাঁশের বুনানির খালুই। আলোর কথাই ওঠে না, যত অন্ধকার ততই মজা। দিনমানে নিরীহ ভাবে ঘুরে ফিরে মনে মনে আঁচ করে আসে, কোন্ ঘেরির কোন অঞ্চলে আজকের অভিযান। ঘোরাফেরারই বা কী এমন দরকার—এ তল্লাটের সকল সুলুকসন্ধান মাছ-মারাদের নখদর্পণে। দিনমানেই চলতে গিয়ে পদে পদে সাপ দেখবেন আলের উপরে, বাঁধের উপরে। রাতের অন্ধকারে বেপরোয়া এরা চলাচল করে, অথচ সাপে কেটেছে কেউ কোনদিন শোনে নি। কেমন যেন বুঝসমঝ আছে সাপে আর মানুষে—প্রায় একই জাতের জীব। কেউ যায় গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে ভর দিয়ে, কেউ বা পা টিপে টিপে ধনুকের মতন বাঁকা হয়ে। ঝিমঝিম করে চতুর্দিক, রাত্রিচর কোন পাখি পাখার ঝাপটায় অন্ধকারে দোলা দিয়ে মাথার উপর দিয়ে হয়তো বা উড়ে গেল। ঝপাং করে আওয়াজ একবার জলে—জাল ফেলল কোন মাছ-মারা। পাহারার লোক এদিক-সেদিক ছড়িয়ে

আছে, ডিঙি-শালতি পাঁচ-সাতখানা সাঁ-সাঁ করে ছুটেছে সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে। ডাঙার বাঁধে মানুষ ছুটেছে হেরিকেন দুলিয়ে শব্দসাড়া করে। কোথায় কে? আন্দাজি জায়গাটায় এসে দেখা যাবে, সদ্য জাল ঝেড়েছে—তার শ্যাওলা-গুলি পড়ে আছে কতকটা। মানুষ উধাও। তখনই হয়তো বা কানে আসবে অনেক দূরে ঠিক অমনি জাল ফেলার শব্দ। ছোট আবার সেদিকে। রাত দুপুরে এ-ঘেরিতে ও-ঘেরিতে নিত্যিদিনের এই লুকোচুরি-খেলা।

আগে এত দর ছিল না। বেশী মাছ ধরে পচিয়ে ফেলে মুনাফা কি? এখন জায়গা হয়েছে—করালী গাঙ আর সইতলা-খালের মোহানায় গগন দাসের আলা। মাছ মেরে সোজা এনে নামাও আলার উঠানে। ব্যাপারীতে ব্যাপারীতে রেষারেষি—আট আনা, দশ আনা, এগারো আনা, সাড়ে-এগারো, বারো। দর শুনে রাধেশ্যাম আগুন। পুরো ঝুড়ি নিয়ে এলাম—পারশে, বাগদা-চিংড়ি, ভেটকির বাচ্চা—কানা ব্যাপারীরা দেখেও না চোখ তাকিয়ে? বারো আনা বলে কোন বিবেচনায়? বারো আনা হলে জলের মাছ জলে ঢেলে দেব। নয় তো বরাপোতার বাজারে নিয়ে হাতে কেটে বেচে আসব। তাতেও কোন না পাঁচ-সিকে দেড়-টাকা টাকা হবে।

এক টানে মাছের ঝুড়ি নিয়ে আসে নিজের দিকে। হর ঘড়ুই বলে, রাখ, রাখ—রাখলে কাজকর্ম হয়? আচ্ছা, আরও দু-আনা ধরে দিচ্ছি। উঁহু, এক আধলা নয় এর উপরে। বউ অন্নদাসী ওত পেতে আছে উঠানের এক দিকে। একা সে নয়, পাড়ার আরও যত মেয়েলোক। মাছ-মারাদের বউ-বোন মা-পিসী। বসে আছে সেই কখন থেকে—পান-তামাক খায়, চুপি চুপি গল্পগুজব করে নিজেদের মধ্যে। মাছের দরদাম হচ্ছে, সচকিত হয়ে ওঠে সেই সময়টা। বিক্রি পাকা হয়ে গগনের খাতায় লেখা পড়ল, তড়াক করে উঠে এসে মেয়েলোকে অমনি হাত পাতবে। খাতাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে দাম মিটিয়ে দেবে, এই হল দস্তুর। দিতে হবে মেয়েলোকের হাতে। পুরুষের হাতে পড়েছে কি অন্তত পক্ষে আধাআধি গায়েব হবে নেশাভাঙের দরুন। নেশা করে পড়ে থাকবে, পরের দিন আর জালে নামবে না। অতএব খাতাওয়ালার স্বার্থও বটে। গগন চৌদ্দ আনার দুটো পয়সা তোলা কেটে রেখে সাড়ে-তেরো আনা দিয়ে দেয় অন্নদাসীর হাতে। আরও দুটো পয়সা আদায় হবে ব্যাপারী হর ঘড়ুই যখন দাম শোধ করবে, চোদ্দ আনার জায়গায় সাড়ে চোদ্দ আনা দেবে। পয়সা আঁচলের মুড়োয় বেঁধে বউ চলে গেল। রাধেশ্যামের এর পরে আর কাজ নেই বেলা আড়াই প্রহর অবধি। স্নান করে মাথায় টেরি কেটে ঘুমাক পড়ে পড়ে - বউ বাজারঘাট রান্নাবান্না সেরে এসে ডেকে তুলবে। খাওয়া-দাওয়ার পর পুনশ্চ শুয়ে পড়ুক, অথবা যা খুশি করুকগে। কাজ আবার সেই নিশিরাত্রে। ভোরের মুখে ভরতি খালুই নিয়ে উঠবে গগনের আলায়—তবে আর ঝগড়াঝাঁটি হবে না, বউ মন্দ বলতে যাবে না পুরুষকে।

সকালবেলা পাড়ার মধ্যে কানা-ন্যাপলা।

রাধেশ্যাম কই গো? পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ, রাতের কাজকর্ম তবে ভাল। বেশ বেশ!

চোখ কচলাতে কচলাতে রাধেশ্যাম উঠে বসল। ন্যাপলা বলে, ভরদ্বাজ মশায় এক পালি চাল পেঠিয়ে দিল।

কেন, চাল কেন।

তোমার বাড়ির চেঁচামেচি কাল শুনে গেল। দয়ার প্রাণ, দয়া হয়েছে আবার কেন?

রাধেশ্যাম খাতির করে ডাকে: উঠোনে কেন ন্যাপলা-দাদা, দাওয়ার উপরে উঠে বস। পান-তামাক খাও। কি কি বলল, শুনি সমস্ত কথা।

হোগলার চাটাই পেতে দিল ন্যাপলাকে। ঘরের ভিতরে ঘুরে এসে বলে, পান নেই ন্যাপলা-দাদা। পান খাবে তো বিকেলে এস। বউ বরাপোতা গেছে, পান-খয়ের-লবঙ্গ সব এসে পড়বে।

হুঁ, ধুমের রকম দেখেই বুঝেছি। বড়লোক হয়ে গেছ আজকে। বাবু তো বাবু —রাধেশ্যাম বাবু।

ঐ তো মজা। আজ নবাব, কাল ফকির। কাল উপোস গেছে, আজকে ডবল খাওয়া খেয়ে নেব। চাল ফেরত দাওগে ন্যাপলা-দাদা, আজ লাগবে না। কাল দিলে কাজে লাগত। ঝগড়া-কচকচি যখনই হবে, বুঝে নিও সেদিন বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। তখন নিয়ে এস।

তামাক খেতে খেতে ন্যাপলা চোখ পিট-পিট করে বলল, চাল ফেরত দিয়ে মুনাফাটা কি? ভরদ্বাজ কি ঘরের থেকে এনে দয়া দেখায়? মনিব মেরে দিচ্ছে, ফেরত দিলেও সেই মনিব অবধি পৌঁছবে না।

রাধেশ্যাম বলে, তবে থাক।

ন্যাপলা আর গোটা কয়েক টান দিয়ে রহস্য-ভরা কণ্ঠে বলে, বউ তোমার ফিরবে কতক্ষণে?

সকল পথ দৌড়াদৌড়ি, গাঙের ঘাটে গড়াগড়ি। গাঙের পারাপার আছে, দেরি বেশ খানিকটা হবে বই কি!

তবে চল। চালের কুনকে হাতে করেই যাচ্ছি।

রাধেশ্যাম বুঝেছে। উৎসাহের সঙ্গে তড়াক করে দাওয়া থেকে নামল। বলে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু, বউ এসে পড়বার আগে।

যেতে যেতে ফোঁস করে একবার নিঃশ্বাস ছাড়ে: অর্থপিশাচ মাগী। রাত জেগে জাল বেয়ে মরি, তা যদি দু-গণ্ডা পয়সা হাতে নিতে দেয়। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—পারলি কই আটকাতে? এক কুনকে চাল বিক্রি করে একটা আধুলি তো নিদেন পক্ষে।

কানা-ন্যাপলা দেমাক করে: আমাদের এসব ঝামেলা নেই। এস্তাজারির ধার ধারি নে। দু-পয়সা রোজগার করব তো সে দুটো পয়সাই আমার। যা ইচ্ছে করব তো গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও কথা নেই।

অন্নদাসী এসে পড়বার আগেই বাড়ি ফেরার কথা, ফিরে এল এক প্রহর রাতে। একা একা এসেছে, ন্যাপলা সাহস করে নি পাড়ার মধ্যে এসে অন্নদাসীর মুখোমুখি পড়তে। বাজারে বুঝি ক'টা মুড়ির মোয়া কিনে খেয়েছিল বউ, তার পর বাড়ি এসে রাঁধাবাড়া করে চুপচাপ বসে আছে। কাল উপোস গেছে, আজও মুখে ভাত পড়ে নি এখনো। ঘরে এসে রাধেশ্যাম হাউ-হাউ করে কাঁদে। কান্নার চোটে বাচ্চাটা জেগে উঠে কাঁদতে লাগল। পুরুষ ঠেকায় না বাচ্চা ঠেকায় অন্নদাসীর এই এখন মুশকিল।

রস অর্থাৎ তাড়ি গিলে এসেছে। রস খেলে নরম হয়, মায়াদয়া উথলে ওঠে।

কিন্তু পয়সা কোথায় পেল ? অন্নদাসী নানান কায়দায় জেরা করে। জালে আজ বেরুল না রাধেশ্যাম, বেরুবার অবস্থাও নেই। যা ছিল এদিকে তো পাইপয়সা অবধি খরচপত্র করে এসেছে অন্নদাসী। রাত পোহালে যে আবার একটা দিন হবে, কালকের সে দিনের উপায় ?

রাগ হলে অন্নদাসীর জ্ঞান থাকে না। পরের দিন সোজা চলে গেল চৌধুরীগঞ্জের আলায়। ভরদ্বাজ তখন নেই। বাঁধ ঘুরতে বেরিয়েছেন। বাঁধ বাঁধা এবং বাঁধ কেটে ঘেরিতে নোনা জল তোলার সময় এইবার। সেই সবের তদারকি হচ্ছে। রান্নাঘরে কালোসোনা খাচ্ছে। রাতে ভাত বেশী হয়ে যাওয়ায় কড়াই শুদ্ধ জল ঢেলে রেখেছিল। সেই কড়াই থেকেই খেয়ে নিচ্ছে। অন্নদাসী হুমকী দিয়ে পড়ে : চাল দাও—

চাল ? কেন, তোমায় চাল দিতে হবে কেন ?

ন্যাপলা কাল দিয়ে এসেছিল তো আজও ফের দিতে হবে।

মুখের দিকে তাকিয়ে কালোসোনা ফিক করে হাসল : দেবার মালিক আসুক। এলে যা হয় করবে। বেলা চড়ে উঠেছে, আসবে এইবারে। ভরদ্বাজমশায় গা ঘামিয়ে মনিবের কাজ করে না।

গর-গর করে খেয়ে নিচ্ছে। আর শুনছে রাধেশ্যাম ও কানা ন্যাপলার কাণ্ড। খেয়েদেয়ে কড়াইটা এগিয়ে দেয় : অমন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বউ ? বস। ঘাটে নিয়ে বসে বসে কড়াইখানা মেজে দাও দিকি। তোমায় দেখেই তাড়াতাড়ি অবসর করে দিলাম। ঘষামাজা আমি তেমন পেরে উঠি নে।

কড়াই দেখে মুখ সিঁটকে অন্নদাসী বলে, কী করে রেখেছ। হাতে ঘষতে ঘেন্না করে। নাম কালো তো যা ছোঁবে তাই অমনি কালিঝুলি হয়ে যাবে ?

ঘাটে বসে কড়াই মাজে অন্নদাসী। নতুন কড়াই কেনার পরে মাজে নি বোধহয় কোনদিন। অন্নকে দেখেই খেয়াল হল কালোসোনার। পরের গতর দেখলে খাটিয়ে নেওয়া এদের অভ্যাস। দুই আংটা দুখানা পায়ে চেপে ধরে খড় আর ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ির চাড়া দিয়ে সজোরে ঘষছে। উপোসের পর উপোস দিয়েও গায়ে কিন্তু দিব্যি জোর। এক গণ্ডা সন্তানের মা, তিনটি পেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেছে—বাঁধন-আটা অন্নদাসীর শরীরখানা তবু চেয়ে দেখতে হয়।

ভরদ্বাজ দলবল নিয়ে ফিরলেন। মাজা কড়াই হাতে নিয়ে অন্নদাসী ঘাট থেকে উঠে এল। ভরদ্বাজ তারিপ করেন : পরিষ্কার কাজকর্ম তোমার হে ! রুপোর মতন ঝকঝকে করে ফেলেছ।

অন্নদাসী বলে, খোরাকির চাল দিতে হবে। সেইজন্যে দাঁড়িয়ে আছি। কালকের চাল বরবাদ হয়ে গেছে। আজকে নিজে হাতে করে নিয়ে যাব।

ভরদ্বাজ বলেন, ও, রাধেশ্যামের বউ তুমি ? এ বড় ফ্যাসাদের কথা হল। একদিন দিয়েছি বলে, রোজই দিয়ে যেতে হবে ?

হবেই তো। কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখালেন কি জন্যে ?

বলে মুখ টিপে অন্নদাসী হাসল।

ভরদ্বাজ তাকিয়ে দেখে বললেন, আচ্ছা থাক তুমি। এদের সঙ্গে সেরে আসি আগে। তোমার সব কথা শুনব।

জগা বলল, ফুলতলায় যাব বড়দা। ঢোলক ছেয়ে আনব, আর ভাল খঞ্জনি পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে। এ জোড়া ক্ষয়ে গেছে।

গগন বলে, তুমি ঢোলক ছাইতে গেলে কুমিরমারি মাল পেঁছিবে কেমন করে? এত জন মাছ-মারা, তাদের উপায় কি? তারা কি খাবে?

এক দিনের তো মামলা। নয়তো বড় জোর দুটো দিন। কত ব্যাপারী আছে—হর বড়ুই, মুলুক মিঞা, বুধেশ্বর—ওদের চালিয়ে নিতে বল।

ওরা বেয়ে দেবে মাছের নৌকো, তবেই হয়েছে! ছাগলের পায়ে ধান পড়লে লোকে গরু কিনত না। নৌকো নিয়ে পেঁছিতেই বিকেল করে ফেলবে—গঞ্জের খদ্দেরপত্তোর সমস্ত ততক্ষণে সরে গেছে, মাছ পচে গোবর।

জগন্নাথ খুশী হয়েছে অন্য সকলকে ছাগল বলা এবং তাকে গরুর সম্মান দেওয়ার জন্য। তবু বলল, আমি যদি কাজ ছেড়ে চলে যাই? এমন তো কতবার হয়েছে। এক কাজ নিয়ে পড়ে থাকবে, সে মানুষ জগন্নাথ নয়।

তুমি ছাড়লে আমি তোমায় ছাড়ব না।

কথার কথা নয়, মনে মনে জগার সম্পর্কে রীতিমত শঙ্কা। যে রকম খেয়ালী লোক, এক লহমায় ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়া অসম্ভব নয় তার পক্ষে। গগন তা হতে দেবে না। ভোর-রাত্রে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে মোটরবাস ধরা। এক জীবনের মৃত্যু হয়ে পুনর্জন্মে এসে গেল। এত দিনে এইবারে মনে হচ্ছে, চেপে বসার দিন এসেছে।

গগন বলে, যেখানে যাবে আমি তোমার পিছন ধরব জগা। দেখি, পালাও কোথা। কোন দিন তোমার আর পালাতে দেব না।

আরও খুশী জগন্নাথ। খোশামুদি পেলে আর সে কিছু চায় না। বলে, আমি যদি মরে যাই বড়দা—

গগন আগুন হয়ে বলে, মরণের ডাক ডাকবে না বলছি। ভাল হবে না। মেরে খুন করে ফেলব বারদিগর বাজে কথা মুখে আনলে।

জগা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা ঘাট মানছি। থাম এবারে বড়দা। কিন্তু রাধেশ্যাম যে ঢোলক ছিঁড়ে দিয়েছে—গান বাজনা না হলে টিকতে পারবে সন্ধ্যের পর? বল সেটা। তা হলে চুপচাপ থেকে যাই।

কদিন কেটে যায় বিনা সঙ্গীতে। সত্যি, অসহ্য। দিনের আলো যতক্ষণ থাকে, সে একরকম। রাতে একেবারে ভিন্ন জগৎ। অকারণ ভেড়িতে চলাফেরা করো না, কেউটে সাপ। জলে পা দিও না, কুমির। গাছের উপর কুঁকু করছে, বানর। হরিণের ডাক আসে ওপারের বাদাবন থেকে, এক-একবার তার মাঝে বাঘের হামলা। কলকল করে জল নামছে একটানা কোন দিকে, জোলো হাওয়ায় গোলবনে পাতা ঝিলমিল করে। এই হল বাদাবন। এরই মধ্যেই আপাতত নিষ্কর্মা কয়টি প্রাণী অন্ধকার আলাঘরের ভিতর। সেই কত দূরের কুমিরমারি থেকে কেরোসিন কিনে নিয়ে আসে, কেরোসিন দুর্মূল্যও বটে। ভোর-রাত্রে কেনাবেচার সময়টা আলো জ্বলে। পারতপক্ষে আলো আর কোন সময় জ্বালতে চায় না। এমন কি রাতের খাওয়াও অনেক দিন অন্ধকারে। খালটুকু পার হয়ে গিয়ে ঘন অরণ্য। এ-পারেও ছিটে-জঙ্গল। চুপচাপ অন্ধকারে বসে থেকে বুকের মধ্যে কাঁপে। মনে হয়, জমে গিয়ে গাছ হয়ে

যাচ্ছে ওরাও যেন। হঠাৎ এক সময় গগন চেঁচিয়ে ওঠে, গান না-ই হল, কথা বলছ না কেন তোমরা? মুখের বাক্যি হরে গেল? গতরের খাটনি এত খাটতে পার, মুখের ভিতরে জিভটা নাড়তেই কষ্ট?

জগন্নাথ আবার এক দিন বলে সেই কথা: ঢোলক ছেয়ে না আনলে হচ্ছে না বড়দা। চলে যাও ফুলতলা।

গগন এক কথায় মত দিয়ে দেয়: যাও—

সকালবেলা মাছের নৌকো নিয়ে কুমিরমারি যাব। হরও যাব-যাব করছে, ফুল-তলায় ওর কি সব কাজকর্ম। দু-জনে আমরা কুমিরমারি থেকে টাপুরে-নৌকায় চলে যাব। আমাদের খালি ডিঙি বলাই বেয়ে নিয়ে আসবে। তা সে পারবে।

গগন ভেবে বলে, উঁহু, কাল নয়—পরশুও নয়। পাঁজি দেখে দিন বলে দিব।

হর ঘড়ুই আছে সেখানে। হেসে উঠে সে বলল, জগা কি বউ আনতে যাচ্ছে যে পাঁজি দেখতে হবে?

গগন বলে, দেখতে হবে বইকি! জ্যোৎস্না-পক্ষ পড়ে গেল। অষ্টমীতে যেও তোমরা। মরা গোনে এমনিই মাছ কম, তার উপরে জ্যোৎস্না হয়ে মাছ-মারাদের মুশকিল বেশী।

আবার বলে, সে-ই ভাল। অল্পসল্প যে মাছ আসবে, বরাপোতায় হাতে কেটে বিক্রি হবে। ব্যাপারীদের কেউ নিজের বন্দোবস্তে ডিঙি নিয়ে কুমিরমারি আনাগোনা করে তো আরও ভাল। মুলুক মিঞা পারতে পারে। সে যা হয় হবে, অষ্টমী থেকে তোমাদের ছুটি রইল জগা। মাছ-মারাদের বলে দিও, বুঝেসমঝে জাল নামাবে—ঐ কটা দিন আমাদের মাল কাটানোর দায় রইল না। সত্যিই তো, ছুটিছাটা না পেলে মানষে বাঁচে কেমন করে? আর শোন—ঢোলক আন, মন্দিরা আন, যদি ইলিশমাছ উঠে থাকে তা-ও নিয়ে আসবে একটা। অবিশ্যি করে এনো। নোনা মাছ খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেল।

বৃত্তান্ত শুনে বলাই বেঁকে বসে: সে হবে না। জগা যাচ্ছে আমিও যাব ফুল-তলায়। ডিঙি কুমিরমারি থেকে যে-কেউ ফেরত আনতে পারবে। মুলুক মিঞা আনবে। না হয় রাত হয়ে যাবে সেদিনটা ফিরতে। তাতে দোষ হবে না।

হর ঘড়ুই বলে, কী রকম, বলি নি বড়দা? বলাই ছাড়বে না। যা গতিক, জগা মারা গেলে বলাই এক-চিতেয় তার সঙ্গে সহমরণে যাবে।

কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নেই। দেখালে বিপদ ঘটে। দেখুন না, বিপদ কী রকম ভরদ্বাজের! সেই একদিন দয়াপরবশ হয়ে অন্নদাসীর জন্য চাল পাঠালেন, তার পরে অন্নদাসী খুঁচি হাতে নিজে চৌধুরিগঞ্জের আলায় এসে পড়ে। এক-আধদিন নয়, দায়ে পড়লেই আসবে চলে। রাধেশ্যাম জালে যায় নি, কিংবা জালে তেমন মাছ পড়ে নি—একটা—কিছু হলেই হল। দাবি জন্মে গেছে যেন ভরদ্বাজের উপর। আর রাধেশ্যামও জো পেয়েছে। হাতের নাগালে দুটো চারটে পয়সা তো কাউকে কিছু না বলে সুট করে নেশায় বেরিয়ে পড়ল। অথবা জাল হাতে করে বেরিয়ে কোন এক আড্ডায় গিয়ে বসল। কিংবা মনের সুখে নিদ্রা দিল কোনখানে পড়ে পড়ে। শেষরাত্রে জালগাছা জলে চুবিয়ে এনে শুকনো মুখে বলবে, বুড়ো হালদার দিল না আজ কিছু। আসলে হল, শৌখিন মানুষ—মেজাজখানা অবিকল বাবুভেয়ের মত। জাল বেয়ে জলকাদা ভেঙে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে মন চায় না। কাজ করতে হত নিতান্ত

পেটের দায়ে। এখন দেখছে, কাজে ঢিল দিয়েও উপোস করতে হয় না। হেন অবস্থায় যে রকম ঘটে—খাটনিতে গা নেই। বউকে তাড়া দেয় ভরথাজের কাছ থেকে চাল নিয়ে আসবার জন্য। গড়িমসি করলে মারগুতোনও দেয়।

অন্নদাসীকে গোপাল বলেন, এমন খাসা তোর গতরখানা, ঐ হতভাগার সঙ্গে নিত্যি নিত্যি চেঁচামেচি করতে যাস কি জন্যে! নিজে রুজিরোজগার করলেই তো হয়।

ফিক করে হেসে অন্নদাসী বলে, মরণ!

হাসি দেখে আরও মাথা ঘুরে যায় গোপালের। তবু শান্তভাবে বলেন, রোজগার করে খাবি, তার মধ্যে মরণ ডাকবার কী হল রে?

অন্নদাসী বলে, কী রকমের রোজগার বলে দাও না বাবু আমায়।

গোপাল সতর্কভাবে এগোন: এই ধর না কেন, এবার থেকে ভাবছি আমি নিজে রান্না করব। তুই তার যোগাড়যন্তর করে দিবি।

কালোসোনার হল কি?

গোপাল বলেন, দূর! মেছোঘেরির কাজকর্মে আছি তা বলে মানুষটা সামান্য নই আমি। ব্রাহ্মণ-সন্তান, দেশে অঢেল যজন-যাজন। সোনারাজ্যে নানান ভজোকটো —তাই ভাবলাম, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি, এখানে কে দেখছে, এক সময় কলকাতায় গিয়ে আচ্ছা করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে সব অনাচার ধুয়ে দিয়ে আসব। তা বেটা কালোসোনার এমন রান্না, অন্নপ্রাশনের অন্ন অবধি পেটের তলা থেকে উপরে বেরিয়ে আসে। খেতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হই। আপন হাত জগন্নাথ! তুই যদি ভরসা দিস অন্ন, পৈতে কোমরে গুঁজে হাতা-খুন্তি নিয়ে লেগে যাই আবার।

সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন তার পানে: কতক্ষণের বা কাজ! কাজকর্ম সেরে রাঁধা ভাত খেয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ঘরে চলে যাবি। কি বলিস?

কাজকর্মগুলো বাতলে দিন, তবে শুনি।

উনুন ধরানো, বাসন মাজা, বাটনা বাটা। খাবার জল বয়ে আনতে হবে না, ফুলতলায় আমাদের বাবুদের টিউকল থেকে মিঠা জল ধরে নৌকোয় করে নিয়ে আসে।

আর কিছু নয় তো? বলুন বাবুমশায় সমস্ত খোলসা করে।

দেখা গেল, অন্নদাসী মুখ টিপে হাসছে। গোপাল বলেন, মেয়েমানুষের মন দেবতাও জানেন না। তোর মনের অন্দরে আর কোন্ কাজের শখ, আমি তা কেমন করে বলব রে!

তেইশ

টাপুরে বলে থাকি আমরা, ইংরেজিনবিস আপনারা বলেন শেয়ারের নৌকো। ফুলতলা আর বয়ারখোলার মধ্যে চলাচল। কুমিরমারির ঘাট মাঝে পড়ে। কুমিরমারি থেকে টাপুরে ধরে জগন্নাথরা ফুলতলায় চলে গেল। নতুন-ছাওয়া ঢোলক গলায় ঝুলিয়ে ঐ নৌকোতেই আবার ফিরে আসবে। আসবে বয়ারখোলা অবধি। সেখানে মেছো-নৌকো পাওয়া গেল তো ভাল। নয় তো হেঁটেই মেরে দেবে নতুন রাস্তার নিশানা ধরে।

হর ঘড়ুইকে সঙ্গে নেওয়া মিছে। তার মাথায় খালি ঘুরপাক খায় বাড়তি দুটো পয়সা আসবে কোন্ কায়দায়। পয়সা, পয়সা, পয়সা—পয়সা কি কড়মড় করে চিবিয়ে খাবি রে বাপু? প্রাণধারণের দায়টুকু মিটে গেলে হল। কুমিরমারি থেকে

রাস্তা হয়ে যাচ্ছে, চৌধুরিগঞ্জ ছাড়িয়ে রাস্তা চলে যাবে আরও নাবালে। সাগর অবধি চলে যাবে, এই রকম শোনা যায়। অতদূরে যাক না যাক, সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নয়। রাস্তার একটা চেহারাও দাঁড়িয়েছে মোটামুটি—মাটি ফেলেছে অনেক জায়গায়, খন কেটে দিয়েছে। পায়ে হাঁটা চলে। রাস্তাটা পাকা করে এবং ছোট-বড় গোটা তিনেক পুল বানিয়ে দেয় যদি, তখন লরী চলবে। হবে নিশ্চয় তাই। কাঙালি চক্কোত্তির ছেলে অনুকূল চৌধুরী যখন উঠে পড়ে লেগেছে, ওদের স্বার্থ রয়েছে—কাজ শেষ না করে তখন ছাড়বে না। নাকের সিধে রাস্তা—ডিঙিতে এ খাল থেকে ও-খালের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে না আর তখন। কত দিন লাগতে পারে ঐ রাস্তায় খোয়া ফেলতে? এক বছর—দু-বছর? হয়ে গেলে তখন এক ঘণ্টার মধ্যে কুমিরমারি। আর কুমিরমারি একেবারে ঘরের দুয়োরে হয়ে গেল তো বেচা কেনা সেখানেই বা কেন? গঞ্জ জায়গা হলেও খেয়ো-খদ্দের যত ওখানে—তারা কত আর মাল টানবে, কী দাম দেবে! ব্যবসা তাতে কত আর ফাঁপানো যায়! এক ঘণ্টায় কুমিরমারি এসে গেলাম তো মোটরলঞ্চে মাল নিয়ে ফেল ফুলতলা। বড় পাইকারেরা বরফ চাপিয়ে ওখান থেকে কলকাতা শহরে চালান দেবে। কলকাতার মানুষ ছাড়া ট্যাঁকের জোর কার?

হর ঘড়ুই এমনি সব মতলবে মশগুল। আড়তওয়ালাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, পড়তা খতিয়ে দেখছে। ধৈর্য ধরতে পারে না। আচ্ছা, রাস্তা যত দিন লরি চলবার মতন না হচ্ছে, লোকের কাঁধে শিকে-বাঁকে মাল যদি কুমিরমারি পেঁছে দেওয়া যায়? সময় কত লাগে, মুনাফা দাঁড়ায় তা হলে কি পরিমাণ?

হরর মুখে এই সমস্ত কথাই কেবল, মনে মনে এই ভাবনা। জগা দোকানে চোল ছাইতে দিয়ে এসেছে। একটা দিন পারে দেবে। রেল-স্টেশন থেকে সামান্য দূরে ঘাট। আঁকা-বাঁকা গাঙ দু-পারে মানুষজনের ঘরবসত ছাড়িয়ে তেপান্তর ধানবনগুলো পার হয়ে গিয়ে অরণ্যভুমে পথ হারিয়ে শতেক ডালপালা ছেড়ে এক সময়ে অবশেষে দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর রেললাইন চলল ঠিক তার উল্টোমুখো। লাইনের ধারে ধারে দালানকোঠা ঘন হচ্ছে ক্রমশ। হতে হতে শেষটা শহর কলকাতা—দালান আর পাকা রাস্তা ছাড়া একটুকু মাটির জমি নেই, মাটি যেখানে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।

জগা আর বলাই ফুলতলা স্টেশনে চলে যায় এক সময়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেল-গাড়ির চলাচল দেখে। কত মানুষে নামল এসে শহর কলকাতা থেকে, ফর্সা জামাকাপড় পরনে। ঘাটে গিয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ নৌকোয় উঠে জামা খোলে। খোলস খুলে ফেলে যেন বাঁচল, ধড়ে প্রাণ এল। পুঁটলি খুলে গামছা বের করে গা-হাত-পা ঘষে ঘষে শহরের কেতাকানুনও মুছে দিল যেন ঐ সঙ্গে। জামা খুলে ফেলে দাঁড় ধরল। মচ মচ করে দাঁড় পড়ছে। জলে আলোড়ন। সাঁ সাঁ ছুটছে নৌকো।... আবার ওদিকে দেখ, তার উল্টো রকম। বাদা অঞ্চলের যত নৌকো এসে ধরছে ফুল-তলার ঘাটে। ঘাটে এসে জোয়ানমরদরা গামছায় জড়ানো গেঞ্জি-কামিজ অমনি গায়ে চড়ায়। কনুই ভরতি লোহা ও তামার মাদুলির রাশ জামার নিচে ঢেকে যায়। অব্যবহারে ধনুকের মতন বেঁকে যাওয়া চটি—পা ধুয়ে ফেলে চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তারা কলকাতার গাড়ি ধরতে চলল।

জগারা দেখে এই সব। নৌকোয় উঠে মাঝিদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। তামাক খায়, নানান জায়গার খবরাখবর শোনে। স্টেশনের অফিসঘরে টরে-টক্কা বেজে যায়,

ঢোকার মুখে মাস্টারবাবু অদৃশ্য কার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। এ-ও হল দূরের জায়গার খবরাখবর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না স্টেশনবাবুদের কাছে। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢোকাই যায় না।

অনেক রাত্রি। বাদাবনের বুকের উপর পাষাণ চাপা—শব্দসাড়া একেবারে নেই। মরা গোনে গাঙখালগুলো অবধি যেন তটের কাছে ঘুমিয়ে। হঠাৎ চিৎকার। চেঁচাচ্ছে কে গলা ফাটিয়েঃ সর্বনাশ হয়েছে, মারা গেলাম। কে কোথা আছ, এস শিগগির।

ঘুমের ঘোরে গগন ধড়মড়িয়ে ওঠে। রাধেশ্যামের গলা যেন। অনেক দূরে থেকে, বোধকরি কালীতলার ওপাশ থেকে চেঁচাল বার কয়েক। তারপরে চুপচাপ। ওটাকে নিয়ে আর পারা যায় না—আবার কোন্ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। আগুপিছু না ভেবে এক-একটা দুঃসাহসিক কাজে নেমে পড়ে, তখন আর খোয়ারের পার থাকে না। আজকে হয়তো মেরেই ফেলেছে একেবারে। নয়তো দুবার তিন বারের পর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন?

ছটফট করছে গগন। নিজে বেরুবে না। ছোট হোক, সামান্য হোক, একটা ঘেরির মালিক সে। জীবনের মূল্য হয়েছে; রাত্রিবেলা একা-দোকা তার পক্ষে বেরুনো ঠিক নয়। যত ঘেরিওয়ালার রাগ তার উপরে। চতুর্দিকে মাছ পাহারা দেওয়া নিয়ে তোলপাড় পড়ে গেছে—সবাই জানে, কলকাঠি টিপছে সে-ই নতুন-ঘেরির আলায় বসে। কামরার বাইরে কপাটের ধারে হর ঘড়ুই শুয়ে পড়ে চটাপট শব্দে মশা মারে, ডাক দিলেই সাড়া পাওয়া যায়। আজকে সে নেই—ফুলতলায় চলে গেছে জগা-বলাইর সঙ্গে। তার জায়গায় শুয়েছে বুধীশ্বর। দোসর একজন থাকা উচিত—মানুষটিকে সেইজন্যে ডেকে আনা। দিনমানে পুরো মানুষই বটে, কিন্তু রাত্রে শুয়ে পড়বার পর শুকনো কাঠ একখানা। ধাক্কাধাক্কি করেও সাড়া মিলবে না। ধরে ঠিক মত বসিয়ে দিলেন তো বসে রইল—একটু কাত হয়েছে কি গড়িয়ে পড়বে আবার মেজেয়।

দরজা খুলে বেরিয়ে গগন ডাকছে, ওঠ দিকিনি একটু বুধীশ্বর।

শেষটা কলসির জল নিয়ে খানিক ঢেলে দিল তার গায়ের উপর।

উঁ—

গগন খিঁচিয়ে ওঠেঃ মানুষটা মরল কি থাকল, খবর নিবি তো একবার?

বুধীশ্বর জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, আলো জ্বাল

গগন হেরিকেন ধরাচ্ছে। বুধীশ্বরের তবু ওঠবার গা নেই। শুয়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করে।

উঠলি কই রে?

বুধীশ্বর বলে, উঠে কি হবে? শড়কি-লাঠি তো চাই। শুধু-হাতে যাওয়া যায় না রাত্রিবেলা।

সে বস্তুও দুর্লভ নয়। কামরার মধ্যে একটা কোণে লাঠি-শড়কি থাকে। দেয়ালে ঝোলানো মেলতুক-রামদা। কখন কোন বিপদ এসে পড়ে, অস্ত্রশস্ত্র হাতের কাছে রাখতে হয়। কামারের গড়া বেপাশি বন্দুকও একটা আনবার ইচ্ছা, কিন্তু চৌধুরি-বাবুদের শত্রুতার ভয়ে সাহস করছে না। পুলিস ডেকে হয়তো ধরিয়ে দিল। নতুন ধার-দেওয়া চকচকে শড়কি বের করে নিয়ে এল তো তখন বুধীশ্বর বলছে, রাধেশ্যাম কি আছে? বড়-শিয়ালে ওটাকে মুখে করে নিয়ে গেছে—বুঝলে বড়দা? গিয়ে

কি হবে? এতক্ষণে কাঁহা-কাঁহা মুলুক—

গগন রীতিমত চটে গিয়ে বলে, নড়বার ইচ্ছে নেই, সেই কথাটা বল না স্পষ্ট করে। আলো রে শড়কি রে হেনোতেনো করে আমায় তবে খাটালি কি জন্যে?

বুধেশ্বর বলে, তুমি যাচ্ছো না কেন বড়দা। পায়ে পায়ে গিয়ে দেখে এস।

যাবার হলে তোকে তবে তেল দিই? এতক্ষণে কতবার আসা-যাওয়া হয়ে যেত!

ঘুমটা ভেঙেছে বটে বুধেশ্বরের। উঠে সে বলল, তা যাই বল একলা মানুষ আমি যাচ্ছি নে। পাড়ার লোকজন ডাক, সকলের মাঝখান থেকে তবে আমি যেতে পারি।

ঠিক এমনি সময় বাঁধের উপর কলরব। ডাকাডাকি করতে হল না, ছুটে ছুটেই আসছে জন কয়েক। মুলুক মিঞার কণ্ঠটাই প্রবল: সর্বনাশ হয়েছে বড়দা। নতুন বাঁধ ভেঙে গেছে।

পিছনে শিরোমণি সর্দার। সে বলে ওঠে, ভেঙেছে না কেটে দিয়েছে?

বুধেশ্বরের উদ্বেগ প্রবল হয়ে উঠল এতক্ষণে। বলে, রাধেশ্যাম চেঁচিয়ে উঠল একবার। তার খোঁজ নিয়েছ—বলি, সে কোথায়?

মুলুক মিঞা বলে, খানার মধ্যে—

শিরোমণি বলে, সেই তো! চেঁচানি শুনে জাল-টাল তুলে নিয়ে ছুটেছি। নতুন বাঁধের খানিকটা কেটে হারামজাদারা গাঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যারাত্রে কেটেছে বোধ হয়। ভাঁটার পয়লা মুখ এখন। পুরো ভাঁটা এমনি থাকলে ঘেরির অর্ধেক জল বেরিয়ে যাবে। মাছ যা জন্মেছে সমস্ত গিয়ে গাঙে পড়বে। কপাল ভাল যে রাধেশ্যাম কাটা-গর্তে পড়ল। তাইতে জানাজানি হয়ে গেল।

মুলুক মিঞা বলে, জাল ঘাড়ে করে বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। নেশায় টরটরে, চোখ মেলে চলাফেরা করে না তো!

গগন বলে, হাত-পা ভাঙে নি তো?

শিরোমণি সহজ কণ্ঠে বলে, তুলে ধরে কে দেখতে গেছে! ঐ দেহ টেনে হিঁচড়ে বাঁধের উপর তোলা দু-একজনের কর্ম নয়! পড়ে আছে, তাতে খুব ভাল হয়েছে। ঝিরঝির করে জল বেরুচ্ছিল, দেহখানা পড়ে সেটা আটক হয়ে গেছে।

মুলুক মিঞা জুড়ে দেয়, আছে বেশ ভালই। খানায় পড়েছে না ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে, সে বোঝবার মতন হুঁশজ্ঞান নেই।

ছুটল সকলে। জগা নেই বলে মাছের ডিঙির চলাচল বন্ধ। মাছ-মারারা কাজে ঢিলঢান দিয়েছে, সাঁইতলার পাড়ার মধ্যে শুয়ে অনেকে আজ ঘুম দিচ্ছে। এ ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে। পাড়াসুদ্ধ গিয়ে জমল বাঁধের উপরে। এই তবে শুরু হয়ে গেল ও-তরফের কাজকর্ম—এরা নৌকো সরিয়েছিল, তারই পালটা শোধ।

রাধেশ্যামকে টেনে তুলেছে, হাউহাউ করে সে কাঁদছে এখন। চরের কাদামাটি কেটে এনে চাপাচ্ছে ভাঙা জায়গায়। মাটি দাঁড়ায় না, জলের টান বেড়েছে। পাড়ায় ঢুকে ক'জনে তখন ছাউনিসুদ্ধ এক চাল খুলে এনে আড়াআড়ি বসিয়ে দিল। বুদ্ধিটা বড় ভাল। খোঁটার সঙ্গে, মাটি চাপান দাও এবার ওদিকে। জলের টানে মাটি আর ভেসে যাবে না। একটু-আধটু যায়ও যদি, মাছ বেরুতে পারবে না—চালে আটক হয়ে থাকবে।

গোপাল পরদিন অন্নদাসীকে বলেন, রাত্তে গণ্ডগোল শুনলাম যেন তোদের ওদিকে?

আমাদের মানুষটা অথম হয়ে পড়ে আছে।

সে কী রে?

মোটামুটি সমস্ত শুনে নিয়ে গোপাল বললেন, একবার ইচ্ছে হল যাই দেখে আসি। কিন্তু গেলে হয়তো কথা উঠত। ধর্ম দেখতে এসেছে বলত লোকে।

তা কেন? বলত, কাজটা কদ্দুর কি দাঁড়াল ভরদ্বাজ মশায় খোদ তার তদারকে এসেছেন।

গোপাল বলেন, দেড় কোদাল মাটি ফেলে ফঙবেনে ঘেরি বানিয়েছে। মাটি ধুয়ে বাঁধ ফাঁক হয়ে গেল, তার জন্য আমরা বুঝি দায়ী? তুইও বুঝি সেই কথার উপর গেরো দিয়ে রেখেছিস?

অন্নদাসী বলে, চোখে যখন দেখা নেই, ছেঁড়া-কথার দাম কি! কিন্তু চাল আজকে বেশী ফুটিয়ে দিতে হবে। আমার একলার পেট ভরালে হবে না। যে-মানুষ শুয়ে পড়ে রয়েছে, তার জন্যে ভাত বেড়ে নিয়ে যাব।

গেরো কেমন দেখ। সে-ই বা কেন ওদিকে মরতে যায়? হয়েছে কী তার?

গা-গতর চুরমার হয়ে গেছে, তাই তো বলছে। পায়ে খুব চোট লেগেছে।

কচু হয়েছে। পড়েছে হাত তিন-চার নিচে, পাথরের শরীরে কী হয় তাতে? তুইও যেমন!

অন্নদাসী ঘাড় নেড়ে মেনে নেয়: সে কথা ঠিক, ও মানুষ অমনি। কায়দায় পেয়েছে তো সহজে ছাড়বে না। এই গা-হাত-পা ব্যথা নিয়ে ছ-মাস এখন নড়ে বসবে না। আমার জ্বালা—এক এক পাথর ভাত নিয়ে গিয়ে মুখের কাছে ধর। আমার ঘরের মানুষের জন্যে চাল নিয়েছ তো ঠাকুর মশায়?

চব্বিশ

চৌধুরিগঞ্জ এলাকার যে-কেউ ফুলতলা আসুক, অসুবিধা নেই। সোজা গিয়ে চৌধুরিবাড়ি উঠবে। অনুকূলবাবুর ঢালা হুকুম। কিন্তু এলাকার মানুষ হয়েও জগাটা তা পারে না। শত্রুপক্ষ। অত বড়মানুষ চৌধুরিরা—এরা সে তুলনায় কী! হাতি আর মশায় শত্রুতা। তা সেই মশা বিবেচনা করেই হাতের নাগালে পেয়ে দিল বা একটা চাপড় ঝেড়ে!

হর ঘড়ুই আগে আরেও এসেছে। তার অনেক জানাশোনা। বলে, ভাবনা কি! কুমিরমারিতে এক গদাধর হোটেল, এখানে চার-পাঁচটা। গদাধরের চালাঘরে পাত পেড়ে খাওয়ায়, এখানে পাকা দালানের পাকা মেঝেয় থালায় ভাত, বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন।

টাপুরেঘাটার অনতিদূরে গাঙের উপর প্রথম যে হোটেলটা পেল, সেইখানে উঠেছে। রেটটা কিছু বেশী এই হোটেলে, জনপ্রতি এক সিকি এক এক বেলায়। পাকা দালান এবং থালাবাটির খাতিরে সম্ভবত। তবে পেট চুক্তি। এবং তামাক ও মাখবার তেল ফ্রী। কোন খদ্দের রাত্রে থাকতে চাইলে একটা মাদুরও দেবে, সে বাবদ কিছু লাগবে না।

রেটের কথায় হর ঘড়ুই আগু-পিছু করছিল। বলাই হাত ধরে টানে: এস দিকি। মা বনবিবির আশীর্বাদ থাকে তো তিন জনের তিন সিকি নিয়েও ওদের

জিতে যেতে দেব না। তিনটে পাতা করতে বল ঠাকুরমশায়। দেখা যাক।

বামুনঠাকুর মালিকের কাছে এই তাম্বির ব্যাপার কিছু বলে থাকবে। এর পরে দেখা গেল, খাওয়ার সময়টা খোদ তিনি সামনের উপর দাঁড়িয়ে। বলাইর আরও রোখ চড়ে যায়। ভাত দিয়ে ঠাকুর ডাল আনতে গেছে, ইতিমধ্যে নুন সহযোগে সমস্তগুলো ভাত সাপটে দিয়ে সে বসে আছে। বাটিতে ডাল ঢেলে দিয়ে আবার ভাত আনতে গেছে, বাটির ডাল চোঁও করে এক চুমুকে মেরে দিল। এক খদ্দের নিয়েই নাস্তা-নাবুদ বামুনঠাকুর। মালিক রাগে গরগর করছে। বলে : মটর কলাই দু-আনা সের হয়ে গেছে। আর ডাল পাবে না বাপু।

হর বলে, কোন হোটেলে তো এ নিয়ম নয়। ভাত আর ডালে কেউ কষাকষি করে না। খদ্দের সব ভেগে যাবে এমনধারা করলে।

হোটেলওয়ালা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, তাদের ডালে মাল থাকে কতটুকু? সাকুল্যে মালসাখানেক ডাল রাঁধে ; আর বড় গামলায় ফ্যানে-জলে গুলে রেখে দেয়। গামলার ফ্যানে হাতা কয়েক ডাল ঢেলে আচ্ছা করে ঘুঁটে দেয়। ব্যস, হয়ে গেল। তারা কি জন্য দেবে না, অমন ডালে খরচাটা কি?

বলাই তাড়াতাড়ি বলে, যাক গে, ডাল কে চায়! ভাত হবে তো? আর নুন? নুন না হলেও চলবে, শুধু ভাতই সই।

নুন-ভাতই চলল। হাঁ, বাহাদুর বলি বলাইকে। সৃষ্টিছাড়া রেট সত্ত্বেও মালিক লোকটার চক্ষু কপালে উঠে গেছে। হাসি চেপে জগা জিজ্ঞাসা করে, অমন এক নজরে কি দেখেন মশাই?

লোকটা বলে, চোখে তো ছোঁড়ার বাইরেটা দেখছি। টিপে দেখতে ইচ্ছে করছে, চামড়ার নিচে বোধ হয় এক কুচি হাড়মাস নেই—শুধুই খোল, তুলো ভরার আগে পাশবালিশের খোলের মতন।

সেই পয়লা দিনের পর থেকে হোটেলওয়ালা আর অমন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে না, ঘোরাফেরার মধ্যে এক-একবার উঁকি দিয়ে যায়। চোখ মেলে ব্যবসার ডাহা সর্বনাশ দেখতে ভয় করে বোধহয়।

খাওয়ার পরে পয়সা মিটিয়ে নেয়, এবং পানের খিলি দেয় খদ্দেরদের। সেই সময় জিজ্ঞাসা করে, কদিন আছ আর তোমরা?

জগা ভালমানুষের মত বলে, কাজ মিটলে তবে তো যাওয়ার কথা, পনের বিশ দিন লাগবে। বেশীও লাগতে পারে। ভয় নেই, যে কদিন আছি, তোমার হোটেল ছেড়ে অন্য কোনখানে নড়ছি নে।

আমি তো নুন-ভাত খাওয়াচ্ছি, অন্য সব হোটেলে দেদার ডাল দেয়, তবু যাবে না? ঐ রসময় চক্কোত্তির ওখানে যাও। বড় বড় মাছের দাগা।

জগা বলে, উঁহু, তুমি যে মানুষ ভাল। তোমার ঘরের দাওয়াটা আরও ভাল। ঠান্ডা হাওয়া দেয়। শুয়ে সুখ আছে।

সেই রাত্রে শুতে গিয়ে তারা মাদুর খুঁজে পায় না। গেল কোথা?

হোটেলওয়ালা বলে দেখ কোন দিকে পড়ে আছে। বাতাসে হয়তো বা গাঙের খোলে নিয়ে ফেলেছে। কি করব, বাড়তি মাদুর মানুষে ক'টা রাখতে পারে বল?

হর ঘড়ুই তখন বলে, ধুলোমাটিতে শুইয়ো না দাদা। বের কর মাদুর। আজকেই শেষ। সকালবেলা আমরা চলে যাচ্ছি।

ঠিক ? তুমি মুরুব্বী মানুষ—কথা দিচ্ছ কিন্তু। ছোঁড়াগুলো কখন কি বলে, ওরা বললে বিশ্বাস করতাম না।

হ্যাঁ, বলছি আমি। নিশ্চিন্ত হয়ে মাদুর বেচ্‌ গে। ঢোলক আজ বিকেলেই পাবার কথা। হয়ে উঠল না। ছাউনির কাজ রাতের মধ্যে শেষ করে রাখবে, ভোর-বেলা দিয়ে দেবে।

হোটেলওয়ালা বলে, পুরানো লোক তুমি, অনেক দিনের ভালবাসাবাসি। হোটেলে এ-রকম খন্দের কোন্‌ আক্কেলে এনে তুললে বল দিকি ?

খাইয়ে দেখেছি নাকি ? হেসে উঠে হর ঘড়ুই বলে, আচ্ছা, এবারে কাউকে যখন সঙ্গে আনব, বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে পরখ করব আগেভাগে।

বড্ড হাওয়া হোটেলের পিছন দিককার দাওয়ায়। মাদুরের উপর পড়ে আছে তাই, নয়ত মাদুর সত্যি সত্যি উড়িয়ে নিয়ে ফেলত। ক'টা রাত পাশাপাশি কাটিয়ে গেল তিন জনে। জগা-বলাই অসাড় হয়ে ঘুমোয়। ঘড়ুইয়ের মগজের ভিতর মতলবের পর মতলব যেন পাঁয়তারা কষে বেড়ায়। এক এক সময় অধীর হয়ে ওঠে, চুপচাপ থাকতে পারে না, ঘুমন্ত জগা-বলাইর গা ঝাঁকিয়ে তাদের কাছে অতীত আর ভবিষ্যতের কথা শোনায়। বন কেটে বসতির শুরু—এই তো ক'টা বছরের কথা। কী হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আরও হবে, শহর কলকাতা এসে পড়বে দেখো বাদা অঞ্চলের মধ্যে।

সকালবেলা উঠে জগন্নাথ ছুটল ঢোলের দোকানে। পয়সা চুকিয়ে দিয়ে জিনিসটা শুধু নিয়ে আসা। বলে, তোমরা ঘাটে চলে যাও। যদি একটু দেরি হয়ে যায়, টাপুরে-মাঝিকে বলেকয়ে রাখবি তুই বলাই। নৌকো ছেড়ে না দেয়।

ঘাটে গিয়ে বলাই বসেছে। আছে বসে তো আছেই। এই আসছি। বলে হর ঘড়ুই পথের পাশে এক দোকানে ঢুকে পড়ল—পাটি-মাদুরের দোকান। জগারও দেখা নেই। নতুন ছাউনির পর ঢোলক কী রকমটা দাঁড়াল, পরখ করতে হয়তো সে দোকানেই বোল তুলতেই বসে গেছে। কিছু বিচিত্র নয়। কেউ যদি দু-চার বার বাহবা দেয়, ব্যস, হয়ে গেল আজকের মতন টাপুরে ধরা। দোকানের উপরেই গান-বাজনার আসর। জগাকে বিশ্বাস নেই, জগা সব পারে।

ঘাটের উপরে এক দোকান। ভাল দোকান—বিড়ি, খিলি-পান, বাতাসা, মুড়ির-মোয়া সমস্ত মেলে। দোকানের ছোট্ট চালাঘর ঠিক মাটির উপরে নয়। খানিকটা উঁচুতে বাঁশ ও গরানের ছিটের মাচা, সেই মাচার উপরে মালপত্র ও দোকানদার। উপরে খড়ের চাল। কোটালের সময় গাঙের জল বেড়ে মাচার নিচে ছলছল করে। দোকানের সামনে খুঁটি পুঁতে চেরাবাঁশের বেঞ্চি মত করে রেখেছে, জন পাঁচ-ছয় বসে আছে বেঞ্চিতে—বিড়ি খাচ্ছে, পান খাচ্ছে। টাপুরে-নৌকোর চড়ন্দার এরা সব। এবং বলাইও বসেছে এই জায়গায়। নৌকো ছাড়ো-ছাড়ো। উঠে পড়েছে বেশির ভাগ। এদেরও ডাকছে। বলাই কিন্তু একনজরে চেয়ে ডাঙার পথের দিকে। সোজা পথ —বাঁকচুর নেই। উদ্বেগের বশে এগিয়েও দেখে এসেছে বারকয়েক।

টাপুরে-নৌকোর ভাড়ার দরদাম করতে হয় না। একেবারে বয়ারখোলা অবধি যাবেন তো চার আনা। তবে ঠিক অর্ধেক পথ কুমিরমারি কিন্তু দশ পয়সা। তেলি-গাঁতি এক আনা, সজনে ডাঙা তিন আনা। গলুয়ে দাঁড়িয়ে এক জনে হাঁক পাড়ছে : বয়ারখোলা কুমিরমারি সজনেডাঙা ছাড়ে নৌকো, ছাড়ে-এ-এ-এ—

এবং ছেড়েও দিল টাপুরে। কাছি খুলে হাল-দাঁড় বেয়ে চলে গেল মাকগাঙ

অবধি। বেঞ্চির উপরের চড়ন্দারেরা. নড়ে না গলেতানি করছে, নতুন করে বিড়ি ধরাচ্ছে আবার। হাঁ, আসছে এইবার—বলাই ঠাহর করে দেখে, মানুষটা জগন্নাথ না হয়ে যায় না। আসছে বাতাসের বেগে, দৌড়ানো বলা চলে। কাছাকাছি এলে দেখা যায়, ঢোলক ঝুলছে পিঠের দিকে—ঢোলকের আংটার মধ্যে চাদর গলিয়ে পৈতের মতন কাঁধের উপর আর বগলের তলা দিয়ে নিয়ে গেছে।

ছেড়ে গেল নাকি রে?

বলাই বলে, নতুন বউ হয়ে পালকি থেকে নামলে দেখছি। যা বললে, আর বলো না। লোকে হাসবে।

বেকুব হয়ে গিয়ে জগাও হাসতে লাগল। তা বটে, পুরানো কায়দা টাপুরে-ওয়ালাদের। ছাড়ছি বলে মুখে মুখে চেঁচালে চড়ন্দারে গা করে না। ঘাট থেকে সত্যি সত্যি ছেড়ে খানিকটা আগু-পিছু করতে হয়। তখনও এমন-কিছু চাড় নেই, সে তো এই বুঝতে পারছেন উপরের লোকগুলোর ধরন দেখে।

গাঙের দিকে তাকিয়ে জগা অবাক হল: এক-পো ভাঁটি নেমে গেল, এখনো চড়ন্দার ডাকে? বয়ারখোলা আজ পেঁছিতে হবে না, সজনেডাঙা কি কুমিরমারি অবধি বড় জোর! আর দেরি কিসের মাঝি? ছাড় এবারে।

ছইয়ের ভিতরের লোকগুলো কলরব করে ওঠে। মনের মত কথা পেয়েছে। ঠিক কথা, সত্যি কথা, ছাড় এখুনি। কেউ বাকি থাকে তো সে লোক কালকে যাবে। দু-একজনের জন্যে এত মানুষ কষ্ট পাবে, সেটা হতে পারে না।

মাঝি চেনে জগাকে। এ অঞ্চলের গাঙে খালে যাদের গতায়াত, জগাকে চিনবে না এমন কে আছে? চড়ন্দারে চেঁচামেচি করছে, ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল—অন্য কেউ নয়, জগা এসে আবার ফোড়ন দিচ্ছে তার ভিতরে। রাগ করে মাঝি বলে, দেরি তো তোমাদের জন্যে জগা। তুমি এসে গেলে, তোমাদের হর-ব্যাপারীর এখনো পাত্তা নেই। যাবে ফেলে তাকে? তাই চল। খুঁজি তুলে ফেল ওরে ছোঁড়া। দাঁড়ে চলে যা।

জগা বলাইকে বলে, কোথায় রে ঘড়ুই? আমি ভাবছি, ব্যস্ত-বাগীশ মানুষ—নৌকোর মধ্যে আগেভাগে গিয়ে বসে আছে।

বলাই বলে, আসছিলাম দুজনে। মাদুরের দোকান দেখে ঘড়ুই ঢুকে পড়ল। বলে, এগুতে লাগ, একটা শীতলপাটি নিয়ে যাচ্ছি।

পায়ে পায়ে তারা নদীর খোলে গিয়ে দাঁড়াল। জগা বলে, ছেড়ে দাও মাঝি, আর কাজ নেই। শীতলপাটি কিনতে গেছে—দোকানসুদ্ধ সওদা করে আনতেও তো এতক্ষণ লাগে না!

এসব নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। নৌকো ছাড়বার মুখে এ ধরনের কথাবার্তা হামেশাই হয়ে থাকে। শেষ মুখটায় কাদায় খুঁজি পুঁতে নৌকোর কাছি তার সঙ্গে জড়িয়ে রাখে। রাগের বশে খুঁজি একবার যা তুলেই ফেলল, পরক্ষণে আবার পুঁতে দেয়, এক চড়ন্দারের ভাড়া চার-চার আনার পয়সা ছেড়ে যাওয়া সহজ কথা নয়।

এমন সময় দেখা গেল, হর ঘড়ুই বিড়ির দোকানের ধারে এসে গেছে। হাত উঁচু করেছে সেখান থেকে।

মাঝি হাঁক দিচ্ছে: চলে এস, চলে এস—

জগা তেড়ে ওঠে: কোথায় ছিলে এতক্ষণ শুনি?

হর হাঁপাচ্ছে। কাঁধের শীতলপাটি দেখিয়ে বলে, সওদা করলাম রে ভাই। আগে

মনে ছিল না, দোকানের সামনে এসে মনে পড়ে গেল।

জগা বলে, ওরে আমার লাটসাহেব! বড্ড পয়সা হয়েছে। ছেলের অন্নপ্রাশন দিয়ে উঠলে সেদিন, তার উপরে আবার শীতলপাটি।

ওদের মধ্যে চকিতে বিশেষণের দুটো-একটা প্রয়োগ করতে যাচ্ছিল। বলাই ত্বরিতে জগার মুখে হাতে চাপা দেয়; খবরদার, চাষামি করবি না এখন। মুখ দিয়ে ভাল কথাবার্তা বল।

নৌকোয় গলুইয়ের ভিতরের দিকে ইঙ্গিত করে চাপা গলায় বলে, ভাল লোকেরা আছেন, চুপ চুপ!

কাদা ভেঙে বাকি ক'জনে এবার উঠে পড়ল। বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছে। নৌকো বেশী জলের দিকে গেলে, কাদা ধুয়ে তবে পা তুলে নেবে। জন কুড়িক চড়ন্দার আগেভাগে চড়ে বসে আছে। একটা ছইয়ের নিচে অতগুলো মানুষ—শোরগোলে গাঙে তো তুফান উঠবার কথা। কিন্তু কী তাজ্জব, ধ্যানে বসে আছে সকলে যেন। অথবা মানুষগুলোকে কেউ বুঝি খুন করে নৌকোর উপর ফেলে রেখেছে। জ্যান্ত মানুষ—বিশেষ করে জোয়ানমর্দ্দরা যেগুলো, এমনধারা চুপচাপ আছে কেমন করে? তামাক খাচ্ছে, তা-ও অতি সাবধানে। হুঁকো টানার ফড়ফড় আওয়াজ যেন অতিশয় লজ্জার ব্যাপার।

ভাল করে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাপারটা মালুম হল জগার। কাড়ালে দুটো মেয়েমানুষ। দুটো মাত্র মুষলের ভয়ে বাঘের দোসর এতগুলো মরদ ঠাণ্ডা। দুই বা বলি কেন—একজনে ঘোমটা টেনে জলের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। বিনোদিনী—বিনি-বউ—গগন দাসের পরিবার। বিনি-বউ কিছু নয়—মুষল হল অপরটি, চারু। আগেও ভাল ছিল। এখন আরও সুন্দর গোলগাল ও পরিপুষ্ট হয়েছে। কমবয়সী মেয়ের লজ্জা করা তো উচিত, সে ই তো দেখি নাটার মতন বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে একনৌকো মানুষ জব্দ রেখেছে। টাপুরে-নৌকোয় মেয়েমানুষ চড়ন্দারও যায়। কেনাবেচা করতে যায় ফুলতলা, আবার অঞ্চলের বউ-ঝিরা বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করে। দরগা ও ঠাকুনতলায় পুণ্যি করতে চলেছে, এমনও আছে। এরা সে দলের নয়—চেহারা, এলাকপোশাক ও চালচলনে সবাই বুঝেছে। এই আবাদ এলাকারই নয়। উত্তরের অঞ্চল থেকে আসছে। এসে থাকে পুরুষেরা—যার নেই মূলধন সেই আসে বাদাবন। শূন্য হাতে এসে আস্তে আস্তে জমিয়ে নেয়। কাঙালি চৌধুরি যেমন একদিন বনকরের বাবুদের চক্কোত্তি-রাঁধুনী হয়ে এসেছিল। আশায় আশায় এসেছে যেমন ঐ গগন, এবং গোপাল ভরদ্বাজও বটে। পুরুষেরা আসে, কিন্তু বাইরের ভদ্র অঞ্চলের মেয়েলোক এই প্রথম বোধহয়। তাই দেখে তাদের সামনে বাদার জোয়ানপুরুষরা ভদ্র হবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

বিরক্তি ভরে জগা ছইয়ের বাইরে বসে পড়ল। আকাশ মেঘে ভরা, ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি নামছে। বৃষ্টির জল ঝরঝর করে মাটি ভিজিয়ে দিয়ে গাঙের জলের উপর দিয়ে বনের মাথার উপর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। একবার এই হয়ে গেল, বাঁকটা না ঘুরতেই আবার সেই কাণ্ড। তা হোক, বৃষ্টিতে বারম্বার চান করবে তবু ছইয়ের ভিতরের ঐ ভেড়ার পালের মধ্যে নয়।

চলেছে, টাপুরে-নৌকো চলেছে। ছপ-ছপ দাঁড় পড়ে একটানা, মচমচ আওয়াজ ওঠে দাঁড়ের বাঁশ-দাড়িতে। অতল নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ যা এক ধরনের আওয়াজ। জগা আর পারে না, ক্ষেপে গিয়ে বলে ওঠে, বাক্যি সব হরে গেল—তোমাদের

হল কি আজকে মাঝি? ভূত দেখেছ না বেলেসিঁদুর খাইয়ে দিয়েছে কেউ? (বেলে-সিঁদুর কোন্ বস্তু সঠিক জানি নে, খেলে নাকি মানুষের বাক্‌শক্তি উবে যাবে একেবারে।)

মাঝি বলে, বকবক করে হবে কি! সজনেডাঙার খাল নিয়ে ভাবনা, শেষ ভাঁটায় একেবারে জল থাকছে না। কোমর ভর কাদা।

দাঁড়িদের স্ফূর্তি দিচ্ছে: সাবাস ভাই! জোর জোর এমনি মেরে দিয়ে ওঠ। কুমিরমারিতে জোয়ার ধরে দাও। নয়তো সারা রাতের ভোগান্তি।

আবার চুপচাপ। জগা তখন হর মড়ুইকে নিয়ে পড়েছে: তোমার জন্যে দেরি। মাছের পয়সার বড্ড গরম—উঁ, শীতলপাটি বিনে ঘুম হয় না?

হর গলা বাড়িয়ে জবাব দেয়, পাটি আমার নয় বড়দার।

জগা বলে, বটে! বড়দা আমাদের কিছু বলে না, চুপি চুপি তোমার কাছে ফরমাশ করল। আমরা পর হয়ে যাচ্ছি।

হুড়োহুড়ির মানুষ তোমরা। ঠাণ্ডা মাথায় দেখেশুনে বাছগোছ করে কেনা পোশায় তোমাদের? ধর, এই একখানা পাটি পছন্দ করতে বিশ-ত্রিশখানা পেড়ে ফেললাম। শলা সরু-মোটা হালকা-ভারী আছে, বুনুনি ঘনপাতলা আছে—অনেক কিছু দেখে নিতে হয়। সওদা অমনি করলেই হল না।

বলাই বলে, ওসব কিছু নয়। বড়দার লজ্জা করেছে আমাদের বলতে। আজকাল ঘড়ি-ঘড়ি খালে নেমে ডুব দেয়, গরম কী রকম বুঝতে পার না? জল নোনা হোক যাই হোক, পানকৌড়ির মত ডুবুতেই হবে।

জগা বলে, আর সেই মানুষ, এদিকে দেখলি তো, বাড়ির চিঠি না খুলে উনুনের আগুনে দেয়। খুলে পড়লে মন পাছে নরম হয়ে গিয়ে কিছু পাঠাতে ইচ্ছে করে। বড়দা বলে মান্য করি—কিন্তু এক এক সময় চামার বলতে ইচ্ছে করে।

হর মড়ুই তাড়াতাড়ি চাপা দেয়: থাক থাক। ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা যাচ্ছে, অকথা-কুকথা মুখের আগায় আনবে না।

ভাল রে ভাল! মুখ খুললেই ত্রস্ত হয়ে ওঠে অন্য সকলে। কোন বেখাপ্পা কথা কখন বেরিয়ে পড়ে। দীর্ঘক্ষণের এত রাস্তা তবে কি বোবা হয়ে কাটাতে হবে? জগা তা পেরে উঠবে না, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা যা-ই বলুক।

তখন দাঁড়িদের বলে, হাতে-মুখে চালাও ভাই সব। দাঁড় মার, আর গীত ধর সেই সঙ্গে—

চাপা গলায় হর ধমক দিয়ে ওঠে: থাম। ওঁরা সব যাচ্ছেন, গীত আবার কী জন্য এর মধ্যে!

বাঃ রে, ওঁরা যাচ্ছেন বলে মুখে তালাচাবি এঁটে থাকতে হবে? আমার দ্বারা পোষাবে না। তোমাদের শরম লাগে তো আমিই ধরি একখানা।

দাঁড়িদের উদ্দেশ করে আবার বলে, গান গাইবে না তো দোয়ারকি কর আমার সঙ্গে। ফাঁকা গাঙের উপর একলা গলায় জোর পাব না।

ঘাড় কাত করে গালে বাঁ-হাত চেপে ধরে আঁ-আঁ-আঁ করে জগা তান ধরল।

বলাই কনুই দিয়ে গুঁতো দেয়: আঃ, কী হচ্ছে!

ফিক করে হেসে ফেলে জগা বলে, শুনতে পাচ্ছিস নে? গান—

গান নয়, কানের ফুটোয় মুগুরের মারা। কী ভাবছে বল দিকিনি ভাল ঘরের মেয়ে-ছেলেরা! ষাঁড়ের মতন না চেঁচিয়ে গানই ধর তবে সত্যি সত্যি!

জগা বলে, গানের তুই কি জানিস রে? গান হলেই বুঝি নাকী-কান্না! নানান সুরের গান আছে। আজকে এই চেঁচানো গানে আমার মন নিচ্ছে।

আরম্ভ করে দিল মার-মার কাট কাট রবে, কানে তালা ধরিয়ে দেবার মতলব। কিছু কিছু দখল আছে বিদ্যাটায়—সুরটা এক সময় মোলায়েম হয়ে উঠেছে, তাল-মাত্রাও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে গানের ভিতরে। প্রতিহিংসার ভাব তেমন আর উগ্র নয়। আবেশে এমন কি চোখও বুজে গিয়েছে, হাতের চেটোয় থাবা দিচ্ছে নৌকোর উপরে। ছইয়ের বেড়ার গায়ে ঢোলক, বলাই পা ঘষে ঘষে গিয়ে পেড়ে আনবার তালে আছে সেটা।

খসখসানি আওয়াজ পেয়ে জগা চোখ মেলল। চারুবালা ছইয়ের বাইরে চলে এসেছে। এসেছে সামনের উপর। স্বহস্তে শাসন করতে এল নাকি? অন্যের কথায় হল না তো ঐ পরিপুষ্ট হাতে জোর করে তার মুখ চেপে ধরে গান থামিয়ে দেবে?

গান আপনা-আপনি থেমে গেছে ততক্ষণে। জগন্নাথ বিশ্বাসের সঙ্গে লাগতে এসেছে—যত বলবানই হোক—বেটাছেলে নয়, মেয়ে একটা। পরক্ষণে অচ্ছেদ্য ভাবটা ঝেড়ে ফেলে শুরু করবে আবার প্রবল কণ্ঠে—আগেভাগে মেয়েটাই বলে ওঠে, খাসা হচ্ছিল—থামলেন কেন?

আরো আশ্চর্য, আপনি-আপনি করে কথা! জগা যেন মান্য-গণ্য মানুষ, খাতির দেখিয়ে তেমনি ভাবে বলছে। এ তল্লাটে এমন সম্বোধন চলে না। ভদ্র অঞ্চল থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। উৎকট লাগে জগার। নীরস কণ্ঠে সে বলে, গানের এমনি জায়গায় আমি থেমে যাই।

সে কি গো! মাঝখানে থেমে পড়লে ভাল লাগবে কেন?

আমার এই নিয়ম।

নগেনশশী নিয়ে চলেছে এদের। অথবা চারুই অপর দুটিকে টেনেহিঁচড়ে বাদাবনে নিয়ে যাচ্ছে। অভিভাবকের সুরে নগেন ডাকে: চলে এস চারুবালা, ওদিকে কী? ওদের সঙ্গে কি বচসা লাগিয়েছ।

চারু কানেও নিল না। অভিমানে কণ্ঠ একটু বুঝি থমথমে হয়ে যায়: আমি না এলে আপনি ঠিক সারা করতেন। বেশ যাচ্ছি আমি ভিতরে।

আমার গান সারা হয়ে গেছে।

চারু তর্ক করে, কক্ষনো হয় নি। যা-তা বোঝালেই হবে?

নগেনশশীতে হল না তো বিনোদিনী ওদিক থেকে রাগ করে ওঠে: কী হচ্ছে ঠাকুরঝি?

চারু বলে, এক-একটা গোঁয়ার স্বভাবের মানুষ থাকে বউদি, লোকে যা বলে ঠিক তার উল্টোটি করবে।

নৌকোসুদ্ধ মানুষ থ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে। কোথাকার মেয়ে এসে উঠেছে, একটুখানি সঙ্কোচ নেই। জগা হেন পুরুষকেও মুখের উপর ট্যাক-ট্যাক করে শুনিয়ে দেয়। বলে, বেশ, তবে আমি বলছি গান আর গাইবেন না আপনি। ঐখানে শেষ।

গাবই না তো!

এটা কি হল? একমত হয়ে গেলাম যে তবে। আমি এক কথা বলব, আর ঘাড় হেঁট করে সেইটে আপনি মেনে নেবেন?

জগন্নাথ বলে, আমার উল্টোপাল্টা রীত। লোকের কথা কখনো শুনি, কখনো শুনি নে। এবারটা শুনব।

বিনি-বউ আবার ডাকে, ঠাকুরঝি ভাই, চলে আয়—

যাচ্ছি বউদি। গানটা পুরো শুনে তবে যাব।

কিন্তু গান আর হল না কিছুতে। চারুও নাছোড়বান্দা, গান না শুনে নড়বে না। আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে গেল সামনে। বসেই রইল। থাক বসে, বয়ে গেল। সারা বেলাভ বসে থাক না—কী হয়েছে।

চারু রাগল অবশেষে: বড্ড যাচ্ছেতাই মানুষ আপনি। না গাইলেন তো বয়ে গেল। মেঠো গান বই তো নয়! এর চেয়ে ভাল ভাল গান কত আমরা শুনেছি।

মুখ ফিরিয়ে চলল। ছইয়ের নিচে গেল না আর, উঠল গিয়ে ছইয়ের উপরে। উঠবার ধরনই বা কি, খুঁটিতে পা ঠেকিয়ে তড়াক করে উপরে উঠে পড়ল। কী গেছো মেয়ে রে বাবা! সার্কাস দেখিয়ে বেড়ায় নাকি? ছইয়ের উপরে উঠেই কিন্তু একেবারে চুপ—মন্ত্র পড়ে কে পাষাণ করে দিয়েছে। মুগ্ধ-চোখে চেয়ে আছে দিগন্তের দিকে। মাঠের দূরপ্রান্ত অবধি সবুজ রঙে ঢাকা, এতটুকু ফাঁক নেই কোনখানে। উদ্ভাসিত কণ্ঠে সহসা চারু কথা বলে ওঠে: জঙ্গল ঐ নাকি মাঝি? বাদাবন?

জগন্নাথ উপযাচক হয়ে সামাল করে: নৌকো টলছে—জলে পড়ে গেলে চিত্তির। জঙ্গলের ফুর্তি বেরিয়ে যাবে তখন।

নিরুদ্বেগ কণ্ঠে চারু বলে কিছু হবে না। ভাল সাঁতার জানি আমি।

সাঁতারের ফুরসত দেবে না। কুমিরে ধরবে কিংবা কামোটে কাটবে। কেটে নেবে যখন, বেশ সুড়সুড়ি লাগবে। তারপরে দেখা যাবে, পুরো একটা পা-ই পাওয়া যাচ্ছে না।

মাঝি বলল, ছইয়ের উপর অমন দাঁড়ায় না বুনডি। বসে বসে দেখ।

অনেক পথ গুন টেনে সজনেডাঙার খালের কাদায় নৌকো ঠেলে ঠেলে অনেক কষ্টে কুমিরমারি পৌঁছানো গেল। বড় গাঙের মধ্যে উজান যাওয়া চলবে না, বাতাসও মুখড়। নৌকো চাপান দেওয়া ছাড়া গতি নেই। আরও খান দুই বাঁক গিয়ে দোখালার ভিতর কোন গতিকে যদি ঢুকে পড়া যেত, খালে খালে যা-হোক করে এগুনো চলত। হল না হরর দোষে। তার ওই শীতলপাটি পছন্দ করতে গিয়ে।

জগা বলে, বয়ারখোলার কাজ কী, কুমিরমারি নেমে আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব। তোমাকেও হর হাঁটতে হবে আমাদের সঙ্গে।

ব্যাপার বাণিজ্যে দু-চার পয়সার মুখ দেখতে আরম্ভ করে হর ঘড়ুই খানিকটা কাবু হয়ে পড়েছে। বলে, জান না তাই। পথ এখনো হয়েছে নাকি? বনজঙ্গল জল জাঙাল—

তোমার জন্য এতগুলো লোকের ভোগান্তি। ছাড়ছি নে তোমায়। হাঁটতে না পার, পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে তুলব।

হর চুপ করে যায়। কথায় কথা বাড়ে। ভদ্র অঞ্চলের মানুষ নৌকোয় যাচ্ছে, তাদের সামনে আরও না জানি কী বলে বসে। বাঁক ঘুরতেই ছোট ছোট টিনের চালা। কুমিরমারির হাটখোলা। হাটখোলার ঘাটের একদিকে টাপুরে-নৌকো কাছি করল। থাকতে হবে বেশ খানিকক্ষণ। জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে ভাটার টান যতক্ষণ না ধরছে। এক প্রহর রাত তো বটেই।

নেমে পড়ছে সব চড়ন্দার। ধরা-গোনে জল বড্ড নেমে গিয়েছে। নিকানো

উঠানের মত নদী-চর তকতক করছে। ছোট ছোট মাছ কাদার উপর ছাপে কেটে সর-সর শব্দে ছুটোছুটি করছে এদিক-সেদিক। পা চাপালে কাদার মধ্যে বসে যায়। নোনা কাদা সাংঘাতিক বস্তু। জোয়ার বলে নৌকো তবু তো অনেক দূর অবধি উঠে এসেছে।

নামতে হবে গো এবারে। নেমে খেয়ে-দেয়ে খানিকটা বেড়াওগে এখন। টানের মুখ ঘুরলে সেই সময় উঠে পড়ো আবার।

চারু নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। যারা নেমেছে, তাকিয়ে তাদের দুর্গতি দেখছে। মুখেই যত ফড়ফড়ানি—কাদায় পা দিতে হবে, সেই শঙ্কায় আঁতকে উঠেছে। সাপের মুখে পা দিতেও মানুষে এমন করে না। তা নামতে না চাও তো থাক নৌকোর খোপে আটক হয়ে, অন্য সকলে নেমে যাক, থাক পড়ে একা। কার দায় পড়েছে, কে পিঠ দিচ্ছে দুর্গাঠাকরুনের সিংহের মতন—সেই পিঠের উপর পা রেখে কাদা পার হয়ে উনি ডাঙায় নামবেন। আর যে পারে পারুক, জগা বিশ্বাস নয় কখনো। তার দিকে তাকায় কেন বারংবার, ভেবেছে কি? বাঁধন-আঁটা নিটোল দেহটার শোভা দেখছে? দেখ তাই, অন্য কিছু প্রত্যাশা করো না। মাথায় কাপড় দেওয়া অপর মেয়েলোকটি দিব্যি তো নেমে এল। আর নবাবনন্দিনী, দেখ, নাকী-নাকী বুলি ছাড়ছে: সবাই চললে যে বউদি, একা-একা আমি পড়ে রইলাম।— ! যেন পায়ে দড়ি দিয়ে কেউ বেঁধে রেখেছে ছইয়ের বাঁশের সঙ্গে। কাদায় নামবে না তো লাফিয়ে পড় এই জগন্নাথ ও আরো দশটা মরদের মতন। কাদা তো বড় জোর হাত আস্টেক জায়গায়—আট হাত লাফাতে পারবে না, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তবে কিসের অত শাসন?

এক দল পশ্চিমা কুলী রাস্তার মাটি ফেলছে। বেলা পড়ে এল, কাজ করছে তবু এখনো। আর কত কাল লাগাবি রে বাপু! মাটি ফেলাটা হয়ে গেলেই পারে-হাঁটার অন্তত সোজা পথ পাওয়া যায়, গাঙেখালে ঘুরপাক খেয়ে মরতে হবে না। খালের উপর পুল হবে। পুলের জন্য ইটকাঠ লোহালক্কড় এসে পড়েছে। খাল-ধারে পাহাড় প্রমাণ তক্তা গাদা দিয়ে রেখেছে। আরে আরে কী করেছে দেখ ছোঁড়া কজন— চার-পাঁচটা তক্তা কাঁধে বয়ে এনে কাদার উপর ফেলল। তক্তার উপর পদারবিন্দ রেখে ঠাকরুনের ডাঙায় ওঠা হবে। আবদার তো বেড়েই চলবে এমনিধারা তোয়াজ হলে।

এত বন্দোবস্ত সত্ত্বেও চারুবালা যেন গলে গলে পড়ছে। চারু নয়, নাম হওয়া উচিত ছিল নবনীবালা। নৌকোর কাড়ালে দাঁড়িয়ে বলছে, হাত ধর না গো কেউ তোমরা। নামি কেমন করে তক্তার উপরে?

তা-ও চার-পাঁচ মরদ এগিয়ে এসেছে তার হাত ধরে নামাবার তরে। রকম দেখে জগা দাঁড়িয়ে হাসে। হঠাৎ সে-ও ছুটল—তার সঙ্গে পারবে কে। ছুটে সকলের আগে চলে গেল। কাড়ালের এপাশে ওপাশে হাতগুলো উঁচু হয়েছে চারুকে নামিয়ে আনার জন্য। সকলের উঁচুতে উঠে আছে জগার ইস্পাতের মত কঠিন কালো হাতখানা।

লম্ফ দিয়ে কাদা পার হওয়ার সময় জগার বিক্রম সকলে জেনে বুঝে নিয়েছে। আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়াল সেই মানুষ। হাতে হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে জগা মেয়েটার হাত অমনি মুঠোয় পুরে হেঁচকা টানে এনে ফেলল তক্তার উপরে নয়— তক্তার পাশে কাদার ভিতর। আর কেউ হলে সে টানে কাদার উপর গড়িয়ে পড়ত, শক্ত মেয়ে তাই সামলে নিল কোন গতিকে।

ছাঁচো কাঁহাকা—বজ্জাতের বেহদ্দ! রাগে গরগর করতে করতে চারুবালা একতাল কাদা তুলেছে জগাকে ছুঁড়ে মারবে বলে। কোথায় জগা? চক্ষের পলকে অত দূরে ঐ নতুন রাস্তার আড়াল হয়ে গেল। কিংবা ধোঁয়া হয়ে আকাশেই উড়ে গেছে হয়তো।

এক-ছুটে চারুও রাস্তার উপর গেল। নতুন মাটি ফেলে অনেক উঁচু করেছে—চতুর্দিক সেখান হতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। গেল কোন্ দিকে? যে চুলোয় গিয়ে থাকে, থাকুক না আপাতত পালিয়ে। নৌকো ছাড়বার সময় হলে আসতে হবে বাছাধনের। শোধবোধ সেই সময়।

হর ঘড়ুই ঘাড় নেড়ে বলে, ক্ষেপেছ? পায়ে পায়ে কত পথ মেরে দিল তারা এতক্ষণে! একা নয়, সঙ্গের সাথী বলাইটা আছে। আমাকেও টেনেছিল। আমি কারো গোলাম নই বাপু, স্বাধীন ব্যবসা আমার। দেরি হল কিংবা তাড়াতাড়ি পেঁছিলাম, আমার কি যায় আসে? আমি কেন কষ্ট করতে যাই?

সকলে অবাক হয়ে যায়: বল কি গো? রাস্তার একটুখানি নিশানা হয়েছে কি না হয়েছে—জলে নেমে খালই পার হতে হবে তিন-চারটে—

হর বলে, এক পহর ঠায় বসে থেকে তারপর নৌকোয় শতেক অঞ্চল ঘুরে যাওয়া—এর চেয়ে জল ঝাঁপানো কাদা মাখা ওদের কাছে অনেক ভাল। যতক্ষণে নৌকো বয়ারখোলা যাবে, ওরা খেয়েদেয়ে পুরো একঘুম ঘুমিয়ে উঠবে তার ভিতরে।

ধোপদুরস্ত কামিজ-পরা নগেনশশীর সঙ্গে হর ঘড়ুই এবার পরিচয় করছে: বাবুমশায়ের যাওয়া হচ্ছে কোথা? ভেবেছিলাম, কুমিরমারি। নতুন চৌকি বসে গেল, কুতঘাটা হল, বাবুলোকের আনাগোনা বেড়ে গেছে—মা-লক্ষ্মীরা এসে পড়ে গেরস্থালি পাতাচ্ছেন এবারে। আরও চললেন এঁদের সব নিয়ে? কোথায় শুনি?

পঁচিশ

চৌধুরিগঞ্জ অবধি রাস্তার নিশানা। জগা সেই রাস্তা ধরে চলেছে। চলা আর কি, একরকম দৌড়ানো। রাস্তায় বেরুলেই জগার এই কাণ্ড, ধীরেসুস্থে পা ফেলা কোষ্ঠিতে লেখে না। পিছনে বলাই, সে হাঁপাচ্ছে: আস্তে রে জগা, আস্তে।

আবার ওরই মধ্যে রসিকতা করে নেয় একটু: এত ছুটছিস কেন রে? দজ্জাল মেয়েটার ভয়ে? উঁহু, সে পিছনে নেই। আস্তে চল।

উঁচু জায়গা হল তো বনজঙ্গল, নাবাল হল তো জল। বনের গাছপালা কেটে নাবাল জমির উপর মাটি ফেলে হাত চারেক চওড়া রাস্তা টেনে নিয়ে গেছে। সেই আরো বিপদ। কাঁটাগাছের গোড়াগুলো শূলের মতন পায়ে খোঁচা দেয়! নতুন-তোলা মাটিতে ঠোক্কর লাগে পায়ে। জগার লাগে না, বোধকরি শহুরে ঘোড়ার মতন পায়ের তলায় সে লোহার নাল বাঁধিয়ে নিয়েছে। নয় তো ছোটে কেমন করে ঐ রাস্তায়? বলাই পেরে ওঠে না—রাস্তা ছেড়ে সে পাশের অপথে চলে যায়, জলে নেমে পড়ে। গোটা দুই-তিন খাল বাঁধা হচ্ছে, কাজ শেষ হয় নি এখনো। তা জগার কাণ্ড দেখ, তিলেক দ্বিধা না করে খালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তরতর করে সাঁতরে পার হয়ে গেল। রাস্তাটা করেছে কিন্তু নাকের সোজা। বারো-বেঁকির পঁ্যাচে পঁ্যাচে যত ঘুরতে হত, সংক্ষেপ হয়ে গিয়ে বোধকরি তার সিকিতে দাঁড়িয়েছে। আর সত্যি সত্যি যখন পাকা-রাস্তা হয়ে মোটরগাড়ি চলবে, তখন কুমিরমারি একেবারে ঘরের দুয়ারে। পলক ফেলতে না ফেলতে পেঁছে দেবে।

সাঁইতলা পেঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। বিস্তর ক্ষণ আগে এসেছে তবু। নৌকো

হলে দিনের আলোর মধ্যে আসা ঘটত না। জগা বলে, আলায় চল রে বলাই আগে। পনের-বিশ হাত বাঁধ ভেঙেছে, তার মধ্যে আজব ব্যাপারটা কি হল? লোহার নয়, মাটির বাঁধ—ভাঙবেই তো জলের তোড়ে। এত বেশী উতলা কেন বড়দা? ধানকর নয় যে নোনা জল ঢুকে সবুজ ধানচারা রাঙা হয়ে মরে যাবে। চারামাছ অধিশ্যি কিছু বেরোতে পারে, তেমনি গুঁড়ো ডিমও ঢুকবে জলের সঙ্গে। ভাঙনের মুখে গোটাকয়েক খোঁটা পুঁতে খোঁটার গায়ে খড় জড়িয়ে দিয়ে জলের টান রুখে দাও। মাছ ঠেকাও। ধীরেসুস্থে মাটি এনে ঢাল তারপরে। ধানচাষীর মতন বুক চাপড়ে হাহাকার কেন করতে যাবে?

আলায় এখন একলা রাধেশ্যাম। গগন বাঁধে গেছে লোকজন যোগাড় করে নিয়ে। ভাঙা জায়গায় মাটি ফেলছে, আর খুঁজে খুঁজে দেখছে যোগ হয়েছে কিনা অন্য কোথাও। অর্থাৎ কোনখানে ছিদ্র হয়ে গাঙের জল চুঁইয়ে ভিতরে আসে কিনা। মাটি ধুয়ে ধুয়ে ঐ সরু ছিদ্র এক সময়ে বড় হয়ে নদীস্রোতের পথ করে দেয়। গোড়া থেকে সতর্ক হলে আখেরে হাঙ্গামা ও খরচান্ত হয় না। বাঁধের আগাগোড়া গগন তাই চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাধেশ্যাম বাবু-মানুষ—পেটের দায়ে জালে যায় বটে কিন্তু জল-কাদা মাখতে সে নারাজ। তায় আবার খানায় পড়ে পা মচকেছে। শুয়ে বসে সে আলা পাহারা দিচ্ছে।

বলে, কালীতলার ঐ দিকটা চলে যাও তোমরা। দূরে বেশী নয়। সকলকে পেয়ে যাবে।

বলাই বলে, গিয়ে কি হবে! হাক্লান্ত হয়ে এসে আবার এখন কোদাল ধরতে পারব না। পেট চোঁ-চোঁ করছে—ঘরে চল জগা, ভাত চাপিয়ে দিই গে। খেয়েদেয়ে আত্মা-রাম ঠাণ্ডা করে খোঁজখবর নিতে আসব।

ভাত নামিয়ে লঙ্কা-তেঁতুল এবং গুড়-তেঁতুল দিয়ে খেয়ে নিল। এই তো তোফা দু-খানা তরকারি। চেষ্টা করলে মাছও মিলত, কিন্তু অত সবুর সয় না। পরিতোষের খাওয়া সেরে গড়িয়ে পড়ল মাদুর পেতে। খোঁজখবর নেবার কথা আর তখন মনে নেই। ঘুম তো নয়, যেন মেরে রেখে গেছে দৈত্যসম ছোঁড়া দুটোকে। ছুটোছুটি করে কত কাতর হয়ে পড়েছে, ঘুমের এই ধরন দেখে বোঝা যায়।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে চোখ রগড়ে জগা উঠে বসল, তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে।

ওঠ রে বলাই। কি হল? জাগবি নে মোটে তুই?

বলাইর পা ধরে ঝাঁকি দেয়। উ—বলে একবার চোখ মেলে দরাজ মাদুর পেয়ে পা ছড়িয়ে সে পাশ ফিরল।

এক ছিলিম তামাক খাওয়ার দরকার এখন মউজ করে। ঘুমের আগে যেটুকু হয়েছে, তাতে তেমন জুত হয় নি। তামাক আছে, কিন্তু গুড় শুকিয়ে গিয়ে বিস্বাদ। তামাক টানছি না শুকনো লাউপাতা—সেঁকই লাগে না গলায়। ক'টা দিন ঘরে ছিল না, সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে গেছে এর মধ্যে।

বলাই ঘুমোক, জগা আলায় চলল। গগন ফিরেছে ঠিক এতক্ষণে। বাঁধ ভাঙার বৃত্তান্ত শুনবে জমিয়ে বসে। তামাক যত কলকে ইচ্ছে খাবে।

গগন দাসের আলা মেছোঘেরির আর দশটা আলার মতন নয়। ছ-চালা ঘর। সাঁইতলা তল্লাটের মধ্যে ঘরের মতন ঘর বানিয়েছে বটে একখানা। বাহারটা আস্তে আস্তে জমেছে। তিন দিকে এখন মাটির দেয়াল। এক পাশের দাওয়া গরানের ছিটেয় জব্দ করে ঘিরে নিয়ে চৌকাঠ-দরজা বসিয়েছে। গগনের শোবার ঘর—যাবতীয়

খাতাপত্র এবং হাতবাক্স সেখানে। এই ঘরে তালা দিয়ে রাখে গগন যখন বাইরে কোথাও যায়।

আলা একেবারে চুপচাপ। এ সময়টা এমন হওয়ার কথা নয়। কাদামাটি-মাখা জন তিন-চার ডোবার জলে হাত-পা ধুচ্ছে। জগা জিজ্ঞাসা করে, মাটি কাটছিলে বুঝি তোমরা? কাজকর্মের কত দূর?

আজ শেষ হয়ে গেল।

বড়দা নেই এখন আলায়?

আছে—হুঁ। হিসেবপত্র হল এতক্ষণ। আমাদের রোজ গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে খোরিদার ঘরে ঢুকে পড়েছে।

কামরায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে জগা হেসে ওঠে: একা একা ধ্যানে বসেছ নাকি বড়দা? আলা ভোঁ ভোঁ করছে, মানুষজন গেল কোথা?

সত্যি, হাসির ব্যাপার নয়। এত দিন সঙ্গে সঙ্গে আছে, এমন ধারা দেখা যায় নি আর কখনো। কামরার মাঝখানটায় টেমি জ্বলছে, সস্তা লাল কেরোসিনের ধোঁয়া উঠছে গলগল করে। আলোর সামনে দু-হাতে মাথা চেপে গগন ঝিম হয়ে বসে। খাওয়ার সময়টাও আলো জ্বালে না, মাছের কাঁটা অন্ধকারে আন্দাজে বেছে ফেলে। সেই মানুষ অহেতুক কেরোসিন পোড়াচ্ছে। ভয় হল জগন্নাথের।

হল কি তোমার? কি ভাবছ?

গগন ক্ষীণকণ্ঠে বলে, এস জগা। মনটা বড় মিইয়ে আছে। জলের নিচে যথা-সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছি। দু-চার পয়সা এদ্দিনে যা রোজগার-পত্তোর হল, বাঁধের মাটি খেয়ে নিল সমস্ত। উল্টে পাঁচ-ছ টাকার মতন দেনা। তার উপরে পিওন এসেছিল আজ আবার। ভুল আমারই। বড় বড় পারশে মাছ খাইয়েছিলাম সেদিন, সেই লোভে পিওন নিত্যি আসতে লেগেছে। এসে মাথায় মুশল মেরে গেল।

চিঠি?

এতখানি পথ আসছে, খালি হাতে আসে কি করে? সেদিন এই ধর, তিনটে খামের চিঠি নিয়ে এল। উনুনে দিয়ে অবসর হলাম। আবার আজ। আগের চিঠি বয়ারখোলায় তৈলঙ্কের বাড়ি থেকে ঠিকানা কেটে এখানে পাঠায়। এবারে সরাসরি চলে এসেছে। তার মানে, এই আস্তানাও জেনে গেছে। কেমন করে জানল, রোজ রোজ এত সমস্ত কী লেখে—দেখিই না খুলে। বুঝলে জগা, ঐ ইচ্ছেটাই হল কাল। চিঠি পড়ে সেই থেকে মাথা ঘুরছে আমার।

জগার ভাল লাগে না। মনোমত এক ছিলিম তামাক খেতে এসে একঘেয়ে কাঁদুনি শুনবে এখন বসে বসে? সংসার জোটানোর সময়টা মনে ছিল না যে ফ্যাচাং আছে পিছনে?

বলে, কষে ফুর্তি চালাও বড়দা। মাথা ঘোরার জবর ওষুধ। মানুষজন দেখতে পাচ্ছি নে—ক'টা দিন ছিলাম না, তার মধ্যে মরেহেজে গেল নাকি সমস্ত?

তোমরা ছিলে না, মাছের খাতা বন্ধ হবার দাখিল। মানুষ এখন কোন্ কাজে আসতে যাবে?

বলতে বলতে গগন কাঁদো-কাঁদো হয়ে পড়ে। বাদাবনের বেঘোরে এনে সত্যি মেরে ফেলবে? এই তোমার ধর্ম হল?

জগা বলে, আমি ছাড়া আর তোমার লোক নেই?

বলাইটাকেও যদি রেখে যেতে—

জগা-বলাই একই কথা ! এ তোমার অন্যায় বড়দা। কথা তোমার চিরকাল আগলে বসে থাকবে না।

কিন্তু মেছো নৌকো কে নিয়ে যায় শুনি ? দু-দুবার এর মধ্যে লোক বদলেছি। বারোবেঁকি ঘুরে মাছ নিয়ে পেঁছিতে বেলা দুপুর করে ফেলে। খদ্দের নেই তখন, একেবারে মাটির দর। ব্যাপারীরা তাই মাল কেনবার গা করে না, মাছ-মারারাও তেমন জাল নিয়ে বেরুচ্ছে না।

জগা বলে, বারোবেঁকি আর ক'দিন ! রাস্তায় মাটি পড়ে গেছে, সেই ডাঙার পথে আমরা এলাম। মাছ এর পরে এক দণ্ডে নিয়ে ফেলবে। ভাবনা করো না, বেরিয়ে এস দিকি। গানবাজনা হোক একটু। নয় তো ছক-ঘুঁটি নিয়ে বসো। কী ঘরের মধ্যে বসে প্যানপ্যানানি !

বাইরে এসে উচ্চকণ্ঠে বলাইয়ের নাম ধরে ডাকে। পচাকে ডাকে। রাধেশ্যামকে। খোল দেয়ালে টাঙানো, চাঁটি মেরে পাড়াময় জানান দিয়ে দিল।

গগনকে বলে, জুত করে এবারে এক ছিলিম চড়াও বড়দা। তামাক না খেয়ে পেট ফুলে উঠেছে। ঘুম ভেঙেই তোমার কাছে ছুটেছি।

তামাক টানতে টানতে এসে গগন জগার হাতে হুঁকো দিল। হুঁকো দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বলে ওঠে, দশটা টাকা কর্জ দিতে পারিস জগা ?

জগা বলে, বড়মানুষ তুমি বড়দা। শীতলপাটি বিনে ঘুম হয় না। হর ঘড়ুই কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে তোমার জন্য শীতলপাটি বয়ে আনে। তোমার আবার টাকার কি টান পড়ল ?

শীতলপাটির কথায় গগনের লজ্জা হয়। কৈফিয়ত দিচ্ছে ফলাও করেঃ সে এক কাণ্ড ! দুপুরবেলা ঘুম হচ্ছে না, গরমে এপাশ ওপাশ করছি। হর ঘড়ুই সেই সময়টা এল। বলে, সামনে বোশেখ মাস, গরমের হয়েছে কি এখন ? ফুলতলায় তোফা শীতলপাটি পাওয়া যাচ্ছে। চোদ্দ সিকের পয়সা তখন গাঁটে, পাশ ফিরতে গায়ে ফোটে। সেই জন্যে আরও ঘুম হয় না। সেই পয়সা ঝড়াকসে বের করে দিলাম ঘড়ুইয়ের হাতে। আখের ভাবলাম না। আবার তা-ও বলি, তখন তো জানি নে, বাঁধ ভেঙে এককাঁড়ি পয়সা গুণোগার যাবে। আর পিঠ পিঠ পিওন শালা এসে পড়বে। মাছ খেতে এসেছে ! মাছ না দিয়ে নুড়ো জেবলে দেব এবারে বেটার মুখে।

পরক্ষণেই আবার অনুনয়ের স্বরে বলে, দশটা টাকা দেরে আমায় জগা ? পিওন বেটা অনেক দূর থেকে আশাসুখে এসেছিল। কিন্তু খাতা একরকম বন্ধ এই ক'দিন —ভাল মাছ কোথা ? ঘুসোচিংড়ির ঝোল খেয়ে গেল বেচারা। কোটালের মুখে আবার আসতে বলে দিলাম। হয়তো বা রাত পোয়ালে এসে পড়বে। দশ টাকা তার কাছে দিয়ে দেব মনিঅর্ডার করতে।

বলার ধরনে জগা অবাক হয়ে তার মুখে তাকায়ঃ মুখেই তোমার ফড়ফড়ানি। বউয়ের জন্য মন কেমন করছে—উঁ ?

গগন না-না করে অন্য দিনের মত। একটুখানি চুপ করে রইল। বলে, ধরেছিস ঠিক। চিঠি পড়ে ফেলেই মুশকিল হল। বউ একা লেখে নি। বোন লিখেছে। মেজো সম্বন্ধীও লিখেছে। সেটা অতি নচ্ছার, সম্বন্ধ না থাকলেও তাকে আমি শালা বলতাম। সংসার ভাসিয়ে দিয়ে আমি নাকি পালিয়ে বসে আছি। শোন কথা !

সজোরে নিঃশ্বাস ফেলে একটা। জগার হাত থেকে হুঁকো নিয়ে ফড়ফড় করে দ্রুত

কয়েকটা টান দেয়। বলে, বউ আছে বোন আছে, ঘরবাড়ি বাগান-পুকুর পড়শী-কুটুম্ব সমস্ত নিয়ে দিব্যি এক সংসার রে! কেউ কি শখ করে সে জিনিস ছেড়ে আসে? বাইরে তাড়াবার জন্য সকলে ওরা উঠে পড়ে লাগল। আমি নড়ব না, ওরাও ছাড়বে না। গাঁয়ে জাগ্রত রক্ষেকালী ঠাকরুন, কালীভক্ত আমরা। তাঁর পাদপদ্মে রেখে চলে এলাম। ঠাকরুন দেখেও আসছেন এত বছর। মাগ্‌গিগণ্ডার বাজারে ইদানীং অচল অবস্থা নাকি, ঘন ঘন চিঠি হাঁটাচ্ছে। ধানাইপানাই করা মেয়েমানুষের স্বভাব—আমি আমল দিই নে। চিঠিই খুলি নে, দেখেছিলে তো! নিজের একটা পেটই চলে না, বারো ঘাটে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। চিঠি খুলে কোন্ সুবিধা তাদের করে দেব?

জগার মনটাও কেমন যেন হয়ে যায় আজ। গগনের জন্য কষ্ট হয়। কোন্ এক দূরদেশে ঘরসংসার ফেলে এসেছে, টাকা পাঠানোর দরকার। সেই টাকার ধান্দায় কত জায়গায় ঘুরল, কত রকম চেষ্টাচরিত্র করেছে—কিছুতে কিছু হয় না। আর জগার টঁ্যাকে টাকাপয়সা আপনি গড়িয়ে আসে। বাদাবনে তোমরা শুধু জঙ্গল, জঙ্গলে বাঘ, জলে কুমির দেখে শুলোর খোঁচায় পা জখম করে বাপ-বাপ বলে চেঁচিয়ে ওঠো। ভিতরের মজাটা জান ক'জনে? বাদায় ঢোকবার মুখে টাকা দিয়ে লাইসেন্স করবার আইন। অদৃষ্টে কী ঘটবে ঠিক-ঠিকানা নেই, আগেভাগে গাঁটের টাকায় সরকারি-সেলামি দিয়ে এস। আচ্ছা আইন রে বাপু! বাঘ-কুমির তো লাইসেন্স করে ঢোকে না, বিনি ট্যাক্সোয় খেয়েদেয়ে চরে বেড়িয়ে এই তাগাড় হচ্ছে। তাদের কায়দায় চলাচল কর তুমিও—লোকসানের ভয় নেই। যা কিছু সওদা ষোলআনা লাভের অঙ্কে পড়বে। টাকা আর নোট কোথায় রাখা যায়, সেই তখন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ও-বছর গগনের এসে পড়ার আগে—গোলপাতা কাটতে গিয়ে কি হল? সরকারী খাতায় বেবাক শূন্য, বনকরের বাবুদের পান-খাওয়া বাবদ বারো কি তেরো টাকা সর্বসাকুল্যে। নিঃসাড়ে মাল বেরিয়ে এল বিশ কাহন। বড়লোক হতে ক'দিন লাগে হেন অবস্থায়? মোটামুটি রকমের গেঁথে নিয়ে বসো; তারপরে পায়ের উপর পা চাপিয়ে খাওদাও আর ফুর্তিসে ঢোলক বাজাও। শহরে পাক দিয়ে এস মাঝে মাঝে দু-পাঁচ দিন। টাকা কিছুতে ফুরোতে চায় না। কিন্তু এমন কপালখানা জগার, মনিঅর্ডার করে ঐপথে কিছু যে হালকা হয়ে যাবে, ভুবন ঢুঁড়ে তেমন একটা লোক মেলে না। গগন বিদ্বান মানুষ—বাদার কাজ তাকে দিয়ে হয় না। তার কাজ ডাক্তারি কিংবা মাস্টারি। বড় জোর এক মাছের খাতা খুলে মাচার উপর হাতবাক্স কোলে নিয়ে ঝুড়ি প্রতি এক এক আনা উপার্জন। বিদ্যাই কাল হয়েছে, এর বেশী এ মানুষকে দিয়ে হতে পারে না।

ছিলিম শেষ করে জগা উঠল। গগন বলে, যাও কোথা?

চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেললাম। পাড়াসুদ্ধ ঠিক মরেছে, নয় তো এ রকম নিঝঝুম হয় না। ঘুরে দেখে আসি বড়দা।

আর ঐ যে টাকার কথা বললাম তোমায়। ন্যায্য সুদ দেব।

হবে হবে। সে তো কালকের কথা।

হন-হন করে সে বেরুল। পাড়ায় নয়, চলল উল্টোমুখো—কালীতলা যে-দিকটায়।

কালীতলায় আরও খানিক এগিয়ে বলাসুন্দরীর ঝোপের এদিকে-সেদিকে বড় বড়

কয়েকটা পগার যোন্দল যান মাথা তুলে আছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে জগা সতর্ক-ভাবে সেইখানে ঢুকে পড়ে। একটা যান-গাছ চিহ্নিত করা আছে, গুঁড়িতে প্রকাণ্ড খোল। আবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে খোলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। বজ্জাত ছোঁড়াগুলো গাঙশালিক ও কাঠঠোকরার ছানা বের করে এমনি ধারা হাত ঢুকিয়ে। অথবা হাতে তুলসীপাতার রস মেখে মৌচাক ভেঙে নিঙড়ে মধু খায়। গ্রহ মন্দ হলে সাপেও কাটে—পাখির ছানার লোভে সাপ কখনোসখনো গাছের খোলে ঢুকে পড়ে। জগা বের করল মাটির ঘট একটা। ঘটের মুখ টাটি ঢাকা—আধাআধি টাকায় ভরতি। নোট নয়, রুপোর টাকা শুধু। মাটির নীচে কাগজের নোট নষ্ট হয়ে যায়, নোট ভাঙিয়ে টাকা করে ঘটের ভিতর রাখে। আজকালকার টাকা—রুপা নামমাত্র, খাদবস্তু বেশী। টাকার রঙ কালো হয়ে যায় দু-পাঁচ দিনে। তেঁতুল বা আমরুল-পাতায় ঘষে চকচকে কর, নয় তো বাজারে নিতে চায় না।

কম নয়, থোক কুড়ি টাকা নিয়ে এল জগা। গগনের হাতে দিয়ে বলে, মেকি নয়, রংটা এই রকম। বাজিয়ে দেখে নাও বড়দা। সুদও সস্তা করে দিচ্ছি—এক পয়সা হিসাবে। বিশ টাকার দরুন পাঁচ গণ্ডা পয়সা খাতা থেকে রোজ ফেলে দিও। চুকে গেল। আসল যদ্দিন খুশি রেখে দাওগে, তাগাদ করব না। সুদটা ঠিক ঠিক দিয়ে যেও।

টাকা গগন বাজিয়ে দেখে না। গুণে নিল। কুড়িই বটে। চাইল দশ, দিল তার ডবল। সাক্ষাৎ কল্পতরু। এক দিনের সুদ এক পয়সা—এক রকম বিনা সুদেই বলা যায়। এমন হলে তো বাদা অঞ্চলের সবাই ঋণ করে হাতি কিনে বসে এক একটা। জগার ঔদার্যে গগন অবাক হল। খুশিতে আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হেসে বলে, আজকের দিনের সুদ কুড়ি পয়সা—নিয়ে নাও নগদ।

থলি ঝেড়েঝুড়ে পয়সা সাতটার বেশী হল না। তাই তো! তখন আর এক পন্থা মনে এসে গেল।

ডেকে এলে, তা আসে কই ওরা? গানবাজনা নয়, খেলা হবে এখন। খেলায় রোজগার করে তোমার সুদ শুধব। সুদই বা কেন, আসলের আধাআধি ঝেড়ে দিচ্ছি এখনই।

এগিয়ে গিয়ে নিজেই চেঁচামেচি করে আসে: চলে আয় কোন্ কোন্ মরদের বেটা আছিস। পয়সা গাঁটে নিয়ে আসিব।

শেষ কথার মধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার। জগা ইতিমধ্যে মেজেয় মাদুর বিছিয়ে ছক পেতে বসেছে। বলাই এল। আরও জন চার-পাঁচ—আজকে যারা জালে যায় নি। গাঁটে যাদের পয়সা তারা খেলবে; বাকি লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে সদুপদেশ ছাড়বে, যে লোক জিতবে তুড়িলাফ দেবে তার পক্ষ হয়ে।

কুড়ি কুড়িটা টাকা গগনের হাতে একসঙ্গে, অতিশয় উঁচু মেজাজ, আপাতত সে থোড়াই কেয়ার করে দুনিয়াটাকে। বলে, দশ টাকা এই আলাদা করে কাপড়ের খুঁটে বাঁধি। বাপের হাড় রে বাবা। পিওন এসে পড়লে তখন গাঁট খুলব। বাকি দশ এই মুঠোয়—রণে এস বাপধনেরা। দেখ কি জগন্নাথ আধাআধি নয়, তোমার পুরো দেনা শোধ করব এখনই। দেনা দাঁড়াতে দেব না।

চলল ফড়খেলা। ক্রমেই গগনের মুখ শুকাচ্ছে। বাঃ শালা, কী বিশ্রী পড়তা, উল্টোপাল্টা দানই পড়ে কেবল। টাকা সমস্ত খোয়া গেল, একলা জগাই তার মধ্যে আট টাকা পনের আনা মত জিতে নিল। বেটা সব দিকে তুখোড়, ফড়ের

ঘঁটিও যেন কথা শোনে ওর। এখন কী উপায়? কানে জল ঢুকলে আবার খানিক জল ঢুকিয়ে আগের জল বের করে ফেলে। ইতস্তত করে গগন শেষটা কোঁচার খঁট খুলে বাকি দশ টাকা বের করে ফেলল।

তা-ও খতম। নেশা জমে গেছে তখন। ছাড়বে না কি জগা আর কিছু? বাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন। বিশ কর্জ হয়েছে, না হয় পঁচিশই হবে। চেটে পুঁছে সবই তো নিয়ে নিলে তুমি।

জগা চটে গিয়ে বলে, খোঁটা দেবার কি আছে বড়দা? চুরি-জোচ্চুরি করেছি। আইনদস্তুর খেলা খেলে জিতে নিইছি।

গগন বলে, তাই দেখলাম গো জগা, পয়সাকড়ি তোমার পোষ-মানা। বিষম চেনা চিনে ফেলেছে তোমায়। যার কাছে যা থাকুক, পায়ে হেঁটে যেন তোমার গেঁজেয় গিয়ে উঠে বসে। তা পাঁচ টাকা না হোক, দুটো টাকা ছাড়। পিওন বেটাকে আসতে বলেছি—পোড়া অদৃষ্টে হবে না কিছু জানি—আরও একটুখানি চেষ্টা করে দেখা।

জগা উঠে দাঁড়াল তো গগন তার হাত চেপে ধরে। জগা মুখ খিঁচিয়ে বলে, টাকার আমি গাছ নাকি—নাড়া দিলে অমনি ঝুরঝুর করে পড়বে?

এই তো জিতে নিলে এতগুলো টাকা। ধর্মপথেই জিতেছ, আমি বলছি। বউয়ের কথা ধরি নে—কিন্তু মায়ের পেটের বোনে আমার মিছে কথা লিখবে না। বড়লোক শালারা দেখাশুনো করত। কী নাকি ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে—এক পয়সাও নেবে না শালার কাছ থেকে, না খেয়ে দাঁতে কাঠি দিয়ে পড়ে থাকবে। তা সে পারে, বড্ড জেদী মেয়ে। উঠে পড়ছ কেন জগা, বসো আর একটু। টাকা দিয়ে লোকসান কিসের তোমার? এমন খাতা রয়েছে, ভেড়ির মাছও বড় হচ্ছে ওদিকে—ঐ ক'টা টাকা তুলে দিতে পারব না?

হেন কালে মানুষের শব্দসাড়া উঠানে। খেলায় মগ্ন ছিল, নজর তুলে কেউ দেখে নি।

কারা গো?

হর ঘড়ুই শীতলপাটি ঘাড়ে নিয়ে আগে আগে আসছে। বলে, বাইরে এসে দেখ বড়দা, তোমার আপন লোকেরা এসে পড়ল।

বাদারাজ্যের ভিতর কুটুম্ব আসা একটা সমারোহের ব্যাপার। হুড়মুড় করে সবাই দাওয়ায় চলে এল। জগার চক্ষু কপালে উঠে গেছে। কি আশ্চর্য, কুমিরমারি অবধি টাপুরে-নৌকোয় যাদের সঙ্গে এসেছে সেই দুটো মেয়েলোক এবং পুরুষটি। তাদেরও যে সাঁইতলায় গতি, কে ভাবতে পেরেছে।

চারুর একেবারে চোখাচোখি পড়ে গেল জগা। বিনি-বউকে চারু বলে, সেই মানুষটা বউদি। চিনতে পারছ না—আমায় যে কাদার মধ্যে ফেলে দিল। দাদার কাছে এসেছে সেই বজ্জাত।

যে জগা বাঘ দেখে ডরায় না, চারুবালার মুখোমুখি কেমন সে জবুথবু হয়ে গেছে। চেহারায় মেয়েলোক, বয়সও কম বটে—কিন্তু পিত্তি জ্বালা করে কথাবার্তায়। নতুন জায়গায় পা দিয়েই সকলের সামনে তার সম্বন্ধে পয়লা উল্লেখ হল বজ্জাত বলে। নেহাত লোকে কি বলবে,—নয় তো ছুটে দিয়ে পালাত মেয়েটার সামনে থেকে। তবে বউদি মানুষটি দেখা গেল মিটমাটের পক্ষপাতী। চাপা গলায় তাড়া দিয়ে ওঠে, ঝগড়া বাধিও না বলছি ঠাকুরঝি। চুপ কর। যেখানে পা দেবে

সেইখানে গণ্ডগোল।

জগাকে ছেড়ে চারু তখন নিজের ভাই গগন দাসকে নিয়ে পড়ল : কী মানুষ তুমি দাদা। আমরা আছি কি মরেছি, চিঠি লিখে একটা খবর নাও না। ভাবৎ পিরথিমের ভিতর জায়গা একটি বেছেছ বটে ! সত্যি সত্যি খুঁজে পাব, একবারও তা ভাবতে পারি নি।

নগেনশশী পিছনে পড়ে গিয়েছিল, পা টানতে টানতে দাওয়ার ধারে এসে দাঁড়ায় : হুঁ, খুঁজে পাবে না ! মানুষে আজ চাঁদ-তারা তাক করে ছুটোছুটি করছে, এ তবু মাটির উপরে। খুঁজে পাবে না তো আমি রয়েছি কি জন্যে ? বিনিকে তাই বললাম, চোখ-কান বুজে আমার পিছু পিছু চলে আয়। হাজির করে দিলাম কি না বল এখারে।

গগন গরম হয়ে বলে, যা লিখেছিলে নগেনশশী, সেইটে অক্ষরে অক্ষরে করে তবে ছাড়লে ? ছি-ছি, গেরস্তঘরের মেয়েছেলে তুমি বনে এনে তুলেছ। তোমার বোনকে নিয়ে এসেছ, আমি কিছু বলতে চাই নে। কিন্তু আমার বোনকে নিয়ে এলে কোন্ বিবেচনায় ?

নগেনও সমান তেজে জবাব দেয়, তোমার বোনেরই তো গরজটা বেশী ! তার ঠেলায় তিষ্ঠানো দায়। নিরুপায় হয়ে বিনি তখন বলে, চল মেজদা, পেঁছে দেবে আমাদের। সাথী না জুটলে ও-মেয়ে শেষটা একা একা বেরিয়ে পড়বে।

চারু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : আলবৎ বেরুতাম। গায়ে যেন জলবিছুটি মারছিল। কাদের কাছে কোন্ ভরসায় রেখে এসেছিলে শুনি ? এদ্দিন তবু চাট্টি চাট্টি ধান হয়েছে, ভেনে-কুটে চলে গেছে একরকম। এখারে খরায় মাঠ শুকনো, একচিটে ঘরে উঠল না। বড়লোকের হাততোলা হয়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল দাদা। সে বড়লোক দয়ায় কিছু করে না, মতলব নিয়ে করে।

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকায় একবার নগেনশশীর দিকে। দৃষ্টির তেজেই বুঝি নগেন সরে গিয়ে হরর কাছে দাঁড়াল। গগন বেকুব হয়েছে, ঠাণ্ডা করতে পারলে এখন বাঁচে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, চলে এসেছিল, সে তো ভালই। ক্ষেত-খামারের এই হাল, আমি তা জানব কেমন করে ? কুটুম্বর হাততোলা কেন হতে হবে ? কাল সকালেই মনিঅর্ডার হয়ে টাকা চলে যেত। খবর আসতেই লেগে যায় কত দিন।

জগা হঠাৎ কতকগুলো টাকা ছুঁড়ে দেয় গগনের দিকে। না বুঝে গগন ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়।

তোমারই টাকা বড়দা। একটু আগে যা তোমার থেকে আমার ট্যাঁকে চলে এল। আলাঘরে কুটুমরা—কুটুম রে-রে করে এসে পড়েছে। টাকা নইলে মচ্ছব হবে কি দিয়ে ?

দাওয়া থেকে সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে উঠানে। পৈঠা দিয়ে নামবার তাগত নেই, চারুবালা সেই দিকে। ও যা বস্তু—চোখ দিয়ে পোড়াচ্ছে, নাগালের মধ্যে পেলে আরও কি করে বসে বলা যায় না।

অন্ধকারে যেন ঢেউ তুলে দিয়ে তার মধ্যে জগা ডুবে গেল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। বাইরের সবাই চলে গেছে, আপন লোকদের কথাবার্তা এইবার নিজেদের মধ্যে। জগা আলা-ঘরের কানাচে এসে দাঁড়াল।

বোন বলছে, দাদা, কি করছিলে ঘরের মধ্যে তোমরা এতজনে মিলে ?

ভারী মজাদার জবাব ভাইয়ের : নামগান হচ্ছিল।

কই, আওয়াজ পাই নি তো?

বিড়বিড় করে হচ্ছিল। তাতে যা ভাব আসে, চেঁচামেচিতে তেমন হয় না।

দেয়ালে-ঝোলানো খোলখানা—আঙুল তুলে নিশ্চয় সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। বড্ড কাজে লেগে গেল খোলটা—পশার বাড়ল আত্মজনের কাছে। কিন্তু খড়ের ছকমুটি কোন্ কায়দায় তিন জোড়া চক্ষুর সামনে থেকে বেমালুম সরিয়ে ফেলল, জগা একদিন বড়দাকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে।

ছাব্বিশ

ভোররাত্রে ডাকাডাকি: জগা কোথা? বলাই কোথা রে? সাড়া দেয় না ওরা ঘরের ভিতর থেকে। পচা আজ জালে বেরিয়েছিল, হয়েছেও যা-হোক কিছু। তার স্বার্থ রয়েছে, তাকেই পাঠাল খাতা থেকে। অন্য কেউ এসে ঘুম ভাঙালে জগা কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে চাইবে,—ভাবের মানুষ পচাকে কিছু বলবে না।

মাছের আমদানি বড্ড কমে গেছে। সে দোষ ষোলআনা জগার। ফুলতলা নিজে গেল, আবার লেজুড় করে নিয়ে গেল বলাইটাকে। দু-দিন বলে পুরো পাঁচ-পাঁচটা দিন কাটিয়ে এল। মাছের নৌকো সেই ক'দিন কুমিরমারি হাজির হয়ে একটা ভাল খদ্দের ধরতে পারে নি। কিছু হ্যাঁচড়া খদ্দের ছিল তখন। যেসব মানুষ ইচ্ছে করেই মেছোহাটে দেরি করে আসে। এসে হয়তো দেখে মাছই নেই তখন। যেদিন থাকে, সস্তা দরে পাওয়া যায়। বেশী থাকল তো বেশী সস্তা। কাঁচা মাল রেখে দেওয়া চলে না, দরদাম যা-ই হোক ছাড়তেই হবে। দর পাচ্ছে না বলে মাছ-মারাদেরও উৎসাহ নেই জলে নামার। খাতার কাজকর্ম তাই বসতে না বসতে চুকে গেছে। গাঙে একপো জোয়ার। এই যে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সে-ও জগারই কারণে।

জগা চোখ মুছতে মুছতে সোজা গিয়ে ডিঙির গলুয়ে বোঠে ধরে বসল। অন্য দিন খাতায় বসে একটি ছিলিম অন্তত তামাক খেয়ে তবে ঘাটে নামে। আজকে—ওরে বাবা, দাওয়ার কামরায় চারুবালা হয়তো ঘাঁটি পেতে রয়েছে। তা ছাড়া দেরিও হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

কাছি খুলে দে বলাই। গাজি বদর বদর!

চারুবালা উপর থেকে ডাকছে, শোন, কানে যাচ্ছে না ও-লোকটা? বোঠে থামাও না গো—।

একটা নাম থাকে মানুষের। নাম না-ই যদি জান, তবে কি তাচ্ছিল্য করে 'লোকটা' বলে ডাকবে? বয়ে গেছে জগার বোঠে থামাতে। বলাইকে বলে, তুইও ধর বোঠে। খালের এইটুকু উজান, কষে টান দে।

চারু বাঁধ থেকে খালের গর্তে নামল। হাত উঁচু করে চেঁচাচ্ছে: শোন, ঝাঁটা নিয়ে এস একগাছ। বাঁধা ঝাঁটা না পেলে নারকেলের শলা। আর রান্নার জন্যে হাতা-খুন্তি আর কাঁটা—

ফর্দ বলতে বলতে আসছে। ভুট-ভাট-ভটাস আওয়াজ উঠছে কাদায়। বাঁয়ে—হেই ভগবান, আর খানিকটা বাঁয়ে নিয়ে ফেল দজ্জাল মেয়েটাকে। বাঁয়ে বিষম দোপি—উপর থেকে কিছু মালুম হবে না। কোমর অবধি বসে যাবে, কাদার মধ্যে আটকে থাকবে। জনা চারেক মরদ-জোয়ান পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর কায়দায় টানাটানি করে তবে তুলবে। এই কাজটি করে দাও হে মা রক্ষেকালী। চারুবালার দুর্গতি দেখতে

দেখতে আর বোঠের আগায় জল ছিটাতে ছিটাতে মনের খুশিতে ওরা গাঙে গিয়ে পড়বে। ভোরবেলাকার সুযাত্রায় দিনমানটা তা হলে কেটে যাবে ভাল।

গাঙে পড়ে জগা বলে, ঝাটা চায় কেন রে?

বলাই হেসে বলে, পেটাবে। পিরীত জমেছে তোমার সঙ্গে—শুধু-হাতে সুখ পাবে না, হাতের অস্ত্রোর জুটিয়ে রাখছে :

হর ঘড়ুই বিষম ঘাড় নাড়ে : উঁহু, কি বলছ তোমরা! ভাল জায়গার মেয়ে—আমাদের বাদাবনে শাকচুন্নী পেয়েছ নাকি? কোস্তা দিয়ে ঝাট দিচ্ছিল—ন্যাড়া কোস্তা, মাথা ক্ষয়ে গেছে। ঝাট দিতে দিতে ঝাটার কথা মনে পড়েছে বোধ হয়। রান্না করবার সময় অসুবিধা হয়েছে, হাতা-খুন্তির গরজ তাই।

আরও গদগদ হয়ে বলতে লাগল, এসেছে কাল রাত্রে। সকালবেলা—না তুমি জগা, ধুলোমাটি পোড়া-বিড়ি ম্যাচের-কাঠি কিছু আর নেই, লক্ষ্মীর অংশ হলেন উঁরা তো, লক্ষ্মীঠাকরুনের পা পড়েছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, রূপ যেমনধারা কপালখানা তার উল্টো।

থেমে যায় হর ঘড়ুই। একটু থেমে ঢোক গিলে হর ঘড়ুই বলে, কালাপেড়ে ধুতি পরনে দেখে বেরিদারকে জিজ্ঞাসা করলাম। বিয়ে হতে না হতে কপাল পুড়েছে। মেজাজ তাই একটু তিরিক্ষি।

কুমিরমারির গঞ্জে এসে মাছ সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে। পয়সা হর ঘড়ুইয়ের গাঁটে। ভরা জোয়ার। কিন্তু জগার ফেরবার চাড় দেখা যায় না। হর তাগিদ দিচ্ছে : উঠে পড় তোমরা। গোন বয়ে যায়, দেরি কিসের?

জগা বলে, খাব না?

খাবে বই কি! মুড়ি কিনে নাও, আর বাতাসা। দানাদার কিনে নাও সের-খানেক। কোঁচড়ে করে খেতে খেতে যাবে।

মুড়ি নয়, ভাত খাব।

আহা, ভাতের হাঙ্গামা কেন আবার! ভাত খাবে সাঁইতলা গিয়ে। পুরো গোন তার উপরে পিঠেন বাতাস—ডিঙি তো উড়ে গিয়ে পৌঁছবে।

জগা বলে, হাঙ্গামাই তো সেখানে। উনুন জ্বাল, রাঁধ-বাড়, বাসন-ধোও—হরেক ব্যাপার। এখানে কি—গদাধর ঠাকুরের হোটেলে ভাত রেঁধে বলে খাওয়ার মানুষ ডাকছে।

অন্য দিন তো সাঁইতলা গিয়ে রাঁধাবাড়া কর।

জগা এবার রীতিমত চটে গিয়ে বলে, জান তো ঘড়ুই, নিয়মের বাঁধাবাঁধি আমার সহ্য হয় না। দুটো দিন সাঁইতলা গিয়ে খেয়ে থাকি তো পাঁচটা দিন এখন গদাধরের হোটেলে খেয়ে যাব।

জেদ যখন ধরেছে নিরস্ত করা যাবে না। হর ঘড়ুই হোটেলে গিয়ে তাড়া দেয় : হাত চালিয়ে ভটচাজ্জি! ভাত আর ডালটা নেমে গেলেই পাতা করে দাও।

জগা বলে, উঁহু, মাছ খাব, মুড়িঘন্ট খাব।

বেশ, খাও ষোড়শোপচারে। বেগোন হয়ে যাবে, বুঝবে তখন ঠেলা।

তোমার কী ভাবনা ঘড়ুই? ডিঙি আমরা কি মাঝপথে ফেলে যাব? বেগোন হোক যা-ই হোক এমনি কথা বলব না যে ঘড়ুই মজার ডাঙায় নেমে দুটো বাঁক গুণ টেনে দাও।

গদাধর কাঁটা গাকাচেহ ফুটন্ত ডালে। কম পরিমাণ ডাল দিয়ে থনথনে ঘন

করবার এই কায়দা। জগা বলে, খালের নাম কে যে বারোবেঁকি রেখেছে! সে বেটা শতকে জানত না। গণে দেখেছি ভটচাজ্জি, বারো দুনো চব্বিশ বাঁকেও বেড় পায় না।

বলাই বলে, বোঠে মেরে মেরে লবেজান। রাস্তাটা এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে, তড়িঘড়ি এবারে ঝামা ফেলে দিক। নৌকো ছেড়ে তাহলে গাড়ির কাজে লেগে যাই। জল ছেড়ে ডাঙার উপর উঠি।

ডালের কড়াই নামিয়ে দিয়ে গদাধর বলে, ঝামা ফেলা পর্যন্ত লাগব না রে! বর্ষা কেটে গিয়ে রাস্তা খটখটে হয়ে যাক। ধানও পেকে যাবে তদ্দিনে। সাতরাজ্যি ঘুরে নৌকোয় এবারে ধান বওয়াবয়ি নয়। গরুর গাড়িতে। এরই মধ্যে সব বাড়ি বানাতে লেগে গেছে। মরশুমে বিস্তর গাড়ি নেমে যাবে। আমিও ভাবছি, দু-জোড়া গরু কিনে গরুর-গাড়ি করে ফেলি খান দুই। ভাড়া খাটবে।

বলাই পুলকে ডগমগ: করে ফেল ভটচাজ্জি, মস্ত মুনাফা। গাড়ী চালানোয় ভারী মজা। ডাডা-ডাডা, ডাইনে-বাঁয়ে—খালি মুখের খাটনি। বাবুমানষের কাজ। বোঠে মারতে মারতে হাতে এমন ধারা কড়া পড়ে না।

আদরমণি গগনের কথা জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তারের কি খবর?

জগা বলে, ডাক্তার এখন নয়, ঘেরিদার। মাঝে দিনকতক গুরুমশাই হয়েছিল।

আদর হেসে বলে, আবার কোন্‌টা ধরবে এর পরে?

বলাই বলে, আর কিছু নয়। পয়মন্ত মানুষ বড়দা ছোটখাটো একখানা খাতাও জমে উঠেছে। হচ্ছে দুটো পয়সা।

জগা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, হতে আর দিল কই! হরেক শত্রু। এক শত্রু চৌধুরিরা। ঘেরির বাঁধ ভেঙে নানান রকমে নাস্তানাবুদ করছে। তার উপর আর এক উৎপাত—ঘরের মানুষজন এসে পড়েছে। নতুন ব্যবসা, এত ধকল সামলে উঠতে পারলে হয়।

গদাধর বলে উঠল, হোটেলের প্রাপ্য এগারোটাকা ছ'আনা দিয়ে দিতে বলো দু-পাঁচদিনের মধ্যে।

জগা বলে, টাকা কেউ বাড়ি বয়ে দিয়ে যায়, শুনেছ কখনো? নিজে গিয়ে পড় একদিন, যদুরে পার থাবা মেরে নিয়ে এস।

বলাই বলে, টাকা না পাও আকণ্ঠ মাছ ঠেসে খেয়ে উশুল করে এস খানিকটা।

সাঁইতলা ফিরতে বেশ খানিকটা রাত হল সেদিন। বলাই বলে, আলা চুপচাপ, গানবাজনা নেই। বোধ হয় ওরা ছকবাঁটি নিয়ে বসে গেছে।

জগা নজর করে দেখে বলে, খেলা হলে তো আলো থাকবে। নয় তো কোট দেখে কেমন করে? গালে-মুখে হাত দিয়ে বসে আছে বড়দা! নয় তো কোনখানে যদি বেরিয়ে থাকে। কিন্তু রাত্তিরবেলা শখ করে বেরুবার মানুষ তো বড়দা নয়। আরও এখন ঘেরিদার মানুষ।

সোজা চলেছে চালাঘরের দিকে। বলাই হাত ধরে টান দেয়: এক্ষুনি ঘরে ঢুকে কি হবে? চল, আমরাই গিয়ে জমাইগে।

শুয়ে পড়ব। গা ব্যথা-ব্যথা করছে আমার।

বলাই হি হি করে হাসে: তা নয়। খান্ডারনী মেয়েটাকে ভয় লেগেছে তোমার। ঝাঁটা দিয়ে পেটায় নি তো এখনো, এর মধ্যে গা ব্যথা কেন?

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জগা চলল। ঘরে গিয়ে সত্যিই সে মাদুরে গড়িয়ে পড়ে।

বলে, তুই বসে বসে কী পাহারা দিবি ? তুই চলে যা, আমি ঘুমোই।

আমি একলা গিয়ে কি হবে ? তুমি না হলে ফুর্তি জমে না।

জগা চটে ওঠে : ফুর্তি না হলে বুঝি যেতে নেই ? তোরা সুদিনের কেবল সাথী। বড়দার এই বিপদ ! মানুষটা কোথায় ঝিম হয়ে পড়ে আছে—অসময়ে দুটো ভাল কথা বলে আসার মানুষ হয় না।

বলে পাশ ফিরে শুল জগা। আর কথাবার্তা বলবে না। একটুখানি বসে থেকে বলাই উঠল। দেখে আসা যাক গগনের দশা। আপন মানুষদের সঙ্গে কোন মজায় ডুবে এমনিধারা নিঃসাড় হয়ে পড়ল।

নিঃস্তব্ধ রাত। ফাঁকা আকাশের মধ্যে বাতাসও হঠাৎ কেমন বন্ধ—গাছের ডাল-পালা নড়ে ফিসফাস শব্দটুকু উঠছে না। গাঙে জোয়ার-ভাটার জল নামার যে কলকল শব্দ, তা-ও নেই এখন। আলার দিক থেকে—হাঁ, খোলের আওয়াজ আসছে বটে। বলে দিতে হবে না, বাজাচ্ছে বলাই। বাজনার ব্যাপারে সে একটু-আধটু জগার সাগরেদি করে, খোলে চাঁটি মেরে বোল তুলতে গিয়ে গালি খায়। জগা আসরে নেই, অতএব একেশ্বর হয়ে জমিয়ে বসে সে বাজাচ্ছে। গানও যেন বাজনার সঙ্গে—ধড়মড়িয়ে উঠে জগা বাইরে চলে এল। বিড়বিড় করে গান—কান পেতে একটু একটু শুনতে পাওয়া যায়। বাদ্যকর বলাই এবং গানের মানুষও পেয়ে গেছে। জগাকে বাদ দিয়েই আসর করতে পারে ওরা। দরকার নেই তবে আর জগার !

টিপিটিপি চলেছে সে চোরের মত। দেখে আসা যাক—বলাই এসে আনুপূর্বিক বলবে, ততক্ষণের সবুর সয় না। সোজাসুজি বাঁধ ধরে না গিয়ে ঝুপসি জঙ্গলের আড়ে-আবডালে চলেছে। কেউ না দেখতে পায়। আলাঘরের খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। মালুম হচ্ছে এবার—গগনের গলা। আরও আছে—কিন্তু ভিন্ন গোঠের গরুর মত গগনের কণ্ঠ একেবারে ভিন্ন পথ ধরেছে। হায় মা বনবিবি, হায় মা রক্ষে-কালী, তোমাদের মহিমায় বড়দা-ও কিনা গায়ক হয়ে উঠল ! গান অবশ্য নয়—হরেকৃষ্ণ হরেরাম রাধাগোবিন্দ—নামগান বিড়-বিড় করে গাইছে কতকটা মন্তরের মত।

বলাই এলে জগা হাসিতে ফেটে পড়ল : দেখে এসেছি। চার জন দেখলাম আসরে তুই ছিলি, বড়দা ছিল, আর দুটো কে রে ?

একজন আমাদের পচা। পচা ওদিকে মুখ করে ছিল। আর ছিল বড়দার মেজো সম্বন্ধী—সেই যে, নগেনশশী যার নাম।

বলে গম্ভীর হয়ে যায় : প্যাঁচে ফেলেছে বড়দাকে। ফড়ের ঘুঁটি লুকিয়ে ফেলে কাল সেই যে নামগানের কথা বলেছিল, সেই হল কাল। পচা আগেভাগে গিয়ে গরুড়পক্ষীর মত অন্ধকারে বসে আছে। আমায় দেখে বলল, তবে আর কি—খোল বাজানোর মানুষ এসে গেল। আর সেই সম্বন্ধী বলে, রোজ নামগান করে থাক, আজকেই বা হবে না কেন ? লাগাও ? পচা ধরল, সম্বন্ধী ধরল—বড়দা কি করে, তারও দেখি ঠোঁট নড়তে লেগেছে। আমার মুখে ওসব বেরোয় না, খোলটা কোলের মধ্যে টেনে নিলাম।

তাই তো বলছি রে, বড়দা সুদ্ধ গান গায় ! বাদায় কী তাজ্জব রে বাবা !

বলাই বলে, সাধে কি বাবা বলে, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়। বাইরে ঐ সম্বন্ধী, ওদিকে কামরায় ভিতরে বউটা আর বোনটা টেমি জেলে বসে গান শুনছে, আর ভাঁটার মতন চোখ ঘুরিয়ে নিরীখ করছে। কী করে তখন বড়দা ? একবার হয়তো একটু থেমেছে—চমক খেয়ে তক্ষুনি আবার হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ করতে লেগে যায়। ভাল

করে দেখতে পাস নি জগা—পাষাণ ফাটে বড়দার কষ্ট দেখে।

জগা বলে, ভুল করল যে বড়দা, আখের ভেবে দেখল না। দেশে ঘরে বখন রেখে এসেছে—হাতে টাকাপয়সা আসা মাত্তর ওদিকে কিছু কিছু ছাড়লে তবে এই খেয়াল হত না। বেড়াল তাড়াবার ভাল ফিকির হল, মাছের কাঁটাকুটি ছুঁড়ে দেওয়া। দূরে থেকে কামড়া-কামড়ি করুক, কাছ ঘেঁষে ঝামেলা করতে আসবে না। টাকা পাঠাতে বড়দা গাফিলতি করল, তার এই ভোগান্তি।

সম্বন্ধী কালকেও আমায় যেতে বলেছে। বলে, গেরস্তঘরে সন্ধ্যার পর ঠাকুরের নাম খুব ভাল কাজ করছ তোমরা। কোন দিন কামাই না পড়ে।

জগা শিউরে ওঠে: সর্বনাশ! একদিন দুদিন নয়, রোজ রোজ এখন অতগুলো পাহারার মধ্যে বড়দাকে বাবাজী হয়ে বসতে হবে! বড়দা বাঁচবে না।

আজ ভোররাত্রেও আগের দিনের মত। জগা সোজাসুজি ঘাটের উপর ডিঙি চেপে বসেছে। বলাই আলা ধরে আসছে। গগন ফর্দ লিখে বলাইর হাতে দেবে কত ঝোড়া মাছ যাচ্ছে, কী রকম দরে কেনা।

এবং ঠিক আগের দিনের মত বাঁধের উপর চারু। আজকে আর কাদায় নামে না, নোনা কাদার মহিমা কাল বুঝে নিয়েছে। বাঁধের উপর থেকে চেঁচাচ্ছে: ঝাঁটা আর হাতা-খুন্তি-কাটা। কাল ভুলেছ, আজকে ভুল না হয়। এমন ভুলো মানুষ তুমি।

জগার মুখে হাঁ-না কিছু নেই, লোহার মূর্তির মত স্থির। কানে গেল কিনা বোঝা যায় না। পচা নেমে আসছে, সে যাবে। কুমিরমারির হাটবার আজ। ঘেরির ডিঙি হোক কিম্বা সাধারণ নৌকো হোক, হাটবারের দিনে কিছু বাড়তি লোকের ভিড় হয়। হাটবেসাতি করতে যায়, হাটে ঘোরাঘুরি করে নতুন মানুষজন দেখতেও যায় অনেকে। পচাকে ডেকে চারু বলে, কালা নাকি গো নৌকোর ঐ লোকটা, রা কাড়ে না। একগাছা ঝাঁটার কথা বলছি কাল থেকে—

জগা কালা নয়, সে তো ভাল মতই বুঝে নিয়েছে সেদিন। ফুলতলার ঘাটে, টাপুরে নৌকোর ভিতরে, এবং বিশেষ করে কুমিরমারিতে। এটা হল মনের ঝাল মেটানোর কথা। আকাশে এখনো সূর্য ওঠে নি—নতুন দিনের সবে মাত্র সূচনা—মধ্যে অকারণ গালিগালাজ শুনিয়ে মনটা খিঁচড়ে দিল একেবারে।

ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে। পচা বলে, খেয়াল করে ঝাঁটা আজ আনতেই হবে।

জগা গর্জন করে ওঠে: আনবি তো ধাক্কা মেরে ফেলে দেব তোকে গাঙের জলে। মরদ হয়ে মেয়েমানুষের ঝাঁটা বইতে লজ্জা করে না?

পচা বলে, পুরুষে না আনলে মেয়েমানুষ পাবে কোথায়? বুঝে দেখ সেটা। দুটো দিন মাত্র ওরা এসেছে, ঠাট বদলে দিয়েছে আলাঘরের। মেয়েজাত হলেন লক্ষ্মী—ঘড়ুইমশায় যা বলে থাকেন। লক্ষ্মীর চরণ পড়েছে, আর লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠেছে। যাও না তো ও-মুখো—দেখে এস একটিবার গিয়ে।

বলাই হেসে ওঠে: খবরদার জগা! দেখতে পেলে তোকেও কিন্তু ছেড়ে দেবে না। গানের গলা শুনেছে সেদিন নৌকোর মধ্যে। আলাঘরে সকলে আমরা নাম-গানে মাতোয়ারা হয়েছিলোম, তা-ও শুনল ঘরের মধ্যে প্রথম পা দিয়েই। বাবাজী করে তোকেও ঠিক আমাদের সঙ্গে বসিয়ে দেবে।

জগা বুক চিতিয়ে বলে, কে বসাবে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? টের পাবে

আমার সঙ্গে লাগতে এলে। বলে দিস সেকথা।

বলাই বলে, বড়দাও এমনি বিস্তর দেমাক করত। কী হাল হয়েছে এই দুটো দিনে! যেন এক ভিন্ন মানুষ। কিছু বলা যায় না রে ভাই, গায়ের জোরের কথাও নয়। কামরূপ-কামাখ্যায় পুরুষকে ভেড়া বানায়। পর্বতের নিচে, শুনেছি, ভেড়ার পাল সারি সারি দাঁড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। হল কি করে?

সাতাশ

যা বলেছিল অন্নদাসী—ঘর করছে এতকাল, মানুষটা চিনবে না? রাধেশ্যামের গায়ের ব্যথা কিছুতে সরে না। তার পর ব্যথা যদিই বা কিছু কমল, খোঁড়া ডান পাখানা কিছুতে আর ভাল হতে চায় না। ঘরে বসেই যখন দুবেলা দু-পাথর জুটে যাচ্ছে। ব্যথা সারতে যাবে কেন? ভাল হয়ে গেলেই তো জাল হাতে বেরুতে বলবে রাত্রিবেলা। মাছ মার, মাছ না মিলল তো উপোস কর। সেই পুরানো ঝামেলা। দিব্যি আছে এখন। অন্নদাসী সকালবেলা বাড়ির পাট সেরে ছেলেটাকে রাতের জল-দেওয়া ভাত চাট্টি খাইয়ে দিয়ে চৌধুরিগঞ্জের আলায় চলে যায়। ভরদ্বাজের খাওয়া-দাওয়ার পর নিজে খেয়ে কাঁসর ভর্তি ভাত-তরকারি নিয়ে ঘরে আসে। সন্ধ্যার পর বেরোয়, রাত্রে আবার ভাত নিয়ে আসে দুপুরবেলার মত।

আছে ভাল রাধেশ্যাম। একটা মুশকিল, অন্নদাসী চলে যাবার পর নিতান্তই চুপচাপ বসে থাকা। বাচ্চাটা ট্যা-ভ্যা করলে তাকে একটু দুটো চড়চাপড় দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ নেই। মন টেঁকে না ঘরের মধ্যে এমন ভাবে। ভেবেচিন্তে এক কাজ করে। বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে-ও বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। বউ টের পাবে না, ফিরে আসতে তার অনেক রাত্রি হয়। পায়ে-পায়ে রাধেশ্যাম চলে গেল গগনের আলায়। নামগানের আসরে গিয়ে বসল। অবাক! বুড়ো হর ঘড়ুই অবধি ইতি-মধ্যে গৌরভক্ত হয়ে পড়েছে। 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম গৌরনিতাই রাধেশ্যাম'—বলছে সকলে বিড়বিড় করে। হ্যারিকেন-লণ্ঠন জ্বলছে আসরের একদিকে—এ-ও ভারী তাজ্জব। গগন কত বড়লোক হয়েছে বোঝ তবে—অবহেলায় অকারণে কেরোসিন। পোড়ায়। আর সেই আলোয় দেখা যায় ভাববিহ্বল গগন, এবং আশেপাশে একগাদা মানুষ। বনরাজ্যে হাঙ্গামা তো কথায় কথায়। মেছোঘেরি হবার পর কোন আলা অরক্ষিত দেখলে রে-রে করে আলায় পড়ে লোকজন পিটিয়ে হল বা শড়কিতে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে এখনো মাছ লুঠ করে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া যারা পেরে ওঠে না, নিশিরাত্রে তারা টিপিটিপি ভেড়ির খোলে জাল ফেলে। ডাকাত না হতে পেরে চোর। সেই সব লোকই পরম শান্ত ভাবে গৌরাঙ্গ-ভজন করছে কেমন দেখ: ভজ গৌরাঙ্গ, ভজ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।

রাধেশ্যাম ভাবছে, তা মন্দ কি! ঘরেও যখন একলা চুপচাপ থাকা, এখানে অর্ধেক চোখ বুজে চুপ করে থাক, পরকালের পুণ্য লাভ হবে।

তা ছাড়া নগদ লভ্যও কিছু আছে, আসর ভাঙার মুখে সেটা জানা গেল। গুড়ে-ঢালা চিঁড়ে-ভাজা, কোন দিন বা মুড়ি-ফুলুরি। আবার এক-একদিন হরির লুঠ দেয়—লুঠের বাতাসা কুড়িয়ে কণিকা পরিমাণ মাথায় দিয়ে দিব্যি কুড়মুড় করে অনেক-ক্ষণ ধরে চিবানো চলে। শুধুমাত্র পরলোকের আশাতেই, অতএব, ভক্তদল আলায় জমায়েত হয় না। গগন দাস কল্পতরু হয়ে দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছে, পোড়ো টাকা

পেল নাকি কোনখানে ? না মা রক্ষেকালী নতুন-আলার চাল ফুঁড়ে নিশিরাত্রে টাকার বৃষ্টি করে গেছেন ?

আলা থেকে ঘরে ফিরে রাধেশ্যাম যথারীতি মাদুরের উপর শুয়ে পড়ে। অন্নদাসীর ফিরবার তখনো দেরি। ফুলতলার নৌকো রওনা করে দিয়ে তবে ভরদ্বাজ রাঁধতে বসেন। রাঁধাবাড়া শেষ করে তিনি খাবেন, উচ্ছিষ্ট মুক্ত করে এঁটো-বাসন সরিয়ে রেখে রান্নাঘরে গোবরমাটি পেড়ে তবে অন্নদাসী বাড়ি ফিরবে। রাধেশ্যাম ঘুমোয় ততক্ষণ। বড় সজাগ ঘুম—বউয়ের পায়ের শব্দ পেলেই জেগে উঠে কাতরাতে আরম্ভ করে। অন্নদাসী এসে কাঁসরের ভাত-তরকারি পাথরের থালায় বেড়ে রাধেশ্যামকে দেয়। অল্প চাট্টি কাঁসরে থাকে, সেগুলো ব্যঞ্জন দিয়ে মেখে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে বসিয়ে গালে পুরে পুরে খাওয়ায়।

একদিন গণ্ডগোল হল। ভাত মেখে বাচ্চাকে তুলতে গিয়ে দেখে, নেই। কোথায় গেল ?

রাধেশ্যামকে জিজ্ঞাসা করে, তুণ্টু কোথা গো ?

অ্যাঁ, ছিল তো শুয়ে—

অন্নদাসী এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে দেখে বলে, কোথাও তো নেই। ছেলের খোঁজ জান না—তুমি ছিলে কি জন্যে তবে ঘরে ?

রাধেশ্যাম বলে, ঘুম এসে গিয়েছিল। বুঝি কি করে যে হারামজাদা সেই ফাঁকে অমনি কানে হেঁটে রওনা দেবে।

বাদারাজ্যে শিয়াল নেই যে ঘুমন্ত বাচ্চা শিয়ালে মুখে করে নিয়ে যাবে। আর হল বড়-শিয়াল—কিন্তু পাড়ার মধ্যে এসে টুঁ শব্দ না করে ছেলের টুঁটি ধরে সরে পড়বে, তেমন চোরাই স্বভাবের তারা নয়। গেল কোথায় তা হলে ?

রাধেশ্যামও খোঁজাখুঁজি করছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে—বিষম কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়—ঘরের বাইরেও উঁকিঝুঁকি দিয়ে আসে একবার। অন্নদাসী চরকির মতন পাক দিচ্ছে। ঝগড়াঝাঁটির সময় আপাতত নয়, ভাঁটার মতন বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে ভবিষ্যতের আভাস দিয়ে যাচ্ছে শুধু। বাঁধ অবধি চলে গিয়ে হাঁক পাড়ছে : তুণ্টু, তুণ্টুরে—

শিরোমণি সর্দারের বউ সুবোধবালা সাড়া দিয়ে উঠল : কিরলি নাকি রে দিদি ? কী কাণ্ড—ওরে মা, সে কী কাণ্ড !

বলতে বলতে এদের উঠানে চলে এল। কাঁধের উপর তুণ্টু। ঘুমুচ্ছে। নেতিয়ে আছে একখানা ন্যাকড়ার মত।

তুণ্টু তোমার কাছে দিদি ? তুমি নিয়ে গিয়েছিলে, আর দেখ, আমরা দাপাদাপি করে মরি।

সুবোধবালা গালে হাত দিয়ে বলে, বলিহারি আক্কেল তোদের দিদি। ঘরের মধ্যে বাচ্চা রেখে দুজনে বেরিয়ে পড়েছিস। দুয়োর হা-হা করছে।

অন্ন বলে, দুজনে কেন যাব ? তোমার দেওর ছিল। তার জিম্মায় রেখে আমি চৌধুরি-আলায় যাই। পেটের পোড়ায় না গিয়ে উপায় তো নেই।

শিরোমণি আর রাধেশ্যামে ভাই ডাকাডাকি। বয়সে কে বড় কে ছোট, এ নিয়ে বিরোধ আছে। হিসাব ও তর্কাতর্কি হয় মাঝে মাঝে। অন্নদাসীর স্বার্থ, নিজের মরদের কম বয়স বলে জাহির করা। রাধেশ্যাম তাই হল সুবোধবালার দেওর।

অন্নদাসী বলে, তোমার দেওর সেই থেকে নড়ে বসতে পারে না। আমিও ছাড়ন-

পান্তর নই দিদি। জালে যাবে না তবে ছেলে ধর।

সুবোধবালা বলে, নড়তে পারে না তো ঘর ছেড়ে গেল কেমন করে? তুইও যেমন দিদি—পুরুষ বলল, আর সেই কথায় অমনি গেরো দিয়ে বসেছিস!

রাধেশ্যাম না-না করে ওঠে: ছিলাম বই কি? আলবত ছিলাম ঘরে, তুমি দেখ নি। ঘুমুচ্ছিলাম।

সুবোধবালা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, যা চেঁচান চেঁচাচ্ছিল, মরা মানুষও খাড়া হয়ে উঠে বসে। বিছের কামড়েছিল—কান্না শুনে ছুটে এসে তুলে নিলাম, বাড়ি নিয়ে গিয়ে মাথা-তামাক ডলে ডলে তবে বুঝি জ্বালাটা কমল, কান্না থামে তখন। ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলে—আমি কানা কি না, পর্বতের মতন দেহখানা আমার ঠাহরে এল না।

ছেলে দিয়ে সুবোধবালা ঘরে চলে গেল। এইবার এতক্ষণে বোঝাপড়া—রাধেশ্যাম সেটা বুঝতে পারছে। মাদুরের উপর পড়বে নাকি—পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে মোক্ষম ঘুম? তাতে খুব সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। আঁস্তাকুড়ে গিয়ে দাঁড়ালে যমে রেহাই করে না। টেনে খাড়া তুলে বসিয়ে অন্নদাসী কথা শোনাবে। তার চেয়ে উল্টো চাপ দিয়ে সে-ই আগেভাগে শুনিয়ে দিক।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রাধেশ্যাম বলে, বলি, এত রাত অবধি কোন্‌খানে থাকা হল ঠাকরুনের? কি কর্ম করা হচ্ছিল?

অন্নদাসী মুহূর্তে হকচকিয়ে যায়। শেষে বলে, ভাত এনে এনে মুখের কাছে ধরি কিনা, মুখে তাই ট্যাঙস-ট্যাঙস বুলি হয়েছে। যার ভাত এনে খাওয়াই, সে মানুষটার খাওয়া শেষ না হলে চলে আসি কেমন করে?

রাধেশ্যাম বলে, সাত জন্মের ভাতার কিনা তোর, সামনে বসে আদর করে খাওয়াস। সেই শোভাটা দেখবার জন্য মরি-মরি করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পায়ের দরুনে বেশী দূর পারলাম না। ফিরে এলাম। ফিরতে হল জিরিয়ে জিরিয়ে। তার ভিতরে এই কাণ্ড।

মোটামুটি বেশ একটা কৈফিয়ত হয়ে দাঁড়াল। অন্নদাসী বিশ্বাস করেছে। রাতটা সত্যিই বেশী হয়ে গেছে, পুরুষমানুষের ক্রোধ অসঙ্গত নয়। দোষ ভরদ্বাজের, গড়িমসি করে রাত করে দিলেন। উনুন ধরিয়ে অন্নদাসী ডাকাডাকি করছে—কাজকর্ম নেই বসে রয়েছেন, তবু রান্নাঘরে আসেন না। মতলব করে কি না, কে জানে। রান্না শেষ হবার পর খেতে বসতেও অকারণ দেরি। আলা নিঝুম তখন, সবাই ঘুমুচ্ছে। গা ছমছম করছিল অন্নদাসীর। ভয় ঠিক নয়। দৈত্যের মতন অতগুলো মরদ পড়ে রয়েছে, চেঁচালে তড়াক করে লাফিয়ে উঠবে—ভয়ের কি আছে? তবু যেন কী রকম! সতর্ক নজর রেখে নিজের ভাতগুলো গবাগব গিলেছে তার পর। বাকি ভাত-তরকারী কাঁসরে তুলেই সাঁ করে বেরিয়ে পড়েছে। এসেছে বাতাসের বেগে। এসে তো এই সমস্ত এখন।

চেঁচামেচিতে নিজের রাত করে ফেরাটা পাড়ার মধ্যে বেশী চাউর হবে। অন্নদাসী চেঁচাল না। ভাত টিপে টিপে তুলুকে খাওয়াচ্ছে। এর মধ্যে একবার ছড়া কেটে উঠল:

> একগুণ ব্যাম্বোনের তিনগুণ ঝাল,
> নির্গুণ পুরুষের বচন সার।

এই সামান্য কথায় রাধেশ্যামের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ার কথা নয়। শুয়ে পড়ে সে পাশ ফিরল। পাশ ফিরতে নজর পড়ল, খাড়া-ভাত পড়ে আছে, ভাতের দু-পাশে

তরকারি দু-খানা। গগনের আলার মুড়ি-ফুলুরি অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে। ভাত দেখে রাগের নিবৃত্তি করে সে উঠে বসে। দাওয়ায় নিয়ে গিয়ে তুষ্টুর মুখ ধোয়াচ্ছিল অন্নদাসী। ভিতরে এসে বউ চোখ পিটপিট করে দেখে। ছেলে শোয়াতে শোয়াতে পুলিন্দ মধুর এক মন্তব্য ছাড়ে: অন্নদাসীর পুরুষ অন্নদাস।

সেই রাত্রেই। আরও অনেকক্ষণ কেটে গেছে। বেড়ার গায়ে আস্তে আস্তে টোকা দেয় কে যেন। দু-বার এক সঙ্গে। একটুখানি থেমে রইল। আবার। রাধেশ্যাম একবার ঘুমালে তারপর ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে গেলেও বোধ হয় জাগবে না! অন্নদাসীর ঠিক উল্টো, গাছের পাতাটি পড়লে অমনি চোখ মেলে উঠে বসবে। উঠে পড়ে সে বাইরে চলে এল।

কে র‍্যা? কোন্ ড্যাকরা, হাড়হাবাতে?

ফিসফিস করে ভরদ্বাজ বলছে, আমি রে আমি। একটা দরকারে পড়ে এলাম।

রাত্রিটা সুমুখ-আঁধারি। এতক্ষণে চাঁদ দেখা দিচ্ছে আকাশে। বাবলা তলায় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে একেবারে সেঁটে গোপাল ভরদ্বাজ দাঁড়িয়ে আছেন।

অন্ন বলে, আপনি যে পালকি ছাড়া চলেন না ঠাকুরমশায়। পায়ে মাটি ফোটে। পায়ে হেঁটে কষ্ট করে এসেছেন, বলে ফেলুন দরকারটা।

রাধেশ্যাম আছে কেমন?

বড্ড ভালবাসেন মানুষটাকে! আমার সঙ্গে মোটেই তো দেখাসাক্ষাৎ হয় না, রাত-দুপুরে খবর নিতে তাই ঘর-কানাচে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বলতে বলতে অন্নদাসী ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, মানুষটা এমনি ভাল। ভস-ভস করে ঘুমুচ্ছে। জাগলে কিন্তু কুম্ভকর্ণ।

ভরদ্বাজ সকাতরে বলেন, তোর যেমন মতি হয় রে অন্ন—আমি কিছু বলতে যাব না। কাঠ-কাঠ উপোস দিচ্ছিলি, আমায় কিছু বলতে যাস নি। কানে শুনেই আমি মানুষ দিয়ে চাল পাঠিয়ে দিলাম। এই বাজারে ফেলে ছড়িয়ে নিজে তুই ভরপেট খাচ্ছিস, যতগুলো খাস তার দেড়া বাড়ি নিয়ে আসিস। চাল এত দিস যে হাঁড়ি উপচে পড়ে যায়। বিনা ওজরআপত্তিতে আমি রেঁধেবেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। বলু, সত্যি কি না।

অন্ন বলে, আপনার বড্ড দয়া ঠাকুরমশায়।

দয়া শুধু একতরফে হলে তো হবে না! বিবেচনা করে দেখ। ব্রাহ্মণসন্তান—বউ-ছেলেপুলে ছেড়ে পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নোনাজল খেয়ে পড়ে আছি। আমিই কেবল সকলের দেখব—আমার মুখপানে কেউ তাকিয়ে দেখবে না?

অন্নদাসী বলে, সরে পড়ুন ঠাকুরমশায়। ঐ যা বললাম—আমাদের মানুষটা এমনি ভাল, কিন্তু বড্ড সন্দেহের বাতিক, আমি রাত করে আসি বলে আপনাকে জড়িয়ে আজকেই নানান কথা হচ্ছিল। উঠে এসে আমাদের দু-জনকে একসঙ্গে যদি দেখতে পায়, বন কাটা হেসো নিয়ে দু-জনের মুণ্ডু দুটো কণ্ঠ থেকে নামিয়ে নেবে। উঃ, পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, এত সাহস ভাল নয়।

পাড়ায় হবে না, আলার মধ্যে নয়, তা কোন্ দিকে যাব সেটা তো বলে দিবি—

অন্নদাসী দ্রুতপায়ে ঘরে চলে যাচ্ছে।

ভরদ্বাজ অধীর হয়ে বলেন, আহা, বলে যা একটা কথা। কষ্ট করে এন্দূর থেকে এসেছি।

অন্নদাসী বলে, মাছ-মারালোক ফিরছে ঐ। গেঁয়োবনের ভিতর ঢুকে যান শিগগির। নয় তো দেখে ফেলবে।

গোপাল ভরদ্বাজ সন্ত্রস্ত হয়ে বাঁধের দিকে তাকান। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় অনেক দূর অবধি নজরে আসছে। কই, মানুষ কোথা? হয়তো এই সময়টা মানুষ বাঁধের নিচে নেমে পড়েছে। বাবুদের খাস-কর্মচারী সদর ফুলতলা থেকে আসছেন—চিনে ফেললে নানান কথা উঠবে। ফুড়ুৎ করে জঙ্গলের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। সাপ-খোপ থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু উপায় কি?

অন্নদাসী তখন ঘরে ঢুকে পড়েছে।

আঠাশ

শীত পড়ি-পড়ি করছে। সুসময় এখন মানুষের। ক্ষেতে ধান পাকে। গাই বিয়োয় ঘরে ঘরে। নতুন-গুড় ডালকলাই রকমারি তরিতরকারি পাইকারেরা দূর-দূরান্তর থেকে নিয়ে এসে কুমিরমারির হাটে নামায়। কাঠুরে আর বাউলেরা দলে দলে জঙ্গলে ঢুকে বোঝাই কিস্তি নিয়ে ফেরে। মাল ছাড় করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রমারম খরচ করে দু-হাতে। ভারী জমজমাট হাট এই সময়টা।

হাটের মধ্যে ঘুরছে জগা, কিনছে এটা-ওটা। হঠাৎ তৈলক্ষের সঙ্গে দেখা। বয়ার-খোলার সেই তৈলক্ষ। বলে, তোমার খোঁজাখুঁজি করছি জগন্নাথ। কোন্ বনবাসে গিয়ে রয়েছ, কেউ সঠিক বলতে পারে না। যাত্রার দল খুলছি, মনের মত বিবেক জোটানো যাচ্ছে না। কী গাঙে গাঙে বোঠে বেয়ে মরছ! চলে এস। এইসা গলা তোমার—গেরুয়া আলখাল্লা পরে বিবেক হয়ে আসরের উপর দাঁড়ালে ধন্যি-ধন্যি পড়ে যাবে।

জগার হঠাৎ জবাব জোগায় না। পুরানো দিন মনে পড়ে। বাপ মা-মরা ছেলে গানের নেশায় বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে। কচি-কচি চেহারা তখন, রাধা সাজত। আসর ভাঙবার পর একবার এক গৃহস্থবাড়ির বউ তাকে দোতলার উপর ডেকে নিয়ে পায়েস খাইয়েছিল। তারপর নতুন পালা খুলল দলে—অভিমন্যু বধ। উত্তরার পাট দিল জগাকে। অভিমন্যু সমরে যাচ্ছে, সেই সময়টা পতির হাত ধরে ফেলে গান:

যেও না যেও না নাথ করি নিবেদন
দাসীরে বধিয়া যাও বিচার এ কেমন—

অভিমন্যুর হাত ছেড়ে দিয়ে তারপরে উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম চতুর্দিকে ফিরে ফিরে গানের একটি মাত্র কলি কেঁদে কেঁদে গাওয়া: ও তুমি যেও না যেও না, ও তুমি যেও না যেও না··· । আসরের মধ্যে সেই সময় একটা সূচ ফেলে দিয়ে বোধকরি শব্দ পাওয়া যেত।

তৈলক্ষ বলে, তাই বলছিলাম। চল জগা আমাদের বয়ারখোলায়। কায়েমী হয়ে না থাকতে চাও, একজন বিবেক তৈরি করে দিয়ে তারপর তুমি চলে এস। আটকে রাখব না। দুবেলা দু নম্বর ষোলআনা সিধে, তেল-তামাক আর নগদ পনের টাকা। গায়ে ফুঁ দিয়ে এমন রোজগার দুনিয়ার মধ্যে কোনখানে হবে না।

জগা এর মধ্যে সামলে নিয়ে বলে, ক্ষেপেছ? সকলে মিলে ঘেরি বানালাম। অজাঙ্গি বনে মানমেলা হচ্ছে। আগে জন্তু-জানোয়ার চরেফিরে বেড়াত, এখন মানুষ। যতই হোক, নিজের কোট—জোর কত ওখানে আমার! আপন কোট ছেড়ে কোনও জায়গায় যাচ্ছি নে। একদিন গিয়ে তোমার দল কেমন হল, দেখে আসতে পারি।

ফেরার পথে ডিঙির উপর বসে ঐ যাত্রাদলের কথা হচ্ছে। বলাই বলে, বড্ড গান-পাগলা তুই। একটু যেন মন পড়ে গেছে।

জগা বলে, দূর! তার জন্যে বয়ারখোলা যেতে যাব কেন? যা-কিছু হবে আমাদের সাঁইতলায়। আরও কিছু মানুষ জমুক—দল এইখানে গড়ব। তৈলক্ষকে বললাম, নেহাত যদি দায় ঠেকে যায় তো এক দিন দু-দিন থেকে তালিম দিয়ে আসতে পারি। তার বেশী হবে না।

সাঁইতলার ঘাটে ডিঙি লাগল। ডিঙিতে কখনোসখনো শোওয়ার প্রয়োজন হয়, ছইয়ের নিচে সেজন্য একটা মাদুর গোটানো থাকে। কাঁধে সেই মাদুর এবং হাতে পোঁটলা পচা তরতর করে নেমে পড়ে।

জগা দেখল পাছ-গলুই থেকেঃ মাদুর নিয়ে চললি কোথা রে? নৌকোর মাদুর?

ও, তাই তো! এতক্ষণে যেন হুঁশ হল পচার। মাদুর যেন হেঁটে গিয়ে তার কাঁধে উঠে পড়েছে। বেকুবির হাসি হেসে মাদুর নামিয়ে বাঁধের উপরে পচা দাঁড় করাল। আঁটি-বাঁধা ঝাঁটার শলা ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে। আড়াল করে বস্তুটা বের করে নেবার মতলব ছিল, কিন্তু জগার নজরে পড়ে যায়।

উঁ, এই তোর কাণ্ড! যা মানা করলাম, তাই। ঝাঁটা কিনে তাই আবার মাদুরে জড়িয়ে রেখেছে, যাতে আমার নজর না পড়ে।

সে যা-ই হোক, আপাতত পচা নিরাপদ। মুখ ফিরিয়ে আলার দূরত্বটা দেখেও নেয় একবার বুঝি। তাড়া করলে ছুটবে।

জগা বলে, আমরা হাটে ঘুরছি, সেই ফাঁকে তুই চারুবালার কেনাকাটা করছিলি। আমায় লুকিয়ে চুরিয়ে আমারই নৌকোয় তার সওদা নিয়ে এলি।

বলাই বলে, কী করবে! তুমি ভয় দেখালে, ধাক্কা মেরে গাঙে ফেলে দেবে। সামনাসামনি পারে না বলেই গোপন করে।

নির্লজ্জ পচা দু-পাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলে, আমায় জলে ফেললে ক্ষতি নেই। কুমিরে কামটে না খায় তো সাঁতরে ঠিক ডাঙায় উঠে যাব। ঝাঁটা ফেললে মুশকিল। সারা হাট খুঁজেপেতে এই কটা নারকেলের শলা পাওয়া গেল। ফেলে দিলে আবার কোথায় পেতাম?

জগা বলে, ঐ ঝাঁটা তোর পিঠের উপর দেয় ঝেড়ে! কালীতলায় সেদিন আমি পাঁচ পয়সার ভোগ দিয়ে আসব। আছে তাই তোর অদৃষ্টে। কামরূপের কথা বলছিলি বলাই, আমাদের সাঁইতলাতেও ভেড়া বানিয়ে ফেলছে। মেয়েমানষের ভেড়া দেখ ঐ একটা। ঐ পচা।

পচা দৃকপাত করে না। কাঁধে ঝাঁটার আঁটি, হাতে পোঁটলা—চারুর হাতা-খুন্তি সম্ভবত পোঁটলার মধ্যে—বীরদর্পে সে আলার অভিমুখে চলল।

অনতিপরে জগাদের ঘরের সামনে পচা এসে ডাকে, বলাই!

হাটের ঘোরাঘুরিতে ক্ষিদে আজ প্রচণ্ড। রাতও হয়ে গেছে। উনুন ধরিয়ে বলাই ভাত চাপিয়ে দিয়েছে।

জগা বলে, পথে দাঁড়িয়ে কেন রে? ঘরে উঠে আয়!

পচা বলে, না, তুমি গাল দেবে।

ডাকিনী গুণ করেছে, মরণদশা ধরেছে তোর। গাল দিয়ে আর কি করব? বোস ঘরে এসে।

পচা ঘরের ভিতরে এল, বসল না। বলে, খোল বাজাবার মানুষ নেই। একবারটি চলে আয় বলাই। বিনি খোলে নামগান খোলতাই হয় না।

জগা বলে, কাল গিয়েছিল খেয়ালখুশি মত, তা বলে রোজ রোজ যেতে যাবে কেন? তুই দাসখত দিয়েছিস, তুই পা চেটে বেড়া ওদের—অন্য মানুষ ডাকিস নে।

বউঠাকরুন বলে পাঠালেন, গৃহস্থর একটা ভাল-মন্দ আছে। বাদা জায়গা—শুধু কেবল জন্তু-জানোয়ার নয়, কত লোক এসে বেঘোরে মারা পড়ে, তাঁরাও সব রয়েছেন। ঠাকুরের নামে দোষদৃষ্টি ছেড়ে যায়। তাই বললেন, আরম্ভ হয়েছে যখন, কামাই দেওয়া ঠিক হবে না। রাত হয়ে গেছে বলে আজ না হয় কম করে হবে।

বলাই বলে, আজকে বরং তুই একবার যা জগা। শুনিয়ে আয় বাজনা কাকে বলে। আমার ঐ হাত থাবড়ানোয় ওদের মুখে সুখ্যাতি ধরে না। তোর বাজনা শুনলে দশা পেয়ে পটাপট সব উপুড় হয়ে পড়বে।

জগা বলে, বয়ে গেছে। সুখের আলা বাঁধলাম সকলে মিলে, আলার মটকায় বাজ পড়ল। বজ্জাতগুলো উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

পচা রাগ করে বলে, বাজ পড়েছে না আরো-কিছু! চোখে দেখে এস গিয়ে। ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়, পরের মুখে ঝাল খাবে কেন? দোমুখো বলাইটা—ওখানে গিয়ে ভাবে গদগদ, এখানে তোমার কাছে ফিরে এসে কুচ্ছো করে। এসেছে মেয়েরা দুটো-তিনটে দিন, শ্রী-ছাঁদ এর মধ্যে একেবারে আলাদা। তকতকে ঘর-উঠোন—কোনখানে একরত্তি ধুলোময়লা থাকতে দেয় না। ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেছিল, সেই উঠোন লেপেপুঁছে কী করে ফেলেছে—সিঁদুরটুকু পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। পানের পিক পোড়া-বিড়ি আগে তো যেখানে-সেখানে ফেলতাম, এখন মালসা পেতে দিয়েছে, যা-কিছু ফেলবে মালসার ভিতরে।

জগা বলে, বলছি তো তাই। বিড়ি খাব না, পানের পিক ফেলব না, হাসিমস্করা করব না, চোখ বুজে খালি হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেরাম করব—সে কাজ আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

বলাইকে বলে, মেয়েমানুষের সামনে গিয়ে তুই গদগদ হোস, আমার সামনে কেন আর ভালমানুষ সাজিস? চলে যা এখান থেকে, খোল কোলে নিয়ে আলায় বোসগে।

অগত্যা বলাই উঠল। যাবার মুখে পচা একবার বলে, তুমিও গেলে পারতে জগা। দেখেশুনে ভাল লাগত।

জগা কালোমুখ করে বলে, চেপে এসে বসেছে সহজে নড়বে না, বুঝতে পারছি। একে একে সকলকে নিয়ে নিচ্ছে। যাবই তো বটে। গিয়ে পড়ব একদিন। ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়ে আসব।

ঐ একটা দিনেই বলাইর চক্ষুলজ্জা ভেঙেছে। ডিঙি ঘাটে বাঁধা হলে সে সোজা গিয়ে ওঠে আলায়। জগা একলা পাড়ার মধ্যে চালা ঘরে চলে যায়। পচা সেদিন বার কয়েক তাকে বলে দায় সেরে গেল। এক সঙ্গে তো ঘোরাফেরা—ইতিমধ্যে জগার মত পালটাল কি না, একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করার পিত্যেশ নেই। আনাড়ী লোকগুলোর আসরে বলাই খোল বাজিয়ে মস্ত বায়েন হয়েছে। বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা। সেই দেমাকে মত্ত হয়ে আছে। জগন্নাথকে নিয়ে যাওয়ার কী গরজ আর এখন! সে হাজির হলে বরঞ্চ পশার হানি ওদের।

নামগান আগে মিনমিন করে হচ্ছিল, গানের ভিতরে হুঙ্কার ক্রমশ ফুটে উঠছে। অর্থাৎ দল ভারী হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং গানের সম্পর্কে ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেছে।

গানের পরে এক-একদিন খারখার হরিধ্বনি। হরির লুঠ—হরিধ্বনির পর উঠানে বাতাসা ছড়িয়ে দেয়, কাড়াকাড়ি করে লোকে বাতাসা কুড়ায়। বলাই কখনো বাতাসা হাতে ঘরে ফিরে বলে, নাও জগা, প্রসাদ নাও।

বাদাবনে বসত, বড়-মেজ-ছোট কোন দেবতাকে চটানো চলে না। হাত পেতে একখানা বাতাসা নিয়ে—একটু গঁড়ো মাথায় দিয়ে এক কণিকা জিভে ঠেকিয়ে বাতাসা-খানা জগা ফিরিয়ে দিল।

মজা দিনকে-দিন বেড়েই চলেছে। আলা থেকে ঘরে ফিরতে বলাইর ইদানীং রাত দুপুর। নামগানের পর গুপগুজব চলে বোধ হয়। রান্না শেষ করে জগা বসে থাকে, আর গর্জায় মনে মনে। তাদের গড়ে-তোলা সহিতলা ঘেরিতে একঘরে করেছে তাকে সকলে। এমন কি বলাই অবধি। সকল গোলমালের মূলে চারুবালা। সর্বনেশে মেয়ে রে বাবা! হনুমানের লেজের আগুন—লঙ্কাকাণ্ড করে সমস্ত ছারখার করবে।

শেষটা একদিন জগা রাগ করে বলে, ভক্ত হয়ে পড়েছিস—উঁ? ঠাকুরের নামে তো রাত কাবার করে ফিরিস। কাঁহাতক বসে আমি ভাত পাহারা দিই? এবার থেকে আমি খেয়ে নেব।

বলাই সঙ্গে সঙ্গে হাত দুখানা ধরে বলে, তাই করবি। খেয়ে নিয়ে তুই শুয়ে পড়িস। নয় তো আমার মরা মুখ দেখবি জগা। হাঁড়িতে ভাত রেখে দিস। নিয়েথুয়ে আমি খাব।

নতুন ব্যবস্থায় ভাল হল বলাইর। জগা না খেয়ে আছে, আগে তাই তাড়াতাড়ি ফেরার চাড় ছিল একটা। এখন নির্ভাবনা। জগা ঘুমিয়ে থাকে। খুটখাট আওয়াজ হল একটু ভেজানো ঝাঁপ খোলার। ভিতরে এসে কপকপ করে ভাত খাচ্ছে। বাইরে গিয়ে জল ঢেলে আঁচিয়ে এল। ঘুমের মধ্যে এই সমস্ত জগা স্বপ্নের মতন টের পায়। সমস্ত দিনমানটা গাঙে খালে আর কুমিরমারির গঞ্জে কেটে যায়। বড়দাকে জাঁপিয়েজাপিয়ে এই বাদা এলাকায় নিয়ে এল—সেই বড়দার পক্ষেও কি উচিত নয়, রাত্রে জগার ঘরে একটিবার এসে খোঁজখবর নেওয়া! উত্তর অঞ্চল থেকে বড়দার আপনজনেরা এসে মিলেছে—আমে-দুধে মিশেছে, আঁটির কী গরজ আর এখন?

শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছতে মুছতে মাছের ডিঙি নিয়ে কুমিরমারি ছুটুক, এ ছাড়া জগাকে নিয়ে অন্য দরকার নেই।

সেদিন ঘাটে ফিরে ডিঙি বাঁধতে বাঁধতে জগা ওয়াক ওয়াক করে। বমি করে ফেলবে এমনি ভাব। দ্রুত বাঁধে উঠতে উঠতে জগা পিছন ঘুরে তাকায়।

ঐ যে ওল-চিংড়ি খাওয়াল গদা ঠাকুর, ক-দিনের পচা চিংড়ি, আর কী রকমের ওল কে জানে! পেটের মধ্যে সেই থেকে পাক দিচ্ছে।

বলাই বলে, ওল-চিংড়ি আমিও তো খেলাম।

বলেই তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে নেয়। অবিশ্বাস করা হচ্ছে, ক্ষেপে উঠবে জগা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলাই বলে, গুচ্ছের খেতে গেলি কি জন্যে? আমি ডাল দিয়ে খেয়েছি, ওল খেতে পারি নে, ওলের নাম শুনলেই আমার গাল ধরে। ওক টানিস নে অমন করে, গলায় নলি ছিঁড়ে যাবে। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় এক্ষুনি।

আজকে যাস নে তুই বলাই। আমি রাঁধতে পারব না এই অবস্থায়।

বলাই বলে, রান্না আবার কি! তোর খাওয়াদাওয়া নেই। একলা আমি। গদাধরের

খাওয়ানোর চোটে তোর ঐ অবস্থা ; আমারও গলায় গলায় হচ্ছে। চাট্টি মুড়ি-চি'ড়ে চিবিয়েও থাকতে পারি। চি'ড়ে-মুড়ি আমাদের ঘরে না থাক, বড়দার ওখানে আছে। মুখের কথা মুখে থাকতে চি'ড়ে ভিজিয়ে দুধ-বাতাসা দিয়ে বাটি ভরে এনে দেবে।

জগা আগুন হয়ে বলে, খাওয়াটাই ভাবলি শুধু, আমার দশা দেখছিস নে। বমি করতে করতে মরে যাচ্ছি—

বলাই বলে, আমি যেতাম না জগা। মাইরি বলছি। যাওয়া যায় না একলা মানুষ হেন অবস্থায় ফেলে। কিন্তু না গেলে ঠাকুরের নাম বন্ধ। যাব আর চলে আসব। রীতরক্ষে করে আসি। রোজ নিয়ম মত রক্ষে করে এসে মাঝখানে একদিন বন্ধ করা যায় না। কোন ভয় নেই, শুয়ে পড়গে জগা। ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি তো, তিনিই ভাল করে দেবেন।

বুঝিয়েসুঝিয়ে বলাই যথারীতি আলামুখো হাঁটল। ছাই হয়েছে জগার, অসুখের ভান করে বলাইটাকে পরখ করে দেখল। পরীক্ষার ফল দেখে ঝিম হয়ে গেছে। অভ্যাস বশে তামাক সেজে নিয়েছে, কিন্তু টানবার মেজাজ নেই। কলকে নিভে গেল না টানার দরুন। ঠকাস করে কলকে মেজের উপরে উপুড় করল। বাদা অঞ্চলে বড় বড় গুণীন আছে—মন্তোর পড়ে আঁকচোখ কেটে বাঘবন্ধন করে। কিন্তু মেয়ে-জাত যেন সকলের বাড়া গুণীন—মন্তোর পড়ে না, আঁকচোখ কাটে না, এমনি-এমনি মায়া করে ফেলে।

আসি বলে বলাই সেই চলে গেল। নামগানও আজ তাড়াতাড়ি সমাধা হয়ে গেছে, শব্দসাড়া বন্ধ। তবু ফিরছে না কেন ? কী করছে না জানি নিঃশব্দ আলার ভিতর বসে বসে ! পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে—জগা বলেছিল। ঠিক উল্টো, ক্ষিধের পেটের নাড়ি চনমন করছে। সে ভাত রে'ধে রাখে, রাতদুপুর অবধি প্রাণ ভরে আড্ডা দিয়ে এসে রাঁধা ভাত ফয়তা দেয়। রোজ রোজ কেন তা হবে ?—আড্ডা কামাই দিয়ে বলাই আজকে রাঁধাবাড়া করুক, এই সমস্ত ভেবে বলেছিল অসুখের কথা।

রাত বাড়ছে। পিছনের বনে রাত্রিচর কোন পাখির দল হুটোপাটি লাগিয়েছে, ঝপাস-ঝপাস করে ডালের উপর পড়ছে। দুত্তোর, কত আর দেরি করব!—উনুন ধরিয়ে জগা ভাত চাপিয়ে দিল। ভাত আর ঝিঙে-ভাতে। ন্যাকড়ায় বে'ধে চাট্টি ডালও ছেড়ে দিল ওর ভিতরে। ভাত ঢেলে নিয়ে খেতে বসল, বলাইয়ের নিশানা নেই। মরেছে নাকি ? অসুখ জেনে গেছে, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার কথা—তা দেখি অন্য দিনের চেয়ে বেশী দেরি আজকে! তাই দেখা গেল—জগা যদি সত্যি সত্যি মরে যায়, তিলেকের তরে ওদের আড্ডা বন্ধ হবে না। গ্রাসে গ্রাসে খেয়ে নিচ্ছে, বলাই আসার আগেই খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়বে। রাত্রের মধ্যে কথা বলবে না, সকালবেলাও না—এক ডিঙিতে যাবে, তবু মুখ তুলে তাকাবে না তার দিকে।

খাওয়া শেষ হব-হব হঠাৎ শাঁখের আওয়াজ। ঘোর জঙ্গলের ভিতরেও অবশ্য শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। এ রকম রাতদুপুরে নয়, ভর সন্ধ্যাবেলা। বাদার নৌকোয় মাঝিমাল্লারা গৃহস্থর রীতকর্ম করে ঃ গাঁয়ে-ঘরে দায়ে-বেদায়ে নিয়মের তবু ব্যত্যয় আছে, কিন্তু বনবিবি-দক্ষিণরায়ের এলাকায় নীতিনিয়ম মেনে ষোলআনা শুদ্ধচারে থাকতে হয়—মা এবং বাবা কোপের কোন কারণ যাতে খু'জে না পান। কিন্তু মেছো-ঘেরির আলার মধ্যে শঙ্খধ্বনি—হেন কাণ্ড কে কবে শুনেছে ? মেয়েমানুষ এসে পড়ে ক'টা দিনের মধ্যে মানবেলার গাঁ-ঘর বানিয়ে তুলল।

শাঁখ বাজিয়ে নতুন কি পুজোআচ্চার শুরু এই রাত্রে। চুলোয় যাকগে। বলাইর

যে ভাত রেঁধেছিল, জগা সেগুলো পগারের জলে ফেলে দিয়ে এল। আছে, থাক ওখানে। ভাত রাঁধার চাকর-নফর কে রয়েছে, খাবে তো ফিরে এসে কষ্ট করে রেঁধে-বেড়ে খাক।

ভাত ফেলে এসে জগা শুয়ে পড়ে। শাঁখ বাজছে, আর উলুও সেই সঙ্গে। উলু দেবার মানুষও জুটেছে। উলু-উলু, উলু-উলু—দীর্ঘ তীক্ষ্ম কণ্ঠ জলের উপরে জঙ্গলের ভিতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিষম জাঁক আজকে যে আলার, রাত কাবার করে ছাড়বে। আবার উঠে পড়ল জগা। উনুনে জল ঢালল, রান্নার কাঠ যা আছে জল ঢেলে আচ্ছা করে ভিজিয়ে দিল। রাঁধবে তো বন থেকে শুকনো কাঠ ভেঙে নিয়ে এস বাদুমণি। ভিজে উনুন ধরানো যাবে না, ডেলা সাজিয়ে তার উপরে হাঁড়ি রেখে রাঁধতে হবে। এতখানি অধ্যবসায় থাকে তো পেটে পড়বে ভাত। নইলে উপোস।

শুয়ে পড়ে ভাবছে এই সব। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে জ্যোৎস্না। বাঁধের উপরে মানুষজন কলরব করতে করতে যাচ্ছে, এতক্ষণে বোধকরি মচ্ছবে ইতি পড়ল। ঘাড় তুলে জগা তাকিয়ে দেখে। পাড়া ঝেঁটিয়ে গিয়েছিল আলায়। জালে বেরুবে আজ কখন—আলার স্ফূর্তিতে কালকের দিন অবধি পেটে ভর থাকবে তো?

বলাই ফিরছে। আরে, সর্বনাশ, মেয়েটাকে গেঁথে নিয়ে এসেছে যে!

ও লোকটা, তুমি গেলে না কেন? লক্ষ্মীপুজো হল, সবাই গিয়েছিল। ওঠ, মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ হাত পেতে নাও।

বয়ে গেছে শত্রুর কাছ থেকে হাত পেতে প্রসাদ নিতে! জগা তো ঘুমিয়ে আছে। ঘোরতর ঘুম। বলাই তাড়াতাড়ি বলে, অসুখ করেছে। তা তুমি রেখে দাও প্রসাদ। পাত্তরটা কাল দিয়ে আসব।

ঘুম থেকে জগাকে ডেকে তুলতে চায় না বলাই। সন্ত্রস্ত। জগা যেন দৈত্যদানো বিশেষ, উঠেই অমনি তোলপাড় লাগিয়ে দেবে চারুবালার সঙ্গে।

চোখ বুজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জগা সব দেখতে পাচ্ছে। পিতলের রেকাবিতে পুজোর প্রসাদ রেখে চারুবালা ফিরে চলল। পিছনে পিছনে বলাই আলা অবধি এগিয়ে দিচ্ছে। তা বেশ হয়েছে। বলাই আবার যখন পাড়ায় ফিরবে, তাকে এগুতে আসবে না চারুবালা? এবং তারপরে চারুবালা? এবং তারপরে চারুবালা যখন ফিরবে? চলুক না সারারাত্রি ধরে এই টানাপোড়েন!

বলাই ফিরে এসে এক ঘটি জল ছড়ছড় করে পায়ে ঢেলে জগার পাশে একটা চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ভাত রান্না আছে কি না, দেখে না একবার তাকিয়ে। ভাতের গরজও নেই তার। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ে বুঝি।

তখন জগাকেই কথা বলতে হয়ঃ শাঁখ পেল কোথা রে?

জুটিয়ে নিয়েছে। কালীতলায় এক কাঠুরে নৌকো বেঁধে মানসিক শোধ দিচ্ছিল। শাঁখের ফুঁ শুনে চারুবালা গিয়ে পড়েছে। অনেক বলেকয়ে কিছু দাম ধরে দিয়ে শাঁখটা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিল। মানবেলায় গিয়ে তারা আবার কিনে নেবে। শাঁক জুটে গেল—তখন ঝোঁক হল, গেরস্তঘরে লক্ষ্মীপুজো করলে তো হয়। দিনটাও আজ বিষ্যুৎবার। এবার থেকে ফী হপ্তায় হপ্তায় এমনি পুজো করবে।

জগা বলে, শাঁখ হল, ফুল-নৈবিদ্যিও না হয় জুটিয়েছে। কিন্তু বামুন নইলে পুজো হয় না—বামুন পেল কোথা রে? তুই গলায় জালের সুতো ঝুলিয়ে পৈতে

করে নিলি নাকি ?

বলাই বলে, লক্ষ্মীপুজো শিবপুজো বিনি বামুনে দোষ নেই। হপ্তায় হপ্তায় বামুন মিলবেই বা কোথা ? পয়লা দিন আজকে কিন্তু বামুনের হাত দিয়েই ফুল ফেলেছে।

হেসে উঠে বলে, জাত-বামুন রে ভাই। একেবারে জাত-গোখরো। চারুবালা খবর রাখে সব, ওর সঙ্গে চালাকি চলে না। বলে, কাছেপিঠে তো বামুন রয়েছে—চৌধুরিগঞ্জের গোপাল ভরদ্বাজ। বলে-কয়ে তাঁকে নিয়ে এস তোমরা। সে কী কম হাঙ্গামা! প্রথমটা রাজী হয়ে শেষে বিগড়ে গেল ঃ জরুরী কাজ আছে—ভেড়ির একটা ব্যাপার ; এক পা নড়তে পারব না এখন আলা ছেড়ে। পচা দুই পা জড়িয়ে একেবারে ঠুঁশ হয়ে পড়ল তো তখন অন্য এক ছুতো ঃ বলি নৈকষ্যকুলীন আমি, সেটা জানিস ? কার নামে পুজোর সংকল্প হবে, কোন্ জাত কি গোত্র কিছু জানি নে। গেলেই হল অমনি ! মুখ চুন করে সবাই ফিরল। চারুবালাও তেমনি মেয়ে। বলে, আমি যাচ্ছি নিজে—গিয়ে মুখোমুখি জবাব দেব। সকলে মিলে দল হয়ে গিয়ে পড়লাম চৌধুরির আলায়। চারু বলে, ঠাকুরমশায়, জাত-জন্ম যত-কিছু মানবেলায় গিয়ে। বাঘ হরিণ সাপ শুয়োরের মধ্যে জাত-বেজাত নেই, বাদাবনে মানুষেরও নেই। বলতে পারেন, পৈতেওয়ালা খুঁজি কেন তবে ? সে আমার বউদির জন্যে, আর কপাল-গুণে আপনি রয়েছেন বলে। বউদি সমস্তটা দিন উপোসী আছে, আপনি পুজো করে এলে খুঁতখুঁতোনি গিয়ে মনের সুখে সে প্রসাদ পাবে। রাতের বেলা সেই জন্যে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি ঠাকুরমশায় ! যা তুখোড় মেয়ে—তোকে কী বলব জগা। মিষ্টি কথায় ভরদ্বাজকে একেবারে জল করে দিল। শালতি নিল না, বাঁধ ধরে পায়ে হেঁটে নতুন আলায় এসে পুজোআচ্চা করল। এরপরে ফী বিষ্যুৎবারে এসে এসে পুজো করে যাবে, কথা দিয়েছে।

জগা বলে ওঠে, কী কাণ্ড রে বাবা ! আলা তবে রইল কোথা ? আমাদের সাধের আলা ষোলআনা এখন গেরস্তবাড়ি।

জগন্নাথের উষ্মা বলাই ধরতে পারে না। পুলকিত কণ্ঠে আরও সে ফলাও করে বলে, বিস্তর ক্ষমতা ধরে মেয়েটা। অমন দেখা যায় না। এই ধর, বাদা-জায়গা—পুজোর কোন অঙ্গে তা বলে খুঁত রাখে নি। মালসার মধ্যে টিকে ধরিয়ে ধুনো দিয়েছে। সেই বরাপোতা থেকে গাঁদাফুল যোগাড় করে এনেছে। ঘর ভরে আলপনা দিয়েছে—পদ্ম আর লক্ষ্মীর পা। লক্ষ্মীঠাকরুন পা ফেলে উঠোন থেকে ঘরে উঠে বসেছেন, তারই যেন ছাপ পড়ে গেছে।

বিরক্তিতে জগার মুখে জবাব আসে না। বলাই ঘুমুতে লাগল। জগা ভাবছে। ভারী বিপদের কথা হল, ভাবতে গিয়ে দিশা পায় না। একচক্ষু হরিণের মত এতকাল শুধু একটা দিকের বিপদ ভেবে এসেছে। চৌধুরীগঞ্জের শত্রুতা। অনেক আগে থেকে জাঁকিয়ে আছেন তাঁরা—মাছের এলাকায় শাহান-শা বলা যায়। নতুন ঘেরিদারের আসার পথে কাঁটা ছড়ান। কিন্তু এটা ছিল জানা ব্যাপার—এরাও সদা-সতর্ক এই জন্য। কাঁটা যতই ছড়িয়ে দিল, খুঁটে তুলবে আর এগিয়ে যাবে। চৌধুরীদের ডরায় না, কিন্তু গাঁ-গ্রাম থেকে মেয়েছেলেরা এসে পড়ে ঘরগৃহস্থালি বানিয়ে খগনকে সকলের থেকে আলাদা মানুষ—ভদ্রমানুষ করে তুলবে, এটা কে কবে ভাবতে পেরেছে ?

ঘুম হয় না, ছটফট করছে। নানান রকম মতলবের ভাঙাগড়া। ভাবতে ভাবতে

মাথা গরম হয়ে যায়। সন্ধ্যারাত্রে মিথ্যা করে অসুখের কথা বলেছিল, রাতদুপুরে অসুখ করেছে সত্যিই। সর্বাঙ্গ জ্বলছে রাগে। রাগ মেয়েলোক দুটোর উপর। বিশেষ করে ঐ চারুবালা—সকলের বড় প্রতিপক্ষ সে-ই এখন। অনুকূল চৌধুরির চেয়েও বড়। রাগে রাগে বাইরে চলে এল। বাঁধ ধরে চলল কয়েক পা।

নতুন আলা নিস্তব্ধ। ঘুমোচ্ছে সকলে বিভোর হয়ে। জগা চোরের মতন টিপি-টিপি এগোয়। যাবে আলার উঠোন অবধি—লক্ষ্মীর পা এঁকেছে যেসব জায়গায়। পা জলে জলে মুছে দিয়ে আসবে আলপনা। রাগের খানিকটা শোধ দিয়ে তার পরে যদি ঘুম হয়।

বাঁধের উপর রাধেশ্যাম। আশ্চর্য, খোঁড়া পা দেখি পরিপূর্ণ আরাম হয়ে গেছে। হনহন করে চলেছে। খানিকটা পিছনে অন্নদাসী। অন্নদাসী হেঁটে তার সঙ্গে পারছে না।

জগাকে দেখতে পেয়ে রাধেশ্যাম বলে, ভাল হয়েছে। চল দিকি আমাদের সঙ্গে। হাতে লাঠি ? বেশ হয়েছে, নিঃসম্বলে বেরুতে নেই। বউকে বললাম, বাড়ি থাক। তা শুনল না। পুলক কত ! বাচ্চাকে সেই সন্ধ্যেবেলা সুবোধবালার কাছে দিয়ে রেখেছে। রাতদুপুরে এখন মজা দেখতে চলল।

ঊনত্রিশ

চৌধুরির ঘেরি করালীর উপরে নয়। করালী থেকে বেরিয়েছে সাঁইতলার খাল —সেই খাল আর ঘেরির বাঁধ প্রায় সমসূত্রে চলেছে। একটা জায়গায় এসে খাল থেকে এক ডাল বেরিয়ে সেই ডাল সোজা ঢুকে পড়ল ঘেরির ভিতর। বাঁধ দিয়ে তার মুখ আটকানো। বাইন গেঁয়ো ও বনঝাউয়ে আচ্ছন্ন ঐ দিকটা। চোত-বোশেখে নদীতে বান এসে পড়লে বাঁধের ওখানটা কেটে দেয়। বাঁধ কেটে ইচ্ছা মত ঘেরির খোলে নোনা জল তোলে। প্রয়োজন মিটে গেলে আবার বাঁধ বাঁধে। নোনা জলের সঙ্গে মাছের ডিম ও গুঁড়ো-মাছ উঠে আসে। তারাই বড় হয় ঘেরির ভিতরে। মাছের পোনা কেনার জন্য এক আধেলা খরচ নেই এ তল্লাটে। বর্ষাকালে ভেড়ি জলে ভর-ভরতি, জল ছাপিয়ে উঠে বাইরের সঙ্গে একাকার হওয়ার উপক্রম। মাছ তখন আটকে রাখা দায়। তখন আবার মরা-কোটালে বাঁধ কেটে খালের পথে বাড়তি জল বের করে। খুব সতর্ক হয়ে এই কাজ করতে হয়, জলের সঙ্গে মাছ না বেরুতে পারে। বাঁশের শলার পাটা বোনা থাকে, বাঁধের কাটা জায়গায় শক্ত করে বসিয়ে দেয়। জোয়ার আসবার আগেই তাড়াতাড়ি মাটি ফেলে বাঁধ মেরামত শেষ করতে হবে। নয় তো খালের জল ভিতরে ঢুকে জল ফেঁপে যাবে আবার। অনেক হাঙ্গামা। এবং একদিন একবার করেই হল না। সারা বর্ষাকাল ধরে নজর রাখতে হয়, অনেক বার এমনি কাটাকাটির প্রয়োজন পড়ে।

বাঁধের ঠিক নিচে সেই জন্য একটা চালা বানিয়ে রেখেছে। বাঁধ-কাঁটা লোকেরা বৃষ্টিবাদলার মধ্যে সেখানে আশ্রয় নেয়, কোদাল রেখে বিশ্রাম করে, তামাক-টামাক খায়। রাত্রিবেলা পড়েও থাকল বা কোনদিন। বর্ষার সময়টা ভিড় খুব, মানুষের গতায়াতে সর্বদা সরগরম, পায়ে পায়ে জঙ্গলের ভিতর পথ পড়ে যায়। অন্য সময় উঁকি মেরেও তাকায় না কেউ ওদিকে। জঙ্গল এঁটে গিয়ে পাতা-লতার মধ্যে চালাঘর অদৃশ্য হয়ে থাকে।

গগন দাসের আজ্ঞায় ভরদ্বাজকে সেদিন বড় খাতির করল। পুজোর কাজকর্ম

মিটে গেল, ভরপেট প্রসাদ পেয়েছেন, তব্ ছেড়ে দিতে চায় না। নাছোড়বান্দা চার্ বলছে, সে হবে না ঠাকুর মশায়! বউদি বলছে, দ্টো চাল ফুটিয়ে সেবা করে যেতে হবে এখান থেকে। ভিটেবাড়ি পবিত্র হবে, দোষাদিষ্টি কেটে যাবে। বউদি ছাড়বে না, আমি কি করব! ঐ দেখেন, উন্ন ধরাতে গেছে এর মধ্যে।

চার্বালা মেয়েটা হাসে বড় খাসা, আর আবদার করে। আবাদের পেত্নীগ্লোর মতন নয়। ছাড়বে না যখন, কী উপায়। আসবার সময় অন্নদাসীকে বিদায় দিয়ে এসেছেন। রাত্রে আজ ভাতের গরজ নেই, ওদের ওখানে জলটল খাওয়াবে, তাতেই ঢের হয়ে যাবে। কিন্তু গ্র্তর রকমের জলযোগের উপরে আবার এই ভাত জ্টে যাচ্ছে। হোক তবে তাই—মা-লক্ষ্মী যখন আসেন, না বলতে নেই।

ভরপেট খাওয়াদাওয়ার পর গড়াতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু না, অনেক রাত হয়েছে, দেরি করা চলবে না আর একটুও। গোপাল ভরদ্বাজ ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। সঙ্গে লোক দিতে চাচ্ছে গগন। ভরদ্বাজ ঘাড় নাড়েন: নাঃ, কী দরকার! এই তো, পে'ছে গেলাম বলে।

চার্বালা বলে, শালতিও নিয়ে এলেন না। পায়ে হে'টে একলা যাবেন ঠাকুর মশায়?

ভরদ্বাজ বলেন, শালতি আর চাপি নে এখন। কতটুকু বা রাস্তা! ফুলতলা থেকে নতুন এসেছি, জ্তো পরে পরে তুলতুলে পা, মাটির উপর বস্ত লাগত। এখন কড়া পড়ে গেছে, ম্গ্র মারলেও পায়ে সাড় হবে না। আরও ঐ অন্নদাসীকে দেখেই হয়েছে। দেখ না, সাঁইতলা থেকে কেমন রোজ দ্-বেলা ফুড়্ং-ফুড়্ং করে যাওয়া-আসা করে। সে আমায় লজ্জা দিয়েছে। মেয়েমানষে পারে তো আমি দশাসই মরদ পারব না কি জন্যে?

গদগদ হয়ে বলেন, খ্ব খেয়েদেয়ে গেলাম। প্জোআচ্চার ব্যাপারে কি অন্য রকম দায়ে-বেদায়ে যখনই দরকার হবে, আমায় ডেকো। আসব। সত্যিই তো, ব্রাহ্মণ বলতে একলা আমি তল্লাটের মধ্যে—মান টানিয়ে বসে থাকলে হবে কেন, আমারও একটা কর্তব্য আছে বই কি! ডেকো তোমরা, কোনো রকম সঙ্কোচ করো না।

হনহন করে চললেন। কয়েক পা গিয়ে ভয়-ভয় করছে। একেবারে নিষ্তি হয়ে গেছে যে! বাদাবনের দিক থেকে ভয়ানক একটা আর্তনাদ উঠল, এক রকম রাত্রিচর পাখীর ডাক ঐ রকম।

পচা থাকতে অন্য কে যাবে? পচা যেন কেনা-গোলাম। তাই বা কেন, কাজের নামে গা ঝাড়া দিয়ে যে আপনি উঠে পড়ে, কিন্তু বলতে হয় না—কেনা-গোলামে এতদ্র করে না। ভরদ্বাজের আগে আলো ধরে পচা চলল। চৌধ্রিগঞ্জের বাঁধের উপরে উঠে গেছে, অদ্রে আলা।

ভরদ্বাজ বলেন, চলে যা এবারে তুই। আর কষ্ট করতে হবে না। সোজা পথ—জলকাদা নেই, দিব্যি এইটুকু চলে যাব।

তব্ পচা খাতির করে বলে, কেন গো? পথটুকু এগিয়ে দিলে আমারই কোন্ পায়ে ব্যথা ধরবে!

ভরদ্বাজ চটে উঠলেন: আচ্ছা নেই-খুড়ে তুই তো বেটা! বলছি যেতে হবে না, জোর করে যাবি নাকি? চৌধ্রি-আলায় গিয়ে ঘাতঘোত ব্ঝে আসতে চাস? চরব্ত্তি করার মতলব?

এত বড় অভিযোগের পর পচা আর এগোয় না। রাগে গজর-গজর করতে করতে ফিরে চলল।

ভরদ্বাজ এগুলেন না আলার দিকে। চুপচাপ দাঁড়ালেন। পচা নজরের বাইরে যেতে ফিরে চললেন আবার। ডাইনে ঘুরে বাঁধ ধরে হনহন করে চলেছেন। বাঙ্কর মুখে, জঙ্গলের দিকে।

কাছাকাছি এসে বাঁধ থেকে নেমে পড়েন। রাত অন্ধকার, ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালা। বাঁধের উঁচু সোজা সড়ক ছেড়ে জঙ্গলের আঁকাবাকা পথে যেতে গা ছমছম করে। উঃ, সাহস বলিহারি অন্নদাসীর! অনেকদিন ঠালবাহানার পর শেষটা এই জায়গার কথা বলে দিয়েছে। জায়গাটা বেছেছে অবশ্য ভালই—স্বয়ং যমরাজেরও খুঁজে পাবার কথা নয়।

ভরদ্বাজকে দেখতে পেয়ে চালাঘরের ভিতরে নয়—বাইরে বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছে অন্নদাসী। হাঁ, অন্নদাসী বই কি—মানুষ ঠিক চেনা যায় না, কাপড়চোপড় জড়িয়ে আছে। নিঃসংশয় হবার জন্য ভরদ্বাজ ডাক দিলেন, কে?

অন্নদাসী হেসে গলে গলে পড়ছে: আমি গো—আমি এক পেত্নী। এত কথা-বার্তা—পোড়ারমুখো মনের মানুষ সমস্ত বিস্মরণ হয়ে গেলি?

মানিকপীরের গান হয়ে গেছে সম্প্রতি গাঙপারে বরাপোতায়। গরুর বড় রকমের রোগপীড়া হলে কিম্বা গরু নিখোঁজ হলে মানিকপীরের নামে সিন্নি মানে, পীরের মহিমা প্রচারে গানও দেয় সুবিধা হলে। এর ফলে গরু নিয়ে আর কোন ঝামেলা হয় না, মানিকপীরের সতর্ক দৃষ্টি থাকে গরুর উপর। পীরের গান থেকে বাদশারাম-দারের প্রতি প্রেয়সীর উক্তি অনেকগুলো অন্নদাসী মনে গেঁথে রেখে দিয়েছে। বলে, পীরিতের মানুষ একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেছে গো। ভাবছে পেত্নী আছে দাঁড়িয়ে।

ভরদ্বাজ বলেন, পেত্নী ছাড়া কী আর তুই! মানুষ হলে এখানে আসতে ডর লাগত। কান পেতে দেখ রে—পুরুষমানুষ হয়ে বুকের মধ্যে আমার ধড়াস-ধড়াস করছে। একলা মেয়েমানুষ এলি তুই কেমন করে বল দিকিনি।

একা কেনে আসব—

ভরদ্বাজ বলেন, কাকে নিয়ে আবার দল জোটাতে গেলি? এত রঙ্গ জানিস, এমন ঘাবড়ে দিস সময় সময়—

অন্নদাসী বলে, আসছিলাম একা একা—তা মরদ কেমনে টের পেয়েছে। সন্দ-বাতিক কি না—পিছু নিয়েছে কখন থেকে। খোঁড়া হয়ে ঘরের মধ্যে পড়ে কোঁকায়, চৌধুরিগঞ্জ থেকে তোমার হাঁড়ির ভাত এনে খাওয়াতে হয়। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি, খোঁড়া পা দিব্যি ভাল হয়ে গেছে। বলি, অত হিংসে কিসের শুনি? তোমার দয়ায় গুষ্টিসুদ্ধ পেটে খেয়ে বাঁচছি—কোন দরকারে একটু জঙ্গলে ডেকেছ, তা নিয়ে ছুটো-ছুটি অত কিসের শুনি?

রাধেশ্যাম হঠাৎ কথা বলে ওঠে। ঝোপের আড়ালে ছিল, উদয় হল যেন মায়া বলে। বলে, এসেছি তাতে কি দোষ হল? দায়ে পড়ে আসতে হয়। একা তুই আসিস কি করে? জঙ্গলের মধ্যে ধর কোন জন্তুজানোয়ার বেরিয়ে পড়ল।

রাধেশ্যামের পাশে আবার জগা। ফিকফিক করে হাসছে। জগা বলে, আমি মানা করেছিলাম, দল বেঁধে গিয়ে কাজ নেই রে তুষ্টুর মা। মেয়েমানুষ তুমিই বা কি জন্য যাবে—আমরা কেউ গিয়ে দরকারটা শুনে আসি গে। তা ভরদ্বাজ মশায়, তোমার উপরে দেখলাম টান খুব। ছেলে অন্য বাড়ি রেখে রাত্তিরবেলা হোঁচট খেতে খেতে

চলে এসেছে।

রাধেশ্যাম বলে, টান বলে টান! চৌধুরি-আলা থেকে ফিরতে এদিকে বিকেল, ওদিকে রাত দুপুর।

অন্নদাসী কিন্তু হাসে। রাধেশ্যামের মুখের নিন্দেমন্দ গায়ে মাখে না। হাসতে হাসতে বলে, তা কথাবার্তা কি আছে, বলে ফেল এবারে। এতখানি পথ আবার তো ফিরে যেতে হবে।

জগা হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল: এই রাধে, মারধোর দিবি নে—খবরদার! মানী লোক—ফুলতলা সদরের খাস-গোমস্তা, গায়ে হাত না পড়ে। সঙ্গে চাকু এনেছি—জাপটে ধর, ক্যাচ-ক্যাচ করে কান দুটো কেটে নিয়ে ছেড়ে দিই।

ভরদ্বাজ আকুল হয়ে কেঁদে বলেন, ওরে বাবা! ধর্মবাপ তোরা আমার। অন্ন আমার মা। নাক মলছি, কান মলছি—থারদিগর আর এমন কাজ হবে না।

জগা নরম হয়ে বলে, আচ্ছা, ব্রাহ্মণমানুষ যখন এমন করে বলছে—মাঝামাঝি একটা রফা হোক। দুটো কানের দরকার নেই। একটা কেটে নিয়ে যাই, একটা ঠাকুর মশায়ের থাকুক গে।

কান কাটা শেষ অবধি রদ হয়ে গেল অবশ্য। চ্যাংদোলা করে ভরদ্বাজকে চৌধুরি-আলার সামনে পুকুর-ধারে দড়ায় করে এনে ফেলল। ফেলে দিয়ে জগা আর রাধেশ্যাম সরে পড়ে। ভরদ্বাজ সেখান থেকে কাতরাচ্ছেন: ওরে কারা আছিস—তুলে নিয়ে যা আমায়। হাঁটবার জো নেই।

লোকজন এসে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

কি হয়েছে?

বলিস কেন। পুজো করতে গিয়ে এই দশা! ঠাহর করতে পারি নি, বাঁধ থেকে গড়িয়ে পগারের মধ্যে। গা-গতর আর আস্ত নেই।

দুই জোয়ানমরদ বগলের নিচে হাত দিয়ে একরকম ঝুলিয়ে ভরদ্বাজকে আলায় নিয়ে চলল। আলায় গিয়ে একটা চৌপায়ায় গড়িয়ে পড়লেন। ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, মাছের ঝোড়া সব উঠে গেছে? নৌকো ছাড়বার দেরি কত রে?

এই তো ভাটা ধরে গিয়ে জল থমথমা খেয়েছে। উল্টো টান ধরলেই ছেড়ে দেবে।

ধরে নিয়ে আমায় নৌকোর চালির উপর তুলে দে বাপসকল। ফুলতলায় গিয়ে চিকিচ্ছেপত্তোর হই গে।

নৌকোয় তুলে দিয়ে ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো নিয়ে কালোসোনা জিজ্ঞাসা করে, আবার কবে আসা হবে ঠাকুর মশায়?

আমি আসি কিম্বা অন্য যে-কেউ আসুক। ঘেরির পাশে ওই ছুঁচোর পত্তন করালীর জলে না ভাসিয়ে আর কাজ নেই। পৈতে ছুঁয়ে এই দিব্যি করে যাচ্ছি।

ত্রিশ

কুমিরমারি থেকে মাছের ডিঙি সেদিন সকাল সকাল ফিরেছে। কিন্তু হলে কি হবে—বলাইকে চালাঘরে পাওয়া যাবে না। সকাল সকাল হোক আর দেরিই হোক, ডিঙি থেকে মাটিতে পা দিয়েই চলে যাবে সে গগন দাসের আলায়। আলা আর কি জন্যে বলা, আলয় এখন পুরোপুরি। আলায় কাজকর্ম গিয়ে আড়ম্বর সেখানে। ওদের আমোদস্ফূর্তি হৈ-হল্লা—আর জগা দেখ কথার দোসর পায় না একলাটি এই ঘরের মধ্যে।

পায়ে পায়ে সে রাধেশ্যামের বাড়ি চলে গেল :

আছ কেমন রাধে ?

আলার দিক থেকে একটু ঝাঁঝ খোলের আওয়াজ আসছিল, রাধেশ্যাম উৎকীর্ণ হয়ে ছিল সেদিকে। জগন্নাথের গলা শুনে চকিতে ফিরে তাকিয়ে আঃ-ওঃ—করতে লাগল। তারই মধ্যে টেনে টেনে বলে, ভাল নয় গো জগা ভাই। সেই একদিন ছুটো-ছুটি করে রাগের বশে ব্রাহ্মণ নির্যাতন করে পায়ের দরদ বড্ড বেড়ে গেছে। তার উপরে বউ জবরদস্তি করে দুটো দিন আবার জাল ঘাড়ে দিয়ে পাঠালে।

ব্রাহ্মণ না কাঁচকলা! পৈতের বামুন হয় না। একটা শত্রু নিপাত হল, আর একটা ঘাড়ের উপর চেপে রয়েছে। এরা কবে বিদায় হবে—কালীতলায় ঢাক-ঢোলে পুজো দিয়ে মানত শোধ করে আসব।

রাধেশ্যাম ঘাড় নাড়ে : না জগা ভাই, মিছামিছি রাগ তোমার চারুবালার উপর। সকলে যায়, তুমি তো একটা দিন গেলে না। গিয়ে আগে নিজের চোখে দেখ—

জগা বলে, যা শুনছি তাতেই আক্কেল-গুড়ুম। দেখবার আর সাধ থাকে না। থুতু ফেলবার উপায় নেই, থুতু নাকি গিলে ফেলতে হবে। বিড়ি খেয়ে গোড়াটুকু হাতের মুঠোয় ধরে বসে থাক, নয় তো উঠে ফেলে দিয়ে এস সেই বাঁধের উপর গিয়ে। জোরে হাসবে না, কথাবার্তা হিসেব করে বলবে। পাড়ার যত মরদ, সব ভেড়া হয়ে গেছে। ছুঁড়ী কামরায় বসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শাসন করে। যেমনটা বলবে ঠিক তেমনি করতে হবে।

রাধেশ্যাম হেসে উঠে বলে, পরের মুখে ঝাল খেয়েছ তুমি। চোখে দেখে তারপরে যা বলবার বলো। পচা-মাছের গন্ধ আর নাকে পাবে না। জায়গার একেবারে ভোল পালটেছে। শুধু জায়গার কেন, মানুষেরও। বড়দা অবধি আলাদা এক মানুষ। ধবধবে গেঞ্জি গায়ে, পান খেয়ে মুখ রাঙা, মিষ্টিমিষ্টি কথা বলে বড়দা! অভ্যেস সকলের ভাল হয়ে যাচ্ছে। আমি বলছি, গিয়ে দেখ একদিন। হাতে ধরে বলছি তোমায়।

জগা বলে, যাব কি! যেতেই হবে। গিয়ে পড়ে বাবুইয়ের বাসা ভেঙে দিয়ে আসব।

বলতে বলতে বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে : আমার ডান-হাত বাঁ-হাত হল বলাই আর পচা—হাত দুখানা মুচড়ে ভেঙে ষোলআনা নিজের করে নিয়েছে। ঘরের মধ্যে কথার দোসর পাই নে। ও ছুঁড়ীকে সহজে ছাড়ব? কুলো বাজিয়ে বিদেয় করে দেব আমাদের বাদা-অঞ্চল থেকে।

গজরাচ্ছে কেউটে সাপের মত। রাগের শান্তি হয় না। বলে, তুমি এক দৈত্য-মানুষ—নিজের বউ পিটিয়ে তুলো-ধোনা কর—ঐ ছুঁড়ীর কাছে গিয়ে কেঁচো। আমার হাত ধরে তুমি ওর জন্যে ওকালতি করছ। না-ই বা গেলাম, খবর রাখি সমস্ত। পা ভেঙে পড়ে ছিলে তবু সেই খোঁড়া পায়ে গড়াতে গড়াতে ওদের ওখানে গিয়ে উঠতে। তোমার বউ তাই নিয়ে ক্যারক্যার করে, খেউড় গায় – ঘরের চালে কাক বসতে দেয় না।

রাধেশ্যামও চটেছে : ক্যারক্যার করে সেইজন্যে? না জেনেশুনে তুমি এক-একখানা বচন ঝেড়ে বসো। দুই দিন জালে গিয়ে দু-গণ্ডা কুচো-চিংড়িও আনতে পারি নি, তাই চেঁচায়। লোভী মেয়েমানুষ। কুকুরের মুখে মাংস ছুঁড়ে দিলে, ঘেউ ঘেউ বন্ধ, ওদের সামনেও তেমনি পয়সা ছুঁড়ে দিলে চেঁচানি থামে। সেটা পেয়ে

উঠি নে—অনেকদিন শুয়ে বসে অভ্যাস ছেড়ে গেছে। গতরও নেই। চৌরস বাঁধের উপরেই এক পা হাঁটিতে চিঁড়িক মেরে ওঠে, ঘাঁতঘোঁত বুঝে ভেড়িতে জুতে করে জাল ফেলি কেমন করে? মাগী তা বুঝবে না। পেটের পোড়ায় আজেবাজে নানান কথা তুলে ঝগড়া করে মরে।

জগা নরম হল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, বাড়ি যে একেবারে চুপচাপ! বউ কোথায় গেল?

গেছে ঐ নতুন আলায়। ছেলে ঘুম পাড়িয়ে আমায় পাহারায় রেখে সে গিয়ে মচ্ছবে বসেছে।

কী সর্বনাশ। অ্যাঁ, তোমার বউ অন্নদাসী অবধি ভক্ত হয়ে গেল?

রাধেশ্যাম বেজার মুখে বলে, ভক্ত না আরো-কিছু! হিংসে—বুঝতে পারলে না? আমি কখনোসখনো গিয়ে বসতাম, সেইটে হতে দেবে না। আগে থেকে ঘাঁটি করে বসে আছে। কেষ্টকথায় মন বসাবে হাড়বজ্জাত ঐ মেয়েমানুষ! তবে একটা ভাল —সমস্তটা দিনের পর বাড়ি এইবারে ঠাণ্ডা। দিব্যি শান্তিতে আছি একলা মানুষ।

জগা বলে, তুমি তো জালে যাচ্ছ না রাধে। জালগাছটা দাও দিকি।

রাধেশ্যাম অবাক হয়ে বলে, জালে তোমার গরজ কি জগা?

যাইব, কী আবার! পারি নে ভাবছ? দুনিয়ার হেন কর্ম নেই তোমাদের জগা যা না পারে। মাছ-মারার কাজ কত করেছি এককালে! যতই হোক, চুরি-ছ্যাঁচড়ামি তো! এখন তাই আর ইচ্ছে করে না।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে রাধেশ্যাম বলে, জগা তুমি ভটচাজ্জি হয়েছ। পেটে জুত থাকলে সবাই হয় ওরকম। মাগী এদ্দিন চাট্টি চাট্টি ভাত এনে দিত চৌধুরি-আলা থেকে—আমিও খুব সাচ্চা হয়ে ছিলাম। এখন ভাত নেই—তাই আবার জাল ঘাড়ে নেবার দরকার। কিন্তু পেরে উঠছি নে। পা খানা খারাপ। পা যদিই বা ভাল হয়ে যায়, অভ্যাস একেবারে খারাপ। জাল ফেলতে গা ছমছম করে। সামলে উঠতে সময় লাগবে।

জগা দেমাক করে বলে, আমার অভ্যাস মোটেই নেই। তবু কিছু না কিছু হবেই। জাল তো নিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাবে।

রাধেশ্যাম হিতোপদেশ দিচ্ছে: গোঁয়ার্তুমি করে যেথাসেথা জাল ফেললেই হল না। সমস্ত পরের জায়গা—এ লোকের ভেড়ি, নয় তো ও-লোকের ভেড়ি। কোথায় ফেলবে, পাহারা কোনদিকে কমজোরি—আগে থাকতে তার বুঝসমজ থাকবে। দিন-মানে ভালমানুষ হয়ে ঘোরাঘুরি করতে হয়; গতিক বুঝে নিতে অন্তত দুটো-তিনটে দিন লাগে। তুমি তো কোন দিন ওমুখো হও নি—পয়লা দিনেই জালগাছটা আক্কেলসেলামি দিয়ে শুধু-হাতে ফিরে আসবে।

জগা রাগ করে বলে, জাল কেড়ে নেয় তো জরিমানার পয়সা দিয়ে খালাস করে নিয়ে আসব। ছিঁড়ে যায় তো নিজ খরচায় মেরামত করে দেব। মাছ সমস্ত খড়দার খাতায় উঠবে, তার অর্ধেক বখরা হিসেব করে পয়সাকড়ি নিজের হাতে গুণেগেঁথে এনো তুমি। এই চুক্তি। এর উপরেও মনে সন্দ থাকলে কাজ নেই। ধানাই-পানাই না করে সোজাসুজি বল। অন্য কোথাও চেষ্টা দেখি গে।

এত সুবিধা কোথায় আর! রাধেশ্যাম জাল দিয়ে দিল। অন্নদাসীর গতর যত দিন আছে, দু-বেলা দু-পাথর যেমন করে হোক জোটাবেই। তার উপর এই বাবদে হাতে-গাঁটে কিছু যদি নগদ মিলে যায়, সেটা রাধেশ্যাম অন্যভাবে খরচ করবে।

বলে, জাল নিয়ে যাও জগা। একটা কথা, বখরা আমি নিজে আনতে যাব না। তোমার উপর ধর্মভার, চোরাগোপ্তা তুমি এসে দিয়ে যাবে। মাগী হল চিলের বেহদ্দ। টের পায় তো ছোঁ মেরে সমস্ত নিয়ে নেবে। আমার ভোগে হবে না। এইটে খেয়াল রেখো।

জাল নিয়ে বেরিয়ে এসে তখন বড় ভাবনা। ঐ যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে রাধেশ্যাম—বেকুব হবার ভয়, ধরা পড়ে আহাম্মক বনে যাওয়ার ভয়। জাল ফেলতে জানে জগা ঠিকই—অনেক বছর জাল ফেলে নি—তা হলেও ভরসা আছে, সুতোয় কাঠিতে জড়িয়ে গিয়ে আনাড়ীর হাতে যেমন লাঠির মতন সোজা হয়ে জাল পড়ে সে অবস্থা হবে না। জায়গা ঘিরে গোল হয়েই পড়বে। কিন্তু ফেলে কোন্ ঘেরিতে কি রকম পাহারা, তারও কিছু আন্দাজ নেই। রাধেশ্যাম যে ভয় করেছে—হয়তো বা ধরাই পড়ে গেল সত্যি সত্যি। জগন্নাথ বিশ্বাসকে ধরে ফেলেছে, বাদা অঞ্চলে এর চেয়ে বড় খবর কি! জঙ্গলের মধ্যে এতকাল চরে বেড়াচ্ছে—সরকার বাহাদুর এত নৌকো মোটরলঞ্চ মানুষ-জন পিটেল-পুলিশ নিয়েও তার গায়ে হাত ঠেকাতে পারে নি। আর এখানে ফাঁকা ঘেরির এলাকায় পাঁচ-দশটা মানুষ পায়চারি করে বেড়ায়—তারা ধরলে তো মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।

জাল-কাঁধে নিয়ে জগা হনহন করে চলেছে রাস্তা ধরে। কুমিরমারি থেকে নতুন যে রাস্তা আসছে। নতুন মাটি ফেলেছে—আর ঐ চারু মেয়েটার অত্যাচারে কিছু অন্যমনস্কও বটে জগা—হেঁচট লাগে বারম্বার। তা হোক, রাস্তা শুধু সরকারী জায়গা। হাতে তুলে জাল নাচিয়ে শব্দসাড়া করে রাস্তা ধরে যতদূর খুশি যাও, কারও কিছু বলবার এক্তিয়ার নেই। বড় বড় মেছোঘেরি ডাইনে বাঁয়ে, রাত্রে আজ জোর হাওয়া দিয়েছে, ছলছল করে জল এসে লাগে রাস্তার নতুন মাটির গায়ে। আঘাতে আঘাতে ফেনা উঠছে জলে। জলের উপর ঢেউ-লাগা সাদা ফেনা আবছা আঁধারেও দিব্যি নজরে আসছে। জল অগভীর জলের মধ্যে মাছ। অনেকবার ঝোঁক হয়েছে কোন এক দিকে রাস্তা থেকে নেমে গিয়ে দেয় এক খেওন। কিন্তু খেওনের জাল জল থেকে টেনে তুলছে—যদি সেই সময় পাহারার মানুষ গেঁয়োবনের আড়াল থেকে বেরিয়ে খপ করে জালের মুঠো চেপে ধরে। বড্ড অপমান। কে হে বটে তুমি? আজেবাজে মানুষ নয়, জগন্নাথ বিশ্বাস। ঘটনা চাউর হয়ে গেলে এই তল্লাট ছেড়ে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই।

এগিয়েই যাচ্ছে। যতদূর সম্ভব চেনা-জানার চৌহদ্দি যাবে ছাড়িয়ে। মাঝে মাঝে জঙ্গল—এখনো হাসিল হয় নি। হয়তো করবেই না হাসিল, ইচ্ছে করে রেখে দিয়েছে। ধানকরের চেয়ে জলকরে রোজকার বেশী—যদি অবশ্য ঠিক মত মাছ চালানের ব্যবস্থা করা যায়। বনকর এক হিসাবে আবার জলকরের চেয়েও ভাল। রোজগারে জলকরের মতন নয় বটে—কিন্তু বড় সুবিধা, পয়সা খরচ করে বাঁধ বাঁধতে হয় না। বাঁধ বেঁধে 'কখন ভাঙে' 'কখন ভাঙে' করে শঙ্কিত থাকতে হয় না অহরহ। ক্ষেতে ধানের চারা লাগানো কিম্বা ঘেরিতে চারামাছ তোল্যার বাবদে পয়সা খরচ করতে হয় না। কখনো জলকর কখনো বা বনকর দু-পাশে ফেলে জগা নিশিরাত্রে নতুন রাস্তা ধরে চলেছে।

ধবধবির খাল—পুল এখনো বানানো হয় নি। ইঁট এনে ফেলেছে, পুল গাঁথা শুরু হয়ে যাবে খুব শিগগির। এমনি আরও তিন-চারটে পুল বাকি, আপাতত

বাঁশের সাঁকো বানিয়ে পারাপারের কাজ চলছে। ধবধবিতে এসে জগার হুঁশ হল, অনেকটা দূরে এসে পড়েছে। খাল পার হয়ে গিয়েই তো, মনে পড়েছে, মেছো-ঘেরি আছে একটা। যা হবার হোক, ঐ ঘেরিতে কপাল ঠুকে দেখা যাবে। সত্যিই তো, সারা রাত্তির ধরে হাঁটবে নাকি? হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে সেই কুমিরমারি অবধি?

সাঁকোয় উঠবে, খালের পাশে গোলবনের ভিতর কি নড়ে উঠল। কুমির—কুমির নাকি? বাঁশের উপর মাঝামাঝি জায়গায় দ্রুত চলে এসেছে। দাঁড়িয়ে পড়ল চুপচাপ সেখানে। বাঁশ মচমচ না করে। অপেক্ষা করছে, কোন জন্তু বেরিয়ে আসে ফাঁকায়। তারপর সাঁকো পার হয়ে ছুটে পালাবে, অথবা এপারে ফিরে মাটির ঢিল ও ডালপালা ছিটে নিয়ে রণে প্রবৃত্ত হবে—সে বিবেচনা তখনকার।

বেরুল জন্তুটা গোলবনের ভিতর থেকে। কুমির নয়, বাঘ নয়, শুয়োর নয়, এমন কি মেছো-ঘড়েলও নয়—মানুষ একজন। সঙ্গে তার বেশ বড় সাইজের মাছের খালুই। খালুই হাতে করে নেয় নি। কাঁধের উপর লাঠি দিয়ে তারই ওদিকে পিঠের গায়ে ঝোলানো। বোঝা গেল তবে তো চাঁদ, মাছ ভরতি তোমার খালুই। ভরতি এতদূর যে হাতে ঝুলিয়ে নিতে পার নি, কাঁধের উপর ঠেকানো দিয়ে নিতে হচ্ছে।

রাস্তায় উঠবে মানুষটা, জলজঙ্গল ভেঙে সোজা চলে আসছে। জগারও অতএব খাল পার হওয়া ঘটল না; ফিরে এসে আড়ালে-আবডালে টিপি টিপি এগোচ্ছে মানুষটার দিকে। একটা ঝোপও পাওয়া গেল, ঘাপটি মেরে আছে সেখানে। যেই মাত্র মানুষটা রাস্তায় পা দিয়েছে, জগা নাকি সুরে বলে, চাট্টি মাঁছ দেঁ।

মাছের উপর সকলের লোভ। বনকরের বাবু, ঘেরিওয়ালা, নৌকার মাঝি, ডাক-পিওন, আবাদের ডাক্তারবাবু, মরশুমী পাঠশালার গুরুমশায়—মাছের নামে সবাই হাত পাতে। মানুষ ছাড়া এমন কি বাদাবনের ভুত দানো ওঁরাও। সেইজন্যে রাত্রিবেলা মাছ নিয়ে মানুষ পারতপক্ষে একলা যাতায়াত করে না।

মাঁছ দেঁ আঁমায়—খাঁব।

চমক খেয়ে মানুষটা ঝোপের দিকে তাকাল। হো-হো করে আকাশ ফাটিয়ে হেসে জগন্নাথ তার হাত চেপে ধরে।

আমরা মাছ-মারারা সন্ধ্যে থেকে জাল নিয়ে চক্কোর দিচ্ছি—কোন্ ঘেরিতে কখন খেওন দেওয়া যায়। তুমি বাবা ওস্তাদ সিঁদেল—টুক করে কার ঘরের পান্তা বেড়ে নিয়ে এলে বল তো?

মানুষটা চটে ওঠে: চুরিচামারির কথা তোল কেন? তোমরাই বা কোন্ সাধুমোহান্ত? তুমি যা, আমিও সেই। দুজনেই মাছের ধান্দায় ঘুরছি।

জগা বলে, না সাঙাত, ছোট হও কি জন্যে? বিস্তর ক্ষমতা তোমার। এক খেওন জাল ফেল নি, জালই নেই তোমার হাতে, দিব্যি গায়ে ফুঁ-দেওয়া কাজ। মাছের ভারে পিঠ কুঁজো হয়ে চলেছ। আর আমাদের দেখ, কালঘাম ছুটিয়ে জাল ফেলে ফেলে মুনাফার বেলা অষ্টরম্ভা। বলছ কিনা, তুমি যা আমরাও তাই! অনেক উপর দিয়ে যাও তুমি আমাদের।

মানুষটা দেমাক করে: গায়ে ফুঁ-দেওয়া কাজ হলে সবাই ঝুঁকত এই দিকে। কষ্ট করে কেউ জাল ফেলতে যেত না। বুকের বল চাইরে দাদা, যেমন-তেমন লোকের কর্ম নয়। টের পেলে গাঙের মধ্যে ধরে চুবানি দেবে। গলা টিপে মেরে ফেলে ভাসিয়েও দিতে পারে জোয়ারের জলে। টানের সঙ্গে ভেসে লাস চলল কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক। সেই জন্যে তক্কেতক্কে থাকতে হয়। পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে বসে মশার কামড়

খাও, আর নজর পেতে রাখ। নৌকো কাছি করল এইবারে। বেউটি-জাল নামাল জলে। গাঁজা খাচ্ছে হাত-ফিরতি করে—এ-হাত থেকে ও-হাত, ও-হাত থেকে সে-হাত। পাঁচবার সাতবার চলে এইরকম, তারপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে গল্প চলল, শেষটা ঝিম হয়ে আসে। তৈরি হও এবারে—জলে নেমে আস্তে সাঁতার কেটে এগোও। জলের এতটুকু নাড়ানি নেই—ভাঁটার টানে যেমন একটানা নেমে যাচ্ছে তেমনি। জালের মাথা উঁচু করে সাবধানে তুলে ধর, খালুই পাতো ঠিক তার নিচে, ধারাল ছুরি দিয়ে পোঁচ লাগাও জালে। খলবল করে মাছ এসে পড়বে খালুইতে, কপালে থাকে তো ভরে গিয়ে ছাপিয়ে পড়বে। তিলেক আর দেরি নয়—ফের, ঠিক যেমন কায়দায় এসেছিলে। ফাঁকায় যাবে না, জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে এগোবে। হাতের নাগালে পেলে বন-কাটা হেঁসো-দা দিয়ে কাঁধের উপরের মুণ্ডুখানা নামিয়ে নেবে। সড়কির নাগালে পেলে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করবে। এত কষ্টের কাজ—আর তুমি কিনা বল গায়ে-ফুঁ দিয়ে বেড়ানো!

জগা বলে, মাছ কি করবে বেচবে তো নিশ্চয় এত মাছ? মহাজন কে তোমার, কোন্ খাতায় নিয়ে তোল?

লোকটা হেসে বলে, বিনি পুঁজির ব্যবসা—এতে মহাজন লাগে না। জাল কাটার জন্যে বারো আনার এক ছুরি মাস্তোর মূলধন। যেখানে খুশি মাল ছাড়তে পারি। কুমিরমারি চলে যাওয়াই ভাল। দেড় পহরে পৌঁছে যাব। বাজার পুরোপুরি ধরা যাবে।

কেন ভাই, কাছেপিঠে গগন দাসের খাতা—তোমাদের জন্যই খাতা বসানো। কুমিরমারি অবধি কি জন্য কষ্ট করবে?

খাতায় কি আর কুমিরমারির দর দেবে? খাতার ব্যাপারীরা কুমিরমারি নিয়ে বেচবে—নৌকায় খরচ-খরচা করে নিয়ে যাবে, তার উপরে লাভও চাই খানিকটা! আর তোমাদের খাতা বসবে সেই ভোর-রাত্রে। হাত-পা কোলে করে ততক্ষণ বসে না থেকে টুকটুক করে পায়ে পায়ে চলে যেতে লাগি।

জগা বলে, মাল নামাও, কোনখানে যেতে হবে না। যাবে তো অজাঙ্গি বন কেটে এত কাণ্ড করেছ কেন? কি মাছ এগুলো—পারসে? আচ্ছা রাক্ষুসে-পারসে জুটিয়েছ ভাই!

মাছের আয়তন দেখে উল্লাসের অবধি নেই। এক-একটা বের করে জগা, পরম আদরে হাত বুলায়, আর বাৎসল্যের চোখে চেয়ে থাকে: আহা-হা, রাজপাত্তুর! তিন-চার গণ্ডায় সেরের ধাক্কা। এ জিনিস পেটে খাবার নয়—সদরে নিয়ে দেখালে সরকারী পুরস্কার দেবে। আমি ছাড়ছি না, কুমিরমারির দর দিয়েই কিনে নেব। আরও বেশী চাও, তাই দেব। কষ্ট করে তোমায় একবার সাঁইতলা অবধি যেতে হবে। পয়সাকড়ি লোকে তো সদাসর্বদা গাঁটে করে ঘোরে না।

কুমিরমারি চলে যাচ্ছিল, সেই লোক সাঁইতলার এইটুকু পথ যাবে, এ আর কত বড় কথা! কালীতলার ওদিকে বনগাছটায় সেই যে জগার সিন্দুক—সিন্দুক থেকে টাকা বের করে লোকটাকে দাম দিতে হবে।

সাঁইতলায় নিয়ে গিয়ে জগা তাকে চালাঘরের ভিতর বসাল। প্রসন্ন মুখে বলে, ঢেলে ফেল সমস্ত মাছ এইবারে। নেড়েচেড়ে দেখে আন্দাজ করে দাম বল।

লোকটা দাম বলে পাঁচসিকে।

উহুঁ, আরও বেশী। দেড় টাকা। দেড় টাকায় খুশী হলে কিনা বল। কুমির-

মারিতে তুমি এই দর পেতে না ভাই। বসে বসে তামাক খেতে লাগ, টাকা নিয়ে আসি।

তামাক সাজছে জগা। লোকটা প্রশ্ন করে, তুমিই বা এত দর দিচ্ছ কেন? পোষাতে পারবে?

তাই বোঝ। না পোষালে দিই কেমন করে?

লোকটা হি-হি করে হাসে: বুঝতে পেরেছি।

কি বুঝলে?

মানুষের মনে কত কি মতলব থাকে। কত রকম ভেবে কাজ করতে হয়। খাতা জমাচ্ছ তোমরা এই কায়দায়। বাবুরা যেমন করে হাট জমায়। হাটে যে মাল অবিক্রী থাকে, বাবুদের তরফ থেকে সমস্ত কিনে নেয়। এমনি করে ব্যাপারীর মাল আমদানি হতে লাগলে খদ্দেরও এসে পড়ে। হাট জমে গেল। তারপরে আর কি— কষে তোলা আদায় করে যাও। ভাল দর দিয়ে তোমরাও তেমনি খাতা জমাচ্ছ—যত মাছ-মারা তোমাদের ওখানে যাতে জোটে। কেউ কুমিরমারি যাবে না, এদিক-ওদিকে হাতে কেটে বেচতে যাবে না। খাতায় এসে নির্ঝঞ্ঝাটে পাইকারি ছেড়ে দিয়ে যাবে।

জগা বিষণ্ণ মুখে বলে, বন কেটে ঘেরি বানিয়েছি। খাতাও আমার বুদ্ধিতে। কিন্তু আমি এখন কেউ নই। আমি তো আমি—খোদ মালিক গগন দাসের দশা গিয়ে দেখ। যাই নে আমি—কিন্তু যা কানে শুনতে পাই, পাষাণ ফেটে জল বেরুবে। ডাঙ্গা অঞ্চলের ভদ্দোররা এসে চেপে পড়েছে। গগন আছে জেলখানায় কয়েদীর মত হয়ে।

লোকটা ছিলিমে গোটা দুই টান দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল: মতলব এইবারে ধরতে পেরেছি। বলি? জাল নিয়ে বেরিয়েছ—জাল একেবারে ফক্কা। আমার মাছ দেখিয়ে বউয়ের কাছে পশার বাঁচাবে তুমি। বল ঠিক কি না?

জগাও হাসে: বউই নেই। এই আমার বসত-ঘর। বউ থাকলে মজা করে এমনি হাত-পা মেলে থাকতে দিত? ঘরের চেহারা দেখে বোঝ না?

একত্রিশ

ভোররাত্রে আর দশটা মাছ-মারার সঙ্গে জগা গিয়ে নতুন আলায় উঠল। বসেছে মাছ-মারাদের মধ্যে। জালে জড়িয়ে মাছ এনেছে, জাল খুলে মাছ ছড়িয়ে দিল। জগার এই নবমূর্তিতে অবাক সকলে। কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলে না। কাজের ভিতর গোঁয়ার মানুষকে ঘাঁটাতে গিয়ে কোন্ বিপত্তি ঘটে না জানি! কী দরকার!

আলায় এসেছে জগা অনেক দিন পরে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চতুর্দিক। হায় হায়, কী চেহারা করে ফেলেছে তাদের সাধের আলার! রাধেশ্যাম বাড়িয়ে বলে নি। আলা কে বলবে, ষোল-আনা গৃহস্থবাড়ি। দরাজ উঠান পড়ে ছিল—আগাছার জঙ্গল, আর নুন ফুটে-ওঠা সাদামাটি। কোদাল দিয়ে খুঁড়ে সারা উঠান ভরে লাউ-কুমড়ার চারা পুঁতে দিয়েছে, নটে-পালংশাক-মুলোর বীজ ছড়িয়েছে। নধর লকলকে শাকে মাটি দেখা যায় না। সামনের দিকে গোয়ালঘর বাঁধা হচ্ছে। উদ্যোগী মরদ-জোয়ানের অভাব নেই—খুঁটি পোঁতা হয়ে চাল উঠে গেছে এর মধ্যে। গোয়ালঘর শেষ হতে বেশী দেরী হবে না। শেষ হয়ে গেলে গরু আসবে, ছাগল আসবে। আর এখনই এই ভোর হবার মুখে হাঁস ঝটপট করছে রান্নাঘরের দাওয়ায় একটুকু খোপের ভিতরে। হাঁস তো এসেই গেছে আর গোয়াল হয়ে গেলে কী কাণ্ড যে হবে, ভাবতে শিহরণ লাগে।

গোয়াল, তরিতরকারির ক্ষেত, উঠান জুড়ে লাউমাচা। লাউমাচার তল দিয়ে মাথা নিচু করে দাওয়ায় এসে উঠব তখন। সাগরের কূলে চর পড়ে ডাঙা বেরুল, ডাঙার জঙ্গল জমল আপনা আপনি। জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার চরে বেড়ায়। সকলের শেষে এল মানুষ। শুধুমাত্র চরে খেয়ে ও জীবের সুখ হয় না। জমিজিরেত নিজস্ব করে ঘিরে নেবে, চিরস্থায়ী ঘরবাড়ি বানাবে—সকল জীবের মধ্যে এই মানুষই কেবল যেন অনড় হয়ে দুনিয়ায় এসেছে।

সব চেয়ে কষ্ট হয় বড়দার জন্যে। কথা বলা চুলোয় থাক, নিদারুণ লজ্জায় মুখ তুলে সে জগার দিকে চাইল না এতক্ষণের মধ্যে। যেন কে না কে এসেছে। পুরো-হাতা কামিজ এবং পুরো দশহাতি কাপড় পরিয়ে খাতা-কলম আর হাতবাক্স সামনে দিয়ে মাচার উপর গগনকে ভদ্রলোক করে বসিয়ে দিয়েছে। বসে বসে হিসাব কর, আর দেদার লিখে যাও। লেখাপড়া শেখার এই বিষম জ্বালা। ফষ্টিনষ্টি ঠাট্টাতামাশা হাসিহল্লা করবে—তা দেখ, শ্যালক নগেনশশী খোঁড়াতে খোঁড়াতে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে সামনের উপর। এবং কামরার দরজার আড়াল থেকেও দোর্দণ্ডপ্রতাপ বোন আর বউ নিশ্চয় একগণ্ডা চোখ তাকিয়ে প্যাহারায় রয়েছে। খাতার এই কেনাবেচার সময়, কাজের সময় বলেই নয়—এমনি নজর দিনরাত অষ্টপ্রহর। মানুষটাকে নড়ে বসতে দেখে না। সন্ধ্যার পর গান-বাজনা আর ফড়ের আড্ডা বসত এইখানে, আড্ডা এখনো আছে। কিন্তু রসের গান গাও দিকি একখানা—'গয়লা দিদি লো, বড় ময়লা তোর প্রাণ'—গাও দিকি কত বড় সাহস! শ্রীখোলের সঙ্গে নামগান করে এখন বড়দা বোন-বউ-শ্যালকের সামনে বাবাজি হয়ে বসে। হরিধ্বনি করে হরির লুঠ ছড়ায়, ঝাঁজ-শঙ্খ বাজায় হয়তো বা লক্ষ্মীপুজোর সময়। জেলের কয়েদী হয়ে আছে, সেটা কিছু মিথ্যে বলে নি জগা।

গগন গদিয়ান হয়ে বসে। আর নগেনশশী মাতব্বরীর চালে চরকির মত ঘুরছে। অকাজের ঘোরাফেরা নয়—খাবার মাছ বলে এক এক আঁজলা মাছ তুলে নিচ্ছে মাছ-মারাদের ঝুড়ি, খালুই ও জাল থেকে। জগা বলেও বাদ দিল না, নিল তার কাছ থেকে গোটাকতক। জগা কিছু বলবে না, সে তো পুরোপুরি মাছ-মারা হয়েই এসেছে। এমনি ভাবে খাতার নিজস্ব ঝুড়িও প্রায় ভর্তি। তার অল্প কিছু খাবার জন্যে রান্নাঘরে পাঠিয়ে বাকিটা বিক্রী করে দেবে। সেটা সকলের শেষে। নগেনশশী এসে এই একখানা বুদ্ধি বের করেছে—অতিরিক্ত রোজগারের পন্থা। ফন্দিফিকিরের অন্ত নেই লোকটার মাথায়। মাছ-মারারা মাছ নিয়ে বসে আছে—নগেনশশী ঘুরে ঘুরে এক-এক জনের কাছে যায়, হাত দিয়ে মাছ উল্টেপাল্টে ব্যাপারীদের দেখায়, দু-খালুই তুলে ধরল বা একটু উঁচুতে। উঃ, পাহাড়ের সমান ওজন! একটা জালে ভেড়ির যাবতীয় মাছ তুলে এনেছ গো! কত বলছ ঘড়ুই মশায়? কিছু বলবার আগে নিজেই মন-গড়া দর বলে, বার আনা? ঘড়ু ব্যাপারী ঐ দেখ এক আঙুল দেখিয়ে পুরো টাকা বলে বসে আছে। এর উপরে কে কত উঠতে পার? এক-দুই—উঁহু আঠার আনা নয়, পাঁচ সিকে। তিন ব্যস, ডাক শেষ, পাঁচ সিকেয় চলে গেল। মাছ ঢেলে নাও ব্যাপারী।

এমনি কায়দায় মাছের দর তোলে নগেনশশী। দর উঠলে বৃত্তি বেশী আদায় হয়, খাতার মুনাফা বেশী। বা গতিক, খাতা তো ধাঁ-ধাঁ করে এবারে জমে উঠবে নগেনশশীর ব্যবস্থা ক্রমে।

সকাল হয়েছে। কিন্তু আজ বড় কুয়াশা—মনে হচ্ছে রাত্রি আছে এখনো। বেচা-কেনা শেষ। মাছের ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ, পচা আর বলাই বেয়ে নিয়ে চলে গেল। জগা ভাবছে, দু-জনেই ওরা সমান ওস্তাদ—এই কুয়াশায় পথ ভুল করে কাণ্ড ঘটিয়ে না বসে! আবার ভাবছে, তাই কর মা-কালী, জগা কী দরের নেয়ে হাড়ে-হাড়ে বুঝবে তবে সকলে। মাছ-মারাদের হিসাব খাতায় উঠে গেছে, এইবার পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পয়সা গুণেগেঁথে বিদায় হচ্ছে একে একে।

বিনোদিনী গিয়ে হাঁসের খোপের ঝাঁপ সরিয়ে দেয়। প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ তুলে ছুটোছুটি করে হাঁসের পাল বাঁধের ধারে ডোবায় গিয়ে পড়ে। বাদা অঞ্চলে শিয়াল নেই, এই বড় সুবিধা। কোমরে আঁচল ফেরতা দিয়ে নিয়ে চারুবালা ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। বলে, ঝেঁটেলা পড়ছে। সরে যাও গো ব্যাপারী মশায়েরা। সর, ও মাছ-মারা ঠাকুর—

সব মাছ-মারার হয়ে গেছে, সর্বশেষ জগার পয়সা গণা হচ্ছে। সেই বাকি আছে শুধুমাত্র। মনে হচ্ছে যেন চারুবালা তার দিকে চেয়ে মাছ-মারা ডেকে মুখের সুখ করে নিল। হর ঘড়ুই আর জগার কথাবার্তা চলছে তখন। ঘড়ুই তারিফ করে: ওস্তাদ বটে তুমি জগা! সর্বকর্মে দড়। একটা দিন জাল নিয়ে পড়লে, তা-ও একেবারে সকলের সেরা মাছ তুলে নিয়ে এসেছ।

ঝাঁট দিতে দিতে চারুবালা স্বগতোক্তির মত বলে, ওস্তাদ বলে ওস্তাদ! মাছ মেরে আনা হয়, তা জালে জলের ছিটে লাগে না। একেবারে শুকনো জাল।

হর ঘড়ুই তাকিয়ে দেখে, ব্যাপারে তাই বটে! আচ্ছা ত্যাঁদোড় মেয়ে তো, অত-দূর থেকে ঠিক নজর করে দেখেছে।

জগা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, বড়দা বারণ কর। হচ্ছে বেটাগানুষের কথা, মেয়েলোকে তার মধ্যে ফোড়ন কাটবে?

জগা যত রাগে, ততই চারুবালা খিল-খিল করে হাসে। কাণ্ডখানা বুঝেছ তো ঘড়ুই মশায়? এর-তার-কাছ থেকে মাছ যোগাড় করে নিয়ে মানুষটা আলায় এসেছে।

ঘড়ুই বলে, তার কোন্ গরজ? যার যখন ইচ্ছে, চলে আসে চলে যায়। বাধা কিছু নেই। অন্যের মাল জগন্নাথের কেন আনতে হবে?

চারু বলে, মনে পাপ থাকলে ছুতো খুঁজতে হয়। সকলকে মানা করে, আলায় যেন না আসে। মাছ-মারা সেজে নিজে তারপর চরবৃত্তি করে।

ঝাঁটার তলে হঠাৎ পোকামাকড় পড়েছে বুঝি! মরীয়া হয়ে মেঝের উপর বাড়ির পর বাড়ি দিচ্ছে। জগা কোন দিকে না তাকিয়ে পয়সা গাঁটে নিয়ে দুমদুম করে পা ফেলে মাটি কাঁপিয়ে চলে গেল।

চালাঘরে জগা একা। সোয়াস্তি নেই। সাপের মতন ফোঁস ফোঁস করছে। ঘরে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ, বেরিয়ে পড়ে। লোকের সামনে এমন হেনস্থা আজ অবধি তাকে কেউ করে নি। চারুবালা থাকতে ভুলেও কোনদিন আর নতুন-আলায় যাবে না। বাদাবন থেকে মেয়েটাকে তাড়িয়ে অপমানের ষোলআনা শোধ নিয়ে তবে যাবে। ভরদ্বাজকে তাড়িয়েছে—তারও চেয়ে বড় শত্রু চারু। ভরদ্বাজ ছিল ভিন্ন এলাকায় চৌধুরিদের মাইনে খাওয়া গোলাম—নিজের ইচ্ছেয় সে কিছু করত না। চারুবালা বুকের উপর বসে থেকে শত্রুতা সাধবে। বলাই আর পচা, তার ডান-হাত বাঁ-হাত কেটে নিয়েছে সকলের আগে।

আপাতত একটা বুদ্ধি মাথায় আসে। চৌধুরি-আলায় চলে যাবে। সেখানে পুরানো সাঙাতরা আছে—অনিরুদ্ধ, কালোসোনা এবং আরও সব। গগন দাসকে নিয়ে প্রথম যেখানে এসে উঠল, বাদাবনের স্বাদ পাইয়ে দিল গগনকে। অতিথ এসে সেই গৃহস্থ তাড়ানোর ফিকির। গোপাল ভরদ্বাজ বিদায় হয়েছে, এখন আবার সেখানে ভাব জমিয়ে নেওয়া কঠিন হবে না। চৌধুরিগঞ্জ থেকে তাদের মানুষ আমদানি করে চালাঘরের ভিতর আড্ডা জমাবে। নতুন-আলার পাশাপাশি ওদের নামগানের আসর থেকে ঢের ঢের জবর আড্ডা।

মনের মধ্যে এমনি সব আনাগোনা করতে করতে বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছে। কুয়াশা—সৃষ্টিসংসার মুছে গিয়েছে যেন একেবারে। দু-হাত দূরের গাছটাও নজরে আসে না। সূয্যিঠাকুর বনের এই নতুন বসতির পথ ভুলে গেছেন বুঝি আজ।

থমকে দাঁড়াল। শিস দিচ্ছে কে কোথায়। শিস দিয়ে ডাকছে যেন কাকে। মন্দ মানুষের কাণ্ডবাণ্ড নাকি? ঐ ভরদ্বাজের যে ব্যাপার—ব্রাহ্মণ-সন্তান পিটুনি খেয়ে মরল অসৎকর্মে গিয়ে। আর মজা এমনি, কাউকে কিছুই বলবার জো নেই—কিল খেয়ে কিল চুরি করা। কান কেটে নেওয়ার কথা হয়েছিল সেদিন—সেটা হলে কি করত? খোঁড়া পায়ের অজুহাত আছে—পগারের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। ফোলা মুখের কৈফিয়ত—মৌমাছি কামড়ে দিয়েছে। পিঠে লাঠির দাগ—তা হয়তো গায়ের ফতুয়াই খুলল না দাগ বসে না যাওয়া অবধি, তেল মাখবার সময়েও না। কিন্তু কাটা-কানের কি কৈফিয়ত? হেন ক্ষেত্র কান ঢেকে পাগড়ি পরে থাকতো হয়তো বার মাস তিরিশ দিন; রাত্রিবেলা মশারির মধ্যে ঢুকে পড়ে তবে পাগড়ি খুলত। তেমনি ধারা শয়তান মানুষ আবার কাউকে যদি বাগে পায়, আজ তবে ছেড়ে কথা কইবে না—কানই নেবে কেটে।

শিসটা বড় ঘন ঘন আসছে গো! জোর জোর এখন। মানুষটা বেপরোয়া—পিরীতের মানুষ সাড়া দিচ্ছে না, বেশী রকম উতলা হয়েছে তাই। নদী-খাল বন-জঙ্গল কুয়াশায় অন্ধকার। রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত মাছ-মারারা বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে; বউরা পসরা নিয়ে কেনাকাটায় বেরিয়ে গেছে। দিন রাত্রির মধ্যে সব চেয়ে নিরালা এই সকালবেলাটা। সময় বুঝে কেউ রাসলীলার যোগাড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

জগন্নাথ বাঁধ থেকে নেমে পড়ল। আওয়াজের আন্দাজ করে যাচ্ছে। কোন্‌খানে কার কাছে গিয়ে পড়বে, কিছুই জানে না। মানুষটা যে-ই হোক—সেই একদিন ভরদ্বাজকে নিয়ে যেমন হয়ে ছিল,—আজকেও তেমনি হাতের সুখ হবে। কিছু বেশীই হবে। যেতে যেতে অনেক নাবালে একেবারে খালের উপর এসে পড়ল যে! ঠিক ওপারে বাদাবন। আওয়াজের অনেক কাছে এসেছে। অত্যন্ত টিপিটিপি এগুতে হচ্ছে—কাদার মধ্যে পায়ের ওঠানামার শব্দ না হয়। সতর্ক হয়ে যাবে তা হলে মানুষটা।

একেবারে পিছনটিতে এসেছে, তখন চিনল। চারুবালা। হায় রে হায়, তোমার এই কাণ্ড। দিগন্তজোড়া কুয়াশা পেয়ে আলা থেকে এতদূর এসে প্রেমিকপুরুষ ডাকাডাকি করছ? জগা হাতের মুঠি পাকাল। উঁহু, এখন কিছু নয়—এসে পড়ুক সেই রসিক নাগর, দৌড় কত দূর দেখা যাক। কাদার মধ্যে একেবারে জলের কিনারে হেঁতালের ডাল ধরে আছে চারু। শিস দিচ্ছে, প্রতিধ্বনি হয়ে আসছে তাই ফিরে। আবার করছে অমনি। হাত কয়েক পিছনে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে জগা। এসে পড়লে যে হয় আহ্বানের মানুষটা। বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরবে। বাঘের গায়ে জোর কতটুকু—তার দুনো জোর তখন জগার হাতের মুষ্টিতে।

শিস দেওয়া ছেড়ে এবারে আর একরকম—কু দিচ্ছে চারুবালা। কু-কু-কু-উ-উ-উ—কোকিলের স্বরের মত কণ্ঠে ঢেউ খেলে যায়। নোনাজল-ওঠা কুয়াশামগ্ন বাদাবনের ভিতর থেকেও পাল্টা দেখি কোকিল ডেকে উঠল। ভারী মজা চলেছে নির্জন খালের এপারে আর ওপারে। মেয়ে এবার স্পষ্টাস্পষ্টি কথাবার্তা শুরু করল বনের সঙ্গে: ও বন, শোন—আমার কথা শোন। ওপার থেকে প্রতিধ্বনি আসছে: শোন—। অতি স্পষ্ট—চারুবালার চেয়েও স্পষ্টতর গলা। ঘাড় দুলিয়ে চারুবালা আরও চেঁচিয়ে বলে, না, শুনব না। তুমি আমার কথা শোন আগে, যা বলি শোন। শোন, শোন—দূর-দূরন্তরে ধ্বনিত হয়। চারু বলে, শোন; বনও বলে, শোন। দু-জনে পাল্লাপাল্লি। মাঝখানে খাল না থাকলে বোধ করি চুলোচুলি বেধে যেত দুই পক্ষে।

এতক্ষণে জগা বুঝতে পেরেছে। মাথা খারাপ মেয়েটার। রকম-সকম দেখে অনেক আগেই সেটা বোঝা উচিত ছিল। হৃৎকম্প হচ্ছে জগন্নাথের। বনরাজ্যে একটা খাল এমন-কিছু দুস্তর বাধা নয়—ভাঁটা সরে গিয়ে সেই খাল এখন আরও সরু হয়ে গেছে। চুলোচুলির ভাবনা ভাবছে না, বাঘ আসতে পারে খাল পার হয়ে। মানুষের গলা পেয়ে দূরের কোন ছিটে-জঙ্গলের মধ্যে হয়তো পার হয়ে এসে উঠেছে—সেখান থেকে টিপিটিপি পা ফেলে ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন কত হয়ে থাকে! পাগলের জায়গা মানষেলায়। বাদাবনে যারা আসবে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিচার-বিবেচনা করে সতর্ক হয়ে চলতে হবে তাদের। মানষেলার মেয়ে বাদায় এসে সঙ্গিনী পাচ্ছে না, বনের সঙ্গে তাই ডেকে ডেকে কথা বলতে খাল-ধারে এসেছে।

গালিগালাজ করা উচিত। কিন্তু খানিক আগে যা কথার খোঁচা খেয়ে এসেছে, চারুকে নাড়তে জগন্নাথের সাহসে কুলায় না। শুধু কথাই বা কেন—মাটিতে ঐ যে অতবার ঝাঁটা ঠুকল, তাই বা তাকে উদ্দেশ করে কি না কে বলবে? বাঘে যদি মুখে করে নিয়ে যায়, ভালই তো—ভরদ্বাজ গেছে, শেষ শত্রু আপসে খতম হয়ে যাক তাদের সাঁইতলা থেকে।

কুয়াশা কেটে হঠাৎ আলো ফুটে উঠল। সূর্য দেখা দিয়েছে। বনের মাথায় রোদের ঝিলিমিলি। কী সর্বনাশ, চারুবালার একেবারে পিছনটিতে জগা—দেখলে যে ক্ষেপে উঠবে দজ্জাল মেয়ে! পা টিপে টিপে পিছিয়ে সে বাঁধে গিয়ে উঠল। খানিকটা বাঁচোয়া এবার। বাঁধের উপর দিয়ে হন-হন করে চলেছে করাতীর দিকে। চারুবালার দৃষ্টিতে না পড়ে যায়। কিন্তু হয়ে গেল তাই। তাড়াতাড়ি করতে পা পিছলালো। পড়ে যাচ্ছিল, একটা ডাল ধরে সামলে নিল। মুখ ফেরাল চারুবালা। এক পলক। ঘুরিয়ে নিল মুখ সঙ্গে সঙ্গে। চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থ যেন দেখে ফেলেছে—এমনি অবস্থা জগার। সন্ন্যাসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়। কিন্তু কে বুঝবে, যাবেই বা কে বোঝাতে? বলি, বাঁধের পথ তো কারো কেনা-জায়গা নয়—গরজ পড়েছে, তাই এসেছি এখানে। যা ইচ্ছে ভাবগে, বয়ে গেল।

নতুন আলায় একেবারে গা ঘেঁষে বাঁধ চলে গেছে, সেইখানটা এসে পড়েছে জগা। বাঁধের মাটি তুলে তুলে ভিতর দিকে ডোবা মতন হয়েছে। মতলব করে ঠিক একটা জায়গা থেকেই মাটি তোলে। ক'বছর পরে এই ডোবা পুকুর হয়ে দাঁড়াবে। কলমির দামে এরই মধ্যে জলের আধা-আধি ঢেকে গেছে, কলমিফুল ফুটে আছে। হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে তার ভিতরে। কতগুলো হাঁস রে বাবা! ডোবাটা আলার এলাকার ভিতরে, কিনারা দিয়ে পথ। পিটুলি-গোলায় লক্ষ্মীর পা এঁকেছিল—খানিকটা তার চিহ্ন রয়েছে। সাদা পায়ের দাগ ফেলে ঐ পথ ধরে লক্ষ্মীঠাকরুন আলাঘরে উঠে বসেছেন

—আপদবালাই তাদের দূরে করে দিয়ে লক্ষ্মীর বসত। এবং সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীমন্তদের আনাগোনা সেই জায়গায়।

খান দুই-তিন গাঁড়ি ফেলে ডোবার একদিকে ঘাট বানিয়েছে। ঝিনি-বউ ধুচনি করে চাল ধুতে এল। বেড়ে আছে ঘড়ুদা, রাঁধা ভাত খাচ্ছে। রকমারি খাবার মাছ রেখে দেয় রোজ, হাঁসে ডিম পাড়ে, তার উপর এটা-ওটা ফাইফরমাস করে পচা-বলাইকে—ঝুমিরমারি থেকে তারা কেনাকাটা করে আনে। ভাত বেড়ে অষ্টব্যঞ্জন চতুর্দিকে সাজিয়ে পিঁড়ি পেতে গগনকে ডাক দেয়, এস গো। সামনে বসে 'এটা খাও, ওটা খাও' বলে, দাঁত খোঁচাবার জন্যে খড়কেকাঠি এনে দেয় আঁচাবার সময়। বউ-বোন-শালায় সংসার পাতিয়ে দিব্যি মজায় আছে নতুন-ঘেরি ও খাতার মালিক শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র দাস।

বত্রিশ

জগা সত্যি সত্যি চলে গেল চৌধুরিগঞ্জের আলায়। অনিরুদ্ধ কালোসোনা এবং আরও যারা আছে—হাঁ করে সবাই তাকিয়ে থাকে। চোখে দেখেও যেন চিনতে পারছে না। এমন আচমকা এসে পড়া—কোন্ মতলব নিয়ে এসেছে, কে জানে? বসতে বলে না তাকে কেউ। অনিরুদ্ধ তামাক খাচ্ছিল, হাতের কলকেটা অবধি এগিয়ে দিল না। অর্থাৎ সেই যে জাতক্রোধ নৌকো সরানো থেকে, এত দিনেও সেটা কিছুমাত্র নরম হয় নি।

জগাই তখন কৈফিয়তের মত দুটো চারটে কথা খাড়া করে : চলে যাচ্ছি তোমাদের তল্লাট ছেড়ে। তাই ভাবলাম, কেমন আছ খবরটা নিয়ে যাই।

ফাঁকা কথা বলেই বোধ হয় কানে নিচ্ছে না। আর তাই বিশদ করে বলতে হয়। উদাসী মন নিয়ে এসেছে কোনরকম বদ মতলব নেই—ভাল করে শুনিয়ে দিয়ে ওদের নিশ্চিত করবে। বলে, বয়ারখোলা যাচ্ছি, আর আসব না। গগন দাস তো কালকের মানুষ, বাদাবনে এই সেদিন এল। যাবার আগে, বলছিলাম কি, আমাদের পুরানো আড্ডা জমানো যাক কয়েকটা দিন। সেই আমাদের পুরানো সবাইকে নিয়ে।

এতক্ষণে অনিরুদ্ধ মুখ খুলল। জগার দিকে সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করে, বয়ারখোলা কেন?

যাত্রার দল খুলছে ওরা। খুব ধুমধাড়াক্কা।

কালোসোনা বলে, পাঠশালা খোলে তো ওরা বছর বছর। এবারে যাত্রার ঝোঁক উঠল?

ক্ষেতের ফলন যে দুনো-তেদুনো। মা-লক্ষ্মী ঝাঁপি উপুড় করে ঢেলেছেন। মনে বড্ড সুখ। তাই বলছে, পাঠশালা শুধু ছেলেদের নিয়ে। যাত্রা হলে ছেলে-বুড়ো সবাই গিয়ে বসতে পারবে। খিবেক পাচ্ছে না, আমায় ধরে তাই টানাটানি। আর সত্যিই তো—গাঙে-খালে বার মাস মেছো-নৌকো বেয়ে বেড়াবার মানুষ কি আমি? গলাখান শুনেছ তো—বল তোমরা সব। মনে শখ হয়েছিল, তিনটে-চারটে বছর এই সব করা গেল। এ মুলুকে মাছের খাতা ছিল না, পাইকারে মাছমারায় মুখ দেখাদেখি হত না—গড়োঁপটে দিয়ে গেলাম একটা। ঘড়ুদা'র হাতে পয়সা-কড়ি আসছে এখন—রক্তের গন্ধে ছিনেজোঁকের মত গাঁ-ঘর থেকে কিলবিল করে সব এসে পড়েছে। করে খাক ওরা সগোষ্ঠী মিলে। আমি আর ওর মধ্যে নেই দাদা। ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। যাত্রার মানুষ আমরা হলাম বসন্তের কোকিল। যে বাড়ি মচ্ছব, সেইখানে ডাক

আমাদের। নেচে গেয়ে আমোদস্ফূর্তি করে ফুরব।

কালোসোনা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, যাচ্ছ কবে এখান থেকে?

পা বাড়িয়ে আছি, গেলেই হল। কিন্তু যে জন্যে এসেছি শোন। যাবার আগে ক'টা দিন গলাখান মেজেঘষে শান দিয়ে নেব। গানবাজনা একলা মানুষের ব্যাপার নয়। সন্ধ্যের সময় যে যে পার চলে যেও আমার বাড়ি—সাঁইতলার সেই চালাঘর-খানায়। পথ তো এইটুকু। আলায় মাছ উঠবার সময় হলে ফিরে আসবে।

অনিরুদ্ধ বলে, আমরা যাব তোমার ওখানে?

জগা অনুনয় করে বলে, পুরানো রাগ মনে পুষে রেখ না। ন্যায়-অন্যায় যা-কিছু হয়েছে, সব ঐ গগন দাসের জন্য। তোমরা যেমন চৌধুরী-বাবুদের জন্য করে থাক। কাজ করতে এসেছি—হুকুমের নফর। নিজের ইচ্ছেয় কি কিছু করি আমরা? কাজের গরজে করতে হয়, আমাদের হাত ধরে করিয়ে নেয়। নিজেদের মধ্যে কি জন্যে তবে গরম হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে থাকবে?

বুঝিয়েসুজিয়ে একরকম মিটমাট করে জগা ফিরে এল। সে যেন আপোদবালাই—বিদায় হয়ে গেলেই তল্লাটের মানুষ বাঁচে। লোক-দেখানো ভাবে মুখের কথা ওরা কেউ বলতে পারত, একেবারে চলে যাবে কি জন্যে জগা, এস ফিরে আবার। তা কেউ বলল না—যাওয়ার ব্যবস্থা পাছে সে বাতিল করে দেয় অনুরোধের অজুহাত পেয়ে। চৌধুরিগঞ্জ শত্রুপক্ষ, তাদের কথা থাক—কিন্তু নতুন-আলায় গগনের দলবলই বা কী! কাজকর্ম দিব্যি চালু হয়ে গেছে, বলাই-পচা মেছোডিঙি নিয়ে নির্গোলে কুমিরমারি যাচ্ছে, আর জগাকে কোন্ দরকার? একটা মানুষ চালাঘরে একলা পড়ে পড়ে গজরায়, সে কথা মনে রাখার গরজ নেই এখন ওদের।

সেইটেই বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার বাঞ্ছা। চালাঘরের মধ্যে ভিন্ন একটা দল হয়ে ঢোল পিটিয়ে গান গেয়ে জানান দেওয়া যে আমরাও আছি অনেকজন—তোমরা সমস্ত নও। তোমাদের বড় বাইন হয়েছে বলাই, আর বড় গায়েন বোধ করি গগন দাস নিজে। ওই তো মজাদার গান হয়ে থাকে—আর কান পেতে একটুখানি আমাদের গানও শুনো।

চৌধুরিগঞ্জ থেকে ফিরে করালী পার হয়ে একবার বরাপোতার দিকে যেতে হল। মানুষজন এসে জুটবে, পান-সুপারি চাই। তামাক বড়-তামাক দুটোরই ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর কিছু ছাঁচ-বাতাসা আনলেও মন্দ হয় না, আড্ডা ভাঙার পর হরির লুটের নামে আরও কিছু হুল্লোড় করা যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। জগা ফিরে আসছে বরাপোতা থেকে। খালের ঘাটে ডিঙি। ফিরেছে তবে পচা-বলাই। গাঙে গোন পেয়েছে, পিঠেন বাতাস—তাই এত সকাল সকাল ফিরল। আলায় ঢুকে মালিক গগন দাসের সঙ্গে হিসাবপত্র মেটাচ্ছে। ফিরে এসে নৌকো ধোবে এখনই। ভাল হয়েছে, পচা-বলাই আলা থেকে বেরোক, ধরবে তাদের। ধরে সোজাসুজি বলবে, আজকের আড্ডা নতুন-আলায় নয়, সাঁইতলার পাড়ার মধ্যে—নিজেদের চালাঘরে। গাওনা-বাজনা সেখানে আজ। চৌধুরীগঞ্জ থেকে ওরা সব আসবে—ঘরের মানুষ তোমরা থাকবে না, সেটা কোন মতে হতে পারে না।

বাঁধের ধারে ঝোপের একটু আড়াল হয়ে সে দাঁড়াল। আচমকা বেরিয়ে অবাক করে দেবে। আলার কাজ সেরে পচা-বলাই বাঁধে এসে পড়ল। দু-হাতে দুটো কলসি প্রতি জনের। কলসি নিয়ে চলল কোথা এখন এই অবেলায়?

খালে নেমে যাচ্ছে। জগা ডাকল, বলাই।

বলাই থমকে দাঁড়াল।

নৌকোয় আবার বেরোবি নাকি? এই তো ফিরে এলি।

মুখ কাঁচুমাচু করে বলাই বলে, আলায় মিঠে জল ফুরিয়ে গেছে। একেবারে নেই। রাত্তিরে খাবার মতও নেই? না এনে দিলে নয়। ঘুরে আসি বরাপোতার পায় থেকে। কতক্ষণ আর লাগবে।

আবার বলে, কুমিরমারি থেকে খালি ডিঙি বেয়ে আনলাম। সকালে যদি বলে দিত, টিউকলের জল ধরে আনতাম ওখান থেকে। যত কলসি খুশি। এই ভোগ ভুগতে হত না।

জগা বলে, চার কলসি নিয়ে চললি—এত জল কে খাবে? সান্নিপাতের তেষ্টা কার পেল রে?

পচা বলে, রান্নাবান্না করবে—

চানও করবে নাকি? বাদাবনে এত নবাবি কার—চারু ঠাকরুনের?

বলাই বলে, কলসি-মাপা জল—চান করে আর কেমন করে? চানটান সেরে এসে কলসির জলে গামছা ভিজিয়ে ননদ-ভাজে তার পরে গা-হাত-পা মুছে নেয়, গায়ে ঢালে এক ঘটি দু-ঘটি। নয় তো নোনা জলে ওদের গা চটচট করে।

জগা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, মরেছিস তোরা হতভাগা। একেবারে গোল্লায় গেছিস।

বলাই বলে, অভ্যেস নেই, কি করবে? গায়ে নাকি কী সব উঠেছে নুনে জবরে গিয়ে। অভ্যেস হয়ে গেলে তখন আর মিঠে-জল লাগবে না।

মরদ হয়ে মেয়েমানুষের নাওয়ার জল বয়ে বেড়াস, মুখ দেখাচ্ছিস কেমন করে তোরা?

বলাই মুষড়ে যায়, মুখ নিচু করে। পচার কিন্তু কিছুমাত্র লজ্জা নেই। গালি শুনে দাঁত মেলে হাসে। কী যেন মহৎ কর্ম করেছে, পরমানন্দে তার যশোকীর্তন শুনছে।

বলাইকে ধরে ফেলল গিয়ে জগা। কঠিন মুষ্টিতে হাত চেপে ধরেছে। বলে, কলসি রাখ। মানুষজন আসছে আজ আমাদের ঘরে। চৌধুরি-আলা থেকেও আসবে। তোর এখন কোথাও যাওয়া হবে না। যায় পচা একলা চলে যাক।

বলাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে—হাঁ-না কিছু রা কাড়ে না। জগন্নাথ গর্জন করে বলে, ফেলে দে কলসি ভালর তরে বলছি।

একটা কলসি কেড়ে নিয়ে রাগের বশে সত্যি সত্যি ছুঁড়ে দিল। চুরমার হয়ে গেল। পচা চেঁচিয়ে ওঠে, আচ্ছা মানুষ তো! কলসি ভেঙে দিলে, কদ্দুর থেকে জোগাড় করে আনতে হয় জান?

হাত ছেড়ে জগা বলাইকে বলে, আসবি নে?

পচা ইতিমধ্যে ডিঙিতে উঠে পড়েছে। পিছন ফিরে বলাই একবার তার দিকে তাকায়।

জগা বলে, জবাব দে বলাই।

বলাই বলে, ফিরে এসে তার পরে যাব। এক্ষুনি ফিরব, বেশী দেরি হবে না।

মরগে যা—

নাগালের মধ্যে পেলে জগা গলাধাক্কা দিত হয়তো। কিন্তু বলাইও ডিঙির উপরে তখন।

কাউকে দরকার নেই। ভারী তো কাজ! এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে একটা দুটো হোগলার পাটি কিম্বা মাদুর চেয়ে এনে পেতে দেওয়া। না দিলেও ক্ষতি নেই, মাটিতে সব বসে পড়বে।

চৌধুরীগঞ্জ থেকে অনিরুদ্ধ এল তিন-চারজনকে সঙ্গে নিয়ে। একেবারে পাড়ার ভিতর জগার ঘরে জমায়েত—সাঁইতলার ও আশপাশের মাছ-মারারা সব এল। রাত গভীর হলে এইখান থেকে জালের কাজে বেরুবে। ছোট চালাঘরে জায়গা দিতে পারে না। খুব জমল। এখানে বসে যা মুখে আসে বলতে পারে, যে গান খুশি গাইতে পারে। শাসন-বাঁধন নেই উচ্ছৃংখল, বেপরোয়া। আড্ডার মাঝখানে উঠে একবার জগা চুপিচুপি বাঁধের উপরে ঘুরে ঘুরে দেখে আসে। নতুন-আলায় সাড়াশব্দ নেই, মিটমিট করে আলো জ্বলছে একটা। খালের ঘাটে ডিঙি—পচা-বলাই অতএব ফিরে এসেছে। কিন্তু অন্য দিনের মত নাম-কীর্তন নয়, ভক্ত কটিকে নিয়ে গগন দাস আজকে বোধ হয় ধ্যানে বসে গেছে।

আসর ভাঙার মুখে জাঁকিয়ে হরিধ্বনি। একবার দুবার নয়, বারবার। শ্মশানে মড়া নিয়ে যাবার সময় হরিবোল দিতে দিতে যায়, এই চিৎকার তারও চেয়ে ভয়ানক। তার সঙ্গে ঢপাঢপ ঢোলের বেতালা পিটুনি। জগাই বাজাচ্ছে। ছাউনির চামড়া না ছেঁড়ে পিটুনির ঠেলায়। সমস্ত মিলিয়ে জঙ্গলের প্রান্তে একটা তোলপাড় কাণ্ড। লোকজন বিদায় করে জগন্নাথ অনেক দিন পরে আজ মনের সুখে অঘোর ঘুম ঘুমাল।

পরের দিন জগা অনেক বেলায় উঠল। নতুন-আলার আসর কাল একেবারে বন্ধ গেছে—ঘুম থেকে জেগে উঠেও সেই আনন্দ। সকালবেলা ওদিককার গতিকটা কি দেখবার জন্য বাঁধে এসেছে। নিতান্ত প্রাতর্ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে, এমনি একটা ভাব। কোটালের কূলপ্লাবী জোয়ার। খাল ছাপিয়ে পাড়ের গাছগাছালি ডুবিয়ে দিয়ে বাঁধের গায়ে জল ছলাৎ-ছলাৎ করছে।

কাত হয়ে-পড়া একটা বড় বানগাছের গুঁড়ি জলে ডুবে গেছে! চার-পাঁচটা ডাল বেরিয়েছে চতুর্দিকে। ডালেরও গোড়ার দিকটায় জল। জগার নজর পড়ল সেখানে। কে মানুষটা দিব্যি ডাল ঠেসান দিয়ে বসে আছে কোমর অবধি জলে ডুবিয়ে? আবার কে—সেই নবাবনন্দিনীর চানে আসা হয়েছে, যার নাম চারুবালা। আলার ডোবায় কাদা-পচা জল—সে জল শ্রীঅঙ্গে লাগানো চলে না। আবার শোনা যায়, বিয়ে হতে না হতে পতিটি শেষ করে বিধবা হয়ে আছেন উনি। বিধবার এত বাহার! কেন যে এসব বাহারের মানুষ বাদাবনে আসে! দালান-কোঠায় বাক্সবন্দি হয়ে থাকলেই পারে, গায়ের চামড়ায় মরচে ধরার যাতে শঙ্কা নেই।

চারুবালার বড় পছন্দের জায়গা। জল ভেঙে এসে এই গাছের ডালে চড়ে বসেছে। হাতে ঘটি। স্রোতের জলে ঘটি ভরে ভরে গায়ে ঢালছে। ঘটি কখনো বা ডালের ফাঁকে গুঁজে রেখে গামছা ভরে ভরে গায়ে দেয়। ডালপাতার অন্তরালে লোকের হঠাৎ চোখ পড়ে না—আব্রু রেখে স্নান হয়। বলাইয়ের আনা কলসি-ভরা মিঠে-জল—বাড়ি ফিরে সেই জলে গায়ের নোনা ধুয়ে ফেলবে। কিন্তু আরও এক মেয়েলোক আছে—গগনের বউ। তার এত শখ নেই। ভয়ডর আছে বউটার, এমন ডানপিঠে নয়।

জল বাড়ছে, কল-কল বেগে স্রোত এসে ঢুকছে। কোমর পর্যন্ত জলতলে ছিল,

দেখতে দেখতে বুক অবধি ডুবে গেল। স্ফূর্তি চারুবালার বেড়ে যাচ্ছে ততই। ডাল ধরে পা দাপাচ্ছে। গাঁয়ের পুকুরে বুঝি সাঁতার কাটত। সুতীব্র স্রোতের মধ্যে ততখানি আর সাহস হয় না, দাপাদাপি করে সাঁতারের সুখ করে নিচ্ছে খানিকটা। গুনগুন করে গানও ধরেছে বুঝি।

আপন মনে ছিল চারুবালা। বাঁধের দিক দিয়ে হঠাৎ বাঘ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বুঝি। এসে কামড়ে ধরে উল্টো এক লাফ। এক লাফে ডাঙার উপর। তখন ঠাহর করে দেখে—কামড়ে ধরে নি, দুই বাহু দিয়ে ধরেছে জাপটে। বাঘও নয়, জগা। ছি-ছি, কী লজ্জা! চান করার মধ্যে কী অবস্থায় আনল টেনে! টেনে এনে বাঁধের উপর ফেলল। চারু কিল দিচ্ছে দমাদম জগার বুকের উপর, ঘুঁষি মারছে পাগলের মত হয়ে। জগাও কি ছাড়বার পাত্র—সজোরে চারুর মুখ ঘুরিয়ে ধরল যে ডালে বসে চান করছিল সেই দিকে: নয়ন তুলে দেখ একবার শ্রীমতী, কী কাণ্ড হয়ে যেত এতক্ষণে!

স্রোতের উপর ভয়াল আবর্ত তুলে কুমির ভেসে উঠেছে ডালের ভিতরে।

দেখছ? এটা হল বাদাবন। গাঙ-খাল মেয়েমানষের সুখ করে সাঁতারের জায়গা নয়। শিকার তাক করে অনেক দূরে থেকে কুমির ডুব দেয়। জলের নিচে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ভেসে উঠবে ঠিক তার সেই তাক-করা জায়গায়। আমি দেখেছিলাম তাই। এতক্ষণে, নয় তো, কুমিরের মুখে কাঁহা-কাঁহা মুলুক যেতে হত।

প্রাণ বাঁচিয়ে দিল, চারুবালা হতভম্ব হয়ে গেছে। ক্ষণপরে সামলে নিয়ে করকর করে উঠল: তা মরতাম আমি—মরে যেতাম। তোমার কি? তুমি কেন তক্কেতক্কে থাকবে? যেদিকে যাই, তুমি ঘুরঘুর করতে থাক। কানা বুঝি আমি—দেখতে পাই নে?

জগা বলে, ভুল হয়েছে আমার। বাঁধে টেনে না এনে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে ঠিক হত। আপদের শান্তি হত, সাঁইতলা জুড়োত। বাদার মানুষ মনের সুখে কাজকর্মে লাগতে পারত।

গজর-গজর করতে করতে যাচ্ছে জগা। নিমকহারাম মেয়েমানুষ। কলিকাল কিনা—ভাল করলে মন্দ হয়, গোঁসাই পুজলে কুড়ি হয়। বাগে পেলে আলটপকা যার মুণ্ডুটা কাঁধের উপর থেকে ছিঁড়ে নেবে, সেই মানুষের পিছন পিছন ঘোরে নাকি জগা! পচা-বলাই শুনতে পেলে কত না হাসাহাসি করবে কলঙ্কের কথা নিয়ে?

আশ্চর্য ব্যাপার, উঠানের উপর বড়দা। প্রথমটা মনে হয়েছিল গুণময়ী ভগিনী কিছু লাগানি-ভাঙানি করেছে, তেড়ে এসেছে ঝগড়া করবার জন্য। জগা তৈরি আছে ষোলআনার উপর আঠারআনা। অনেকদিন ধরে জমে জমে মনের আক্রোশ বিষের মত ফেনিয়ে কণ্ঠ ছাপিয়ে উঠছে। দাওয়া থেকে উঁকি মেরে দেখে জগা খাতির করে ডাকে: এস এস—কী ভাগ্যি, নতুন ঘেরির খুদে মালিক গগনবাবু আজ বাড়ির উপর এসেছেন!

পরিহাস গগন কানে নেয় না। চাঞ্চল্যকর ব্যাপারও কিছু নয়। বলে নৌকোর কাজ একেবারে ছাড়লে জগন্নাথ? ঘর থেকে তো নড়ে বস না।

জগা বলে, কাজ তা বলে তো আটকে নেই। অন্যেরা কাজ শিখে গেছে। কুমিরমারির গঞ্জে মাছের ঝোড়া নামিয়ে দিয়ে টাকা নিয়ে আসে, টাকা বাজিয়ে তুমি হাতবাক্সে তুলছ। কাজকর্ম তো দিব্যি চলেছে।

গগন বলে, সে যাই হোক, তিনটে-চারটে দিন তুমি ঠেকিয়ে দেবে জগা। মেছো-

ডিঙি কাল সকালে তুমি নিয়ে যাবে।

কেন, পচা-বলাই গেল কোথা ? মরে গেছে ?

বলাই আছে। পচা আর আমার শালা নগেনশশী বল্লাপোতার হাটুরে-নৌকোয় রওনা হল গাইগরু কিনতে। গোয়াল হল, গরু তো চাই এবারে। পচা হাঁটিয়ে নিয়ে আসবে গরু, কবে ফেরে ঠিকঠিকানা নেই।

গগন বলে, মানুষ একজন হলেই তো হল না। কোটালের টান—জলে কুটোগাছটা ফেললে ভেঙে দুই খণ্ড হয়ে যাচ্ছে। যে সে মানুষ পারবে কেন এই টান কাটিয়ে কাটিয়ে নৌকো ঠিক মত নিয়ে যেতে।

অনুনয় করে আবার বলে, তোমার পাওনাগণ্ডা পুষিয়ে দেব জগা। একেবারে হাত-পা কোলে করে বসলে হবে কেন ? নিত্যি দিন না পার, দায়ে-বেদায়ে দেখতে হবে বই কি ! না দেখলে যাই কার কাছে ? ধর, তোমার উয্যুগেই তো সমস্ত।

জগা হেসে ওঠে : গরু কিনতে গেছে, সে গরুর দুধ খাওয়াবে আমায় এক ছটাক ?

হাসতে হাসতে বলছিল। বলতে বলতে স্বর কঠিন হল : উয্যুগের কথা তুললে যখন ছিল, তখন ছিল। পুরানো সেসব দিন মনে রাখ তুমি বড়দা ?

রাখি নে ?

না। ছাড়াছাড়ি পুরোপুরি হয়ে গেছে। আজকে দায়ে পড়ে তোমার আসতে হয়েছে।

বলে জগা কথার মধ্যেই প্রশ্ন করে, কাল গান শুনলে কেমন বড়দা ? দুই দল হয়ে গেল আমাদের। আমার একটা, তোমার একটা।

গগন বলে, দল দুটো হোকগে, কিন্তু আমার কোন দল নয়। আমি তোমার দলে জগা।

চারিদিক তাকিয়ে দেখে গগন মনের কথা ব্যক্ত করে : তোমাদের পাড়া বলে কেন, কোনখানেই যাই নে। দেখেছ কোনদিন আলার বাইরে ? আমি মরে আছি জগন্নাথ। বেরুতে পারি নে ঐ নগেন শালার জন্যে। বিষম খচ্চর। দিবারাত্রি চোখ ঘুরিয়ে পাহারা দেয়। খোঁড়া মানুষ নিজে বেশী দৌড়ঝাঁপ করতে পারে না, অন্য করলে হিংসে হয়। কী জানি, তোমায় সে একেবারে পয়লা নম্বরের শত্রু ঠিক করে বসে আছে। নগনা নেই বলেই আজ তোমার কাছে আসতে পারলাম।

জগা বলে, সে জানি। আমি শত্তুর সকলেরই। তোমার বোনটাও বড় কম যায় না। তাই তো ভাবি বড়দা, কত কষ্টের জমানো আড্ডা—সেদিকে এখন চোখ তুলে তাকাবার উপায় নেই। এ জায়গায় পোকা ধরে গেছে—থাকব না এখানে। মন ঠিক করে ফেলেছি। তোমরা থাক পয়সাকড়ি আর সংসারধর্ম নিয়ে।

গগন বলে, তা আমায় দুষছ কি জন্যে ? আমি কি ওদের আনতে গিয়েছি। জান তো সবই। আসবার আগে মুখের কথাটা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল ?

কিন্তু তোমায় দিব্যি তো তেল-চুকচুকে দেখাচ্ছে। মুখের বচনের সঙ্গে চেহারার মিলছে না। খুব যে দুঃখের পাথারে ভাসছ, চেহারা দেখে মনে হয় না বড়দা।

গগন বলে, বেটা তো মার খেতে পারে—আরে, ধরে মারে তবে উপায়টা কি ? শুধু নগনা কেন, নগনার বোনটাও চোখে তুলে নাচায়। চানের আগে আচ্ছা করে তেল রগড়াতে হবে, নয়তো ছাড়ে না। খাওয়ার সময় সামনে বসে এটা খাও সেটা খাও —করবে। খাওয়া না হতে তামাক সেজে নিয়ে আসবে চারু। খেয়ে তার পরেই

বিছানায় গড়ানো। শোয়ার পরে দেখে যায় ঠিকমত ঘুমুচ্ছি কিনা। দেহে তেল না ছুঁইয়ে খায় কোথা বল।

জগাও এমনি ভাবছে। নগনার বোনকে সে ভাল জানে না, কিন্তু গগনের বোনকে জেনেবুঝে ফেলেছে। গাই-বকনা কিনে এনে নতুন গোয়ালে ঢোকাবে। বাদারাজ্যের দুর্দান্ত মানুষগুলোকে মেয়েটা ইতিমধ্যেই জাবনা খাইয়ে শিষ্টশান্ত করে গলায় দড়ি পরিয়ে টান জুড়ে দিয়েছে।

বেলা ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকার। কথা বলতে বলতে গগন আর জগা বাঁধের উপর এল। ভাটা এখন। কলকল স্বরে উচ্ছল আবর্তে জলধারা দূর সমুদ্রে ধেয়ে চলেছে। তারা-ভরা আকাশ, তারার আলো চিকচিক করছে জলে। মাটিতে নেমে-আসা মেঘের মত ওপারের ঘন কালো বাদাবন। সেইদিকে চেয়ে চেয়ে জগার মনটা পিছনের কালে ঘুরে বেড়ায়। এই যেখানটায় ঘুরছে, এখানেও তো বন ছিল আগে। আস্তে আস্তে বসতির পত্তন হচ্ছে—জনালয় একটু একটু করে হাত বাড়িয়ে বনরাজ্যে মুঠির মধ্যে চেপে ধরছে। এখানকার লীলাখেলার ইতি। নতুন চালা বাঁধতে হবে ভাঁটি ধরে আবার কোন নতুন জায়গা খুঁজেপেতে নিয়ে। সেই ফাঁকা বাদার মধ্যে হৈ-হল্লায় আবার কিছুদিন কাটাবে ঘরগৃহস্থালির বিষ-নজর যতক্ষণ সেই অবধি না গিয়ে পড়ছে।

তেত্রিশ

কুমিরমারির হাট সেদিন। মেছোডিঙি ঘাটে বেঁধে বোঠে রেখে জগা নেমে পড়ল। বলাই ভয়ে ভয়ে একবার বলেছিল, দাঁড়াও ভাই একটু। মাছগুলো উঠে যাক।

আমার কি দায় পড়েছে?

ভ্রূক্ষেপ না করে ভিড়ের মধ্যে চক্ষের পলকে সে অদৃশ্য। জগন্নাথ নিতান্ত পর-অপর এখন। গগনের খাতিরে ডিঙিটা বেয়ে এনে দিল, ডিঙি পেঁাছে গেছে—ব্যস, ছুটি। দুজন ব্যাপারী এসেছে ঐ ডিঙিতে—তাদের সঙ্গে ধরাধরি করে বলাই মাছের ঝোড়াগুলো পাইকারী-বাজারে তুলে ডাক ধরিয়ে দিল। সমস্ত বলাইর ব্যবস্থা। কাজকর্ম সে সম্পূর্ণ শিখে গেছে।

বিকালবেলা হাট পাতলা হয়ে গেল। নানা অঞ্চলের নৌকো এসে জমেছিল, বেচাকেনা সেরে একে দুয়ে সব কাছি খুলে দেয়। ঘাটের জল দেখবার জো ছিল না, আস্তে আস্তে আবার ফাঁকা হয়ে আসে। জগা সেই যে ডুব দিয়েছে—ফেরার সময় হয়ে এল, এখনো তার দেখা নেই। খুঁজে খুঁজে বলাই হয়রান। কোথায় গিয়ে পড়ে আছে—হোটেলের ভাত না-ই হোক, মুড়ি-মুড়কি জলযোগ করতেও তো একটিবার দেখা দেবে মানুষটা।

জগা তখন ছই-দেওয়া বড় এক হাটুরে-নৌকোর ভিতরে। নৌকো ছাড়ো-ছাড়ো। যারা গাঙে-খালে ঘোরে, জগাকে চেনে তারা মোটামুটি সবাই। মাঝি বলে, এ নৌকোয় উঠলে কেন তুমি? আমরা মোটে একটুখানি পথ যাব—বয়ারখোলা।

জগা বলে, এই যাঃ। বয়ারখোলার নৌকোয় উঠে বসেছি?

তুমি কি ভাবলে বল দিকি।

জগা দাঁত বের করে হাসে: যাব সহিতলা। চৌধুরিগঞ্জ হোক বরপোতা হোক—ঐদিককার একখানা হলে চলে।

মাঝি বলে, জলের পোকা হলে তুমি। তোমার এমনিধারা ভুল!

হল তো দেখছি। তামাক খাওয়াও দিকি ও বোঠেওয়ালা ভাই।

মাঝি বলে, তামাক খাবে কী এখন! গোন বয়ে যাচ্ছে, নৌকো ছাড়ব। নেমে যাও তুমি তাড়াতাড়ি।

জগন্নাথ বলে, যা কাদা! উঠে যখন বসেছি, নেমে কাদায় পড়তে ইচ্ছে যাচ্ছে না। একেবারে বয়ারখোলা গিয়েই নামা যাবে।

মাঝি বুঝে ফেলে এইবারে হেসে উঠল: বুঝলাম, বয়ারখোলাতেই যাবে তুমি। মতলব করে উঠেছ! মস্করা না করে গোড়ায় সেইটে বললে হত। নাও, বোঠে ধরে বসোগে। শিশুবর, জগার হাতে বোঠে দিয়ে জুত করে তুমি কলকে ধরাও।

হাটুরে-নৌকোর নিয়ম হল, উটকো যাত্রী টাকা পয়সায় ভাড়া দেবে না, গতরে খেটে দেবে। জগন্নাথ হেন পাকা লোক নৌকোয়, তাকে না খাটিয়ে ছাড়বে কেন?

বয়ারখোলার নৌকোয় জগন্নাথ বোঠে বেয়ে চলেছে। আর বলাই ওদিকে সমস্ত হাট পাতিপাতি করে খুঁজছে তাকে। যাকে পায় জিজ্ঞাসা করে, জগা গেল কোন্ দিকে, জগাকে দেখেছ? কটা দিন জগা নৌকোয় আসে নি, শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে। নতুন ছাটের গরুর মত জোয়াল আর কাঁধে রাখতে চায় না—ফাঁকে ফাঁকে ঘুরছে। ব্যস্ত হচ্ছে বলাই—আর দেরি করলে সাঁইতলা রাতের ভিতরেই পৌঁছনো যাবে কিনা সন্দেহ। মেছো ডিঙি নিয়ে তো আসতে হবে আবার সকালবেলা!

বয়ারখোলায় নেমে জগন্নাথ সোজা পাঠশালা-ঘরের দিকে চলল, গগন দাস একদা যেখানে গুরু হয়ে বসেছিল। গাঁয়ের মধ্যে ঐ একটা বাড়ি শুধু চেনা, ঐখানে এসে সে গগনের সঙ্গে আড্ডা জমাত। চেনা ছিল তখন গগন ছাড়া আরও একজন মানুষ —তৈলঙ্ক।

কী কাণ্ড! আলপথে চলার উপায় নেই। হলুদবরণ ধানগাছ ফসলের ভারে ঢলে পড়েছে দু-পাশ থেকে। পায়ে পায়ে ধান ঝরে পড়ে। ধানের ঘষায় পায়ের গোছার উপর খড়ির মতন ছাপ এঁকে যায়। অঘ্রান শেষ হয়ে যায়, এখনো কেটে তোলে নি ক্ষেতের ধান?

কত আর তুলতে পারে বল। খাটছে সকাল থেকে রাত দেড় পহর দু-পহর অবধি। দিনমানে ধান কেটে এনে খোলাটের উপর ফেলে, রাতে মলন মলে। যেখানে যেটুকু উঁচু চৌরস জায়গা, লেপে-পুঁছে সেখানে খোলাট বানিয়ে নিয়েছে। পাঠশালা-ঘরের উঠানও দেখ পালায় পালায় ভরতি।

ডোবার ঘাটে গাছের গুঁড়িতে ঘষে ঘষে পা ধুয়ে হাতের চটি-জোড়া পায়ে পরে জগা এবার ভদ্র হল। তাইতে আরও গোলমাল। ক্ষিপ্ত হয়ে এক ছোঁড়া চেঁচিয়ে উঠলে, বড় যে জুতোর দেমাক! মা লক্ষ্মীর ধান মাড়িয়ে চলেছ—খোল জুতো বলছি।

দাওয়ার উপরে তৈলঙ্ক। সেখান থেকে জিজ্ঞাসা করে, কাকে বলিস রে সুদন?

চিনি নে। ম্যাচ-ম্যাচ করে আসছে ধানের উপর দিয়ে।

তৈলঙ্ক বলে, কে হে তুমি? জুতো পরে ধানের উপর দিয়ে আসতে নেই। ঠাকরুনের গোসা হয়।

চটি খুলে জগা আবার হাতে নিল। ঐখান থেকে চেঁচায়: আমায় চিনতে পারলে

না তৈলক্ষ মোড়ল ? সেই কত আসতাম ! গগন গুরুকে আমিই তো জুটিয়ে দিয়েছিলাম।

তৈলক্ষ তড়াক করে উঠে পৈঠা অবধি নেমে এসে খাতির করেঃ এস এস জগন্নাথ। এদ্দিনে সময় হল ? বলি, পাকাপাকি এলে তো ? না, এসেই পালাই-পালাই করবে ?

পাকা ছড়াদারের মত কথা বলে জগা ঃ যাত্রার দলও কি পাকাপাকি তোমাদের ? যতক্ষণ দিনমান, ততক্ষণ কমল দল মেলে আছে। রাত্তির হলে আর নেই। তোমাদের যাত্রাও গোলায় ধান যতদিন। ধান ফুরোবে, দলও যাবে। পাঠশালা নিয়ে যে ব্যাপার হত। সমস্ত ছেড়েছুড়ে হাত-পা ধুয়ে উঠে আসব তোমাদের এখানে, দল গেলে আমার তখন কি গতি বল ?

চিনতে পেরে তৈলক্ষের বড় ছেলে সুদনও উঠে এসেছে দাওয়ায়। কলকেয় তামাক সেজে গেঁয়োকাঠের কয়লা ধরাচ্ছে টেমির উপর ধরে। বলে, খাটতে পারলে ভাতের অভাব ! গুরুমশায়ের কাছে যখন আসতে, ধানের ভরা নিয়ে হাটে হাটে ঘোরা ছিল তোমার কাজ। দল উঠে যাক কি যাচ্ছেতাই হোক গে, গাঙ-খাল তো শুকিয়ে যাবে না ! নতুন রাস্তাপথে এরই মধ্যে গরুরগাড়ির চল হয়েছে। তোমার মতন লোকের কি ভাবনা ?

তামাক টানতে টানতে তৈলক্ষকে জগা বলে, ক্ষেতখামার দেখতে দেখতে এলাম। চোখ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু পাঠশালা বাতিল করলে কেন বল তো মোড়ল ? নামডাক হয়েছিল বয়ারখোলার পাঠশালার। রাজী থাক তো বল—সেই গগন গুরুকে খবর দিয়ে দিই। এখন সে খেরিদার—টাকাপয়সা করছে, কিন্তু সুখ নেই। খবর দিলে পালিয়ে এসে পড়বে। ফাটক-পালানো কয়েদীর মত।

তৈলক্ষ বলে, গোড়ায় আমাদের পাঠশালার কথাই হয়েছিল। গুরুর চেষ্টায় দু-এক হাট ঘোরাঘুরিও করেছিলাম। তারপরে মাতব্বরদের মন ঘুরে গেল ঃ খরচপত্তোর দু-পয়সার জায়গায় চার পয়সা হলেও অসুবিধা হবে না—যাত্রার দল হোক এবারটা।

জগা বলে, যাত্রা আর পাঠশালা দু রকমই তো হতে পারে।

তৈলক্ষ ঘাড় নেড়ে বলে, ওইটি বলো না। যাত্রার দলে ছেলেপুলেরও অনেক কাজ। জুড়ির দল—মুখোড়ে আটটা করে ধরলে চার সারিতে আট গণ্ডা। তার উপরে রাজকন্যা সখী কেষ্ট-রাধা গোপিনী—সবই তো ছেলেপুলের ব্যাপার। তারা পাঠশালায় বসে সকাল-বিকাল ক-খ-ঠ করতে লাগল তো পেরাজ সামলায় কে ? লেখাপড়া আর পালাগান উল্টো রকম কাজকর্ম—দুটো এক সঙ্গে হয় না।

আবার নিজেই বলছে, পুরোপুরি উল্টো—তাই বা বলি কেমন করে ? পাঠ পড়তেও পড়াশুনো লাগে। মোশান-মাস্টার কাঁহাতক পড়িয়ে পড়িয়ে দেবে, শুধু একজনকে নিয়ে পড়ে থাকলে দল চলে না। তা এবারটা যাত্রা হল। দেখা যাক, কী রকম দাঁড়ায়, আরেন্দা সনে আবার নয় একটা পাঠশালা করে নেওয়া যাবে।

জগাকে বলে, দরাজ গলাখানা তোমার। এক একটা গানে আসর ফেটে চৌচির হবে। বিবেক নিয়ে ভাবনা ছিল, মা বীণাপাণি সুবুদ্ধি দিয়ে তোমায় হাজির করে দিলেন।

প্রশংসার কথায় জগা চুপ করে আছে।

তৈলক্ষ বলে, কি ভাবছ ? ভাবনার কিছু নেই। জবর মাস্টার জোগাড় হয়েছে।

সবাই তো নতুন। সকলের সঙ্গে তুমিও শিখে পড়ে নিও। ঠিক হয়ে যাবে।

জগার অভিমানে আঘাত লাগে : আমায় কাঁচা লোক ঠাওরালে নাকি তৈলক্ষ মোড়ল? যাত্রার নামে ঘর ছেড়ে বেরুই—কতটুকু বয়স তখন! বিবেকই তো কত জায়গায় কতবার করেছি! মেডেল আছে, জাটঘরার রসিক রায় দিয়েছিল। বিষম খুঁতখুঁতে মানুষ—তার হাত থেকে মেডেল জিতে নিয়েছি আমি। চাট্টিখানি কথা নয়।

পরনে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, কপালে সিঁদুর আর চন্দন, গলায় এক বোঝা কড় রুদ্রাক্ষ আর কাঠের মালা—এই হল বিবেকের সজ্জা। একটো নয়, কথাবার্তা একটিও বলে না, গান শুধুমাত্র। শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্য থেকে সম্রাটের শুদ্ধান্তঃপুর—বিবেকের গতি সর্বত্র। চক্ষের পলকে কোন্‌ কৌশলে পেঁছে যাচ্ছে, তার কোন ব্যাখ্যা নেই। মানুষজন যাত্রার আসরে বসে এই সব আজেবাজে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাইরের দেশদেশান্তর শুধু নয়, মনের অভিসন্ধিতেও বিবেকের অবাধ ঘোরাঘুরি। কোন্‌ লোক মনে মনে কি ভাবছে, সে তা সঠিক জানতে পারে। অত্যাচারীকে সাবধানবাণী শোনায়, বেদনায় মুহ্যমান বিরহিণীকে প্রিয়-মিলনের ভরসা দেয়, দুঃখে ভেঙে-পড়া মানুষকে আশার বাণী বলে। যাত্রার দলে ভারী খাতির বিবেকের। আসর মুকিয়ে থাকে—যখন বড্ড সঙ্গিন অবস্থা, বুঝতে পারে এইবারে এসে পড়বে বিবেক। দুঃখ-বেদনায় মানুষ আর নিশ্বাস নিতে পারছে না—ঠিক সেই চরমক্ষণে দেখা গেল, আধ-খাওয়া বিড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটেছে বিবেক আসর পানে। আধা-পথেই গান ধরেছে—

তিষ্ঠ তিষ্ঠ ওরে দুষ্ট, (ও তোর) ইতো নষ্ট ততো ভ্রষ্ট,
ঘটিবে অনিষ্ট ঘোর, বুঝিবি কি মহা কষ্ট—

আসর জুড়ে বাহবা-বাহবা রব। উল্লাসে শ্রোতারা ফেটে পড়ছে। রক্ষে পেয়ে গেল এতক্ষণে। পাপের ক্ষয়, পুণ্যের জয়—আর কোন সংশয় নেই বিবেকের এই গানের কথার পরে। পুণ্যবান নায়কের মুণ্ড দুই খণ্ড হয়ে গেলেও শেষ অঙ্কে নির্ঘাৎ সে বেঁচে উঠবে। ঝোঁকের মাথায় বিবেকের নামে মেডেলই বা হেঁকে বসল মুরুব্বীদের কেউ।

এ হেন বিবেকের পাঠ আবার এসে যাচ্ছে। মানিক হাতের মুঠোয় পেয়ে ছাড়ে কেউ কখনো? চুলোয় যাকগে সাঁইতলা আর গগন দাসের ঘেরি। সাধ করে বানানো আলা পয়মাল করে দিল মানবেলা থেকে ছিটকে-পড়া ওরা ঐ তিনটি প্রাণী। বিশেষ করে মাতব্বর ঠাকরুনটি—ঐ চারু।

কুমিরমারির হাট থেকে জগা নিরুদ্দেশ। জীবনে এমন কতবার ঘটেছে। সাঁই-তলার উপর তিতিবিরক্ত, বয়ারখোলার দলের মধ্যে সে জুটে গেল।

চৌত্রিশ

ভাল যাত্রার দলে বারমেসে কাজকর্ম। বৃষ্টিবাদলার সময় তিনটে কি চারটে মাস ঘরে বসে কাজ। পালা ঠিক করে ফেলে পাঠ লেখাও, পেরাজ দাও, সাজপোশাক বানাও, বাক্সপেঁটরা গোছাও। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, দেয়া ডাকছে, ঘরের মধ্যে ঝুনুঝুনু ঝুনুঝুনু সখীদের পায়ের ঘুঙুর, রাজকন্যা ছোঁড়াটার নাকি-সুরের একটো। সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি একনাগাড়ে চলেছে। তারপর বৃষ্টিবাদলা বিদায় হল তো

মজা এইবারে। দেশ-দেশান্তর চরে।ফিরে গাওনা করে বেড়াও। নতুন নতুন মানুষ। আজকে এই গাঁয়ে পাত পেড়ে খাচ্ছি, কালকের অন্ন কোথায় মাপা আছে সে জানেন দেবী অন্নপূর্ণা আর দলের ম্যানেজার।

এসব পেশাদারী পাকা দলের রীতি। বাদা অঞ্চলের শখের দলের পরমায়ু অখণ্ড নয় অমনধারা। এ বছর রমারম চলছে—কিন্তু ও-বছর চলবে কিনা, সেটা নির্ভর করে ক্ষেত কি পরিমাণ ফসল দেবে তার উপরে। খামার ভরা তো মনও ভরা। খামার খালি তো তিন বেলার তিন পাতড়া ভাত কোন্ কৌশলে জুটবে, মানুষ তখন তাই ভাববে—আমোদস্ফূর্তি উঠে যাবে মাথায়। ভিন্ন বছরের কথাই বা কেন, সামনের বোশেখ-জষ্ঠিতেই দেখা যাবে ধান যত গোলা-আউড়ির তলায় এসে ঠেকছে, দলের মানুষ দুর্লভ হচ্ছে ততই। আয়ান ঘোষ আসেনি আজকের আসরে, যে লোকটা মৃত-সৈনিক করে তাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে আয়ানের কথাগুলো তার মুখে জুড়ে দেওয়া হল। কিন্তু পরের দিন খোদ রাধিকাই গরহাজির। শখের দল, শখ হল তো আসবে। মাইনে খায় না যে কান ধরে বেত মারতে মারতে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। তেমনি ওদিকে পালাগান দেওয়ার মানুষও ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। নিয়ম ছিল, বায়না পনের তঙ্কা নগদ এবং খাওয়া। পনের কমিয়ে দশ, তারপরে পাঁচ, ক্রমশ ষোলআনাই মকুব হয়ে গেল—শুধুমাত্র এক বেলা পেটে খাওয়া দলের লোক ক'টির। এ সুবিধা দিয়েও কাউকে রাজী করানো যায় না। এখন খোরাকির দাবিও তুলে নেওয়া হয়েছে। সামিয়ানা খাটিয়ে অথবা কোন রকম একটা আচ্ছাদন দিয়েও দাও উঠানে। পান-তামাক এবং লণ্ঠনের প্রয়োজনীয় কেরোসিনটুকু দাও—ঘরে খেয়ে তোমার বাড়ি গেয়ে আসব। তবু কালভদ্রে কদাচিৎ গাওনার ডাক পড়ে।

তবে জগা করিতকর্মা লোক—দল একেবারে উঠে গেলেও সে বসে থাকবে না। বিবেক সাজা ছাড়াও কাজ জুটিয়ে নিয়েছে, পয়সা রোজগারের নতুন ফিকির। কুমির-মারির নতুন রাস্তা বয়ারখোলা ফুঁড়ে সোজাসুজি চলে গেছে চৌধুরিগঞ্জের দিকে। দু-তিন বছর মাটি ফেলার পরে রাস্তা মোটামুটি চালু এখন। বাদার মানুষ দিনকে-দিন ভদ্র হয়ে উঠে ডাঙার পথে চলাচল শুরু করেছে। জলচরেরা স্থলচর হচ্ছে ক্রমশ। আরও দেখবে দু-চার বছর বাদে খোয়া ফেলে পাকা করে দেবে যখন এই রাস্তা - শহর-জায়গার মতন মোটরবাস ছুটাছুটি করবে আবাদের পাকা-রাস্তা দিয়ে। এখন কিছু গরুরগাড়ি চলে মাটির রাস্তায়। খামারের ধান গাড়িতে চাপান দিয়ে খোলাটে তোলে, এই কাজে মানুষ নৌকোর হাঙ্গামা নিতে চায় না। তবে ভগবতীর স্কন্ধে চেপে যাওয়া বলে মানুষ সোয়ারি কিছু দ্বিধা করে গরুরগাড়ি চাপতে। মেয়েলোক হলে তো কিছুতেই নয়। কিন্তু কতদিন! উত্তর-দক্ষিণে টানা পথ, জোয়ার-ভাঁটার তোয়াক্কা নেই—অতএব জরুরী কাজকর্ম থাকলে এবং গাঙে বেগোন হলে নিতেই হবে গরুরগাড়ি।

তৈলক্ষ মোড়ল একখানা গরুরগাড়ি করেছে। সুদন চালায়। কাজকর্ম না থাকলে জগাও এক-একদিন গাড়োয়ান হয়ে গাড়ির মাথায় চেপে বসে। ডা-ডা-ডা-ডা—খাসা লাগে গরুর লেজ মলে এমনি ধরনের মোলাকাত করতে। নৌকোর কাজে জগার জুড়ি নেই, গাড়ির কাজেও ক'টা দিনের মধ্যে দেখতে দেখতে ওস্তাদ হয়ে উঠল। আবার মোটরবাস চালু হয়ে গেলে জগা যদি ড্রাইভার হয়, তখনও দেখো তার সঙ্গে কেউ গাড়ি দাবড়ে পারবে না।

চৈত্রের গোড়া অবধি ধান বওয়াবয়ি চলল, গাড়ির তিলেক ফুরসত নেই। মাঠের

কাজকর্ম সারা হয়ে গেলে সুদেন গাড়ি নিয়ে কুমিরমারি যেতে লাগল। হয় কিছু কিছু রোজগার। বিশেষ করে হাটবাজারগুলো ফাঁক পড়ে না, ব্যাপারীদের মাল পেঁছে দেবার ভাড়া পাওয়া যায়। অন্য ভাড়াও জোটে অথরেসবরে।

একদিন এক কাণ্ড হল। মানুষ সোয়ারি দু-জন। কুমিরমারি তারা মোটরলঞ্চে করে এসেছে। যাবে চৌধুরিগঞ্জ। এসেছে দেড় প্রহর বেলায়, গাঙে ভাঁটি তখন, সঙ্গে সঙ্গে নৌকো নিলে সন্ধ্যার আগে করালীর সাঁইতলা-খালের মোহনায় নামিয়ে দিত। তবু কিন্তু নৌকোয় গেল না তারা, অত সকাল সকাল পেঁছতে চায় না। গদাধর ভটচাজের হোটেলে ভরপেট খেয়ে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে যখন উঠল, তখন প্রায় সন্ধ্যা। হাটেরও শেষ হয়ে এসেছে। ভরা জোয়ার, নাবালে কোন নৌকো যাবে না। দেখ, কোথায় গরুরগাড়ি পাওয়া যায়।

খোঁজে খোঁজে সুদেনকে গিয়ে ধরল। চরের উপর গরু ছেড়ে দিয়ে হাটখোলার প্রান্তে গাছের ছায়ায় গাড়ির চালার উপর সে শুয়ে আছে। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে, জ্বর হয়েছে। ব্যাপারীর ধানের বস্তা বোঝাই দিয়ে গাড়ি দাবড়ে আসছিল ঠিক-দুপুর-বেলা, পথের মধ্যে জ্বর এসে গেল। বস্তাগুলো কোন গতিকে হাটে নামিয়ে সেই থেকে শুয়ে পড়ে আছে। হাটুরে অনেকেই তো বয়ারখোলা ফিরবে, তাদের একজন কেউ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে, সুদেন শুয়ে পড়ে থাকবে অমনি—এই মতলব মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। এমনি সময় গদাধর মধ্যবর্তী হয়ে এসে ধরল: নৌকো নেই, অন্য গাড়িও পাওয়া যাচ্ছে না, এই দুটো মানুষকে চৌধুরিগঞ্জে নিয়ে যেতে হবে। জরুরী কাজ ওঁদের, পেঁছতেই হবে। ন্যায্য ভাড়া পাবে, না হয় কিছু বেশী ধরে নেবে। নিতেই হবে মোটের উপর।

দর কষাকষি করে শেষ পর্যন্ত যে অঙ্কে রফা হল, তার পরে আর শুয়ে থাকা চলে না। উঠে বসল সুদেন তড়াক করে।

গাড়ির ছই কিন্তু নেই মশায়। সেটা অবধান করুন।

ভুঁড়িওয়ালা মোটাসোটা ইয়া এক লাস—প্রমথ হালদার, চৌধুরি-এস্টেটের সদরনায়েব। প্রমথ বললেন, সে তো দেখতেই পাচ্ছি বাপু। চোখ আমাদের কানা নয়। ধানের বস্তা বোঝাই দিস, বেশ তো আমরাও বস্তা হয়ে যাচ্ছি। হেলব না, দুলব না, নড়াচড়া করব না—তবে আর কি! সুখ করতে কে চাচ্ছে, গিয়ে পেঁছলেই হল।

কত কষ্টে যে সুদেন বয়ারখোলা অবধি গাড়ি চালিয়ে এল সে জানেন মাথার উপরে যিনি আছেন। বাপের পুণ্যের জোরে, তাই মুখ থুবড়ে পড়ে নি। আর পারে না। বড় রাস্তা ছেড়ে বেশ খানিকটা আলপথ ভেঙে তৈলক্ষ মোড়লের বাড়ি। গাড়ি থেকে নেমে পড়ে গরুর কাঁধের জোয়াল নামিয়ে সুদেন বলে, আর যাবে না, নেমে পড়ুন এবারে—

রোগা লিকলিকে অন্য মানুষটা—আদালতের পেয়াদা, নাম নিবারণ। সে খিঁচিয়ে ওঠে: তেপান্তরের মধ্যে এসে বলে নেমে পড়ুন। ইয়ার্কি? আমাদের যা-তা মানুষ ভাবিস নে। উনি হলেন ফুলতলা এস্টেটের নায়েব। জানিস তো—নবাব আর নায়েব এক কথা। দশখানা লাটের মালিক, প্রতাপে বাঘ আর গরু এক ঘাটে জল খায়।

প্রমথও তেমনি মেজাজে নিবারণের পরিচয় দেন: আর এই যে এঁকে দেখছ,

সরকারী লোক ইনি। চাপরাসখানা দেখাও না হে নিবারণ। সরকার নিজে আসেন না, মানুষ দিয়ে কাজকর্ম করান। এঁর পায়ে একখানা যদি কাঁটা ফোটে, সেটা সরকারের পায়ে ফোটার সামিল। জানিস?

বাদা রাজ্যের বোকাসোকা মানুষ সুদেন—খুব বেশী বিচলিত, এমন মনে হয় না। বলে, চন্দ্র-সূর্যি যা-ই হোন হুজুর মশায়রা, মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি। নতুন ছাঁটের গরু, আপনাদের সুদ্ধ কোন্ খানাখন্দে নিয়ে ফেলবে, ঠেকাতে পারব না। সেটাই কি ভাল হবে মশায়রা?

প্রমথর মেজাজ খাদে নেমে এল: তা হলে কি করব বাবা, উপায় একটা কর। চৌধুরিগঞ্জে যেতেই হবে, জরুরী কাজ। অত ভাড়া কবুল করলাম তো সেই জন্যে।

সুদেন একটুখানি ভাবল। জগন্নাথের কথা ভাবছে। বলে, আছে একজন আমাদের বাড়ি। মেজাজ-মরজি ভাল থাকলে সে আসতে পারে। সে হলে ভালই হবে। খাঁ করে পৌঁছে দেবে, তার মতন গাড়িয়াল এ পাইতক্কে নেই। এইখানে থাক একটু তোমরা, বাড়ি গিয়ে বলে কয়ে দেখি। গরু দুটো রইল, ভয় কি তোমাদের?

যাত্রার বায়না বিষম মন্দ এখন। পেরাজের ঘরে জগা বিনা কাজে একলা বসে ছিল। অত দরের মানুষ দুটি বিপাকে পড়েছে—শুনতে পেয়ে দ্বিরুক্তি না করে সে রাস্তায় ছুটল। গরুর কাঁধে জোয়াল তুলে দিল: ডা-ডা ডা-ডা—গরু তুই ভেবেছিস কোন্টা? হুজুরের জরুরী কাজ। চাঁদ উঠবার আগে সাঁইতলার খাল পার করে দিবি। নয় তো কোন মতে ছাড়ান নেই।

গাড়ি চলেছে-চলেছে। মাঠ ছেড়ে জঙ্গলে এল। খানিকটা জায়গা হাসিল হয় নি এইখানে। হাসিল না হলেই বা কি—কাঠকুটো বেচেও পয়সা। বাদাবনের এই বড় মজা। যেমন-কে-তেমন বন রেখে দাও, পয়সা গণে দিয়ে কাঠ কেটে নিয়ে যাবে। হাসিল করে নোনা জলে বুড়িয়ে রাখ, গাঙ-খালের চারা মাছ এসে আপনি জন্মাবে। কঠিন বাঁধের ঘেরে নোনা জল ঠেকিয়ে রেখে লাঙল নামাও, লক্ষ্মীঠাকরুন সোনার ঝাঁপি উপুড় করে ক্ষেতময় ধান ঢালবেন, ডাঙা অঞ্চলে তার সিকির সিকি ফলন নেই।

দু-পায়ে জঙ্গল, গরুর গাড়ি চলেছে নতুন মাটির রাস্তার উপর দিয়ে। ডালপালা ছাতের মতন মাথার উপরে। আকাশে চাঁদ নেই, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

রাস্তাও তেমনি এই দিকটায়। উঠেছে, উঁচুমুখো উঠে চলেছে—স্বর্গধামে নিয়ে তোলার গতিক। হুড়মুড় করে তক্ষুনি আবার পাতালের তলে পতন। ভেঙেচুরে গাড়ি উলটে পড়ে না, লোহা দিয়ে ধুরো বানানো নাকি হে?

নিবারণ সুমিষ্ট স্বরে বলেন, পথ ভুল করে হিমালয় পর্বতে ওঠ নি তো বাবা? দেখ দিকি ঠাহর করে।

আর প্রমথ হালদার গর্জন করে উঠলেন, কোথায় আনলি? হাড়-পাঁজরার জোড় খুলে মারবি নাকি রে হারামজাদা?

গালিগালাজে জগার স্ফূর্তি বেড়ে যায়। কানের কাছে মধুকণ্ঠে যেন তার তারিপ হচ্ছে। হি-হি করে হেসে বলে, গরুর খাবার খড় রয়েছে পিছন দিকে। আঁটি-গুলো টেনে গদি করে নিয়ে গতর এলিয়ে দিন। ঝাঁকুনি লাগবে না, আয়েস ঘুম এসে যাবে।

সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রমথ নির্ণিমেষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দেখেন। শঙ্কিত কন্ঠে বলেন, রাত দুপুরে কোন্ অজাঙ্গ জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেললি, পথ বলে তো মালুম হয় না। সে বেটা গাড়িতে তুলে মাঝপথে চম্পট দিল। ভাড়ার লোভে ভাঁওতা দিস নে—সত্যি কথা বল, পথঘাট চিনিস তো সত্যি সত্যি?

জগন্নাথ বলে, বাদা রাজ্যি হুজুর। ফুলতলার মত বাঁধা শড়ক কোথা এখানে? এ-ও তো ছিল না এদ্দিন। সাপ-শুয়োরের চলা চলে পথ পড়ত, তাই ধরে আমরা যেতাম।

প্রমথর সর্বদেহ সিরসির করে ওঠে: বলিস কি, সাপ-শুয়োর খুব বেরোয় বুঝি?

জগা বলে, ওঁরা তো সামান্য। বড়রাও আছেন। রাতের বেলা নাম করব না হুজুর।

জঙ্গল আরও এঁটে আসে। রাত্রিচর পাখির ডাক। গাছগুলো জোনাকির মালা পরেছে। পাতায় ডালে হাওয়া ঢুকে অনেক মানুষের ফিসফিসানির মতো শোনা যায় চতুর্দিকে।

সজোরে গরুর লেজ মলে জগা চেঁচিয়ে ওঠে: ডা-ডা ডা-ডা—নড়িস না মোটে! বেতো-রুগী হলি নাকি রে নায়েব মশায়?

প্রমথ হালদার নিজের চিন্তায় ছিলেন। চমকে উঠে বললেন, নায়েব কাকে বলিস রে হতভাগা?

জগা ভালমানুষের ভাবে বলে, গরুর নাম হুজুর। মানুষজন কেউ নয়। এই ডাইনের ইনি। খেয়ে গতরখানা বাগিয়েছে দেখুন। তিন মনের ধাক্কা। তোয়াজের গতর পারতপক্ষে নড়াতে চান না। শুয়ে শুয়ে খালি জাবর কাটবেন, আর লেজে মাছি তাড়াবেন। পিটুনি দি হুজুর, আবার নায়েব মশায় বলে তোয়াজও করি। যাতে যখন কাজ হয়।

নিবারণ শুনে ফিকফিক করে হাসে। রসটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। বলে, বড্ড ফাজিল তুই তো ছোঁড়া। নায়েব হলেই বুঝি গায়ে-গতরে হতে হবে? কটা নায়েব দেখেছিস তুই শুনি।

জগা সঙ্গে সঙ্গে বলে, দেখব কোথায় হুজুর? সে সব ভারী ভারী মানুষ বাদাবনে কি জন্য মরতে আসবেন। নায়েব দূরস্থান, চাপরাসীই বা ক'টা দেখেছি? এদ্দিন বাদে মানুষের গতিগম্য হওয়ায় এখনই যা একটি-দুটি আসতে লেগেছেন। বাঁয়ের এই এনারে দেখছেন, রোগা প্যাঁকাটি, পাঁজরার হাড় গণে নেওয়া যায়—কিন্তু ছোটে একেবারে রেলের ইঞ্জিনের মতন। চুঃ-চুঃ। চাপরাসী ভাই, অত ছুটলে নায়েব পেরে উঠবে কেন? মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।

অর্থাৎ ডাইনের গরু নায়েব, বাঁয়ের গরু চাপরাসী। কাউকে বাদ দেয় নি। নিবারণও অতএব চুপ। অন্ধকারে গা টেপাটেপি করছেন দুজনে। গাড়োয়ান টের পেয়ে গেছে, একজন হলেন চৌধুরি-এস্টেটের সদর নায়েব, অপরে আদালতের চাপরাসী। সেই আগের ছোঁড়াই নিশ্চয় বলে দিয়েছে। মেজাজ হারিয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে ফেলা উচিত হয় নি তখন। পাকা-লোক হয়ে বিষম কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন, তার জন্যে মনে মনে পস্তাচ্ছেন এখন। গাড়োয়ান কৌতুক করে গরু দুটো এঁদের দুই নামে ডাকছে। তা সে যাই করুক, কানে তুলো আর মুখে ছিপি আঁটলেন আপাতত। ভালয় ভালয় চৌধুরিগঞ্জে পেঁছানো যাক, তারপরে শোধ নেওয়া যাবে।

পথের মাঝখানে এখন কিছু নয়।

চলেছে। এক সময় প্রমথ বললেন, দু-ঘণ্টায় পে'ছৈ দেবে বলেছিলে কিন্তু বাবা।

ঘাড় নেড়ে সজোরে সমর্থন করে, দেবই তো—

প্রমথ দেশলাই জেলে বিড়ি ধরালেন। অমনি ট্যাঁক থেকে ঘড়িটা বের করে দেখে নিলেন ঃ এগারোটা বেজে গেছে।

জগা বলে, কলের ঘড়ি যদি লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটে। গরু তার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন হুজুর?

কথার তুবড়ি, জবাব দিতে দেরী হয় না। নিবারণেরও ধৈর্য থাকে না। খিঁচিয়ে উঠল ঃ একের নম্বর শয়তান হলি তুই!

পরম আপ্যায়িত হয়েছে, এমনি ভাবে দন্ত মেলে জগা বলে, আজ্ঞে হাঁ, সবাই বলে থাকে একথা। আপনারাও বলছেন।

নিবারণের গা টিপে প্রমথ হালদার থামিয়ে দিলেন। বলেন, ভালই তো, দেরি তাতে কি হয়েছে! দিব্যি ডাঙায় ডাঙায় যাচ্ছি—জলে পড়ে যাই নি। খাসা আমুদে লোক তুমি বাবা, হাসিয়ে রসিয়ে কেমন বেশ নিয়ে যাচ্ছ। চৌধুরিগঞ্জের একটা লোক কিন্তু বলে এসেছিল, কুমিরমারির নতুন-রাস্তায় ডাঙাপথে দু-ঘণ্টা হদ্দ আড়াই ঘণ্টার বেশী লাগে না।

কে লোক—অনিরুদ্ধ?

তাকেও চেন তুমি? বাঃ বাঃ, সবই দেখছি চেনাজানা তোমার। কিন্তু দু-ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টা হতে চলল, পথ ঠিক মত চেনা আছে তো? মানে বড্ড আঁধার কিনা, আর চলেছ জঙ্গল-জাঙাল ভেঙে—

জগা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, আমি ভুল করলেও গরু কখনো ভুল করবে না হুজুর। কত ধান বওয়াবয়ি করেছে, ছেড়ে দিলে চরতে চরতে কত দূর অবধি চলে যায়। পথ-ঘাট গরুর সব নখদর্পণে থাকে।

সশঙ্কে নিবারণ বলে ওঠে, কী সর্বনাশ! সে ছোঁড়া তো জ্বরের নাম করে বাড়ি গিয়ে উঠল। তুই তবে কি গরুর ভরসায় এই রাত্রে আমাদের বাদার পথে ঘোরাচ্ছিস?

আজ্ঞে হুজুর, ভয় করবেন না। মানুষের চেয়ে গরুর বুদ্ধি বেশী। চাপরাসী হুটকো মতন আছে, তার কথা বাদ দিলাম। কিন্তু নায়েবমশায়টি হল ভারী সেয়ানা —দেখেশুনে হিসেব করে চরণ ফেলে। পিটিয়ে খুন করে ফেলেন, কিছুতে বেপথে যাবে না। এক কাজ করেন আপনারা—এক এক আঁটি খড় মাথার নিচে বালিশ করে নিয়ে ঘুম দেন। উতলা হবেন না, ভাবনা করবেন না। আলার উঠোনে হাজির হয়ে আপনাদের ডেকে তুলে দেব।

বলে মনের স্ফূর্তিতে জগা গান ধরে দেয়—

ও ননদী পোড়াকপালি,
মিথ্যে বলে মার খাওয়ালি?
আসুক তো শ্বশুরের বেটা,
বলে দিব তারে—
ভাত-কাপড় না দিবার পারে,
বিয়া কেন করে?

প্রমথ ডাকছেন, শোন বাপধন—

কলি কয়েকটা সমাধা করে থেমে গিয়ে জগা বলে, আজ্ঞে ?

বলছি কি, চুপচাপ চল। গান-টান আলায় গিয়ে হবে।

জগা বলে, ভাল লাগছে না হুজুর ? আমার গানের সবাই তো সুখ্যাতি করে।

খুব ভাল লাগছে। ভারী মিঠে গলা তোমার। তবে ঐ যে বললে, এ পথে আরও অনেকের চলাচল। রাতে নাম করতে নেই, তাঁরাও সব ঘোরাফেরা করেন। দরকার কি, গান শুনতে তাঁরা যদি গাড়ির কাছ ঘেঁষে আসেন!

এবারে জগা রীতিমত ধমকে উঠল: তবে বাদাবনে আসতে গেলেন কেন হুজুর ? পাকা ঘরের মধ্যে মেয়েমানষের মত ঠ্যাং ধুয়ে বসে থাকুন, সেই তো বেশ ভাল। ভরদ্বাজ মশায় কিন্তু এদিক দিয়ে বেশ জবর। বনবাদাড় গ্রাহ্য করে না, একলা চরে বেড়াতে ভয় পায় না রাত্তিরবেলা।

প্রমথও চটেছিলেন। কি একটা জবাব দিতে গিয়ে সামলে নিলেন। ভারী যেন রসিকতার কথা—হেসে উঠলেন তেমনি ভাবে। বললেন, ভরদ্বাজকেও জান তুমি ? খাসা লোক তুমি হে – দুনিয়ার সকলের সঙ্গে ভাবসাব, সব কিছু জানাশোনা!

ঢাকের আওয়াজ আসছে। আওয়াজ মৃদু—অনেকটা দূরে বলেই। জগা বলে, শুনতে পাচ্ছেন ? কালীতলায় পুজো দিচ্ছে কারা ?

প্রমথ বলেন, জায়গাটা কোথায় ?

করালী গাঙের উপর। আসল সাঁইতলা—সাঁইয়ের যেখানটা আসন ছিল। আপনাদের চৌধুরিগঞ্জ ওর আগেই পেয়ে যাব। গরু তবে ভুল পথে আনে নি, বুঝতে পারছেন ?

প্রবল উৎসাহে গরু দুটোর পিঠে পাঁচনির খোঁচা দিয়ে জগা জিভে টক্কর দেয়: টক-টক। চল সোনামানিক ভাইরা আমার, টেনে চল পথটুকুন। বাবুরা বখশিশ দেবেন। খইল মেখে সরেস জাবনা খাওয়াব। চল।

হুড়মুড় করে, পড়বি তো পড়, গরুর গাড়ি একেবারে জলের মধ্যে। ছিটকে উঠল জল—মুখে-চোখে কাপড়ে-জামায় জল এসে পড়ল। প্রমথ শুয়ে পড়েছিলেন গামছার পুঁটুলি মাথার নিচে গুঁজে দিয়ে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

কোথায় এনে ফেললি রে ?

পথে জল জমেছে সন্দ করি।

ব্যাকুল কণ্ঠে প্রমথ বলেন, দু-মাসের ভিতর আকাশে এক কুচি মেঘ দেখলাম না, জল জমবে কেমন করে ? কি গেরো, কোন্ অথই সমুদ্দুরের মধ্যে এনে ফেলেছিস। এখন উপায় কি বল ?

জগন্নাথ ইতিমধ্যে লাফিয়ে পড়েছে। জল সামান্য, কিন্তু হাঁটু অবধি কাদায় ডুবে গেল। সেই যাকে বলে প্রেম-কাদা—সমস্ত রাত্রি এবং এক পুকুর জল লাগবে ছাড়াতে। এদিক-ওদিক ঠাহর করে দেখে সে হেসে উঠল: সমুদ্দুর নয় আজ্ঞে, খাল—সাঁইতলার খাল যাকে বলে। প্রায় তো বাড়ি এনে ফেলেছে।

আবার কৈফিয়তের ভাবে বলে, নতুন রাস্তা তৌলগাঁতি হয়ে গেছে। অনেকখানি ঘুরপথ। খালের উপর পুল বানাচ্ছে, এখনো শেষ হয় নি। নায়েব মশায় তাই বোধ হয় ভাবল, খাল ভাঙতে হবে তো একেবারে সোজাসুজি গিয়ে উঠি। চাপরাসীর সঙ্গে বড় করে কখন ডাইনে নেমে পড়েছে, গানের মধ্যে সেটা ঠাহর করে উঠতে পারি নি।

নিবারণ দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে: বেশ করেছ! রাত দুপুরে গামছা পরে খাল

সাঁতরাতে হবে কিনা, সেইটে জিজ্ঞাসা কর এবার তোর নায়েব মশায়কে।

জগন্নাথ অভয় দেয়ঃ নির্ভাবনায় বসে থাক চাপরাসী ভাই। নায়েব মশায় নড়াচড়া করো না—ওজনে ভারিক্কী কি না, নড়াচড়ায় চাকা বসে যাবে। গরু মানুষের মতন বেয়াক্কিলে নয়। এনে ফেলেছে যখন, ঠিক ও-পারে নিয়ে তুলবে।

পঁয়ত্রিশ

চেষ্টায় কসুর নেই। দুই গরুতে টানছে, আর জগন্নাথও ঠেলছে পিছন থেকে প্রাণপণে। কাদা মেখে ভূতের চেহারা। গাড়ি হাত দশেক এগুল এমনি ভাবে। জল আরও বেড়েছে। তার পরে কাদায় চাকা এমনি এঁটে গেল, ধাক্কাধাক্কিতে আর এক চুল নড়ে না। প্রমথর ভিতরটা রাগে টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু পথের মাঝখানে বিপদ—ঐ ছোঁড়া ছাড়া অন্য কোন মানুষ কাছেপিঠে নেই। অতএব ঠোঁটে কুলপ এঁটে আছেন তিনি, এবং বাপু-বাছা করছেন। একবার কোন রকমে চৌধুরিগঞ্জের চৌহদ্দির ভিতর নিয়ে তুলতে পারলে হয়। তখন নিজমূর্তি ধরবেন, ফ্যা-ফ্যা করে হাসার মজা দেখিয়ে দেবেন।

কি হল রে বাপধন?

এতখানি কাদা, আগে ঠাহর হয় নি। চাকা একেবারে কামড়ে ধরেছে। যেন কুমিরের কামড়, ছাড়ছে না।

প্রমথ বললেন, ঘুর হয় হোকগে। সোজা সড়কে কাজ নেই। গাড়ি ঘুরিয়ে নে তুই বাবা। তেলিগাঁতির পুল হয়েই যাব।

জগা হেসে ওঠেঃ বললেন ভাল কথাটা। চাল বাড়ন্ত—তবে ভাতেভাতই চাপিয়ে দিগে। গাড়িই যদি ঘুরবে, আর দশ হাত গেলেই তো কাদা পার হওয়া যেত।

নিবারণ হাত-মুখ নেড়ে বলে, বলিহারি গাড়োয়ান তুই বাপু। যেন মাংনা-সোয়ারি তুলেছিস। খালের মাঝখানে গাড়ি নামিয়ে বলে, আর নড়বে না। আমরা এখন কি করব, সেটা বল তবে।

জগা বলে, ঘাবড়ান কি জন্যে? পেঁছেই তো গেছেন। চৌধুরিগঞ্জ কতই বা হবে—দু-ক্রোশ কি আড়াই ক্রোশ বড় জোর। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে যান দিব্বি ঠান্ডায় ঠান্ডায়। গাড়ি-গরুর কপালে যা আছে তাই হবে।

প্রমথ সকাতরে বলেন, সে এই চাপরাসী মশায় পারবে। সমন নিয়ে জলজাঙাল ভাঙা অভ্যাস, গায়ে লাগবে না! আমার তো বাপু ফরাসে বসে হুকুম ঝাড়া কাজ —কলের ইঞ্জিন নই যে কল টিপলে অমনি পেঁ করে বেরিয়ে পড়লাম।

জগা দেশলাই জেবলে বিড়ি ধরাল। কাঠিটা ধরে প্রমথর দিকে চেয়ে থাকে। বলে, সে কথা একশ বার। ফরাসে বসে বসে গতরখানা পর্বত করেছেন। এতখানি গতর আমি বুঝি নি, গরুও বোঝে নি। গাড়ি তা হলে খালে নামাত না। অ্যাদ্দিন ঘর করছি ওদের নিয়ে, হেন অবিবেচনার কাজ ওরা কখনো করে নি।

প্রমথ বলেন, গরু একেবারে ঘুমিয়ে পড়ল মনে হচ্ছে। হাল ছেড়ে দিস নি বাপু, পিঠে দু-চারটে বাড়ি দে, আরও খানিক টানাটানি করে দেখুক।

জগা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়লঃ না, হুজুর, ঠিক উল্টো। বিগড়ে যাবে গরু। ডাইনের এই যে নায়েবটাকে দেখছেন—বেটা বিষম মানী। মান করে শুয়ে পড়বে জলের মধ্যে। গাড়িও কাত হয়ে পড়বে, শুয়ে বসে জুত হবে না হুজুরদের। তার

চেয়ে যেমন আছেন, চুপচাপ থাকেন। গরু ঘাটাতে যাবেন না, ওরাও এমনি থির হয়ে থাকবে।

আবার বলে, থাকেন একটু বসে। আমি বরঞ্চ লোকজন ডেকে আনি। আর জোয়ার অবধি থাকতে পারেন তো নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ হয়ে যাবে। জল বেড়ে গিয়ে কাদার আঁটাআঁটি থাকবে না। দু-দশ ঠেলায় গাড়ি উঠে যাবে। ঠেলতেও হবে না, গরু দু-জনে টেনে তুলে ফেলবে।

প্রমথ বলেন, আরে সর্বনাশ—জোয়ার অবধি ঠায় বসিয়ে রাখবি? লোক ডেকে নিয়ে আয় তুই।

নিবারণ বলে, লোক কদ্দুর?

তার কোন ঠিকঠিকানা আছে? চৌধুরিগঞ্জ অবধি যেতে হতে পারে, কপালে থাকলে পথে মাছ-মারা লোক পেতে পারি।

জগাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা নয়। কিন্তু তা ছাড়া উপায়ও দেখা যায় না কিছু। প্রমথ পৈতে বের করলেন: দেখ বাবা, ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি। ভাঁওতা দিয়ে সরে পড়ছিস নে, পা ছুঁয়ে দিব্যি করে যা। তবে ছেড়ে দেব। ছুটে যাবি আর ছুটে চলে আসবি কোনখানে জমে যাবি নে। কেমন বাবা, এই কথায় রাজী?

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলে, মানবেলায় যাচ্ছিস তো চিঁড়েমুড়ি যা-হোক কিছু নিয়ে আসবি। খালি হাতে আসিস নে। দুপুরবেলা কখন সেই গদাধরের হোটেলে গণ্ডা কয়েক ভাতের দানা পেটে পড়েছিল, তার পরে গরুর-গাড়ির ধকল —ক্ষিধেয় নাড়ি পটপট করছে।

কুড়ুকুড়ু কুড়ুকুড়ু ড্যাডাং-ড্যাং ড্যাডাং-ডাং—ঢাকের বাজনায় জোর দিয়েছে এখন। জগা ছুটল সেই বাজনায় কান রেখে। কালীতলার বাজনা, সন্দেহ নেই। নিশিরাত্রে করালীর কুলে বাতাসের বড় জোর, বাজনা তাই নিতান্ত কাছে মনে হচ্ছে। তীরের মতন ছুটেছে জগা বাঁধের নিচে দিয়ে—কাদার মধ্যে পড়ছে, কাঁটাবনে গিয়ে পড়ছে। তা বলে উপায় নেই—সরু বাঁধের উপর দিয়ে ছোটা যায় না, পড়ে গিয়ে এতক্ষনে হাড়গোড়-ভাঙা দ হয়ে থাকত। ব্রাহ্মণসন্তান প্রমথর কাছে কথা দিয়ে এসেছে, সেই জন্যেই বুঝি ছুটোছুটি এত!

সাঁইতলা এসে গেল। পাড়ার মধ্যে পা দিল কত দিনের পর। কী আশ্চর্য, কেউ নেই। পুরুষ না হয় জালে চলে গেছে, কিন্তু বউঝিরা? ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে গেছে কেউ কেউ। বেশির ভাগ ঘরে আবার দরজাই নেই। মানবেলার ভদ্রপাড়া হলে চোর-ছ্যাঁচোড়ের মজা বেধে যেত। পাড়া ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেলেও তো কথা বলার কেউ নেই। কিন্তু বাদারাজ্যের পাড়ায় চোর আসে না। ধন-সম্পত্তির মধ্যে মাটির হাঁড়ি-কলসি, কলাইরের বাসন দু-একখানা আর কাঁথা-মাদুর। ঝাঁটপাট দিলে দেদার ধুলো মিলবে, অন্য-কিছু নয়। দিন আনে, দিন খায়। চাল-ডাল-নুন তেল ঘরে কিনে মজুত করে রাখে না। কপাল জোরে বেশী লভ্য হলে খাওয়াটা ভারিক্কী রকমের হবে সেদিন, দুটো পয়সা বাঁচল তো পানে এলাচের মশলা দিয়ে খাবে। আর রোজগার কম হল তো সেদিন আধপেটা ভাত। যোটে না হল তো কাঠকাঠ উপোস। চোরকে তাই খোশামোদ করেও এদের পাড়ার মধ্যে নেওয়া যাবে না।

কিন্তু বৃত্তান্ত কি? পুরুষ না হোক মেয়েরা সব গেল কোথায়?

গগনের নতুন-আলার দিকে দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। সেখানেও চুপচাপ

একেবারে। ছাড়া বাড়ির মত। আগে কত দিন তো পুরদমে কীর্তনানন্দ চলেছে এমনি সময় অবধি। জগা ছিল না—এরই মধ্যে রাক্ষসে এসে মেরে ধরে রূপকথার রাজবাড়ির মত করে রেখে গেল নাকি? ভাল হল, চারুবালার ঘাড় মুচড়ে রেখে গিয়ে থাকে যদি—মুখ দিয়ে দেমাকের ফড়ফড়ানি না বেরোয় আর কখনো!

ঢুকে পড়ল জগা আলার সীমানার মধ্যে। যেতেই হবে। এত ছুটোছুটি করে এল এদেরই জন্যে তো—গগন দাসের কথা মনে করে, নিজের কোন গরজ ভেবে নয়। তাকিয়ে দেখে, কামরার ভিতরে যেন আলো। বন্ধ কবাটের জোড়ের ফাঁক দিয়ে আলো আসে। আলো যখন, মানুষও তবে আছে ভিতরে। এবং খুব সম্ভব ননদ-ভাজ মেয়েলোক দুটি। জগা তখন ডোবার ধারে। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে। কাদা-মাখা দেহটার দিকে হঠাৎ নজর পড়ে যায়। অতিশয় বিশ্রী দেখাচ্ছে। এতদিন পরে এসেছে—নেয়েধুয়ে মেয়েলোকের সামনে হাজির হওয়া উচিত। চারুটা নয় তো হি-হি করে হাসবে। বলে বসবে হয়তো কোন একটা অপমানের কথা—রক্ত চড়ে যাবে জগার মাথায়।

নেয়েধুয়ে ভিজে কাপড়ে জগা আলাঘরে উঠল। এদিক-ওদিক তাকাল একবার গগন, নগেনশশী, এমন কি ব্যাপারীদেরও একজন কেউ নেই কোনদিকে। দরজায় ঘা দিল। সাড়া নেই। জোরে জোরে ঝাঁকাচ্ছে। ভিতর থেকে তখন করকর করে উঠল—আবার কে?—চারুবালা।

এসে জুটেছ কালীতলা থেকে? যেটা ভেবে এসেছ—একলা নই আমি, শড়কি আছে। যে ঠ্যাংখানা আছে, সেটাও নিয়ে নেব আজকে।

একখানা ঠ্যাঙের কথা তুলেছে, মধুবর্ষণ অতএব নগেনশশীর উদ্দেশ্যে। আনন্দে জগা থই পাচ্ছে না। ওরা একদল হয়ে বাদাবনে চড়াও হয়েছিল, দলের মধ্যেই এখন ফুটোপুটি বেধেছে।

কবাটে জোরে জোরে করাঘাত করে জগা বলে, আমি গো, আমি জগন্নাথ। বয়ার-খোলায় পড়ে ছিলাম, যাত্রা গাইতাম, কারও কোন ক্ষতি লোকসান করি নি, আমার কেন ঠ্যাং ভাঙতে যাবে গো? দোর খোল। বড্ড জরুরী, সেজন্য ছুটতে ছুটতে এসেছি।

চারুবালা দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়াল: তুমি কোথা থেকে হঠাৎ?

কাপড়ের জলে তোমাদের নিকানো ঘর কাদা-কাদা হয়ে গেল। আগে শুকনো কাপড় দাও। বলছি সব।

চারু খোঁজাখুঁজি করল একটুখানি। বলে, ধুতি পাচ্ছি না। হর ঘড়ুইয়ের সঙ্গে দাদা সদরে গেল। একটা ধুতি পরনে, আর গোটা দুই পুঁটলি বেঁধে নিয়ে গেছে।

নগনা-খোঁড়ার ধুতি নেই?

ওর জিনিসে হাত দিতে ঘেন্না করে আমার।

ভারী খুশী জগন্নাথ। অনেকদিন পরে আজ আলাঘরে পা দেওয়া অবধি নগেন-শশী সম্পর্কে চারুর মনোভাব পাওয়া যাচ্ছে—বড্ড ভাল লাগছে চারুর কথাবার্তা। সায় দিয়ে জগা বলে, ঠিক বলেছ। পাজী লোক।

তাই তো, কাপড়ের কী করা যায়! সরু পেড়ে শাড়ী আমার, এটাই পর।

ফিক করে হেসে রসান দেয়, শাড়ি পরে মেয়েমানুষ হয়ে বসো, আর কি হবে। জগন্নাথ নয়, জগমোহিনী।

জগন্নাথ বলে, দু-বেটাকে খালের মধ্যে রেখে এলাম। পরোয়ানা নিয়ে তোমাদের এখানে সীল করতে আসছে। বড়দা নেই—তার কাছেই ছুটতে ছুটতে এলাম। চৌধুরিরা বড় মোকর্দমা সাজিয়েছে। ওরা বলাবলি করছিল, গাড়ি চালাতে কানে গেল।

চারু বলে, দাদাও তো গেল ওই মোকর্দমার ব্যাপারে। গোপাল ভরদ্বাজ এসে দেখেশুনে জেনেবুঝে গেল, সে-ই গিয়ে শয়তানি করছে। খবরটা বেরুল আবার চৌরুরি-আলা থেকেই। কালোসোনা তড়পাচ্ছিল : গাঙ আর খালের এদিকে যত-কিছু সমস্ত নাকি চৌধুরিদের খাস-এলাকা। খাল-পারে সাপ-বাঘের মুখে নাকি ছুঁড়ে দেবে আমাদের। হর ঘড়ুই বলল, সদর ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়, সাপ বাঘও নেই সেখানে। কালোসোনার মুখে ঝাল না খেয়ে নিজেরা সেরেস্তায় খোঁজখবর করে আসি গে। ঘড়ুই আর দাদা খাঁটি খবর আনতে গেছে।

জগা বলে, নগনাটা গেল না যে! তারই তো এই সবে মাথা খোলে ভাল।

সে যাবে রাজ্যপাট ছেড়ে তবেই হয়েছে! দশজনে তোমরা যোগাড় যন্তোর করে দিলে, দাদা তো মালিক শুধু নামেই। তৈরি রুটি ফয়দা দিচ্ছে ওই লোক এখন।

চোরের মুখে ধর্মের কাহিনী—এ সব কী বলে চারুবালা! গগন দাসের দশ জন হিতার্থীর অন্তত একজন তবে জগন্নাথ। চারু স্বীকার করল। আর নগেনশশীকে তো দাঁতে-দাঁতে চিবোচ্ছে। উল্লাসে কী করবে জগা ভেবে পায় না। আগেকার দিন হলে মনেও যা ভাবতে পারত না, সেই কাজ সে করে বসল। খাওয়ার কথা বলল চারুবালার কাছে। আসার মুখে নিবারণ যা বলে দিয়েছে—প্রায় সেই কথারই আবৃত্তি করে বলে, ক্ষিদেয় নাড়ি পটপট করছে। চাট্টি ভাত বাড় চারুবালা। খেয়েদেয়ে বিষম জরুরী কাজ আছে। বিস্তর খাটনির কাজ।

ভাত কোথা? ছ-মাস পরে আজকে আসা হচ্ছে, খবর দেওয়া ছিল কি কাউকে দিয়ে?

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে জগা বলে, জানব কেমন যে দাদা-রাজ্যের মধ্যে মশায়রা শহুরে বাবু হয়ে গেছেন। সন্ধ্যের ঝোঁক না কাটতে রান্না-খাওয়া খতম। আগে তো দেখে গেছি, হরির লুঠের হরিধ্বনি পড়তে পোহাতি তারা উঠে যেত।

চারিদিক ইতস্তত তাকিয়ে দেখে আবার বলে, আসর বসে না আজকাল? বড়দা সদরে, তা বউঠাকরুন গেল কোথা? চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নগেন-কর্তাও তদারক করছে না? ব্যাপার কি বল দিকি?

চারু বলে, রক্ষেকালীর পুজো কালীতলায়।. বাজনা শুনতে পাও না? পাড়াসুদ্ধ সেখানে চলে গেছে। বউদিদির উপোস, সে তো সেই বিকাল থেকে কালী-তলায় পড়ে গোছগাছ করছে। রান্নাবান্না হয় নি, ভাত দিই কোথা থেকে? ও-বেলার চাট্টি পান্তা ছিল, তাই খেয়ে আমি ঘরে দুয়োর দিয়ে রয়েছি।

জগা বলে, রান্না হয় নি তো হোক এখন। হতে বাধা কিসের? চৌধুরিদের নায়েব চাপরাসী আর মানুষজন নিয়ে ভোরের মুখে সীল করতে এসে পড়বে। তার আগে সারা সাত্তির ধরে খাটনি। পেটে না খেয়ে খাটতে পারব না।

পাড়াগাঁয়ের লোকেরা—পুরুষ হোক আর মেয়ে হোক—সীল কথাটা বুঝতে দেরি হয় না। আদালত-ঘটিত ব্যাপার - সাধুভাষায় যার নাম অস্থাবর ক্রোক। দেনার বাবদ ডিক্রি হয়ে আছে—চাপরাসী এসে দেনাদারের মালপত্র ধরবে, সেই সমস্ত নিলামে বিক্রি হয়ে টাকা আদায় হবে। রাত্রিবেলা বাড়ি ঢোকবার নিয়ম নেই। অতএব

ভোরবেলা এসে নিশ্চয় তার হানা দেবে। আর এই পক্ষের কাজ হল, ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র এবং গোয়ালের গর্‌-বাছুর রাতারাতি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা। জগন্নাথ এই খাটনির কথা বলছে। নায়েব সদলবলে এসে দেখবে, বাড়ির জিনিসপত্র কিছু নেই, মানুষ কটি আছে কেবল। মানুষেরা ফ্যা-ফ্যা করে হাসবে, বেকুব হয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকে সরে পড়বে পাওনাদারেরা। খালি পেটে এত সমস্ত হবে কেমন করে?

চারু বলে চি'ড়ে খেয়ে নাও। ঘরে চি'ড়ে আছে।

চি'ড়ে তো দোকানেও থাকে। চি'ড়ে খাব তো গৃহস্থবাড়ি এসে উঠলাম কেন? চি'ড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে মাড়িতেই শুধু খিল ধরে, পেটের কিছু হয় না। চি'ড়ে আমি খাই নে।

চারু বলে, চি'ড়ে কুটতে গিয়ে ঢে'কিতে হাত ছে'চে গেছে। রাঁধাবাড়া করি কেমন করে বল।

হুঁ, বুঝলাম—

কি বুঝলে শুনি?

দুয়োর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ডেকে তুলেছি। ঘুমের ঝোঁক কাটে নি। ঘুম-চোখে ছাই ঘে'টে উনুন ধরাতে মন নিচ্ছে না।

ভারী গলায় চারু বলে, মরছি হাতের যন্ত্রণায় বলে কিনা ঘুম। ঘুমোবার জো থাকলেও তো ঘুমোতে দিত না। তবে আর বলছি কি। নগনা-খোঁড়া দু-বার এর মধ্যে এটা-ওটা ছুতো করে কালীতলা থেকে এসে ঢু' মেরে গেছে।

চারুবালা কাপড়ের নিচে থেকে ডান হাত বাড়িয়ে ধরল। বলে, হাত ফুলে ঢাক হয়েছে, দেখ—

খাল-পারে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ, হাল্কা জ্যোৎস্না দোর-গোড়া অবধি এসে পড়েছে। নগেনশশীকে দোষ দেওয়া যায় না, বাদাবনের নির্জন রাত্রে যুবতী মেয়ে দেখে মাথার ঠিক রাখা দায়।

বলছে, হাতের টাটানিতে বসে বসে পিদিমের সেক দিচ্ছি। নইলে ঘরে থাকতাম বুঝি! তল্লাটের সব মানুষ কালীতলায়, আমি একলা পড়ে থাকবার মানুষ!

জগা বলে, টাটানি-জ্বলুনি বাইরের লোকে দেখে না। আস্ত একখানা কাপড় জড়িয়েছ তো হাতে—সত্যি বটে, ও হাত উ'চু করে তুলে ধরে থাকতে হয়, কাজকর্ম করা যায় না ও-হাত দিয়ে।

দেখাচ্ছি তবে খুলে। মানুষকে রে'ধে খাওয়ানোর ব্যাপার—তাই নিয়ে বুঝি ছুতো ধরে কেউ কখনো।

গরগর করতে করতে চারুবালা ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলতে চায়। জগা হি-হি করে হাসে। হাত ধরে ফেলে বলে, একটুখানি ক্ষেপিয়ে দেখলাম তোমায়। ঝগড়া না করলে মেয়েমানুষের বাহার খোলে না। মিনিবিড়ালের মত মিন-মিন করছিলে, চেনা তখন মুশকিল। ভাবছিলাম বড়দার বোন কি এই—না অন্য কেউ?

আবার বলে, আন চি'ড়ে—চি'ড়ে ভিজিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি কর, নয় তো নাড়ি-ভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাবে। খালের মধ্যে সে দু-বেটা পেটের জ্বালায় এতক্ষণ আমায় ঝাপাণ্ড করছে।

রান্নাঘরে গিয়ে চারুবালা জগাকে ডাকল। আয়োজন পরিপাটী। চি'ড়ে ভিজিয়ে

দিয়েছে। নলেনের সুগন্ধ পাটালি। কলাগাছের নতুন ঝাড়ে কাঁদি পড়ে পেকেও গিয়েছে। এককাঁদি মর্তমান-সবরি। এর উপরে কড়াইতে সর-আঁটা দুধ আছে। ভাত নেই, তা বলে খাওয়ার কোন্ অসুবিধা গৃহস্থ-বাড়ি।

জগা খিঁচিয়ে ওঠে : রোগা না খোকা যে আমি দুধ খেতে যাব ?

এমনি সময় ডোবার জলে পরিষ্কার হয়ে তিন জোড়া পা চলে এল উঠানের উপর। জগা উঁকি দিয়ে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে, আরে ব্যস, বড়দা এসে পড়েছে, আর ভাবনা কিসের ? বড়দাকে না বলতে পেরে কথাগুলো টগবগ করে ফুটছিল গলা পর্যন্ত এসে।

গগন বলে, জগন্নাথ নাকি ? আহা, উঠছ কেন, খাও। চৌধুরীবাবুদের কাণ্ড শুনেছ ? নতুন ঘেরির খাজনা বলে তিন-শ বাইশ টাকার একতরফা ডিক্রি করেছে আমার নামে। সায়ের থেকে উচ্ছেদের নালিশ করেছে। দেওয়ানি আর ফৌজদারি মিলে তিন নম্বর একসঙ্গে যুদ্ধ হয়ে গেছে।

জগা বলল, আরও বেশী জানি বড়দা। তুমি জান, যেটুকু এখন অবধি করেছে। আরও যা-সব করবে বলে মনে মনে মতলব ভাঁজছে, তা ও জেনে এসেছি আমি।

গগনের সঙ্গে হয় ঘড়ুই। আর একটা নতুন লোক—নিতান্তই অস্থিসর্বস্ব, বিধাতা হাড়ের উপর মাস ছোঁয়াতে ভুলে গেছেন, লোকটিকে দেখে তাই মনে হয়। নতুন লোক দেখে জগন্নাথ বলতে বলতে থেমে গেল।

গগন পরিচয় দেয় : চক্কোত্তি মশায়। সদরের পুণ্ডরীক বাবু উকিল—তাঁর সেরেস্তায় বসেন। টৌনিগিরি কাজ। বরাপোতায় কিছু জমিজিরেত আছে, অবরে-সবরে আসেন। আমরা চক্কোত্তি মশায়কে এই অবধি টেনেটুনে নিয়ে এলাম। রাতটুকু থেকে কাল সকালে বরাপোতা যাবেন। মামলা-মোকদ্দমা আমরা তেমন বুঝি নে তো। নগেনশশী বোঝে ভাল। দু-জনে শলাপরামর্শ করে উপায় বাতলে দিন। নগেন কি বলে শোনা যাক। সে-ও বুঝি কালীতলায় পড়ে ? তাড়াতাড়ি সেরে নাও জগা, আমরাও যাই চল চক্কোত্তি মশায়কে নিয়ে। তুমি কি জেনে এসেছ, শুনতে শুনতে যাব।

চারু তিক্ত কণ্ঠে বলে, না দাদা। চুপচাপ থাক। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে-ই কতবার চক্কোর দেয় দেখতে পাবে।

গগন বলে, সে ভরসায় কী করে থাকা যায়! সকালবেলা চক্কোত্তি মশায় চলে যাবেন। পুজো দেখে সে হয়তো একেবারে রাত কাবার করে ফিরল।

জগাও যেতে চায় না। কষ্ট করে এল, চারুবালা সামনে বসে খাওয়াচ্ছে—আধ-খাওয়া করে ছোট এখন কালীতলায়। বলে, তোমরা যাও বড়দা। আলায় জরুরী কাজ। শীল করতে আসছে, এক্ষুনি মাল সরাতে হবে। নগনা আসুক আর না আসুক, পচা-বলাই ঐ দুটোকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাওগে। একলা হাতে পেরে ওঠা যাবে না।

গরুর-গাড়ির বৃত্তান্ত বলল। শুনে গগনের মুখ শুখায়, টৌনি চক্কোত্তি ইতি-মধ্যে আলাঘরে গিয়ে উঠেছেন, হর ঘড়ুই মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে। গগন ব্যস্ত হয়ে গিয়ে ডাকে, কালীতলায় গেছে আমার শালা। যাবেন ?

মাদুর পেয়ে চক্কোত্তি গড়িয়ে পড়েছেন। বলেন, কিছু মনে করো না দাস মশায়। একফোঁটা বুদ্ধি নেই তোমার ঘটে—ঘেরি কী করে চালাও জানি নে। গাটোয়ারী কথাবার্তা কালীতলায় একহাট লোকের মধ্যে হয় নাকি ? না হওয়া উচিত ? আমিও

দেখা দিতে চাই নে। লোকে ভাববে, চক্কোত্তি মশায় যখন উপস্থিত, কী একখানা কাণ্ড ঘটেছে। তাড়াই বা কিসের এত? বুদ্ধি-পরামর্শ ভেবে চিন্তে দিতে হয়। এক কাজ কর, তামাক সেজে আন দিকি আগে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে নিই। থেকেই যাব না হয় কালকের দিনটা।

জগা ওদিকে বলছে, কি গো চারুবালা, ভাত রান্নার তো উপায় নেই—টৌনি চক্কোত্তি মশায়কে বড়দা ডেকে নিয়ে এল, এরাও সব চিঁড়ে খেয়ে রাত কাটাবে নাকি?

চারুবালা হারবার মেয়ে নয়। চোখ-মুখ নাচিয়ে সে বলে, ভালই তো হল চক্কোত্তিকে ডেকে এনে। বামুন মানুষ উনি রাঁধবেন, নীচু জাতের আমরা মজা করে খাব।

ছত্রিশ

জগা আর চারু দিব্যি তো হাসাহাসি করছে রান্নাঘরে চালের নিচে জমিয়ে বসে। চারুবালা সামনে বসে খাওয়াচ্ছে। মুশকিল ওদিকে খালের মধ্যে—প্রমথ আর নিবারণের নড়াচড়ায় গাড়ির চাকা আরও অনেকখানি বসে গেছে। জগা লোক ডাকতে গেছে তো গেছে। ক'ঘণ্টা কিম্বা ক'দিন লাগায় তাই দেখ। পৈতেধারী সদ্‌-ব্রাহ্মণের কাছে কথা দিয়ে গেল, তা বলে দৃকপাত নেই। গরুরগাড়ি ঠেলাঠেলির কষ্টে পথের উপর কোনখানে গুটিসুঁটি হয়ে গড়িয়ে পড়ল নাকি? কিছুই বিচিত্র নয় জঙ্গলে এই বিচ্ছুগুলোর পক্ষে।

নিবারণ, কি করা যায় বল তো?

ভুর্‌-রু-রু্‌ করে নাক ডেকে নিবারণ জবাব দিল। বিচালির আঁটি ঠেশ দিয়ে আরামে দিব্যি সে গা ঢেলে দিয়েছে। রাগে প্রমথর সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে খালের জলে। কিন্তু চাপরাসী হলেও আদালতের কর্মচারী—সরকারী মানুষ। সমীহ না করে উপায় কি!

নিবারণ, তুমি বাপু নরদেহে নারায়ণ। থই-থই ক্ষিরোদ সমুদ্দুর, তার মধ্যেও নাক ডেকে ঘুম দিচ্ছ। বালিশ অভাবে নারায়ণ একটা পটোল মাথায় দিয়েছিলেন, তোমার কিছুই লাগে না।

বাইরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখেন প্রমথ। আরে সর্বনাশ, মহাপ্রলয় আসন্ন, কিছুই ঠাহর করেন নি এতক্ষণ। জোয়ার এসে গেছে, খালের জল হু-হু করে বাড়ছে। খরস্রোত আবর্তিত হয়ে ছুটেছে। গাড়ির পাটাতনের উপর বসে তাঁরা—জল এরই মধ্যে ছোঁব-ছোঁব করছে। বেটা গাড়োয়ান ডুবিয়ে মারবার ফিকিরে এইখানে গাড়ি আটকে সরে পড়ল নাকি? মতলব করে খালে এনে ফেলেছে?

ওহে, নিবারণ, উঠে দেখ কাণ্ড। জীবন নিয়ে সঙ্কট, এখনো চোখ বুজে পড়ে আছ।

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর নিবারণ অবশেষে চোখ কচলে খাড়া হয়ে বসল।

ডাঙায় ওঠ নিবারণ। আর খানিক থাকলে টানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

তাই তো বটে।

তড়াক করে নিবারণ গাড়ির পাটাতন থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। এবং হাল্কা মানুষ—পাড়েও উঠে পড়ল পলকের মধ্যে। কিন্তু প্রমথর পক্ষে ব্যাপারটা সহজ নয়। নিবারণের পুরো দেহখানা পাল্লায় তুলে দিলে যা ওজন দাঁড়াবে, নায়েবের

শুধুমাত্র ভুঁড়িখানাই বোধ করি তাই। তার উপর সাঁতারের কায়দাকানুন জানা নেই তাঁর। জানলেই বা কী—হিমালয় পর্বত জলে ভাসবে না যত কায়দাই করা যাক না কেন।

শুকনো ডাঙার উপর দাঁড়িয়ে নিবারণ হাঁক পাড়ছেঃ হল কি নায়েব মশায়! পা চালিয়ে আসুন। জায়গটা গরম বলে মালুম হয়। বদখত একটা গন্ধ পাচ্ছেন না নাকে?

যেখানে বাঘের চলাফেরা, তেমনি সব জায়গাকে গরম বলে। তাড়াতাড়ি পার হয়ে যেতে প্রমথর কি অসাধ? কিন্তু এক একখানা পা ফেলছেন, ভারী দুরমুশের মত গিয়ে পড়ছে—সেই পা তারপর টেনে তোলা দায়। নিরাপদ ডাঙার উপর দাঁড়িয়ে নিবারণ ভয় ধরাবে না কেন—তার পালানোয় মুশকিল কিছু নেই।

ডাঙার কাছাকাছি হতে নিবারণ খানিকটা নেমে এসে হাত বাড়িয়ে হিড়হিড় করে প্রমথকে টেনে তুলল। ভালমানুষের মত বলে, গন্ধ কেন বেরোয় জানা আছে তো নায়েব মশায়!

বিরক্ত মুখে প্রমথ খিঁচিয়ে ওঠেনঃ না, জানি নে বাপু। রাত দুপুরে কে তোমায় ও-সব মনে করিয়ে দিতে বলছে?

নিঃশব্দে কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ নিবারণ দাঁড়িয়ে পড়ল। বারকয়েক সশব্দে নাক টেনে বলল গন্ধটা বেশী বেশী লাগে। আর এগোব না। ওই দিকে রয়েছেন নিশ্চয় ওত পেতে।

কিন্তু একা নিবারণই গন্ধ পাচ্ছে, প্রমথর নাকে কিছু লাগে না। রাগ করে তিনি বলেন, পথের উপরে কু ডাক ডাকছ, হয়েছে কি বল তো চাপরাসী?

নিবারণ বলে, একটা-কিছু উপায় দেখবেন তো! চুপচাপ এগিয়ে চলব, আর পথের উপর থেকে জলজ্যান্ত দুটো প্রাণী টুক করে তিনি জলযোগ সেরে যাবেন, আপসে সেটা কেমন করে হতে দিই?

একটা উঁচু কেওড়াগাছ তাক করে বলে, আমি মশায় দোডালার উপর উঠে বসি গে। যদি কিছু দেখতে পাই, আপনাকে বলব। সমন নিয়ে রাত্তিরবেলা জঙ্গল ঠেলে পায়ে হাঁটতে হবে, এমনি কি কথা ছিল? বলুন।

দীর্ঘ গুঁড়ি—ডাল উঠেছে অনেকটা উপর থেকে। প্রমথ অসহায়ভাবে গাছের দিকে তাকান। জায়গা নিরাপদ সন্দেহ নেই। নিবারণের বড় সুবিধা—দেহ নয়, যেন লিকলিকে বেত একগাছা, যেদিকে যেমন খুশি নোয়ানো যায়। মালকোঁচা মেরে সে গাছে ওঠার যোগাড় করছে।

প্রমথ কাতর হয়ে বলেন, দু-জনে একসঙ্গে যাচ্ছি। আমায় বাঘে খাবে, আর ডালের উপর বসে বসে মজা করে দেখবে তুমি! এই বাপু ধর্ম হল? ভাল লাগবে দেখতে?

নিবারণ হাঁ-হাঁ করে ওঠেঃ সর্বনাশ, কী করলেন, অসময়ে বড়মিঞার নাম ধরে ডেকে বসলেন! গাছ তো কেউ ইজারা নিয়ে নেয় নি, সবাই উঠতে পারে। আপনিও উঠে পড়ুন না মশায়।

প্রমথ মুখ ভেংচে স্বরের অনুকৃতি করে বলেন, উঠে পড়ুন না মশায়! এমনি হবে না, মশায়কে উঠতে হলে কপিকল খাটাতে হবে গাছের মাথায়। উঠেও তার পরে ঐ সব ডাল ভর সইতে পারবে না, মড়মড় করে ভেঙে পড়বে।

যে-কেউ সেটা আন্দাজ করতে পারে। অলক্ষ্যে নিবারণ হাসি চেপে নিল। অদূরের

জঙ্গলটায় কি-একটা শব্দ এমনি সময়। ভয়ার্ত কণ্ঠে নিবারণ বলে, পচা গন্ধ পান এবারে? বস্তু যে কাছে এসে গেল। কী হবে!

প্রমথ পিছনে তাকিয়ে বলেন, তুমি ঢিল ছুঁড়লে নাকি নিবারণ? আমায় ভয় দেখাচ্ছ?

নিবারণ কথা শেষ হতে দেয় না: দৌড়ন মশায়। এল। এবং গাছে না উঠে দিল চোঁচা দৌড়। দৌড়ানো কর্মেও ওস্তাদ—দুই পায়ে ঈশ্বর এত ক্ষমতা দিয়েছেন! সাঁ-সাঁ করে ছুটল। প্রমথ কি করেন—বিপুল দেহ নিয়ে যথাসাধ্য ছুটলেন পিছন ধরে। ব্যাবধান বাড়ছে ক্রমেই—এমন হল, ভাল করে নজরেই আসে না। তবে জঙ্গলটা গিয়ে ফাঁকায় এসে গেছেন এবার। দু-পাশে বাঁধা ঘেরি, মাঝখানে বাঁধ।

এতক্ষণে সাহস পেয়ে প্রমথ হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকছেন: দাঁড়াও চাপরাসী! আর পারছি নে। ফাঁকার মধ্যে আর এখন তেড়ে আসবে না।

নিবারণ বলে, আসবে না কি করে বলেন? কপালে যদি থাকে ঘরের মধ্যে দুয়োরে খিল দিয়ে তক্তাপোশের উপর ঘুমুচ্ছেন, সেইখান থেকে মুখে করে নিয়ে যায়। এমন কত হয়ে থাকে।

প্রমথ আগুন হয়ে ওঠেন: ভয় দিও না চাপরাসী, ভালর তরে বলছি। ঘোরাঘুরির কাজ তোমার, খাতাপত্তোর খুলে আমরা এক জায়গায় বসে থাকি। এমনি পেরে উঠি নে, তার উপরে আজেবাজে কথা বলে আরও ঘাবড়ে দিচ্ছ।

ঢাকের বাজনা থেমে ছিল অনেকক্ষণ, আবার বেজে উঠল। তাই তো, পাড়ার মধ্যে এসে গেছেন একেবারে। অদূরে আলো মিটমিট করছে, ঘরবাড়ি বলে মালুম হয়।

মাটির পাঁচিল। নিবারণ বলে, বাদাবনের এই রীতি। ঘর হোক না হোক পাঁচিল আগে তুলবে। পাঁচিল তুলে বাস্তুর গণ্ডি ঘিরে নেওয়া। রাতবিরেতে হাওয়া খেতে খেতে ওঁরা যাতে ঢুকে না পড়েন।

প্রমথ ঠাহর করে দেখে বলেন, কিন্তু এটা কি করেছে—সামনের দিকে আলগা কেন অতটা? পাঁচিল দেওয়ার তবে কি ফল হল—যাদের যাবার তাড়া তারা তো এই পথে ঢুকে পড়বে। এই যেমন আমরা।

নিবারণ বলে, শেষ তুলতে পারে নি, খানিকটা এই বাদ রয়ে গেছে। সামনের বার শেষ করে ফেলবে। তা বলে ফল কিছু হয় নি, অমন কথা বলবেন না। বাদাবনে যত আছেন, দুপেয়ে জীবকে ভয় করেন সবাই। তা সে জন্তুজানোয়ার হোন, আর জিন-পরীই হোন। গণ্ডি ঘিরে মানুষে ঘাঁটি করে আছে, এগোবার মুখে অনেক বার আগুপিছু করবে।

দু-জনে উঠানের উপর চলে এসেছে। মৃদু কথাবার্তা আসছিল রান্নাঘরের ভিতর থেকে। মানুষ দেখে চুপ।

তীক্ষ্ম স্ত্রী-কণ্ঠের প্রশ্ন: কারা ওখানে?

আমরা—

আমরা বললে কি বোঝা যায়? কারা তোমরা? আসছ কোথা থেকে? বাড়ি কোথায়?

সীল করতে বেরিয়ে আদালতের চাপরাসী মরে গেলেও আত্ম-পরিচয় দেবে না। দস্তুর এই। সীলের চাপরাসী এসেছে খবর যেন বাতাসের আগে ছোটে। দেনাদার সামাল হয়ে যায়। নিবারণ কাতর স্বরে বলে, পথ-চলতি মানুষ। ঘুরতে ঘুরতে

এদিকে এসে পড়েছি। রাতটুকু কাটিয়ে যাব—খেতে চাইনে মা-জননী, শুধু একটু শুয়ে থাকব।

টেমি হাতে চারুবালা বেরিয়ে এল। আলাঘর দেখিয়ে দেয়।

সর্বরক্ষে! নিবারণ সগর্বে তাকায় প্রমথর দিকে। দয়া হয়েছে তার কথা বলার কায়দায়। উঁহু, দয়া ঠিক বলা চলে না—বাদা অঞ্চলের রেওয়াজ এই। রাত্রিবেলা অতিথি এলে ফেরাবার নিয়ম নেই। দিতেই হবে আশ্রয়—নইলে জানোয়ারের মুখে যাবে নাকি সেই মানুষ। ঘুরতে ঘুরতে আসেও অনেকে—ভাগ্য খুঁজতে নতুন যারা জঙ্গলরাজ্যে এসে পড়েছে।

আলাঘরে পা দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে প্রমথ বলেন, কোথায় এসে পড়লাম মালুম হচ্ছে না তো।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে গগন অভ্যর্থনা করে: আসতে আজ্ঞা হক। আসুন, বসুন—

প্রমথ বলেন, [কোন্ জায়গা, কার বাড়ি? এ দিকটা আমার এই প্রথম আসা কিনা!

সাঁইতলা ডাক এই জায়গার। অধীনের নাম শ্রীগগনচন্দ্র দাস। জঙ্গল কেটে নতুন একটু ঘেরি বানিয়েছি বলে সকলে আজকাল ঘেরিদার গগন বলে।

কী সর্বনাশ! প্রমথ ও নিবারণে চোখাচোখি হল। তখন একেবারে ঘরের মধ্যে। এবং বাইরে বেরুলেই তো নিবারণ চাপরাসীর নাকে পচাগন্ধ আসবে, ও জঙ্গলে নড়াচড়া হবে। নইলে প্রমথ সেই মুহূর্তেই দুড়দাড় ছুটে বেরুতেন।

চক্রবর্তী দেয়াল ঠেস দিয়ে আধেক চোখ বুজে ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানছিলেন। আর গণ্ডগোল সম্পর্কে নিম্ন কণ্ঠে উপদেশ দিচ্ছিলেন মাঝে মাঝে। মানুষের সাড়া পেয়ে থেমে গিয়েছিলেন। সেই মানুষ দুটো ঘরে উঠে পড়ল তো সোজা হয়ে বসলেন তিনি। প্রমথ ব্রাহ্মণ বলে, নিজের মাদুরের প্রান্তে জায়গা দেখিয়ে দিলেন। নিবারণ চাপরাসী ঘড়ুইয়ের মাদুরে গিয়ে বসল।

হুঁকোর মুখ মুছে চক্রবর্তী প্রমথর দিকে এগিয়ে দিলেন: তামাক ইচ্ছে করুন।

মউজ করে এবারে আলাপ-পরিচয়।

টোর্নি মানুষ চক্রবর্তী—সেই হেতু রীতিমত এক জেরার ব্যাপার। আর প্রমথ হালদারও কম ব্যক্তি নন—তিনি এক মর্মভেদী গল্প ফেঁদে বসেছেন। নাম হল তাঁর জনার্দন মুখুজ্জে। কাজকর্মের চেষ্টায় বেরিয়েছেন তিনি, এবং সঙ্গের এই লোকটি। আরও নাবালে কাঁটাতলা অঞ্চলে কারা নাকি লাট ইজারা নিয়ে বন কাটছে। এদিকে সুবিধা না হলে সেই কাঁটাতলা অবধি চলে যাবেন। লোকজন খাটানো হিসাবপত্র রাখা এই সমস্ত কাজ ভাল পারেন তিনি। মোটের উপর, ডাঙা-অঞ্চলে আর কিছু নেই। পোকার মতন মানুষ কিলবিল করে। পোকায় জরো-জরো ঐ মানষেলায় পড়ে থেকে বাঁচা যাবে না। বাঁচতে হলে নতুন জায়গায় বসত গড়তে হবে। যেমন এই এঁরা সব করেছেন।

গগন তিক্তস্বরে বলে, সে-ও আর থাকছে কোথা ঠাকুর মশায়? মানুষের খিদের অন্ত নেই। দেদার খাবে, আবার ছেলেপুলের জন্য রাজ্যপাট বানাবে। ক্ষ্যাপা মহেশ বলে একজনে ঘোরাফেরা করে। ক্ষ্যান্ত বাউলে, কথাবার্তাও বলে বেশ খাসা। সে বলে, বড়লোকের নজর লেগেছে—পোকায় ধরেছে, এ ঘেরির আর বাড় বাড়ন্ত হবে

না। আরও নাবালে, একেবারে সাগরের মুখে গিয়ে দেখ। কিন্তু গিয়ে কি হবে, সেখানেও তো গিয়ে পড়বে বড় বড় মানুষ। কত হ্যাঙ্গামা করে বনের মধ্যে ক'খানা ঘর তুলে নিয়েছি, এত দূরেও শনির দৃষ্টি।

জগন্নাথের চিঁড়ে খাওয়া হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কানাচে এসে একটুখানি ওদের কথাবার্তা শুনল। হাসে। চারুবালাকে চুপি চুপি বলে, শোনগে কী বলছে সেই বেটা নায়েব। ভারী ভারী সমস্ত কথা। ভূতের মুখে রামনাম। আমি সামনে যাচ্ছি নে। খালের মধ্যে রেখে পালিয়ে এসেছিলাম। গেলে ধরে ফেলবে। পচা-বলাই এখনো তো আসে না - পায়ে পায়ে এগিয়ে দেখি। বাড়িতে তোমাদের ভাল ভাল অতিথ— বিস্তর রান্নাবান্না হবে। আমিও অতিথ আজকে। চিঁড়ের ফলারে শোধ যাবে না, ভাতও খাব।

সাঁইত্রিশ

চারুবালা এসে প্রমথকে ডাকে : উঠুন ঠাকুর মশায়। উনুন ধরিয়ে চালডাল গুছিয়ে এলাম। চাপিয়ে দিন এবারে গিয়ে।

ছুটোছুটির কষ্টে ক্ষিধে খুব প্রবল। খেতে হবে তো বটেই। কিন্তু পরোপকারে প্রমথর ভারী বিতৃষ্ণা। উনুনের ধারে সেঁকা-পোড়া হয়ে তিনি রেঁধে দেবেন, অন্য সকলে মহানন্দে রাঁধা ভাত নিয়ে বসবে—ভাবতে গিয়ে দেহ যেন এলিয়ে আসে। আড়-মোড়া ভেঙে বললেন, আমার অত হাঙ্গামা পোষাবে না। প্রাকটিসও নেই। গৃহস্থঘরে যা থাকে দাও। আর ঘটি দুয়েক জল। রাতটুকু স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে।

নিবারণ বলে, ভাত বিনে আমার কিন্তু চলবে না। স্পষ্ট বলছি। আমি হাঙ্গামা পোহাব। রাঁধিও ভাল। চল মা, রান্নার জায়গা দেখিয়ে দেবে।

উদ্যোগী পুরুষ—মুখে বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল। চারুবালার সঙ্গে রান্নাঘরে যেতে প্রস্তুত। প্রমথ খিঁচিয়ে উঠলেন : তোমার এ সাউখুরি কেন বল তো? রেঁধে খাওয়াবার শখ তো ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিলে না কেন? তোমার রান্না কে খেতে যাচ্ছে? একা তুমি খাবে, আমরা সবাই চেয়ে চেয়ে দেখব—তাই বা কেমন হবে বিবেচনা কর।

নিবারণ বলে, কি করতে পারি বলুন মশায়? আপনাদের কারও তো গরজ দেখিনে।

চক্রবর্তীর দিকে আড়চোখে চেয়ে প্রমথ বলেন, সদ্‌ব্রাহ্মণ আরও তো রয়েছেন আমি ছাড়া।

চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমার কথা বলেন তো নাচার। দুপুরবেলা বিষম খাওয়ান খাইয়েছে—গলায় গলায় এখনও। ভাত বেড়ে আসন সাজিয়ে দিলেও খেতে পারব না।

টৌনি' মানুষ কত রকমের মক্কেল ভাঙিয়ে খান। ধৈর্য সকলের বড় গুণ, জেনে বুঝে বসে আছেন। ধৈর্য ধরে চুপচাপ চেপে বসে থাকুন, গরজ দেখাবেন না, নড়া-চড়া করবেন না—সিধে পায়ে হেঁটে আপনার কাছে হাজির হবে।

ঢেকুর তুলে চক্রবর্তী বলেন, দাস মশায় আর বড়ুই মশায় মিলে যা ব্রাহ্মণ-সেবাটা করল, তিন দিন আর জলগ্রহণ করতে হবে না। চারু, একটা পাশবালিশ দিতে পার তো এই মাদুরের উপর গড়িয়ে পড়ি। চক্রবর্তী ঠাকুর খান বা না খান, শোন ভাল। শিয়রের বালিশ না হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু পাশবালিশ ছাড়া ঘুম হবে না।

নিবারণ রাগ করে বলে, বামনাই ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়ে আমি যে মশায় ক্ষিধের মারা পড়ি। পেটের নাড়িভুঁড়ি অবধি হজম হয়ে যাচ্ছে। আমার মতন আমি চাট্টি ফুটিয়ে নিই গে।

প্রমথ হালদার তড়াক করে উঠে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন: একটা মিনিট ক্ষিধে চাপতে পার না, তা বাইরে এত ঘোর কেমন করে? বসে থাক তুমি, আমি যাচ্ছি।

নিবারণ না-না করে ওঠে: মশায়ের যে প্রাকটিস নেই। হাত-টাত পুড়িয়ে ফেলবেন শেষটা। রান্নাও ভাল হবে না। মুড়ি খেয়ে থাকবেন, তাই থাকুন না মশায়।

প্রমথ ধৈর্য হারিয়ে বললেন, রান্না হয়ে যাক—খেয়ে দেখো প্রাকটিস আছে কি নেই। বকর-বকর কর কেন, শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছিলে তাই নাচাও আবার।

চারুকে বলেন, কোথায় কি যোগাড় করেছ, চল।

চারুবালার সঙ্গে প্রমথ রান্নাঘরে গেলেন। খিক-খিক করে চাপা হাসি হাসে নিবারণ। চক্রবর্তীর কাছে জাঁক করে বলে, জাতে ছোট হওয়ার কত সুবিধা বুঝে দেখুন চক্কোত্তি মশায়। আমাদের হাতে কেউ খাবে না, আমরা মজা করে সকলের হাতে খাব। ঝামেলা পোহাতে হল না তাই। কিন্তু আপনি যে সত্যি সত্যি শুয়ে পড়লেন, একেবারে নিরম্বু রাত কাটাবেন?

চক্রবর্তী সে কথার জবাব না দিয়ে উচ্চকণ্ঠে চারুকে ডাকলেন, শুনে যাও তো মা একবার এদিকে?

চারু এলে বললেন, মুখুজ্জে মশায় রাঁধতে গেলেন তো আমারও একমুঠো চাল দিয়ে দিও।

চারুবালা হেসে বলে, সে জানি। চাল আমি বেশী করে দিয়েছি।

হর ঘড়ুই বলে, ব্রাহ্মণের প্রসাদ আমিও চাট্টি পাই যেন।

চারু বলে, তুমি একলা কেন, বাড়িসুদ্ধ সবাই আমরা প্রসাদ পাব। হিসেব করে চাল মেপে দিয়েছি।

বেশ, বেশ! পরম উল্লাসে নিবারণ ঘাড় দোলায়: এক যজ্ঞির রান্না রাঁধিয়ে নিচ্ছ তবে তো! খাসা রাঁধেন, আমি খেয়েছি ওঁর রান্না। এক দোষ পরের উপকারে আসবে শুনলে মন বিগড়ে যায়। আজকের রান্নাই বা কী রকমটা দাঁড়ায় দেখ!

রান্নাঘরের ভিতরে প্রমথ ওদিকে তেরিয়া হয়ে উঠেছেন: আস্ত এক পশুরের গুঁড়ি—গোটা বাদাবন তুলে এনে রান্নাঘরে ঢুকিয়েছে! এই কাঠ ধরাতেই তো রাতটুকু কাবার হয়ে যাবে।

নায়েবের অবস্থা বুঝে নিবারণের মায়া হল বোধ হয়। বলে, মাথা গরম করবেন না। রান্নায় তা হলে জুত হবে না। দা-কাটারি একখানা দাও দিকি ভালমানষের মেয়ে, আমি কাঠ কুচিয়ে দিচ্ছি।

জগার কাছে শুনে পচা বলাই রাধেশ্যাম এবং আরও দু-তিন মরদ কালীতলার দিক থেকে এসে পড়ল। গগন আর হর ঘড়ুইও জুটেছে তাদের সঙ্গে। গোয়ালের গরু বের করে কোথায় নিয়ে গেল। কামরার তক্তাপোশটাও ধরাধরি করে নিয়ে চলল। প্রমথ রান্না করেন আর দেখেন। রাঁধেন তিনি সত্যিই ভাল। ভাত আর হাঁসের ডিমের তরকারি নেমে গিয়েছে, মুগের ডাল ফুটছে। আহা-মরি কী সুগন্ধ! রান্না-

ঘরের সামনে গগন এসে তাগিদ দেয় ; আর বেশী কাজ নেই, নামিয়ে ফেলুন দেবতা।

প্রমথ বলেন, খুব খিদে পেয়ে গেল ?

গগন বলে, আজ্ঞে না, খিদের কারণে বলছি নে ! গোলমালের ব্যাপার আছে। আমাদের যখন হয় হবে, বিদেশী মানুষ আপনারা তাড়াতাড়ি সেবা শেষ করে নিন। তার পরে মশায়দের পার করে বয়ারপোতার দিকে পাঠিয়ে দেব।

নিবারণ বলে, বেশ তো আছি ভাই, রাতদুপুরে আবার পারাপার কেন ? একটা চট-মাদুর যা হোক কিছু দিও, তোমার ঐ আলাঘরে পড়ে থাকব। কিছু না দিতে পার, তাতেও ক্ষতি নেই। মেজের পড়ে ঘুমব।

গগন বলে, ঘুম হবে না এদিগরে থাকলে। তবে আর বলি কেন !

হর ঘড়ুই ঐ সঙ্গে যোগ দেয় : একটা রাতের তরে অতিথ এসেছেন, গণ্ডগোলে থাকার কী দরকার ? তাড়াতাড়ি চাট্টি খেয়ে নিয়ে গাঙ পার হয়ে সরে পড়ুন।

কী একটা বড় ব্যাপার আছে, মানুষগুলোর গতিক দেখে বোঝা যায়। এক দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, চরকির মত ঘুরছে। এই রকম আধাআধি বলে গগনও ছুটে বেরুল আবার কোন্ দিকে।

প্রমথ জানবার জন্য আকুলিবিকুলি করছেন। চারুবালাকে ইশারায় কাছে ডেকে বলেন, ওরা কি বলে গেল, মানে তো বুঝলাম না।

নিম্নকণ্ঠে চারু বলে, কালীতলায় পুজো হচ্ছে। নরবলি ওখানে।

সে কি গো !

বলবেন না কাউকে ! খবরদার, খবরদার ! আমার আবার মস্ত দোষ, পেটে কথা থাকে না। সমস্ত বলে-কয়ে অবসর হয়ে যাই। টের পেলে পাড়ার ওরা আমাকেই ধরে হাড়িকাঠে ফেলবে।

কিন্তু চারুকে নিয়ে যা-ই করুক অতিথিদের সেজন্য মাথাব্যথা নেই। নিবারণ বলে, বলছ কী তুমি ! জলজ্যান্ত মানুষ ধরে বলি দেবে—থানা-পুলিসের ভয় করে না ?

চারু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলে, এমন কত হয়ে থাকে ! থানা তো একদিনের পথ এখান থেকে। কুমিরমারিতে এক চৌকি আছে—শুনেছি, জন দুই-তিন সিপাহি সেখানে তিন বেলা ঠেসে মাছ-ভাত খেয়ে নাক ডেকে ঘুমোয়। ধরবে কি করে ? বলির পরে পুজো-আচ্চা হয়ে গেলেই তো ধড়-মুণ্ডু গাঙে ছুড়ে দেয়। টানের মুখে সেসব দূর-দুরন্তর চলে যায়, কামটে খুবলে খুবলে খেয়ে দু-দশ খানা হাড় শুধু অবশেষ থাকে।

প্রমথ সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, এ যে বাবা মগের মুলুক একেবারে !

চারু বলে, বাদা মুলুক। বাদায় মানুষ কাটতে হাঙ্গামা নেই। কাটে যত বাইরের মানুষ ধরে ধরে ! বাদার বাসিন্দা তারা নয়। তাদের কোন খোঁজখবর হয় না। এই যত শোনেন, সাপে কাটল, বাঘ-কুমিরের পেটে গেল—সবই কি তাই ? মায়ের ভোগেই যাচ্ছে বেশির ভাগ। পাঁচ-সাতখানা বাঁক অন্তর এক এক মায়ের থান —তারা কি উপোসী পড়ে থাকেন ! সমস্ত কিন্তু সাপ-বাঘের নামে চলে যায়।

শুনে প্রমথ হালদার থ হয়ে গেছেন। বাদা-রাজ্যের এ হেন পুজো-প্রকরণ বাইরের লোকের অজানা। মুগের ডাল কড়াইয়ে টগবগ করছে, প্রমথ দেখেও দেখছেন না। নিবারণ বলে, ডালে খানিকটা জল ঢেলে দাও ঠাকুর মশায়। ধরে যাবে, খাওয়া যাবে না।

প্রমথ বলেন, রাখ বাপ্‌ এখন ডাল খাওয়া। মানুষ কেটে মায়ের পুজো—কী সর্বনাশ! গা-মাথা আমার ঘুলিয়ে আসছে। খাওয়া মাথায় উঠে গেল।

চারু বলে, কিন্তু ভাল মানুষ কখনো বলি হবে না। বাদায় যারা মন্দ করতে আসে, কালী করালী তাদেরই রুধির খান। তাদেরও ভাল—মায়ের ভোগে লেগে মুক্তি হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

সহসা গলা নামিয়ে নিরীহ কণ্ঠে বলে, জানেন মুখুজ্জে মশায়, ভারী এক শয়তান-ফেরেব্বাজ আজ নাকি বাদায় আসছে। প্রমথ হালদার নাম—ফুলতলার কাঙালি চক্কোত্তির ছেলে অনুকূল চৌধুরি, তাদের নায়েব। আমাদের উচ্ছেদ করে এই নতুন-ঘেরি গ্রাস করবার নানা রকম প্যাঁচ কষে বেড়াচ্ছে সেই লোক।

প্রমথ তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নেন। কিন্তু চারুবালা ছাড়ে না। বলে, অমন কুটকচালে লোক শুনেছি চাঁদের নিচে নেই। আমি দেখি নি মানুষটাকে। আপনারা দেখেছেন?

নিবারণের দিকে তাকিয়ে প্রমথ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, না না, আমরা দেখব কোথায়?

চারুবালা সহসা খুব কাছে এসে ঘনিষ্ঠভাবে বলে, একটা কথা বলি মুখুজ্জে মশায়। দাদা আপনাদের বরাপোতা চলে যেতে বললেন। কক্ষনো যাবেন না। কিম্বা গেলেও নরবলির সময়টা লুকিয়ে এসে চোখে দেখে যাবেন। এত বড় সুবিধা হয়ে গেল তো ছাড়বেন কেন? নরবলি আমাদের দেখতে দেবে না। কি করব—মেয়েমানুষের রাত্তিরে একা-দোকা বেরুতে সাহস হয় না। ঘরে বসে বলির বাজনা শুনব।

প্রমথ বলেন, বলি দিচ্ছে কাকে? কোথায় রেখেছে মানুষটাকে—দেখেছ তুমি?

চারু ফিসফিস করে বলে, আপনাদের বলছি। চাউর না হয়ে যায়, খবরদার! ওরা বলা-কওয়া করছিল, চুরি করে আমি শুনে নিয়েছি। নায়েব প্রমথ হালদারের কথা হল না—বলি দেবে সেই মানুষটাকে। মিথ্যে মামলা সাজিয়ে আমাদের দায়ি করেছে, জিনিসপত্তোর ক্রোক করে নিতে আসছে আজকে তারা।

নিবারণ আর ধৈর্য রাখতে পারে না।

সব মালই তো পাচার করে দিলে। পাড়াসুদ্ধ মিলে করলে তাই এতক্ষণ ধরে। রান্নাঘরে আছি, কিন্তু চোখ দুটো মেলেই আছি মা-লক্ষ্মী। জিনিসের মধ্যে আছে ওই মেটে-হাঁড়ি, ফুটো-কড়াই আর ছেঁড়া-মাদুর গোটাকয়েক। ক্রোক করতে এসে নৌকো-ভাড়াও তো পোষাবে না। কে এক বাজে খবর রটাল—তাই অম্নি একদল মাল বওয়াবয়িতে লেগেছে, আর একদল হাড়িকাঠ পুঁতে খাঁড়া উঁচিয়ে আছে কালীতলায়।

চারু বলে, খবর বাজে নয়। দাদা নিজে গিয়ে সদরে জেনে এসেছে। আসছিল নাকি সেই প্রমথ। তা আচ্ছা এক কায়দা হল—খালের ভিতর গরুর-গাড়িতে আটক রেখে এসেছে। চার-পাঁচ জন বেরিয়ে পড়েছে, হাত-পা বেঁধে চ্যাংদোলা করে এনে ফেলবে এক্ষুনি।

প্রমথ সাহস করে বলে ফেললেন, এ-ও তো বিষম ফ্যাসাদ দেখছি। সরকারী হুকুম মতে আইন মোতাবেক পরোয়ানা নিয়ে আসেই যদি সত্যি সত্যি, এরা বলি দিয়ে ফেলবে? লাটসাহেব যা, আদালতের চাপরাসিও তাই—সবাই ওঁরা ভারত-সরকার। সরকারের বিপক্ষে যাবে—তার পরের হাঙ্গামাটা কেউ একবার ভেবে দেখবে না।

চার্ সহজ কণ্ঠে বলে, হাঙ্গামা কিসের! বললাম তো সে কথা। মানখেলা নয় —এখানকার রীতিব্যাভার আলাদা। ছাগল বলি দিতে দিতে তার মধ্যে এক সময় মানুষটাও টুক করে হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দেবে। খালিতে ধার দিয়ে দিয়ে মেলতুকখানা এমন করে রেখেছে, সে মানুষ নিজেই ঠাহর পাবে না কখন ধড়-মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেছে। কাটা মুণ্ডু পিটপিট করে তাকাবে। ততক্ষণে ঝপ্‌পাস করে মাঝগাঙে ছুঁড়ে দিয়েছে। জলের টানে পাক খেয়ে পলকের মধ্যে কোথায় চলে গেল মুণ্ডু— কোথায় বা চলে গেল ধড়! বলি তো তাই। যখন এসে পড়েছেন স্বচক্ষে দেখে যাবেন কেমন সে ব্যাপার।

বলে কি মেয়েটা! কী রকম সহজ ভাবে বলে যাচ্ছে! হামেশাই যেন ঘটে থাকে, মাটি কাটা কিম্বা মাছ মারার মতোই অতি সাধারণ এক ব্যাপার। হবেও বা! বাদাবন এক তাজ্জব জগৎ —প্রাণের দাম কানাকড়িও নেই এখানে। মানখেলার থেকে প্রাণ বাঁচাতে না পেরে তবে মানুষ প্রাণ হাতে করে এখানে এসে পড়ে। প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা। টিকে থাকল তো মাছে-ভাতে সুখেই বাঁচবে। এমন কি কাঙালি চক্কোত্তির কপাল হলে মেছো-চক্কোত্তি নাম ঘুচিয়ে চৌধুরি খেতাবও হতে পারে কোন এক দিন। কিন্তু প্রাণ হারাতেও হয় গাদা গাদা মানুষের—জন্তু-জানোয়ারের মুখে যায়; আবার এই দেখা যাচ্ছে, সোজাসুজি মানুষের কবলেও।

চারু বলে, ভালো সন্দেশ দেবেন না ঠাকুর মশায়? দাঁড়ান, কালাজিরে এনে দিই। আর বিলাতি-কুমড়ো আছে ঘরে, কুমড়ো-ছেঁচকি খেতে চান তো এক-ফালি কেটে নিয়ে আসি।

চারু উঠে কামরার দিকে দ্রুত চলে গেল কালাজিরা ও কুমড়া আনতে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার ফুসরত এতক্ষণে। প্রমথ বলেন, শুনলে তো বিপদ, উপায় কি বল?

নিবারণ হাই তুলে দু-বার তুড়ি দিয়ে বলে, আমি চুনোপুঁটি মানুষ—আমার বিপদ-টিপদ নেই। এত কথা হল, আমার নাম একবারও তো করল না নায়েব মশায়।

আঃ—বলে প্রমথ ঠোঁটে আঙুল ঠেকালেন। বলেন, আমি হলাম জনার্দন মুখুজ্জে —ভুলে যাও কেন? নায়েব এখানে কেউ নেই।

তা নেই বটে। তবে আবার ভাবনা কিসের? ডাল নামিয়ে ফেলুন, পাতা করে বসে পড়া যাক।

প্রমথ আগুন হয়ে বলেন, বুঝেছি চাপরাসী। ভাবছ, তুমি ভাত-তরকারি সাপটাবে, বলি দেবে শুধু আমাকেই। সেটা হচ্ছে না। যেতে হয় তো তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে হাড়িকাঠে মাথা দেব। দুজনে একসঙ্গে এসেছি, তো তোমায় একলা ছেড়ে যাব কোন্ আক্কেলে?

নিবারণ বলে, আমার কি! বিবাদ-বিসম্বাদ আপনাদের মধ্যে, সরকারী মানুষ আমার কোন্ দোষ?

সমন বয়ে বেড়াচ্ছ তুমি। তোমার জোরেই তো আসা। নইলে একা আমার কী সাধ্য, কারও অন্দরে হাত ঠেকাতে পারি।

যে ডিক্রিজারি করবে, তারই সমন বইব আমরা। এই গগন দাসই কাল যদি চৌধুরিগঞ্জের মাল ক্রোক করে, গগনের আগে আগে ব্যাগ ঘাড়ে আমি গিয়ে আপনাদের আদায় [illegible]।

কথাবার্তা নিম্নকণ্ঠে হচ্ছিল। হাত তুলে সহসা প্রমথ থামিয়ে দেন। চুপ, চুপ!

অনাত্মজনের ওদের তরফের আলোচনা। মশালগুলো খাল অবধি খুঁজতে বেরিয়েছিল, তারাই বুঝি এইবার ফিরে এল। স্তব্ধ নিশিরাত্রে উত্তেজিত কণ্ঠের প্রতিটি কথা কানে আসে।

গাড়ি ডাঙায় তুলে এনে গরু দুটো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ সরে পড়েছে। বেঁধে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসব, সেটা বোধ হয় কেমন ভাবে টের পেয়ে গেছে।

যাবে কোথা! নতুন মানুষ—পথঘাট কিছু জানে না। আমাদের সব নখ-দর্পণে। পাখি হয়ে উড়ে পালাতে পারে না তো! আছে কোনখানে ঘাপটি মেরে। সবাইকে জিজ্ঞাসা কর, নতুন মানুষ এদিগরে দেখা গেছে কি না। ঘড়দা কোথায়?

হর ঘড়ুইকে নিয়ে কালীতলার দিকে গেল, দেখতে পেলাম।

চল তবে কালীতলায়। বলি পালিয়ে গেছে, খবর দিতে হবে। বেশী লোক বেরিয়ে পড়ে খোঁজাখুঁজি করুক। মহাবলির সংকল্প করে শেষটা চালকুমড়ো বলি না হয়।

আর একজন বলে, কামার দেবীস্থানে তৈরী থাকুক। ধরে আনা মাত্তোর কপালে সিঁদুর দিয়ে হাড়িকাঠে চাপান দেবে।

দুড়দাড় পায়ের শব্দ। ছুটল বোধ করি ওরা কালীতলায়। নিঃশব্দ। চলে গেছে তবে সবগুলো।

প্রমথ আর নিবারণ দম বন্ধ করে শুনছিল। আর নয়—নিবারণ তড়াক করে উঠানে লাফিয়ে পড়ে। ভাগ্য ভাল, মানুষজন কেউ নেই রান্নাঘরের এদিকটা। একটি-বার পিছনে তাকিয়ে দেখল না, মোটা মানুষ প্রমথর অবস্থাটা কি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। অন্ধকারে সাঁ করে কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল। প্রমথ তখন প্যাথরের খোরায় ডালটা ঢেলেছেন সম্বরার জন্য। রইল পড়ে ডাল আর ভাত—প্রাণের বড় কিছু নয়। বেঁচে থাকলে ঢের ঢের খাওয়া যাবে।

বাইরে এসে ভয় যেন হুমড়ি খেয়ে চেপে ধরল। যেদিকে তাকান, মনে হচ্ছে ওই মানুষ। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাঁধ থেকে নিচে নেমে পড়লেন। ঝুপসি জঙ্গল আর মাঝে মাঝে জল ভেঙে চলেছেন। চৌধুরিগঞ্জ কতখানি দূরে, পশ্চিম না উত্তরে —কোন রকম তার ধারণা নেই। যাচ্ছেন, যাচ্ছেন। আর নিবারণ যেন কর্পূর হয়ে উবে গেছে, কোন দিকে মানুষটার চিহ্ন দেখা যায় না। সন্ধানী মানুষগুলোর চোখ এড়িয়ে চৌধুরি-আলায় নিজের কোটে কোন গতিকে ঢুকে পড়তে পারলে যে হয়!

আটত্রিশ

সকল আমোদস্ফূর্তি ছাপিয়ে গগন দাসের হাসি—সে হাসির তোড় ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়েছে। রান্নাঘরে সকলে এখন ঢুকে পড়েছে। গগন বলে, আশাসুখে নায়েব মশায় রাঁধাবাড়া করলেন। তা অতি নিষ্ঠুর তোমরা জগা। দুটো গ্রাস অন্তত মুখে তুলতে দিলে হত। বলি-টলির কথা না হয় পরে উঠত।

জগা বলে, বড়লোকের নায়েব—কত মানুষকে নিত্যিদিন ওরা বেগার খাটায়। আজকে একটা বেলা খোদ নায়েবকে আমরা বেগার খাটিয়ে নিলাম। রান্না করে দিয়ে চলে গেল। ভাল ভাল রেঁধেছে হে, নাকে সুবাস লাগছে। মালপত্তোর টানাহেঁচড়া করতে খাটনি হয়েছে, বসে পড় সবাই। দু-গ্রাস চার-গ্রাস যেমন হয় ভাগ করে খাওয়া যাক।

চারুবালা জগার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, পেটুক মানুষটা খাই-খাই করছে আসা অবধি। বউদি কালীতলায় পুজোআচ্চার যোগাড়ে আছে, আমার হাত ছেঁচে গিয়েছে—কী মুশকিলে যে পড়েছিলাম! পেট বাজিয়ে একটা মানুষ খেতে চাচ্ছে, স্পষ্টাস্পষ্টি নাও বলতে পারি নে—

জগাও কথা পড়তে দেয় না: পিঠ পিঠ আবার এই চক্কোত্তি মশায় এসে পড়লেন। বড়দা আহ্বান করে এনেছেন, ব্রাহ্মণ মানুষ ভিটের উপর উপোসী পড়ে থাকেন। যার তার হাতের রান্নাও চলে না ওঁর। নায়েব মশায় নৈকষ্য কুলীন—তিনি এসে পড়ে সুরাহা করে দিলেন। এইদিকে চলে আসুন চক্কোত্তি মশায়, পরিবেশনটা বরঞ্চ আপনি করুন। চারুবালার হাতের টাটানি—আমি সকলের পাতা করে দিচ্ছি। আমরা ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে যাব না।

পাশাপাশি পাতা পড়ল অনেকগুলি। কত চাল দিয়েছে রে চারু—এতজনের প্রায় ভরপেট হবে। কিসের পর কোনটা ঘটবে আগেভাগে যেন ছকে ফেলে সাজানো। এরা দিব্যি খাওয়াদাওয়া চালাচ্ছে—আর পাকশাক সমাধা করে দিয়ে প্রমথ হালদার পশ্চিমের চৌধুরিগঞ্জের পথ না চিনে হয়তো বা উত্তরমুখোই ছুটছেন এখন। রং-তামাশা হাসিমস্করা—তার মধ্যে খাওয়া বেশী এগোয় না।

এমনি সময় বিনি-বউ আর নগেনশশী এসে পড়ল। ধামা কাঁধে দশাসই এক পুরুষ খানিকটা পিছনে। ক্ষ্যাপা মহেশ। অনেক কাল আগে সেই যে মনোহর ডাক্তারের বাড়ি গগনের কাছে একদিন এসেছিল। পরনে তেমনি লাল চেলির কাপড়। গলায় কড়ি ও রুদ্রাক্ষের মালা, শুভ্র সুস্পষ্ট উপবীত। এই বাদা অঞ্চলেও এক ডাকে চেনে তাকে সকলে। এসেছে ও পুজোর নামে—কালীপুজোর পুরুত সে-ই। নৈবেদ্য ও গামছা-কাপড় নিয়ে নিয়েছে। দক্ষিণা বল আর যা ই বল, নগদ সেই এক সিকি। সেটা এখনো মেলে নি। নগেনশশীর পিছু পিছু সেইজন্যে আসছে। কর্তা-ব্যক্তি নগেনশশী, শুধুমাত্র মচ্ছবের মানুষ নয়, দায়দায়িত্ব অনেক তার কাঁধের উপর। বাজন-দারের হিসাব মিটিয়ে ও প্রসাদ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে তবে আসতে হল। আরও অনেক কাজ পড়ে, সমাধা হতে হতে এই মাস পুরো লেগে যাবে। তার উপরে একখানা পা ইয়ে মতন তো নগেনের - বিনি-বউ ভাইয়ের হাত ধরে এতখানি পথ ধীরে ধীরে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই জন্যে দেরি।

আলায় ঢুকে কলরব শুনে নগেনশশী রান্নাঘরের ছাঁচতলায় এসে দাঁড়াল।

কি গো, ভোজে বসে গেছ যে সকলে?

গগনের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। স্ফূর্তিবাজ মানুষ। দেশের বাড়ি থেকে বউ-বোন এসে পড়ার আগে ব্যাপারী আর মাছ-মারাদের কত দিন খাইয়েছে এটা-ওটা উপলক্ষ করে। এতগুলো তরকারি-সহ এমন আয়োজন করে নয় অবশ্য, সে সাধ্য তখন ছিল না। কোনদিন হয়তো শুধুই নুন-ভাত। তবু খেয়েছে অনেক মানুষ একত্র বসে। নগেনশশী জেঁকে বসার পর সে জিনিস হবার জো নেই। নিজের ঘরেই চোর যেন সে।

কৈফিয়তের ভাবে তাড়াতাড়ি বলে, কী করা যাবে! ঠাকুর মশায় রান্নাবান্না করে দিয়ে গেলেন। ভাত নষ্ট হয়। তাই বললাম, তোরা বাপু এগুলো খেয়ে শেষ করে দিয়ে যা।

চারুবালা কিন্তু দৃকপাত করে না। ঠেস দিয়ে বলল, পায়ের দোষে দেরি করে ফেললেন মেজদা। নইলে আপনিই তো এক সঙ্গে বসে খেতে পারতেন।

জগন্নাথ জুড়ে দেয় ঃ এখন বসে পড় না কেন একটা পাতা নিয়ে। ভাল বামুনে রেঁধেছে, জাত মরবে না।

চারু ও জগাকে একেবারে উপেক্ষা করে নগেনশশী গগনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, কোন্ বামুন ঠাকুর এসে রান্নাবান্না করে দিয়ে গেল ?

জবাব দেয় জগাই ঃ চৌধুরিদের নায়েব প্রমথ হালদার। মানুষ যেমনই হোক, লোকটার জ্যাত্যাংশে খুঁত নেই।

ঘরের ভিতরে উঠে এল নগেনশশী, কিন্তু খেতে বসল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরাখবর শুনে নেয়। শুনে হতবাক হয়ে থাকে খানিকক্ষণ।

কী সর্বনাশ কোন্ সাহসে এত বড় কাণ্ড করে বসলে জামাইবাবু ? জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া! চৌধুরিরা লোক সোজা নয়, তাড়িয়ে তুলবে, হাত-পা ধুয়ে আবার গিয়ে দেশঘরে উঠতে হবে। এই তোমার ভবিষ্যৎ, সে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

গগন ভালমন্দ কিছু জবাব দেয় না। জগা বলে কুমিরের যা স্বভাব সে তা করবেই। ঝগড়া না করে যাও না জলে কুমিরের সঙ্গে ভাব করতে। গিয়ে মজাটা বুঝে এস।

নগেনশশী আগুন হয়ে বলে, মতলবখানা কে পাকাল বুঝতে পারছি। বাউণ্ডুলেটা বিদেয় হয়ে গিয়েছিল, আবার কখন এসে ভর করল ?

জগা বলে, তোমার বুকে টনটন করে কেন ? তুমি কে হে ? তোমার বুকে চড়াও হয়েছি নাকি ?

কথাগুলো বলল যেন জগা নয়, গগন—গগনের উপরে নগেনশশী খিঁচিয়ে ওঠে ঃ বলে দিয়েছি না জামাইবাবু, বাড়ির উপর কেউ না আসে। কাজকর্ম থাকলে বাইরে থেকে মিটিয়ে যাবে। তবে কি জন্য বাজে লোক ঢুকতে দাও ?

এর উচিত জবাব আর মুখের নয়, হাতের। তাতে জগা পিছপাও নয়। কিন্তু হঠাৎ কী হল তার—দুরন্ত অভিমানে সর্বদেহ অসাড় হয়ে গেল যেন। সকলে মিলে কত আশায় নতুন-আলা বানাল—এই নগেনরা কোথায় তখন ? আজকে সেই লোক হুমকি দিচ্ছে, জগন্নাথকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে কেন ? জবাব গগনই যা দেবার দিক।

গগনকে সে বলে, কী বড়দা, বলবে না কিছু ? নতুন-ঘেরি শালাকে দানপত্র করে দিয়েছ বুঝি—কিচ্ছু তোমার বলবার নেই ?

তার পরে অন্য যারা খাচ্ছে, দৃষ্টি ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকায়। ঘাড় নিচু করে সবাই দ্রুত খেয়ে যাচ্ছে। জগা উঠে পড়ল।

বলাই বলে, ও কি, ভাত থুয়ে ওঠ কেন ?

সুখের মাছ-ভাত খেয়ে মেনিবিড়াল হয়ে গেছিস তোরা সব। মানুষ নেই এখানে। নয় তো পা ভেঙে লোকটা খোঁড়া হয়ে আছে, হাত ভেঙে নুলো করে দিতিস এতক্ষণ।

আলার সীমানা ছেড়ে তীরবেগে বেরুল। ইচ্ছে হচ্ছিল, যাবার আগে একটা থাবড়া মেরে যায় নগেনশশীর গালে। কিন্তু ঘেরি পত্তনের সে গোড়ার আমল আর নেই। সবাই তাকে বাতিল করে দিয়ে নতুন-আলায় পড়ে খোশামুদি করে। সাইতলা কম দুঃখে ছেড়েছে সে! ফিরে যাবে ময়ারখোলা এই রাত্রেই। গরু দুটো, শোনা গেল, খাড়ি এপারে এনে ফেলেছে। গাড়ি ঘুরিয়ে তেলিগাঁতির পুল

হয়ে যাবে এবার।

বাঁধের উপর এসেছে। নীরন্ধ্র অন্ধকার। ভাবছে, পাড়ার ভিতর তাদের চালা-ঘরে দু-দণ্ড বসে যাবে কিনা। মাছ-মারোরা ভোর থাকতে জাল নিয়ে ফিরবে, তাদের সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলে যেতে ইচ্ছে করে। জগাকে দেখে তারা নিশ্চয় খুশী হবে। তবে তো চালাঘরে পড়ে থেকে রাতটুকু কাটিয়ে যেতে হয়। মাছের সায়ের বসাল এই মুলুককে—মাছ-মারারা সেই থেকে দুটো চারটে পয়সার মুখ দেখছে। নাক সিঁটকে ভাললোকেরা বলেন, চোরাই কাজ-কারবার বাড়িয়ে দিল সায়ের বানিয়ে। তা সাধু পথের দিন না একটা ব্যবস্থা করে, চোর মাছ-মারারা খেয়ে-পরে যাতে সাধু-সজ্জন হয়ে যায়।

ফাঁকায় এসে শীতল জলের হাওয়ায় রাগ কিছু ঠাণ্ডা হয়েছে, তখন জগা এই সমস্ত ভাবছে। জঙ্গল কেটে ঘেরি বানালাম, জনালয় জমছে—কার ভয়ে এক্ষুনি খাল পার হয়ে উল্টোমুখো বয়ারখোলা ছুটব? অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ এক সময় চোখ তাকিয়ে দেখে, এদিকে-ওদিকে ছায়ার মতন মানুষ। বাদাবন—কত মানুষ মরে কত রকমে! অপঘাতে মরলে গতি হয় না, ভূত-প্রেত হয়ে বিচরণ করে। রোম-হর্ষক কত কাহিনী! তাদেরই একটা দল এসে পড়ল নিশিরাত্রে!

একজন তার মধ্যে জগার হাত জড়িয়ে ধরল। বলাই। নগেনশশীর হুমকিতে ওরাও সব আধ-খাওয়া করে উঠে এসেছে। বলাই বলে, ঘরে চল জগা!

কোন্ ঘরের কথা বলছিস?

তোমার ঘর—আমাদের সকলের সেই চালাঘর। ঘরের কথাও বুঝিয়ে দিতে হয়—বাপ রে বাপ, কী রাগ তোমার জগা ভাই!

ক্ষ্যাপা মহেশ এমন সময় দ্রুত পা ফেলে তাদের মধ্যে এল। জগার আর এক হাত ধরে বলে, ঘরে কেন, বাদায় চলে যাওয়া যাক। বাদার পথ একেবারে ছেড়ে দিলে—কত দিন যাও নি বল তো জগা-ভাই। মানুষের কুদৃষ্টি লেগেছে, এ জায়গায় আর জুত হবে না। নতুন জায়গা খুঁজে নাও। ভগবানের এত বড় পিরথিমে জায়গার অভাব কি!

পচা এসে আবার এর মধ্যে যোগ দেয়: যেদিন যাবে, তখন সে কথা! কিন্তু নিজের ঘর-দুয়োর ফেলে বয়ারখোলায় পড়ে থাকবে, সে কিছুতে হবে না জগা। তুমি না এলে আমরাই সেখানে গিয়ে পড়তাম, গিয়ে জোরজার করে নিয়ে আসতাম।

জগা খোঁটা দিয়ে বলে, ঘরে থেকে তো রাতভোর একা একা মশা তাড়ানো? তার চেয়ে, যাত্রাদলের মানুষ।—দিব্যি সেখানে জমিয়ে আছি।

বলাই বলে, এবার আর একলা থাকতে হবে না। সন্ধ্যের পর চালাঘরেই এখন গান-বাজনা আড্ডাখানা। নতুন-আলায় কেউ যাই নে।

পচা সোজা মানুষ, রেখে ঢেকে বলতে জানে না। বলে, যাই নে মানে কি! আলায় যাওয়া বারণ হয়ে গেছে। আলা আর বলি কেন, ষোলআনা গৃহস্থবাড়ি। গৃহস্থবাড়ি উটকো লোক কেন ঢুকতে দেবে? নগনা-খোঁড়া চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহারা দেয়। খালের মুখে এক ঘর বেঁধে দিয়েছে, সেইখানে সায়ের। কেনা-বেচার সময়টা মানুষ জমে, তার পরে সারা দিনরাত সে ঘরও খাঁ-খাঁ করে।

জগার হাত ধরে নিয়ে চলল পাড়ার দিকে। যেতে যেতে বলাই বলে, ঐ নগনাটা চারুকে বিয়ে করবে বলছে। বিধবা-বিয়ে। তা বাদা-রাজ্যে বিধবা-সধবা কি! এক

বউ কোথায় নাকি পড়ে আছে, খোঁড়ার সঙ্গে ঘর করতে চায় না। ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে—বউঠাকরুনের খুব মত। বড়দা ভালমন্দ কিছু বলে না। অনিচ্ছে থাকলেও বলতে সাহস পায় না।

থমকে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ প্রশ্ন করে, চায়, কি বলে?

মেয়েমানুষ তো! ধরেপেড়ে পিঁড়িতে তুলে দিলে সাতপাকের সময় সে কি আর লাফ দিয়ে পড়বে? অজাঙ্গি বাদা জায়গা—লাফিয়ে পড়ে যাবেই বা কোথায়?

পচা আবার বলে, ভিন জায়গায় পড়ে থাকা হবে না কিন্তু জগা। কক্ষনো না। কি ভাবছ?

আচ্ছা, গরুর-গাড়ি তো পেঁছে দিয়ে আসি বয়ারখোলায়।

পচা বলে, তোমায় ছাড়ব না। গাড়ি-গরু আমিই কাল তৈলক্ষ মোড়লের বাড়ি দিয়ে আসব।

উনচল্লিশ

রাত তো অনেক। তা বলে কেউ শুয়ে পড়ছে না। এমন রাত্রি কতদিন আসে নি। এত জনে আজ, একসঙ্গে জগাদের সেই চালাঘরে জমিয়ে বসা গেল অনেক দিন পরে। না, ঘরের জায়গা কতটুকু—উঠান জুড়ে বসা যাক। মায়ের পুজা উপলক্ষে সাঁইতলার মাছ-মারারা কেউ জালে বেরোয় নি। কালকের দিন না হয় উপোসই যাবে। কাজকর্ম বারোমাস আছে, মায়ের নামে একটা দিনের এই ছুটি।

জমেছে খুব। জগন্নাথ এসে পড়ল কোথা থেকে, নতুন-ঘেরি পত্তনের মূলে যে মানুষটা। ঘেরি বানিয়ে আলো বেঁধে সায়ের চালু করে জঙ্গলে জনালয় বানিয়ে দিয়ে একদিন সরে পড়ল। আর আছে মহেশ, কালী করালীর পুজোয় পুরুত হয়ে এসেছে। এই এক মজা। ক্ষ্যাপা বাওয়ালীর কোথায় বসবাস, কেউ জানে না। অন্য সময় বুঝি সে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য হয়ে থাকে, মায়ের নামে ঢাকে কাঠি পড়লে অমনি মূর্তি ধরে উদয় হয়। বাদারাজ্যে এবং বাদার আশেপাশে যেখানেই পুজো হোক, মহেশ হাজির। জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে। বাঘ-কুমির পোষ-মানা গরু-ছাগলের মত। অন্যে যা দেখতে পায় না, তার নজরে সে সব এড়ায় না। এই যেমন, কথাবার্তা হচ্ছে আজ উঠানের উপর বসে—কথার মাঝখানে চোখ পাকিয়ে হঠাৎ মহেশ আকাশ-মুখো তাকিয়ে পড়ে: এইও—দাঁড়িয়ে কি দেখিস? পালা, পালা—

গা সিরসির করে ক্ষ্যাপা-মহেশের কথা শুনে! তার কাণ্ড-কারখানা দেখে।

ঠিক মাঝখানে আগুন। আগুনের সামনেটায় মহেশ, তার পাশে জগা। মহেশ আজ জগাকে নিয়ে পড়েছে। বোঝা বোঝা শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে দিয়েছে। শীত কেটে গিয়ে ওম হচ্ছে আগুনে। আলো হচ্ছে। বাতাসের ঝাপটা আসে এক-একবার। রাত্রিচর পাখি হুশহুশ করে উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে। ক্ষ্যাপা-মহেশ কথা বলে, আর খলখল করে হাসে। সাঁইতলার মেয়েপুরুষ আগুন ঘিরে বসেছে।

কত আজব খবর। ক্ষ্যাপা-মহেশ যখনই আসে, এই সব শুনতে পাওয়া যায়। শোনবার জন্য সকলে উৎসুক হয়ে থাকে। জানাশোনার এই যত দেশভুঁই আর মানুষ-জন নয়। অগম্য অরণ্য—কালেভদ্রে কদাচিৎ যেখানে মানুষের পা পড়ে। পা ফেলে এই মহেশ আর তারই মতন দশ-বিশটা গুণীন বাওয়ালী। পা ফেলবার আগে পুজো দিয়ে এবং ভবিষ্যতের জন্য মানসিক করে বনের ঠাকুরকে তুষ্ট করে যেতে হয়। হরেক রকমের শত্রু, নজর মেলে কতক দেখা যায়—বাঘ-সাপ-কুমির। শুধুমাত্র অস্ত্রের

ভরসায় গেলে হবে না। চোখ রয়েছে সামনে, পিছনে চোখ নেই তো তোমার—পিছন দিয়ে এলে কি করবে? চোখ থেকেই বা কি! কোন হেঁতালঝাড়ে কিম্বা গিলেলতার ঝোপের মধ্যে গাছপালার রঙের সঙ্গে গায়ের রঙ মিলিয়ে ঘাপটি মেরে আছে—চোখ থেকেও তুমি যে বনকানা বনে গিয়েছ। অস্ত্র থাকুক, কিন্তু আসল হল মন্ত্র। ভাল গুণীন আগে আগে পথ দেখাবে—যাদের মুখের মন্ত্র ডেকে কথা বলে।

আর শত্রু আছে—যারা বাতাস হয়ে থাকে, গুণীনের তীক্ষ্ণ চোখই শুধু ঠাহর পায় তাদের। ভুটো-দানো জিন-পরী। জনালয়ের অত্যাচার এড়িয়ে নিঃশঙ্ক আরামে থাকে তারা। এককালে হয়তো মানুষ ছিল—মরে যাবার পর মানুষের সম্বন্ধে ঘৃণা আর অবিশ্বাসের অন্ত নেই। মানুষকে কিছুতে ঢুকতে দেবে না তারা জঙ্গলে।

জগা এর মধ্যে সহসা মন্তব্য করে ওঠেঃ বেঁচে থেকে আমাদেরও ঠিক তাই। মানুষ বড় পাজী। তাড়িয়ে তাড়িয়ে কোথায় এই এনে তুলেছে। তাড়া করছে এ-জায়গায় এসেও।

চোখ তুলে ক্ষ্যাপা-মহেশ তাকায় একবার তার দিকে। গল্প যথাপূর্ব চলছেঃ নতুন যারা জঙ্গলে ঢোকে, সকল রকম শত্রুতা বাধে তাদের সঙ্গে। ঝড়-তুফান তুলে নৌকো বানচাল করে। বাঘ-সাপ-কুমির লেলিয়ে দেয়। নিজেরাই পশু-মূর্তি ধরে আসে কখনো বা। রূপসী মোহিনী হয়ে কোন জলাভূমিতে ভুলিয়ে নিয়ে ঘাড় মটকায়। অথবা সোজাসুজি উড়িয়ে নিয়ে দুর্গমতম অঞ্চলে একলা ছেড়ে দেয়। বড় দয়া হল তো মানবেলার ভিতর আবার উড়িয়ে রেখে আসে।

মহেশ বলে, আমার সহায় ধর তোমরা। বড়লোকের বিষ-নজর লেগেছে, এ সইতলা জায়গায় মজা নেই। সাপের ফণার বিষ, আর মানুষের নজরে বিষ। কোনদিন আর এখানে সোয়াস্তি পাবে না। দক্ষিণের নতুন নতুন বাদায় নিয়ে যাব তোমাদের। মা বনবিবি আর বাবা দক্ষিণরায়ের আজ্ঞায় জীবজন্তু আমার হুকুমের দাস। কথা না মানলে মাটি আগুন করে দেব—গাঙ-খাল ঝাঁপিয়ে দৌড়ে পালাতে দিশে পারে না। কামরূপ-কামিখ্যের আজ্ঞায় দানো-পরী সব মান্য করে চলে, আকাশের বায়ু নয় তো আগুন করে দেব। গুরু কাণ্ডারী ধরে লোকে ভবসিন্ধু পার হয়, গহিন বনের কাণ্ডারী হলাম আমরা ফকির-বাউলে। চল আমার সঙ্গে। কানা-গাঙ পার হয়ে গিয়ে কেশেডাঙা—দরিয়া সেখান থেকে পুরো বেলার পথও নয়।

সেই কেশেডাঙার তেপান্তর জুড়ে সাদা বালি চিকচিক করছে। আর কাশবন। মিঠাজল দূর-দূরান্তর থেকে বয়ে আনতে হবে না। গুপ্তস্থান আছে কাশবনের ভিতরে, সন্ধান জানে শুধুমাত্র মহেশ। বালি সরিয়ে গর্ত করে চুপচাপ বসো গিয়ে—কাকের চোখের মত নির্মল জল এসে জমবে। আঁজলা ভরে খেয়ে দেখ, কি মিষ্টি! জলে যেন বাতাসা ভেজানো।

শুনতে শুনতে সকলে দোমনা হয়ে ওঠে। সইতলা সত্যি আর ভাল লাগে না। এক জায়গায় অনেক দিন হয়ে গেছে। তাছাড়া প্রবল শত্রু চৌধুরিরা নানা রকম প্যাঁচ কষছে। এতদিন নিজেরা করছিল, এবারে সদরে আদালত অবধি ধাওয়া করেছে। আদালতের চাপরাসী এসে পড়েছিল, পিছন ধরে আরও কত কী আসবে কে জানে! কিন্তু সকলের চেয়ে অসহ্য নগেনশশীর মাতব্বরি। নতুন-আলা এখন হয়ে গেছে গৃহস্থবাড়ি। জঙ্গল হাসিল করে গতরে খেটে যারা একদিন আলা বেঁধেছিল, বাইরের বাজে মানুষ তারা আজ—গৃহস্থবাড়ি ঢোকবার তাদের এক্তিয়ার নেই। তাদের যাওয়া-আসা খালধারের সায়ের অবধি—মাছ নামিয়ে দিয়ে টাকাপয়সা মিটিয়ে নিয়ে ঘরে যাও।

ব্যস্। কাজকর্ম ব্যাপার-বাণিজ্য ছাড়া অন্য সম্পর্ক নেই। তামাক খাওয়াটা এখনো মুফতে চলে বটে, তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে। একদিন খোঁড়া নগনা এমনভাবে চোখ ঘোরায়, ইচ্ছেও করে না বিনি-কাজে সেখানে দুদণ্ড বসে থাকতে।

বলাই বলল, যেতে তো মন লয় গুণীন। কিন্তু এখানে বড়দা ছিল। হিসাবী মানুষ, লিখতে পড়তে জানে, হাতে-গাঁটে দু-চার পয়সা নিয়ে এসেছিল। তাইতে ঘেরি পত্তন হল। আমাদের সম্বল ফুলো-ডুমুর—শুধু কটা মানুষ গিয়ে নতুন জায়গায় কি করব?

মহেশ বলে, অথই দরিয়ার তলা থেকে দেবতা ডাঙা বের করে দিয়েছেন, মবলগ পয়সা লাগে কিসে? ডিঙি যোগাড় করে নাও। চাল-নুন নাও। আর পুজোর বাবদ যা লাগে সেইগুলো নিয়ে নাও মিলঝিল করে। এইটে হল আসল, পুজো অঙ্গে খুঁত না থাকে। নৌকা কাছি কর গিয়ে চরের পাশে। গুণীন যাবে পথ দেখিয়ে, মরদ-জোয়ানেরা তার পিছন ধরে। পা ফেলে জায়গা-জমির দখল নিয়ে নেবে। পায়ে হেঁটে যে যতদূর বেড় দিয়ে এল, জমি ততখানি তার। লেখাজোখা দলিল পত্তর নেই। এ-স্ব জমির মালিক মানুষ নয়, মালিক হলেন দেবতা। মালিক মা বনবিবি, বাবা দক্ষিণ রায়। তাঁদের সঙ্গে লেখাজোখা লাগে না, খরচার ব্যাপার নেই।

জগা জেদ ধরল : হবে না ঠাকুর। আগে এদের তাড়াব আমাদের সাঁইতলা থেকে। তাড়িয়ে দিয়ে তার পরে যেখানে যেতে হয় যাব।

জ্যোৎস্নার আলোয় নিষুতি আলা দেখা যায় দূরে। সেদিকে জগা আঙুল দেখায় : দেখ, কী রকম আয়েশ করে ঘুমুচ্ছে। কোন্ মুলুক থেকে বাঁশ জুটিয়ে এনে জঙ্গলের গোল গরান কেটে ঘর বেঁধে দিয়েছি—মজা লুটছে বাইরের উটকো মানুষরা এখন। ওদের তাড়াব।

মহেশ বলে, তাড়িয়ে কি লাভ? একজন গেল তো অন্য দশজন এসে পড়বে। রাস্তা হয়ে গেল, কলের গাড়ি এসে যাচ্ছে, মানুষের গাদি লেগে যাবে। থাকার সুখ আর রইল না হেথায়।

এ সমস্ত পরের ভাবনা, এক্ষুনি আর হচ্ছে না। এত জনে এক জায়গায়—আপাতত আনন্দ করা যাক কিছু। মস্তবড় রণজয় হয়েছে, নায়েব প্রমথ আর চাপরাসী নিবারণ রাঁধা-ভাত ফেলে ছুটে পালাতে দিশা পায় না। সেই ষড়যন্ত্রের ভিতরে যেমন জগন্নাথ তেমনি গগন দাস। এবং মেয়েলোক হয়ে চারুবালাও রয়েছে। সকলের বড় আনন্দ, খোঁড়া-নগনার তাড়া খেয়ে বলাই-পচা আবার এখন ষোল আনা পাড়ার মানুষ হয়েছে। বলাই ঢোল বের করে নিয়ে এল চালার ভিতর থেকে। জগা কোলের উপর টেনে নিয়ে দু-তিনটে ঘা দিয়ে বলে, বেশ তো আছে। খাসা আওয়াজ আছে।

বলাই বলে, বাজাই যে আমরা।

বাজাবি ছাড়া কি! নতুন-আলায় খোল বাজাতিস—বাজনার বড় ওস্তাদ তুই এখন।

জগার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। বলে, আলায় ওরা মজা করে ঘুমুচ্ছে। সে হবে না।

ক্যাপা-মহেশ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। জানে এদের। কিছুই অসম্ভব নয় বাদা অঞ্চলের এই হুটকো ছোঁড়াদের পক্ষে।

কি করবি? হানা দিয়ে পড়বি নাকি আলায়?

জগা হাসতে হাসতে বলে, অন্যায়-অধর্মে আমরা নেই। ষোলআনা ধর্মকাজ।

একটা জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে কি হবে—ঘুরে ঘুরে গানবাজনা। নগরকীর্তন।

পচা বলে, ঢোল বাজিয়ে কিসের কীর্তন রে?

ঢোলে বুঝি খোলের বোল তোলা যায় না! শুনিস। ঢোলে আরও জোরদার হয়। এতগুলো জোয়ান-মরদের গলা—মিনমিনে খোল তার সঙ্গে মিশ খাবে কেন?

মহেশ চালাঘরে ঢুকে গেল। বাঁধের পথে বেরিয়ে পড়ল এরা সব:

নগরবাসী আয় তোরা
সংকীর্তনের সময় বয়ে যায়—
নেচে নেচে বাহু তুলে
হরি বলে ছুটে আয়।

আঠার-বিশ জন মানুষ—আঠার রকম সুর তাদের গলায়। তোলপাড় লেগে গেছে। কালীতলাটা আগে পরিক্রমা করে এল। নতুন-আলার সামনে বাঁধের উপর এসে পড়ে। নড়তে চায় না আর এখান থেকে। বাঁধের উপর পাশাপাশি দুটো কেওড়াগাছের নিচে পুরো আসর বসিয়ে নিয়েছে।

গান গায় আর উঁকিঝুঁকি দেয় জগা।

বলাই বলে, পাড়াসুদ্ধ আমরা জেগে, ওদের কিচ্ছু নড়াচড়া নেই। দেখে আসব জগা, ভিতরে গিয়ে?

জগা বলে, দেখবি আর কোন ছাই, এর পরেও ঘুমুতে পারে? সে যারা মরে গেছে তারাই।

বলছে, তবু ষোলআনা ভরসা করতে পারে না। গানে আরও জোর দিয়ে দিল। প্রত্যাশা, নগেনশশী মেজাজ হারিয়ে যদি উঠানে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু চিৎকারে গলার নলি ছিঁড়ে যাবার দাখিল, বাজাতে বাজাতে আঙুল টনটন করছে—না রাম না গঙ্গা, তিলেক শব্দসাড়া নেই ওপক্ষ থেকে। হতাশ হয়ে বলাই বলে, ঘরে চল জগা-ভাই। কানে ছিপি এঁটে ওরা পড়ে আছে। পারবি নে। আমরাই মিছে হয়রান হচ্ছি।

পচা বলে, নগনা বুঝে নিয়েছে, এত মানুষ আমরা পিছু হঠব না। এক কথা বলতে এলে উল্টে বিশ কথা শুনিয়ে দেব। মরে গেলেও সে এখন বেরুবে না।

জগা বলে, তার উপরে আজ এক উপসর্গ এসে জুটেছে—টৌনি চক্কোত্তি। কিন্তু ওরা কিছু না বলুক, চারুবালার কি হল বল দীক? গলার তোড়ে জঙ্গলের বড়-শিয়াল লেজ তুলে দৌড় দেয়, সে মেয়েমানুষ ঠান্ডা হয়ে আছে কেমন করে?

বলাই হেসে বলে, আমি বলতে পারি।

কেন রে?

বলাই বলে, নগেনশশী জব্দ হচ্ছে, তাতে বড্ড সুখ চারুবালার। খোঁড়াটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। নিজের কষ্ট হলেও দু-কানে আঙুল ঢুকিয়ে দাঁত-মুখ চেপে পড়ে আছে।

জগা উল্লাস ভরে বলে, সত্যি? লাগাও তবে, জোর লাগাও—

কিন্তু কতক্ষণ! পোহাতি-তারা উঠে গেছে। একতরফা লড়াইয়ে মজাও পাওয়া যায় না। পাড়ায় ফিরে এল অবশেষে। দাওয়ায়, ঘরের মধ্যে, উঠানের উপর যে যেখানে পারল গড়িয়ে পড়েছে।

চক্কোত্তি মশায় আর নগেনশশী কমবেশী উভয়েই পাটোয়ারী ব্যক্তি। পরিচয় অল্প

সময়ের বটে, কিন্তু একে অন্যের গুণে বুঝেছেন। ভাব বুঝেছেন। ভাব হয়ে গেছে দু-জনায়। আলাঘরে পাশাপাশি শুয়েছেন। একটুখানি ঘুমের আবিল এসেছিল, গানের তোড়ে সে ঝোঁক অনেকক্ষণ কেটে গেছে।

নগেন বলে' এক ছিলিম হবে নাকি চক্কোত্তি মশায় ? কলকে ধরাব।

চুপ ! বলে চক্কোত্তি থামিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বলেন, কথা বলবে না, মোটে নড়াচড়া নয়, তা হলে পেয়ে বসবে। বেড়ায় চোখ দিয়ে দেখছেও হয়তো কেউ। যেমন আছ ঘুমিয়ে পড়ে থাক অমনি। আর ভাব।

রাত কেটে গিয়ে অবশেষে গান-বাজনা থামল। আলো হয়ে গেছে চারিদিক। বাঁধের পথে কেউ নেই। চক্কোত্তি তখন উঠে বললেন ঃ তামাকের কথা বলছিলে না ? এইবারে হোক।

হালকা গেঁয়োকাঠের কয়লা করা থাকে। টেমি জ্বেলে ধরানো যায়। নগেনশশী তামাক সেজে কয়েক টান টেনে ভাল করে ধরিয়ে দিল। ব্রাহ্মণের হুঁকো নেই, বাদা অঞ্চলে দরকার পড়ে না। নলচের মাথা থেকে কলকে নামিয়ে ডান-হাতে নিয়ে বাঁ-হাতটা চিতিয়ে নিচের দিকে ধরে চক্কোত্তির দিকে সম্ভ্রমভরে এগিয়ে দেয়।

চক্কোত্তি চোখ বুজে কিছুক্ষণ ধরে টানলেন। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সহসা চোখ তাকিয়ে বলেন, কেমন বুঝলে ?

ঠিকমত অর্থ না বুঝে নগেনশশী বলে, আজ্ঞে ?

দাস মশায় আমায় বললেন, শত্তুরে পিছনে লেগেছে। শত্তুর কিসে নিপাত হয়, তার যুক্তি পরামর্শের জন্য টেনেটুনে নিয়ে এলেন। তা ভালই হল, সব শত্তুরে স্বচক্ষে দেখে গেলাম। রাত দুপুরে এক শত্তুরে দেখেছি, ভোররাত্রে আবার এই ভিন্ন দল দেখলাম। বেশী প্রবল্ল কারা, দেখ এইবারে ভেবে।

নগেনশশী বিনয় দেখিয়ে বলে, আপনি বলুন, শুনি।

চক্কোত্তি বলেন, চৌধুরি বাবুরা ঘেরিদার, দাস মশায়ও তাই। বড় আর ছোট, এই হল তফাত। চিল বড় পাখি, তা বলে চড়ুই কি আর পাখি হল না ? সামনা-সামনি বসে এদের দু-পক্ষের খানিকটা বুঝসমঝ হতে পারে। অন্তত চেষ্টা করে দেখা যায়। কিন্তু হাঘরের দল পথে দাঁড়িয়ে গণ্ডগোল করে গেল, তাদের সঙ্গে মুখ-শোঁকাশুঁকি কিসের হে ? আমি বাপু দাস মশায়ের ব্যাভারের মর্ম বুঝলাম না।

পুলকিত নগেনশশী ঘাড় নেড়ে বলে, দেখুন তাই। আলায় ওদের আসা বন্ধ করে দিয়েছি, তাই নিয়ে জামাইবাবু মন গুমরে বেড়ায়। বুঝিয়ে বলুন আপনি তাঁকে। আর প্রতিকার কোন্ পথে, সেটাও বলে দিন।

চক্কোত্তি হেসে উঠে বলেন, নতুন আর কি ! সনাতন পথ—সদরের পথ। ঐ একটা পথ আজন্ম চিনে বসে আছি। পাঁচ-সাত নম্বর মামলা ঠুকে দাও। পয়লা নম্বরে ফৌজদারি—কাঁচা-খেগো দেবতা যাকে বলে। আইন মোতাবেক ওই চলল, আর আইনের বাইরে যা করবার এদিক থেকে চলুক। থানায় ভাল করে তদ্বির করে এস, কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে সবগুলোকে যাতে টেনে নিয়ে যায়।

নগেনশশী বলে, সবগুলোকে লাগবে না। পালের গোদা ঐ জগন্নাথকে নিলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বেটা ছিল না এখানে, কাল এসে পড়েছে। খালের মধ্যে গরুর-গাড়িতে ওঁদের আটকে রেখে চক্রান্ত করতে এল এখানে। বাঁধে দাঁড়িয়ে অমন হট্টগোল করা জগা না থাকলে কেউ সাহস করত না।

চক্কোত্তি লুফে নিয়ে বলেন, খপ্পরে এসে গেছে, ভালই তো হয়েছে। খাটা দেওয়া

হবে না, বুঝলে? খেয়েদেয়ে ফুর্তিফার্তি করে বেড়াক। কোন-কিছু টের না পায়। আর দেখ, তোমাদের উপর ঝুঁকি রেখে কাজ নেই। তোমাদের কতটুকু মুরোদ? চৌধুরিবাবুদের কাজে নামাতে হবে। নায়েব টং হয়ে রয়েছে—নতুন কিছু করতে হবে না, খালি এখন বাতাস দিয়ে যাওয়া। দেখাতে হবে, তোমরাও চৌধুরিদের সঙ্গে —কালকের ব্যাপারের মধ্যে তোমরা ছিলে না, বাউণ্ডুলেগুলো করেছে।

বলতে বলতে চিন্তান্বিত হয়ে চক্কোত্তি একটু থামলেন। বলেন, তবে কিনা দাস মশায়ের বোনটাও জড়িয়ে পড়েছে। নায়েবকে ভয়-ভীত দেখাল সে-ই।

নগেনশশী আগুন হয়ে বলে, তাকে ঐ জগাই টেনেছে। আচ্ছা রকম জব্দ করতে হবে ওটাকে। রান্না-করা মুখের ভাত ফেলে ভদ্রলোক ছুটে বেরুলেন। সাপে কাটল, না গাঙে-খালে ভেসে গেলেন কে জানে!

সহাস্যে চক্কোত্তি ঘাড় নাড়েন: কিছু না, কিছু না। ও মানুষ মরবে না—প্রহ্লাদ। নামটা শোনা ছিল, কাল পরিচয় হল। নাম ভাঁড়িয়ে কত খেল খেলতে লাগল। চৌধুরিগঞ্জে গেলে খবরবাদ পাওয়া যাবে। যাবে তো চল। আমি যেতে রাজী আছি।

টৌনি মানুষ, মামলা-মোকদ্দমা বাধাতে জুড়ি নেই। এই হল পেশা। গণ্ডগোল দু-পক্ষে যত জমে আসবে, তত মজা লুটবেন।

বলেন, দাস মশায়কেও নিয়ে চল। খোদ মালিক তো বটে—তোমার আমার চেয়ে তার কথার দাম বেশী। ভেবে দেখছি, কালকের কাজটা ভালই হয়েছে মোটের উপর। ঠিক মত খেলাতে পারলে নায়েব আর জগন্নাথে লেগে যাবে। সেই যে বলে থাকে, বাঘ মারতে শত্তুর পাঠানো। বাঘ মরে ভাল, শত্তুর মরে আরও ভাল।

উৎসাহে নড়েচড়ে চক্কোত্তি উঠে দাঁড়ালেন: কি হে দাস মশায় ওঠে নি এখনো? খোঁজ নাও।

কামরার ভিতরে গগন শোয়। অনেকক্ষণ সে উঠেছে, ডোবার ঘাটে গুঁড়ির উপরে বসে বাবলার ডাল ভেঙে দাঁতন করছে। নগেনশশী বলে ঐ যে জামাইবাবু। জিজ্ঞাসা করে আসি।

বেরুতে গিয়ে দেখে বেড়ার ওধারে মানুষ—চারুবালা। ঝাঁটা হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কি?

চারুবালা করকর করে ওঠে, তামাক-টামাক বাইরে গিয়ে খেলেই তো হয়। এতখানি বেলা হল, ঝাঁটপাট হবে আর কখন?

না, রাজী হল না গগন। চৌধুরিগঞ্জে সে কিছুতে যাবে না। অম্বাবের ধরতে এসে কাল ওরা পেরে ওঠে নি. দৌড়ে পালাতে দিশা পায় না। কিন্তু ছাড়বে না, আবার আসবে। মামলা-মোকদ্দমায় নাস্তানাবুদ করে শোধ তুলবে। যতদূর সাধ্য লড়ে যাবে গগন। নিতান্ত না পেরে ওঠে তো বাস তুলবে এ জায়গা থেকে। পালা গেয়ে যাত্রার দলের মানুষ যেমন এক গ্রাম ছেড়ে বিদায় হয়; রং মেখে আবার ভিন্ন গাঁয়ের আলাদা আসরে গিয়ে নামে। দুনিয়ার মধ্যে ভাগ্য খুঁজে নিতে একদিন খালি হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল—সেই দুনিয়া একেবারে শেষ হয়ে যাচ্ছে না সাঁইতলার করালীর কূলে এসে। আবার বেরুবে। তা বলে কাল রাত্রে এত সব কাণ্ড, সকালবেলা চোখ মুছতে মুছতে শত্রুর পায়ে দণ্ডবৎ হয়ে পড়বে কোন্ আক্কেলে?

নগেনশশী নানা রকমে বোঝাবার চেষ্টা করে: ক্ষেপে গেলে কেন জামাইবাবু?

ব্রাহ্মণমানুষ অতিথ হয়ে হাত পুড়িয়ে রাঁধাবাড়া করলেন। তোমরাই রাঁধা-ভাত কেড়ে নিলে ওরে মুখ থেকে। হাঁ, কেড়ে নেওয়া ছাড়া আবার কি! মামলা-মোকদ্দমা চুলোয় যাক—কিন্তু মনের কষ্টে ব্রাহ্মণ শাপশাপান্ত করে গেলেন, তার একটা প্রতি-বিধান চাই তো! গিয়ে পড়ে দুটো মিষ্টিকথা বলে বুঝসমঝ করা।

গগনের এমনি স্বভাবটা নরম, কিন্তু গোঁ ধরল তো একেবারে ভিন্ন মানুষ। বাড়ি থেকে বেরুবার দিন সেই যে বলেছিল, গাড়ালের গোঁ আর মরদের গোঁ—একবার যে পথ নিয়েছে, কারও ক্ষমতা নেই ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেবার। যার বলে ঘর ছেড়ে এসে এত দুঃখকষ্ট পেয়েছে, কিন্তু বাড়ি ফিরে যাবার কথা মনে কখনো ওঠে নি। যাবেও না আর—সেই কথা গগন যখন-তখন বলে থাকে।

নগেনশশী তখন ভিন্ন দিক দিয়ে তাতিয়ে তুলছে: শত্রু-শত্রু করছ—চৌধুরিগঞ্জের কাছে তো দণ্ডবৎ হবে না। কিন্তু চৌধুরিরা যে শত্রুতা-ই করুক, টাকার মানুষ—ভদ্রলোক। যত সব ছ্যাঁচড়া শত্রু যে তোমার ঘরের দুয়োরে। সুবিধা পেলেই বুকে বসে দাড়ি উপড়াবে। তাদের ঠাণ্ডা করাটা হল বেশী জরুরী।

গগন বোকা নয়। বুঝে ফেলেছে নগেন কি বলছে। ন্যাকা সেজে তবু প্রশ্ন করে, ঘরের দুয়োরে কাদের কথা বলছ তুমি—হ্যাঁ?

ভোর অবধি কীর্তন গেয়ে যারা আমাদের গঙ্গাযাত্রা করে গেল। ঘরের সামনে বাঁধের উপর এসে হানা দেয়—একা-দোকা নয়, পাড়াসুদ্ধ জুটেপুটে এসে। কাল ঢোল পিটেছে, এর পরে লাঠি-পেটা করবে। টৌলির্ ঠাকুর বলে দিলেন, ভয় এদেরই কাছে, এদের কি করে সামলাবে সেইটে ভাব।

গগন উড়িয়ে দেয়: আমার ভয়টয় নেই। তোমাকেই ওরা দুচক্ষে দেখতে পারে না। আর চারুকে বিয়ে করব-করব করছ—তাই যদি হয়, বিয়ে-থাওয়া সেরে দু-জনে বিদেয় হও দিকি। গাঁয়ে না ফিরবে তো আর যেখানে হোক যাও চলে। আগে সাঁই-তলায় আমরা যেমন ছিলাম, ঠিক আবার তেমনি হব।

রাগ ও বিরক্তির ভাব গিয়ে নগেনশশীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হল: বেশ, তাই। যোগাড়যন্তর করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দাও। তুমি বোনাই আছ, আমিও বোনাই হয়ে যাই তোমার। দেশে-ঘরে ফেরা যাবে না—হুঁকো-নাপিত বন্ধ, মরলে কাঁধ দেবে না কেউ। তা যেখানেই থাকি সেই তো দেশ। আবাদ অঞ্চলে ঘরবসত করব, যেখানে সমাজের বায়নাক্কা নেই। সাঁইতলায় না পোষাল তো কত জায়গা রয়েছে।

গগন বলে, তোমার ভাবনা কি! বড় গাছে না বাঁধবে গিয়ে। খবর পেলে চৌধুরিরা লুফে নেবে তোমায়।

গগন যাবে না তো, নগেনশশী ও চক্কোত্তি চললেন। সেই যে দুটো বিদেশী মানুষ রাত্রিবেলা অচেনা পথে ছুটে বেরুল—অন্য-কিছু না হোক, তাদের খবরাখবর নিয়ে আসা কর্তব্য। খবর ঐ চৌধুরিগঞ্জে না মেলে তো চলে যাবেন ফুলতলা অবধি। ও-অঞ্চলের [illegible] গিয়ে [illegible] অপরাধ ঝেড়ে ফেলতে হবে একেবারে: আমরা নেই ওসব বজ্জাতির মধ্যে, আমরা কিছু জানি নে।

নায়েব ও চাপরাসী পৌঁছে গেছেন চৌধুরিগঞ্জের আলায়। অনেক কষ্ট পেয়ে, অনেক অপথ-বিপথ ঘুরে। নিবারণ ভোরবেলা মাছের ডিঙিতে সদরে রওনা হয়ে গেছে। আছেন প্রমথ হালদার। আয়েশী মানুষ, ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। রাত্রিবেলা নিরম্বু উপোস গেছে, মুড়িও ছিল না ঘরে। এই মেছোরাজ্যে দরকার মতন

ছাইটুকুও পাওয়া যায় না। সব কিছু আগে থাকতে যোগাড় রাখতে হয়। কালো-সোনা সকালবেলা চিঁড়ে-মুড়ির চেষ্টায় গেছে। গেছে তো গেছেই—দেখ, কোথাও রস গিলতে বসে গেল কিনা। মেছোঘেরির এই ভূতগুলোকে বিশ্বাস নেই।

প্রমথ শুয়ে ছিলেন। নগেনশশীকে আগে দেখেন নি, চক্কোত্তিকে দেখে চিনলেন। তড়াক করে উঠে বসে গর্জন করে উঠলেন: সকালবেলা কোন্ মতলবে আবার? কালীতলায় আমাদের বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছিল, আইন তো জানা আছে মশায়ের—ক'বছর জেলের ঘানি ঘোরাতে হবে সেইটে ভাল করে ওদের বুঝিয়ে দিন গে।

টোর্নি চক্কোত্তি বলেন, শুধু আপনি হলেও ভাল ছিল নায়েব মশায়। আদালতের চাপরাসী সঙ্গে। সরকারী কাজে ব্যাঘাত-সৃষ্টি—সরকারী লোকের উপর জুলুম ও খুনখারাবির চেষ্টা। ব্যাপার কদ্দুর অবধি গড়াতে পারে, গোঁয়ারগুলো কিছু কি তলিয়ে দেখে?

নগেনশশী স্তম্ভিত। কী মানুষ চক্কোত্তি। ঠাণ্ডা করতে এসে আরও যে বেশী করে তাতিয়ে দিচ্ছে। হালদার ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, কাউকে ছাড়ব না, সবশুদ্ধ জড়িয়ে ফৌজদারি হচ্ছে। নামধাম যোগাড়ের জন্য আজকের দিনটা আছি।

উঁহু—সবেগে ঘাড় নেড়ে ওঠেন চক্কোত্তি: পাকা লোক হয়ে কাঁচা কাজ করে বসবেন না। তবে তো জুত পেয়ে যাবে। গগন দাস যতই হোক ঘেরিদার মানুষ। শাঁস আছে, ছ্যাঁচড়া কাজে সে কক্ষনো যাবে না। এ সব করে বেড়ায় উড়ো মানুষ যারা। বলে দিল মুখে মুখে ফুক্কুড়ি কথা, বাতাসে উড়ে চলে গেল। সে কথার দায়ঝক্কি নিতে যাবে না। এবারে কায়দায় পাওয়া গেল তো দলটা ধরে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে দিন। আপনাদের বৈষয়িক বিরোধের মীমাংসা হতে তার পরে দেখবেন দু-দণ্ডের বেশী লাগবে না।

আসল মারপ্যাঁচ নগেনশশী এতক্ষণে বুঝতে পারছে। চক্কোত্তিকে মনে মনে তারিফ করে। চক্কোত্তি আবার বলেন, পুরো দল নিয়ে পড়তে হবে না। পালের গোদা একটা আছে, তার নাম জগন্নাথ। ওটাকে ফাটকে পুরে দিন, দেখবেন সব ঠাণ্ডা।

কিন্তু প্রমথও গভীর জলের মাছ—এক কথায় মেনে নেবেন, সে পাত্র নন। ঘাড় নেড়ে বলেন, ও বললে শুনি নে মশায়। খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে। গগন দাস প্রকাশ্যে না হোক তলে তলে ছিল। ওই যে ছুঁড়ীটা—গগন দাসের বোনই তো—হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল আমরা যখন বেরিয়ে আসি। স্বকর্ণে শুনে এসেছি।

চক্কোত্তি বলেন, ফচকে ছুঁড়ী—মজা পেলেই হাসে। ও হাসি ধর্তব্যের মধ্যে নাকি? ইনি নগেনশশী, গগনের সম্বন্ধী—মেয়েটাকে বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছেন। বিয়ে করে রান্নাঘরে পুরে হেঁসেলে জুতে দেবেন। হাসতে হবে না আর, জীবন ভোর ঘানি টেনে মরবে।

প্রথম কঠিন হয়ে বলেন, আমি ওসব বুঝি নে মশায়। বাছাবাছির কী দরকার। সবসুদ্ধ জড়িয়ে দেব। নির্দোষী হলে আদালতে প্রমাণ দিয়ে ছাড়িয়ে আসবে।

কথা এমনি দাঁড়াবে, চক্কোত্তিরও আন্দাজে ছিল সেটা। নগেনের দিকে তিনি চোখ ইশারা করেন: নায়েব মশায় বুঝতে পারছেন না, বুঝিয়ে দাও নগেনবাবু।

নগেনশশীর কোমরে গাঁজিয়া। চক্কোত্তির পরামর্শে নিয়ে এসেছে। গাঁজিয়া খুলে টাকাপয়সা বের করে। ইতিমধ্যে কালোসোনা ফিরেছে কোথা থেকে মুড়ি সংগ্রহ

করে। লেনদেনের ব্যাপার দেখে একটুখানি দাঁড়িয়ে। তামাক আনল, পান সেজে এনে দিল, কথাবার্তা চলল আরও কিছুক্ষণ। যাওয়ার সময় প্রমথ এগিয়ে বাঁধ অবধি দিয়ে এলেন। নগেনকে বলেন, মহাশয় মানুষ চক্কোত্তি মশায়। আটঘাট বাঁধা কাজ-কর্ম। এঁর জন্যে তোমাদের রক্ষে হয়ে গেল। তোমার বোনাইকে বলো সে কথা। আমরা ঘেরিদার—আমাদের উভয় তরফের শত্রু নিকেশ করি আগে! চোর-ছ্যাঁচোড় চেলাচামুণ্ডাগুলো তার পরে ফুঁয়ে উড়ে যাবে! বুঝিয়ে বলো সমস্ত দাসমশায়কে।

চৌধুরিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে গগনকে মাঝে বসিয়ে ফলাও করে সমস্ত খবর বলছে। বড় শত্রু এইবারে মিত্র হয়ে মাথায় মাথায় এক হয়ে লাগছে। নতুন ঘেরির বিপদ কাটল।

নজর পড়ল, চারুবালা ঘুণ হয়ে শুনছে। নগেনশশী বলে ওঠে, বোনের জন্যেই তুমি জাহান্নামে যাবে জামাইবাবু। মান পশার নষ্ট হবে। ম্যানেজার আর চাপরাসীকে কালীতলায় বলি দেবার কথা চারু বলেছিল, কোমরে দড়ি বেঁধে ওকেই তো সকলের আগে থানায় টানত। খরচপত্র করে বিস্তর কষ্টে আমরা ঠেকিয়ে এলাম। সামাল কর এখনো বোনকে, ওদের দলের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে দাও। আমরা সেই কথা দিয়ে এসেছি। ঝামেলার নয় তো পার থাকবে না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো চক্কোত্তি মশায়ের কাছে শোন।

চারু চলে গেল। বেরিয়ে গেল সে পাড়ার দিকে। সারারাত্রি হুল্লোড়ের পর নিশ্চয় সব মজা করে ঘুম দিচ্ছে। চৌধুরি-আলা আর নতুন-আলায় মিলে গলা কাট-বার মেলতুকে শান দিচ্ছে, নির্বোধ গোঁয়ারগুলো সে খবর জানে না।

ক্ষ্যাপা-মহেশ শুধুমাত্র জেগে। লম্বা কলকের গাঁজা সেজে একমনে নুড়ি ধরাচ্ছে। ঘাড় তুলে চারুবালাকে দেখে বলে দুপুরের সেবা তোমাদের ওখানে দিদি। বাদাবনে আর শ্রীক্ষেত্রে জাতবেজাত নেই। তোমাদের হেঁসেলের ভাত খাব। হাঁদারাম যেগুলো, বাদা-রাজ্যে তারাই কেবল হাত পুড়িয়ে রান্না করতে যায়।

চারুবালা এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে বলে, সে লোকটা কোথায় গেল ঠাকুর মশায়? সেই যে নাটের গুরু—দুশমন দুটোকে গরুর গাড়িতে তুলে নিয়ে আসছিল।

জগন্নাথ? গাড়ি ফেরত দিতে বয়ারখোলা গেল। যাত্রাদলে আবার পাছে ছুটে যায় বলাই আর পচা পাহারাদার হয়ে গেছে। ওরা টেনেটুনে নিয়ে আসবে।

কবে আসবে।

আমি তো রয়ে গেলাম ওদের জন্যে। বলে-কয়ে ছাড়ান করে আনবে তো—আজকে পেরে উঠবে না। কাল নয় তো পরশু। বয়ারখোলায় আর যাবে না, এই-খানে থাকবে।

চারু দৃঢ় স্বরে বলে, এখানেও থাকবে না। সেই কথা বলতে এসেছিলাম। ওদের পেলাম না, তোমায় বলে যাচ্ছি ঠাকুর। নতুন কোন্ জায়গার কথা বলছিলে, সেইখানে নিয়ে তোলগে। আমার দাদা ঘেরিদার এখন। আগের দিন আর হবে না। হাঙ্গামায় পড়ে যাবে, ধরে নিয়ে ফাটকে পুরবে। বলে দিও সকলকে।

মহেশ বড় খুশী: আছি আমি সেই জন্যে। নেহাত পক্ষে নতুন জায়গাটা একবার দেখিয়ে আনব। মানুষের নজর খাটো কেন জানি নে। দূরের দিকে দেখতে পায় না। পিরথিমে ঠাঁইয়ের অভাব নেই, হাঙ্গামাহুজ্জুতের কী দরকার তবে বল। ওরা যদি না যায়, তখন ভিন্ন এলাকার মানুষ দেখব। সেবা এই ক'দিন কিন্তু

তোমাদের ওখানে। জঙ্গলের মানুষের গৃহস্থ-বাড়ি খাওয়া – এমন খাওয়া খেয়ে নেবে, মাসাবধি তার ঢেঁকুর উঠবে।

চল্লিশ

জগারা গেছে তো গেছে। দুটো দিন দুটো রাত্রি কাটল, ফিরবার নাম নেই। মহেশ ঠাকুরকে চালাঘরে রেখে গেছে। ঘরবাড়ি পাহারায় আছে ঠাকুর।" পাহারাদার মানুষই বটে! গাঁজা টানে, আর মানুষ পেলে বনের গল্প জুড়ে দেয়। মানুষ না থাকলে পড়ে ঘুমোয়।

রাধেশ্যাম জুটেছে ক্ষ্যাপা ঠাকুরের সঙ্গে। গাঁজার গন্ধ তাকে টেনে নিয়ে তুলেছে। কিন্তু এমন মানুষটার সঙ্গে মউজ করে ভালমন্দ দুটো কথা বলবে তার ফুরসত কই? সুমুখ-আঁধারি রাতে বলে সকাল সকাল এখন জালে বেরুতে হয়। কড়া ব্যবস্থা অন্নদাসীর। সন্ধ্যা হতে না হতে যা-হোক দুটো খাইয়ে জালগাছে কাঁধে দিয়ে বাঁধের উপর তুলে দেবে। ঠিক ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে, কিংবা পাড়া মুখো ফিরল—পরখ করবার জন্য নিজেও পিছু পিছু সঙ্গে যায়। বউ বটে একখানা? ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে এক সময় ফিরে আসে একলা মেয়েমানুষ—ভয় লাগে না। বউ সত্যি সত্যি ফিরে গেছে—রাধেশ্যাম তবু ভরসা করতে পারে না। কোন্ হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে! পতি-দেবতার একটু বেচাল দেখলে ক্যাঁক করে অমনি টুঁটি চেপে ধরবে: তবে রে হাড়-ফুটো, এই তোমার জালে যাওয়া!

মহেশের মত গুণিজন পাড়ার মধ্যে বর্তমান, তা সত্ত্বেও রাধেশ্যাম বউয়ের ভয়ে সারা রাত ভেড়িতে ভেড়িতে জাল বেয়ে বেড়াল! ব্যাপার-বাণিজ্যও নিন্দের হয় নি—টাকা পুরে তার উপরেও তিন আনা। অন্নদাসী শেষ রাত্রে উঠে যথারীতি সায়েরে চেপে বসেছে। ডাক শেষ হয়ে ব্যাপারীর ঝোড়ায় মাছ পড়তে না পড়তে দামের টাকা-পয়সাগুলো ছোঁ মেরে আঁচলে বেঁধে সে ফরফরিয়ে চলল। রাধেশ্যাম হাঁ করে দেখছে। বে-আক্কেলে মেয়েমানুষ বিড়ি খাওয়ার জন্যেও দুটো পয়সা হাতে দিয়ে গেল না।

রাতটা গেল তো এই রকমে। আলা থেকে তারপর সোজা সে মহেশের কাছে চলে গেল। কিন্তু গিয়ে হবে কি! সারারাত ভূতের খাটনি খেটে চোখ ভেঙে আসছে, ভাল করে দুটো কথা বলার তাগত নেই এখন মানুষটার সঙ্গে। ঢুলতে ঢুলতে শুয়ে পড়ে শেষটা। মড়ার মত ঘুমোয়। পরের রাতে বেরুতে আর মন চায় না। ভাগ্য-বশে মহেশ ঠাকুর আজকের দিনও রয়ে গেছে। তবু, হায় রে, বউয়ের তাড়ায় জাল ঘাড়ে রওনা হতে হল। এখানে ওখানে ঝুপ ঝুপ করে জালও ফেলে পাঁচ-দশ ক্ষেপ। শীত ধরে আসে, দেহে কাঁপুনির প্রতিষেধক আছে মহেশের কাছে। তার বড় কলকেয়। আজকের খরচের সিকিটা হর ঘড়ুই দিয়েছে। সায়েরের মধ্যে রাধেশ্যামের চোখের উপরেই দিয়ে দিল। মরীয়া হয়ে এক সময় রাধেশ্যাম বাঁধ ধরে আবার ফিরে চলল। ভারী তো বউ—বউ-টউ সে গ্রাহ্য করে না।

আলো নেই, অন্ধকার চালাঘরের ভিতর কলকের মাথা জ্বলে জ্বলে উঠছে। ছায়া-মূর্তির মত ক্ষ্যাপা-মহেশ ও দু-তিনটি লোক গোল হয়ে বসে। হর ঘড়ুই এসে বসেছে, দেখা গেল। ব্যাপারী মানুষ—পয়সা দিয়েছে, যতখানি এর ভিতরে উশুল করা যায়। রাধেশ্যামও গিয়ে একপাশে ঠাঁই নিল।

শীতে মারা যাই ঠাকুরমশায়, প্রসাদ দাও।

ভেবেছিল দুটো-তিনটে টান টেনেই আবার বেড়িয়ে পড়বে। কিন্তু গা এলিয়ে দিচ্ছে। এ-নেশার একবার বসে পড়লে হঠাৎ আর ওঠা যায় না। চলছে। মহেশ আগে বেশ কথাবার্তা বলছিল। কিন্তু কলকে ঘুরে ঘুরে যতবার হাতে আসে, দম নিয়ে ততই সে ঝিম হয়ে যাচ্ছে। রাধেশ্যাম ভাবছে, ক-খানা ঘরের পরেই তার ঘর। অন্নদাসী ঘুমিয়ে গেছে এতক্ষণে। রাধেশ্যাম জল ঝাঁপিয়ে মাছ মেরে বেড়াবে, আর অবলা নারী শুকনো-খটখটে ঘরে ঘুম দিচ্ছে মজা করে। ভোর থাকতে আলায় গিয়ে চেপে বসবে মাছের পয়সাকড়ি আঁচলে বাঁধবার জন্য। আঁচল কেন রে বউ, দু-মুখো থলি সেলাই করে নিয়ে যাস কাল। সেরেসুরে যা পয়সাকড়ি রেখেছিল, তাই কাল বের করতে হবে। নয় তো পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা সকলের। বাচ্চাটা অবধি।

এমনি নানা রকম ভাবতে ভাবতে, বিশেষ ঐ বাচ্চার কথা মনে ভেবেই, রাধেশ্যাম আবার জাল কাঁধে বেরিয়ে পড়ে। চাঁদ উঠে গেছে, জুত হবে না আর। বাঁধে উঠলেই ভেড়ির যত পাহারাদার দূরে থেকে দেখে ফেলবে। ঘিরে ধরবার চেষ্টা করবে নানান দিক থেকে। তার ভিতরে এক-আধ ক্ষেপ দেওয়া যায় যদি বড় জোর। মাছ-মারার দেবতা বুড়ো-হালদার—তিনি ইচ্ছে করলে কী না হতে পারে! উঠানের উপর কানকো হেঁটে মাছ আসছে, কত এমন দেখা যায়। সবই বুড়ো-হালদারের মরজি।

কিন্তু হল না আজ কিছুই। বউ ক্যার-ক্যার করে ঘরের চালে কাক পড়তে দেবে না। পাড়ার লোকের অশান্তি। বাচ্চাটা। ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাবে।

অন্নদাসী বলে, যাও নি তুমি মোটে জালে। গেলে নিদেনপক্ষে দুটো কুচোচিংড়ি জালে বেধে আসত না?

যাই নি, তবে জাল ভিজল কি করে?

খানাখন্দের জলে জাল ভিজিয়ে আনা যায়। গাঁজার দম মেরে পড়েছিলে পাগলা ঠাকুরের ওখানে।

এমনি কথা উঠবে অনুমান করে রাধেশ্যাম সতর্ক হয়ে এসেছে। কুলকুচা করে এক মুঠো তুলসীপাতা চিবিয়েছে। বউয়ের নাকের কাছে মুখ নিয়ে যায় একেবারে। বলে, দেখ রে—গন্ধ শুঁকে দেখ মাগী।

ঠেলা দিয়ে অন্নদাসী মুখ ফিরিয়ে দিল। জোরটা বেশী হয়ে গেল রাগের বশে।

রাধেশ্যাম চেঁচিয়ে ওঠে, অ্যাঁ, মারলি তুই আমায়? পতির গায়ে হাত তুললি? পতি হল দেবতা, কাঁচাখেগো দেবতা—হাতে কুড়িকুষ্ঠ হয়ে খসে পড়বে।

এবং দেবতাটি শুধুমাত্র মুখে শাপশাপান্ত করেই নিরস্ত হয়ে যাবার পাত্র নয়। হাতও চলে। অন্নদাসী যথাসম্ভব প্রতিরোধ করে শেষটা বুক ছেড়ে কাঁদে। জেগে উঠে বাচ্চাটাও চেঁচাচ্ছে।

এদিককার রণে ভঙ্গ দিয়ে রাধেশ্যাম দু-হাতে বাচ্চা তুলে নেয়। নাচিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে শান্ত করে। কিন্তু পেটের ক্ষিধে ভুলে অবোধ শিশু নাচানোয় কতক্ষণ শান্ত হয়ে থাকবে? একটা উপায় এখন—আধুলিটা সিকিটা হাওলাত চাইতে হবে গগন দাসের কাছে। সায়েরে মাছের দাম থেকে পরে কেটে নেবে।

গণ্ডগোলে দেরি করে ফেলল, সায়ের তখন ভেঙে গেছে। গগন আলায় ফিরেছে।

রাধেশ্যাম আলার সীমানার মধ্যে ঢোকে না। খোশামুদি করতে এসেছে আজ, ঝগড়াঝাঁটি নয়। ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকে, একটা কথা বলব, ইদিক পানে এস বড়দা।

চুপ হয়ে যায় হঠাৎ। নির্বাক ভালমানুষ হয়ে দাঁড়ায়। ধবধবে ফর্সা জামা-কাপড় পরে নগেনশশী বেরিয়ে আসছে। নগেনের আগে সেই মানুষটি—চক্কোত্তি মশায়।

নগেনশশী রাধেশ্যামের দিকে ভ্রূকুটি করেঃ মতলব কি হে? জামাইবাবুকে ডাকছ কেন, কোন্ দরকার?

রাধেশ্যাম কাতর হয়ে বলে, জালে কিছু হয় নি। চার-পাঁচ আনার পসসা না হলে তো বাচ্চাটা সুদ্ধ উপোস করে মরে।

নগেন বলে, সেটা ভাল। কাজ করবে, বেজুত হলে এসে হাত পাতবে। নয় তো আমরা সব আছি কী করতে! কিন্তু বলে দিচ্ছি, জগার ঐ শয়তানি-রাহাজানির মধ্যে কক্ষনো যাবে না। গেলে মরবে। পথে দাঁড়িয়ে সারারাত্তির হল্লা করল, তুমি তার মধ্যে ছিলে নাকি রাধে?

রামো! আমি কেন থাকতে যাব, ছ্যাঁচড়া কাজে আমি নেই। তিনটে মুখের ভাত যোগাতে আমার বলে রক্ত জল হয়ে যাবার যোগাড়—

সেদিনের নগরকীর্তনের দলে রাধেশ্যাম ছিল তো বটেই, কিন্তু সজোরে সে ঘাড় নাড়ে। নগেনশশীও এক কথায় মেনে নেয়। শত্রুর সংখ্যা যত কম হয় ভাল। বলে যাচ্ছি পিণ্ডি চটকাতে ওদের। চক্কোত্তি মশায় সহায়। সদরে যাচ্ছি, ফুলতলা আগে হয়ে যাব। চৌধুরি-আলা আর সাঁইতলার নতুন-আলা এক হয়ে গেছে। ফিরে এসেই লাল-ঘোড়া দাবড়ে দেব—খাণ্ডব দাহন হবে।

লাল-ঘোড়া দাবড়ানো মানে আগুন দেওয়া। এত কথা বলেও রাগ শান্ত হয় না। কয়েক পা গিয়ে আবার দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বলে, সমঝে দিও পাড়ার সকলকে, নগেনশশীবাবু খোদ বেরিয়ে পড়ল। এস্পার-ওস্পার করে তবে ফিরব। সায়েরে আজ আমিও বলেছি সকলকে। তুমি এই দেখে যাচ্ছ—তোমার মুখে আর একবার শুনে নিক।

খালের ধারে ছয় দাঁড়ের পানসি বাঁধা। এ হেন বস্তু বাদাবনে হামেশা আসে না, উত্তর অঞ্চল থেকে জুটিয়ে আনতে হয়। দুজনে সেই নৌকোয় উঠছে। আরও লোক আছে ছইয়ের খোপে। রাধেশ্যাম উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে কে মানুষটা এদের আহ্বান করেঃ এস গো! লাঠি ধরে খুব সামাল হয়ে ওঠ, খোঁড়া-মানুষ পা পিছলে না পড়। উঠে আসুন চক্কোত্তি মশায়।

রাধেশ্যামের মোটে ভাল ঠেকে না। যা বলেছে—কাণ্ড ঘটাবে একখানা সত্যিই। পানসি কি ফুলতলার চৌধুরি বাবুদের—প্রমথ হালদার যাচ্ছে পানসিতে, ক'দিন আগে সকলে মিলে যাকে নাস্তানাবুদ করল? কাজটা অন্যায় করেছে জগা—কেউটেসাপ খাঁটা দিয়ে রাখা।

পানসি চলে যাবার পর গগন আলা থেকে বেরুল। বেরিয়ে বেড়ার ধারে আসে। রাধেশ্যামকে এইমাত্র যেন চোখে দেখতে পেল। কোমল সুরে বলে, কে, রাধে? পর-অপরের মত বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে এস।

অপস্রিয়মান নৌকোর দিকে চেয়ে রাধেশ্যাম করুণ সুরে বলে, আগে তো যখন তখন চলে যেতাম ভিতরে। বলতে হত না। এখন ডর লাগে।

গগন ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ কুকুর পুষেছি। পুষি নি, এমনি এসে জুটেছে। মানুষ দেখলে ঘেউ-ঘেউ করে। কিছু বলতে গেলে আমায় অবধি তেড়ে আসে।

রাধেশ্যাম বলে, এই মাত্তর চলে গেল—সেই জন্যে বলতে পারলে দাদা। কিন্তু আর একটি যে আছে—

আলাঘরের দিকে সভয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করে বলে, নিজের বোন বলে চেপে যাচ্ছ, কিন্তু ওটিও কম যায় না।

গগন ভারী এক ভরসার কথা বলে, তাড়াব। কোনটাকে থাকতে দেব না। চেষ্টা করছি এক সঙ্গেই তাড়াব দুজোকে—বিয়ে দিয়ে সরিয়ে দেব। এখন বুঝতে পারি, নগনাটা ওই লোভে ওদের পিছু পিছু ধাওয়া করে এল। মানেমেলায় হবে না, তাই বাদারাজ্যে এসে পড়ল বিয়ের মতলব করে। বড় ভাই আমি মত না দিলে কিছু হবে না, চেপে বসে থেকে তাই যত অঘটন ঘটাচ্ছে।

বড্ড ভয় দেখিয়ে গেল শালা। শুনে তো গা কাঁপে।—বলতে বলতে রাধেশ্যাম ফিক করে হেসে ফেলল। বলে, তোমার শালা সেই সুবাদে পাড়াসুদ্ধ আমাদের সকলের শালা।

গগন বলে, ভয়টা মিথ্যে নয়। আমে-দুধে মিশে যাচ্ছি, আঁটি তোরা এখন তল। চৌধুরি ঘেরিদার আর গগন ঘেরিদার দুই এবার এক হয়ে গেছে—পাড়ার মধ্যে তোমরা কারা হে বাপু? রাতবিরেতে ঘেরিতে জাল বাওয়া চলবে না, সায়েরে চুরির মাছ বেচাকেনা হবে না। যত পুরানো নিয়মকানুন বাতিল। ঘেরির আইন আর সরকারী আইন দুটো এক হয়ে যাচ্ছে। চুরি করে জাল বাইলে ফাটকে নিয়ে পুরবে।

রাধেশ্যাম সভয়ে বলে, বিয়ের শিগগির মত দিয়ে দাও খুড়ো। ঝুলিয়ে রেখো না। বিয়েথাওয়া চুকিয়ে আপদ বালাই যেখানে হোক তাড়াতাড়ি বিদেয় কর।

বয়ারখোলায় পুরো দুটো দিন কাটিয়ে জগারা ফিরল। চুকিয়ে-বুকিয়ে আসা সহজ নয়। ছাড়তে কি চায়! যাত্রার দলটা এখন অসময়ে ঝিমিয়ে আছে বটে কিন্তু কটা মাস গিয়ে আবার তো পৌষমাস। উঠোন-ভরা ধানের পালা, দলও চাঙ্গা হবে সেই সঙ্গে। বিবেক তখন কোথায় খুঁজে বেড়াবে?

সুদন কপাল চাপড়ায়। খানিকটা মস্করা, খানিকটা সত্যি সত্যি বলে, ইস রে! জ্বর হোক, বিকার হোক, ধুঁকতে ধুঁকতে কেন আমি গাড়ি নিয়ে গেলাম না! কোটে গিয়েই জগা-দার মন গেঁথে গেল। কেন রে? কী আছে সেখানে?

জগা বলে, কোট কামার কোন্‌টা দেখলি তোরা? দুনিয়ার উপর জন্মে পা দুখানা শক্ত হতে যে কটা বছর লেগেছিল। তারপর থেকে কোট বদলে চলেছি। নামতে নামতে নাবালে নেমে যাচ্ছি। দেখি কদ্দুরে দুনিয়ার মুড়ো। যেখানে গিয়ে বিনি গণ্ডগোলে আয়েশ করে থাকা যায়। সেই হবে পাকা জায়গা। সে কি পাব? তেমন জায়গা আছে কি কোথাও?

সবাই বলে, চলে যাচ্ছ যখন একসঙ্গে চাট্টি শাক-ভাত খেয়ে যাও জগা। এ-বাড়ি খায়, ও-বাড়ি খায়। বলি, শীতকালে আসছ তো ঠিক? কথা দিয়ে যাও। হ্যাঁ, জগার কথার কানাকড়িও দাম আছে ন্যাকি!

বলাই বলে, সবাই তোকে ভালবাসে জগা। যেখানে যাস, মানুষজন দুদিনের ভিতর মাতিয়ে তুলিস।

জগা বলে, ভালবাসা সয় না আমার মোটে। মন ছটফট করে, লোহার শিকলির মতন লাগে।

অবশেষে তিনজনে রওনা হয়ে পড়ল। বলাই, পচা আর জগা। সকলের হাত ছাড়িয়ে বেরুতে দেরি হল অনেক। পথ কতটুকুই বা! গাঙখালে আগে শতেক বাঁক ঘুরতে হত, তখন দূরে-দূরন্তর মনে হত। সড়ক বানিয়ে বাঁকচুর সিধে করে দিয়েছে। রাস্তাঘাট বানিয়ে দুনিয়া কত ছোট করে ফেলেছে মানুষে। সাঁইতলা সকাল সকাল পৌঁছানোর দরকার—পাড়ার মানুষ ডেকে ডুকে আসর বসাতে হবে। আজকেই। সেদিনের মতই আজ আবার তুমুল গান-বাজনা। আর কিছুতে না পারা যায়, গান গেয়েই জব্দ করবে খোঁড়া-নগনাকে। পা চালিয়ে চল। দেরি হলে সব জালে বেরিয়ে যাবে, আসরের মানুষ পাওয়া যাবে না।

সাঁইতলা এসে পড়ল, প্রহর রাতও হয় নি তখন। পাড়া নিষুতি। মানুষ খরচা করে কেরোসিন পোড়াবে না সেটা বোঝা যায়। কিন্তু মুখের উপর তো খাজনা-ট্যাক্স বসায় নি, কথা বলতে পয়সাও খরচা নেই—তবে কেন চুপচাপ এমনধারা? পাখি-পাখালি জীব-জানোয়ার সকলের ডাক আছে! কিন্তু সাঁইতলার পাড়া ভরতি এক গাদা মানুষে যেন ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। দুটো রাত্রি ছিল না—সবসুদ্ধ তার মধ্যে মরে-হেজে গেল নাকি?

বলাই বলে, কেষ্টপক্ষ পেয়ে সকাল সকাল জালে বেরিয়ে গেছে।

জগা বলে, বেরুবে মরদমানুষ। মাগীগুলো কি করে? কাজকর্ম সেরে নিয়ে নিদেনপক্ষে একটু ঝগড়াঝাঁটি তো করবে। কী হল রে! বন না বসত বোঝা যায় না।

উঠানে এসে গাঁজার গন্ধ নাকে পায়। তাতে খানিক সোয়াস্তি। পাড়ায় মানুষ থাকুক না থাকুক তাদের চালাঘরে আছে। অন্ধকারে ভূতের মত বসে আছে ক্ষ্যাপা-মহেশ। দাওয়ার খুঁটি ঠেস দিয়ে ঝিম হয়ে একলাটি বসে। অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে, বুঝে দেখ তবে। গাঁজা একা একা খাবার বস্তু নয়। অথচ এমন পাড়ার ভিতর থেকে একজন কেউ বেরুল না। গন্ধ পাচ্ছে—মানুষের মন ঠিক আনচান, তবু কেন আসে না—তাজ্জব ব্যাপার!

মহেশও ঠিক এই কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। বোমার মত ফেটে পড়েঃ বেরিয়ে পড় ওরে শালারা, পায়ে মাথা কুটছি। এ জায়গায় শনির নজর লেগেছে। বাবু-ভেয়েরা ধাওয়া করেছে—আর সুখ হবে না। পালা, নয় তো মারা পড়বি একেবারে।

বৃত্তান্ত অতঃপর সবিস্তারে শোনা গেল। রাধেশ্যামকে ঐ যে শাসানি দিল, পাড়ার প্রতিজনকে ধরে ধরে অমনি বলে দিয়েছে। নতুন চৌকি বসে যাচ্ছে নাকি চৌধুরিগঞ্জে, পুলিস মোতায়েন হবে। রাত্রিবেলা বেরির খোলে জাল ফেলে মাছ মারা বা, সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে মাল পাচার করাও ঠিক সেই বস্তু। চুরি। চুরির আইনে বিচার হবে এবার থেকে, শুধুমাত্র জাল কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে না। হাতে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে থানায় নিয়ে যাবে।

পচা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে, চলবে কি করে তবে মানুষের? খাবে কি?

মহেশ বলে, সে কথাও হয়েছিল। নগেনবাবু বলল, রাস্তাঘাট হচ্ছে, মাটি কাটবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে খেতে হবে। অসৎবৃত্তি চলবে না। শোন কথা! ওরাই যেন খাটনি খেটে রোজগার করে খায়।

পচা বলে, মাটি কাটুক, ভাল কথা। কিন্তু একদিন তো রাস্তা বাঁধা শেষ হয়ে যাবে। তখন।

মহেশ বলে, তখন মরবে। সময় থাকতে তাই তো পালাতে বলি। সে তো কানে নিবি নে শালারা।

চালাঘরে ঢুকে বলাই টেমি জ্বালে। বয়ারখোলা থেকে চাল নিয়ে এসেছে—তাই কিছু তাড়াতাড়ি ফুটিয়ে নেওয়া। পচাকে ডাকছে, উনুন ধরা পচা। খিদের পেটের মধ্যে খাপান্ত করছে—।

জগা বলে, খাওয়া হোক, শোওয়া কিন্তু হবে না। তাই বুঝে চাল নিবি। কাঁচকি-কণ্ঠা গিলে হাঁসফাস করবি, ঘুষি মেরে ভুঁড়ি ফাঁসাব তাহলে। সারারাত জেগে গান-বাজনা। ঢোল বাজাব আমি, আর গাইব তিনজনে মিলে। দল ভেঙে দিল তো বয়ে গেছে—আমাদের তিনটে মানুষের প্রতাপ দেখিয়ে দেব আজকে।

বলাই চাল ধুতে গেছে বাঁধের নয়ানজুলিতে। পচা উনুন ধরাচ্ছে। ক্ষ্যাপা-মহেশ উঠে এসে উনুনের আগুনে কলকের নুড়ি ধরিয়ে নিয়ে গেল। আর জগাই বা সময়ের অপব্যয় করে কেন—ততক্ষণ ঢোলক নামিয়ে নিয়ে বসলে তো হয়।

বেড়ায় ঢোলক টাঙানো থাকে—কী আশ্চর্য, ঢোলক নেই। গেল কোথায়? টেমি নিয়ে এল উনুনের ধার থেকে, বেড়ার চতুর্দিকে টেমি ঘুরিয়ে দেখে। নেই তো! ঢোলক বলে নয়—দড়ির উপর কাঁথা টাঙানো থাকে, তা-ও গেছে। দুটো-দিন ছিল না, মহেশকে পাহারাদার রেখে গিয়েছিল। ক্ষ্যাপা ঠাকুর গাঁজা খেয়ে ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে পড়েছিল, সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে সেই ফাঁকে।

জগন্নাথ গরম হয়ে মহেশকে বলে, তোমার জিম্মায় ছিল সব। চালাঘরের মধ্যে কে এসেছিল?

বড়-কলকেয় প্রবল এক টান দিয়ে চোখ পিটপিট করে মহেশ বলে, কে আসবে? চারুবালা এসেছিল বুঝি ক'বার। মেয়েটা বড্ড ভাল। ওদের আলায় এই ক'দিন আমার সেবা ছিল কিনা—ডাকতে আসত।

ডাকবে তো বাইরে দাঁড়িয়ে। কোন সাহসে ঘরে ঢোকে? ঢুকল তো ঠ্যাঙে লাঠি মেরে খোঁড়া করে দিলে না কেন?

মহেশ ভ্রূভঙ্গি করে বলে, এসে মন্দটা কী করল শুনি? ময়লা দেখতে পারে না মেয়েটা। কোমরে আঁচল বেঁধে ঝাঁটা নিয়ে লেগে যেত। গোবর মাটি জলে গুলে ঘরের মেঝে লেপত। বেড়ার নিচে ফুটো। বলে, মাটিতে পড়ে থাকে মানুষগুলো। ফুটো দিয়ে কবে সাপখোপ ঢুকে পড়বে। মাটি লেপে ফুটো বুজিয়েছে। ঘর কেমন ঝকঝক তকতক করছে। বড্ড দোষ হল মেয়েটার – উঁ?

কিছু নরম হয়ে জগা বলে, আমাদের কাঁথা কোথায় রেখে গেল?

বলো না। যা দশা হয়েছিল কাঁথার! কটা আঙুল ছুঁইয়ে মেয়েটা তো হেসে খুন। বলে, বাদায় যাচ্ছ গুণীন ঠাকুর, তা তোমাদের বন্দুক লাগবে না। জন্তু-জানোয়ার দেখলে কাঁথা ছুঁড়ে দিও, কাঁথার গন্ধে পালাতে দিশে পাবে না। দানো-ভূতের জন্যেও তোমার ধুনোবাণ সর্বেবাণের দরকার নেই—এই কাঁথা। নিয়ে গেল সেই কাঁথা বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে। ক্ষারে কেচে দেবে। কাচতে গিয়ে সুতো-সুতো হয়ে যায় তো গোবর মাটি দেবার ন্যাতা করবে। নয় তো ফেরত দিয়ে যাবে বলছে।

আর ঢোলক?

মহেশ হি-হি করে হাসতে লাগল ঃ মেয়েটা ওদিকে ফুর্তিবাজ খুব। ঘর লেপে

হাত ধরে এসে ঢোলকটা গলায় ঝুলিয়ে ডুমডুম করে বাজাতে লাগল। আর ঠিক তোমার মতন গলা করে ভেঙচে ভেঙচে গান গায়। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়।

গেল কোথায় ঢোলক ? সে-ও কারে কাচতে নিয়ে গেল নাকি ?

মহেশ বলে, ভুল করে বোধহয় গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে গেছে।

জগা আগুন হয়ে বলে, নিয়ে গেছে মানে ? ঢোলক কি চেনহার যে গলায় পরে তার আর খুলতে মনে নেই ? চালাকি পেয়েছে ?

বলাইকে জগা হাঁক দিয়ে ডাকল।

বড় তো ব্যাখ্যান করিস চারুবালার। ওটা হল চর। গানে সেদিন অসুবিধা ঠেকেছে। আমরা ছিলাম না—খোঁড়া নগনা সেই ফাঁকে ভয় দেখিয়ে হুমকি দিয়ে দল ভাঙাল। আর মেয়েমানুষ চর পাঠিয়ে ঢোলক হরে নিয়ে গেছে। তিনটে মানুষ খালি গলায় চেঁচিয়ে কায়দা করতে পারব না।

পচা আর বলাইর হাত ধরে জগন্নাথ হিড়হিড় করে টানে: চল—

বলাই বলে, কোথায় রে ?

আলায়। ঘরের জিনিসপত্তর টেনে নিয়ে গেল, ভেবেছে কি ওরা !

মনে মনে রাগ যতই থাক, বলাই ঠিক সামনাসামনি পড়তে চায় না। বলে, ভাত চাপিয়েছি, ধরে যাবে।

পোড়া ভাত খাব আজকে। চল—

বলাইর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জগা বলে: মেয়েটাকে ভয় করিস, স্পষ্টাস্পষ্টি তাই বল না কেন। কাছা দিবি নে আর তুই, বুঝলি ? মাথায় ঘোমটা টেনে বেড়াবি এবার থেকে।

মহেশ এর মধ্যে বলে ওঠে: যেতে হবে না। তোমরা এসে গেছ, কাঁথা এবারে নিজে থেকেই এসে দিয়ে যাবে। বড্ড ভাল মেয়ে গো, সাধ্য পক্ষে কারও কষ্ট হতে দেবে না।

আর ঢোলক ?

তা জানি নে। ঢোলক অবিশ্যি না দিতে পারে। ঢোলক হাতে পেয়ে তো কান ঝালাপালা করবে তোমরা। সেটা বোঝে।

জগা আগুন হয়ে বলে, দেবে না, ইয়ার্কি পেয়েছে ? নতুন করে ছেয়ে আনলাম ফুলতলা বাজার থেকে। করকরে টাকা বাজিয়ে দিয়ে। দেখে আসি, কেমন দেবে না —ঘাড়ে কটা মাথা নিয়ে আছে !

টেনে নিয়ে চলল দু-জনকে। রোখের মাথায় আজকে আর সীমানার বাইরে নয়, একেবারে আলা-ঘরের ছাঁচতলায় গিয়ে হুঙ্কার ছাড়ে: বড়দা—

ঘরের ভিতর কথাবার্তা হচ্ছিল, ডাক শুনে চুপচাপ হয়ে গেল।

জগা বলে, কানে তুলো ভরে রেখেছ বড়দা, শুনতে পাও না ? বেরিয়ে এস, বলছি। নয় তো ঘরে ঢুকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসব।

এইবারে দাওয়ার প্রান্তে গগন দাসকে দেখা গেল: চেঁচাও কি জন্যে ? হল কি তোমাদের ?

অন্ধকারে গগন দাসের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু গলার স্বরে বোঝা যায়, ভয় পেয়ে গেছে খুব। বলে, কি বলবে বল। এত রাগারাগি কিসের ?

তোমার বোন শাসন কর বড়দা।

গগন অসহায়ের ভাবে বলে, কী করল সে আবার ? নাঃ, পারার জো নেই ওদের নিয়ে। খাসা শান্তিতে ছিলাম। জুটে-পুটে এসে এই নানান ঝঞ্জাট।

জগা বলে, ক'দিন সইতলা ছিলাম না। সেই ফাঁকে চালাঘরে ঢুকে পড়ে মাল-পত্তোর পাচার করেছে।

চারুবালা বুঝি পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: মাল আর পত্তোর—কচু আর ঘেঁচু !

জগা বলে, ভালর তরে বলছি, আপসে দিয়ে দিক সমস্ত। নয় তো কুরুক্ষেত্তোর হবে।

চারুবালা দ্রুত ভিতরে চলে গেল। পরক্ষণে কাঁথা এনে দু-হাতে মেলে ধরে। কেচে ফর্সা করতে গিয়ে পুরানো কাঁথা ফেঁসে গিয়েছে। ছেঁড়া কাঁথা দেখিয়ে হেসে ফেটে পড়ে।

দেখ দাদা, চেয়ে দেখ। ঘর থেকে দামী শাল-দোশালা নিয়ে এসেছি, সেই জন্যে মারমুখী হয়ে এসে পড়ল। মানুষ নয় ওরা, মানুষে এর উপরে শুতে পারে না।

জগা আগুন হয়ে বলে, আমাদের ঘরের ভিতর আমরা যেমন খুশী শোব, অন্য লোকে কেন মোড়লি করতে যাবে বড়দা ? দিয়ে দিক এক্ষুনি।

চারুবালা বলে, সেলাই করে তারপর দিয়ে আসব। এ কাঁথায় শোওয়ার চেয়ে মাটিতে শোওয়া অনেক ভাল।

মাদুর গুটানো ছিল দোরের পাশে, চারুবালা ছুঁড়ে দিল। বলে, মাদুরে শুয়ে আজকের রাত্তটা কাটুক। কাঁথা দেব কাল।

জগা জেদ ধরে: না এক্ষুনি। পরের মাদুরে পা মুছি আমরা।

সত্যি সত্যি পা মুছে পায়ের ঘায়ে মাদুরটা চারুর দিকে ছুঁড়ে দেয়।

আর গগন ওদিকে কাতর হয়ে বলছে, ওকে চারু, দিয়ে দে ওদের জিনিস। মিছে ঝগড়া করিস নে।

চারু কানেও নেয় না। জগার রাগ দেখে বরঞ্চ হাসে মিটিমিটি।

জগা বলে, ঢোলক কি জন্যে আনা হয়েছে, জিজ্ঞাসা কর তো বড়দা। ঢোলক ময়লা নয়, ছেঁড়াও নয়।

চারু বলে, ছিঁড়ে দেব সেই জন্যে নিয়ে এসেছি। ড্যাব-ড্যাব করে যেমকা পিটিয়ে কানে তালা ধরিয়ে দেয়। তবু যদি বাজাতে জানত !

জগা চেঁচিয়ে ওঠে: ছিঁড়ে দেবে, জুলুম ! তাই যেন দিয়ে দেখে। হাত মুচড়ে ভেঙে দেব না ?

চারু বলে, মুচড়ে ভাঙতে আসবে, তার আগেই যে হাতকড়া পড়ে যাচ্ছে। তারই কি উপায়—সেই ভাবনাটা ভাবলে এখন ভাল হয়।

বলাই হাত ধরে টানে: চল রে জগা। ভাত ধরে গেল ওদিকে।

জগা বলে, ভয় পেয়ে গেলি ?

বলাই ঢোক গিলে বলে, না, ভয় কিসের ? তবে এরা লোক খারাপ, বলাও যায় না কিছু।

পচা এগিয়ে এসে আর এক হাত চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলে, গোঁয়াতুমি করো না জগা, চলে এস। ছিল নগনা-খোঁড়া, তার উপরে আবার টৌনি চক্কোত্তি জুড়ে করেছে। গতিক সুবিধের নয় মোটেই।

দু-জনে দু-হাত ধরে টেনেই নিয়ে চলল জগাকে।

মহেশ শোনে সমস্ত কথা, আর হা-হা করে হাসেঃ চল রে বেরিয়ে পড়ি। বদর-বদর জকার দিয়ে ক্যাছি খুলে দে নায়ের—তরতর করে নেমে চলুক। হিংলি বিংলি আর মোল্লা—ঘোর জঙ্গলের তিন দেবতা। বাঘরূপী দেবতা ওঁরা। হন্যে মানুষ তাড়া করল, মানুষের রাজ্যে আর ঠাঁই হবে না। বাঘের রাজ্যে যাই চল। তাদের দয়া হবে, সেখানে ঠাঁই মিলবে ?

সে রাত্রে গান-বাজনা হল না। ভালই হল। ক্ষ্যাপা-মহেশ ঘুমোয় না। ঘোর বাদার গল্প করে, আর গাঁজা খায় ক্ষণেক্ষণে। এরা তিন জনে প্রসাদ পায়।

শোন, জল হোল জীবন। জলে জলময় বাদাবনের চতুর্দিক—সে জল ডাকে, রোদের আলোয় ঝিকমিক করে দাঁত মেলে সে জল গ্রাস করতে আসে। ঝিলিক দেয় সে জলে রাত্রিবেলা। অন্তহীন আকাশের নিচে কূলহীন সেই জলের উপরে ভীত মানুষ আর্তনাদ করেঃ ঠাকুর, দুনিয়া-জোড়া তোমার দরিয়া। কত ছোট্ট আমাদের নৌকো। ডাঙা এনে দাও কাছাকাছি—ডাঙার জীব, শক্ত মাটির উপর পা রেখে রক্ষে পাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে, তবু এত জলের একটি ফোঁটা মুখে তোলবার উপায় নেই। উৎকট নোনতা। সেই সময়ে কেউ যদি বলে, এক ঘটি সোনার মোহর নিবি না এক ফেরো জল—জল চাইবে মানুষ। মিঠা জলে—যার বিহনে কণ্ঠাগত জীবন।

সেই জীবন অফুরন্ত রয়েছে কেশডাঙার চরে। মাটির নিচে লুকানো। আমি সন্ধান পেয়েছি। বালি খুঁড়ে খেয়েও এসেছি অঞ্জলি ভরে। নিজে গিয়ে দেখে এসে তবে বলছি।

আমি প্রথম নই। সকলের আগে গিয়েছিল শশী গোয়ালা। তার মুখে শুনে সমস্ত হদিস নিয়ে তবে আমি যাই। সরকার থেকে লাট বন্দোবস্ত নিয়েছিল শশী। সিকি-পয়সা সেলামি লাগে নি, খাজনাও নয় প্রথম আট বছর। আট বছর অন্তে দু-আনা নিরিখে নামে-মাত্র খাজনা। এমনি চলবে। ষোলআনা হাসিল হয়ে গেলে পুরো খাজনার কথা তখন বিবেচনা। কী দিনকাল ছিল—জমি-জিরেত ডেকে দিয়েছে, নেবার লোক মেলে না। সাহস করত না লোকে। মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান ছিল, ইচ্ছেও হত না লোকের। ভাত-কাপড় পুড়ে-জ্বলে যায় নি তো এখনকার মত !

গাঙে-খালে ডাকাতি করে শশী পয়সা করেছিল। বয়স হয়ে গিয়ে এবং টাকা-পয়সা জমিয়ে পাপবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে, পুলিস তবু ত্যক্ত-বিরক্ত করে। মোটা তঙ্কা গুণে যেতে হয়, নয় তো দশধারার মামলায় জুড়ে দেবে, নাজেহাল করবে নানা রকমে। ডাকাতির আমলে কাঁচা-পয়সা হাতে আসত, দিতে আটকাত না। এখন পুঁজি ভেঙে দিতে গায়ে বড্ড লাগে। শশী তাই ছেলেদের নিয়ে বাদায় গেল। নিরিবিলি সেখানে সংসার পাতবে। চেষ্টাও করল অনেক রকমে। পেরে উঠল না। তিন-তিনটে জোয়ান ছেলে বাঘের মুখে দিয়ে টাকাকড়ি সমস্ত খুইয়ে শশী আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। উপযুক্ত গুণীন সঙ্গে নেয় নি, সেজন্য এই দশা। ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী হলেন গুরু-মুর্শিদ, বনের কাণ্ডারী ফকির-গুণীন। আমার পিছন ধরে শশী যেতে চাচ্ছে আর একবার। বনের টান কাটে নি—ও নেশা কারও কোন দিন কাটে না।

যাওয়ার মতি হল অবশেষে ওদের। টিকতে না পারে তো ফিরে আসবে। কিম্বা আর যেখানে হয় চলে যাবে। দুনিয়ায় এতকাল থেকে যা সঞ্চয় করেছে, সেটা ভার-বোঝা কিছু নয়। এদের এই সমস্ত সুবিধা, নড়তে-চড়তে হাঙ্গামা নেই। বাদাবনে যত্র

নি কত কাল ! অরণ্যের অলিগলিতে সাপের মত বুকে হাঁটা, বানরের মত ডালের উপর চড়ে বসা, আবার কখনো বাঘের মত চক্কোর দিয়ে ঘোরা। মনে পড়ে গিয়ে বুকের মধ্যে আনচান করে।

পচা বলে, নৌকোর কি হবে ?

পচার বেকুবি কথা শুনে বলাই হি-হি করে হাসে : ছুতোর ডেকে নৌকোর বায়না দে। নয় তো আর কোথায় পাবি ? বলি, হাটবারে কুমিরমারি গিয়ে ঘাটে তাকাস নি কখনো ? নৌকোয় নৌকোয় গাঙের জল দেখা যায় না। বনে যাবে, তাই নৌকোর ভাবনা করতে বসল !

মহেশ ঘাড় নেড়ে আপত্তি করে ওঠে : দুর্নীতি করো না, খবরদার ! অনিষ্ট হবে। আশামুখে যাচ্ছ, কেউ শাপমন্যি না দেয়। দুঃখ পেয়ে নিশ্বাসটাও জোরে না ফেলে যেন কেউ।

শশী গোয়ালার কথা উঠল আবার। শশীর পাপার্জিত পয়সা। ভোগান্তি সেই কারণে। গাঙ-খাল আর গহিন জঙ্গল একসঙ্গে যেন আড়েহাতে লাগল ডাকাত শশীর সঙ্গে। সন্ধ্যা অবধি লোক খাটিয়ে মাটি ফেলে বাঁধ বাঁধল—সকালবেলা দেখা যায় মাটি ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে ; বাঁধের নিশানা পাওয়া যায় না। কুড়াল মেরে যে গাছটা কাটে, সাতটা দিন না যেতে গোড়া দিয়ে পাঁচ-সাতখানা গজ বেরোয়। কেটে কেটে শেষ হয় না। ক্ষেপে গিয়ে শশী আরও টাকা ঢালে, জনমজুর দুনো-তেদুনো নিয়ে আসে। হল না, সর্বস্ব গেল। টাকা না পেয়ে মাটি-কাটার দল শেষটা একদিন বিষম মার মারল শশীকে। মার খেয়ে শশী পালাল। নির্বংশ নিরন্ন হয়ে ছেঁড়া তেনা পরে এখন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

জগা বলে, সদ্ভাবে নৌকো ভাড়া করব আমরা। জগন্নাথকে সবাই চেনে। ভাড়ার টাকা আগাম দিয়ে দেব।

বানগাছের কোটরের সেই ভাণ্ডারে কিছু এখনো অবশিষ্ট আছে। জোর সেইখানে জগার।

মহেশ ঠাকুর বলে, কুমিরমারি চল তবে একদিন। নৌকো ঠিক করা যাবে। বাদায় নেমেই তো পুজোআচ্চা, তার কেনাকাটা আছে। খোরাকিও সঙ্গে নিতে হবে।

বলাই পরমোৎসাহে বলে, ফর্দ করে ফেল ঠাকুর।

মহেশ বলে, লেখাজোখার ধার ধারি নে। ফর্দ মুখে মুখে। ফর্দ আমার মনে গাঁথা। কত বার কত লোক নিয়ে গেলাম।

জগা বলে, পরশু হাটবার আছে। পরশুদিন চল তবে। সাঁইতলা আর ফিরব না। ঐ পথে লা ভাসাব।

গোপন ছিল ব্যাপারটা। খেটেখুটে জঙ্গল কেটে বসতি গড়ে তুলে এক কথায় এমনি ছেড়ে চলে যাওয়া লজ্জার ব্যাপারও বটে। নগেনশশী নেই, শয়তানী প্যাঁচ কষছে কোন্‌খানে গিয়ে। কিন্তু চারুবালা আছে। টের পেলে মেয়েটা হাসাহাসি করবে : নেড়ী কুকুরের মতন লেজ তুলে পালায় কেমন দেখ।

সেইজন্য রা কাড়ে নি ওরা মুখে। রাধেশ্যামটা তবু কি ভাবে জেনে ফেলেছে। বেড়ায় আড়ি পেতে শুনে গেছে নাকি ?

শেষরাত্রি। তারা ঝিকমিক করছে ওপারে বনের মাথায়। খালে ভাটার টান। জল নামছে কোন্‌দিকে অবিশ্রান্ত কলকল আওয়াজে। এদিক ওদিক তাকিয়ে চারজনে বাঁধের উপর এসে উঠল।

বাঁধের নিচে গর্জনগাছের পাশ থেকে রাধেশ্যাম কথা বলে ওঠে, আমি যাব—

তুমি যাবে কোথা ?

তোমরা যেখানে যাচ্ছ। ক্ষ্যাপা ঠাকুর যেখানে নিয়ে যায়।

তোমার বউ-বাচ্চা ?

বউয়ের ভয়েই তো যাচ্ছি।

বাঁধের উপর সকলের মাঝখানে চলে এল। হাতে খেপলাজাল। বলে, মাছ আজও হল না। গালি দিয়ে ভূত ভাগাবে বউ। ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে। মরে গিয়ে জ্বালা জুড়াব, আগে সেই মতলব করেছিলাম। বউ বলে, আমি মরলে সে-ও সঙ্গে সঙ্গে মরবে। মরে গিয়ে পেত্নী হয়ে পিছু নেবে। তা ভেবে দেখলাম, এই ভাল। রাতে রাতে সরে পড়ি রে বাবা, বউ টের পাবে না। রোসো, জালগাছ দাওয়ায় রেখে আসি। মাগী ঘুমুচ্ছে এখন।

একচল্লিশ

প্রহরখানেক বেলায় তারা কুমিরমারি পেঁছিল। হাট বসে দুপুরের পর থেকে। বড্ড সকাল সকাল রওনা হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি করতে হল দায়ে পড়ে। বন কেটে বাঁধ বেঁধে বড় সাধে ঘেরি বানিয়েছিল। বসত গড়ে উঠল—মজা করে এবারে খাটবে, খাবে পরবে, আমোদস্ফূর্তি করবে। এত দূরের বাদাবনে দিনগুলো শান্তিতে কাটবে। হল না, ভণ্ডুল ঘটাল জনপদের মানুষ এসে। সেকালে কত গরিব মানুষ নিঃসম্বল এসে গুছিয়ে নিয়েছে কাঙালি চক্কোত্তির মত। আর কিন্তু সে বস্তু হবার জো নেই। রাস্তা হয়ে গেল—মোটরগাড়ি চড়ে বাবুভেয়েরা এসে খোলামকুচির মত টাকা ছড়াবে। বাদার যত মানুষ কুকুরের মত পা চাটবে তাদের। জগা হেন লোকের ঠাঁই নেই এ-মুলুকে। লোকজনের চোখের সামনে পালাতে লজ্জা লাগে, রাত পোহাবার আগেই তাই পালিয়ে এল। দেরি করা চলল না।

হাটে কেনাকাটা আছে বিস্তর। জঙ্গলে যাচ্ছে, রসদ চাই কিছু দিনের মতন। তা ছাড়া নৌকো থেকে ভুঁয়ে পা দিয়েই পুজোআচ্চা—তার রকমারী উপকরণ। পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্ষ্যাপা-মহেশ তড়বড় করে ফর্দ বলছিল। তীর্থের পাণ্ডার মত কতবার কত মানুষ নিয়ে এসেছে—রীতকর্ম সমস্ত তার নখদর্পণে। জগা বলে, বলেই যাচ্ছ তো ঠাকুর, খরচা যোগাবে কে ? নৌকোও তো ডুবে যাবে তোমার ঐ গন্ধমাদনের ভারে। সংক্ষেপ কর, যার নিচে আর হয় না।

অত কে মনে রাখতে পারে ? যদ্দুর মনে পড়ে কেনাকাটা করে চারজনের গামছায় বাঁধে। ফিরে আসুক মহেশ, তার পরে মিলিয়ে দেখা যাবে। মহেশ কুমিরমারি অবধি আসে নি। খানিকটা পথ এসে শশী গোয়ালার খোঁজে রাস্তা ছেড়ে আলপথে নেমে পড়ল। সর্বস্ব খুইয়ে এসে শশী এক দূরসম্পর্কের কুটুম্বর ভাতে পড়ে আছে এখন। যথাসাধ্য খাটাখাটনি করে, দুটো দুটো খেতে দেয় তারা। নিঃসীম ধানক্ষেতের মধ্যে মধ্যে বাদার উপর বসতি। জায়গাটার নাম শোনা আছে, মহেশ ঠাকুর সেই তল্লাসে চলল। একটুখানি গিয়ে আলেরও আর নিশানা নেই, মহেশ তখন জলে নেমে পড়ে। জল বাড়ছে, কাপড় হাঁটুর উপর তুলছে। তারপরে এক সময় হয়তো দিগম্বর হয়ে পরনের কাপড় পাগড়ির মতন মাথায় জড়াতে হবে। বাদা অঞ্চলে এই নিয়মে মানুষের চলাচল। রাস্তা বাঁধা হালফিল এই তো শুরু হল। ভাল রাস্তাঘাট হয়ে গেলে আর তখন বাদা থাকল কোথা ?

জগারা এদিকে ভাড়ার নৌকো খঁজে বেড়াচ্ছে। জগার মত দক্ষ মাঝির হাতে নৌকো দিয়ে শঙ্কার কিছু নেই। খুব বেশী তো বিশ-পঁচিশ দিন—ভাড়াটা পুরো মাসেরই ধরে দিয়ে নৌকো যথাসময়ে ঘাটে হাজির করে দেবে। এবারে কেবল দেখে-শুনে আসা। জায়গা পছন্দ হলে নিজস্ব নৌকোর ব্যবস্থা হবে।

ঘাটমাঝিদের ধরতে হয় নৌকো-ভাড়ার ব্যাপারে। তারা খোঁজ-খবর রাখে। ভাড়া থেকে দস্তুরি কেটে নেয় আর দশটা দালালী কাজের মত। সব ঘাটোয়ালই জগাকে চেনে ভাল মতো। জগা যে ভালমানুষ হয়ে ঘাটে ভাড়ার নৌকোর তল্লাসে ঘুরছে, ব্যাপারটা বড় ভাল ঠেকে না। নৌকো দিতে কেউ রাজী নয়। স্পষ্টাস্পষ্টি 'না' বলছে না, এটা-ওটা অজুহাত দেখায়ঃ এই দেখ, জানাশোনার মধ্যে সব ক'টা নৌকোই যে বেরিয়ে গেল। ক'দিন আগে বললে না কেন? অথবা বলে, নৌকো ফুটো হয়ে পড়ে আছে, মেরামত না করে ছাড়বার উপায় নেই।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষটা জগা ভরসা ছেড়ে দেয়। কেউ বিশ্বাস করে না তাদের। ভবঘুরে মানুষ—ক'বছর কোন রকমে ঠাণ্ডা হয়ে ছিল, মাথার মধ্যে ঘূর্ণি-পোকায় আবার কামড় দিচ্ছে। ত্রিভুবন চক্কোর দিয়ে বেড়াবে, কোন্ বিশ্বাসে ওদের হাতে নৌকো ছেড়ে দেয়।

একজনে তাদের মধ্যে বলল, আছে বটে নৌকো একটা কিন্তু মালিকের বড় সন্দেহ-বাতিক, কাউকে বিশ্বাস করে না। তোমার ঘেরিদার গগন দাস জামিন হয় তো বল, চেষ্টা করে দেখি।

নিজের কথাটা অনুপস্থিত অজ্ঞাত মালিকের দোষ দিয়ে বলল। সকল ঘাটোয়ালের প্রায় এই রকম কথা। জগাকে কেউ বিশ্বাস করে না। এক ছটাক ভূসম্পত্তি নেই, জগার কোন্ মূল্য দুনিয়ার উপর? গগন দাসের মূল্য হয়েছে এখন।

জঙ্গলে যাবার নামে মহেশ ঠাকুরের অসাধ্য কাজ নেই খুঁজে বের করেছে ঠিক শশীকে। আগের হাটে খবর দেওয়া ছিল হাটুরে লোকের মারফতে। শশী একপায়ে খাড়া, কেশেডাঙার চরে তার মনপ্রাণ পড়ে রয়েছে। রূপকথার রাক্ষসীর প্রাণ থাকত যেমন কৌটোর ভোমরার মধ্যে।

দুপুরের পর হন্তদন্ত হয়ে মহেশ আর শশী কুমিরমারি পৌঁছল। হাট তখন জমজমাট। খুঁজে খুঁজে জগাদের পায় না। অবশেষে হাটের বাইরে নতুন চরের পাশে দেখা গেল গাছের ছায়ায় চারজনে গোল হয়ে বসে। কোঁচড় থেকে মুঠো মুঠো মুড়ি নিয়ে মুখগহ্বরে ফেলছে। একদিকে মাটির মালসায় মুড়ি জমা রয়েছে, কোঁচড়ের মুড়ি ফুরোলে নিয়ে নিচ্ছে মালসা থেকে।

মুখ তুলে এক নজর তাকিয়ে দেখে জগা বলে, বস্ত কাদা-জল ভেঙে এসেছ, জুত করে করে বসে মুড়ি ঠেকা দাও এবারে।

মহেশ বলে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক জগা। খাওয়া-টাওয়া সব নৌকোয়। উজোন বেয়ে—হল যা খানিক গুণ টেনে গিয়ে কয়রার মুখে নৌকো ধরাতে হবে। রান্নাবান্না সেই জায়গায়।

নৌকোই তো হল না। গুণ টানবে কিসের?

বলাই বলে উঠে, তাই দেখ ঠাকুরমশায়। আমরা ভাল হতে চাইলে কি হবে? দেবে না ভাল হতে। আগাম টাকাকড়ি দিয়ে নিয়মমাফিক ভাড়া নিতে গেলাম, কেউ দিল না। ঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো ঘুরেছি, ঘাটোয়ালের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তেল দিয়েছি।

মহেশ ব্যস্ত হয়ে বলে, সে কি গো ! শশীকে আমি অত পথ টানতে টানতে নিয়ে এলাম। জগা নিয়ে যাচ্ছে শুনে কত আশা করে সে ছুটে এল।

জগন্নাথ বলে, আশা করে ঐ রাধেশ্যামও এসেছে। সবাই আমরা এসেছি। বেরিয়ে এসেছি যখন উপায় কিছু হবেই। নৌকো দিল না, কিন্তু আমরা ঠিক নিয়ে নেব।

হি-হি করে সে হাসতে লাগল। বলে, বাবুভেয়েদের কায়দা ধরি এবারে। নেমন্তন্নবাড়ি যায় বাবুরা। একজনের তার ভিতরে খালি পা। কিম্বা শতেক তালি-মারা জুতো পায়ে। ভাল একজোড়া জুতোর পা ঢুকিয়ে ফাঁক মতন সে বেরিয়ে পড়ে। খলাই, পচা আর আমি তেমনি এখন ফাঁক খুঁজে খুঁজে বেড়াব।

শশী বলে ওঠে নৌকো চুরি করবে তোমার ? হাটেঘাটে গোঁয়াতুমি করতে যেও না। মার খেয়ে কুলোতে পারবে না। যাকে বলে হাটুরে-মার। বুড়োমানুষ আমরা সুদ্ধ মারা পড়ব।

ডাকাত শশীর বিগত যৌবনের কোন ঘটনা হয়তো মনে পড়ে। শিউরে উঠে সে না-না করে উঠল।

জগা হেসে বলে, সিঁদকাঠি হাতে এসে গেছে ঘোষ মশায়। কাজের তো পনের আনা হাসিল। কেউ কিছু করতে পারবে না। আমাদের হাতের কাজ দেখ নি তাই। সাফাই কাজকর্ম।

নৌকো না হোক, তিনটে বোঠে যোগাড় করে এনেছে। সিঁদকাঠি দিয়ে দেয়ালে গর্ত কেটে চোরে জিনিসপত্র সরায়, নৌকো সরানোর কাজে বোঠে হল সেই সিঁদকাঠি। নৌকা খুলে দিয়ে তিনি মরদে বোঠে ধরে পলকের মধ্যে বেমালুম হবে। নৌকোয় সেজন্য কেউ বোঠে রেখে যায় না। কাঁধে করে নিয়ে হাটের মধ্যে ঢোকে, কোনখানে রেখে দিয়ে কেনাকাটা করে। নৌকো হল না দেখে এরা এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে বোঠে সরানোর তালে ছিল। বোঠে ভেঙে গেছে বলে একটা বোঠে চেয়ে এনেছে চেনাশোনা এক জেলের কাছ থেকে। অন্য দুটো চুরি। হারানো বোঠের খোঁজ পড়বে হাট ভেঙে গিয়ে যখন বাড়ি ফিরবার সময় হবে। ততক্ষণ নিরাপদ।

জগা বলে, হাট বলে ভয় পাচ্ছ ঘোষ মশায়, কিন্তু হাট নইলে এত নৌকো পাচ্ছ তুমি কোথা ? ইচ্ছে মতন এর ভিতরে পছন্দ করে নেব। তবে মুরুব্বী মানুষ তোমরা এর মধ্যে থেকো না। হাঁটনা শুরু করে দাও। পুব মুখো ফুঁড়ে বেরিয়ে একটা দোয়ানি পড়বে, সেইখানে কাঁচা-বাদার ধারে দাঁড়াও গিয়ে। রাধেশ্যাম জানে সে জায়গা। তুই থেকেই বা কি করবি রাধে, ওঁদের সঙ্গে চলে যা। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবি।

রাধেশ্যাম হাসতে হাসতে বলে, কুয়োপাখী ডাকবে—বনের মধ্যে আমরা পাখি ধরে বেড়াব।

হেসে জগা ঘাড় নাড়ে : হ্যাঁ। কোনটা তোর অজানা ! বেরিয়ে পড় এক্ষুনি, দাঁড়াস নে। আমাদের আগে গিয়ে পড়বি।

খুব জোরে হাঁটে রাধেশ্যাম। মহেশ ও শশী গোয়ালা পেরে ওঠে না : আহা, দৌড়স কিসের তরে ? আমাদের কি, কে আমাদের তেড়ে ধরছে ?

কিন্তু টানের মুখে নৌকো-ছাড়বে জগারা, প্রাণপণে বাইবে। আর এদের হল পায়ে হাঁটা। জোরে না হাঁটলে পেরে উঠবে কেন ? ঐ ছুটোছুটির মধ্যেও কুয়ো-পাখির বৃত্তান্ত বলে এক সময়। কাঁচাবাদা হল গভীর বন—সেখানে কালেভদ্রে কাঠুরের কুড়ুল পড়ে। বনের অন্ধিসন্ধি জুড়ে খাল। কে যেন খালের মস্তবড়

খেপলাজাল ফেলেছে বনের উপরে—জালের ফুটোয় ফুটোয় বনের গাছ বেরিয়ে পড়েছে। ঠিক এই গতিক। জোয়ারবেলা বিস্তৃত পরিমাণ ডাঙা জেগে থাকে না, গাছগুলো মনে হবে সমুদ্দুর ফুঁড়ে উঠেছে। নৌকো একবার ঢোকাতে পারলে কারো সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। জগার কিন্তু নখদর্পণে সমস্ত—সেই জায়গার কথা বলে দিল সে। বলে তো দিল—কিন্তু এরা খুঁজে পাবে কোথায়? নৌকোর মানুষ সাড়া দিয়ে তাই জানান দেবে—পাখির ডাক। লোকের কানে গেলে ভাববে, কুয়োপাখি ডাকছে রাত্রিবেলা বনের ভিতর। ডাকছে কিন্তু বলাই। পাখির ডাক ছাগলের ডাক বেড়ালের ডাক মুরগির ডাক—কত রকম ডাক ডাকতে পারে। সেই ডাক নিরিখ করে জল ভেঙে শুলোয় গুঁতো খেয়ে ওদের নৌকোয় উঠে পড়।

সন্ধানী চোখ, পাকা হাত, ঘাঁতঘোঁত অজানা কিছু নেই। এর চেয়ে কত ভারী ভারী কাজকর্ম হয়েছে আগে। এত নৌকো জমেছে, নৌকোয় জল দেখবার জো নেই, তবু কিন্তু সহজ উপায়ে হয় না। গাঙের একেবারে কিনারা অবধি হাট, হাটুরে মানুষ ঘোরাফেরা করছে ঠিক হাটের নিচে কিছু করতে গেলে ফ্যাসাদে পড়বে মনে হয়। একেবারে শেষ দিকে চার দাঁড়ের ছিপনৌকো একটা। জুত মতন ধোন্দল গাছ পেয়ে ঘাট থেকে কিছু সরিয়ে এনে ঐখানে নৌকো বেঁধেছে। লোহার শিকল গাছে জড়িয়ে ভারী তালা এঁটে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে।

প্রণিধান করে দেখে জগা বলে, দেখ তো পচা, কুড়াল কোথা পাস। কামারের দোকানে মেরামতের জন্য দেয়—ওদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে নিয়ে আয়।

পচা বলে, কুড়াল কি হবে।

বলবি যে রসুই-কাজের জন্য কাঠের ক'খানা চেলা তুলে নিয়ে এখুনি দিয়ে যাচ্ছি।

বলাই বলে, গাছ কেটে ফেলবি। কিন্তু শব্দ হবে যে, কেউ না কেউ দেখে ফেলবে।

জগা বলে, শব্দসাড়া করেই কাটব। গরজ হয়েছে, সদরে তাই গাছ কেটে নিচ্ছে —দেখেও কেউ দেখবে না।

কুড়াল এল। কপাল ভাল, গাছ কাটা অবধি দরকার হল না। কুড়ালের পিঠের কয়েকটা ঘা দিতেই লোহার শিকলের জোড় খুলে গেল। নোনায় জরে গিয়ে লোহায় পদার্থ থাকে কিছু?

কপাল আরও ভাল। এই টানের গাঙ, তার উপরে পিঠেন বাতাস। মাঝগাঙে নিয়ে ফেলতে নৌকো যেন, উড়িয়ে নিয়ে চলল। বোঠে হাতে ধরে আছে বলাই-পচা, কিন্তু বাইতে হয় না। টানের জলে ছোয়ানোই যায় না বোঠে। নৌকোই যেন কেমন করে বুঝতে পেরে গাঙ বেয়ে চোঁচা দৌড় দিয়েছে।

এই রকম ছুটে পালানো দেখেই বোধকরি হাটের মানুষের নজরে পড়েছে। কিম্বা নৌকোর মালিকও দেখে ফেলে চেঁচামেচি করতে পারে। গাঙের কিনারা ধরে বিস্তর জমায়েত। একটা হৈ-হৈ রব আসছে বাতাসে। এরা অনেক দূরে। স্পষ্টাস্পষ্টি নজর হয় না—মনে হল, আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। দেখিয়ে কি করবে বাদুমেশিরা? নৌকো খুলে পিছন নেবে, ততক্ষণে একেবারে শূন্য হয়ে গেছে এরা। বাতাসে মিশে গেছে। বড়-গাঙে আর নয়, খালে ঢুকে পড় এইবার। খালের গোলকধাঁধা। তখন আর খুঁজে পায় কে! নৌকো মানুষজন এবং হয়তো বা লাঠি-বন্দুক নিয়ে সমারোহে

খোঁজাখুঁজি হচ্ছে—তাদেরই একেবারে পনের-বিশ হাতের মধ্যে হেঁতালঝাড়ের ফাঁকে নৌকো ঢুকিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। এই অবস্থায় মানুষ বলে কি—স্বয়ং যম-রাজেরও তো খুঁজে বের করা অসম্ভব।

বিয়াল্লিশ

জঙ্গলে যাবে তারা ঠিকই। কয়েকটা দিন কেবল দেরি পড়ে যাচ্ছে। চোরাই নৌকোর প্রকাণ্ড ছই—ছইটা ভেঙে চুরমার করে গাঙের জলে ডুবিয়ে গোলপাতা দিয়ে নতুন একটা ছই করে নিতে হবে। আলকাতরা আর কেরোসিন মিশিয়ে পোঁচ টেনে নিতে হবে নৌকোর আগাগোড়া। আর এক ব্যাপার—গলুয়ের কাঠের উপর নাম খুদে রয়েছে—'তারণ'। তারণ নামে ব্যক্তি নৌকোর নাম খোদাই করে স্বত্ব-স্বামিত্ব পাকা করে রেখেছে। নামটা চেঁচে তুলে দিতে হবে। না হলে পুরো কাঠখানাই ফেলে দিয়ে নতুন একটা বসিয়ে নেবে। নৌকোর ভোল এমন পালটে দেবে, খোদ মালিক সেই তারণ এসে স্বচক্ষে দেখলেও চিনতে পারবে না। এই সব না হওয়া পর্যন্ত লোকের সামনে বের হবে না নৌকো। ছইটা তো ভেঙে দেওয়া যাক সকলের আগে। বাকি কাজগুলো কোথায় নিয়ে করা যায়, তাই ভাবছে। সুদন ছাড়া অন্য কারো উপর আস্থা করা যায় না। তৈলক্ষর ছেলে সুদন! জগাকে বড্ড খাতির করে, জগার ইদানীং সে ডানহাত হয়ে উঠেছিল। সম্পন্ন চাষীঘরের ছেলে—দাঁও পেয়ে একটা নৌকো কিনে নিয়ে এসেছে, সেই পুরানো নৌকো ছুতার ডেকে মেরামত করাচ্ছে, ছই বাঁধছে। এতে কোন সন্দেহের কারণ ঘটবে না। জগা তারপর একদিন সরে পড়বে একদিন সেই নৌকো নিয়ে। জঙ্গলে ঢুকে গেলে তখন কে কার তোয়াক্কা রাখে। গণ্ডগোল যতক্ষণ এই মানুষের এলাকায় ঘুরাঘুরি করছে। ঘোর জঙ্গলের ভিতরে মানষেলার সব আইন-কানুন গিয়ে পেঁছিতে পারে না।

কিছু দেরি অতএব হবেই। খুব বেশী তো পাঁচ-সাত দিন। এই এক বাগড়া পড়ে গেল, পথের উপর আটক হয়ে থাকা। সকলে মুষড়ে গেছে ঃ রাধেশ্যামের কিন্তু একগাল হাসি। বলে, আমি ঘরে চললাম। বাচ্চাটাকে দেখে আসি। সাঁজ-রাতে সেদিন বড় কেঁদেছিল। নেড়েচেড়ে আসি এই কদিন।

পচা টিপ্পনী কাটে ঃ বাচ্চার মা-ও রয়েছে, সেটা খেয়াল রেখো। জাল ফেলে পালিয়ে এসেছ, তুলোধোনা করবে এবার বাগে পেলে।

বললি ঠিক কথা বটে! মাগীর জন্যেই বিবাগী হয়ে যাওয়া। নইলে উঠোন পার হয়ে এক পা নড়তে চাই! মাগীটাকে জো-সো করে জঙ্গলে নিয়ে ফেলতে পারিস, তবে শান্তি পাই! বাচ্চাকে কোলে-পিঠে করে দিব্যি কাটাতে পারি।

ক্ষ্যাপা-মহেশ বলে, শশীকে নিয়ে কী করা যায় এখন? আমার নিজের কথা ভাবছি নে। কালী-কালীমায়া গাজি-কালু উঠানে দাঁড়িয়ে যার নামে দোহাই পাড়ব, গৃহস্থ পুরো সিকির সেবা না দিয়ে পারবে না। কিন্তু শশী ঘোষ যায় কোথায় বল দিকি? পড়ে থাকত এক বাড়ি, তাদের আউড়ির ধান তলায় এসে ঠেকেছে। মানুষটার একদিন বিস্তর ছিল, নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় তারা কিছু বলতে পারছিল না। তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এসেছে, আবার এখন কোন্ মুখে ফিরে যায় সেখানে।

বলাই বলে, চলুন তবে আমাদের সইতলায়। উপোস করে থাকতে হবে না। ঠাকুর মশায়, তুমিও চল।

জগা বলে, তুই সইতলা যাচ্ছিস বলাই?

বলাই বলে, নৌকো তো বয়ারখোলা নিয়ে চলল। পরের জায়গায় সবসুদ্ধ চেপে পড়ি কেন? এঁরা সব যাচ্ছেন, রেঁধেবেড়ে খাওয়াবার মানুষ চাই তো একজন।

মহেশ তাড়াতাড়ি বলে, আমায় খাওয়াবার লোক আছে। আমার জন্যে ভাবি নে। চারুবালার মত মেয়ে হয় না। তোমরা ছিলে না, কী যত্ন করে যে খাইয়েছিল সেই ক'টা দিন! তার উপর সেবার বাবদে দৈনিক এক সিকি। শশীকেও কারও রেঁধেবেড়ে দিতে হবে না। বাদায় ঘোরা মানুষ—চাল পেলে নিজেই সে দুটো ফুটিয়ে নিতে পারবে।

জগা বলে, শুধু চাল ফোটাতেই কি যাচ্ছে বলাইধন? কত রকমের কাজ! চারুবালার হুকুম তামিল করা—রান্নার কাঠ কেটে দেওয়া, খাবার জল বয়ে আনা। পায়ের কাদা গাড়ুর জলে ধুয়ে দিয়েছে কিনা, সেটা অবিশ্যি আমার চোখে দেখা নেই।

বলাই হাসতে হাসতে বলে, ফুলতলায় গয়নার নৌকোয় জগা আর চারুতে কী লগ্নে যে দেখা, সে রাগ আজও গেল না। সাঁইতলা ছাড়তে হল, চারুবালার কিন্তু কোন দোষ নেই। শয়তান ঐ খোঁড়ানগনা।

মহেশ ঠাকুরও লুফে নিয়ে বলে, না জগন্নাথ, রাগ রেখো না। বড্ড ভাল মেয়ে। আমি বলছি, শুনে নাও। স্বয়ং রক্ষাচণ্ডী ঐ মেয়েটা, নষ্ট করে না কিছু, সমস্ত বজায় করে রাখে। মানবেলা থেকে বাদায় চলে এসেছে সকল দিক রক্ষে হবে বলেই।

ফুলতলা থেকে চক্কোত্তি মশায় নতুন আলায় ফিরে এলেন। সেই টৌনিং চক্কোত্তি।

একা যে! শালাবাবু কোথায় আবার আড্ডা গাড়ল?

চক্কোত্তি বলেন, কাজকর্ম না চুকিয়ে আসে কেমন করে! আরও কটা দিন থাকতে হবে নগেনবাবুর। দলিল রেজেস্ট্রি হয়ে কাজ ষোলআনা পাকা হয়ে গেলে তবে আসবে। সেই রকম বলে এসেছি। আমি আর দেরি করতে পারলাম না। পরের উপকারে গিয়ে আমার ওদিকে সর্বনাশ হয়—বরাপোতার ধান কটা হরির লুঠ হয়ে গেল বোধহয় এদ্দিনে। বরাপোতা চলেছি—তা ভাবলাম দাস মশায় উতলা হয়ে আছে, এই পথে অমনি খবরটা দিয়ে যাই। আমায় যখন সহায় ধরেছ, কাজের ব্যবস্থায় কোন দিক দিয়ে খুঁত পাবে না।

গগন এত সমস্ত শুনেছে না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে, দলিল কিসের বুঝলাম না তো?

চক্কোত্তি ভর্ৎসনা করে ওঠেন: কী কাণ্ড করে বসে আছ ভাব দিকি দাসমশায়! এত বড় জলকরের সম্পত্তি—আইনদস্তুর লেখাপড়া চুলোর যাক, ফস-কাগজের উপর দুটো-চারটে ক-খ-ঠ অক্ষরও তো ফেঁদে রাখ নি। নায়েবের কাছে কথাটা শুনে গোড়ায় তো বিশ্বাসই হয় নি আমার।

গগন বলে, প্রথম যখন এলাম, কর্ত্তালীর উপর তখন ছিটেখানেক চটের জমি। যা নেবার চৌধুরিবাবুরা সমস্ত ঘের দিয়ে নিয়েছে। জমিটুকু বাতিল হয়ে বাইরে ছাড়া ছিল। জোয়ারের সময় এক-কোমর জল, ভাটার সময় হাঁটুভর কাদা। সাঁইবাবাকে পর্যন্ত বাঘে ধরে নিয়ে যায়, এমন গরম জায়গা! তখন কি কানাকড়ি দাম ছিল যে লেখাপড়ার কথা ভাবতে যাব?

চক্কোত্তি চুকচুক করেঃ ভাবতে হয় গো দাসমশায়। দলিল-দস্তাবেজ করে আটঘাট বেঁধে তবে লোকে কাজে নামে। বিষয় নয় তো দু-দিন পরে বিষ হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়কর্ম শক্তব্যাপার, যে-সে লোকে বোঝে না। কিন্তু পুণ্ডরীকবাবু উকিল মশায় সদরে দপ্তর সাজিয়ে বসে আছেন কোন্ কর্মে? আমরা আছি কেন? শিক্ষিত মানুষ হয়েও এমন অযত্নের কাজ করলে দাসমশায়, ভাল লোকের পরামর্শ নেবার কথা একটি বার মথায় এল না?

শিক্ষিত বলে উল্লেখ করায় গগনের গর্ব চাড়া দিয়ে ওঠে। বলে, সকলের আগেই তো ফুলতলায় গিয়েছিলাম, চক্কোত্তি মশায়। পাঁচ টাকা নজর দিয়ে দেখা করলাম ছোটবাবুর সঙ্গে। আর ভরদ্বাজ নিল তিন টাকা। তিন টাকা গাঁটে গুঁজে বলে দিল, কিছু করতে হবে না, কোন ভয় নেই। গাঙ থেকে চর উঠেছে—চরের মালিক সরকার না চৌধুরি তারই ঠিকঠিকানা নেই। বন কেটে তাড়াতাড়ি বাঁধ না হোক একটা পাতাড়ি দিয়ে নাও গে। দখলই হল স্বত্বের বারোআনা—দখল কর গিয়ে আগে।

ঘাড় নেড়ে চক্কোত্তি বলেন, বলেছিল। ঠিকই বটে বারোআনা কেন সাড়ে-পনের-আনা। এবারে তাই মতলব পাকাল, রাতারাতি মাছের বাঁধ উড়িয়ে দেবে, তোমার আলাঘরের চিহ্নও রাখবে না। চৌধুরিগঞ্জের সীমানা বলে গাঙ অবধি দখল করে নেবে। আদালতে মামলা উঠলে অমন বিশ জনে হলপ পড়ে বলে আসবে। নায়েব রেগে টং, ভরদ্বাজ তায় উস্কানি দিচ্ছে আবার এদিকে সাঁইতলার মাছ-মারারা বিগড়ে আছে—তোমার লোকবলও নেই। সমস্ত খবর চলে যায় ফুলতলা অবধি। কোন্ তরকারি দিয়ে ভাত খেলে সেই অবধি। সকল দিকে তোমার বেজুত, এমন সুবিধা কেন ছাড়বে? সমস্ত ঠিকঠাক, দু-দশ দিনের ভিতর এস্পার-ওস্পার হয়ে যেত। সেই সময়টা আমরা গিয়ে পড়লাম।

গগন আগুন হয়ে বলে, পাড়ার ওরা বিগড়াল ঐ নগনা-শালার জন্যেই। বাদা-বনের মধ্যে খেটে খুটে সকলে মিলে একটা বাঁচবার পথ করছি, তা ভাঙনচণ্ডী এসে পড়ে তছনছ করে দিল সমস্ত।

চক্কোত্তি বলে, আঃ, নিন্দে কর কেন? খুব পাকা বুদ্ধি নগেনবাবুর।

গগন আরও উত্তেজিত হয়ে বলে, মুখের নিন্দে শুধু নয়। পারলে ওকে নোনা-জলে নাকানি-চুবানি খাওয়াতাম। আমার ডানহাত বাঁহাত হল জগা-বলাই—ওরা সমস্ত। হাত-পা কেটে ঠুঁটো করে দিল ঐ শালা। চৌধুরিরা সেইজন্যে সাহস পেয়ে যায়। তাদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে এসেছি, এদ্দিন তো কিছু করতে পারে নি।

চক্কোত্তি শান্ত করছেন গগন দাশকে: আর কিছু করবে না তারা। মিটমাট হয়ে গেছে। চৌধুরির মালিকানা আপসে স্বীকার করে নেওয়া হল। নতুন-ঘেরি নগেনবাবুর নামে উচিত খাজনায় অনুকূলবাবু বন্দোবস্ত করে দিলেন।

গগন বলে, নগেনশশীর নামে কেন? সে আসে কেমন করে ঘেরির ব্যাপারে? সে করে কি করল?

আহা, শালা-ভগ্নিপতি কি আর আলাদা। তোমার বদলে নগেনবাবুই না হয় হল। আসল যে কাজ—দুই পক্ষ এক হয়ে হুটকো বদমাইশগুলোকে এবারে শায়েস্তা করে ফেল দিকি। ভেড়ির উপরে যাতে অত্যাচার না হয়, রাত-বিরেতে কেউ জাল না ফেলতে পারে। যে মাছটা জন্মাবে, তার ষোলআনা বেচাকেনা হয়ে যাতে ঘরে উঠে আসে।

গগন বলে, তা হলে ওরা কি খাবে?

মাছ-মারাদের কথা তো ? খাবে না। না খেতে পেয়ে উঠে যাবে তল্লাট ছেড়ে। আপদের শান্তি হবে। তাই তো স্বার্থ তোমাদের।

গগন বলে, ভেড়ি বাঁধার সময় দরকারে লেগেছিল ওদের! আমাদের ছোট্ট ব্যাপার, আমাদের কথা ছেড়ে দিন। চৌধুরিবাবুদেরও লেগেছিল। বছর বছর বাঁধে মাটি দেবার সময় এখনো ওদের ডাকতে হয়।

চক্কোত্তি ভ্রুভঙ্গি করে বলেন, সে আর কতটুকু ব্যাপার! সব রকম কথা হয়েছে বাবুদের সঙ্গে। ছোটবাবু বললেন, রাস্তা তো শেষ হয়ে গেল। শুকনোর সময় মাটি-কাটা পশ্চিমা কুলী আসবে লরী বোঝাই হয়ে; কাজকর্ম চুকিয়ে চলে যাবে। তাদের কাজকর্ম ভাল, মজুরিও বেশী নয়। অবরেসবরে মেরামতি কাজের জন্য একজন দুজন বেলদার রেখে দিলে চলে যাবে।

হেসে ফেললেন চক্কোত্তি। হেসে বললেন, তোমার কথাও একবার যে না উঠেছিল তা নয়। দাসমশায় পুরানো ঘেরিদার, দলিলটা সেই নামে ক্ষতিটা কি? তা ছোটবাবুর ঘোরতর আপত্তি। এক সঙ্গে সকলে খন কেটেছে, গগন দাস ওদের কি ঝেড়ে ফেলতে পারবে? আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওদের বিরুদ্ধে জবানবন্দি দেবে? চক্ষুলজ্জার কারণ হবে তার পক্ষে। আর আমাদের হবে বেড়াল কাঁধে নিয়ে শিকার করার মতন। আর প্রমথ হলদার এই মারে তো এই মারে। সেদিন সেই যে নাজেহাল হল, তার মধ্যে তোমারও নাকি যোগাযোগ ছিল। শেষটা নগেনবাবুর নাম ওঠে, তখনই সব রাজী হয়ে যায়। ঘাবড়াচ্ছ কেন দাসমশায়? বিষয়-সম্পত্তি লোকে বেনামিও করে থাকে। ধরে নাও তাই করেছে তুমি সম্বন্ধীর নামে।

গগনও হয়তো সেই রকমটা বুঝে চুপচাপ হত। কিন্তু চারুবালা এসে পড়ল। বেড়ার কাছে এসে কখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। মারমুখী হয়ে এল: আপনিই এই সব করাচ্ছেন খোঁড়ার কাছে ঘুষ খেয়ে। দাদার কাছে এখন আবার ভালমানুষ হতে এসেছেন।

গাল খেয়ে চক্কোত্তির কিছুমাত্র ভাবান্তর নেই। এই সমস্ত অভ্যাস আছে ঢের। দন্ত মেলে হেসে আরও যেন উপভোগ করছেন। বলেন, করছি তো বটেই। নইলে তোমার সুদ্ধ হাতকড়া পড়ত। এত বড় একটা কাজ মাংনাই বা করতে যাব কেন? নগেনবাবু বলেছে খুশী করে দেবে। না দিলে ছাড়ছি নে। এই যখন পেশা হল আমার।

আরও উত্তেজিত হয়ে চারুবালা বলে, পাপের পেশা। একজনের হকের ধন অন্যায় করে অন্যকে পাইয়ে দেওয়া।

পরম শান্তভাবে চক্কোত্তি বলেন, তা ঠিক। মক্কেলের জন্য সব সময় ন্যায়-অন্যায় বাছতে গেলে চলে না। কিন্তু আজকের এই ব্যাপারে তুমি কি জন্যে কথা বলতে এসেছ মা? যার জন্যে চুরি করি সে কেন চোর বলবে? জগন্নাথ মরদমানুষ— কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাক, জেলে নিয়ে পুরুক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ গোঁয়ারটার সঙ্গে জুটে সরকারী কাজে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করলে, সরকারী মানুষকে দেবীস্থানে বলি দেবার ষড়যন্ত্র করলে—তোমার ভাই বলে দাসমশায় পর্যন্ত চৌধুরিবাবুদের কাছে দোষী। আর কোন্ উপায় ছিল বল, এমনি ভাবে মিটমাট করা ছাড়া?

সঙ্গে সঙ্গে আবার গগনের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন: ঘাবড়াবার কিছু নেই দাসমশায়! রেজেস্ট্রী-দলিল হলেই কি সম্পত্তিটা অমনি নগেনবাবুর হয়ে যায়?

দখলিসত্বে স্বত্ববান তুমি। আইন-আদালত আছে কি করতে? আমরা আছি কেন? যেদিকে বৃষ্টি, সেইদিকে ছাতা তুলে ধরব। প্রবল শত্রু চৌধুরিদের সঙ্গে যখন মিটমাট হয়ে যাচ্ছে, এবারে নিশ্চিন্তে নিজেদের মধ্যে লড়াপেটা কর।

চারু বলে, দাদাকে তাতিয়ে তুলে আবার নতুন গণ্ডগোল পাকাতে চান বুঝি? বরাপোতায় না গিয়ে সেইজন্য এখানে আসা? ছাতা ধরতে হবে না আপনাকে, রক্ষে করুন। যা করতে হয় আমরাই ভেবেচিন্তে দেখব। আপনি আসুন এবারে চক্কোত্তি মশায়।

দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, এর পরে চক্কোত্তি মাদুরের উপর ধপ করে বসলেন: এত বেলায় কে আমার জন্য সেখানে ভাত রেঁধে-বেড়ে বাতাস করছে? যেতে হয়, দুটো খেয়ে যাব তোমাদের এখান থেকে।

চারু মুখ-ঝামটা দেয়: ঝঞ্ঝাট করে আমি পারব না।

বলে পাক দিয়ে পিছন ফিরে ফরফর করে সে চলে গেল।

চক্কোত্তি ভ্রূভঙ্গি করেন: ও, উনি না হলে আর লোক নাই! যে দেশে কাক নেই, সে দেশে যেন রাত পোহায় না। নগেনবাবুর বোন ত রয়েছে। ঘরের গিন্নী যিনি। বলি, শুনতে পাচ্ছ ও ভালমানুষের মেয়ে? তোমার ভাইকে এর মধ্যে নিয়ে এসেই যত ফ্যাসাদ। ব্রাহ্মণ-সন্তান ভর দুপুরে নিরম্বু চলে যাচ্ছে তোমাদের বাড়ি থেকে। গৃহস্থর তাতে কি কল্যাণ হবে?

রান্না শেষ হল চক্কোত্তির। মাছের তরকারি আর ভাত বেড়ে নিয়েছেন পাথরের থালায়। আবাদে দেদার ধান—ভাত খাওয়া অতএব শহুরে মাপে নয়। পাহাড়ের চূড়া না হল, তা বলে নিতান্ত মোচার মাথাটুকু নয়। বিড়ালে লম্ফ দিয়ে বাড়া ভাত ডিঙোতে পারবে না। ভাতের পাশে চক্কোত্তি কড়াইসুদ্ধ তরকারি টেনে নিলেন। লোকে এই সব অঞ্চলে মাছ খেতেই আসে, বাজে তরকারি বাহুল্য। লোকালয়ে এক কুচি মাছ মুখে দিয়ে পরিতৃপ্তিতে জিভে টক্কর দেয়, বাদারাজ্যের মাছ খাওয়া সে ব্যাপার নয়। ভাতের পরিমাণ যা, মাছের তরকারিও তাই। বাটিতে হয় না, বড় খোরার প্রয়োজন তরকারি ঢালার জন্যে। তার চেয়ে কড়াইতে রাখা সুবিধা—কড়াই থেকে তুলে তুলে খাবেন। তৈলাক্ত পারশে মাছ—তরকারির চেহারাখানা যা দাঁড়িয়েছে, তাই থেকে স্বাদের আন্দাজ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ মানুষ—ভোজন আরম্ভের মুখে গণ্ডূষ করতে হবে, সেইটুকু সবুর সইছে না।

কিন্তু এক গ্রাস মুখে দিয়ে চক্কোত্তি থু-থু করে ফেলে দিলেন: নুনে পুড়ে গেছে। যবক্ষার।

বিনি-বউ বলে, একজনের মত রান্না, তাই নুনের আন্দাজ করতে পারেন নি ঠাকুরমশায়।

আন্দাজ ঠিকই আছে। রান্না আজ নতুন করছি নে মা-লক্ষ্মী। নুন যা দেবার দিয়ে আমি একবার আলাঘরে গেলাম কলকেয় তামাক দিতে। শত্তুরে এসে সেই সময় ডবল নুন ছেড়ে দিয়ে গেছে।

বলে হাসতে লাগলেন: কাঁচা কাজ হয়ে গেল। রান্না চাপিয়ে উনুনের পিঠ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হয় নি। এ রকম কখনো করি নে। নুন না দিয়ে খানিক সেঁকো-বিষও দিতে পারত রাগের বশে। রাগ না চণ্ডাল—সে অবস্থায় মানুষের হুঁশজ্ঞান থাকে না।

অতিথি-ব্রাহ্মণ নিয়েও এমনিধারা কাণ্ড। লজ্জায় আর ব্রহ্ম-শাপের ভয়ে কিনি-ঙ্গিশা করতে পারে না। চলে যান তো ইনি—তার পরে হবে একচোট চারুর সঙ্গে। বড্ড বাড় বেড়েছে। লজ্জা নেই, সকলের সঙ্গে পায়তাড়া কষে বেড়ায়। ভাইয়ের ভাতে ধিঙ্গি এক মাগী হয়ে উঠল, দুনিয়ার আর কোন চুলোয় ঠাঁই নেই। কিসের দেমাকে তবে এত ফড়ফড়ানি?

চক্কোত্তি ওদিকে হাসতে হাসতে বলছেন, আমিও ছাড়ন-পাত্র নই বাছা। আসন ছেড়ে ওঠা যাবে না, ভাত মরে যাবে। এক ঘটি জল নিয়ে এস দিকি। ঝোলের মাছ জলে ধুয়ে ধুয়ে খাব। উঃ, কত নুন দিয়েছে রে বাবা—নোনা-ইলিশের মত মাছের কাঁটা অবধি জরে গেছে।

রান্নাঘরের দাওয়ার উপর সেই খাবারের জায়গায় গগন উঠে এল। থমথমে মুখ সেই তখন থেকে। বলে, প্যাট্টা কবে রেজেস্টি হচ্ছে চক্কোত্তি মশায়?

চক্কোত্তি বলেন, বুধবার। সোম মঙ্গল দুটো দিন ছুটি—ঈদের পরব পড়ে গেল কি না।

গগন বলে, ভাল হয়েছে। বুধেশ্বরকে ফুলতলায় পাঠাচ্ছি নগেনের কাছে। তার মুখে সমস্ত শুনব।

চক্কোত্তি আহতকণ্ঠে বলেন, আমার কথা বিশ্বাস হয় না—আমি কি মিথ্যে বানিয়ে বললাম? অত উতলা কেন হচ্ছ, তা-ও তো বুঝি নে। হয়ে যাক না রেজেস্টি—যেমন খুশি লেখাপড়া করে নিক গে। তার পরে রইলাম আমরা সব। তোমার ঘেরির উপর কোন শালা না আসতে পারে, পুণ্ডরীকবাবুকে দিয়ে আমি তার যাবতীয় ব্যবস্থা করব। অমন দুঁদে উকিল সদরের উপর দ্বিতীয় নেই।

না, চলে আসুক নগেনশশী। আমার সামনাসামনি হোক। মতলবটা বুঝব। ঢাক-গুড়গুড় নয়, খোসা ছাড়িয়ে কথাবার্তা এবারে।

চক্কোত্তি একগাল হেসে বলে, আসবে না, দেখে নিও। নেহাত সাদা মানুষ তুমি দাসমশায়, কথাটা তাই ভাবতে পারছ। এ সময়টা সামনে আসে! বলি, মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে তো একটা!

গগন বলে, আসবে নিশ্চয়। চিরকুটে মন্তোর লিখে বুধেশ্বরের কাছে দিয়ে দিচ্ছি। মন্তোরে টেনে আনবে। বাঁদরকে কলা দেখিয়ে ডাকতে হয়। হাত মুঠো করে আ-তু-উ বলতে হয় কুকুরকে। তবে আসে। কয়েকটা দিন আপনাকেও থেকে যেতে হবে চক্কোত্তি মশায়।

তেতাল্লিশ

জগন্নাথ আর পচা নৌকো নিয়ে বয়ারখোলা গেছে। ছুতোর ধরে কাজকর্মগুলো সারবে, আলকাতরা দেবে। বাকি চারজন এরা সহিতলায়। পাড়ায় এসে পা দিতেই একটা কলরব উঠল। অন্নদাসী চেঁচাচ্ছে। তার পরে কী কথায় রাধেশ্যাম ঠাণ্ডা করে দিল একেবারে। চুপচাপ আছে। স্ত্রী-পুরুষে নিঃসাড় হয়ে আর কখনো ঘর করে নি।

চালাঘরে পড়ে ক্ষ্যাপা-মহেশ ক্ষণে ক্ষণে গাঁজা খায়, আর ভেবে ভেবে ফর্দ বলে। শশী গোয়ালা কাগজে একটু-আধটু অক্ষর ফাঁদতে জানে। তাতে সুবিধা হল, টুকে রাখে ফর্দগুলো। মহেশ এক চিলতে কাগজ এনে দিয়েছে চারুবালার কাছ থেকে। ফর্দের মধ্যে পুজোর উপকরণ আছে; আর রসদ-সামগ্রী আছে জঙ্গলে থাকবার। হাটে-

বাজারে বা মিলতে পারে, যেমন কুম্ভকার-সজ্জা, ফাঁক মতন এক দিন ঝড়াপোতায় গিয়ে কিনল। কলা, শসা, নারকেল, বাতাসা—জগারা এসে পড়লে তারপরে এগুলোর ব্যবস্থা হবে। সেই একদিনে কুমিরমারির হাটে সমস্ত হয়ে যাবার কথা, কিন্তু নৌকোর অসুবিধার জন্য বাকি রয়ে গেল। ধীরেসুস্থে এখন সব যোগাড় হচ্ছে। চাল অনেক লাগবে—খোরাকির চাল ও পুজোর নৈবেদ্য। বয়ারখোলার তৈলঙ্ক মোড়লকে ধরে নিখরচায় চালটার যেগোড় হয় যদি। চাল বলেছে ওরা নিয়ে আসবে। নুন, তেল, ঝাল মোটামুটি একটা হিসাব করে সেদিন নিয়ে এসেছে। আর ডাল। ডাল অবশ্য এসব অঞ্চলে বাড়াবাড়ি রকমের বিলাসিতা। তবু কিছু ডাল সঙ্গে নেওয়া ভাল। জলের মাছের কথা তো—হয়তো জালে উঠল না কোন দিন। কিম্বা মাছ খেয়ে অরুচি হয়ে মুখ বদলাবার শখ হল। ডাল ঘুঁটে নেবে সেদিন।

কুম্ভকার-সজ্জা অর্থাৎ মেটে জিনিস কতগুলো রে বাবা! ঝাঁকা ভর্তি হয়ে গেল। সাতটা ঘট, সাতটা পিদিম, সাতটা জলের ভাঁড়, একটা ধুনুচি। তা ছাড়া ঘর-খ্যাভারি হাঁড়ি-কলসি-মালসা-সরা কিছু আছে। রাত করে মাল নিয়ে আসতে হল, নয় তো লোকের নজরে পড়ে যায়। ছিটে-গরান কেটে চেঁচে-ছুলে লাঠি বানানো হল এগারখানা। এই লাঠির মাথায় নিশান উড়বে। দুই গজ লাল শালু কুমিরমারি থেকে সেদিন এনেছে নিশান ও পিদিমের সলতের জন্য! কাপড় কেটে এগার খণ্ড নিশান বানিয়ে রাখ, আর টুকরোগুলো নিয়ে সলতে পাকাও। বনে নেমে পুজোর গণ্ডির পাশে নিশান তুলতে হয়।

এই সমস্ত হচ্ছে। অত্যন্ত গোপনে, কেউ না টের পায়। তাড়া খেয়ে সাঁইতলা ছেড়ে পালাতে হল—অপমানের কথা বটেই। তা ছাড়া চৌধুরিগঞ্জের শত্রুপক্ষ আগে-ভাগে খবর পেলে দারোগা নিয়ে এসে জগাকে আটক করে ফেলতে পারে। দরকার কি জানান দিয়ে? বয়ারখোলা থেকে চলে আসুক নৌকো, এদিকে সমস্ত ঠিকঠাক রইল। নতুন জায়গায় যাচ্ছে, ভাল দিনক্ষণ চাই অবশ্য। কিন্তু পাঁজির শুভদিন নয়। অন্ত-রীক্ষের পানে নিরিখ করে দেখে সুদূরে বাদাবনের দিকে তাকিয়ে ক্ষ্যাপা-মহেশই বলে দেবেন সেটা। সময় ধরে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়বে। পীর-দেবতাদের তুষ্ট না করে গুণীন-বাউল সঙ্গে না নিয়ে হুট করে বাদায় নেমে গাছের গোড়ায় কুড়ুলের কোপ দেওয়া যায় বটে, গাছও পড়ে। পরিণাম কিন্তু শুভ হয় না। বাঘ-কুমিরে না-ও যদি খায়, টিকে থাকতে পারবে না সে জায়গায়। বনবিবি, দক্ষিণরায়, গাজি, কালু রণ-গাজি, ছাওয়ালাপীর—এঁরা সব কুপিত হয়ে থাকেন। ওদিকে দানো, ঘুটো, দুধেরাও সব কায়দায় পেয়ে যায়। দু-পক্ষ মিলে তাড়িয়ে তুলবে। প্রাণে রক্ষা পেতে পার নিতান্ত পিতৃপুরুষের পুণ্যবল যদি থাকে—কিন্তু প্রাণটুকুই শুধু, অন্য কিছু থাকবে না। দেখতে পাচ্ছ না, আশাসুখে ঘর তুলে সাঁইতলা থেকে কেমন সরে যেতে হচ্ছে। গোড়ায় কোন রীতকর্ম কর নি, তার পরিণাম।

তিনদিনের দিন জগা-পচা এসে পড়ল। ত্বরিতে কাজ হয়েছে। কাজটা হয়েছেও খাসা। আলকাতরা মেখে নৌকো চকচক করছে। নতুন ছই। খোদ মালিক এসেও যদি এখনই নৌকোয় চলাচল করে, নিজের বস্তু বলে চিনবে না।

পৌঁছেছে ঠিক দুপুরে। ভেবেচিন্তে ওপারের পাশখালিতে নিয়ে গিলেলতার ঝোপের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। মানুষের নজরে না পড়ে। তাতে নানান ঝামেলা। নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে, মুখ ব্যথা হবে জবাব দিতে দিতে। কোথা থেকে

আনলে, তাড়া কত ? রওনা হচ্ছ কবে ? কোন্ মতলবে চলেছ, থাকবে কতদিন বনে গিয়ে ? চটপট জবাব বানাতে হবে—মিথ্যে বানিয়ে বানিয়ে কাঁহাতক পারা যায়।

কিন্তু নৌকো লুকিয়ে রেখেই বা কাজ হল কই ? চাউর হতে বাকি নেই কিছু। সাঁজের মুখে গগন এসে সাঁইতলার পাড়ার মুখটায় দাঁড়াল। উচ্চকণ্ঠে কাকে যেন বলছে, জগন্নাথ ফিরেছে শুনতে পেলাম। ঘরে আছে ? ডেকে দাও একবারটি। আমার নাম করে বল।

ডাকতে হল না। কানে গিয়ে জগা নিজেই বেরিয়ে এল। ভূমিকা না করে গগন বলে, ঠিকঠাক হয়ে গেল ?

জগন্নাথ ন্যাকা সেজে বলে, কিসের ঠিকঠাক বড়দা ?

বসত তুলে পাকাপাকি চলে যাবার।

কে বলল ?

সন্দেহটা পচার উপর। চারুবালার সে বড় অনুগত। চলে যাবার কথা সে হয়তো বলে দিয়েছে।

গগন বলে, বলে দিতে হয় না। বাদা জায়গা—শহর-বাজার নয় যে মানুষ কিল-বিল করছে, ঘরের মানুষ উঠোনের মানুষটাকে জানে না। এ জায়গায় মানুষ লাগে না, গাছগাছালি বলে দিতে পারে। ঝোপের মধ্যে নৌকো ঢুকিয়ে রেখে এলে—মানুষে না দেখল তো পাখপাখালি দেখছে, তাইতে সকলের দেখা হয়ে যায়। সামাল করে দিতে এসেছি জগা। মহেশ তোমাদের ঘাড়ে লেগেছে, ক্ষেপিয়ে তুলছে। কোন্ অজাঙ্গি জঙ্গলে নিয়ে তুলবে ঠিকঠিকানা নেই। ওর ঐ কাজ। কতবার কতজনাকে নিয়ে গেছে—হর ঘড়ুই অনেক জানে, তার কাছে শুনে দেখো। কাউকে বাঘে নিয়েছে, দানোয় ধরে তুলে কাউকে আছাড় মেরেছে, উড়িয়ে নিয়ে কাউকে বা সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। পাগল হয়ে কেউ কেউ আবার ফিরে আসে—ঐ শশী গোয়ালার হয়েছে যেমন।

জগা বলে, জেনে ফেলেছ তো খুলেই বলি বড়দা। চৌধুরিদের পেয়ারের লোক তুমি এখন। শালা আর বোনাই মিলে ঘড় করছ—জেলে পুরবে আমাদের, ধরে ধরে ফাঁসি দেবে। জঙ্গলের বাঘ তোমাদের চেয়ে ভয়ের হল কিসে ?

খুব হাসতে লাগল জগা। গগনের আষ্টেপৃষ্টে যেন ঐ হাসির বেত মারছে। হতভম্বের মত সে জগার দিকে চেয়ে থাকে। বলল, সে কথাই তোমাকে বলতে এলাম। মেজ-শালা বিস্তর প্যাঁচ খেলছে। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। তোমাকে তাড়াল, আমাকেই কবে আবার বোঁচকাবিড়ে বাঁধতে হয় !

তাড়া খেয়ে চলে যাচ্ছে, এমন কথা জগন্নাথ কিছুতে মেনে নিতে পারে না। ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করে বলে, আমায় কি আজ নতুন দেখছ বড়দা ? যত না দেখেছ, শুনেছ তো আমার কথা। নেড়ী কুকুরের মতন লেজ গুটিয়ে পালাবার লোক আমি ? কিন্তু পাড়ার মধ্যে বোকাসোকা আছে কতকগুলো—ঘরসংসারে জড়িয়ে নাকের জলে হচ্ছে। ঘেরিদার হয়ে তোমরা এবার বাদার চিরকেলে নিয়ম বাতিল করে দিচ্ছ। ঘেরিতে জাল ফেললে নাকি সরকারী আইন মতে কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় চালান করবে। তখন আর উপায় থাকবে না মাছ-মারাদের। সেইজন্যে ভাবছি, আগেভাগে গিয়ে ওদের জন্য যদি একটা জায়গা করে নেওয়া যায়।

গগনের কথা হাহাকারের মত শোনায় : বাদার মধ্যে তুমিই তো আমায় এনে বসালে। একা ফেলে সত্যি সত্যি চললে জগা ?

জগা বলে, বন কেটেছে, ঘর বেঁধেছে—তখন কি চলে যাবে কেউ এরা ভেবেছিল ? তোমরাই থাকতে দিচ্ছ না—থাকা যাবে কেমন করে ?

হাসল ঃ তুমিও যাবে বড়দা—ভাবনা কিসের ? দুটো দিন আগে আর পিছে জায়গা করে রাখি গে, গিয়ে যাতে উঠতে পার। সে জায়গায় কিন্তু ঘেরিদার কেউ নয়। ঠিক আর দশজনের মতন ঘাটি-কাটা মাছ-মারা হয়ে থাকতে হবে। পারবে ? মানে মেজাজটা এখন উঁচুতে উঠে গেছে কিনা।

গগন সাফ বেকবুল যায় ঃ আমি কেন যেতে যাব ? কাঁধে তোমার মতন ঘুরন-পেত্নী চেপে বসে নেই, কোন একটা জায়গায় যে সোয়াস্তিতে থাকতে দেয় না।

নিজের ইচ্ছেয় না যাও তো তাড়িয়ে তুলবে। সে মানুষ বাইরের কেউ নয়—তোমার পরিবারের আপন ভাই। চেপে যাচ্ছ কি জন্যে ? তোমার কথাটাই ঘুরিয়ে বলছি—এ জায়গা শহরবাজার নয়, জানতে কিছু বাকি থাকে না। মানুষে না বললে গাছগাছালি বলে দেয় নগেনশশী নতুন-ঘেরি লিখে পড়ে নিচ্ছে। কুটুম্বমানুষ বলে একেবারে না তাড়িয়ে গোমস্তা করেও রাখতে পারে। ঘাড় হেঁট করে রাতদিন তখন খাতা লেখার কাজ, ঘাড় তুলে তাকাতে দেবে না।

গগন উত্তেজিত হয়ে বলে, শোন তবে। তেমন কিছু হবার আগে আমিই তাড়াচ্ছি। বৃন্দাবিশ্বরকে ফুলতলায় পাঠিয়েছি। পরশু দিন দলিল রেজেস্ট্রি হবার কথা। সমস্ত ফেলে, দেখতে পাবে, আজ রাত্রে কিম্বা কাল সকালবেলা হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়েছে। ঝগড়া বিবাদে পেরে উঠব না তো আলাদা এক মতলব ঠাউরেছি। উড়ো আপদ সাঁইতলা ছেড়ে গেলে আবার আমরা সেই আগেকার মতন থাকব।

জগন্নাথের হাত জড়িয়ে ধরে। বলে, যেও না তুমি। সেই কথা বলতে এলাম। ওরাই যখন চলে যাবে, তোমাদের কোন্ দায় পড়েছে। নৌকো যেখান থেকে এনেছ, ফেরত দিয়ে এস।

বলতে বলতে জগাকে টেনে নিয়ে চলল খালের দিকে। বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় না। অনেক কথা। নিরিবিলি একটা জায়গায় বসিগে চল।

শেষ পর্যন্ত গগনই নগেনশশীকে তাড়াচ্ছে, এ খবরটা নতুন। অমন ধুরন্ধর লোকটাকে কোন্ কায়দায় তাড়াচ্ছে, তারিয়ে তারিয়ে শোনার মতই ব্যাপার বটে।

খালের ধারে বাঁধের আড়ালে বসল এসে দু-জনে।

গগন বলে, নগনার টানের মানুষ হল চারি। আমার বোন চারুবালা। তার জন্যে মজেছে। মরুকগে যাক, বোনটা নিয়ে রেহাই দিক আমাদের। এমন বিয়ে তো আকছার হচ্ছে। খাদা অঞ্চল বলে কেন, শহর-বাজারেও। বিয়ে না হয়েও কত জোড়া বেঁধে থাকে। শাস্তরেও শুনি বিধান রয়েছে। মানবেলায় সমাজের ভয়ে পেরে উঠি নে। পুরুত ডেকে মন্তর পড়ে, আমি ওদের বিয়ে দিয়ে দেব।

জোয়ারের জল অল্প একটু দূরে ছলছল করছে। সেদিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে শুনে যায়। অতএব চারুবালা বউ হচ্ছে নগেনশশীর। বিয়ের পর বিদায় হয়ে যাবে সাঁইতলা ছেড়ে। শত্তুর ওরা দুজনেই—মতলবটা ভাল। এক ঢিলে দুই পাখী মারা।

অনুকূল চৌধুরি নগেনের নামে নতুন-ঘেরির বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন, খবরটা টোনি চক্কোত্তি মুখে করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দলিল-দস্তাবেজ যতই করে আসুক, গগন দাস কি জন্যে দখল ছাড়তে যাবে ? চক্কোত্তি বুদ্ধি দেয়, সাহস দেয় ঃ কক্ষনো না, চেপে বসে থাক তুমি দাস-মশায়। মামলা লড়ে তবে উচ্ছেদ করতে হবে বাছাধনের। সে এখন পাঁচ সাত-দশ বছরের ধাক্কা। কত রকম ফ্যাকড়ার কথা উঠবে। করালীর চর-

ওঠা ছুঁইয়ে কার মালিকানা—চৌধুরির না ভারত-সরকারের ? যাবতীয় দলিলপত্তর হাকিমের রায়ে চোতা-কাগজের শামিল হয়ে যাবে। মামলায় হেরে শালাবাবু অঞ্চল ছেড়ে পালাতে দিশা পাবে না! চৌধুরিদের বড়গাছে দা বেঁধেছে, বড়গাছ মড়াৎ করে ভেঙে ঘাড়ের উপর চেপে পড়বে। হা-হা-হা—

চক্কোত্তির প্রবল হাসির সঙ্গে গগন কিন্তু হাসতে পারে না। ভাবছে। টৌর্নি মানুষ—মামলা গড়োপিটে বানানো তাঁর পেশা। মামলা জমে উঠলে কোমর বেঁধে কোন এক পক্ষের হয়ে লেগে যাবেন। ভাল রকমের একটা জুড়ে দিতে পারলে কিছু দিনের মত নতুন রোজগারের পথ হল। ভাবতে ভাবতে তখন পন্থা এসে গেল গগনের মনে। চক্কোত্তি মামলার কৌশল বাতলে দিচ্ছেন, কিন্তু আরও এক ভাল উপায় আছে নির্গোলে নগেনশশীকে অঞ্চল-ছাড়া করবার। চারুবালার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। চারুর লোভে ঘুরঘুর করছে বিস্তর দিন ধরে। সেই দেশে-ঘরে থাকবার সময়েও। যার জন্যে ওদের পিছন ধরে বাদা-অঞ্চল অবধি চলে এসেছে। টৌর্নি হওয়া সত্ত্বেও চক্কোত্তি মশায় জাত্যংশে ব্রাহ্মণ। অতএব বৃন্দাবনকে ফুলতলায় পাঠিয়ে চক্কোত্তিকেও বলেকয়ে ধরে রেখেছে এখানে। অং-বং দুটো বিয়ের মন্তর উনি পড়ে দেবেন। বাদারাজ্যের বিয়েথাওয়ায় খাঁটি ব্রাহ্মণ কটা ক্ষেত্রে মেলে! গদাধরের মতন লোকেরাই পৈতে ঝুলিয়ে হঠাৎ-ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। ভাগ্যবলে এত বড় যোগাযোগ। বুধবারটা দিনও ভাল—পাঁজির অভাবে স্মৃতি থেকে চক্কোত্তি বিধান দিয়েছেন। দলিল রেজেস্টির কথা ছিল, তার বদলে নগেনশশী বর হয়ে বিয়ে করতে বসবে। চুক্তি থাকবে বউ নিয়ে যেখানে হোক বিদায় হয়ে যাবে বিয়ের তিন দিনের মধ্যে। সই করে নেওয়া হবে চক্কোত্তির মুকাবেলায়। তবে বিয়ে।

আদ্যোপান্ত শুনে জগন্নাথ গুম হয়ে যায়। ক্ষণপরে বলে, শুনেছে তোমার বোন ? সে রাজী ?

গগন অবহেলার ভাবে বলে, ঘটা করে কে বলতে গেছে! কিন্তু আপত্তির কি আছে ? বিধবা সে তো একটা গাল। কটা দিনই বা বরের ঘর করল! বামুন-কায়েতের ভিতরও তো শুনতে পাই, কত একছেলে দু-ছেলের মা দোজপক্ষের বিয়ের গিয়ে বসেছে। আমাদের বেলা কী দোষ হল ? বড় ভাই আমি, ভাল বুঝে দিচ্ছি বিয়ে! ধড়িবাজ পাত্তর—যেখানেই যাক জমিয়ে নেবে সঙ্গে সঙ্গে। আমার বোন ভাত-কাপড়ের কষ্ট পাবে না।

জগা বলে, বোনটি তোমার সোজা নয় বড়দা। বললেই অমনি সুড়সুড় করে কনে হয়ে পিঁড়িতে বসবে, সেটা ভেবো না। পুজোর দিন সেই যে আমি আলায় এসে পড়লাম। চারুবালা ভেবেছে খোঁড়া-নগনা। যাচ্ছেতাই করে উঠল। যা কথার ধার—যোষ বালি-দেওয়া মেলতুকের ধার কোথায় লাগে তার কাছে!

গগন বলে, ও কিছু নয়। দুটো হাঁড়ি-মালসাও তো এক ঝাঁকায় রাখলে ঠনঠন করে। এক বাড়িতে একসঙ্গে সব রয়েছি, ঝগড়া-ঝাটি হবে না—বলি, বোবা তো কেউ নয়। ঝগড়া বিয়ের আগে হচ্ছে, বিয়ের পরেও হবে। কিন্তু সেজন্য কোন্ কাজটা আটকে থাকে কার সংসারে ?

একটু চুপ করে থেকে নিজের কাছেই যেন কৈফিয়ত দিচ্ছে : মন্দটা কিসে ? বর দোজবরে তো তোর বেলাতেও তাই। নগনার বিয়েও শুধু নামে হয়েছিল। বউ ঘর করল না। বিয়ের পরে এসেছিল, তারপরে একদিনের তরে শ্বশুরবাড়ি আর আনা গেল না। নানান কেলেঙ্কারি। সে বউ আসবে না কোনদিন, এলেও ঠাঁই পাবে

না। ঘরের একটু পায়ে টান, বলবি তো তাই? থাকল তো ঘরেই গেল। এমন চালাকচতুর চৌপিঠে মানুষ কটা পাওয়া যায়? যতই হোক, বছরখানেক এক ঘরের সঙ্গে ঘর করে এসেছিল। ষোলআনা নিখুঁত হলে সে পরুষ রাজী হতে যাবে কেন? বলি, মায়ের পেটের বোনকে আমি কি খারাপ ঘরে দেব? মারাদয়া বুদ্ধি বিবেচনা নেই?

জগন্নাথ বলে ওঠে, তা আমায় ওসব শোনাও কেন? আমার কি? যেখানে খুশি দাওগে। যার পাঁঠা সে লেজে কাটবে, অন্যের কী যায় আসে!

গগন গম্ভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বলে, দেখ, যার কপালে যেমন লেখা থাকে, মানুষের কিছু করবার নেই। নগনাটা কি আজকের থেকে চারির পিছনে লেগেছে! গাঁয়ের উপরে সমাজের মধ্যে থেকে ঠেকিয়ে আসছিলাম। ঘরদুয়োর ছেড়ে তারপরে বেরিয়ে আসতে হল। বউ পরের ঘরের মেয়ে, তার কথা ধরি নে। কিন্তু নিজের বোন হয়ে চারুও আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে তুলল। হচ্ছেও তেমনি। আমি কি করব—জঙ্গলে পড়ে আছি। সমাজ নেই এখানে, বিয়ে-থাওয়ার কোন বাধা নেই। কিন্তু জঙ্গলে বরপাত্তর কোথায়? যে আছে, তার হাতেই তুলে দেব।

খরকণ্ঠে বলে, দোষটা শুধু নগনার দেখলেই হবে না। বোন বলে ছাড়ব না— বাদায় পা দিয়ে ও-ই তো সকলের আগে গণ্ডগোল পাকাল। তোর সঙ্গে ভাঙাভাঙি ওরই কারণে। মেয়েলোক আরও একজন তো এসেছে। চোখে দেখতে পাস তাকে কখনো? গলা শুনতে পাস? তা ভালই হল, জোড়া আপদ এদ্দিনে এক সঙ্গে বিদেয় হচ্ছে। ঘরে-বাইরে সোয়াস্তিতে থাকা যাবে।

অন্ধকার হয়েছে। আলাঘরে হ্যারিকেন-লণ্ঠন জেলে দিয়ে গেছে। গগন উঠে পড়ল। মাছের ডিঙি ফেরার সময় হল কুমিরমারি থেকে। অনেক কাজ। নগেনশশী নেই, একলাই আজ সমস্ত করবে। মাছের দাম হিসাবপত্র করে নেবে, খাতা লিখবে। জগার দল ডিঙির কাজ ছেড়েছে, কাজ তা বলে আটকে নেই। চৌধুরি-আলা থেকে অনিরুদ্ধ নৌকো বাওয়ার পাকা লোক দিয়েছে। বুদ্ধীশ্বর আছে—এই তরফের নতুন মাতব্বর। তা ছাড়া কথা আছে, দরকার মতন চৌধুরিগঞ্জের নৌকোর মাছ বয়ে দিয়ে আসবে কুমিরমারি। পাকা লোক নগেনশশী, সে-ই সব ব্যবস্থা করেছে।

ডোবার ধারে গিয়ে একবার গগন মুখ ফিরিয়ে দেখে। জগন্নাথ আছে তখনো—নিশি-পাওয়া লোকের মতন খাল-কিনারে ছিটে জঙ্গলের ভিতর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চুয়াল্লিশ

গগন যা ভেবেছে, মিথ্যে নয়। খানিকটা পরেই নগেনশশী বুদ্ধীশ্বরের সঙ্গে এসে পড়ল। তখন গা ধুচ্ছে গগন ডোবার ঘাটে বসে। নগেনকে দেখল। বাঁদরকে কলা দেখাতে হয়, সেই হল চারুবালা। একা একা গগন খুব হাসছে।

আর হাসছে চারুবালা রান্নাঘরে বিনি-বউয়ের সঙ্গে। বলে, দেখ বউদি, কিসে কি হয়ে যায়। এত বড় শয়তান মানুষ, কিন্তু দাদার বুদ্ধির সঙ্গে পেরে উঠল না। দলিল করে সর্বস্ব নিতে যাচ্ছিল—দাদা এমনি চিরকুট লিখে পাঠাল, ছেড়েছুড়ে ছুটে এসে পড়ল।

বিনোদিনী বলে, কি লিখেছে জান না বুঝি ঠাকুরঝি ? তোমার যে বিয়ে।

হাসি আরও বেড়ে যায় চারুর : ওমা, তাই নাকি ! মত ঘুরল তোমাদের এতদিনে ? কার সঙ্গে বিয়ে গো, বনের মধ্যে বর পেলে কোথা ?

বিনোদিনী হেসে বলে, ভিজে-বেড়ালটি—কিছু জানেন না ! ঘর এই দু-খানা মাত্তর—এত কথাবার্তা হচ্ছে, উনি যেন কানে তুলো দিয়ে থাকতেন। কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশুদিন বিয়ে মেজ ভাইয়ের সঙ্গে। সেইজন্যে তাকে আনতে পাঠিয়েছিল।

এই চারু কৃত্রিম হতাশার সুরে বলে, সে মানুষ তো কত বছর ধরে ঘুরছে। বিয়ের তাগিদে বরপাত্তর আমাদের পিছন পিছন অজঙ্গি জঙ্গলে এসে উঠল। এদ্দিনে চাড় হল তোমাদের ?

বিনোদিনী বলে, ফুল না ফুটলে কি জোর করে হয় ভাই ! মানুষের হাত কিছু নেই, যা করবার বিধাতাপুরুষ করেন। যোগাযোগটা কী রকম ? চক্কোত্তি মশায় এসে পড়লেন—ভাল বামুন নৈকষ্যকুলীন। মন্তোর পড়াবার জন্য বলেকয়ে রাখা হল তাঁকে।

চারু বলে, শুধু বলাকওয়ায় হয় নি। টোনি' মানুষ—মোটা দক্ষিণা কবুল করতে হয়েছে। বরকেও ছেড়ে কথা কইবে না, মোটা দালালি আদায় করবে তার কাছ থেকে।

নগেনশশী ইতিমধ্যে জামা খুলে হাত-পা ধুয়ে গামছা দিয়ে পরিপাটি করে মুছে চক্কোত্তির কাছে বসেছে। নিচু গলায় কথাবার্তা। চক্কোত্তি খবরাখবর নিচ্ছেন ফুলতলার। নগেনও শুনছে এদিককার খবর—তাড়াহুড়ো এই বিয়ের আয়োজনের বিবরণ। গগনের মতলব যা আছে এর পিছনে। গগন না থাকায় দু-জনে খোলাখুলি কথাবার্তার জুত হয়েছে।

বিনি-বউয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে চারুবালা ডোবার ঘাটে গেল গগন যেখানে গা ধুচ্ছে। জলে নামবার উপায় নেই, বিষম কাদা। ঘাটের উপরে সেজন্য মাচা বানিয়ে নিয়েছে। জলের ভিতরে শক্ত দুটো খুঁটি পোঁতা, আড় বেঁধেছে ঐ খুঁটির সঙ্গে, লম্বালম্বি কতকগুলো কাঠ ফেলে নিয়েছে। ঐ মাচার উপরে বসে ঘটিতে করে গায়ে জল ঢালছে। চারু এল খান দুই থালা হাতে করে। থালা ধুতে এসেছে। সেটা উপলক্ষ, গগন বুঝতে পারে। মুখ খুলবে এইবারে চারু।

গগন কিছুমাত্র আমল না দিয়ে মুখের উপর সোয়াস্তির ভাব টেনে এনে বলে, যাক এসে গেল তবে মেজবাবু নিজের ঘর-বর হবে এতদিনে। ওদের সঙ্গে পুরানো কুটুম্বিতে ঘালিয়ে নতুন কুটুম্বিতে।

চারু বলে, তোমার মেছো-সম্পত্তিটা রক্ষে হল দাদা। যদি অবশ্য তোমার নতুন কুটুম্ব সত্যি সত্যি সইতলা ছেড়ে যায়।

গগন জাঁক করে বলে, বন কেটে জন্তুজানোয়ার তাড়িয়ে সম্পত্তি বানানো। হেঁ-হেঁ, এ সম্পত্তি নিয়ে কেউ জিলোতে পারবে না। চক্কোত্তি মশায়কে জিজ্ঞাসা করে দেখিস।

তারপরে একেবারে আলাদা সুরে বলে, তোকে নিয়ে কত উদ্বেগে যে দিন কেটেছে ! মায়ের পেটের বোন এমনি দশায় চোখের উপর ঘুরঘুর করছে। শহরবাজারে থাকলে কাজকর্ম খোঁজা যায়, বাদাবনে সে উপায় নেই—

চারু বলে, উদ্বেগের কথা আমায় বল নি কেন দাদা ? আমি উপায় করতাম।

কি উপায় করতিস ? বর ধরে আনবি, কিন্তু জঙ্গলে মানুষ কোথা। হাটবার দেখে তাহলে কুমিরমারি যেতে হত। কিম্বা সেই ফুলতলা অবধি।

রসিকতা করে গগন খুব এক চোট হেসে নেবে, কিন্তু চারুবালার মুখে চেয়ে স্তম্ভিত হল। চারু বলে, কোথাও যেতে হত না দাদা। এইখানে করালী গাঙে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। বোনের দায় মোচন হয়ে যেত তোমার।

গগন আহত কণ্ঠে বলে, শুভকর্মের আগে তুই জলে ঝাঁপ দেবার কথা বলিস চারু ?

জল অনেক ঠাণ্ডা দাদা। রাতে ঘুমিয়ে থাকতাম—সেই সময় কেন হাত পা ধরে ছুঁড়ে দাও নি ? দায় চুকে যেত।

গগন চটে গিয়ে বলে, এখন তুই বলছিস, কিন্তু নগেনকে তুই-ই তো নিয়ে এলি লোভ দেখিয়ে। দাদার মত ছাড়া হবে না—দাদার কাছে মত নিতে এসেছিস তোরা। তা ভেবেচিন্তে দিচ্ছি আমি মত। চক্কোত্তি মশায়কে ঐ জন্য ধরে রেখেছি। এখন উল্টোপাল্টা বললে হবে কেন ?

কেন বলেছি সে-ও তো জান দাদা। নিজের গরজ বুঝে আজকে অবুঝ হচ্ছ। তুমি খবরবাদ দাও না। একলা দুটো মেয়েমানুষ আসতে পারি নে জঙ্গলরাজ্যে। কী করা যায়—বানিয়ে বলতে হল একটা-কিছু। নয় তো খোঁড়া পা টানতে টানতে মানুষটা এদ্দূরে অবধি কোন স্বার্থে আসতে যাবে ? কিন্তু পেঁছিবার পর থেকেই দূরে-দূরে করছি। তিতো কথাবার্তা দিনরাত। ভেবেছিলাম, রাগ করে দেশ-ভুঁয়ে ফিরে যাবে—তা একেবারে উল্টো ব্যাপার, জোঁকের মতন লেপটে রয়েছে।

গগন বলে, লেপটে থেকে প্যাঁচ কষে কষে এবারে সবসুদ্ধ ধরে টান দিয়েছে। আমার এত বছরের নোনা জল খাওয়া বরবাদ করে দেয়।

হঠাৎ সে চারুর দিকে খিঁচিয়ে ওঠে: তোদের জন্যেই তো। হাতে-গাঁটে মানষের সব সময় টাকাপয়সা থাকে না। চিঠি লিখেছিলি, আরও না হয় পাঁচ-দশখানা লিখতিস। হুট করে এসে পড়বার কোন্ দায় হল ? সব গণ্ডগোলের মূলে তোরা। বলি, নগনাটা এসে না জুটলে এসব কোন হাঙ্গামা হত না। উল্টে আবার টকটক কথা বলিস আমার উপর।

দু-খানা থালা ধুতে তার কত সময় লাগে। হয়ে গেছে। থালা হাতে নিয়ে অন্ধকার উঠানে চারুবালা ম্যাচ-ম্যাচ করে চলল। বাদারাজ্যে কতরকম সাপখোপের কথা শোনা যায়। একটা সাফ ফণা তুলে এসে ছোবল দিলেও তো পারে।

তিরকুট পেয়েই নগেনশশী আ-তু-উ ডাকা কুকুরের মতন ছুটে এসেছে, মুখের তম্বি কিন্তু ষোলআনা। গগন গা ধুয়ে এসে দাঁড়াতেই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: কী কাণ্ড ! বুধবারটা ছাড়া দিন খুঁজে পেলে না ? কাজটায় বাধা পড়ে গেল।

নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিরাসক্ত ভাব দেখাতে হয়। সবাই বলে থাকে এমনি। গগন বলে, শুভকর্মটা অনেক দিন ধরে ঝুলছে। সেইজন্যে ভাবলাম—

কথা শেষ হতে না দিয়ে নগেন বলে, এদ্দিন ঝুলছে তো আরও না হয় দু দশ দিন ঝুলত। লোক পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা—বিয়ের তারিখ ঐ বুধবারের পর আর যেন আসবে না !

গগন বলে, তারিখ কতই আসছে যাচ্ছে। কিন্তু বাদার মধ্যে পুরুত মেলে কোথা ? ভাগ্যি ভালো চক্কোত্তি মশায়কে পাওয়া যাচ্ছে। খাঁটি ব্রাহ্মণ—হোটেলওয়ালা গঙ্গাধরের মত ভেজাল বামুন নন।

চক্কোত্তি মশায় এখন বরাপোতা থাকবেন। অন্য দিন খবর দিলে কি আসতেন না? নাঃ, কাজটা ঠিক হল না জামাইবাবু। পাকা দলিল হয়ে যাচ্ছিল। বড়লোকের ব্যাপার তো—কোন কোট না কী মন্ত্রণা দেয়, মন ঘুরে না যায় অনুকূল বাবুর।

দলিল নাই বা হল? এদ্দিন বিনি-দলিলে চালিয়ে এসেছি, হঠাৎ দলিলের কোন গরজ পড়ল? আসল মালিক কে, তারই তো সাকিন নেই।

নগেনশশী জাঁক করে বলে, দলিল হবে না মানে? ইয়ার্কি? ঠিকঠাক করে এসেছি বাবুর সঙ্গে। এ বুধবারে হল না তো আসছে বুধবারে। স্ট্যাম্পের উপর লেখাপড়া আছে, খালি এখন সই মেরে হাকিমের সামনে তুলে ধরা। কেন যে লোকে অনুকূল বাবুর নিন্দে করে—আমি তো কই খারাপ দেখলাম না। তিনি আরও ঠাট্টা করে বললেন, বিয়ে করতে যাচ্ছ মিষ্টি মিঠাই নিয়ে এস। নয় তো কাজের ভণ্ডুল ঘটিয়ে দেব।

কী সব উল্টোপাল্টা কথা! গগন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিয়ে হয়ে গেলেই বাদা থেকে বিদায় হবে—এমনি ধরনের কথা কত হয়েছে। শতমুখে বাদার নিন্দে করত নগেনশশী: সাপ-শুয়োর থাকতে পারে এখানে, মানুষের বসবাসের জায়গা নয়। বিনিটা নাছোড়বান্দা—তার জন্যে আসা। পালাতে পারলে বেঁচে যাইরে বাবা। বিনি-বউ আর এক রকম বলে: আসতে চাচ্ছিল না মেজদাদা। যেই বলেছি, আমার একেবারে তাড়িয়ে তুলল। তখন ঠাকুরঝি বলে, যাবে না কী রকম! নাকে-দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাব। ঠাকুরঝির চক্কোরে পড়ে মেজদাদা এল, আমার কথায় নয়। তাকে পাওয়ার লোভে।

কিন্তু বিয়ের পরেও এখান থেকে তো নড়ে বসবাস মতলব দেখা যাচ্ছে না সেই নগেনশশীর।

গগন বলে, এ কী রকম কথা! রীতকর্ম আছে একটা! দলিল হোক না হোক আমি বুঝব। তার জন্য ফিরে বুধবার অবধি হাঁ করে থাকতে হবে না। বিয়ের পরদিন বউ নিয়ে জোড়ে জোড়ে চলে যাও। যা নিয়ম, যে রকম কথা তোমার সঙ্গে।

নগেনশশী বলে, বউ নিয়ে ভিন্ন জায়গায় যেতে বল, তার জন্য আটকাবে না। এখান থেকে গিয়ে ঐ চৌধুরিগঞ্জের আলায় পাঁচ-সাত দিন জোড় থেকে আসতে পারি। অনুকূল চৌধুরী আমার গুণ বুঝেছেন। নতুন-ঘেরির একটা ব্যবস্থা হয়ে গেলে তার পরে চৌধুরিগঞ্জের ভারও হয় তো আমায় নিতে হবে। অনিরুদ্ধকে দিয়ে হয় না, ফুলতলা থেকে এসেও সুবিধা করতে পারে না। ভালই হবে কি বল জামাই বাবু? একচ্ছত্র হয়ে বসব। অঞ্চল জুড়ে চেপে বসে তখন দেখা যাবে কত শক্তি ধরে পাড়ার ঐ হাঘরেগুলোর। ভিটে-ছাড়া করে তাড়াব।

গগন ব্যাকুল হয়ে বলে, না গো, দেশে ফিরে যাও তোমরা! কি অন্য কোথাও যাও। কথাও তো তাই। বিয়ে দিচ্ছি আমি সেই কারণে।

কিন্তু নগেনশশী কিছুমাত্র আমল না দিয়ে চক্কোত্তির সঙ্গে পুনশ্চ কথাবার্তায় মগ্ন হল। কেমন ভাবে কি রকম শর্তে চৌধুরিগঞ্জের কাজটা নেয়া যায়, কাজ নেবার পরে কোন্খানে ঘাঁটি করা যাবে—সইতলায় না চৌধুরিগঞ্জে, তারই সব জরুরী শলা-পরামর্শ।

আচ্ছা মজা! বিয়ে করবে চারুবালাকে—এবং বিয়ের পরে নতুন ঘেরি ও চৌধুরি-

গজ উভয় জলকরের কর্তা হয়ে বাদারাজ্যে আধিপত্য করে বেড়াবে। ধান ছাড়াতে গিয়ে চাল বেঁধে আসে—উপায় কি এই বিপদে ?

পঁয়তাল্লিশ

বলাই-পচার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে নতুন-আলায় বৃন্ধীশ্বর গিয়ে জুটেছে। ওঠাবসা আগেও ছিল, সে হল আর দশটা মাছ-মারার মতন। এবারে চাকরি দিয়েছে নগেনশশী। নতুন ঘেরির বেলদার। বেলদার বৃন্ধীশ্বর। মাস মাস নগদ তঙ্কার মাইনে। এয়ার-বন্ধুদের মাঝে বৃন্ধীশ্বর চাকরির কথা তুলে জাঁক করে। সকলের থেকে স্বতন্ত্র—তুচ্ছ মাছ-মারা নয়, চাকুরে মানুষ।

বেলদারের প্রধান কাজ দিবারাত্রি ভেড়ি পাহারা দিয়ে বেড়ানো। ঘোগ হল কিনা ঠাহর করে দেখা। গাঙ-খালের নানা জল ঝিরঝিরিয়ে ঘেরির ভিতরে আসে, সেই ছিদ্রপথের নাম হল ঘোগ। ঘেরির তলদেশে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র—সেই পথে জল এসে ঢুকছে, খুব নজর না করলে বোঝা যাবে না। কিন্তু অত্যন্ত সংঘাতিক হয়ে পড়ে একদিন এই ছিদ্রটুকু। সুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুনো—বাদাবনের এই ঘোগের ব্যাপারে সেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। জল চুঁইয়ে এসে মাটি ধুয়ে আস্তে আস্তে পথ বড় হয়ে ওঠে। তারপর কোটালের সময় প্রচণ্ড স্রোত সেই পথে মাথা ঢুকিয়ে বাঁধ ভেঙে ফেলে চারিদিকে একাকার করে দেয়। দীর্ঘ দিনের তৈরি করা মাছ বেরিয়ে চলে যায়, ম্যালিকের মাথায় ঘা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় থাকে না। আবার তখন নতুন করে ভেড়ি বেঁধে নতুন ডিম ও চারামাছের মরশুম অবধি বসে থাক চুপচাপ। এতদিন যা-কিছু করছিলে, সমস্ত বরবাদ। বেলদার তাই সতর্ক চোখে ঘোগ পাহারা দিয়ে বেড়ায়। তিলেক সন্দেহ ঘটলে দুষ্ট জায়গাটুকু খুঁড়ে নতুন মাটি শক্ত করে চাপান দেবে। ভেড়ির কোনখানে যদি বৈদাৎ ভেঙে গেল, লোকজন জুটিয়ে এনে ত্বরিতে সেটা মেরামত করে ফেলবে। তার আগে বাঁশের পাটা পুঁতে ঘিরে দেবে ছেঁড়া জায়গাটা। কিছু পরিমাণ বাইরের জল আসে আসুক, কিন্তু ভেড়ির খোলের একটি কুচো-চিংড়ি বেরিয়ে যেতে না পারে।

বেলদারের অতএব হেলাফেলার কাজ নয়। কঠিন দায়িত্ব। এর উপরে ফাইফরমাশ আছে হরবখত। আলায় রান্নার জন্য কাঠ কেটে আন বন থেকে। কাঠ চেলা করে দাও। কলসি ভরে মিঠা জল নিয়ে এস নৌকোর সুবিধা হল না তো কাঁধে বয়ে আন। পথ কতই বা—তিন-চার ক্রোশ বই তো নয়। বেলদারের কাজের কোন লেখাজোখা নেই। যেমন এই বিয়ের পাত্র নগেন শশীকে খবর দিয়ে আনতে হল ফুলতলা অবধি ছুটে গিয়ে।

তাই নিয়ে বৃন্ধীশ্বর জাঁক করছিল বলাইয়ের সঙ্গে : যার যেখানে আটকাবে, অমনি বৃন্ধীশ্বর। চারখানা হাত আমার, আর চারটে চোখ। এই কোদাল ধরে ভেড়ির মাটি কাটছি, এই আবার শিলনোড়া নিয়ে রান্নাঘরে ঝাল বাটতে বসে গেলাম। কালী-পুজোর পাঁঠা কিনে এনেছি বড়দলের হাট গিয়ে, আবার এই দেখ ফুলতলা গিয়ে বরও এনে হাজির করে দিলাম। তোমাদের কী-ই বা কাজ ছিল—কুমিরমারি মাছের ডিঙি পৌঁছে দিয়ে ছুটি। ডিঙি নিয়ে যেতে তা-ও তিনজনে মিলে।

বৃন্ধীশ্বর নামখানা খুব জাঁকালো, কিন্তু মানুষটা হাবাগবা। খাঁটিয়ে খাঁটিয়ে তার কাছ থেকে লোকে মজার কথা শোনে।

বাদাবনে বিয়ে—কী কাণ্ড হচ্ছে বল দিকি বুদ্ধীশ্বর! মানবেলা থেকে তফাতটা তবে কি রইল। দুটো-পাঁচটা মেয়েমানুষ যা এদিকে আসে,—হয় তারা বিয়েথাওয়া চুকিয়ে এসেছে, না হয় তো আর ঐ পথে যাবে না।

বুদ্ধীশ্বর বলে, কিন্তু হচ্ছে তাই এবারে। না হয়ে আর রক্ষে নেই। কনে মজুত, চক্কোত্তি পুরুতমশায় মজুত। বরকে আমি হাজির করে দিলাম। ফুলতলা থেকে ঐ সঙ্গে বিয়ের বাজারও সেরে এসেছি। বড্ড ঘড়েল বর—হিসেবপত্তর করে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কেনাকাটা করল, একটা পয়সা এদিক-ওদিক না হয়। টোপর পছন্দ করে মাথায় বসিয়ে মাপ দেখে নিল। সমস্ত হয়ে গেছে, বাকি এখন শুধু মন্তোর পড়ে কনের পিঁড়ি সাতটা পাক ঘুরিয়ে নেওয়া।

জগন্নাথ শুনছিল বলাই আর বুদ্ধীশ্বরের কথাবার্তা। এবার কাছে চলে এসে বলে, কনে যা দজ্জাল, পিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়বে না তো সাতপাকের সময়? খোঁড়া-বর ছুটে গিয়ে কনে চেপে ধরবে, সে ক্ষমতাও নেই।

বুদ্ধীশ্বর বলে, বর না পারুক—অত বড় চৌধুরি-আলার সবশুদ্ধ নেমন্তন্ন বাছা বাছা মরদজোয়ানরা থাকবে। তারা গিয়ে ধরে ফেলবে।

বলাই বলে, নেমন্তন্ন আমাদের হবে না?

হাত ঘুরিয়ে বুদ্ধীশ্বর বলে, সব সব। বরমশায় বলে দিয়েছে, সাঁইতলা আর চৌধুরিগঞ্জ মিলে কতই বা মানুষ! কেউ বাদ থাকবে না।

জগা হেসে বলে, চালাও হুকুম। বাপরে বাপ, বেসামাল হয়ে পড়েছে স্ফূর্তির চোটে। মজা টের পাবে। ঐ মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করা আর জাত-গোখরো নিয়ে ঘর করা এক কথা। যেমন শয়তান নগনাটা, তেমনি তার উচিত শাস্তি। অন্য কিছুতে এত শাস্তি হত না। দেখিস বলাই, বিয়ের যেন কোনরকম বাগড়া না পড়ে। নির্বিঘ্নে যেন হয়ে যায়।

হেসে হেসে চলে গেল জগন্নাথ। দিনটা কাটল। সন্ধ্যার দিকে শশী ঘোষকে ডেকে নিয়ে খালের ধারে গেল, জঙ্গলের পাশে। বলাইও আছে।

শশীকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি তো ডাকাত?

শশী ঘাড় নেড়ে না-না করে: না জগা, হিংসুটে লোকে বদনাম রটায়। দেখতে পাবে, থাকব তো বরাবর একসঙ্গে গরু-চুরির মামলায় মিথ্যেমিথ্যে জড়িয়ে একবার ফাটকে পুরেছিল।

জগন্নাথ গম্ভীর হয়ে বলে, একজন খুনে-ডাকাত দরকার আমার। বনে গুচ্ছের ভালমানুষ নিয়ে গিয়ে কী হবে! তবে তো তোমায় দিয়ে হবে না। দেখি আর কাকে পাওয়া যায়।

শশী তাড়াতাড়ি বলে, ফাটকে একবার ঘানি ঘুরিয়ে এলে আর তো ভালমানুষ থাকবার জো নেই। খুন যদি হয়েও থাকে, ইচ্ছে করে করি নি। কাজ-কারবারে আপনি খুন হয়ে গেছে।

তেমনি কাজ আবার একটা করতে হবে। আজকেই।

জিভ কাটে শশী: পাপের ফল কখনো ভালো হয় না জগন্নাথ। খারাপ পথে যেও না। কাঁচা বয়সে আজ হয়তো মনে ধরবে না, কিন্তু আমায় দিয়ে দেখ। আমার পরিণামটা দেখ। টাকাকড়ি যা-হোক কিছু করেছিলাম, আজকে একেবারে ঢনঢন। পরের ভাতে থাকি। ছেলে নেই, বউ নেই, নির্বংশ মানুষ। রোগপীড়েয় পড়ে থাকলে এক ঝিনুক জল এগিয়ে দেবার মানুষ নেই। নিড়ানি নিয়ে ক্ষেতে বসে যেলাক

ঘাস খাছলে তবে তারা একমুঠো ভাত দিত।

জগা বলে, খুন করতে হবে না! মালপত্তর লুঠেরও দরকার নেই। একটা মানুষ চুরি করতে হবে শুধু, অল্পবিস্তর মারধোর দিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে আসবে।

বলাই অবাক হয়ে যায়। মতলব সমস্ত একলা জগার, বলাই কিছু জানে না। তাকে বলে নি। প্রশ্ন করে, কোন মানুষ রে জগা—কোথায় থাকে?

নগনা খোঁড়া।

বলাই আন্দাজ করেছিল তাই। শশী বলে, খোঁড়ামানুষের উপর আক্রোশ কেন গো?

জগা বলে, ও খোঁড়া একগুণ বাড়া। পুরো দুই ঠ্যাংওয়ালের কান কেটে দেয়। বড়দাকে উৎখাত করে নিজে মালিক হবে! সর্বনাশ ঠেকাবার জন্য বোনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বড়দা ভাব জমাচ্ছে। কিন্তু ভবী ভোলে না—পাশাপাশি দুই ঘেরির মাতব্বর হয়ে আরও জাঁকিয়ে বসবে। সর্বনাশ যা হবার হবেই, মাঝে থেকে মারা পড়বে ঐ মেয়েটা।

বলাইয়েরও রাগ খুব নগেনশশীর উপর। বলে, জঙ্গলে বওয়াবয়ির কী দরকার জগা? ও লোকের উপর মায়া কিসের? পারে তো শশীদা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে বস্তায় পুরে মাঝগাঙে ছেড়ে দিয়ে আসুক। জ্বালাতন করতে আর যাতে না ফিরে আসে।

শশী ঘোষের স্ফূর্তি লাগছে। অনেকদিন পরে মজাদার কাজ একখানা এসে পড়ল বটে। হাত নিশপিশ করে। একগাল হেসে বলে, একই তো দাঁড়াল বলাই-ভাই। জঙ্গলে ছেড়ে এলেও ফেরার ভয় নেই। বাঘে ধরবে। এক দিক দিয়ে বরঞ্চ ভালই—আমাদের উপর নর হত্যার পাপ আসবে না। বাঘে খেলে আমরা কি করতে পারি।

বলাই ঘাড় নেড়ে বলে, ওকথা মনেও ঠাঁই দিও না শশী-দা। খোঁড়া নগনার মাথা-ভরা শয়তানির বিষ। হাড়-মাংস বিষে তিতো। বাঘ যদি আসে, এক কামড় দিয়ে থু-থু করে ফেলে দিয়ে যাবে। গিলতে পারবে না।

জগা বলে, শোন শশী-দা, বড়দার উপর বড্ড অত্যাচার হচ্ছে। বাদাবন এটা। সমাজ নেই যে পঞ্চায়েতে পাঁচ মাতব্বর মিলে একটা ফয়সালা করে দেবে। সরকারী উপরওয়ালার কথা যদি বল, তিন জো মেরে উঠে তবে থানা। থানার গাছতলায় তোমায় বসিয়ে রেখে দিল। দারোগাবাবুকে একটা খবর পৌঁছে দেবে, তার জন্যেও শালার সিপাহিগুলো হাত পেতে আছে। পুরো বাক্স সিগারেট—বিড়ির বাণ্ডিলে হবে না। তবে বোঝ, যা-কিছু করতে হবে নিজেদেরই। বয়সকালে নিজের মুনাফার জন্যে বিস্তর করেছ—বুড়ো বয়সে পরের জন্য কিছু কর, পুণ্যি হবে। আমরা সাথেসাথে আছি। পাকা মাথার বুদ্ধি বাতলে দাও, হাতে-নাতে না হয় আমরাই করি।

শশী ঘোষ কিছু চিন্তিত হল।

বিয়েটা কবে?

বুধবার।

যা করবার, আজকেই তবে করে ফেলতে হবে। একটা রাত্তির হাতে রাখতে হয়। যদি ধর কোন গতিকে পয়লা মুখে বাগড়া পড়ে গেল।

চুপচাপ আরও একটুখানি ভেবে নেয় শশী। বলে, মক্কেল মশায় কোথা? ভাল করে দেখা আছে জায়গাখানা?

বাঁধের উপরে উঠে এল তিনজনে। নতুন-আলোর কাছাকাছি এল। শশী বলে, আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না। এমনি বল, আমি আন্দাজ করে নেব।

বলাই বলে, পুবের পাশে খোলা জায়গা—ঐখানটা আমরা আড্ডা জমাতাম। বড়দা আর নগনা ওখানে শোয়। ক'দিন আবার চক্কোত্তি জুটেছে এদের সঙ্গে। মেয়েলোক দুটো কামরার ভিতর থাকে।

শশী প্রণিধান করে বলে, সেটা ভাল। দুয়োরে শিকল তুলে দিলে বেরোতে পারবে না। মেয়েমানুষ বড্ড চেঁচায়।

আবার বলে, তিনজনের বেশী তো নয় বাইরে—ঠিক জান? বাইরের কেউ এসে থাকে না—এই ব্যাপারী-মহাজন মাঝি-মাল্লারা সব?

বলাই নিশ্বাস ফেলে বলে, থাকতাম তো কতজনে আমরা? কিন্তু খোঁড়া-নগনা মানুষের ঘেঁস সইতে পারে না। একে একে তাড়িয়েছে। মজা বুঝুক এই বারে। গুণতিতেই ঐ তিনজন বটে। ওর মধ্যে টৌর্নি চক্কোত্তিটা মানুষ নয়, শামুক একটা। সেদিনের নগর-কীর্তনে টের পাওয়া গেছে। হাঁক শুনলেই আগপাস্তলা কাঁথা চাপা দিয়ে মড়ার মতন পড়বে।

জগা বলে, বড়দাও তাই। পয়সা হয়ে ভয় ঢুকেছে মনে। প্রাণের বড্ড মায়া।

শশী ঘোষ বলে, তোমাদের নগেনশশীও অমনিধারা হবে। এদিক-ওদিক চরে বেরিয়েছি তো এককালে—অনেক রকম মানুষ দেখা আছে যে যত শয়তান, সে তত ভীতু। জঙ্গল অবধি যেতে হবে না, হাত পা বেঁধে গাঙপারে ফেলে দিয়ে এলে আর কখনো পার হয়ে আসনে না। দেশ-ঘরের পানে হাঁটবে।

অনেক রাত্রি। কী ভয়ানক অন্ধকার! জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে এদিকে সেদিকে। বেরুল তারা। আগে শশী ঘোষ, পিছনে বলাই আর জগন্নাথ। মহেশ ঠাকুর এসব কিছু জানেন না, অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। পচাকেও খুলে বলে নি। একটা কিছু হবে এই মাত্র সে বুঝেছে, জগা নিজে থেকে না বললে সাহস হয় না কিছু জিজ্ঞাসা করবার। নৌকো এবারে আঘাটায় এনে চুপচাপ আছে বসে সে প্রতীক্ষায়।

পাকালোক শশী। দেহ একটু কুঁজো হয়ে পড়েছে, কিন্তু রাত্রিবেলা কাজের মুখে এখন দেবদারুর মত খাড়া। চোখের মণি দুটো জ্বলছে। বিড়ালের চোখ যেমন। নতুন-আলার কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়। ফিসফিসিয়ে বলে, দেখে এস। আজকেও তিনজন, না বাইরের আরও কেউ এসে জুটেছে। নগেন কোন পাশে, সেটাও দেখে এসে ঠাহর করে।

জগা বলে, বলাই চলে যাক। এসব ব্যাপার পাঁচকান না হয়। জানলাম আমরা এই তিনজন। আর পচা জানবে একটু পরে। যা বলাই, আমরা ওইখানে রইলাম। রাধেটাকে ডেকে নিলে হত না ঘোষ মশায়? হবে তো তিন জনে?

শশী ঘোষ অবহেলার ভাবে বলে, তিনই তো অনেক। কাজ দেখবি আমার হাতের। পচার মতন তোমাদেরও নৌকোয় বসিয়ে দিয়ে একলা চলে যেতাম। কিন্তু আনকোরা নতুন জায়গা, ঘাত-ঘোত বুঝে নেবার একটা দিনও তো ফুরসত দিলে না। তার উপর বয়সও খানিকটা হয়ে গেছে। ডান-হাতে বাঁ-হাতে সেজন্য তোমাদের দুটিকে নিয়ে যাচ্ছি।

বলাই সাঁ করে চলে গেছে আলা-ঘরের কানাচের দিকে। ছায়ার মতন একটা মানুষ বাঁধ ধরে এদিকে আসে। মাছ-মারাদের ফেরবার অনেক দেরি। ঘোঁরির কাছাকাছি

এই তল্লাটে জাল ফেলতেও কেউ আসবে না। কে তবে মানুষটা? শশী আগে দেখেছে। দেখতে পেয়ে জগার হাত ধরে টানে। একটুখানি সরে গিয়ে দুজনে গেঁয়োবনের আড়ালে দাঁড়াল। হাঁটনা দেখেই জগা আন্দাজ করেছে। অন্য কেউ নয়, বুধীশ্বর। কাছাকাছি হল মানুষটা—বুধীশ্বরই বটে। বেরিয়ে এসে জগা বলে, বিয়ের কাজে তোর বড্ড খাটনি। সারা হল যোগাড়যন্তর?

বুধীশ্বরে বলে, পনেরআনা তো ফুলতলা থেকেই যোগাড় হয়ে এসেছে। চক্কোত্তি মশায় দেখেশুনে যা দুটো-একটা এখন বলছেন, চৌধুরীগঞ্জের ওরা কামিরমারি থেকে কেনাকাটা করে এনে দেবে।

ফিক করে হেসে বলে, বরের বাড়ি তো চৌধুরিগঞ্জ হয়ে গেল। সাঁইতলা কনের বাড়ি। চৌধুরি-আলা থেকে সেজেগুজে ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে বরযাত্রী-পুরুত সঙ্গে নিয়ে বিয়ে করতে আসবে। বরপাত্তর সেইখানে গিয়ে উঠেছে।

জগন্নাথ স্তম্ভিত হয়ে বলে, নগনা এখানে নেই?

এই তো চৌধুরি-আলোয় রেখে এলাম। মেজবাবু আর চক্কোত্তি মশায় দুজনেই। কত হাঙ্গামা! আমাদের শালতি নেই, হেঁটে যায় কেমন করে—চৌধুরিগঞ্জ গিয়ে সেখানকার শালতি নিয়ে আসতে হল। ফিরে আসছি, অনিরুদ্ধ আটকে ফেলল। কুটুম্ববাড়ির লোক হলাম কিনা—না খাইয়ে ছাড়ল না।

জ্বালা-ভরা সুরে জগা বলে, এইটুকু হাঁটতে পারে না, শালতি নিয়ে আসতে হয়—পা তো একখানা খোঁড়া ছিল, আর একখানা কেউ খোঁড়া করেছে নাকি?

একগাল হেসে বুধীশ্বর বলে, বিয়ের বর হয়েছে যে! তোমারও হবে একদিন জগা। বরপাত্তর পায়ে হাঁটলে লোকে কি বলবে! চক্কোত্তি মশায়ও সেই ব্যবস্থা দিল। হেঁটে যাওয়া চলবে না। হোঁচট খেয়ে পড়লে চিত্তির। রক্তপাত হলে বিয়ের ভণ্ডুল পড়ে যাবে। এই দুটো দিন সামাল সামাল—মন্তোর কটা পড়ে গেলে তার পরে আর ভাবনা নেই।

আলায় ঢুকে গেল বুধীশ্বর। বর ও পুরুতের নির্বিঘ্নে পেঁছানোর খবর দেবে। এবং গগন একলা আছে বলে বুধীশ্বরও থাকবে হয়তো আলায়। কিন্তু বলাই যে ফেরে না—কোনখানে ডুব দিয়ে আছে বুধীশ্বরকে দেখতে পেয়ে।

শশী বলে, বলাই এসে নতুন কি বলবে? সবই তো জানা গেল।

ফিরে চলল দুজনে। জগন্নাথ গুম হয়ে আছে। তারপর বলে ওঠে, আচ্ছা ঠিক আছে—

কি বলছ?

মেয়েটাই চুরি হবে। ঐ চারুবালা। কনে না পেলে বিয়ে করবে কাকে।

এক মুহূর্ত থেকে বলে, মেয়েটা আরও বিচ্ছু। নগনা-খোঁড়াকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। এখন ভাবছে, দু-দুটো ঘেরি নগনার হাতে এসে গেলে মুলুকের মালিক হয়ে মাতব্বরি করে বেড়াবে। সেই লোভে চুপ করে গেছে। নইলে রণচণ্ডী একবার হুঙ্কার ছাড়লে বড়দার সাহস হত কাজে এগোবার?

শশী ঘোষের দোমনা ভাব: গণ্ডগোলের ব্যাপার, হয়ে দাঁড়াচ্ছে জগন্নাথ, বেটা-ছেলে চুরি আর মেয়েছেলে চুরি একরকম কথা নয়। সোমত্ত মেয়ে ঐ ভাবে জঙ্গলে ছেড়ে আসা যাবে না।

জঙ্গলে না হয়, মানবেলায় নিয়ে ছাড়ব। ফুলতলায়, না হয় একেবারে কলকাতা শহর অবধি গিয়ে।

শশী বলে, মানষেলা বেশী ভয়ের জায়গা জঙ্গলের চেয়ে। জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারের থাবা তবু হয়তো এড়ানো যায়, কিন্তু একলা সোমত্ত মেয়ে দেখে মানষেলার মানুষ হামলা দিয়ে পড়বে।

জগা বিরক্ত কণ্ঠে বলে, জান না ঘোষ মশায়, সেই জন্যে অমন কথা বলছে। এ মেয়ে আলাদা—মেয়েই তো হামলা দিয়ে বেড়ায় যত পুরুষের উপর। ফুলতলায় নিয়ে গিয়ে কিছু পয়সাকড়ি হাতে গুঁজে দেব, রেলগাড়ি চড়ে তারপরে যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক।

শশী ভেবে নেয় একটু: সিঁদকাটি চাই তবে একটা। কামরায় খিল দিয়ে শুয়ে আছে। ভিতরে ঢুকতে হবে। ঢুকে পড়ে দুয়োর খুলে দেব। দেয়াল খুঁড়ে পথ করে দাও, তার পরে তোমাদের আর কিছু দেখাতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, খোঁড়াখুঁড়ির কাজ পেরে উঠবে না তোমরা। পোক্ত হাত ছাড়া হয় না, আওয়াজ করে ফেলবে। সিঁদকাঠি যোগাড় করে দাও, আমি সব করছি। আমার নিজেরই একটা ভাল জিনিস ছিল, পয়লা নম্বরের পোলাদে গড়ানো। দারোগার ভয়ে পুকুরে ফেলে দিলাম। সে কী আজকের কথা! দারোগার অত্যাচারেই দেশভুঁই ছেড়ে জঙ্গলে এসে পড়েছি।

বলাই এসে পিছন ধরল। আলার উল্টো দিকে পগার পার হয়ে জল ভেঙে এসে বাঁধে উঠেছে। জগা বলে, সিঁদকাঠির কী করা যায় বলাই? ওদের কামরার দেয়াল ফুটো করব।

বলাই বলে, সিঁদকাঠি না-ই হল, খন্তা দিয়ে হবে। মাটির দেয়াল। হবে না ঘোষ মশায়?

কাঁচা বাদায় বন কাটতে চলেছে। ঘরও বাঁধবে সেখানে। খন্তা আছে, হেঁসো-দা আছে, কুড়াল আছে। তা ছাড়া শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য আছে লেজা কোচ ছোরা। আর ঠারেঠোরে শশী ঘোষ ভরসা দিয়েছে, দেশী বন্দুকও মিলতে পারে একটা; বন্দুক সেরে সামলে রাখা আছে বাদাবনে কোথায়। অস্ত্রের ভরা যাচ্ছে, নৌকোর খোলে রয়েছে সব।

বলাই বলে, সিঁদই বা কেন কাটতে যাবে ঘোষমশায়? কামরার কানাচে জানলা। জানলায় কাঠের গরাদ, ধারালো কিছু দিয়ে গরাদ কাটা যাবে। তুমি একবার নৌকোয় চল, যা দরকার নিজে বেছেগুছে নিয়ে এস।

তাই উচিত বটে। ওস্তাদ মানুষ শশী ঘোষ অনেকদিন বাদে কাজে নামছে। পুরানো সাকরেদ কেউ নেই, একলা হাতে সমস্ত করতে হবে। স্বচক্ষে দেখে নেওয়া ভাল। কিন্তু জগা যাবে না নৌকোয়। তার যাবার কি প্রয়োজন? এখন তার অন্য কাজ। ঐ যে কথা হল কিছু টাকাপয়সা দিতে হবে চারুবালার হাতে—সেই ব্যবস্থায় যাচ্ছে। সেদিন কুমিরমারি থেকে ফিরে এসে বান গাছের গোপন ভাণ্ডারে আবার সব রেখে এসেছে। বের করে আনবে এখন।

বলে, চলে যাও তোমরা। আমি একটা কাজ সেরে আসছি। দেরী হবে একটু। দেয়াল-খোঁড়া জানলা-কাটা—ঐ কাজগুলো করতে লাগ, তার মধ্যে এসে পড়ব। আর আমায় বাদ দিয়ে যদি না করতে চাও, নৌকোয় থেকো তা হলে।

শশীর পৌরুষে লাগে। বলে, তোমার জন্য কেন বসে থাকতে যাব, তোমারে কোন্ কর্মে লাগবে? করব তো আমিই। শুধু বলাই থাকলে হবে, হাতের কাছে এটা-ওটা এগিয়ে দেবে। মুখ বেঁধে মাল নৌকোয় এনে ফেলবার সময়টা তোমাদের

দরকার। জোয়ান-যুবোর কাজ। তার মধ্যে চলে এস।

শশী আর বলাই নৌকোয় চলল। শেষ এইখানে চারুবালার ছলাকলা। বাদাবন থেকে জন্মের মতন বিদায়। ফুলতলার ঘাটে সেই প্রথম দেখা। কোন্‌ লগ্নের দেখা গো—সাপে-নেউলে লেগে গেল একেবারে। সর্বনাশী মেয়ে শেষ পর্যন্ত জগাকে দেশান্তরী করে ছাড়ল। বন কেটে মাটি তুলে ঘেরি বানানো—এমন সাধের জায়গা ছেড়ে বয়ারখোলার যাত্রার দলে চলে যেতে হল তাকে। শোধ এত দিনে। জগারা না ই বা থাকল—কিন্তু তাদের নতুন-ঘেরিতে চারুবালাও নগেনশশীর সঙ্গে জাঁকিয়ে সংসারধর্ম করবে না, এই ভাবনায় বড্ড আরাম পাচ্ছে।

হন-হন করে জগা চলেছে। ক্ষিদে পেয়েছে বড্ড। পা টলছে ক্ষিদেয়। সাঁজবেলায় ওরা সবাই খেয়ে নিল, জগা খায় নি। খেতে ইচ্ছে হল না কিছুতে। আসন্ন শুভ-কর্মের একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া অবধি ক্ষিধে-তেষ্টা উবে গিয়েছিল। এখন সেই ব্যাপারের খানিকটা বন্দোবস্ত হয়ে যাওয়ায় ক্ষিধে চাড় দিয়ে উঠেছে। অনেক হাঙ্গামা তো এইবারে—নৌকো নিয়ে কি ভাবে কত পথ যেতে হবে, ঠিকঠিকানা নেই। খালি পেটে বোঠে যাওয়া যাবে না।

ভাতে জল ঢেলে পান্তা করা আছে। ঝাঁপ সরিয়ে ঘরে ঢুকে কলাইয়ের থালায় পান্তা নিল ঢেলে, আর খানিকটা গুড়। খেতে খেতে শান্ত হয়ে এখন ভাবে কাজটা ভাল হচ্ছে কিনা। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে কোন জয়গায়? টাকাপয়সা কি পরিমাণ দেওয়া হবে তাকে? যেমন রাগী মেয়ে, পয়সা যদি ছুঁড়ে মারে তার গায়ের উপর? ঝাঁপিয়ে পড়ে গাঙের জলে? বন্দোবস্ত সারা, কাজে লেগে গেছে দু-দুটো মানুষ। এখন জগা এমনি সমস্ত আবার ভাবছে।

মেঘে থমথম করছে আকাশ। বাতাস বন্ধ, গাছের পাতাটাও নড়ে না। মাদুরের উপর মহেশ ঠাকুর বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন। টেমি জ্বালিয়ে রেখেই ঘুম, নিভোবার কথা মনে নেই। গাঁজাটা ঠাকুর আজ বড্ড বেশী মাত্রায় টেনেছেন। কেরোসিন ফুরিয়ে দপদপ করে উঠে টেমি নিভে গেল। চুলোয় যাকগে—মাছ বেছে বেছে খেতে হবে না, আলোর কি দরকার? ভালই বরঞ্চ। আলো দেখে পাড়ার কেউ হয়তো ঢুকে পড়ল। রাধেশ্যাম হয়তো—ক্ষ্যাপা-মহেশের কল্কের প্রসাদ পাবার লোভে। এসেই বকর-বকর জুড়ে দেবে, মুশকিল তখন সামাল দিয়ে বেরুনো। ওরা এতক্ষণে কাজ অনেক দূরে এগিয়ে ফেলেছে। পাকালোক শশী ঘোষ—বয়সে বুড়ো হলে কী হবে জোয়ান-যুবাদের হার মানিয়ে দেয়। বাইরের কাজকর্ম সেরে কামরায় ঢুকতে পারছে না হয়তো তারা, জগন্নাথের পথ তাকাচ্ছে। জগা গোগ্রাসে গিলছে, পান্তা কটা শেষ করে লহমার মধ্যে বেরিয়ে পড়বে।

চমকে যায়। মানুষ যেন বাইরে। খুটখাট আওয়াজ। ঝাঁপ একটু ফাঁক করল। দেখলে কি, বিষম অন্ধকার। এমন অন্ধকার ডানহাত মুখে তুলে তুলে খাচ্ছে—সেই হাতখানা অবধি ভাল দেখা যায় না। কিন্তু ছায়ার মত মানুষটাকে দেখা যাচ্ছে। বলাই চলে এল নাকি দেরি দেখে? গণ্ডগোল মিটল কোনরকম? হয়তো বা ধরে ফেলেছে শশী ঘোষকে, খবর নিয়ে বলাই ছুটেছে।

ঝাঁপ সরিয়ে ঘরে ঢোকে মানুষটি—কী আশ্চর্য, ঝাঁপ ঠেলতে চুড়ি বাজে ঝিনঝিন করে। ভাতসুদ্ধ হাত থেমে যায় জগার—নিজেদের চালাঘরে নিঃসাড় হয়ে, একেবারে চোর হয়ে রইল।

ঘরে বসে চারুবালা বলে, আলো জ্বাল নি কেন?

বিরক্তস্বরে জগা বলে, নিবে গেছে, তেল নেই।

ও—

কী মুশকিল. চেপে বসল চারুবালা সামনে। বসে প্রশ্ন করে, খাওয়া বন্ধ করলে কেন?

হয়ে গেছে খাওয়া।

তাহলে উঠে পড়।

সে যখন হয় উঠব। কিন্তু ঘুরঘুট্টি আঁধারে এদ্দূরে এসে একলা পুরুষমানুষের ঘরে উঠে পড়লে, কেমন মেয়েছেলে তুমি?

বোঝ তবে কেমন! চারুবালা খিলখিল করে হেসে ওঠে। এমন হাসি হাসতে পারে, সেটা জানা ছিল না। হাসি এমন মিষ্টি লাগে অন্ধকারে!

হাসির রেশ মিলিয়ে যেতে বলল, গরজে পড়ে আসতে হল। নৌকো নিয়ে এসেছ, কী শলাপরামর্শ হচ্ছে তোমাদের শুনি?

জগা ঢোক গিলে বলে, না তো। নৌকো কোথায় দেখলে?

চকচকে ঝকঝকে নৌকো, ওপারে গিলেলতার ঝোপে ঢুকিয়ে রেখেছিলে। খবর জানতে কিছু বাকি নেই।

জগন্নাথ স্তম্ভিত হয়ে যায়। গোপনতা সত্ত্বেও নৌকো লোকের নজরে পড়েছে, স্ত্রীলোক চারুবালা অবধি জানাজানি হয়ে গেছে।

চারুবালা বলে, রাতদুপুরে এইবারে নৌকো এপারে নিয়ে এল। বড়-গাঙ পাড়ি দিয়ে দূর-দেশে কোথায় চলে যাবে। আমি জানি।

থমথমে আকাশ। আসন্ন ভাঁটায় অদূরে খালের জলও থমথমে হয়ে আছে! সর্বনাশ! এই রাত্রে চুপিসাড়ে পচা নৌকো বেয়ে এপারে নিয়ে এল, সেটা পর্যন্ত জেনে বসে আছে। হাত গুণতে পারে নাকি মেয়েটা? কিম্বা ডাকিনী-হাকিনী কেউ খালপারের বাদাবন থেকে চারুবালার মূর্তি ধরে এল?

চারু বলে, আমি সমস্ত জানি। আজ রাত্রে তোমরা সাঁইতলা ছেড়ে চলে যাচ্ছ। মহেশ ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছে। চিরকালের মত যাচ্ছ, আর আসবে না। কেন যাবে, তাই জিজ্ঞাসা করি। নিজের হাতে কুড়ুল মেরে গাছ কেটেছ, কোদাল মেরে ভেড়ি বেঁধেছ—এত গোছগাছ করে সমস্ত পরের হাতে তুলে দেবে, সেই জন্যে কি অত খেটেছিলে?

সর্বরক্ষে রে বাবা! পচাই ফাঁস করেছে, নিঃসংশয়ে এবারে বোঝা গেল। পচা ছাড়া কেউ নয়। চারুবালাকে তোয়াজ করে সে এখনো। কোন এক দূরের জায়গায় যাওয়া হবে, ভাঁটার মুখে নৌকো এনে এপারে রাখবে—এই অবধি জানে শুধু পচা, ভিতরের ব্যাপার কিছু জানে না। জানে না ভাগ্যি।

জগাও এবারে খানিকটা জো পেয়ে যায়ঃ ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি একলা একজন নই। যত এই মাছ-মারা দেখ, কত স্ফূর্তিতে সবাই মিলে খাটাখাটনি করল। কিন্তু থাকবার মতন রইল কোথা এ জায়গা! মানবেলা থেকে এক দল এসে পড়লে সুখের গন্ধ পেয়ে। পিছন পিছন চৌধুরিদের ভরদ্বাজ এল, নায়েব প্রমথ হালদার এল, আদালতের পেয়াদা এল। টৌনি চকোত্তি এসে আড্ডা গাড়ল মাথাভরা শয়তানী বুদ্ধি নিয়ে। পাকা রাস্তা হচ্ছে, গাড়ি-মোটর আসতে লাগবে দু-দিন পরে। গাড়ি চড়ে কত কত দূরের বাবুরা আসবে। দুটো বছর পরে আর কেউ ছাতা ছাড়া বেরুবে না এ জায়গায়, জুতো ছাড়া হাঁটবে না। রক্ষে কর বাপু, আমাদের

পোষাবে না। আমরা চললাম—দেখি, পিরথিমের মুড়ো আর কত দূরে।

চারুবালা সহসা কাতর হয়ে বলে, আমিও থাকব না। আমায় নিয়ে যাও এখান থেকে। একটা মানুষ তুমি একটু মাথা খাড়া করে চলতে। তুমিও শেষ করে দিয়ে যাচ্ছ, তবে আর কোন্ ভরসায় থাকা?

জগা অবাক হয়ে বলে, সে কি গো! উড়ে এসে জুড়ে বসলে—আমাদের খেদিয়ে দিয়ে তোমাদেরই তো দিনকাল। কিন্তু নগেনশশী যা মানুষ বড়দাকেও রেহাই দেবে না। খেদাবে—দুটো দিন আগে আর পরে।

চারুবালা বলে, দাদা বুঝেছে সেটা। সেই আপদটা বিদায় হবে বলেই তো খিয়েখাওয়া। দাদার সংসারের ভারবোঝা এখন আমি। বড় লোক হয়েছে দাদা, আগের সে দিনকাল নেই।

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। বলে, দাদা ভেবেছিল, এক ঢিলে দুই পাখি নিকেশ করবে। কিন্তু খোঁড়া নগনা অনেক বেশী সেয়ানা – সে গাছের খাবে তলারও কুড়োবে। বুঝেছে দাদা এখন। বুঝেসমঝে হাত কামড়াচ্ছে, পিছোবার উপায় নেই।

কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে আসে। বলে, ভেবেচিন্তে তোমার কাছে চলে এসেছি। তুমি উপায় করে দাও। দাদা দেশ ছেড়ে এল। নগেনের জ্বালাতন সইতে না পেরে ছলছুতোয় শেষটা আমরাও বাদাবনে পাড়ি দিলাম। সে পিছন ধরে এল। তারপরে দেখতেই পাচ্ছ সব। সহোদর বড়ভাই মাথার উপরে থেকেও নেই—দাদা আর বউ দু-জনেই আজ শত্তুর।

চারুবালার কথাবার্তায় জগা অবাক। মনে কষ্টও হচ্ছে। কায়দায় পেয়ে তবু একটা লাগসই জবাব না দিয়ে পারে না: তুমিই তো সকলের মাথায় চড়ে বেড়াও। কার ঘাড়ে কটা মাথা যে তোমার মাথার উপরে থাকতে যাবে!

ব্যঙ্গবিদ্রূপ চারুবালা কানে নেয় না। বলে, যত খুশি গালিগালাজ কর, আমি তা বলে ছাড়ব না। তক্কেতক্কে থাকব, নৌকো ছাড়বার সময় জোর করে উঠে পড়ব। এই যে রাতদুপুরে এসে তোমার ঘরে উঠে পড়লাম, ঝাঁপ চেপে ধরে পারলে ঠেকিয়ে রাখতে?

জগা বলে, যাব আমরা অজাঙ্গি জঙ্গলে। আমাদের নৌকোয় তুমি কোথায় যাবে?

তার আগে মানখেলার মধ্যে নিয়ে যে জায়গায় হোক আমায় একটু ছেড়ে দিয়ে এস। যেমন করে পারি আমাদের গাঁয়ে গিয়ে উঠব। এমনি ভাত না জোটে, দশ দুয়োরে ভাড়া ভেনে বাসন মেজে খাব। সে অনেক ভাল। এখানে এসে পড়ে কয়েদখানায় আটকে গেছি। তুমিই এক উদ্ধার করতে পার। তোমার সঙ্গে যাব আমি।

যেন আলাদা এক মানুষ—এত দিনের দেখা চারুবালা থেকে একেবারে ভিন্ন। ভিতরে কোন মতলব আছে কিনা কে জানে! প্যাঁচে ফেলার কৌশল? সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে জগা সাফ জবাব দিল, বাইরের কাউকে নৌকোয় নেওয়া যায় না। মানখেলার দিকে যাচ্ছিই নে মোটে, যাব উল্টোমুখো।

তবে কি হবে?

ছুটে চলে যাও, সাঁতার কেটে যাও। রাতবিরেত মান না, গাঙ-খালই বা মানবে কিসের ভয়ে? সাপে কাটুক, কুমিরে নিক—আমি কিছু জানি নে।

তড়াক করে জগা উঠে পড়ল। বেরিয়ে যাবে। ঘ্যানর-ঘ্যানর করে সময় যাচ্ছে,

আর অকারণে দেয়াল খুঁড়ে মরছে শশী-বলাই ওদিকে। গিয়ে তাদের সরিয়ে আনবে।

কিন্তু ঝাঁপের দুয়োর আগলে বসে চারুবালা। বলে, যাও কেমন করে দেখি। যেখানে যাও, আমি পিছন পিছন চলব।

বিষম মুশকিল, কাঁঠালের আঠার মতন লেপটে রইল। জগা কঠিন হয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে: আমি লোক খারাপ। বদনাম শোন নি আমার।

খুন করবে? তাই কর তুমি। জ্যান্ত আমায় খোঁড়া-নগনার হাতে ফেলে কিছুতে এখান থেকে যেতে দেব না।

সেই অন্ধকারে চারুবালা জগন্নাথের পা এঁটে ধরেছে। পায়ের উপর মাথা খোঁড়ে। বিনুনি বাঁধে নি কেন কে জানে, গোছায় গেরো দিয়ে ঝুঁটি করে রেখেছিল। গেরো খুলে চুল ছড়িয়ে পড়েছে দুই পায়ে। পা ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়বে জগা, কিন্তু বড্ড ধরেছে যে! বলিষ্ঠ পুরুষ, ঢলঢলে একটা মেয়ের সঙ্গে পেরে ওঠে না। কথায় ও কলহে যেমন কোনদিন পারে নি তার সঙ্গে। ডাকাতি করে মুখ বেঁধে আনতে যাচ্ছিল, সে-ই এখন হামলা দিয়ে পড়েছে তারই ঘরে, তার পায়ের উপর।

কতক্ষণ রইল এমনি। তারপর জগন্নাথ বলে, চল তোমায় আলায় রেখে আসি।

সে কণ্ঠে কী ছিল, দ্বিরুক্তি না করে চারুবালা আগে আগে উঠানে নামল উঠানের আঁধার গাঢ় নয়, নজর চলে একরকম। ঝাপসা আঁধারে, মরি-মরি, কী অপরূপ দেখায় চারুবালাকে!

জগা বলে, চল, দাঁড়িয়ে থেকো না। ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় আজকে, যাচ্ছি নে কোথাও। কাল রাত্রে—ঠিক এমনি সময়।

চারুবালা কথা বিশ্বাস করেছে। চলল নতুন-আলায়। জগন্নাথ তার পাশে পাশে। ধান গাছের ভাণ্ডার থেকে টাকাপয়সা তোলার আজ কোন দরকার নেই। শশী আর বলাইকে এবার চুপিসাড়ে ফিরিয়ে আনবে। চারুবালা টের না পায়। সিঁদ কাটা শেষ করে ফেলেছে হয়তো বা এতক্ষণ। কামরায় ঢুকেই গর্ত দেখে চারু-বালা চেঁচামেচি করবে। কাদের সেই কাজ, বুঝতে না পারে যেন কোনক্রমে। কোন দিন না টের পায়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চারুবালা বলে, তোমরা যেখানে যাচ্ছ, আমিও সেইখানে যাব। একা একা মানবেলায় থেকে কি হবে?

জগন্নাথ বলে, আমিও ভাবছি তাই। মানবেলার উল্টো দিকে যাত্রা আমাদের। নৌকো ঘুরিয়ে উজান অতদূরে যেতে হাঙ্গামা অনেক। কাজে দেরি হয়ে যাবে। অন্য লোক সব যাচ্ছে, তারাই রাগারাগি করবে।

দৃঢ় কণ্ঠে চারুবলা বলে, তাই কথা রইল কিন্তু, কোথাও আমি যাচ্ছি নে, তোমার সঙ্গে যাব।

জগা প্রীত হয়ে বলে, কেশেডাঙার চরে এবারের নতুন বসত। ভাল হবে। সুন্দর করে তুমি ঘরের ডোয়া নিকাও, ফুল-নৈবিদ্য দিয়ে লক্ষ্মীপুজো কর, গোয়াল তুলে গরুর সেবা কর।

একটুখানি হেসে বলে, কিন্তু একটা মুশকিল চারুবালা, বাঘ এসে পড়ে তোমার গরু মুখে করে নিয়ে যাবে। নিকানো ডোয়ার মাটি নোনা লেগে ঝুরঝুরে করে পড়বে। তোমার পুজোআচ্চায় বামুন পুরুত মিলবে না।

হেসে উঠে চঞ্চল সুরে চারুবালাও তেমনি জবাব দেয়, পুরুত না হলেও লক্ষ্মী-

পূজো হয়, বউ-মেয়েরা করে। ঘরের ডোয়া আমি রোজ লেপাপোঁছা করব। বাঘও কি আর থাকতে দেবে তোমরা? বন কেটে কোন্ মানুষকে বাঘ তাড়িয়ে জ্বলবে।

ঘাড় নেড়ে জগা বলে, উঁহু। বন কিছু রেখে দেব, তাতে বাঘ থাকবে। মানুষ পড়শীর চেয়ে বাঘ পড়শী ভাল। বাঘেরা পাহারা দেবে—আবার কোনদিন খোঁড়া-নগনা, গোপাল ভরদ্বাজ, প্রথম নায়েব, আদালতের চাপরাসী আর অনুকূল চৌধুরিরা ঢুকে পড়তে না পারে।

ছেচল্লিশ

চারুবালার তর সয় না। আলার মানুষ শুয়ে পড়ল। বিনিবউকে বার দুই ডেকে দেখে, সাড়াশব্দ নেই। অমনি সে টিপটিপ বেরিয়ে পড়ল। চোরের বেহদ্দ।

নৌকো কাল এপারে এনে কোন্ জায়গায় রেখেছিল, তা সে জানে। চর হল পচা, চারুবালার সে বড় অনুগত। জগার অনুমান মিথ্যা নয়, দূরদেশে যাবার গোপন খবর চারুবালাকে সে-ই এনে দিয়েছিল।

বড্ড তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। হরগোজা-ঝাড়ের পাশে ওপারের দিকে চোখ রেখে বসে আছে—কখন পচা নৌকো নিয়ে আসে। বড় জন্তু-জানোয়ার এদিকে না-ই এল, সাপ তো পায়ে পায়ে দেখা যায়। কিন্তু এখন কেবল পালানোর চিন্তা, অন্য কথা মনে আসছে না।

নৌকো ডাঙার কাছাকাছি এলে পুঁটুলি হাতে জলকাদা ভেঙে চারুবলা গলুইয়ে উঠে বসে। জলে পা ঝুলিয়ে দিয়ে কাদা ধুচ্ছে। একলা পচা। পচা হেসে বলল, ভাবলে বুঝি তোমায় ফেলে চলে যাব।

চারু বলে, হচ্ছিল তো তাই।

যাচ্ছ—টের পাবে মজা। এই যেখানে আছ, এ সব হাসিল-করা জায়গা। এর সঙ্গে কিছু মেলে না। সে হল কাঁচা-বাদা—বাঘ বুনো-শুয়োর বুনো-মোষ—

মিলবে না কেন? এখানে তেমনি নগেনশশী, আমার ভাই-ভাজও বড় কম যায় না।

ছইয়ের ভিতরে ঢুকে চারুবালা চুপচাপ বসল। তার পরে আর সকলে এসে যায়। গুণীন মহেশ আগে আগে, পিছনে শশী গোয়ালা, বলাই আর জগা।

চারুবলাকে দেখে শশী ঘোষ বড্ড খুশী: দিব্যি হয়েছে। দেখ, আমি ভুল করে-ছিলাম। মেয়েমানুষ হল রক্ষাচণ্ডী। জঙ্গলের যত পীর ঠাকুর বেশির ভাগ হলেন মেয়ে। যদি সেবারে বউকে সঙ্গে নিতাম, ছেলে কটা অমন বেঘোরে যেত না। কাঠুরে-মউল বাদায় যায়—যায় তারা, কটা দিন পরে ভরা নিয়ে চলে আসে। তাদের কথা আলাদা। বসতঘর বাঁধার যখন মতলব, মেয়েমানুষ বাদ দিয়ে হবে না।

তা যেন হল, রাধেশ্যামটা বড্ড দেরি করছে। কি হল তার? বউ মাগী ধরে ফেলেছে না কি খেরোনোর মুখে? যা দজ্জাল বউ! ভাটা হয় নি অবশ্য এখনো, জোয়ার চলছে। কিন্তু চারুবালা আগেভাগে এসে পড়েই মুশকিল করল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে বিনি-বউ দেখবে, চারু বিছানায় নেই। খোঁজ-খোঁজ পড়ে যাবে। গগন তো অনেক খবরই রাখে—বোনের খোঁজে তক্কেতক্কে এই অবধি এসে পড়বে হয়তো। হামলা দেবে নৌকোয়। আর কিছু না হোক, চেঁচামেচি হৈ-হল্লার ব্যাপার তো বটে! রাধেশ্যাম এসে পড়লেই নৌকো ছেড়ে দেবে, ভাটা অবধি দেরি করবে না। গুণ টেনে উজান বেয়ে যাবে খালের পথটুকু। করালীতে পড়ে জোয়ার মেরে উঠবে। তার পরে

দোয়ানিতে ঢুকে ভিন্ন মুখ দিয়ে বেরোবে। ধানের পালার নিচে ইঁদুরের গর্তের যেমন নানান মুখ -এক মুখে খোঁড়াখুঁড়ি লাগলে অন্য মুখে ইঁদুর ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পালায়, বাদাবনের গাঙ-খালেও অবিকল সেই গতিক।

আসে কই রাধেশ্যাম ? বলাই খানিকটা এগিয়ে দেখে আসবি নাকি ?

বলতে বলতে হরগোজা-ঝাড় বেড় দিয়ে উদয় হল রাধেশ্যামের ছায়ামূর্তি। পচা তাকিয়ে দেখে বলে, জাল আনিস নি কেন ? তোর ভরসায় আলাদা আর জালের ব্যবস্থা হয় নি।

রাধেশ্যাম বলে, আছে জাল। আরও সব আছে।

রাধেশ্যামের পিছন ধরে আসে বাচ্চা ছেলেটা। আরও কতক দূর পিছনে ফুটফাট করে কাদায় আওয়াজ তুলে আসে—অবাক কাণ্ড, অন্নদাসী। অন্নদাসীই তো! জাল আছে। রাধেশ্যাম পোঁটলপুঁটলি ঘাড়ে নিয়েছে, অন্নদাসী জাল বয়ে আনছে।

জগা অবাক হয়ে বলে, আস্ত সংসার সঙ্গে নিয়ে এলি যে!

রাধেশ্যাম আমতা-আমতা করে বলে, ছেলেটা বড্ড ন্যাওটা! ছেড়ে যাওয়া যায় না, মন হু-হু করে। আবার মা না হলে বাচ্চারই বা সামাল দেয় কে? ক্ষারে কেচে কাপড় ফর্সা করে বসে আছে, ছেড়ে এলে বউ রক্ষে রাখত!

জগা বলে, গিয়ে তো কোন্দল বাধাবি সেই জায়গায় ?

না নিলে এখনই যে লেগে যায়। পাড়া তোলপাড় হবে—জানতে কারো কিছু বাকি থাকবে না।

ঘাড় নেড়ে শশী ঘোষ খুব তারিফ করে: ভালই তো, ভালই তো। কথা-কথান্তর কি ঝগড়াঝাঁটি না হল তবে আর বসত কিসের? সে হল বনবাস। ভাল করেছে রাধে, বউ নিয়ে বুদ্ধির কাজ করেছে।

জোয়ারে নৌকো ছাড়ল। যাবে কিন্তু দক্ষিণে—বিস্তর দক্ষিণে। ভাঁটির শেষ যেখানে। কালাপানির মুখে। হালে বসেছে জগন্নাথ, উজান কেটে এগুচ্ছে। রাত্রিবেলা কাদাজলে জঙ্গলের মধ্যে গুণ টেনে কাজ নেই। দাঁড় রয়েছে চারখানা—বলাই পচা আর রাধেশ্যাম তিন জোয়ান লেগে গেছে। বুড়ো শশী স্ফূর্তির চোটে বসে বসে হাঁপায়।

রাধেশ্যাম হেসে বলে, তোমার এ কাজ নয়। কলকেটা নিয়ে এক ছিলিম জুত করে সাজ দিকি। সারা পথ তুমি তামাক খাইয়ে যাবে মুরুব্বী মশায়।

করালীতে পড়ে এইবার। হাত শক্ত করেছে জগা। হালের মুঠোয় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ ওঠে, দাঁড় কড়কড় করে। ফালুক ফুলুক কেন করে সে ছইয়ের দিকে—ছইয়ের তলে কি? দাঁড় তুলে ধরে সকৌতুকে বলাই একনজর জগার দিকে তাকায়, কথাটা জিজ্ঞাসা করলে হয়। কিন্তু মুখ খোলবার উপায় নেই। মরদমানুষের এলো-মুখের কথাবার্তা এ জায়গায় চলবে না। মেয়েলোক রয়েছে। শুধু অন্নদাসী থাকলেও হত চারুবালা রয়েছে। মানবেলার ভাল ঘরের মেয়ে—আজেবাজে কথা শুনে কি ভাববে? হয়তো বা করকর করে উঠবে এই মাঝগাঙের উপরে।

দোয়ানির মধ্যে ঢুকে পড়ে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত। আর কেউ নিশানা পাবে না। যে খালের দুটো মুখই বড়-গাঙে পড়েছে, তার নাম দোয়ানি—দুই মুখে একই সময় জোয়ার ওঠে, একই সঙ্গে ভাটা নামে। দোয়ানি বনের মধ্যে শাখাপ্রশাখা ছেড়ে যায়। কেউ তাড়া করলে কোন একটা শাখার ভিতর ঢুকে পড়, নৌকো ঠেলে দাও ঝোপঝাড়ের

মধ্যে দিয়ে, নিঃসাড় হয়ে বসে থাক যতক্ষণ না বিপদ কেটে যাচ্ছে।

দোয়ানির অন্ধিসন্ধি ঘুরে এইবারে আবার বড়-গাঙ পড়বে। সকাল হল। খাল বড় হচ্ছে ক্রমশঃ। আর সুবিধা, জোয়ার শেষ হয়ে ভাটার টান ধরেছে; উজান বেয়ে মরতে হবে না আর। আবাদ এখন দু-ধারে। মানুষজন। খালে-বেড়-জাল পেতেছে। জালের মানুষ নৌকোয় বসে গল্পগুজব করছে, তামুক খাচ্ছে। ডাঙায় দাঁড়িয়ে খেপলা-জাল ফেলছে কেউ কেউ। জলের সন্তান—কালোকালো চেহারা, বাবরি চুল। রুপোর পদক কারো গলায়, হাতে তামার কড়। সাদা মাটির বাঁধ চলে গেছে এদিক-ওদিক অজগর-সাপের মতন। মরদমানুষ মেয়েমানুষ যাচ্ছে সব বাঁধের উপর দিয়ে। মেটে-দেয়ালের ঘর একটা—দেয়ালে নুন ফুটে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়ছে। ভাঙা গাছের গোড়া—জলের তরফা খেয়ে খেয়ে কয়লার মতন কালো হয়ে গেছে। সাদা বক একটা এখানে, একটা উই ওখানে—ভাটা সরে-যাওয়া চরের উপর কুচো মাছ ধরে ধরে খাচ্ছে।

চলেছে নৌকো। পিঠেন বাতাস পেয়ে বাদাম তুলে দিল। সাঁ-সাঁ করে ছুটে চলেছে—জল ছোঁয় কি না-ছোঁয়। দাঁড় তুলে ফেলল। এই বেগের মধ্যে দাঁড় জলে পড়তে পায় না। পার হবার জন্য ঘাটে বসে জন কয়েক। খেয়া-নৌকো ডাকছে চিৎকার করে। ওপারে একজন আনমনে দড়ি পাকাচ্ছে, বাবলাগাছে দড়ির অন্য প্রান্ত বাঁধা। খেয়ার মাঝি বোধহয় ঐ লোকটাই। ডাকুক না—ভাবখানা এই। আরও মানুষ জমুক, এক খেয়ায় সকলকে তুলে আনবে।

চরের কাদা অনেকটা ভেঙে এসে তবে জল। ব্যস্তবাগীশ ক'জনে সেই কাদার মধ্যে জলের ধারে এসে চেঁচাচ্ছে। ভাল কথায় হচ্ছিল এতক্ষণ, এইবারের সুর বাঁকা। দড়ি পাকানো বন্ধ করে হাতে-বোঠে মাঝি তড়াক করে নৌকোয় উঠে কাছি খুলে দিল। অজস্র আলকাতরার টিন ভাসছে জলে, জালের মাথা ওর সঙ্গে বেঁধে ভাসিয়ে রেখেছে। বানগাছের সারি জলের কিনারা ধরে। চলেছে, নৌকো চলেছে। উঁচু বাঁধের ওদিকে বসতি—খোড়ো চালের মাথা অল্পসল্প দেখা যায়। টিনের ঘরও আছে যেন—টিনে আর খড়ে একত্র ছাওয়া। গরমে গা জ্বালা করে, সেই জন্যে কোন শৌখিন জোতদার টিনের উপরে খড় বিছিয়ে নিয়েছে।

নৌকো বড়-গাঙে পড়ল। বেলা হয়েছে বেশ খানিক। গেরে-মাঠ; মাঠ ভরতি গেরে-গুল্ম। মাঠের রং সবুজ নয়, সাদা নয়—গোলাপী। গাঙ ক্রমেই বড় হচ্ছে। এপার ঘেঁষে চলেছে, ওপার ধোঁয়া-ধোঁয়া। ঠাহর করে দেখলে অস্পষ্ট সবুজ টানা-রেখা নজরে পড়বে। ওপারে বন। মানবেলার একেবারে শেষ—কাঁচা-বাদার শুরু এখান থেকে।

অন্নদাসীর বাচ্চা ছেলে আর চারুবালা ছইয়ের ধারে উবু হয়ে বসে জল দেখছে। কুমির গা ভাসান দিয়েছে ঐ দেখ পুরানো গাছের গুঁড়ির মতন। বকবক করছে দু-জনে মৃদুকণ্ঠে। বাচ্চার সঙ্গে চারুবালার ভাব জমেছে। উনুন ধরাচ্ছে ওদিকে অন্নদাসী। পোড়া মাটির তিন ঝিকের উনুন। নৌকো দুলে দুলে যাচ্ছে দাঁড়ের টানে। হাওয়ার জন্য উনুন ধরে না—চোঙার মুখে ফুঁ দিতে দিতে দপ করে একবার যদি বা জ্বলে উঠল, নিভে গিয়ে আবার ধোঁয়ায় ধোঁয়া। গোটা দুই বস্তা ঝুলিয়ে দিল তখন ওদিক-কার হাওয়া ঠেকাবার জন্য। এমনি করে কোন গতিকে চালে-ডালে দুটো ফুটিয়ে নিতে পারলে যে হয়। বেশী গরজ বাচ্চাটার জন্য। এখন বেশ কুমির দেখছে, চেঁচানি জুড়বে হয়তো একটু পরে। ছেলেমানুষ চারুবালাও তো—ভাত নামলে হাপুস-হুপুস করে সে-ও চাট্টি খেয়ে নেবে। অন্য কেউ এখন খাচ্ছে না। টানের গাঙ, পিঠেন

বাতাস। ধনুকের তীরের মত নৌকো ছুটেছে। জলে ভাসছে না বাতাসে উড়ছে—ঠাহর হয় না। এই জল থমথমে হবে, বাতাস পড়ে যাবে—খাওয়ার কথা তার আগে নয়। তখন কোন পাশখালিতে নৌকো ঢুকিয়ে গাছগাছালির সঙ্গে কাছি করে নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে বসবে।

দাঁড়ের মচমচানি, ছলাৎছলাৎ করে জল ঘা দিচ্ছে নৌকোর তলিতে। এই রকম চলল একটানা বিকাল অবধি।

দুদিকে বন এবারে। আসল বাদাবন। ঘন সবুজ। গাছের মাথা সব এক সমান—যেন কাঁচি দিয়ে মাপসই করে গাছগুলো ছেঁটে দিয়েছে। বড় একঝাঁক পাখি বনের উপর কিচিরমিচির করছে। চরের কেওড়াগাছে বানরের হুটোপাটি—ডাল ভেঙে ভেঙে নিচে ফেলছে। হরিণের সঙ্গে বানরের বড় ভাব—হরিণের দল ডেকে আনে এমনিভাবে, কেওড়াপাতা খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু আসে না কেন একটা হরিণ? নৌকো নজরে পড়ে গেল নাকি? অথবা কাছাকাছি বোধ হয় বাঘের আনাগোনা—গন্ধ পাচ্ছে। বাঘের গন্ধ অনেক দূরে থেকে হরিণ নাকে পায়।

মানুষের এলাকা গিয়ে বাঘের এলাকা বুঝি এইবারে? ঠিক তাই। বানরের দল এখান থেকে ওখানে—ছুটোছুটি করে পালাচ্ছে। বাঘ দেখতে পেয়েছে। বাঘের আস্তানা, সেটা গাছের বানরের রকম-সকম দেখে টের পাওয়া যায়।

মহেশ তাই বলছিল, মানুষ এবারে বড় আর চোখে দেখবে না। মানুষের বসত ছেড়ে এলাম।

তিক্তকণ্ঠে জগা বলে, সেই তো ভাল ঠাকুর। বাঘের চেয়ে বেশী সাংঘাতিক হল মানুষ। মানুষে ঐ খোঁড়া নগনা, গোপাল ভরদ্বাজ, প্রমথ নায়েব। ঝাঁটা মারি মানুষের মুখে—যে ক-জন এই আমরা যাচ্ছি, মানুষে আর কাজ নেই এর ওপর।

বহুদর্শী শশী ঘোষ হেসে বলে, খানিকটা গোছগাছ করে নাও, কত মানুষ হামলা দিয়ে পড়বে দেখো। পাকা কাঁঠাল ভাঙলে মাছি গন্ধ পেয়ে আসে। মানুষও তেমনি। ঠেকাতে পারবে না।

জোয়ার আসন্ন। শেষরাত্রে আবার ভাঁটি মিলবে, সেই অবধি নৌকো বেঁধে থাকা কোন এক জায়গায়। নৌকো বেঁধে তারপরে খাওয়া-দাওয়া। খাওয়ার পরে গা গড়িয়ে পড়া। কিন্তু যত্র তত্র নৌকো বাঁধা যাবে না রাত্রিবেলা। জায়গাটা গরম অর্থাৎ ব্যাঘ্র-সঙ্কুল কিনা জেনে-বুঝে নেবে ভাল করে। একা না থোকা—যেখানে আর পাঁচখানা নৌকো, তুমিও গিয়ে চাপান দেবে সেই শাবরে। একসঙ্গে অনেক নৌকো থাকার নাম শাবর। কিন্তু শাবর পেয়েই নিশ্চিন্ত হয়ো না—অন্য সব নৌকোর মানুষ-গুলো কেমন, কাজকর্ম দেখে কথাবার্তা বলে আন্দাজ করে নাও। নিরীহ মাঝি-মাল্লা হয়ে নৌকো নিয়ে ঘুরছে, আসলে তারা হয়তো ঠগ-ডাকাত। সামাল, খুব সামাল ভাই। সমস্ত কেড়েকুড়ে নিয়ে মানুষ কটাকে চরের উপর নামিয়ে নৌকোর কাছি কেটে দিয়ে সরে পড়বে। এমন অনেক হয়েছে। দক্ষিণে, একেবারে দক্ষিণে যাচ্ছে—ভাটির প্রায় শেষ যেখানে, দরিয়ার মুখ। সেদিকে মানুষজন কালেভদ্রে কদাচিৎ যায়, শুধু জন্তু-জানোয়ার। তাদের রীতিপ্রকৃতি চেনাজানা হয়ে গেছে, তাদের সহজে সামাল দেওয়া যায়। পোড়া মানুষেরই মনের তল আজ অবধি পাওয়া গেল না।

কত খাল-দোখালা ছেড়ে যাচ্ছে। জগা বারম্বার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে মহেশ ঠাকুরের দিকে। ঘাড় নেড়ে মহেশ 'উঁহু' বলে দেয়। বাদাবন তার নখদর্পণে—

এসব খালে ঢোকা যাবে না, বিপদ আছে। ধৈর্য ধরে বেয়ে চলে যাও, ঠিক জায়গায় এসে সে বাতলে দেবে। সেই পাশখালিতে ঢুকে তিনখানা বাঁক গিয়ে বনকরের বাবুদের ছোটখাটো আস্তানা। খালের সিকি আন্দাজ জুড়ে মাচান, তার উপরে ঘর। ঐ মাচানের খুঁটির সঙ্গে নৌকো বাঁধা চলে। বন্দুক আছে বাবুদের। আছে সাদা বোট। নিঃশঙ্ক নিরাপদ এমন জায়গা কাছাকাছি রয়েছে—সেইখানে গিয়ে ওঠ। কাল কিন্তু এমন জায়গা পাবে না। জায়গার জন্য কাল থেকে হিসাবকিতাব ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন হবে। কড়া মন্তোর পড়ে নৌকোয় চাপান দিতে হবে। আজকে কোন হাঙ্গামা নেই।

পাশখালি ঢুকে হঠাৎ যা দেখা যায় দাঁড় পোতা রয়েছে। দাঁড়ের মুঠো মাটিতে, চওড়া মাথা উপর দিকে। মাঝে মাঝে এমনিধারা দেখা যায় জঙ্গলে। পোতা-দাঁড়ের মাথায় সাদা কাপড় বাঁধা, কাপড়ের এক প্রান্তে চাট্টি চাল বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে, অপর প্রান্ত বাতাসে উড়ছে নিশানের মতন। নৌকোর কোন দাঁড়ি বা মাঝি পড়েছিল এই জায়গায়। বাদাবনে মরাছাড়ার বলতে নেই, বলবে পড়েছে অমুক মাঝি, কিম্বা ভাল হয়েছে অমুক কাঠুরে। বাঘের নামও নয়—বলবে বড়-শিয়াল বড়-মিঞা ভোঁদড় বা অমনি একটা-কিছু। নৌকো বেয়ে মানুষ কাঁচা-বাদার গাঙে-খালে ঘোরে, আর আচমকা ঐরকম পোঁতা দাঁড় দেখে হায়-হায় করে মনে মনে। গাছের দোডালায় মাদুর-কাপড়-হাফপ্যান্টও দেখা যায়। খেয়েদেয়ে বাঘ হয়তো মুণ্ডটা কি আধখানা হাত উচ্ছিষ্ট ফেলে গেছে, তাই সব খুঁজেপেতে কবর দিয়ে গেছে গাছের গোড়ায়। কাদের ঘর খালি করে বাদায় এসেছিল গো, সে মানুষ আর ফিরল না।

বাইতে বাইতে হয়তো বা তোমার হাতের দাঁতের দাঁড় ভেঙে গেল মচাৎ করে। কিম্বা বেসামাল হওয়ার দরুন দাঁড় জলে পড়ে স্রোতে ভেসে গেল। বিপদের মুখে তখন কি করবে—পাড়ে নৌকো ধরে নিয়ে নাও ঐ পোঁতা দাঁড়খানা। কিন্তু একটানে উপড়ানো চাই—দাঁড় হাতে নিয়েই চক্ষের পলকে নৌকোয় উঠে পড়বে। একটানের বেশী লাগলে কিম্বা ডাঙার উপরে তিলেক দেরি হলে রক্ষে নেই। বাঘের পেটে যাবে নির্ঘাত। বনবিবি স্বয়ং যদি মূর্তি ধরে আগলে দাঁড়ান, তবু ঠেকাতে পারবেন না।

দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে। যাবে দরিয়ার মুখে—ডাঙা সেই অবধি গিয়ে শেষ। দুটো দিন দুই রাত্রে পুরো চার ভাঁটি নৌকো বেয়েছে। তিলেক জিরোয় নি।

রাত্রিবেলা বিষম কাণ্ড হঠাৎ। দানোখুটোরা বুঝি বনে হামলা দিয়ে পড়ল। এক রকমের ঘোরতর আওয়াজ—লাখখানেক জাঁতা ঘোরাচ্ছে কোনদিকে যেন। ক্ষ্যাপা-মহেশ বহুদর্শী লোক—তিনি বুঝেছেন। শশী ঘোষও জানে। দু-জনে পাল্লা দিয়ে চেঁচাচ্ছে: নৌকো লাগাও—শিগগির, শিগগির—

ভাগ্যক্রমে নৌকো তখন সরু খালে। জল অগভীর। জগা বলাই আর পচা লাফিয়ে পড়ে টেনেটুনে কাছি করল মোটা এক পশুরগাছের সঙ্গে। নৌকোর সবাই হুটোপুটি করে নেমে পড়ল। ছুটে যায় এক-একটা গাছ নিরিখ করে। বাচ্চা নিয়ে অন্নদাসীও ছোটে। এই দানোর দল সামাল দেওয়া যায় শুধুমাত্র মাটির উপরে দাঁড়িয়ে। জলের উপরে নয়, গাছের উপরে তো নয়ই। প্রাণপণ শক্তিতে গাছ এঁটে ধরে দাঁড়াল সকলে।

চক্ষের পলকে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। মড়মড় করে ডাল ভেঙে পড়ছে। পাতা উড়ছে, ডালের উপরের পাখির বাসা উড়ছে। কলরব করে পাখির দল খাল পার হয়ে জঙ্গল ছেড়ে উড়ে পালায়। বানরের দল ছুটে পালাচ্ছে মাটিতে নেমে এসে, হরিণ

পালাচ্ছে। বাঘও পালায়—

বাঘ অবশ্য নজরে এল না, নজর ফেলবার ফুরসত কোথা এখন? গাছের গুঁড়ি এঁটে ধরে আছে—কারা এসে প্রবল জোরে টান দিচ্ছে, গাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবে। টুকরো ডাল আর পাতার রাশি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে, লাগছে গায়ে চাবুকের মতন। তবু ছাড়বে না গাছের আশ্রয়। ছাড়লে তো বলের মত লোফালুফি করে হাতে পিষে পায়ে দলে মানুষ কটিকে ছুঁড়ে দেবে এদিক-সেদিক।

রক্ষা এই, হুটোপাটি বেশীক্ষণ থাকে না। পাঁচ-সাত মিনিটে শেষ। বন আবার পরম শান্ত। কিন্তু তার মধ্যে তছনছ করে দিয়ে গেল চারিদিক। বড় লড়াইয়ের পর রণক্ষেত্রের যে অবস্থা, বনের অবস্থা তেমনি। দরিয়ার ঘূর্ণি এই বস্তু—ডাঙা অঞ্চলে যে ঘূর্ণিঝড় দেখেন, তার সঙ্গে কোন মিল হয় না। বাউলে-কাঠুরে, মাঝিমাল্লারা বলে দানো-ভূতের কাজ। বঙ্গোপসাগরের কোনখানে ঘাঁটি হয়েছে। হঠাৎ একসময় হাজার হাজার লাখো লাখো দল বেঁধে এসে পড়ে অরণ্যরাজ্যে। বনের ঝুঁটি ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকিয়ে আক্রোশ মিটিয়ে আবার ফিরে যায় সমুদ্রতলের গোপন বিবরে।

পরের দিন কেশেডাঙার চর দেখা দিল বাঁকের মাথায়। সন্ধ্যার অল্প বাকি। শশী ঘোষ যথারীতি দাঁড়ে বসে, কিন্তু একটা টানও দেয় নি আজ সমস্ত দিন। তাকিয়ে আছে দূরের দিকে। এসব চেনা জায়গা তার, বড় আপন জায়গা। কতকাল এ-পথে আসে নি! দু চোখ দিয়ে যেন পান করতে করতে এসেছে এই অকূল জল আর সীমা-হীন জঙ্গল। কেশেডাঙা দেখা দিলেই উত্তেজিত হয়ে সে আঙুল দেখায়: ঐ, ঐযে আমার কেশেডাঙা। বন্দুক পুঁতে রেখে গিয়েছি চলে যাবার দিন। বিষখালির যদু কম-কারের গড়া। বিশ্বম্ভর কর্মকার ঈশ্বরীপুরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বন্দুক গড়ত, যদু হল সেই বংশের মানুষ। বিলাতী বন্দুক দাঁড়াতে পারে না দেশী-লোহায় গড়া যদুর হাতের জিনিসের কাছে। যদু মরে গেছে। কিন্তু ছেলেপুলেরা কেউ বিদ্যেটা শিখে নিল না। আর ও-জিনিস হবে না।

আবার বলে, শিখেই বা কী হত! বেশী বন্দুক মানখেলায় নিতে দেবে না, বাদাবনে চোরাগোপ্তা নিয়ে বেড়ানো। মানখেলায় এলে শতেক বায়নাক্কা, হাজার রকমের আইন। ধরতে পারলে কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে ফাটকে পুরবে। কেশেডাঙা ছেড়ে যাবার সময় মাটির নিচে পুঁততে হল আমার এমন বন্দুকটা। সে কী আর আছে এদ্দিন! নোনা মাটিতে খেয়ে লোহা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। জায়গাই খুঁজে পাব না। নতুন গাছপালা জন্মে জঙ্গল ঢেকে উঠেছে। কিম্বা জয়াল নিয়ে ভেঙেই পড়েছে হয়তো গাঙের খোলে।

ফোঁস করে শশী নিশ্বাস ফেলে। বারম্বার বন্দুকের কথা বলছে, বন্দুকের জন্যই শোক। আরও যে কত কী ফেলে গিয়েছিল—টাকাপয়সা, দৈত্যের মতন তিন-তিনটে ছেলে—এ সব কথা একটিবার মুখে আনে না।

চর জায়গা, বড় গাছপালা নেই। সাদা কাশফুল ফুটে আছে অনেক দূরের নীল বনের ঘের অবধি। কাশবন নয়, দুধসাগর—দরিয়ার বাতাস এসে এই নির্জন সাগরে ঢেউ তুলছে এক-একবার। রাত হল, আকাশে চাঁদ নেই। তবু জ্যোৎস্না হয়ে চর-ভূমিতে কাশের ফুল লুটিয়ে আছে। গাছগাছালির যে বন, তার তলদেশ ফাঁকা—নজর করে বসে থাকলে জীবজন্তুর চলাচল বোঝা যায়। কাশ বনে ভয় অনেক বেশী। জলের নিচে কুমির কামটের মতন একেবারে নিকটে অলক্ষ্যে ওৎ পেতে থাকে। কোনদিক

দিয়ে কখন যে কোন্ প্রভু লম্ফ দিয়ে ঘাড় মুচড়ে ভাঙবেন, তার কিছু ঠিকঠিকানা নেই।

ডাঙার নৌকো ধরতে যাচ্ছে, ক্ষ্যাপা-মহেশ মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে: ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই তোমাদের? এ তোমার কুমিরমারির হাটখোলা পেয়েছ, নৌকা বেঁধে নেমে পড়লেই হল! অষ্টবন্ধন না সেরে নাম দেখি কত বড় বাপের বেটা! টপ করে গালের মধ্যে কামড়ে ধরে ঘাসবনে ডুব দেবে। বুঝতেই পারবে না। বুঝবে যখন দুখানা ঠ্যাং এক সঙ্গে সজনের ডাঁটার মত কচরমচর চিবোতে লেগেছে।

কাঁচা-বাদার উপর প্রথম পা ছোঁয়ানো চাট্টিখানি কথা নয়, রীতকর্ম বিস্তর। স্নান করতে হবে সকলের আগে। গাঙের জলে ঝুপ করে পড়ে ডুব দিয়ে নাও গোটাকতক। কুমির-কামটের ভয় থাকলে ডালির উপরে বসে ঘটি ভরে মাথায় জল ঢাল। অস্নাত অশুচি অবস্থায় বাদায় পা দিলে রক্ষা নেই।

দেহবন্ধন করে নাও। গুণীন মন্তোর পড়ে ফুঁ দিয়ে দেবেন, তোমার দেহ কেউ ছুঁতে পারবে না। জন্তুজানোয়ারে পারবে না, দানোভূতোরাও নয়। বড় বড় গুণীন মাটি গরম করে দেন মন্ত্রবলে। ঐহিক মানুষ তুমি-আমি কিছু টের পাচ্ছি নে—মাটি কিন্তু আগুনের মতন তপ্ত হয়ে গেছে, বাঘে পা রাখতে পারছে না, বন ছেড়ে পালাচ্ছে। এমনি কত আছে। যথানিয়ম আটঘাট বেঁধে এগোয় না বলেই এত লোক ঘায়েল হয় ফি বছর, লোকের এত ক্ষতি-লোকসান। নইলে তিল পরিমাণ অনিষ্ট হবার কথা নয়। বাদাবন মানবেলার চেয়ে নিরাপদ।

রাতবিরেতে অতএব ডাঙায় নামা চলবে না। জলে থাকবে নৌকো। জলের মধ্যে ধবজি পুঁতে কাছি করে রাখ। সকালবেলা ডাঙার উপরে পীর-দেবতাদের বিস্তর পুজোআচ্চা। উপকরণ সব এসেছে। আগ-নৌকোয় বের করে এনে মহেশ ঠাকুর সেইসব উপকরণ পুনশ্চ মিল করে দেখছেন। কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে—মিলিয়ে দেখে তবে নিশ্চিন্ত। পাঁচ সের বাতাসা আর আড়াই সের চিনি—এই দুটো পোঁটলায় তো? শসা হলগে এক দুই তিন চার—হ্যাঁ, দশটাই হয়েছে। দুটো নারকেল, নৈবেদ্যের পাঁচ সের আতপ চাল। পাকা-কলা ছ'কুড়ি—ইস, কলা যে পেকে উঠেছে। ডাঁসা দেখে কিনতে হয়, এত পথ আসতে আসতে পেকে ওঠে। সিঁদুর পুরো দু-বাণ্ডিল তো? অনেক কাজ সিঁদুরের, কাল দেখতে পাবে। সাতটা পিদ্দিম, সাতটা জলের ভাঁড়—ঠিক আছে। ধুনুচি আছে, ধুনো এসেছে তো? বেশ, বেশ! পাঁচ গজ সাদা থান—নতুন এই থান কাপড় পরে আমি পুজোয় বসব।

আয়োজন নিখুঁত। মহেশ ভারী খুশী। যেখানটা নৌকো রেখেছে, তার কয়েক হাত দূরে জলের ধারে শরবন হঠাৎ খড়খড় করে উঠল। পুজোর জিনিসপত্র নিয়ে মহেশ ব্যস্ত ছিলেন, চমকে ওঠেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়লেন। না, সে সব কিছু নয়। বাতাস কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল—এক ঝাপটা হঠাৎ এসে পড়ায় শব্দ হল অমনি। কিন্তু শরবন এত কাছাকাছি থাকবেই বা কেন? বেহুঁশ হয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়বে এক্ষুনি—মন্তোর পড়া নৌকো অবশ্য চাপান দেওয়া থাকবে—তা হলেও অজানা জায়গায় সতর্ক বেশী হওয়া উচিত।

গলুয়ে চলে গিয়ে মহেশ গাঙ থেকে একঘটি জল তুলে মাথায় ঢেলে দিলেন। জগাকে ডাকেন: ওরে বাপ জগন্নাথ, তুই আর বলাই এক এক ঘটি ঢেলে নে। মুরগিটা কোনখানে রেখেছিস, বের কর।

বলাই আশ্চর্য হয়ে বলে, বল কি ঠাকুর, এখনই নামবে?

হ্যাঁ বাবা। ভেবে দেখলাম, নামা উচিত একটিবার। লণ্ঠন আর ম্যাচবাক্স নিয়ে নে। চট করে সামনের ওখানটায় আগুন দিয়ে আসি। চল্‌!

মুরগি লাগে বনবিবির পুজোয়। মা-কালী পাঠায় তুষ্ট, মা-বনবিবি তেমনি মুরগিতে। বনরাজ্যে সকলের বড় ঠাকরুন—বনে পা দিয়েই তাঁর পুজো। এ পুজোয় হাঙ্গামা কিছু নেই। পুরুত-বামুন মন্তোর-তন্তোর পাঁজির দিনক্ষণ কিছুই লাগে না। দুটো ফুল জোটাতে পার ভালই, নয় তো গাছের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পুজো দাও। তাতেই চলবে। একটা গাছ বেছে নিয়ে খানিকটা সিঁদুর মাখাও ডালের উপর। গাছ ঘিরে দাঁড়িয়ে বল, হেই মা বনবিবি, দোয়া লাগে, দোয়া লাগে। মুরগি জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দাও বনবিবির নামে। ব্যস, হয়ে গেল পুজো।

মুরগি ছেড়ে তারপর তারা শরবনে আগুন দিয়ে দিল। দেখতে দেখতে প্রবল আগুন। সারারাত ধরে জ্বলবে। আগুন দেখে জন্তু জানোয়ার শতেক হাত দূরে চলে যায়। একেবারে নিশ্চিন্ত। বাতাসে বিষম জোর দিয়েছে, কাঁচা ঘাসবনও উত্তাপে শুকিয়ে পুড়তে পুড়তে যাচ্ছে। ফুলকি উড়ছে এদিক-সেদিক। এখন একটা ভয়, এই আগুন ধেয়ে এসে নৌকোর উপরে ছিটকে না পড়ে। নৌকোর গলুই ধরে গেলে সর্বনাশ। রাত্রি জেগে নজর রাখার প্রয়োজন। আগুন পড়লে জল ঢেলে নিভিয়ে দেবে সঙ্গে সঙ্গে। তা রাত্রি জাগবার মানুষ রয়েছে—কী ভাবনা! শশী ঘোষ নিষ্পলক চোখ মেলে নৌকোর কাড়ালে একভাবে বসে রয়েছে। ভাত খেয়ে নিল তা-ও ঐ এক জায়গায় বসে—ঐখানে ভাত এনে দিতে হল। আর জেগে রইল ক্ষ্যাপা-মহেশ। গাঁজার দম দিয়ে কলকের মাথায় দস্তুরমত আগুনের শিখা তুলে পহরে পহরে। সে আছে গলুয়ে। গলুই আর কাড়াল—নৌকোর দুই পাহারাদার, নির্ভাবনায় ঘুমাক আর যারা রয়েছে।

সাতচল্লিশ

রাত পোহাল। পোহাতে কি চায়! শশী ঘোষ কতবার তাগিদ দিয়েছে: ঝিম ধরে আছে ক্ষ্যাপা-ঠাকুর—কাকতুলি ডাকছে, শুনতে পাও না? বনের দিক থেকে পাখির কলরব আসে বটে অল্পসল্প। শেষরাত্রের তরল জ্যোৎস্না দিনমান বলে ভুল করেছে। পাখিরা শশী ঘোষেরই সমগোত্র আর কি! শশীর তাড়নায় মহেশকে স্নান করতে হল পোয়াতি থাকতেই। নতুন থানকাপড় পরেছে, ডগমগে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছে কপালে ব্রহ্মতালুতে বুকে দু-হাতে। নৌকোর অন্য সকলেও স্নান করে পরিশুদ্ধ হয়ে নিল।

শরবন সারারাত পুড়েছে। ধিকি ধিকি জ্বলছে এখনো দূরের দিকে। ছাই ছড়ানো সমস্ত জায়গায়, ছাইয়ের নিচে আগুনও থাকতে পারে। ছাইয়ের উপর দিয়ে যাওয়া হবে না। পা পুড়ে যেতে পারে, সে এক কথা। তা ছাড়া সুখে বসত বাঁধতে যাচ্ছি, ছাই মাড়িয়ে কেন যেতে যাব?

জগন্নাথ হাল ধরেছে। পাশে দাঁড়িয়ে মহেশ নির্দেশ দিচ্ছেন ঠিক কোন্‌ জায়গায় লাগাতে হবে নৌকোর মাথা। দৃষ্টি তাঁর কেশে-ডাঙার চরেই বটে—কিন্তু মহেশ দূরবিস্তীর্ণ কাশবন দেখছেন না, সকলের অলক্ষ্য আর কোন বস্তু ঠাহর করে দেখছেন। ঘাড় নেড়ে এক এক বার আপত্তি করে ওঠেন: না, এখানেও নয়। হুকুম হল না। এগিয়ে চল জগন্নাথ, হরগোজা-ঝাড় ছাড়িয়ে ঐ ওঁর এলাকায় গিয়ে যদি হুকুম মেলে। ইনি তো দিলেন না, উনি যদি সদয় হন।

হয়গোজা-ঝাড় পার হয়ে নতুন কার এলাকা, সদয় হয়ে যিনি নৌকো বাঁধতে দেবেন —কেউ এসব প্রশ্ন করে না। সাধারণের বোঝাবার বস্তুও নয়। গুণীন-বাউলের ব্যাপার—বাদাবনের যাঁরা কাণ্ডারী। হুকুম-হাকাম যার কাছে যা নেবার, তাঁরাই নিয়ে নেবেন। বিনা তর্কে কাজ করে যাবে তোমরা শুধু।

কিন্তু খোদ গুণীনকেও বাঘে নিয়ে যায়, এমন হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। মন্দ লোকে এই নিয়ে সংশয় তোলে। বাঘে নিয়েছে ঠিকই—কিন্তু খবর নিয়ে দেখ, সেখানে গুণীনেরই দোষ। বড় রকমের গোনাহ্ ছিল। রোজার উপর অপদেবতার রাগ—মন্তর পড়ে ধুলোবাণ সর্ষেবাণ নিক্ষেপ করে সর্বক্ষণ তাদের শাসন করে বেড়ায় বলে। বেকায়দায় ফেলবার জন্য তক্কে তক্কে থাকে। রোজাও তাই বুঝে অষ্টবন্ধন সেরে তাগাতাবিজ নিয়ে তবে বাড়ির গণ্ডির বাইরে যায়। বন্ধনের কোন অঙ্গে দৈবাৎ ভুল হয়ে গেলে নির্ঘাত রোজার ঘাড় মটকাবে। এই বাদার ব্যাপারেও ঠিক তেমনি। বনের বাঘ জলের কুমির কিম্বা বায়ুবিহারী দানো-ভূতেরা মুকিয়ে থাকে। পীরঠাকুরদের যথানিয়ম দোয়া করে আসে নি হয়তো, কিম্বা মন্তোরে কিছু ছুট হয়ে গেছে—আর তখন রক্ষে রাখবে? বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবারে ঘুঘু তোমার বধি পরাণ।

ভুঁয়ের গায়ে নৌকো বেঁধে নৌকোবন্ধন সকলের গোড়ায়। মা-কালীর দোহাই পেড়ে গলা ফাটিয়ে মহেশ চড়বড় করে মন্ত্র পড়ছেন:

বাঘ তাড়িয়ে দাও মা, আমার নৌকোর ত্রিসীমানার মধ্যে না আসে। বাঘ এসে পড়ে যদি কোন রকম ক্ষতির কারণ হয়, কালী তুমি কামরূপ-কামিখ্যের মাথা খাবে।

মা কালীর এর পরে বাঘ না খেদিয়ে উপায় কি?

এদিক-সেদিক কাছাকাছি বাঘ আছে কিনা, তাও মহেশ ঠাকুর বলে দেবেন মন্ত্রের জোরে:

বাঘ আমার ডাইনে যদি থাক, ডান দিকে হাঁক ছাড়; বাঁদিকে থাকলে বাঁয়ে হাঁক দাও।

মন্ত্রপাঠের পর বাঘের সাধ্য নেই মাথাগুঁজে বোবা হয়ে থাকবে। ঠিক হাঁক ছাড়তে হবে।

দেহবন্ধন হবে প্রতি জনার—দেহ ছুঁয়ে ওরা মন্দ করতে পারবে না। উল্টো রকমে আবার বাঘের চোখ বন্ধ করার কায়দাও আছে। ধুলো-পড়া। ধুলো পড়ে বাঘের মাথায় ছুঁড়ে মার। বাঘ দৃষ্টি হারাবে, অন্ধ হয়ে গিয়ে পালাতে দিশা পাবে না। আবার নিদ্রাবতীর দোহাই পেড়ে ঘুম পাড়ানো যায় বাঘকে:

বাঘের চোখে নিদ এনে দাও মা নিদ্রাবতী। কালী আমার ডাইনে, দুর্গা আমার বাঁয়ে। কালীর সন্তান আমি—হেলা করলে টের পাবে মজা।

বনের যেখানে বাঘ থাকুক মন্ত্রের সম্মোহনে ঢলে পড়বে।

বাঘের হামলায় বুক কাঁপে যদি তারও ব্যবস্থা আছে। মুখ-বন্ধনের মন্ত্র। মাড়ি এঁটে যাবে, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে না বাছাধনের।

চালাক বাঘ থাকে, তারা মন্ত্র কাটান দিতে জানে। ডাইনে বন্ধ করলে বাঁয়ে ঘুরল। বাঁয়ে বন্ধ করলে তো ডাইনে। এদের নিয়েই বিপদ। মাটি গরমের মন্ত্র ছেড়ে দেবে তখন। যেখানে যেখানে বাঘ পা ফেলছে—মাটি নয়, যেন অগ্নিকুণ্ড। বিপন্ন বাঘ গাঙে খালে ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ের জ্বালা জুড়াবে।

মন্ত্র পড়ছে ক্ষ্যাপা-মহেশ। একেবারে ভিন্ন মানুষ এখন। ভয় করে তার সামনে

গিয়ে দাঁড়াতে। মন্তের কথা জ্বলন্ত তুবড়ির মত মুখগহ্বর থেকে যেন ছিটকে বেরোয়। অশ্লীল আর অসভ্য। মানষেলার ভদ্রমানুষ কানে আঙুল দেবে। কিন্তু মিনমিনে ভদ্রবাক্যের কতটুকু জোর। মন্তের কথায় আগুন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেন চোখের উপরে।

নৌকোর কাজ শেষ হয়ে গিয়ে এইবারে ডাঙায় নামছে। মহেশ প্রথম পা ঠেকালেন। পীর-দেবতার পুজো—একটি দুটি নন, গুণতিতে পনের। চলল সকলে গুণীন মহেশের পিছন ধরে। কোন ভয় নেই। কি গো শশী ঘোষ, তুমি করেছিলে এ সব? কক্ষনো না। কর নি বলেই তো ওদের কোপ-নজরে পড়লে। যথাসর্বস্ব গেল।

পুজোর জায়গা পছন্দ কর। গাঙ থেকে অনেকখানি দূরে—জয়াল নিয়ে ধসে না পড়ে যেন গাঙের গর্ভে। যতদিন মানুষের ঘরবসত, ঐ পুজাস্থানও থাকবে ততদিন। একটা গাছ চাই সেখানে, পুজোর মধ্যে গাছের ব্যবহার আছে। অন্য গাছপালা কেটে ঘাসবন তুলে জায়গা সাফসাফাই কর। মহেশ একটা ডাল ভেঙে নিয়ে জায়গাটুকু বেড় দিয়ে বৃত্তাকারে দাগ কেটে নিলেন। গণ্ডি। দাগের উপর দিয়ে মহেশ ঠাকুর সবেগে চক্কোর দিচ্ছেন, আর মন্ত্র পড়েন তড়বড় করে:

গণ্ডি আঁকলাম ভুঁয়ে। মৌচাকের মতন। দোনো দুধ দেও পরী আছ তোমরা তের হাজার। সবাই গণ্ডির বাইরে থাকবে। বাঘ যদি গণ্ডিতে ঢুকে উৎপাত কর তো কামরূপ কামিখ্যের মাথা খাও।

উপরে আকাশের মেঘ, আর নিচে মাটির গণ্ডি—এই হল আমার সীমানা। আশি হাজার বাঘ শুয়োর জিনপরী আর, সবাই সীমানার বাইরে থাকবে। ভিতরে এস তো দেবীর রক্ত খাও।

কালী কপালিনী, আমি তোমার ছেলে। এই গণ্ডি আঁকলাম। অন্ধকারে তুমি ঘিরে থাকবে আমায়। আর আমার এই লোকজনদের (বাঁ-হাত ঘুরিয়ে মহেশ দেখিয়ে দেয় সকলকে)। রামের মুখের এই বাক্য।

রামের ধনুক ওপারে। এপারে রামের গণ্ডি। মন্তোর না খাটে তো মহাদেবের শির যাবে।

গণ্ডি ঘেরা হল তো গণ্ডির ভিতরে পুজোর ব্যবস্থা এবারে। মেয়েরা ভোগ সাজাও। মরদেরা ঘর বাঁধ, নিশান পোঁত। বাচ্চাটাকে নামিয়ে রাখ অন্নদাসী। নির্ভাবনায় কাজ করে যাও, এই গণ্ডি পার হয়ে আসবে হেন সাধ্য বনের বাসিন্দা কারো নেই। লতাপাতা ডালপালা দিয়ে ঘর বানিয়ে ফেল ছোট ছোট। গুণতিতে সাতটা। বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এই ডান দিক দিয়েই ধর—পয়লা ঘর জগন্নাথের। পাশে মহাদেবের। ঘরের চার কোণে নিশান পুঁতে দাও চারটে করে। সেই যে গরানের লাঠির মাথায় লাল কাপড়ের নিশান বেঁধে রেখেছে। ঘরের সুমুখে পিদিম জ্বাল, বাতাসা শশা আর চাল-কলা দিয়ে ঠাকুরের ভোগ সাজিয়ে রাখ।

হয়ে গেল। পরের ঘরে মনসাঠাকরুন। ভোগ সাজাবে আগেকার মত। কিন্তু মাটির পাত্রে নয়, কলাপাতার উপর। বিধি এই রকম। বাড়তি এখানে চাই পূর্ণকুম্ভ ও আম্রপল্লব। আর নারকেল একটা। পূর্ণকুম্ভের উপর সিঁদুর দিয়ে মা-মনসার ছাঁদ এঁকে দেবে।

এর পরে ঘর নয়—মাটি তুলে একটু ভিটের মতন গাঁথা। রূপপরীর থান। রূপ কলসে ঘুরঘুর করেন তিনি, ঘরের মধ্যে ঢুকে সুস্থির হয়ে পুজো নেবার ধৈর্য নেই।

মুক্ত আকাশের নিচে বড় জোর এক লহমা থমকে দাঁড়াবেন। ফাঁকায় তাই পুজোর ব্যবস্থা। এখানেও মাটির পাত্র নয়, কলাপাতায় ভোগ।

ভিটের বাঁয়ে আবার ঘর। দুই দেবী এক ঘরে—তাই ঘর একটু বড়-সড় করতে হবে। মা-কালী আর কালীমায়া। কালীমায়া হলেন মা-কালীর বেটী। ঘরের চার কোণে লাল নিশান—ভিতরে দু-দিকে দুই দেবীর ঠাঁই। পূর্ণকুম্ভ বসাবে মুখে আম্রপল্লব দিয়ে। কালীমায়ার ঘটে সিঁদুরের নারীমূর্তি, হাতে লাঠি। মহাদেবের যে ভোগ, এঁদেরও ঠিক ঠিক তাই। কর্তার যা ভোগ, মা-মেয়ের তার চেয়ে কোন অংশে কমতি হবে না। বরঞ্চ বাতাসার পরিমাণ বেশী দেবে কালীর ভোগে। মিষ্টিটা পছন্দ করেন বোধ করি মা-জননী।

আবার ভিটে—ওড়পরীর থান। বাদাবন যোপে ওড়পরী উড়ে উড়ে বেড়ান। ভোগের বিধান অবিকল রূপপরীর মতন।

তার পরে লম্বাটে বড় আকারের ঘর। দুই দেবীর ঠাঁই একসঙ্গে এখানেও। কামাখ্যা আর বুড়ী ঠাকরুন। এই ঠাকরুনটি কে, শাস্ত্র-পুরাণে হদিস মেলে না। তবু পুজো পেয়ে আসছেন।

গাছ এইবারে। মহেশঠাকুর সেই যে গাছ রেখে দিতে বলেছিলেন। সিঁদুর লেপেছে গাছের গুঁড়িতে। গাছ আর নন এখন। রণচণ্ডীকে ভোগ দিতে হয় না, তাঁর নামে পুজো নেই।

পর পর দুটো ঘর এবারে। ঘরের চার কোণে লাল নিশান উড়ছে। প্রতি ঘর দুই কামরায় ভাগ করা। গাজি কালু দুই ভাই—দুই পীরের আসন পড়েছে প্রথম ঘরে। পরের ঘর ছাওয়ালপীর ও রণগাজির। ছাওয়ালপীর হলেন গাজির ছেলে, আর রণগাজি ভাইপো। গাজি-কালুর বিষম কেরামত বাদাবনে। বাঘ তাঁদের হুকুমের গোলাম, বাঘের সওয়ার হয়ে এ-বনে সে-বনে ছুটে বেড়ান। জঙ্গলে ঢুকে আর হিন্দু-মুসলমান নেই। যেই হও, গাজির দোহাই দেবে, পীরদের তুষ্ট করবে। পাঁচটা করে মাটির ঢেলা লাগে পীরের পুজোয়। পিদ্দিম জ্বালবে। চিনি-বাতাসা-নারকেলের ভোগ তো আছেই।

সর্বশেষ বাস্তুদেবতা। ঘর লাগবে না, ফাঁকা জায়গায় তাঁর থান। ভোগ কলা-পাতায়।

দেবতা-পীর এতগুলি পাশাপাশি—এক পুরুত যা এক ফকিরে পুজো করে যাচ্ছেন। পুজো করলেন ক্ষ্যাপা-মহেশ। মন্ত্র সংস্কৃত কিম্বা আরবী নয়, গ্রাম্য ছড়া। ফুল জোটাতে পার ভাল—নইলে বনবিবির বেলা যেমন হল, পাতালতা ছিঁড়েই পুজো। মানমেলার দেবতাগোসাঁইর মতন এঁদের অত বায়নাক্কা নেই। পুজো সেরে নির্ভাবনায় চরে বেড়াও জঙ্গলে। গাছ কাট, মৌচাক ভাঙ, আবাদ কর, ঘর বাঁধ। পুজোয় যদি ভুলচুক না হয়ে থাকে আর মনে ভক্তি-ভাব থাকে, কেউ ক্ষতি করতে পারবে না তোমার। যেখানেই থাক সাতটা দিন অন্তর কেবল এই পুজাস্থানে এসে গড় করে যেও। পীর-দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে যেও।

সাঙ্গ হতে বেলা দুপুর। নিখুঁত পুজো হয়েছে। কোন রকম বাগড়া আসে নি বনের দিক থেকে। পীর-দেবতা অতএব প্রসন্ন। মনের স্ফূর্তিতে আবার সবাই নৌকোর উপর উঠল। মিঠাজলের জায়গা দেখে এসেছে, বালি সরিয়ে জল নিয়ে এসেছে এক কলসি। নৌকোর উপর রাঁধাবাড়া এখন, নৌকোয় খাওয়া। শশী ঘোষের

আমলের ভিটে আছে, তার উপরে একখানা ঘর তুলে নেবে। সেই ক'দিন নৌকোর উপর বাস। খানিকটা গ্ৰছিয়ে আরও লোকজন আনতে যাবে। কত লোক মুখিয়ে আছে, খবর পেলে হুড়মুড় করে এসে পড়বে। বসতি জমজমাট হবে।

খাওয়াদাওয়া হতে হতে বেলা ডুবে গেল। ভালই হল—দিনের খাওয়া রাতের খাওয়া একপাকে। বারম্বার ঝামেলা করতে হবে না। অধিক রাত্রে কারো যদি ক্ষিধে পায়, পুজোর প্রসাদ রয়েছে। ভাবনা নেই।

আকাশে একটু চাঁদ দেখা দিয়েছে। সন্ধ্যা জ্বালল চারুবালা। ছইয়ের বাইরে এসে প্রদীপ হাতে ডালির উপর দাঁড়িয়ে বনের দিকে ঘুরিয়ে সন্ধ্যা দেখায়। অন্নদাসী মুখ ফুলিয়ে শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে তখন। শঙ্খ অবধি নিয়ে এসেছে চারুবালা। আচ্ছা গোছানি মেয়ে।

শশী ঘোষ বলে ওঠে, আমরা কত কাল কাটিয়ে গেছি। এসব কখনো করি নি। খেয়ালই হয় নি।

মহেশ বলেন, মেয়েলোক নইলে হয় না। নিয়ে এসেছিলে তুমি হুটকো জোয়ান কতকগুলো। গৃহস্থবাড়ির রীতকর্ম কী তারা জানে, আর কী করবে! এসেও ছিলে ঘরবসত করতে নয়, বনের ধন লুঠপাঠ করতে। মতলব খারাপ। বনও তাই তাড়িয়ে তুলল!

সমুদ্র নতুন ছেড়েছে এই জায়গাজমি। বালু আর বালু। আর কাশবন। গাছ-গাছালি দু-চারটে মাঝে মাঝে। কাঁচা বাদাবন অনতিদূরে—থাবার পর থাবা ফেলে ধীরে ধীরে সেই বন এগিয়ে আসছে। গ্রাস করবে চরের জায়গা। সে বনের জীব-জন্তুরা নির্ভাবনায় বেরিয়ে এসে সেখানে চরেফিরে বেড়ায়। সমুদ্রের হাওয়া নিশিদিন হুটোপাটি করে, কাশবনে ঢেউ ওঠে সমুদ্র-জলে ঢেউ ওঠার মতন। এবারে মানুষ এসে চাপল – বন কেটে বসত গড়বে যেসব মানুষ। পায়ের নিচে বালিমাটি, যে মাটি এক মুঠো ফসল দেয় না। সম্মুখ-পানে বনের গাছগাছালি, যে গাছ একটা খাদ্যফল দেয় না। পিছনে দিগ্‌ব্যাপ্ত নোনা জল, যে জল মুখে ঠেকানো চলবে না।

মজা জমে আছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে। বালির নিচে অমৃতের ধারা খানিকটা সরিয়ে ফেল, মিঠা জল এসে জমবে। আঁজলা ভরে তুলে খাও। খাও যত খুশি, গায়ে ছিটাও। দেহ শীতল হবে, মন আরামে ভরবে। অরণ্য নিষ্ফলা কিন্তু বন-লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভাণ্ডার ঐ অরণ্যের ভিতর। খালপথের দু-ধারে গোলঝাড়। গোল-পাতা কেটে কেটে গাদা কর, লোকে ঘর ছাইবে। দিকচিহ্নহীন পাতিবন কোন এক মোহনার উপর—পাতি কেটে চরের উপর শুকাতে দাও, লোকে মাদুর বুনবে। কাঠ কত রকমের—সুন্দরী, বান, পশুর, ধোন্দল, কেওড়া, গরান, গেঁয়ো, গর্জন, হেঁতাল, সিঁঙড়, গড়ে, কাঁকড়া, খলসি, ভাঁড়ার, করঞ্জ, হিঙে—গাছের কি অন্ত আছে! গাছ কেটে বোঝাই কর নৌকো। বড়গাঙে নিয়ে তোল পুরো দিবারাত্রে দুই জোয়ার ও সিকি ভাঁটি বেয়ে। অথবা চোত-বোশেখে মউল হয়ে মৌমাছির পিছন ধরে ছোট। চাক বেঁধেছে গাছের ডালে ডালে—মধুতে টলমল করছে, কাচের মতন রং. ধামা ভরে চাক কেটে আন, নৌকো বেয়ে হাটে নিয়ে তোল। অভাব কি তোমার! চাল-ডাল, পান-তামাক, কাপড়-চোপড় কেনো। ঐশ্বর্যের বন, শান্তির বন, আরামের বন। দায়ে পড়েই বনের বাইরে আসা; যেইমাত্র দায় চুকল, বনের ভিতর ঢুকে পড় আবার। মাছ যেমন দুটো-পাঁচটা আফালি করে পলকের ভিতর জল-তলে চলে যায়; মাছের আর নিশানা মেলে না।

বনের বাঘ, জলের কুমির, গাছের পাখপাখালি, অগন্তি আরও কত রকমের বনের বাসিন্দা—এরাই এবারে নতুন পড়শী। চেনা-জানা করে নাও পড়শীদের সঙ্গে। মানুষ পড়শী তো জেনে এলে এতকাল, এদের গতিক বোঝ এইবারে। ডালে জড়িয়ে কোথায় সাপে দোল খাচ্ছে, সবুজের এক-মিশাল—সবুজ লতাই দুলছে যেন হাওয়ায়। কাছে গিয়েছ কি টুক করে আদর করে দেবে। ছটফটিয়ে মর সেই চুম্বনের জ্বালায়।

হরিণ কাছে ডাকবে তো নিজে তুমি গাছের মাথায় চড়, গাছে চড়ে বানর হও। কু-উ-উ—বানরের ডাক ডাকবে, মানুষের গলা না বেরোয়। মানুষ বুঝলে হরিণ পালাবে। বনে এসে পড়েছ তো বনের জীব তুমি, মানবেলায় ফিরলে তখন মানুষ।

নিরিখ করে দেখ, হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে খুঝি চকচকে দুটো চোখ। মানুষের এলাকা ছেড়ে এদেরই এলাকায় তুমি এখন। একনজরে তাকিয়ে আছে। ভাব বুঝে নিচ্ছে। বাঘ বলে ভয়ের কী আছে! কাপুরুষের যম হল বাঘ, শক্তসমর্থকে বাঘ রীতিমত ডরায়। পিঠ ফিরিও না খবরদার—মুখোমুখি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। ঝোপের বাইরে এসে সামনের পা ভেঙে তখন বাঘও মুখোমুখি বসল। ডোরাকাটা হলদে দেহ—কী সুন্দর,—বিজলী-ডুরে পরে যেন সাজ করে এসেছে। অরু-রু-রু আওয়াজ করেছে, লাল ঝরছে গালের কষ বেয়ে। চোখে চোখে রেখে হাতের লাঠি দমাদম জঙ্গলে পেটাও। বাঘও ঠিক অমনি লেজের ঝাপটা দিচ্ছে মাটিতে। চেঁচাও জোরে—টগবগ করে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির মত গালি দিয়ে যাও অবিশ্রান্ত। ছেদ না পড়ে। তার যে আওয়াজ, তার দুনো তেদুনো গর্জ তোল। বাঘের মুখে পড়ে তুমিও আর এক বাঘ হয়ে গেছ। বাঘ তখন অবহেলার ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে শরবনের মধ্যে ঢুকে পড়বে, ফিরেও তাকাবে না আর তোমার পানে।

বনবিবির আদরের দুলাল বাঘ—গাজি-কালু যার পিঠে সওয়ার হয়ে বন-বনান্তরে ঘোরেন। বাঘ নইলে আবার বাদা কিসের! বাঘ মেরে সদরের কর্তাদের দেখালে মোটা বখশিশ। কিন্তু পুরোপুরি বাঘটা সেই সদর অবধি নিয়ে হাজির কে করতে পারে? বনের মানুষ তোমায় নিতে দেবে না। বাঘের যে বিস্তর গুণ! মরা বাঘের জিভটা টেনে উপড়ে নেবে তারা সকলের আগে। পেট-জোড়া প্লীহা ফুলে টামার মত হয়েছে—কণিকাপ্রমাণ জিভ কলার মধ্যে পুরে খাইয়ে দাও। আর নয় তো জিভের টুকরা শিলে বেটে হুঁকোর জলে মিশিয়ে খাওয়াও সাতটা দিন। প্লীহা শুকিয়ে মোটা পেট চিটে হয়ে যাবে। বাঘের গোঁফও অব্যর্থ ওষুধ—মানুষের নয়, গরু-ছাগলের। কয়েকগাছি গোঁফ ন্যাকড়ায় বেঁধে পায়ে ঝুলিয়ে দাও, গায়ের ও মুখের ঘা সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন। বাতে শয্যাশায়ী তো বাঘের চর্বি মালিশ কর, খোঁড়া মানুষ তড়াক করে শয্যা ছেড়ে উঠবে। বাঘের চামড়া চোখ ওঠার ওষুধ। চামড়া পুড়িয়ে হুঁকোর জলে মিশিয়ে কাদা-কাদা করে প্রলেপ দাও, চোখ সেরে যাবে। বাঘের নখ রুপোয় বাঁধিয়ে ছেলেপুলের কোমরে ধারণ করাও, আপদ-বিপদের দায় নিশ্চিন্ত। কোন রকম দোষদৃষ্টি পাবে না সেই ছেলে। বাঘও যদি লাফ দিয়ে তার ঘাড়ের উপর পড়ে, দাঁত বসাতে পারবে না।

খেয়েদেয়ে মরদ ক'জন পাছ-নৌকোয় গোল হয়ে বসেছে। পান-তামাক চলছে। বন হাসিলের কথা উঠল। সেই একবার যা নিয়ে শশী ঘোষ চেষ্টা-চরিত্র করেছিল। বনই জিতে গেল। শেষ পর্যন্ত যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে বন ছেড়ে পালাল শশী। সেই কাহিনী সে সবিস্তারে বলছিল। সেবারের ত্রুটি আর না ঘটে।

জগার কানে যেতে সে রে-রে করে ওঠে : তোমার মতন আমরা তো ঝগড়া করব না

বনে সঙ্গে। বনের বাঘ থাকবে। বাঘ না থাকলে বাবুরাই সব জুটবে এসে। শ্রীগোপ আসবে, চৌধুরি-চক্রবর্তী আর প্রমথ নায়েব আসবে। হাওয়াগাড়ি চড়ে অনুকূল চৌধুরিও আসবে পিছন ধরে। ওদের যে রীতিপ্রকৃতি, তার কাছে অনেক ভাল বনের বাঘ।

আজকে প্রথম দিনেই সেই ভাবনা মনে ঢুকেছে। বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে এসেছে কিনা জগন্নাথ! কেশেডাঙার চরে মানুষ আসে না একটি। জনমজুর মেলে না। টাকার লোভ দেখিয়ে শশী এনেছিল কয়েকজন। কিন্তু টেকে না, পালিয়ে যায়। পশুপক্ষীর জায়গা—মানুষ থাকবে তো অর্ধেক পশু হয়ে থাকতে হবে এখানে। এই-জন্য বিনি-খাজনার বন্দোবস্ত। কাশবনের চর আর চরের কিনারায় জঙ্গল উত্তরের একটা সরু খাল অবধি। সেই খাল হল ওদিকের সীমানা। জমি সাফসাফাই করবে, বাঁধ বাঁধবে, সাদা বালির নিচে উর্বর কালো মাটি আবিষ্কার করবে—এত শ্রমের পর আবার নগদ খাজনা গুণতে হলে পারবে কেন? ধরাপড়া করলে দয়াবান মালিকই বরঞ্চ সামান্য সুদে দু-দশ টাকা নগদ ছাড়াতে পারেন এই মানুষগুলোর খোরাকির জন্য।

পাঁচ বছর না হোক দশ বছর পরে, না হয় পঁচিশ বছর পরে—একদিন তো মানুষ এসে পড়বে। ঐ যে-কথা বলল—দলে দলে আসবে ভাল ভাল বড় বড় মানুষ। তখন আবার পথ দেখতে হবে আমাদের, এই যত গোড়ার মানুষ এসেছি। ভাবে জগা, আর হাসে খলখলিয়ে। মানুষই তো এক রকমের বাঘ। গোবাঘা আছে, তেমনি মানুষবাঘা। সেই কোন্ মুলুকে জন্মেছিল, মানুষ বাঘ তাড়াতে তাড়াতে কোথায় তাদের নিয়ে এসেছে! একেবারে দরিয়ার কিনারে।

বনের বাঘ মানবেলায় যায় না, মানুষবাঘাও তেমনি সহজে আসতে চায় না এই সব দুর্গম বনজঙ্গলে। সেইটে বড় বাঁচোয়া। সেইজন্য বোকাসোকা জগাদের প্রয়োজন। বন কেটে এরা বসত বানায়। পুরোপুরি বানানো হয়ে গেলে তারপরে দলকে দল বড়দরের মানুষেরা এসে পড়েন। ভাল ভাল দালান-কোঠা হয়। ভারী ভারী মহাজনী নৌকো—এবং ক্রমশ ধোঁয়াকল-স্টিমার দেখা দেয় জলে। ঝনঝন টাকাপয়সা বাজে। ভাল রাস্তাঘাট হয় জুতা-পায়ে বাবুদের চলাচলের জন্য। ঠেলা খেয়ে এরা চলে যায় আদাড়ে-আঁস্তাকুড়ে। হেজেমজে মরে কতক। গগন দাসের মত এককালের দুঃখ-সুখের সাথী কতজনে ভিড়ে যায় বড়দের সঙ্গে। আর যারা নিতান্তই জগাদের মতন, নতুন জায়গার তল্লাসে আবার তারা বেরিয়ে পড়ে।

অথই কালাপানি সামনে—একবেলার পথও নয়। জগা ভাবে: এখান থেকে তাড়া খেয়ে—আর তো ডাঙাজমি নেই, তখনকার কী উপায়? জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে? কালাপানির পারেও নাকি ডাঙা আছে, শোনা যায়। কিন্তু সাঁতরে যাওয়া যায় না। ডিঙি-নৌকোও ডুবে যায়। জাহাজ লাগে। সে হল মবলগ টাকার ব্যাপার—ধান গাছের খোলে সঞ্চয় করে-রাখা ঐ কটা টাকায় কুলায় না! ভারী ভারী ডাকাতি আর খুন-খারাবি করলে সরকার নিজ খরচায় জাহাজে করে নিয়ে যেত সেই কালাপানির পার। এখন নাকি বন্ধ হয়ে গেছে। দিনকে-দিন কী অবস্থা—সব পথে কাঁটা পড়ে গেল। ক্যাপা-মহেশের দয়ায় তো কেশেডাঙায় এসে পড়ল, কালাপানি পারের জন্য আবার একদিন কোন্ কায়দা ধরতে হবে, কে জানে?

শেষ

মানুষ গড়ার কারিগর

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট । কলিকাতা ৭০০০৭৩

উৎসর্গ

শ্রীমান মনীষী ও শ্রীমতী নন্দিতাকে

এই লেখকের

নিশিকুটুম্ব (একত্রে)
শ্রেষ্ঠ গল্প
তিনটি অবার আলো (বকুল, সাজবদল, সবুজ চিঠি)
বনকেটে বসত
ছবি আর ছবি
পথ কে রুখবে
হার মানিনি দেখ
তিন কাহিনী (শত্রু পক্ষের মেয়ে, নরবাঁধ, বনমর্মর)
সে এক দুঃস্বপ্ন ছিল
চাঁদের ওপিঠ

সেই গ্রাম সেই সব মানুষ
গল্প সমগ্র (আদি পর্ব)
ঐ (মধ্যম পর্ব)
ঐ (উত্তর পর্ব)
ঐ (প্রান্তিক পর্ব)
সংগ্রাম (ভুলি নাই, সৈনিক, বাঁশের কেল্লা)
থিয়েটার
প্রেমিক
জলজঙ্গল
চীন দেখে এলাম (একত্রে)
ভুলি নাই

সোভিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসুর রচনাবলী (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)

(উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনী)

॥ এক ॥

সে কি আজকের কথা?

মহিম বি. এ পাশ করলেন। অঙ্কে অনার্স পেয়েছেন। মহিমারঞ্জন সেন বি. এ. (হনস্)। নামের শেষে লেখে না কেউ এসব, রেওয়াজ উঠে গেছে। কিন্তু য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রি—লিখবার এক্তিয়ার আছে ষোল আনা।

গাঁয়ের ছেলে, আলতাপোল গ্রামে বাড়ি। পাশও করেছেন মফস্বল-শহর থেকে। খবর বেরুনোর পরে পাড়ার এবাড়ি ওবাড়ি থেকে পায়েসটা তালক্ষীরটা খাবার নিমন্ত্রণ আসছে। মা বললেন, এত দিনের কষ্ট সার্থক হল বাবা। কাজটাজ ধরাতে হবে এইবারে একটা। পায়েস-পিঠে খেয়ে হাসিখুশিতে যাতে চিরকাল কাটে। চাকরির যোগাড় দেখ—যেমন-তেমন চাকরি ঘি-ভাত। মাছনার সাতু ঘোষ বাপের শ্রাদ্ধে বাড়ি এসেছে, তার কাছে যা একদিন। সে যদি কিছু করে দেয়।

সাতকড়ি ঘোষ কলকাতায় থাকেন। নানা রকমের ব্যবসা, সেই সূত্রে ভাল ভাল লোকের সঙ্গে দহরম-মহরম। রোজগারও ভাল—বাপের শ্রাদ্ধের আয়োজন দেখে বোঝা যাচ্ছে। চার গ্রামের সমাজ ডেকে বলেছেন। এ ছেলে সাতু ঘোষ চেষ্টা করলে কোন একখানে কি লাগিয়ে দিতে পারবেন না? ঠিক পারবেন।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটলে মহিম একদিন গেলেন মাছনার সাতু ঘোষের কাছে। শুনে সাতু ঘোষ মহিমের পিঠে সশব্দে এক থাবা ঝেড়ে বললেন সাবাস! আমাদের গৌরব তুমি, ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছ। আমার সঙ্গে চল, আমার কাছে থাকবে। কোন চিন্তা নেই। ও মা, ও দিদিমা, ও মেজদি, দেখে যাও তোমরা। খুশিটা গেল কোথায়, একটু চা করে দিলেও তো পারে। ও, তুমি চা খাও না? তবে থাক। দেখ মা, বি. এ. পাশ করেছে এই ছেলে অনার্স নিয়ে। বিদ্যের জাহাজ। আর চেহারাটাও দেখ—রাজপুত্তুর। এক্সারসাইজ করে থাক ঠিক—ডাম্বেল, মুগুর, হরাইজেন্টাল-বার? নয়তো এমন চেহারা খোলে না। আছি আমি আরও হপ্তা দুই। কারো গোলামি করি নে, ইচ্ছাসুখে ঘুরে বেড়াব। যাবার আগে তোমায় খবর দেব। একসঙ্গে যাব দুজনে।

এতেই হল না। একদিন সকালবেলা সাতকড়ি হাঁটতে হাঁটতে নিজে চলে

এলেন আলতাপোলে। মহিমের মায়ের সঙ্গে দেখা করে প্রণাম করলেন: খুড়িমা, কাজকর্মে শহরে পড়ে থাকি। অনেকদিন পরে পিতৃধার উদ্ধারের জন্ম বাড়ি এলাম। তারপরে কেমন আছেন আপনারা সব?

মহিমের মা পিঁড়ি পেতে বসতে দিলেন। ছেলের কথা তুললেন: তুমি বাবা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ, শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। চেষ্টা করে যদি একটা কাজকর্ম করে দিতে পার।

পরশু যাচ্ছি, সেই খবরটাই দিতে এলাম। বলি, লোক পাঠিয়ে খবর দেবার কি, নিজে যাই না কেন হাঁটতে হাঁটতে। খুড়িমার পায়ের ধুলো নিয়ে সামনাসামনি কথাবার্তা বলে আসি। আপনি বোধহয় জানেন না খুড়িমা, কলকাতায় গিয়ে প্রথম আমি রঙ্গলাল কাকার বাসায় উঠি। মুখ্যু মানুষ আমি, 'ক' লিখতে কলম ভাঙে—তবু যে অমন শহর জায়গায় করে খাচ্ছি, গোড়ায় তাঁর খুব সাহায্য পেয়েছিলাম সেই জন্ম। সে কথা ভুলতে পারি নে। তিনি রান্না করতেন, আমি কলতলায় জল ধরে আনতাম, বাটনা করতাম। এনামেলের ডিসে ভাত বেড়ে খেতাম দুজনে। উঃ, আজকের কথা। মহিম তখনও পাঠশালায় যাবার মতো হয়নি। তারপরে রঙ্গলাল কাকা একটা কাঠের আড়তে ঢুকিয়ে দিলেন। তিন টাকা মাইনে আর খাওয়া। আমি লোকটা মুখ্যু হই যা-ই হই, উপকারের কথা মনে রাখি। সেই কাঠের আড়তের সঙ্গে সম্পর্ক আজও বজায় আছে, তাদের দিয়ে অনেক কাজকর্ম করাই। মহিমকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, নিজের কাছে রাখব। আমারও একজন শিক্ষিত লোকের দরকার। ব্যবসা বড় হয়ে যাচ্ছে, নানান জায়গায় ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখতে হয়। আজকালকার ব্যবসায়ে অনেক রকম ব্যাপার—বাইরের লোককে ঘাঁতঘোত কেন শেখাতে যাব? নিজের লোক পেয়ে গেলাম, ভাল হল।

একগাদা কথার তুফান বইয়ে দিয়ে, সাতু ঘোষ উঠলেন। মহিমের বিধবা বড় বোন সুধা এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, এত খাতির কি জন্তে বুঝতে পার মা?

উনি যদ্দিন বেঁচে ছিলেন, পরের জন্ম বিস্তর করে গেছেন। ওঁর কাছে সাতু ঘোষ উপকার পেয়েছিল।

সুধা হেসে বললেন, উহু। কবে ঘি খেয়েছে, সেই গন্ধ বুঝি এতকাল লেগে থাকে মা। সাতুর এক লোমস্ত ছোট বোন আছে, খুশি-খুশি করে সবাই ডাকে, সেই মেয়ে গছাবার তালে আছে। পশ্চিম-বাড়ির ছোটবউ মাছলার মেয়ে। তার কাছে সমস্ত শুনলাম। খাঁদা-নাক চ্যাপসা গড়নের মেয়ে, রং কালো—

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, সে হবে না। কিছুতে নয়। এক ছেলে আমার। তোমাদেরও একটি তাজ। টুকটুকে বউ ছাড়া ঘরে আনব না। সাতু ঘোষ যতই করুক, এ কাজ হবে না। যাক গে, এখন রা কাড়বে না কেউ। বিয়ের কথাবার্তা মুখের আগায় আনবে না। চলে যাক মহিম, কাজকর্মে লেগে পড়ুক। তার পরে শুনব।

সাতু ঘোষের সঙ্গে মহিম রওনা হয়ে গেলেন। বাপ রঙ্গলাল কলকাতায় থাকতেন। নানান ঘাটের জল খেয়ে হাইকোর্টের এক বাঙালি জজের বাড়ি স্থিতি হয়েছিল তাঁর অবশেষে। কায়েমি ভাবে থাকলেন সেখানে। অনেকগুলো বাড়ি জজসাহেবের—বাড়ি-ভাড়া আদায়, বাড়ি মেরামত, বাড়ি সম্পর্কিত মামলা-মকদ্দমা, এইগুলো প্রধান কাজ। বাড়তি ঘরোয়া কাজকর্মও ছিল, জজগিন্নি বড় ভালবাসতেন রঙ্গলালকে, তাঁর অনেক ফাইফরমাশ থাকত। রঙ্গলাল যখন দেশে আসতেন স্ত্রীর জন্য শাড়ি-সিঁদুর-আলতা কিনে দিতেন জজগিন্নি।

ছেলে হল না, বংশলোপ হয়ে যায় বলে মনে দুঃখ। অবশেষে বুড়া বয়সের ছেলে মহিম। মহিমের বয়স যখন ছয়, চাকরি ছেড়ে সাংঘাতিক অসুখ নিয়ে রঙ্গলাল আলতাপোল চলে এলেন। জ্বর, কাশি, মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত ওঠে—কেউ বলে রক্তপিত্ত, কেউ বলে যক্ষা। বছর দুই ভুগে নাবালক ছেলে এবং দুই অবিবাহিত মেয়ে রেখে তিনি চোখ বুজলেন। তারপরে সেজগিন্নি দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ছেলেকে বি. এ. অবধি পড়ালেন। বুদ্ধিমতী এবং শক্ত মেয়েমানুষ তিনি। সেইজন্যে পেরেছেন।

রঙ্গলাল সেন—যিনি বলতে গেলে কলকাতার উপর জীবন কাটিয়ে গেছেন—তাঁরই বি. এ. পাশ-করা ছেলে মহিম শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। চোখে বুঝি পলক পড়ে না।

সাতু ঘোষ বলেন, হল কি তোমার ?

এত মানুষজন যাচ্ছে কোথায় ?

সাতকড়ি অবাক হলেন। বি. এ. পাশ করল—কলকাতায় না আসুক, এতাবৎ কালের মধ্যে লোকের মুখেও শোনেনি শহর-কলকাতা কি বিরাট বস্তু!

হাসি চেপে নিয়ে বললেন, যাচ্ছে ওরা রথের মেলায়।

হাঁদারাম তবু ধরতে পারেননি। বিড়বিড় করে হিসেব করে নিয়ে বললেন, রথ এখন কোথায় ? আরও তো এক মাসের উপর বাকি।

সাতু ঘোষ বলেন, নিত্যরোজ রথের মেলা এই শহরে। বারোমাস, তিরিশ দিন।

মনে মনে হতাশ হলেন তিনি। একেবারে উৎকট পেঁয়ো—এ মানুষকে দিয়ে ব্যবসায় কাজ কতদূর হবে কে জানে।

মেসে থাকেন সাতু ঘোষ। জাঁদরেল নাম মেসের—ইম্পিরিয়াল লজ। রাস্তার উপরের ছোট একখানা ঘর সম্পূর্ণ নিয়ে সাতু ঘোষ আছেন। সেই খাস্তার দরজার উপর তাঁর নিজস্ব আলাদা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড: ঘোষ এণ্ড কোম্পানি, কণ্ট্রাক্টর্স, বিলডার্স, ব্যাঙ্কার্স, জেনারেল মার্চাণ্টর্স, অর্ডার সাপ্লায়ার্স—ছোট অক্ষরে হিজিবিজি আরও অনেক সব লেখা। যত রকম ব্যবসার কথা মানুষের মাথায় আসে, লিখতে বোধহয় বাকি নেই। সাতু বলেন, কেন লিখব না? সাইনবোর্ডের মাপ হিসাবে দাম। কথা দুটো বেশি হল কি কম হল, দামের তাতে হেরফের হয় না।

সরু একটা দরজা দিয়ে ভিতরের উঠানে ঢুকে সাতকড়ি ওদিককার দরজার চাবি খুলে ফেললেন। হাঁক দিয়ে উঠলেন: ও ঠাকুর, ফ্রেণ্ড আছে আমার একজন। পার্মানেন্ট ফ্রেণ্ড। খেয়াল রেখো।

ঘরে ঢুকে বাইরের দিককার দরজা খুললেন না। বলেন, রাতের বেলা এখন শয়নকক্ষ। দিনমানে অফিস—সেই সময় ও-দরজা খুলি। বাইরের লোকজন আসে।

চেয়ারগুলো ঠেলে ঠেলে একপাশে করছেন। একটুখানি জায়গা বেরুল। মাদুর পেতে ফেললেন মেঝের। বালিশ-চাদর কাঠের আলমারির ভিতরে থাকে, তা-ও বেরুল।

বলছেন, ঘর একেবারে পাওয়া যায় না। পাশাপাশি দুখানা ঘর হলে হয়—একটায় অফিস, একটায় বেডরুম। তোমায় বলব কি ভাই, চার বচ্ছর আজ পা লম্বা করে শুইনি। সরিয়ে ঘুরিয়ে বিস্তর দেখেছি, এর বেশি আর জায়গা বেরয় না। বাড়ি গিয়ে এদ্দিন পরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে বাঁচলাম।

মহিম সবিস্ময়ে বলেন, কিন্তু যেদিকে তাকাচ্ছি শুধুই তো বাড়ি। ভাবছি, এত ইট পেল কোথায়? তবু বলছেন, লোকের ঘর জোটে না?

লোকও যে পোকার মতন কিলবিল করছে। কত লোক ফুটপাথে পড়ে থাকে, রাত্তিরবেলা রাস্তায় বেরিয়ে দেখো। বেরতেও হবে তো মাঝে মাঝে।

খাওয়াদাওয়া সেরে পান চিবাতে চিবাতে সাতকড়ি মহিমের জায়গা দেখিয়ে দেন: আমার পাশে ঐখানে তুমি গড়িয়ে পড়। বাব্বা, ছাতি যা চওড়া—চীৎ হয়ে শুলে তো পাকা দু-হাত ভুঁই লেগে যাবে তোমার। মুশকিল! টেবিলটা আরও একটু ঠেলে দাও দিকি। কাজকর্ম সেরে শুতেশুতে ক-ঘণ্টাই

যা বাকি থাকে। কত লোকে তো বলে বলেই ছুলোয়। সেই রকম মনে করে নাও। তারপরে মা গন্ধেশ্বরী আর বাবা গণেশের কৃপায় ব্যবসায়ে উন্নতি হয় তো তখন দু-পাশে দুই পাশবালিশ নিয়ে গদিয়ান হয়ে শোব। কি বল?

সাইনবোর্ডে ভারি ভারি কাজকারবারের নাম দেখে মহিম ভেবেছিলেন না জানি কত বড় ব্যাপার। শোওয়ার গতিক দেখে বুঝে গেলেন। শুয়ে শুয়ে যতক্ষণ ঘুম না আসে, অনেক কথা শুনলেন ব্যবসা সম্পর্কে। হাতেগাঁটে একটি পয়সা এবং পেটে এককোঁটা বিদ্যে না নিয়ে শুধুমাত্র অধ্যবসায়ের জোরে সাতু ঘোষ এতদূর গড়ে তুলেছেন। আশা পর্বতপ্রমাণ বলেই সাইনবোর্ডে বড় বড় কাজের ফিরিস্তি। একদিন ঐ সমস্ত করবেন নিশ্চয়ই, সাইনবোর্ডের লেখা ষোল আনা সত্য হবে। মহিমের মতো শিক্ষিত আপনার লোক পাবার পরে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেছেন। আপন লোকের এই জন্য দরকার যে ব্যবসায়ের গুহ্যকথা মরে গেলেও বাইরে চাউর হবে না। কলকাতা শহর হল চালিয়াতের জায়গা—খদ্দের চালিয়াত, ব্যবসাদার চালিয়াত, দালাল-মহাজন সবাই চালিয়াত। ভিতরের অবস্থা যা-ই হোক, লম্বা লম্বা বচন ছাড়ে—ওর থেকে খোলা বাদ দিয়ে সারটুকু বুঝে নিতে হয়। সেই খোলার পরিমাণ সাড়ে-পনের আনাই কোন কোন ক্ষেত্রে।

আলো-নেবানো অন্ধকার ঘর বলে সাতু ঘোষ দেখতে পেলেন না, শহরের মানুষের রকম শুনে মহিমের মুখ আমসি পারা হয়ে গেছে। কী সর্বনাশ, সকলের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে বেড়াতে হবে? মিথ্যাচার অহরহ?

সাতকড়ি বলে যাচ্ছেন, পাড়াগাঁয়ের মানুষ তুমি। গোড়ায় গোড়ায় অসুবিধা লাগবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। একদিন আমারই উপর দিয়ে চলবে, এই বলে রাখলাম। শহরের জলের গুণ আছে। ঘুমোও এখন তুমি, সকালবেলা কাজে নিয়ে যাব।

সকালবেলা সাতু ঘোষের সঙ্গে মহিম কাজ-দেখতে বেরলেন। কাঠের আড়তে গেলেন, সাতু ঘোষের সর্বপ্রথম চাকরি যেখানে।

অনেক দিন তো ছিলাম না, বাক্সগুলো কদ্দুর?

প্রায় হয়ে গেছে! এই মাসের ভিতর ডেলিভারি দেব।

খুব খাতির দেখা গেল সাতুর। যাওয়া মাত্র সিগারেট এনে দিল, চায়ের ফরমাস হয়ে গেল। দারোয়ান সঙ্গে করে পিছন দিকে নিমগাছতলায় গেলেন। চৌকো সাইজের পাইপের মতন জিনিসটা—কাঠ দিয়ে বানানো। পনের-বিশ

হাত লম্বা—ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে অক্লেশে এদিক-ওদিক করা যায়। বাক্স হল এর নাম?

বাক্সই বলে। সুন্দরবন অঞ্চলে সাহেবের আবাদের অর্ডার। বাঁধ বেঁধে নদীর নোনাজল ঠেকায়—সেই বাঁধের মাঝে মাঝে বাক্স বসিয়ে দেয় এই রকম। আবাদের খোলে জল বেশি হয়ে গেলে দরকার মতো বের করে দেওয়া চলে। কিন্তু নদীর নোনাজল এক ফোঁটাও ভিতরে ঢুকবে না, বাক্সের মুখ আটকে যাবে জলের চাপে।

হঠাৎ এক টুকরো কাঠ তুলে দিয়ে সাতকড়ি গরম হয়ে বলেন, এটা কি হচ্ছে, সেগুন লাগাতে কে বলল? এই রকম বর্মা-সেগুন?

হেঁ-হেঁ করে হাত কচলাচ্ছে—লোকটা আড়তের মালিকই বোধ হয়। বলল, সেগুন কাঠের বাক্স বলে অর্ডার—তাই ভাবলাম, অন্তত বাক্সর বাইরের মুখটায় দু-চার টুকরো সেগুন থাকা ভাল।

সাতকড়ি বলেন, ভাবাভাবির তো আপনার কিছু নেই মশাই। অর্ডার সেগুনের তো হবেই। নয়তো দাম বাড়বে কিসে? আপনাকে জারুল দিতে বলা হয়েছে, তাই দেবেন। থাকবে বাঁধের নিচে, সেখানে জারুল কি সেগুন কে দেখতে যাচ্ছে?

জারুল কাঠেরই হল তা আগাগোড়া। বাক্সের মুখটা বাইরে থাকছে—সেইজন্যে ভয় হল, কি জানি, কাঠের কারচুপি সাহেবের যদি নজরে পড়ে যায়।

ভয়ের কিছু নেই। বলতে বলতে এবারে সাতু হেসে বললেন: সাহেবের নজর পড়বে না, তার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে। কেউ আঙুল দিয়ে দেখাবে—এইটে সেগুন এইটে জারুল, তবেই তো নজর পড়বে। কেউ তা করতে যাবে না, সব মুখে ছিপি-আঁটা। কেউ পনের কেউ বিশ—যে মুখের যে রকম খোল। দামী কাঠকুটো সরিয়ে ফেলুন মশায়, মিস্তিরি ভুল করে হয়তো বা লাগিয়ে বসল দু-একখানা।

সেখান থেকে নিয়ে চললেন, ওঁদের বন্দোবস্তে একটা বাড়ি বানানো হচ্ছে সেই জায়গায়। ট্রামে চলেছেন। বেজার মুখে সাতকড়ি বলেন, এইরকম ভিড় ঠেলে কাজকর্ম হয় নাকি? একদিন জুড়িগাড়ি হাঁকাব দেখ না। কোচোয়ান জুতো ঠুকে ঘণ্টা বাজিয়ে পথের লোক সরাবে। গাড়ি থামলে উর্দি-পরা সহিস দোর খুলে দেবে পিছন থেকে নেমে এসে। তাড়াতাড়ি কাজকর্মগুলো শিখে নাও, সোজাসুজি আমরা কনট্রাক্ট ধরব।

ব্যবসায় হালচাল মুখে মুখে কিছু শুনিয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় কোম্পানি

আছে, তাদের অনেক টাকা, বিস্তর তোড়জোড়—বড় কন্ট্রাক্ট তারাই বাগিয়ে নেয়। নিয়ে তারপর সাব-কন্ট্রাক্ট দিল আর একজনকে। কিছুই না করে ফুড়ুতি মেরে কিছু পয়সাকড়ি বের করে নিল। সাব-কন্ট্রাক্টরেরও নিজে করতে বয়ে গেছে। কাজ ভাগ ভাগ করে একে খানিকটা ওকে খানিকটা দিয়ে দেয়। আমার ঘোষ কোম্পানি হল এরও দু-তিন ধাপ নিচে, আমার নিচে আর নেই। রস আগে থেকে সব চুমুক মেরে নিয়েছে—আমার হলগে, কাজকর্ম নিজে দেখাশুনো করে শিটে নিংড়ে যদি কিছু বের করতে পারি। ভাঁড়ে মা-ভবানী যে—খালি হাতে কত আর খেল দেখাব? তবে এ দশা থাকবে না বেশিদিন। পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে—কায়দা শিখে গেছি, তোড়জোড় করে ধরে নেওয়ার ওয়াস্তা।

একদিন খুব রাত করে ফিরলেন সাতু ঘোষ। মহিম খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছেন। সাতকড়ি ফিসফিসিয়ে ডাকেন, শোন। ঘুমিয়ে পড়লে এর মধ্যে? উঠতে হবে, কাজ আছে।

মহিম ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সাতকড়ি বলেন, নতুন রাস্তার যে চারতলা বাড়িটা হচ্ছে, সেইখানে চলে যাও। মোড়ের কাছে লরী দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভারের পাশে উঠে বোসোগে। এই চাবি নাও গুদোমের। তোমায় কিছু করতে হবে না। লরীতে কুলিরা আছে, যা করবার তারাই সব করবে।

যন্ত্রচালিতের মতো মহিম হাত পেতে চাবি নিলেন। লরী গেল নতুন রাস্তায়। ঠিক রাস্তার উপর নয়, পাশে আধ-অন্ধকার গলিতে। ড্রাইভার নেমে গিয়ে বড় রাস্তায় সতর্কভাবে ঘোরাঘুরি করছে। হঠাৎ একবার এসে ফিসফিসিয়ে বলে, খুলুন এইবারে গুদোম। তাড়াতাড়ি। খুব তাড়াতাড়ি।

গুদামের দরজা গলিতেই। চাবি খুলে ফেলে বস্তা বস্তা সিমেন্ট লরীতে তুলে ফেলেছে। আঁটি আঁটি লোহার রড। গা কাঁপে মহিমের। সাদা কথায় এর নাম চুরি। আজকের আমদানি এইসব মাল। দিনমানে এই লরীতেই বয়ে এনে হিসাবপত্র করে তুলেছে, রাত্রিবেলা সরিয়ে দিচ্ছে। সাতু ঘোষ নিজে না এসে তাঁকে পাঠালেন। ধরে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে জেল। লেখাপড়া শিখে শেষটা সাতু ঘোষের চুরির কারবারে এসে ভিড়লেন। এ কাজে থাকলে আজ না হোক কাল জেল আছে অদৃষ্টে। চালাক মানুষ সাতকড়ি—তিনি নিজে এগোন না, পর-অপর দিয়ে সারেন। মরতে হয় তো মর তোমরা, উনি সাফা থেকে যাবেন। সাংঘাতিক মানুষ!

ঘণ্টা তিনেক পরে লরী আবার মহিমকে মোড়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে গেল, যেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মেসে কলকাতায় গিয়ে টোকা দিলেন। শুধু টোকা দেবার কথা, কড়া নাড়তে মানা করেছেন সাতকড়ি। জেগে বসে আছেন তিনি, দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। মহিমের বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছিল, ধড়ে প্রাণ এল এতক্ষণে। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে বাঁচলেন।

সাতকড়ি বলেন, হয়ে গেল সব? মাল পৌঁছে গেছে বর্মণ মশায়ের ঘরে?

মহিম বললে, পিতৃপুণ্যে বেঁচে এসেছি দাদা।

সাতু ঘোষ হাসেন: ভয় পেয়ে গেছ। মফস্বলের মানুষ কিনা! ব্যবসার মধ্যে ঢুকে যাও ভাল করে, তখন আর এসব থাকবে না।

কিছু উত্তেজিত হয়ে মহিম বলেন, ব্যবসা কি বলছেন—এ তো চুরি! স্পষ্টাস্পষ্টি চুরির ব্যাপার। আইন সদরে মফস্বলে এক। ধরতে পারলে জেলে নিয়ে পুরবে।

ধরতে পারবে না। সেইটে জেনে বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ কর। ব্যবসাই হল তো এই।

দেখুন, অনেষ্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি—সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সাচ্চাপথে কাজ করে যান, আপনি উন্নতি হবে।

ক্ষণকাল অবাক হয়ে সাতু ঘোষ মহিমের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

এই সেরেছে! ওই সমস্ত পড়ে এসেছ বুঝি বইতে? মাথার মধ্যে গজগজ করছে। ভুলে যাও, ভুলে যাও। নয়তো কিছু করতে পারবে না জীবনে। ওসব এগজামিন পাশ করতে লাগে, সাংসারিক কাজকর্মে পদে পদে বাগড়া দেবে। মন থেকে ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেল।

মহিম সোজাসুজি প্রশ্ন করেন, আমায় কি এই কাজের জন্যে নিয়ে এলেন দাদা?

দায়ে-বেদায়ে করতে হবে বইকি! কনট্রাক্টরি লাইনে নতুন আসছি, এখন যেখানে জল পড়বে সেইখানে ছাতা মেলে ধরতে হবে। আমি এই করব তুমি ওই করবে—ভাগ করে বসে থাকলে হবে না। জমিয়ে নিই একবার, তখন ফাইল সাজিয়ে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বোসো। দরদাম ঠিক করে বর্মণের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে এসেছি—পাঁচ টন মাটি আর বারো হন্দর বস্ত রাতের ভিতরে পৌঁছে যাবে। সকালে এই মালই হয়তো অন্য কোথাও সাপ্লাই দেবে বর্মণ।

হেসে হেসে বললেন, হয়তো আমাদেরই কাছে। অকালবেলা আমাদেরই গুদোমে আবার এসে উঠবে।

দেখুন বড্ড ভয় করছিল আমার—

সাতু ঘোষ উদার ভাবে বললেন, গোড়ায় গোড়ায় করবে এইরকম। আমাদেরই কি করত না? কিন্তু যে বিয়ের যে মন্তোর। লুকলুকানি থাকলে কাজ হবে কি করে।

মহিম বলেন, জানেন না দাদা। দুটো কনেস্টবল পাহারা দিচ্ছিল নতুন রাস্তায় ঐ জায়গাটায়।

অনেক বাড়ি উঠছে ঐ তল্লাটে। একটা কথা উঠেছে, যাতে নাকি গুদোমের মাল পাচার হয়ে যায়। বাড়ির মালিকের বড্ড সন্দেহ-বাতিক, পুলিশে তদ্বির করে বাড়তি কনেস্টবলের ব্যবস্থা হয়েছে ওদিকটা। কিন্তু কনেস্টবলে যদি মাল ঠেকানো যেত!

মহিম বলেন, টহল দিতে দিতে কনস্টেবলরা অন্য দিকে চলে গেল, তাই। ড্রাইভার এসে বলল, এই ফাঁকে—

অন্য দিকে গেল তো! যাবেই।

মানে?

নয়তো ফাঁক বুঝে তোমরা মাল সরাবে কেমন করে? ভাল লোক ওরা। অবস্থা বিবেচনা করে সরে পড়ল।

মহিম ভেবে দেখছেন, সেই রকমই বটে। কিন্তু সিমেন্ট পাচার হয়ে গেল তো গাঁথনি হবে কিসে?

যা আছে তাই দিয়ে হবে। কাল থেকে দশটা বালিতে একটা সিমেন্ট দেবে। তোমায় বলা রইল।

তিনটের একটা দেবার কথা। সেই স্পেসিফিকেশনে কাজ হয়ে আসছে। বাড়িওয়ালার তরফে এতদিন ওভারশিয়ার ছিল, তার মাথার উপরে পাশ-করা ইঞ্জিনিয়ার বসিয়েছে একজন। কাজকর্ম ভাল করে বুঝে নেবার জন্য।

সাতু ঘোষ বিরস মুখে বলেন, সেই তো বিপদ। খরচ বেড়ে যাচ্ছে আমাদের। ওভারশিয়ারের পঁচিশ টাকা বরাদ্দ তো ইঞ্জিনিয়ারের পজিশন বড়—তাঁর হবে একশ টাকা। তার মানে আরও মাল সরাতে হবে। লোকের পর লোক এনে মাথায় বসাচ্ছে—এর পরে তো শুধু-বালির গাঁথনি দিয়েও পোষানো যাবে না।

মাস দুয়েক কাটল। আর পারেন না মহিম। লেখাপড়া শেখা এইজন্ত ? কলেজের ছাত্র ছিলেন চারু-দা—অনেক দিন ধরেই নাম টেনে যাচ্ছেন কলেজে। মহিমরা গাঁয়ের ইস্কুলে পড়তেন তখন। গ্রীষ্মের ছুটি আর পূজোর ছুটিতে চারু-দা আলতাপোল আসতেন বাইরে থেকে একরাশ নতুন আলো নিয়ে। দুপুরবেলা গোপন ক্লাস করতেন চারু-দা। দেশ-বিদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, স্বামী বিবেকানন্দের বই—এই সমস্ত পড়া হত। আলোচনাও হত অনেক রকম। চরিত্র গঠনের কথা, সাধু সত্যনিষ্ঠ ও আত্মত্যাগী হবার কথা, দেশের প্রয়োজনে প্রাণ-বিসর্জনের সঙ্কল্প। শরীর-চর্চাও হত খুব। সেই অভ্যাসটা কলকাতা আসার আগে পর্যন্ত মহিম বজায় রেখেছেন—এমন সুঠাম দেহখানি সেইজন্ত। চারু-দা মুখে যা বলতেন, দেখা গেল, নিজের জীবনে ঠিক তাই করলেন। গুলিতে প্রাণ দিলেন তিনি।

সামান্ত মানুষ মহিম অত দূর না পারুক—সাতু ঘোষের সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে আসে তাঁর। রীতিমতো পাপচক্র। যারা রক্ষক, তারাই ভক্ষক। লক্ষ্য করেছেন, কারসাজির সময়টা উপরের কর্তাব্যক্তিরা চট করে একদিকে সরে পড়ে, মুখের উপরে মৃদু হাসি খেলে যায় কেমন। কেউ ভাল নয় এ দলের। উপরে নিচে একটি সৎমানুষ নেই।

মহিম বলেন, পেরে উঠছিনে দাদা। আমায় অব্যাহতি দিন।

সাতকড়ি হেসে সান্ত্বনা দেন : পারবে, পারবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন ? দু-মাসে হল না, কুছ পরোয়া নেই—লাগুক না দু-বছর।

তাতেও হবে না। আপনি অন্ত লোক দেখে নিন।

সে লোক পাব কোথায় ? এইসব গুহ্য ব্যাপারে বাইরে প্রকাশ হলে সর্বনাশ। নয়তো তোমায় এত করে বলছি কেন ? খাঁটি কথা বল দিকি। পোষাচ্ছে না, মাইনে-বৃদ্ধি চাই ?

কাজই করব না। মাইনের কথা কাজ করলে তবে তো।

সাতু ঘোষ দরাজ ভাবে বললেন, পাঁচ টাকা মাইনে বাড়াচ্ছি আসছে মাস থেকে। মাইনে তো রইলই—মন দিয়ে কাজকর্ম কর, কারবারের এক আনা বখরা দিয়ে দেব ওর উপর। বুঝে দেখ ঠাণ্ডা মাথায়। কারবার কত বড় হতে চলল। তোমার এক আনা অংশে কম-সে-কম বছরে পাঁচ হাজার উঠতে পারে। মহিম চুপ করে আছেন।

কি ঠিক করলে বল।

আমায় মাপ করুন। টাকার জন্ত মনুষ্যত্ব বেচতে পারিনে।

এ সমস্ত অনেককাল আগেকার কথা। নতুন বয়স মহিমের। পাটপাটি বলে ফেলে সোয়াস্তি বোধ করলেন।

সাতকড়ি শুনে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। ঘাড় নেড়ে বললেন, হুঁ, পিছনে লোক লেগেছে। তা মনুষ্যত্ব বজায় রেখে কোন কর্ম করা হবে শুনি?

ঠিক কিছু হয়নি। রমেন আমাদের সঙ্গে পড়ত, করপোরেশনে ঢুকেছে। তার শ্বশুর হলেন লাইসেন্স-অফিসার। চেষ্টাচরিত্র করে লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর একটা হয়তো হয়ে যেতে পারে।

সাতু ঘোষ তারিফ করে ওঠেন: ভাল চাকরি। করপোরেশনের নিয়ম হল —চাকরি একটা দিয়ে ছেড়ে দিল, তারপরে তুমি চরে খাওগে। কিন্তু মনুষ্যত্ব যে ডুবড়ে যাবে ভাই। দোকানদারদের প্যাঁচে ফেললে তবেই তারা পয়সা বের করে। এক বস্তা সিমেন্ট লরীতে তুলতেই তোমার মাথা ঘোরে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্যাঁচ কষতে পারবে কি?

ব্যঙ্গের সুরে বলেন, পারবে না, উপোস করে মরবে। ইস্কুল-মাস্টারি হল তোমার কাজ—মানুষ গড়ার মহাব্রত। বারো বছর যে কাজ করলে গাধা হয়ে যায়। তোমার অতদিন লাগবে না, এখনই অর্ধেক হয়ে আছ। নইলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে কেউ এমন!

পরবর্তীকালে মহিম আশ্চর্য হয়ে ভেবেছেন এইসব কথা। যেন দৈববাণী। একটা তৃতীয় নেত্র ছিল সাতু ঘোষের। ব্যবসা বিষম জাঁকিয়ে তুললেন দু-পাঁচ বছরের ভিতরে। আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া বলে, তা নয়—উনি শালগাছ। আর মহিমারঞ্জন সেন বি. এ. মানুষ তৈরির মহাব্রত নিলেন ভারতী ইনস্টিটুশনের শিক্ষক হয়ে।

॥ দুই ॥

প্রভাতকুমার পালিত স্বনামধন্য ব্যক্তি। ভাল লেখাপড়া শিখেছেন। পাবলিক প্রসিকিউটার, বাইরের প্র্যাকটিশও ভাল। তাছাড়া খুব নাম-করা বনেদি বংশের সন্তান, জমিদারির আয়ও নিতান্ত হেলা-ফেলার নয়। প্র্যাকটিসের ফাঁকে ফাঁকে ইদানীং আবার দশের কাজও করছেন। খবরের কাগজে নাম ওঠে হামেশাই। বহুকাল পূর্বে একদা তিনিও শিশু ছিলেন। তখন নাকি মহিমের স্বর্গীয় পিতৃদেব বজলাল এ-বি-সি পড়িয়েছিলেন তাঁকে দিনকতক। গল্পটা শোনা ছিল মায়ের

কাছে। মা গর্বভরে বলতেন, ওই যে প্রভাত পালিতের নাম শোন, উনি মাস্টার ছিলেন তার, ওঁর কাছে পড়েছে। কে জানে কতদিন ধরে পড়িয়েছেন, কি দরের মাস্টার ছিলেন রঙ্গলাল। মা তার সঠিক হিসাব দিতে পারেন না।

সাতু ঘোষের কাজ ছেড়ে দিয়ে মহিম সেই মেসেই পুরো মেম্বার হয়ে আছেন। এবং সাতু ঘোষ ইতিমধ্যে জোড়া ঘর পেয়ে ঘোষ এণ্ড কোম্পানি তুলে নিয়ে গেছেন মেস থেকে। রমেন ও তার অফিসার শ্বশুরের পিছনে ঘোরাঘুরি করে বিশেষ কোন আশা পাওয়া যায় না। কলকাতা শহর হঠাৎ যেন অকূল সমুদ্র হয়ে দাঁড়াল। সেই সমুদ্রের মধ্যে প্রভাত পালিতমশায় অনেক দূর-থেকে-দেখা আলোকস্তম্ভ। ঐ আশ্রয়ে উঠতে পারলে হয়তো সুরাহা হবে একটা।

যা থাকে কপালে—মহিম সাহস করে একদিন ঢুকে পড়লেন পালিতের সুবিশাল কম্পাউণ্ডের ভিতরে। ড্রইংরুমের বাইরে বেঞ্চির উপরে বসে থাকেন। ক'দিন এসে এসে বসছেন এমনি। পাঁচুলালবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। দাড়িওয়ালা কালো চেহারার মাঝ-বয়সি মানুষটা—পোর্টকমিশনার অফিসে চাকরি করেন, বাকি সময় পালিত-বাড়ি পড়ে থাকেন। খাওয়া-দাওয়াও এখানে। শনিবারে শনিবারে দেশের বাড়ি গিয়ে বউ-ছেলেপুলে দেখে আসেন। কমিশনার সাহেবকে বলে প্রভাতই তাঁর চাকরি করে দিয়েছেন। প্রভাতের পরিবারের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী তিনি। অতি-দূর একটু আত্মীয়তাও আছে বুঝি। প্রভাতের নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ হয় না—বাড়ির দেখাশুনার ভার পাঁচুলালের উপর অনেকটা। দেখাশুনা আর কি—মেয়েপুরুষ ছেলেবুড়ো সকলকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে যাওয়া। এই একমাত্র কাজ তাঁর।

পাঁচুলাল কোনদিকে যাচ্ছিলেন, ঘুরে এসে মহিমের কাছে দাঁড়ালেন : কী বাপু, কি দরকার বল দিকি তোমার? ক'দিনই দেখছি বসে বসে থাক।

মহিম তখন পরিচয় দিলেন : বাবা মারা গেলেন, আট বছর বয়স আমার তখন। মা'র মুখে শোনা কথা, সত্যি-মিথ্যে জানি নে। মিথ্যে যদিও হয়, কাজকর্ম একটা করে দিতে হবে। নইলে শহরে থাকা হয় না। দেশে ফেরত গিয়ে কি খাব, তা জানি নে। আমার পড়াতে আর দিদির বিয়ে দিতে দেনা হয়ে গেছে অনেক।

সরল কথাবার্তা পাঁচুলালের খুব ভাল লাগল, করুণা হল মহিমের উপর। প্রভাতকে গিয়ে বললেন, রঙ্গলাল সেন বলে কারো কাছে পড়েছেন আপনি?

রঙ্গলাল···রঙ্গলাল···হাঁ, মনে পড়ে গেল প্রভাতের। রঙ্গলালই নাম ছিল বটে। কি চায় তাঁর ছেলে? তা বেশ, মামলাটা নিয়ে এ ক'দিন তো বড্ড

কাছেলো—সোমবারে নয়, মঙ্গলেও নয়, বুধবারে আসতে বলে দিল।

বুধবারে মহিম এল।. ভোরবেলা থেকে বসে আছে। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় আটটা—সেই সময় টের পেল, সাহেব এইবার নিচে এসে বসেছেন। তার পরে কত মানুষ এল, কতজনে দেখা করতে গেল ভিতরে, কথাবার্তা সেরে-ফিরে চলে গেল। মহিম বসেই আছেন। স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রথমে মহিম—নেমে আসবার অনেক আগে। প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে, এইবার বেয়ারা বুঝি তাঁর স্লিপ হাতে করে আসে—তাঁর ডাক পড়েছে। টং করে ঘড়িতে সাড়ে-ন'টা বাজে, আর প্রভাত ফের দোতলায় উঠে গেলেন। বসে বসে মহিম সমস্ত বুঝতে পারছেন। বেয়ারা এসে বলে, চলে যান বাবু, আজকে আর হবে না।

পরের দিন এলেন। এসে অমনি বসে আছেন। পাঁচুলাল দেখতে পেলেন: ও, দেখা হয়নি বুঝি? বড্ড কাজের চাপ কিনা! আচ্ছা, আমি বলব আর একবার।

ক'দিন চলল এমনি। বসে বসে মহিম ফিরে চলে যান। একদিন বেয়ারার কথা শুনলেন না, চলে যেতে বলল তবু বসে আছেন একভাবে। প্রভাতের মোটর বেরিয়ে যাচ্ছে—পিছনের সিটে প্রভাত, পাশে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা এক ভদ্রলোক। সামনে ড্রাইভারের পাশে আর একজন অমনি। দারোয়ান গেট খুলে গাড়ি বেরনোর রাস্তা করে দিচ্ছে। মহিম সেইখানে ছুটে এসে মোটরে মুখ ঢোকালেন।

মুহূর্তে এক কাণ্ড হতে যাচ্ছিল। প্রভাতের পাশের লোক এবং সামনের সিটের লোক পাঞ্জাবির নিচে থেকে দুই রিভলবার বের করে তাক করল মহিমের দিকে। হয়ে যায় আর কি! অনেকগুলো স্বদেশি মামলা চলছে তখন আদালতে। আগেও কয়েকটা হয়ে গেছে। প্রভাত পালিত সরকারের পক্ষে। একজনের ফাঁসি হয়েছে ইতিপূর্বে, কয়েকজনের দ্বীপান্তর। পাবলিক প্রসিকিউটার আশু বিশ্বাসকে আদালতের প্রাঙ্গণে গুলি করল, সেই থেকে সরকারি নানা সতর্ক ব্যবস্থা। সামাল হয়ে চলাফেরা করেন এঁরা, সাদা পোশাকে সশস্ত্র পুলিশ সর্বদা আগুপিছু থাকে।

চাকরি করা হয়ে যাচ্ছিল এখনই মহিমের। প্রভাত 'উহু' বলে মানা করে উঠলেন। অস্ত্র দুটো তখনই আবার পাঞ্জাবির নিচে চলে গেল। শামুক-যেমন পলকের মধ্যে খোলের ভিতর মুখ ঢুকিয়ে নেয়। মুহূর্তে আবার নিরীহ দুটি ভদ্রলোক প্রভাত পালিতের পাশে এবং সামনে।

প্রভাত লক্ষ্য করেছেন, ছেলেটা দিনের পর দিন এসে বসে থাকে।

পাঁচুলালের কাছে শুনে আন্দাজে চিনে নিয়েছেন মহিমকে। বললেন, তুমি তো ঘনশ্যামবাবুর ছেলে? চাকরির যা বাজার, বুঝতে পারছ। সোমবারে এস। দেখা যাক কি করতে পারি।

নিজের মুখে দিন বলে দিলেন। মহিমের কথা প্রভাত তবে একটু মনে নিয়েছেন। আহা, বেচারির প্রাণটা যাচ্ছিল—অন্নের জন্য রক্ষা হয়েছে। গেট থেকে বেরিয়ে মোটর চলতে আরম্ভ করেছে। প্রভাত ভাবছেন, সত্যিই কিছু করা যায় কিনা ছেলেটার সম্বন্ধে। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের প্রেসিডেন্ট তিনি। একটা চিঠি হয়তো লেখা যায় হেডমাস্টারকে। মস্ত বড় ইস্কুল—কলকাতার সেরা ইস্কুলগুলোর একটি।

মুখ বাড়িয়ে ইশারায় মহিমকে কাছে ডাকলেন: সোমবারে সন্ধ্যাবেলায় এস তুমি—

পাঁচুলাল যে ঘরটায় থাকেন, মহিম সেখানে গেলেন। পাঁচুলাল ব্যাপার শুনেছেন, তিনি বকে উঠলেন: একেবারে গেঁয়ো তুমি—ছি-ছি, অত বড় লোকের কাছে অমনি ভাবে ধেয়ে যায় কখনো।

বেকুবি হয়েছে সেটা এখন বুঝতে পারছেন মহিম। লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করলেন।

কিছু নরম হয়ে পাঁচুলাল জিজ্ঞাসা করেন, কি বললেন উনি?

সোমবার সন্ধ্যায় আসতে বলেছেন। চেষ্টা করে দেখবেন।

পাঁচুলাল বললেন, ছুটে গিয়ে তবে তো ভালোই হয়েছে দেখছি। চেষ্টা করবেন বলেছেন তো? তার মানে হয়ে গেছে। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোওগে এখন। গবর্নমেন্টে বিষম খাতির—এক কথায় এক্ষুনি রাইটার্স বিল্ডিং-এর যে কোন চেয়ারে বসিয়ে দিতে পারেন। কিংবা অন্য কোথাও। ভারি ক্ষমতা। আর, ও-মানুষ বাজে কথা বলবেন না কখনো।

পাঁচুলালের পাঁচখানা মুখ হলেও প্রভাতের গুণ-ব্যাখ্যান শেষ হত না। বলেন, কী দরের মানুষ—কোন সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা! তার মধ্যেও দেখ, ছেলেবয়সে কে-একজন কি-একটু পড়িয়েছিলেন তাঁর কথা মনে রেখেছেন। কত শ্রদ্ধা সেই প্রথম মাস্টারের উপর! গুণ না থাকলে এমনি এমনি মানুষ বড় হয়!

মহিম ঘাড় নাড়েন। বিষম বদনাম প্রভাত পালিতের। ইংরেজের পা-চাটা, বাবা স্বদেশি করে তাদের তিনি চিরশত্রু। মহিম যখন কলেজে পড়তেন, ছেলেরা থুথু ফেলত তাঁর নামে। কাগজে প্রবন্ধ লিখে বিপ্লবীদের তিনি গালি

পারেন—দেশের সর্বনাশ করছে নাকি তারা ইংরেজি শেখিয়ে দিয়ে। ইংরেজের অনেক গুণ—লোকের ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ হয়েছে তাদের শাসন-গুণে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তারা চলে যায়, তাসের ঘরের মতো শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে-চুরে পড়বে।

এই সঙ্গে পূর্ণকান্ত মাস্টারমশায়ের নাম মনে পড়ে মহিমের। মহিম তাঁর প্রিয় ছাত্র। আলতাপোল থেকে ক্রোশ তিনেক দূরে ঘোষগাতি গ্রামে বাড়ি। সে আমলে আলতাপোলে মাস্টারি করবার সময় পূর্ণবাবু শনিবারে-শনিবারে বাড়ি চলে যেতেন, সোমবার ফিরতেন। আজ তাঁর কী দুর্গতি! সংসার বলতে দুই মেয়ে—রানী আর লীলা। রানীর তুলনা ছিল না, বুড়া বাপকে চোখে হারাত। তার কাছে থাকতেন পূর্ণবাবু। কিন্তু ভাগ্য খারাপ—রানী মারা গেল, জামাই বিয়ে করল আবার। তখন পূর্ণবাবু ছোট মেয়ে লীলার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠলেন। লীলার অল্পদিন বিয়ে হয়েছে, জামাইটা কিছু করে না। শাশুড়ি মুখ বেজার করেন সর্বদা, বেহাইয়ের সঙ্গে ভাল করে দুটো কথাও বলেন না। কিন্তু উপায় কি—বুড়ো বয়সে আশ্রয় চাই একটা। সামান্য সঞ্চয় ভেঙে হাটবাজার করে ওদের মনে রাখেন। আর চুপচাপ পড়ে থাকেন বাইরের ঘরে।

ক্লাসে তখন একটা বই পড়ানো হত—ইংল্যাণ্ডস ওয়ার্কস্ ইন ইণ্ডিয়া। য়ুনিভার্সিটি থেকে বের করেছিল বইটা, ইতিহাসের মাস্টার পূর্ণকান্ত পড়াতেন। প্রভাত পালিত যা সমস্ত বলে থাকেন, অবিকল তাই—ইংরেজদের গুণের ফিরিস্তি বইয়ে ঠাসা। তার ভিতরের একটা অধ্যায় ভাল করে পড়িয়ে সংক্ষেপে করে লিখিয়ে দিয়ে পূর্ণবাবু বলতেন, মুখস্থ করে রাখ বাপসকল। ভাল নম্বর পাবে। কিন্তু একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না। বাজে কথা, সমস্ত ধাপ্পা।

প্রভাতের ঠিক উল্টো। তিনি মুখেই শুধু বলেন না, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। নয়তো উদ্যোগ করে কাগজে প্রবন্ধ ছাপতে যাবেন কেন? বাইরের এমন প্র্যাকটিশ সত্ত্বেও সরকারের মাইনে খেয়ে স্বদেশি ছেলের পিছনে লাগেন কেন এমন করে? এক-একটা মামলা নিয়ে এমন পরিশ্রম করেন, যেন একটি আসামীকে লটকে দিতে পারলে চতুর্বর্গ লাভ হবে তাঁর জীবনে! সর্বসাধারণ এইজন্যে তাঁর সম্বন্ধে যে সব বিশেষণ ছাড়ে, শুনে কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু আজকে মহিম একটা নতুন দিক দেখতে পেলেন। দুর্দান্ত ক্ষমতাবান পুরুষ—নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস ও বিচারের উপর অটল আস্থা। যা তিনি বিশ্বাস করেন, গলা ফাটিয়ে দশের মধ্যে প্রকাশ করতে ভয় পান না প্রতিপক্ষ জীবন বিপন্ন জেনেও।

মহিম বললেন; উনি আমায় সোমবার সন্ধ্যেবেলা আসতে বলছেন।

পাঁচুলাল বললেন, এস ভাই।

তারিখটা একটু বদলিয়ে রবিবার করা যায় না? আমার বড় সুবিধা হয়। একটা টুইশানি পেয়েছি—টালিগঞ্জে নতুন যে রাস্তা বেরুচ্ছে সেইখানে। অনেকটা দূর। নতুন জায়গা বলে কামাই করতে ভয় লাগে। টুইশানিটা চলে গেলে মেসের খরচ চালাতে পারব না। রবিবার হলে কোন অসুবিধা হত না।

পাঁচুলাল বললেন, রবিবারে আসবে কি। ওদিন সাহেব বাড়ি থাকেন না।

তাহলে শনিবার সন্ধ্যেয়। শনিবারে ইস্কুল দুটোয় ছুটি হয়ে যায়। ছাত্রকে বলে রাখব, দুপুরবেলা পড়িয়ে আসব ও দিন। কথাটা শুনবে বোধহয়।

সতীশ টাইপিস্ট। পাঁচুলাল একটা চিঠি টাইপ করতে দিয়েছিলেন, সেটা হাতে করে সে এল। সতীশ বলে, শনিবারে কোর্টের পর সাহেব বেরিয়ে যান, আসেন সোমবার সকালবেলা। এসেই কাজকর্মে লেগে পড়েন।

বড়লোকের ব্যাপারে মাথা গলানো উচিত নয়। কিন্তু যতই হোক, মহিম পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন—না ভেবেচিন্তে ফস করে প্রশ্ন করে বসেন, কোথায় যান তিনি?

প্রশ্নটা সতীশকে। কিন্তু সে শুনতে পায় না। টাইপ-করা চিঠিটা পাঁচুলালের হাতে দিয়ে চোখে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে তাড়াতাড়ি সে বেরিয়ে গেল।

পাঁচুলাল চটে গিয়ে বললেন, সে খোঁজে তোমার দরকার কি শুনি? তোমার কাজের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে? সন্ধ্যেবেলা না পেরে ওঠ তো এলই না মোটে। জোরজার কিছু নেই।

বেকুব হয়ে গিয়ে মহিম বললেন; আজ্ঞে না। আসব বই কি। জীবনে ভুলব না আপনাদের দয়া।

কপাল খুলল অবশেষে। প্রভাত সোমবারে সন্ধ্যার পর মহিম আর সতীশকে একসঙ্গে ভিতরে ডাকলেন। বললেন, ভারতী ইনস্টিট্যুশন জান? চিঠি দিয়ে দিচ্ছি হেডমাস্টারকে। মাস্টারের যদি এখন দরকার থাকে, তোমায় কয়েকটা দিন পরীক্ষা করে দেখবেন। দেখ, শিক্ষাবৃত্তির মতো পুণ্যকর্ম নেই। দেশের কাজও বটে। দেশের ভাবী নাগরিকদের উপযুক্ত রূপে গড়ে তোলা—এর চেয়ে দায়িত্বের ব্যাপার আর কি হতে পারে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বল, মিনিস্টার বল, এমন কি গবর্নর বল, শিক্ষকের মতো সম্মান কারো নয়। গোখলে মাস্টার

ছিলেন, বিদ্যাসাগরও তো সংস্কৃত কলেজের মাস্টার। আমার ছেলে-মেয়েদের আমি মাঝে মাঝে পড়িয়ে থাকি। বড় ভাল লাগে। কিন্তু কি করব—অবসর পাইনে মোটে।

ভাল মেজাজে ছিলেন। ভূমিকাটুকু শেষ করে সতীশকে বললেন, নাও—

বলে যাচ্ছেন, সতীশ নোটবই বের করে শর্টহ্যাণ্ডে নিয়ে নিল। প্রভাত বললেন, টাইপ করে আন, সই করে দিচ্ছি। চিঠি নিয়ে কাল হেডমাস্টারের কাছে চলে যাবে তুমি। দেখ, কি হয়।

বলে মামলার ফাইল খুলে মাথা নিচু করে বসলেন। অর্থাৎ কাজ চুকেছে, বেরিয়ে পড় এবার। চিঠি নিয়ে মহিম বেরিয়ে যাচ্ছেন, এই সময় পাঁচুলালের সঙ্গে দেখা: বাঃ রে, আমায় দেখালে না?

খাম খুলে একবার নজর বুলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পাঁচুলাল বলেন, কপাল বটে তোমার ছোকরা! আর, সাহেব মানুষটা কি রকম তা-ও বুঝে দেখ। এক কথায় চাকরি।

মহিম বিরস মুখে বললেন, চাকরি আর হল কোথায়? ওঁদের মাস্টারের দরকার থাকে, তবে তো! শুধুমাত্র পরীক্ষা করে দেখতে লিখেছেন—তা-ও তো দু-চার দিনের জন্য।

হো-হো করে হেসে উঠলেন পাঁচুলাল: দিয়েই দেখই না এ চিঠি। খোদ প্রেসিডেন্ট লিখছেন, মাস্টারের দরকার নেই কি রকম! পড়ানোর পরীক্ষা করতে বলছেন—খবর চলে আসবে, এমন মাস্টার ভূ-ভারতে কখনো জন্মেনি। দু-চার দিন কি, যাবৎ চন্দ্রসূর্য এই মাস্টার রাখবে তারা ইস্কুলে। বলি, হেড-মাস্টারের একটা আখের নেই? তিনিও চান, দশ-বিশ টাকা মাইনে বাড়ুক, বুড়ো হয়েছেন বলে ঝটপট তাড়িয়ে না দেয় তাঁকে। চলে যাও ড্যাং-ড্যাং করে, গিয়ে দেখগে কী ব্যাপার।

অনেক রাত্রি অবধি মহিমের ঘুম আসে না। সাতু ঘোষ ব্যঙ্গ করে যা-ই বলুন, বড় কাজ করবার সুযোগ এই চাকরিতে। চারুদাকে মনে পড়ল। সর্বত্যাগী সেই তরুণ দাদার উদ্দেশ্যে মনে মনে বলেছেন, বড় গরিব আমরা। একরাশ ধারদেনা করে মা আমার মুখ চেয়ে আছেন। অন্ধের যষ্টির মতন আমি। তোমাদের পথ নিতে পারলাম না চারু-দা। কিন্তু দশটা মানুষ তোমরা চলে গিয়ে থাক তো ঠিক তোমাদেরই মতন দু-শ জন আমি তৈরী করে পাঠাব। এই আমার ব্রত। সূর্যবাবুর কাছে পড়েছেন চারু-দাও। যত্ন করে পড়ানোর পদ্ধ

ক্লাসের বই বন্ধ করে ফেলা ঃ যা [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। ইস্কুলের মাস্টার সূর্যবাবু—এমনি সব মাস্টার ইস্কুলে থাকতে ইংরেজ শাই গাণিরে পুলিশ দিয়ে ছেলে ঠেঙিয়ে কি করবে ? পারে তো ইস্কুল-কলেজগুলো তুলে দিক, মাস্টার-প্রফেসারগুলো আটক করুক।

॥ তিন ॥

ভারতী ইনস্টিটুশন বনেদি ইস্কুল। বয়সে অতি প্রবীণ। সুবর্ণজয়ন্তী হয়ে গেছে ও-বছর। ইস্কুলের যখন জন্ম, চতুর্দিকে পতিত জলাভূমি জঙ্গল কাঁচা-নর্দমা এ অঞ্চলে মানুষও ছিল কত সামান্ত ! অত জায়গাজমি তাই ইস্কুলবাড়ির এখনকার দিনে ওর সিকির সিকি পরিমাণ জমি নিতে হলে আক্কেলগুড়ুম হয়ে যাবে। এক-একটা বাড়ি আছে, তিন-চার পুরুষ ধরে পড়ছে এই ভারতী-ইস্কুলে। পিতামহ পিতা পুত্র—এমন কি প্রপিতামহ কোন কোন ক্ষেত্রে। দিকপাল অনেকে শৈশবকালে ছাত্র ছিলেন এখানকার। মাস্টারমশায়রা সেইসব কৃতী ছাত্রের নাম করে পাশাপাশি নতুন ইস্কুলগুলোকে ভুয়ো দেন। ইস্কুলের বার্ষিক রিপোর্টে ওই বাঁধা গৎ ছাপা হয়ে আসছে একাদিক্রমে বিশ-পঁচিশ বছর ধরে।

প্রভাত পালিতের চিঠি নিয়ে মহিম ইস্কুলে ঢুকলেন। বড় সকাল-সকাল এসে পড়েছেন, ইস্কুল বসবার দেরি আছে। ছেলে কত রে বাবা, আসছে তো আসছেই। একতলা দোতলা তেতলা বোঝাই হয়ে গেল। আরও আসছে। সামনে ছোট একটু উঠানের ফালি, পিছনে বড় উঠান। বাচ্চাদের মধ্যে কেউ বড় সময়ের অপব্যয় করে না। ক্লাসের বেঞ্চিতে ধপাস করে বই ছুঁড়ে দিয়েই বাইরে ছোটে। মার্বেলের গুলি বেরোয় পকেট থেকে, বল বেরোয়। বিনা সরঞ্জামে চোর-পুলিশও খেলছে ছুটাছুটি করে। আর এক খেলা, কলের মুখ চেপে ধরে ফোয়ারার মতন জল ছিটিয়ে দেওয়া ঃ এক-পায়ে লাফিয়ে খেলা হচ্ছিল ওদিকটা—জলের ধারায় কাপড় ভিজিয়ে দিল তো খেলা ছেড়ে ঘুসি বাগিয়ে এসেছে একটা ছেলে—

সহসা যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ। সামনের সরু উঠানের চেঁচামেচি একেবারে নেই। পরম সভ্যভব্য ছেলেপুলে পিলপিল করে ক্লাসে ঢুকছে। হেড স্যার, হেড স্যার— চোখ-মুখের ইশারায় চাপা গলার কথা।

গম্ভীর পদক্ষেপে হেড মাস্টার ডি-ডি-ডি এসে ঢুকলেন। পুরো নাম দিব্যেন্দুর দাশ। গৌরবর্ণ দীর্ঘমূর্তি, মাথা-জোড়া টাক—হাজার লোকের

অনেকেও আলাদা করে দেখা যায়। কুচকুচে কালো রঙের গলাবন্ধ কোট গায়ে, গলায় পেঁচানো তুষি চাদর, পায়ে স্প্রিং-দেওয়া চীনেবাড়ির জু। যেমন যেমন এগুচ্ছেন, সামনে ও দু-পাশে নিঃশব্দ হয়ে যাচ্ছে। মসমস করে উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। লাইব্রেরী-ঘরে শিক্ষকেরা বসে দাঁড়িয়ে—তর্কাতর্কি কথাবার্তা রসরসিকতা তুমুল বেগে চলেছে। কেউ কেউ ওর মধ্যে ঘুমিয়েও নিচ্ছেন বসে বসে। দরজার বাইরে হেডমাস্টারকে দেখে সকলে তটস্থ হলেন, চোখ-বোঁজা মানুষ ক'টি তাড়াতাড়ি চোখ খুললেন। দুখিরাম বেয়ারা ছুটে এসে হাত থেকে ছাতাটি নিয়ে নিল। হেডমাস্টারের জন্য আলাদা একটা কামরা—কামরার দরজা খুলে পাখার জোর বাড়িয়ে দিল।

কামরায় ঢুকে যেতেই চতুর্দিক আবার যেমন-কে-তেমন। ঘুসি বাগিয়ে এসে যে ছেলেটা হাত তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়েছিল, হাত বের করে সে ধাঁই করে মেরে দিল কলের ধারের ছেলেটার উপর। নবীন পণ্ডিত বলছিলেন, নরীম্যানের তুলনা? উঁ, ঢাকের কাছে—ওইখানে থেমে গিয়ে খবরের কাগজে মনোযোগ করেছিলেন। ডি-ডি-ডি ঘরে ঢুকে যেতেই মুখ তুলে উপমাটা শেষ করলেন: ঢাকের কাছে ট্যামটেমি?

টেবিলে কি চিঠিপত্র আছে, হেডমাস্টার নেড়েচেড়ে দেখছেন। অ্যাসিস্টান্ট-হেডমাস্টার চিত্তরঞ্জন গুপ্ত ঘরে ঢুকে বেঁটে সাইজের বেঢপ মোটা একখানা খাতা তুলে নিলেন টেবিল থেকে। অ্যারেঞ্জমেন্ট বুক—মাস্টাররা যমের মতো ডরান ঐ খাতাকে। যাঁরা কামাই করেছেন, ক্লাস তাঁদের খালি যাবে না। অন্য মাস্টারের লিসার-ঘণ্টা কেটে নিয়ে সেখানে পাঠানো হয়। অর্থাৎ সেই সেই মাস্টার অবসর পেলেন না আর সেদিন। এই বেঁটেখাতায় তার ব্যবস্থা।

খাতা নিয়ে বেরুবার মুখে চিত্তবাবু বলছেন, চারজন আসবেন না, এখন অবধি খবর পেলাম। কি করে কাজ চলবে নিত্যিদিন এমন হতে থাকলে?

ডি-ডি-ডি বললেন, বিশ্রী আইন করে রেখেছে—বছরে পনের দিন ক্যাজুয়াল ছুটি। সেই সুযোগ নিচ্ছে। পড়াশুনো কিছু আর হতে দেবে কি? আপনাকে বলা রইল, কামাই করার পরে কেউ যখন ফের ইস্কুলে আসবেন, একনাগাড়ে চার-পাঁচ দিন তাঁর লিসার কেটে যাবেন। সমুচিত শিক্ষা হবে তাহলে।

তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, ঘণ্টা বাজিয়ে দাও দুখিরাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চিত্তবাবু বললেন, তিন মিনিট আছে দার এখনো।

ডি-ডি-ডি বললেন, হোকগে। গোলমালে মাথায় টনক নড়ে যাচ্ছে।

ছেলেরা আর কতটুকু গোল করে! মাস্টারমশায়রা, যেখানে, লাইব্রেরী-ঘরে মেছো-হাট বসিয়ে দিয়েছেন।

জবরদস্ত হেডমাস্টার। গার্জেনরা শতমুখ ডি-ডি-ডি'র প্রশংসায়। দেড়-হাজার ছেলে কী রকম ভেড়ার পাল হয়ে আছে, দেখে এস একদিন ইস্কুলের সময় গিয়ে। কমিটিও খুশি—বিশেষ করে সেক্রেটারি। মিষ্টি কথার রাজা হলেন তিনি—মাস্টাররা দায়ে-দরকারে গেলে খুব খাতির করে বসান: ইস্কুল তো আপনাদেরই। কমিটি কিংবা এক হেডমাস্টার কী করতে পারেন উৎকৃষ্ট শিক্ষক যদি না থাকেন। এর পরে দশরকম কথার মারপ্যাঁচে বের করে ফেলেন হেডমাস্টার সম্বন্ধে মাস্টারদের কি রকম মনোভাব। খুশি হন মনে মনে: হ্যাঁ, মাস্টারগুলোকে কেমন ঠাণ্ডা করে রেখেছেন, এই না হলে হেডমাস্টার!

ঠুন-ঠুন-ঠুন-ঠুন—মন্দিরের আরতির মতন দুখিরাম লম্বা বারাণ্ডা ধরে ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্নিং-এর প্রথম ঘণ্টা: ছেলেরা সব ক্লাসে ঢুকে যাও, ঘর থেকে বেরিয়ে টিচাররা ক্লাসমুখো রওনা হন এবারে। এর পরে ঢং-ঢং করে পেটা-ঘড়ি বাজবে। ইস্কুল বসে গেল তখন, ক্লাসে ক্লাসে পাঠগুঞ্জন। ফ্যাক্টরির কল চালু হয়ে যাবার মতন। পিরিয়ডের পর পিরিয়ড পার হয়ে অলস ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে টিকোতে টিকোতে এখন চলল পশ্চিমের প্রকাণ্ড লাল বাড়িটার আড়ালে সূর্য অদৃশ্য না হওয়া অবধি।

ডি-ডি-ডি অফিস-ঘরের সামনে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছেন, নজর চতুর্দিকে পাক খাচ্ছে। মাস্টারমশায়রা তাড়াতাড়ি খড়ি-ঝাড়ন নিয়ে নিলেন, বই নিয়েছেন কেউ কেউ। ভূগোলের মাস্টাররা গোটানো ম্যাপ আর লাঠির আকারের পয়েণ্টার, এবং অঙ্কের মাস্টাররা দীর্ঘ স্কেল নিয়েছেন হাতে। হাতিয়ার পত্তরে সজ্জিত হয়ে ক্লাসে চললেন। ভূদেববাবু এর মধ্যে বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়েছেন হেডমাস্টারের দিকে। তিন-তিনটে মিনিট জুলুম করে আজ খেয়ে দিল। কী অটুট স্বাস্থ্য, অসুখও একদিন করতে নেই। সেই দিন তোমার ইস্কুলের কী হাল করি, বুঝবে।

মহিম দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। ডি-ডি-ডি'র নজর পড়ল: ইউ বয়, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং—ক্লাসে না গিয়ে ঘুরছে কেন ওখানে?

ছাত্র ভেবেছেন মহিমকে। এসব অনেক দিনের কথা—ফুটফুটে সতেজ চেহারা তখন। বি. এ. পাশ করেছেন, তবু ইস্কুলের উপরের ক্লাসের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলে বেমানান দেখাবে না বোধহয়।

ইউ বয়, গো অ্যাটওয়ান্স টু য় ক্লাস—

মহিম কাছে গিয়ে প্রভাত পালিতের চিঠিটা দিলেন।

কিসের চিঠি? সকাল সকাল ছুটি—

চিঠি পড়ে চোখ তুলে তাকালেন মহিমের দিকে। আর একবার পড়লেন। পাশের বড় ঘরটা দেখিয়ে বললেন, যান, লাইব্রেরীতে গিয়ে বসুনগে। চিত্তবাবু, বাইরে আসুন একটু, এই দেখুন।

অতএব মহিম লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকে গেলেন। লাইব্রেরি আছে যখন ইস্কুলে, বইটই বেশ পড়া যাবে। বই মহিমের বড় প্রিয়, বই মুখে ধরে থাকতে পারলে আর কিছু চান না তিনি। উঃ, সাতু ঘোষের সঙ্গে কী নাগপাশে আটক হয়ে পড়েছিলেন! বই পড়া সাতু হাস্যকর খেয়াল বলে মনে করে, ওটা বোকা মানুষের লক্ষণ। শুধুমাত্র পয়সাই চিনেছে, পয়সার পিছনে ছোটা ছাড়া জীবনে ওদের অন্য লক্ষ্য নেই। লেখাপড়ার আবহাওয়ায় এসে মহিম পুনর্জীবন পেয়ে গেলেন যেন।

কিন্তু দেড় হাজার ছাত্র এবং এতগুলো শিক্ষকের জন্য গোণাগুণতি চারটে আলমারি। অন্য কোন ঘরে আছে বোধহয় আরও। একদিককার দেয়াল ঘেঁষে আলমারিগুলো, মাঝখানে টানা টেবিল, টেবিলের এদিকে-ওদিকে সারবন্দি চেয়ার। মাস্টারমশায়রা ক্লাসে চলে গেছেন, চেয়ার প্রায় সমস্ত খালি। যাঁদের এখন ক্লাস নেই, তাঁদেরই জনকয়েক রয়েছেন। দু-জন তার মধ্যে লম্বা হয়ে পড়েছেন টেবিলের উপর। পাখা ঘুরছে, পাখার নিচে পড়ে আরামে চোখ বুজেছেন। মহিম আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে বইয়ের নাম পড়েন। এনসাইক্লো-পেডিয়া বৃটেনিকা আঠার শ'-পঁচানব্বুই সালের এডিসন। অপর বইগুলোও দস্তুরমতো প্রাচীন। ইস্কুলের গোড়ার দিকে দিকপালেরা সেই যখন ছাত্ররূপে এখানে ঢুকেছিলেন, তখনই উৎসাহ বশে বোধহয় বই কেনা হয়েছিল। পরবর্তী-কালে আর উদ্যোগ হয়নি। কাচের বাইরে থেকে চেহারা দেখে অন্তত খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

এমনি সময়ে বেঁটেখাতা নিয়ে ক্ষুদিরাম এসে পড়ল। মাস্টারদের দেখিয়ে দেখিয়ে সই করিয়ে ঘুরছে। অমুক পিরিয়ডে যে কিলার আছে, তমুক ক্লাসটা নিতে হবে সেই সময়।

ঘুমাচ্ছিলেন গগনবিহারীবাবু, টেবিলের উপর তড়াক করে উঠে বললেন। এসে গেল চিত্রগুপ্তের খাতা? কই, আমার কোথায় হে? আমায় বাদ দিলে তো ইস্কুল তোমাদের উঠে যাবে।

ক্ষুদিরাম বলে, আপনার কাজ নেই মাস্টারমশায়।

অবাক কাণ্ড! দু-দুটো সিসার-কর্তার চিত্রগুপ্তের ছোঁয়া পড়ল না? কলি উলটে গেল নাকি?

বসাস করে শুয়ে পড়লেন; চোখ বুজলেন পূর্ববৎ।

ক্ষুদিরাম বলে, পতাকীবাবু আপনার আছে। টিফিনের পরের ঘণ্টায়। দেখে নিন।

খাতা মেলে ধরল পতাকীচরণের সামনে। সই মেরে দিলেন পতাকী। হেসে উঠে বলেন, বিলকুল ছুটি আজকে। বাঁচা গেল।

দাশুর বয়স কম, অল্পদিন ঢুকেছেন। ভাল নাম দাশরথি—দাশু দাশু করে সবাই ডাকে। বুঝতে না পেরে তিনি বলেন, ছুটি হয়ে গেল কি রকম?

প্রিন্সিপল নিয়ে চলি আমি ভায়া। যেদিন সিসার মারবে, সব ক'টা পিরিয়ড সেদিন ছুটি করে নেব। কিছু করব না কোন ক্লাসে গিয়ে। দশ বছর মাস্টারি হয়ে গেল, তিনটে ইস্কুল ঘুরে এসেছি। অনিচ্ছের আমায় দিয়ে কাজ করাবে, এমন তো কোন বাপের বেটা দেখিনে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গগনবিহারী বলেন, আঃ, বাপ তোল কেন পতাকী? ওটা কি ভাল?

পতাকী থতমত খেয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেন। দাশুর দিকেও তাকালেন একবার। শোনা যায়, দাশু হেডমাস্টারের কাছে গিয়ে লাগানি-ভাঙানি করেন। এমনিভাবে চাকরির উন্নতি চেষ্টা। কথা একটা বলে ফেলে পতাকীচরণ গিলে নেবার জন্ম আঁকুপাঁকু করেছেন: ভি-ভি-ভি কিংবা চিত্তবাবু ওদের কথা বলছি নে তো। টিচার কামাই করলে কারো-না-কারো সিসার যাবেই। ওঁরা করবেন কি? বলছিলাম ছোঁড়াগুলোর কথা। সেকেণ্ড-সি'র এত বদনাম শোনেন—ভূদেববাবুর ক্লাসে পর্যন্ত মেজেয় পা ঠোকে। আমি তো কাল এক প্যাসেঞ্জ ট্রানস্লেশন দিয়ে চা খেতে নেমে এলাম—মরে আছে কি বেঁচে আছে, বাইরে কেউ বুঝতে পারবেন না। তাই বলছিলাম, মুখে রক্ত তুলে পড়িয়ে তবে ক্লাসের ছেলেপুলে ঠাণ্ডা রাখতে হবে, এ কেমন কথা!

অবান্তর এমনি সব বলে বেফাঁস কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা। ক্ষুদিরাম ওদিকে বেঁটে খাতার পাতাটা পড়তে পড়তে হিমসিম হচ্ছে! বলে, দেখুন তো দাশুবাবু, এই যে—এম-আর-এস এই মাস্টারমশায় কে বলুন দিকি?

এম-আর-এস—তাই তো! পতাকীবাবু, এম-আর-এস কে আমাদের ভিতর?

কঙ্কালীকান্ত এসে ঢুকলেন। কটকটে কালো রং, ছিপছিপে দেহ, ধবধবে

কাপড়জামা, মাথায় এলবার্ট-টেরি—চড়কডাঙার দত্তবাড়ির ছেলে বলে জাহির করেন সর্বদা। হেডমাস্টার, চিত্তবাবু এবং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, বৃদ্ধ গজাননবাবু পদমর্যাদায় বড়। করালীবাবুও খানিকটা কাছ ঘেঁসে যান ওঁদের। ইস্কুলের কেয়ারটেকার ও লাইব্রেরিয়ান। কালি-নিব-খড়ি ফুরিয়ে গেছে, পায়খানায় চুনকাম করতে হবে, বেঞ্চিটার ঠ্যাং ভেঙেছে ইত্যাদি যাবতীয় দায়ঝক্কি কেয়ার-টেকারের। ভাতা এই বাবদে মাসিক পাঁচ টাকা। এবং প্রাচীন আলমারি চতুষ্টয়ের দায়িত্ব বহন করায় অতিরিক্ত ভাতা আরও পাঁচ। তাছাড়াও ঘন্টা কয়েক বেশি জিলার অন্তরের চেয়ে। ঐ জিলার পিরিয়ডগুলো নিয়ে করালীকান্ত সর্বদা সশঙ্ক—কখন কাটা পড়ে যায় চিত্তবাবুর খোঁচায়। বেঁটেখাতা লেখার সময় সেইজন্ত ঘূণ হয়ে বসে থাকেন তাঁর পাশে। উঁহু, করছেন কি—ঐ সময়টা চুনের মিস্তিরি আসবে, দেখিয়ে-শুনিয়ে দিতে হবে। ক্লাসে ঢুকে থাকলে কেমন করে চলবে? আজকেও ছিলেন এতক্ষণ, কাঁড়া কাটিয়ে হাসিমুখে এখন এসে বসেছেন।

এম-আর-এস কে হলেন করালীবাবু?

ওই যে, মহিমবাবু—নতুন যিনি এলেন আজকে। দাঁড়িয়ে কি করেন মশায়—আসুন, আলাপসালাপ করি। প্রেসিডেন্টকে কি করে বাগালেন বলুন দেখি?

দু-তিনজনে প্রায় সমস্বরে বলে ওঠেন, অ্যাঁ—প্রেসিডেন্ট?

করালী বলেন, খোদ হাইকোর্ট থেকে ফরমান নিয়ে এসেছেন, রোখে কে আপনাকে মশায়। কোন ক্লাস দিচ্ছিস রে ক্ষুদিরাম—এইটথ বি? চিত্তবাবুকে বললাম, প্রেসিডেন্টের লোককে রৌরবকুম্ভীপাক ঘোরাচ্ছেন কি জন্তে? বললেন, টুইশানিওয়ালারা কেউ যেতে চায় না—নিচের মাস্টারকে কেউ তো পড়াতে ডাকে না। নতুন লোক উনি, টুইশানির টান নেই—ঘোরাঘুরি করুন না এখন দিনকতক।

ক্ষুদিরাম বেরিয়ে গিয়ে ক্লাসে ঘুরছিল। ক্ষতপায়ে ফিরে এল: গগনবিহারী-বাবু, উঠুন—দেখতে পাইনি সে সময়।

আছে তো? বল সেই কথা। চিত্রগুপ্ত সাধে নাম দিয়েছি। চিত্ত গুপ্ত নয়, চিত্রগুপ্ত—যমরাজের ম্যানেজার। বার মাস তিরিশ দিন এই কাণ্ড চলেছে। গোটা মানুষটা মারতে পারেন না, তাহলে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে লটকাবে—জিলার মেরে মেরে তাই হাতের সুখ করে নেন। কি বলেন পতাকীবাবু?

পতাকীচরণ সমদুঃখী বটে, কিন্তু আপাতত আর এসবের মধ্যে নেই। শান্ত

এখনো বসে রয়েছেন, তার উপরে কথালীকাণ্ড। নতুন আবার এই উদয় হয়েছেন প্রেসিডেন্টের লোক। ম্যহস্পর্শ-যোগ। পকেট থেকে বিড়ি বের করে নীরবে একটি ধরিয়ে নিলেন।

ঘণ্টা পড়ল। সেকেণ্ড পিরিয়ড। মহিম ক্লাসে যাবেন এবারে। ইস্কুল-কলেজে পড়েই এসেছেন এতদিন, জীবনে এই প্রথম ইস্কুলে পড়ানো। কতকাল আগেকার কথা! সেদিনের এইটথ ক্লাসের সেই আধো-আধো কথা-বলা শিশুগুলো এখন ছেলেপুলের বাপ। বলা যায় না, পিতামহও হতে পারে কেউ কেউ।

ঘণ্টা পড়লে মাস্টারমশায়রা সব ফিরছেন লাইব্রেরী-ঘরে। গোটা চারেক কুঁজো, কুঁজোর মাথায় গেলাস বসানো। চকচক করে সব জল খেয়ে নিচ্ছেন, বিড়ি ধরাচ্ছেন। বেয়ারাদের ঘরের পাশে জানলাহীন আধ-অন্ধকার ছোট্ট একটা ঘরও আছে, সেখানে হুঁকো ও কলকের ব্যবস্থা। হুঁকো বিনে যাঁদের চলে না, তাঁরা সব ছুটলেন সেদিকে। উঃ কতগুলো মাস্টার রে বাবা, চিনে নিতে মাসখানেক লাগবে অন্তত। মহিম পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে পড়েছেন, এমন বিরাট কাণ্ডকারখানা তাঁর ধারণায় আসে না।

সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গঙ্গাপদবাবু—খুনখুনে বুড়ো, দেহ নুয়ে পড়েছে, মাথায় একটা কাঁচা চুল নেই—বলছেন, কি বাবাজি, আজ থেকে লাগলে বুঝি? কোন ক্লাসে এখন? ভাল, খুব ভাল। দেখ, নিচের ক্লাস বলে তাচ্ছিল্য করে মাস্টার পাঠানো হয়। ঠিক উল্টো। ভিত তৈরি হয় ওখানে।—হেডমাস্টারেরই যাওয়া উচিত। উপরের ক্লাসে আমরা তো একটুখানি বাহার করে ছেড়ে দিই। ভিত কাঁচা থাকলে উপরের চাপে নড়বড় করে, ধ্বসে পড়ে ফাইনালের সময়। ভিত ভাল থাকলে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হয় না। এই ছুখিরাম, ক-ছটাক জল রাখিস রে কুঁজোয়, গেলাসে ঢালতে ফুরিয়ে যায়। তুমি-তুমি করে বলছি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না।

মহিম বলেন, বলবেন বইকি! ছাত্রতুল্য তো আমি।

তুল্য কেন বলছ? আমার অনেক ছাত্রের ছেলে তোমার চেয়ে বড়। একটা কথা বলি বাবাজি—বড় পুণ্যকর্ম এটা। হাসিভরা মুখ আর পবিত্র মন নিয়ে ক্লাসে ঢুকবে। ছুখিরাম, নতুন মাস্টারমশায়কে ক্লাস দেখিয়ে দিয়ে আয় বাবা। নয়তো খুঁজে খুঁজে হয়রান হবে বেচারি।

বুড়ো হয়ে বেশি কথা বলেন গঙ্গাপদবাবু। বকতে বকতেই ছুটলেন আবার

ক্লাসে। ছুটবার সময় আর সেই কুঁজো থাকে না, সরলরেখার মত খাড়া হয়ে ওঠেন।

লম্বা একটা ঘর। এক ঘরের মধ্যে এইটথ ক্লাসের দুটো সেকশন—'এ' আর 'বি'। 'সি' আর 'ডি' সেকশন ঠিক এমন মাপের উল্টো দিকটায় ঘরে। পার্টিশন নেই মাঝে। আরে, পার্টিশনে যে জায়গা যাবে সেইখানেই কোন না দশটা ছেলে বসে আছে। ইস্কুলে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না—জায়গা থাকলে দেড় হাজার ছেলে স্বচ্ছন্দে আড়াই হাজারে তোলা যেত। ভারতী ইনষ্টিট্যুশনের খুব নাম বাজারে।

হাতাওয়ালা মান্ধাতার আমলের ভারী চেয়ার টেবিল দেখে মনে হবে, আস্ত চারটে গুঁড়ির উপর পেরেক ঠুকে এই পুরু পুরু তক্তা বসিয়ে দিয়েছে। পাকাপোক্ত কাজ। পঞ্চাশ বছর আগে ইস্কুলের জন্মকালে এই আসবাব গড়া হয়ে থাকে তো হেসে-খেলে আরও অমন তুই পঞ্চাশ কেটে যাবে।

কি হবে তোমাদের এ ঘণ্টায়?

পয়লা বেঞ্চিতে সকলের প্রথম-বসা ছেলেটা বলে, বাংলা হবে সার।

অন্য সকলে কলরব করে ওঠে,—গল্প—গল্প হবে।

গল্পের নামে ওদিককার 'এ' সেকশনের ছেলেগুলোও সচকিত হয়েছে। নতুন সার যখন, নিশ্চয় বেশ নরম আছেন; তাঁর কাছে আবদার চলবে। তারাও চেঁচিয়ে দল ভারী করে: গল্প সার।

মহিম প্রশ্ন করেন, কে আছেন তোমাদের সেকশনে?

রামকিঙ্করবাবু। তিনি আসেননি।

মহিম বললেন, আচ্ছা গল্পই হবে। চেঁচিয়ে গল্প করব, তোমরাও শুনতে পাবে। তার আগে পড়াটা হয়ে যাক। ততক্ষণ তোমরা কিন্তু চুপ করে থাকবে। কোথায় পড়া?

সামনের বেঞ্চির সেই ভাল ছেলেটি বলে, ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর।

ও, সেই যে পোষা কুকুরের সঙ্গে বনের বাঘের দেখা। কুকুর খায়-দায় ভাল, কিন্তু গলায় শিকলের দাগ—সেই তো? আচ্ছা, পড়ার গল্পই হবে আগে। ভাল খাবে জেনেও কেন বাঘ গৃহস্থবাড়ি যেতে চাইল না, সেইটে বলব।

ভাল ছেলেটা বলে, কাল জগদীশ্বরবাবু সার পড়িয়ে গেছেন। সমস্ত কথার মানে লিখে আনতে বলেছিলেন বাড়ি থেকে। আমি নিয়ে এসেছি।

বাহাদুরি নেবার জন্য খাতা খেকে গড়গড় করে পড়ে শোনাচ্ছে: সমস্ত লিখেছি। ব্যাঘ্র মানে বাঘ, পালিত মানে প্রতিপালিত, কুকুর মানে সারমেয়।

সহসা তুলতুলে একখানা হাত এসে পড়ে মহিমের মুখ ফিরিয়ে ধরেছে ওদিকে ; দেবশিশুর মত টুকটুকে এক ছেলে ! গল্প শুরুতেই ভেঙে যায় দেখে থাকতে পারেনি, সিট ছেড়ে উঠে এসেছে। আধো-আধো মিষ্টি সুরে, বলে, গল্প খাম। ও সবত নয়, গল্প—

দু-তিনটে ছেলে হাত নেড়ে ডাকছে তাকে : চলে আয় মলয়, অমনি করে বুঝি ! সারের গায়ে হাত দেয় ?

মহিমকে বলছে, নতুন ছেলে সার, জানে না। পরশুদিন ভর্তি হয়েছে। কখনো ইস্কুলে পড়েনি। ওকে কিছু বলবেন না।

অনেক তো বলবার ইচ্ছে করে কোলের উপর বসিয়ে ! ক্লাসের ছেলেগুলো মানা করছে। মায়ের কোল ছেড়ে এসেছে—আহা, কাউকে এখনো পর ভাবতে শেখেনি। ভালবেসে গায়ে হাত দিয়েছে, একেবারে কিছু না বলে পারা যায় কেমন করে ?

বললেন, নাম তোমার মলয় ? দিব্যি নাম। ভাই-বোন ক'জন তোমরা ?

তুই হতভাগা চেয়ার ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিস। মুখ টিপলে দুধ বেরোয়—কী সাহস রে বাবা ! যা, সিটে গিয়ে বোস।

হুঙ্কার দিয়ে রামকিঙ্কর ঘরে ঢুকলেন : মুখ নড়ছে সর্বক্ষণ সুপারি চিবান। গালের দুই প্রান্তে চিবো সুপারির কষ বেরিয়ে পড়ছে। ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়েছে। মহিমের একেবারে পিছনে তিনি, 'বি' সেকশনের এলাকার মধ্যে। তাকিয়ে দেখে মহিমও চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

রামকিঙ্কর বললেন, এত এলাকাড়ি দিচ্ছেন কেন মশায় ? যা ভাবছেন, সে গুড়ে কিন্তু বালি।

কি ভাবছি ?

হি-হি করে হেসে রামকিঙ্কর বলেন, চেহারায় ধরেছেন ঠিক। ভাল ঘরের ছেলেই বটে, চৌধুরী বাড়ির ছেলে। কিন্তু টোপ গেঁথে গেছে, নজর দিয়ে আর মুনাফা নেই। দাশু পড়াচ্ছে। দাশু খলিফা লোক, বয়স কম হলে কি হয়—মাথায় খুব প্যাঁচ খেলে—ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠিনে। 'বি' সেকশনে এলতে গেলে আমারই বুকের উপরে তিন তিনটে দিন চরে ফিরে বেড়াল, আমি আরলাম না, দাশু ঠিক বড়শি গেঁথে তুলে নিয়ে চলে গেল।

রামকিঙ্করের তাড়া খেয়ে মুখ কাচুমাচু করে মলয় জায়গায় গিয়ে বসেছে। আর সে এদিকে তাকায়নি, হয়তো বা কাঁদবে বসে বসে। বিরক্তি চেপে নিয়ে-

বাঁচিয়ে বললেন, আমি কিন্তু একেবারে কিছু ভাবিনে। ক্লাসে নতুন এসেছি, ছেলেদের সঙ্গে চেনাশুনা করে নিচ্ছি।

হতে পারে। হরিহরের আপাদমস্তকে বার দুয়েক দৃষ্টি বুলিয়ে রামকিঙ্কর ভ্রুকুটি করলেন: সস্তা আমদানি। উঁ, গোঁফও ওঠেনি ভাল করে। তা বেশ, সবে তো কলির সন্ধ্যে—আজকে ভাবেননি, ভবিষ্যতে বিস্তর ভাবতে হবে। কিন্তু দরজা হাঁ-হাঁ করে কী রকম পড়ানো মশায়। বাইরের গোলমাল ঘরে আসে, ঘরের গোলমাল বাইরে চলে যায়। ক্লাসে এসে দুয়োরটা আগে এঁটে দেবেন। নিজের কায়দা অপরকে দেখতে দেবেন কেন?

নিজ হাতে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে হেলতে দুলতে 'এ' সেকশনের দিকে চললেন। চেয়ারে বসে টেবিলের উপর পা দুটো তুলে দিলেন।

কি আছে রে?

অঙ্ক—

খিঁচিয়ে উঠলেন রামকিঙ্কর: সবে এই ছুটোছুটি করে এলাম, অঙ্ক এখন কিরে? অঙ্ক হবে বিকেলবেলা।

রুটিনে আছে স্যার।

থাকবে না কেন? চিত্তবাবুর রুটিন তো। নিজে কস্মিনকালে ক্লাসে যাবেন না, একে তাকে পাঠিয়ে কাজ সারেন—বুঝবেন কি করে রোজ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আবার তক্ষুণি বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঙ্ক কষানোয় কি ঠ্যালা! ইতিহাস কখন।

টিফিনের পরের ঘণ্টায় স্যার।

সেইটে এখন হয়ে যাক। বের কর ইতিহাসের বই।

এইটথ ক্লাসের ক্লাস-টিচার রামকিঙ্করবাবু—'এ' সেকশনের। চিরকাল ধরে এইটথ আর নাইন্থ ক্লাসে পড়াচ্ছেন, অঙ্ক মাষ্টারের মতো অনুযোগ নেই। অঙ্কের অনুপস্থিতিতে চিত্তবাবু কখনো-সখনো দু-এক ক্লাস উপরে দিতে গেছেন—রামকিঙ্করবাবুই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: বয়সকালে দিলেন না, কেন স্যার বুড়ো বয়সে ঝামেলায় ফেলেন। জানিই কী। এককালে জানতাম, এখন বেমালুম হজম করে বসে আছি। নতুন ক্লাসে চোখে সর্ষের ফুল দেখব।

অঙ্ক মাস্টাররা বলেন, তা উনি বলবেন বইকি! তিন ছেলে রোজগেরে। টুইশানি একটা-দুটো হল ভাল, না হলেও অচল হবে না। রামকিঙ্করবাবুর মতন ভাগ্য কার!

রামকিঙ্কর বলছেন, ইতিহাসের কোন্‌খানে পড়া—শাজাহান ও তাজমহল?

-পড়ে এসেছিস ভাল করে? একটা এদিক-ওদিক হলে পিতৃদত্ত নাম ভুলিয়ে দেব।

ছেলেরা চুপ করে আছে। পিতৃদত্ত নামের মতো শক্ত ব্যাপারের মানে বুঝবার এখনো বয়স হয়নি। রামকিঙ্কর সহসা সদয় হয়ে বললেন, লিখে ফেল ওটা আগাগোড়া। লেখাই আসল। যত্ন করে খুব ধরে ধরে লিখবি।

ইতিহাসের বই খুলে নিল সমস্ত ছেলে। টেবিলের ওপর পা আগেই তোলা ছিল, অতঃপর রামকিঙ্কর চোখ বুজালেন। ক্ষণে ক্ষণে নাসার ধ্বনি। আবার সামলে নিচ্ছেন। ইতিহাস লেখা বন্ধ করে ছেলেরা কাটাকাটি খেলা শুরু করেছে। প্রয়োজনে পড়ে এরা নানা রকম নিঃশব্দ খেলার আবিষ্কার করেছে। তাতে আপত্তি নেই, শব্দ না হলেই হল। তারপরে সারকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন জেনে সাহস ক্রমশ বেড়ে যায় ওদের। খেলার রকমফের চলেছে। এ-ওর পেন্সিল কেড়ে নিচ্ছে, বই ছুড়ে দিচ্ছে—বলের মতো লুফে নিচ্ছে আবার চিমটি কাটছে পরস্পর। জায়গা বদলাবদলি করে এর কাছ থেকে ওর কাছে গিয়ে বসেছে। একজনের বই পড়ে গেল এরই মধ্যে মেঝের। ঘুমলে কি হবে, ক্ষীণতম শব্দও কানে এড়ায় না। রামকিঙ্কর তাড়া দিয়ে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে, এইও—

ছেলেরা থতমত খেয়ে একবার তাকায়। তারপর যথারীতি খেলা চলতে থাকে। ওটা কিছু নয়, ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ আওয়াজ। চোখ না খুলেই চলে ওটা। তিরিশ বছর ধরে এই অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লাসে কানামাছি খেল, যা ইচ্ছে কর—শব্দ না হলে শঙ্কার কিছু নেই।

বাইরের কয়েকটা ছেলে অল্পদিন আগে ভর্তি হয়েছে। তারা অতশত বোঝে না। লেখা শেষ করে একটি এসে ডাকছে, সার—

অন্য ছেলেরা হাত নেড়ে নিঃশব্দে ইঙ্গিতে প্রাণপণে তাকে ডাকছে জায়গায় ফিরে এসে বসবার জন্যে। ছেলেটা হয় বুঝতে পারছে না, নয়তো সকলের আগে লেখা দেখিয়ে বাহাদুরি নিতে চায় মাস্টার-মহাশয়ের কাছে।

হয়ে গেছে সার।

ঘুমের মধ্যে রামকিঙ্কর সাড়া দিয়ে ওঠেন, উঁ—

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গে ত্রিভুবন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, রামায়ণে আছে। রামকিঙ্কর মাস্টারমহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ আসন্ন। চক্ষের পলকে পট-পরিবর্তন। ছেলেরা যে যার জায়গায় বসে খাতার উপরে ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগে লিখে যাচ্ছে।

শাহ্, লেখা শেষ হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে ? দেখি।

একটানে খাতা কেড়ে নিয়ে নিদ্রারক্ত চোখ দুটো বিঘূর্ণিত করে রামকিঙ্কর হুংকার দিয়ে ওঠেন : শাজাহানে কোন্ শ, তাজমহলে কোন্ জ ?

ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল। তবু দোনলা বন্দুকের দুই গুলি একসঙ্গে তাক-করায় ঘাবড়ে গিয়ে বলে তালব্য-শ উঁহু, দন্ত-স।

মূর্ধন্য-ষ কেন হবে না।

মূর্ধন্য-ষ সার।

আর চিলে যেমন করে ছোঁ মারে, চাদরের নিচে থেকে বাঁ-হাতখানা বেরিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরে আচমকা দিল হেঁচকা টান। ডান হাতের দুটো আঙুল বেঁকে চিমটার মতো হয়ে চেপে ধরেছে তার কনুয়ের কাছটা। চামড়ার উপরে পাক পড়ছে।

লাগছে কেমন—মিষ্টি ?

নতুন নিয়মে ক্লাসে বেত নিয়ে যাওয়া বন্ধ হেডমাস্টারের কড়া নিষেধ। লাইব্রেরি-ঘরের কোণে আলমারির একটু আড়াল করে বিশ-পঁচিশ গাছা বেত থাকত, মাস্টারমশায়রা দরকার মতো নিয়ে যেতেন। বেয়ারাদের এখন সমস্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে উনুনে পোড়ানোর জন্য। বুড়ো শিক্ষকরা মুখ তাকাতাকি করেন : মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি, স্পেয়ার দ্য রড এণ্ড স্পয়েল দ্য চাইল্ড—শাস্ত্রবাক্য রয়েছে। সে বাক্যের অন্যথাচরণ করে দিন-কে-দিন কী হতে চলল! শুধু রামকিঙ্করের ভ্রূক্ষেপ নেই : বয়ে গেছে, বেতের কি গরজ ? বলি, আঙুল দুটো তো কেটে নিচ্ছে না! ছেলেরা বলে, রামকিঙ্কর সারের আঙুল নয়—লোহার সাঁড়াশি। আঙুল দিয়ে দেহের উপর ওই প্রক্রিয়াটির নামকরণও হয়েছে ভাল—মধুমোড়া।

মোড়া দিতে দিতে রামকিঙ্কর প্রশ্ন করেন, মিষ্টি লাগছে তো ? মধুর মতো ?"

এই ব্যাপার হচ্ছে, পিছনে আবার এক হাঁদারাম এসে দাঁড়িয়েছে। আহা রে, বড়-বড় চোখ, থোপা-থোপা চুল—। কিন্তু গতিক বুঝে ছোঁড়াটা এখন সরে পড়বার তালে আছে। সে সুযোগ দিলেন না রামকিঙ্কর। প্রথমটাকে ছেড়ে ধাঁ করে তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন খাতাখানা। যেন সময়ে নেমেছেন—যে সামনে এগুবে, কোনমতে তার নিষ্কৃতি নেই দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন খাতায়। মুখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখলেন ছেলেটার দিকে। আবার পড়লেন। কোথাকার হতভাগা রে—একটা ভুল রাখে না। একটা

লাইন বাঁকা নেই, ই-কার উ-কার এমন কি একটা মাত্রায় অবধি হেরফের নেই। আগাপাস্তলা অক্ষেত্ত বর্ষ পরে এসেছে যেন। খাতাটা গোল করে পাকিয়ে তাই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে: পিঠে দিয়ে বোস। একবারে হয় না, আরও লেখ। দু-বার তিনবার ধরে ধরে লেখ ভাল করে। তিনবার হলে আনবি, তার আগে নয়।

সমস্ত ক্লাসে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, নিয়ে আয় রে, অন্ত কার হল—

কারও হয় নি। হবেও না ঘণ্টার মধ্যে। পুরানো ছেলে তারা, বহুদর্শী —এ ছুটোর মতো হালফিলের ভর্তি হওয়া নয়। নিশ্চিন্ত হয়ে রামকিঙ্কর পুনশ্চ চোখ বুজলেন।

ঘণ্টা পড়তে রামকিঙ্কর চোখ মেলে উঠে পড়লেন। বেরিয়ে যাবার মুখে মহিমের কাছে দাঁড়ালেন।

ভায়া নতুন এসেছ কিনা—শুনছিলাম তোমার পড়ানো। ক্লাসে গোল হয় কেন? বদনাম হয়ে যাবে।

মহিম বললেন গোল কোথা? বোঝাচ্ছিলাম। একেবারে শব্দ না করে পড়ানো যাবে কেন?

আমি তবে পড়াই কি করে? তিরিশ বছর হয়ে গেল। কত গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করেছি। সুখময় চক্কত্তির নাম শুনেছ—ছোট আদালতের জজ। আমার ক্লাসের ছাত্র। হাফ-ইয়ার্লিতে ইংরেজীতে পেল তের। পড়াতে লাগলাম। এন্ট্রান্সে উঠে গেল তিরানব্বুই। স্বভাবচরিত্র পালটে গেল। একেবারে চুপচাপ থাকে, সাত চড়ে কথা বলেন না। হাকিম হয়ে এজলাসে বসে এখনো তাই। সেই অভ্যেস রয়ে গেছে—সারাটা দিন চুপচাপ, রা কাড়ে না মুখে।

মহিমের কাঁধে হাত দিয়ে একসঙ্গে বেরুচ্ছেন ক্লাস থেকে। বললেন, তুমি ভাই বড্ড শব্দ করে পড়াও। 'এ' সেকসনের অসুবিধে হয়। ফুসফুস বড্ড খাটাও তুমি। নতুন আমদানি কিনা, বিষদাঁত ভাঙেনি। লাইনে এসে পড়েছ যখন, তিরিশ-চল্লিশ বছর চালাতে হবে। নেচেকুঁদে একদিনে সব বুঝিয়ে দিলে তো পরে থাকল কি? ফুসফুসেই বা সইবে কেন?

ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তি-তি-তি কামরা ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। মাস্টাররা এক ক্লাস বেরিয়ে অন্য ক্লাসে যান—হচ্ছে-হবে করে পরস্পর একটু গল্পগুজব করে ওরই মধ্যে যে ক'টা মিনিট কাটিয়ে নেওয়া যায়। ছেলেরাও ক্লাস ছেড়ে বেরোয় মাস্টার বেরুলোর সঙ্গে সঙ্গে। হেডমাস্টার দাঁড়িয়ে থাকলে দেখে

ওঠে না তেমন। রামকিঙ্করকে ডি-ডি-ডি ডাক দিলেন, শুনুন এ দিকে। ইস্কুলে ক'টায় এসেছেন?

সাড়ে দশটায়।

লিখেছেন তাই বটে। সাড়ে-দশটাও নয়, দশটা পঁচিশ। এসেছেন এগারোটার পর।

রামকিঙ্কর চুপ করে আছেন।

কি বলেন। ভেবেছেন আমি টের পাইনে?

হাত কচলে রামকিঙ্কর বলেন, আজ্ঞে না। সে কি কথা! আপনি অন্তর্যামী। আপনার অজান্তে এ ইস্কুলে কোনটা হতে পারে?

দেরী করে এসে দশটা পঁচিশ কেন তবে লিখলেন?

ভুল হয়ে গেছে।

কালও দেরি হয়েছিল আপনার। রোজই হয়।

আজ্ঞে—

কেন হয়, সে কথা জিজ্ঞাসা করছি।

এবারে অনেকগুলো কথায় রামকিঙ্কর জবাব দিলেন: বউমা বড়ি দিয়ে বেগুনের ঝোল করেছিলেন। নতুন বেগুন উঠেছে এখন, ঝোল খেতে খাসা লাগে। আবার সামনের উপর বসে বউমা এটা খান ওটা খান করেন। তা মজা করে খাব, তার জো আছে? ভয়ে ভয়ে মরলাম চিরকাল। আপনার কথা মনে পড়ে গেল—খাওয়া ফেলে মুখ-হাত ধুয়ে ছুটবার দিশে পাইনে। তবু তো দেরি। এবারটা মাপ করে দিন, আর দেরি হবে না।

মাস্টারদের তিনি আতঙ্ক, ডি-ডি-ডি বড প্রসন্ন হন শুনে। আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বিশেষ করে এই রামকিঙ্কর—বয়সে অন্তত দেড়গুণ যিনি হেডমাস্টারের। মৃদু হেসে তিনি এগিয়ে গেলেন। অর্থাৎ রামকিঙ্করের ব্যাপার মিটল। দ্রুত খানিকটা এগিয়ে মহিমের কাছে এলেন। বলা নেই, কওয়া নেই, নিজের চাদরটা নিয়ে মহিমের কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন।

মহিম সবিস্ময়ে তাকান। ডি-ডি-ডি বলেন, কী সর্বনাশ! বিনি চাদরে এতক্ষণ ক্লাস করলেন নাকি? আজকের দিনটা আমার চাদর নিয়ে ক্লাসে যান। কাল থেকে চাদর নিয়ে আসবেন।

মহিম এইবারে লক্ষ্য করবেন, চাদর সব মাস্টারের কাঁধেই। কনেস্টবলের যেমন কোমরে চাপরাস, মাস্টারের তেমনি চাদর গলায়। ডি-ডি-ডি বলেন, ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের তফাৎ থাকা চাই তো একটা—চাদর হল তাই।

এই এক খেয়াল হেডমাস্টারের। চাদর চাই-ই চাই, নয় কোন ভারিক্কি হয় না। মাইনের ভাল লাগে না। চাদরের সঙ্গে বিশ ত্রিশ-বছর বয়সও যেন বাড়তি চাপিয়ে দিলেন কাঁধের উপর। চপলতা মানা। ইস্কুলের এলাকায় ভিতর মুখ গম্ভীর করে থাকতে হবে, এমনি সব নির্দেশও যেন নামাবলীর মতন চাদরের উপর লেখা রয়েছে। বুড়ো না হয়ে পাকা মাস্টার হওয়া যায় না—চাদর জড়িয়ে জবরদস্তি করে যেন তাই বুড়ো করে দেওয়া হল।

সামনের ছোট উঠানের প্রান্তে জলের ঘর। অনেকগুলো কল সারবন্দি—ছেলেরা সব পাশাপাশি জল খাচ্ছে। রামকিঙ্করও জল খাচ্ছেন তাদের মধ্যে ঢুকে তাদের মতন কলে হাত পেতে। জল খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন, জগদীশ্বরবাবু অদূরে। দিশার বোধহয় তাঁর, দাঁড়িয়ে দেখছেন। অপ্রতিভ ধরনের হাসি হেসে রামকিঙ্কর বলেন, আমি মশায় জলটা একটু বেশি খাই। পঞ্চাশজন মাস্টারের জন্য চারটে কুঁজো—জল তো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। অমন মাপা গেলাসের জল খেয়ে আমার পোষায় না।

জগদীশ্বর বলেন, ও সমস্ত কি বললেন আপনি হেডমাস্টারের কাছে? কাল আপনার দেরি কোথা? একসঙ্গেই তো দুজনে এলাম।

রামকিঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন: বটেই তো! দেরি আজকে হয়েছে, কাল হয়নি।

তবে হাঁ বলে ঘাড় নাড়লেন কেন? হেডমাস্টারকে বলতে পারতেন সে কথা।

এক গাল হেসে রামকিঙ্কর বললেন, উপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। যা বলে 'হাঁ' দিয়ে যেতে হয়।

বলেছেন কিন্তু আর দেরি হবে না কোনদিন—

রামকিঙ্কর নিশ্চিন্ত ওদাস্যে বললেন, তিরিশ বছরের চাকরিতে অন্তত পক্ষে তিনশবার বলেছি অমন। ওঁকে বলেছি, ওঁকে আগে যিনি হেডমাস্টার ছিলেন তাঁকে বলেছি কত দিন। তার আগের জনকেও বলেছি। বউমার পাঁচ ছেলেমেয়ে, ঝি-চাকর নেই—অতগুলোকে সামাল দিয়ে তবে তো রান্না চাপাবেন। সময়ে আসা ভাগ্যিজোগা একদিন হল তো দশদিন হবে না। ক'দিন আর থাব বলুন মশায়। তাই বলি খেয়ে নিই, ইস্কুল তো আছেই। কিন্তু বুঝিয়ে বলতে গেলে শুনছে কে? ঘাড় নেড়ে দিয়ে সরে পড়া ভাল।

॥ চার ॥

টিফিনের ঘণ্টা একটু টুন-টুন করেছে কিনা, একতলা দোতলা তেতলার সবগুলো ঘর থেকে একসঙ্গে তুমুল আওয়াজ। হু-উ-উ-উ—। দেড় হাজার সোডার বোতলের মুখ কেটে একসঙ্গে জল উৎসারিত হচ্ছে, এই গোছের একটা কথা মনে আসে। তিনঘণ্টা কাল ছিপি-আঁটা অবস্থায় যেন ক্লাসের বেঞ্চিতে বেঞ্চিতে সাজানো ছিল, লহমার মধ্যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। বারান্দা, হল, দুই উঠোন ভরে হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি মারামারি। ইস্কুলে আসবার সময় একজন-দুজন পাঁচজন-দশজন করে আসে। ভারতী ইনস্টিটুশন যে কত বড় ব্যাপার, পরিমাণটা তখন ধারণায় আসে না।

অজয়-বিজয় দুই ভাই। মুখের চেহারা প্রায় এক রকম—দুই ভাই সেটা বলে দিতে হয় না। দু-ভাই রোজ পোশাকও এক রকমের পরে আসে। সাদা হাফপ্যাণ্ট আর সাদা হাফসার্ট। সদ্য পাট-ভাঙা—ভাঁজগুলো সরলরেখায় স্পষ্ট হয়ে থাকে। ওয়ার্নিং ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মোটরগাড়ি গেটে এসে দাঁড়ায়; দু-ভাই নেমে পড়ে যেন নাচতে নাচতে দোতলায় উঠে যায়। গাড়ি সশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যায় পলক না ফেলতে। তখন গাড়ির ভিতরে থাকে আশ্চর্য সুন্দরী একটি মেয়ে। মাস্টারমশায়রা অনেকে দেখেছেন। আজকে জগদীশ্বরবাবু হন-হন করে ঢুকছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন অজয়-বিজয়ের গাড়ি। থমকে দাঁড়ালেন অমনি গেটের পাশে। মেয়েটাকে এক নজর দেখে নেওয়া, বয়সের ফারাক তখন মনে থাকে না। এই ব্যাপারে দু-মিনিট দেরি হয়ে গেল নাম সই করতে। হেডমাস্টার অদূরে, অতএব দশটা সাতাশই লিখলেন, রামকিঙ্করের মতো সময় চুরি করতে যাননি। দেরি হওয়ার দরুন নামের নিচে যথারীতি লাল পেন্সিলের দাগও পড়ল। তবু এক ধরনের তৃপ্তি পলকের ওই দেখে নেওয়ার মধ্যে। কথায় কৌশলে জগদীশ্বর ক্লাসের মধ্যে মেয়েটার পরিচয়ও নিয়েছেন। অজয়-বিজয়ের বড় বোন। ভাই দুটোকে ছেড়ে দিয়ে অফিসে চলে যায়, ভাল কাজ করে কোন অফিসে। এত সমস্ত জেনে নিয়েছেন জগদীশ্বরবাবু।

টিফিনের ঘণ্টায় আধবুড়ো একটি লোক অজয়-বিজয়ের টিফিন নিয়ে এসেছে। বেশি কিছু নয়—দুটো করে সন্দেশ আর কাচের কুঁজোয় জল। রোজই দেখা যায় লোকটাকে এবং রোজই এই এক জিনিস। গেটের বাইরে রাস্তার পাশে গরম গরম পকৌড়ি ভাজে টিফিনের এক সময়টা। রেলিঙের ফাঁক দিয়ে হাত

বাড়িয়ে অনেক ছেলে শালপাতার ঠোঙায় পকৌড়ি কিনে খাচ্ছে। সন্দেশ হাতে নিয়ে বিজয় করুণ চোখে তাকায় সেদিকে। একটা ছেলে বলল, কি গো, লোভ হচ্ছে? খাবে?

বিজয় বলে, সন্দেশ খাও না তুমি একটা।

উঁচু ক্লাসের ছেলে। সে মুখ বাঁকায়: দুর, সন্দেশ কেন খাব? যা নরম— জিভে লেপটে যায় কাদার মতো।

একটু পরে, যেন মহৎ একটা ত্যাগ স্বীকার করছে এমনি ধরনের মুখ করে বলে, তা দাও একটা সন্দেশ। আমি পকৌড়ি দিচ্ছি দুটো। একটার বদলে দুটো দিচ্ছি—খাও।

দুটো পকৌড়ি দু-ভাই তারা ভাগ করে নিয়েছে। পরম আনন্দে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। ওদের সেই লোকের দিকে চেয়ে বলল, তুমি তো আর-কিছু দেখতে পাও না মথুর। সন্দেশ আর সন্দেশ।

মথুর হেসে বলে, বা ঠাকরুন তাই বলছেন যে। তিতু ময়রার দু-আনাওয়ালা সন্দেশ নিয়ে যাবে দুটো করে। তোমরাও কিছু বলনা তো দাদাবাবু।

অজয় বলে, পকৌড়ি ভাল, ডালমুট ভাল, ফুচকা ভাল। আমরা এইসব খাব এখন থেকে, বুঝলে?

মথুর বলে, শক্ত কিছু নয়—রোজই কিনে আনা যায়। এক একদিন একরকম। তোমাদের খাবার ইচ্ছে, আমি কেন এনে দেব না? তবে মা টের পেলে আস্ত রাখবেন না। পইপই করে বলেছেন, সন্দেশ ছাড়া অন্য-কিছু তোমাদের পেটে না যায়।

বিজয় বলে, আমরা কিছু বলব না। জিজ্ঞাসা করলে বলব, সন্দেশ খেয়েছি। টের পাবে কেমন করে মা?

তবুও চিন্তাকুল ভাব মথুরের।

বিজয় বলে, আজকে পকৌড়ি হল যা-হোক একখানা করে। কাল ডালমুট নিয়ে আসবে। কেমন?

মথুর বলে, মুশকিল হল, মা তো মাত্তোর চার আনা করে পয়সা দেন। চারটে সন্দেশ টায়েটোয়ে হয়ে যায়। কিন্তু ডালমুট চার আনায় কুলোবে কিনা ভাবছি।

অজয় বলে, ফুচকা?

শিউরে উঠে মথুর বলে, তাতে তো আরো বেশি খরচ।

অজয় অভয় দিল: ভেবো না মথুর-দা, আমার কাছে টাকা আছে।

পিসেমশায় পুজোর সময় পাঁচ টাকা বাজার-খরচ দিয়েছিলেন। খরচ করিনি, তোলা আছে। সেই টাকা কাল তোমায় দিয়ে দেব। কাউকে কিছু বলব না। ফুচকা নিয়ে এস তুমি কাল।

মহিমের প্রথম দিন আজ, অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন। পিছন দিকে হাত পড়ল একখানা। তাকিয়ে দেখেন মলয় চৌধুরি হাত রেখেছেন তাঁর গায়ে। মুখ মলিন—ঠাহর করলে বুঝি চোখের কোণে জলের আভাস নজরে পড়বে।

তুমি খেলা-টেলা করছ না মলয় ?

ভাল লাগে না সার। আমি বাড়ি যাব। আপনি একবার দারোয়ানকে বলে দিন। মার জন্ম প্রাণ পুড়ছে।

হাত জড়িয়ে ধরে গেটের দিকে নিয়ে চলল মলয়। চললেন মহিম—অমন করে বলছে, হাত ছাড়িয়ে নেবেন কেমন করে ?

বাপে ছেলেয় দারোয়ানি করে। দু-জনে গেটের পাহারায় আছে। ছেলেটা রীতিমতো পালোয়ান, দু-হাতে দুই পাল্লার রড এঁটে ধরে বুক চিতিয়ে আছে—ভাবখানা, কে কত ক্ষমতা ধর এগোও এদিকে। বুড়ো দারোয়ান খানিকটা আগে থেকে ভিড়টা চারিয়ে দিচ্ছে—সবাই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে গেটের উপর না পড়ে। হেডমাস্টারের সই-দেওয়া টিফিন-পাশ যাদের আছে তারাই শুধু বেরতে পারবে। আর বেরবেন মাস্টারমশায় ও গার্জেনরা।

মহিমের কাছে এগিয়ে এসে বুড়ো দারোয়ান হুঙ্কার দেয়, পাশ ?

মহিম হতবুদ্ধির মতো তাকালেন। দারোয়ান বলে, পাশ নেহি তো ভাগো। বজ্জাত, বাঁদর—

করালী কখন পিছন দিকে এসেছেন, হো-হো করে হেসে উঠলেন : পাশ লাগবে না দারোয়ানজি, টিচার ইনি। নতুন এলেন। বয়স কম দেখেছে কিনা ছাত্র বলে ধরে নিয়েছে। কাঁধে চাদরটা ছিল, সেইটে রেখে এসেই গোলমাল। বাইরে বেরবেন বুঝি ? আমি বেরচ্ছি, আসুন।

নাঃ আমার গরজ নেই। ছেলেটা যাবে-যাবে করছে।

মুখ টিপলে দুধ বেরোয়, বাইরের টান ধরেছে এর মধ্যে ? বাইরে যাবে তো গার্জেনের চিঠি নিয়ে এস। বিনি-পাশে যেতে চায়, আব্দা বুঝুন এটুকু ছেলের। এই এক কায়দা। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে—টিফিনের প্রথম মুখে বড্ড চাপ পড়ে তো—পাশওয়ালাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে গোলমালে এমনি দু-পাঁচটা ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে বেরোয়।

মদনের দিকে ফিরে রসিকতা করে করালী বলেন, সে ঝোঁক কেটে গেছে ভায়া। আজকে আর সুবিধে হবে না। লেট করে ফেললে যে। ঘণ্টা পড়তে না পড়তে ভিড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে যাবে। তবেই হবে।

ছেলেটা কি বুঝল, কে জানে। মুখখানা আরও বিষণ্ণ করে চলে গেল। করালী বলেন, আসুন না ঐ মোড় অবধি। পান খাওয়াব। দারোয়ানজি, মাস্টারমশায়কে চিনে রাখ। আর যেন ভুল হয় না।

মহিমের পান খাবার গরজ নেই, কিন্তু করালীবাবুর হাত এড়ানো যায় না। টানতে টানতে নিয়ে চললেন। পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেলেন অন্য এক মাস্টার। সলিলবাবু। দীর্ঘ অস্থিসার দেহ, মাথাভরা টাক, দু-চোখ কোটরে বিলুপ্ত। কিন্তু ছুটেছেন বাতাসের বেগে।

করালী চোখ টিপে বলেন, মজাটা দেখুন:

চেঁচাচ্ছেন, ও সলিলবাবু, শুনুন দরকারি কথা আছে একটা, শুনে যান!

বারংবার ডাকাডাকিতে সলিলবাবু পিছনে চেয়ে একটিবার হাত ঘুরিয়ে আরও বেগ বাড়িয়ে দিলেন।

ও সলিলবাবু, আপনার জামাইয়ের চাকরি হয়েছে। খবর পেয়েছেন?

হুঁ-উঁ-উঁ—একটা অব্যক্ত স্বর বের করে সলিলবাবু অদৃশ্য হলেন।

করালী হেসে উঠলেন, দেখলেন! গুপ্ত-অধ্যাপনার শাহান-শা। এখন হল যাত্রা-মুখ—ছেলে ছাত থেকে পড়ে গেছে শুনলেও অমনি হাত ঘুরিয়ে দিয়ে ছুটবেন।

হিম বুঝতে পারেন না: গুপ্ত-অধ্যাপনা ব্যাপারটা কি?

করালী বলেন, সে কী মশায়, মাস্টারি লাইনে এলেন, গুপ্ত-অধ্যাপনা জানেন না? ওই তো আসল। ইংরেজিতে যাকে বলে প্রাইভেট টুইশান। কিন্তু আমার আপিসেও ওটা গুপ্ত হল না! দু-বেলায় মোটমাট চারটের বেশি পেরে উঠি নে।

সলিলবাবু পড়াতে চললেন এখন?

করালী বলেন, সকালে বিকালে রাত্রে তো আছেই। ঠাসা একেবারে, নিঃশ্বাস ফেলার ফাঁক নেই। বাড়তি একটা এই ইস্কুলের মধ্যে সেরে আসেন। চিত্তবাবুকে রোজ চা খাইয়ে জপিয়ে-জপিয়ে রেখেছেন—টিফিনের পরের পিরিয়ডটা ফাঁক করে দেন। চালাকি কেমন! বেঁটে বইতে লিখলে রেকর্ড থেকে যাবে, অমুক মাস্টারের ক্লাসে রোজ একে তাঁকে পাঠানো হচ্ছে—সেজন্য আলাদা স্লিপ পাঠানো হয়। বাইরে থেকে লোকে জানে, বড্ড সাধাসিধে গোবেচারা মাস্টার আমরা—ভিতরে ঢুকলে হরেক মজা দেখবে।

পানের দোকানের সামনে দাঁড় করালেন। তবল-বিড়ি কিনে দিলেন এক পয়সা দিয়ে। সিগারেট কিনতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মহিম খান না। মাস্টার মানুষের পক্ষে রীতিমতো সদাব্রতের ব্যাপার। তবে করালীকান্তর কথা স্বতন্ত্র, ষোল আনা মাস্টার তিনি নন। তার উপরে বড় ঘরের ছেলে। মুক্কি, লক্কা, গোলা আর লোটন—চার রকমের একশ'টা পায়রা পুষতেন তাঁর ঠাকুরদাদা—শুধুমাত্র পায়রার বাবদে কত টাকা যেত মাসে মাসে! আজকে পয়সা না থাকুক মেজাজটা যাবে কোথা?

বললেন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি, বলুন দেখি।

সম্পর্ক কী আবার!

তাই বললে কি শুনি মশায়। সম্পর্ক না থাকলে নিজে লিখে পাঠিয়ে চাকরি দিতেন না। বলতে চান না, সেইটে বলুন।

মহিম বলেন, সত্যি এমন কিছু নয়। আমার বাবা ছেলেবেলায় কিছুদিন তাঁকে পড়িয়েছিলেন—মহৎ ব্যক্তি তিনি—

কথা লুফে নিয়ে করালী বলেন, সে তো একশ বার। হাজার বার। কেউ কেউ আবার কি বলে জানেন?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বললেন, ছোট ভাইয়ের মতন আপনি। বলেই ফেলি। কেউ কেউ বলছে, ভিতরের খবরাখবর নেবার জন্য প্রেসিডেন্ট একজন নিজের লোক বহাল করলেন। তাই যদি হয়, আমি তো দোষের কিছু দেখিনে। এত নামডাকের ইস্কুল, ইন্দ্র-চন্দ্র বায়ু-বরুণ বেরিয়েছেন এখান থেকে—আজ তিন বছর ধরে যা রেজাল্ট হচ্ছে বলবার কথা নয়। যাবতীয় গুহ্য ব্যাপার কর্তাদের কানে যাওয়া উচিত। নয় তো সংশোধন হবে কি করে? ওই যে সলিলবাবু ইস্কুল ছেড়ে টুইশানি সারতে চললেন—কিংবা ওই চিত্তবাবুই বেঁটেখাতায় প্রকাশ্যে মারেন, আবার চোরাই-মার মারেন স্লিপ পাঠিয়ে। বড়দের গা ছুঁতে সাহস পান না, মরণ যত হাবাগোবা নরম মাস্টারের।

একটু থেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগলেন, এই আমার কথা ধরুন। ভালমানুষ বলে কোনদিন আমি কিছু বলতে যাই নে কেরারটেকারের কাজ কত রকমের তার অন্ত নেই। চক-স্টক কিনতে এখন এই কলুটোলা ছুটলাম। এমনি তো হামেশাই। কতটাকা দেয় বলুন তো—পাঁচটি টাকা মাসিক এলাউন্স। আর লাইব্রেরিয়ান করে রেখেছে, সেই জন্যে পাঁচ। ভাবতে পারেন? কমিটির মিটিং শিগগির—আমি দরখাস্ত দিয়েছি।

কথায় কথায় আপনি আমার সম্বন্ধে শুনিয়ে রাখবেন তো প্রেসিডেন্টকে। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি, সেইজন্য বললাম কথাটা।

ভাবেন কি এঁরা। প্রেসিডেন্ট যেন পেয়ারের লোক—হরবখত দেখাসাক্ষাৎ হয়, গল্পগুজব চলে! ইস্কুলের খবরাখবরের জন্য তাঁরা উৎকর্ণ হয়ে আছেন, করালীবাবুর জন্যে সুপারিশ করে দিলেই এলাউন্স সঙ্গে সঙ্গে দুনো-তেদুনো হয়ে যাবে!

রামকিঙ্কর, দেখা গেল, ছেলেদের ঠেলেঠুলে সরিয়ে ডান হাতে মুখ মুছতে মুছতে জলের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। জামার হাতা আর বুকের উপরটা ভিজে জবজবে। উপরে গিয়ে উঠলে জগদীশ্বর বললেন, এ কি রামকিঙ্করবাবু, একেবারে চান করে এসেছেন!

ছোঁড়ারা নড়িয়ে দিল ধাক্কা দিয়ে। পিছন দিকে দুটো চোখ যদি থাকত দেখে নিতাম শয়তানগুলোকে।

জগদীশ্বর বলেন ; বড্ড জল খান আপনি। অত ভাল না। এই তো থার্ড পিরিয়ডের মুখে অতক্ষণ ধরে খেলেন।

রামকিঙ্কর হাসিমুখে বলেন, সকলের একবার টিফিন, আমার ঘণ্টায় ঘণ্টায়। থার্ড পিরিয়ডে একবার হয়ে গেছে, আবার এই।. আরও হবে।

কিন্তু অত খেয়ে এলেন, বউমা সামনে বসে খাওয়ালেন। এখন আবার জলে পেট ভরাতে হচ্ছে?

চটে গিয়েছেন রামকিঙ্কর : কোথা থেকে গল্প বানান, বলুন তো শুনি।

বানান কেন? আপনিই তো বললেন হেডমাস্টারকে।

উপরওয়ালার কাছে মানুষে কত কি বলে থাকে। সে সব ধর্তব্যের মধ্যে নাকি? সত্যি কথা শুনুন তবে। বউমা হারামজাদী ভারি দজ্জাল—অজাতের ঝাড়। ইস্কুলের মাইনে একুশ টাকা পয়লা তারিখে নিয়েছে। টুইশানির পনর টাকা বরাবর সাত তারিখের মধ্যে আদায় করে দিই। ক'দিন থেকে তাগাদা দিচ্ছে। তা টুইশানি কোথা এখন? সে ঘোড়ার ডিম ও-বছরের সঙ্গে সঙ্গে ডিসেম্বরে খতম হয়ে গেছে। নতুন আর গাঁথতে পারিনি বলবার জো নেই —বললেই ক্ষেপে যাবে। সন্দ করেছে তবু বোধহয়। এটা-ওটা ওজুহাত করে আজ তো মোটে রাঁধতেই গেল না ইস্কুলের আগে।

এত শিক্ষকের মধ্যে জগদীশ্বরের সঙ্গেই ভাবসাব বেশি। মনের দুঃখ তাঁর কাছে বললেন। বলে ফেলেই সামাল করে দেন : কাউকে বলবেন না কিন্তু— খবরদার! হেডমাস্টার টের না পান। দশের কাছে তা হলে পসার থাকবে না!

টিফিন শেষ হওয়ার সামান্য একটু আগে ক্ষুদিরাম এক টুকরো কাগজ এনে মহিমের হাতে দিল : এম-আর-এস উইল প্লিজ টেক থার্ড-ই ইন দ্য ফিফথ পিরিয়ড। করালীবাবু যা বলে গেছেন, সেই বস্তু—স্লিপ পাঠিয়ে চোরাইমার মারা।

গগনবিহারীবাবু বলেন, এসে গেলো তো ? আসতেই হবে। নতুন মাস্টার আপনি. ফোঁস করতে পারবেন না—এই চলল এখন একনাগাড়। কোন্ ক্লাস, না দেখে বলে দিতে পারি। থার্ড-ই—মিলেছে ? কি পড়াতে হবে, বলে দিচ্ছি। অঙ্ক। ক্লাসে গিয়ে দেখবেন. মেলে কিনা। কার ক্লাস তা-ও বলে দিই তবে। খোদ ছোটবাবু—চিত্ত গুপ্তের। ভুলেও ক্লাসে যান না। আরে মশায়, হাতে ক্ষমতা আর হাতের কাছে বেঁটেখাতা রয়েছে—কোন্ দুঃখে ক্লাস নিতে যাবেন ?

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অ্যাসিস্টাণ্ট-হেডমাস্টার চিত্ত গুপ্ত। থতমত খেয়ে গগনবিহারী থেমে গেলেন। মহিম ফিরে তাকিয়েছেন, হাতছানি দিয়ে চিত্তবাবু কাছে ডাকলেন : গ্র্যাজুয়েট সুশিক্ষিত মানুষ আপনি—পর পর তিনটে নিচের ক্লাসে দিয়ে মনে মোটে ভাল ঠেকছিল না। যান এবারে উপরের ক্লাসে। প্রেসিডেণ্ট আপনাকে বাজিয়ে দেখতে বলেছেন, তা 'বালক পাঠ' আর 'গণিত মুকুল' নিয়ে কী আর বাজানো যায়। বিস্তর কষ্টে তাই ব্যবস্থা করেছি। সিঁড়ি দিয়ে তেতলা উঠে যান। চৌকাঠের মাথায় নাম-লেখা বোর্ড ঝুলছে—থার্ড-ই দেখে নেবেন।

উপরের ক্লাসে পড়াতে গিয়ে কৃতকৃতার্থ করেছেন—মুখে চোখে তেমনি এক গরিমার ভাব এনে চিত্তবাবু নিচে তামাক খাবার ঘরে চললেন। কয়েক পা গিয়ে ফিরে এসে বললেন, বলে দিই একটা কথা। ক্লাস ঠাণ্ডা থাকে যেন। ছেলেগুলো ত্যাঁদড়। ক্লাসের ভিতরে বসে কি কাজ করছেন, কেউ দেখতে যাবে না। কিন্তু গোলমাল হলে বাইরের লোকের কানে আসবে। তাই বুঝে কাজ করবেন।

কত কালের কথা. ভাবতে গেলে মহিমের এখনও সব মনে পড়ে। দুর্দান্ত ক্লাস থার্ড-ই'তে দুর্গানাম স্মরণ করে ঢুকে. পড়লেন মহিম। দৈত্যসম একজন পিঠ-পিঠ ঢুকল—লম্বায় চওড়ায় এবং ওজনে মহিমের দেড়গুণ তো হবেই। গার্জেন ভেবে মহিম শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি সার এই ক্লাসে পড়ি। জল খেতে গিয়েছিলাম।

টিফিনের পরে হাজিরা-বইটা আবার ডেকে নেওয়ার নিয়ম। সেই সময়

ছাত্রের নামটা দেখে নিলেন : মণীন্দ্রমোহন ঘোষ। দেখা গেল, দৈত্য ঐ একটা মাত্র নয়—আধ ডজনের উপর। বজ্জ বুক ঢিবঢিব করছে। তবু কিন্তু তাই নিয়ে মহিম পরবর্তীকালে দুঃখ করতেন। কী রকম ভরভরতি ক্লাস তখনকার! এক ছেলে দু-ছেলের বাপ কতজন বই খাতা নিয়ে বেঞ্চিতে এসে বসেছে। মণি ঘোষের অবশ্য তা নয়। বয়স কমই, তবে স্বাস্থ্যটা বাড়াবাড়ি রকমের ভাল। আর এখনকার ক্লাসের ছেলেদের তো দেখাই যায় না চোখে, হাই-বেঞ্চির ফাঁকে উহ্য হয়ে থাকে। কলির শেষে সব বামন হয়ে যাবে, বেগুনতলায় হাট বসবে—সেইসব দিন এসে যায় আর কি!

মাথার উপর বন বন করে পাখা ঘুরছে, তবু দস্তুরমতো ঘাম দেখা দিয়েছে মহিমের। দুর্বলতা দেখানো চলবে না। কারো মুখের দিকে না চেয়ে মহিম বললেন, কি অঙ্ক হচ্ছে তোমাদের?

টাইম এণ্ড ওয়ার্কস—

মণি ঘোষ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল : তার আগে এই অঙ্ক ক'টা করে দিন স্যার। হচ্ছে না।

মহিম ঘাড় নাড়লেন : এখন নয়, পরে।

একবার আড়চোখে তাকালেন মণির খাতার দিকে। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা। প্রেসিডেণ্ট হেডমাস্টারকে পরখ করে দেখতে বললেন, তার আগে এই ক্লাসের ছেলেরাই পরীক্ষা করবে তাঁকে। ফাঁদের ভিতরে পা না দেওয়াই ভাল।

ক্লাসের কাজ হয়ে যাক, তারপরে ওইসব বাইরের অঙ্ক—। গম্ভীরভাবে রায় দিয়ে মহিম পাটিগণিত খুললেন। খুব সহজ করে বোঝাচ্ছেন। একটা অঙ্ক ধরে তার ভিতর গল্প এনে ফেলেছেন। এ জিনিসটা ভাল পারেন তিনি। সেই নন-কো-অপারেশনের সময়টা কলেজ ছেড়ে কিছুদিন হাটে-মাঠে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছিলেন নিরক্ষর চাষাভুষোর কাছে। ঢংটা ভোলেননি এখনো দেখা যাচ্ছে। নতুন মাস্টার সম্পর্কে কৌতূহল থাকায় ছেলেরা গোড়াতেই একেবারে বরবাদ করে না—শোনা যাক কি বলেন। কি বলছেন তা নিয়ে মাথাব্যথা নয়, কিন্তু বলার ধরনটা বেশ ভাল। হঠাৎ মহিমের কানে গেল—মণি ঘোষ ফিসফিসিয়ে বলছে, বিষম চালাক। এমনি করেই ঘণ্টা কাবার করে দেবে, গোলমালের মধ্যে মাথা ঢোকাবে না।

মহিমের অভিমানে লাগল। অঙ্কে অনার্স-পাওয়া মানুষ, আর উঁচু ক্লাসেই একটি মেয়েকে অঙ্ক কষিয়ে থাকেন রোজ সন্ধ্যাবেলা। ছেদ টানলেন

পড়ানোর। মণির দিকে চেয়ে বললেন, দাও খাতাটা তোমার। কিন্তু একটা কথা—

ক্লাসে সর্বত্র দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, অঙ্ক করছি আমি। কিন্তু বোর্ডের দিকে ফিরে অঙ্ক কষব, তোমরা সেই সময় গণ্ডগোল করবে না কথা দাও।

মণি ঘোষ প্রধান পাণ্ডা। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, টুঁ শব্দটি হবে না সার। আপনি করুন।

প্রথম অঙ্কটা হয়ে গেল। মহিম বললেন টুকে নাও তোমরা।

মণির চোখ বড় বড় হয়ে গেছে: এর মধ্যে হয়ে গেল?

উত্তর মিলিয়ে দেখ হয়েছে কিনা? তাড়াতাড়ি কর। এতগুলো কষতে দিয়েছ এই সামান্য সময়ের মধ্যে।

কেল্লা ফতে, বুঝতে পারছেন মহিম। এদের মন চিনে নিয়েছেন। আগের অঙ্ক মুছে ফেলে পরেরটা ধরছেন ইতিমধ্যে! খটখট খটাখট—দ্রুতবেগে খড়ি চলেছে ব্লাক-বোর্ডের উপর। হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, এবারে এই উপরের রাশিটা বাদ দিয়ে নিলেই উত্তর। বুঝতে পারছ?

মণি বলে, আর করতে-হবে না সার। বাকিগুলো বাড়িতে করব আমি। পাটীগণিতের যেখানটা হচ্ছিল, তাই হোক এবারে।

ক্লাস চুপচাপ একেবারে। ঘণ্টা পড়লে মহিম বেরুলেন, মণিও এল সঙ্গে সঙ্গে। বলে, পায়ে ধরে মাপ চাচ্ছি সার। আমাদের ক্লাসের বদনাম শুনে এসেছেন। কিন্তু রোজই নতুন এক একজন এসে উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে হাতির মুণ্ড গণেশের ধড়ে চাপিয়ে—কোন রকমে সময় কাটিয়ে চলে যান। কিছু জানেন না তিনি, ধরেপেড়ে আচমকা ক্লাসে পাঠিয়ে দিয়েছে—তিনি কি করবেন? আমরাও তেমনি ঘায়েল করবার জন্য অঙ্ক ঠিক করে রেখেছি। আপনি আসবেন সার, একটুও গোলমাল হবে না দেখতে পাবেন।

মাস্টারির সেই প্রথমদিনেই আত্মবিশ্বাসে মন ভরে গেল। থার্ড-ই'র ছেলেগুলো নাকি বাঘ—দুটো অঙ্ক কষেই বাঘের দল মহিম বশ করে ফেলেছেন। ছেলেরা সব সত্যি ভাল—মণি ঘোষ ভাল, মলয় ভাল। ভাল লাগছে না ওই মাস্টারমশায়দের! শিক্ষিত জনেরা মহৎ কাজের ভার নিয়ে আছেন, আর ফাঁক পেলেই ইনি ওঁর গায়ে কালি ছিটোবেন, এ কী ব্যাপার? পিরিয়ড কাটলে সবাই ক্ষেপে যান, আর মহিমের উল্টো—লিসার উপভোগ না করে ক্লাসে ছেলেদের মাঝে বসতে পারলেই বেঁচে যান যেন। অলিগলির অন্ধকার কাটিয়ে খোলা মাঠের ঝলমলে আলোয় আসার মতন।

সলিলবাবু ডাকছেন, দাঁড়ান মশায়, অত ছুটছেন কেন? ক্লাস তো আছেই। বছরের পর বছর কত ক্লাস করবেন, করতে করতে ঘেন্না ধরে যাবে। আলাপ-পরিচয় করি এক মিনিট—

পাশে এসে নিচু গলায় বললেন, করালীবাবু কি বলছিলেন তখন? আমার কথা কিছু?

মহিম ঘাড় নেড়ে দিলেন। চারু-দা ওঁরা বলতেন, সবচেয়ে বড় কাজ হল মানুষ গড়ে তোলা। সেই কাজে এসে পরনিন্দা-পরচর্চায় জড়িয়ে পড়বেন না। কিন্তু নাছোড়বান্দা যে সলিলবাবু। বললেন, তবে?

নিজের সম্বন্ধে বলছিলেন দু-এক কথা।

আছেন তো রাজার হালে। দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান। ওঁর আবার কি কথা?

মহিম ইতস্তত করে বলেন, কেয়ারটেকারের এক কাজ—এলাউন্স মাত্র পাঁচ টাকা। এই সমস্ত আর কি—

সেই তো অনেক হে!

পতাকীচরণ ইতিমধ্যে এসে জুটেছেন। তিনি বললেন, কমিটি কাজটা নিলামে তুলে দিন। এলাউন্স এক পয়সাও দেওয়া হবে না, উল্টে মাসে মাসে কে কত দিতে পারেন ইস্কুলকে। আমার ডাক থাকল দশ টাকা।

সলিলবাবু বলেন, আমার পনের—

হেসে নিলেন খানিকটা। বলেন, দাদামশায়ের এক চাকর ছিল, সব জায়গায় তার দস্তুরি। একটা সন্দেশ কিনতে দিয়েছেন একদিন—কী আর করে জিভে চেটে নিল সন্দেশটা? আমাদের করালীবাবুরও তাই। ইস্কুলের এক বোতল ফিনাইল। কিনলেও সিকি পরিমাণ শিশিতে ঢেলে বাড়ি রেখে আসবেন। দুখিরাম জানে অনেক-কিছু, তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করবেন।

হেডমাস্টারের মুখ দেখতে পেয়ে নিমেষে তাঁরা ক্লাসে ঢুকে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

কালীপদ কোনার পরিচালক কমিটির মেম্বার—মাস্টারদের প্রতিনিধি, তাঁরা ভোট দিয়ে পাঠিয়েছেন। তেমনি আর একজন মেম্বার চিত্তবাবু। হেডমাস্টার তো আছেনই।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন কালীপদ। পাঁচ-সাত জনে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। পতাকীচরণ, জগদীশ্বর ও সলিলবাবু আছেন। হৃদয়ভূষণ চার বছর অস্থায়ীভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তিনিও গলা বাড়িয়েছেন পিছন দিক থেকে। কমিটির মিটিং হওয়া সর্বোদয়-যোগ কিংবা কুম্ভমেলার মতন ব্যাপার। একবার হয়ে গেল তো আবার কবে হবে কেউ বলতে পারে না। সেক্রেটারী অবনীশ চাটুজ্জে ডাক্তার মানুষ, আর প্রেসিডেন্ট হলেন এডভোকেট। একজনের সময় হল তো অন্য জনের সময় হয় না। অথচ অনেক কাজ আছে। কাল রাত্রে কালীপদবাবু ও চিত্তবাবু ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন সেক্রেটারির কাছে—কবে মিটিং হবে আলোচনার জন্য।

কি ঠিক হল বলুন। সেক্রেটারি কি বললেন?

কথা বলতে বলতে কালীপদ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন। বললেন, পুজোর মধ্যে হয়ে উঠবে না। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর দিকে স্পোর্টস আর প্রাইজ-ডিষ্ট্রিবিউশন হবে, সেই সময়। এবারে অনেক কষ্টে প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারির সময় হল তো মুশকিল রায়মশায়কে নিয়ে। তিনি বৃন্দাবন চলে গেছেন।

রাখহরি রায় ভাইস-প্রেসিডেন্ট। বুড়ো হয়ে কাজকর্ম থেকে রিটায়ার করে তীর্থধর্ম করে বেড়ান। ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর পিতামহ—তাঁকে বাদ দিয়ে মিটিং হলে ক্ষেপে যাবেন বুড়ো একেবারে: ন-মাসে ছ-মাসে একবার তো বসবে, আমায় ছেঁটে ফেলার মানেটা কি? জঙ্গল কেটে জলাজমিতে মাটি ফেলে ঠাকুরদা-মশায় ইস্কুল-ঘর বানালেন, আমি কেউ হলাম না—তৈরী রুটি ফয়তা দিতে এসেছে, তোমরা কারা হে চাঁদ? পিতৃপুরুষের জমাখরচ খুঁজে দেখো তো একটি পয়সা কেউ কখনো দিয়েছেন কিনা।

বড় কটুকাটব্য করেন বুড়ো, বাড়ি বয়ে গালিগালাজ দিয়ে আসেন। কাউকে গ্রাহ্য করেন না। তাঁকে বাদ দিয়ে মিটিং হয় না।

জগদীশ্বর ক্ষেপে গিয়ে বললেন, রায়মশায় নেই আজ পাঁচ-সাত দিন। এদ্দিন কি হচ্ছিল—নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমচ্ছিলেন আপনাদের সেক্রেটারি?

কালীপদ বলেন, ঘুমুবেন কি—রুগি দেখে সময় করতে পারেন না। রাত্রি-বেলাতেও ঘুমতে দেয় না। বলছিলেন সেইসব কথা।

ছেড়ে দিলেই তো পারেন।

কালীপদকে সাহসী ও স্বাধীনচেতা বলে নাম বজায় রাখতে হবে মাস্টার-মশায়দের কাছে। পরের বারেও ভোট পাবার জন্য। সায় দিতে হবে অতএব সেক্রেটারির নিন্দায়। এঁরা যা বলবেন, অন্তত পক্ষে তার ডবল বাড়িয়ে বলতে হবে।

পতাকীচরণ বললেন, সময় নেই তবে ছেড়ে দেন না কেন ?

কালীপদ হেসে বলেন, আজকে পশার আছে, কাল যদি না থাকে। তখন সময় কাটবে কিসে ? হাঁকডাক করবেন কাদের উপর ? দলে দলে সব পাশ করে ডাক্তার হয়ে বেরচ্ছে—ডাক্তারের গাদি লেগে যাবে। ওঁর মতন ক্যাম্বেল-ইস্কুলের ডাক্তারের কাছে কে তখন আসবে ? এইসব ভেবেই আঁকড়ে রয়েছেন বোধহয়।

পতাকীচরণ রসান দিয়ে বলেন, নতুন ডাক্তার লাগবে না, নিজেই তো মেরে মেরে শেষ করে দিচ্ছেন। মানুষ-বেঁচে থাকলে তবে তো রুগি ! সবাই বলে, অবনীশ ডাক্তারের হাতে রুগি ফেরে না। যমরাজের দোসর। তা উনি দেশের কাজও করছেন বটে ! দু-চারশ অমন ডাক্তার থাকলে দেশে আর খাদ্যসমস্যা বলে কিছু থাকত না। মানুষ না থাকলে কে খাবে ?

কালীপদ বলেন, তবু গিয়ে একবার দেখে আসুন পশারটা। আমরা সময় ঠিক করে গিয়েছিলাম, যে সময়টা রুগিপত্তর থাকবে না। কিন্তু কথা বলছেন তার মধ্যেও অমন পাঁচবার টেলিফোন। প্রেস্কৃপসন হাতে কম্পাউণ্ডার এসে ঢুকছে, উঠে উঠে রুগির সঙ্গে কথা বলে আসছেন।

পতাকী বলেন, হবেই। মাছ-মানুষ-মশা যত মারবে তত কোলথেঁসা। ছিপে যত মাছ তুলবেন, চারে ততই মাছের ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে। মানুষও তাই।

জগদীশ্বর অধীর হয়ে বলেন, মস্করা রাখুন মশায়। পুজো এসে পড়ল, একশ গণ্ডা খরচ মাথার উপরে, পুজো-বোনাস চাই। আর এদ্দিন টালবাহানা করে রায়মশায়কে বৃন্দাবনে পার করে এখন বলছেন মিটিং হবে না।

কালীপদ বলেন, বোনাসের কথাবার্তা হয়ে গেছে। সকলেই সই দিয়ে একখানা দরখাস্ত পাঠান। হেডমাস্টারের পঞ্চাশ টাকা, চিত্তবাবুর চল্লিশ আর সকলের পঁচিশ করে নিজ দায়িত্বে দিয়ে দেবেন সেক্রেটারি। সেটা মিটিয়ে এসেছি একরকম।

করালীকান্ত বলেন, ঐ ছিটেফোঁটাই শুধু। আসল যে মাইনে-বৃদ্ধির ব্যাপার, সেটা কেবলই চাপা দিয়ে যাচ্ছে। তিন বছর অন্তর মাইনে বাড়ার কথা—কদ্দিন হয়ে গেল দেখুন।

রামকিঙ্কর ছুটোছুটি করে আসছিলেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভ্রূভঙ্গি করে তিনি বলেন, মাইনে বৃদ্ধি করে ওরা অখণ্ড হিমালয়পর্বত দিয়ে দেয়। আপনারাও যেমন ! আমার সেবারে পনের আনা বৃদ্ধি হয়েছিল।

কালীপদ ঘাড় নেড়ে বলেন, উঁহু, আদায় তো হয়নি, ভুল বলছেন রামকিঙ্করবাবু।

মাইনে কুড়ি টাকা ছিল, একুশ করে দিল। কুড়িতে স্ট্যাম্প লাগত না। স্ট্যাম্পের দাম বাদ দিয়ে কত বেড়েছে, হিসাব করুন।

লাইব্রেরি-ঘরের সামনের বারান্দায় তখন অনেকে এসে জমেছেন। বেশ একটা গুলতানি হচ্ছে। সলিলবাবু বলেন, আমি মশায় মাইনে-বৃদ্ধি চাই নে। স্ট্যাম্প-কাগজে লিখে দস্তখত করে দিতে পারি। ওঁরাই বরঞ্চ দাবি করতে পারেন, ট্রেডমার্ক দেগে দেওয়ার দরুন। ভারতী ইনস্টিটুশন-ব্রাণ্ড আমরা, যেমন ওদিককার ওঁরা হলেন প্রাচী শিক্ষালয় ব্রাণ্ড। ব্রাণ্ড দেখে লোকে টুইশানিতে ডাকে আমাদের, ব্রাণ্ড অনুযায়ী দর। মাস্টারি চাকরি ছেড়ে দিন—তখন আর কেউ ডাকবে না। সকালে বিকালে খোকাকে কোলে নাচানো ছাড়া কাজ থাকবে না আর তখন।

হৃদয়ভূষণ ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। এতক্ষণ ধরে সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন, একটিবার মুখ খোলেননি। নিঃশ্বাস ফেলে কতকটা যেন আপনার মনেই বললেন, সাধ ছিল ভারতীর পুরো মাস্টার হয়ে যাব চোখ বুঁজবার আগে। মফস্বলের হেডমাস্টারি ছেড়ে চলে এসেছি। সে বোধ হয় আর ঘটে উঠল না। চিরকাল প্রিন্স-অব-ওয়েলসই থেকে গেলাম। যেমন হচ্ছিল টেকো-এডোয়ার্ডের বেলা।

করালীবাবু ওদিকে হতাশভাবে মহিমকে বললেন, মিটিং হল না, আমার তো ভাই সমস্ত বরবাদ। আপনাকে সেই বললাম—তারপরে মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি হেঁটে নতুন একজোড়া জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেলেছি। কোন কালে মিটিং হবে, তখন কি আর মনে থাকবে ওঁদের? আবার তখন গোড়া থেকে তদ্বির।

হঠাৎ চিত্তবাবু বেরিয়ে এলেন: কি হচ্ছে আপনাদের? ছেলেরা আশে-পাশে ঘুরছে—যা বলার থাকে, ঘরের ভিতর গিয়ে বলাবলি করুন গে।

মহিমকে একান্তে নিয়ে গেলেন: শুনুন সুখবর দিচ্ছি। প্রেসিডেন্টের কাছে হেডমাস্টার গিয়ে আপনার কথা বলে এসেছেন। আমি বলে দিয়েছিলাম, অঙ্ক ইংরেজি বাংলা তিনটে বিষয়ে চৌকোস—অ্যারেঞ্জমেন্ট-বইতে চোখ বুঁজে নাম ফেলা যায়, ভাবতে হয় না। হাতে পেয়ে এমন মাস্টার কে ছাড়ে বলুন। আর ভারতী ইনস্টিট্যুশন, দেখতে পাচ্ছেন, সমুদ্র বিশেষ। ছাত্র-মাস্টার উভয় দিক দিয়ে। এ সমুদ্রে এক-এক ঘটি জল ঢাললেই বা কি, তুলে নিলেই বা, কি! একজন মাস্টারের কমবেশিতে কিছু আসে যায় না।

হল তাই, চাকরি আপনার বরাবর চলবে। প্রেসিডেন্টের লোক আপনি—উন্নতি সুনিশ্চিত। ওঁদের ঐ খেয়োখেয়ির মধ্যে কখনো যাবেন না।

মহিমও তা চান না। কিন্তু নিজে কিছু না বললেও কানে শুনতে হয় অবিরত। লিসার-পিরিয়ডে কানের ভিতর তুলো ঢুকিয়ে বসে থাকতে পারেন না তো!

পূজোর ছুটি এসে যায়। ক্লাসে ক্লাসে সার্কুলার গেছে, দু-মাসের মাইনে দিয়ে দেবে সব বাইশ তারিখের মধ্যে। ইস্কুল খুলেই এগজামিন। ডি-ডি-ডি একদিন মিটিং করলেন মাস্টারদের নিয়ে: কোন্ বইয়ের কতদূর অবধি এগজামিন, এই হপ্তার মধ্যে লিখে আপনারা চিত্তবাবুর কাছে দিয়ে দেবেন। গত বছরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তারপর খাতায় তোলা হবে। কম হবে না, অন্তত সিকি পরিমাণ বেশি হওয়া চাই আগের তুলনায়। গতবার এই নিয়ে না-হক কথা শুনতে হল সেক্রেটারীর কাছে। কমিটিতেও উঠেছিল, কালীপদ-বাবুর কাছে শুনে দেখবেন।

বাইরে এসে গগনবিহারী ফেটে পড়লেন: রুগি দেখে সময় পায় না, সেক্রেটারির বয়ে গেছে প্রোগ্রেস মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে। বোঝেও কচু। সেক্রেটারির বাড়ি কে কে যায়, খবর নিয়ে দেখ। সকল মাস্টার নিয়ে ব্যাপার—মাস্টারদের কেউ বলতে যাবেন না। বলে অমূল্যটা! কেরানি মানুষ—তা জন্মে কোনদিন কলম ছুঁয়ে একটা দুর্গানাম লিখতে দেখলাম না। কাজ একটা তো চাই—সে-ই গিয়ে সেক্রেটারির কাছে ধরিয়ে দিয়ে আসে।

ভূদেব বলেন, লাগিয়ে কি করবে? পড়ানো নিয়ে কথা—প্রোগ্রেস কম হয়ে থাকে, বেশ, দিচ্ছি এই পনের-বিশ দিনে বইয়ের আগাপাস্তালা পড়িয়ে। ভরাই নাকি?

চলল পড়ানো। জানুয়ারি থেকে যদি অর্ধেক আন্দাজ হয়ে থাকে তো বাকি অর্ধেক এই ক'দিনের ভিতর সারতে হবে। টানা পড়ে গেলেও তো হয় না। গগনবিহারী বলেন, কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। আমাদের কি, দিন ছুটিয়ে পাঞ্জাব-মেল।

ঘণ্টা বাজতে বাজতেই মাস্টাররা এখন ক্লাসে যান, ক্লাসে ঢুকেই গড়গড় করে পড়ান। মুশকিল হল, ভাল ছেলেও দু-একটা থাকে ক্লাসে। একটা যেমন অশোক। বেটা যেন মুখিয়ে থাকে: এইখানটা বুঝতে পারছি নে সার।

বাড়ি গিয়ে বুঝো—

বাড়িতে টিউটর নেই। বাবা টিউটর রাখবেন না। তাঁদের সময় টিউটর থাকত না, তবু তাঁরা ভাল করে পাশ করতেন।

তবে বাবাই পড়াবেন। সকলে দিব্যি বুঝে যাচ্ছে, একা তুমি না বুঝলে কী করতে পারি বাবা?

প্রমাণ হিসেবে একজন দুজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে হয়। শেষ বেঞ্চির কোনে দুটো ছেলে কাটাকাটি খেলছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক দূর থেকে দেখেই বুঝতে পারেন। তাদের সামনের ছেলেটাও নিশ্চয় গল্পের বই পড়ছে হাই বেঞ্চির নিচে রেখে। অমন অখণ্ড মনোযোগ নয়তো সম্ভব না। গগনবিহারী তাদেরই ডাক করে বললেন, কি হে, বুঝতে পারছ না তোমরা?

রঙ্গভঙ্গে বিচলিত হয়ে তারা একসঙ্গে হাঁ-হাঁ করে ওঠে: হাঁ সার—

তবে? তোমার একার জন্যে প্রোগ্রেস আটক রাখা যায় না। বিশেষ সেসনের এই শেষ মুখটায়।

এই সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদে তবু খানিকটা সময় চলে গেল। দিব্যি বুঝিয়ে দেওয়া যেত এর মধ্যে। কিন্তু না, আশকারা দেওয়া চলবে না। তা হলে পেয়ে বসবে।

'ক্লাসটিচার' বলে বিশেষ ভাবে যাঁর উপরে ক্লাসের যাবতীয় দায়িত্ব। পতাকীচরণ থার্ড-বি'র ক্লাসটিচার। ক্লাসে গিয়ে তিনি বলছেন, কি রে, ছুটির দিনে কি করবি তোরা? চাঁদা কেমন উঠছে? ডি-সেকশনের, যা শুনেছি, ধুমধাড়াক্কা ব্যাপার। এক টাকা করে দিচ্ছে প্রত্যেকে, কেউ বাদ নেই। তবে তো চল্লিশ টাকা—বেশি ছাড়া কম নয়। অনন্তবাবুকে সিল্কের চাদর দেবে, বলাবলি করছে।

আবার থার্ড-ডি'র ক্লাসটিচার অনন্ত ঠিক অমনি কথা বলছেন। বি-সেকসন তো বিষম তড়পাচ্ছে। এবারে নাকি বসিয়ে দেবে তোদের। তাই নিয়ে তর্কাতর্কি আজ পতাকীচরণবাবুর সঙ্গে—ব্যারিস্টার সিংহসাহেবের ছেলে রয়েছে এই ক্লাসে, হারিয়ে অমনি দিলেই হল!

শঙ্কিত থার্ড-ডি'র ছেলেরা ছুটির পরে পরামর্শে বসেছে। বি-সেকশনের কি আয়োজন, ওদের সঙ্গে ভাবসাব করে জেনে নিতে হবে। ব্যারিস্টার সিংহের ছেলে বলে, দশটাকা চাঁদা দেব আমি। দরকার হলে আরও দেব। হারাতেই হবে ওদের। আর দেখ, আমরা কি করছি না করছি কেউ যেন ঘুণাক্ষরে না বুঝতে পারে। খবরদার!

রামকিঙ্করের নিচু ক্লাস—এইটথ-এ। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, পয়সা কে তাদের

হাতে দেবে? চাঁদা উঠেছে অতি সামান্য, পুরোপুরি পাঁচ টাকাও নয়। রামকিঙ্কর বেজার মুখে বলছেন, ছি, ছি, এত খেটেখুটে এই মাত্তর হল? লোক-সমাজে কহতব্য নয়। তা ওই উনিশ সিকে কিসে খরচ হবে, ঠিকঠাক করলি কিছু?

নাইনথ ক্লাস থেকে ফার্স্ট হয়ে উঠেছে সেই ছেলেটা বলে, গোড়ের মালা আসবে একটা সার। আর জলখাবার।

রামকিঙ্কর বলেন, পুজোর মুখে মিষ্টিমুখ—সেটা খুব ভাল। দিস জলখাবার যেমন তোদের খুশি। সন্দেশ দিস, লেডিকেনি দিস। চপ-কাটলেট দিলেও খাব। ক'দিন আর খেতে পারব বল। যা তোরা হাতে করে দিবি, চেটেপুছে খেয়ে নেব।

আবার বলেন, কিন্তু মালার বুদ্ধি কে দিয়েছে শুনি? গুচ্ছের জঙ্গল কিনে আনবি পয়সা দিয়ে। গোড়ের মালা ঝুলিয়ে নৃত্য করে বেড়াব নাকি? এক ঘন্টা তো পরমায়ু—শুকিয়ে তার পরে আমসির মতো হয়ে যাবে। মফস্বল হলে পোষা গরু-ছাগলের মুখে দেওয়া যেত, কলিকাতা শহরে তা-ও তো নেই।

ছেলেটা বলে জলখাবার হয়ে যা বাঁচে, তাই দিয়ে তবে বই কিনে দেব সার। যে বই আপনি বলবেন।

রামকিঙ্কর বলেন, এই দেখ। ছেলেমানুষ তবে আর বলি কেন! বই কি হবে রে? পাহাড় প্রমাণ বই-টই পড়ে তবে তো শিক্ষক হয়েছি। বই বয়েই জনম কাটল—কোন বইটা না পড়া? বই দিতে যাস না, ওতে লাভ নেই।

ছাত্রেরা মুখ তাকাতাকি করে: তবে কি দেব সার?

কি দিবি? তাই তো, ঝট করে কী বলি এখন তোদের! এক কাজ করিস, টাকাপয়সা যা বাঁচে নগদ ধরে দিস আমায়। আমি কিনে নেব। ভেবে দেখতে হবে কিনা, কোন জিনিস হলে আমার কাজে আসবে।

নগদ টাকা দেওয়া—সেটা কী রকম! মালা হলে গলায় পরিয়ে দিত, বই হলে ফিতে বেঁধে নাম লিখে টেবিলের উপর রাখা চলত। তা নয়—টাকা দিলাম আর রামকিঙ্কর সার পকেটে ফেললেন, কাকপক্ষী কেউ টের পাবে না। তবু ক্লাসটিচারের কথার উপর আপত্তি চলে না। ঘাড় নাড়তে হল মনমরা ভাবে।

। ছয় ।

পুজোর ছুটিতে মহিম আলতাপোল এসেছেন। কার কাছে যেন শুনলেন, সূর্যকান্ত ঘোষগাতির বাড়ি এসে উঠেছেন ছোট মেয়েকে নিয়ে। লীলা বিধবা। আহা, এইটুকু বয়সে বিধবা—মেয়ে বড় দুর্ভাগা। বাপও তাই—এই লীলার কাছেই থাকতেন তিনি শেষটা। বেহান ঠাকরুন অর্থাৎ লীলার শাশুড়ি কালো মুখ করতেন, বাক্যবাণ ছুঁড়তেন অন্তরাল থেকে। তা হলেও পাখির আহারের মতো বুড়োমানুষের দুই বেলা সামান্য চাট্টি ভাতের অসুবিধা ছিল না। সে বাসা ভেঙেছে। জামাই ননীভূষণ মারা গেল।

মরল আবার গলায় দড়ি দিয়ে। বিষয়ভোগী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। দূরদর্শী পূর্বপুরুষেরা জমিজিরিতে রেখে গিয়েছেন—তার মধ্যে কতক খাসখামার, কতকটা প্রজাবিলি। বছর খাওয়ার ধান আসত খাসখামার থেকে। আর প্রজার কাছ থেকে যা আদায়পত্র হত, তাতে মালেকের মালখাজনা দিয়ে কাপড়চোপড় ও হাটবাজারের খরচা হয়ে যেত। ছেলেপুলেদের নষ্টে বসতে না হয়, কর্তারা তার নিখুঁত ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু দিনকাল সব পালটে গিয়ে সব হিসাব বানচাল করে দিল। ক্ষেতে ধান হয় না আর তেমন। জিনিস-পত্র অগ্নিমূল্য, আদায়পত্তর যা হয় এখন তাতে কুলিয়ে ওঠা যায় না। চাকরি-বাকরি করে দুটো বাইরের পয়সা ঘরে আনা দরকার।

কিন্তু বংশের নিয়মে ননীভূষণ তেমন-কিছু লেখাপড়া শেখেনি, ধরাধরির মুরুব্বিও নেই—তবে চাকরি কে দেবে? মায়ের গঞ্জনা—শেষটা লীলাও শাশুড়ির সঙ্গে যোগ দিল। খুব ঝগড়াঝাটি হল একদিন। দেখা গেল, ঘরের আড়ায় দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস এঁটে ননী মরে আছে। এবং তার পরেই বিধবা মেয়ে নিয়ে সূর্যকান্ত ঘোষগাতির পোড়ো ভিটেয় চলে এলেন।

জাঁকিয়ে পুজা হয় সূর্যবাবুদের বাড়ি। অঞ্চলের মধ্যে এই পুজোর নাম। যেখানেই থাকুন পুজোর সময় অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য তিনি বাড়ি আসতেন। এখন তো কায়েমি হয়েই আছেন। সব সরিকের এজমালি পুজো ছিল আগে। কিন্তু মাস্টার মানুষ সূর্যবাবু অংশমতো খরচ দিয়ে উঠতে পারেন না। জ্যাঠতুত ভাইয়ের ছেলেরা সব কৃতি হয়েছে—একজন স্টেশনমাস্টার, একজন পুলিশ-ইনস্পেক্টর। আরও একজন কেদারনাথ কোন জমিদার এস্টেটের তহশিলদার।

পয়সাকড়ি আয় করে কেদারনাথই সবচেয়ে বেশি। পিতৃপুরুষের নাম নষ্ট হতে দেব না, আর মানুষজন খাওয়ানোয় বিষম ঝোঁক তার। তা দোষ নেই কেদারনাথের। বলেছিল সমান সমান অংশ দিতে বলছি নে কাকামশায় ; কমবেশি যা-হোক কিছু দেবেন। কিন্তু সূর্যবাবুর এক পয়সাও দেবার উপায় নেই। দেবেন কোত্থেকে ? মাস্টারি চাকরিতে দুর্গোৎসব হয় না। তা-ও তো রিটায়ার করে মেয়ের ভাতে ছিলেন এতাবৎ।

অগত্যা পুজোয় ইদানিং আর সংকল্প হয় না সূর্যকান্তর নামে। উনি কিছু মনে করেন না। বলেন, থুনথুনে বুড়ো—কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া। মা-দুর্গা কোন হিতটা করবেন এখন আমার।

মান-অপমান গায়ে বেঁধে না সূর্যবাবুর। রানী বরাবর মাথা ভাঙাভাঙি করত : যেও না বাবা, সামনে দাঁড়িয়ে যেচে কেন অপমান নিতে যাব ? কিন্তু এর বাড়ি তার বাড়ি যখন কুমোর এসে পটের উপর প্রতিমা গড়তে বসে যায়, সেই সময়টা মন কেমন করে ওঠে ঘোষগাঁতির ভিটার জন্য। গ্রামে চলে আসেন। সেই আগেকার মতন আসুন রে বসুন রে—নিমন্ত্রিত মানুষজনের আদর-অভ্যর্থনা। চাকরে ভাইপোদের উপর হম্বিতম্বি, বউমাদের ও নাতিনাতনিদের সম্পর্কে খবরদারি। ঠিক যেন এক-সংসারে আছেন তাঁরা—একান্নবর্তী পরিবার। ভাইপোদের যে খারাপ লাগছে তা নয়। বারোমাস তারাই নিজ নিজ সংসারের কর্তা। এই ক'টা দিন গার্জেন হয়ে সূর্যকান্ত ধমকধামক দিচ্ছেন, দায়িত্বের বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে মুক্তি পেয়ে যায় যেন তারা। বেশ লাগে। এমন কি চটুলতা ও দুষ্টুমি পেয়ে বসেছে দোর্দণ্ড প্রতাপ দারোগাবাবুকে। পুরানো দীঘির মাঝখানে পদ্ম তুলতে গিয়ে ডোঙা আটকে গেল ফিরে আসতে পারেন না। জল নেই যে সাঁতার কেটে আসবেন। পাঁকে কোমর অবধি ডুবে যায়—হেঁটে আসবারও উপায় নেই। কাকামশায়ের কানে গিয়ে সে কী চেঁচামেচি। দারোগা-গিন্নি সাত ছেলের মা মনোরমা টিপিটিপি হাসেন স্বামীর গালি খাওয়া দেখে।

এই সূর্যকান্ত। তাঁর বিপদের কথা শুনে মহিম ঘোষগাঁতি ছুটলেন। বাড়ির ঠিক নিচে নদী। এবং সতীঘাট। সূর্যকান্তর প্রপিতামহী ওখানে সতী হয়েছিলেন। ঘাটের আর কিছু নেই—শুধুমাত্র প্রাচীন এক বটগাছ। নদী দূরে সরে গেছে। নদীও ঠিক বলা চলে না আর এখন। বর্ষাকালটা ছাড়া জল চোখে পড়ে না—জঙ্গল। হোগলা কচুরিপানা আর হিঞ্চেকলমির দাম এপার-ওপার ছেয়ে থাকে। গরু-ছাগল চরতে চরতে দামের উপর দিয়ে অনেক দূর অবধি চলে যায়। এখন এই দশা, আর সেকালে খেয়ানৌকোয় পারাপারের

সময় অতি-বড় সাহসীরও বুক কাঁপত। হ্যালিডে সাহেবের বর্ণনায় আছে। হ্যালিডে সাহেব তখন জেলায় কালেক্টর—নিজের চোখে-দেখা অনেক ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বই লিখে গেছেন। সতীর কাহিনীও তার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে।

বটগাছের পাশেই ছিল শ্মশান। লক্ষ মড়া পুড়েছে বলে মহাশ্মশান বলত। মড়া নামিয়ে রেখে শ্মশান-বন্ধুরা ওই বটতলায় বিশ্রাম নিত। জোয়ারের জল খলবল করত বটের শিকড়-বাকড়ের মধ্যে। রামজীবন মারা গেলেন—সূর্যকান্তর প্রপিতামহ তিনি। প্রথম পক্ষের ছেলে, ছেলের বউ আর নাতিনাতনিরা। শেষ বয়সে আবার নতুন সংসার করেন তিনি। শাস্ত্র অনুযায়ী বিধবার সজ্জা নেওয়ার কথা—কিন্তু নতুন-বউ আড় হয়ে পড়ল। চুড়ি ভাঙবে না, সিঁদুর মুছবে না, থানকাপড় পড়বে না, বিধবা হবে না সে কিছুতে।

তারপর আসল মতলব প্রকাশ হয়ে পড়ল। সতী হবে নতুন-বউ, স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়ে মরবে। ছেলে-বউরা বোঝাচ্ছে: বাবা বিস্তর দিন সংসারধর্ম করে সকল সাধ মিটিয়ে ষোল আনা সমস্ত বজায় রেখে স্বর্গে চলে গেলেন, তুমি কোন দুঃখে এই বয়সে চিতায় উঠতে যাবে মা?

নতুন-বউ কানে নেয় না। হাসি-খুশি নিরুদ্বিগ্ন ভাব। কপাল জুড়ে সিঁদুর দিয়েছে, টকটকে রাঙা-পাড় শাড়ি পরেছে। দু-চার ক্রোশ দূরের মানুষও আসছে সহমরণের ব্যাপার দেখতে। শ্মশানঘাটা নয়, মেলাক্ষেত্র যেন। বউ-ঝি সকলে কৌটা ভরে সিঁদুর এনে একটুখানি নতুন-বউয়ের কপালে ছুঁইয়ে সিঁদুর কৌটো আঁচলে গিঁট দিয়ে রাখছে।

এ সমস্ত হ্যালিডের বর্ণনা। তিনি তখন গ্রামের শেষে মাঠের উপর তাঁবু খাটিয়ে আছেন। সেদিন ব্রেকফাস্ট খেয়ে সাহেব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে পাখি-শিকারে বেরিয়েছেন, পথের মধ্যে কে এসে বলল সতীর বৃত্তান্ত। সতীদাহ আইন পাশ হয়নি, তা হলেও অনুষ্ঠানের কথা কালেভদ্রে শোনা যেত। শিকার বন্ধ করে সাহেব শ্মশানমুখো ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

জনতা তটস্থ হয়ে সাহেবের পথ ছেড়ে দেয়। চিতার ধারে নতুন-বউয়ের কাছে সোজা চলে গেলেন সাহেব। মুনসির মারফতে কথাবার্তা। সাহেবের কথা মুনসি বউকে শোনাচ্ছেন, বউয়ের কথা ইংরেজি করে দিচ্ছেন সাহেবের কাছে।

সাহেব বললেন, তুমি মরছ কেন?

বউ বলে, স্বামীর কাছে যাচ্ছি। স্বামী ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

আগুনে পুড়ে মরায় কী কষ্ট, তোমার ধারণা নেই।

বউ হেসে বলে, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? দেখি, প্রদীপটা আন দিকি তোমরা কেউ।

চিতায় ঘি ঢালছে। আর একটা বড় ঘৃতের প্রদীপে সলতে ধরিয়ে দিয়েছে।—ওই প্রদীপ থেকে চিতায় আগুন দেবে। বউয়ের কাছে প্রদীপ এনে রাখে। বাঁ-হাতের বুড়ো-আঙুলটা বউ প্রদীপের উপর ধরল।

হ্যালিডে লিখছেন: আশ্চর্য দৃশ্য। আঙুল কুঁকড়ে গেছে, মাংসপোড়া গন্ধ বেরিয়েছে। বউ ফিরেও তাকায় না, হাসিমুখে কথা বলছে আমার সঙ্গে। আমি আর না দেখতে পেরে ফিরে চলে এলাম। লোক-মুখে শুনেছি, দাউদাউ করে চিতা জ্বলছে, সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসতে হাসতে বউ আগুনের মধ্যে ঢুকে স্বামীর শব জড়িয়ে ধরে যেন আরামের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বর-বউ ঘোষগাঁতি ঢুকবার মুখে সতীঘাটে প্রথম পালকি এনে নামাল। বিয়ের পর গাঁয়ের কনে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, এই বটতলায় গড় হয়ে সে আশীর্বাদ কামনা করে: সতী-মা, মাগো, দু-জনের মধ্যে বিচ্ছেদ না আসে যেন জীবনে মরণে। রানী যেদিন যায়, সে বলেছিল এই কথা। লীলাও বলেছিল।

সতীঘাটের রাস্তা ধরে মহিম সূর্যকান্তর বাড়ি এলেন। বেড়ার ধারে সূর্যবাবু—কয়েকটা ভেরেণ্ডাগাছের ডালপালা বেড়ে গিয়ে যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে, কাটারি নিয়ে ঠুকঠুক করে কাটছেন সেইগুলো। মহিম এসে পায়ের ধুলো নিলেন।

কি রে? অ্যাঁ, তুই? কবে বাড়ি এলি? চল ঘরে গিয়ে বসি।

নড়বড়ে চৌরিঘর লেপেপুঁছে খানিকটা বাসযোগ্য করে নেওয়া হয়েছে। লীলা ছুটো মোড়া রেখে গেল দাওয়ার ওপর। একটা কথা বলল না—যেমন এসেছিল, নিঃশব্দে তেমনি চলে গেল। অনেকদিন পরে মহিম তাকে দেখলেন। কী হয়ে গেছে মেয়েটা! চোখে জল আসবার মত হয় চেহারা দেখে।

সূর্যবাবু বললেন, আমি আর ক'দিন! তখন মেয়েটার কি হবে, সেই চিন্তা। কাঁচা বয়স—লম্বা জীবন পড়ে আছে সামনে। আমার বুড়ো-ঠানদিদি সতী হয়েছিলেন সেকালে। নিজের মেয়ে হলেও ভাবি সেই রেওয়াজটা আজকার দিনে থাকলে অনেকের অনেক ভাবনা চুকে যেত।

তারপর মহিমকে জিজ্ঞাসা করেন, কলকাতায় আছিস তা জানি। মাছনার সাতু ঘোষ নিয়ে গেছে। তা আছিস বেশ ভাল?

মহিম বলেন, ভাল আছি মাস্টারমশায়। দাদু-মা'র কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন ইস্কুলের শিক্ষক হয়েছি।

সূর্যকান্তর বার্ধক্যের ঘোলাটে দৃষ্টি জলজল করে ওঠে। তাকালেন তিনি মহিমের দিকে। তাকিয়ে রইলেন। মহিমের মনে হয়, স্নেহ আর আশীর্বাদ ঝরে ঝরে পড়ছে তার দুই চোখ দিয়ে। বললেন, ভাল করেছিস। এর চেয়ে মহৎ বৃত্তি আর নেই।

বলতে বলতে আবার ওই মেয়ের কথা এসে পড়ে : আমার বড় ভাইপো, সে হল পুলিশের দারোগা—তার শালা এসেছে এখানে। ছেলেটা কলকাতায় পড়াশুনো করে। ওরা নাকি চেষ্টা করে ট্রেনিং-ইস্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পারে লীলাকে। পাশ করলে করপোরেশন-ইস্কুলে মাস্টারি দেবে। তুই কি বলিস মহিম?

মহিম বলেন, ভালই তো। আপনি চিরকাল আগলে থাকতে পারবেন না। ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

আমিও তাই ভাবছি। তারপর, কোন ইস্কুলে তুই আছিস সেটা তো শুনলাম না।

ভারতী ইনস্টিট্যুশন।

ওরে বাবা। বিরাট ইস্কুল। আমাদের এ সমস্ত উইটিবি, সে হল হিমালয় পর্বত। কত সব ছাত্র বেরিয়ে এসে নাম করেছেন। ভাল ভাল ছাত্র পড়িয়ে সুখ পাবি, সার্থক জীবন তোর।

মহিম বলেন, বাইরে এত নাম, কিন্তু মাইনেপত্তর বড় কম।

কত? সূর্যকান্ত প্রশ্ন করলেন।

অনার্স-গ্রাজুয়েট বলে আমার হল চল্লিশ। আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের বিস্তর কম।

সূর্যকান্ত বলেন, খাতায় লিখিস চল্লিশ টাকা। দেয় কত আসলে?

দেয়ও চল্লিশ।

ক-বারে দেয়? মানে, আমাদের এইসব ইস্কুলে যেমন যেমন ছাত্রের মাইনে আদায়, সেই অনুপাতে কাউকে দশ কাউকে পাঁচ এমনিভাবে দিয়ে যায়। তোদের কি নিয়ম?

আমাদের একদিনে দেয়। মাসের পয়লা তারিখে।

ধমকের সুরে সূর্যকান্ত বলেন, কী আশ্চর্য, এই ইস্কুলের নিন্দে করছিস তুই। শিক্ষককে কি আর লাটসাহেবের বেতন দেবে।

জানেন না মাস্টারমশায়, অফিসের দারোয়ানও আজকাল চল্লিশ টাকায় পাওয়া যায় না।

সূর্যকান্ত বলেন, কিন্তু তোর কাজ তো দারোয়ানের নয় বাবা, শিক্ষকের। মাইনের টাকা ক'টি ছাড়া দারোয়ানের আর কি প্রাপ্য আছে? তোদের অন্য দিকে পুষিয়ে যায়।

টুইশানি মেলে, সে কথা ঠিক। সাত-আটটা টুইশানিও করেন কেউ কেউ। তাঁরা পুষিয়ে নেন এই দিক দিয়ে। কিন্তু আমি পারিনে মাস্টারমশায়। দুটো করতেই হাঁপিয়ে উঠি, ছাড়তে পারলে বেঁচে যাই। আমার প্রবৃত্তি হয় না।

সূর্যকান্ত বলেন, পোষানোর কথা আমি বাবা ওসব ভেবে বলিনি। ছেলেদের মধ্যে বসে পড়ানো, তিলে তিলে পরিপূর্ণ করে মানুষ গড়ে তোলা—কত বড় আত্মতৃপ্তি! বাচ্চা ছেলে বড় করে তুলে মায়ের যে আনন্দ, এ হল ঠিক তাই। স্রষ্টার আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ। টাকা পয়সা আর ভোগসুখই জীবনের সব নয়। আদর্শহীন জীবন হল পশুর জীবন।

এই এক আজব মানুষ। দুর্লভ হয়ে আসছেন এঁরা। সূর্যকান্ত মোড়ায় বসেছেন, মহিমকেও মোড়া দিয়েছিল লীলা। কিন্তু মহিম উঁচু আসনে বসলেন না। তালপাতার চাটাই নিয়ে মেঝের উপর তিনি বসে পড়লেন। ঠিক পায়ের নিচে এমনিভাবে বসা ভাগ্য।

সতীঘাটের বিশাল বটগাছের মাথা একটুখানি দেখা যাচ্ছে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সূর্যকান্ত। বলতে লাগলেন, চারু আমার ছাত্র। জীবন দিল সে আদর্শের জন্য। আমার প্রপিতামহী সেকেলে গৃহস্থদের সাধারণ স্ত্রীলোক। কিন্তু তিনি যা আদর্শ বলে জানতেন, তার জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিলেন। বিদেশি সাহেব মুগ্ধ হয়ে লিখে গেছে। ওঁরা সবাই এক জাতের—চারু আর বুড়ো-ঠানদিদির মধ্যে আমি কোন তফাৎ দেখিনে। দেখ, একটা কথা বলি তোকে। মানুষ গড়ার কাজ নিয়েছিস, এ ব্রত অবহেলা করবি নে। ক্লাস হচ্ছে মন্দির—বালগোপালদের নিত্যসেবা সেখানে। মন্দিরে যাবার মতো মন নিয়ে ক্লাসে ঢুকবি।

কথাবার্তা চলল অনেকক্ষণ। ঘোষগাতিতে মহিম পুরো বেলা কাটিয়ে এলেন। ফিরে আসছেন—মনে হচ্ছে, মানুষ হিসেবে অনেকখানি উঁচুতে উঠে গেছেন।

বড় বোন সুধা একদিন গল্পে গল্পে বললেন, খুশির কথা মনে আছে মহিম—সাতু ঘোষের বোন খুশি? অবুঝের মত ঘাড় নাড়লে শুনিনে—তুমি আমার

বিদ্বান ভাই, মনে আছে সব, চালাকি কথা হচ্ছে। খুশির মার বড্ড পছন্দ তোমায়। সে কী কাণ্ড—

মেয়ের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সেনগিন্নি নিজে বলতে লাগলেন, খুশির মা একদিন গরুর গাড়ি করে সেই মাছুলা থেকে মেয়ে বয়ে নিয়ে আমাদের এখানে হাজির। পাড়াগাঁয়ে যা কখনো কেউ করে না। এসে বলেন, পাদজলে মেয়ে নিয়ে এলেম মহিমের মা। ঘরে তুলে নেবেন না লাথি মেরে ছুঁড়ে দেবেন, বিবেচনা করুন। চিঁড়ে-দুধ-বাতাসা-আমসত্ত্ব খাইয়ে মিষ্টি কথায় তো বিদেয় করলাম। কি হবে, তারপর ভেবে মরি। সুধা এদিকে আড় হয়ে পড়েছে: সে হবে না, ওই ভিটেকপালি নাক-থ্যাবড়া মেয়ে ভাইয়ের পাশে দাঁড়াবে, সে আমরা চোখ মেলে দেখতে পারব না।

সুধা বলেন, আমিই বুদ্ধি দিলাম, সোজাসুজি না পার তো বড়মামার দোহাই পেড়ে দাও। কুষ্ঠি ঘাঁটাঘাঁটির বাই আছে তাঁর—পাত্রীর জন্মপত্রিকা চেয়ে পাঠাও। বিচারে যা আসবে সেই মতো হবে।

হেসে উঠে বলেন, মেয়েওয়ালা ভাগানোর আচ্ছা এক ফিকির এই কুষ্ঠি। ভাগিয়ে দিয়ে আমরা মুখে হা-হুতাশ করছি, তারাও চটতে পারছে না।

মা বললেন, এদ্দিনে মেয়েটার সম্বন্ধ গেঁথেছে একটা। পশ্চিমবাড়ির ছোটবউ বলছিল। অঘ্রাণে বিয়ে, পাকা-দেখা হয়ে গেছে। ম্যাট্রিক পাশ ছেলে, জজ-আদালতের পেস্কার। মেয়ের মা নাকি মুখ অন্ধকার করে বেড়াচ্ছেন। ছোটবউ বলছিল, কী চোখে আমাদের ঠাকুরপোকে দেখেছেন, কোন পাত্রই তার পরে পছন্দ হয় না। তা বলে ওই কুচ্ছিৎ মেয়ের সঙ্গে কী করে হয়। খরচপত্রও তেমন করতে পারছে না, শুনলাম। সাতুর ব্যবসা নাকি বড্ড টালমাটাল যাচ্ছে।

মহিমের কাছে এটা নতুন খবর। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হন না। বললেন, আরও হবে, ব্যবসা একেবারে যাবে। অধর্ম করে ব্যবসা চলে না। সাধে মা ছেড়েছুড়ে চলে এলাম?

সুধা বলেন, মুখে তো রাজা মারেন, উজির মারেন। এই দাওয়ার উপর বসে সেবারে লম্বা-লম্বা কথা বলে গেলেন।

মহিম বলেন, কোন্‌ দিন না শোন যে জেলে গেছেন সাতকড়ি ঘোষ। নুন খেয়েছি, নিন্দেমন্দ করা ঠিক নয়। কিন্তু যে পথে চলেছেন, তাই আছে ওঁর অদৃষ্টে।

সেনগিন্নি শিউরে উঠে বলেন, তুই ভাল করেছিস বাবা বেরিয়ে এসে। ধর্মপথে থেকে শাক-ভাত জুটলেও সে অনেক ভাল।

ছুটি দেড় মাসের, কিন্তু বিজয়া-দশমীর পরদিনে মহিম টিনের স্যুটকেসে কাপড়চোপড় ভরছেন।

সেনগিন্নি বলেন, সে কিরে! ইস্কুল খুলবে সেই জগদ্ধাত্রী-পুজোর পর। এর মধ্যে যাবার কি তাড়া পড়ল?

সে ছুটি যা ইস্কুল দিয়েছে—দুপুরবেলায় যারা মনিব। সকাল-সন্ধ্যার মনিব নিয়েই মুশকিল। ইস্কুল খুলে এগজামিন। সারা বছর বই ছোঁয়নি, বছরের পড়া একটা মাসে সারা করে দিতে হবে। ছেলে যত না খাটবে, মাস্টার খাটবে তার দুনো তেদুনো। নয় তো বারোমাস মাইনে খাওয়াচ্ছে কেন?

সুধা হাসিমুখে এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়েন: ওসব নয় মা। সাতু ঘোষের বোনের সঙ্গে না হোক, মেয়ের তো আকাল হয়নি। গণ্ডায় গণ্ডায় কত রয়েছে এদিক-সেদিক। বিয়েথাওয়ার যোগাড় দেখ, তাই তখন আর পালাই-পালাই করবে না।

মহিম বললে, এগজামিনের মুখে বিয়ে বললেও মাপ হয় না দিদি। বিয়ে তো বিয়ে—মরে গেলেও বোধ হয় বলবে, কি কি ইম্পর্টান্ট আছে দাগ দিয়ে রেখে তবে গঙ্গাযাত্রা করুন। বড় শক্ত ঘানি গো দিদি।

মর্যাছাড়ার কথা মায়ের কানে খারাপ লাগে। সংক্ষেপে তিনি প্রশ্ন করলেন, কতগুলো টুইশানি?

সকালে একটা, রাতে একটা। তাইতে হিমসিম খেয়ে যাই। ইস্কুলমাস্টারি করে মাত্র দুটো টুইশানি—অন্য মাস্টাররা অপদার্থ কুলাঙ্গার ভাবেন আমায়। কিন্তু দুটোই তো আমার ধাতে সয় না। পাকা হয়ে গিয়ে খরচপত্র চলার মতো মাইনে কিছু বাড়লে টুইশানি একেবারে ছেড়ে দেব। ছেলেদের যাতে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাই নিয়ে পড়াশুনো ভাবনাচিন্তা করব। গ্রীষ্মের পুরো সাত হপ্তা বাড়ি থেকে যাব। টিউটর হয়ে বাড়ি বাড়ি বিদ্যে ফিরি করে বেড়ানো—ইজ্জত থাকে ওতে কখনো। ছেলেরাই বা মানবে কেন?

॥ সাত ॥

পুজোর ছুটির পর ইস্কুল খুলেছে। বার্ষিক পরীক্ষা আসন্ন। ক্ষুদিরাম ছুটোছুটি করে সার্কুলার ঘুরিয়ে আনল: ছুটি হলেই শিক্ষকরা আজ বাড়ি চলে যাবেন না, লাইব্রেরি-ঘরে অপেক্ষা করবেন। কাজ আছে।

ডি-ডি-ডির চালচলন গম্ভীর। ছুটির আগে থাকতেই নিজের কামরায়

দরজা এঁটে আছেন। ছুখিরাম লাইব্রেরির ঘর থেকে এক-একজন করে ডেকে পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তিনি বেরিয়ে এলে আর একজন। একখানা ডায়েরি-বই ডি-ডি-ডি'র হাতে। এটি তাঁর নিজের কাছে থাকে, কাউকে দেখতে দেন না। চিত্তবাবুকেও না। বই দেখে ফিস ফিস করে প্রতি মাস্টারকে বলে দিচ্ছেন, কোন ক্লাসের প্রশ্নপত্র করবেন তিনি; কোন্ ক্লাসের খাতা দেখবেন। অতিশয় গোপন ব্যাপার—কেউ কাউকে বলবেন না যেন, একজনের খবর অন্যে টের না পায়।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চিত্তবাবু মুখ টিপে টিপে হাসছেন: বাজে খাটনি এত খাটতে পারেন। এই কখনো গোপন থাকে। ভূত যে সর্ষের মধ্যে। ইনি ওঁকে ডেকে কানে কানে বলবেন। জিজ্ঞাসা করতে হবে না, নিজের গরজে বলে বেড়াবেন সবাই।

কিন্তু মহিমের গরজ নেই। ছুটিতো টুইশানি। একটা মেয়ে পড়ান—তার সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবার নেই। আর ছেলেটা এই ইস্কুলের হলেও ন্যায্যর বেশি সিকি নম্বর বাড়াতে যাবেন না, এ বিষয়ে দৃঢ়পণ তিনি। তাঁর কাছেও অতএব পালটা কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার—জিজ্ঞাসা না করেও জেনে ফেলেছে দেখছি অপরে।

করালীকান্ত এসে বললেন, চেক আছে আমার ভাই। বেশি নয়, তিনখানা। নোট বই আছে?

কিসের চেক, কোন ব্যাপার—মহিম কিছু বুঝতে পারেন না। নোট-বই লাগছে বা কিসের জন্যে?

করালী হেসে বলেন, নতুন মানুষ আপনি। ভিতরের অনেক ব্যাপার শিখতে হবে। বলি, শুধু কি পড়িয়ে যাবেন? ছাত্র পাশ করে যাবে, সেটা আপনার দায়িত্ব নয়?

মহিম বলেন, দায়িত্ব কিনা জানিনে, তবে পাশ করে যাক নিশ্চয় চাই সেটা। পাশ করবে না তো কী পড়ালাম এদ্দিন ধরে।

শুধু পড়িয়েই কি পাশ হয় ভাই? নতুন আপনি, জানেন না। সেই জন্যে চেক। চেক মানে হল এক টুকরো কাগজে লেখা ছাত্রের ক্লাস আর রোল-নম্বর। রোল-নম্বর স্পষ্টাস্পষ্টি বললে খারাপ শোনায়, বাইরের কানে পড়ে যেতে পারে—সেজন্যে চেক নাম দিয়ে কাজকর্ম চলে। টুকরো টুকরো এমনি কাগজ অনেক আসবে, আমরা তাই নোট-বুকে সঙ্গে সঙ্গে টুকে রাখি। অমুক বাবুর এই নম্বর। খাতা দেখবার সময় নম্বরগুলো পাশে রেখে বিবেচনা করতে হবে।

বিবেচনা কি ছাই—পাশ করিয়ে দেবেন, ভাল নম্বর দেবেন। নয়তো টুইশানি খসে যাবে। আবার আপনিও যেসব চেক দেবেন, অন্তেরা তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করবেন। পালটাপালটি ব্যাপার।

মহিম বিরক্ত হয়ে বলেন, আমি কোনদিন কাউকে চেক দিতে যাব না মশায়।

দায়ঝক্কি নেই—আজকে তাই বলছেন বড় বড় কথা। কিন্তু লাইনে যখন এসেছেন, করতেই হবে ভাই। আজ না হয় তো কাল; কাল না হয় তো পরশু। সে যাকগে—ভবিষ্যতের কথা, এখন তার কি! আপনি চেক না দিতে পারেন, আমি এই দিয়ে যাচ্ছি তিনটে। সামাল করে রেখে দিন।

মহিম দেখলেন, নম্বরগুলো সবই থার্ড ক্লাসের। থার্ড ক্লাসের অঙ্ক দেখতে হবে তাঁকে। আশ্চর্য হয়ে করালীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, জানলেন কি করে বলুন তো?

হাত গণে—

না সত্যি বলুন। হেডমাস্টার মানা-করে দিলেন, কারও কাছে আমি প্রকাশ করিনি। অথচ জানতে তো বাকি নেই দেখছি।

করালী হেসে বলেন, অঙ্ক কষে জেনেছি ভাই। স্রেফ যোগবিয়োগের ব্যাপার। প্রসেস অব এলিমিনেসন। অঙ্কে অনার্স আপনি—উপরের ক্লাসের অঙ্কই দেবে আপনাকে। অন্য সব ক্লাসের জানা হয়ে গেল, থার্ড ক্লাসের অঙ্কের হদিস মেলে না। অতএব আপনি।

গঙ্গাপদবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এতগুলোর মধ্যে এই একটি মানুষকে মহিমের বড় ভাল লাগে। তিনিও খোঁজখবর নেন। একদিন বললেন, লাগছে কি রকম বাবাজি?

মহিম বলেন, ছেলেরা খুবই ভাল। আপনাকে খুলে বলি—মাস্টারমশায়রা সব শিক্ষিত ব্যক্তি, বড় কাজ নিয়ে আছেন। কিন্তু তাদের বড্ড নিচু নজর, নোংরা কথাবার্তা। আমার মোটেই ভাল লাগে না, গা ঘিনঘিন করে। দেখুন, ভাল পয়সার চাকরি ছেড়ে এসেছি। এখানেও মনে হয়, ছেড়ে দিয়ে চলে যাই। কিন্তু ক্লাসে ছেলেদের কাছে বসলে আর সে কথা মনে থাকে না তখন ভাল লাগে।

গঙ্গাপদবাবু পুরানো শিক্ষক, সেকাল-একাল অনেক দেখেছেন। ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, তোমার ব্যথা যে কোন্‌খানে তা ভালই বুঝতে পারছি। কিন্তু

মাস্টারমশায়দের দিকটাও ভেবে দেখ। টুইশানি করে করে মাথায় আর সাড় থাকে না। ইস্কুলটা আছে তাই রক্ষে—ইস্কুল হল বিশ্রামের জায়গা। হাত-পা ছেড়ে জিরিয়ে নেন এখানে, ফাঁক মতো ঘুমিয়েও নেন। কঠিনই করেন। ক্লাসে হল পাইকারি পড়ানো, ফাঁকি ধরবার মা-বাপ নেই। বাড়ির পড়ানোয় সেটা চলবে না। টিউশানি না করলেও চলে না—সাধ করে কেউ পাড়ায় পাড়ায় উঞ্ছবৃত্তি করে! এত বড় ইস্কুল—গ্রাজুয়েটদের তিরিশ টাকা দেন, সেই দেমাকে বাঁচেন না। মাস্টাররাও ঐ তিরিশ টাকা ফাউ হিসাবে ধরে নিয়েছেন। আসল খাটনি ইস্কুলের বাইরে।

টুইশানির গল্প হয় নানারকম। মতিবাবু মস্ত বড়লোকের বাড়ির গৃহশিক্ষক হয়ে আছেন। সেইখানে খাওয়া-থাকা। এলাহি ব্যাপার মশায়। গদির বিছানা, বনবন করে পাখা ঘুরছে মাথার উপরে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চা খাবেন ভোরবেলা, দেরি হলে নাকি মাস্টার-মহাশয়ের মাথা ধরে। কলিং-বেল টিপছেন তো দুটো চাকর হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে। ইস্কুলে মোটরগাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায়। আবার চারটে না বাজতে গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কপাল, কপাল, বুঝলেন মশায়, পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে এ রকম বাড়ি থেকে ডাক আসে না।

জগদীশ্বরবাবু বলছেন, আমার এক মেয়ে-পড়ানো আছে, তার কথা বলি। পড়াতে গেলেই চটে যায়—মেয়ে নয়, মেয়ের মা আর বাবা। পড়ার ঘরে বসে পা দুলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। মেয়ের মা এসে বললেন, এর মধ্যে এসেছেন —ইস্কুল থেকে ফিরে একটু জিরতেও দিলেন না যে! ঘড়িতে সাড়ে সাতটা তখন। চারটেয় বাড়ি এসে সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যেও মেয়ের জিরানো হল না। আবার আটটা বাজতে না বাজতে মা চলে এসেছেন: আর নয়, ঘুম পাচ্ছে পলির, এবারে যেতে দিন। পরের দিন হয়তো বাবা এসে বললেন, আজকে আর পড়বে না পলি; ওর মাসি মাসতুত-বোনেরা সব এসেছে। তার পরের দিন বললেন, আজকে থাক; সিনেমায় যাচ্ছে। ফিরে আসছি—বললেন, দাঁড়ান একটু। মাইনেটা অগ্রিম চুকিয়ে দিয়ে বললেন, পলির মাসি এসেছেন দিল্লী থেকে—এ মাসের ক'টা দিন আসবেন না আর। নতুন মাসে গিয়েছি— গিন্নি—বললেন, পলি রোজ পড়বে না, হপ্তায় তিন দিন করে আসবেন মাস্টারমশায়। বেশী পড়লে শরীর খারাপ হবে। তাই চলছে; তিন দিন করে যাই—পড়ে হয়তো একটা দিন। মাসের ঠিক পয়লা তারিখে পুরো বেতন।

ভূদেববাবু সদুঃখে বলেন, আমার কাহিনী তবে শুনুন। আমার কপালে এক হারামজাদা জুটেছে। বলে, এগজামিনের মুখে এখন রবিবারেও আসুন না স্যার। উঠে দাঁড়িয়েছি তখনো বলবে, জ্যামিতির এই প্রবলেমটা বুঝিয়ে দিয়ে যান। পিছু পিছু রাস্তা অবধি নেমে এল গোটা পাঁচ-সাত ইংরেজি ইডিয়াম মুখে করে নিয়ে: এইগুলোর মানে কি হবে বলুন। পড়ায় কী চাড়—ব্যাটা আমার বিদ্যেসাগর হবে! কিছু না, বুঝলেন, স্রেফ শয়তানি। মাস্টার-জ্বালানো ছেলে থাকে এক-একটা। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে জ্বালিয়ে মারিস, টের পাবি—পরীক্ষার খাতায় পাতায় পাতায় গোল্লা। উঃ, পূর্বজন্মের কী মহাপাপ ছিল, তাই অমন নরক-ভোগ করছি। ভাল চাই নে, মাঝামাঝিও একটা পেতাম—তার পরে একটা দিনও আর ওদের ছায়া মাড়াতে যাব না।

মহিম আর ভূদেববাবু মেসে ফিরছেন। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ট্রাম-রাস্তার মোড়ে নতুন বাড়ি হচ্ছে। মার্বেলের মেঝে, কালো মোজেয়িকের বড় বড় থাম, লতাপাতা-কাটা কাচের আবরণ সিঁড়ির সামনেটায়। ভারি শৌখিন বাড়ি। যেতে যেতে ভূদেববাবু চট করে ভিতরে ঢুকে দারোয়ানকে গিয়ে ধরলেন: মনিবের বাড়ি কোথা দারোয়ানজি।

জলপাইগুড়ি। চা-বাগানের মালিক—বিস্তর পয়সা।

পুলকে ডগমগ হয়ে ভূদেববাবু ফিরে এলেন। বলছেন, জলপাইগুড়ির লোক অদ্দূর থেকে প্রাইভেট মাস্টার ট্যাঁকে করে আসছে না। কি বলেন মহিমবাবু? ঘট পেতে গৃহপ্রবেশ করবে, নজর রাখতে হবে দিনটার উপরে!

মহিমকে সামাল করে দিচ্ছেন: আপনার খাঁই নেই জানি, আপনার কাছে সেইজন্যে বলে ফেললাম। খবরদার, খবরদার—অন্য কানে না যায়।

আবার বলেন, একেবারে ইস্কুলের পথের উপর—সব টিচারের নজর পড়ে যাচ্ছে। কতজনে এর মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে গেছে, ঠিক কি!

॥ আট ॥

গার্ড দিচ্ছেন মহিম। সঙ্গে পতাকীচরণ আছেন। পতাকী বড় ভাল। পরিশ্রমীও খুব। ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে বেড়ান: এই, পেট মোটা কেন—বই-টই আছে নাকি রে? শার্টটা তোল দিকি উঁচু করে। ব্লটিং-পেপার টানাটানি করবি নে। ন্যাকা আমরা, কিছু বুঝি নে—উঁ! কাঁচা কালির

উপর ব্লটিং চাপিস, ব্লটিং-এর উপর লেখা উল্টো হয়ে ছাপ পড়ে যাচ্ছে। ওকে কালী বাঁ-হাত চিত করে অত কি লিখিস? দেখুন মহিমবাবু, কাণ্ডখানা দেখে যান। হাতের তলা ভরতি করে কপিং-পেন্সিলে কত সব লিখে এনেছ।

যত দেখেন, মহিম অবাক হয়ে যাচ্ছেন: আমরাও পড়াশুনো করেছি। কিন্তু এ কী! সাতজন্ম ভেবেও এত সব ফন্দি মাথায় আসত না।

পতাকীচরণ হেসে বলেন, ভাবতে কে বলছে আপনাকে? আমি একাই পারব। আপনারা মফস্বলের ইস্কুলে পড়েছেন, কলকাতার বিচ্ছুদের হদিশ কি করে পাবেন? কিচ্ছু করতে হবে না, যদি কখনো বাইরে যাই সেই সময়টা দেখবেন আপনি।

সত্যি, চোখ দুটো বিঘূর্ণিত করে পতাকীচরণ ঘরময় চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন। একটা মশা উড়লেও তাঁর নজর এড়াবে না। মহিম নিতান্তই বাহুল্য এক্ষেত্রে।

পতাকী বলেন, কাজ না থাকে বই-টই পড়ুন না বসে বসে। দেখবার কিছু নেই, আমি একাই একশ।

এটা মন্দ কথা নয়। এনসাইক্লোপেডিয়ার বাঁধানো পিঠগুলো দেখে থাকেন আলমারিতে। পড়বার ইচ্ছে হয়। এডুকেশন সম্বন্ধে কি লিখেছে—সেই ভল্যুমটা এনে পড়া যাক। হোক পুরানো এডিশন, প্রাচীন মনীষীদের ভাবনাটা জানা যাবে।

আসছি আমি একটা বই নিয়ে।

কয়ালীবাবুকে খুঁজছেন। কেয়ারটেকার মানুষ, কখন কি কাজের দরকার পড়ে—সেজন্য তাঁকে গার্ড দিতে হয় না। চিন্তবাবু বললেন, তিনি কি আছেন এতক্ষণ? একটা কোন কাজের নাম করে বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়ি গিয়ে ঘুম দিচ্ছেন, নয় তো টুইশানি সেরে বেড়াচ্ছেন এই ফাঁকে। দেখুন খুঁজে। কপালে থাকলে পেয়েও যেতে পারেন।

দুখিরাম বলে, তামাক খাবার ঘরটা দেখুন দিকি। ওই দিকে একবার যেতে দেখেছিলাম।

সেইখানে পাওয়া গেল। বাড়ি যান নি, কিন্তু ঘুমুচ্ছেন ঠিকই। জানলাহীন আধ-অন্ধকার—একটিমাত্র দরজা, দরজাটা ভেজিয়ে পুরোপুরি রাত করে নিয়েছেন।

কয়ালীবাবু—

অ্যা—? করালীবাবুর সজাগ ঘুম, ধড়মড় করে উঠে বসে আরক্ত চোখ কচলাচ্ছেন : কী মহিমবাবু যে। আপনি ডাকছেন ?

একটিবার উপরে চলুন। একটা বই দিয়ে আসবেন।

বই—তা আমার কাছে কেন ? বিনোদ দেবে, তার কাছে বলুনগে।

মহিম বলেন, বিনোদের বই নয়—

খড়ি ডাস্টার স্কেল ম্যাপ ইত্যাদি এবং ক্লাসে পড়বার বই বিনোদের জিম্মায় থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে বলে বেয়ারা বলা ঠিক হবে না তাকে। টিচাররা ক্লাসে যাবার সময় যার যা দরকার, বিনোদের কাছ থেকে নিয়ে যান। এই নিয়ে বিনোদের অহঙ্কারের অন্ত নেই। বলে একদিন যদি না আসি, ক্লাসের কাজ বন্ধ। খালি হাতে মাস্টারমশাইরা কি পড়াবেন ?

আর, মরে যাও যদি বিনোদ ?

বিনোদ এক কথায় অমনি জবাব দেয়, ইস্কুল উঠে যাবে।

এই বিনোদ। মহিম বললেন, টেক্সটবুক চাচ্ছি নে করালীবাবু। লাইব্রেরি থেকে একটা এনসাইক্লোপেডিয়া নিয়ে নেব।

লাইব্রেরির বই ?

করালীবাবু এমন করে তাকালেন যেন কড়াৎ করে আকাশের এক মুড়ো থেকে খানিকটা ভেঙে পড়ল সেখানে। বলেন, লাইব্রেরির বই তো আলমারিতে তালাবন্ধ রয়েছে।

নাছোড়বান্দা মহিম বলেন, তালা খুলে দিন একটু কষ্ট করে গিয়ে।

তালা খুলব, কিন্তু চাবি তো লাগবে—

অতিমাত্রায় বিরক্ত হয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্টের লোক বলে মুখে কিছু বলছেন না। বললেন, চাবি কোথায় কে জানে!

ধীরেসুস্থে মহিমের সঙ্গে দোতলায় গিয়ে বিনোদকে বলেন, লাইব্রেরির আলমারির চাবি তোমার কাছে ?

বিনোদ বলেন, আমায় কবে দিলেন ?

হুঁ, মনে পড়েছে। অনেক দিনের কথা বলে ভুলে যাচ্ছি বিনোদ। সেই যে ইস্কুলের জুবিলির বছরে চারদিক ঝাড়ামোছা হচ্ছিল, আলমারি সেই সময় খোলা হয়েছিল। বন্ধ করে তারপর চাবির তাড়া তোমার কাছে দিলাম একটা কৌটোয় মধ্যে রেখেছিলে, খুঁজে দেখ।

বিনোদ বলে, কৌটোয় রেখে থাকি তো এরই মধ্যে আছে।

কোথা থেকে এক বিস্কুটের টিন এনে মেঝের উপুড় করল। ছিপি-ঢোকানো

কলঙ্ক-ধরা একতাড়া চাবি তুলে নিয়ে করালী বললেন, এই দেখ। রয়েছে তোমার কাছে—তুমি বলছ, কবে দিলেন ?

আলমারির তালার ভিতর চাবি ঢুকিয়ে করালী অনেক চেষ্টাচরিত্র করলেন। শেষটা ঘাড় নেড়ে বলেন, খোলে না—

তবে কি হবে ?

বিরক্তস্বরে করালীকান্ত বললেন, আপনার হল কংসরাজার বধের ফরমাস। যা হবার নয়, তাই হওয়াতে বলছেন! তালা খুললেও তো পাল্লা খুলবে না, কবজায় জং ধরে আছে। টানাটানি করলে ভেঙে যাবে।

মহিম বললেন, কী আশ্চর্য! লাইব্রেরিয়ান রয়েছেন। বই কেউ নেয় না কোনদিন ?

পাঁচ টাকার লাইব্রেরিয়ান—ওতে আর বই দিতে গেলে চলে না!

পরক্ষণে আবার নরম স্বরে বলেন, বই পড়বেন তো বাড়ি থেকে নিয়ে আসবেন। আলমারি খুললেই বা কী হত তাই ? বইয়ের কিছু আছে নাকি, হাত লাগালেই গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে। যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁরা সব গত হয়ে গেছেন—বই আর কতকাল টিকবে।

পরের দিন থেকে একটা-কিছু হাতে করে আসেন মহিম। পরীক্ষা চলছে। পতাকীচরণ অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে চতুর্দিকে পাহারা দিয়ে ফিরছেন। মহিম উঠতে গেলেই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন : পড়ছেন, পড়ুন না। কী দরকার। আমি তো রয়েছি—কোন বেটার খাতা থেকে মুখ উঁচু হবে না।

সেকেণ্ড ক্লাসের প্রশ্নপত্র একখানা হাতে করে এলেন।

দেখছেন মশায়, কোয়েশ্চেনের বকমটা দেখুন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় দিলেও বেমানান হত না। এই ইকুয়েশন। দুটো—ভাবলাম, করেই দেখি না কেমন দাঁড়ায়, তা এই দেখুন, এক পাতা কষে ফেললাম তবু কোন মুড়োদাঁড়া পাওয়া যায় না। ইস্কুলের ছেলেদের এই অঙ্ক দিয়েছে, আক্কেল-বিবেচনা বুঝুন।

মহিম অঙ্ক-কষা কাগজখানার দিকে তাকিয়ে দেখলেন : আপনি যে সোজা সড়ক ধরে চলেছেন—এতে হবে না পতাকীবাবু। ফাইভ-বি আছে, ওটা ভেঙে থ্রি-বি প্লাস টু-বি করে নিন। ফর্মুলায় পড়ে যাবে। দেখি—

পেন্সিল আর কাগজটা হাতে নিয়ে টুকটুক করে কষতে লাগলেন। লহমার মধ্যে হয়ে গেল। একটা শেষ করে পরেরটাও করলেন।

দেখুন—

পতাকীচরণের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল : সার্থক পড়াশুনো করে এসেছেন মশায়। আপনার উন্নতি কেউ রুখতে পারবে না। ছেলে-মহলে একবার চাউর হয়ে গেলে টুইশানির গাদি লেগে যাবে। ঠেলে কূল পাবেন না।

শেষ ঘণ্টা চলেছে। খাতা দেবার সময় হয়ে আসে। বাইরে যাবার বড্ড হিড়িক এইবার। একজন ছেলে ফিরে এল তো চার-পাঁচটি উঠে দাঁড়ায়।

উঁহু, একের বেশি হবে না। যা নিয়ম।

ছেলেরা কলরব করে : তবে তো যাওয়াই হবে না আমাদের। এর মধ্যে ঘণ্টা বেজে যাবে।

কিন্তু কড়া মাস্টার পতাকীচরণ কোনক্রমে নিয়ম শিথিল করবেন না।

নতুন বছরের পাঠ্য-বই নির্বাচন এইবারে, নানান কোম্পানির ক্যানভাসার আসছে। হেডমাস্টারের কামরার বাইরে তাদের জন পাঁচ-সাত ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে পি. কে. পাবলিশিং হাউসের প্রাণকেষ্ট পালের সর্বাগ্রে ডাক পড়ল। এ তো জানা কথাই। মডেল ট্রানশ্লেশন নামে ডি-ডি-ডির-র একখানা বই বের করে সম্পর্ক ওঁরা পাকা করে রেখেছেন।

প্রাণকেষ্ট এলে ডি-ডি-ডি বললেন, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বসুন। সেই দশটা থেকে আপনারা সব হানা দিচ্ছেন, এখনও চলছে। কাজকর্ম হবার জো নেই।

প্রাণকেষ্ট বলে, এই একটা মাস স্যার। প্রাচী শিক্ষালয়েব হেডমাস্টার আমার উপর খিঁচিয়ে উঠলেন। পাশাপাশি ইস্কুলের হেডমাস্টার আপনার বই ছেপেছি —বুঝতে পারছেন তো, সেই হিংসে। আমিও ছাড়িনি : বছরের মধ্যে একটা মাস আমরা এসে আজ্ঞে-হুজুর করে যাই, এর পরে কেউ থুতু ফেলতেও আসব না। দোকানে গেলে একখানা টুল এগিয়ে দেব বসতে। ছাড়ব কেন, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে এসেছি। বই না হয় না ধরাবে।

ডি-ডি-ডি বলেন, এবারে কি করবেন আমার বইটার? গেল বারে তো মোটমাট সাতাশটি টাকা ঠেকালেন।

চেষ্টা তো করা যাচ্ছে স্যার। সাড়ে চারশ চিঠি চলে গেছে মফস্বলের হেডমাস্টারদের নামে। ছাপা চিঠি নয়, ছাপা জিনিস কেউ পড়েন না। আপনি নিজের হাতে সব প্রাইভেট লিখে পাঠিয়েছেন।

ডি-ডি-ডি অবাক হয়ে বলেন, সে কি! আমি লিখতে গেলাম কবে চিঠি?

একগাল হেসে প্রাণকেষ্ট বলে, লিখছে আমাদের লোকে আপনার নাম-ছাপা

শাস্তজনের উপরে ঃ হাতের লেখা কে চিনে রেখেছে ? যিনি চিঠি পেলেন, তিনি কৃতার্থ হয়ে যাবেন—অত বড় ইস্কুলের হেডমাস্টার বই ধরাবার জন্য কাতর হয়ে নিজের হাতে লিখছেন। কাজ হবে বলে মনে হয়। এ ছাড়া আপনাকেও কিন্তু সত্যি সত্যি কিছু করতে হবে স্যার। সেই জন্যে এসেছি।

বলুন—

ব্যাগ খুলে দশ-বারোখানা বই প্রাণকেষ্ট টেবিলের উপর রাখল ঃ এইগুলো পাঠ্য করে দিতে হবে আপনার ইস্কুলে।

সে কি করে হবে ? মাস্টারমশায়রা দেখেশুনে বই পছন্দ করে দেন। এই এখানকার নিয়ম।

ভাল নিয়ম। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে স্যার—যাঁরা পড়াবেন, বই বেছে নেওয়া তাঁদেরই তো কাজ। এ-বি-সি কাঁদতে কালঘাম ছুটে যায়, ভোটের জোরে মেম্বার হয়ে তারাই সব নাক গলাতে আসে। কুমুন কাণ্ড ! তা মাস্টারমশায়রা দেখেশুনে যাতে পছন্দ করেন, সেই ব্যবস্থা করে দিন আপনি। আমাদের তরফ থেকে ক্যালেণ্ডার আর পকেট গীতা দিয়ে যাব। আর বেশি দামের ভারিক্কি বই ধরালে নতুন বছরের ডায়েরি একখানা করে।

ফসফস করে দু-তিনটা বইয়ের প্রথম পাতা খুলে দেখাল। বাজে বই নয়, দেখছেন ? অথচ হয় হেডমাস্টার নয়তো অ্যাসিস্টান্ট-হেডমাস্টার। এঁদের বই করুন, ওঁরাও আপনার মতোন রিকমেণ্ড করবেন। পাকা কথা নিয়ে এসেছি। হয়ে গেলে ছাপা চিঠি দেখিয়ে যাব।

ভি-ভি-ভি কেটে কেটে বলেন ঃ সে এখন বলতে পারছি নে। মাস্টাররা আছেন। তার উপর কমিটি—তাঁদের প্রত্যেকের দু-একখানা করে উপরোধের ব্যাপার থাকে।

প্রাণকেষ্ট মুখ কালো করে ঃ কমিটি কি আর অই সব ইস্কুলে নেই ? রাগ করবেন না স্যার। বই অন্য লোকে লিখে দিল, আপনাকে ঝক্কি পোহাতে হয়নি, ছাপা হয়ে বেরিয়ে এলে তবে তো আপনি চোখে দেখলেন। এখন এইটুকুও যদি না পারবেন, তবে কেন লাভের বখরা কম হওয়ার কথা তোলেন ?

ভি-ভি-ভি চোখ তুলে তাকালেন প্রাণকেষ্টর দিকে। এ ভিন্ন মানুষ—ভারতী ইনস্টিট্যুশনের টিচার নয়, ছাত্রও নয়—বছর বছর বাড়ি এসে নগদ টাকা গণে দিয়ে যাওয়ার মানুষ। স্বর নরম করে অতএব বললেন, আচ্ছা রেখে তো যান। দেখি।

প্রাণকেষ্ট বলছে, সবগুলো না পারেন, খান আষ্টেক অন্তত করে দেবেন। আর একটা কথা বলছিলাম সার। শুনুন—

কাছাকাছি মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে, অন্তত আটখানা বই যদি ধরিয়ে দেন বুকলিস্ট মাংনা ছেপে দেব আমরা।

ভি-ভি-ভি ঘাড় নেড়ে বলেন, ওসব এখানে নয়। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের টাকার অভাব নাকি? মাংনা ছেপে দেব কোন্ দুঃখে?

প্রাণকেষ্ট বলে, ছেপে দেব আমরা। আটখানা না হোক, ছ-খানা অন্তত ধরাবেন। ছেপে তারপরে যে রকম বিল করতে বলেন, করব। বিলের সে টাকা ঘরে নেব না। আপনার হাতে দিয়ে যাব। তারপরে যা করবার আপনি করবেন। টিচারদের কোন ফাণ্ড-টাণ্ড থাকে তো দিয়ে দেবেন সেখানে।

ভি-ভি-ভি বলেন, কদ্দুর কি হয়ে ওঠে দেখা যাক। পরের কথা পরে। আপনি আর একদিন আসুন। বাইরে আরও সব দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টা পড়ার সময় হল, ছেলেরা সব বেরবে। দু-এক কথায় সেরে দিই ওঁদের।

প্রাণকেষ্ট উঠল। হেডমাস্টার হাঁক দিলেন, আসুন আপনারা এক এক করে—

কিন্তু অন্য কেউ ঢোকবার আগে সকলকে ঠেলে সরিয়ে দাশু একটা ছেলের হাত ধরে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলেন।

এই কাগজটা ওর কাছে পাওয়া গেছে সার। জলের ঘরে ঢুকে পকেট থেকে বের করল। আমার ওখানে ডিউটি—ট্যাঙ্কের ওপাশে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে নর্দমায় ফেলে দিত, ক্যাঁক করে অমনি চেপে ধরেছি।

হেডমাস্টার একেবারে মারমুখি। চারিদিক সচকিত করে চেঁচিয়ে উঠলেন: নাম কেটে তাড়িয়ে দেব। পড়াশুনো না পারুক, তার মার্জনা আছে। কিন্তু দুর্নীতি-মিথ্যাচার এ ইস্কুলের ত্রিসীমানায় চলবে না। কাগজ কোথায় পেলি, সত্যি করে বল।

ছেলেটা চুপ করে থাকে।

চিৎকারে চিত্তবাবু ছুটে এসেছেন। এদিক-ওদিক থেকে আরও দু-একটা এসেছে।

কাগজ কে দিয়েছে, বল সেই কথা। উড়তে উড়তে এসে পকেটে ঢুকে পড়ল?

ছেলেটা বলে, কথা অঙ্ক টুকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি বাবাকে দেখাব বলে।

এই তোর হাতের লেখা? মিথ্যে বলার জায়গা পাসনি? ওই যা

বললাম—মিথ্যেবাদীর এ ইস্কুলে জায়গা নেই। চিত্তবাবু, ছেলেটা কোন ঘরে বসেছে দেখুন তো। ওর খাতাটা নিয়ে এসে বাতিল করে দিন। এগজামিনারের কাছে যাবে না।

শেষ ঘণ্টা পড়বার দেরি নেই। ক্ষুদিরাম ছুটতে ছুটতে মহিমের কাছে এসে চিত্তবাবুর স্লিপ দিল: কাশীনাথ সরকারের খাতা হেডমাস্টার এখুনি চেয়ে পাঠিয়েছেন।

কাশীনাথ? মহিম নজর ঘোরালেন ঘরের চতুর্দিকে: কাশীনাথ সরকার কে আছে, উঠে দাঁড়াও। হেডমাস্টারের কাছে খাতা যাবে।

পতাকীচরণ বলেন, কাশীনাথ বাইরে গেছে। কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছে একখানা। এক নম্বরের শয়তান—বুঝলেন? যেমন শয়তান তেমনি হাঁদা। ধরা পড়েছে কি করতে গিয়ে। ঠিক হয়েছে!

ঘণ্টা পড়ে ছুটি হয়ে গেল। কাশীনাথ তখনও দাঁড়িয়ে। হেডমাস্টার বলেন, কী রকম গার্ড দেন পতাকীবাবু? অঙ্ক কষে বাইরে থেকে ছেলের হাতে দিয়ে যায়, আপনারা দেখতে পান না?

ছেলেটাকে পতাকী এই মারেন তো এই মারেন। বলছেন, আমি স্যার চেয়ারে বসি নে, সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে গার্ড দিই। মহিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন। ছোঁড়াটা বার বার বাইরে যাবে,—সেই সময় কোথা থেকে সাপ্লাই হয়েছে। ধরে আগাপাস্তলা চাবকালো যেত—কাগজ কোত্থেকে আসে তাহলে বেরিয়ে পড়ত। সে তো সার হবার জো নেই।

মহিমকে পতাকীচরণ সাক্ষি মেনেছেন, কিন্তু তিনি একেবারে থ হয়ে গেছেন। অঙ্ক কষা তাঁরই—যে ইকুয়েশন ছটো খানিক আগে পতাকীচরণ কষিয়ে নিয়ে গেলেন। ভি-ভি-ভি কিংবা চিত্তবাবু ভাগ্যিস তাঁর হাতের লেখা চেনেন না! চোরের দায়ে তাঁরই তো পড়বার কথা! আর কাশীনাথ ছেলেটাও কী ধাতু রে—পতাকীচরণ এমন যাচ্ছেতাই করছেন, মুখে তবু টু-শব্দটি বের করে না।

মহিম আর পতাকীচরণ পরের দিনও সেই ঘরের গার্ড। পয়লা ঘণ্টা পড়ে গেছে, প্রশ্নপত্র এইবার আসবে। কাশীনাথ যথারীতি সিটে গিয়ে বসল। কালকের একটা বেলার খাতাই শুধু বাতিল।

ছেলেরা কাশীনাথকে ঘিরে ধরেছে: অঙ্ক তোকে কে করে দিয়েছিল?

কাশীনাথ রক্ত-ভরা হাসি হাসে: জানি নে। সত্যিই জানি নে কিছু আমি। স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এক টুকরো কাগজ হাওয়ায় উড়তে উড়তে এল। হাতের মুঠোয় ধরে নিলাম।

চুকেবুকে তো গেছে—কেন লুকোচ্ছিস? বল ভাই, শুনি।

অনুরোধে বেশ জোরে বলছে ওরা। তুখড় ছেলে মাত্রেই করে থাকে, না করাটাই বোকার লক্ষণ—এমনিতরো ভাব কথাবার্তায়।

পতাকীচরণ সগর্বে মহিমের দিকে চোখের ইঙ্গিত করলেন। কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বললেন, শুনছেন তো মশায়? সোনার টুকরো ছেলে ওই কাশীনাথ। ক্লাসের ছেলের কাছেও কথা ভাঙে না। আর কাল তো দেখলেন হেডমাস্টারের সামনে। যেমন সাহস, তেমনি সত্যনিষ্ঠা। আমার কাছেও সত্য করেছিল, গলা কেটে ফেললেও কিছু বলবে না। ঠিক তাই। কাশীর কাছ থেকে কথা বের করবে, সে মানুষ আজও জন্মে নি।

মহিম তখন অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছেন কৃষ্ণকিশোর নাগ হেডমাস্টারের কথা। তাঁরই এক ছাত্র সূর্যকান্ত। সোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডমাস্টার—কমিটি-ফমিটি কেঁচো তাঁর কাছে। কমিটি তো ছার—সেই স্বদেশি যুগে লালমুখ পুলিশ সুপার দলবল নিয়ে ইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ছাত্রকে অ্যারেস্ট করবে, কিন্তু ঢোকবার সাহস নেই। কৃষ্ণকিশোর বেরিয়ে এলেন: এখানে কেন? চলে যান আপনারা। ছেলেরা ভয় পেয়েছে, পড়াশুনোর ব্যাঘাত হচ্ছে। যেতে হল পুলিশ-সুপারকে থোতা মুখ ভোঁতা করে।

কৃষ্ণকিশোর কবে গত হয়েছেন, আজও দেশ-জোড়া নাম। সূর্যবাবুর কাছে মহিম তাঁর অনেক গল্প শুনেছেন। ইস্কুল যেন বিশাল এক যৌথ পরিবার—সে বাড়ির কর্তা হলেন বৃদ্ধ কৃষ্ণকিশোর। ছাত্র হোক শিক্ষক হোক, বাইরের কেউ ছুঁয়ে কথা বললে রক্ষে থাকবে না। তোমার কোন অভিযোগ থাকলে হেডমাস্টার কৃষ্ণকিশোরকে বল, তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর, কিছু করণীয় থাকলে তিনিই তা করবেন।

একবার শীতকালে ইনস্পেক্টর এলেন ইস্কুলে। পাড়াগাঁয়ের ইস্কুলে ইনস্পেক্টর আসা রাজসূয় ব্যাপার। ইনস্পেক্টর দেখেশুনে ভিজিট-বুকে মন্তব্য লিখে চলে গেলেন, ফাঁড়া কেটে গেল—মাস্টার-ছাত্র ও কমিটির কর্তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই ফাঁড়া কাটানোর কতরকম তোড়জোড় কতদিন থেকে। খাতাপত্র ঠিকঠাক বানিয়ে ফেল দিনরাত্রি খেটে। রেজেস্ট্রিতে যত আজেবাজে ছেলের নাম আছে, তাদের [illegible] দু-একদিন ক্লাসে বসিয়ে কিছু তালিম

দিয়ে দাও। ইস্কুলের উঠোনের জঙ্গল সাফ কর, বরান্দায় ঝাটপাট দাও। ছেলেপুলে ও মাস্টাররা কাপড়চোপড় কেচে ফর্সা করুক আগে থাকতে। পতাকা বাঁধনাকা। ওদিকে গাঁয়ের পুকুরগুলোয় দাঁড়জাল নামিয়ে সবচেয়ে বড় মাছটা ধরিয়েছে, গোপালভোগ-চন্দ্রপুলি-ক্ষীরের ছাঁচ বানিয়ে রেখেছেন এবাড়ির-ওবাড়ির মেয়েরা। আসছেন যেন গ্রামসুদ্ধ মানুষের সরকারি জামাই।

কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের ইস্কুলে সে ব্যাপার নয়। ইন্‌স্পেক্টর আসার খবর নিশ্চয়ই আগে চিঠিতে জানিয়েছিল। কিন্তু সরকারের কর্মচারী আসছেন কর্তব্য করতে, এসে যা দেখবার দেখে যাবেন—অপরের সে খবরে কি প্রয়োজন? সাধারণ কাজকর্মের একতিল এদিক-ওদিক হবে না ইনস্পেক্টর আসার জন্যে।

এসেছেন ইনস্পেক্টর। অফিসে বসে খাতাপত্র দেখে নিলেন। উঠলেন তারপরে। ক্লাস দেখবেন। মাস্টারমশায়রা বিশ্রামঘরে। শীতেরবেলা উঠোনে রোদ পোহাচ্ছেন কেউ কেউ। কৃষ্ণকিশোরকে ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করেন, ক্লাসে যাননি ওঁরা?

বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে, ক্লাসের পড়ানো নেই। সেইজন্য ওঁদের ছুটি।

স্তম্ভিত ইনস্পেক্টর: কি বলেন! পরীক্ষার হলে মাস্টারমশায় কেউ নেই—টোকাটুকি করে দফা সারবে তবে তো!

কৃষ্ণকিশোর বিরক্ত হয়ে বলেন, শিক্ষকরা থাকেন পড়ানোর জন্য। পুলিশ-পাহারাদার তাঁরা নন—তাঁদের আজ কাজ কি? ছেলেরাও পড়াশুনো করতে আসে, ইস্কুল চোর-ছ্যাঁচোড়ের জায়গা নয়—তারাই বা কেন টোকাটুকি করতে যাবে?

ইনস্পেক্টর অবাক হয়ে আছেন তো কৃষ্ণকিশোর বললেন, আপনার সঙ্গে আমি ক্লাসে যাচ্ছিনে। যেখানে খুশি আপনি একলা ঢুকে পড়ে দেখে আসুন। ছেলেদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা থাকবে, আমি সেটা চাইনে। দেখেশুনে নিঃসংশয় হয়ে আসুন।

ইনস্পেক্টর একলাই চললেন দেখতে। আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়েও দেখলেন। সব ছেলে নিজ নিজ খাতা লিখে যাচ্ছে নিঃশব্দে—ঘাড় তুলে তাকায় না কোনদিকে। জলের কলসির ধারে বেয়ারা জন দুই বসে। কেউ জল খেতে এলে মাটির গেলাসে করে দিচ্ছে, খাওয়ার পরে ফেলে দিচ্ছে সেই গেলাস। এ ছাড়া আশেপাশে কোথাও কেউ নেই।

ইনস্পেক্টর কমবয়সি। অফিসে ফিরে এসে বললেন, পায়ের ধুলো দিন আমায়। আর কিছু দেখবার নেই, আমি যাচ্ছি।

মহিম ভাবছেন, হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নেওয়া যায় সে সব মানুষ বড় দুর্লভ। অতিকায় ডাইনোসর লোপ পেয়ে গেছে। বড় মাপের স্বষ্টির দিন যেন ফুরিয়ে এল।

॥ নয় ॥

নিচের ক্লাসের ছেলেদের মুখে-মুখে পরীক্ষা ; বড়দের মতন তারা লিখে পরীক্ষা দেয় না। লেখা পরীক্ষাগুলো আগেভাগে হয়ে যায়, টিচাররা বাড়িতে নিয়ে খাতা দেখেন, আর ইস্কুলে এসে মৌখিক পরীক্ষা নেন। এমনি প্রোগ্রাম হওয়ায় পরীক্ষার কিছু সময়-সংক্ষেপ হয়। নগদ কারবার মৌখিক পরীক্ষার ব্যাপারে। প্রশ্ন হল—হর্ষবর্ধন কে ছিলেন, তাঁর দানযজ্ঞের কাহিনী বল। হর্ষবর্ধন সার একজন রাজা—। ততক্ষণে এই প্রশ্নের বাবদ নম্বর পড়ে গিয়ে ভিন্ন প্রশ্ন এসে গেছে : হজরত মহম্মদ কি করেছিলেন ? পরীক্ষা চারটে পর্যন্ত হতে পারবে, কিন্তু তার অনেক আগে একটা-দেড়টার মধ্যে কাজ শেষ করে নম্বরের কাগজটা চিন্তবাবুর কাছে জমা দিয়ে মাস্টারমশায়রা বিদায় হয়ে যান।

এইটথ ক্লাসের ইতিহাস নিচ্ছেন মহিম। দাশু এসে বলেন, একটু গোপন কথা আছে মহিমবাবু।

মহিম বলেন, ছাত্র আছে, এই তো ? দু-হপ্তা ধরে এই চলেছে, সবাই এসে গোপনে বলে যান। কাকে যে কে গোপন করছেন জানি নে। চেক-টেকের দরকার নেই—রোল-নম্বর বলে দাও, মার্কসিটের পাশে দাগ দিয়ে নিচ্ছি।

দাশুর ছাত্রের রোল-নম্বরে দাগ দিয়ে নিয়ে পরীক্ষার্থীর দিক চেয়ে বললেন, হ্যাঁ, কি বলছিলি ? থেমে গেলি কেন রে, বলে যা—

দাশু তবু দাঁড়িয়ে আছেন।

হবে, যাও তুমি। সবাইকে দিচ্ছি, তোমায় বেলা কেন দেব না ?

ছেলেটাকে আরও গোটা দুই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শেষ করে দিলেন। তারপরে বিরক্তস্বরে মহিম বলেন, দু-জনেই আমরা অল্পদিন ঢুকেছি, তোমার বয়স দু-চার বছর কমই হবে আমার চেয়ে। তাই কথাটা বলছি দাশু। পরীক্ষা একেবারে ফার্স হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ভাবছি, একটা লেখা নিয়ে রাখলে হয়—কোন কোন ছেলে ইস্কুলের মাস্টার রেখেছে। তারা তো পাশ হবেই। তাদের বাদ দিয়ে রেখে বাকিগুলোর পরীক্ষা করলে খাটনি অনেকখানি কমে।

দাশু আমতা-আমতা করেন : কথা তো ঠিকই। কিন্তু অস্তায় জেনেশুনেও পেটের দায়ে করতে হয়। নইলে টুইশানি থাকে না।

মহিম বলেন, কাল আমি হিসাব করে দেখলাম। পঁচাশিখানা খাতা পেয়েছি। তার মধ্যে পঞ্চাশের উপর চেক এসে গেছে। আরও আসবে। পনের-বিশটা হয়তো বাকি থাকবে—সেই হতভাগাদের মাস্টার রাখবার সঙ্গতি নেই, কিংবা সস্তায় পেয়ে বাইরের টিউটর রেখেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পড়াশুনো করা আর পরীক্ষায় পাশ হওয়ার মধ্যে সম্পর্ক এমন কিছু নেই। দেখা যাচ্ছে, দুটো গোষ্ঠী ছাত্রের মধ্যে—পয়সা দিয়ে যারা মাস্টার-টিউটর রেখেছে, যাদের সুপারিশ করতে এসে মাস্টারমশায়রা ভাতভিত্তির দোহাই পাড়েন। আর হল—যারা টিউটর রাখতে পারেনি, যা খুশি করা যায় তাদের নিয়ে, বলবার কেউ নেই।

দাশু বলেন, গালিগালাজ করেছেন। উচিত বটে! কিন্তু দোষ শুধুই কি আমাদের? ইস্কুলের কর্তাদের নয়—তিরিশ টাকায় গ্রাজুয়েট রেখে যাঁরা দেমাক করেন? বিশ টাকা আওয়ার গ্রাজুয়েটের মাইনে। মাস্টারদের ন্যায্য মাইনে বাড়ানো কি ইস্কুলের হিত সম্বন্ধে দুটো আলাপ-আলোচনা—এর জন্যে একটা মিটিং ডাকার যাদের সময় হয় না। শিক্ষিত মানুষ প্রথম যখন আসেন, মনের মধ্যে বড় বড় আদর্শ মরে দুদিনে ভূত হয়ে যায়। দোষ গার্জেনেরও—বেশি টাকায় ইস্কুলের মাস্টার রেখে যাঁরা ভাবেন কর্তব্য শেষ হয়ে গেল। ছেলে কি করছে তার কোনরকম খোঁজ নেবেন না। এগজামিনের রেজাল্ট বেরুলে তখন কৈফিয়ৎ চান ছেলের কাছে নয়—মাস্টারের কাছে। ছেলের সামনেই মাস্টারের উপর হুমকি ছাড়েন।

উচ্ছ্বাস ভরে দাশু অনেক কথা বলে ফেললেন। মহিম এক নজরে চেয়ে শুনে গেলেন। বললেন, যাও তুমি ভাই। ঠিক করে দেব। কিছু বলুক আর না বলুক, হেসে নম্বর দিয়ে দেব তোমার ছাত্রকে।

দাশু ঘাড় নেড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলেন, না না মহিমবাবু। ঠিক উল্টো। টরটর করে বলে যাবে, সব প্রশ্নের ভাল জবাব দেবে। নম্বর দিতে হবে খুব চেপে। তিরিশে পাশ, একত্রিশ কি বত্রিশ নম্বর দেবেন। তার বেশি কক্ষণো নয়।

মহিম একেবারে দস্তুর মতো চটে গেলেন : ছি-ছি! নিরীহ শিশুকে ন্যায্য নম্বর থেকে বঞ্চিত করব—এ কাজ আমায় দিয়ে হবে না। নম্বর বাড়িয়ে দিতে বল, সে এক কথা, কিন্তু কমিয়ে শত্রুতা সাধন করা—এ জিনিস ত্রিসীমানায় নয়।

দাশু বললেন, শত্রুতা সাধল কার উপরে বলুন? আমিই তো পড়াই ছেলেটাকে। আগে বুঝে দেখিনি—এখন হয়েছে গণেশের স্কুল থেকে যাবার যোগাড়। আপনি রক্ষে না করলে বাঁচবার উপায় নেই।

হাত জড়িয়ে ধরতে যান মহিমের।

রাখ, রাখ—আহা, উতলা হয়ে পড়েন কেন? বল সব কথা, শুনি।

মহিম আদ্যোপান্ত শুনলেন।

গণেশ নামে একটি ছেলে এই ইস্কুলের এইট্থ ক্লাসে পড়বার সময় মারা যায়। বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে—তাঁরা স্কলারশিপ দিয়েছেন গণেশের নামে। গণেশ-স্মৃতি স্কলারশিপ। এইট্থ ক্লাস থেকে যে ছেলে ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পাবে, এক বছর তাকে মাসিক বারো টাকা করে দেওয়া হবে। এবার খুব ভাল ছেলে আছে—প্রাক্তন ছাত্র সেই সুখময় জজের ছেলে। কিন্তু দাশু অতশত বোঝে নি, নিজের ছাত্রের জন্য তদ্বিরটা বড্ড বেশি করে ফেলেছে। গণেশ-স্কলারশিপ এর ঘাড়ে এসে চাপলে নজর পড়ে যাবে সকলের, নানা রকম খোঁজ-খবর হবে—

দাশু বলছেন, সব টিচারের সঙ্গে ভালবাসাবাসি, সকলে খাতির করেন। এইট্থ ক্লাসের যাঁরা প্রশ্নপত্র করেছেন, তাঁরা সব ইম্পর্টাণ্ট বলে দিয়েছিলেন। এই বছরের নতুন টুইশানি বলে আমিও যত্ন করে উত্তর লিখে দিয়ে মুখস্থ করতে বললাম। অঙ্কগুলো কষিয়ে কষিয়ে রপ্ত করে দিয়েছি। হতভাগা ছেলে—যা বলেছি, তাই কিনা অক্ষরে অক্ষরে করে রেখেছে। এতাবত কি রকম করল, খোঁজ নিতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ—ফার্স্ট বয়কে ছাড়িয়ে বেটা পঞ্চাশ নম্বরের উপরে বসে আছে। আর সব হয়ে গেছে—বাকি এই ইতিহাসের আপনি, আর জগদীশ্বরবাবু কাল অঙ্ক নেবেন। তাঁকে বলা আছে, সমস্ত অঙ্ক নির্ভুল করলেও নম্বরটা তিরিশের বেশি উঠবে না। এখন আপনি দয়া করলে স্কলারশিপটা কোন রকমে রক্ষে হয়ে যায়।

দাশুর ছাত্র অন্য কেউ নয়—মলয়। সেই মলয় চৌধুরি। চেহারা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। কী মধুর কণ্ঠস্বর! দেবশিশু একটি। প্রশ্ন না করতেই গড়গড় করে বলে যাচ্ছে। কিন্তু হলে কি হবে জাদুমণি—হাত বাঁধা, টায়েটোয়ে পাশের নম্বরটা শুধু।

মহিমের দেহমন রি-রি করে জ্বলছে। সাতু ঘোষ তো অনেক ভাল—সে ঠকায় শক্ত সমর্থ মানুষদের। নিষ্পাপ অবোধ ছেলেপুলে নিয়ে খেলায় না। এ চাকরি আর নয়। শহর ছেড়ে মফস্বলের কোন শান্ত অঞ্চলে চলে যাবেন

মহিম। ঠাণ্ডা গাছের ছায়া, [illegible] নদীর কূল, ছোটখাট ইস্কুল, একটা—আশ্রমের পরিবেশ। সেখানে কৃষ্ণকিশোর না হন, সূর্যবাবুর মতো মিলে যেতে পারে কাউকে। শহরে এইসব হাঁকডাকের ইস্কুলের খুদে [illegible] [illegible] কারা। আলো পাখালা বিনে জবজব—এর মধ্যে মানুষ বাঁচে কেমন করে।

হেডমাস্টার এবারে নতুন সার্কুলার দিয়েছেন, শুধুমাত্র নম্বর জমা দিলেই হবে না, উত্তরের খাতা ফেরত দিতে হবে ছেলেদের। যা দেখে ভুল কোথায় তারা ধরতে পারবে, ভবিষ্যতের জন্য সামাল হবে। প্রোমোশানের এক হপ্তা আগে একটা তারিখ দেওয়া হল—ঐ দিন ক্লাস বসবে খাতা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

বোলতার চাকে ঘা পড়ল। দুজন মাস্টার মুখোমুখি হলেই ওই প্রসঙ্গ। দিন-কে-দিন আজব নিয়ম। খাতার ভুল দেখে তো রাতারাতি বিদ্যাদিগ্‌গজ হবে। ওসব কিছু নয়, মাস্টারগুলো জব্দ হয় যাতে। ক্লাস-পরীক্ষা হয়ে গেল, কিন্তু টেস্ট আর ফাইন্যালে বাঘা বাঘা পরীক্ষা দুটো সামনে। উপরের মাস্টার যাঁরা আছেন, টুইশানির ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখছেন তাঁরা। দশটা মিনিট পড়তে চাইত না, দেড় ঘণ্টা পরেও সেই ছাত্রের হাত ছাড়িয়ে ওঠা যায় না। হেডমাস্টারের সন্দেহ, অযত্নে আন্দাজি নম্বর দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রের হাতে খাতা দিয়ে সেইজন্য মাস্টার পরীক্ষার নতুন আইন।

টুইশানির শাহান-শা সলিলবাবু—তিনি কিন্তু একেবারে নির্বিকার। ছোকরা মাস্টাররা টুইশানির গরব করেন: আমার তিনটে, আমার পাঁচটা। সলিলবাবু কানে শোনেন আর হাসেন মৃদু-মৃদু। স্বল্পবাক নির্বিরোধী এই মানুষটিকে মহিমের ভাল লাগে। একদিন বললেন, লোকে বলে পুরো ডজন টুইশানি নাকি আপনার?

সলিল হেসে বললেন, তাই কখনো পারে মানুষে?

তবে ক'টা? বলতে কি, কেউ আর কেড়ে নেবে না।

ওসব জিজ্ঞাসা করতে নেই মহিমবাবু। আমি বলতে পারব না, গুরুর নিষেধ।

হেসে আবার বলেন, কত বন্ধুজনের রাতের ঘুম নষ্ট হবে। কী দরকার।

এ হেন সলিলবাবুর মুখে একটি অনুযোগের কথা নেই। যথারীতি মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছেন, পরীক্ষা না থাকলে হল বা লাইব্রেরি ঘরের লম্বা টেবিলে গড়িয়ে নিলেন একটু। আবার তখনই তড়াক করে উঠে চিত্তবাবুর দিকে চোখের

ইঙ্গিত করে বেরিয়ে পড়লেন। বেরুলেন টুইশানিতে, চলবে সেই রাত দুপুর অবধি।

মহিম বললেন, সোমবারে তারিখ। সমস্ত খাতা ওইদিন দিয়ে দিতে হবে।

সলিল মাথা নাড়লেন: হুঁ—

আপনার কত খাতা সলিলবাবু?

সলিল বললেন, বাণ্ডিলের ভিতরে সমস্ত নাকি লেখা আছে। আমি এখনো দেখিনি। শ'-ছয়েকের মতো হবে মনে হয়।

বলেন কি! বাণ্ডিলই খোলেননি বোধহয়। তবে কি করবেন?

হাসিমুখে সলিল বললেন, মাঝে রবিবার আছে। দেখে দেব যেমন করে হোক।

সোমবারে ইস্কুলে এসেই মহিম সলিলের খোঁজ নিলেন। হাসিমুখ তাঁর যথারীতি, সামনে প্রকাণ্ড খাতার বাণ্ডিল।

এক দিনের মধ্যে এত খাতা দেখে ফেললেন?

সলিল বলেন, পুরো দিনই বা পেলাম কোথা! জানুয়ারীর গোড়ায় টেস্ট—শিরে সংক্রান্তি, এখন কি রবিবার বলে কিছু আছে? রবিবারেও বেরুতে হল। দুপুরবেলা ঘণ্টা তিনেক অনেক কষ্টে একটু ফাঁক করে নিয়েছিলাম।

মারা পড়বেন সলিলবাবু। খাতা ছেলেদের হাতে দিয়ে দেখুন, খুঁড়ে খাবে তারা আপনাকে।

নির্বিকার কণ্ঠে সলিল বলেন, এই কর্মে চুল পাকালাম। কিছু হবে না দেখতে পাবেন।

ক্লাসে গেলেন সলিল। অন্য দিনের চেয়ে বেশি গম্ভীর আজ। সকলকে খাতা দিয়ে দিলেন।

দেখ তোমরা, মনোযোগ করে মিলিয়ে দেখ। মার্কসিট আমার কাছে। ভুল-টুল থাকতে পারে তো—তাই এখনো জমা দিইনি।

ছেলেরা খাতা খুলে দেখছে! মোটামুটি খুশি সকলে। নম্বর যা প্রত্যাশা করেছিল, তারচেয়ে বেশি বেশি পেয়েছে। ভাল মাস্টার সলিলবাবু, দয়াধর্ম আছে।

একটা ছেলে উঠে দাঁড়াল।

সলিল বলেন, কি গোলমাল আছে বুঝি?

হ্যাঁ সার ফিফ্‌থ কোয়েশ্চেনে নম্বর পড়েনি।

হতে পারে এই জন্যেই তো মার্কসিট জমা দিইনি এখনো। নিয়ে এস, দেখি।

কাছে এসে ছেলেটা খাতা মেলে ধরে : এই দেখুন সার। গ্রামারের এই প্রশ্নে তিন তো পাবই—

নিরিখ করে দেখে সলিল বলেন, তিন কেন, চার পাবে। তাই দিয়ে দিচ্ছি।

চার মার্ক বসিয়ে দিলেন। তার পরেও পাতা উল্টে যাচ্ছেন। বলেন, খাতাটা সত্যি অমনোযোগের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভুল আরও আছে! এই ব্যাখ্যা করেছিস, সাত নম্বর দেওয়া যায় এতে? পাঁচের বেশি কিছুতে নয়।

সাত কেটে সলিল পাঁচ করে দিলেন।

বনভোজনের এসে লিখেছিস—হুঁ, হুঁ, হুঁ—আরে সর্বনাশ, কী কাণ্ড করেছি, কুড়ির মধ্যে ষোল দিয়ে বসে আছি। সাত-আটের বেশি কিছুতে দেওয়া যায় না—আচ্ছা, নয়ই দিলাম।

ছেলেটা কাঁদো-কাঁদো : একবার যখন দেওয়া হয়ে গেছে—

সলিল হাসিতে গলে গলে পড়ছেন : বলিস কি রে? ভুল করেছি, তার সংশোধন হবে না? গ্রামারের প্রশ্নেও যে মার্ক পড়েনি—দিয়ে দিলাম চার নম্বর। মার্কসিট এই জন্যেই এখনো হাতে রেখে দিয়েছি।

বলছেন, আর পাতার পর পাতা উল্টে খচখচ করে নম্বর কেটে সংশোধন করছেন। কমই হচ্ছে প্রতিক্ষেত্রে। ছেলেটা খারাপ নয়, আগে পেয়েছিল সাতষট্টি। সংশোধনের পর পঁয়তাল্লিশে দাঁড়াল।

খাতা ফেরত দিয়ে মার্কসিটে সাতষট্টি কেটে পঁয়তাল্লিশ করলেন। হাসিমুখ। তারপর সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি দেখা কিনা, ভুলচুক অনেক থাকতে পারে। নিয়ে এস যে যে খাতায় ভুল আছে।

সব ছেলে ইতিমধ্যে খাতা ভাঁজ করে পকেটে পুরে ফেলেছে। এমন কি ক্লাসের অপর ছেলেকেও দেখতে দেবে না।

চতুর্দিক থেকে সবাই বলে, ভুল নেই, ঠিক আছে সার।

ভাল করে দেখেছিস তো? যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।

টিফিনের সময় সেদিন ছাত্রের ভিড় এক-এক মাস্টারকে ঘিরে। এটা কম হয়েছে, ওটা বাদ গেছে, এখানে যোগের ভুল—মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। মহিম দু-হপ্তা ধরে এত খেটেখুটে বিচার-বিবেচনা করে দেখলেন, তাঁর কাছেও দলে দলে খাতা নিয়ে আসছে।

কেবল সলিলবাবু একান্তে বসে মৃদু-মৃদু হাসছেন। মহিম গিয়ে তাঁকে ধরেন : কী আশ্চর্য, আপনার কাছে কেউ আসে না!

নির্ভুল দেখেছি যে।

দু-ঘণ্টায় দু-শ খাতা নির্ভুল দেখে ফেললেন, কায়দাটা আমায় বলে দিতে হবে সলিলবাবু।

তাই তো! সলিল একটু ইতস্তত করেন: থাকগে, লাইনে নতুন এসেছেন —গুরুদত্ত শিক্ষা আপনাকেই দিয়ে দিচ্ছি একটু-আধটু। পরীক্ষার নম্বর লম্বা হাতে দিয়ে যাবেন। ঝামেলা আসবে না, ছেলেরা সুনাম করবে। গাঁট থেকে বের করতে হচ্ছে না, তবে আর ভাবনা কিসের?

একটুখানি থেমে হাসতে হাসতে বলেন, দেখুন ভাই, পয়সা খরচা করে পরোপকার করতে পারি নে। সে ক্ষমতা ভগবান দেননি। পেন্সিলের মুখের পাঁচ-দশটা নম্বর—তাতে কঞ্জুসপনা করতে গেলে হবে কেন?

॥ পাঁচ ॥

তেসরা জানুয়ারি। ক্লাস প্রোমোশানের সঙ্গে সঙ্গে ইস্কুল বন্ধ হয়েছিল। খুলেছে কাল। নতুন সেশন, নতুন সব ছেলেপুলে। পুরানোদের অনেক প্রোমোশান পেয়ে উপর ক্লাসে উঠেছে, ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেছে কেউ কেউ, নতুন নতুন ছেলে ভর্তি হয়ে আসছে। আপাতত পুরানো রুটিনে কাজ চলেছে। রুটিনও নতুন হবে—কোন্ ক্লাসের ক'টা সেকসন হয়ে দাঁড়ায়, সেই অপেক্ষায় দেরি করা হচ্ছে। চিত্তবাবুর কাছে ইতিমধ্যেই মাস্টারদের ঘোরাঘুরি আরম্ভ হয়ে গেছে নতুন রুটিনে একটু উঁচু ক্লাস পাবার জন্যে।

মস্তবড় গাড়ি এসে থামল ইস্কুলের গেটে, জানালা দিয়ে গগনবিহারীবাবু তাক করে আছেন। গাড়ি থেকে নামলেন মোটাসোটা প্রবীণ ভদ্রলোক। পিছনে কর্ডের হাফপেন্ট ও ঘিয়ে-রঙের হাফশার্ট-পরা দুই বাচ্চা ছেলে। দুই ভাই সন্দেহ নেই।

নতুন ফার্স্ট' ক্লাসের পড়া শুরু হতে ক'দিন এখনো দেরি আছে। তিন সেকসনের তিনটে ঘরে ছেলে ভর্তির ব্যবস্থা। একটায় গার্জেন ও ছেলেপুলেরা এসে বসছে। একটায় পরীক্ষা। আর একটায় ভর্তির ফরম-পূরণ, টাকার লেনদেন এবং বইয়ের লিস্ট দেওয়া হচ্ছে। বিষম ভিড়। অন্য ইস্কুলের ট্রান্সফার-সার্টিফিকেট থাকলেই হল না, যাকে তাকে নেন না এরা, ছেলে দেখেশুনে বাজিয়ে নেবেন। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা তো বটেই, তাছাড়া আপাদ-মস্তক চেহারাও দেখবেন। যে ক্লাসে ভর্তি হবে, তার মানানসই হওয়া চাই। সমারোহ ব্যাপারে। ভর্তির কাজটা কালাচাঁদবাবু করে থাকেন, এবারও তাঁর

উপরে-তলার। গৃহশিক্ষক জন তিনেক মাস্টার নিয়ে পরীক্ষায় বসিয়ে দিয়েছেন। বাহির তার ভিতরে।

গাড়ি থেকে নেমে সেই ভদ্রলোকটি ছোট উঠান পার হয়ে আসছেন। গগনবিহারী দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছেন, সিঁড়ির মুখে গিয়ে ধরবেন। ভূদেববাবু, দেখা গেল, অন্য জায়গায় দাঁড়িয়ে। হাসছেন তিনি গগনবিহারীর দিকে চেয়ে, আর বুড়ো আঙুল নাড়ছেন: ভাই-রে নারে নারে-না—সে-গুড়ে বালি। চাকের মধু নেপোয় খেয়ে যাচ্ছে। হবে না, কোন আশা নেই।

গগনবিহারী থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, চেনেন বুঝি ওঁদের? অতবড় গাড়ি হাঁকিয়ে এলেন, কে মানুষটা?

ভূদেব বলেন, বড়লোক—সেটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। ছেলে ভর্তি করতে আসছেন, তা-ও ঠিক। কিন্তু ড্রাইভারের পাশ থেকে আধ-ময়লা পাঞ্জাবী-পরা ওই যে একজন ছেলে এল, তাকে দেখছেন? ছেলে ছুটোর মাথায় ছাতা ধরে নিয়ে আসছে—রোদ্দুর থেকে আমাদের কারো দৃষ্টি না লাগে। মাস্টার ওটি, আমাদের কোন আশা নেই। হবার হলে আমিই আগে ছুটে গিয়ে ওঁদের খাতির করে বসাতাম।

ছত্রধারী লোকটাকে ভাল করে দেখবার জন্য গগনবিহারী ফিরে আবার জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন। চশমা-পরা রোগা-লিকলিকে মানুষ—চাকর নয়, আরদালী নয়—বলেছেন ঠিক ভূদেববাবু, প্রাইভেট মাস্টার না হয়ে যায় না। ওই মাস্টারের কাছে বাড়িতে পড়েছে বোধহয় এতদিন। বড় হয়ে গেছে বলে এবারে ভর্তি করতে নিয়ে আসছে। কী রকম আগলে নিয়ে আসে—অন্য মাস্টারের যেন ছোঁয়াচ লাগতে দেবে না। আরে বাপু, ক'দিন চলবে অমন সামাল-সামাল করে? তোমার তো সন্ধ্যের পরে একটা ঘুল কেলে যাওয়ার সম্পর্ক—বারোমাসের অষ্টপ্রহর এবার থেকে আমাদের সঙ্গে।

গগনবিহারীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেমন যেন দুষ্টগ্রহের নজর লেগেছে। পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চার-চারটে টুইশানি ছেড়ে গেল—দুই ছাত্রের বাপ গভর্নমেন্ট-অফিসার, ভিন্ন জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে গেল। একটা ছেলে রক্ত-আমাশয়ে শয্যাশায়ী, কবে উঠে বসে পড়াশুনা করবে ঠিক-ঠিকানা নেই। আর এক গুণধর বাপের বাক্স ভেঙে নিয়ে কোন অজানা মুলুকে পাড়ি দিয়েছে। চারটে গেছে, সে জায়গায় একটাও গাঁথতে পারলেন না এখন অবধি।

চলে গেলেন কাদাটাকবাবুর কাছে: বাপরে বাপ, ঘোরতর মাহুব আপনার এখানটা!

কালাচাঁদ হাসলেন একটু। অজস্র মানুষ আসছে, জমিয়ে কথা বলার ফুরসত নেই। তিন ঘর জুড়ে ভর্তির কাজকর্ম, চকোর দিয়ে বেড়াচ্ছেন সর্বত্র।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

কালাচাঁদ বুঝেছেন সেটা। অনেক মাস্টারই আসছেন। ক'টা দিনের বাড়বাড়ি তাঁর, সবাই এসে এসে খোসামুদি করেন। একপাশে সরে এসে কালাচাঁদ বলেন, বলুন—

বাজার কেমন এবারে? এমনি তো ভিড় দেখা যাচ্ছে।

কালাচাঁদ মুখ বেজার করলেন: দম মশায়। মুখে রক্ত তুলে খাটছি—কিন্তু আসলের বেলা অষ্টরম্ভা। বাজে মক্কেলের ভিড—কেরানি দোকানদার এইসব। ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে ফ্রি-হাফফ্রি দরখাস্তের ফরম কোথা মিলবে? দূর দূর—পয়সা দিয়ে প্রাইভেট মাস্টার রাখবার লোক এরা!

শুক মুখে অসহায়ভাবে গগনবিহারী বলেন, তবে কি হবে কালাচাঁদবাবু? সবাই আমরা আপনার দিকে মুখ করে আছি। ভর্তির সময় দুটো-একটা যদি পাইয়ে না দেন সারা বছর কি খেয়ে বাঁচব?

আরে মশায়, আমার কি অসাধ? দিই নি এর আগে? বলুন। দিন দিন বাজার পুড়েজ্বলে যাচ্ছে। তার উপরে ঘরের পাশের ওই প্রাচীশিক্ষালয়—হাল আমলের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে খৈ ফোটায় মুখে মুখে, নতুন সাজসরঞ্জাম, কথায় কথায় খাস ছারভাঙ্গা-বিল্ডিং অবধি তদ্বির-তদারকের ব্যবস্থা। আর আমাদের হল বনেদি গদাইলস্করি ব্যাপার। মোটরওয়ালা যত গার্জেন যেন জাল ফেলে মোড থেকে ওরা ধরে নিচ্ছে। কাল টিফিনের সময়টা বেড়াতে বেড়াতে গিয়েছিলাম ওদের ইস্কুলের সামনে। মোটরে মোটরে ছয়লাপ—দেখে তো চক্ষু কপালে উঠে গেল।

গগনবিহারী বললেন, তা হলেও হাত-পা কোলে করে থাকলে হবে না। রুই-কাতলা না হল, চ্যাংরা-পুঁটি কিছু তো তুলতে হবে। কাল থেকে বরঞ্চ আমায় নিয়ে নিন পরীক্ষার কাজে। নিজে একবার বেরেছেরে দেখি। সবে ধন একটা টুইশানিতে ঠেকেছে। একপাদা কাচ্চাবাচ্চা—বড় ঘাবড়ে যাচ্ছি মশায় এবারে।

কালাচাঁদ বিরক্ত হয়ে বলেন, সলিলবাবু, মহিমবাবু আর বনোয়ারিবাবু—তিনজন ওঁরা রয়েছেন। আপনি তার উপরে এসে কি করবেন? জলই নেই একেবারে—শুকনো ডাঙার উপরে চ্যাংরা-পুঁটিই বা কি করে ধরবেন?

অর্থাৎ নিরিবিলি বসে আরও বেশি করে তেল দিতে হবে কালাচাঁদকে।

বনোয়ারি ব্যক্তিটি ঘুঘু এক নম্বরের। নিজের পেটে একহাঁটু খিদে—খিদে মিটিয়ে তবে তো পরের ভাবনা! প্রক্রিয়াটি কেমন চলেছে, দেখবার জন্ত গগন-বিহারী শরীকায় ঘরে গেলেন। বনোয়ারি ডাকলেন, আসুন—

সেই যিনি বড় মোটরে চড়ে এলেন, তাঁকে নিয়ে চলছে। চিন্তিত ভাবে ঘাড় নেড়ে বনোয়ারি বলেন, মুশকিল হয়েছে স্যার আপনার ছেলে ইংরেজিতে একেবারে কাঁচা। কী করে নেওয়া যায় বলুন।

বলেন কি মাস্টারমশায়? ইংরেজীই তো জানে আমার ছেলে। কথতলা একাডেমিতে ইংরেজিতে সেকেণ্ড হয়ে আসছে বরাবর।

ওসব পচা ইস্কুলের নাম করবেন না স্যার। বাঘ-সিংহ পশু আবার ব্যাঙ-ইঁদুরও পশু। দেখলেন তো চোখের উপর—এইটুকু এক প্যাসেজ ডিকটেশন লিখতে দিলাম, তার মধ্যে পাঁচটা ভুল।

ভদ্রলোক বলেন, মাপে এইটুক্ হলে কি হবে। ইটপাটকেল সব ছড়িয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে। বাহাদুর ছেলে, তাই পাঁচটা ভুল। ওর বাপ হলে তো পাঁচ গণ্ডায় পার পেত না। নিয়ে নিন মশায়, ভোগাবেন না। প্রাচী শিক্ষালয়ে এই ক্লাসের একটা সিটও নেই. তারা হলে লুফে নিত।

গলা খাটো করে বললেন, ইস্টার্ন প্রডাক্টস বলে যে কোম্পানি, সেটা আমার। জানেন তো, মলটেড মিল্ক বানাচ্ছি এবারে আমরা। হরলিকসকে বসিয়ে দেব বাজার থেকে। যাবেন না ছুটির পর একদিন বেড়াতে বেড়াতে। আলাপ-সালাপ হবে—দুটো বড় শিশি দিয়ে দেব; খেয়ে দেখবেন।

বনোয়ারি নরম হলেন। বলেন. সে যাক এখন। ভর্তির এই ঝামেলা না কাটলে কোনদিকে তাকাতে পারছি নে। কিন্তু ঐ যা কথা হল, ইংরেজির জন্ত ভাল মাস্টার রাখতে হবে। আপনার ছোট ছেলের কথা তো বলছি নে—এই মাস্টারমশায় রয়েছেন, ইনিই চালিয়ে দেবেন যা-হোক করে। বিপদ বড়টিকে নিয়ে। অন্ত সব সাবজেক্ট নিয়ে তত ভাবি নে, এই ইংরেজি—

রাখব ইংরেজির মাস্টার। ভর্তি করে নিন।

বনোয়ারি কাঁচা লোক নন, টুইশানি শিকার করে করে চুল পাকিয়েছেন: কাকে রাখবেন? ঠিক করে ফেলুন এখনই। যাকে তাকে দায়িত্ব নিতে হবে—হাফ-ইয়ারলি একজামিনে ইংরেজির নম্বর পঞ্চাশে তুলে দেবেন অন্ততঃ। বাইরের আজেবাজে মানুষের কথার কী দাম! আমাদের হেডমাস্টার বড্ড কড়া এসব ব্যাপারে। দুটো পাঁচটা টাকার সাশ্রয়ের জন্ত আপনারা বাইরের লোক খোঁজেন,

কিন্তু তাঁরা কি পারেন? আমরা ধরুন, জীবন কাটিয়ে দিলাম এই প্র্যাকটিস করে।

সঙ্গের সেই মাস্টারের সামনেই এসব হচ্ছে। বসির পাঁঠার মতো অর্থহীন দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন।

গার্জেন ভদ্রলোক বললেন, বাইরের লোক নয়, আপনাদেরই একজনকে— আপনার নিজের সময় থাকে তো বলুন।

আমার? না, আমার সময় আর কোথায়—

পুলকিত হয়ে বনোয়ারি আমতা-আমতা করছেন: অবিশ্যি সকালবেলার একটাকে ছুটির পর যদি ঠেলে দেওয়া যায়—

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলেন, যা-হোক কিছু করে আপনি ছেলেটার ভার নিন মাস্টারমশায়। নিশ্চিন্ত। বাজে লোকের উপর আর আস্থা করা যায় না।

ষোলআনা প্রসন্ন এখন বনোয়ারি: সত্যি, বড় দায়িত্বের ব্যাপার। এখনই ধরুন লেখাপড়ার ভিত গড়া হবে। ভিতের জন্ম চাই সেরা মিস্তিরি। উপরে উঠে গেলে বরঞ্চ মাঝারি লোক দিয়ে একরকম চালানো যায়।

ভদ্রলোক জেদ ধরে বলেন, না, উপরেও আপনি। পর-অপর নয়—নিজের ছেলে, আশা-স্বখে বড় ইস্কুলে ভর্তি করতে এনেছি, সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থাই করব তার জন্যে।

সে তো বটেই! ক'টি গার্জেন বোঝেন সেটা! আপনার মতো ক'জন? পান খান মশাই—

বনোয়ারি পকেট থেকে পানের কৌটো বের করলেন। খুট করে একটুকু চাপ দিতেই ডালা উঁচু হয়ে উঠল। দু-খিলি পান এগিয়ে দিলেন। আবার এমনি কায়দায় উপরের ছোট্ট খোপটা খুলে কৌটার আগায় চুন নিলেন। বলেন চলুন তবে ঐ বারান্দার দিকে। কথাবার্তা মিটে যাক।

গগনবিহারীর চোখ জ্বালা করে। চোখের উপরেই গেঁথে ফেলল একখানা। বারান্দায় খুব চলেছে ওঁদের। কথাবার্তা আর হাসি। হাসির ঢঙে বোঝা যাচ্ছে মক্কেল সত্যি সত্যি শাঁসালো। চেয়ারটা সরিয়ে একেবারে জানলার গায়ে নিলেন। কী বলাবলি হচ্ছে, শোনা যায় যদি।

বনোয়ারি বলছেন, পঁচিশের কমে পড়াই নে আমি। সস্তায় মাস্টার আছে বইকি! কিন্তু সে বনোয়ারি রক্ষিত নয়। বিদ্যোসাধ্যি আর পড়ানো দেখেই লোকে বেশি পয়সা দিয়ে রাখে।

গগনবিহারী মনে মনে বলেন, ওরে আমার বিশ্বেশ্বর রে। পড়াও তুমি কচু। শিখেছ ফেরেব্বাজি আর লম্বা লম্বা বচন।

ভদ্রলোক বলেন, কিছু বিবেচনা করুন মাস্টারমশায়। পাঁচটা টাকা কমিয়ে নিন। কুড়ি।

চিংড়িমাছের দরাদরি করবেন না। সময়ই হচ্ছিল না মোটে। আচ্ছা, আপনি বলছেন—পড়ানোর সময়টা না হয় কিছু বাড়িয়ে দিলাম। দু-ঘণ্টা। খুশি তো? থাকা হয় কোথায় মশায়ের?

ভদ্রলোক ঠিকানা বললেন।

যাওয়া-আসা কিন্তু আপনার—

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন, কথার অর্থ ধরতে পারেন না। বনোয়ারি তখন বুঝিয়ে দিচ্ছেন: আপনার বাড়ি পড়াতে যাব, পড়িয়ে ফিরে আসব—ট্রামে গেলেও কতক্ষণ লাগবে ভেবে দেখুন। দশ দুয়োরে খেটে খাই আমরা, সময়ের বড্ড টান। আপনারা বাড়ি করবেন, কেউ যাদবপুরে কেউ হলদুলুতে। এই যাতায়াতের সময়টা পড়ানোর মধ্যে কিন্তু ধরে নেব।

ভদ্রলোক হাত জড়িয়ে ধরেন বনোয়ারির: যাওয়া-আসা আর বই খুলতেই তো পুরো সময় চলে যাবে। পড়ানোই হবে না মোটে। সে হয় না।

শেষ পর্যন্ত মিটমাট হল, যাওয়া ও আসার একটা মাস্টারের একটা গার্জেনের। কথাবার্তা চুকিয়ে ছেলে ভর্তি করে দম্পতি বিদায় হলেন।

কালাচাঁদ লক্ষ্য করছিলেন এতক্ষণ। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, হয়ে গেল পাকাপাকি?

বনোয়ারি বলেন, সঠিক বলা যাচ্ছে না। খদ্দের চরিয়ে খায় ঘুঘু লোক। কথা অবিশ্যি দিয়ে গেছে। কিন্তু পিছিয়ে যায় অনেকে তো? এসে হয়তো বলবে, ছেলের মা বলছে পুরানো একজন আছেন এখন—

কলকাঠি তো আপনাদের হাতে! পড়া ধরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেঞ্চির উপর দাঁড় করাতে থাকলে 'বাপ' 'বাপ' বলে মাস্টার ডাকতে দিশে পাবে না।

কাণ্ডকারখানা দেখে মহিম হতবাক একেবারে। তাঁর প্রতি সহসা সদয় হয়ে কালাচাঁদ বললেন, আপনি কিছু করতে পারছেন না। নতুন মানুষ—কোপ বুঝে কোপ মারবার ব্যাপার, দু-একদিনে এ বস্তু হয় না। ঘাবড়াবেন না, আমি আছি। আমি করে দেব একটা। ভাল দেখে দেব। অবিশ্যি মতিবাবুর মতন না হতে পারে, তা হলেও হেজিপেজি দেব না। চৌপ ফেলে বসে আছি বঁড়শির দিকে চেয়ে, খরি-খরি করে ধরছে না। আপনার টুইশানি পাওয়া তো সোজা

বলার। চৌকস মাস্টার—একাধারে ইংরেজি বাংলা অঙ্ক। এমন কটা মেলে? তার উপরে বি. এ. পাশ। এম. এ. হলে বটে মুশকিল ছিল।

মহিম সরলভাবে প্রশ্ন করেন, এম. এ-র মাইনে বেশি বলেই?

উঁহু। এম. এ এমনিই কেউ নিতে চায় না—বেশি মাইনে দিচ্ছে কে? ধরুন ইংরেজিতে এম. এ—পার্সেন ভাবেন, শুধু ইংরেজিটা জানে, অন্য কিছু পড়াবে না। তেমনি অঙ্কের এম. এ শুধু অঙ্কই পড়াবে। আর আপনারা হলেন গোলআলু—ঝালে-ঝোলে-চচ্চড়িতে যেমন খুশি চালানো যায়।

॥ সাত ॥

সাতু ঘোষের সঙ্গে প্রথম যে মেসে উঠেছিলেন, মহিম এখনো সেইখানে। সাতু ঘোষ আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ভাল অফিস করেছেন। ভূদেববাবু আর জগদীশ্বরবাবু থাকেন এখানে। প্রাচী শিক্ষালয়েরও দু-জন। কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে ইস্কুল। পাকাপোক্ত সরকার-জনিত ইস্কুল; তাছাড়া ব্যবসাদারি ইস্কুল অনেক—কোন ঝানু ব্যক্তি একটা বাড়ি ভাড়া করে সস্ত কলেজফেরত ছোঁড়াদের মাস্টার করে নিয়ে ইস্কুল চালায়। বিয়েথাওয়ার ব্যাপারে বাড়ি ভাড়া দেয় ইস্কুলের ছুটি দিয়ে। ভাল রোজগার এই ইস্কুলের ব্যবসায়ে। এমনি সব ব্যবসায় ইস্কুলের মাস্টারও আছেন দশ-বারোটি। মাস্টার মেম্বার মেসের বারো-আনা। শনিবারে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে ওই পথে একটা-দুটো টুইশানি সেরে মাস্টারমশায়রা দেশে চলে যান, রবিবার সন্ধ্যার পর থেকে আবার ফিরে আসতে থাকেন। সোমবার সকালে টুইশানি আছে। শুধুমাত্র মহিম বাদ। তাঁর বাড়ি কলকাতার কাছাকাছি নয়।

জগদীশ্বরবাবু হেসে বলেন, ঠিকই তো। বাড়ি কাছাকাছি করবার ব্যবস্থাও তো করেন না আপনার মা-জননী। ট্রেন থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে কেন ছুটতে যাবেন আমাদের মতন? কোন লোভে?

সেদিনের ভর্তির ব্যাপার সাঙ্গ করে ইস্কুল থেকে বেরুতে ঘোর হয়ে গেল। সোজা ছাত্রীর বাড়ী গেলেন মহিম, মেসে যাওয়া হল না। ফিরতে সাড়ে-ন'টা। মাস্টার মানুষের পক্ষে এটা নিতান্তই সন্ধ্যাবেলা। অন্য সকলের টুইশানি সেরে বাসায় ফিরবার অনেক দেরি।

রসুই-ঠাকুর বলল, দু-জন বাবু আপনার খোঁজ করছেন বিকাল থেকে।

আপনি ফিরছেন না দেখে ওঁরাও বেরিয়ে পড়েছিলেন। আবার এসেছেন। সতীশবাবুরা তাস খেলছেন, সেই ঘরে বসে খেলা দেখছেন।

দাঁড়াও, কাপড়টা বদলে নিই। তারপর ডেকো ঠাকুর। উহু আমি যাব ওখানে।

হেন ক্ষেত্রে একটিমাত্র অনুমান মনে আসে। টুইশানি নিতে বলেছেন ভদ্রলোকেরা। ভর্তির পরীক্ষায় মহিম যাদের বাতিল করেছেন, তাদেরই গার্জেন কেউ হয়তো। টুইশানি আর একটা হলে মন্দ হয় না। সত্যিই দরকার, মা'কে কিছু বেশি করে পাঠানো যায় তাহলে। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য—মা লিখেছেন সেই কথা। তা বলে টুইশানির ঘুষ খেয়ে আজকের বাতিল ছেলে কারো সুপারিশ করে দেবেন—মরে গেলেও তা হবে না। বনোয়ারি রক্ষিত নন মহিম—স্পষ্ট 'না' বলে দেবেন। অবশ্য অন্য রকমের ছেলেও হতে পারে—আসে অমন দু-একটি। ভূদেব এক কাজ করেছেন—মেসের মধ্যে মাস্টারের সংখ্যা বেশি হওয়ায় আগের 'ইম্পিরিয়াল লজ' বদল করে 'টিচার্স লজ' নতুন নাম দিয়েছেন। এক টুকরো টিনের উপর নামটা লিখে পেরেক ঠুকে সেঁটে দিয়েছেন দরজার উপর। অঞ্চলের মধ্যে জানিত হয়ে যাক মাস্টারের মেস এটা। যেমন রাঁধুনে-বামুনের দরকার হলে দ্বারিক সরকার লেনের বস্তিতে লোকে যায়, প্রাইভেট মাস্টারের প্রয়োজনে আসবে লোকে এখানে। চাকরে গার্জেনদের অফিস কামাই করে ইস্কুলে যাওয়ার অসুবিধা, সকালে বা সন্ধ্যায় মেসে এসে তাঁর খোঁজ নিতে পারেন। মাস্টারেরও রকমফের আছে এখানে। নর্মাল-ত্রৈবার্ষিক থেকে এম. এ। পাঁচ টাকা থেকে পঁচিশ টাকার। মাস্টার আছেন প্রাচী শিক্ষালয়ের—যেখান থেকে বছরে দুটো-তিনটে স্কলারশিপ পায়; আবার আছে বিদ্যেশ্বরী হাই ইস্কুলের—যেখান থেকে আশিটা ফাইন্যালে পাঠিয়ে ঊনআশিটা ফেল হয়ে ফিরে এসেছে। কী রকম চাই, বাছাই করুন।

কাপড়টা বড্ড ময়লা, মহিম তাড়াতাড়ি বদলে নিলেন। শীতকাল বলে গলা-বন্ধ কোট গায়ে—এ বস্তু ময়লা হলে ধরা যায় না। মাথায় জলের থাবড়া দিয়ে চুলটা নরম করে আঁচড়ে নিলেন। ভেক নইলে ভিখ মেলে না। উজবুকের মতন গিয়ে দাঁড়ালে—বিশ-পঁচিশ কি দেবে—এক নজর তাকিয়ে দেখেই বলবে হয়তো দশ টাকা।

সতীশবাবু ঘরে গিয়ে দেখেন, ও হরি! গার্জেন নয়, সহপাঠী হিরণ রায়। হিরণ সঙ্গের প্রবীণ লোকটি পরিচয় দিল: আমার মামা। বলে ঘর খুলেছিস মহিম? তোর ঘরে চল, কথাবার্তা সেখানে।

হিরণের মামাকে মহিম প্রণাম করলেন। অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে হিরণ, খুব ফিটফাট বরাবর। একসঙ্গে দু-জনে বি. এ. পাশ করেছেন। মহিমের অবুঝবুঝ গেঁয়ো ভাবের জন্য হিরণ মিশত না তাঁর সঙ্গে ভাল করে। সেই মানুষ খুঁজেপেতে মেসবাড়িতে মামাকে নিয়ে এসে উঠেছে, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

মাতুল তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরখানা দেখছেন : দু-জনে থাকা হয় বুঝি এক ঘরে ? আর একজন—ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন। তা বেশ। তারকবাবু তোমার বোনের ভাসুর বুঝি—আমাদের অফিসের ক্যাশিয়ার। তাঁর কাছে ঠিকানা পেলাম তোমার। হিরণের সঙ্গে কথায় কথায় জানলাম ক্লাসফ্রেণ্ড তোমরা—একসঙ্গে পড়েছ—বলি, তবে আর তারকবাবুকে টেনে নিয়ে কি হবে, তুই চল আমায় নিয়ে। হিরণ তো তোমার কথায় পঞ্চমুখ। ভাল ছেলে তুমি, অঙ্কে অনার্স পেয়েছ।

হিরণ বলে বাড়াবাড়ি রকমের ভাল। খেলা নয়, আড্ডা নয়—মফস্বল-শহর হলেও সিনেমা ছিল সেখানে—বুঝলেন মামা, যে দিকটা সিনেমা-হল সেই পথ দিয়েই মহিম চলাচল করত না।

মামা হাসতে লাগলেন। বলেন, ছেলে সত্যিই ভাল। আর আমার বেবিটা উল্টো একেবারে। শনি কি রবিবারে সিনেমায় একটিবার যেতেই হবে। ওর মা-ই করেছে। নিজের যাওয়া চাই, মেয়েকেও টেনে নিয়ে যাবে। আমাকেও টানতে চায়—আমি বলি, না বাপু, বিষম নেশা। আমারও নেশা ধরে যাক শেষটা। বেবির মা বলে, তাই তো চাই। নিজে যেচে টিকিট করে আমাদের ডাকাডাকি করবে তখন। নেশার ব্যাপারে—তা সে যেমন নেশাই হোক—একা সুখ পাওয়া যায় না, সাথী ডাকতে হয়। তোমার মামির হল তাই। প্রজাপতির নির্বন্ধে এই সম্বন্ধ যদি লেগে যায়, আচ্ছা জব্দ হবে বেবিটা। বাড়িতে গিয়ে বলব।

হা হা করে আবার একচোট হেসে নিলেন। মহিম অবাক। মাস্টার নয়, জামাইয়ের সন্ধানে নড়বড়ে ঐ তক্তপোশের উপর চেপে বসে আছেন। চাকর পাঠিয়ে তবে তো কিছু খাবার আনিয়ে দেওয়া উচিত।

মাতুল প্রশ্ন করেন, কি করা হয় বাবাজীর ?

মাস্টার মানেই বুড়োধুড়ে মানুষের একটা যেন ব্যাপার। বিয়ের সম্পর্কে বলতে লজ্জা হয়। তরুণ বয়স তখন মহিমের ; বললেন, এই এটা-ওটা—ছেলে পড়িয়ে থাকি একটা।

প্রাইভেট পড়াও? সে তো সবাই করে থাকে। লাটসাহেবও পেলে বোধহয় করেন একটা-দুটো।

লিখি-টিখি একটু। কাগজে গল্প বেরিয়েছে।

বলছিল বটে হিরণ। এ বয়সে লেখার বাতিক থাকে কারো কারো। সেটা তো কোন কাজ হল না, শখের ব্যাপার! কাজ হল যাতে দুটো পয়সা ঘরে আসে। সেটার কি?

অগত্যা মহিমের বলতে হয়, একটা ইস্কুলে ঢুকেছি কিছুদিন।

হিরণ হো-হো করে হেসে ওঠে: কলেজ থেকে পাশ করে ফিরে-ঘুরে আবার ইস্কুলে?

মাতুলেরও মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল: ইস্কুলমাস্টার তুমি? আর তারকবাবু বলছিলেন কিনা করপোরেশনের লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর।

মহিম সঙ্কোচভরে বলেন, চাকরিটা হওয়ার মতো হয়েছিল। অনেক দিন ঘোরাঘুরি করেছি। তারকবাবু ভেবেছেন, হয়েই গেছে বুঝি। এখনো যে আশা ছেড়েছি তা নয়। যদ্দিন না হচ্ছে, প্রভাত পালিতমশায় বললেন ততদিন ইস্কুলে যাতায়াত করতে থাক। যা আসে মন্দ কি। তিনিই চেষ্টা করেছেন আমার জন্য।

হিরণ চমকিত হয়ে বলে, কোন প্রভাত পালিত?

তিনিই। রায় বাহাদুর—

তিনি চেষ্টা করলে তো লাইসেন্স ইনস্পেক্টর কোন্ ছার—করপোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার অবধি করে দিতে পারেন।

মহিম বলেন, সেইজন্যে আশা করছি ভাল কাজ একটা জুটে যাবেই। আমার বাবার কাছে উনি পড়েছেন। বাবাকে বড় শ্রদ্ধা করেন।

মাতুল বলেন, ও, বাবাও বুঝি মাস্টারি করেছেন? দু-পুরুষের জাত মাস্টার তোমরা? ভাল কাজ, চোচ্চুরি-ফেরেব্বাজি নেই ওতে। ছেলেপুলে নিয়ে কাজ, মনটা বড় সাচ্চা থাকে। বেঁচেবর্তে থাক বাবা। রাত হয়েছে—আচ্ছা উঠি এবারে।

উঠতে উঠতে বললেন, কোথায় কাজ কর, ইস্কুলের নামটা বল দিকি শুনি।

শতমুখে আশীর্বাদ করে মাতুল উঠলেন। হিরণ পিছনে চলল। মহিম মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন: কেন সঙ্কোচ হল মাস্টারির কথা সোজাসুজি বলতে। জেরার মুখে নিরুপায় হয়েই যেন স্বীকার করে ফেললেন। খারাপ হল কিসে মাস্টারি কাজটা? কত বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি এই কাজ করে

গেছেন। বিদ্যাসাগর কি—মাস্টার তো সংস্কৃত কলেজের। মহাব্যক্তি ঘোষদের কি? কৃষ্ণকিশোর নাগ মশায় কি? সূর্যবাবুও মাস্টার, গ্রাম্য ইস্কুলের এক নগণ্য মাস্টার। 'ভারতে ইংরেজ শাসন' বই পড়ানো শেষ করে বলতেন, এগজামিনের জন্য মুখস্থ কর কিন্তু একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না, সমস্ত মিথ্যে। ছাপা বই সশব্দে বন্ধ করে তখন মুখে মুখে আসল ইতিহাস পড়ানো শুরু হত। ননী মজুমদার আই. বি. পুলিশের খুব বড় চাঁই। তিনি বলতেন, দশ-বিশটা ছোকরা ধরে কী ছাই হবে? রক্তবীজের ঝাড়—দশটার জায়গায় একশ'টা জন্মাচ্ছে। শাসন করবে তো ইস্কুলগুলো তুলে দাও আগে। ছেলেপুলে না ধরে সূর্যবাবুর মতো মাস্টারদের ধর।

দশটা-পাঁচটা কলম-পেশা ম্যাকিনন কোম্পানির কেরানি—বিদ্যাদান আর বিদ্যাচর্চার মহিমা ওই মানুষ কি বুঝবেন?

॥ এগার ॥

ইস্কুলের বার্ষিক স্পোর্টস্। কাছাকাছি এক বড় পার্কে ফাইন্যাল হবে, প্রেসিডেন্ট নিজে উপস্থিত হয়ে পারিতোষিক বিতরণ করবেন। তার আগে ইস্কুলের পিছন-উঠোনে হিটস হয়ে যাচ্ছে দু-দিন ধরে। অর্থাৎ প্রাথমিক দৌড়ঝাঁপ হয়ে বেশির ভাগ ছেলে বাতিল করে দিয়ে ফাইন্যালের জন্য বাছাই হয়ে থাকছে গোটাকতক।

চিত্তবাবু বেঁটেখাতায় সকলের ডিউটি ভাগ করে দিয়েছেন। স্টার্টে কারা থাকবেন, বিচারক কে কে, কোন্ শিক্ষক কোথায় দাঁড়িয়ে ডিসিপ্লিন বজায় রাখবেন—তন্নতন্ন করে লেখা। দুখিরাম ছুটোছুটি করে সকলকে দেখিয়ে সই নিয়ে গেল। কাজ আরম্ভ হলে কিন্তু দেখা গেল, আছেন ছোকরা-শিক্ষকদের মধ্যে ক'জন। বুড়োরা হয় বাড়ি চলে গেছেন, নয়তো তামাক খাবার ঘরে বসে হুঁকো টানছেন আর গুলতানি করছেন, নয়তো ঘুমোচ্ছেন অকাতরে লাইব্রেরি-ঘরে পাখা খুলে দিয়ে। হেডমাস্টার নিজেই তো পাথসাট মারলেন। এমনিতরো অবস্থায় ডি-ডি-ডি'র হাবভাব ও কথাবার্তার ধরন একেবারে বদলে যায়। দাশুকে মাতব্বর ধরে হাসতে হাসতে বলেন, আমায় কি বাদ দিচ্ছ? চিত্তবাবু তো কিছু লেখেননি—তোমরা কি কাজ দেবে বল, কোমরে চাদর বেঁধে লেগে যাই।

এর যা প্রত্যাশিত উত্তর—দাশু কৃতকৃতার্থ হয়ে বলেন, না স্যার, আজ

আপনাকে রোদে পুড়তে দেব না। প্রাইজের জিনিসপত্র যা আসবে, হরলালবাবু একটা ফর্দ করেছেন। সেটায় চোখ বুলিয়ে দিন একবার। আসল দিন যাবেন একেবারে ফাইন্যালের দিন। সকালবেলা রোদ বেশি হবে না, গার্জেনরা আর বাইরের ভদ্রলোকেরা আসবেন, প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা করবেন। সেইদিন আপনার কাজ।

ডি-ডি-ডি বলেন, বাঁচালে ভাই। একাউন্টান্ট আসবে এখনই। তিন মাসের বাকি পড়ে গেছে। তার সঙ্গে বসে যাব এক্ষুনি।

পতাকীচরণ মহিমের সঙ্গে বলতে বলতে নামছেন: ফুটো বাতব্যাধি দেখলেন তো দাদুর? আমরা সবাই আছি, সকলের হয়ে বলতে যায় কি জন্যে? ও-ই যেন সব। চারগুণ মাইনে হেডমাস্টারের রোদে পুড়বেন না কেন জিজ্ঞাসা করি? আমরা যদি একঘণ্টা রোদে থাকি, উনি থাকবেন চার ঘণ্টা। উঠোনের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড় করিয়ে দাও, টাক ফেটে চৌচির হয়ে যাক। কিন্তু হবার জো নেই, খোশামুদেরা আগে থাকতেই…এক-শ গজি দৌড়ে নাম পড়েছে বাহাদুরির! কাণ্ড দেখুন দিকি। চার ব্যাচ করতে হবে অন্তত—খাটিয়ে মারবে।

আকস্মিক স্বর-পরিবর্তনে মহিম তাকিয়ে দেখেন, দাদু পিছনে আসছেন। সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায় এসে পতাকীচরণের নজরে পড়েছে।

ডি-ডি-ডি'র তিন ছেলে পড়ে ইস্কুলে। জ্যেষ্ঠজন ফার্স্টক্লাসে উঠেছে, সে এসব দৌড়ঝাঁপের তালে নেই। মওকা পেয়েছে তো সিনেমায় চলে গেছে সহপাঠী তিন-চারটে জুটিয়ে নিয়ে। অন্য দু'টি আছে। কাঙারু-দৌড়ের মধ্যে মেজো সজলের নাম। দুই পা রুমালে একসঙ্গে বেঁধে দেবে, থপথপ করে লাফিয়ে ছুটবে। পতাকীচরণ বিচারকের একজন। চুন ছড়িয়ে মোটা দাগে চিহ্নিত করা আছে, ছুটবে সেই অবধি। থামবার সময় মুখ থুবড়ে পড়তে পারে, বিচারকরা তাই এসে পৌঁছানো মাত্র ধরে ফেলেন ছেলেদের। পতাকীচরণ সজলকে ধরেছেন পাঁচ-সাত হাত দূর থেকে—ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন। আর চেঁচাচ্ছেন—সেকেণ্ড, সেকেণ্ড! অর্থাৎ দ্বিতীয় হয়েছে সে প্রতিযোগিতায়। ছেলেরা কলরব করছে: না স্যর ওর আগে আরও তো তিনজন ছিল, ও পারেনি। পতাকী হুংকার দিয়ে ওঠেন, পারেনি তো মিছে কথা বলছি?

মহিম খাতায় ফলাফল টুকছেন। পতাকী বলেন, লিখে নিন সজলের নাম। ওর আগে যারা ছিল, তাদের পায়ের গিঁঠ খুলে গিয়েছিল। তাদের নাম কাটা। ভাল করে দেখে তবে বলছি।

বিচারক যা বলবেন, তার উপরে কথা নেই। লিখতেই হল মহিমকে। মনটা কিন্তু খুঁতখুঁত করে। এটা মিটল, নতুন আর এক রকার ব্যবস্থা হচ্ছে। পতাকীচরণকে একপাশে ডেকে নিয়ে মহিম বলেন, আমারও যেন সন্দেহ ঠেকছে। আপনি বিচারক—আপনার উপরে বলার অবশ্য এক্তিয়ার নেই। দেখেছিলেন ঠিক তো—সত্যিই গিঁঠ খোলা ছিল আগের জোড়া তিনটের ?

পতাকীচরণ বিরক্ত মুখে বলেন, দেখেছি বইকি ! না দেখলে রক্ষে আছে ? মাইনে বাড়ার ব্যাপার ঝুলছে সামনের মিটিঙে।

দূরে কাজে ব্যস্ত দাশুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলেন, একটা কথা বলে দিই মহিমবাবু। দাশুটা হল এক নম্বরের কোটনা। পুটপুট করে সব কথা হেডমাস্টারকে লাগায়। ওর সামনে কথাবার্তা সামাল হয়ে বলবেন। আমার মশায় ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নেই, যা মনে আসে বলে ফেলি। ওই যে তখন শুনে ফেলল, সমস্ত গিয়ে বলবে। আরে বলে করবি কি তুই ? সজলও বাড়ি গিয়ে বলবে আমার কথা। সে হল নিজের ছেলে—তার চেয়ে তোর কথার দাম বেশি হবে ?

এরপর আর আর এক রকমের দৌড় হল। তিন-পায়ের দৌড়—থ্রি-লেগেড রেস। ডি-ডি-ভি'র ছোট ছেলে কাজল তার মধ্যে। কাজলের বাঁ-পায়ে টান—ডি-ডি-ভি'র ছেলে বলে খোঁড়া বলা চলবে না ! দাশু ওদের ক্লাস-টিচার—সে-ই কাজলের নাম ঢুকিয়ে দিয়েছে। হেডমাস্টার বললেন, না হে দাশু, নাম কেটে দাও। কাজল দৌড়বে কি, পড়ে গিয়ে কাণ্ড ঘটাবে একখানা।

দাশু অভয় দেন ওই জন্যেই থ্রি-লেগেড রেসে দিয়েছি স্যার। জোড়া গেঁথে দৌড়বে—যে পাখানা ইয়ে মতন আছে, সেটা অন্য ছেলের পায়ের সঙ্গে বাঁধা থাকবে। খাসা দৌড়য়—বাতাসের আগে দৌড়চ্ছে, দেখতে পাবেন। সব ছেলে ছুটোছুটি করবে, ও বেচারি একলা মুখ চুন করে বসে থাকবে, সেদিক দিয়েও ভাববেন তো কথাটা !

কিন্তু খোঁড়া পা অপরের সমর্থ পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়েও জুত হল না। হেরে গিয়ে হেডমাস্টারের ছেলে মুখ চুন করে থাকবে, সেটা উচিত হয় না। স্টার্ট দিয়ে দাশুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছে—বাঃ, বেশ হচ্ছে, দিব্যি হচ্ছে। উৎসাহ দিয়ে চেঁচাচ্ছে শেষটা : জোরে, আরও জোরে, এই তো—আরও আরও জোরে। তাতে কুলায় না তো কনুয়ের নিচে হাত ঢুকিয়ে শূন্যের উপর দিয়ে ছুটিয়ে এনে কাজল আর তার জুড়িকে ফাস্ট করে দিল।

নবীন পণ্ডিতমশায় দোতলা থেকে নামলেন। জনকয়েক টিচার পরম ভক্ত

তাঁর। খবরের কাগজ পড়ে পড়ে তাঁদের বোঝাচ্ছিলেন। পণ্ডিতের নিত্য দিনের কাজ। হেডমাস্টারমহাশয় অবধি মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে শোনেন। কাগজে যা ছাপে, সেটা কিছু নয়। আসল বস্তু আদায় করে নিতে হয় ওই ছাপার ভিতর থেকে। পড়ে গেলেই হয় না। কাগজখানা ভাঁজ করে বগলে নিয়ে বাড়ি চললেন এইবার। নামলেনই যখন, উঠোনটা ঘুরে ডিউটি করে যাচ্ছেন উঁকিঝুঁকি দিয়ে। দাশুকে ডাকছেন: বলিহারি বাবা দাশু। শোন, এদিকে এস। সাক্ষাৎ ভগবান তুমি। পঞ্চ লক্ষ্মণতে গিরিম্—একেবারে তাই করে ছাড়লে হে?

বেকুব হয়ে গিয়ে দাশু কৈফিয়ত দেন: এই দেখছেন, আর পতাকীবাবুর কাজটা তো দেখলেন না। মাঝখানের তিনটে চারটে ছেলে একেবারে শক্তি হয়ে গেল—তারা নেই। সজল সেকেণ্ড হল। পতাকীবাবু বেশি দিন কাজ করছেন আমার চেয়ে, অভিজ্ঞতা বেশি। তাঁরই নিয়ম ধরে চলেছি। মাইনে-বৃদ্ধির মিটিং হবে শোনা যাচ্ছে, হেডমাস্টারের কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট যাবে। এছাড়া কি করা যেতে পারে বলুন তবে।

রেজাল্টের খাতা মহিমের হাতে। হেডমাস্টারের কাছে জমা দিয়ে যেতে হবে এটা। আসন্ন সন্ধ্যা। মাস্টার-ছাত্র কেউ নেই আর এখন। জমাদার ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, ধুলোর অন্ধকার। হেডমাস্টারই শুধু আছেন তাঁর কামরার ভিতরে। একাউন্টান্টের আসবার কথা, সে আসেনি। এক প্রাণকেষ্ট। পি. কে. পাবলিশিং হাউসের প্রাণকেষ্ট পাল। মাসখানেক ধরে ডাকাডাকি করছেন, এতদিন তার সময় হল। গরজ মুখ করে এসেছে প্রাণকেষ্ট। পা দিয়েই বলে, মডেল ট্রানস্লেশন ফুরিয়ে এল সার। সামান্য আছে। জায়গায় জায়গায় ঢেলে সাজাবেন বলেছিলেন, কপি তৈরী থাকে তো দিয়ে দিন। প্রেসে দিতে হবে। আর দেরি করা যায় না।

প্রাণকেষ্টকে দেখে ভি-ভি ভি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন, এরপর কিছু ঠাণ্ডা হলেন। এডিশন কাবার হবে নতুন এডিশন হওয়ায় মানে প্রাপ্তিযোগ কিঞ্চিত। বললেন, ও-কথা পরে। বইয়ের লিস্ট ছাপতে নিয়ে কী কাণ্ড করেছ। এত বড় সাহস তোমার। তারপর থেকে ডেকে ডেকে আর পাওয়া যায় না।

প্রাণকেষ্ট নিরীহ গোবেচারা মুখে বলে, কি করলাম সার?

মাস্টারমশায়রা মিলে বুদ্ধিপরামর্শ করে পাঠ্য বই ঠিক করে দিলেন, সে সমস্ত বই বাদ দিয়ে অন্য বই ঢুকিয়েছ।

আজ্ঞে না। তাই তো আছে। ছাপার ভুলে একটু-আধটু হেরফের হতে পারে।

একটু-আধটু? পাঁচ-পাঁচটা বই বদল হয়ে গেছে।

নির্লজ্জ প্রাণকেষ্ট দাঁত বের করে হাসে: হয় ও-রকম স্যার। কম্পোজিটার-গুলোর মাথায় যদি কিছু থাকে! ক-এর ই-কার অ-এর ঘাড়ের উপর নিয়ে চাপায়।

'সাহিত্য পাঠ' ছিল, সে জায়গায় হয়ে গেছে 'নীতিবোধ'। এসব ছাপবার ভুল? যে পাঁচটা বই ঢুকেছে, সমস্ত তোমার কোম্পানির।

বাজে কম্পোজিটার দূর করে দেব ছাপাখানা থেকে। আর এমন হবে না।

ডি-ডি-ডি বলেন, খুব হয়েছে, আবার তোমার হাতে পড়ি! মাস্টারমশায়রা বলছিলেন, এসব বই তো আমরা দিইনি। তখন সেক্রেটারির নাম করে বাঁচি: তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন ছাপার মুখে। সেক্রেটারির এ রকম অভ্যাস আছে—লিস্টের বই কেটে দিয়ে খাতিরের বই ঢোকান অনেক সময়। এইসব বলে আপাতত রক্ষে হল। তবু বলা যায় না, কমিটির মুকাবেলায় কখনো যদি কথা উঠে পড়ে, খবর পৌঁছে দেবার মানুষ তো আছে—

ভাল মতো জানেন ডি-ডি-ডি সেই মানুষগুলোকে। সামনে একেবারে ভিজে-বেড়াল, মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ। এক নম্বর হলেন কালীপদ কোনার—কমিটিতে আছেন, মেম্বারদের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে, সন্দেহ হলে তিনি বলে ফেলতে পারেন কারো কাছে। আর ঐ দাশু—শুধু হেডমাস্টারের কাছে যাওয়া-আসা নয়, সেক্রেটারির বাড়ি যায়। ও-বাড়ির পুরুতবংশের ছেলে। বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন, লক্ষ্মীপুজো সরস্বতীপুজোয় হামেশাই দাশুর বাপের ডাক পড়ে! সেই সূত্রে দাশুও যায়—ভিতর-বাড়ি মেয়েমহল অবধি যাতায়াত। কালাচাঁদ চাটুজ্জে সেক্রেটারির ছেলেকে পড়াতে যান ওখানে। নাছোড়বান্দা টিউটর। সে ছেলে প্রাচী শিক্ষালয়ের ছাত্র। সেই ইস্কুলের টিচারও আছেন পড়াবার জন্য। তবু সন্ধ্যার পরে কালাচাঁদ কোমর বেঁধে গিয়ে পড়বেন। ছেলের পড়ার ঘরে ঢুকে বই খুলে নিয়ে বসেন ইস্কুলে এসে লম্বা লম্বা কথা: সেক্রেটারি নিজে নাকি ডেকে বলেছেন, আপনার মতন ইংরেজি কেউ জানে না কালাচাঁদবাবু, মাঝে মাঝে এসে গ্রামারটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন ওকে। মাস পুরতে না পুরতে খামের মধ্যে তিনখানা নোট ভরে সেক্রেটারি নিজে নাকি টেবিলের উপর রেখে যান। মিছে কথা, টাকা দেবার লোক বটে সেক্রেটারি! ফোন খোশামোদে নাকি

কাপড় কাচিয়ে নিয়ে পরলা যেমনি—বলেছিলেন, তোর ছেলেকে বী করে দেব ভাবজী ইস্কুলে। সেই মানুষ আপসে নোট রেখে যাবেন টেবিলে। বি. টি পাশ করার পর ছেলে স্ত্রী পড়িয়ে নানান রকমে সেক্রেটারির তোয়াজ করে কালাচাঁদের কাজ হাসিলের মতলব। আড়ালে আবার হাসিমস্করা করতেও ছাড়েন না। কালা বামুন আর কটা শুদ্দুর—সাংঘাতিক চিজ ওঁরা। সুপারিটেণ্ডেণ্ট গঙ্গাপদবাবু অথর্ব হয়ে পড়েছেন, সেই পদটা চান। হয়তো বা আরও উপরে হেডমাস্টারি অবধি নজর। ওই মানুষকে সেজন্য তোয়াজ করে চলতে হয় খানিকটা। করতে হবে আর বোধহয় মহিমকেও। প্রেসিডেন্টের মানুষ যখন। এইসব প্রাইভেট ইস্কুলের হেডমাস্টারি—ইস্কুলের কাজ কতটুকু! না করলেও চলে। বাইরের বারো কর্তার মন জোগাতে প্রাণান্তকর পরিচ্ছেদ।

এইসময় বাইরে থেকে মহিম সাড়া দিলেন, আসব?

কি মহিমবাবু, হয়ে গেল আজকের মতন? আমি দেখুন বসে আছি আপনার জন্যে। এতক্ষণ হিসেব নিয়ে পড়েছিলাম। নেমে গিয়ে একটিবার চোখের দেখা দেখে আসব, সে ফুরসত হল না। রোদে সমস্তদিন আপনারা ভাজা-ভাজা হয়েছেন। ক্ষুদিরামটা গেল কোথা রে—তিন কাপ চা এনে দিক। তুমি বুঝি উঠছ প্রাণকেষ্ট? দু-কাপই আসুক তবে। মহিমবাবু, ডেকে বলে দিন তো ক্ষুদিরামকে।

মহিম ঢুকতেই প্রাণকেষ্ট উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্য লোক এসে পড়ায় বেঁচে গেল। বলে, ট্রানস্লেশন কত ছাপা যায়—দোকানে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন, পরামর্শ করা যাবে।

মহিম বলেন, আজকের হিটসের রেজাল্ট দেখুন সার—।

ক্লান্ত স্বরে ভি-ডি-ভি বলেন, ঠিক আছে। আপনারা করে এনেছেন দেখতে হবে কেন? বসুন, একটা পরামর্শ আছে। ফাইন্যালটা এর পরের রবিবারে যদি করা যায়। আপনি তো যান প্রেসিডেন্টের বাড়ি—খোঁজ নিয়ে আসবেন, আঠাশে সকালবেলা কোন এনগেজমেন্ট আছে কিনা। এরপরে আমি নিজে অবশ্য যাব। কার্ড ছাপা, গার্জেনদের কাছে কার্ড পাঠানো, প্রাইজ কেনাকাটা —হাঙ্গামা অনেক। আগে থাকতে তারিখ পাওয়া দরকার।

চা এসে গেল। চা খেতে খেতে বলছেন, শুনুন, আজ এক ব্যাপার হল এই খানিকক্ষণ আগে। এক ভদ্রলোক এসে আপনার যাবতীয় খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। কদ্দিন আছেন ইস্কুলে, মাইনেপত্তর কত, স্বভাবচরিত্র কেমন, বাড়ির

-খবর কদ্দুর কি জানি—এইসব। জেরার রকম দেখে মোটেই ভাল লাগল না। ভাসা-ভাসা জবাব দিয়ে বিদেয় করলাম। পলিটিক্স করেন নাকি মশায়, গোপন-দলের সঙ্গে যোগসাজশ আছে? থাকে তো ছেড়েছুড়ে দিয়ে বিয়েথাওয়া করুন, ছেলেপুলে গড়ে তোলবার ব্রত নিয়ে এসেছেন, মনেপ্রাণে লেগে পড়ুন সেই কাজে। আমার কিন্তু মনে হল আই. বি. পুলিশের লোক। আপনার পিছন ধরে আছে।

ভাবতে ভাবতে মহিম মেসে ফিরলেন। আলতাপোল হাই ইস্কুলে পড়তেন ছেলেবয়সে। গাঁয়ের ছেলে, বাইরের খবর কিছু জানতেন না। বাহির বলতে কেশবপুরের গঞ্জ—বাড়ি থেকে ক্রোশ আড়াই দূর। বড় বড় চালানি-নৌকা এসে গঞ্জের ঘাটে কাছি বেঁধে থাকত। পাকা-রাস্তা ধরে ঘোড়ার গাড়ি আসত সদরের বাবুভায়াদের বয়ে নিয়ে। তারপরে মোটরবাস চলতে লাগল। জানা এই অবধি। বয়স বেড়ে আরও দূরের খবর আসতে লাগল ক্রমশ। প্রমোশন পেতে পেতে উপরের ক্লাসে উঠলেন মহিম, শূর্যবাবু সে ক্লাসে পড়াতেন। একটা অধ্যায় পড়িয়ে বই মুড়ে ফেলে বলতেন, সব মিথ্যে, বাজে ধাপ্পা। কর্মভোগ আমাদের, এগজামিনে আসে বলে এই সমস্ত পড়াতে হয়।

ছুটিতে অমুক দা তমুক-দা সব এসে পড়তেন গাঁয়ে—কলেজের ছাত্র। এসে আত্মোন্নতি-সঙ্ঘ গড়লেন। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর বসা হত সকলে একত্র হয়ে। সৎপ্রসঙ্গ হত। বই পড়া হত। স্বামী বিবেকানন্দ ও সখারাম গণেশ দেউস্করের বই। টডের রাজস্থান, ম্যাটসিনি ও গারিবিল্ডির জীবন-কথা। চণ্ডীচরণ সেন ও যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের বই। বিদ্যাভূষণের নামই বোধহয় জানে না শহরের এইসব ছেলেরা। দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মা—অতএব দেহচর্চাও করতে হত আত্মোন্নতির কারণে। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্। কুস্তি লড়তে হত, ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজতে হত। চারু-দা রিভলভার জুটিয়েছিলেন কোত্থেকে—এঁদো পুকুর-পাড়ে কসাড় ভাঁটবনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একদিন বস্তুটা দেখালেন। হাতেও ছুঁতে দিলেন। ঘোড়া টিপলে খুটখুট করে গুলির চেম্বারগুলো ঘুরে যায় কেমন। পকেট থেকে বের করে দেখালেন। ছোট্ট লম্বাটে ধরনের জিনিস। একদিন চারু-দা বললেন, ঘর-সংসার আমাদের জন্য নয়, সারা দেশের মানুষজন নিয়ে আমাদের সংসার। হাজার-লক্ষ মানুষ নিয়ে দেশাত্মা—সকলকে গড়ে তুলতে হবে। আত্মোন্নতির মানেই হল তাই। দরকার হলে প্রাণ দেব তাদের সেবায়। গাঁয়ের ইস্কুলের নিভৃতে শূর্যবাবু পড়াতেন—আর ভারতী ইনস্টিটুশনে আড়ম্বরের পড়ানো কান

পেতে শোন দিকে। ইস্কুল নয়, কারখানা একটা। মাস্টার নয়—মিস্ত্রি, কারিগর। হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে কাজ চলছে। দেড়-শ দু-শ ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসেছে প্রতিবার। এ চাকরি মহিমের ভাল লাগে না। প্রায় তো গাড়ু ধোয়ার চাকরির সমান। ছেড়ে দেবেন। নিশ্চয় ছাড়বেন।

॥ বারো ॥

ক'দিন পরে হেডমাস্টার মহিমকে ডেকে বললেন, একি মশায়, আপনি বললেন আঠাশ তারিখে কোন এনগেজমেণ্ট নেই। আজ সকালে আমি নিজে গিয়েছিলাম। চন্দননগরে কোন মক্কেলের বাড়ি নেমন্তন্ন সেদিন। আপনি কী দেখে এলেন ?

প্রেসিডেণ্টের বাড়ি যাননি মোটে মহিম। গিয়ে তো বসতে হবে—ওয়েটিং-রুমে নয়, বাইরে বারান্দার উপর বেঞ্চি ও বেতের চেয়ার ক'খানা আছে সেই জায়গায়। সাহেবি ঠাটবাটের অমন বাড়িতে ইচ্ছাসুখে কে যেতে চায় ? নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যেন। ভয় করে নিঃশ্বাস নিতে—এই রে:, নিঃশ্বাসের হাওয়ার টানে আদব-কায়দার পলেস্তারা খসে গেল বুঝি খানিকটা !

কিন্তু এই মনোভাব ভাঙেন না কারো কাছে। শিক্ষাটা করালীবাবুর কাছ থেকে : পশার ছাড়বেন না মশায়। তাহলে ওরা পেয়ে বসবে। বৈঠেখাতায় লিসার মেরে মেরে চোখে সর্ষেফুল দেখিয়ে দেবে। যান না যান গল্প করবেন খুব। আজ এই কথা হল প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে, আজ প্রেসিডেণ্ট এই জিজ্ঞাসা করলেন ইস্কুলের সম্পর্কে তাহলে দেখবেন, হেডমাস্টার থেকে ক্ষুদিরাম অবধি কী রকম খাতির জমাবে আপনার সঙ্গে !

না গিয়েই হেডমাস্টারকে যা হোক একটা আন্দাজে বলে দিয়েছিলেন। বলা যখন হয়েছে, সেই টান ধরে চলতে হবে। হেডমাস্টারের জবাবে মহিম বললেন চন্দননগর ? স্টেনো সতীশবাবু বললেন, আঠাশে ফাঁকা আছে। আমি আরও বললাম, ভাল করে দেখে বলুন, বড় দায়িত্বের কাজ। আন্দুনি ভাবে বললে হবে না। সরুন, আমি নিজের চোখে দেখি একবার। এনগেজমেণ্ট-বই নিজে দেখে এসেছি সার, আঠাশে জানুয়ারি গড়ের মাঠের মতন ফাঁকা।

ডি-ডি-ডি বলেন, আমার যেতে দুটো দিন দেরি হয়ে গেল, তার মধ্যেই ভরাট হয়ে গেছে তবে। পরের হপ্তায় চৌঠা ফেব্রুয়ারি ছাড়া তারিখ দিতে পারেন না। তাই পাকা করে এলাম, কি করব।

মহিম বললেন, সাতটা দিন দেখি হয়ে গেল। তাতে ক্ষতি হবে না। এমন পড়ে-গেলে মুশকিল ছিল।

ডি-ডি-ডি বলেন, সাতদিন বলে তো নয়। ওর আগের দিন জেলখা মেয়ের বিয়ে আমার। যোগাড়যন্তর বিলিব্যবস্থা সমস্ত একটা মানুষের উপর। আড়াই কামরার ভাড়া-বাড়িতে বিয়ে হতে পারে না, সেজন্যে কোন্নগরে পৈতৃক বাড়ি সকলকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে যাতায়াত। কাজটা আঠাশে যদি চুকে যেত, ভেবেছিলাম পাঁচ-সাতদিন ছুটি নেব বিয়ের সময়টা। কিন্তু যে রকম দাঁড়াল, বিয়ের দিন ভোরবাই হয়তো বা আসতে হয়।

মহিম বলেন, সে কী কথা। আমরা সব রয়েছি। এত ভাবনা করেন কেন?

ডি-ডি-ডি গদগদ হয়ে উঠলেন: ভরসা তো তাই। আপনাদের পেয়েছি ছোট ভাইয়ের মতন। নইলে এ যা চাকরি! বরাত ভাল যে প্রেসিডেন্ট তেসরা ফেব্রুয়ারি তারিখ দেননি। তাহলে বোধহয় মেয়ের বিয়েয় থাকা হত না। চাকরির চেয়ে তো মেয়ের বিয়ে বড় নয়।

তারপরে মনে পড়ে যায় একটা জরুরি কথা। বললেন ইয়ে হয়েছে, মহিমবাবু, প্রেসিডেন্টের বক্তৃতাটা লিখতে হবে। বললেন, কত শিক্ষক আছেন কাউকে বলে দেবেন? প্রেসিডেন্টের মুখ দিয়ে বেরুবে, যাকে তাকে দিয়ে সে জিনিষ হয় নাকি? আপনার সেই গল্পটা দেখেছি, খাসা বাংলা আপনার। ইংরেজি হলে তো আমি কলম ধরতাম। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বলে দিলেন, ওই দিনটা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসে বক্তৃতা করবেন। পাবলিক এইসব চাচ্ছে আজকাল। ইংরেজি বলতে গেলে হয়তো বা হৈ-হৈ করে উঠল: বাংলায়—বাংলায়। যত মুখ্যু নিয়ে কাজকারবার তো! সভা-সমিতির আর কোন ইজ্জত থাকতে দিল না।

কবালীকান্ত এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। তিনি টিপ্পনী কাটেন: দেখেব কী হাল হচ্ছে সার। বিয়ের মন্তোরও এর পরে বাংলায় পড়তে বলবে। পাবলিক যেটা বোঝে।

দিনকে দিন বাংলা চালু হচ্ছে, এই নিয়ে হাসাহাসি চলল খানিকটা। দুঃখের কারণও বটে! কাজকর্ম কিছু আর হবার জো নেই। বেশি দূরে যেতে হবে কেন—ইস্কুল-কমিটির-মিটিং হয়ে থাকে, সেই ব্যাপারটা ধর না। এঁর আগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন অত্যন্ত কড়া ধাঁচের মানুষ—নিজের বাড়ি কি করতেন জানা যায় না, কিন্তু বাইরের কাজকর্মে ইংরেজি ছাড়া বলতেন না।

মিটিংয়ের প্রথম নিয়ম ছিল, যত কিছু কথাবার্তা ইংরেজিতে। আধ-ঘণ্টার ভিতর দশটা আইটেম খতম হয়ে যেত। বিশেষ-দরকারি কথা ছাড়া কেউ কিছু বলত না—ইংরেজি গ্রামার ভুল করে হাস্যাস্পদ হয়ে যায় পাছে। বাংলা হয়ে এখন ভয়-ভাবনা ঘুচে গেছে। দেদার বলে যাও, দরকার না থাকলেও মাতব্বরি দেখাবার জন্যে বল। একটা আইটেম সারা হতে এখন দুটি ঘণ্টার ধাক্কা। কাজকর্ম হবার জো আছে!

হেডক্লার্ক অমূল্য এমনি সময় এসে ঢুকল। গলার চাদরটা নিজের চেয়ারের উপর ফেলে অর্থাৎ উপস্থিতির পরিচয় রেখে আবার তক্ষুণি নিচে তামাক খাবার ঘরে ছোটে। হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়েছে—মউজ করে পুরো একটি ছিলিম টেনে তবে কাজে বসবে। কাজ যোড়ার ডিম—সেকেণ্ড-ক্লার্ক ফকিরচাঁদের কাছে কাজের কথা শোন গিয়ে। বড় গলায় হুকুম হাকাম ছাড়া—ওটার কি হল, এটা হয় নি কেন? আর কথায় কথায় সেক্রেটারির দোহাই পেড়ে আসর গরম করা। যখন খুশি আসে. যখন খুশি চলে যায়। মাথার উপরে হেডমাস্টার একজন রয়েছেন তাঁকে একটা মুখের কথা বলে যাওয়ার ভদ্রতা নেই।

চা খাওয়ার অনেকগুলো দল মাস্টারমশায়দের ভিতর। ফকিরচাঁদের পিছনে জনকয়েক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে যান। পয়সা জমা থাকে ফকিরের কাছে, ঘণ্টা বাজবার মুখে সে চা আনিয়ে রাখে, মাস্টারমশায়রা যেমন যেমন আসেন গেলাসে চা ঢেলে দেয়। ফকিরচাঁদ নাকি-কান্না কাঁদে এঁদের কাছে: অমূল্যবাবু কিছুই করেন না, একলা আমার কাঁধে যত চাপ।

ভূদেব বলেন, খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে। ইস্কুলে একবার করে আসছে, সেই তো ঢের।

কালাচাঁদ বলেন, উঁহু অমূল্য খাটে না একথা কদাচ বোলো না ফকির। অমূল্যর খাটনি অনেক বেশি তোমার চেয়ে। আমি দেখে থাকি। সকাল সন্ধ্যা সেক্রেটারির বাড়ি ভিখিকাকের মতো পড়ে থাকা। ইস্কুলের টাইপরাইটার সেক্রেটারি বাড়ি নিয়ে রেখেছেন—সে কি অমনি অমনি? চিঠিপত্তর, আর ওর কী ঘোড়ার ডিমের থীসিস আছে গাদা-গাদা—সেই সমস্ত টাইপ করা। তার উপরে হল বা, কাছাকাছি বাজার আছে—এক ছুটে গিয়ে চাট্টি মাছ-তরকারি এনে দেওয়া। আর সেক্রেটারি সেই যখন বাড়ি বানাচ্ছিলেন—ওরে বাবা!

একটা গল্প খুব রসিয়ে করে থাকেন কালাচাঁদ। সেক্রেটারির নতুন বাড়ি হচ্ছে। কালাচাঁদ সেই সময়টা ইস্কুলের চাকরির উমেদার—তাঁর কাছে

দিনরাত হাঁটাহাঁটি করছেন। যখনই যান অমূল্য হাজির। একদিন কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানেই তো পড়ে থাকেন ইস্কুলে যান কখন আপনি ?

অমূল্য বল, হাঁা, যেতে হয় বই কি ! পয়লা তারিখ, মাইনে নেবার দিন যাই। বলল বড় বেদনার সঙ্গে। যেন মাইনেটা বাড়ি পৌঁছে না দেওয়ায় বিষম অত্যাচার হচ্ছে তার উপরে।

সেক্রেটারির যত কিছু মন্তব্য অমূল্যের মুখ দিয়ে এসে পৌঁছয়। তাকে অতএব সমীহ না করে উপায় নেই। চৌঠা ফেব্রুয়ারীর কথা ডি-ডি-ডি কাল নিজে গিয়ে সেক্রেটারির টেবিলে লিখে রেখে এসেছেন। অমূল্যর কাছে খবরটা নিতে হবে। প্রেসিডেন্ট তারিখ দিয়ে দিয়েছেন—সেক্রেটারির আপত্তি না থাকে তো হুড়োহুড়ি এবারে। নিমন্ত্রণ পত্র ছাপতে দিতে হবে আজকেই। করালীবাবু মেডেলের কথা তুললেন : চাঁদিরুপোর হলে প্রত্যেকটা আট-দশ টাকা পড়বে। আবার আট আনা থেকেও আছে। বাজেট বুঝে বলুন এবারে সার, কি রকমের ক'টা আনবে।

ডি-ডি-ডি বলেন, বড়-মেজো-সেজো কমিটির সব কর্তা সেদিন আসবেন। ইস্কুল-বাড়িও হয়তো ঘুরে ঘুরে দেখবেন। চারদিক সাফসাফাই থাকে যেন করালীবাবু। আমতলার জঞ্জালের গাদা যেন সরানো হয়। ক'টা ডাল নিচু হয়ে পড়েছে, কেটে দেবেন ওগুলো। ক্লাসের দেওয়ালে আর পায়খানায় ছেলেরা এটা-ওটা লেখে, চুনের পোঁচ টানিয়ে দেবেন তার উপর। ফুলের মালা আর তোড়া যা লাগবে, সে ভার মহিমবাবুর উপর দিন। কবি মানুষ, পছন্দ করে কিনবেন। আর একটা কাজ—আপনি শুনে নিন মহিমবাবু। ফাইন্যালের ছেলেগুলোকে লিস্ট ধরে আগে থাকতে নাম বলে দেবেন। সেদিন সকাল সকাল তারা ইস্কুলে চলে আসবে। ইস্কুল থেকে একত্র করে নিয়ে পার্কে একটা জায়গায় জমায়েত করবেন। ছড়িয়ে থাকলে কাজকর্মে দেরি হয়ে যায়। আপনি দাশু আর পতাকীবাবু তিনজনের উপর ভার। আর যাকে দরকার মনে করবেন, নিয়ে নেবেন আপনাদের সঙ্গে।

অমূল্য ফিরছে এতক্ষণে তামাক খাওয়া সেরে। ডি-ডি-ডি কাছে ডাকলে : আমার চিঠি দেখেছেন সেক্রেটারি ? কি বললেন ?

বিরক্ত ভাব কেমন যেন। বললেন, চিঠি লেখালেখি করে হবে না, অনেক পরামর্শ আছে। সন্ধ্যেবেলায় আজ আবার যেতে বলেছেন। বলে তিলাং সময়ক্ষেপ না করে অমূল্য নিজের চেয়ারে চলে গেল।

নিয়ন্ত্রণ-পত্র কেমন হবে ভি-ভি-ভি তার মুসাবিদা করছিলেন। কলম থামিয়ে ক্ষণকাল গুম হয়ে রইলেন। তারপর মৃদু স্বরে বলেন, বিরক্ত হলে আমি কি করতে পারি? কালকে গিয়ে মশায় দেড় ঘণ্টা বসে থাকার পর শুনলাম রুগি দেখে ফিরলেন। খবর পাঠালাম—বলে, খেতে বসে গিয়েছেন। তারপরে বলে, নতুন রেকর্ড কিনে এনেছেন, খাওয়ার পর গান শুনছেন। সকলে মিলে। আমার ট্রেনের সময় হয়ে যায়—কি করি লিখে রেখে চলে এলাম। এতবড় গবর্নমেন্ট চলছে লেখালেখির উপর, আমাদের তাতে হবে না—

মহিম সহানুভূতির স্বরে বললেন, বাড়িতে কাজ। এই সময়টা রোজ রোজ গিয়ে বসে থাকা।

রাত পোয়ালে কাল পাত্রপক্ষ পাকা দেখতে আসছে মেয়েকে। বাড়ি থেকে বলে দিয়েছে আজ সকাল সকাল ফিরতে। আর উনি বললেন, চিঠি লেখালেখি করে হবে না—নিজে যেতে হবে। না হলে আর কি করছি! যাব তাই, বদ্যিনাথের মন্দিরের মতো হত্যে দিয়ে পড়ে থাকিগে। মেয়ের পাকা দেখা যেমন হয় হবে।

মহিম অনেকক্ষণ চলে গেছেন। কাজকর্ম অনেকটা বুঝে নিয়ে করালীও উঠছেন। ভি-ভি-ভি বলেন, বসুন না একটু। অনেকগুলো বিল জমে আছে। নিরিবিলি আছি—দুজনে ওইগুলো দেখে পাশ করে রাখা যাক।

করালী কেটে দেন সঙ্গে সঙ্গে: আমি তো রেট দেখে একবার মিলিয়ে দিয়েছি। আর যা দেখবার আপনি দেখুন স্যার।

আবার বলেন, সেক্রেটারি আটটার আগে বাড়ি ফিরবেন মনে হয় না। এতক্ষণ কোথায় বসে থাকেন আপনি একা একা; মুশকিলের কথা হল। মাস্টারমশায়রা টুইশানিতে বেরবেন, খুন হয়ে গেলেও এসময় কাউকে পাবেন না। আমি থাকতে পারতাম। কিন্তু ওই যে বললেন চুনের পোঁচ টেনে দেওয়ালের লেখা ঢেকে দিতে হবে—রাজমিস্তিরির খোঁজে বেরব এখনই। কোঠাকুঠি লেনে না পেলে সেই পার্কসার্কাস অবধি দৌড়তে হবে।

সাড়ে সাতটা। গড়ের মাঠে খুব করে আজ সান্ধ্যভ্রমণ করেছেন ভি-ভি-ভি। সেখান থেকে সোজা কালীবাড়ী গিয়ে মায়ের দর্শন সারলেন। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে এসেছেন সেক্রেটারির বাড়ি অবধি। সময় কিছুতেই কাটতে চায় না, ঘড়ির কাঁটা যেন টিকিয়ে টিকিয়ে চলছে। ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় এসে ভি-ভি-ভি বসে পড়লেন অবনীশের-বৈঠকখানায় নয়, সিঁড়ির মুখে দরোয়ান যে

বেঞ্চিখানায় বসে তার উপর। বৈঠকখানায় ঢুকে চুপচাপ বসে থাকেন, আর সেক্রেটারি এদিক দিয়ে বাড়ির ভিতর চলে যান। চাকরবাকরগুলোকে খবর দিতে বললে গা করে না। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের সকলকে তারা চিনে রেখেছে, মানুষ বলে ধরে না এঁদের।

আছেন দারোয়ানের বেঞ্চিতে। গেটের কাছাকাছি কতবার গাড়ি থামবার শব্দ হয়, ডি-ডি-ডি উঠে দাঁড়ান। কিছু নয়, রাস্তায় চলতি গাড়ি কি কারণে থেমে গিয়েছিল একটু। আটটা বেজে যাওয়ার খানিক পরে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হল—এসেছেন। ডি-ডি-ডি'কে দেখে বললেন, কী আশ্চর্য এখানে কেন মাস্টারমশায়? ভিতরে গিয়ে বসুনগে! যাচ্ছি আমি।

শোনা গেল, খেতে বসেছেন অবনীশ। ডাক্তার মানুষ—স্বাস্থ্যের নিয়ম ষোল আনা মেনে চলেন। খাওয়া সাড়ে-আটটার মধ্যে সারবেনই। যত কাজই থাকুক।

বসে আছেন ডি-ডি-ডি। আজ যখন স্বচক্ষে দেখে গেছেন, খাওয়া অন্তে রেকর্ড বাজাতে বসবেন না। তাই বটে। চাকরের উদয় হল ভিতরের দিক থেকে। ক্ষীণ আলো জ্বলছিল, খুট করে সুইচ টিপে পাঁচ-বাতিওয়ালা ঝাড়টা জ্বেলে দিয়ে চলে গেল। অবনীশ এলেন। নমস্কার বিনিময় হল, কিন্তু বড় গম্ভীর। আলমারির কাছে গিয়ে খুঁজে খুঁজে এক ডাক্তারি বই নিয়ে বসলেন। পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় এসে গিয়েছেন। পড়ছেন। পড়তে পড়তে পাতা উল্টাচ্ছেন।

দেয়াল-ঘড়িতে টকটক করে পেণ্ডুলাম দুলছে। ডি-ডি-ডি ওদিককার একটা চেয়ারে স্থাণুর মতো বসে। চোখের ঠিক সামনে দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা কেঁপে কেঁপে এগিয়ে চলছে। তা সত্ত্বেও নিজের বাঁ-হাত ঘুরিয়ে হাত-ঘড়ি দেখছেন বারবার।

এই বন্ধ করে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। সাহস করে ডি-ডি-ডি ডাকলেন, স্পোর্টসের কথাটা স্যার।

হুঁ—বলে সাড়া দিয়ে অবনীশ পুনশ্চ আলমারির ধারে গেলেন। হাতের বইটা যথাস্থানে রেখে এবারে একটা ঢাউস বই বের করে নিয়ে চেয়ারে ফিরে এলেন।

ফাঁক পেয়ে ডি-ডি-ডি অনেকগুলো কথা বলে ফেললেন: চৌঠা স্পোর্টসের ফাইন্যাল। প্রেসিডেন্ট তারিখ দিয়েছেন। স্যার-আমায় আসতে বলেছিলেন এই ব্যাপারে।

হচ্ছে—বলে চাউশ বইটা খুলে অবনীশ তার মধ্যে আবার ডুবে গেলেন। সাড়াশব্দ নেই।

মরীয়া হয়ে ডি-ডি-ডি বলেন, আমায় সার কোন্নগর যেতে হবে। সেখান থেকে যাতায়াত। এখানকার বাসা তুলে দিয়েছি।

হঁ, জানি—বলে আঙুল জিভে ঠেকিয়ে অবনীশ ফসফস করে বইয়ের তিন-চার পাতা উল্টে গেলেন।

আরও অনেকক্ষণ গেল। ডি-ডি-ডি কাতর হয়ে বলেন, শেষ লোকাল বেরিয়ে গেছে। আর দেরি হলে বাসও পাওয়া যাবে না।

অবনীশ নিবিষ্ট একেবারে। ডি-ডি-ডি'র মনে হ'ল ভ্রূ দুটো তাঁর কুঞ্চিত হচ্ছে পাঠের মধ্যে বারংবার ব্যাঘাত ঘটানোর দরুন। কিন্তু নিরুপায় হেডমাস্টারকে তবু বলতে হয়, মেয়ের পাকা-দেখা কাল সকালবেলা। ট্রেন পাব না, হাওড়া থেকে শেষ বাস ছাড়বে ঠিক সাড়ে-ন'টায়। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে যদি উঠতে পারা যায়—

না বাম না গঙ্গা—কোন রকম জবাব নেই ও-তরফের। কানেই পৌঁছল না হয়তো। কি করবেন ডি-ডি-ডি, বসেই আছেন। আর মনে মনে ভারতী ইনষ্টিট্যুশনের হেডমাস্টারির চাকরির মাথায় ঝাড়ু মারছেন।

ঘড়িতে ঠিক সাড়ে ন'টা, সেই সময় অবনীশ মুখ তুললেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, কি আশ্চর্য! এত রাত হয়ে গেছে, খেয়াল ছিল না। আপনাকে তো অনেক দূর যেতে হবে। চলে যান আপনি। আজকে আর হল না, কাল আসবেন।

ডি-ডি-ডি আহত কণ্ঠে বলেন, এখন হাওড়া অবধি গিয়ে বাসও পাওয়া যাবে না। সে যা হয় হবে। অনেকক্ষণ বসে আছি, স্পোর্টসের কথাবার্তাগুলো হয়ে গেলে ভাল হয়। কাজে লেগে পড়তে হবে এইবারে তো!

প্রতিবাদের কথায় অবনীশ অসহিষ্ণু হলেন। বলেন, দু-হপ্তা সময় আছে, তাড়াতাড়ি কিসের? একটা শক্ত কেস নিয়ে পড়েছি, সঠিক ডায়োগনেসিস হচ্ছে না, মানুষের জীবন-মরণের ব্যাপার। আজ হবে না, আপনি কাল আসবেন মাস্টারমশায়।

মাঘের ওই অত রাত্রে ছাড়া পেয়ে ডি-ডি-ডি কী বিপাকে পড়লেন, সে জানেন তিনি আর জানেন অন্তর্যামী ভগবান। কিন্তু পরদিন ইস্কুলে গিয়ে দেখা গেল, জানতে কারও বাকি নেই—ইস্কুলময় চাউর হয়ে গেছে। অমূল্য ঠিক সাড়ে দশটায় হাজিরা দিয়েছে আজ। তারই কাণ্ড। দাত্ত কিসফিস করে

বলে গেলেন, মাস্টারদের সঙ্গে সে খুব হাসাহাসি করছিল এই নিয়ে। আজকেও নাকি সারকে যেতে হবে। কতবার গিয়ে কাজ মেটে তাই দেখুন। আসল ব্যাপার, এত বড় ইস্কুলের হেডমাস্টারের দিনে রাতে কখন কি দরকার পড়ে—কোন্নগর থেকে এসে কাজ করা সেক্রেটারির গরপছন্দ। পাড়ার মধ্যে আবার সারকে বাড়িভাড়া করতে হবে—তা সে যেমন খরচাই হোক।

সেক্রেটারির বাড়ি যেতে যেতে ডি-ডি-ডি মনে মনে ঠিক করছেন, একটা কথা ওঁকে আজ স্পষ্টাপষ্টি বলতে হবে। আপনি যা করুন আর যা-ই বলুন, অন্ত লোকে টের না পায় যেন কিছুতে। জানাজানি হলে কেউ আর মানতে চাইবে না। অতগুলো ছাত্র-শিক্ষক চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো অসম্ভব হবে তার পরে।

কিন্তু কোনকিছু বলবার অবকাশ হল না, এক কথায় সেক্রেটারি শেষ করে দিলেন। বললেন, পার্কে ব্যবস্থা করেছেন শুনলাম। ফাঁকা জায়গা—মাথার উপর একটা আচ্ছাদন থাকে যেন। রোদের বেশ চাড় হয়েছে।

এই মাত্র। এই পরামর্শের জন্ত ডি-ডি-ডি তিনটে দিন নাজেহাল হলেন। অবনীশ চাটুজ্জের এই স্বভাব। ক্ষমতা আছে সেইটে জাহির করা। কাজকর্ম করা উদ্দেশ্য নয়, বোঝেনও না কিছু। অন্তের অসুবিধা ঘটিয়ে আনন্দ।

॥ তের ॥

বক্তৃতা একটা দাঁড় করিয়েছেন মহিম। নাম হল দেহচর্চা। প্রেসিডেন্টের মুখ দিয়ে বেরবে, যে-সে ব্যাপার নয়। খুব খেটেখুটে লিখেছেন। স্বদেশি দাদাদের কাছে সেইসব পুরানো আলোচনা ও পড়াশুনো বেশ কাজে লেগে গেল। খাসা উৎরেছে লেখাটা। হেডমাস্টারকে দিচ্ছেন, পড়ে কি বলেন তিনি শোনা যাক।

দেখুন দিকি কি রকম হল?

আমার দেখে কি লাভ? আসল মানুষে দেখলেই হবে। না দেখে কি তিনি নিজের নামে চলতে দেবেন?

মহিম বলেন, অতবড় লোকের হাতে যাবার আগে আপনি একবার চোখ বুলিয়ে দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি সার।

বড্ড ব্যস্ত, দেখতে পাচ্ছেন তো! পরে!

ভি-ভি-ভি খপ করে লেখাটা নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। করালীবাবুর সঙ্গে কিসের একটা ফর্দ হচ্ছিল তখন। গম্ভীর কণ্ঠে করালী বললেন, ধীরেসুস্থে ভেবেচিন্তে পড়তে হবে, তাড়াহুড়োর মধ্যে হয় না। শার রেখে দিলেন, কাজ সারা হলে পড়ে দেখবেন।

খানিক পরে কাজকর্ম সেরে করালীকান্ত ঘরের বাইরে এলেন। মহিম ঘোরাঘুরি করছেন তখনও— এমন চমৎকার লেখাটা হেডমাস্টারকে পড়ে শোনাতে পারলে তৃপ্তি হত। কল্পনার চোখে দেখতে পান, হেডমাস্টারের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে শুনতে শুনতে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছেন, ওয়েল ডান ইয়ংম্যান—প্রতিভা আপনি একটি!

করালীবাবুকে বললেন, এইবারে যাওয়া যায় বোধ হয়। কি বলেন?

করালী না বোঝার দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, কোথায়?

তারপর মহিমকে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, ঘণ্টা, ঘণ্টা! কী শুনবেন উনি, আর কী বুঝবেন! লেখাপড়া জানেন নাকি? পাঁচলাইন ইংরেজি লিখতে তিনটে ভুল। দেশবন্ধুর মৃত্যু হল, ছুটির সার্কুলারে দেশবন্ধুর কোন বিশেষণ দেওয়া যায়—তিলকের মৃত্যুতে সেই কোন কালে সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল, পুরানো খাতা ঘেঁটে ঘেঁটে সার্কুলার খুঁজে বেড়ান। আর আপনার ও জিনিস তো বাংলা—জন্মে এক পাতাও পড়েন নি বোধ হয়। কমিটিও ঠিক এই রকম চান। পণ্ডিত হেডমাস্টার তো পড়াশুনো নিয়ে থাকবেন, এত বড় ইস্কুল সামলানো তাঁর কর্ম নয়। চাই এখানে দারোগা হেডমাস্টার। ভাল ভাল টিচার রয়েছেন, পড়াবেন তাঁরাই। ওঁর কাজ খবরদারি করা—টিচাররা ফাঁকি না দেয়, ছেলেপুলে হৈ-চৈ না করে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে নিয়মিত তেল দিতে হবে সেক্রেটারিকে, ব্রহ্মা-বিষ্ণুর সঙ্গে উপমা দিতে হবে। না দিতে পারলে বিগড়ে যাবেন। হেডমাস্টার স্কলার হলে ওইসব করতে আত্মসম্মানে বাধবে।

•

স্পোর্টসের ছেলেরা ব্যবস্থা মতো সকাল সকাল এসেছে। ইস্কুলের হলঘরে মহিম নিয়ে বসিয়েছেন। এদের মধ্যে মলয় চৌধুরী। ফুটফুটে দেবশিশুর মত চেহারা, থোপা থোপা কোঁকড়া চুল, নিষ্পাপ সরল চাউনি! এ শরীরে দৌড়-ঝাঁপ হয় না, মলয় নেইও তার মধ্যে। মহিম তাকে আসতে বলেছেন, প্রেসিডেন্টের গলায় মালা পরিয়ে দেবে এই জন্যে।

কখন সে ইতিমধ্যে উঠে গিয়েছিল। রামকিঙ্কর হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন।

হল কি রামকিঙ্করবাবু?

অনেক বিদ্যে শেখাই তো আমরা। পায়খানায় দেয়ালের উপর বিদ্যে জাহির করছিল। তামাক খাবার টিকে এনে বাখে, সেই টিকে নিয়েছে একখানা। আমায় দেখে টিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার চোখ রাঙায়ঃ আমি নই সার, অন্য কে লিখেছে।

করালীবাবু কোন দিকে ছিলেন। দেয়ালে লেখাব কথা কানে গিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এলেনঃ অ্যাঁ, কাল সন্ধ্যেবেলা মিস্তিরি চুনটানা সারা করে দিয়ে গেল—নচ্ছার ছেলেপুলে চব্বিশ ঘন্টাও দেয়াল সাদা থাকতে দেবে না? বিচ্ছের জাহাজ সব! দুখিরাম কোথায় গেলি রে? চুনের বালতি নিয়ে আয়, আব পোঁচড়াটা। একটান টেনে দিয়ে আসি। দত্তবাড়ির ছেলে হয়ে মিস্তিরিগিরিও কপালে ছিল যে!

দুখিরামকে নিয়ে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিরলেন। মহিমকে বলেন, আসুন মশায়। একটি বার যেতে হবে। আপনাকে না দেখিয়ে ও জিনিস বোঝা যায় না তো!

বজ্রমুষ্টিতে মলয়ের হাত এঁটে ধরলেন। নরম হাত গুঁড়ো হয়ে যায় বুঝি! মহিম আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, অত রাগ করছেন কেন? নতুন লিখতে শিখে ছেলেমানুষে লেখে অমন যেখানে সেখানে।

করালী বলেন, লেখা বলে লেখা! রীতিমতো সাহিত্য একখানা। আপনি সাহিত্যিক মানুষ কদর বুঝবেন। ফুলের মালা দেবার জন্য একে আনিয়েছেন, মালা এরই গলায় পরিয়ে দিতে হবে।

ইঙ্গিত বুঝে রামকিঙ্কর এবং আর যে দু তিনটি শিক্ষক ছিলেন, সবাই চললেন দেখতে। লেখা পড়ে মহিমের আপাদমস্তক রি রি করে জ্বলে ওঠে, বিষম এক চড় কষিয়ে দিলেন মলয়ের গালে। পাঁচ আঙুলের দাগ লাল হয়ে ফুটে উঠল।

রামকিঙ্কর শশব্যস্ত হয়ে কানে কানে বলেন, সামলে মহিমবাবু। বড়লোকের ছেলে মারধোর করবেন না, গার্জেনের চিঠি নিয়ে আসবে।

মহিম গর্জন করে ওঠেন, খুন করে ফেলব ওকে।

বড্ড ভয় পেয়েছে মলয়। ঘাড় নেড়ে সে প্রবল প্রতিবাদ করেঃ আমি লিখি নি সার। লিখেছে অন্য কেউ। আমি জানি নে।

সব ছাত্রই সমান শিক্ষকের চোখে। এ-বস্তু যে ছেলের হাত দিয়েই বেরুক, শিশু হয়ে যাবার কথা। তবু মহিম একান্তভাবে চাচ্ছেন, মলয় না হয় যেন।

যে ছেলে নতুন এসে তাঁর গায়ে হাত রেখেছিল : ভাল লাগে না সার, বাড়ি যাব, মায়ের জন্ম প্রাণ পুড়ছে···

মহিম বলেন, দাঁড়া ওই লেখাটার সামনে। দেখব।

যেইমাত্র দাঁড়ানো, ঠাই-ঠাই করে আরও তিন-চারটে চড়। ঘাড়ে ধরে গেটের বাইরে দিয়ে এলেন। আর গর্জাচ্ছেন : মালা ওকে ছুঁতে দেব না। স্কুল অপবিত্র হয়ে যাবে।

শাস্তির বহর দেখে করালী দয়ার্দ্র হয়ে বলেন, রামকিঙ্করবাবু চোখে ভাল দেখেন না, না-ও হতে পারে ও-ছেলে—

মহিম বললেন, তাই আমি দেয়ালে দাঁড় করিয়ে দেখে নিলাম। অন্যায় করেছে, আবার মিথ্যা বলে ঢাকতে চায়। ও-ছেলে অধঃপাতে গেছে।

শার্লক হোমস দেয়ালের লেখা দেখে বলে দেন, লোকটা লম্বায় কত। দাঁড়িয়ে লিখতে গিয়ে সাধারণভাবে লোকে চোখের সামনে দিয়েই লাইন ধরে। বিলিতি নবেলে পড়া এই পরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে খাটিয়ে দেখেছেন মহিম। মলয়ের বেলাতেও ঠিক ঠিক মিলে গেল।

রামকিঙ্করের দিকে চেয়ে মহিম বলেন, কোন জজ ছাত্র নিয়ে আপনার তো বড্ড দেমাক—

রামকিঙ্কর সগর্বে বলেন, তার নাম সুখময় চক্কত্তি। আমারই হাতে মানুষ। ভর্তি হবার সময় এসেছিল এক নম্বরের হাঁদারাম, সেই মাল শেষ অবধি জজ হয়ে উতরে বেরুল।

করালী রামকিঙ্করের কথাই ঐ সঙ্গে জুড়ে দেন, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া।

মহিম বলেন, কোনকালে কি হয়েছিল জানি নে। সে দিনকাল উল্টে গেছে। এখন আমরা করে থাকি, ঘোড়া পিটিয়ে গাধা। এক বছরে চোখের উপর অন্তত এই একটাকে দেখলাম।

একটুখানি থেমে আবার বলেন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন, মাস্টারি করা পাপের কাজ।

৮•

পার্কের একপ্রান্তে রঙিন চাঁদোয়া খাটানো। অবনীশের যেমন নির্দেশ। পিছন দিকে পর্দা, থিয়েটারের সিনের মতন কতকটা। রাজ-সিংহাসনের ধাঁচের একখানা চেয়ার। আশেপাশের চেয়ারগুলোও খারাপ নয়। এই চাঁদোয়ার নিচে প্রেসিডেন্ট ও কমিটি-মেম্বাররা বসবেন। বিশিষ্ট কেউ যদি আসেন, তাঁকেও আহ্বান করে বসানো হবে এখানে। চাঁদোয়ার বাইরে দু-সারি হালকা

চেয়ার, গুণতিতে খান পঞ্চাশেক। নিমন্ত্রিত গার্জেনদের জায়গা। দেড় হাজার চিঠি ছাড়া হয়েছে—কুলাবে না সেটা আগে থাকতেই জানা। লোক-দেখানো —জায়গা করে রাখতে হয়, তাই। না কুলালো তো দাঁড়িয়ে থাকবেন এধারে-ওধারে। দাঁড়াতে না চান, চলে যাবেন। মাথার দিব্যি কে দিয়েছে থাকবার জন্যে ?

এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর বলা যায় কঙ্কালীকান্তকে। সাজগোজে আজকে বড্ড বাহার। চুলের ঠিক মাঝখান দিয়ে টেরি চালিয়ে দু-পাশ ফাঁপিয়ে দিয়েছেন। এলবার্ট কাটা বলে এই পদ্ধতি—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী এলবার্ট নাকি এমনি টেড়ি কাটতেন। প্রেসিডেন্টের চেয়ারের সামনে প্রকাণ্ড টেবিলের উপর প্রাইজের জিনিসপত্র সাজানো। কঙ্কালীবাবু সেই সমস্ত আগলে আছেন। যথাসময়ে মহিম নাম ডেকে যাবেন, আর কঙ্কালী প্রাইজগুলো চটপট প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেবেন, তিলেক দেরি না হয়। মহিম ওদিকে স্পোর্টস শেষ হওয়া মাত্র ছেলেগুলোকে ফের এক জায়গায় এনে লাইন সাজিয়ে শিষ্ট সাজিয়ে ফেলবেন। সময় বেশি দিতে পারবেন না প্রেসিডেন্ট, অন্যত্র কাজ আছে। শিক্ষক আরও পাঁচ-সাতজন একদিকে ছুটাছুটি করছেন এমনি নানা কাজকর্মে। বাকি সব মাঠের ডিসিপ্লিন রাখছেন। তার মানে মজা তাঁদের। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মজা করে দৌড়ঝাঁপ দেখবেন।

এর মধ্যে কঙ্কালীবাবু একবার মহিমকে বললেন, আরে মশায়, আপনার সেই লেখা নিয়ে তো বিস্তর কথাবার্তা—

মহিম পুলকে ডগমগ হয়ে বলেন, কি রকম, কি রকম? কে কি বললেন শুনি।

বলছিলেন নবীন পণ্ডিত। হেডমাস্টার ওঁকে দেখতে দিয়েছিলেন। যা ওঁর স্বভাব—অঙ্কের কিছু ভাল দেখতে পারেন না। বললেন, ছ্যা-ছ্যা—এই ছেঁদো জিনিস প্রেসিডেন্টের হাতে দেওয়া যায় না। ছিঁড়ে ফেলে দিন।

মুখ কালো করে মহিম বললেন, পড়ে দেখে বললেন এই ?

পড়েন কি আর উনি ? বিদ্যাসাগর মশায়ের পরে কে কবে বাংলা লিখল যে উনি পড়তে যাবেন! হেডমাস্টারের খাতিরে চোখ বুলিয়েছিলেন হয়তো একটু। বক্তৃতাটা ওরই লেখবার কথা। উনি পাকসাট মারলেন বলে আপনার ঘাড়ে এসে পড়ল। তাই বললেন হেডমাস্টার : আপনি করলেন না, মহিমবাবু যা-হোক একটা দাঁড় করিয়েছেন। এর উপরে কিছু দাগবাজি করে আপনি চলনসই করে দিন, প্রেসে পাঠানো যাক। আমিও সাহস দিলাম : প্রেসিডেন্ট

বাংলা স্টাইলের কি জানেন! কোনদিন পড়েছেন ওঁরা বাংলা? যা হাতে দেবেন, সোনা হেন মুখ করে পড়ে যাবেন।

মহিম সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। নবীন পণ্ডিতের দাগবাজিতে কী দশা দাঁড়াল লেখাটার! প্রেসিডেন্ট এসে কতক্ষণে বক্তৃতা করবেন—ছাপা বক্তৃতার প্যাকেট তার আগে খোলা হবে না।

অবশেষে এলেন প্রেসিডেন্ট। সেক্রেটারি অবনীশ ও হেডমাস্টার পার্কের দরজা অবধি ছুটে গিয়ে এগিয়ে আনলেন। করালীবাবু এবং দাশুও ছুটেছেন। এঁরা দু-জন বিষম কাজের মানুষ, ছুটাছুটি ও হাঁকডাকে জাহির করছেন সেটা কর্তাদের সামনে। কী তাজ্জব, যা বলেছিলেন একেবারে ঠিক তাই—ধুতি-পাঞ্জাবি পরা প্রভাত পালিত। স্পোর্টসের চেয়ে এইটেই যেন বড় দর্শনীয় বস্তু, আঙুল দিয়ে এ-ওকে দেখাচ্ছে। কে একজন বলে উঠল, সবে তো কলির সন্ধ্যে। আসছে বারে দেখো খদ্দর পরে মাথায় গান্ধিটুপি জড়িয়ে আসবে এই মানুষ।

গলা শুনে মহিম মুখ ফিরিয়ে তাকালেন মানুষটির দিকে। আবার কে—তারক কর মশায়—ম্যাকলিন কোম্পানির ক্যাশিয়ার, বড় বোন সুধার ভাসুর। তারক-দাদা বলে ডাকেন তাঁকে। থাকেন বেহালার দিকে—এ তল্লাটে নয়। ভারতী ইনস্টিট্যুশনে তাঁর ছেলেপুলে পড়ে না, নিমন্ত্রণ-পত্রও যায় নি। তবু এসে জুটেছেন তিনি, এক চেয়ার দখল করে জাঁকিয়ে বসে আছেন। নিজেই বলছেন, রবিবার গঙ্গার ধারে হাওয়া খাই। ফিরে যাচ্ছি, দৌড়ঝাঁপ দেখে বসে পড়তে হল। আমারও খুব নাম ছিল এক সময়, খুব দৌড়তে পারতাম। তা দেখ, শহরে থেকে ট্রামে-বাসে চড়ে চড়ে শরীরে কিছু পদার্থ থাকে না। হাঁটতেই দম বেরিয়ে যায়, তার দৌড়নো। দূর দূর, এসব নচ্ছার জায়গায় মানুষ থাকে!

ট্রাম-বাসের উপর দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু বয়স এদিকে ষাটের কাছাকাছি এল, সে কথা ভাবছেন না তারক-দাদা। মাথায় একগাছি কালো চুল নেই, চোখের নিচে চামড়া ঝুলে পড়েছে। কোন বয়সে দৌড়তে পারতেন—তার পরে কত কত কাল কেটে গেছে, সেটা খেয়াল থাকে না তাঁর।

একটা কিছু বলতে হয়, মহিম তাই বললেন, অনেক দিন আপনার বাসায় যাওয়া হয়নি। একের পর এক এইসব চলছে। আজ রবিবারেও এই দেখছেন। ফুরসত পাই নে।

তারক বলেন, তোমার একটা বিয়ের সম্বন্ধ করছিলাম। তোমার মা খুব করে বলেছিলেন। উচিত বটে! পাশ করেছ, চাকরি হয়েছে—

বলতে বলতে থেমে গিয়ে আবার বললেন, চাকরি না হলে কিন্তু বিয়েটা

ঠিক লেগে যেত। আমাদের এক্সপোর্ট সেকসনের বড়বাবুর সেজো মেয়ে। মেয়েটা ভাল—ইস্কুলে পড়ে ফার্স্ট ক্লাসে। এক্সপোর্টের কাজে ভাল রোজগার—পাওনা-থাওনার দিক দিয়ে ভালই হত। কিন্তু কেঁসে গেল, ইস্কুল-মাস্টারকে মেয়ে দেবে না।

মহিম বলেন, বিয়ে আমি করব না তারক-দাদা। মা বললে কি হবে। কিন্তু আমার ব্যাপার বলে নয়। শিক্ষক শুনেই বিগড়ে যান কেন, সেইটে জিজ্ঞাসা করি। ছেলে মানুষ করা মহৎ কর্ম! পুণ্য কর্ম। দেশের কাজও বটে।

তারক বলছেন, তোমায় দেখে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। ক'দিন আগে নিজে তোমাদের ইস্কুলে গিয়ে হেডমাস্টারের কাছে খোঁজখবর নিয়ে এসেছেন। ভেবেচিন্তে শেষটা আমায় বললেন, না ভাই, মেয়ে তো শত্রু নয়। উপোস করে শুকিয়ে মরবে, জেনেশুনে সেটা হতে দিই কেমন করে?

মহিম রাগে গরগর করছেন। বলেন, শিক্ষক না হয়ে করপোরেশনের লাইসেন্স-ইনস্পেক্টর—নিদেনপক্ষে মার্চেন্ট-অফিসের বিলক্লার্ক হলেই মেয়ে বোধ হয় রাজ্যসুখ ভোগ করত! আমার কথা হচ্ছে না, আমি তো বিয়ে করবই না। লোকের এমনি ধারণা মাস্টারের সম্পর্কে। বললেন না কেন দাদা, হেডমাস্টারের কাছ থেকে মাইনের কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু মাস-মাইনের ওই ক'টা টাকা আমরা অন্ধ-খঞ্জকে দান করে আসতে পারি পয়লা তারিখ। মাইনের টাকা ফাউ, আসল রোজগার সকাল-সন্ধ্যায়। একদিন শুনিয়ে দেবেন, ইস্কুলের মাস্টার ও-রকম ফুটো বড়বাবুকে বাজার-সরকার করে পুষতে পারে।

এসবে কান না দিয়ে তারক কতকটা নিজের মনে চু-চু করছেন: বড্ড কাঁচা কাজ হয়ে গেছে। এবারে সম্বন্ধ এলে ঘুণাক্ষরে মাস্টারির কথা বোলো না। বরঞ্চ বোলো, বেকার হয়ে ঘুরছি। তাতেও একটা আশা থাকে। কিন্তু পাত্র মাস্টারি করে শুনলে একেবারে বসে পড়ে মেয়ের বাপ।

জবাব অনেক ছিল, বলতেন মহিম অনেক কথা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়েছেন বক্তৃতার জন্য। কী বিষম জরুরি কাজ, বক্তৃতা সেরে দিয়েই উনি চলে যাবেন। প্রাইজ বিলি করবেন সেক্রেটারি। ছাপা বক্তৃতার প্যাকেট খুলে করালীকান্ত বিতরণের জন্য ছাড়ছেন এবার। মহিম এক গোছা নিয়েছেন। শতেক হাত বাড়ানো নানান দিকে। মাংনা-পাওয়া জিনিস কেউ ছাড়ে না! কিছু না হোক কান চুলকানো যাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাকিয়ে নিয়ে।

বক্তৃতার শেষ দিকে সেই মোক্ষম জায়গাটা। দেহের সঙ্গে চরিত্র চর্চার কথা

এসে পড়েছে। খুব হাততালি প্রভাত পালিত যখন পড়ছেন। তারক অবধি ঘাড় নেড়ে তারিপ করছেন, না, ভেবেছে সত্যি লোকটা। নতুন কথা বটে।' এতদূর কেউ তলিয়ে ভাবে না।

ভাবনাটা বক্তারই বটে। মহিম মুচকি মুচকি হাসেন। ভাবনা নয়, চাক্ষুস অভিজ্ঞতা। যাঁদের মুখের কথা এ সমস্ত—শুধুমাত্র কথা বলেই খালাস নয়, দেহ-মনের অপরূপ সমন্বয়ে বিরাট চরিত্র তাঁরা এক একটি। সেই যে বলে থাকে, বজ্রের চেয়ে কঠিন ফুলের চেয়ে কোমল—একেবারে তাই। কিন্তু খুলে বলা তো চলে না। মহা চরিত্রবান পুরুষ প্রভাত পালিত ভেবে ভেবে এইসব লিখেছেন, জানুক তাই সকলে। হাততালি পড়ুক।

কাজকর্ম চুকে গেল। বক্তৃতা জমেছে ভাল, মহিমের শ্রম সার্থক। কিন্তু তার মধ্যে তারকের কথাগুলো খচখচ করে এক একবার মনে বিঁধছে। মাস্টার না হয়ে বিল-সরকার কিংবা পুরোপুরি বেকার হলেও মেয়েওয়ালার এত বিতৃষ্ণা হত না। শুধু মেয়েওয়ালা কেন—যে-কেউ মাস্টারির কথা শোনে, মুখে ভক্তি-গদগদ ভাব: এমন আর হয় না। মনের ভিতরে করুনা: লেখাপড়া শিখে মরণদশা—আহা বেচারি গো!

বোঝেন সেটা মহিম, ষোলআনা অনুভব করেন। হিরণের মামার প্রশ্নে বরাবর তাই পাশ কাটিয়েছেন—টুইশানি করি, গল্পটল্প লিখি। পুরো মাস্টার—জেরার গুঁতোয় শেষটা স্বীকার করতে হল। ফৌজদারি উকিলকে হার মানিয়ে যান বড়বাবুটি। আর নয়, ছেড়ে দেবেন ইস্কুলের চাকরি। ঐ যে 'মাস্টারমশায়' 'মাস্টারমশায় করে পার্কের এদিক-ওদিক থেকে ডাক উঠছিল, মাস্টারমশায়, আমায় একটা কাগজ দিন, ও মাস্টারমশায়—মহিমের কানের ভিতর সিসা ঢেলে দেয় যেন ওই ডাকে। খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি নিরীহ-নির্বিষ কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ একটা নরচিত্র মনে আসে ওই ডাকের সঙ্গে। তাঁর এই বয়সে অবিরত 'মাস্টারমশায়' ডেকে ডেকে জরার পথে ঠেলে দিচ্ছে—'মহিমবাবু' বলে ডাকবে না, যেমন অন্ত চাকরকে ডাকে লোকে। মাস্টারি ছাড়বেন, এ-ও এক কারণ তার বটে। চাকরির জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে আবার। স্পোর্টসের দরুন কাল ইস্কুল বন্ধ। সকালের দিকে রমেনকে গিয়ে ধরবেন কোন নতুন খবর আছে কিনা করপোরেশনের।

হেডমাস্টার ডাকলেন, শুনে যাবেন মহিমবাবু। আপনি বক্তৃতা লিখেছেন, তার বড্ড নিন্দে হয়েছে।

মহিম আকাশ থেকে পড়লেন। বলেন, ছেড়ে দিন নবীন পণ্ডিত মশায়ের

কথা। ওঁরা সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার স্টাইল ধরে বসে আছেন। গালভরা কথা না হলে মন ওঠে না। পড়া শেষ হয়ে গেলে বত্রিশ পাটি দাঁতের সবগুলো যদি টিকে রইল তবে আর কি হল।

নবীন পণ্ডিত সরে পড়েছেন, অতএব এ-জায়গায় স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলতে বাধা নেই কোন রকম।

হেডমাস্টার বললেন, পণ্ডিতমশায়ের কথা নয়। নিজে খোদ প্রেসিডেন্টের মুখে। রাগই করে গেলেন: এরকম শয়তানি জিনিস লেখাবেন জানলে আমি নিজে ব্যবস্থা করে নিতাম।

সভয়ে মহিম বলেন, ওর মধ্যে আপত্তিকর কোন কথা—কই, আমি তো কিছু জানি নে।

আপত্তিকর কি একটা ছুটো যে মাইক্রোস্কোপে খুঁজে বেড়াতে হবে? রাগে রাগে হেডমাস্টার পকেটের ভিতর থেকে ছাপা অভিভাষণ একখানা বের করলেন। মেলে ধরে মহিমকে দেখান: পাতা ভরে কড়াই-ভাজা ছড়িয়ে রেখেছেন—আর বলছেন, জানেন না কিছু। এই, এই দেখুন 'বজ্রনির্ঘোষ', এই 'উপচিকীর্ষা' এই হলগে 'প্রতিদ্বন্দ্বী', আর এটা কি হল? দেখুন আমিই পেরে উঠছি নে—'অবিমৃষ্যকারিতা'। বাপের বাপ, এক একখানা উচ্চারণ করতে কালঘাম ছুটে যায়। তাই তো প্রেসিডেন্ট বললেন, শয়তানি করে এক একটা শক্ত শব্দ বসিয়ে রেখেছে। যাতে উচ্চারণ আটকে গিয়ে সভার মধ্যে অপদস্থ হই।

মহিম বলেন, কী সর্বনাশ! আমার কথা এর একটাও নয়। নবীন পণ্ডিতমশায়কে দিয়েছিলেন, বিদ্যে জাহির করেছেন তিনি।

হেডমাস্টারও ভাবছেন, তাই হবে। জোলো ভাষা পণ্ডিতমশায় নিরেট করে দিয়েছেন।

মহিম বলেন, আমার মূল লেখা বের করুন। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বিচার হবে। 'অবিমৃষ্যকারিতা' বানান করতে আমিই তো মুখ থুবড়ে পড়ব। কিচ্ছু জানি নে আমি, কোন দোষে দোষী নই। প্রেসিডেন্টের কাছে মিছিমিছি আমার বদনামের ভাগী হতে হল।

হেডমাস্টার সরে গেলে করালী খলখল করে হাসলেন: কিছু না ভায়া, চুপ করে থাকুন, আপনার কিছু হয় নি। মরতে মরণ হেডমাস্টারের। আপনার নাম করবেন—উনি সেই পাত্র কি না! নিজে লিখেছেন বলে যশ নিতে গিয়েছিলেন। ইস্কুলে যে যা ভাল করবে—নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলবেন,

আমি করেছি। হয়েছে তেমনি এবার। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আমি ছিলাম সেই সময়টা হাসি আর চেপে রাখতে পারি নে।

॥ চোদ্দ ॥

পরদিন সকালবেলা মহিম রমেনের বাসায় গেলেন। করপোরেশনের খবরাখবর নেবেন। লাইসেন্স অফিসার শ্বশুর কি বললে—খালি-টালি হল এদ্দিনে ?

রমেন অবাক হয়ে বলে, অমন সোনার চাকরি পেয়ে গেছ, আবার চাকরির খোঁজখবর কেন ! তাই দেখছি, মানুষের লোভের কোন মুড়োদাঁড়া নেই।

চাকরি তো ইস্কুলের মাস্টারি। সোনার চাকরি বলছ একে ? রমেন বলে কোন ইস্কুল, বল সেটা একবার। কত নামডাক ! ওই শুনতেই কেবল। তালপুকুরের ঘটি ডোবে না। মাইনে কত দেয় জান ?

রমেন বলে, মাইনে কি শোনাবে আমায় ! এখানকার চাকরির আগে কিছুদিন ইস্কুলে কাজ করে এসেছি। সবাই করে থাকে। সে আবার তেমনি ইস্কুল। তোমার মতন কপাল জোর ক-জনার—ত্রিশ টাকা খাতায় লিখে পনের টাকা নিতে হয় না, পুরো মাইনে একদিন একসঙ্গে হাতে গণে দিচ্ছে। তার উপরে টুইশানির টাকা মাস ভোর চলেছে। আমাদের কি—পয়লা তারিখে পকেট ভরে টাকা নিয়ে এলাম চিনির বলদের মতন। মুদি-গয়লা বসে আছে বাড়িতে, সন্ধ্যের পর ঠিকে-ঝি আর কয়লাওয়ালা এল, রাত না পোহাতে বাড়িওয়ালা। সমস্ত ভাগযোগ করে নিয়ে নিল—সারা মাস তার পরে খালি পকেটে ভন করে বেড়াও। দুই পয়সার ট্রামে চড়ে অফিস যাব, সে উপায় থাকে না, পায়ে হেঁটে মরতে হয়। ঝাড়ু মারি চাকরির মুখে—তোমার সঙ্গে বদলাবদলি করে নিতে রাজি আছি ভাই।

এ মানুষ কিছু করবে না, বোঝাই যাচ্ছে। খালি বকবকানি। উঠানে কলের ধারে বসে গেঞ্জি আর রুমালে সাবান দিতে দিতে কথা বলছে। উঠে দাঁড়িয়ে চৌবাচ্চায় মগ ডুবিয়ে জল ঢালে এবার মাথায়। এর পর খেতে বসবে। জল ঢালা বন্ধ রেখে রমেন বলে, একটা উপকার কর মহিম সন্ধ্যের একটা টুইশানি জুটিয়ে দাও আমায়। ইস্কুল-মাস্টার না হই, গ্রাজুয়েট তো বটে ! টুইশানি বরাবর করেও এসেছি। এখনই পাই নে তোমাদের মাস্টারদের ঠেলায়। রাঘববোয়াল যত—একজনে আট-দশটা করে ধরবে, তোমাদের মুখ ফসকে এলে

তবে তো বাইরের লোকের। ঘাঁটি আগলে আছ তোমরা। তা ভাই দয়াধর্ম করে দিও একটা আমার দিকে ছুঁড়ে। চালাতে পারছি নে।

মেসে ফিরেছেন মহিম। কালাচাঁদ ইতিউতি চেয়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে পথ চলেছেন।

কী মশায়, কোত্থেকে?

হেসে কালাচাঁদ বলেন, বলুন না।

তা কেন বলা যাবে না। জিজ্ঞাসা করার রকম মানে হয় না। মাস্টার মানুষ বেলা সাড়ে-ন'টায় চলেছেন—নিশ্চয় টুইশানি।

যাচ্ছি টুইশানিতে, না ফেরত আসছি?

মহিম একটুখানি ইতস্তত করছেন তো কালাচাঁদ উচ্চ-হাসি হেসে উঠলেন: ভেবে বলতে হবে? না মশায়, বছর ঘুরে গেল কিছু এখনো শিখতে পারলেন না। হাঁটা দেখেই তো বুঝবেন, ফেরত চলেছি এখন। টুইশানিতে যাবার হলে কি কথা বলতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? সাঁ করে বেরিয়ে যেতাম। খুব পেয়ারের লোক হলে একটা আঙুল তুলতাম মানুষটার দিকে, তার অর্থ যা হয় বুঝুক গে।

মহিম বলেন আমায় একটা টুইশানি দেবেন বলেছিলেন।

সন্ধানে আছি। ভাল না পেলে দেব না। আপনি তো আর উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে বসে নেই। করবেন একটা-দুটো, বেশ ভাল পেলে তবেই করবেন।

পড়ার আর বাড়িতে থাকব, এমনি যদি পান তো ভাল হয়।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করেন, কেন মেসে কি অসুবিধা হচ্ছে?

ল-কলেজে ভর্তি হব সামনের সেসনে। মেসে হৈ-হুল্লোড—পড়াশুনো হয় না। সেই জন্যে নিরিবিলি কোন বাড়ি থাকতে চাই।

কালাচাঁদ অবাক হয়ে বলেন, আইন পড়ে উকিল হবার বাসনা? উকিল হয়ে গাদা-গাদা লোক ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। মক্কেল শিকারের জন্য গাছতলায় সমস্ত দুপুর তাক করে আছে, দেখে আসুনগে একদিন আলিপুর গিয়ে।

মহিম তিক্ত কণ্ঠে, বলেন, তবু উকিল বলে তাদের। মাস্টারমশায় নয়। মাস্টারি আর করতে চাই নে।

কথা বলতে বলতে চার রাস্তার মোড়ে এসে পড়েছেন। কালাচাঁদ বলেন,

বাড়ি থাকলে বা খাটিয়ে নেয়। তখন আর টাইম-বাঁধা রইল না তো! আমি ছিলাম এক জায়গায়। বাপ এসে বলবে, মাস্টারমশায় ধোবার হিসাবটা ঠিক দিয়ে দিন। ঝি এসে দেশের বাড়ি চিঠি লেখাতে বসবে। পড়াতে হবে এক ঘণ্টার জায়গায় আড়াই ঘণ্টা। এ সমস্ত তার উপরি।

জগদীশ্বরবাবু পিছন দিক দিয়ে নিঃসাড়ে এসে কালাচাঁদের কাঁধে হাত রাখলেন। বাঁ-হাতে তেলে-ভাজা বেগুনি। বললেন, বেড়ে বানায়। খাবেন? কিন্তু ইচ্ছে হলেও খাই বসে কোন্ জায়গায়? শতেক চক্ষু শত দিকে। আর ঠিক এই সময়টা গুরুভক্তি উথলে ওঠে: নমস্কার স্যার! তেলে-ভাজা দেখুন ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর কোন জুত থাকে না।

কালাচাঁদ বলেন, হয়ে গেল এবেলার মতন?

জগদীশ্বর বলেন, হল আর কোথায়! আমার সেই যে আহ্লাদি ঠাকরুনটি আছে—সন্ধ্যের সিনেমায় যাবে, নয়তো মাসি-পিসি আসবে। আজকে ভাবলাম; ছুটি আছে তো সকালবেলা ঘুরে আসিগে। মেয়ের মা চটে আগুন: সাত সকালে কেন আসেন? ঘড়িতে তখন ন'টা? বলেন, পলির ওঠার দেরি আছে। ভোরে উঠলে সর্দি ধরবে। বাড়ির বাজার-সরকার আমায় ডেকে বলে, আপনার অত কি মশায়—মাইনে তো আগাম পেয়ে যাচ্ছেন। মাস্টার রাখা বড়লোকের ফ্যাশান, তাই রেখেছে। পড়ানোর জুলুম করলে চাকরি কিন্তু না-ও থাকতে পারে। সরকার মানুষটি বড় ভাল। খানিকটা বসে গল্পগুজব করে ফিরে যাচ্ছি।

হঠাৎ এঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, খবর শুনেছেন তো? ছুটি আমাদের বোধহয় বেড়ে গেল।

কেন, কেন?

ছুটির মতন আনন্দ মাস্টার-ছাত্রের অন্য কিছুতে নয়। দু-জনেই প্রশ্ন করছেন কি হয়েছে, বলুন না খুলে।

প্রেসিডেন্ট নাকি এখন-তখন। হয়তো বা টেঁসেই গেল এতক্ষণে। মাস্টার মলেই পুরো দিন ছুটি দেয়। প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এঁদের বেলা নির্ঘাৎ দুটো দিন। কি বলেন?

জগদীশ্বরের পুলকে মহিম যোগ দিতে পারেন না। উপকারী মানুষ প্রভাত পালিত। ইস্কুলের চাকরি তাঁরই দৌলতে। বলেন, কাল পার্কে এলে সভা করলেন, এর মধ্যে হঠাৎ কি হল?

কেলেঙ্কারি কাণ্ডবাণ্ড মশায়। রেবেকা বলে এক ইহুদি মাগি আছে, সেখানকার ব্যাপার। পালিতের বাড়ি থেকে আসল ঘটনা চাউর হতে দিচ্ছে

না। তারা এটা-ওটা বলছে। আমার ছাত্রীর বাড়ি আর প্রেসিডেন্টের বাড়ি একেবারে পাশাপাশি তো—ওঁরা সব জানেন। সরকার সমস্ত বলল আমায়।

শনিবারে কোর্ট করে প্রভাত পালিত কোথায় নিরুদ্দেশ হতেন, সে রহস্য মহিম এত দিন পরে জানলেন। যেতেন কড়েয়া রোডে রেবেকার বাড়ি। সেখান থেকে কখনো বা হাওড়ার পুল পার হয়ে চন্দননগরে—গঙ্গার ধারে কোন এক বাগানবাড়িতে। বাড়ির ছেলেপুলে লোকজন সবাই জানে ; গেঁয়ো মানুষ বলে এতবার যাতায়াত সত্ত্বেও মহিম কিছু জানতেন না। প্রভাতের স্ত্রী অনেকদিন গত হয়েছেন। দিনরাত্রির এই খাটুনি, এত রোজগার, এমন নামডাক। সপ্তাহে একটু বিশ্রাম নেবেন, কেউ কিছু মনে করে না এতে। এইবারে কেবল অনিয়ম ঘটল। এক বড় মামলার ব্যাপারে বাইরে থেকে ব্যারিস্টার এসেছেন, শনিবার রাত্রে তাঁর সঙ্গে কনসালটেশন ছিল। রবিবার সকালে ইস্কুলের স্পোর্টসের হাঙ্গামা। বক্তৃতা সেরেই জরুরি কাজের নাম করে ওই যে ছুটলেন, বোঝা যাচ্ছে, মন ছটফট করছিল তখন রেবেকার জন্য।

ইহুদি মেয়ে রেবেকা। বড়মানুষদের সমাগম সেখানে। দেশের বড় বড় সমস্যার আলোচনা ও সমাধান হয় তার ড্রইংরুমে বসে। রেবেকার ভিতর-ঘরের বন্দোবস্ত আলাদা। সেই বন্দোবস্ত-ক্রমে শনিবারের রাত্রিটা এবং পুরো রবিবার প্রভাত পালিতের। প্রভাত উপস্থিত না থাকলেও তাঁর দিন ফাঁকা থাকবে। সেটা হয়নি। অন্যায় রাখাল দাশের। মামলা এবং তদুপরি সভাসমিতির খবর জেনে নিয়ে রাখাল ঢুকে পড়েছিল। হ্যাঁ, রায়সাহেব রাখাল দাশ, পুলিশের বড়-কর্তাদের একজন। এমনি দু-জনে বড় বন্ধু। মোট দু-জনে, ভুঁড়ি উভয়ের। কিন্তু ও-জায়গায় খাতির নেই।

বলতে বলতে সরকার লোকটা হি-হি করে হাসে। জগদীশ্বর দুঃখিত হয়ে বলেন, মানুষ মারা যায়, আপনার এরকম হাসি আসে কেমন করে ?

সরকার বলে, হাসি কি দেখছেন মাস্টারমশায়, কেউ কিছু না বলে তো মালা কিনে প্রভাত পালিতের গলায় পরিয়ে দিয়ে আসি। লড়নেওয়ালা বটে! যা ঘুসোঘুসি হল দুই বন্ধুর মধ্যে! রাখাল শুনলাম, প্রভাতের সাড়া পেয়ে রেবেকার খাটের নিচে ঢুকে যাচ্ছিল। ভুঁড়িতে বাদ সাধল। ভুঁড়ি থেকে পা অবধি খাটের বাইরে মেজের উপর। জুত পেয়ে প্রভাত বেধড়ক পেটাচ্ছেন। রেবেকা মাঝে পড়ে টেনে হিঁচড়ে রাখালকে বের করে দিল। তখন রাখালও আবার শোধ তুলছে। প্রভাত রাখালের হাত দুটো মুচকে ভেঙে দিয়েছেন। যে হাত দিয়ে বেত মেরে মেরে সে স্বদেশি ভলান্টিয়ারদের পিঠের চামড়া তুলে নিত।

আর প্রভাতের, ওই তো শুনলেন, এখন-তখন অবস্থা। মরেন তো শহীদ বলে পুজো করব প্রভাতকে। বাড়ির লোকে ঢাকতে গেলে কি হবে—খবর বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাটের উপর বয়স—এতদূর বলবীর্য দেখে ভরসা হয়, আমাদের স্বাধীনতা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শোনা কথায় অনেক রঙ চড়ানো থাকে। বিকালবেলা মহিম নিজে প্রভাত পালিতের বাড়ি গেলেন। অন্য সময় মানুষজনে গমগম করে। আজকে একটি প্রাণীকেও দেখা যায় না। যেন ছাড়া বাড়ি, গা ছমছম করে। অবশেষে পাঁচুলালকে দেখতে পেলেন। কোথা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি খিঁচিয়ে ওঠেন, কি হে কি দেখতে এসেছ? ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে গেছে। এতক্ষণে পোড়ানো শেষ। যাও।

পরদিন কাগজে বেরল, প্রবীণ ও সুবিখ্যাত উকীল প্রভাতকুমার পালিত সোমবার বেলা একটার সময় অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। বহু দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। দাতা ও পরোপকারী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ইস্কুলের সামনে সকাল থেকে ছাত্র-শিক্ষক অনেকের আনাগোনা। প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর জন্য ছুটির সার্কুলার লটকে দিয়েছে কিনা। উদ্যোগী কেউ কেউ ভিতরে ঢুকে বুড়ো দারোয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করে এসেছে। না, সেক্রেটারি বা হেডমাস্টার কেউ কোন খবর পাঠাননি, চুপচাপ আছেন, ইস্কুল বন্ধ হবে কিনা বলবার উপায় নেই। কী আশ্চর্য, খবর জানেন না ওরা—সারা অঞ্চল জুড়ে কাল থেকে রসালো কল্পনা-জল্পনা, ওঁরা দু-জন কানে ছিপি এঁটে বসে আছেন নাকি? মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজেও দিয়েছে। পরশুদিন তাঁকে সভাপতি করে বসিয়ে কত মাতামাতি, মরার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পর্ক শেষ? হয় হোকগে, কিন্তু মানুষটার খাতিরে দুটো-একটা দিন ইস্কুলের ছুটি দেবে তো অন্তত?

সার্কুলার যখন নেই,—খেয়েদেয়ে ইস্কুলে আসতে হল সাড়ে দশটায়। এই শোকগ্রস্ত অবস্থায় ভোগান্তি হয়তো বা সেই চারটে অবধি। লাইব্রেরি-ঘরের সামনে ডি-ডি-ডি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখ থেকে ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল।

অতবড় মানুষটা গেলেন—শুধু এক সার্কুলার ছুঁড়ে ছুটি দেওয়া যায় না। সবাই এসে পড়েছেন—আজকের দিনটা হিসাবে ধরা হবে না। দু-দিন ছুটি—

কাল আর পরশু। আপনারা যে যার ক্লাসে চলে যান তাড়াতাড়ি। ঘণ্টা পড়বে, ছুটির সময় যেমন পড়ে থাকে—একবার দু-বার তিনবার। একটা করে ক্লাস ছাড়বেন—ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে ছেলেরা বেরবে। শোকের ব্যাপার, টু-শব্দটি না হয়। আর ততক্ষণ প্রেসিডেন্টের গুণপনা বুঝিয়ে বলুনগে ক্লাসের ছেলেদের কাছে।

ভূদেববাবু বললেন, শনিবারেও ছুটি আছে সার। খৃষ্টান-পরব। বুধ-বিষ্যুৎ না করে এই ছুটি যদি বিষ্যুৎ আর শুক্কুরবারে করে দিতেন, একসঙ্গে চারদিন পড়ত। অনেকে বাড়ি যেতে পারতেন।

ডি-ডি-ডি বলেন, সেক্রেটারিকে না বলে আমি পারি নে। তিনিও করবেন না। শোকের ব্যাপার মুলতুবি রাখা যায় কেমন করে?

ক্লাসে যেতে যেতে জগদীশ্বর মহিমকে বলেন, আপনি তো গল্পটল্প লেখেন। বানিয়ে দিন না একটা গল্প!

কিসের গল্প?

প্রেসিডেন্টের গুণপনা ছেলেদের বোঝাতে হবে। হেডমাস্টার বলে দিলেন। কি বোঝাব, বলুন দিকি? রাখাল দাশকে ঠেঙানি দিয়ে আত্মদান করেছেন? ষাট বছর বয়সের মধ্যে এই একটা বোধহয় ভাল কাজ করেছেন উনি। কিন্তু ছেলেদের কাছে বেবেকার বাড়ির কথা বলা ঠিক হবে কি? তাই বলছিলাম, কল্পনায় আপনি কিছু বানিয়ে দিন।

এক-একটা ক্লাস করে ছেলেরা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ইস্কুলের দোর্দণ্ড-প্রতাপ হেডমাস্টার ডি-ডি-ডি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। বাইরে গিয়ে চেঁচামেচি করছে: কী মজা! স্পোর্টসের ছুটি কাল গেছে। আবার এই প্রেসিডেন্টের ছুটি। নিত্যি নিত্যি একটা করে হয় যদি এমনি।

সলিলবাবু সই করে ছাতা তুলে নিয়েছেন, ডি-ডি-ডি বলেন, উঁহু, আপনারা চলে যাবেন না। অতবড় মানুষ—রীতিকর্ম আছে তো একটা। চলুন সকলে ফার্স্ট-বি ঘরে। দুখিরাম, মাস্টারমশায়দের ডেকে নিয়ে এস। যে যেখানে আছেন, ফার্স্ট-বি ঘরে চলে আসুন। রেজল্যুশন লেখা আছে, দু-মিনিটে হয়ে যাবে।

করিৎকর্মা লোক ডি-ডি ডি। বক্তৃতা-টক্তৃতা নয়, তিনি মাত্র দুটো কথা বললেন। প্রেসিডেন্ট কতবড় লোক, সবাই আমরা জানি। পরশুদিন সভাপতি হয়ে বক্তৃতা করলেন, কত নীতি-উপদেশ দিলেন। শোক-প্রস্তাব পাশ করে

দিয়ে চলে যান আপনারা। শুক্রবারে আসবেন। মিস্টার পালিতের ছেলেদের কাছে প্রস্তাবটা আমি পাঠিয়ে দেব।

সভাভঙ্গ হল। অনেকেই টুইশানিতে ছুটলেন। ছেলেরা ছুটি পেয়ে বাড়ি যাচ্ছে, তাদের পিছন ধরে গিয়ে চুকিয়ে আসা যাক রাত্রের কাজটা। আয়েশি দশ-বারোজন রইলেন, দুপুরের রোদে যাঁরা বেরতে চান না। করালীকান্তকে ধরেছেন : প্রাইজ তো ভালোভালি মিটে গেল। আপনি কর্মকর্তা—খাওয়ালেন কই? আজকে এমন সুবিধা আছে। ভিড়ও নেই। খাওয়ান।

করালী বলেন, খাওয়াচ্ছি। তার জন্যে কি! দত্তবাড়ির ছেলে—আমার বাপ-পিতামহ খাইয়েই ফতুর। ফতুর হয়ে গিয়ে এখন মাস্টার হয়েছি। এই দুখিরাম, চা এনে দাও মাস্টারমশায়দের। আট আনার চা আর আট আনার বিস্কুট।

সত্যি, অবস্থা পড়ে গেছে—কিন্তু বংশের ধারা যাবে কোথায়? করালীবাবুর মেজাজ আছে। এক কথায় এই ষোল আনা বের করে দিলেন, দৃক্‌পাত করলেন না। কে দেয় এমন!

চা-বিস্কুট এল। মাস্টার, কেরানি ও দরোয়ান-বেয়ারায় উপস্থিত আছেন জন কুড়ি। বিস্কুট একখানা করে হাতে হাতে নিলেন সকলে। আর আধ-ভাঙা মিলে কাপ বেরল চারটে। আর গেলাস ছটা। অনেক হয়ে গেল। পুরো এক কাপ নিলে সকলের ভাগে হবে না। আধ কাপ আন্দাজ ঢেলে ঢেলে নিচ্ছেন। খাওয়া হয়ে গেলে কাপ ও গেলাস জলে ধুয়ে অন্যের হাতে দিলেন। দিব্যি জমানো গেল যা হোক এই ছুটির দুপুরটা।

॥ পনের ॥

কালাচাঁদ মহিমকে টুইশানি দিয়েছেন। খাওয়া-থাকা ছাত্রের বাড়ি। বনেদি গৃহস্থ, এখন ফোঁপরা হয়ে গেছেন। বাড়ির কর্তা পরিমলকে চাকরি করে খেতে হয়। রেলের চাকরি—এমন-কিছু বড় চাকরি মনে হয় না। পৈতৃক অট্টালিকা। মোটা মোটা থাম, নিচের তলায় পুরু দেয়ালের বড় বড় আধ-অন্ধকার ঘর। দিনমানেও আলো জ্বালিয়ে রাখলে ভাল হয়। মহিমকে তারই একটা ঘর দিল। বাড়ির লোকে দোতলায় থাকে। নিচে রান্নাঘর আর খাবার ঘর। পড়ুন না কত পড়তে চান নিরিবিলি একা একা।

ইস্কুলের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে ল-কলেজে বেরিয়ে পড়েন মহিম। পৌনে পাঁচটায় ক্লাস। কলেজ থেকে বাড়ি আসেন না, পুরানো টুইশানিটা সেরে একেবারে ফেরেন। সকালবেলা তো এই বাড়িতে। কথা হয়েছিল, বড় ছেলে পাটুকে এক ঘণ্টা পড়াবেন, তার পরে নিজে পড়াশুনো করবেন। কয়েকটা দিন তাই চলল।

একদিন পাটু ছোট ভাই বটুকে সঙ্গে করে নিচে নামল। বলে, মা পাঠিয়ে দিলেন।

কেন ?

ওর মাস্টার ক'দিন আসছেন না। অসুখ করেছে। আমাদের ইস্কুলেই সেভেন্থ ক্লাসে পড়ে। কাল ক্লাসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মা বললেন, আপনার কাছ থেকে পড়াটা জিজ্ঞাসা করে নিয়ে চলে যাবে। এই বটু, তাড়াতাড়ি কর। আমার আবার আছে আজ অনেক।

বুঝে নিল বটু একটি একটি করে সমস্ত পড়া। তারপরেও চলে যায় না। তক্তাপোশে মহিমের বিছানার উপর বসে পড়ল। পড়া তৈরি করে নিচ্ছে ওখানে থেকে। ক্ষণে ক্ষণে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করে নেয়। কী বলবেন মহিম —এমন আগ্রহশীল ছাত্রের কাছে কেমন করে মুখ ফেরান ? সত্যি তো ব্যবসা নয় এটা ! আগেকার দিন শিক্ষক শিক্ষাদান করতেন, আর আহার-আশ্রয় দিতেন ছাত্রদের। এখন পেটের দায়ে পয়সাকড়ি নিতে হয়, আশ্রয়ও নিতে হয় ছাত্রদের বাড়িতে। তা বলে চশমখোর হওয়া যায় না। পড়ে যাক—কী আর হবে !—বটুর মাস্টার যতদিন সুস্থ হয়ে না আসছেন।

আরও বিপদ। বটুর পিঠোপিঠি বোন মায়া—সে-ও দেখি বটুর পিছনে গুটি গুটি পা ফেলে আসছে। কি সমাচার ? ওই মাস্টার তারও—বটু আর মায়া দুজনকে এক মাস্টার পড়ান। তিনি আসছেন না ; ইস্কুলের দিদিমণি খুব বকাবকি করেছেন কাল। মায়াকেও পড়া বলে দিতে হবে।

মাসখানেক হতে চলল, ওদের মাস্টার আসেন না কী অসুখ রে বাপু ! মাস্টারের বাড়ি খোঁজখবর নিয়ে দেখ—চুপিসাড়ে ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেল কিনা।

সমস্ত সকালটা এমনি ভাবে কেটে যায়। ল-কলেজের লেকচার কানে শুনে এলেন—তারপরে বই খুলে একটু যে ঝালিয়ে নেবেন, সে ফুরসৎ মেলে না। মুট-কোর্ট হয় মাঝে মাঝে—বলা যেতে পারে, কলেজের ভিতরে আদালত-আদালত খেলা। সেই আদালতের হাকিম হলেন প্রফেসর। আর ছাত্রদের

মধ্য থেকে কতক বাদী পক্ষের ব্যারিস্টার, কতক বিবাদী পক্ষের। মহিমের উপর ভার হল, আসামির হয়ে লড়তে হবে। ইস্কুল থেকে হন্তদন্ত হয়ে ল-কলেজ এসে সোজা লাইব্রেরিতে ঢুকে ল-রিপোর্ট এনেছেন, যার মধ্যে এই মামলাটা রয়েছে। কিন্তু একটিবার চোখ বুলিয়ে নেবার সময় হল না। ক্লাস আরম্ভ হয়ে গেছে। অতিকায় বইটা হাতে নিয়ে মহিম ঢুকলেন। প্রফেসর তাকিয়ে দেখে বললেন, বোসো ওইখানে। রোল-কল হয়ে গেছে, তা হলেও পার্সেণ্টেজ দেব মুট-কোর্টের কাজ কেমন হয় দেখে।

মূল ক্লাস হয়ে যাবার পর মুট-কোর্ট বসল। ফরিয়াদি পক্ষ তাঁদের কথা বললেন. এবারে মহিমের বক্তৃতা। প্রফেসর চোখ বুঁজে শুনছেন, আর মাঝে মাঝে তারিপ করছেন—বাঃ, চমৎকার! বক্তৃতা অন্তে মহিম বসে পড়লে তিনি চোখ খুলে বললেন, আসামী পক্ষের সুশিক্ষিত কৌন্সিল আইনের জটিল তথ্য সুনিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। আসামি ছাড়া পাবে, কোন সন্দেহ নেই। তবে কিনা—

একটুখানি হেসে মহিমের দিকে তাকালেন : এই মামলা অনেক বছর আগে যখন হাইকোর্টে উঠেছিল, বারওয়েল সাহেব অবিকল এমনিভাবে আসামিকে সমর্থন করেছিলেন। মহৎ ব্যক্তিরা একই রকম চিন্তা করেন। এমন কি, বক্তৃতার ভাষাও হুবহু এক—কমা-সেমিকোলনের পার্থক্য নেই।

ক্লাসসুদ্ধ হেসে উঠল। প্রফেসরটি চতুর। ডেস্কের উপর ল-রিপোর্ট বইটা খুলে রেখে মহিম বক্তৃতা চালাচ্ছিলেন, চোখ বুঁজে থেকেও তিনি সমস্ত জানেন। কিন্তু উপায় কি? দিন রাত্রির নিরেট ঘন্টাগুলোর মধ্যে এক মিনিটের ফাঁক পাওয়া যায় না। দেখা যাক, পূজোর ছুটি তো সামনে। সেই সময়টা কিছু পড়াশুনো করে নেবেন।

কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করেন, পড়াশুনো কেমন চলছে মহিমবাবু?

আরে মশায়, পড়িয়েই কুল পাচ্ছি নে, নিজে পড়ি কখন? রক্তবীজের ঝাড়? দিন-কে-দিন বেড়েই যাচ্ছে। ভাই-বোনে মোটমাট কতগুলো, ঠিকঠাক একদিন জেনে নিতে হবে।

কালাচাঁদ বলেন, বলেছিলাম না গোড়ায়? আপনারা সকলে মতিবাবুর কথা তোলেন। আরে মশায়, টুইশানি পাওয়ার ভাগ্য। মতিবাবুর মতন রাজসিক টুইশানি ক'জনের ভাগ্যে ঘটে থাকে!

ওই মাস্টার সঙ্গেও বিপদের শেষ নয়। ক'দিন পরে আবার একটি মাস্টার পিছন ধরে আসে। নন্তু।

মায়া বলে, বড্ড জ্বালাতন করে নন্তুটা, কাজকর্ম করতে দেয় না। মা তাই বলে দিলেন, বসে থাকবে এখানে চুপচাপ। বই এনেছিল কইয়ে নন্তু।

হেসে বলে, অ-আ পড়ে। এক-আধবার দেখিয়ে দেবেন, তাতেই হবে। মা বলে দিলেন।

রীতিমতো এক পাঠশালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধৈর্য থাকে না। বলেন, আর ক'টি আছে বল দিকি ?

মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়ে মায়া বলল, ভাই-বোন ক'টি আমরা, জিজ্ঞাসা করছেন মাস্টারমশায় ?

তাই বল।

এই তো, চারজনে পড়তে আসি। এরপরে অন্তু আর ছায়া আছে।

সে দুটি আসবে কবে থেকে ?

মায়া খিল খিল করে হেসে উঠল : তারা কেমন করে আসবে মাস্টারমশায় ? ছায়া আট মাসের—কথাই ফোটেনি। আর অন্তু এই সবে হাঁটতে শিখেছে।

মহিম তিক্ত কণ্ঠে বলেন, ব্যস ব্যস ! হাঁটতে শিখেছে যখন হেঁটে হেঁটে চলে এলেই তো পারে।

বাড়ির লাগোয়া এঁদেরই এক শরিকের বাড়ি। মহিমের ঘরের পূবদিকে গলি—সেই গলির পথে তাঁদের যাতায়াত। একদিন যথারীতি সমারোহের সঙ্গে পড়ানো চলেছে। গঙ্গাস্নানের ফেরত বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা ভিজা কাপড় সপসপ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলেন। ছেলেমেয়েরা জ্যাঠাইমা জ্যাঠাইমা করে উঠল।

মহিলা মধুর হেসে বললেন, আমি জ্যাঠাইমা এদের। আমার দেওরের বাড়ি এটা। গঙ্গায় যাই আমি—জানলা দিয়ে তোমায় দেখতে পাই বাবা। বড্ড যত্ন করে পড়াও তুমি, আমার খুব ভাল লাগে। রোজ ভাবি, গিয়ে কথাবার্তা বলে আসি ; আবার ভাবি, কী মনে করবে হয়তো। আমাদের সংসারে সব পুরানো রেওয়াজ—আজকালকার মতন নয়। মেয়েরা বাইরের কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। শেষটা আমি সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আমার ছেলে মধুসূদনের বয়স হবে তোমার। ছেলের সঙ্গে মা কেন কথা বলবে না ? তাই এসেছি বাবা।

মহিম বলেন, সে তো সত্যি কথা। এবং উঠে গিয়ে পায়ের গোড়ায় ঢিপ

করে প্রণাম করলেন। ধবধবে গায়ের রং, যেন অন্নপূর্ণা ঠাকরুণ। বনেদি বাড়ির ছাপ সর্বাঙ্গে।

এইবারে আসল কথা পাড়লেন তিনি: আমার মেয়ে মঞ্জুরাণীকে তুমি পড়াও! বড্ড ভাল পড়ানো তোমার! মাস্টার পড়াত—যেমন বজ্জাত, তেমনি ফাঁকিবাজ। সেটাকে দূর করে দিয়েছি। মেয়ে ম্যাট্রিক দেবে এইবার।

ম্যাট্রিক দিচ্ছে সেই মেয়ে পড়বে তাঁর মতন ছোকরা-বয়সি একজনের কাছে! অস্বস্তি লাগে মহিমের। বললেন, সময়তো নেই। এই দেখুন, সকালবেলাটা যায় এদের নিয়ে। সন্ধ্যায় ল-কলেজে যাই।

জ্যাঠাইমা বলেন, আমার ছেলেও ল-কলেজে গিয়েছিল কিছুদিন। সে তো বেশি সময়ের ব্যাপার নয়। কলেজের পরে কি কর তুমি?

বলবার ইচ্ছা ছিল না যে বাইরে আরও টুইশানি করে বেড়ান। কিন্তু কথার বঁড়শি দিয়ে যেন টেনে বের করলেন জ্যাঠাইমা। বললেন, সেইটে ছেড়ে দিয়ে আমার মঞ্জুরাণীকে পড়াও। ছুটোছুটি করে বেড়াতে হবে না, একটা জায়গায় হয়ে গেল! গলির মধ্যে এই বাড়ির লাগোয়া।

মহিম বললেন, অনেকদিনের পুরানো ঘর কিনা, তাই ভাবছি পুজো তো এসে গেল। নিজের পড়াশুনোর জন্য থাকতে হবে কলকাতায়। ছুটির মধ্যে দুপুরবেলার দিকে সাহায্য করতে পারি। ছাড়া না ছাড়া ছুটির পর ভাবা যাবে।

জ্যাঠাইমা বললেন, এরা সব বাইরে যাবে পুজোয়। পরিমল রেলের পাশ পায় কিনা, পুজোর সময় কলকাতায় থাকে না। কোথাও না কোথাও যাবেই!

পাটু বলে উঠল, চুনারে যাচ্ছি এবার আমরা। শেরশা'র ফোর্ট আছে গঙ্গার উপর। আপনি চলুন না মাস্টারমশায়। বড় সুন্দর জায়গা, বাবা বলছিলেন।

লোভ হয় বটে! নিজে খরচা করে দেশ-বিদেশ যাওয়া কোনদিন হয়তো হবে না। দোমনা হলেন মহিম: অনেক পড়াশুনা রয়েছে। সময় পাই নে, ছুটিতে পড়ব বলে ভেবে রেখেছি। বাইরে গিয়ে তো হৈ-হল্লোড়—পড়াশুনো ঘটে উঠবে কি? তা দেখ তোমাদের মা-বাবাকে বলে। তাঁরা কি বলেন—

ছাত্র-ছাত্রী পুরো এক গণ্ডা, কেউ-না-কেউ বলে থাকবে মায়ের কাছে। ক'দিন পরের কথা। পরিমল ভাত খেতে বসেছেন। মহিম কলঘর থেকে শুনতে পাচ্ছেন কর্তা-গিন্নির কথাবার্তা। গিন্নি বললেন, নিয়ে গেলে হত

মাস্টারকে। ছেলে-মেয়ে এই চায় হতো বইশক্তর চোখেও না দেখো। ইস্কুল খোলার পরেই এগজামিন।

পরিমল বলেন, ক্ষেপেছ! বিদেশ জায়গা—একটা মানুষ টেনে নিয়ে যাওয়ার খরচ কত! ঝিটা শুধু যাবে। একজন ঠিকে-ঠাকুর আর এক ঠিকে-মাস্টার দেখে নেব ওই ক'দিনের জন্যে।

কলের জল অঝোর ধারে মাথায় ঢেলেও মহিমের মনের উত্তেজনা কাটে না। পায়ে ধরে সাধলেও যাবেন না ওদের সঙ্গে। ছি-ছি, বসুই ঠাকুর আর তাঁর একসঙ্গে নাম করল! মানুষের এমনি মনোভাব মাস্টারের সম্বন্ধে! টাকা দেয় না মাস্টারকে—কিন্তু তার চেয়েও বড় দুঃখ, কণিকা প্রমাণ সম্মানও দেয় না। ওকালতি পাশের যেদিন খবর বেরবে, মাস্টারিতে ইস্তফা সঙ্গে সঙ্গে।

মহালয়ার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা পরিমলরা রওনা হয়ে গেলেন। বাড়ি ফাঁকা। ঠাকুরকে ছুটি দিয়ে গেছেন; শুধু পুরানো চাকরটা আছে। কোন গতিকে সে নিজের মতন দুটো চাল ফুটিয়ে নেয়। মহিম মেসে গিয়ে খেয়ে আসেন দুবেলা। আইনের বই-টই খুলে নিয়েছেন।

জ্যাঠাইমা পরের দিনই এসে পড়লেন: কই বাবা? কথা দিয়েছিলে যে!

মহিম বলেন, এ-বাড়ির এবা নেই যখন, সকালবেলাই একবার গিয়ে পড়িয়ে আসব। কাল থেকে যাব!

কাল কেন বাবা? এখনই চল না আমার সঙ্গে। পড়া-টড়া নয় আজকে, আলাপ করে আসবে। অফিসের ছুটি, আমার ছেলে মধুও বাড়ি আছে।

গেলেন মহিম। জ্যাঠাইমা তাঁকে একবারে দোতলায় নিয়ে তুললেন। পরিমলের বাড়ি এত দিনের মধ্যে কেউ তাঁকে দোতলায় ডাকেনি। ছবি সোফা ফুলদানিতে সাজানো চমৎকার ঘর। ছুটির দিন হলেও মধুসূদন বাড়ি থাকে না, ছিপ-বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে যায়। জ্যাঠাইমা হেসে বলেন, কী নেশা রে বাপু! সমস্তটা দিন রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে সন্ধ্যেবেলা খালি হাতে ফিরে আসা।

মধুসূদন বলে, মিছে কথা বোলো না মা মাস্টারমশায়ের কাছে। মাছ আনিনি কোনদিন?

আনবে না কেন, বাজার থেকে কিনে এনেছিলে। আমরা টের পাই নে বুঝি!

হাত গণে তুমি সব টের পাও মা—

হাত গণতে হবে কেন? বরফ-দেওয়া চালানি মাছ পুকুর থেকে তোমার ছিপে উঠে আসে—কানকো উঁচু করলেই তো টের পাওয়া যায়।

বেশি কথা বলার সময় নেই এখন মধুসূদনের। হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে

গেল। বেশ সংসার! মায়ে ছেলের হাসাহাসি হল কেমন সমবয়সির মতো। কিন্তু মাস্টারমশায় বলল মহিমের সম্বন্ধে, এইটে বড় বিশ্রী। চেহারায় সত্যি কী মাস্টারের ছাপ পড়ে গেছে এই বয়সে? তাঁর যেন আলাদা কোন নাম নেই —মাস্টার, মাস্টার, মাস্টার (খাঁটি কলকাত্তাই কেউ কেউ আবার উচ্চারণ করেন, ম্যাস্টার)। শুনলে গা বমি-বমি করে।

ওদিকে মেয়েকে ডাকছেন জ্যাঠাইমা: মঞ্জু আসছিস নে কেন? কী লজ্জা হল। যার কাছে পড়বি, তাকে লজ্জা করলে হবে না তো। চলে আয়।

সর্বরক্ষে, মাস্টারমশায় বলে জ্যাঠাইমা উল্লেখ করেননি এবার। মঞ্জুরাণী এল। রাণীই বটে। জ্যাঠাইমার গর্ভের মেয়ে—সে আর বলে দিতে হয় না। ম্যাট্রিক দেবে, বছর ষোল বয়স হওয়া উচিত—কিন্তু বাড়ন্ত গড়নের বলে কুড়ি ছাড়িয়ে গেছে মনে হয়। ঘর যেন আলো হয়ে গেল রূপে।

মহিম বললেন, কোন্ ইস্কুলে পড়া হয়?

এরকম রূপবতী বড়-ঘরের মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা এই প্রথম। 'তুমি' মুখে আসে না, অথচ ছাত্রীকে 'আপনি' বলাই বা যায় কেমন করে।

জ্যাঠামা বললেন, চাট্টি খেয়ে যাবে বাবা।

মহিম আমতা-আমতা করেন: না না—খাওয়া আবার কি জন্যে?

মেসে গিয়ে খাও তুমি, আমি জানি। তার দরকার নেই। এরা যদ্দিন না ফিরছে দুবেলা এখানে খাবে।

মেসের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে একমাসের মতো—

মানা করে এস। আমার দেওর পবিমলের বাড়ি খেতে পায়, আমার বাড়ি খেলে কি জাত যাবে?

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কি জাত তোমরা বাবা? সেন উপাধি বদ্যির হয়, আবার কায়স্থেরও হয় কিনা।

কায়স্থ।

আমরাও কায়স্থ। তবে তো স্বজাত আমরা। আমার হাতের রান্না নিরামিষ তরকারি পাতে দিতে পারব। আসছি আমি। তোমরা কথাবার্তা বল। একেবারে খেয়ে যাবে এখান থেকে।

মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, চানটান হয়নি—

চান-ঘর এ-বাড়িতেও আছে। আচ্ছা চান করেই এস ও-বাড়ি থেকে। বেশি দেরি কোরো না।

বাপরে বাপ, কী আয়োজন! কতগুলো তরকারি থালা ঘিরে গোল করে

সাজানো। খাওয়ার সময়টা জ্যাঠাইমা সর্বক্ষণ সামনে বসে এটা খাও ওটা খাও করেন। বেশি আদর-যত্ন মহিমের অসুবিধা লাগে। কিন্তু মুখ ফুটে বলাও যায় না কিছু।

শ্যামাপুজো এসে পড়ল। ফট-ফট আওয়াজে বাজি ফুটতে শুরু হয়েছে রাস্তাঘাটে। শ্যামাপুজোর আগের দিন পরিমলরা সব এসে পড়লেন। ইস্কুলে এখনো ছুটি আছে, ছুটি চলবে জগদ্ধাত্রীপুজো অবধি। মা বড্ড চিঠি দিচ্ছেন, দেশে যাবে এইবার ক'দিনের জন্য। সত্যিই তো, একমাত্র ছেলে—ছেলেকে দেখতে ইচ্ছে হবে না মায়ের? বড় বোন সুধাও আর আলতাপোলে থাকতে পারছে না। তার ভাশুর তারক কর মশায়ের সংসার অচল, তিনি তাকে বেহালার বাসায় নিয়ে আসবেন। মা তখন একেবারে একা। তারও একটা বন্দোবস্ত করে আসতে হবে।

মঞ্জুর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংসারের যাবতীয় খবরাখবর নেন। বলেন, তোমারই তো অন্যায় বাবা। বুড়ো মাকে একলা কেন পাড়াগাঁয়ে ফেলে রাখবে? বাসা কর। আচ্ছা, বিয়েথাওয়া হয়ে যাক, তারপরে বাসা করবে। বিয়ের কথা মা কিছু বলেন না?

মহিম মুখ নিচু করে থাকেন, জবাব দেন না। মঞ্জুর মা বলেন, মা তো আমিও। কোন্ মা চায় যে ছেলে আধা-সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াক। কিন্তু তোমরা আজকালকার সব হয়েছ, মনের তল পাওয়া যায় না। আমার মধুর জন্যেও মেয়ে দেখছি। তার অবশ্য বলবার কথা আছে—বোনের বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর ভাইয়ের বিয়ে। সেটা ঠিক বটে। মঞ্জুরাণী বড় হয়ে গেছে। নিজের মেয়ের কথা জাঁক করে কি বলব—দেখছ তো তাকে চোখে। পড়াচ্ছ যখন, সবই জান। পাত্তর অনেক এসেছিল, তখন গা করিনি। বলি, পড়ছে পড়ুক না—পাশটাশ করে যাক, বিয়ের কথা তারপরে। কিন্তু পাশ করে তো আর দুখানা হাত বেরবে না। বিয়ে হয়ে গেলে তার পরেও পড়তে পারবে। ভাল ছেলে পেলে দিয়ে দেওয়া উচিত। কি বল?

সে তো বটেই।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তোমার ইস্কুলের চাকরি কদ্দিন হল বাবা?

মহিম তাড়াতাড়ি জবাব দেন, দু-বছর হয়নি এখনো। ছেড়ে দেব আইন পাশ করে। ভাবলাম, সন্ধ্যেবেলার একটুখানি তো ক্লাস—সমস্তটা দিন বসে বসে কি করা যায়—

মধুর মা লুফে নিলেন কথাটা : বেশ করেছ। লেখাপড়া শিখেছ, বাড়ির টাকা এনে শহরে বসে কি অন্ন খাবে? এই রকম ছেলেই আমার পছন্দ। দেশের ঠিকানাটা দাও তো বাবা। আমি তোমার মাকে চিঠি লিখব।

ঘেমে উঠেছেন মহিম, বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করছে। বলছেন কি ইনি—বনেদি ঘরের এই অপরূপ রাজকন্যা মহিমের মতো মাস্টারের হাতে দেবেন? ম্যাকলিন কোম্পানির হামবড়া কেরানি এক কথায় যে সম্বন্ধ নাকচ করে দিয়েছিলেন।

মঞ্জুর মা বলছেন, একটি মেয়ে আমার—গয়নাগাঁটি মেয়ের গা সাজিয়ে দেব। আমার নিজের পুরানো একসেট জড়োয়া গয়না—তা-ও মেয়ে পাবে। এই পৈত্রিক বাড়ি মধুর। কালীঘাটে আলাদা একটা বাড়ি কর্তা মেয়ের নামে কিনে দিয়ে গেছেন। ভাড়াটে আছে, ষাট টাকা ভাড়া দেয়। মেয়ে আমার শুধু হাতে যাবে না। জগদ্ধাত্রীপুজোর পর ফিরে আসছ—তার মধ্যে তোমার দেশের বাড়ি চিঠি চলে যাবে। মাকে তুমি বুঝিয়েসুজিয়ে সমস্ত বোলো।

নিচে নেমে মহিম বেরিয়ে যাচ্ছেন। মঞ্জুরাণী লুকিয়ে লুকিয়ে কথাবার্তা ঠিক শুনেছে। দরজার ধারে সে দাঁড়িয়ে। মহিমও থমকে দাঁড়ান। তাকান এদিক-ওদিক। কেউ কোন দিকে নেই।

মঞ্জু বলে, মাস্টারমশায়, আপনার সঙ্গে কথা আছে। আগের মাস্টার পড়াতেন ভাল। শিক্ষিত মানুষ। শেষটা মাইনেও নিতেন না। তবু তাঁকে তাড়িয়ে দিল।

থেমে পড়ল মঞ্জু হঠাৎ। বলে, না, এখন হবে না! মানুষজন চারদিকে। অন্য সময়। আপনাকে বলতে হবে সব কথা—কেন সে মাস্টার তাড়া খেলেন। এমনি তাড়ানো নয়, মেরে বাড়ির বের করে দিল—গ্রামের মানুষ আপনি, ভাল মানুষ—সমস্ত আপনার জানা দরকার।

বলেই চক্ষের পলকে কোন দিকে সে সরে গেল, পাখির মতো ফুড়ুত করে উড়ে পালান যেন।

সেই রাত্রে। গলির জানলায় টোকা পড়ছে, ঘুমের মধ্যে শুনছেন মহিম। খুট—খুট—খুট। আর মাস্টারমশায়—বলে ফিসফিসানি।

ধড়মড়িয়ে মহিম শয্যায় উঠে বসলেন। জানলার ওধারে মঞ্জুরাণী। মনে হচ্ছে স্বপ্ন।

সাঁ করে মঞ্জু একটুখানি পাশে সরে দাঁড়ায়। চাপা গলায় ডাকছে, বাইরে আসুন। কথা আছে—সেই কথা।

ঘুমের আবিল কাটেনি। কি করবেন মহিম, বুঝে উঠতে পারেন না। মঞ্জুরাণী তাড়া দেয়: আঃ, আমি চলে এসেছি, আপনি আসবেন না?

তরল অন্ধকার। তার মধ্যে দেখা যায় মঞ্জুকে। দিনমানের ছাত্রী মেয়ে নয়, রাতের রহস্যময়ী। গায়ের উজ্জ্বল রং এখন যেন জ্বলছে।

একেবারে কাছে চলে এল সে। কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান। এলোচুল, আলুথালু কাপড়চোপড়। কোন গতিকে কাপড় জড়িয়ে এসেছে। চলার সঙ্গে টলমল করে যৌবন, পাত্র ছাপিয়ে যেন উছলে পড়ে। মহিমের গা শিরশির করে ওঠে।

আগে আগে মঞ্জু নিজেদের বাড়ির সামনে গেল। দরজা ভেজানো, নরম হাতে নিঃসাড়ে খুলে ফেলল। এক পা ভিতরে গিয়ে দরজা ধরে ডাকে, আসুন।

পাথর হয়ে গেছেন মহিম। পা দুখানা অচল।

দাঁড়িয়ে রইলেন কেন কে দেখে ফেলবে। ভিতরে চলে আসুন।

ঘাম দেখা দিয়েছে মহিমের। মঞ্জুর মুখে কেমন এক ধরনের হাসি। বলে ভয় করে? তবে থাক। কথা শুনে কাজ নেই। আপনি ঘোমটা দিয়ে বেড়াবেন মাস্টারমশায়। আপনার কাছে পড়ব না।

দরজা বন্ধ করল মঞ্জু ভিতর থেকে। সর্বনেশে ব্যাপার। কথা বলার এই হল সময়? তাড়াতাড়ি মহিম ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। ভাল করলেন কি মন্দ করলেন ভাবছেন। ঘুম আসে না, এপাশ-ওপাশ করেন। সর্বদেহে যেমন অগ্নিজ্বালা। কী কথা ছিল ও রাণীর মতো মেয়েটার, কোন এক গূঢ় বেদনা। যার স্ত্রী হতে যাচ্ছে, মনের গোপন কথা তার কাছে খুলে বলতে চেয়েছিল। মহিম ভয় পেয়ে গেলেন। কলঙ্কের ভয়, ওর, এই উচ্ছল উন্মত্ত যৌবনের ভয়। আশৈশব বাঁধাধরা রীতিনীতির মধ্যে অভ্যস্ত জীবন, তার বাইরে পা বাড়াতে পারবেন না মাস্টার মানুষটি।

॥ ষোল ॥

আলতাপোল গিয়ে মহিম দেখলেন, মা আর দিদি উঠে-পড়ে লেগেছেন তাঁর বিয়ের জন্য। চিঠির পর চিঠি—ঠিক এই ব্যাপারই আন্দাজে এসেছিল। পাড়ার গিন্নিবান্নিরা তাতিয়ে দিচ্ছেন আরও মাকে: পাশ-করা ছেলে, চাকরির পয়সা হাতে রমারম আসছে এখন। না মহিমের মা, মোটে আর দেরি করো না।

কোন সাহসে দেরি করছ, তা ও তো বুঝি নে। কলকাতার শহর, শাসন-নিবারণের কেউ নেই মাথার উপরে। কোন ডাকিনির ফাঁদে পড়ে যাবে, ছেলে তখন আর তোমার থাকবে না। তাই বলি, ঘোষগাঁতিতে আমার মামাতো ভাইয়ের মেয়ে—ডাগরডোগর, কাজকর্মে ভাল, সাত চড়ে রা কাড়বে না—মেয়েটা তুমি নিয়ে নাও মহিমের মা। দেবে-থোবেও একেবারে নিন্দের নয়।

ডাকিনীর ফাঁদে পড়ে পেটের ছেলে মাকে দাসী-বাঁদীর মতো জ্ঞান করে—দৃষ্টান্ত তুলে তুলে শোনানো হয়েছে। হরেন আলতাপোল পোস্ট অফিসের পোস্ট-মাস্টার। মহিমের সঙ্গে বড় হয়েছে, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছে। তাকে ডেকে সেনগিন্নি বললেন, তুমি না লাগলে হবে না হরেন। মহিম বাড়ি এলে দুজনে গিয়ে মেয়েটা দেখে এস। ছেলের মেয়ের দেখাদেখি হয় তো আজকাল—আমাদের পাড়াগাঁয়েও বিস্তর হচ্ছে। ছাড়বে না তুমি, ধরেপড়ে নিয়ে যাবে।

সুধা গিয়ে মহিমের কাছে তুললেন: মেয়ে নিজের চোখে দেখে বিয়েথাওয়া হওয়া ভাল। বাবা কি বড় ভাই মাথার উপরে থাকলে তাঁরাই অবশ্য দেখতেন। একেবারে পরের মুখে ঝাল খাওয়া ঠিক নয়, কি বল?

মহিম সাগ্রহে সমর্থন করেন, ঠিকই তো।

তাহলে যাও ভাই, ঘোষগাঁতির মেয়েটা দেখে এস। 'মঙ্গলে ঊষা বুধে পা'—কাল বুধবার ঘোর-ঘোর থাকতে-বেরিয়ে পড় তুমি আর হরেন। তুমি বাড়ি আসছ, মেয়েওয়ালাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়ে দেখতে পাঠানো হবে, তা-ও তারা জানে।

মহিম অবাক হয়ে বলেন, কী মুশকিল! এতখানি এগিয়েছ তোমরা, আমি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

সুধা মুখ টিপে হেসে বলেন, কি ভেবেছ তবে? মুখে রক্ত তুলে খেটে খেটে সংসারে টাকা পাঠাও, খেয়েদেয়ে আমরা খালি ঘুমোই—এই ভাবতে বোধহয়? হরেন কাপড়চোপড় কেচে তৈরি হয়ে আছে, বলে আসি তাকে।

সত্যি সত্যি তখনই চললেন বুঝি হরেনকে বলতে। ঘাড় নেড়ে মহিম বলেন, কিছু বলতে যেও না দিদি। বয়ে গেছে আমার এগাঁয়ে-ওগাঁয়ে হট্ট-হট্ট করে বেড়াতে। ক'টা দিন বাড়ি এসেছি, শুয়ে বসে থাকব। এক পা নড়তে পারব না।

আরও দু-চার বার বলায় মহিম রাগ করে উঠলেন: বেশ, যেতে বল তো যাচ্ছি একেবারে কলকাতায় চলে। অন্য কোথাও নয়।

মেয়েকে দিয়ে হয় না তো সেনগিন্নি নিজে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

কবে যাবি ঘোষগাঁতি ?

যাব না তো। বলে দিয়েছি দিদিকে।

করবি নে তবে বিয়েথাওয়া ? স্পষ্ট করে বলে দে। লোকের কাছে আমি অপদস্থ হতে চাই নে।

মহিম বলেন, তুমি যে ক্ষেপে গিয়েছ মা। ব্যস্ত কিসের ? সময় হলে হবে।

ক্ষেপে যেতে হয় তোমার কাণ্ড দেখে। সুধা থাকছে না, তার ডাক্তার তাকে বাসায় নিয়ে যাবে। একলা আমি পড়ে থাকব। তখন কেউ খুন করে রেখে গেলে পচে দুর্গন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পড়শির কাছে খবর হবে না।

চোখে আঁচল দিলেন মা। মহিম হেসে বললেন, আজেবাজে ভেবে মরা তোমার স্বভাব। একলা কি জন্য থাকতে যাবে ? আমিও বাসা করব কলকাতায়, তোমায় নিয়ে যাব।

মা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন : আমি বুড়ো বয়সে হাঁড়ি ঠেলতে পারব না তোমার বাসায়। হ্যাঁ, সাফ জবাব।

আচ্ছা সে দেখা যাবে হাঁড়ি ঠেলবার মানুষ পাওয়া যায় কিনা কোথাও। এখন তাড়া করলে তো হবে না মা।

ডাক এলে চপচপ করে চিঠির উপর শিলমোহর পড়ে। শব্দ শুনে মহিম পোস্টঅফিসে ছোটেন। হরেনকে বলেন, কলকাতার চিঠিপত্তর আসে না কেন বল তো ?

কেউ দেয় না বলেই আসে না। এত উতলা কেন ? চিঠি দেবার মানুষ জোটাও, ভারি ভারি খাম চলে আসবে রোজ।

মহিম বলেন, ঠাট্টা নয়। একটা জরুরি চিঠি আসার কথা। কাজের চিঠি। তোমার ওই মুখ্যু রানারটা শিল মারে আর বাঁ-হাতে চিঠি ঠেলে দেয়। কোনখানে সেই সময় পড়েটড়ে গেল কিনা কে জানে।

হরেন বলেন, পড়লেও এই ঘরখানার মধ্যে থাকবে। আসেনি, এলে আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব।

মহিম গেলেন না তো ঘোষগাঁতি থেকে মেয়ের খুড়ো এসে পড়লেন। হয়তো বা সেনগিন্নিই খবর পাঠিয়েছিলেন সেখানে।

এই ঘোষগাঁতি সূর্যকান্তর বাড়ি। তিনি এখন স্টেশন-মাস্টার ভাইপোর আশ্রয়ে শিলিগুড়ি আছেন। নয়তো মহিম নিশ্চয় চলে যেতেন গেল-বারের মতো। মেয়ের খুড়োর কাছে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সূর্যবাবুর সমস্ত কথা শোনা গেল। বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে, বিয়ে করে ফেলেছে লীলা। সূর্যবাবুর প্রপিতামহী

বিধবা হয়ে স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়েছিলেন, তাঁর মেয়ে বিধবা হবার পর আবার বিয়ে করে সংসারধর্ম করছে। বড় ভাইপো পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টরের সেই স্থালকটি। কলকাতায় নিয়ে ট্রেনিং-এ ঢুকিয়ে দিয়েছে ঠিকই—তার পরে দুজনে মিলে এক চিঠিতে বাপের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে পাঠাল। সূর্যকান্ত জবাব দেননি। কোন সম্পর্ক নেই ও-মেয়ের সঙ্গে। বাণীর মতো লীলাও মরে গেছে, এই তিনি ধরে নিয়েছেন। শিলিগুলি থেকে ভাইপোর ছেলে-মেয়েগুলোকে পড়ান, আছেন একরকম।

মহিমকে ডেকে সুধা বললেন, মেয়ে তো দেখতে গেলে না—এই দেখ, মেয়ে ওঁরা বাড়ি তুলে এনে দেখাচ্ছেন।

পাত্রীর ফোটো। ফোটো সকলের হাতে হাতে ঘুরছে। নোলকপরা নাকচোখ টানা-টানা ফুটফুটে মেয়ে। নাম সরলাবালা।

মা বলেন, পাকা কথা দিই, কি বল ?

শশব্যস্তে মহিম ঘাড় নাড়েন : না মা। এখন থাক, তাড়াতাড়ি কিসের ?

মুখ কালো করে মা সরে গেলেন। বাক্যালাপ বন্ধ।

দিন তিনেক পরে কলকাতা রওনা হবার সময় মহিম মাকে প্রণাম করলেন। তখনও রাগ পড়েনি। পোস্ট অফিসটা ঘুরে হরেনকে শেষ একবার জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন ! না, আসেনি কোন চিঠি।

পরিমলের বাড়ি পা দিয়েই রহস্যের সমাধান হল। মাস্টারমশায় দেশ থেকে ফিরলেন, ছাত্রছাত্রীরা ধুপধাপ করে নেমে এসেছে। মায়া কলকণ্ঠে বলে, ও-বাড়ির মঞ্জুদিদির বিয়ে হয়ে গেল পরশুদিন। বাড়িসুদ্ধ সবার নেমতন্ন। আপনি থাকলে আপনারও হত।

মহিম মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ধুলোয় ভর্তি জুতো-জোড়াও খুলে রাখতে যেন ভুলে গেছেন। তারপর বললেন, আমার কথা হয়েছিল নাকি ?

না, হয়নি। যদি থাকতেন, একজনকে কি আর বাদ দিয়ে বলত ?

পাটু বলে, ফুলশয্যার আগেই আজ সকালে মঞ্জুদিদি চলে এসেছে। শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা নাকি বড্ড খারাপ। গোঁয়ার-গুণ্ডা লোক। বাবা সেই কথা শুনে খুব রাগ করলেন : দুটো দিনের মধ্যে বিয়ে ঠিক করে ফেলল। কাউকে কিছু বলল না, খোঁজখবর নিল না ভাল করে। হবেই তো এমনি।

মায়া বলে, এসে অবধি যা কান্না কাঁদছে মঞ্জুদিদি ! দেখে কষ্ট হয়। আমি গেলাম, তা একটা কথা বলল না। চিলে কোঠায় উঠে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

বিয়ে হতে না হতে এই। মহিমের কষ্ট হচ্ছে মঞ্জুরাণীর জন্যে। এত রূপসী মেয়ে, তার ভাগ্যে এই! রাগ হচ্ছে ওই মা আর ভাইটার উপর। অত আমড়াগাছি করল কি জন্ম তাঁকে? পড়াবার নামে ডেকে নিয়ে গিয়ে—চর্ব্য-চোষ্য খাইয়ে? পড়ানো তো বাজে অজুহাত—বোঝা গেছে সমস্ত। আসলে হল মেয়ে দেখানো, মেয়ের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে দেওয়া। ইস্কুল-মাস্টার বলে তারপরেও আগুপিছু করছিল বোধ হয়—হঠাৎ ধাপ্পাবাজের পাল্লায় পড়ে সর্বনাশ করল এমন মেয়েটার। মা আর ভাই দুজনে মিলে। দুটোকে কেটে কুচি-কুচি করে আদিগঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে তবে রাগের শোধ যায়।

বেশি নয়, হপ্তা দুই কেটেছে তার পরে। বার্ষিক পরীক্ষা একেবারে ঘাড়ের উপর—ছাত্রদের বড্ড চাড় হয়েছে, প্রাইভেট মাস্টারকে ছাড়তে চায় না, জোঁকের মতন লেপটে থাকে। টুইশানি সেরে মহিম ফিরছেন, রাত্তিরটা বেশি হয়ে গেছে। দেখেন গলির, ঠিক মোড়ের উপর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। সামনের পিছনের আলো নিভানো। ট্যাক্সির ষণ্ডা ষণ্ডা কয়েকটা লোক শীতের জন্যই বোধ করি গাদাগাদি হয়ে আছে। মহিমের দিকে তারা কটমট করে তাকায়। পথ একেবারে নির্জন। রকম-সকম মহিমের ভাল লাগে না।

অনতি পরেই প্রলয় কাণ্ড একেবারে। চেঁচামেচি মঞ্জুদের বাড়ি থেকে। মহিম ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন, জানালা খুলে ফেললেন। লোক জমেছে, ওদিকে টিনের বস্তিতে ক'ঘর ভাড়াটে ওঁদের—তারা সব এসে পড়েছে। বেশভূষায় রীতিমতো বাবু এক ছোকরা—ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে বের করে দিল তাকে মঞ্জুদের বাড়ি থেকে।

ছোকরা চেঁচাচ্ছে, কোথায় সব? দেখ, মারছে আমার শালারা।

মধুসূদন অগ্রণী। রাগে কাঁপতে কাঁপতে কিল-ঘুসি টিপটাপ ঝাড়ছে সে ছোকরার পিঠে। ভিড়ের মানুষরাও ছাড়ে না—সুযোগ পেয়ে তারাও যথাসম্ভব হাতের সুখ করে নিচ্ছে।

ছোকরা রাস্তার দিকে মুখ করে হাঁক দেয়: এই, কি করছ সব তোমরা?

পরিমলের উপরের ঘরের জানলা খট করে খুলে গেল: হল্লা কিসের? আরে, কি সর্বনাশ! জামাইকে মারছ মধু?

মাতাল হয়ে এসেছে দেখুন কাকা। বলে, বউ নিয়ে যাব, ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি। ঠাকুর উঁকি দিয়ে দেখে এসে বলল, ট্যাক্সিতে গুণ্ডা বোঝাই। মঞ্জুকে নিয়ে ওরা খুন করে ফেলবে।

জামাই বলে, গুণ্ডা কেন হবে। আমার মাসতুতো আর মামাতো ভাইরা বউ বাড়ি নিয়ে যাবার জন্ত এসেছে। এই, কি করছ তোমরা? বেরিয়ে এস না।

ট্যাক্সি কোথায় তখন! মামাতো মাসতুতো ভাইদের নিয়ে দৌড় দিয়েছে অনেকক্ষণ আগে।

পরিমল তাড়া দিয়ে উঠলেন: এত রাত্রে কিসের বউ নিয়ে যাওয়া? বউ নিতে হলে দিনমানে এস। চলে যাও। ভদ্রলোকের পাড়া—মাতলামির জায়গা নয় এটা।

জামাই ক্ষেপে গেল একেবারে। উপর দিকে মুখ করে আকাশ ভেদ করার মতন কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে: ওরে আমার ভদ্দরলোক! পোয়াতি মেয়ের সঙ্গে ঠকিয়ে বিয়ে দিয়ে এখন ভদ্দর ফলাতে এসেছে। বের করে আনুন মেয়ে—দশজনে দেখেশুনে পরখ করে ভদ্দোরপাড়া থেকে বস্তিতে তুলে দিয়ে আসুক, তবে যাব এখান থেকে।

উল্লুকটাকে দূর করে দাও—। সংক্ষেপে আদেশ দিয়ে পরিমল সশব্দে জানলা বন্ধ করলেন। কিন্তু যারা মারধোর করছিল, হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে হাত থেমে গেছে তাদের। মজাদার কথা, রসের খবর। বনেদি ঘরের মেয়ের কুৎসা। জামাই হাঁকডাক করে বলছে, সময় দিচ্ছে সেই জন্তে। বলে নিক শেষ পর্যন্ত। দূর করে দেওয়া মিনিট কতক পরে হলেও ক্ষতি হবে না।

সেই রাত্রেই মহিম পোস্টকার্ড লিখলেন: মা, কখনো আমি কি আপনার কথার অবাধ্য হইয়াছি? আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই করিবেন। পাত্রী দেখিবার আমি প্রয়োজন মনে করি না…

॥ সতেরো ॥

ম্যাকলিন কোম্পানির বড়বাবু মাস্টার বলে মেয়ে না দিলেন—কিন্তু বাংলাদেশ এটা খেয়াল রেখো। ভাত-কাপড়ের অভাব থাকলেও বিয়ের মেয়ে কত গণ্ডা চাই? সরলাবালার বাপ-খুড়ো কৃতার্থ হয়ে গেলেন কন্যাদান করে। মানুষের মন পড়া যায় এমনিতরো চশমা আজও বেরল না—তাহলে দেখতে আরও কতজন নিজেকে বাপান্ত করছে, টপকে পড়ে এমন পাত্রটা নিজের মেয়ের সঙ্গে গাঁথতে পারেনি বলে।

তারক কর মশায় ভ্রাতৃবধূ সুধাকে বাসায় নিয়ে এসেছে। সেনগিন্নি বুড়ো হয়েছেন, তাঁকে এখন সদাসর্বদা দেখাশোনার দরকার। সুধা সেই কাজ করতেন। বুড়ো মায়ের উপরে অধিকন্তু এক ছেলেমানুষ বউয়ের দায়িত্ব চাপিয়ে গাঁয়ে ফেলে রাখা যায় কেমন করে? মহিমকেও বাসা করতে হল অতএব। ইস্কুলের কাছাকাছি নিচের তলায় ছোট একখানা ঘর আর ঘেরা বারান্দা পাওয়া গেছে। ভাল হয়েছে, ইস্কুলে যাতায়াতের সময় লাগবে না। টিফিনের সময়টাতেও এসে একটু গল্পগাছা করা যাবে। সকালবেলা পরিমলের ছেলে-মেয়েদের পড়াতেন, সেখান থেকে চলে এসে ওই সময়টা এখন দুটো টুইশানি নিয়েছেন। রাত্রের পুরানো ছাত্রীটাও আছে, ছেড়ে দেননি ভাগ্যিস মঞ্জুর মায়ের কথায়।

পয়লা তারিখে মাইনে পাওয়া গেছে। ভারতী ইনস্টিট্যুশনের এই রীতিটা বড় ভাল, প্রায় যা কোন ইস্কুলে নেই। রসগোল্লা বানাচ্ছিল এক খাবারের দোকানে। বড়ি বড়ি ছানা ফুটন্ত চিনির রসে ফেলছে, ফুলে-ফেঁপে রসে টইটম্বুর হচ্ছে। মাইনে পেয়ে মনমেজাজ আজ ভাল—ছ' আনার ছ'টা রসগোল্লা কিনে খুরিতে নিয়ে বাড়ি চললেন।

সরলাবালাকে বলেন, গরম রসগোল্লা খেয়েছ কখনো? একেবারে হাতে গরম। টুপ করে দুটো গালে দাও দিকি এখুনি। জুড়িয়ে গেলে আর মজা থাকবে না।

সরলা খুব কথা কম বলে। বড় বড় চোখ তুলে তাকায়, আর মুচকি হাসে কথায়-কথায়। হাসি আর চাউনি ভারি চমৎকার। খুরি নিয়ে সে চলে গেল। ক্ষণপরে বাটিতে করে দুটো রসগোল্লা আর এক গেলাস জল মহিমের সামনে এনে রাখল।

চা খেয়ে এস নি তো? চা করে আনি—

চিনি তো নেই, কাল থেকে শুনছি। চিনি এনে দিই তবে।

উঠছিলেন মহিম। হেসে কাঁধে হাতের মৃদু চাপ দিয়ে সরলাবালা বসিয়ে দিল: এই বসো, এক্ষুণি আবার দোকানে ছুটতে হবে না। রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় আনলে হবে। এখন চিনি লাগছে না, রসগোল্লার রস দিয়ে চা করব। জেনে ফেললে তাই, খেয়ে কিন্তু মোটেই ধরতে পারবে না আসলে চিনির রসের চা।

তাড়াতাড়ি চা করতে যাবে। কিন্তু যেতে দিচ্ছে না মহিম, হাত ধরে ফেললেন।

আমায় তো দিলে। তোমরা খাবে না?

সরলাবালা বলে, মার জন্যে দুটো তুলে রেখে দিলাম এঁটো হবার আগে। সন্ধ্যাহ্নিকের পর দেব।

নিজের কথা বলছ না—তুমি খাবে কখন?

সরলা বলে, কষ্ট করে এলে, তোমায় আগে চা করে দিই। চা খেয়ে কলেজে চলে যাও। আমার খাওয়ার কত সময় রয়েছে।

হাত-পা অলস ভাবে ছড়িয়ে মহিম বলেন, এখন কলেজে গিয়ে কী আর হবে! গিয়ে পৌঁছতেই তো প্রায় সাড়ে পাঁচটা। পুরো এক ঘণ্টা কোন প্রফেসর ধৈর্য ধরে পড়ান না, আগেভাগে ছুটি দিয়ে দেন। চারতলার সিঁড়ি ভেঙে হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে দেখব, কেউ নেই—ছুটি হয়ে গেছে।

সরলা বলে, পরশু তো কামাই করলে। ও-হপ্তায় করেছ তিন দিন। হত ইস্কুলের মতো: গার্জেনের চিঠি আন, নয় তো বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেব—তাহলে জব্দ হতে।

মহিম বলেন, কিসের জব্দ? তোমাকেই বলতাম যে চিঠি লিখে দাও—বিষম অসুখ। দিয়ে দেখাতাম, এই যে চিঠি আমার গার্জেনের।

মুখ টিপে হেসে সরলাবালা বলে, তাই বটে! শুয়ে পড়ে থাকার অসুখ নয়, বসে বসে পাগলামি আর কষ্টিনষ্টির অসুখ। কলেজ কামাই করে নিত্যিদিন তুমি অসুখে ভুগবে, আমার যে এদিকে সৃষ্টি-সংসারের কাজ পড়ে থাকে।

মহিম বলেন, কলেজে একটি দিনও কামাই নেই আমার। তাই দেখ—বাড়ি বসে অসুখে ভুগি, আবার কলেজ করেও যাচ্ছি কেমন একসঙ্গে।

সরলা সেই বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে থাকে, বুঝতে পারে না। মহিম কলাও করে বোঝাচ্ছেন: আমাদের ল-কলেজে না গিয়েও হাজির থাকা যায়। আমি তবু তো একই কলকাতা শহরের উপর রয়েছি। একজনে ধরা পড়ে গিয়েছিল—বরিশাল শহরের এক বড় ইস্কুলে কাজ করে, দশটায় ইস্কুলে যায় চারটের সই করে বাড়ি ফেরে, আবার ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশে কলকাতায় ঝাবভাঙা বিল্ডিং-এ ক্লাস করছে। পুরো দুটো বছর এমনি করে আসছে।

সরলা বলে, কেমন করে হল?

পাকা বন্দোবস্ত। মাসিক একটা বরাদ্দও থাকে—এত করে দেব, রোল-কলের সময় রোজ 'প্রেজেন্ট' বলে যাবে।

বল কি? প্রফেসররা তো আচ্ছা বোকা, ধরতে পারেন না?

বড্ড ভাল প্রফেসররা। এই কাজে লুকোছাপা কিছু নেই, সকলের জানা।

মস্তবড় ক্লাসঘরে পনেরটি ছাত্র হয়তো টিমটিম করছে। প্রফেসর ষাট-সত্তরটি হাজির লিখেছেন। একটা নাম ডেকে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, প্রফেসর হেসে বললেন, দুর্ভাগা ভদ্রলোক—একটি বন্ধুও থাকতে নেই ক্লাসে!

তারপর বলেন, এক এক সময় ভাবি, ওই রকম পাকা বন্দোবস্ত আমিও করে ফেলব। কোনদিন কলেজে যাব না, অন্য লোকে প্রক্সি দিয়ে যাবে। রাত্তিরে যে পড়ানোটা আছে, সেটা সাঁজের ঝোঁকে সেরে আসব। পুরো রাত্তির হাতে রইল—গড়ের মাঠে খানিক বেড়ানো গেল। হল বা সিনেমায় গিয়ে বসলাম একদিন।

সরলা বলে পড়াশুনো?

মহিম লুফে নিয়ে বলেন, তাই বলতে যাচ্ছিলাম। আইনের বই এখন ছুঁতেই পারছি নে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটাও দেওয়া গেল না। কাজকর্মের ঝঞ্ঝাট সকাল সকাল সেরে রাত জেগে চুটিয়ে পড়া যাবে। উকিল হয়ে না বেরনো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। মরীয়া হয়ে উঠেছি।

বর উকিল হবে, সরলাবালারও সাধ খুব। উকিল একজন আছেন তাদের ঘোষগাঁতিতে, ছেলেবয়স থেকে দেখে আসছে। মোটাসোটা, গোলগাল, মাথায় টাক। পুজোর সময় বাড়ি আসেন। রেল-স্টেশন থেকে ক্রোশখানেক পথ, সবায় হেঁটে চলে আসে, উকিলবাবু পালকি চেপে আসেন আট বেহারায়। আট বেহারা ও-হো ও-হো ও-হো ডাক ডেকে অঞ্চলের মধ্যে সাড়া তুলে গ্রামে আসছে—মাঠ ভেঙে তাড়াতাড়ি সংক্ষিপ্ত পথ, কিন্তু উকিলবাবুর ওই পথে আপত্তি: তা কেন! পৌঁছলে তো ফুরিয়ে গেল। পুবপাড়া পশ্চিমপাড়া উত্তরপাড়া—তিনটে পাড়া বেড় দিয়ে যাও। চোখ টাটাবে কত জনের, বুক ফাটবে, ঘুমতে পারবে না। তবেই তো পয়সা খরচ সার্থক।

সরলাবালার বড় ইচ্ছা, উকিল হয়ে মহিম পাল্কি-বেহারা হাঁকিয়ে একদিন আলতাপোলের বাড়ি যাবেন।

সে যাকগে। পরের কথা পরে। আজ এখন কলেজে যাচ্ছেন না, সেটা ঠিকই। আটটা অবধি আছেন বাসায়। জামা খুলে বারান্দায় একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলেন, সেটা নিয়ে সরলাবালা ভিতরের আলনায় রাখল। ইস্কুলের জুতাজোড়া সরিয়ে নিল: মোটর-টায়ার ফিতের মতন কেটে খড়মের উপর বসানো—সেই বস্তু এনে রাখল মহিমের পায়ের কাছে। বলে, আজকে পয়লা তারিখ, তাই বল। মাইনে পেয়েছ। তা পকেটে অমনভাবে টাকাকড়ি রাখে! বাসন মাজতে মাজতে ঝি'টা তাকাচ্ছিল আড়ে আড়ে। টাকাটা

আমি তুলে রেখে এলাম—সাঁইত্রিশ টাকা একআনা—তাই তো? একটা মনিব্যাগও নেই—পকেটের ভিতর আজেবাজে কাগজের মতন নোটগুলো পড়ে থাকে। রোসো, মনিব্যাগ বুনে দিচ্ছি একটা। দুটো লাটিমের সুতো কিনে এনে দিও তো। কুরুসকাঁটা আছে আমার।

পকেটের টাকা সরলাবালা সাবধান করে তুলে রেখেছে। মহিমের অন্ত-কিছু এখন কানে ঢুকছে না। নতুন বউ গণেগেঁথে বরের মাস মাইনে দেখল সাঁইত্রিশ টাকা একআনা। চল্লিশের মধ্যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আড়াই টাকা এবং রসগোল্লার ছ-আনা বাদ। আর একআনা দিয়ে স্ট্যাম্পের দাম যার উপর সই করে টাকা নিতে হয়। বি. এ. পাশ-করা গ্রাজুয়েট বর—এই মাইনের তিনি শহরে চাকরি করেন, বাসা করে বউ নিয়ে আছেন!

মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, হ্যাঁ মাইনে তো দিল আজ। মাইনের ভিতর থেকে আটত্রিশটা টাকা মোটে দিল। হতভাগা ইস্কুল পুরো মাইনে একদিনে দিতে পারে না, বলে, আপনার একলার তো নয়, সকলকে কিছু কিছু করে দিতে হবে। তা দিয়ে দেবে আর দুটো তিনটে কিস্তিতে।

ল-কলেজে যাওয়া বন্ধ, প্রক্সি চলেছে সেখানে। ইস্কুল থেকে ফিরে মহিম গল্পগুজব করেন খানিকটা। আটটা নাগাদ বেরোন ছাত্রী পড়াতে। দিন পাঁচেক পরে ইস্কুল থেকে এসে তিনি বলেন, টাকাটা পড়ে আছে গো! আজকে আবার দিল কিছু—পনেরটি টাকা। যেন ফকিরের ভিক্ষে। তুলে রেখে দাও, কী আর হবে!

সকালবেলা যে দু-বাড়ি ট্যুইশানি করেন, তারাই এক জায়গায় মাইনে দিয়েছে। পেয়েছেন সকালেই। সারাদিন চেপেছিলেন—ইস্কুল থেকে ফিরে আসার পর তবেই ইস্কুলের মাইনে পকেটে থাকতে পারে।

এর পরে ঠিক এমনি আর দু-কিস্তিতে পনের আর আঠার টাকা মাইনে এসে পড়ল। এবং সরলাবালা পকেট থেকে নিয়ে গণেগেঁথে তুলে রাখল। মোটমাট পঁচাশিতে দাঁড়াল—নেহাৎ নিন্দের নয়। পঁচাশি টাকার স্বামীকে নতুন বউয়ের রীতিমতো মান্য করা উচিত। আরও কত বাড়বে! উকিল হয়ে আদালতে গেলে তো কথাই নেই।

রাত্রে যে পড়ানো, সময় বদলাতে তারা রাজি নয়। পড়ে মেয়ে, সন্ধ্যাবেলা তিনদিন তার গানের মাস্টার আসে। গান যেদিন না হয়, চোর-পুলিশ খেলে ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে। রাত হয়ে গেলে তারা তো ঘুমিয়ে পড়বে! মহিমের কাছে সন্ধ্যাবেলা কিছুতে পড়বে না মেয়েটা।

মা বললেন, তবে আর মিছামিছি কলেজ কামাই করা কেন? আবার যেতে লাগ।

মহিম বলেন, কলেজে গিয়ে লাভ কিছু নেই মা। মিছে ট্রাম-খরচা গোলদীঘি অবধি। এ হলগে ল-কলেজ—অন্য দশটা ইস্কুল-কলেজের মতন নয়। প্রফেসররা হাইকোর্টে সারাদিন মামলা করেন, তাঁরা কেউ পড়াতে চান না। ছাত্র যারা, তারাও চাকরি-বাকরি করে—পড়বার জন্য যায় না কেউ। পড়াশুনো যত-কিছু বাড়িতে। খেয়েদেয়ে শুয়ে শুয়ে খানিকটা আমি পড়ে থাকি।

মা এবার সরলাবালার কানে না যায় এমনিভাবে বললেন, সন্ধ্যাবেলা তবে আর একটা পড়ানো দেখে নে। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। পোয়াতি বউমা খাটতে পাবে না বেশি, ঠিকে-ঝি রাখতে হল। বাচ্চা হবার সময় খরচা, হয়ে যাবার পরে আরও বেশি খরচা। ইস্কুলের পর আজেবাজে গল্প না করে ওই সময়টা যাতে দু-পয়সা আসে সেই চেষ্টা দেখ।

বছরের মাঝখানে ভাল ট্যুইশানি মেলে না। সে সব জানুয়ারি মাসে নতুন সেসনের মুখে দেখতে হয়। দু-একটা রদ্দি মাল পড়ে থাকে এখন। অত্যন্ত কম মাইনের বলে মাস্টার জোটাতে পারেনি, অথবা ছেলের বাঁদরামির জন্য টুইশানি ছেড়ে দিয়ে কোন মাস্টার হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। মা যা বলছেন— বউয়ের সঙ্গে হাসি-মস্করায় সময় নষ্ট না করে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই লই। পাওয়া গেল বার টাকার একটা।

মাসের পয়লা তারিখে মহিমের পকেটে যথারীতি মাইনের টাকা সরলাবালা গুণেগেঁথে তুলে রেখে এল। এসে মুখ টিপে হেসে বলে, বরাবর আর তিনটে কিস্তি আসে। এ মাসে তার উপরে আবার একটা। কিছু মাইনে-বৃদ্ধিও হয়েছে, কি বল?

ধরণী দ্বিধা হও, মহিম-মাস্টার তন্মধ্যে প্রবেশ করবেন। বউ দেখা যাচ্ছে ভিজে-বেড়াল একটি, জেনেশুনে ন্যাকা সেজে থাকে। মাস্টারি চাকরি কিছুতে নয়, ওকালতিটা পাশ হলে যে হয়। কিন্তু সে আশাও মরীচিকা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতদিনের মধ্যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটাই দেওয়া ঘটে উঠল না, পার্সেন্টেজ পচে যাবে। কলেজে প্রক্সি দেবার ভার যার উপর—খবর নেওয়া গেল, সে লোক পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়ে কোথায় চলে গেছে। সকলের বড় বাধা, ছ-মাস মাইনে দেওয়া হয়নি—কলেজের খাতায় নাম কেটে দিয়েছে। আর সংসার-খরচের যা বহর, টুইশানি আরও একটা বিকালের দিকে জুটিয়ে নেবেন কি না ভাবছেন।

॥ আঠার ॥

ইস্কুলের ঠিকানায় মহিমের নামে একখানা পোস্টকার্ড এল। সুরেশ নামে কে একজন লিখেছে : আপনার শিক্ষক সূর্যবাবু অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে আছেন। কার্জন-ওয়ার্ডের আঠাশ নম্বর বেড। আপনাকে তিনি দেখতে চান।

ইস্কুল থেকে সোজা মহিম বেরিয়ে পড়লেন। একটু না হয় রাত হবে টুইশানি শুরু করতে। কামাই হবে না-হয় ছাত্রীদের ওখানে। ঘুরে ঘুরে এনকোয়ারি অফিসে খোঁজখবর নিয়ে অবশেষে জায়গাটায় হাজির হলেন। একতলার একটা ঘরের শেষ প্রান্তে ফ্রী-বেড।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। হাসপাতাল মানুষজনে ভরে গেছে। আত্মীয়-বন্ধুরা ফল নিয়ে ফুল নিয়ে মিষ্টি-মিঠাই নিয়ে রোগিদের দেখতে আসছে। সূর্যকান্তর কাছে কেউ নেই, একলাটি পড়ে আছেন। চিরদিনই রোগা শরীর—এখন যেন বিছানার সঙ্গে মিলিয়ে আছেন একেবারে। ঠোঙায় করে চারটে কমলালেবু নিয়ে মহিম বিছানার পাশে দাঁড়ালেন।

আয় বাবা—বলে সূর্যকান্ত আহ্বান করলেন। উঠতে যাচ্ছেন, একটু বোধ হয় ঘাড়ও তুলেছেন। কিন্তু সিস্টার তাকিয়ে পড়লেন। যেমন তেমনি শুয়ে পড়লেন আবার তিনি।

অসুখ হয়ে কলকাতায় এসেছেন, কিছুই জানতাম না মাস্টারমশায়। সুরেশ বলে একজন চিঠি লিখেছেন—

সুরেশ আমার ছোট জামাই। আসবে। আলাপ করে দেখিস, বড্ড ভাল ছেলে। অমন ছেলে হয় না। লীলা আর সুরেশ দুজনে এসে যাবে এখনই।

নতুন জামাইয়ের প্রশংসায় শতমুখ। মহিমের বিস্ময় লাগে। প্রপিতামহী সতী হয়েছিলেন—চিরকাল সেই আদর্শের বড়াই করে এসে এখন সূর্যকান্ত বিধবা-বিবাহের পক্ষে। বলেন, বেঁচেছে আমার মেয়েটা। সুরেশের বাপ কর্পোরেশনের বড় অফিসার, তাঁর চেষ্টাতেই লীলার এত শিগগির চাকরি। কিন্তু বিয়ের পর ছেলে-বউকে তিনি বাড়ি ঢুকতে দেননি। বস্তির টিনের ঘর ভাড়া করে ওরা আছে। মাস্টারির হাড়-ভাঙা খাটনি খেটে লীলা পঁচাত্তরটি টাকা আনে। সুরেশ কিছু জোটাতে পারেনি, এখানে-ওখানে বইয়ের প্রুফ

দেখে দু-দশটা টাকা যা পায়। কিন্তু কী আনন্দে আছে যে! চোখে না দেখলে বুঝতে পারবি নে বাবা। টিনের চালের নিচে স্বর্গধাম বানিয়েছে। তাই দেখ —টাকায় কোন সুখ নেই, সুখ মনে। ভাইপোর ওখানে ছিলাম। মাইনে আর উপরি মিলে রোজগার খুব ভাল, কিন্তু ঝগড়া-কচকচির ঠেলায় বাড়ি তিষ্ঠানো দায়।

একটু থেমে বলতে লাগলেন, তবু কিন্তু এখানে সহজে আসতে চাইনি। আমার মনের কথা জানিস তুই—রেখে-ঢেকে আমি কিছু বলি নে, অঞ্চলসুদ্ধ সবাই জানে। অসুখের খবর শুনে সুরেশ টেনেটুনে নিয়ে এল শিলিগুড়ি থেকে। সারাদিন একলা শুয়ে শুয়ে নানান কথা ভাবি। দেখ, আমি ভুল করেছিলাম। কাল তো স্থির দাঁড়িয়ে নেই—এক সময়ের নীতি-নিয়ম আর এক সময়ে বাতিল। লোমশ ম্যামথ হিমযুগের সঙ্গে সঙ্গে বিলয় হয়, লোমহীন হাতী আসে সেই জায়গায়। সমাজের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনি। আমার প্রপিতামহীর আমলে স্বামী ছাড়া মেয়েদের কি ছিল জীবনে? স্বামী অন্তে বেঁচে থাকার যে দুঃখ, তারচেয়ে চিতায় পুড়ে মরা আরামের। কিন্তু আমাদের মেয়েরা জীবনে হাজার পথ খোলা পাচ্ছে। স্বামী ওদের যথাসর্বস্ব নয়, নানা সম্পদের মধ্যে একটি। স্বামী না থাকলেও জীবনের অনেক কিছু থেকে যায়। ওরা কোন্ দুঃখে তবে চিতায় মরবে? কিংবা জীবনে বেঁচে থেকেও মরার মতন থাকবে?

অনেক কথা বলে সূর্যকান্ত ক্লান্তিতে চুপ করলেন। শিয়রে টুলের উপর বসে মহিম ধীরে ধীরে তাঁর কপালে হাত বুলাচ্ছেন। এক সময়ে প্রশ্ন করেন, অসুখটা কি মাস্টারমশায়?

কী আর এমন। খেতে পারিনে, পেটে যন্ত্রণা। অম্বলের দোষ আর কি। হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় লীলাদের গলিতে। সেখানকার ডাক্তারবাবু বললেন, এক মাসের মধ্যে রোগ সারিয়ে দেবেন। কিন্তু ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বিষম ভয়তরাসে। জোরজার করে হাসপাতালে এনে তুলল। আর হাসপাতালের এরাও কী লাগিয়েছে আমায় নিয়ে! কত রকমের এক্স-রে ছবি তুলল। নাকের ফুটো দিয়ে পেট অবধি নল ঢুকিয়ে কচ্ছপ চিত করে রাখার মতো ফেলে রাখল পুরো একটা বেলা। ডাক্তার এসে দেখে যান, হাউস-সার্জেন আসে, সিস্টার তো আছেই। তার উপরে আছে ছাত্রেরা—ও এসে নাড়ি টেপে, সে এসে চোখ টেনে দেখে। মচ্ছব লেগে গেছে।

ঝিকঝিকে সাদা দু-পাটি দাঁত মেলে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন? বললেন, গাঁয়ের ভাগাড়ে শকুন পড়া দেখেছিস—সেই ব্যাপার।

একটু পরে লীলা আর সুরেশ এসে পড়ল। ইস্কুলের মিস্ট্রেসদের নিয়ে মিটিং ছিল, ঝামেলা মিটিয়ে লীলার বাসায় ফিরতে ছ'টা। সুরেশও কোথা থেকে একগাদা প্রুফ নিয়ে এসেছে আজ, দুপুর থেকে একটানা তাই দেখেছে। রোগির পথ্য দুধ-বার্লি ফুটিয়ে নিয়ে এলুমিনিয়ামের পাত্রে ঢেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। বাসে যা ভিড়—তিনটে বাস ছেড়ে দিয়ে তবে জায়গা হল দুটো মানুষের একটু দাঁড়িয়ে আসবার।

কী মধুর আলাপ-ব্যবহার। পুরানো মতামত বিসর্জন দিয়ে কেন সূর্যবাবুর অত উচ্ছ্বাস, বুঝতে পারা যায়। বিছানার ধারে বসে লীলা এখন বার্লি খাওয়াচ্ছে বাপকে। মুখ দেখে কে বলবে অত খাটনি খেটে এসেছে—যেন ফুলের বিছানা পেতে সারাদিন সে অলস শয্যায় শুয়ে ছিল। সুরেশও যে ঘাড় গুঁজে সারাক্ষণ প্রুফ দেখেছে, চেহারায় ধরা যাবে না।

মহিম বলেন, মাস্টারমশায় ভীতু বঙ্গে তোমাদের নিন্দে করছিলেন। সামান্ত একটু অম্বলের অসুখ, হোমিওপ্যাথিতে সেরে যেত—কী কাণ্ড লাগিয়েছ তোমরা তাই নিয়ে।

সামান্তই বটে! সুরেশ বলে, তাই হোক দাদা, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

কানে কানে বলে, ক্যান্সার বলে সন্দেহ করছে।

হাউস-সার্জন ছোকরা মানুষ, অল্পদিন পাশ করে বেরিয়েছে। তার সঙ্গে মহিম দেখা করলেন। রোগ ক্যান্সারই! সারবে না। কয়েকটা এক্স-রে প্লেট নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে অপারেশনের সুবিধা হবে কিনা। নিরাময়ের আশা নেই, অপারেশনে জীবনের মেয়াদ এক বছর দেড় বছর বাড়তে পারে বড় জোর। এর অধিক কিছু নয়।

মহিম অবিশ্বাসের সুরে বলেন, ক্যান্সারে শুনতে পাই ভয়ানক কষ্ট। এঁর তো কষ্ট কিছু দেখছি নে। হেসে হেসে কতক্ষণ ধরে গল্প করলেন।

আমরাও তাই দেখি। কষ্টের কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু হচ্ছে নিশ্চয় কষ্ট, না হয়ে পারে না। চেপে আছেন। অদ্ভুত সহ্যশক্তি।

ধ্বক করে মহিমের মনে আসে, ওঁর ছাত্র চারুও অমনি। গুবরেপোকা নাভির উপর ছেড়ে বাটি উপুড় করে চাপা দিয়ে দেয়। তাতে বড় কষ্ট, স্নায়ুর উপর ভয়ানক প্রতিক্রিয়া—পাগল হয়ে ওঠে মানুষ। চারু-দা'কে তাই করেছিল নাকি। তিনি সর্বক্ষণ হেসেছিলেন, পুলিশ একটা কথাও বের করতে পারেনি।

পরের দিনেও এলেন মহিম। প্রায়ই দেখতে আসেন। ডাক্তার মহিমকে বলেন, অপারেশনের কথাটা ওঁকে শুনিয়ে দেবেন। উনি রাজি আছেন কিনা।

সূর্যকান্ত বলেন, দরকার হলে করবেন বইকি! কিন্তু দরকার আছে বলে তো মনে হয় না।

কথাটা এখন যা-ই ভেবে বলুন, এসব মানুষের দরকার থাকে না কোন-কিছুতে। কোনদিন ছিল না। ঈশ্বর নিয়ে মাথা ঘামান না—ইহকালে যেমন, পরকালের জন্যেও তেমনি কোন প্রার্থনা নেই কারো কাছে। মানুষের যাতে ভাল হয়, তাই চিরদিন করে এসেছেন। কোন রকম উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, না করে পারবার জো নেই।

অপারেশন আর হল না। এর পরে ক'টা দিন রোগির বেহুঁশ অবস্থায় কাটল। আধেক চক্ষু মেলে নিঃসাড় হয়ে থাকেন, ঘুম কি জাগরণ বোঝা যায় না। মহিম কানের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করেন, মাস্টারমশায়, আমি—আমি মহিম। চিনতে পারেন?

হয়তো বা অতি-অস্পষ্ট হুঁ—আওয়াজ একটু এল।

বাসার ঠিকানা দিয়ে এসেছিলেন মহিম। বিকালবেলা ইস্কুল থেকে সবেমাত্র এসে দাঁড়িয়েছেন, খালি-পা উচ্ছৃঙ্খল-চুল গায়ে শুধুমাত্র একটা আলোয়ান সুরেশ এসে বলে, চলুন দাদা—

সবিস্তারে বলবার প্রয়োজন নেই। ক'দিন থেকেই এখন-তখন অবস্থা। পায়ের জুতোজোড়া খুলে ফেলে মহিম বিনা বাক্যে রাস্তায় নেমে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে একটা কথা: তোমাকেই আসতে হল?

সুরেশ বলে, লীলাও বেরিয়েছে। কাঁধে করে নিয়ে যাবার চারটে মানুষ চাই অন্তত। কলকাতার মত শহরে তা-ও জোটানো দায় হয়েছে।

জুটে গেল অবশ্য। সুরেশকে যেতে বলে দিয়ে মহিম পুরানো মেসে চললেন। মড়া পোড়ানোর কাজে ভূদেববাবুর উৎসাহ খুব—এক কথায় তাঁকে রাজি করানো গেল। তিনি কাঁধ দেবেন। রাত্তিরের টুইশানি কামাই হবে। হোকগে। তা বলে এত বড় একজন শিক্ষকের গতি হবে না? কাঁধে গামছা ফেলে মহিমের পিছু পিছু ভূদেব ট্রামে গিয়ে উঠলেন।

লীলাও কোথা থেকে আর দুটিকে জুটিয়ে এনেছে। একসময়ে ছাত্র ছিল তারা সূর্যবাবুর। পুরুষ পাঁচজন হল—আবার কি। আর মেয়ে লীলা।

ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে হাসপাতালের ছাড় করে বেরুতে সন্ধ্যা গড়িয়ে

গেল। মড়ি-বওয়া খাটিয়া আনল সুরেশ। অত্যন্ত ছোট, দাহে যত সস্তা হয়। সূর্যকান্ত ছোটখাট মানুষটি—কুলিয়ে যাবে একরকমে। বরঞ্চ ভালই হল, হালকা জিনিস কম মানুষে বয়ে নিতে কষ্ট হবে না। চারজনে কাঁধ দিয়েছে, আর একজন পিছু পিছু যাচ্ছে। কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তার সঙ্গে বদলাবদলি হবে।

শ্মশানে সেদিন বড় জাঁক। মস্ত এক বড়লোক এসে পড়েছেন ভবলীলা সাঙ্গ করে। লোকারণ্য। কীর্তনের দল তিন-চারটে। বৃষ্টির ধারার মতো খই আর পয়সা ছড়াতে ছড়াতে এসেছে সমস্ত পথ। শ্মশানবন্ধুদের মধ্যে কয়েকটা ছোকরা এখন ঘাটের বাঁধানো চাতালের উপর বসে সিগারেট ধরিয়েছে, আর হাসাহাসি করছে, নেপাল-দা গোপাল-দা বড্ড যে দিলদরিয়া। বুড়ো বাপ এদ্দিনে সিঙে ফুঁকল সেই আনন্দে নাকি?

আর একজন বলে, কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না। আমার ভয় করছে মাইরি। মড়ি পাশমোড়া দিয়ে বসে হয়তো বা হুমকি দিয়ে উঠবে। চিরকেলে কঞ্জুষ মানুষ, ট্রামে সেকেণ্ড ক্লাসের উপরে কোন দিন চড়েন নি—সেই তিনি চোখ বুঁজলেন, অমনি যেন, দেখিয়ে দেখিয়ে সারা পথ পয়সার হরির লুঠ দিয়ে এল। পরলোকে ওঁর কি ভাল ঠেকছে একটুও!

মোটরগাড়ি সঙ্গে এসেছে অমন বিশখানা। সামনের রাস্তাটায় আগাগোড়া জুড়ে আছে। বড় ঘরের আত্মীয়কুটুম্ব ও মেয়েরা এসেছে গাড়িতে। গয়না কত মেয়েদের গায়ে—ঝিকমিক করছে। নজর করলে পাউডারের গুঁড়োও দেখা যাবে ঘাড়ে গর্দানে। পাঁচ-দশ জন চোখ মোছামুছি না করছে এমন নয়। ওদিকে গঙ্গার একেবারে উপরে ধুনি জেলে এক সাধু বসে আছেন। সাধুবাবার কাছাকাছি কয়েকটা বাবু মানুষ বুঝি বোতল বের করে বসল।

একটা গাছের তলায় সূর্যকান্তকে নামিয়ে রেখে মহিম আর ভূদেব যাচ্ছেন ডেথ সার্টিফিকেট দেখিয়ে দাহের জন্য অফিসে টাকা জমা দিতে। এই সমারোহ দেখতে দেখতে যাচ্ছেন। ভূদেব বলে উঠলেন, আমাদের মাস্টারমশায় এসেছেন, কেউ একেবারে টেরই পেল না।

মহিম বলেন, জীবন চুপিসারে কাটালেন, মরণেও ঠিক তাই। যে আমলের গ্রাজুয়েট, ইচ্ছে করলে কেষ্টবিষ্টু একজন হতে পারতেন। কিন্তু গাঁয়ের মধ্যে ছেলেপুলে নিয়ে চিরকাল পড়ে রইলেন।

ঘোষপাতির বাড়ি সেই একদিন কথাবার্তা হয়েছিল, মহিমের মনে পড়ে যায়। খুব বড় শিল্পী সূর্যকান্ত—কচিকোমল শিশুদের হাতে নিয়ে বছরের পর বছর ধীরে

ধীরে মানুষ গড়ে তুলতেন। জয়ের পুরস্কার অর্থে নয়, সৃষ্টির সফলতায়। সকলের চেয়ে বড় পুরস্কার বোধ হয় চারু-দার কাজকর্ম নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে রেখে। গুলিগোলায় ভয় ছিল না, ডরাতেন কেবল প্রশংসায়। যক্ষারোগাক্রান্ত এক বুড়িকে দিনরাত্র সেবা করেছিলেন, কেমন করে সেটা চাউর হয়ে গেল। চারু-দা ঘাড় নেড়ে মহাবেগে না না—করতে লাগলেন: আমি কিছু করিনি, আমি কিছু জানি নে। কিন্তু অনেকে সমস্বরে একই কথা বলছে—চারু-দা'র অবস্থা তখন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ার মতন। মুখ-চোখ রাঙা করে সকলের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। এই একটি দিনের ব্যাপার দেখেছিলেন ? হিম।

সূর্যকান্তও তাই। গুরুর এবং ছাত্রের জীবনে এক মন্ত্র—আত্মা-বিলুপ্তি। আধময়লা জামা-কাপড়, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—হঠাৎ দেখে কে বলবে মানুষটির কিছুমাত্র মূল্য আছে। কথা বলতে যাও, মিনমিন করবেন অচেনা লোকের কাছে। কিন্তু ক্লাসের ছাত্র হয়ে পড়ানো শোন একদিন এই মানুষটির—সে আর-এক মূর্তি। গলার স্বরও যেন সেই সময়টা একেবারে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু সে হল গ্রাম্য ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে ক্লাস, বাইরের গণ্য-মান্যেরা কী খবর রাখেন!

মহিম ও ভূদেব ইতিমধ্যে অফিসে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাউন্টারের মানুষটির হাড়সর্বস্ব আগুনে-ঝলসানো চেহারা। চিতার ধোঁয়া খেয়ে খেয়ে এমনি হয়েছে বোধ হয়। আজকের আগন্তুক ওই বড়লোকটির প্রসঙ্গ হচ্ছে পাশের একজনের সঙ্গে: হুঁ:, ভারি দেমাক দেখাতে এসেছে! বিহারের এক জমিদার ক নিয়ে এল সেবার—একমানুষ সমান চন্দনকাঠের চিতে, আর টিন টিন ঘী। হাতের হীরের আংটি ঘুরিয়ে এরা এসে বলছে, ডবল-চিতের খরচা ধরে নিন। আরে ডবল হোক যা-ই হোক, আমকাঠের উপরে তো নয়। আমার কাছে কেউ যেন ফুকুড়ি করতে না আসে। আজকের চাকরি নয়। সকাল নেই রাত্রি নেই, চিতে আর চিতে। ষাট-সত্তর হাজার হয়ে গেছে। পুরো এক লক্ষ পুড়িয়ে তারপর নিজে একদিন চিতের উপর চড়ে বসব। সেই শেষ।

সূর্যকান্তর কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে ঘাড় তুলে মহিমের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, পুরো না ঠ্যাং-ভাঙা ?

মহিম জানেন না ব্যাপারটা। বহুদর্শী ভূদেব বঝিয়ে দিলেন। মড়ি পোড়ানোর দুই রকম রেট। এক হল সাড়ে-তিন টাকা—তাতে ঠ্যাং ভেঙে পোড়ানো হবে। ঠ্যাং ভাঙার দরুণ মড়ির দৈর্ঘ্য কমে গিয়ে চিতায় সাইজ

ছোট হয়, কম কাঠ লাগে। সস্তা সেইজন্ত। পুরোপুরি লম্বা করে শুইয়ে পোড়াবেন তো আর এক টাকা বেশি—সাড়ে-চার। কীভাবে পোড়াতে চান বলুন—সেইমতো রশিদ কাটা হবে।

ফিরে এলেন তাঁরা পরামর্শের জন্ত। সুরেশ-লীলাও আনাড়ি—এ সম্বন্ধে সঠিক জানা ছিল না, ফুল কিনে বাড়তি খরচ করে ফেলেছে। এ-ওর মুখে তাকাতাকি করছে। মহিম পকেট থেকে আনা আষ্টেক বের করে দিলেন। অফিসে গিয়ে বলেন, ঠ্যাং-ভাঙার রশিদ কাটুন মশায়। সাড়ে-তিন টাকা।

চিতা জ্বলল! মহিমের মনে হচ্ছে, প্রাচীন এক আদর্শবাদ আগুনে তুলে দিয়েছেন। অতবড় ভারতী ইনস্টিট্যুশন—এক গঙ্গাপদবাবু ছাড়া শিক্ষক তো মেলে না সেখানে। মিস্ত্রি-কারিগর সকলে। ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গেছে—কচিৎ বা মাটি খুঁড়ে কঙ্কালের অবসন্ন পাওয়া যায়। কৃষ্ণকিশোর সূর্যকান্ত একে একে সবাই তো চলে গেলেন। লোকের মুখে মুখে গল্প হয়ে ঘুরবেন কিছুকাল।

॥ উনিশ ॥

সতের বছর কেটেছে তারপর। প্রথম সন্তান মেয়ে—মহিম নাম রাখতে চাচ্ছিলেন সরস্বতী। সে নামে বাতিল করে সরলাবালা শৌখিন নাম দিল দীপালী। বলে, নামে তো পয়সা খরচা নেই, তবে বাগড়া দাও কেন? সেকেলে নামে পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এগুবে না। বিয়ের মুখে নাম বদল করতে হবে। সেই ঝামেলা গোড়াতেই চুকিয়ে রাখা।

দীপালির পিঠে ছেলে—শুভব্রত। তারপর যমজ মেয়ে হল। দুটোই মরে গেছে। তাদের পরে পুণ্যব্রত—চার বছরেরটি এখন। পুণ্যব্রত হল, আর মহিমের মা সেনগিন্নিকে গঙ্গায় নিয়ে গেল তার ঠিক দুটো দিন পরে। সরলা-বালার শরীরও ভাঙল সেই থেকে—জ্বর গেঁটেবাত, লিভারের ব্যথা—উপসর্গ একটা না একটা আছেই। অনেকদিন বাদ দিয়ে এই এবারে মেয়ে হয়েছে। কিন্তু আঁতুড় থেকে বেরিয়ে সরলাবালা উঠে বসতে পারেনি আর একদিনও। ঘুসঘুসে জ্বর সর্বক্ষণ নাড়িতে। তেজপাতার মতন ফ্যাকাসে চেহারা, শরীরে একফোঁটা রক্ত নেই—উঠতে গেলে পড়ে যায়। কোলের মেয়েটা কিন্তু দিব্যি হয়েছে। ধবধবে রং—মেমদের মতো। সরলাবালা এই অবস্থায় মধ্যেও

দীপালির সঙ্গে নামকরণের কথা বলে, রূপালি দিলে কেমন হয় রে ? দীপালির বোন রূপালি—কি বলিস ?

মা শয্যাশায়ী, সংসার দেখবার দ্বিতীয় মানুষ নেই। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে তারপর থেকে দীপালি আর ইস্কুলে যায় না। আঁচলে চাবি বেঁধে গিন্নিপনা করে বেড়ায়। শুভব্রত পড়ে ভারতী ইনস্টিট্যুশনে। মাস্টারের ছেলে বলে মাইনে লাগে না। বইও কিনতে হয় না, মাংনা পাওয়া যায়। ইস্কুলের শিলমারা চিঠি নিয়ে পাবলিশারদের কাছে গেলেই হল : একটি গরিব মেধাবী ছাত্রের জন্ত একখানা করিয়া বই দিবেন। বাপ-বাপ বলে তারা দেবে, নয়তো আগামী বছর বই কাটা পড়বে লিস্ট থেকে। মেধাবী ছাত্র শুভব্রত, সেটা কিন্তু মিথ্যা নয়। ক্লাসের মধ্যে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। চেক চালাচলি করতে হয় না, বিনা তদ্বিরেই হয়ে থাকে।

কিন্তু মুশকিল হল সকলের ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে। যার নাম রূপালি। একফোঁটা মায়ের দুধ পায় না। দিন দিন সলতে হয়ে যাচ্ছে। মাস্টারদের মধ্যে পতাকীচরণ মানুষটা তুখড়। যত ছাত্র আর গার্জেন, নাড়িনক্ষত্রের খোঁজ রাখেন তিনি সকলের। দুনিয়াসুদ্ধ লোকের সঙ্গে মেলামেশা। করেনও তিনি পর-অপরের জন্ত। মহিম তাঁকে গিয়ে ধরলেন : বাচ্চাকে তো বাঁচাতে পারি নে পতাকীবাবু। ওর মা'র যা দেখছি, নিজের অসুখের যন্ত্রণার চেয়ে বাচ্চার জন্ত দুঃখটা বেশি। হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল কাল। তারপরে সারা রাত্রি আর ঘুম হল না। সত্যি, কী জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের! পড়ানো আর পড়ানো—সংসারের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখার সময় হয় না।

কাতর অনুনয়ের কণ্ঠে বললেন, ঘাঁতঘোঁত সমস্ত আপনার জানা। একটা উপায় করে দিন পতাকীবাবু। দিতেই হবে।

পতাকী হাসিমুখে নির্বিকারভাবে বললেন, কি চাই সেটা তো খুলে বলবেন—

গ্লাক্সো কিংবা ঐ জাতীয় কিছু।

ক'টা চাই ?

মহিম অবাক হয়ে বলেন, লোকে তো চৌপর দিন মাথা খুঁড়ে একটাই যোগাড় করতে পারে না।

আবার কায়দা জানলে ডজন ডজন যোগাড় হয়ে যায়। আচ্ছা, কাল বলব আপনাকে।

পরদিন পতাকী বলেন, হবে। দুটো বা তিনটে আপাতত।

কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে মহিম বললেন, ওঃ বাঁচালেন ভাই। শিশুর প্রাণদান করলেন।

পতাকী বলেন, দরকার হলে পরে আরও পাবেন। কিন্তু দামটা কিছু চড়া।

মহিম ভীতস্বরে প্রশ্ন করেন, কত? আড়াই টাকা তিন টাকার জিনিস ছ-সাত টাকায় কিনছেন নাকি কেউ কেউ। মরি-মরি করে তা-ই না হয় দেওয়া যাবে। প্রাণের বড় কিছু নয়।

পতাকীচরণ দরাজ ভাবে হাসতে লাগলেন: কার কাছে শোনেন মশায় ছ'টাকায় পাওয়া যায়, কে এনে হাতে তুলে দিচ্ছে? বাঘের দুধ হয়তো জোটানো যায়, কিন্তু এই সমস্ত ফুড কি দরকারি অষুধ-পত্তর একরত্তি বাজারে পাবেন না। যদি পান, ভেজাল মাল। কিন্তু দরদাম আমি টাকায় হিসাবে বলছি নে। টেস্ট-পরীক্ষা দিয়েছে—পাশ করিয়ে একেবারে 'সেন্ট আপ' করে দিতে হবে ছেলেটাকে।

ফিসফিস করে পতাকীচরণ ছেলের নাম বললেন। অলককুমার ঘোষ।

মহিমের চমক লাগে: আরে সর্বনাশ, সেই দামড়া ছেলেটা তো! ছেলে আর বলছেন কেন তাকে—বয়সের গাছ-পাথর নেই। ম্যাট্রিক দিতে চায়, কিন্তু বি এ পাশ করলেই মানান হত বয়সের পক্ষে।

পতাকী বলেন, সেই ম্যাট্রিকও তো দিতে দিচ্ছেন না আপনারা। টেস্টে ফেল করিয়ে আটকে রাখবেন। বয়স বেড়ে গেছে, আরও বাড়বে। আবার তা-ও বুঝুন—বাপের কালোবাজারি কারবার। সেই বাপের মাথায় হাত বুলিয়ে মাল সরিয়ে এনে দেওয়া। একফোঁটা পুচকে ছোঁড়া হলে পারত এই কাজ?

মহিম বলেন, আপনি টাকায় দেখুন পতাকীবাবু। ছ'টাকায় না হল তো আরও কিছু বাড়ানো যাবে।

পাবেনই না মোটে। হাত ঘুরিয়ে ব্যঙ্গের সুরে পতাকী বলেন, বিশ বছর মাস্টারি হতে চলল, এখনো সলজ্জ নববধূটি! ঝামেলা বেশি-কিছু নয়—আজেবাজে ইস্কুলে ফেল করে করে বয়স বেড়ে গেছে। কালাচাঁদবাবুকে টিউটর রেখে তবে এদ্দিনে এই ইস্কুলে ঢুকতে পারল। গোড়া বেঁধে সব কাজকর্ম। কালাচাঁদবাবু হিস্ট্রীর খাতা দেখছেন, এক'শর কাছাকাছি তো পাবেই। নবীন পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃত—কালাচাঁদবাবু, দেখেননি, মুগ্ধ হয়ে বসে তাঁর খবরের কাগজের ব্যাখ্যা শোনেন—সেটা এমনি নয়। পাশের নম্বর আদায় হয়ে যাবে পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে! বাংলায় তো আপনি আপনি পাশ হয়ে যায়, ফেল

কথালোই বরঞ্চ মুশকিল। বাকি আর কি রইল তবে? অঙ্ক আর ইংরেজি। অঙ্ক আপনি দেখেছেন, ইংরেজি দাশুর কাছে। নতুন সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে দাশুর পায়াভারি—কালাচাঁদবাবুর উপর রাগও আছে, ওকে টুইশানি জুটিয়ে দেননি। আরে ফাঁকিবাজ মাস্টার—ছেলেরা চায় না, কালাচাঁদবাবুর কি দোষ? সে যাই হোক, দাশুরটা আপনাকে দেখতে হবে মশায়। কালাচাঁদবাবু পড়ান, সেটা টের না পায়। টের পেলে আর হবে না। চেষ্টা করে দেখুন, না হলে কী করা যাবে! এক সাবজেক্টে ফেল—কালাচাঁদবাবুই তখন হেড মাস্টারকে গিয়ে বলবেন।

মহিম দোমনা হলেন। ওর চেয়ে ভাল ছেলেরা পড়ে থাকবে, আর তদ্বিরের জোরে ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে যাবে অলক। অন্যায়, অধর্ম।

মনের কথাটা কেমন করে বুঝে নিয়েই যেন পতাকী বললেন, আরও দশজনার গরজ আছে বেবি-ফুড সকলকে বাদ দিয়ে আপনি নিচ্ছেন—এটাও ধর্মকাজ নয়। এত খুঁতখুঁতানি বলেই আমাদের মাস্টারদের কিছু হয় না। বলি, ব্যাপার হল তো কিছু মার্ক দেওয়ার! নিজে দেবেন, আর কিছু পাইয়ে দেবেন। সত্যি কথা বলুন মহিমবাবু, দেননি কোনোদিন কারো নম্বর বাড়িয়ে? খাতিরে দিতে হয়েছে। এখানেও তাই, বাচ্চা মেয়েটাকে বাঁচানোর খাতিরে দেবেন।

…অবোধ শিশু ক্ষিদের জ্বালায় সারারাত্রি কেঁদেছে কাল, চিলেকোঠা থেকে শুনতে পেয়ে মহিম নিচে নেমে এলেন। রোগার্ত সরলাবালা বুক ছেড়ে দিয়ে কাঁদছেন। ঘুম থেকে উঠে চোখ মুছতে মুছতে দীপালিও ভেবে পায় না, কী করা উচিত। উনুন ধরিয়ে বার্লি ফুটিয়ে তাই খানিক গেলানো হল বাচ্চাটাকে…

মহিম রাজি। অলক ছেলেটা বিনয়ী, কথাবার্তা বলে খাসা। বলল, লজ্জার ব্যাপার স্যার। আপনি নেবেন, আপনার লজ্জা; আমি দেব, আমারও লজ্জা। শখের ব্যাপার তো নয়, তাহলে একাজে যেতাম না। অসুখ না হলেও পথ্যি। খালের উপর বটগাছ আছে, সন্ধ্যের পর বটতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। গায়ে আলোয়ান থাকে যেন স্যার।

খিদিরপুর বাজারের পিছন দিকে খুব নিরিবিলি জায়গা। জায়গাটা অলক ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। রাতের টুইশানি সেদিন কামাই করতে হল। পরীক্ষা হয়ে গেছে, ফল বেরোয়নি—এখন এক আধবেলা কামাই করলে তত

বেশি আপত্তি হয় না। দাঁড়িয়ে আছেন মহিম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, রাস্তা নয় বলে আলো দেয় না এদিকটা। ঝাঁকড়া বটগাছ মাথার উপরে ডালপালা মেলে আছে। অন্ধকারের মধ্যে সাঁ করে অপক চলে এল। ফিসফিস করে বলে, তিনটে হল না সাহ, আজকে দুটো নিয়ে যান। আলোয়ান জড়িয়ে ফেলুন গায়ে, আলোয়ানের নিচে ঢেকে নিন। বেরিয়ে পড়ুন দেরি করবেন না। পুলিশ অনেক সময় ঘাপটি মেরে থাকে।

কৌটো দুটো পর পর কাগজে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে এনেছে—আলোয়ানের নিচে হাতে ঝুলিয়ে নিতে অসুবিধা নেই। এদিকটায় মহিমের আসা যাওয়া খুব কম। ঘুরে এসে রাস্তায় পড়লেন। হনহন করে চলেছেন। পিছন থেকে কে ডাকছে, মহিম না? দাঁড়াও মহিম, অত ছুটছ কেন? তোমায় আমি খুঁজছি।

সাতু ঘোষ। প্রথমটা মহিম চিনতে পারেননি। সাতু ঘোষ ইদানীং দাড়ি রাখেন—পাকা দাড়ি। নৈমিষারণ্যবাসী পৌরাণিক ঋষিতপস্বীর মতন। এমন চেহারায় এক নজরে চিনবেন কি করে?

সাতু বললেন, আমি খোঁজাখুঁজি করছিলাম। তারপরে শুনি, ভারতী ইস্কুলের মাস্টার হয়েছ, প্রাইভেট পড়ানোয় খুব নাম করে ফেলেছ। ইস্কুল থেকে তোমার বাসার ঠিকানাও এনে রেখেছি। যাব যাব করছিলাম। আমার ছেলেটাকে এবার ওই ইস্কুলে ঢুকিয়েছি। জানব কি করে তুমি ওখানে—তাহলে তো কম ঝামেলায় হয়ে যেত। চালানি কারবার একটা ফেঁদেছি এই বাজারে। এস আমার সঙ্গে। কথা আছে।

বৃহৎ টিনের ঘর।—সামনের দিকে তিন-চারটা খোপ—একটায় অফিসের মতন চেয়ার-টেবিল সাজানো। সাতু ঘোষ এক চেয়ারে বসে পড়লেন। মহিমকে বলেন, মেসের সাইনবোর্ডে মাচেন্টস লিখেছিলাম মনে পড়ে? সেই গোড়ার আমলেই এত সব ভেবে রেখেছি। 'একটা একটা করে সবগুলো ফলে যাচ্ছে। ব্যাঙ্কার্স লিখেছিলাম—ব্যাঙ্কও হয়েছে একটা। কল্যাণশ্রী ব্যাঙ্ক—নাম শোননি? বোসো—বসো না হে ভাল করে। ম্যানেজার, এই মহিমকে আমিই প্রথম কলকাতায় নিয়ে আসি। আজকে গণ্যমান্য হয়েছে। এক কাপ চা দিতে বল তাড়াতাড়ি।

ম্যানেজার খুব বিচলিত। বলে, এ যে দিনে-ডাকাতি হতে চলল। এক ডজন র‍্যাকসো ঘণ্টা খানেক আগে বের করে দিয়েছি। ক্যানিঙের ক্ষুদিরাম সাহার ঘরে উঠবে—এখন মিল করতে গিয়ে দেখছি দুটো কম।

সাতু ঘোষ অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, ন্যাকামি রাখ ওই সব। এটা যাচ্ছে—ওটা যাচ্ছে—যত চোরের আড্ডাখানা হয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে যায় কোথায়। কৌটোর গায়ে পাখনা গজায়নি, উড়ে যেতে পারে না। কাউকে বেরিয়ে যেতে দেবে না, সার্চ করব সকলকে। শীতকাল বলে মজা হয়েছে—আলোয়ান গায়ে ঘোরাফেরা করে, তার নিচে মাল সরায়। কে কে ছিল ও-ঘরে ?

ক্যাশিয়ার চুণিবাবু—

তাঁকে বাদ দাও। আর কে ?

হাজারি আর কুলচন্দ্র বওয়াবয়ি করছিল। আর শুনলাম খোকাবাবু একবার এসে ঢুকেছিলেন।

সাতু ঘোষ ভ্রূকুটি করলেন : খোকাবাবু মানে তো অলক ? বাড়িতে পড়াশুনা করবে, সে কি জন্য আসতে গেল এখানে ? মানা করে দিয়েছি তো, গুদামের ওদিকটা তাকে ঢুকতে দেবে না—কী দরকার, আগে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

ম্যানেজার বলে, আমি তখন ছিলাম না। আর চুনিবাবুকে জানেন তো—খোকাবাবু ঢুকতে গেলে পথ আটকাবেন, তাঁর কি সেই তাগত আছে ?

আচ্ছা, খুঁজে দেখগে ভাল করে—

বলে ওই প্রসঙ্গ চুকিয়ে দিয়ে সাতু ঘোষ মহিমের দিকে তাকালেন : জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে কেন ? বোলো।

ছেলে পড়ানো আছে। ছুটতে হবে এখনই।

সাতু জিজ্ঞাসা করেন, এদিকে কিজন্যে এসেছিলে ?

অদৃষ্ট ভাল, মিথ্যেকথা চট করে এসে গেল মহিমের : ডায়মণ্ডহারবার রোডে এক বন্ধুকে দেখতে এসেছিলাম। অসুখ তার।

সাতু ঘোষ বলেন, ভাল হল তোমায় পেয়ে। শোন, আমার ছেলে টেস্ট দিয়েছে তোমাদের ইস্কুলে। তাকে পড়াতে হবে।

কালাচাঁদবাবু তো পড়িয়ে থাকেন।

বোলো না, বোলো না। ওরকম ফাঁকিবাজ জন্মে দেখিনি।

এটা-সেটা লেগেই আছে, কামাই-এর অন্ত নেই। ওঁকে মাস্টার রেখে এক মাসের মাইনে অগ্রিম দাদন দিয়ে তবে ভর্তি করতে পেরেছি। এখনো টেনে যাচ্ছি—টেস্ট দিয়েছে, ফাইন্যালেও যদি গিয়ে বসতে দেয়। কালাচাঁদবাবুর মাইনে আমি পড়ানোর হিসাবে ধরি নে, তদ্বিরের খরচা। তা দেখ, দুজন মাস্টার রেখে পড়াবার ক্ষমতা আছে আমার। উনি পড়ালেন না পড়ালেন গ্রাহ্য করি নে। তোমায় পড়াতে হবে তাই।

বলেন, এক ছেলে ওই আমার। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওই যে মাকলোর কথা শুনলে—কৌটো দুটো অন্য কেউ নয়, অলকই সরিয়েছে। তোমার কাছে গোপন কি—কারবারে যথেষ্ট উন্নতি করেছি, কিন্তু মনে শান্তি নেই। ছেলেটা চোর হয়ে গেল, হামেশাই জিনিসপত্র সরায়। সিগারেট ফোঁকে, সিনেমায় যায়, অসৎসঙ্গে পড়ে গেছে।

কাতর হয়ে বলতে লাগলেন, তুমি সাধুচরিত্র। ম্যানেজারকে দেখলে—আমার সঙ্গে থেকে ওই লোকটা কলকাতার উপর একখানা বাড়ি তুলেছে। তোমারই তো এসব হবার কথা। কিন্তু টাকাপয়সা হাতের ময়লা তোমার কাছে। বড় আদর্শ নিয়ে সৎ-জীবনযাপন করছ। ওতেই সুখশান্তি—বুড়ো বয়সে আজকে তা বুঝতে পারছি। ছেলে টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে, পাশ করে ভালই। কিন্তু সেটা নিয়ে তত মাথা ঘামাই নে। তোমার দৃষ্টান্তে অলক মানুষ হয়ে উঠুক, এই আমি চাই। তুমি ওর ভার নাও। কথা না পেলে কিন্তু উঠতে দেব না ভাই।

কথা দিয়ে আসতে হল। নয়তো হাত জড়িয়ে ধরতে যান (হাতে কৌটা দুটি)। সেই ভয়েই তাড়াতাড়ি কথা দিতে হয়।

টুইশানি ইদানীং আসে অনেক। শুক মুখে হাসি টেনে এনে অন্য মাস্টাররা বলেন, টুইশানি-রাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট। আগে ছিলেন সলিলবাবু, সেই সিংহাসনে এখন মহিমবাবু বসেছেন। সত্যি খুব জমে গেছে। বিশেষ করে এই সময়টা—টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে। টিউটরদের লগনসা হল এই তিনটে মাস। কত রকমের কত টুইশানি আসে, কিন্তু অলকের এই টুইশানি এসে গেল মজার অবস্থায়। সাধুত্বের প্রশংসা করেছেন সাতু ঘোষ। আর সেই সময়ে আলোয়ানের নিচে বুকের উপর মাকলোর কৌটো দুটো চেপে ধরে আছেন, বুক ধড়াস-ধড়াস করছে মহিমের। হাঁ—বলে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এসে বাঁচলেন।

একদিন দাশুর বাড়ি গেলেন অলকের ইংরেজির তদ্বিরে। ভাল ভাল খোশামুদি কথা মনে মনে তালিম দিয়ে এসেছেন। আগের মতন শুধু দাশু নয়—দাশুবাবু বলতে হবে।

এত বড় ইস্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হলে দাশুবাবু, ভগবান তোমায় বড় করেছেন। বড্ড খুশি আমরা সকলে।

ভগবান এমনি-এমনি বড় করলেন? খেয়ালখুশি মতো?

ইঙ্গিত বুঝে মহিম তাড়াতাড়ি বলেন, গুণ না থাকলে কি কেউ বড় হয়? গুণীর উপর ভগবানের দয়া। তবে দয়াটা আদায় করে নিতে হয়। তোমার তাই গুণ রয়েছে, সেই সঙ্গে উদ্যোগও রয়েছে : এই বয়সে সকলের মাথার উপরে। একটা দরবারে এলাম দাশুবাবু। আমার ছাত্রের পাশ-নম্বর করে দিতে হবে।

বড় পদে উঠে গিয়ে দাশু ন্যায়নিষ্ঠ হয়েছেন। এক কথায় কেটে দিলেন : নম্বর দেবার মালিক আমি তো নই। নম্বর সে নিজে নেবে, নম্বর আছে তার খাতায়। যেমন লিখেছে, ঠিক সেই রকম পাবে।

আরও গম্ভীর হয়ে বলেন, অন্য কথা থাকে তো বলুন। প্রবীণ শিক্ষক হয়ে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছেন, দেখে দুঃখিত হলাম। এসব কথা উপরে চলে গেলে চাকরি নিয়ে টান পড়বে।

মহিমের হঠাৎ কী রোখ চেপে গেল, উচিত জবাব না দিয়ে পারেন না। বললেন, উপর অবধি কেন যাবে দাশুভাই? তেমন সম্পর্ক আমাদের মধ্যে তো নয়। প্রথম যেবার এখানে আসি—ইস্কুলের হালচাল কিছু জানি নে, মাস্টারি মহৎ কর্ম বলে মনে করি, প্রেসিডেন্টের বাড়ি সর্বদা যাতায়াত তখন—তুমিই একটা ছাত্রের ব্যাপারে গিয়েছিলে আমার কাছে। সেসব কথা প্রেসিডেন্ট অবধি যায়নি, এখন কিজন্য তবে যাবে?

দাশুর কিছুই মনে পড়ছে না।

মহিম বলেন, ছাত্রেরনামটা বলে দিচ্ছি। মলয় চৌধুরি ফুটফুটে পদ্মফুলের মতো ছেলে। সেই ছেলে একদিন পায়খানায় খারাপ কথা লেখার জন্য ধরা পড়ে গেল।

দাশু বলেন, ও। কিন্তু নম্বর কমানোর জন্য বলেছিলাম, বাড়াতে বলিনি তো। তাতে দোষটা কি হল? একশ টাকা পাওনার জায়গায় পঞ্চাশ নিলে দোষ হয় না, পঞ্চাশের জায়গায় একশ দাবি করলেই দোষ দাঁড়ায়।

কি ভেবে দাশু উঠে দাঁড়িয়ে আলমারির মাথা থেকে খাতার বাণ্ডিল নামালেন।

কোনটা আপনার ছাত্র?

অলককুমার ঘোষ—এই যে।

ছত্রিশ পেলে পাশ, সাইত্রিশ করে দিলাম। হল তো?

ভিতরে কি আছে, দেখলে না তো?

দাশু বলেন. দেখতে হয় না। ছেলেদের নাড়ি নক্ষত্র জানা। ক্লাসে দিনের পর দিন দেখছি—এখন আবার খাতা খুলে নতুন কি দেখব? এই অলক ঘোষ.

পাবে সাত কি আট—ফেল মানে একেবারে জব্বর রকমের ফেল। বিশ্বাস না হয়, আপনার সামনে পাতায় পাতায় নম্বর দিয়ে যাচ্ছি। আটের উপরে সিকি নম্বর পায় তো বুঝতে হবে টুকে মেরেছে।

কেল্লা ফতে করে মহিম প্রসন্ন চিত্তে ফিরলেন। টুইশানিতে পারতপক্ষে তিনি না বলেন না। টাকার বড় প্রয়োজন। মায়ের শ্রাদ্ধ বেশ জাঁকিয়ে করেছিলেন। গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ শান্তি হল। মৃতের কল্যাণে ভূরিভোজন—এখানকার বাসায় মাস্টারমশায় সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন, আবার আলতাপোল গিয়ে চারখানা গাঁয়ের সমাজ ডাকলেন। মোটা দেনা হয়েছিল, টুইশানির টাকায় সমস্ত শোধ করে এনেছেন। মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, তার বিয়ের জন্ম সঞ্চয় এবারে। পাখি যেমন বাসার জন্ম খড়কুটো বয়ে আনে, মহিম তেমনি দশ বাড়ি পড়িয়ে এখান থেকে দুখানা ওখান থেকে আড়াইখানা নোট এনে এনে জমাচ্ছেন। মবলগ টাকার ব্যাপার। কন্যাদায় চুকে গেলে তার পরে আবার ছেলের দায়। শুভব্রতকে মানুষ করতে হবে। নিজের যত কষ্টই হোক, ছেলের শিক্ষা-ব্যাপারে কৃপণতা করবেন না। যতদূর পড়তে চায় পড়বে। ছেলে মানুষ হলে দুঃখ ঘুচে যাবে তাঁদের।

॥ কুড়ি ॥

ডি ডি ডি অবসর নিয়েছেন অনেকদিন। নতুন হেডমাস্টার এখন—কমবয়সি চটপটে মানুষ। পাশ করানোর ব্যাপারে মহিমের দক্ষতা তাঁরও কানে গিয়েছে। টেস্ট পরীক্ষায় ছেলে এক বিষয়ে কম নম্বর পেয়েছে—হেডমাস্টার বলে দিলেন, মহিমবাবুকে ধর, উনি যদি ভার নেন, পাশ করিয়ে দেবেন। আমার কাছে বলে যান, তবে তোমায় পাঠাতে পারি। হেডমাস্টারের কাছ থেকে এসে ছেলে মহিমকে ধরে। হাসতে হাসতে বিপুল আত্মতৃপ্তির সঙ্গে মহিম বলেন, হেডমাস্টার মশায় জানেন কিনা! তিনি তো বলবেনই। কিন্তু কতজনের ভার নেব, বল্ দিকি। মেরে ফেলবি নাকি আমায় তোরা?

আপনি বললে তবেই হেডমাস্টার পাঠাবেন। বলে দিন কবে থেকে যাবেন।

মহিম আপাতত তা-না-না-না করে ছেড়ে দিলেন। ঘুরুক দুটো-একটা দিন, দর উঠুক। নাছোড়বান্দা ছাত্র পরের দিন বাড়ি থেকে অভিভাবক সঙ্গে নিয়ে আসে। বাবা, কাকা কি দাদা।

মহিমবাবু আপনি ? নমস্কার ! চোখে না দেখেও নাম জানি খুব। ছেলে বলে, আপনি যাদের পড়ান তাদের কেউ ফেল হয় না। অফিস কামাই এসেছি, অসিতের অঙ্কটা আপনি না দেখলে কিছুতে হবে না।

মহিম বলেন, আপনারা আগে কোথায় থাকেন বলুন তো ? ভাল পড়াচ্ছি কি এই টেস্টের রেজাল্ট বেরনোর পর থেকে ? মার্চের প্রথম হপ্তায় ফাইন্যাল—এর মধ্যে কি শেখাব, আর কতই বা নম্বর পাওয়াব ?

অভিভাবক বলেন, শেখাতে হবে না মাস্টারমশায়। পাশ-টাস করে নিয়ে কপালে থাকে তো ধীরেসুস্থে পরে শিখবে। শেখার কি শেষ আছে জীবনে ? নম্বর পেলেই হল—টায়েটায়ে পাশের নম্বরটা নয়, তার কিছু উপরে।

আরে মশায়, নম্বর দেবে তো য়ুনিভার্সিটি। নম্বর কি আমার বাক্সে তোলা রয়েছে যে বের করে এনে দিলেই হল।

অভিভাবক হেসে বলেন, ছেলে যেমনধারা বলে, তাতে তো মনে হয় তাই—আপনার বাক্সের নম্বর !

কাজের কথা এবারে, মহিম গম্ভীর হলেন : কম সময়ের ভিতর কাজ দেখাতে হবে। এর আলাদা রেট—কণ্ট্রাক্টের কাজের মতন।

রেট শুনে অভিভাবকের চক্ষু কপালে ওঠে : শিক্ষক আপনারা, ছাত্র-শিক্ষা দিয়ে পুণ্যকর্ম করছেন। নিতান্ত কাটখোট্টের মতন হয়ে যাচ্ছে যে মাস্টারমশায়।

দু বছর ধরে টিউটর রেখে যা পেতেন, তিনটে মাসে তাই আদায় হয়ে যাচ্ছে। মাইনেটা দু' বছরের হিসাব ধরুন, খুব সস্তাই ঠেকবে।

সত্যিই অদ্ভুতকর্মা মহিম। অঙ্ক ইংরেজি বাংলা তিনটে বিষয়ে চৌকোস মাস্টার— বৈঁটেথাতায় লিসার মারতে চিন্তবাবুর সুবিধা। বলেন, গোলআলু—ঝাল-ঝোল-চচ্চড়িতে যেমন খুশি লাগিয়ে দেওয়া যায়, ভাবতে হয় না। মহিম ভেবে ভেবে কয়েক ধরনের অঙ্ক কষবার সংক্ষিপ্ত নিয়ম বের করেছেন—মাথা ঘামাতে হয় না, ছকে ফেলে দিলে আপনি হয়ে যায়। আর যেন একটা তৃতীয় দৃষ্টি খুলে গেছে—ফাইন্যাল পরীক্ষায় কি কি আসতে পারে দাগ দিয়ে দেন, তারই পনের আনা এসে যায়। এক-আধ বারের কথা নয়, বছর বছর এমনি হয়ে আসছে। তাতেই আরও নাম হয়ে গেল ছেলেমহলে।

লাইব্রেরি ঘরে টিফিনের সময় দাশু জিজ্ঞাসা করেন, এবারে কতগুলো গাঁথলেন মহিমবাবু ?

সামান্য—

ওজন পুরল ?

হ্যাঁ তাই বুঝি পারে মানুষ !

হুবহু সলিলবাবুর মুখের কথা। একবার মহিম চোখ বুলিয়ে নিলেন অঙ্কের মাস্টারের উপর। কতজনে একটা দুটো টুইশানিও জোটাতে পারে না, তাঁর বেলা এমন হয়েছে ঠেলে সরিয়ে কূল পাচ্ছে না।

ক'টা হল, বলুন না—

আসছে যাচ্ছে, জোয়ার-ভাঁটার খেলা—এর কি হিসাব থাকে দাশুবাবু ?

গঙ্গাপদবাবু দেহ রেখেছেন, দাশু তাঁর জায়গায় নতুন সুপারিন্টেডেন্ট। বেশি টুইশানি করলে ইস্কুলের কাজ হয় না, এই দাশুর ধারণা। বলেও থাকেন তাই। পতাকীচরণ চুপিচুপি বলেন, নিজে পায় না বলে হিংসে। অমন ফাঁকিবাজ মাস্টারকে কে ডাকবে ? খোশামুদি করে কমিটির মন ভেজানো যায়, কিন্তু ছেলের বাপ ভিজবেন ছেলে যদি কিছু শিখতে পারে তবেই।

একটা জিনিষ মহিমকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। দাশুকে বলেন, চোখ দিন-কে-দিন খারাপ হয়ে পড়ছে। কী করা যায় বল দিকি ?

দাশু এককথায় জবাব দেন : চোখ খাটাচ্ছেন যে বড্ড। বিশ্রাম নিন। টুইশানির—অর্ধেক নয়, একেবারে বারো আনা ছেঁটে ফেলুন।

পতাকীচরণ টিপ্পনী কেটে ওঠেন : চোখের খাটনি কিসে ? মহিমবাবুর পড়াতে চোখ লাগে না। সবই ওঁর মুখস্থ—চোখ বুজে বুজেই উনি পড়ান।

কথা মিথ্যে নয়। পড়িয়ে পড়িয়ে এমন হয়ে গেছে—অ্যালজাব্রা না দেখেই বলতে বলতে ক্লাসে ঢোকেন, তিনশ-ছিয়াত্তরের পাতায় সাতার নম্বরের অঙ্ক, লিখে নে। এ-কিউব প্লাস এ-স্কোয়ার বি···দীর্ঘ অঙ্কটা বলে যাচ্ছেন। বই খুলে মিলিয়ে দেখ, একটুকু হেরফের নেই।

মহিমের বাসা আগে ইস্কুলের কাছাকাছি ছিল, এখন সেই সানগরের দিকে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করেছেন। অনেকে জিজ্ঞাসা করে, অত দূরে কেন মাস্টারমশায় ? কাছাকাছিই তো বেশ ছিল। অনর্থক হয়রানি।

শুধুমাত্র ছাত্রের বাড়ি ছাড়া মহিম কথাবার্তা ইদানীং কমিয়ে দিয়েছেন। ফুসফুস যন্ত্রকে বিনামূল্যে খাটাতে যাবেন কেন ? মৃদু হেসে তিনি বলেন, হুঁ—

দুই রকমের হাঁটনা মহিমের। সব টিউটরেরই। একসময় দেখবে, গতিবেগ মোটরগাড়ি হার মেনে যাচ্ছে। ছাত্রের বাড়ি চলেছেন সেই সময়। এক বাড়ি সারা করে অন্য ছাত্রের বাড়ি যাচ্ছেন, গতিবেগ ডবল হয়ে গেছে তখন। আবার

একসময় সেই মানুষ ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়ার মতন খুটখুট খুটখুট পা ফেলে চলেছেন। সেটা নিশিরাত্রে। বুঝে নেবে, কাজকর্ম শেষ করে ঘরে ফিরছেন এবারে।

একতলার ছাতে চিলেকোঠায় মহিমের নিরিবিলি ঘর। একা শোন ওই ঘরে। ঘুম থেকে উঠে পড়েন, পুরোপুরি দিনমান নয় তখনও। পোহাতি তারা পশ্চিম আকাশে জ্বলজ্বল করছে। ওই শেষরাত্রেই স্নান করে চালের কলসি থেকে গোণা বারো-চোদ্দটি চাল মুখে ফেলে ঢকঢক করে এক গেলাস খেয়ে কাঁধে চাদর ও হাতে ছাতা তুলে নেন। দুর্গা-দুর্গা—বসে দেয়ালে টাঙানো পটের দিকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়েন এবার। যাওয়ার সময় মেয়ের নাম ধরে ডেকে যান, ওরে দীপালি, দুয়োর খোলা রইল। ওঠ এইবার তোরা। বেলা হয়েছে, উনুনে আগুন-টাগুন দে।

ডাকলেন এইমাত্র—তাকিয়েও দেখলেন না তাঁর আহ্বান কানে গেল কি না। দেখার ফুরসত কই? ঢং করে সাড়ে-চারটে বাজার আওয়াজ হল কোন বাড়ির ঘড়িতে—কে যেন সপাং করে চাবুক মারল মহিমের পিঠে। হাঁটা নয়—দৌড়চ্ছেন একরকম। এমন শক্তি শীর্ণ দীর্ঘ পা-দুটোর!

পাড়াটা তীরবেগে অতিক্রম করে মহিম তিন তিনটে চৌমাথায় এসে পড়েন দিনের প্রথম পড়ানো এইখানে—ডানদিকের দোতলা বাড়িটায়। ছাত্রের নাম প্রবোধ। আগের বছর ফেল হয়েছিল, তার পরেই মহিম-মাস্টারের খোঁজ পড়ে। মহিম বলেছিলেন গায়ে ফুঁ দিয়ে কেউ পাশ করতে পারে না বাবা। বিশেষ করে তোর মত অথা ছেলে। রাত থাকতে উঠে পড়বি। চারদিক ঠাণ্ডা থাকে তখন খুব মুখস্থ হয়। পড়েই দেখ না ক'দিন—হাতে হাতে ফল পাবি।

প্রবোধ অসহায়ভাবে বলে, ইচ্ছে তো করে মাস্টারমশায়, কিন্তু উঠতে পারি নে। ঘুম ভাঙে না কিছুতে।

তাই তো! বাড়ির লোককে বলে রাখতে পারিস, তাঁরা তুলে দেবেন।

আমার উপর দিয়ে যান তাঁরা। আমি যদি সাতটায়, বাবা ওঠেন আটটায়। মা সাড়ে ন'টায়।

মুশকিল তবে তো! একটুখানি চিন্তা করে মহিম বললেন, আচ্ছা, নিচের ঘরে—এই পড়ার ঘরে শুবি তুই। শেষরাতের দিকে উঠিস তো একবার—খিলটা তখন খুলে রেখে দিবি। আমি এসে ডেকে তুলব।

আপনি সার এই শীতের রাত্রে—শীতটা বেশি পড়ে গেল হঠাৎ আজ ক'দিন—

কি করব বাবা, উপায় নেই। ভার নিয়েছি যখন, তোর বাবার কাছে কথা দিয়েছি পাশ করিয়ে দেব।

মহিম-মাস্টারের কর্তব্যজ্ঞান দেখে প্রবোধের বাড়ির সকলে অবাক হয়ে গেছে। মাস্টার এসে পড়িয়ে যান কেউ তা জানতে পারে না। প্রবোধ তারপর থেকে গলা ফাটিয়ে পড়তে লাগে। কিন্তু শেষরাত্রি থেকে না ধরলে মহিম যে কোনরকমে সময় কুলিয়ে উঠতে পারেন না। এতগুলোর দায়িত্ব নিয়েছেন, নিদেনপক্ষে এক ঘণ্টা করে পড়াবেন তো প্রতি জায়গায়। না হল পঞ্চাশ মিনিট। মুশকিল হয়েছে, বিধাতা মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় দিনরাত্রি করেছেন —এর ভিতর থেকেও খাওয়া ও ঘুমে ঘণ্টা আষ্টেক বাজে খরচ হয়ে যায়। আবার ইস্কুলে আছে সাড়ে-দশটা থেকে চারটে।

প্রবোধকে শেষ করে মহিম পথে বেরোন, রাস্তায় তখনো গ্যাসের আলো। কালীঘাট মুখো ছুটেছেন। এবারের বাড়িটায় সুবিধা আছে—কর্তাবাবু ভোরবেলায় ট্রামে উঠে চাঁদপালঘাটে বড়-গঙ্গায় নাইতে যান। তার আগে নিজের হাতে কড়া তামাক সেজে খেয়ে নেন এক ছিলিম। শয্যাত্যাগ করে উঠে ছেলেকেও ডেকে তুলে দেন। মহিমের কড়া নাড়া শুনেই ছাত্র এসে দুয়োর খুলে দেয়।

পড়বার ঘর উপরে—দোতলার সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়, এই এক হাঙ্গামা আর কিছু না হোক, ওঠানামায় খানিকটা সময় নষ্ট তো বটে!

এখানে থেকে ছুটলেন সিংহিবাড়ি অভিমুখে। সিংহিরা নাম-করা বড়লোক, কিছু সাহেব ঘেঁষা। পৌনে-আটটা থেকে পড়াবার কথা। অল্পসল্প রোদ উঠেছে, মহিম ছাতা খুলেছেন। ছাতা সর্বক্ষণ মহিমের হাতে, ছাতা বাদ দিয়ে মহিম-মাস্টারকে ভাবা যায় না। একই ছাতা বছর কয়েক ঘুরছে তাঁর হাতে, আরও ছ-বছর ঘুরবে এমন আশা করা যায়। ছাতার কাপড়ের কালো রংটা কেবল ধূসর হয়ে গেছে, তা ছাড়া অন্য কোন খুঁত নেই। শীত-গ্রীষ্ম বসন্ত-বর্ষা সর্বঋতুতে সমান ছাতার ব্যবহার। বর্ষায় ছাতা মেলেন বৃষ্টির জন্য, অন্য সময় রোদ ঠেকাতে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে রাত্রিবেলাও ছাতা খুলে চলেন। মাথার উপরে ছাতা ঠিক খাড়া থাকে ছবিতে-দেখা পৌরাণিক রাজছত্রের মতন। খোলা ছাতা কাঁধের উপর ঠেসান দিয়ে চলা তাঁর অভ্যাস নয়। ছাতা দেখেই দূর থেকে বুঝতে পারা যায়—ছেলেরা বলে, মহিম-মাস্টার আসছেন।

সিংহিবাড়ির বুড়ো কর্তা চন্দ্রভূষণ সিংহ বারাণ্ডায় টেবিলের ধারে খবরের

কাগজ পড়েন। মহিমকে উঠতে হয় বারান্দার অন্ত প্রান্ত দিয়ে। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকান সেই সময় চন্দ্রবাবু! পৌনে-আটটায় পরে দুটো মিনিট হয়ে গেল অমনি হাঁক ছাড়বেন, শুনে যান মাস্টারমশায়, এইদিক হয়ে যাবেন। কাছে এলে দেরি হবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। দু-একথায় শেষ করে চলে যাবেন সে উপায় নেই। চন্দ্রবাবু এক সময় বড় উকিল ছিলেন—রিটায়ার করেছেন, কিন্তু জেরার অভ্যাস যায় নি। দু-মিনিট দেরির জন্ম যথোচিত কৈফিয়ৎ দিয়ে পড়ার ঘরে যেতে মিনিট দশেক লেগে যায়। অবশ্য তাড়াতাড়ি গিয়ে যে কোন লাভ আছে, তা নয়। জলি সিং পড়ে না প্রায়ই। বলে, আজকে থাক স্যার। শরীরটা বেজুত লাগছে। বসুন, চায়ের কথা বলে আসছি। চায়ের কথা বলতে জলি বেরিয়ে যায়। চা সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ে, কিন্তু জলি হয়তো আর ফিরে এল না।

অথবা ফিরে এসে বলল, মাস্টারমশায়, আপনি পড়ে যান—আমি শুনি। শুনে শুনেই শিখে ফেলব। বলে সে ইজিচেয়ারে সটান গড়িয়ে পড়ে। মহিম পড়িয়ে যাচ্ছেন, ছাত্র ওদিকে খেলার ক্যাটলগের এ-পাতা ও-পাতা উল্টাচ্ছে মাঝে মাঝে মহিমের মনে বিবেকের দংশন জ্বালা—এখন এই গোলামির বেহদ্দ, আর একদিন তিনি সাতু ঘোষের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। বড্ড রাগ হয় নিজের উপরে। আর এই ছেলেটার উপরেও বটে! থাপ্পড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মুখে এতটুকু বিরক্ত প্রকাশ করবার উপায়ও নেই। বাড়ির একমাত্র ছেলে—সকলের আদরের। মাইনে ভালই দেয়—সুতরাং যা করে চুপ করে সয়ে যেতে হবে। সিংহিবাড়িতে পড়ানো নয়—মোসাহেবি অনেকটা।

একটার পর একটা সেরে যাচ্ছেন, আর ইস্কুলের দিকে এগোচ্ছেন ক্রমশ। ছাত্রের বাড়ি হিসাব করে মহিম এমনভাবে পর পর টুইশানি সাজিয়ে নিয়েছেন। বিশেষ করে সানগরে বাসা ভাড়া করাও সেই কারণে। সিংহি-বাড়ির পরে বলরাম মিত্তির লেনে রবীনকে পড়ান। সকালবেলায় এই শেষ। মণি ঘোষের ছোট ভাই রবীন—মাস্টারির প্রথম দিন গাজেন ভেবে মহিম যাকে খাতির করেছিলেন। এম. এ. পাশ করে গেছে মণি, স্বাস্থ্য সেই আগের মতোই ফেটে পড়ছে। কিন্তু হলে কি হবে—সংসার করল না, দেশের কাজ নিয়ে মেতে আছে। মহিমকে দেখলে গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নেয়। সাতু ঘোষের অসাধু কাজ ছেড়ে দিয়ে ইস্কুল মাস্টারি নেবার কথা কার কাছে শুনেছে সে—মহিমই কোন দিন বলে থাকবেন। সেই থেকে তার

বড় সম্ভ্রম। বলে, আপনারাই তো সার আলো দেখান, বড় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বার শক্তি পাই। মণিদের বাড়ির অবস্থা ভাল। রবীনকে পড়ানোর ভার মণির জন্যেই নিতে হয়েছে।

এই এক মজার বাড়ি। খুব ভাল ছেলে রবীন—পড়াশুনোয় ভাল, ব্যায়াম-চর্চা করে, মজবুত গড়ন শরীরের, একটা মিথ্যে কথা পর্যন্ত কখনো বলে না। রবীনের মায়ের কিন্তু সন্তোষ নেই। পূর্বদিন থেকে আজকের এই অবধি রবীনের যাবতীয় অপরাধের ফিরিস্তি পাঠিয়ে দেন চাকর অথবা ছোট-মেয়েকে দিয়ে। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় কখনো বা এক টুকরো কাগজে স্বহস্তে আনুপূর্বিক লিখে পাঠান। সেই সঙ্গে মোটা বেতের লাঠিও আসে। ইঙ্গিত অতিশয় স্পষ্ট। অতএব কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম সমাধা করে ঠিক দশটার সময় মহিম উঠলেন ও-বাড়ি থেকে।

মেস সামান্য দূরে এবং ইস্কুল তার পরেই। রবীনের বাড়ি থেকে সোজা মেসে এসে ঢুকে পড়লেন। রান্নাঘরের সামনের বারাণ্ডার ফালিতে আসন পাতা আছে ব্যবস্থামতো। গেলাসে জল দেওয়া। মহিম জুতো খুলে টাঙানো দড়ির উপর কাঁধের চাদর ছুঁড়ে দিয়ে আসনে বসে পড়লেন। ভাতের থালা এসে গেছে ইতিমধ্যে—ডাল-মাছ-তরকারি সমস্ত ঠাকুর একবারে সাজিয়ে নিয়ে আসে। বারংবার এসে দেবার ফুরসত হবে না। এইবারে হাতের খাটনি মহিমের—থালার ভাত অতি দ্রুত মুখ-বিবরে পৌঁছে দেওয়া; এবং মুখের খাটনিও—দ্রুত চিবিয়ে গলাধঃকরণ করে পরের আমদানির জন্য জায়গা খালি করে ফেলা। দুই অবয়বে পাল্লা চলেছে যেন—সে এক দেখবার বস্তু। খাওয়া অন্তে জোরে একবার গলা-খাঁকারি দিয়ে হাতে-মুখে হড়হড় করে মগ দুই জল ঢেলে চাদরকাঁধে ফেলে জুতো পায়ে ঢুকিয়ে মহিম সাঁ করে বেরিয়ে যান। ওয়ার্নিং-বেল পড়ে গেছে ইস্কুলে। নাম সই করে খড়ি আর স্কেল হাতে মহিম চেঁচাতে চেঁচাতে ক্লাসে ঢুকলেন; আঠারোশের থিয়োরেম—একশ বারোর পৃষ্ঠা খুলে ফেল। লেট এ-বি-সি বি এ ট্রায়েঙ্গেল—

খড়ি দিয়ে খটাখট ত্রিভুজ এঁকে ফেললেন ব্ল্যাকবোর্ডের উপর। পড়ার ঐ ধরতা দিয়ে দিলেন—তারপরে ডেকে তুলবেন একে ওকে তাকে। এক-জনের দুটো লাইন বলা হয়েছে কি না—তাকে বসিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে তুলবেন। আগের জন যে জায়গায় ছেড়েছে—বাক্য শেষ না হয়ে থাকলে সেই মাঝের শব্দ থেকেই বলতে হবে পরের জনকে। লাইন ধরে পর পর ডেকে তুলছেন তা নয়—এখান থেকে একটি, ওখান থেকে একটি।

ক্লাসের সব ছেলেকে তটস্থ থাকতে হয় সেইজন্য—পড়া টনটনে মুখস্থ করে কান পেতে থাকতে হয়। কী জানি, তারই বা ডাক পড়ে এবারে!

ব্ল্যাকবোর্ডের ধারে দাঁড়িয়ে মহিম অবিরত পড়া ধরছেন: স্টাণ্ড আপ—ইউ, ইউ সেকেণ্ড বয় অব দ্য সেকেণ্ড বেঞ্চ। হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। বলে যাও তারপর থেকে। ভেরি গুড, সিট ডাউন। নেক্সট—থার্ড বয় অব লাস্ট বেঞ্চ। কি হে, শুনতে পাচ্ছ না, লাস্ট বেঞ্চির ওই মোটা ছেলেটা—

সে ছাত্র ওঠে না কিছুতে। এতবার বলছেন, ঘাড় তোলে না। তার মানে, কিছু করে আসেনি বাড়ি থেকে। ফাঁকিবাজ ছেলে, ন্যাকা সেজে আছে। এমন ঢের ঢের দেখা আছে—

মহিম গর্জন করে ওঠেন: স্টাণ্ড আপ আই সে। তবু সে বধির হয়ে আছে। আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, স্টাণ্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ—বেঞ্চির উপর দাঁড়াও দুর্বিনীত ছোকরা।

ক্লাসের সমস্ত ছেলে মরে আছে যেন। টু শব্দটি নেই। স্কেল নিয়ে মহিম ছুটে আসেন ক্লাসের শেষ প্রান্তের সর্বশেষ বেঞ্চিতে। দেবেন স্কেলের একটা-দুটো ঘা কষিয়ে—হাল আমলের আইন-টাইন মানবেন না। কান ধরে তারপর তুলে দেবেন বেঞ্চির উপর।

একেবারে কাছে গিয়ে উঁচিয়ে-তোলা স্কেল নামিয়ে নিলেন: আপনি সার?

হেডমাস্টারই ঘাড় নিচু করে বসে আছেন ছেলেদের মধ্যে। কোন কথা না বলে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এ-ও এক কায়দা মাস্টারদের কাজকর্ম দেখবার। ছেলে হয়ে বসে থাকা। তবে মহিমের মতো ক্ষীণদৃষ্টি না হলে আগে থাকতে দেখে ফেলে। বাইরে এসে দাশুকে হেডমাস্টার বলেন, আপনি যা বললেন ঠিক অতখানি নয়। মহিমবাবু ক্লাস ফাঁকি দেন না। তবে পড়ানো একেবারে পুরানো ধাঁচের। ছেলেদের মুখস্থ করান, বোঝাতে কই দেখলাম না।

দাশু টিপ্পনী কাটেন: ক্লাসেই সব বুঝে গেল তো বাড়িতে ডাকবে কেন? বিদ্যে ছাড়েন ওঁরা টুইশানির সময়।

হেডমাস্টার ঘাড় নেড়ে বলেন, মতলব করে কিছু করেন, সেটা মনে হল না। তবে চোখের দৃষ্টি বড় খারাপ। কাছে গিয়েও ঠিক চিনে উঠতে পারেন না।

বলতে বলতে হেসে ফেললেন: আমার সত্যি ভয় হয়েছিল দাশুবাবু। স্কেলের এক ঘা মেরেই বসেন বা। মোটের উপর আপনার কথাই মানি আমি।

নতুন রুটিন উঁচু ক্লাস নেওয়া চলবে না। চোখের এই অবস্থায় কষ্ট হবে ওঁর। চিত্তবাবুকে তাই বলে দেব।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে মহিম তেতলায় যাচ্ছেন। থার্ড ক্লাস ই-সেকসন এবার। আরও ক-জন উঠেছেন তেতলায়। গগনবিহারী বলেন, কাল ছাব্বিশে জানুয়ারি—স্বাধীনতা-দিবস। স্ট্রাইক হবে নাকি ইস্কুলে। আপনি কিছু শুনেছেন মহিমবাবু?

পাশ থেকে জগদীশ্বর বলে ওঠেন, ফুলচন্দন পড়ুক মশায় আপনার মুখে। ছুটিটা নেই—নিরন্থু ক্লাস চলল সেই মাচ অবধি। এইসব আছে বলে তবু বাঁচোয়া।

মহিম চিন্তিত ভাবে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, চোখ নিয়ে তো মুশকিল হল গগনবিহারীবাবু। বড্ড খারাপ হয়ে পড়ছে। কাছেও এখন ঝাপসা দেখি। বিপদ ঘটাল দেখছি।

গগনবিহারী বলেন, ছানি পড়েছে বোধ হয়। কাটিয়ে ফেলুন, ঠিক হয়ে যাবে।

জগদীশ্বর বলেন, শীতকাল, এই তো হল কাটাবার সময়। হাসপাতালে চলে যান। সেকেণ্ড-বি'র সুশীল সরকারের বাপ হলেন সার্জন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন গিয়ে।

মহিম বলেন, ওরে বাবা, রক্ষে রাখবে তাহলে। এই সময় হাসপাতালে গিয়ে উঠলে ছেলেরা আর তাদের বাপ-দাদারা তেড়ে গিয়ে পড়বে না?

হেসে একটু রসিকতা করেন: মরে গেলে সাবিত্রীর মতন যমরাজের পিছন পিছন ধাওয়া করবে। বলবে, ফাইন্যাল এগজামিনটা কাটিয়ে দিয়ে তবে যান।

থার্ড ই ক্লাসের সামনে এসেছেন। জগদীশ্বর মহিমের হাত এঁটে ধরলেন: দাঁড়ান না মশায়। কী হয়েছে।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মহিম ব্যস্ত হয়ে বললেন, উঁহু, তিন মিনিট হয়ে গেছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঢুকে পড়লেন ক্লাসে।

জগদীশ্বর বিরক্ত হয়ে বলেন, ক্লাস যেন আমাদের নেই! ক্লাস আছে বলেই ঘোড়দৌড় করতে হবে? বিত্তে-দান সেই তো শেষরাত্তির থেকে চলছে, ঘেন্না ধরে না মানুষটার!

জগদীশ্বর আর গগনবিহারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। কালকের স্ট্রাইকের প্রসঙ্গ। প্রাচী শিক্ষালয় তো ছুটি দিয়ে দিচ্ছে শুনলাম। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-ডে সোজাসুজি বলতে পারেন না—ভাইস-প্রেসিডেণ্টের খুড়ো না কে মরছে,

সেই ছুতো দিয়ে মোর্নিং-ডে। আমাদের এতজনের খুঁজলে কি অন্য-ছুতো একটা পাওয়া যেত না? ইস্কুল খুলে রেখে নিরর্থক ঝামেলায় সৃষ্টি।

গগনবিহারী বলেন, খুলে কি ইচ্ছে করে রাখে! ছেলেরা ছুটি চায়, আমরাও দিতে চাই। গোল বাধায় শুধু হতভাগা গার্জেনগুলো। যত বেটা ঘরের খাঁ ইস্কুলে ছেলে দিয়েছে। স্বাধীনতা-দিবস বলে ছুটি দিলে কলেজ কেটে চৌচির হবে না?

জগদীশ্বর বলেন, দেখুন তাই। ত্রিদস্ দেয়ার এ ম্যান হুজ সোল সো ডেড—কিন্তু বলে দিচ্ছি মশায়, ইস্কুল কাল কিছুতেই হবে না। মাঝ থেকে সকাল সকাল খেয়ে এসে ছেলেগুলো পার্কে ঢুকে গুলি খেলবে।

গগনবিহারী বলেন, আর কতক টালিগঞ্জে সিনেমা স্টুডিও-য় গিয়ে দরজায় ভিড় করে স্যুটিং দেখবার জন্যে। কত উন্নতি যে হয়েছে!

দাশু হঠাৎ হনহন করে তেতলায় চলে এসেছেন। পিছনে জমাদার। উভয়ে সবে পড়ছিলেন, দাশু তার আগে গেলেন!

আরে মশায় জগদীশ্বরবাবু, ফিফথ ক্লাস ছিল আপনার আগের ঘণ্টায়। অত আগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়লেন—

জগদীশ্বর আকাশ থেকে পড়েন: কে বলল? এইতো—এইমাত্র এসেছি। আঁ্যা, কি বলেন গগনবিহারীবাবু?

দাশু বলেন, পাশের ক্লাসে পড়ানো যাচ্ছিল না গণ্ডগোলের চোটে।

বনোয়ারি বলেছে? কোটনার কথায় কান দিও না দাশুবাবু। নিজে ক্লাসের মধ্যে থাকে, তখনই তো হাট বসে যায়। আমরা তার জন্যে পড়াতে পারিনে। কি বলেন গগনবিহারীবাবু, আঁ্যা?

এ পিরিয়ডেরও পাঁচ-সাত মিনিট হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনারা গল্প করছেন!

বলে দাশু আর দাঁড়ান না। কোথায় ওদিকে একটা ছেলে বমি করেছে। বমি পরিষ্কার করতে হবে, ছেলেটাকে লাইব্রেরি-ঘরের টেবিলে নিয়ে শুইয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ। দৃষ্টির আড়াল হলেই জগদীশ্বর ফেটে পড়লেন। গগনবিহারীকে বলেন, ছুটছেন কেন মশায়, অত ভয় কিসের? হাতে মাথা কাটবে নাকি? ফিফথ ক্লাস আগে ছেড়ে থাকি তো থার্ড ক্লাসে এই পরে যাচ্ছি। চুকেবুকে গেল। মুখে এসে গিয়েছিল, তা যেন চেপে দিলাম। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়ে নিজে তো একটা ক্লাসেও যায় না। কাজ হচ্ছে কানভাঙানি আর মাস্টারদের পিছনে লাগা।

চারটের শেষ ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে মহিম আবার টুইশানিতে চলেছেন।

জগদীশ্বর পিছন থেকে ডাকেন, ও মহিমবাবু, নোটিশ দেখলেন? প্রাচী শিক্ষালয় অবধি ছুটি দিয়ে দিল, আমাদের উল্টো। একঘণ্টা আগে সাড়ে ন'টার সময় কাল হাজিরা।

ততক্ষণে মহিম অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ঘাড় নেড়ে হুঁ—বলে দিলেন। বাক্যটুকু শোনা গেল না, ঘাড় নাড়াটা দেখা গেল শুধু।

দৌড়চ্ছেন যে মশায় কে তাড়া করল? পতাকীচরণ হি-হি করে হাসছেন। বললেন, না দেখেশুনে পার হতে গিয়ে একটা লোক সেদিন চাপা পড়ল মোড়ের মাথায়। আপনার তো আবার চোখ খারাপ।

এবারও ঘাড় নেড়ে মহিম বললেন, হুঁ—

কথা বলার ফুরসত নেই। চাপা পড়লেও দেখেশুনে ধীরেসুস্থে রাস্তা পার হবার সময় হবে না। পার হয়ে গিয়েই গোয়ালপাড়া লেন বেরিয়েছে বড়রাস্তা থেকে। একটা হিন্দুস্থানি খাবারের দোকান সেখানে। কচুরি ভাজছে দেখা যাবে। মহিম-মাস্টারকে চেনে তারা। রাস্তা পার হচ্ছেন দেখতে পেয়েই শালপাতার ঠোঙায় খানিকটা আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট ও তিনখানা কচুরি দিয়ে এগিয়ে ধরবে। ঠোঙা হাতে নিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে মহিম ছুটেছেন গলি ধরে। ছুটছেন আর কচুরি কামড়ে নিচ্ছেন। গলি শেষ হয়ে হরি চাটুজ্জে স্ট্রিট। খাওয়া শেষ হয়ে যাবে সেই সময়—ঘড়ি ধরে যেন হিসাব করা। সেই মোড়ের উপর কল আছে। ঠোঙা ফেলে দিয়ে কল টিপে ঢকঢক করে জল খেয়ে নিলেন মহিম। তটো বাড়ি ছাড়িয়ে বারান্দাওয়ালা বাড়ি একটা। ছাত্রটি বাইরের ঘরে বই খুলে বসে আছে। আগে থেকে দাগ দিয়ে রেখেছে কোনটা বুঝে নিতে হবে মাস্টারের কাছ থেকে। সময়ের অপব্যয় নেই। সত্যি ভাল ছেলে, নইলে বিকেলবেলা না বেরিয়ে খেলাধুলো না করে বই খুলে বসে মাস্টারের অপেক্ষায় থাকে।

এর পরে একটি মেয়ে—স্বর্ণলতা। বাড়িমুখো মুখ ফিরিয়েছেন এবার। আর যত টুইশানি শেষ করতে করতে বাড়ির দিকে এগোবেন। স্বর্ণলতাকে পড়ানোর মধ্যেই রাস্তায় ওদিকে গ্যাস জ্বেলে দিয়ে গেছে। যাবার সময় মেয়েটা এককাপ চা এনে দেয়। গরম চা খেয়ে তাজা ভাবটা ফিরে আসে। বেশ খানিকটা গিয়ে এইবারে সাতু ঘোষের বাড়ি। অলক পড়বে। ভোরবেলাকার প্রথম সেই গতিবেগ ফিরে এসেছে আবার চায়ের গুণে।

রাত্রি সাড়ে দশটা বাজে। শেষ ছাত্রের বাড়ি সশব্দে বই বন্ধ করে মহিম উঠে

পড়েন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আজকে সেটা হল না। ত্যাঁদড় ছেলে জ্যামিতির তিনটে একস্ট্রা বের করে বসল—বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে। এমন ঢের ঢের দেখা আছে। কাল হবে বলে চাপা দিয়ে আসতে হয় এমনি ক্ষেত্রে। অন্য সময় করেনও তাই। কিন্তু ছাত্রের বাবা বসে আছেন এই ঘরে—এত রাত্রি অবধি অফিসের কাগজপত্র লিখছেন। অতএব দরদ দেখিয়ে বসে পড়তে হল আবার। এগারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিল। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। পথ অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু মহিম অন্যদিন ট্রামে ফিরে যান এই পথটুকু।

পা দুটো যেন অসাড়—বেতো ঘোড়ার মতন কিছুতে এগুতে চায় না। ঘোড়ার পিঠে যেমন চাবুক মারে, কাঁধের চাদর পাকিয়ে দড়ির মতো করে দুই ঠ্যাঙের উপর দেবেন নাকি ঘা কতক? থপথপ করে যাচ্ছেন। পথ বেশি-বেশি লাগছে। রাত্রিবেলা কোন কুহকমন্ত্রে পথ যেন মহিম-মাস্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লম্বা হয়ে উঠছে।

বায়োস্কোপ ভেঙে লোকজন বেরিয়ে আসে। হাস্যমুখ এতগুলো নরনারী —কোন এক আলাদা দুনিয়া যেন।

জনতার মধ্যে দাশুকে দেখে চমক লাগে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে এই জায়গায়! একা নয়, পাশে মেয়েলোক একটি—দাশুর বউ। নিশিরাত্রে বউ নিয়ে টকি-বায়োস্কোপ দেখতে এসেছে।

মহিম ডাকছেন, দাশুবাবু—

কলকাতায় প্রথম যখন বাসা করেন, সন্ন্যাসীবালাকে নিয়ে মহিম এসেছিলেন একদিন। কিন্তু মাস্টার মানুষের ছেলে পড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার জো আছে। বেইজ্জতি হতে হয়। তারপরে আর কখনো টকি দেখেননি।

এই যে দাশুবাবু, এদিকে—এদিকে—

দাশু আগেই দেখতে পেয়েছেন, না দেখার ভান করে সরে পড়ার তালে ছিলেন। রাত্রি অনেক। বউ দাঁড় করিয়ে রেখে ভ্যানর-ভ্যানর করবার সময় এখন নয়। কিন্তু টুইশানি ফেরত বাড়ি চলেছেন মহিম—দুটো কথাবার্তা না বলে কি অমনি ছাড়বেন? সাড়া না পাওয়া অবধি ডাকাডাকি চলবে।

বায়োস্কোপ দেখা হল বুঝি? বিজ্ঞানের কী অসাধ্য-সাধন! তোমার বউদিদিকে নিয়ে আমি একবার এসেছিলাম। কী পালা ভাল, নাম মনে পড়ছে না। ছবিতে গড়বড় করে কথা বলতে লাগল। দশমহাবিদ্যা—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী ফসফস করে একের পর এক আবির্ভূত হচ্ছেন। যত বুড়োবুড়ি গদগদ হয়ে মা-মা করছে। কিন্তু ফচিনষ্টি আছেও তো

আবার! অন্ধকার করে দিয়েছে, লিটি যাচ্ছে আমার পিছনে। অনবরত কথাবার্তা বলছে। খানিক পরে আলো জললে দেখি আমাদের ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাস সি-সেকশনের ক্ষুদ্রটা ছেলে। বলে, নমস্কার স্যার! লজ্জায় আমি মুখ তুলে তাকাতে পারি নে! তোমার বউদিদি এখনো বলে, আর একদিন দেখে আসি চল না। রক্ষে কর, একদিনে যথেষ্ট হয়েছে, আর কাজ নেই।

দাশু বলেন, রাত্রের শো-তে ছেলেপুলে থাকে না। অছাড়া আমি যখন গিয়ে বসেছি, হলের মধ্যে টুঁশব্দ করবার তাগত আমার ইস্কুলের কারো হবে না।

বউ একটু সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে চেয়ে দাশু বলেন, এই যাচ্ছি। চল, রিকশাই করা যাক একখানা।

চলে যাবার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়েও ছাড়বেন কি মহিম। বললেন, কী নোটিশ বের করেছ আজ তোমরা, আমি কিছু দেখিনি।

এক ঘণ্টা আগে কাল হাজিরা। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স-ডে'র ঝামেলা। বাইরের লোক আসবার আগে গেট চেপে থেকে ছেলে ঢোকাতে হবে আমাদের।

বলে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দাশু বলে উঠলেন: নোটিশ দেখবেন কেন! ইস্কুলের কোন-কিছু দেখেন কি চোখ তাকিয়ে? মন উড়ু উড়ু—ঘণ্টা বাজতে না বাজতে ছুটতে শুরু করে দেন।

রাগ না করে মহিম কাতর হয়ে বললেন, যা বলেছ দাশুবাবু। আর পারছিনে, সত্যি কথা বলছি। বি. এ. পাশ করলাম ভালভাবে, অঙ্কে অনার্স পেলাম। ইস্কুল-কলেজে ছুটোছুটি দৌড়ঝাঁপ করিনি কোনদিন—খালি পড়েছি। এখন দেখছি, অনার্সের জন্য মরণ পণ না করে টু-টোয়েন্টি আর ফোর-করটি রেস ছুটো রপ্ত করে রাখলে কাজ দিত। যত পড়াই, তার তেদুনা দৌড়ই। ছেড়ে দেব, বুঝলে ভায়া, ছ্যা-ছ্যা—শিক্ষিত লোকের কাজ নাকি এই!

রিকশা একটা যাচ্ছিল অদূরে। দাশু তাড়াতাড়ি ডাকলেন। বউকে বলেন, উঠে পড়, রাত হয়ে গেছে। বউকে তুলে নিজে উঠে পাশে বসলেন। পায়ে হেঁটে যেতেন বাড়ি অবধি। কিন্তু ওঁর খপ্পর থেকে বেরবার জন্য রিকশা নিতে হল। গচ্চা গেল আনা তিনেক।

বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল। দীপালি জেগে বসে আছে। আহা, কী কষ্ট এইটুকু মেয়ের! ভিতরে গিয়ে মহিম দেখলেন, শুভব্রতও আছে দিদির সঙ্গে। রাত বড্ড হয়ে গেছে, তারা এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে বসেছিল।

দীপালি কেঁদে পড়ে: এই খানিক আগে কী কাণ্ড মাকে নিয়ে! পুশ্মকে

খাইয়ে দিয়ে বামুনদিদি চলে গেলেন। ডাক্তারের পরামর্শমতো বরফজলে ভাতলাল আমরা দু-জনে খেতে বসেছি। হুস করে এক আওয়াজ। ছুটে এলাম দেখি, মা মেঝের পড়ে গেছে। কথা বলতে পারছে না—চোখ ঘুরিয়ে কেমন করে তাকায়, আর গোঁ-গোঁ করে। তক্ষো কাঁদতে কাঁদতে গোবিন্দ ডাক্তারবাবুর বাড়ি ছুটল। তিনি তাশিস বাড়ি ছিলেন এসে ওষুধ-টষুধ দিলেন। সকালবেলা দেখা করতে বলে গেছেন ডাক্তারবাবু।

মহিম ব্যস্ত হয়ে বললেন, এখন আছে কেমন সে? জেগে না ঘুমিয়ে? তাই তো, ছেলেমানুষ তোদের জিম্মের রেখে যাওয়া—আমারও তেমনি মরণ-বাঁচন এই তিনটে মাস, নিঃশ্বাস ফেলার ফাঁক দেয় না। বেহালায় গিয়ে তোদের দিদিমাকে নিয়ে আসব, তা এমনি হয়েছে—

বকতে বকতে তাড়াতাড়ি জুতো-জামা খুলছেন। ঘরের মধ্যে বড় তক্তা-পোশের মাঝখানটায় সরলাবালা—একপাশে বাচ্চা মেয়েটা, অন্য পাশে পুণ্যব্রত। পুণ্যও দেখা যায় চোখ পিটপিট করছে, ঘুমোয়নি। কিংবা ঘুমিয়েছিল, জেগেছে শব্দ-সাড়া পেয়ে। মায়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেছে—মুখে চোখে এখনও আতঙ্কের ভাব।

মহিম বলেন, শরীর খারাপ করল আজ?

সরলাবালা ম্লান হাসি হাসল: ওদের যেমন কথা! আজকে বরঞ্চ ভাল অন্য দিনের চেয়ে। আমিই একটা অন্যায় করে বসলাম। মেয়েটা মুখে রক্ত তুলে খাটে, খেতে বসেছে ওরা—বলি, ভাল যখন আছি, একটু জল ফুটিয়ে রূপালির দুধটা হাতে হাতে বানিয়ে দিই গে। যেই মাত্র ওঠা, মাথার ভিতর চিড়িক দিয়ে উঠল। ডাক্তার-টাক্তার এনে খুব হৈ-চৈ করেছে ওরা। ছেলেমানুষ তো!

গায়ে হাত দিয়ে মহিম বললেন, গা পুড়ে যাচ্ছে তোমার।

ও কিছু নয়। বাড়িতেলা মাথায় জল ঢালাঢালি করেছে। দুর্বল শরীর তো তাই একটু গরম আছে।

মেয়ে একেবারে উজিয়ে দিয়ে পুণ্যব্রতর দিকে চেয়ে সকৌতুকে বলে, কে বল্ দিকি পুণ্য?

মহিম বললেন, কী যে বল! আমায় যেন চেনে না!

চিনবে কি করে? দেখতে পায় কখন বল। ভোর না হতে বেরিয়ে যাও, তখন পড়ে পড়ে ঘুমোয়। রাত্তিরবেলা ফেরো, তখনও ঘুমোয়। একটা দিন রবিবার—পোড়া টুইশানির সেদিনও ছাড়ান নেই। বাপে ছেলেয় দেখা হবে কেমন করে?

দুদিক সামলে কী করি, তবু তো পাথ পাওয়াতে পারি নে। কত টুইশানি করার চারদিন করে। সোম থেকে শনির মধ্যে তিনদিন সেরে দিই। বাকিটি একদিন রবিবারে। অনেক টাকার দরকার—মেয়ের বিয়ে দেবার টাকা, ছেলে মানুষ করবার টাকা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা না হওয়া অবধি এই রকম, তারপরে খানিকটা ফাঁকা হয়ে যাবে।

বলতে বলতে একটু দেমাকও এসে যায় কথার ভিতরে ; ইস্কুলে ক্লাস পড়াবার রুটিন করে। আমার টুইশানির জন্যে রুটিন করতে হয় তেমনি। অথচ দেখগে, একটা টুইশানির জন্য কত মাস্টার দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তবু পায় না।

দীপালি আর শুভব্রতের দিকে নজর পড়ে মহিম তাড়া দিয়ে উঠলেন : তোরা হাঁ করে কেন দাঁড়িয়ে ? শুয়ে পড়গে যা। রাত জেগে তোরাও একখানা করে বাধা, কাজকর্ম ছেড়ে হাত-পা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বাড়ি বসে থাকি আমি তখন।

সরলাবালা বলে, দেখ দীপালি একলা আর কত পারে ! ঠাকুরঝিকে কদ্দিন থেকে আনবার কথা হচ্ছে—

চিঠি লেখা আছে তারক দা'কে। শুধু যেতে পারছি নে। দেখছ তো অবস্থা ! তুমি এই পড়ে আছে, এক দণ্ড একটু কাছে বসতে পারি নে। দেখি, কাল শুনেছি স্ট্রাইক হবে। ফাঁকতালে যদি ছুটি পাওয়া যায়, কালই দিদিকে নিয়ে আসব।

মহিমের ডান হাতখানা দু-হাতের মুঠিতে ধরে আছে সরলাবালা। চোখের কোণে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে। আঁচলে জল মুছে সরলা বলে, দেখ, একটা কথা বলছি তোমায়। আর বলতে পারি না পারি—

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি সামলে নেয় : প্রায় তো সেরে উঠেছি। সেরে গিয়ে তখন মনে থাকে না থাকে—সেইজন্যে বলে রাখি। আমার শুভো আর পুণ্য কক্ষনো যেন মাস্টার না হয়।

মহিম উত্তেজিত হয়ে বলেন, ওরা বলে কেন, কেউ কক্ষনো ইস্কুল-মাস্টার না হয় যেন। অতি বড় শত্রুর জন্যেও ওই কামনা করি নে। ছ্যা-ছ্যা—একটা জীবন নাকি !

বলতে বলতে অন্য কথা এসে পড়ে : সেরেসুরে ওঠ, টকি-বায়োস্কোপে নিয়ে যাব। সেই যে গিয়েছিলে মনে নেই—কালী-তারা-ভুবনেশ্বরীরা সব আসতে লাগলেন ! ম্যাট্রিক পরীক্ষা চুকে-বুকে যাক—রাখি তো সন্ধ্যের দিকে মাত্তর একটা টুইশানি রাখব। সেইটে সেরে টকিতে গিয়ে বসব দুজনে। বেশি রাত্রে ছাত্রের ঝামেলা থাকে না। মাস্টারদের কদর তখন।

টং-টং করে কাদের ঘড়িরত বারোটা বাজে। কাজ বাকি আছে মহিমের। ঢাকা নামিয়ে ভাত ক'টা গবগব করে গিলে ছাদের উপর সংকীর্ণ চিলেকোঠায় গিয়ে উঠলেন। আলো জেলে আরও অনেকক্ষণের কাজ—আলো চোখে পড়ে অন্যের ঘুমের অসুবিধা হয়, সেজন্য এই ঘরে সরু একখানা তোষকের উপর বসে কাজ করেন। কাজের শেষে গড়িয়ে পড়েন সেখানে। কাজ এখন সারা দিনের জমাখরচ লেখা। দীপালি মোটামুটি টুকে রেখেছে—হিসাবের পাই-পয়সা অবধি বড় খাতায় লিখে রাখবেন এবারে। দিনের পর দিন বছরের পর বছর লিখে যাচ্ছেন এমনি। মুক্তার মতো পরিচ্ছন্ন গোটা গোটা অক্ষর। সমস্ত জমাখরচের খাতা সযত্নে রাখা আছে শিয়রে কাঠের বাক্সের ভিতর। অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের জন্য মহিম যেন নির্ভুল কৈফিয়ৎ রচনা করে যাচ্ছেন। জীবনের একটা মুহূর্তও অনর্থক নষ্ট করেননি, একটা পয়সাও অন্যায় পথের উপার্জন নয়, এক পাই-পয়সারও অপব্যয় হয়নি কোনদিন—তার এই অকাট্য দলিল।

জমাখরচ হয়ে গেলেও চিলেকোঠার আলো জলে কোন কোন দিন। পড়াশুনো করেন—নেসফিল্ডের গ্রামার, ভূগোল, মেকানিক্স। টুইশানির জন্য দেখে নিতে হয় মাঝে মাঝে। ভাল দেখতে পান না, বই তাই একেবারে চোখের উপরে নিয়ে পড়েন।

॥ একুশ ॥

হুকুম হল, সাড়ে ন'টায় ইস্কুলের হাজিরা—সময়ের ঠিক এক ঘণ্টা আগে। কর্তারা ভাবলেন, ঘণ্টাগুলো মাস্টারদের নিজের এক্তিয়ারে—ইচ্ছে করলেই আগুপিছু করা যায়। একটি ঘণ্টা হেরফেরের জন্য বিশ গণ্ডা কৈফিয়ৎ দিতে হবে—কি হয়েছিল মাস্টারমশায়? ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসবে ছেলে—এখন একটা দিন যে এক মাসের সমান। তা সে যা-ই হোক, মূল ইস্কুল আগে বজায় রাখতে হবে, টুইশানির ডালপালা পরে। টুইশানি কত আসছে যাচ্ছে, ইস্কুল অনড়। ইস্কুলের কাজটা আছে বলেই টুইশানি। নবীন ঘোষকে পড়ানো এবং মেসের আহারটা বাদ দিয়ে মহিম ইস্কুলে ছুটলেন।

তবু একটু দেরি হয়ে গেছে। লোকারণ্য রাস্তায়। ভিড় ঠেলে এগুনো যায় না। যাচ্ছেন কোন রকমে। গেটের কাছাকাছি হয়েছেন—নানান দিক থেকে বলছে, ঢুকবেন না সার—ঢুকবেন না সার। কিন্তু যেতেই হবে। না

গেলে বলবে, মহিম-মাস্টার তলে তলে স্বদেশি—স্ট্রাইক করে আজ ইস্কুলে আসে নি। স্বদেশি হওয়া একটা খারাপ গালাগালি চাকরির ক্ষেত্রে। কনুই ঠেলে এগুচ্ছেন মহিম। ছেলেরা গেট জুড়ে শুয়ে পড়েছে। বলে, আমাদের মাড়িয়ে ঢুকতে হবে স্যার, এমনি যেতে দেব না। একটি ওদের মধ্যে চেনা—ধ্রুব। এখান থেকে পাশ করে গিয়ে কলেজে পড়ছে। বড় অফিসারের ছেলে, বাপের হাজার টাকার উপর মাইনে।

হকচকিয়ে গেলেন মহিম। অনেক মাস্টার ঢুকে গেছেন ইতিমধ্যে, ভিতর উঠানে তাঁদের দেখা যাচ্ছে। খোলা গেটের এদিকে আর ওদিকে মানুষে মানুষে পাঁচিল গেথে আছে যেন। বাইরে ভলন্টিয়াররা আটকে আছে—ছাত্র-মাস্টার কাউকে ঢুকতে দেবে না। ভিতর দিকে মাস্টার আর দারোয়ান-বেয়ারাদের নিয়ে দাশু রয়েছেন—ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া বাইরের কেউ কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়তে না পারে। লড়াইয়ে দু-পক্ষের সৈন্য যেন মুখোমুখি। হেডমাস্টার আর চিত্তবাবু দোতলার জানলায়—সেনাপতিরা রণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করেন বোধ করি এমনি উঁচুতে দাঁড়িয়ে। এমনি দূরবর্তী থেকে।

এ বড় ফ্যাসাদ হল তো! মহিমের মন খারাপ। সেই এক বাড়ি পড়ানো বাদ গেল, অথচ কাজের কাজ কিছু হয় না। হেডমাস্টার নজর রাখছেন কে কে ইস্কুলে এসেছে, কারা এল না। গোপন খাতায় হয়তো বা টুকে রাখছেন। আরও ঘণ্টাখানেক আগে এলে ঢোকা যেত। কিন্তু টুইশানি কামাই হত আর এক জায়গায়। কামাই করলেই হয় না, আবার তা পুষিয়ে দিতে হবে। সময় কোথা? রবিবারের দিনটাও তো পনের আনা ভরতি হয়ে আছে?

হেডমাস্টার উপর থেকে হাঁক দিয়ে উঠলেন: বেয়ারা, ঘণ্টা দিয়ে দাও। সাড়ে দশটা বাজল। মাস্টারমশায়রা যে যার ক্লাসে চলে যান এইবারে।

মহিম ছটফট করছেন। ব্যূহভেদ করে কোন কৌশলে ঢুকে পড়েন? ভূদেব কোন দিক দিয়ে এসে হাত ধরলেন। চাপা গলায় বলেন, চলে আসুন না মশায়। হাওয়ার গতিক বুঝতে পারেন না? ঢুকতে পারি নি বলে কি ফাঁসিতে লটকাবে?

মহিম আর ভূদেব শুধু নন, আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন কিছু দূরে নিরাপদ ব্যবধানে। ইস্কুলের ছেলে একদল ভিড় করে আছে। ভূদেব বলেন, ঢোকা গেল না, কিন্তু বাইরে থেকেও তো কাজ করা যায়। দোতলা থেকে ওই দেখুন দু-জোড়া চক্ষু তাক করে রয়েছে। কাজ দেখান মশায়রা, কাজ দেখান—

বলে সেই উপরমুখো মুখ করে ভূদেব চেঁচিয়ে উঠলেন : ভিড় কোরো না ছেলেরা। পুলিশ এলে টিয়ার-গ্যাস ছাড়বে এখনই। ভিতরে ঢুকে যাও। ঘণ্টা পড়ে গেল, ক্লাস আরম্ভ এবারে, যাও, যাও - ঢুকে পড়।

দু-একটা ছেলেকে ধাক্কাধাক্কিও করছেন। ধাক্কা উল্টো মুখো। গলা নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলেন, বাড়ি চলে যা হতভাগারা, উঁহু, ইস্কুলে গিয়ে বিদ্যেসাগর হবেন সব! ছুতো পেলি তো বাড়ি গিয়ে খেলাধুলো করগে।

হঠাৎ এক কাণ্ড! তেতলার ছাতের উপরে রব উঠল—বন্দে মাতরম্। আলসের উপরে উঠে জোয়ান ছেলে তেরঙা নিশান তুলে ধরেছে। উজ্জ্বল রোদ পিছলে পড়ে গৌর দেহে। বহু দূর থেকে, বোধকরি ট্রামরাস্তা থেকেও, দেখা যাচ্ছে তাকে। কে আবার! মণি ঘোষ—জীবনের যে পরোয়া করে না। নিশান পতপত করে উড়ছে। বাজ পড়ে সেজন্য দেয়াল ফুঁড়ে রড় বের করা— নিশান ধীরেসুস্থে সেই রডের সঙ্গে বেঁধে দিল। মণি তার পরে নেমে এল তেতলা থেকে দোতলায়, দোতলায় থেকে একতলায়, একতলা থেকে রাস্তায়— সকলের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে। উপরে ছেলেবুড়ো ভিড় করে আছে নিশানের দিকে তাকিয়ে। মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। ইস্কুলের তরফের সবাই একেবারে চুপ। জানলায় কেউ নেই। ইস্কুলের ভিতরেই আছে কিনা সন্দেহ হয়।

নিশান তুলে দিয়ে রণ-জয় করে ভলন্টিয়াররা চলে গেছে। মহিম, ভূদেব ও অন্যেরা ঢুকে পড়েছেন। রাস্তা-ফাঁকা। গেট বন্ধ হয়ে ডবল তালা পড়েছে। হেডমাস্টার ক্ষিপ্তপ্রায়। সবগুলো বেয়ারাকে ডাকিয়ে এনে হাঁকাহাঁকি করছেন তাদের উপর : বাইরের লোক কেমন করে ঢুকল কম্পাউণ্ডের ভিতরে? ঢুকেছে অত বড় ফ্লাগ নিয়ে। এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় চলে গেল, কারো একটু নজরে পড়ল না। চোখ বুজে থাক সব। দেখাচ্ছি মজা—সেক্রেটারিকে বলে দলসুদ্ধ তাড়াব।

চিন্তবাবু বেয়ারাদের পক্ষ হয়ে বলেন, ওরা কি করবে? কী রকম ড্যাঁদড় মণি ঘোষটা—এইখানে পড়ে গেছে তো! চালার ভিতর রাঁধাবাড়া করছিল ওরা, ঘর খুলে রেখে জমাদার ঝাঁটপাট দিচ্ছিল, পিছনের নিচু পাঁচিল টপকে সেই সময় বোধহয় ঢুকে পড়েছে। ঢুকে লুকিয়ে বসেছিল—সামনের রাস্তায় লোকজন জুটলে সময় বুঝে বুক চিতিয়ে আলসের উপর উঠে দাঁড়াল।

নবীন পণ্ডিত হাতের খবরের কাগজ পাকাতে পাকাতে বলেন; পিনছায়

[illegible] দিচ্ছে [illegible]। [illegible] এখানে দিয়ে তো একটা [illegible] পাকা কি।

চিত্তবাবু বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। এখনকার উপায় ভাবুন।

ভাবাভাবির কি আছে? নাড়ু গর্জন করে ওঠেন: আর একটা মুখের কথা বলে দিন, নিশান টেনে নামাচ্ছি।

হেডমাস্টার চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়েন: উহু, হাতের উপরের ব্যাপার। লোকে দেখে ফেলবে। লোক জমে যাবে পতাকার অপমান হচ্ছে বলে। খবরের কাগজে উঠবে।

চিত্তবাবুও সায় দেন: সত্যি কথা। গোঁয়ার্তুমির কাজ নয় নাড়ু। সময় দিন উড়ুক অমনি, বেয়ারারা রাত্তিরে সরিয়ে ফেলবে।

হেডমাস্টার হায়-হায় করছেন: কী সর্বনাশ বলুন দিকি! এদিককার কোন ইস্কুলে যা হয় নি। প্রাচী শিক্ষালয়ে ছুটি দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু নিউ-মডেল খোলা আছে। নিউ-মডেলের নয়নবাবু জাঁক করছিলেন, বড় বড় লোকের ছেলে পড়ে—বন্দেমাতরম্ আমাদের ইস্কুলে সেঁধুতে পারবে না। কালাচাঁদবাবু একবার ঘুরেফিরে দেখে আসুন কোথায় কি হল। অন্য জায়গায় হলে কমিটির কাছে বলবার তবু মুখ থাকে। শিক্ষকদের মাইনে-বৃদ্ধির দরখাস্ত ঝুলছে এই সময়টা—বিপদ দেখুন!

মহিম ক্লাসের দিক থেকে ঘুরে এসে বললেন, ছেলে তো আটজন। কি করব বলুন চিত্তবাবু, বাড়ি চলে যাই?

ভূদেব বললেন, চলে যাবেন কি মশায়! চা আসছে নবীন পণ্ডিত মশায়ের ওখানে। গগনবিহারীবাবুর মার্কশিট হারিয়ে যায়, ফকিরচাঁদ খুঁজে দিয়েছিল। সেই বাবদে তাঁর কাছ থেকে এক টাকা আদায় হল। চা আনতে বেরিয়ে গেছে।

করালীকান্ত বললেন, ক্ষেপেছেন? চা খাওয়ার জন্য বসে থাকবেন মহিমবাবু? দুটো বাড়ি সেরে নেবেন ততক্ষণে।

মহিম শুকনো মুখে বললেন, পড়ানো নয়। বাড়িতে অসুখবিসুখ চলছে খুব। ছুটি পেয়ে যাই তো কোলা গিয়ে বড়বোনকে বাসায় নিয়ে আসি।

রুটিনের চার্টটা খুলে ধরে চিত্তবাবু আঙুল বুলিয়ে নিরীক্ষণ করছেন: সেকেন্ড-বি। থার্ড-এ। তারপরে হলগে ফোর্থ-ডি। না, এসব ক্লাসে ছেলে আসে নি। টিফিনের পরে এই যে—থার্ড-বি ক্লাস রয়েছে এই। থার্ড-বি'তে গোটা পাঁচ-ছয় এসেছে, দেখে এলাম।

তিন-চারজনে সমকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, টিফিনের পরেও ইস্কুল চলবে নাকি?

হেডমাস্টার গম্ভীর স্বরে বললেন, চারটে পর্যন্ত ইস্কুল। অবস্থি যাদের ক্লাসে মোটে ছেলে নেই, তাঁরা চলে যেতেন পারেন। ক্লাসের ভিতর একটা ছেলে থাকলেও পড়াতে হবে।

রুটিন দেখতে দেখতে চিত্তবাবু বলে উঠলেন, আপনারও তো থার্ড-বি ভূদেববাবু। এই ঘণ্টায়। ক্লাসে যান নি, বসে আছেন—

ভূদেব আকাশ থেকে পড়েন: আমার? কই—না না, আমার কেন হতে যাবে!

পকেট থেকে ছোট্ট একটু খাতা বের করে মিলিয়ে দেখেন। হপ্তায় দুটো দিন থার্ড-বি—আজকেই বটে! জমাটি আড্ডার মধ্য থেকে ভূদেব বিরস মুখে উঠলেন: ওরে বিনোদ, আফ্রিকা আর দক্ষিণ-আমেরিকায় ম্যাপ দুটো ক্লাসে পাঠিয়ে দাও!

ক্লাসে গিয়ে মুখের উপর একটুখানি হাসি টেনে এনে ভূদেব বললেন, এই ক'জন এসেছ তোমরা? বেশ, বেশ। কোনও ক্লাসে কেউ এল না, তোমরা ত বেশ এসে গেছ।

ছেলেরা এ ওকে ছাড়িয়ে বাহাদুরি নেবার জন্ত ব্যস্ত: কী করে যে ঢুকেছি সার! গেটের সামনে সব শুয়ে পড়েছে—তখন মাথায় এল, পিছন দিকে নিচু পাঁচিল আছে তো। পাঁচিল বেয়ে উঠে টুপটুপ করে সব লাফিয়ে পড়ি। চার-পাঁচ জন পড়তে ভলান্টিয়াররা টের পেয়েছে। রে-রে করে এসে পড়ল। তার পরে আর কেউ পারে নি। আমরাই ক'জন শুধু।

ভূদেব উচ্চকণ্ঠে তারিপ করেন: ভাল, ভাল। নিষ্ঠা আছে তোমাদের।

কৃতিত্বের কাহিনী আরও কিছু ফলাও করে বলতে যাচ্ছিল, ভূদেব থামিয়ে দিলেন: গল্প নয়। কত কষ্ট করে এসেছ, পড়া হবে এখন। আফ্রিকার ম্যাপটা টাঙিয়ে দাও বোর্ডের উপরে।

ছেলেরা বলে আফ্রিকা তো ফোর্থ ক্লাসে সারা করে এসেছি।

সে পড়া ধরব। 'পড়ে-শুনে প্রমোশান নিয়ে এলে, গোড়াটা কি রকম আছে দেখে নিতে হবে না? আফ্রিকা হয়ে গেলে দক্ষিণ-আমেরিকা—তাও ম্যাপ এনেছি। ম্যাপ পয়েন্টিং হবে—এক-একটা জায়গার নাম করব, মুখের কথা মুখে থাকতে ম্যাপে দেখাবে। এই যাঃ, পয়েন্টার আনা হয় নি তো! নিয়ে আসছি। কারো যদি একটা ভুল হয়, আগাপাস্তলা পেটাব পয়েন্টার দিয়ে। থার্ড ক্লাসে উঠে বড্ড বাড় বেড়েছে! ভুল হলে বুঝব, টুকে পাশ করে এসেছিল। পিটিয়ে পিঠের ছাল তুলব, আসছি দাঁড়া—

রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। আবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, চুপচাপ বসে বসে বই দেখ ততক্ষণ। ম্যাপের জায়গাগুলো দেখে রাখ—হ্রদ, নদী পর্বত রাজধানী এই সমস্ত।

বিনোদের কাছ থেকে ভূদেব পয়েণ্টার নিয়ে নিলেন একটা। পয়েণ্টার হল কাঠের বেঁটে লাঠি, মাথার দিকে সুঁচাল করা। ম্যাপ দেখাতে হয় ওই বস্তু দিয়ে, দরকার মতো বেতের কাজও হয়। ক্লাসে বেত আনা বন্ধ, কিন্তু পয়েণ্টার রুল এইসব অস্ত্র চালু রয়ে গেছে।

হেডমাস্টার আর চিত্তবাবু ইতিমধ্যে কামরায় ঢুকে গেছেন। সেক্রেটারির কাছে কি পরিমাণ রেখেঢেকে আজকের রিপোর্ট যাবে, তার শলাপরামর্শ হচ্ছে। অতএব ওদিকটা আপাতত বাঁচোয়া। ভূদেব উঁকিঝুঁকি দিয়ে নবীন পণ্ডিতের ওখানে ঢুকলেন। চা এসে গিয়েছে। আফিমের ভেলা মুখে ফেলে পণ্ডিতমশায় একটু একটু চায়ে চুমুক দিচ্ছেন আর লড়াইয়ে হারতে হারতে ইংরেজ কোন কায়দায় জিতে গেল সেই তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। বসবার জায়গা নেই এ-ঘরে, খান দুই মাত্র চেয়ার। মাস্টাররা তবু ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন নবীন পণ্ডিতকে ঘিরে।

আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পণ্ডিত বললেন, হেঁ হেঁ, খবরের কাগজ তো অনেকেই কেনেন—পড়তে পারেন ক'জনে শুনি? পড়তে জানা চাই। যা ছাপা থাকে সমস্ত মিথ্যে। সত্যি খবর ছাপে না কাগজে, ছাপবার জো নেই। ছাপা জিনিসের ভেতর আকারে-ইঙ্গিতে বলে, মনোযোগ করে পড়ে বুদ্ধি খাটিয়ে বের করে নিতে হয়। ইংরেজিতে যাকে বলে টু রিড বিটুইন দ্য-লাইনস। উপরে নিচে দুটো লাইনের মাঝখানে তো ফাঁক—তার মধ্যে সত্যি খবর সাদা কালিতে ছাপা থাকে।

চোখের উপরে কাগজখানা মেলে ধরে নবীন পণ্ডিত অনর্গল বলে যাচ্ছেন সেই সাদা কালিতে ছাপা সত্য: হিটলার শুদ্ধি করে হিন্দু হয়েছিল, বক্ষে স্বস্তিকচিহ্ন ধারণ করত। বগলামুখী কবচও ছিল কোটের নিচে; মাইনে-করা জ্যোতিষী ছিল। কাশী এসে একবার মদনমোহন মালবীয়কে প্রণাম করে গিয়েছিল লড়াই বাধবার অনেক আগে…

হাতে চায়ের বাটি নিয়ে ভূদেবও মগ্ন হয়ে শুনছেন। কিন্তু ঈর্ষী লোকের অন্যের সুখ সহ্য হয় না। দাশু বলে উঠলেন, আপনি ক্লাস নিচ্ছিলেন ভূদেববাবু। ক্লাস ছেড়ে চলে এলেন?

ও, হ্যাঁ—যাচ্ছি। ম্যাপ পয়েণ্টিং হবে, পয়েণ্টার নিতে এসেছি।

লাইব্রেরি-ঘরে মহিম একাকী চোখ বুঁজে বসে আছেন। সময়ের অপব্যয়

করেন না; কাজকর্ম না থাকলে বকে বকেই একটু ঘুমিয়ে নেন। কম্পাউণ্ডার মতন দাঁড়িয়েও ঘুমতে পারেন বোধহয়। আজ কিন্তু ঘুম নয়, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছেন বুঝি। কী যেন নেশায় পড়েছেন ওই মণি ঘোষ ছেলেটাকে নিয়ে। জ্যোতির্ময় ছেলে! ছাতের আলসের উপর দাঁড়িয়েছিল নিশান হাতে। বীরমূর্তি। ঠাকুর দেবতার ছবিতে যেমন দেখা যায়—ঠিক তেমনি রোদের আলো পড়েছিল তার মুখখানা ঘিরে। দীপালিকে ঐ ছেলের হাতে দেবেন। মণির মা দরজার আড়াল থেকে কথা বলেন, তাঁর কাছে কথাটা তুলবেন একদিন। দীপালি নিন্দের মেয়ে নয়, কনে পছন্দ হয়ে যাবে ওঁদের। মহিমকে মণি বড় ভক্তি করে, সে-ও নিশ্চয় 'না' বলবে না। ছেলেটাকে বাড়ি ডেকে নিয়ে সরলাবালাকে একদিন দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

ভূদেব দাঁড়ালেন। মুখে হাসি ধরে না। মহিমকে বলেন, চলে যেতে পারেন মহিমবাবু। পয়েন্টার দিতে এসেছিলাম, থার্ড-বি সেই ফাঁকে ভেগে পড়েছে। চালাক ছেলে সব, বুঝে নিয়েছে। আমিও যথেষ্ট সময় দিয়েছিলাম।

মহিম বলেন, কিন্তু গেট তো তালা-বন্ধ। গেল কি করে?

গেট দিয়ে তো ইস্কুলে আসেনি। এসেছিল পাঁচিল টপকে, গেছেও সেই পথে। ছুটি করে দিলাম, একদিন চা খাওয়াতে হবে।

সুধাকে নিয়ে মহিম বাসায় যাচ্ছেন। ট্রামে যাচ্ছেন। সারা পথ কেবল ওই মণি ঘোষের কথা: তুমি যাচ্ছ দিদি, ভাল হয়েছে, ছেলেটাকে বাসায় এনে তোমাদের দেখিয়ে দেব। বর আর কনের বাপের অবস্থাটা ভাবছ। কিন্তু চোখে দেখ একবার মণিকে, বিদ্যে-বুদ্ধির কথা শোন, তারপরে ওসব কিছু মনে আসবে না। কোন এক অজুহাতে বাসায় ডেকে আনব, আমি বললে, ঠিক সে আসবে। মেয়েমানুষের মতন চোখ তো পুরুষের নয়—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিও যত খুশি। তোমরা ননদ-ভাজে ছেলে পছন্দ করলে তারপরে আমি কথা পাড়ব। আগে কিছু বলছি নে। দীপালির চেহারা ভাল—ওদের ঠিক চোখে লেগে যাবে।

সুধার কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে বলেন, মাস্টার বটে, তা বলে নিতান্ত শুধু হাতে মেয়ে দেব না দিদি। রাতদিন মুখে রক্ত তুলে খাটি—সে ওই মেয়ের বিয়ের জন্য, আর ছেলে দুটো মানুষ করার জন্য। গয়নায় নগদে যতদূর পারি সাজিয়েগুজিয়ে দেওয়া যাবে।

পাড়ায় ঢুকতে গোবিন্দ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। ডাক্তার বেরিয়ে পড়েছেন।

মহিমকে দেখে গাড়ি থামিয়ে বললেন, এই এখন বুঝি আসছেন মাস্টারমশায় ? যান।

কথায় ধরন ভাল লাগে না। শুষ্ককণ্ঠে মহিম বলেন, খবর কি ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার খিঁচিয়ে ওঠেন : অতবড় রোগি বাচ্চা ছেলেমেয়ের উপর ফেলে রাতদিন পয়সা-পয়সা করে ঘুরছেন। শিক্ষিত মানুষ আপনি—দেখুন কিছু মনে করবেন না, বস্তির মিস্ত্রি-মজুরের মধ্যেও একটা কর্তব্যজ্ঞান থাকে, এতদূর পাষণ্ড তারা নয়। কাল বলে এসেছিলাম, সকালবেলা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। করেছেন ?

গাড়ি বেরিয়ে গেল। মহিম ব্যাকুল হয়ে বলেন, কী বলে গেলেন দিদি, মানে কি ওসব কথার ? কাল রাত্রে তোমাদের বউ টরটর করে কত কথা বলল। কত গল্প : বলল, অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি ভাল। তবে ডাক্তার গালিগালাজ করেন কেন ?

বাড়ি ঢোকবার দরজা হা-হা করছে। পাশের ভাড়াটেদের বড় বউয়ের কোলে বাচ্চা মেয়েটা—সরলাবালার সাধের রূপালি। আরও তিন-চারটে মেয়েছেলে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ছোকরা কয়েকটি। মহিমকে দেখে শুভো-পুণ্য-দীপালি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

সরলাবালার আধেক-বোজা দৃষ্টি। মারা গেছে, মনে হবে না। ঘুমিয়ে পড়েছে যেন। কাল রাত্রেও এত কথা—কথা সে আর বলবে না।

॥ বাইশ ॥

পরের দিন সারা বেলাটা মহিম বাসায় শুয়ে-বসে কাটালেন। দশ-বারো বছরের মধ্যে এ রকম হয়েছে, মনে পড়ে না। খুব যখন কম ভিড়, তখনও রবিবারে দু-এক বাড়ি যেতে হয় অন্তত। সরলাবালা মরে গিয়ে একটা দিনের পুরো ছুটি দিয়ে গেল। হাত-পা মেলে জিরানোর ছুটি।

সন্ধ্যার পর বাইরে থেকে ডাকাডাকি করছেন—কী আশ্চর্য, সাতু ঘোষের গলা। বড়লোক হয়েও, দেখ, বিপদ শুনে ছুটে এসেছেন। তাড়াতাড়ি মহিম দরজা খুলে দিলেন। মোটরে চড়ে ছেলে অলককে সঙ্গে নিয়ে বাসা খুঁজে খুঁজে এসেছেন। মহিম তাঁদের দেখেন না, তাঁদের মোটরগাড়িখানা দেখেন, ভেবে পান না। কত বড় অবস্থা আজ সাতু ঘোষের ! আর সেই প্রথর বয়সে সাতুর

চাকরি ছেড়ে দেবার পর মহিম জামের কাছে বলেছিলেন, উঠে যাবে সাতুর ব্যবসা : অধর্ম করে ব্যবসা হয় না। বইয়ে ভাল ভাল উক্তি পাঠ করে সবে পাশ করে বেরিয়েছেন, পূর্বকান্তর কাছে পড়ে এসেছেন—ঘোরটা কেটে যায়নি তখনো। অধার্মিক সাতুর উন্নতি চেয়ে দেখ আজ চক্ষু মেলে।

সাতু ঘোষ বললেন, কাল পড়াতে যাওনি কেন? দেখ ইস্কুল থেকে পাঠাত না—সে একরকম। পাঠিয়েছে যখন, ছেলে ফাইন্যাল এগজামিনে বসতে যাচ্ছে—বের করে ওকে আনতেই হবে। ওর পিছনে টাকা তো কম খরচ কর'ছি নে!

এক অঞ্চলের মানুষ, মহিমের বাপের কাছে একদিন উপকার পেয়েছেন। তাঁর মুখে অন্তত দুটো সান্ত্বনার কথার প্রত্যাশা ছিল। কী বলবেন মহিম চুপ করে আছেন।

রুক্ষ গলায় সাতু বলছেন, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে যাচ্ছি। দু-দুটো মাস্টার রেখেছি। কালাচাঁদবাবু এক নম্বরের ফাঁকিবাজ—একদিন এলেন তো দুদিন আসেন না। আমি বাড়ি না থাকলে ঢকঢক করে এক কাপ চা গিলেই সরে পড়েন। চেনা-জানা মানুষ বলে তোমায় রাখলাম, তুমিও দেখছি ওই দলের। তাই আজ নিজে এসে পড়লাম। না এলে যা করতে সে তো জানি। আরও দু-একদিন কাটিয়ে নিয়ে চান না করে দাড়ি না কামিয়ে উপস্থিত হতে—কী ব্যাপার? না, অসুখ করেছিল। ছুতো বানাতে তোমাদের জুড়ি নেই। এইজন্যে কিছু হয় না মাস্টারদের—সারা জন্ম দুয়োরে দুয়োরে বিদ্যে বিক্রি করে বেড়াতে হয়। নাও, ওঠো গাড়িতে।

যেন আকস্মিক বজ্রপাত। পিছন দিকে দীপালি কখন এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলে উঠলো, বাবা যাবেন না।

সাতু ঘোষ অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, যাবে না মানে? দয়া করে পড়ায় নাকি? মাসে মাসে মাইনে খায়—যাবে না অমনি বললেই হল! ওই বুঝেই গাড়ি নিয়ে নিজে চলে এসেছি—আজেবাজে বলে কাটিয়ে দিতে না পারে।

মানুষের সুখ-অসুখ থাকে। যেতে পারবেন না আজ বাবা। কঠিন ভাবে কথাগুলো বলে মেয়ে বাপের হাত ধরে টানল।

মহিম আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিলেন। নিয়ে দীপালির মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। বলেন, কিছু মনে করবেন না দাদা। ওদের মা মারা গেছে। ছেলেমানুষ, কেমন ভাবে কথা বলতে হয় জানে না। আপনারা ঘরে এসে বসুন।

সাতু নরম হয়ে গেলেন : ইস, সে খবর তো জানি নে! কি হয়েছিল? তাহলে অবিশ্যি যেতে পারা যায় না।

কাল কামাই হয়েছে, আজকেও যেতে পারছি নে দাদা। ছেলে-মেয়ে সবগুলোই অগণ্ড—বড্ড কান্নাকাটি করছে। আবার মুশকিল, কেঁদে কেঁদে ছোট ছেলেটার জ্বর এসেছে, জ্বরে হাঁসফাঁস করছে। একশ-চার পয়েন্ট ছয় এখন।

সাতু ঘোষ বললেন, আচ্ছা, কাল যেও তবে। এগজামিন এসে পড়েছে। একেবারে শিরে-সংক্রান্তি কিনা, নয়তো বলে দিতাম রবিবার অবধি থেকে সোমবারে যেও একেবারে।

তারপর নিঃশ্বাস ফেলে দার্শনিকসুলভ কণ্ঠে বললেন, যে চলে যায় সে-ই শুধু থাকল না। বাকি সমস্ত পড়ে থাকে, সব-কিছু করতে হয়। কাজকর্মের মধ্যে থাকলে বরঞ্চ কেটে যায় ভাল, শোকতাপে কাবু করতে পারে না। কাল সন্ধ্যাবেলা যাবে, এই কথা রইল।

গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, এই বুঝি বড মেয়ে? মেয়ে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। দেখতেও খাসা। টান খুব তোমার উপর—কী রকম মারমুখি হয়ে পড়ল! আমি তো কিছু জানতাম না, জানলে কি আর বলতাম? কি নাম তোমার মা?

আজকে আর শেষ-রাত্রে নয়, ফর্সা হয়ে গেলে তবে মহিম পড়াতে বেরুলেন। প্রবোধকে ডেকে তুলতে হল না, নিজেই উঠে বই নিয়ে বসেছে। পড়াতে শুরু করে মহিম হঠাৎ চুপ করে যান। বারংবার হচ্ছে এইরকম। অবাধ্য মনটাকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে কাজে লাগাতে হচ্ছে। বৃত্তান্ত শুনে প্রবোধ বলে, আপনি চলে যান মাস্টারমশায়। কিছু কাজ দিয়ে যান, করে রাখব।

এর পরের ছাত্রের বাড়ি আর গেলেন না। ছুটতে পারছেন না, থপথপ করে যাচ্ছেন। সিংহিবাড়ির সময় হয়ে এল। দু-দিন কামাইয়ের অপরাধ, তার উপরে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলে কৈফিয়তের বোঝা বিষম ভারী হয়ে দাঁড়াবে। সিংহিবাড়ির বিশেষ সুবিধা, পৌঁছলেই হয়ে গেল। আর খাটনি নেই, জলি পড়ে না। খানিকটা সময় কাটিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়েন। এর পরে তো রবীন—রবীনকে আজ মারলেন না। নেপথ্যবর্তিনী মাকে বললেন, বাড়িতে অশৌচ, কয়েকটা দিন এখন মারধোর রেহাই দিতে হবে মা।

ইস্কুল থেকে এক ঘণ্টা আগে ছুটি নিয়ে ট্রামে চেপে সোজা বাসায় চলে এলেন। বিকালের দুটোও পড়াবেন না আজ, যা হবার হোকগে। ভোরবেলা পুণ্য ঘুমচ্ছিল। গায়ে হাত দিয়ে দেখে গেলেন—জ্বর ধাঁ-ধাঁ করছে। গোবিন্দ এসে বসলেন।

একগাদা কমলালেবু আর বেদানা, একবাক্স বিস্কুট—ও দিদি, তোমার কিছু

পয়সা আছে জানি, তাই বলে গাদার কিনে এনে তাকের উপর তুলছ! এক বাচ্চা অত খাবে ক'মাস ধরে?

সুধা বলেন, আমরা কিনিনি। সাতু ঘোষের ছেলে তোমার ছাত্র অলক হাতে করে এনেছিল। বাপের মতন চশমখোর নয়, ছেলেটা বড় ভাল।

অলকের প্রশংসায় সুধা শতমুখ: অমন ছেলে হয় না। কী মিষ্টি মুখের কথা! পিসিমা বলে আমায় গড় হয়ে প্রণাম করল। বলে, ফলটল আমি কেন আনতে যাব পিসিমা, আমি কি জানি? মা সমস্ত শুনেছেন, তিনি এসব পাঠিয়ে দিলেন। গোবিন্দ ডাক্তারবাবু এসে প্রেস্কৃপসন লিখে দিলেন, গুভোর, হাত থেকে কাগজটা ছোঁ মেরে নিয়ে অলক ছুটল। বলে, গুরুদশা চলছে—খালি পায়ে ধড়া-গলায় গুভোর রাস্তায় যেতে হবে না। ওষুধ নিয়ে এসে দামের কথা কিছুতে বলে না, হবে-হবে করে কাটান দেয়। দুপুরবেলা থেকে এতক্ষণ ধরে কত গল্প—এই একটু আগে উঠে গেল। বলে, মাস্টারমশায় গিয়ে পড়বেন এইবার, আমায় না পেলে ভয়ানক রেগে যাবেন।

মহিম বলেন, এমনিও রেগেছি। কিচ্ছু তো জানে না বোঝে না—মাথা-ভরা গোবর। তার উপর এইরকম আড্ডা দিতে লাগলে কোন পুরুষে ওর পাশ করতে হবে না।

সুধা তাড়াতাড়ি বলেন, এ নিয়ে তুমি কিছু বলতে যেও না অলককে। খবরদার, খবরদার! খাসা ছেলে। ওর মা পাঠিয়েছিলেন, ও কি করবে? পরের অসময়ে যারা দেখে ভগবান তাদের ভাল করেন। পড়ার ক্ষতি-লোকসান ভগবান পূরণ করে দেবেন। রোজ কি আর আসতে যাচ্ছে এখানে?

চাদর কাঁধে তুলে নিয়ে মহিম এবার উঠলেন। সোজা সাতু ঘোষের বাড়ি—অলকের কাছে। ছেলেটা বই-টই গুছিয়ে নিয়ে বসে আছে। অত্যন্ত সহজ জিনিসটাও হাতুড়ি পিটিয়ে পেরেক বসানোর মতো করে ওর মাথায় ঢোকাতে হয়। কিন্তু আজ অলককে নতুন চোখে দেখছেন। মাথা না থাক, মস্ত বড় হৃদয় আছে ছেলেটার।

বললেন, আমাদের বাসায় তুমি গিয়েছিলে, দিদি খুব প্রশংসা করছিলেন।

ইস্কুল থেকে বাসা হয়ে এলেন বুঝি?

মহিম বললেন, পুণ্যের আবার অসুখ করে বসল, মন খুব খারাপ, তাই একবার দেখে এলাম ছেলেটাকে। মায়ের বড্ড ন্যাওটা ছিল কিনা, মা-মা করে সারাক্ষণ কেঁদে কেঁদে জ্বর হয়েছে। জ্বরের গতিকও ভাল নয়। কিন্তু তুমি বাবা ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনে দিয়ে দাম নিলে না কেন?

. অন্তত অবহেলার জরিমানা বলে, দেওয়া যাবে, তার কি রয়েছে!

না-বাবা, এটা ঠিক নয়। ফল-টল নিয়ে এলে—মা-জননী পাঠিয়েছেন, মাথা পেতে নিয়েছি। কিন্তু তুমি ছাত্র-মানুষ, কিজন্য পয়সা খরচ করতে যাবে?

অশোক বলে, ছাত্র তো ছেলের মতন। সামান্য আট-দশ আনা পয়সার জন্য আপনি মাস্টারমশায় পীড়াপীড়ি করবেন, আমি না হয়ে ছেলে হলে কি করতেন?

এমন করে বলছে, ঠিকমতো উত্তর মুখে জোগায় না। মহিম অন্য কথা পাড়েন: তোমার উঁচু মন, বিপদে ছুটে গিয়ে পড়লে। কিন্তু এক-এক মিনিট এখন যে এক-এক ঘণ্টার সমান। বারংবার গিয়ে সময় নষ্ট করো না, আমি তাহলে নিজেকে অপরাধী মনে করব।

পুণ্যব্রতের জ্বরটা বাঁকা পথ নিলে। টাইফয়েড—একেবারে আসল বস্তু নয়, প্যারা-টাইফয়েড। কাজকর্মে তাই বলে কতদিন আর ফাঁক কাটানো চলে! এগজামিন ঘনিয়ে আসছে। ইস্কুল থেকে মহিম টুইশানিতে সোজা বেরিয়ে পড়লেন আগেকার মতো। সেই যে ছেলেটা বই-খাতা নিয়ে বাইরের ঘরে তৈরি হয়ে থাকত, সে নেই। খেলাধুলো করে না, বেড়ায় না—গেল কোথায় তবে? চাকরটা বলে, কোন এক কোচিং-ক্লাসে পড়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, সেইখানে যাচ্ছে কাল থেকে।

ইদানীং অলিতে-গলিতে কোচিং-ক্লাস। পাইকারি হারে প্রাইভেট পড়ানো। যেমন ধর, রেলের কামরায় দশজনে একসঙ্গে বসে যায়; আবার বড়লোক কেউ রিজার্ভ করে নেয় একলার জন্যে। একটি ছেলের জন্য এক ঘণ্টার টিউটর রিজার্ভ করার মতো মানুষ কমে আসছে। কোচিং-ক্লাসের পাইকারি পড়ানোর বেশি চাহিদা। পড়ানো তো কচু—একজন মাস্টারকে সামনে বসিয়ে রেখে দশ-বিশটা ছেলের হট্টগোল। তবে সস্তায় হয়। চার-পাঁচদিন মহিমকে না পেয়ে ছেলে কোচিং-এ ঢুকে পড়েছে, সস্তার স্বাদ পেয়েছে। আর ফিরে পাওয়া যাবে না। গেল এটা।

সুলতার টুইশানিও গেছে। গিয়ে দেখলেন, নতুন মাস্টার এসে তোলপাড় করে পড়াচ্ছে। এটা লিখছে, ওটা বোঝাচ্ছে লাল পেন্সিলে দাগ দিচ্ছে ওখানটা। নতুন নতুন এমনি করতে হয়। মহিমও করেন। তারপরে উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে। চার-পাঁচটা দিন বিকালে অবহেলায় দরুন পৃথিবী উল্টে যাওয়ার ব্যাপার। টিউটর যেন পড়িয়ে যাবার কল একটা—সংসারধর্ম নেই তার, সংসারে অসুখ-অশান্তি থাকতে নেই। যাকগে, ভালই হল। মেহ কেবল

যেন শিথিল, খাটিতে মন লাগে না। ইস্কুল থেকে ফিরে পুণ্যের কাছে বসবেন একটু। সংসারের খবরাখবর নেবেন, দিনের জমাখরচ লিখে রাখেবেন বরঞ্চ বিকালের এই সময়টা।

প্রশ্নকর্তারা প্রশ্ন রচনা করেছেন—য়্যুনিভার্সিটির কর্তারা গোপনে ছাপা শেষ করে অতি-সাবধানে সিন্দুকে তালা এঁটে রেখেছেন, প্রশ্ন পাচার হয়ে না যায়। সেই প্রশ্ন আগেভাগে বের করে এনে উত্তর লিখে ছাত্রকে মুখস্থ করিয়ে দেবেন—মহিমদের এই কাজ। সিন্দুক ভেঙে চুরি করা নয়, প্রশ্নকর্তার মনের ভিতর সেঁধিয়ে হাতড়ে হাতড়ে খোঁজা। বুদ্ধির খেলা—ওঁরা কতদূর লুকোতে পারেন, ইনি কতটা বের করতে পারেন। অনেক রাত্রে কাজকর্ম চুকিয়ে হিসাব লেখা শেষ করবার পর মহিম ছাদের উপর পায়চারি করে বেড়ান। গতবার এই এই প্রশ্ন এসেছিল, তার আগের বার এই রকম—এবারে কি কি আসবে? ভেবে ভেবে ব্যাসকূট ভেদ করে ফেলেন। বছর বছর করে আসছেন। মহিম-মাস্টারের সেইজন্যে নামডাক—এত টুইশানি তাঁর কাছে আসে। অন্য ছেলেরা ঘুন-ঘুন করে মহিমের ছাত্রের কাছে: বল না ভাই কোনটা কোনটা দেগে দিলেন। মহিম যা দেবেন, ছাত্রেরা নিঃসংশয়, তার ভিতর থেকেই প্রশ্ন এসে যাবে। মহিমের ছাত্র মিথ্যে করে উল্টোপাল্টা বলে। অথবা সোজাসুজি হাঁকিয়ে দেয়: মাসের পর মাস মাইনে গনে তবে আদায় হয়েছে, হরির লুঠের মতন ছড়িয়ে দেবার বস্তু নয়।

এমন হয়েছে, এক ঘণ্টা দু' ঘণ্টা ধরে ঘুরছেন ছাতের উপরে। চটির ফটফট আওয়াজ ঘুমের মধ্যে নিচের লোকের কানে যাচ্ছে। সরলাবালা উঠে এসেন হয়তো বা। সিঁড়ির দরজার উপর থেকে শিকল দেওয়া—দরজা ঝাঁকাচ্ছেন। মহিম দরজা খুলে দেন: কী ব্যাপার?

রাত অনেক হয়েছে। শুয়ে পড়।

মহিম বললেন, শোব—

এক্ষুণি শোও। তাই দেখে তবে আমি যাব। আবার তো এক পহর রাত থাকতে ছুটবে। এতে শরীর থাকবে না।

সরলাবালা নেই—প্রশ্ন ভেবে ভেবে আজকে সারা রাত ধরে পায়চারি করলেও সিঁড়ির দরজায় ঝাঁকাঝাঁকি করবে না কেউ এসে। ইচ্ছেও করে না। —পড়িয়ে এসে একটু-কিছু মুখে দিয়েই মহিম শুয়ে পড়েন। অনভ্যাসে সকাল সকাল ঘুম আসে না। সময়ের অপব্যয় হচ্ছে, এপাশ-ওপাশ করছেন। উঠতে ইচ্ছে করছে না তবু, আলস্য লাগে।

কাইস্তাল পয়মাকা হয়ে গেল। ফাঁকা এখন। শুধু মাত্র রবীনের ট্যুইশানিটা আছে। আস্তে আস্তে আবার এসে জমবে। কত ছেলে বলে রেখেছে, হাত খালি হলে আমায় নিতে হবে কিন্তু সার। দু-একটি গার্জেনও এসে দেখা করে গেছেন। পরীক্ষা হয়ে যাওয়া এবং রেজাল্ট বেরনো—এরই মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলার ফাঁক মেলে কয়েকটা দিন।

বেড়াতে বেড়াতে মহিম সিংহিবাড়ি গেলেন। জলিটা এমনি বেশ চালাক। সবগুলো পেপার জড়িয়ে মোটের উপর কি দাঁড়াল, আলোচনা করে দেখবেন। পরীক্ষা যতদিন চলতে থাকে, তার মধ্যে করতে নেই। কোন একটা ভুল হয়েছে দেখলে ছেলে মুশড়ে পড়ে।

চন্দ্রভূষণের নজরে পড়েছে। বারান্দা থেকে হাঁক পাড়ছেন, শুনুন মাস্টার-মশায়, এইদিক হয়ে যাবেন। কোয়েশ্চেন দেখেছেন তো ?

আজ্ঞে হাঁ—

কেমন দেখলেন ?

এ জেরা কোথায় নিয়ে পৌঁছয়—মহিম শঙ্কিত হচ্ছেন। ভাসা-ভাসা জবাব দিলেন, মন্দ কি !

আর আপনি যা সব দেগে দিয়েছিলেন, মনে আছে নিশ্চয়।

মহিম আমতা আমতা করে বললেন, একটা-দুটো জিনিস তো নয়। অত মনে থাকবে কি করে ?

বই-খাতা নিয়ে এসে আমি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলাম। যা-কিছু দেগেছেন সমস্ত ভুয়ো। একটাও মেলে নি।

কথা সত্যি। মহিম-মাস্টারের এত দিনের নাম ডুবতে বসেছে। প্রশ্নকর্তা যেন তাঁর যাবতীয় ছাত্রের বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখে ঠিক সেইগুলোই বাদ দিয়ে প্রশ্ন ফেঁদেছেন। অজ্ঞতার ভান করে মহিম বলেন, তাই নাকি ? আন্দাজি ব্যাপার বুঝতে পারছেন—প্রশ্ন তো দেখে আসিনি আগেভাগে !

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলেন, টাকা দিয়ে মাস্টার রাখা কেন তবে ? ছেলে নাগাড় সমস্ত পড়ে যাবে—সে কাজ ইস্কুলেই হয়ে থাকে। বেছেগুছে দুটো-চারটে মোক্ষম বলে দেবেন, রপ্ত করে দেবেন সেইগুলো—

তাই তো দিয়ে থাকি সব জায়গায়।

অন্য জায়গার খবরে গরজ নেই। জলিকে দিয়েছেন ঠিক আসলগুলো বাদ দিয়ে। পলিসি মাস্টারমশায়, সে কি আর বুঝি নে ?

হকচকিয়ে গিয়ে মহিম বলেন, পলিসি কি বলছেন ?

নং টার্গ পলিসি। পাশ করলেই তো হয়ে গেল—ফেল করিয়ে-করিয়ে ছাত্র জিইয়ে রাখা। চাকরি পাকা হয়ে রইল। এমন সুখ আর কোন বাড়িতে পাবেন। লেট করে করে আসবেন—মাস কাটাতে পারলেই পুরো মাইনে। এখন তম্বিয়ে এসেছেন—ফেল হবার পর আবার যাতে তাকে আপনাকে। অন্য মাস্টারের কাছে না যায়। সেটা আর হচ্ছে না, আমি স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিলাম।

এর পরে আর অলির সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা হয় না। বেরিয়ে এলেন। প্রবোধের বাড়ি যেতে হবে একটিবার। তিন মাসের মাইনে বাকি। বাপের সঙ্গে দেখা হয় না, তাগিদ প্রবোধের মারফতে করতে হত। আজ নয়, কাল—করতে করতে দিব্যি এগজামিন অবধি কাটিয়ে দিল। আর দেরি করলে মোটেই আদায় হবে না।

প্রবোধের বাপকে পাওয়া গেল আজ। বললেন, মাইনের জন্যে এসেছেন? পরীক্ষার খাতায় পাতার পর পাতা রসগোল্লা পাবে, ছেলে বলছে।

মহিম ঘাড় নাড়লেন: তা কেন—

পাবে তাহলে হীরে-চুনি-পান্না? রেজাল্ট বেরুক। আটশ ফুল নম্বরের মধ্যে হাজার দেড় হাজার কত পায় দেখা যাক। তখন আসবেন। একসঙ্গে হিসাব কিতাব করে টাকা নিয়ে যাবেন।

বলতে বলতে আগুন হয়ে ওঠেন: মাস্টার রাখা গোখুরি কাজ হয়েছে। এটা আসবে ওটা আসবে—দাগ দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন ছেলের। ও সেইগুলো মুখস্থ করে মরেছে। হলে বসে চোখে অন্ধকার। এমনি হয়তো পড়ত কতক কতক—দু-দশ মার্ক পেত। কিন্তু রাতের কুটুম চুপিসারে এসে ওই যে কোন বুদ্ধি খাটিয়ে সরে পড়তেন, তাতেই সর্বনাশ হয়ে গেল। ন'মাসের মাইনে তো নিয়েই নিয়েছেন—আমার এতগুলো টাকা বরবাদ।

রাতের কুটুম বলা হয় চোরকে। মহিমকে ভদ্রলোক চোর বলে দিলেন। বছরের পর বছর ধরে যশের সৌধ গড়ে তুলেছিলেন—মহিম-মাস্টারের হাতে ছেলে ফেল হয় না। একটা ঝড়েই ভেঙে সমস্ত চুরমার।

অপমানের পর অপমান। আজ কার মুখ দেখে বেরিয়েছেন না জানি। তবু একবার যেতে হয় সাতু ঘোষের বাড়ি। অলকের খবর নিতে হয়। খবর যা হবে সে তো সকলের জানা। সাতু ঘোষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনিও কি জানেন না? অন্য জরুরি ব্যাপার আছে—সাতু ঘোষের ভারি বিপদ। কল্যাণশ্রী ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে। সরলাবালার মৃত্যুর পর তার বিপদের দিনে অলক গিয়ে

পড়েছিল বাসায়। কত করেছে! মহিমেরও সাতুর বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

গিয়ে কিন্তু বিপদের লক্ষণ কিছু দেখেন না। সাতু ঘোষ পাশা খেলছেন। কচ্চে বারো—হাঁক শোনা যায় রাস্তা থেকে। মহিমকে দেখে সাতু একগাল হেসে বলেন বোসো। অলক তো খুব লিখে এসেছে। বলল নাকি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবে। তুমি সমস্ত তৈরি করিয়ে দিয়েছিলে। বোসো একটুখানি, সব কথা শুনব। এই হয়ে গেল—এক ঘুঁটি আছে, এক্ষুণি ঘরে উঠে যাবে।

খেলা শেষ হয়ে গেলে সাতু ঘোষ উঠে এলেন। মহিম বলেন, কল্যাণশ্রী ফেল হয়েছে কাগজে দেখলাম।

সাতু হেসে বলেন, তাতে তোমার কি? টাকাকড়ি রেখেছিলে নাকি? আমায় তো কোনদিন কিছু বল নি।

না দাদা, মাস্টারি করে ব্যাঙ্কে রাখবার টাকা কোথায় পাব?

সাতু বলেন, তাহলে ভাল। ন্যাড়ার নেই বাটপাড়ের ভয়। টাকাকড়ি খুব পাজি জিনিস। আমি ডিরেক্টর—আমার কিছু নয়। কত জনে টাকা রেখেছিল ব্যাঙ্কে—তাদেরই মুশকিল। একেবারে যাবে না, পাবে হয়তো কিছু কিছু। কিন্তু লিকুইডেটরের হাতে গেলে কোন যুগে বেরুবে, সে কিছু বলা যায় না।

গলা নামিয়ে বললেন, শোন, ব্যাঙ্কে কিছু থাকে তো তুলে ফেল তাড়াতাড়ি। ব্যাঙের ছাতার মত ব্যাঙ্ক গজিয়েছে, লড়াই অন্তে এবার ডুবে যাবে একে একে।

অলকের পরীক্ষার কথা উঠল। সাতু বললেন, শুনে তো তাজ্জব লাগে ভাই। ওর বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দপুরুষের মধ্যে কেউ পাশ করে নি—ও কি করে ফার্স্ট ডিভিশনে যাবে, ভগবান জানেন।

মহিমের পিঠ ঠুকে দিয়ে বলেন, তুমি ছাড়া অন্য কেউ পারত না! আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সন্দেশ কিনে তোমার বাসায় গেল। বলে পায়ের ধুলো নিয়ে আসি মাস্টারমশায়ের।

বাসায় ফিরে মহিম দেখলেন, তখন অবধি রয়েছে অলক। সন্দেশ খাওয়াখায়ি আর খুব গুলতানি হচ্ছে। এর পরে প্রস্তাব আছে, সুধা আর দীপালিকে নিয়ে অলক সিনেমায় যাবে। শুভব্রত ভাল ছেলে, সে যাবে না পড়াশুনা ছেড়ে। পুণ্য যেতে পারে মহিম যদি অনুমতি দেন।

মহিমকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে অলক পায়ের ধুলো নিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সমস্ত অঙ্ক মিলিয়ে দেখেছি। পঁচাশি নম্বর রাইট। আশির নিচে পাব না। অঙ্কে নিশ্চয় লেটার পাব মাস্টারমশায়।

মহিম বলেন, তাই তো শুনে এলাম সাতু-দার কাছে। হল কি করে বল তো? টুকে মেরেছিস নিশ্চয়।

অলক আহত স্বরে বলে, কি বলছেন সার! আপনিই তো করে দিলেন সমস্ত।

আমি? সজোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, বরাবর তাই তো হয়ে এসেছে বাবা। কিন্তু এবারে কি হল—দীপালীর মা নিজে গেল, আমাকেও মেরে রেখে গেছে একেবারে।

অলক তর্ক করেঃ আপনি ভুলে গেছেন। অঙ্ক কষে দিয়েছেন, গ্রামারে দাগ দিয়ে দিয়েছেন, ইতিহাস সংক্ষেপ করে লিখে দিয়েছেন। যা বলেছেন, অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে। হুবহু লিখে দিয়ে এসেছি। পিসিমাকে তাই বলছিলাম, ফার্স্ট ডিভিশন কেউ রুখতে পারবে না।

সকল ছাত্র গালিগালাজ করছেঃ মহিম-মাস্টারের আর কিছু নেই। চোখের দৃষ্টি যায় নি শুধু, মাথার ঘিলুও শুকিয়ে গেছে। অলকের মুখে উল্টো কথা। সকলকে বাদ দিয়ে গুহ্য পাঠ একলা অলককেই দিলেন কেবল? স্বপ্নে বলে দিয়েছেন? কিছু না ধুরন্ধর ছেলে টুকে মেরেছে। নিজের বিত্তেয় করেছে, কেউ বিশ্বাস করবে না। মহিমের গুণগান করে সামাল দিচ্ছে এখন।

॥ তেইশ ॥

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বেরল। মহিমের কাছে যারা প্রাইভেট পড়েছে সবগুলো ফেল। অঙ্কে তো অলকের আশি পাবার কথা, নম্বর আনিয়ে দেখা গেল আট পেয়েছে, এবং কোন বিষয়েই পাশ-নম্বর নেই। তা বলে দৃকপাত নেই ছেলেটার। মহিমের বাসায় এখনো আসে। সুধাকে বলে, কী জানি, বুঝতে পারছি নে পিসিমা কিসে কি হয়ে গেল। অঙ্কের উত্তর সমস্ত আমি মিলিয়ে দেখেছিলাম। খাতা যে আমার দেখতে দেবে না—তা হলে বুঝতে পারতাম। যাকগে, পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না তো! এবারে হল না তো আসছে বার। মা'কে বলে রেখেছি, মহিমবাবু মাস্টারমশায় ছাড়া অন্ত কারো কাছে আমি পড়ব না।

কিন্তু মহিমই যাবেন না আর ওখানে। সব বিষয়ে ফেল, কোন মুখ নিয়ে সাতু ঘোষের কাছে দাঁড়াবেন? নতুন টুইশানি একটাও আর আসে না। ছাত্র আর গার্জেন কত জনে বলে রেখেছিল, একটি প্রাণীরও এখন দেখা নেই। শুধুমাত্র

রবীন আজে। সকাল থেকে সন্ধ্যায় বদল করে নিয়েছেন তাকে—সন্ধ্যাবেলার এই একটুখানি কাজ। রবীন আসছে বছর ফাইন্যাল দিয়ে বেরিয়ে যাবে—তারপরে যে রকম গতিক, হাত-পা ধুয়ে থাকতে হবে সমস্ত সময়। আজকে সরলাবালা নেই—তখন একটা মিনিট চোখের দেখা দেখতে পারেননি। সারা জীবন তাই নিয়ে কত অনুযোগ। কত মুখভার করেছে কতদিন। আজ যদি বেঁচে থাকত, সকাল-বিকাল সারাক্ষণ তার শয্যায় পাশটিতে বসে থাকতাম।

কিন্তু রবীনের টুইশানিও সেই ফাইন্যাল অবধি থাকে কিনা দেখ। একদিন পড়াতে গিয়ে মহিম শুনতে পেলেন, দুই ভাই মণি আর রবীনে কথাবার্তা হচ্ছে। তাঁকে নিয়ে কথা, বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে নিলেন একটুখানি। মহিমের কাছে আর পড়তে চায় না রবীন; অন্য কাউকে দেখ দাদা। অলক্ষুণে মাস্টার। এত জনের মধ্যে একটা ছেলেও পাশ করল না ওঁর কাছ থেকে।

মণি বলছে, মহিমবাবুর মত শিক্ষক অন্য কোন ইস্কুলে আছে কিনা জানি নে, তোদের ইস্কুলে তো নেই। পুরো তিনটে বছর পড়েছি ওঁর কাছে। যে কোন ক্লাসে গিয়ে যে-কোন সাবজেক্ট পড়িয়ে আসতেন। সে কী পড়ানো। সবাই মগ্ন হয়ে শুনত, ক্লাসের ভিতর একটা ছুঁচ পড়লে শোনা যেত।

রবীন বলে, কবে কী ছিলেন, জানিনে। এখন ফিফথ ক্লাসের উপরে ওঁর রুটিন নেই। বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—তাই সামলাতে হিমসিম হয়ে যান। উপর ক্লাসে কি পড়ানো হয়, একেবারে কিছু জানেন না। উনি থাকলে আমি কখনও পাশ হব না।

মহিম আর দেরি করলেন না। গলা খাঁকারি দিয়ে ঢুকে পড়লেন। দেরি হলে আরও কত কি শোনাবে কে জানে। সে আমলের এই একটি ছাত্র—মণি তাঁর ক্ষমতার সাক্ষি। নিজের নিজের মণিরও কান ভারী করে তুলছে—মহিম যতক্ষণ পারেন, সেটা ঠেকিয়ে রাখতে চান।

•

পড়ানোর পরে আজ চিত্তবাবুর বাড়ি চললেন। পুরানো আমলের আর একজন। চিত্তবাবুরই কত ক্লাস পড়িয়ে এসেছেন—ক্ষমতা জানেন তিনি মহিমের। কিন্তু কোথায় চিত্তবাবু এখন। পড়াতে বেরিয়ে গেছেন। মহিমের মতো নিষ্কর্মা নন। মহিমের চেয়ে চিত্তবাবু বয়সে অনেক বড়। অথচ কেমন শক্তসামর্থ। চিরদিন ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটালেন, সেজন্য চশমাটাও লাগে না এতখানি বয়সে। হাতে কাজ আছে বলেই টুইশানির ডাক।

অ্যাসিস্ট্যান্ট-হেডমাস্টার, মানুষ—জানে, এই লোকের কাছে প্রাইভেট পড়লে টেস্টে পাশ হয়ে অন্ততপক্ষে ফাইন্যাল পরীক্ষায় গিয়ে বসতে পারবে। সেই নিশ্চিন্ত, পরের ভাবনা পরে।

কাঁচা নর্দমার উপর কালভার্ট—চিত্তবাবুর বাসায় ঢোকবার পথ। নাকে কাপড় চেপে সেই কালভার্টের উপর মহিম বসে আছেন। রাত দুপুর হয়ে গেল—ব্যাপার কি। পড়ানোর পরে কোন আড্ডায় জমে গেলেন নাকি চিত্তবাবু?

কে?

অবশেষে দেখা পাওয়া গেল। মহিম বলেন, অনেকক্ষণ বসে আছি চিত্তবাবু।

চিত্তবাবু বলেন, ঘরে আসুন! ওখানে কি জন্তে বসে? বললেই দুয়োর খুলে দিত।

বসতে হবে না। সামান্ত একটা কথা, কথাটা বলবার জন্ত কখন থেকে পথ তাকিয়ে আছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হয়ে যাবে।

ঢোক গিলে নিয়ে বলেন, নতুন রুটিনে আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। কোন দোষঘাট হয়েছে বলুন। আপনি যখন যে ক্লাসে দিয়েছেন, কোনদিন তো আপত্তি করেনি। বলুন, করেছি কি না।

প্রবীণ শিক্ষক রাত দুপুরে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে এমনি করছেন, চিত্ত গুপ্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন। বলেন, আমি কি করব বলুন। আমার হাতে কিছু নেই। কাকে কোন ক্লাস দিতে হবে, হেডমাস্টার সমস্ত বলে দেন; আমি জুড়ে-গেঁথে দিই এইমাত্র।

মহিম হাহাকার করে ওঠেন: অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেছি। ফিফথ ক্লাসের উপরে পড়াবার বিদ্যে কি নেই আমার? বলুন।

বিদ্যে নিয়ে কথা নয়। পড়ানো চায় না তো ইস্কুলে। মুশকিল কি জানেন—আপনি ক্লাস ম্যানেজ করতে পারেন না মোটে। ফিফথ ক্লাসেও তো গণ্ডগোল—হেডমাস্টারের কাছে হররখত রিপোর্ট এসে যাচ্ছে।

চোখে ঠাহর করতে পারি নে, ছানি পড়েছে। চোখ ভাল থাকলে দেখে নিতাম বিচ্ছুগুলোকে। আগে হয়েছে এমন? এই শীতকালে ছানি কাটিয়ে ফেলব। আমায় মারবেন না চিত্তবাবু।

খপ করে তাঁর হাত জড়িয়ে ধরছেন। বলেন, সত্যি সত্যি মরে যাচ্ছি। একটা টুইশানি জোটে না। গার্জেন খবর নেয় কোন ক্লাসের মাস্টার। ফিফথ ক্লাসের মাস্টারকে কে ডাকে বলুন, ক'টাকাই বা দেয়? একটা-দুটো উঁচু ক্লাসে নেহাত বুড়ি ছুঁইয়ে রাখুন—লোককে যাতে বলতে পারি।

চিন্তবাবু হাত এড়াবার জন্যই বললেন, আচ্ছা, এবারে যা হবার হয়ে গেছে। দেখা যাক, আসছে-বছরের রুটিনে কি করতে পারি।

আসছে-বছর সাগাত ধুলিসাৎ হয়ে যাব চিন্তবাবু। বউ মরেছে, ছেলেমেয়ে ক'টাও না খেয়ে মরবে। রুটিনে না হল, বৈটেখাতার মাঝে মাঝে মারুন। আপনার দুটো-একটা ক্লাসে দিয়ে দেখুন না। আগে যেমন দিতেন।

কী করেন চিন্তবাবু! বাড়ি বয়ে এসে পড়েছেন। রাজি হতে হল।

সেই শুভক্ষণ এল দিন চারেক পরে। বৈটেখাতার মারফতে উঁচু ক্লাসে। চিন্তবাবুরই অঙ্কের ক্লাস। এমন-কিছু উঁচু নয়—থার্ড ক্লাস বি-সেকসন। মহিমের কাছে তাই আজ এভারেস্ট-কাঞ্চনজঙ্ঘা। ফিফথ ক্লাসের দু-দুটো ধাপ উপরে। ভাল কাজ হলে আবার গিয়ে খোশামুদি করবেন আর এক ধাপ উপরে তুলতে। ছেলেরা জানবে, হাঁ, উঁচু মাস্টার বটে!

মাস্টারির প্রথম দিন এই থার্ড ক্লাসেই অঙ্ক কষিয়েছিলেন মহিম। বজ্রাহত ছেলেগুলো অঙ্ক কষার কায়দা দেখে মোহিত হয়ে গেল। একটা পিরিয়ডের ভিতরেই রণ-বিজয়। আজকে কিন্তু জুত হচ্ছে না সেদিনের মতো। কাল বদলেছে, বয়স বেড়ে গেছে। ছেলেদের দোষ কি—ক'টা দাঁত পড়ে গেছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে যায়। তারা কথা বুঝতে পারে না।

আবার বলুন স্যার—

গলায় যত জোর আছে, সর্বশক্তিতে মহিম পড়াচ্ছেন। চোখ এত খারাপ হয়েছে—কী সর্বনাশ! ব্লাকবোর্ডের মোটা মোটা লেখাও ঝাপসা।

আলজাব্রার বই বদল হয়ে গেছে, এ নতুন বইয়ের ভিন্ন পাতায় আলাদা রকমের অঙ্ক। পাতা না খুলে আগের দিনের মতন মুখস্থ বলে যাবেন, সে উপায় নেই। পাতা খুলে তো বলতে পারেন না, না পড়তে পারলে কি বলবেন?

বেঞ্চিতে বসা সারি সারি ছেলেগুলোর দিকে তাকালেন। ছাত্র নয়, নির্মম বিচারক। মুখ তাদের ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না—কিন্তু এটা জানেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মহিমের অঙ্ক কষার দিকে। দেখেশুনে রায় দেবে। কী ছাই কষবেন তিনি—এটা-ওটা লিখে সময় কাটানো, ঘণ্টা কাবার করে দেওয়া। মহিমের পা দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে, ঘাম ফুটেছে সর্বাঙ্গে।

মিউ—

মহিম আগুন হলেন: বেড়াল ডাকছ তোমরা? আমি মহিমারঞ্জন সেন, অঙ্কে অনার্স সহ গ্রাজুয়েট—থার্ড ক্লাসের এইটুকু-টুকু ছেলে ইয়ার্কি করছ আমার

মজে ? মূর্খস্ত মূর্খ, তোমরা বুঝবে কি—তোমাদের বাপ-দাদাদের জিজ্ঞাসা কোরো মহিম মাস্টারের কথা। আমি যে কায়দায় অঙ্ক কষে দেব, খোদ নিউটন তা পারবেন না। আমি যে অঙ্ক দাগ দিয়ে দেব, য়্যুনিভার্সিটি থেকে বাপের ঠাকুর বলে ঠিক সেই ক'টা অঙ্ক কোয়েশ্চেন-পেপারে বসিয়ে দেবে।

বলতে বলতে গলা ধরে আসে। কী সব দিন গিয়েছে! থার্ড ক্লাসে এসে হিমসিম খাচ্ছেন, আর ফার্স্ট ক্লাসে সেকশনের পর সেকশনে রাজচক্রবর্তীর মতো পড়িয়ে ফিরছেন একদিন। বাঘ বাঘা মাস্টার অনুপস্থিত—চিত্তবাবু বলছেন, যাবেন নাকি মহিমবাবু ?

বললে কেন যাব না ?

জিওগ্রাফি কিন্তু—

হবে।

রুটিন দেখে সংশোধন করে চিত্তবাবু বলেন, উঁহু, ভুল হয়েছে। জিওগ্রাফি নয়, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন।

তা-ও হবে।

হেসে ফেলে চিত্তবাবু বলতেন, পণ্ডিতমশায়ের সংস্কৃতের ক্লাস হয় যদি ?

তা-ই পড়াব।

থার্ড ক্লাসের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—শুভব্রতের চেয়ে অনেক ছোট, বিড়াল ডাকে আজ সেই মানুষের ক্লাসে !

ছেলেরা কিন্তু বিড়াল ডাকেনি। সত্যি সত্যি এক বিড়ালছানা জানলা দিয়ে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দারোয়ান বিড়াল পোষে, তার ছা-বাচ্চা। ডাকছিল-সত্যিকার বিড়ালেই—চোখে দেখেন না বলে মহিম ছেলেদের অকারণ গালিগালাজ করলেন।

আর, সেইজন্য পেয়ে বসল তারা।

মিউ-মিউ—

মহিম ক্ষেপে গেলেন। স্কেল নিয়ে ছুটোছুটি করছেন আওয়াজ আন্দাজ করে। এবারে ছেলেই ডাকছে, কিন্তু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে স্কেলের বাড়ি খাবে, এমন আহাম্মক ছেলে নয়।

মিউ-মিউ—মিউ-মিউ—

একজন থেকে চার-পাঁচটা জুটেছে। দিব্যি এক খেলা দাঁড়িয়ে গেছে—কানামাছি খেলার মতো। মহিম পাক দিচ্ছেন, তারা গলাগলি খেলছে। পাগলের মতো হয়ে মহিম শাপশাপান্ত করছেন : সর্বনাশ হবে বুঝলি, মুখে রক্ত

উঠবে। বাড়ি গিয়ে সকলের মরা-মুখ দেখবি। তখন আর একটা ছেলেও বাকি নেই, সারা ক্লাস জুড়ে চলেছে : মিউ-মিউ, মিউ-মিউ, মিউ-মিউ—

ছুটোছুটির ক্লান্তিতে অবশেষে মহিম ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

আর আসব না তোদের ক্লাসে। মাস্টারি আর করব না। গুখুরি করেছি এমন কাজে এসে। ছ্যা-ছ্যা, এ কি ভদ্রলোকের কাজ।

একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে ভাল মানুষের ভাবে বলে, অন্যায় রাগ করছেন স্যার। ডাকছে বেড়ালই। বেড়াল আপনার কোটের পকেটে। সেখান থেকে ডাকছে।

গলায় চাদর, গলাবন্ধ চিলে কোট গায়ে। মাস্টারির পোশাক—ডি-ডি-ডি যে রেওয়াজ রেখে গেছেন। কোটের পকেটের ভিতরে সত্যিই কখন বিড়াল-ছানা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ইস্কুল থেকে মহিম ট্রামে উঠলেন না। সকাল সকাল বাসায় এসে কি করবেন? অকারণ পয়সা-খরচ শুধু। লজ্জাও করে ছেলেমেয়েদের কাছে হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে। বড় হয়েছে তারা ; ভাববে, বাবাকে কেউ ডাকে না আজকাল—বাতিল করে দিয়েছে। মহিম হেঁটে হেঁটে চললেন তাই। বলরাম মিত্তির লেনে রবীনকে অমনি সেরে যাবেন। অঢেল সময়, আস্তে আস্তে চলেছেন।

কি ভেবে ডাইনের গলিতে বাঁকলেন। পুরানো দিনের এক ছাত্রের বাড়ি। পাশ করার কোনও আশা ছিল না। পাশ করলে ছাত্রের বাপ নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন তাঁকে। ঢুকে গেলেন সোজা সেই বাড়িতে।

ভূপতিবাবু আছেন?

ভূপতি সবে অফিস থেকে ফিরছেন। অবাক হয়ে বললেন, কি খবর মাস্টারমশায়?

আপনার ছোট ছেলে তো এবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠল। টিউটর রাখবেন না?

রয়েছেন একজন।

দক্ষ লোক রাখুন মশায়। অমিয় পাশ করলে আপনি বলে রেখেছিলেন, মিহিরকেও পাশ করিয়ে দিতে হবে।

খবরাখবর না নিয়েছি, তা নয়। সহসা কণ্ঠে কোমল দরদের সুর এনে ভূপতি বললেন, শরীরটা আপনার বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে মহিমবাবু। কদ্দিন

আর এই উঞ্ছবৃত্তি করবেন ? বিস্তর খেটেছেন, এখন বিশ্রাম নেওয়া উচিত ! এসেছেন যখন, একটা মিষ্টি খেয়ে যান।

মিষ্টি খেয়ে ঢকঢক করে পুরো এক গেলাস জল খেয়ে মহিম আবার হাঁটছেন। সন্ধ্যা হয়েছে, আলো রাস্তায় রাস্তায়। একদল ছেলে, রংবেরঙের জার্সি-পরা, খেলা করে ফিরছে মাঠের দিক থেকে। ছড়া কাটছে, মহিম শুনতে পেলেন—

মহিম সেনের চোখ কানা
পকেটে তার বিড়ালছানা।

দৃষ্টি নেই, তাই চিনতে পারেন না ছেলেগুলোকে। থার্ড-বি'র গুণধর কেউ কেউ আছে, সন্দেহ নেই। ঘণ্টা তিন-চার আগেকার ব্যাপার—এর ভিতরেই ছড়া বাঁধা হয়ে গেছে। ছোঁড়াগুলো স্বভাব-কবি দেখা যাচ্ছে, পদ্য গাঁথতে দেরি হয় না।

রবীনের পড়ানো শেষ করে বাসায় ফিরে এলে সুধা বললেন, সিঁদুর-কৌটো এনেছ ?

সিঁদুর-কৌটো কেন ? ও হ্যাঁ, তাই তো—

তারক করের ছেলে মন্মথর বিয়ে হয়ে গেছে পরশুদিন। বিয়ের দিন মহিম সুধাকে নিয়ে বেহালায় গিয়েছিলেন। বর-বিদায়ের পর তক্ষুনি আবার ফিরে আসতে হল। রূপালিকে নিয়ে মুশকিল, সে কার কাছে থাকে ? দিনমান আর অল্প সময় বলে দীপালির কাছে রেখে গিয়েছিলেন, তাতেই দীপালি হিমসিম খেয়েছে। বউভাতে বাড়িসুদ্ধ নেমন্তন্ন। কাল বৃহস্পতিবার বউ-ভাতের তারিখ বটে।

সুধা বলেন, ভুলে গিয়েছ ? সকালবেলা তবে কিনতে হবে। আজকেও মন্মথ এসেছিল—দীপালি শুভো পুণ্য সবাই যাতে যায়। বলে দিলাম, বাচ্চা মেয়েটা রয়েছে, রাত্রে তো থাকতে পারব না। কাজের বাড়ি বাচ্চা নিয়ে যাওয়াও যায় না। দুপুরের পর গিয়ে রাত্রিবেলা আমরা ফিরে আসব। কাল তুমি সকাল সকা ছুটি নিয়ে এস মহিম। রূপালি তোমার কাছে থাকবে।

মহিম বললেন, যাবই না কাল ইস্কুলে। ইস্কুলে যাওয়া কবে যে একেবারে বন্ধ হবে, তাই ভাবি !

॥ চব্বিশ ॥

সেদিন রাত্রে মহিম চিলেকোঠায় ঘুমচ্ছেন। ঘুমের ভিতর মনে হয়, কে যেন ছায়ার মতো ঘুরঘুর করছে ঘরের মধ্যে। ছায়া যেন তাঁর নিজের শিয়রে এসে বসল।

কে, কে তুমি ?

ছায়া তাঁর কপালে হাত বুলায়, মাথায় স্বল্প চুল ক'টা কোমল আঙুলে চিরুনির মত নাড়াচাড়া করে।

ঘুমসনি তুই দীপালি ?

ঘুম হচ্ছিল না বাবা। ঘরের মধ্যে বড্ড গরম। ছাতে উঠে বেড়াচ্ছিলাম। দেখলাম, ঘুমের মধ্যে বড্ড এপাশ-ওপাশ করছ। হাত-পা টিপে দিই একটু ?

সিঁড়ির দরজায় শিকল দেওয়া ছিল। খুললি কি করে তুই ?

কাঠি ঢুকিয়ে খোলা যায়। আমি পারি।

দীপালি পা টিপতে লাগল। মহিম-মাস্টারের মনটা কেমন করে ওঠে। ক্লাসের ছেলেরা নাস্তানাবুদ করেছে তাঁকে। ছড়া কেটে পথের উপরে অপমান করেছে। টুইশানির আশায় পুরানো ছাত্রের বাড়ি উপযাচক হয়ে গিয়ে মুখ ভোঁতা করে ফিরে এলেন। কোনকিছুই চোখে জল আনতে পারেনি। কিন্তু মা মরা মেয়ে ঘুমের মধ্যে এসে পড়ে এই মমতা দেখাচ্ছে, অত্যাচারিত অসহায় একটি শিশুর মতন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করছে—মহিম-মাস্টারের চোখ শুকনো রাখা দায় হয়ে উঠল অতঃপর। পাশবালিশ আঁকড়ে ধরে তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন।

অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াল দীপালি। কী একটু ভাবল। বলে, কাল আমরা তো সব বেহালায় বউভাতে যাচ্ছি। তুমি যাবে না বাবা ?

বুড়োমানুষ, চোখে দেখতে পাই নে। আমি কোথা যাব কাজের বাড়ির ভিড়ের মধ্যে ? বিয়ের দিন একবার তো দেখা দিয়ে এসেছি।

একা থাকবে বাসায় ?

আমি আর রূপালি—একলা কিসে হল মা ? সে-ই বা কতটুকু সময় ! রাত্রিবেলা তোরা সব ফিরে আসছিস।

ক'দিন পরের কথা। বেঁটে খাতাটা চোখের কাছে নিয়ে মহিম ঠাহর করে দেখে নিচ্ছেন কোন্ ক্লাসে এবারে। দাশু খুব হাঁকডাক করছেন ওদিকে :

মাস্টারের নামে ছড়া লেখে—কী আস্পর্ধা। ক্লাসের দেয়ালে লিখে রেখেছে। পায়খানায় লিখেছে। কাগজে লিখে নোটিশ-বোর্ডের উপর সেঁটে দিয়েছে। আমার হাতে নিস্তার পাবে না, ঠিক ধরে ফেলব। ধরতে পারলে রাস্টিকেট করা হবে ইস্কুল থেকে।

মহিমকে দেখেই যেন বেশি চেঁচাচ্ছেন। কথাগুলো সহানুভূতির, কিন্তু ঠোঁটে বাঁকা হাসি। অমন গগনভেদী চিৎকারের অর্থ : হেডমাস্টার চিন্তবাবু এবং মাস্টারদের কারো যদি নজর এড়িয়ে থাকে, কানে শুনে নিন। এবং স্বচক্ষে দেখে কৌতূহল মিটিয়ে আসুন লেখাগুলো নষ্ট হবার আগে।

একটা জায়গায় লেখা মহিমকে ধরে নিয়ে দেখাচ্ছেন : কী বাঁদর ছেলেপুলে মশায়! ধরে আগাপাস্তলা ঠেঙালে তবে রাগ মেটে।

মহিম আর পারেন না—তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, বাহাদুরি আমাদের দাশুবাবু। নর গড়তে বাঁদর গড়ি। বাহাদুর কারিগর আমরা। বিশ্বকর্মা কত বড় কারিগর, হাতপা ঠুঁটো জগন্নাথের মূর্তি গড়ায় তা মালুম।

বলতে বলতে দ্রুত ক্লাসে চললেন। নাইন্থ ক্লাস—যার নিচে আর নেই। চিন্তবাবু লিসার মেরে এখানে দিয়েছেন। তাঁর দোষ নেই, জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহিমকে। প্রবীণ শিক্ষক বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে উঁচু ক্লাসের জন্য এত করে বললেন—কিন্তু উঁচু ক্লাসে পাঠিয়েও তো ফ্যাসাদ। সেইজন্য জিজ্ঞাসা করতে হল : চারজন মাস্টার আসেননি, থার্ড পিরিয়ডটা নিতে হবে মহিমবাবু। ফোর্থ-বি'র ইতিহাস কিংবা নাইন্থ-এর বাংলা—কোনটা দেব?

নাইন্থ ক্লাস মশায়। আর নিচু থাকলে তাই আমি চেয়ে নিতাম।

নাইন্থ ক্লাসের নিতান্ত অবোধ শিশুগুলো। মহিমের কেমন যেন আক্রোশ—মনে মনে বলছেন, দাঁড়াও না বাছাধনেরা কটা বছর সবুর কর। কী মাল বানিয়ে দিই বুঝবেন তোমাদের গার্জেন। বুঝবে তোমরা বড় হয়ে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন বই খুলে ফেল। গোড়া থেকে দশ পৃষ্ঠা খাতায় লেখ। ধরে ধরে লিখবি—বানান ভুল না হয়, লাইন না বাঁকে। মেরে ভূত ভাগাব তাহলে।

নিশ্চিত জানা আছে, চল্লিশ মিনিটের পিরিয়ডে দশ পৃষ্ঠা কি তার অর্ধেক পাঁচ পৃষ্ঠাও লেখা হবে না। রামকিঙ্করবাবুর কাছে সেই প্রথম দিনের শিক্ষা। পুণ্যাত্মা শিক্ষক স্বর্গলাভ করেছেন। মহিম-মাস্টার নিশ্চিন্তে পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিলেন, চোখ বুজলেন।

কিন্তু হবার জো আছে। বেয়ারা একটা স্লিপ নিয়ে এসে হাজির। হেডমাস্টার ডেকে পাঠিয়েছেন।

জালাতন! ঘণ্টার পরে গেলে চলত না? ক্লাস ছেড়ে গেলে কাজকর্ম হয়? আচ্ছা, বলগে আমি যাচ্ছি।

বেজার মুখে উঠে ছেলেদের বললেন, বসে বসে লেখ। জায়গা ছেড়ে উঠেছিস কি মুখে একটা কথা বেরিয়েছে—পিটিয়ে তক্তা করব ফিরে এসে।

হেডমাস্টারের কামরায় এসে মহিম দেখলেন, সাতু ঘোষ অপেক্ষা করছেন। হেডমাস্টারের ডাক তাঁর গরজেই। সাতু রেগে আগুন হয়ে আছেন। বলেন, এখানে নয়—এখানে কথাবার্তা হবে না। বাইরে এস।

সজোরে মহিমের হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে চললেন।

অলক লিখেছে, পড়। এলাহাবাদ ডাকঘরের ছাপ—শয়তান-শয়তানী এলাহাবাদ অবধি পৌঁছে গেছে। ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, ভাবনায় পড়েছিলাম। এ চিঠির পরে ভাবনা-চিন্তা থাকল না।

একটা খামের চিঠি মহিমের হাতে দিলেন। তিক্তকণ্ঠে বললেন, কি ডাকিনী মেয়ে তোমার! ছি-ছি-ছি, ভদ্রলোকের মেয়ে এমনধারা হয়! আমার একমাত্র ছেলে—বিয়ে দেব বললে কত বড় বড় জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসত। সমস্ত বরবাদ করল। ঘন ঘন যাতায়াত তোমার বাসায়, মাস্টার বলে ভক্তিতে গদগদ—ষড়যন্ত্র অনেক দিন ধরে চলেছে, কেমন?

বলে সাতু ঘোষ এমনভাবে তাকালেন, মহিমও যেন সেই ষড়যন্ত্রের ভিতর।

মহিম বললেন, দীপালির ভাগ্য খারাপ, তাই সে এক গাছমুখ্যু বাঁদরের ধাপ্পায় ভুলে গেল। আমি মামলা করব। আপনার ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব।

বেহালায় তারক করের বাড়ির বউভাতে গিয়েছিল অন্য সকলে রাত্রে চলে এল, দীপালি রয়ে গেল সেখানে। নতুন বউ দীপালির সমবয়সি—বাড়ির মধ্যে একজন সঙ্গিনী পেলে বউয়ের ভাল লাগবে। এই সমস্ত ভেবে তারকই বলেছিলেন কয়েকটা দিন থাকবার জন্য। সুধা তাকে রেখে এসেছেন। দিন পাঁচ-ছয় পরে বউ বাপের বাড়ি গেলে দীপালি ফিরে আসবে তখন। কিন্তু আর সে ফিরছে না অলকের চিঠি পড়ে বোঝা গেল। কালীঘাটের মন্দিরে গোপনে মালা-বদল হয়ে গেছে, দুজনে এখন পশ্চিমে চলল। ষড়যন্ত্র তো বটেই—অনেক দিন ধরে চলেছে ওদের সলাপরামর্শ।

মহিম ক্লাসে ফিরে গেলেন সাতু ঘোষের সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে। গিয়ে চেয়ারের উপর ঝিম হয়ে বসে রইলেন। ছেলেরা স্তব্ধ। হাত নেড়ে

একটি ছেলেকে কাছে ডেকে হেডমাস্টারের নামে এক টুকরা কাগজে লিখে পাঠালেন : মাথা ধরেছে, বাড়ি চললাম।

ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মহিম বেরিয়ে গেলেন, হেডমাস্টারের হুকুম আসবার অপেক্ষা করলেন না।

অসময়ে বাসায় চলে এলেন। সুধাকে ডাকলেন : শুনেছ দিদি ?

দীপালি জলে-ডুবে মরেছে। তারকদার বেহালার বাড়ি থেকে।

বল কি ?

জলও নয় পচা পাঁক।

হাতের মুঠোর মধ্যে পাকানো অলকের চিঠি। চিঠি ছুঁড়ে দিয়ে আর কিছু না বলে মহিম গম্ভীরভাবে ছাতে উঠে গেলেন। সিঁড়ির দরজায় শিকল তুলে দিলেন। বেলা পড়ে এসেছে। ছাতের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি পায়চারি করছেন অবিরত। মাথা ধরার নাম করে ইস্কুল থেকে এসেছেন—সত্যিই এখন মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। শুয়ে পড়লেন চিলেকোঠায় গিয়ে।

শান্ত হয়েছেন এতক্ষণে একটু, ভাবতে পারছেন ? মায়ামমতা, সেবাযত্ন, পুরানো কালের নীতিনিয়ম সমস্ত বুঝি বাতিল এখন—শুধুমাত্র অভিনয়ের বস্তু! হিমযুগের সঙ্গে ম্যামথের যেমন বিলয় ?

ভাবছেন, বেশ হয়েছে, ভালই তো হয়েছে। নিখরচায় কন্যাদায় কেটে গেল। যা-কিছু সঞ্চয় শুভব্রতের কাজে লাগুক। আসছে-বার সে ফাইন্যাল দেবে। ভাল ছেলে, ক্লাসে ফার্স্ট-সেকেণ্ড হয়। ভালভাবে পাশ করবে, সন্দেহ নেই। স্কলারশিপও পেতে পারে। তারপরে ডাক্তারি পড়াবেন, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেবেন তাকে। সরলাবালার বড় ইচ্ছা ছিল, মাস্টারের ছেলে মাস্টার না হয়ে দশজনের একজন হয় যেন! ক্যাম্বেলে ঢোকবার তোড়জোড় এখন থেকেই শুরু করবেন। তদ্বিরের জোর ছাড়া জগতে কিছু হয় না। কত ছাত্র কত দিকে আজ কৃতী হয়েছে, তাদের সাহায্য নিয়ে শুভোকে নিশ্চয় ঢোকানো যাবে! দেরি নয়, কাল-পরশু থেকে খোঁজখবর নিতে থাকবেন।

পাশবালিশটা কোলে টেনে নিলেন। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে দেখেন তুলোর ভিতর। জোড়ের মুখে নজর পড়ে চমকে উঠলেন, নতুন সেলাই যেন সেখানে। সেলাই খুলে ফেললেন তাড়াতাড়ি, তুলো টেনে টেনে বাইরে ফেললেন। ব্যাঙ্কের গোলমাল শুনে আঠারখানা একশ টাকার নোট তুলে এনে রেখেছিলেন। পাশ-বালিশের ভিতরে। বারোটা বছর মাসের পর মাস ধরে জমানো। নোট-ভরা এই পাশবালিশ বুকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমোতেন। দীপালি টের

পেয়েছিল কেমন করে। রাত্রিবেলা ছাতে ঘুরঘুর করে বেড়ানো, বাপের পা টেপা, মাথায় হাত বুলানো—সমস্ত এই জন্যে ?

খলখল করে আপন মনে হেসে উঠলেন মহিম। বরপণের টাকা নগদ আঁচলে বেঁধে তবে মেয়েটা বিদায় হয়েছে। দুহিতা কিনা—যথাসর্বস্ব দোহন করে নিয়ে দু-জনে পশ্চিম অঞ্চলে হনিমুনে বেরিয়ে পড়ল।

॥ পঁচিশ ॥

ঠিক এক বছর পরে।

মহিম আর ইস্কুলে যান না। পড়াবার ক্ষমতা নেই, অথর্ব হয়ে পড়েছেন। চাকরিটা ছাড়েন নি, লম্বা ছুটি নিয়ে আছেন।

শুভব্রত ইতিমধ্যে তিনটে লেটার পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করল। স্কলারশিপ অল্পের জন্য ফসকে গেছে। সেক্রেটারির কাছে মহিম হাঁটাহাটি লাগালেন : আমাদের এই অবস্থা, চালাতে পারছি নে সার। ছেলের একটা-কিছু করে দিন।

সেক্রেটারি বলেন, একেবারে ছেলেমানুষ যে। তার উপরে ভারতী ইনস্টিটুশনের নিয়ম হয়েছে, গ্র্যাজুয়েটের নিচে মাস্টার নেওয়া হবে না।

সে আমি জানিনে সার। সারা জীবন আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরে যাব বুড়ো বয়সে।

দয়াবান সেক্রেটারি, পুরানো শিক্ষককে ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। চাকরি হল শুভব্রতের। ইস্কুলের থার্ড ক্লার্ক—ক্লাসে ক্লাসে মাইনে আদায় করার কাজ। এ ছাড়া সকালে আর বিকালে অ-আ পড়ানো দুটো টুইশানি। পাঁচ টাকা করে দেয়। তার বেশি কে দিচ্ছে ? প্রাইভেটে আই. এ পড়ছে শুভো। আই. এ. পাশ করুক, বি. এ. পাশ করুক। গ্রাজুয়েট হলে মাস্টার করে নেবেন, সেক্রেটারি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সানগরের পাকাবাড়ি ছেড়ে দিয়ে মহিম ইস্কুলের কাছাকাছি একখানা টিনের ঘরে আছেন। সুধা বেহালায় জামাইয়ের বাড়ি উঠেছেন আবার। লোকপরম্পরায় শোনা গেল, সাতু ঘোষের রাগ পড়ে গেছে, ছেলে-বউকে সাদরে ঘরে তুলে নিয়েছেন। নিয়ে থাকেন নিয়েছেন, বড়লোকের ঘরের বউ দীপালি—মহিমের কেউ নয়।

ঝামেলা নেই কিছু এখন। বস্তির টিনের ঘরে দুই ছেলে আর বাচ্চা মেয়ে রূপালীকে নিয়ে আছেন। রান্নাবান্না করেন মহিম নিজে। খেয়েদেয়ে ভক্তো বেরিয়ে যায়, তারপরে আর কাজকর্ম থাকে না—পুণ্যব্রতকে নিয়ে বসেন একটু-আধটু। নানান গণ্ডগোলে পুণ্যের এতদিন পড়াশুনো হয় নি। বড্ড পিছিয়ে আছে—প্রথম ভাগ শেষ করে সবে দ্বিতীয় ভাগ ধরল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ।

স্তিমিত দৃষ্টি বইয়ের উপর মেলে ধরে মহিম পড়াচ্ছেন—

সদা সত্য কথা বলিবে। যে সত্য কথা বলে, সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না, সকলে তাহাকে ঘৃণা করে।

[ঠিক ঠিক! পরম সত্যবাদী সাতু ঘোষ। ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট প্রভাত পালিতও বটে—চরিত্রচর্চার বক্তৃতা করে গিয়েই রেবেকার গৃহে মৃত্যুবরণ।]

বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে, সকলে তোমাকে ভালবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না—

[তাই বটে! আমি মহিমারঞ্জন সেন বি. এ.—লেখাপড়ায় আলস্য করি নি, ফার্স্ট হয়েছি বরাবর। চিরদিন 'সত্যপথ ধরে চলেছি, দৈনিক জমাখরচে একটিবার নজর দিয়েই যে-কেউ বুঝবে। দুনিয়ার ভালবাসা তাই আমার উপরে—থার্ড-বি'র বেড়াল-ডাকা ছেলেপুলে থেকে নিজের আত্মজা দীপালির।]

পড়াতে পড়াতে মহিম স্তব্ধ হলেন একমুহূর্ত। বলেন, বানান করে করে পড়, মানে শিখে নে। কিন্তু বিশ্বাস করিস নে। সমস্ত মিছে, সমস্ত ধাপ্পা—

সূর্যবাবু এককালে যেমন. 'ভারতে ইংরেজ-শাসন' পড়াতেন। পড়িয়ে শেষটা বসে দিতেন, মুখস্থ করে রাখ, কিন্তু একবর্ণ বিশ্বাস কোরো না, বাজে কথা, সমস্ত ধাপ্পা।

—শেষ—

গ্রন্থপ্রকাশ | ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
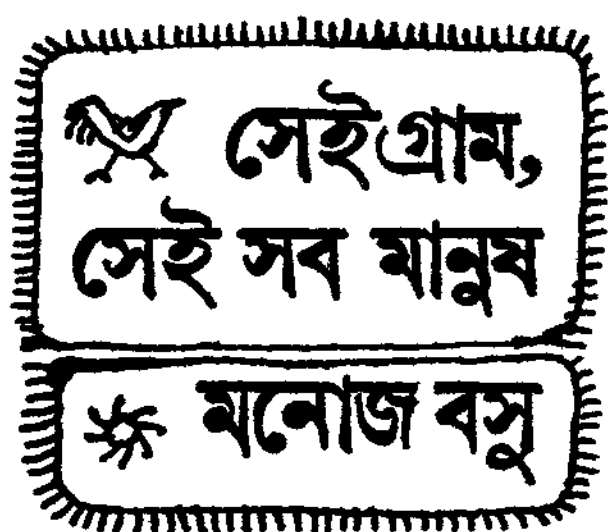
॥ এক ॥

যবনিকা তুলছি

এই শতকের প্রথম পাদ। মানুষেরা সেই সময়ের। গ্রামের চেহারা ভিন্ন।

আট বেহারার পালকি, গলা-ফাটানো ডাক ছাড়ছে। চারিদিকে তোলপাড। সবাই জিজ্ঞাসা করে: কে চললেন হে?

সোনাখড়ির দেবনাথ ঘোষ।

বাইরেবাড়ি পালকি নামাল। ছেলেপুলে দৌড়চ্ছে। মেয়েরা খিড়কির দুয়ারে উঁকিঝুঁকি দেয়। ভবনাথ রোয়াক থেকে নেমে পালকির পাশে দাঁড়ালেন। দেবনাথ বেরিয়ে এলেন। ধবধবে ফরসা রং, মাথাজোড়া টাক, লম্বা-চওড়া দেহ। বললেন, গলায় বাঁশ দিয়ে চেঁচাচ্ছিল তোমার বেহারারা, কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছে।

ভবনাথ হাসতে লাগলেন। দেবনাথ অনুযোগের কণ্ঠে বলেন, নাগরগোপে পালকি পাঠিয়েছ কেন দাদা? দেড়ক্রোশ পথ হাঁটতে পারব না, এতদূর অথর্ব হয়ে পড়েছি?

ভবনাথ বললেন, পারলেই হাঁটতে হবে তার কোন মানে আছে?

তুমি বড়ভাই হয়ে দশ ক্রোশ পথ কসবা অবধি হাঁটতে পার—তা-ও একদিন আধদিন নয়, পাঁচ-সাতবার মাসের মধ্যে—

ভবনাথ বললেন, হাঁটি তো সেইজন্যেই। গাড়ি-পালকির ভাড়া দিয়ে ফতুর হব নাকি? এক আধদিন হলে পায়ে হাঁটি না পালকি চড়ি, বিবেচনা করতাম।

ভাইয়ের উপর ধমকি দিয়ে উঠলেন: বকবকানি থামাও দিকি। কষ্ট করে এলে, জিরিয়ে নাওগে।

সর্দার-বেহারা কেষ্ট যোড়ল কোমরের গামছা খুলে ঘাম মুছছে। তাকে দেখিয়ে দেবনাথ বলেন, পালকির খোল থেকে উঠোনে নেমে পড়লাম—আমার কি কষ্ট? কষ্ট ঐ ওদের। পায়ের কষ্টের চেয়ে বেশী কষ্ট গলার। যা চেঁচান চেঁচাচ্ছিল—গলা চিরে রক্ত বেরুবে, ভয় হচ্ছিল আমার।

পথে দেবনাথ মানা করেছিলেন: অত চেঁচিও না কেষ্ট।

কেষ্ট বলল, জোরডাক ডাকতে হবে, বড়কর্তা বলে দিয়েছেন। পালকি পাঠানোই সেইজন্যে। ছোটবাবু বাড়ি আসছেন, দশে-ধর্মে জানুক।

চাকরিবাকরি করার আগে দেবনাথও গ্রামে ছিলেন, দাদার সঙ্গে কিছুদিন বিষয়আশয় দেখেছেন। কসবাতেও হেঁটে গিয়েছেন বার কয়েক। দশ ক্রোশ পথ অবাধে তখন হাঁটা চলত, এখন সামান্য দূর নাগরগোপ থেকে আসতেও পায়ে মাটি ঠেকানো চলবে না। চাকরে ভাই চুপিসাড়ে বাড়ি আসবে, সে কেমন কথা। পাইতকে হৈ-হৈ পড়ে যাক, পুববাড়ির আর সেদিন নেই। শত্রুজনে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরুক।

এই রকম চিরটা কাল। ভবনাথের ধরণ-ধারণ ও কাজকর্ম অন্য সকলের সঙ্গে বড়-একটা মেলে না। বাপ মারা গেলেন, তার অল্পদিন আগে বিয়ে হয়েছে, সন্তানাদি হয়নি, দেবনাথ নাবালক তখন। ভাসলেন তিনি সংসার-সাগরে। পৈতৃক দুটো গাঁতি এবং কিছু খামারজমি সম্বল—শরিকেরা নানান ক্যাকড়া তুলে মামলা জুড়ে দিল দেওয়ানি-ফৌজদারি উভয় প্রকার। মামলা একটার ফয়শালা হল তো নতুন আবার দুটো জুড়ে দিল. জিতুন না ভবনাথ, কত জিতবেন—জিতিয়ে জিতিয়েই ওঁকে খতম করবে, শরিকেরা এই পণ নিয়ে বসেছিল। তখন মা ছিলেন—ভবনাথকে তিনি কত করে বললেন, তোর জেঠার পায়ে গিয়ে পড়্, তাতে অপমান নেই। কখনো না—ভবনাথ গোঁ ধরে বসেছেন: মিথ্যেবাদী ফেরেব্বাজ উনি আবার জেঠা কিসের? পৈত্রিক এক-কাঠাও নষ্ট হতে দেননি ভবনাথ, অধিকন্তু বাড়িয়েছেন। আর এখন তো পাথরে-পাঁচ কিল—ভাই মানুষ হয়ে বাইরে থেকে পয়সাকড়ি আনছে। সংসার ভারী হয়েছে, ছেলেমেয়েদের বিয়েথাওয়াও হয়েছে কতক কতক। গেল শীতকালে বাগের মধ্যে নতুন পুকুর কাটা হয়েছে। কিন্তু যখন স্বপ্নের অতীত ছিল এই সমস্ত—

দেবনাথ তীক্ষ্ণবুদ্ধি। বাংলা লেখাপড়াও ভাল শিখেছিলেন। তখনকার দিনে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি শিখে উকিল হওয়া যেত। দেবনাথ উকিল হবেন। ভবনাথের বিশেষ ইচ্ছা তাই—ভাই উকিল হয়ে যদি সদরে বসেন, সাধ মিটিয়ে প্রতিপক্ষদের নাস্তানাবুদ করতে পারবেন। বাড়ি বসে আইনের বই টই পড়ে দেবনাথ তৈরি হয়েছেন—কলকাতা ছোটআদালতে পরীক্ষা, পাশ করলে সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন। রওনা হচ্ছেন কলকাতা—সেই মুখে বাগড়া। কপোতাক্ষে ষ্টিমার চালু হয়নি তখন, কসবার পথে মোটরবাস তো দূরস্থান ঘোড়ার-গাড়িও নেই। গোযান মাত্র সম্বল। কলকাতায় তাড়াতাড়ি পৌছানোর উপায়, গোটা দুই নদী পার হয়ে ক্রোশ পাঁচ-ছয় মাঠ ভেঙে নপাড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরা। শীতকাল বলেই সম্ভব এটা—বর্ষাকালে জলে ডুবে মাঠ-বিল সমুদ্র হয়ে থাকে। দেবনাথ নপাড়াতেই যাবেন।

এ-গ্রাম সে-গ্রামের আরও চারজন পরীক্ষার্থী—একসঙ্গে যাচ্ছেন সকলে। শেষকালে ভবনাথ রায় দিলেন: জামা-জুতো খোল, যাওয়া হবে না।

বৃত্তান্ত এই: সকালবেলা কুয়াসার মধ্যে ভবনাথ এজমালি কানাপুকুরে গেছেন মুখ-টুক ধোবার জন্য। গলদাচিংড়ি নজরে পড়ল—পাড়ের ঝাঁঝিবনে দাড়ি ভাসান দিয়ে চুপচাপ রয়েছে। বর্ষাকালে বিল আর পুকুর একচালা হয়ে যায়, তখন এই সমস্ত মাছ ঢোকে। ভবনাথ লাঠি নিয়ে দু-হাতে করে জলের উপর বাড়ি দেন, চিংড়ি ডুবে যায়, হাতড়া দিয়ে তুলে নেন সেটা। পাড় ঘুরে-ঘুরে এই কায়দায় মেরে বেড়াচ্ছেন। বেশ কতকগুলো হল—তিনটে তার মধ্যে দৈত্যাকার—কত বছর ধরে বড় হয়েছে, কে জানে। গলদাচিংড়ি কতই তো খায় লোকে, কিন্তু খাওয়া পড়ে মরুক—এমন জিনিস কালেভদ্রে কদাচিৎ চোখে দেখেছে। লাঠির ঘায়ে মাথা কেটে একটার ঘিলু বেরিয়ে গেছে, বাটিতে ঘিলু তুলে রাখল—হুবহু গব্যঘৃতের চেহারা, বাটি ভরতি হয়ে গেছে একেবারে। পরীক্ষার বাবদে ভাই এ-জিনিসে বঞ্চিত হবে, সেটা কেমন করে হয়? হুকুম হয়ে গেল: যাওয়া তোমার হতেই পারে না আজ।

দেবনাথ আকাশ থেকে পড়লেন: রাত পোহালে পরীক্ষা—বলছ কি দাদা?

ভবনাথ বললেন, পরীক্ষা ছ-মাস বাদে আবার হবে। পুকুরের মিঠাজলের এত বড় চিংড়ি আর মিলবে না। আমি তো দেখিনি—ছোটকর্তা আদ্যিকালের মানুষ, তিনিও দেখেননি বললেন।

হুকুম ঝেড়ে বাদ প্রতিবাদের অপেক্ষায় না থেকে ভবনাথ কোন্ কাজে হন-হন করে বেরিয়ে গেলেন। পুববাড়িতে ভবনাথকে ডিঙিয়ে কিছু হতে পারে, তেমন চিন্তাও আসে না কারো মনে। পরীক্ষা বাতিল করে দিয়ে দেবনাথকে অতএব চিংড়ি-ভোজনে বাড়ি থেকে যেতে হল। ছ-মাস পরে আবার পরীক্ষা—হাঁইপাই অবে ভুগছেন তখন। কাজে একবার বাধা পড়লে যা হয়—উকিল হওয়া তাঁর ভাগ্যে ঘটল না।

উকিল হলেন না, তবে ভাল একটা চাকরি হল। হীরালাল সম্পর্কে দেবনাথের জ্ঞাতিভাই, সমবয়সি। এক সময়ে দেশে-ঘরে থাকতেন, এখন কলকাতার বাসিন্দা। একবার সোনাখড়ি এসেছিলেন, দেবনাথকে টেনেটুনে নিয়ে চললেন: চলো আমার সঙ্গে, জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকিয়ে দেবো। আমার শাশুড়ির এস্টেট। শ্বশুরের নয়—শাশুড়ির, মাতামহের জমিদারি পেয়েছেন তিনি। একজন বিশ্বাসী আইনজ্ঞ লোক খুঁজছেন, তোমায় দিয়ে খাসা হবে।

চাকরি নেবার পরেও দেবনাথ মতলব ছাড়েননি। বিদেশে পড়ে থাকবেন না তিনি, উকিল হয়ে কসবায় এসে বসবেন। মাসে একবার-দুবার বাড়ি যেতে পাবেন। যাতায়াতের অসুবিধাও দূর হয়েছে। সদর থেকে পায়ে হাঁটা কিম্বা গরুর-গাড়ি ভিন্ন উপায় ছিল না, এখন ঘোড়ার-গাড়ি চালু হয়েছে। দাদার বন্ধু আর কার্তিক ধরের তিনখানা করে ঘোড়ার গাড়ি, আরও ক'জনের একখানা করে। কলকাতায় উপর রয়েছেন দেবনাথ, কার্যবিধি বইগুলো ঝালিয়ে ঝুলিয়ে নিচ্ছেন, এবারে পরীক্ষা দেবেনই। এবং পাশও হবেন নির্ঘাৎ। কিন্তু আসলে বরবাদ—বাংলা-উকিলের রেওয়াজ উঠে গেল সেই বছরেই—এন্ট্রান্স পাশের পর প্লিডারশিপ পাশ না হলে উকিল হওয়া যাবে না। সাধ অতএব চিরতরে ঘুচে গেল, জমিদারি চাকরিতে দেবনাথ কায়েমি হয়ে রইলেন।

চাকরির আগেই ভবনাথ পনের বছুরে ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে ন'বছুরে তরঙ্গিণীকে বউ করে এনেছিলেন। একবার দেবনাথ বাড়ি এলে তরঙ্গিণী এক কাণ্ড করে বসলেন। মেয়ে হয়েছে তখন—বিমলা। শহর কলকাতার নানান আজব গল্প শুনে মনে মনে লোভ হয়েছিল। চুপিচুপি স্বামীর কাছে বললেন, একলা পড়ে থাকো—বাসা করো না কেন কলকাতায়। আমি বেঁধেবেড়ে দিতে পারব, বিমিরও যত্ন হবে।

দেবনাথ বললেন: তোমার মেয়ের এবাড়ি বুঝি যত্ন নেই? খুবই অন্যায় কথা। তোমারও নেই, বুঝতে পারছি।

তখন অল্প বয়স—স্বামী বিদেশে পড়ে থাকেন। তরঙ্গিণী কতটুকুই বা বোঝেন তাঁকে। নালিশের বস্তা খুলে দিলেন—এর দোষ, তার দোষ। অমুক এই বলছিল, তমুক এই বলছিল। শতমুখে বলে গেলেন—বাসা করার পক্ষে তাতে যদি সুরাহা হয়।

চুপ করে শুনছিলেন দেবনাথ। অবশেষে কথা বললেন, তবে তো তোমার তিলার্ধ থাকা চলে না এ-সংসারে। কালই একটা এস্পার-ওস্পার করতে হবে।

দেবনাথের স্বর অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। ভয় পেয়ে গেলেন তরঙ্গিণী। কী কাণ্ড করে বসেন না জানি ও-মানুষ।

তখন আবার সামলে নিতে যান: তা কেন। মেয়েটাকে কোলে কাঁখে করতে পারিনে, সেই কথা বলছি। সংসারের খাটাখাটনি, সময় পাওয়া যায় না। দুধ খাওয়ানোর গরজে দু'বার-চারবার নিয়ে আসে—সেই সময় যা-একটু ধরতে পাই। দিনের কোলে কোলে ঘোরে, দিদিরও বেশ ন্যাওটা তাঁরা

কি আর যত্ন-আদর করেন না? তেমন কথা কেন বলতে যাব? তাহলেও মায়ের টান আলাদা, পুরুষ হয়ে সে-জিনিষ বুঝবে না।

হেসে তরল কণ্ঠে বলেন, নতুন বুলি ফুটেছে মেয়ের—বা-বা বা-বা করে। দু'বছর বয়স হল, বাবাকে চেনেই না মোটে। দেখল কবে যে চিনবে?

তা সে যেমন করেই বলো, ভবী ভোলবার নয়। রান্নাঘরের দাওয়ায় পরদিন পাশাপাশি দু' ভাই খেতে বসেছেন—মেয়ে-বউ সব রাঁধাবাড়া দেওয়া থোওয়া নিয়ে ব্যস্ত। দেবনাথ বললেন, দাদা, ছোটবউর উপর বাড়ির সবসুদ্ধ বিষম অত্যাচার করছে।

স্তম্ভিত ভবনাথ। বললেন, সে কি রে!

অত্যাচার কি এক-আধ রকম! তার হেনস্থা, মেয়ের অযত্ন—মোটের উপর, বাড়ির কেউ দু' চক্ষে ওদের দেখতে পারে না। বড্ড ঘুম আসছিল তখন, সব কথা আমার মনে নেই। কলকাতায় বাসা করতে বলছে। কিন্তু বাসা হলেও কাউকে বাদ দিয়ে তো হবে না—আশ্রিত-প্রতিপাল্য চাকর-বাকর সকলকে নিয়ে বাসা। জমিদারের নায়েব হয়ে অত খরচা কোত্থেকে কুলোব? তার চেয়ে ছোটবউকেই বাপের-বাড়ি পাঠানো ভাল। এক মায়ের এক মেয়ে—থাকবে ভাল, খাবে ভাল, মেয়ে নিয়ে সারাক্ষণ আদর-সোহাগ করতে পারবে—

থামো—বলে ভবনাথ ভাইকে থামিয়ে তরঙ্গিণীকে ডাকতে লাগলেন: মা, ওমা—

তরঙ্গিণী দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেবনাথের কথা সব কানে গেছে, তিনি শরমে মরে আছেন।

ভবনাথ বললেন, আমার সঙ্গে তো কথা বলবে না মা। অসুবিধের কথা খুলে সমস্ত তোমার বড়মাকে বলো—

দেবনাথ বলে উঠলেন, বউদি'ই তো বড় শত্রু। শত্রু কে নয় এ-বাড়ির মধ্যে? শোন দাদা, তালিতুলি দিয়ে চালানোর অবস্থা আর নেই। দু'দিনের তরে বাড়ি এসেছি—আমার কানে পর্যন্ত উঠেছে—বুঝলে না? ঐ আমি যা বললাম, তাছাড়া ওষুধ নেই।

ভবনাথ হুঙ্কার দিয়ে ভাইকে নিরস্ত করলেন: থাক্। মাতব্বরি করতে হবে না—চিরকেলে মোটাবুদ্ধি তোমার। বউমাকে এ-সংসারে আমি এনেছি। দায়িত্ব আমার—যা করতে হয়, আমি বুঝব সেটা। বাপের-বাড়ি পাঠাতে হয়তো সে বড়বউকে। সে আগে এসেছে, বউমা পরে। কেন সে মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে পারে না।

তরঙ্গিণী মনে মনে ভাবছেন : বয়ে গেছে বাপের-বাড়ি যেতে। বললেই গেলাম আর কি! যিনি পাঠাতে চান, তিনি তো কর্তা নন। আসল-কর্তা আমার দিকে। খাও কলা।

এরপর ভবনাথ উমাসুন্দরীকে নিয়ে পড়লেন : মানিয়ে-গুছিয়ে চলতে না পারো তো সংসারের বড় হয়েছ কেন? মাথা আমার হেঁট করে দিলে।

ভয় পেয়ে উমাসুন্দরী বললেন, আমি কি করলাম?

যা-সমস্ত করবার, করোনি তুমি। বাপেরবাড়ি তোমারই চলে যাওয়া উচিত। একফোঁটা মেয়ে এনে তোমার সংসারে দিলাম—দশ-দশটা বছরেও বাঁধতে পারলে না, চলে যাবার কথা বলে।

উমাসুন্দরী চোখ মুছলেন। দোষ তাঁরই—কৈফিয়তের কিছু নেই। এর পরে তরঙ্গিণীর ডাক পড়ল। ভাসুরের ঘরে গেলেন না তিনি, দরজার বাইরে দাঁড়ালেন।

ভবনাথ বলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী-ঠাকরুনকে খুঁজেপেতে ঘরে এনে প্রতিষ্ঠা করেছি। সংসার উথলে উঠছে সেই থেকে। কিসের ব্যথা আমায় বলো মা। আমি তোমায় এনেছি, কষ্টের আমি বিহিত করব।

ঘাড় নাড়লেন তরঙ্গিণী, কোন ব্যথা নেই। কোন অভিযোগ নেই তাঁর। দেবনাথের উপর অভিমানে দু' চোখে ধারা গড়াচ্ছে। একটুকু কথা থেকে কত বড় কাণ্ড জমিয়ে তুললেন বাড়ি মধ্যে। লজ্জায় কারো পানে তিনি মুখ তুলতে পারেন না।

কথাবার্তা বন্ধ দেবনাথের সঙ্গে। রাত্রিবেলাতেও না। আষ্টেপিষ্টে কাপড় জড়িয়ে মেয়ে নিয়ে এক প্রান্তে শুয়ে থাকেন। কাঁচা বয়স তখন দেবনাথের—বারো মাস বিদেশে পড়ে থাকেন, কয়েকটা দিনের জন্য বাড়ি এসেছেন, তার মধ্যে এই বিপত্তি। হাত ধরে কাছে টেনে—দুটো খোশামুদির কথা বললেন, তরঙ্গিণী অমনি ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন।

বিপাকে পড়ে দেবনাথ উমাসুন্দরীকে ধরলেন : ছিঁচকাঁদুনে নিয়ে মুশকিল হল বউঠান। উপায় কি বলো।

উমাসুন্দরীর রাগ আছে, কথা ঝেড়ে ফেলে দিলেন একেবারে : আমি কিছু জানিনে ভাই। কর্তার কাছে লাগানি-ভাঙানি করতে গিয়েছিলে যেমন। এক-বিছানায় শুয়ে মেয়েমানুষে অমন কত কি বলে থাকে। আমরাও বলেছি। ভাইয়ের কাছে পুটপুট করে সমস্ত বলতে হবে, এমন কখনো শুনিনি। বলবার ছিল তো আমায় বলতে পারতে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়েছিলে যেমন—হাত ধরে না হয় তো পা জড়িয়ে ধরোগে যাও। আমি জানিনে।

॥ দুই ॥

পুরোনো কথা এমনি বিস্তর আছে। ভবনাথ আর দেবনাথ রাম-লক্ষণ বলে গাঁয়ের লোক তুলনা দিয়ে থাকে। সৌভাগ্য উথলে উঠছে। তরঙ্গিনীর মেয়ের পর মেয়ে হতে লাগল—পরপর তিনটি। ছেলের আশা সকলে ছেড়ে দিয়েছিল, তা-ও হয়েছে। ছেলের নাম কমল—পয়মন্ত ছেলে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দেবনাথের পদোন্নতি—সদর-নায়েব থেকে ম্যানেজার। খরার সময় শরিকী প্রাচীন পুকুরের জল খারাপ হয়ে যায়—এবারে শীতকালে বাগের মধ্যে নিজেদের নতুন পুকুর কাটা হয়েছে। কিস্তির খাজনা কালেক্টারীতে জমা দিয়ে হাইকোর্টের কিছু মামলা-মোকদ্দমার কাজ সেরে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে দেবনাথ বাড়ি এসেছেন। থাকবেন কিছুদিন,—সারা জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আম-কাঁঠাল খেয়ে তারপর যাবেন। ভাল ভাল কলমের চারা নিয়ে এসেছেন এক বিখ্যাত লোকের বাগান থেকে—আম, লিচু গোলাপজাম জামরুল, সপেটা, বিলাতিগাব—গন্ধমাদন বিশেষ। চারাগুলো কসবা থেকে দুখান গরুর-গাড়ি বোঝাই হয়ে পরম যত্নে আসছে। কাছারির দুজন বরকন্দাজ সঙ্গে এসেছেন, তাদের উপর চারা পৌঁছে দেবার দায়িত্ব, সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবে তারা। পুকুরের তোলা মাটিতে গাছ লাগালে ধাঁ-ধাঁ করে বড় হয়ে উঠবে—জমিদারির শতেক কাজের মধ্যেও সে খেয়াল আছে। বাড়ির কথা দেবনাথ তিলেকের তরে ভুলতে পারেন না। বাড়ি কেন, সারা সোনাখাড়ি গ্রাম তাঁর নখদর্পণে। গাঁয়ের লোক পেলে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়শিদের খবরাখবর নেন।

একটা এস্টেটের ম্যানেজার নাগরগোপে বাস থেকে নেমে টং-টং করে বাড়ি পর্যন্ত হাঁটবে, সে কেমন। ভবনাথ অতএব পালকির ব্যবস্থা করলেন। খুব একটা অন্যায় অপব্যয় নাকি? হয়ে থাকে হয়েছে—পূববাড়ির বড়কর্তা কারো কাছে কৈফিয়তের ধার ধারেন না।

দুই মাহিন্দার আজ মাসখানেক ধরে চারাগাছের ঘের বুনেছে, বাদামতলায় গাদা দেওয়া রয়েছে সেগুলো। সারা বিকাল ভবনাথ ও দেবনাথ দুই ভাই বাগান ও নতুনপুকুরের চারি পাড়ে ঘুরছেন, মাহিন্দার শিশুবর কোদালি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আছে। আষাঢ়ে চারাপোনা বেচতে আসবে, রুই, কাতলা, মৃগেল—সে তো ছাড়া হবেই। তাছাড়াও এখানটা এই কাঁঠালগাছের পাশ দিয়ে নালা কেটে বিলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাক। শিশুবর, ক' কোদাল মাটি কেটে নিশানা কর দিকি জায়গাটা। বিলের নিখরচার মাছ নালার পথে পুকুরে এসে ঢুকবে।

চারার গাড়ি এসে পৌঁছনোর পর কোন চারা কোথায় পোঁতা হবে, তারও ভাবনাচিন্তা বিচারবিবেচনা হচ্ছে। কোদালের কোপ দিয়ে শিভবর জায়গা চিহ্নিত করে যাচ্ছে। সকাল থেকেই গর্ত খুঁড়ে পোঁতার কাজ আরম্ভ। চারা কম নয়, এবেলা-ওবেলা সমস্তটা দিন লেগে যাবে।

দেবনাথ বললেন, গোলাপখাস বিলের ধারে দিও না দাদা। কাঁচা থাকতেই আমে লালের ছোপ ধরে যায়—চাষারা লাঙল চষতে এসে, ঢিল আর এড়ো মেরে কাঁচা আমই শেষ করে ফেলবে, পাকা অবধি সবুর করবে না। গোলাপখাস বাড়ির ধারে দাও, বরঞ্চ গোপলাখোবা ওখানে। গোপলা-খোবা পেকে গেলেও বোঝা যায় না, উপরটা কাঁচা থাকে। আর কাঁচামিঠে বাগের ভিতরেই না, উঠোনের এক পাশে। কাঁচা অবস্থায় খেতে হয়, পাকলে বিস্বাদ হয়ে যায়। নজরের উপর না থাকলে এ-আমের গুটিই খেয়ে ফেলবে মানুষে, বড় হতে দেবে না। আর একরকম এনেছি দাদা, বিষম টোকো—

নামেই ভবনাথ চমকে গেলেন, দেবনাথ মিটিমিটি হাসছেন।

ভবনাথ বলেন, টোকো আমের অভাব আছে ? ঝঞ্চাট করে ও আবার আনতে গেলে কেন ?

দেবনাথ বললেন, নামেই শুধু টক—আমে টকের ভাঁজও নেই। ভারি মিষ্টি আম।

গাছে নতুন আম ফললে পাড়ার লোকে নাকি জিজ্ঞাসা করেছিল : কেমন, আম, টক না মিষ্টি ? মুখ বাঁকিয়ে মালিক জবাব দিয়েছিল : বিষম টক। কোনো লোক তলার দিকে আসবে না, গাছের সব ক'টি আম নির্বিঘ্নে নিজেরা খাবে—ভয়-ধরানো নাম সেইজন্য। তারপরে অবশ্য সব জানাজানি হয়ে গেল—আমের নামে তবু কলঙ্ক রয়ে গেল—'বিষম-টোকো'।

চারা পৌঁছতে বেশি রাত্রি হয়ে গেল। তা হোকগে, রোপণ তো কাল। যোগাযোগটা ভাল, পাঁজির মতে বৃক্ষরোপণের দিনও বটে আগামীকাল। বিকেল তিনটা-পাঁচ থেকে ছ'টা-ছত্রিশ। অঢেল সময়, তিন ঘন্টারও বেশি। সকালবেলার দিকে গর্ত খোঁড়া সমাধা করে রাখবে। সেই গর্তে নির্দিষ্ট চারা নামিয়ে কিছু ঝুরো মাটি ভিতরে ছড়িয়ে দিয়ে পরের গর্তে চলে যাবে। বাকি সমস্ত কাজ—গর্ত ভরাট করা, ঘের বসানো বাহিন্দার দু'জন শেষ করবে। কঞ্চির বুনানি গোলাকার ঘের বানিয়ে রেখেছে—চারা বেড় দিয়ে বসিয়ে দেবে, গরু ছাগলে খেতে না পারে। চারা বড় হচ্ছে, ও'দিকে রোদ-বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে ঘেরও জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে একদিন ভেঙে পড়বে—চারা তখন গাছ হয়ে গেছে, ঘেরের আর প্রয়োজন নেই।

গাছ পোঁতা—এ-ও যেন এক পরব। কবি-মনোভাব দেবনাথের (অল্পসল্প লেখেনও)—যে কাজে হাত দেন, কাজটা যেন আলাদা এক চেহারা নিয়ে নেয়। বাড়ির লোক বাগের মধ্যে এসে জুটেছে। ভবনাথ, দেবনাথ তো আছেনই, ভবনাথের তিন ছেলে—কৃষ্ণময়, কালীময় ও হিরন্ময় এবং মেয়ে নির্মলা, আর দেবনাথের মেয়ে পুঁটি। কমললোচন বাচ্চাছেলে, দিদি পুঁটির হাত ধরে সে ও এসেছে। পুঁটির উপরের মেয়ে চঞ্চলা শ্বশুরবাড়িতে, মচ্ছবের মধ্যে সে নেই। আর বউ-গিন্নিরাও আসতে পারেন নি বাইরের এত মানুষের সামনে—গাছ পোঁতার ব্যাপারে তাঁরা সব বাড়ি রয়ে গেছেন।

দেবনাথ বলছেন, চারা গর্তে দেবার সময় সবাই একটু করে হাত ঠেকিয়ে দাও, একমুঠো করে মাটি দিয়ে দাও গোড়ায়। কেউ বাদ থাকবে না।

কমলের হাত নিয়ে চারায় ঠেকানো হচ্ছে, মাটিতেও একটুকু হাত ছুঁইয়ে দিয়ে সে মাটি গর্তে ফেলছে। দেবনাথ বললেন, সকলের হাতের পোঁতা গাছ। নিজের গাছ বলে মমতা হবে, ডালখানা কাটতেও প্রাণে লাগবে। এই কমল ছোট্ট এখন, কোন-কিছু বোঝে না—কিন্তু বড় হয়ে সমস্ত শুনে গাছপালার উপর অপত্যস্নেহ জাগবে ওর।

পাড়ায় চাউর হয়ে গেছে। ব্যাপারটা শুধু আর পূববাড়ির মধ্যে নেই। নিত্যিদিনের খাওয়া পরার বাড়তি কিছু হলেই গ্রামের মানুষ ঝুঁকে এসে পড়বে। তারিফ করছে সকলে দেবনাথের : শুনে যাও—চেয়ে দেখ। কোন কালে কি হবে, মাথার ভিতরে সেই ভবিষ্যদিনের ভাবনা। বিদেশের ভাল ভাল মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসার ফলে এমনি সব চিন্তাভাবনা আসে।

বাগের কলরব বাড়ির মধ্যে দক্ষিণের ঘর অবধি এসেছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে তরঙ্গিণীর দু'চোখ জলে ভরে গেল। কৃষ্ণময়ের বউ অলকা কি কাজে ঘরে এসেছে। তরঙ্গিণী সামলাবার সময় পাননি, দেখে ফেলেছে সে। কাছে এসে প্রশ্ন করে : ছোটমা, কি হয়েছে?

কিছু হয়নি—কী আবার হবে! তুমি যাও।

অলকা নড়ে না। নিজের আঁচলে খুড়শাশুড়ির চোখ মুছিয়ে দিল। বলে, বলো। কেন কাঁদছ, বলো আমায়।

একটা জিনিস মনে উঠল। বলে, কাকামশায় কিছু বলেছেন নাকি?

তরঙ্গিণী ঝেড়ে ফেলে দিলেন : না না, উনি কি বলবেন। দেখাই বা হল কোথায়?

অলকাকে তারপর সামাল করে দেন : কাউকে এসব বলতে যেও না

বউমা, সবাই মিলে ওখানে আনন্দ করছে—আমার চোখে জল। খুবই খারাপ সত্যি।

জেদ ধরে অলকা বলে, কী হয়েছে বলো তবে।

একমুহূর্ত নিঃশব্দে তরঙ্গিণী তাকিয়ে রইলেন। ঠোঁট দুটো অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। বললেন, আমার বিমি থাকলেও বাগে গিয়ে কত আহ্লাদ করত।

ধৈর্য হারিয়ে হাউ-হাউ করে তিনি কেঁদে উঠলেন।

নয় বছরেরটি হয়ে মারা গিয়েছিল তরঙ্গিণীর প্রথম সন্তান বিমি—বিমলা। কত কাল হয়ে গেছে। আচমকা কেন জানি একদিন বিমলা বলেছিল, আমি মরে গেলে, মা, তোমার উনুনে কাঠ দেবে কে?

তরঙ্গিণী বিষম এক ধমক দিলেন: চোপ। একফোঁটা মেয়ে তার পাকা পাকা কথা শোন।

উঠানে কলাই শুকোতে দেওয়া আছে। আকাশ-ভরা মেঘ—ছড়-ছড় করে বৃষ্টি নামল। অকালবর্ষা। ভিজে গেল রে সব, ভিজে গেল। ও বিমি—

কোথায় ছিল বিমলা, ছুটে এসে পড়ল। বাতাস বেধে রাঙা শাড়িটুকু ফুলে উঠেছে—পাখনা-মেলা পরীর মত উড়ে এলো যেন। তরঙ্গিণী কুনকে ভরে দিচ্ছেন, মেয়ে বয়ে বয়ে ঘরে নিচ্ছে। মেজেয় ঢেলে আবার কুনকে নিয়ে আসে।

কাঁথা সেলাই করেন তরঙ্গিণী কাঁথার ডালা নিয়ে। পাশে বসে বিমলাও পুতুলের কাপড় সামান্য এক ন্যাকড়ার টুকরোর উপর ফুল তোলে।

সেই মেয়ের ভেদবমি। কবিরাজ জল বন্ধ করে গেছেন, আর বিমলা 'জল' 'জল' করে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে: দাও মা জল—একটুখানি দাও। কবিরাজ টের পাবে না।

সামনে থাকলে এমনি তো করবে অবিরত—তরঙ্গিণী একটু আড়ালে গিয়েছেন, মেয়ে সেই ফাঁকে গড়াতে গড়াতে একেবারে জলের কলসির কাছে। কলসিতে জল কোথা, খালি কলসি ঢনঢন করছে।

তরঙ্গিণী অবাক হয়ে বললেন, তক্তাপোষ থেকে নেমে পড়েছিস—কেন রে?

জল দাও—

মেয়েকে আলগোছে আবার উপরে তুলে দিয়ে তরঙ্গিণী বললেন, কষ্ট করে একটু থাক্‌ মা, সেরে ওঠ্‌। কত জল খেতে চাস খাবি তখন।

ঘুমোল মেয়ে। মা ঘুরেফিরে আসেন, আর গায়ে হাত দেন। ঠাণ্ডাই তো। চুপচাপ ঘুমুচ্ছে—তবে আর কি! বাগের মধ্যে কুয়োপাখি ডাকছে: কুব-কুব-

ডুব। অকক্ পাখি ডেকে জানান দিল দুই প্রহর হয়ে গেছে। ভুতুম ডেকে উঠল বাদামগাছ থেকে। তরঙ্গিণীর গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঝিঁঝিপোকারা কাঁদছে যেন। জোনাকি আজ রাত্রে বড্ড বেশি।

হাত-পা ঠাণ্ডা যে মেয়ের। লোকজন ভেঙে এসেছে। সোনার বিবি আমার, চোখ মেল্, 'মা' বলে ডাক্ একটিবার তুই—

বিমলার দেহ শ্মশানে নিয়ে যায়। অল্প অল্প রোদ উঠেছে। মরেছে বিমলা, কে বলবে। গায়ের রং ঝিকমিক করছে। মুখে হাসি লেগে আছে। রোগের যন্ত্রণা নেই, জল তেষ্টা পাচ্ছে না আর—

কত কাল গেছে তারপর।

দু-বছর আগে এমনিধারা বৈশাখ মাসের দিনে বাড়িতে বৃহৎ উৎসব। ভবনাথের মেয়ে নিশি আর দেবনাথের দ্বিতীয় মেয়ে চঞ্চলার একই রাত্রে বিয়ে। ঢোল কাঁসি সানাই নিয়ে দেশি বাজনা, জয়ঢাক ব্যাণ্ড কর্নেট নিয়ে বিলাতি বাজনা। গ্রাম তোলপাড়। দুড়ুম-দাড়াম গেঁটেবন্দুক ফুটছে, ঘট-বাজি সবাবাজি চরকি হাউই দীপক-বাজি হরেক রকমের। ভোজের পর ভোজ চলছে, যেন তার মুড়োদাঁড়া নেই। বিয়ের প্রীতিউপহার ছাপানোর নতুন রেওয়াজ উঠেছে—শহরে বাসিন্দা দেবনাথ মেয়ে-ভাইঝির বিয়ের তা-ও ছাপিয়ে এনেছেন। আলাদা ধরণের পদ্য—আর দশ জায়গায় যা দেয়, সে জিনিস নয়:

> কখনো কন্যা কামনা কেউ যেন না করে,
> ভুজঙ্গের হার গলে সাধ করে কেবা পরে?
> মাতৃদায় পিতৃদায় এর কাছে লাগে কোথায়,
> কন্যাদায়ে হায় হায়, কান্নাকাটি ঘরে ঘরে।...

আনন্দ-সমারোহের মধ্যে কারো মনে পড়ল না একফোঁটা বিমির কথা, বেঁচে থাকলে আগেই তার বিয়ে হয়ে যেত। পালকি করে কোলে কাঁখে একটি-দুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বোনেদের বিয়েয় চলে আসত সে। সবাই বিমিকে ভুলে গেছে—তরঙ্গিণী সেদিনও খুব গোপনে চোখের জল মুছেছিলেন, কেউ টের পায় নি। আজকে হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন।

চারা পোঁতা সারা হতে প্রায় সন্ধ্যা। নতুনপুকুরে তালের গুঁড়ির ঘাটে নেমে দেবনাথ ডুব দিয়ে দিয়ে অবগাহন-স্নান করলেন, গায়ের কাদামাটি ধুলেন। দেহ কিন্তু ঠাণ্ডা হয় না। পুকুরের ধারে কাছে গাছপালা নেই। শুধু কয়েকটা নারকেল-চারা পোঁতা হয়েছে ক'দিন। সারাদিনের ঠা-ঠা রোদে জল

একেবারে আগুন হয়ে আছে। গুমট গরম, লেশমাত্র হাওয়া নেই, গাছের পাতাটি কাঁপে না।

পাঁচিলের দরজার ডান দিকে তুলসীমঞ্চ। শ্বেততুলসী কৃষ্ণতুলসী দুই রকমের দু'টো গাছ, ক্ষুদে ক্ষুদে চারাও আছে। মাটি দিয়ে গোঁড়া বাঁধানো, লেপা-পোঁছা, ঝকঝক তকতক করছে, পালেপার্বণে আলপনা দেয়। মাথার উপরে ঝারি দুটো—নিচু খুঁটি পুঁতে আড় বেঁধে ছিদ্রকুম্ভ ঝুলিয়ে দিয়েছে, কুম্ভের ভিতরে জল। টপটপ করে অহর্নিশি ফোঁটায় ফোঁটায় তুলসীর মাথায় জল পড়ছে। জল এক ফুরিয়ে যায়, কুম্ভ পরিপূর্ণ করে দেয় আবার। সারা বৈশাখ ধরে তুলসী-সেবা চলবে, তাপের ছোঁয়া এতটুকু না লাগে। আদর পেয়ে পেয়ে গাছের বাড-বৃদ্ধি বিষম, বড় বড় পাতা—পাতায় ডালে ছত্রাকার হয়েছে।

নিমি তুলসীতলায় পিদিম এনে রাখল, ধুপধুনো দিচ্ছে। দেবনাথ ঢুকে পড়ে পিছনটাতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিঃশব্দে দেখছেন। আঁচলটা গলায় বেড় দিয়ে মাটিতে মাথা রেখে বিড়বিড় করে কী সব বলছে। মাথা তুলে দেবনাথকে দেখল।

সকৌতুকে দেবনাথ জিজ্ঞাসা করেন : কী মন্তোর পড়ছিলি রে?

শুনবে কাকাবাবু? শোন—

হাসতে হাসতে বলে যাচ্ছে :

তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন
তোমার তলায় দিয়ে বাতি
হয় যেন মোর স্বর্গে গতি।

পিদিম দিয়ে সব মেয়ে এই বলে থাকে, নিমিও বলেছে। দেবনাথের বুকের মধ্যে তবু মোচড় দিয়ে উঠল। একফোঁটা মেয়ের স্বর্গচিন্তা—সংসার বিষিয়ে উঠছে। আগের দিন হলে কাকা-ভাইঝিতে হাসিতামাসা হয়তো চলত—আজকে দেবনাথ আর দাঁড়াতে পারলেন না, মুখ ফিরিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

দু বছর আগে এমনি বৈশাখ মাসের দিনে আশাসুখে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন—দেবনাথের নিজের মেয়ে চঞ্চলা, আর ভবনাথের মেয়ে নিমি—নির্মলা। একই তারিখে—নিমির গোধূলিলগ্নে হল, আর চঞ্চলার হল দশটা পঁচিশ মিনিট গতে।

চঞ্চলা শ্বশুরবাড়িতে সুখেস্বচ্ছন্দে আছে—এক দোষ, তারা বউ পাঠাতে

চায় না মোটে। তরঙ্গিণী বেয়ানকে দোষেন আর নাকিকান্না কেঁদে বেড়ান। নিমির বেলা উল্টো—একেবারেই তারা বউ নেয় না। এবং এঁদেরও পাঠাতে আপত্তি। ভবনাথ বিয়ের আগে পাত্রের বৈষয়িক খোঁজখবর নিখুঁতভাবে নিয়েছিলেন, কিন্তু খোদ পাত্র নিয়ে তত মাথা ঘামান নি। কানে আপনা-আপনি কিছু এসেছিল, তিনি উড়িয়ে দিলেন: জ্ঞাতি-শত্রুরা ভাংচি দিচ্ছে, ওসবে কান দিতে গেলে পল্লীগ্রামে কারোই কোনদিন বিয়ে হবে না। বাহির-টান একটু-আধটু যদি থাকেও—বেটাছেলের অমন থেকে থাকে, সে কিছু ধর্তব্য নয়—বিয়ের পরে শুধরে যায়। বাজিবাজনা করে বিস্তর আড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল—আর দু'টো বছর না যেতেই মেয়েটা যেন যোগিনী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর-দেবতার উপর ভক্তি বেড়ে গেছে, দেবস্থান দেখলেই মাথা খোঁড়ে।

দালানকোঠা দেবনাথের পছন্দ নয়, বাড়ি এসে খড়ের ঘরে থাকেন তিনি। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা ঘর—দেয়াল অবশ্য পাকা, কিন্তু চাল খড়ের মেঝে মাটির। দুদিকে দুটো দাওয়া আছে—দক্ষিণের দাওয়া, উত্তরের দাওয়া। দেবনাথ দক্ষিণের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে নিয়ে বসলেন। নিমি কোন দিকে ছিল—ছুটে এসে ধবধবে তাকিয়া পিঠের দিকে দিল। তালপাতা-পাখা নিয়ে পাশে বসে বাতাস করছে। সামনে উঠান আছে একটা, ধান উঠলে তখন এই উঠানের গরজ—মলা-ডলা সমস্ত এখানে। এখন ঘাসবন হয়ে আছে। বাঁ-হাতে গোয়াল, ডাইনে কাঠকুটো রাখার চালাঘর আর সামনাসামনি একফালি কানাপুকুর। দামে ও হোগলায় পুকুর প্রায় আচ্ছন্ন—পাড়ের কাছে খানিকটা অংশে জল পাওয়া যায়, বাসন মাজাটা চলে সেখানে। গিন্নি-বউদের কায়ক্লেশে আগে স্নানও সারতে হত, বাগের পুকুর কাটা হয়ে সে দুঃখের অবসান হয়েছে। বাতাস বন্ধ। কানাপুকুর-পাড়ে ডালপালা-মেলানো প্রাচীন টুরে-আমগাছ, একটি পাতা নড়ছে না গাছের এখন।

খাওয়াদাওয়া সেরে এবং ভবনাথের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগাছা করে দেবনাথ আবার দক্ষিণের দাওয়ায় এলেন। মাদুর তাকিয়া পাখা সেইখানেই আছে। ভিন্ন অবস্থা এখন। হাওয়া দিচ্ছে, ডালপালা দুলছে। চাঁদ উঠে গেছে খানিক আগে। বসা নয়—তাকিয়া মাথায় দিয়ে গড়িয়ে পড়লেন তিনি। গ্রাম নিশুতি, এ-বাড়ির রান্নাঘরের পাট এখনো বোধহয় কিছু বাকি। তরঙ্গিণী ঘরে আসেননি। জোনাকি উড়ছে গোয়ালের ধারে, হাসনুহানার ঝাড়ে জমেছেও বিস্তর—জ্বলছে আর নিভছে। টুরে-গাছের ছোট ছোট আম, কিন্তু মধুর মতন মিষ্টি। ফলেছেও অফুরন্ত। কিন্তু হলে হবে কি—বড্ড নরম বোঁটা, হাওয়ার ভর সয় না। হাওয়ায় তো পড়ছেই, আবার বাদুড়ের ঝাঁক ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়ছে আমডালের উপর। টুপ-টুপ করে তলায়

পড়ছে আম। কানাপুকুরের জলের মধ্যেও পড়েছে। হাতড়া দিয়ে যেমন করে জলের মাছ ধরে, পচা গাদের মধ্যে নেমে কাল সকালে তেমনিধারা হাতড়া দিয়ে পাকা আম তুলবে। বিশাল দেবদারু গাছ কানাপুকুর-পাড়ে—দেবদারু-ফলের লোভে তার উপরেও ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড়। কিচিরমিচির আওয়াজ। ফুটফুটে জ্যোৎস্নার উঠানের উপর কালো কালো ছায়া ফেলে উড়ছে। শিয়াল ডেকে গেল বাঁশবনে। গোয়ালের ভিতর থেকে গরুর আবর-কাটা ন্যাজ লেজের ঝাপটায় শব্দ—সাঁজাল নিভে গিয়ে বোধহয় মশায় কামড়াচ্ছে অবলা জীবদের। মানকচু-বনে শজারু একটা ছুটে গেল—ঝুনঝুন আওয়াজে মল বাজিয়ে যাওয়ার মতন। অতবড় হাসনুহানার ঝোপ ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে, বাতাসে গন্ধ এসে চারিদিক আমোদ করে তুলছে। সন্ধ্যারাত্রে সব কেমন নিঝুম হয়েছিল—এবারে মানুষজন ঘুমিয়েছে তো অন্যেরা সব আড়ামোড়া খেয়ে জেগে উঠল।

তরঙ্গিণী ঘরে এসেছেন। এদিককার দরজায় চৌকাঠে এসে দাঁড়ালেন। ডাকছেন: ঘরে আসবে না?

দেবনাথ তন্ময় হয়ে ছিলেন। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, আর একটু থাকি। এসো না তুমি, ভারি চমৎকার।

তরঙ্গিণী একটু-খানি চুপ করে থাকেন। দেখছেন দেবনাথকে। অন্যের স্বামী আর তরঙ্গিণীর স্বামী একরকম নয়—বারোমাস বিদেশে পড়ে থাকেন, দুর্লভ বস্তু। বয়স হয়েছে কে বলবে—লম্বাচওড়া দশাসই পুরুষ, ধবধবে গায়ের রং প্রশস্ত ললাট মাথাভরা টাক। টাকে যেন আরও রূপ খুলেছে। জ্যোৎস্নার আলো কপালে এসে পড়েছে, আধ-শোয়া হয়ে আছেন—যেন এ জগতের নন, জ্যোতির্ময় লোক থেকে নেমে এসেছেন দাওয়ার উপরে।

নিরুত্তরে তরঙ্গিণী ঘরের মধ্যে খাটের ধারে চলে গেলেন। বড় পিলসুজের উপর রেড়ির তেলের প্রদীপ—একটা সলতের টিপ-টিপ করে জ্বলছে। কুমোরের গড়া দোতলা মাটির প্রদীপ—উপরে তেল-সলতে নিচের খোলটা জল ভরতি। নিচে জল থাকায় তেল নাকি কম পোড়ে। কমল বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। মুখের কাছে প্রদীপ ঘুরিয়ে তরঙ্গিণী দেখে নিলেন একবার। পুঁটি বড়গিন্নির কাছে শোয়। কমল হবার সময় তরঙ্গিণী উঠানের আঁতুড়ঘরে গেলেন, পুঁটির খাওয়া-শোওয়া তখন জেঠাইমার কাছে। সেই জিনিসই চলে আসছে, বড়গিন্নির বড় নেওটা সে।

দেবনাথ বললেন, বোসো। হাত বাড়িয়ে তরঙ্গিণীকে কাছে টেনে নিলেন একেবারে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তক্ষক ডাকে: কটর-র-র তক্ক তক্ক।

জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটছে।

তরঙ্গিণী বললেন, কুসুমপুর যদি অমনি ঘুরে আসতে—

ট্রেনে কসবায় নেমে দেবনাথ মোটরবাসে নাগরগোপ এসেছেন। কুসুমপুর ক্রোশ দুই পথ কসবা থেকে—চঞ্চলার শ্বশুরবাড়ি সেখানে।

আসল কথায় পড়লেন তরঙ্গিণী এইবার : তুমি বললে বেহান কখনো 'না' করতেন না। মেয়েটা আম-কাঁঠাল খেয়ে তোমার সঙ্গেই আবার ফিরে যেত।

দেবনাথ বললেন, জামাইষষ্ঠীর সময় জোড়ে এসে দিন চারেক থেকে যাবে। ও কথা তুলতে গেলে বেহান এখন আমায় ধরে পেটাতেন। খনি আম কাঁঠালের অভাব নাকি তাদের বাড়ি? গাঙের ধারে পাঁচ বিঘের উপর ফলসা বাগান—ঢুকে পড়লে পথ খুঁজে বেরুনো যায় না।

বললেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছ, আদরে যত্নে আছে—এর চেয়ে আনন্দের কথা কি। বেয়ানের একটা ছেলে—নিত্যি নিত্যি তিনি কেন পাঠাবেন বলো। বলেন, এককোঁটা মেয়ে আপনার—কিন্তু একতলা দোতলার এত-গুলো ঘর একলাই সে ভরে থাকে। চার চারটি মেয়ে—তাদের যখন বিয়ে হয়নি, তখনও এমন ছিল না। বউমা না থাকলে বাড়ির মধ্যে তিষ্ঠানো দায়।

তরঙ্গিণী খপ করে বলে উঠলেন, আমার কমলের বিয়ে খুব সকাল সকাল দেব।

সেই ভাল। বুদ্ধি ঠাউরেছ এবার। ওঁদের বউ না-ই পাঠাল তো ছেলের বিয়ে দিয়ে নিজস্ব বউ এনে নিই।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেবনাথ হেসে ফেললেন : সেই ভাল। ভাল মেয়ে কাদের আছে, এখুনি খুঁজতে লেগে যাই। তিন-বছুরে বর—তারই মানান মতো এক-বছুরে কনে। ছিক পুঁটি সকলের আগে কমলের বিয়ে। মাইনের চেয়ে উপরি-রোজগারের কদর বেশি, জমিদারি এস্টেটের মানুষ আমরা সেটা ভাল মতন জানি। পরের মেয়ে নাড়তেচাড়তে পেলে নিজের মেয়ে তখন আর মনেও পড়বে না। ঠিক বুদ্ধি ঠাউরেছ ছোটবউ।

॥ তিন ॥

খুব ভোরবেলা, তখনও অন্ধকার কাটেনি। পাতলা ঘুমের মধ্যে গ্রাম-বাসা নিত্যদিন গান শুনে থাকে এখন। বৈশাখ মাস ভোর চলবে। কত্তালের আওয়াজ পেয়ে পুঁটি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে চোখ মুছতে মুছতে হুড়কোর ধারে গিয়ে দাঁড়াল। আসছেই তো বাড়িতে, উঠানে দাঁড়িয়ে দু-এক পদ

গেয়ে চলে যাবে—এ মেয়ের তর সয় না। বৈরাগী গাইতে গাইতে আসছেন : ঠাকুর-দেবতাদের গান--হরি-কথা, কৃষ্ণ কথা। পুণ্যমাস বৈশাখে ঠাকুরের নাম কানে নিয়ে দিনের কাজকর্মের আরম্ভ। বৈশাখে হচ্ছে, এর পর আবার কার্তিক মাসে—পয়লা তারিখ থেকে সে-ও পুরো মাস। বছরের বারো মাসের মধ্যে দুটো মাস এই প্রভাতী গান।

বকুলফুল সারা রাত্তির ঝরেছে, তারই উপর দিয়ে গুটিগুটি আসছেন। কী মধুর গলাখানি, প্রাণ কেড়ে নেয়। আহ্লাদ বৈরাগী, দু-ক্রোশ দূরে হরিহর নদের ধারে মধ্যকুল গ্রামে বাড়ি। সোনাখড়িতে এসে ওঠেন, তখনো বেশ রাত্রি—আকাশে তারা ঝিকঝিক করে। আর গ্রাম পরিক্রমা যখন শেষ হয়, রোদ উঠে যায় দস্তুরমতো। আহ্লাদের বয়স বেশি নয়—কচি কচি মুখ, কিন্তু সমস্ত চুল পেকে গেছে, ভ্রূ অবধি পাকা। অন্ধ—চোখ বুঁজে পথ চলেন, কদাচিৎ যখন চোখ মেলেন—শূন্যদৃষ্টি। এক বৃদ্ধা আগে যাচ্ছেন—আহ্লাদ বৈরাগীর মা। করতাল মা-ই বাজাচ্ছেন, পিছনে বিরাগীঠাকুর মায়ের দু-কাঁধে দু-হাত রেখে গাইতে গাইতে চলেছেন। মা আর অন্ধ ছেলে। লহমার তরে গান থামাবেন না বৈরাগী, চলন ও থামবে না দেখেশুনে ভাল পথ ধরে মা নিয়ে চলেছেন—তবু তার মধ্যে গোলমেলে কোন ঠাঁই পড়লে সতর্ক করে দিচ্ছেন : ডাইনে—বাঁয়ে—সামনে......। করতাল বন্ধ করে ছেলের হাত ধরছেন কখনো-বা। এত সবের মধ্যে গানের কিন্তু তিলেক বিরতি নেই। গ্রামের সব বাড়ি শেষ করে ফকির রাস্তায় যখন পড়বেন, তখন থামবেন।

উমাসুন্দরী সাত সকালে উঠেই আজ ল্যাম্পো নিয়ে গোয়ালে ঢুকে গেছেন। মুংলি গাইটা বড্ড খুর-দাপাদাপি করছে শেষরাত থেকে। সাঁজাল নিভে গেছে, ডাঁশপোকায় কামড় দিচ্ছে বোধহয় খুব। কিম্বা কেঁদো ঢুকে গেল কিনা গোয়ালে, কে জানে—ক'দিন আগে খুব ফেউ ডাকছিল। গিয়ে দেখলেন, ওসব কিছু নয়—পালান ভারী, বাঁট দুধে টনটন করছে। দুলেবাছুর খোয়াড়ে আটকানো, সেইদিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। বড়গিন্নিকে দেখে হাম্বা ডেকে উঠল। গরু হোক যাই হোক, মা তো বটে। বাঁট-ভরা দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে পারছে না। হাম্বা দিয়ে তাই যেন সকাতর প্রার্থনা জানাল।

উমাসুন্দরী বললেন, উতলা হোসনে মা, একটু সবুর কর। রমণীকে ডেকে পাঠাচ্ছি—সকাল সকাল দুয়ে নিয়ে বাছুর ছেড়ে দেবো।

গান তখন উঠানে এসে পড়েছে। উমাসুন্দরী বলেন, ছোটবাবু বাড়ি এসেছেন। তোমাদের মা বেটার কাপড় এসেছে। ফেরার সময় নিয়ে যেও।

বৈরাগী তো গান বন্ধ করবেন না—মা বগলা কণ্ঠাল থামিয়ে বললেন, এখন কেন ঠাকরুন। মাস অন্তে যেদিন বিদায় নিতে আসব, যা দয়া হয় তখন দিয়ে দেবেন।

বৈশাখ গিয়ে জ্যৈষ্ঠমাস পড়বে, প্রভাতী গাওনা তখন বন্ধ। মা আর ছেলে বিদায় নিতে বাড়ি বাড়ি দেখা দেবেন। পাওনাথোওনা খারাপ নয়—বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরোমাস পুণ্যার্জন হয়েছে, গৃহস্থরা যথাসাধ্য চালে-ডালে সিধা সাজিয়ে দেয়, নগদ টাকা দেয়। এ বাবদে কেউ বিশেষ কৃপণতা করে না।

ভাল বোষ্টম সুরেলা-কণ্ঠ আরও সব আছে—সোনাখড়িতে প্রভাতী গাওয়ার দরবার করেছিল তারা: চিরদিন এক মুখে কেন নাম শুনবেন, আমরাও তো প্রত্যাশী। কিন্তু কর্তারা কাউকে আমল দেন নি: বেশ তো চলছে। ঠাকুরদের নাম কানে যাওয়া নিয়ে কথা—আহ্লাদ-বৈরাগীই বা মন্দ হল কিসে? বাবাজীরা অন্যত্র দেখুনগে—অন্ধের অন্নজলে নজর দিতে আসবেন না। বগলা-বোষ্টমী আর ছেলে আহ্লাদ যদ্দিন সমর্থ আছেন, আমাদের গাঁয়ে কেউ ঢুকতে পাবে না।

সবাই জানে সে দুঃখের কাহিনী—বগলা-বোষ্টমী সকলকে বলেন, আর কপাল চাপড়ান: মা হয়ে আমি ছেলের সর্বনাশ করেছি—মা নয়, রাক্ষসী আমি।

আহ্লাদ বড় মাতৃভক্ত। সে কেঁদে পড়ে: অমন করে বলিসনে তুই মা। অ মার অদেষ্ট। তুই তো ভালর তরে ব্যবস্থা করলি। জানবি কেমন করে, আমার অদেষ্টে অমুধ আগুন হয়ে উঠবে।

মাথার অসুখ আহ্লাদের। ভীষণ যন্ত্রণা—ছিঁড়ে পড়ে যেন মাথা। কপাল টিপে ধরে আবোল-তাবোল বকে। ভয় হয়, পাগল না হয়ে যায়। সেই সময় এক তান্ত্রিক ঠাকুর এলেন হরিহরের তীরবর্তী কালীতলায়। ঠাকুরের পায়ের উপর বগলা বোষ্টমী আছড়ে পড়লেন: বাঁচাও আমার ছেলেকে—আর আমাকেও। নয়তো মায়ে বেটায় বিষ খেয়ে পদতলে এসে মরে থাকব। ঘৃতকুমারী এবং আরও কয়েকটা গাছগাছড়ার রসে চিকিৎসা হল ক'দিন—উপশম হয় না তো শেষটা এক মোক্ষম চিকিৎসা। মাথায় পুরোনো-ঘি মাখিয়ে আগুনের মালসা দিল তার ওপর চাপিয়ে। কী আর্তনাদ রোগীর—ধাক্কা মেরে মাথার মালসা ফেলে দিল। ছটফট করছে কাটা-ছাগলের মতো। খানিকটা ভাং গিলিয়ে চুপ করে থাকতে বলে তান্ত্রিক কালীতলা ফিরলেন।

ঘুম এসে গেল আহ্লাদের, গভীর ঘুম। অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙল, কিন্তু চোখ মেলে কিছুই যে দেখছে না—

ও মা, মাগো, চৌদিকে অন্ধকার আমার—

কত রকম চিকিৎসা হল তারপর। মা-বুড়ি ভিক্ষেসিক্ষে করে কলকাতার ডাক্তারকেও একবার দেখিয়ে এনেছেন। দৃষ্টি ফিরল না। হলধর বৈরাগীর মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্ছিল। ভাল অবস্থা হলধরের—নিজের হাল-গরুতে দশ বিঘে জমির চাষ। কিন্তু চক্ষুহীন পাত্রের হাতে কে মেয়ে দেয়। সম্বন্ধ ভেঙে গেল।

আহ্লাদ বলে, এই বেশ ভাল মা। বিষয়-ভোগে ঠাকুরকে ভুলে থাকতাম। মায়ে-পোয়ে কেমন এখন নাম গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছি।

দেবনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন সব। বাংলা লেখাপড়া তো ভালই জানেন তিনি, ইংরেজিও জানেন না এমন নয়—অতএব শিক্ষিত ব্যক্তি এবং চাকরি করে বাইরে থেকে টাকা-পয়সা আনছেন, পুববাড়ির অবস্থা দেখতে দেখতে ফিরিয়ে ফেলেছেন—সে হিসাবে কৃতী পুরুষও বটেন। যতদিন বাড়ি আছেন, মানুষের আনাগোনা চলতে থাকবে। শুধু সোনাখড়ি বলে কি, বাইরের এ গ্রাম ও-গ্রাম থেকেও আসবে।

উত্তরের বাড়ির যজ্ঞেশ্বর এলেন—মস্ত একখানা মেটেআলু কলার ছোটায় বেঁধে হাতে ঝোলানো। খন্তা খুঁড়ে সারা সকাল ধরে মেটেআলু খুঁজেছেন—গায়ে ও কাপড়চোপড়ে ধুলোমাটি। বললেন, আলতাপাত আলু—খেয়ে দেখো কী জিনিস। তুলে আনার বড় ঝঞ্ঝাট—গাছ মরে গেছে, মাটির নিচে কোথায় আছে হদিশ হয় না। আছে এইটুকু জায়গায়, তল্লাট খুঁড়ে খুঁড়ে মরতে হয়েছে।

দেবনাথ বললেন, ঝঞ্ঝাটের দরকার কি ছিল যজ্ঞে-দা?

খাবে তুমি, আবার কি। শহরে সোনাসুবর্ণ খেয়ে থাক জানি, কিন্তু এসব জিনিস পাওনা।

দেবনাথ হেসে ঘাড় নাড়লেন : সোনা কোন দুঃখে খাবো যজ্ঞে-দা। ডাল-ভাতই খাই। বাজার খুঁজলে আপনার মেটেআলুও মিলে যাবে। হেন জিনিস নেই, যা কলকাতায় মেলে না।

শশধর দত্তকে দেখা গেল, লাঠি ঠুক ঠুক করে আসছেন। থুনথুনে বুড়ো হলেও পলকে কান খাড়া হল। কলকাতার কথা হচ্ছে—কলকাতা সম্বন্ধে দত্তমশায় যা বলবেন, তাই শেষ কথা। যেহেতু স্ত্রীর বাপের-বাড়ি ছিল কলকাতায়। এবং ছেলে কালিদাস দত্ত এখনো কলকাতায় মেসে থেকে মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করে। ফোকলা গলায় দত্তমশায় বলে উঠলেন, উঁহু, ঠিক

বললে না বাবাজি। বলি, ভয়াকলা পাও তোমরা কলকাতায়?

চেষ্টা করলে মেলে বই কি।

হা-হা-হা, ভয়াকলার মতন জিনিস—তা-ও চেষ্টা করতে হয়। বোঝ তবে যজ্ঞেশ্বর—

একচোট হেসে নিয়ে যজ্ঞেশ্বরকেই নালিশ মানেন: কেমন কলকাতা বুঝে দেখ। ভয়াকলা কেউ খায় না—বীচেকলা নাম দিয়ে ঠেলে রেখেছে। বীচিতে ভয় পেয়ে যান শহরে মানুষ। আরও একটা কী যেন উদ্ভট নাম দিয়েছে—কী যেন—কী যেন—ডেমরে-কলা। হি হি হি—

পুনরপি প্রশ্ন: চই খায় তোমাদের কলকাতার লোক?

কলকাতার শহরে সব জিনিসের আকাল, প্রমাণ না করে বুড়ো ছাড়ছেন না। বলেন, পাবে কোথায় যে খাবে। কালিদাসের সঙ্গে ওর অফিসের দুই বন্ধু এসেছিল সেবার। পাঁঠা মারা হয়েছে। কাঁঠালগাছে চই উঠেছে, কয়েকটা টুকরো কেটে এনে মাংসে ছাড়া হল। বন্ধুরা অবাক: এ-ও খায় নাকি? কালিদাসের মা এক কুচি করে তাদের পাতে দিল। খেয়ে তো শিসিয়ে মরে।

চলল ঐ কলকাতা নিয়ে। তার মধ্যে খপ করে যজ্ঞেশ্বর বললেন, তারপরে—হচ্ছে কবে তোমার এখানে?

দেবনাথ হেসে বললেন, হলেই হল। দাদা রয়েছেন যখন, না হয়ে উপায় আছে?

কোন বস্তু, বুঝিয়ে বলতে হয় না। দেবনাথ বাড়ি এলে গ্রামসুদ্ধ মানুষের এক-পাত পড়বেই। ব্যবস্থা ভবনাথের। চাকরে ভাইয়ের বাড়ি আসা সকলকে ভাল করে জানান দিতে হবে বই কি। নয়তো রামা-শ্যামা যোদো-মোধোর আসার মতোই হয়ে যায়। গোলার মধ্যে ধানের উপর কয়েক কলসি উৎকৃষ্ট দানাগুড় রেখে দিয়েছেন, পায়েসে লাগবে। গোয়ালের পিছনে বড় মানকচু রাখা আছে, মাছের তরকারিতে দেওয়া হবে। ক্ষেতের সোনামুগ-কলাই ভেজে ডাল করা আছে, নতুনপুকুরে রুই-কাতলা আছে। ভবনাথের সবই গোছানো, দেবনাথ এখন কিছু নগদ ছাড়লেই হল।

যজ্ঞেশ্বর নলডাঙা জমিদারি এস্টেটের তহশিলদার। বললেন, ভঠির গোড়ায় কাছারির পুণ্যাহ। ক'টা জরুরি মামলার কারণে ছোটবাবু সদর ছাড়তে পারেন নি—পুণ্যাহে তাই দেরি পড়ে গেল। তোমাদের কাজটা এই মাসের মধ্যে সেরে ফেল ভায়া, যেন ফাঁকিতে পড়ে না যাই।

ভবনাথকে দেখতে পেয়ে দেবনাথ বলেন, তাড়াতাড়ি সেরে দেবার জন্য যজ্ঞে-দা বলছেন। ভঠি পড়লে উনি কাছারি চলে যাবেন।

হোক তাই—ভবনাথ বললেন। জোর দিয়ে আবার বলেন, হয়ে গেলেই ভাল—জিইয়ে রেখে লাভ কি। হাটের কিছু কেনাকাটা আছে। বুধবারে গঞ্জের হাট করব, পরের দিন খাওয়াদাওয়া। বিষ্যুদের রাত্রিবেলা।

দেবনাথ শুধোলেন : আমার মিতে কোথায় এখন, কোন মেয়ের বাড়ি? তাকে একটা খবর দেওয়া যায় না?

পাথরঘাটা গাঁয়ের দেবেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা বলছেন। শৈশবে দেবনাথ কাজেম-গুরুর পাঠশালায় পড়তেন, পাততাড়ি বগলে ঐ ছেলেটিও মাঠঘাট ভেঙে আসত, ভাবসাব তখন থেকেই। নামের খানিকটা মিলের দরুন একে অন্যকে মিতে বলে ডাকেন।

দেবনাথ বলেন, বাড়ি এসেছি খবর পেলে মিতে যেখানে থাকুক, ছুটে এসে পড়বে।

ভবনাথ বলেন, মির্জানগরে ছোটমেয়ের বাড়ি ছিল তো জানি। ফটিককে পাঠাব কাল।

যজ্ঞেশ্বর ঘাড় নেড়ে বলে উঠলেন, বোশেখমাস যখন, বিষ্টুপুরে বড়মেয়ের বাড়িতেই আছেন। বছরের আরম্ভে উনি বড় থেকেই ধরেন।

কিছু অবাক হয়ে দেবনাথ প্রশ্ন করেন : দৈবজ্ঞের কাজকর্ম একেবারে ছেড়েছে?

যজ্ঞেশ্বর হেসে বল্লেন : এই তো কাজ এখন – মেয়েগুলোকে পালা করে পিতৃসেবার পুণ্যদান।

শতকণ্ঠে তারিপ করে চলেছেন : পাঁচ-পাঁচটা মেয়ে বহাল তবিয়তে শ্বশুরঘর করছে—দেবেন চক্কোত্তির মতন কপাল কার। অশন-বসন হুঁকো-তামাক বাবদে কানাকড়ির খরচা নেই। এক এক মেয়ের বাড়ি দু-মাস হিসেবে ভাগ করে নিয়েছেন। দু-মাস পুরল তো দুর্গা-দুর্গা বলে রওনা—পায়ে চটি গলায় চাদর বগলে পাঁজি হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ব্যাগের মধ্যে কাপড়টা-জামাটা—তাছাড়া ছক-গুটি-পাশা আর জলশূন্য খেলোহুঁকো তামাক-টিকে বাতি-দেশলাই। এই মানুষ কোন দুঃখে এখন আর খড়ি পেতে বিচার-আচার করতে যাবেন?

দেবনাথ বলেন, আগের কষ্টটাও ভাবো যজ্ঞে দা। এতগুলো মেয়ে সুপাত্রে দিয়েছে, তবেই না সুখভোগ এখন।

যজ্ঞেশ্বর বলেন, সুখ বলে সুখ! মেয়েয় মেয়েয় আবার পাল্লাপাল্লি। বড়-মেয়ের বাড়ি দা-কাটা তামাক শুনে মেজমেয়ে সদরে লোক পাঠিয়ে বাপের জন্ত অম্বুরি তামাক আনাল। সেই মেজমেয়ে রাত্রে রুটি দেয় শুনে সেজমেয়ে লুচির

বন্দোবস্ত করল। ন-মেয়ে তারও উপর টেক্কা দিল—নিত্যি রাত্রে ঘি-ভাত। ছোটমেয়ে ভিন্ন দিক দিয়ে গেল: ছোটজামাই খেলে ভাল, দেওরটাও মোটামুটি চালিয়ে যেতে পারে। চতুর্থ খেড়ি কোথায় আর খুঁজে বেড়াবে—বউ হওয়া সত্ত্বেও নিজে সে শিখেপড়ে নিয়েছে। এক মেয়ে অন্য মেয়ের বাড়ি যাবার পথে দেখেন স্বগ্রাম পথে দেখেন স্বগ্রাম পাথরঘাটায় এক হপ্তা দু-হপ্তা জমাজমির তদারক করে যান—সেইসময় সকলের কাছে সুখের গল্প করেন, আর হেসে হেসে খুন হন। মড়িপোড়া চোয়াড়ে চেহারা ছিল, এখন খেওয়াপাতি গোছের খাসা একখানা ভুঁড়ি নেমেছে।

রাজীবপুরে পোস্টঅফিস, পিওন মাধব বাড়ুয্যে। রান্নায় তিনি ভারি ওস্তাদ। বললে সোনা হেন মুখ করে ভোজের রান্না রেঁধেবেড়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু বাড়ির মধ্যে থেকে ঘোরতর আপত্তি: সামান্য একটু কাজে পিওনঠাকুর অবধি যেতে হবে কেন, বলি হাত-রত্ আমরা কি পুড়িয়ে খেয়েছি? ওঁকে ডেকো যেদিন পাঁচগাঁয়ের পুরো সমাজ ধরে টান দেবে। গ্রামের ক'টা মানুষের পাতে ভাত-দেওয়া কাজটুকু স্বচ্ছন্দে আমরা পারব। ব্রাহ্মণ নিয়ে সমস্যা—তিন বামুন-বাড়ি ষোলআনা লিখে পাঠিয়ে দিলেই হয়ে যাবে।

তরঙ্গিণীর ঝোঁকটা সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে জুটেছে বিনো আর অলকা। হবে তাই। লুচি-পোলাওর ব্যাপার নয়, শুধুমাত্র সাদা-ভাত। কেন হবে না?

উষাসুন্দরী বললেন, গ্রামে বিধবা ক'জনকেও বাদ দেওয়া যাবে না। ভোজের দিন নয়, দুটো দিন বাদ দিয়ে—এঁটোকাঁটা সম্পূর্ণ সাফসাফাই হয়ে যাবার পর। ছোটবউ তরঙ্গিণী মিত্তিরদের মেয়ে, অলকা বোসেদের। আর বিনো তো এই বাড়িরই—ঘোষ বংশের। রান্নার মধ্যে যে তিনজন, সবাই কুলীনের মেয়ে। কাপড়চোপড় ছেড়ে শুদ্ধাচারে রাঁধাবাড়া করবে। কারো আপত্তি হবার কথা নয়।

না, আপত্তি কিসের? বিনোই গ্রাম চক্কোর দিয়ে সকলের মতামত নিয়ে এলো।

চাঁদারডাঙি গঙ্গাপুত্তুরদের (জেলে কথাটা ভাল নয়, ওরা গঙ্গাপুত্র) সর্দার মাধব পাড়ুইকে খবর দেওয়া হয়েছে। বাঁশে জড়ানো দড়াজাল দস্তুরমতো এক বোঝা—বাঁশের দুই মুড়ো দুই জোয়ানে ঘাড়ে নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে, পিছনে অন্যেরা। বাগের মধ্যে নতুনপুকুরের পাড়ে গ্রামের মানুষ ভেঙে এসে পড়ল।

আমড়াতলায় পা ছড়িয়ে বসেছে মাধব। জড়ানো জাল খুলে আস্ত থান-ইট বাঁধছে জলের যে দিকটায় শোলা তার বিপরীতে। শোলার জালের উপর

ঠিক ভাসিয়ে রাখে, ইটের ভারে তলা অবধি টান-টান থাকে। তেল মাখছে জেলেরা আষ্টেপিষ্টে। ভবনাথ হেসে বলেন, পাকি এক সের তেল সাবাড় করলি যে বেটারা। কে-একজন বলল, চার আনা সেরের বাগ্গি তেল, কেনে তো এক পয়সার দু-পয়সার—খাবে না মাখবে? বাবুর বাড়ি পেয়েছে, বেদরদে মেখে নিচ্ছে।

তেল মেখে ঝুপঝুপ করে সব জলে পড়ল। দড়াজাল নামছে—পাড়ে আর মানুষ ধরে না। মাছ খাওয়ার চেয়ে ধরার সুখ—ধরা দেখতেও সুখ খুব। কমল অবধি চলে এসেছে। বিনো কোলে করে আনছিল—কিন্তু বড় হয়ে গেছে সে। এত মানুষের মধ্যে কোলে উঠে আসবে—ছিঃ, নামিয়ে দিয়ে বিনো হাত ধরেছে, পুকুরের একেবারে কিনারে যেতে দিচ্ছে না। কমল টানাটানি করছে তো বিনো ভয় দেখায়: তবে খোকন বাড়ি নিয়ে যাবো তোমায়, মাঝের-কোঠায় পুরে শিকল তুলে দেবো। আর কমলের কথাটি নেই।

জাল অনেক লম্বা—পুকুরের এ-মুড়ো ও-মুড়ো বেড়ায় ঘেরা হয়ে গেল। আস্তে আস্তে টেনে ওপারে নিয়ে চলল—পুকুর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। একটা দুটো চারা-মাছ জালের বাইরে লাফিয়ে পড়ে, হই-হই করে ওঠে অমনি মানুষ। মাধব বলে, চেঁচামেচি করলে মাছ একটাও জালে থাকবে না, মিছে আমাদের খেটে মরা। জালের গা ঘেঁষে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে সে, জাল কোথাও গুটিয়ে গেলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। জলতলে অদৃশ্য হয়ে থাকছেও অনেকক্ষণ, ভুড়ভুড়ি কাটছে। ডুব দিয়ে দিয়ে চক্ষু দুটো জবাফুলের মতো রাঙা।

টেনে টেনে জাল পাড়ের কাছে এনেছে, আবার তখন চিৎকার। দেবনাথের গলা সকলকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ তাঁর বাড়িতে কাজ—রাত পোহালে মাছের দরকার তাঁরই। এতবড় দরের মানুষ, তা একেবারে ছেলেপুলের অধম হয়ে গেছেন। দেবনাথ ধরিয়ে দিলেন, তারপরে সবসুদ্ধ চেঁচাচ্ছে—পুকুরপাড়ে ডাকাত পড়েছে যেন। শ্রম বৃথা যায় না—মাছ লাফাচ্ছে খোলাহাঁড়ির কড়ুইভাজা খইয়ের মতন। রোদে রুপোর মতন ঝিকমিক করছে। লাফিয়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে জালের বাইরে পড়ছে বেশির ভাগ।

মাধব ব্যস্ত হয়ে বলে, সব মাছ যে পালিয়ে গেল কর্তা।

দেবনাথ বলেন, লোকে কত আমোদ পাচ্ছে তা-ও দেখ। টানো না আর একবার—

মাধব সতর্ক করে দেয়: চেঁচামেচি না হয়, দেখবেন।

দেবনাথ বলেন, একটু-আধটু হবেই। এত মানুষ এসেছে—তুমি কি চাও, পুকুরপাড়ে এসে সব ধ্যানে বসে থাকবে? টেনে যাও না তোমরা—

হিমচাঁদ বলে ওঠেন, ছুটো-চারটে টান না-হয় বেশি লাগবে। ভারী ভারী সব গতর নিয়ে এসেছ—বলি, গতরে কি আলু-কচু আর্জে খাবে? লোকে মজা করে দেখছে, হলই বা একটু কষ্ট তোমাদের।

মাঝারি রুই তিন-চারটি রেখে চারামাছ জলে ছুঁড়ে দিল। বড় হোক—এখন ধরবে না ওদের। যেগুলো ধরেছে, তা-ও ডাঙায় তোলা হবে না—কানকোয় দড়ি দিয়ে খোঁটার সঙ্গে বেঁধে জলে রেখে দিল। খেলা করুক দড়ি বাঁধা অবস্থায়। কাজের দিন কাল সকালবেলা তুলবে, কোটা-বাছা হবে তখন।

আবার জাল টানছে। পাড়ের কাছকাছি হলেই যথাপূর্ব চিৎকার। মাছ লাফাচ্ছে—কী সুন্দর, কী সুন্দর!

টানের পর টান চলল দুপুর অবধি। এরই মধ্যে এক কাণ্ড। হিরু ধরে ফেলল—এত লোকের মধ্যে তারই শুধু নজরে এসেছে। চ্যাটালে-আমতলায় জলের মধ্যে শোলাকচু-বন—মাধব পাড়ুই ঐখানটায় বড় বেশি ডুব দিচ্ছে। কোমরজল সেখানে—হাঁটছে জলের মধ্যে পা চেপে। হিরুতে ঝন্টুতে কি চোখ টেপাটেপি হল—ভাঁড় থেকে এক এক খাবলা তেল নিয়ে দুজনেই মাথায় মাখছে।

হারু মিস্ত্রির বলে, জল ঘুলিয়ে দই-দই হয়ে গেছে—চান করবে তো নতুন- বাড়ির পুকুরে চলে যাও।

কে কার কথা শোনে, ঝপাঝপ তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতরে চলে গেল চ্যাটালে-তলার কচুবনে, ঠিক যে জায়গায় মাধব পা চাপাচাপি করেছিল। ডুবের পর ডুব দিচ্ছে। টেনে বের করল কাতলামাছ একটা—কাদার মধ্যে ঠেসে ঠেসে কবর দিয়ে রেখেছে। চ্যাটালে গাছ হল নিরিখ—মাছধরা শেষ হবার পর পুকুর নির্জন হলে কোন এক ফাঁকে এসে মাছ তুলত।

কাদায়-পোঁতা মাছ তুলে ঝন্টু চপাস করে সকলের মধ্যে ফেলল। আরে সর্বনাশ, কী ডাকাত—সবাই দুষছে, যাচ্ছেতাই করে বলছে মাধবকে।

দেবনাথ এ-গরে এসে বললেন, শুধু-হাতে চললে কেন পাড়ুয়ের পো? মাছটা নিয়ে যাও. খাবে তোমরা।

শাস্তি না দিয়ে বখশিস। সকলে স্তম্ভিত। দেবনাথ বলেন, মাছ মারাই তো মানুষ খাওয়ানোর জন্য। কন্যাদায় পিতৃদায় কোন রকম দায়দাঁড়ার কারণে নয়, নিতান্তই শখ করে মানুষের পাতে চাট্টি ভাত দেওয়া। তোদের পাতে হচ্ছে না তো পাড়ুয়েরা বাড়ি নিয়ে খাবে নতুনপুকুরের মাছটা।

অদ্রজনকে তবু মন সরে না: রাজপুত্তুর মতন কাতলা—উঃ।

দেবনাথ মাধবকে বলছেন, আশা-সুখে রেখেছিল—মুখের জিনিস কাড়লে আমাদের পেটে হজম হবে না। জালে জড়িয়ে নিয়ে যাও—সকলে সমান ভাগ করে নিও।

মাছ ধরা সেরে বাড়ি ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেল। পুঁটি-কমল ছটফট করছে। এর পরে তো স্নান, খাওয়া—এবং তারও পরে শোওয়া। বিকাল হয়ে গেছে দেখে শোওয়াটা দেবনাথ হয়তো বাতিলই করে দেবেন। তাহলে সর্বনাশ—মোটা রোজগার মাটি। ক'দিন ভাই-বোন এরা দুপুরবেলা দেবনাথের মাথার পাকাচুল তুলছে। দর ভালই—পয়সায় চারটে করে ছিল এবারে বাড়ি এসে ছ'টা হয়ে গেল। দেবনাথই আপত্তি তুলেছিলেন: এক পয়সায় এক গণ্ডা--বড্ড মাগ্‌গি রে। চুল এখন বেলা পেকে গেছে—তোদের কাঁচা-চোখে একগণ্ডা চুল বের করা কিছুই না, হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে পুরো পয়সা রোজগার করে ফেলবি। এবারের রেট পয়সায় দশটা করে—থাকগে যাক, আটটা। অনেক ঝুলোঝুলির পর ছ'টায় এসে রফা হয়েছে—ছ'টা পাকা চুল তুলবে, এক পয়সা মজুরি।

পুঁটি-কমলের আগে দেবনাথের মাথা নিমি-চঞ্চলার দখলে ছিল। রেট সাংঘাতিক তখন—একগাছি চুল এক পয়সা। দেবনাথ বুঝিয়ে বললেন, রেট দেখলে তো হবে না—মাথা ভরা কাঁচা চুল যে তখন। একটি সাদা চুল বের করতে চোখের জল বেরুত, সারা বেলাস্ত লাগত। চঞ্চলাটা বেশি বজ্জাত—একই চুল দু-বার তিন বার দেখাত, দেখিয়ে বেশি পয়সা আদায় করত। বুঝতে পেরে দেবনাথ নিয়ম বেঁধে দিলেন, তোলা মাত্তোর চুলটা দিয়ে দিতে হবে—নিজে রাখতে পারবে না। ফাঁকি দেবার আর তখন উপায় রইল না।

মাঝে-মধ্যে এরা ভবনাথের ধারে গিয়েও বসে। তাঁর মাথা শনের ক্ষেত—ঢেদার পাকাচুল, তুলতে পারলেই হল। এক অসুবিধা, খাটো খাটো চুল তাঁর মাথায়—দু-আঙুলে এঁটে ধরা যায় না। রেটও অতি সস্তা—এক-কুড়ি এক পয়সা। কষ্ট করে খুঁজতে হয় না বলে পাকাচুল তোলার মজাও নেই ভবনাথের মাথায়।

॥ চার ॥

কোকিল ডাকছে গাছের উপর ডালপালার মধ্যে। মাটির উপরেও যে ডাকে, ঠিক কোকিলের মতো একটা দুটো নয়, অনেকগুলো—এদিক-সেদিক থেকে। যত বজ্জাত ছেলেপুলে কোকিলের ডাক ভ্যাংচাচ্ছে।

কড়া রোদ, ধূসর আকাশ। এলোমেলো হাওয়া আসে এক-এক-একবার—ধুলো ও শুকনো পাতা উড়ায়। বাতাসে যেন আগুনের হল্কা। মাঠ ফেটে চৌচির। দুটো কুকুর মুখোমুখি হাঁ করে জিভ ঝুলিয়ে হা-হা করছে। গরু ঘাস খায় না, আমতলায় শুয়ে ঝিমোয়। নতুনপুকুরের জল আগুন হয়ে যায়, চানের সময় অগ্নিকুণ্ডে নামছি এমনি মনে হবে। কানাপুকুর প্রায় শুকনো, দ'মের নিচে অল্প জল থাকতে পারে। আশশ্যাওড়া ভাঁট আর কাঁটাঝিটকে বাস্তার পগারের উপর ঝুঁকে পড়ে খানিকটা অংশ একেবারে অদৃশ্য। একটা মেটে সরা নিয়ে কটা ছোঁড়া ঐ জঙ্গলে নেমে পড়ল। জল আছে পগারের অদৃশ্য ঐখানটায়, এবং জল থাকলে মাছও আছে। জঙ্গল মলে দলে এদিকে আর ওদিকে দুটো আ'ল দিয়ে নিল। সরা দিয়ে তারপর ভিতরের জল সেঁচে আলের বাইরে ফেলছে। চাপ পড়ে সত্ত বানানো আ'লে জল চোঁয়াচ্ছে, এক কোদাল দু-কোদাল মাটি কেটে সঙ্গে সঙ্গে চাপাচ্ছে সেখানে। জল সেঁচা হয়ে গিয়ে কাদার উপরে মাছ খলবল করে। মাছ সর্বসাকুল্যে—পাঁচ-সাতটা নাটা ও কয়েকটা কই-জিয়েল। তারই লোভে একটা মাছরাঙা এসে বসেছে অদূরের শুকনো সজনে-ডালের উপর। মাছ নাই থাক, কাদা বেশ গভীর ও আঁঠালো—ফুর্তিটা অমল কাদা মাখা ও কাদা মাখানোয়। ছোঁড়াগুলোর কোনটা কে—কথা না বলা অবধি আলাদা করে চেনবার জো নেই।

পাড়ার সকলের সারা হয়ে গেলে খাঁ খাঁ দুপুরে কর্মকারপাড়ার বউরা ঘাটে আসে। সব তাদের দেরিতে। দুপুরের-খাওয়া খায় বেলা যখন ডুবু-ডুবু তখন। পুরুষরা হাটে যায় অথবা যে সময় হাট করে ফেরে। স্নান করে কর্মকার-বউ ভরা কলসি নিয়ে ঘরে ফিরছে। মেজে মেজে পেতলের কলসি সোনার মতন ঝকঝকে হয়েছে, কলসির উপরে রোদ ঠিকরে পড়ে। পথের বেলেমাটি রোদে তেতে-পুড়ে আগুন। পা ফেলা যায় না, সেঁক লাগে, পুড়ে ঠোস্কা ওঠার গতিক। বউমানুষ হলেও ফাঁকা জায়গাটা একদৌড়ে পার হয়ে বাঁশতলায় চলে যায়। জল ছলকে কাপড় ভিজে গেল। ভিজে পায়ের দাগ মাটিতে পড়তে না পড়তে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন। পাড়ায় ঢোকবার মুখে প্রাচীন বটগাছ—শীতলাতলা। কলসি নামিয়ে বউ একটু জল ঢেলে দেয় বৃক্ষদেবতার পায়ের গোড়ায়। মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, আর বিড়বিড় করে বলে, ঠাণ্ডা থাকো মা-জননী গো, পাড়া আমাদের ঠাণ্ডা রাখো।

উঠানে তুলসীগাছ—মাথার উপর ঝরা টাঙানো। ছিদ্রকুম্ভ থেকে ফুটো বেয়ে অবিরত জল ঝরছে। সারা বৈশাখ জুড়ে তুলসীঠাকুর দিবারাত্রি ঝরার জলে স্নান করেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় কলসি নামিয়ে তুলসীতলায়

বউ গড় হয়ে প্রণাম করে। একটুখানি আড়ালের দিকে গিয়ে ভিজে কাপড় ছাড়ছে।

নতুনপুকুরের জল খুব ভাল বলে চারিদিকে সুখ্যাতি। বেলা পড়ে এলে কাঁখে কলসি এ-পাড়ার সে-পাড়ার মেয়েরা এসে খাবার-জল নিয়ে যায়। অত দূরের পাথরঘাটা গাঁ থেকেও এসেছে, দেবনাথের একদিন নজরে পড়ল। দূরের পথ বলে মেয়েলোক নয়, পুরুষ এসেছে। কলসি একটা নয়, এক জোড়া। কাঁধের উপর বাঁকের শিকেয় ঝোলানো জল-ভরতি কলসি দুটো নাচতে নাচাতে নিয়ে চলে গেল।

এক বিকালে ঘনঘটা আকাশে। দেখতে দেখতে ঝড় উঠল। কাল-বৈশাখী। যজ্ঞেশ্বরের ছেলে জল্লাদ তখন খেজুরতলি গাছের মাথায়, জল্লাদের সর্বক্ষণের সাথী পদাও আছে কয়েকটা ডাল নিচে। কী ফলন ফলেছে এবার গাছটায়, ফলের ভারে ডাল ভেঙে পড়বার গতিক। ছিদ্র-করা শামুক তাদের গাঁটে, কাগজের মোড়কে নুন। দোডালার উপর পা ছড়িয়ে জুত করে বসে কোঁচড়ের কাঁচা-আম শামুকে কেটে নুন মাখিয়ে খাচ্ছে।

লোভে লোভে চারি, নুরি, পুঁটি আর পালেদের বেউলো তলায় ছুটে এলো। চারি তাহদ্দ খোশামোদ করছে জল্লাদকে: এত কষ্ট কেন করিস রে। ডালের উপর পা দিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে দে—আম তলায় পড়বে, বঁটিতে কেটে নুনে-ঝালে জারিয়ে এনে দেবো। এক টিপ চিনিও দিতে হবে, চিনি না পেলে গুড়। কী রকম তার হবে দেখিস খেয়ে।

জল্লাদ সোনা-মোনা—আম-জারানো সত্যি সত্যি দেবে, না ফাঁকি দিয়ে আম পাড়িয়ে নিচ্ছে? ভাবখানা বুঝে নিয়ে চারি বলে, দিয়ে দেখ। এক-দিনের দিন তো নয়—ফাঁকি দিলে কোনদিন কখনো আর দিসনে।

জল্লাদ দিত নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত—দেরি করে একটু মান কাড়াচ্ছিল। কোনকিছুর আর দরকার নেই—ঝড় উঠল, কাউকে লাগবে না এখন। টিব-টাব করে আম পড়ছে এ-তলায় সে-তলায়—মেয়েগুলো ছুটোছুটি করে কুড়োচ্ছে। ধামা-ঝুড়ি নিয়ে আরও সব আমতলায় আসছে। চারি বুড়ো-আঙুল আন্দোলিত করে জল্লাদকে দেখাচ্ছে: পেড়ে দিলিনে তো বয়ে গেল। এই কলা, এই কলা। আম-জারানো দেখিয়ে দেখিয়ে খাব, এক কুঁচিও দেবো না। চাইলেও না।

ডালপালা বিষম দুলছে। সুপারিগাছগুলো এত নুয়ে পড়ছে—ভেঙেই পড়ে বুঝি-বা। পদা সড়াক করে ভুঁয়ে নেমে গেছে। জল্লাদের ডরভয় নেই,

নামবে কি—মজা পেয়ে গেছে, বেয়ে বেয়ে আরও উঁচুতে উঠছে। দোল খাবে। সুরির বয়স এদের মধ্যে বেশি, সে চেঁচামেচি করছে : নেমে আয় ওরে জল্লাদ, পড়ে থেঁতো হয়ে যাবি—

দৌড়ে দৌড়ে মেয়েগুলো এ-তলায় সে-তলায় আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। চুল বাঁধা হয়নি—এলোচুল উড়ছে তাদের। আঁচলও উড়ছিল, বেড় দিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছে। পাতা ঝুর ঝুর করে মাথায় ঝরছে পুষ্পবৃষ্টির মতন। দুম করে বেউলোর পিঠে ঢিল মারল—উহু-হু, কে মারল, কে? মেরেছে ঢিল নয়, আম। পিঠ বাঁকাতে বাঁকাতে বেউলো আমটা কুড়িয়ে নিল। কে মেরেছে—জল্লাদ ছাড়া কে আবার। ঘাড় তুলে নিরিখ করে দেখে, তা-ও নয়। মেরে যদি কেউ থাকে, সে এই গাছ—জল্লাদ নয়।

জল্লাদকে এখন নতুন খেলায় পেয়ে গেছে, উঠে যাচ্ছে সে উপরের মগডালে ফনফন করে। ঝড়ের সঙ্গে দুলবে। বটগাছে দড়ির মতন সরু সরু ঝুরি ঝোলে, তারই কয়েকটা গেরো দিয়ে জল্লাদরা দোলনা বানিয়ে নেয়। ঝুরির দোলনায় বসে একজন দু হাতে শক্ত করে ঝুরি ধরে, অন্যে দোল দেয়। এই আকাশে উঠে গেল, আবার এই নেমে এলো ভুঁয়ে। ঝড়ের মধ্যে কিন্তু ভারি সুবিধা—দোল দেবার মানুষ লাগে না। ঝড়ই সে কাজটা মহাবিক্রমে করছে। দে দোল, দে দোল—

তরাসে সুরি ওদিকে সমানে চেঁচাচ্ছে : পড়ে মরবি রে হতভাগা। নেমে আয়—

জল্লাদের দৃকপাত নেই, লম্বা একখানা ডাল জড়িয়ে ধরে আছে। প্রচণ্ড বেগে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে—মজাটা সেই রকম।

সুরি সকরুণ কণ্ঠে বলে, নেমে আয় রে, ব্যাগোত্তা করছি। লকপকে ডাল ভেঙে পড়ল বলে। হাত-পা ভেঙে তুই মারা পড়বি।

সুরির ছটফটানিতে ডালের উপর জল্লাদ হি-হি করে হাসছে। চেঁচিয়ে জবাব দিল : পড়লে তো পাতাসুদ্ধ ডাল ভেঙে নিয়ে পড়ব। তাতে লাগে না। দিব্যি যেন গদিতে শুয়ে নেমে এলাম, সেই রকম ঠেকে।

অভিজ্ঞতা আছে আগেকার, তাই এরকম নিরুদ্বিগ্ন ভাব। এমনি সময়ে ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। দৌড়, দৌড়। জল্লাদের কি হবে, ভাবনার ফুরসত নেই আর। চারজনে আবার একত্র রয়েছে—পুঁটি, চারি, সুরি, বেউলো। বৃষ্টি যেন আক্রমণ করতে আসছে, পালাচ্ছে চার মেয়ে।

তারপরে কবলে পড়ে গেল—ধারাবর্ষণ মাথার উপরে। ছুটছে না আর, হাতে হাতে ধরে মনের সুখে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। কথা বলছে কলকল

করে—হাওয়ায় গুজুনি কথা উড়িয়ে নিয়ে যায়, একবর্ণ কানে পৌঁছয় না। যাও না বাড়ি। চুল ভিজিয়ে ফেলেছ—বকুনি কারে কয়, বুঝবে আজ।

ঘোর হতে না হতে বৃষ্টিবাতাস একেবারে থেমে গেল। কে বলবে, একটু আগে তোলপাড় করে তুলেছিল। পুব আকাশে খণ্ডচাঁদ দেখা দিয়েছে, ফিকে জোৎস্নায় চারিদিক হাসছে। টপটপ করে গাছ থেকে ফোঁটা পড়ছে এখনো, চাঁদের আলো পড়ে ভিজে পাতা চিকচিক করছে।

উঠোনে জল দাঁড়িয়ে গেছে। শিশুবর কোদালে খানিক খানিক মাটি সরিয়ে পথ করে দিল, সোঁতা দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়ে উঠোন শুকনো।

অটলা কোথা রে?

আর এক বাহিন্দার অটলের খোঁজ নিচ্ছেন ভবনাথ: আমতলায় আলো ঘুরছে—অটলা বুঝি?

অনতিপরে হাতে লণ্ঠন কাঁধে ঝুড়ি অটল এসে রোয়াকে উঠল। চৌখুপি কাচের লণ্ঠন, ভিতরে টেমি। ঝুড়ি ভরতি কাঁচাআম হড়াস করে ঢেলে ঝুড়ি খালাস করে নিল। আম ছড়িয়ে পড়ল। ভবনাথ হায়-হায় করে উঠলেন: পাকা আম খেতে দেবে না আর এবার। সেই বোল হওয়া ইস্তক অপঘাত চলেছে। কুয়োর আলেপুড়ে গেল এক দফা, শিলাবৃষ্টিতে গুটি সব জখম করে দিয়ে গেল। যা বাকি ছিল, মুড়িয়ে শেষ করল আজ।

উমাসুন্দরী কিন্তু খুশি। ডাকে বলছেন, সরষে কোটো এবারে ছোটবউ। ঠাকুরপো বাড়ি এসেছে, এদ্দিনের মধ্যে পাতে একটু কাসুন্দি পড়ল না। 'বউ সরষে কোট' বলে পাখি তো মাথার ঝিটকি নড়িয়ে দেয়। গাছের কাঁচা আম প্রাণ ধরে পাড়তে পারছিলাম না, আর তোমার ভাসুরও তাহলে রক্ষে রাখতেন না। কালবোশেখী পেড়েঝেড়ে দিয়ে গেল।

পাখপাখালির ডাকে সকাল হয়। বেলা বাড়ে, কাজকর্মের মধ্যে পাখির ডাক কে আর শুনতে যাবে। এক রকমের ডাক কানে কিন্তু ঢুকবেই—এ ডাক বড় বেশি আজকাল। ছেলেপুলেরা পাখির সঙ্গে হুবহু সুর মিলিয়ে অনুকরণ করে: বউ সরষে কোট্, বউ সরষে কোট্। ডালপাতার মধ্যে অলক্ষ্য থেকে গৃহস্থবউদের পাখি মনে করিয়ে দিচ্ছে: আমের গুটি বেশ বড়সড় হয়েছে, সরষে কোটার সময় এখন। আমে পাক ধরলে এর পরে আর হবে না।

বিকালের দিকে রোজই আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা। মেঘ জম-জমাট হয়ে চারিদিক আঁধার করে তোলে। ঝড় হয়, বৃষ্টি হয়। কাঁচাআম পড়ে, জামরুল পড়ে ডাঁই হয় তলায়। কলাবাগানে একটা অখণ্ড পাতা নেই—শত-

ছিন্ন হয়ে ডাঁটার গায়ে ন্যাকড়ার ফালির মতন ওড়ে। শিলাবৃষ্টি হল একদিন —জলের মধ্যে ছুটোছুটি করে মেয়েগুলো শিল কুড়োচ্ছে। হাতে রাখতে পারে না, হাত হিম হয়ে আসে। কুড়িয়েই মুখে ফেলে, আর নয়তো আঁচলের কাপড়ে রাখে। একদিন এর মধ্যে ঝড় বেশ জোরালো রকম হয়ে দেদার কলাগাছ ও সুপারিগাছ ফেলে গেল। চলছে এই। সারা দিনমান কড়া রোদ, আগুনের হল্কা—সন্ধ্যার মুখে মাঝে মাঝে বৃষ্টি-বাতাস। আর সকাল হতে না হতে পোড়া পাখি গাছে গাছে চেঁচিয়ে মরছে: বউ সরষে কোঁট্, বউ সরষে কোট্—

বাড়ি বাড়ি সরষে কুটছে, কাসুন্দি বানাচ্ছে। এ-ও এক পরব। সকাল বেলা বাসি কাপড়চোপড় ছেড়ে গায়ে তুলসীর জল ছিটিয়ে যোল আনা শুদ্ধাচারে চারজন এঁরা কাসুন্দির কাজে ঢেঁকিশালে এলেন। বড়গিন্নি উমাসুন্দরীকে মূল কারিগর বলা যায়। অলকা-বউ পাড় দিচ্ছে—কুচি কুচি রাঙা সরষে লোটের গর্তে, তরঙ্গিণী এনে দিচ্ছেন। কাঁচাআম চাকা চাকা করে কেটে আঁঠি ফেলে উমাসুন্দরী ধামায় করে নিয়ে এলেন। সরষে কোটা হয়ে গেল তো আম কোটা এবারে। আরও সব জিনিসপত্র বিনো বয়ে বয়ে আনছে। হলুদবরণ নতুন তেঁতুল বীচি বের করে ভাঁড়ে করে রেখেছে—সেই তেঁতুলের ভাঁড় একটা। বেঁটে সাইজের ছোট ছোট কাসুন্দির ঘট কুমোরেরা এই মরশুমে গড়ে, তাই গোটা আষ্টেক। হলুদগুঁড়ো, লঙ্কাগুঁড়ো। পাথরের খোরা, পাথরের থালা। পিতলের কড়াই, পিতলের কলসিতে জল। বওয়াবয়ির কাজটা বিনো পারে ভাল। ঢেঁকিশালের চালের নিচে এই চারজন—বাইরের কেউ না উঠে পড়ে দেখো। অনাচার লাগবে। তেমন হলে কাসুন্দি বিধবা কি সাত্ত্বিক লোকের পাতে দেওয়া যাবে না।

উমাসুন্দরী একলা হাতে বানাচ্ছেন, আর তিনজনে জোগাড় দিচ্ছে। ঢেঁকিশালের উনুনেই জল ফুটিয়ে নিল। ফুটন্ত জলে সরষে গুলে পরিমাণ মতো হলুদগুঁড়ো ও লঙ্কাগুঁড়ো মিশিয়ে ঝালকাসুন্দি। তার সঙ্গে কোটা-আম মিশাল দিলে—হল আমকাসুন্দি। পুনশ্চ তার সঙ্গে তেঁতুল চটকে দিয়ে তেঁতুল কাসুন্দি। মুখে বলেছি, আর চট করে অমনি হয়ে গেল—অত সোজা নয়। উপকরণের কমবেশি এবং মাথার কায়দা-কৌশলের উপর কাসুন্দির ভালমন্দ। সব হাতে কাসুন্দি উতরায় না। এ বাবদে পুববাড়ির বড়গিন্নির নাম আছে. তাঁর মাখা কাসুন্দি সকলে তারিপ করে খায়। ব্যঞ্জনে মিশালে একেবারে নতুন স্বাদ। ঝালকাসুন্দি আমকাসুন্দি বেশি দিন থাকে না, ছাতা ধরে যাবে। তেঁতুলকাসুন্দি ধীরেসুস্থে অনেক দিন ধরে খাওয়া চলবে, আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ি যাবে। আমকাসুন্দি ও তেঁতুলকাসুন্দি বড়গিন্নি ঠেসেঠেসে কয়েকটা ঘটে

ভরলেন। বললেন, সিকের তুলেপেড়ে রাখো এগুলো। আট-দশ দিন অন্তর রোদে দিতে হবে, খেয়াল্ থাকে যেন। কাসুন্দি ঠিক রাখা চাট্টিখানি কথা নয়

কাসুন্দি হচ্ছে দেখে নিদি-পুঁটি ডালা নিয়ে শাক তুলতে বেরিয়েছিল। খুঁটে খুঁটে একরাশ ডাটাশাক তুলে ফিরল। শাক তেল-শাক হবে। শাক-ভাতের সঙ্গে ঝালকাসুন্দি জমে ভাল।

নতুনবাড়ির মেজঠাকরুন বিরাজবালা দেবনাথের কাছে নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন। দেবনাথকে নয়, যে দু'জন বরকন্দাজ নিয়ে এসেছেন তাদের। বললেন, আমার ওখানে রেঁধে-বেড়ে খাবেন ওঁরা। আমি তো চিনি নে—তুমি বলে-কয়ে দাও ঠাকুরপো।

দেবনাথ হেসে বলেন, ওদের ভাগ্যি খুলল, আর আমরাই বাদ পড়ে গেলাম বউঠান?

আছ তো জষ্ঠিমাস অবধি—বাদ কেন পড়বে ভাই। ওঁদের তাড়াতাড়ি, কবে রওনা হয়ে পড়েন—

দেবনাথ বললেন, পরশু যাবে। বাংলাদেশের এ রকম গাঁ-গ্রাম দেখেনি কখনো। বললাম, কয়েকটা দিন থেকে যাও তবে। নয়তো আগেই চলে যেত।

মেজঠাকরুন ধরে পড়লেন : পরশু নয়, আরও একটা দিন থেকে যাক। যাবেন তরশু। কাল দুপুরে একজনে খাবেন, আর একজনে পরশু। খাওয়া-দাওয়া সারা করে তার পরে পরশুও চলে যেতে পারেন, তাতে আমার অসুবিধে নেই।

দেবনাথ বলেন, পরশু কেন আবার? কালই একসঙ্গে দু-জনার হয়ে যাক না।

উঁহু—বলে ঠাকরুন ঘাড় নেড়ে দিলেন : তা কেন হবে? এনেছ অবিশ্যি তোমার নিজের কাজে, আমি ফাঁকতালে দুটি বামুন পেয়ে গেলাম। পেয়েছি তো দু-দিনের দায় সেরে নেবো। একসঙ্গে খাইয়ে দিলে তো এক দিনের কাজ হবে আমার।

দেবনাথের গোলমাল লাগছে। বললেন, বৃত্তান্তটা কি, খুলে বলো বউঠান।

এই বোশেখমাস জুড়ে ব্রাহ্মণ সেবা। নিত্যিদিন একজন করে তিরিশ দিনে তিরিশ। এতো বামুন পাই কোথা বলো দিকি। হতচ্ছাড়া গাঁয়ে ধানচালের আকাল নয়, বামুনের আকাল। তিন ঘর আছেন ওঁরা—কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কত আর হবেন। সেই পাথরঘাটা বড়েলা রাজীবপুর ফুলবেড়ে অবধি নেমন্তন্ন

পাঠিয়ে হাতে-পায়ে ধরে দুনো দক্ষিণা কবুল করে আনতে হয়। না এনে উপায় নেই ঠাকুরপো, সংকল্প নিয়েছি—যেমন করে হোক চালিয়ে যেতে হবে।

দেবনাথ বসিয়ে দিলেন একেবারে: বরকন্দাজরা তো বামুন নয় বউঠান। একজন ছত্রি আর একজন গোয়ালা।

ঠাকরুন স্তম্ভিত। তারপর বললেন, তুমি মস্করা করছ ঠাকুরপো। চান করছিলেন, গলায় তখন এই মোটা পৈতে দেখেছি।

পৈতে তো আমাদের কায়স্থরাও কত জায়গায় নিচ্ছে। নাথমশায়রাও পৈতে ধারণ করেন। তাই বলে বামুন হয়ে গেল নাকি সব? হয় তো ভাল। তেমন বামুন খাসে তিরিশ কেন তিনশ জনকে ধরে ধরে খাওয়াও না।

বিরাজবালা সত্যি বিপদে পড়েছেন। বৈশাখী ভোজনের ব্রাহ্মণ জোটানো দিনকে দিন মুশকিল হয়ে উঠছে। হালের ছোকরারা ইস্কুল-কলেজে পড়ছে—শোনা যায়, চুপিসারে শহরের হোটেলে ঢুকে মুরগি মারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষায় গররাজি তারা—ভোজনান্তে হাত পেতে দু-আনা দক্ষিণা নিতে তাদের ঘোর আপত্তি। ভোজন অবশ্য মেজঠাকরুনের বাড়িতে পোলাও-কালিয়া নয়, সাদামাটা ডাল-চচ্চড়ি-ভাত। বেওয়াবালতি মানুষ—পুণ্যের লোভ ষোলআনা আছে, কিন্তু খরচার টানাটানি। তা সে যা-ই হোক, এই সোনাখড়ি গাঁয়ের তিন ব্রাহ্মণবাড়িতে উপবীতধারী যতগুলি আছেন, সবাইকে এক একদিন করে খেয়ে যেতে হয়। আপত্তি করলে ঠাকরুন পা জড়িয়ে ধরবেন—একফোঁটা বালকেরও পা ধরতে বাধা নেই। বয়স কম হলেও ব্রাহ্মণো কেউ খাটো যায় না—কেউটেসাপ বাচ্চা হলেও পুরোদস্তুর বিষ থাকে। মেজঠাকরুনের হাত এ-তাবৎ এড়াতে পারেনি কেউ—উঁহু, একবারই কেবল, অনিল ভটচাজের বাপ হৃষীকেশ ভটচাজ মশায়। রাজি হয়ে গিয়ে দিনের দিন ভটচাজমশায় 'না' বলে বসলেন। কেন, কি বৃত্তান্ত? জ্বর হয়েছে কাল রাত্রে, নয়তো কেন আর যায় না বলো। খাচ্ছি তো ফি বছর। কিন্তু ফি বছর আর এ বছরে তফাত আছে, জানেন মেজঠাকরুন। অব্রাহ্মণের অন্নাহার চলবে না, সম্প্রতি কথা উঠেছে—হৃষী ঠাকুর হয়তো-বা তার মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। বিরাজবালাও সহজে ছাড়ার পাত্র নন, টিপ করে হৃষীকেশের পায়ের উপর আছড়ে পড়লেন: কি করি এখন ঠাকুরমশায়? আপনার কথা পেয়ে অন্য কাউকে নেমন্তন্ন করা হয়নি—ব্রত পণ্ড হয়ে যাবে। একহাতে ঠাকুরের পা জড়িয়ে রয়েছেন, অন্য হাত বুলিয়ে ভাল করে আন্দাজ নিচ্ছেন। ঈষৎ গরম বলে ঠেকে—হতেও পারে জ্বর। তারপর হৃষী ভটচাজ 'ওঠো মা' বলে হাত ধরে তুলে দিলেন, তখন আর সন্দেহ রইল না। জ্বরই বটে, ঠাকুর ছুতো ধরেন নি। দীনু চক্কোত্তিকে

ধরে পেড়ে সেদিনের কাজ সমাধা হল। কিন্তু মনে মনে মেজ-ঠাকরুন শাসিয়ে গেলেন: ছাড়ছি নে ঠাকুর। অর বলে বিছানায় ক'দিন প'ড়ে থাকতে পারো দেখি। বোশেখ শেষ হতে এখনো বাইশ দিন বাকি— ভোজনে না বসে যাবে কোথা?

ওকে ওকে রইলেন ঘরের বার হলেই পা জড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু ক'রবার পাওয়া গেল না, জরবিকারে হৃষীকেশ মারা গেলেন বোশেখের ভিতরেই। আট তারিখে অসুখ করেছিল—তাঁর খাওয়ানোটা আগে সেরে রাখলে ব্রাহ্মণ সেই বছরটা অন্তত ফাঁকি দিতে পারতেন না।

বৃদ্ধ দীনু চকোত্তি ভোজনে বসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আর চারটে-পাঁচটা বছর পরে অসুবিধা থাকবে না বউমা, গ্রামের ভিতর থেকেই বিস্তর পাবে।

আঙুলের কর গণে হিসাব করেছেন: আমাদের হরি আর অতুল, ভটচাজ-বাড়ির রমণা নিমু আর গোবরা, আর চাটুজ্জে দরজ্যামাপদ এতগুলোর উপনয়ন হয়ে যাবে। ছয়-ছয়টা আনকোরা ব্রাহ্মণ গাঁয়ের মধ্যে। তারপরেও যা নাজাই থাকল, এত গ্রাম চুঁড়তে হবে না, শুধু এক রাজীবপুর থেকেই হয়ে যাবে।

বিরাজবালা কিন্তু ভরসা পান না। ওমা যেমন ছয়টি পড়ছে, খরচাও এর মধ্যে কতগুলো হবে কে জানে। ঐ হৃষী ভটচাজের মতো। বয়স তোমারও কম হল না দীনু ঠাকুর—আরও পাঁচটা বছর তুমি নিজে টিকে থাকবে তো বটে?

রাজীবপুর বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বিস্তর ঘর ব্রাহ্মণের বসতি। হলে হবে কি— বৈশাখ মাস সেখানেও, এবং নিত্যদিনের ব্রাহ্মণসেবী জন আষ্টেক অন্তত আছেন বিরাজ-বালার মতন। তার মধ্যে আবার চৌধুরিবাড়ি ও সরকারবাড়ির গিন্নি দুটি রয়েছেন। চৌধুরিরা বনেদি গৃহস্থ, রাজীবপুর তালুকখানার রকম চারআনা হিস্যার মালিক সকল শরিক মিলে। আর সরকাররা নতুন বড়লোক—কালীকান্ত সরকার মোক্তারি করে দু-হাতে রোজগার করছেন। চৌধুরিগিন্নি আর সরকারগিন্নিতে ঘোর পাল্লাপাল্লি। ইনি আজ কইমাছ খাওয়ালেন তো নির্ঘাত উনি কাল গলদাচিংড়ি খাওয়াবেন, ইনি পায়েস খাওয়াচ্ছেন তো উনি দই-রসগোল্লা। প্রতিযোগিতায় দক্ষিণাও বেড়ে যাচ্ছে—দু-আনা থেকে উঠতে উঠতে টাকায় পৌঁছে গেছে। এত মজা ছেড়ে রাজীবপুরবাসী কোন হতভাগা বামুন চড়া রোদের মধ্যে দু-ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে সোনাখড়ি অবধি খেতে যাবে?

এই তো অবস্থা! দেবনাথের কথা শুনে মেজঠাকরুন ঝিম হয়ে আছেন। বরকন্দাজ দুটো ফসকে গেল তবে—পৈতে সত্ত্বেও তারা সত্যিকার বামুন নয়।

ডুবন্ত লোকের তৃণ চেপে ধরার মতন তবু একবার বললেন, মস্করা কোরো না ঠাকুরপো, কত আশা করে এসেছি আমি—

দেবনাথ বললেন, মিছামিছি বামুন বলে তোমার পুণ্যি বরবাদ করব, সেইটে কি ভাল হবে বউঠান?

আচ্ছা, কী জাত আমিই ওঁদের জিজ্ঞাসা করব—বলে আশাভঙ্গের আঘাতে বেহঠাকরুন মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।

॥ পাঁচ ॥

পুষ্পময় তরুরাজি কৈলাস-শিখরে।
সদা শোভে মনোহর রতন-নিকরে ।
সিদ্ধ চারণাদি তথা সুখেতে বিহরে।
আমোদে অপ্সরাকুল নৃত্য করি ফিরে॥
বেদধ্বনি উঠে সদা ব্রহ্মর্ষির মুখে।
নিবাস করেন শিবা শিব অতি সুখে॥

ভিতর দিক থেকে আসছে। দেবনাথের চমক লাগে, গলাটা মিতের না? বিনো পুকুরঘাটে গিয়েছিল—ভরা কলসি নিয়ে উঠি-কি-পড়ি বাড়িমুখো দৌড়চ্ছে।

দেবনাথ বললেন, সুর ধরেছে কে রে বিনো? দেবেন না?

বিনো বলে, তিনিই। হাঁটু অবধি কাপড় তুলে বিল ভেঙে বাদামতলায় এসে উঠলেন, ঘাট থেকে দেখতে পেলাম। ছোটমেয়ের কাছে বিল-পার মির্জানগরে ছিলেন, মনে হচ্ছে।

দেবনাথ হঠাৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, আমার কাছে না এসে মিতে সরাসরি ভিতরে ঢুকে গেল?

কৈফিয়ৎ যেন বিনোরই দেবার কথা। সে বলে আপনি বাড়ি এসেছেন—কি করে জানবেন? বিষ্ণুপুর গিয়ে ফটিক সেদিন পায়নি। আমি গিয়ে বলছি আপনার কথা।

দেবেন্দ্র চক্রবর্তী বাড়ি যাচ্ছেন, পাথরঘাটা গাঁয়ে। পথের মাঝে সোনাখড়িতে একটু বসেছেন। দেবনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দরুন সোনাখড়ি এলে পুববাড়িতে একবার বসবেনই। মেয়েমহলে বেশ পশার—কোথাও গেলে পুরুষদের এড়িয়ে সোজা ভিতরে চলে যান। সেকালে দৈবজ্ঞগিরি পেশা ছিল—তক্তার উপর আলকাতরায় সাইনবোর্ড লিখে বাড়ির সামনের সুপারিগাছে

টাঙিয়ে দিয়েছিলেন : হাত-দেখা বর্ষফল-গণনা গ্রহশান্তি স্বস্ত্যয়ন কোষ্ঠি-ঠিকুজি-বিচার যোটক-বিচার ইত্যাদি করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পাঁচ মেয়ে পাত্রস্থ হবার পর অবস্থা বদলে গেল। 'দশপুত্র সম কন্যা যদি পড়ে পাত্রে'—চক্রবর্তীর কপালে তাই ঘটেছে। ব্রাহ্মণী গত হয়েছেন, কিন্তু মেয়েরা সাতিশয় ভক্তিমতী। তবে আর কোন দুঃখে দৈবজ্ঞগিরি করে বেড়াবেন। পেশা বরঞ্চ বলা যায়, পঞ্চকন্যাকে পালাক্রমে পিতৃসেবার পুণ্য-বিতরণ।

তখন দেবেন্দ্রের একটা কাজ ছিল, বৈশাখের গোড়ার দিকে বাড়ি বাড়ি বর্ষফল শোনানো—সিকিটা-আধলটা মিলত। পেশা ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু নেশা যাবে কোথায়। আগেকার মতোই পাঁজি সব সময় সঙ্গে থাকে। পাঁজির ভিতরেই সর্বশাস্ত্র—পাঁজি যার নখদর্পণে, চক্রবর্তীর মতে, সে ব্যক্তি সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম। এখনো যেহেতু বৈশাখ মাস চলছে, মেয়েরা সব তাঁর কাছে বর্ষফল শুনতে চায়। চক্রবর্তীও মহানন্দে লেগে গেলেন :

হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী।
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।।
কোন গ্রহ হৈল রাজা, কেবা মন্ত্রীবর।
প্রকাশ করিয়া কহ, শুনি দিগম্বর।
ভব কন ভবানীকে, কহি বিবরণ।
বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ।।

ভূমিকা চলছে, আর চক্রবর্তী দ্রুত পাঁজির পাতা উল্টে যাচ্ছেন। রাজা-মন্ত্রীর পাতা বেরিয়ে গেল—গুরু রাজা, রবি মন্ত্রী। পাতার আধাআধি জুড়ে ছবি : মুকুট-পরা রাজা রাজসিংহাসনে আসন-পিঁড়ি হয়ে আছেন। আঁটো জামা গায়ে, ভারী গোঁফ। মাথার উপর ছাতা—ছাতা বোধহয় সিংহাসনের সঙ্গে সাঁটা। অথবা ছাতা ধরে কেউ পিছনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে আছে। রাজার বাঁ-দিকে প্রকাণ্ড পাখা হাতে পাখাবরদার, তলোয়ার কাঁধে চাপদাড়ি-আঁটা সৈন্য কয়েকটা। মন্ত্রীমশায় ডানদিকে—তাঁরও উঁচু আসন, কিন্তু আয়তনে ছোট। মাথায় পেখম-দেওয়া, মুকুট নয়, পাগড়ির মতন জিনিস। চোখ বুলিয়ে দেখে দেবেন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, এবারের রাজাটি ভাল। মেঘ যথাকালে বৃষ্টিদান করবে। ধরিত্রী শস্যপূর্ণা, প্রজারা নিঃশঙ্ক। মন্ত্রীটি কিন্তু সুবিধের নন। শস্যহানি, প্রজাদের নানা নিগ্রহ-ভোগ, শোকভয়।

হিরু কলকের তামাক সেজে আগুনের জন্য রান্নাঘরে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে পড়ে টিপ্পনী কাটে : রাজার মন্ত্রীতে লেগে যাবে খটাখটি। ইনি শস্য ঢালবেন, উনি ভরা-ক্ষেত খরায় পুড়িয়েজ্বালিয়ে দেবেন।

জলাধিপতি শস্যাধিপতি মেঘনায়ক নাগনায়ক পথরাধীশ গজপতি সমুদ্রপতি পর্বতপতি ইত্যাদির ফলবর্ণনা একে একে আসছে। শস্যাধিপতির নামে চক্রবর্তী শিউরে উঠলেন—সর্বনেশে ঠাকুর—শনি। ফলং শস্যহানি, অগ্নিভীতি, দুর্ভিক্ষ, মড়ক।

কলকের ফুঁ দিতে দিতে হিরু এসে পড়ল। পাঁজি রেখে চক্রবর্তী নিজ হুঁকোর কল্কে বসিয়ে নিলেন।

কমল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল গুরু-রাজা রবি-মন্ত্রীর ছবি দেখবার জন্য। পাতাটা খোলাই আছে। বর্ষফল একটু থামিয়ে রেখে দেবেন দ্রুত কয়েক টান টেনে নিচ্ছেন। রাজা-মন্ত্রী কমল খুব মনোযোগ করে দেখছে। ধুস্—পুরানো পাঁজিগুলোয় যেমন আছে, এরাও হুবহু তাই। বছর বছর রাজা-মন্ত্রী বদলাচ্ছে, চেহারা তো বদলায় না। অবশেষে সমাধান একটা ভেবে নিল, আগে চেহারা যেমনই থাকুক রাজা-মন্ত্রী হলেই সব এক রকমের হয়ে যায়।

হপ্তাখানেক পরে একদিন হুলস্থূল কাণ্ড। শয়তানি সেধে গেছে কারা। সকালবেলা বাবলাডালের একটা দাঁতন ভাঙবেন বলে দেবনাথ দক্ষিণের দোর খুলে বেরিয়েছেন। সামনে দাওয়ার উপর ঠাকুর প্রতিমা। সদ্য-গড়া প্রতিমা রাতের অন্ধকারে চুপিসারে রেখে গেছে।

ও দাদা, উঠে এসো। দেখ কী করে গেছে—

হাঁক পাড়ছেন দেবনাথ। ভবনাথ মশারি খুলে দিয়ে শয্যার উপর উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন। এই বিলাসটুকু বহু দিনের। হুঁকো ফেলে ছুটতে ছুটতে এলেন। চেঁচামেচিতে বাড়িসুদ্ধ সব এসে পড়েছে।

দেবনাথ বললেন, প্রতিমা রেখে গেছে, ফেলে তো দেওয়া যাবে না।

জিভ কেটে উমাসুন্দরী বললেন, সর্বনাশ! ছেলেপুলে নিয়ে ঘর—অমন কথা মুখেও আনে না। তোমাদের যেমন সাধ্য, করবে। নমো-নমো করে হলেও করতে হবে।

উত্তরে শরিক-বাড়ির দিকে চোখ পাকিয়ে ভবনাথ গর্জন করে উঠলেন: বংশীধর ঘোষের কারসাজি, দেখতে হবে না। দেওয়ানি মামলা করেছে, ফৌজদারি করেছে, কিছুতে কায়দা করতে পারে না—উল্টে নিজেই নাকানি-চোবানি খেয়ে আসে। এবারে এই চালাকি খেলল। খরচান্ত করে পুববাড়ি কাবু হয়ে পড়লে ওদেরই ভাল।

কৃষ্ণময় ঘাড় নেড়ে বলল, আমার কিন্তু তেমন মনে হয় না বাবা। বংশী-কাকা নন, ফক্কোড় ছোঁড়াদের কাজ—গাঁয়েরই হোক, কিম্বা বাইরের হোক।

নতুনবাড়ি ক'বছর পূজো করে বন্ধ করে দিল, তারপর থেকে আশ্বিনে এ গ্রামে ঢাকের কাঠি পড়ে না। অথচ সামান্য দূর রাজীবপুরে ছ-সাতখানা পূজো। কথা উঠেছিল, চাঁদা তুলে গাঁওটিপূজো হবে। মতলব করে তারপর আমাদের একলার ঘাড়ে সম্পূর্ণটা চাপিয়ে দিল।

কথার মাঝে উমাসুন্দরী না-না করে ওঠেন। কেউ চাপায় নি রে বাবা—প্রতিমা কারো রেখে-যাওয়া নয়। আমাদের ভাগ্যে জগন্মাতা নিজে এসে উঠেছেন।

কৃষ্ণময় আগের কথার জের ধরে বলে যাচ্ছে, নতুনবাড়ি অষ্টপ্রহরী আড্ডা। মতলব ওখান থেকেও উঠতে পারে। হিরুকে একবার ভাল মতন জেরা করে দেখুন কাকা।

উৎস আবিষ্কারে দেবনাথের আগ্রহ নেই। এতবড় দায় কাঁধে চাপল, তিনি আরও হি-হি করে হাসেন। বললেন, বড়লোক হয়েছে যে দাদা। ভাইয়ের পা রুপোয় বাঁধানো—হাঁটা-চলা নিষেধ, নগরগোপ থেকেও পালকি হাঁকিয়ে আসতে হয়, বেহারারা ও-হো এ-হে হাঁকডাক করে তল্লাটের কানে তালা ধরিয়ে দেয়। পূববাড়ি-রা সাংঘাতিক রকমের ধনী, সকলে জেনেছে। যে জিনিস তুমি চেয়েছিলে দাদা। সব শেয়াল ছেড়ে দিয়ে ল্যাজ-মোটাকে ধর, পরে আছে না—এবারে সামলাও ঠেলা। গাঁওটি বাতিল করে একলা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। চেষ্টা করে ল্যাজ মোটা করেছ, এর তার ঘাড়ে বোঝ চাপিয়ে কি হবে। পূজো কেমন করে ওতরায়, তাই দেখ এখন।

চাউর হয়ে গেল, পূববাড়িতে ঠাকুর ফেলেছে, প্যাঁচে পড়ে গেছে ওরা—পূজো না করে উপায় নেই। নতুনবাড়িতে আগে পূজো হত। শরিক অনেক—সকলের অবস্থা সমান নয়। খরচ করা ও ঝঞ্ঝাট পোহানোর অভি-রুচিও থাকে না সকলের। মাদার ঘোষের বাপ চণ্ডী ঘোষ তখন বর্তমান। জজের পেস্কার তিনি, সিকিতে আধুলিতে নিত্যিদিন বিস্তর পকেটে পড়ে, হিসাব করলে উপরি-রোজগার মাসান্তে খোদ জজসাহেবের মাইনের দুনো-তেদুনো দাঁড়ায়। অতএব, শরিকদের যে যতটা পারে দিল, নাজাই পূরণের বাবদে আছেন চণ্ডী ঘোষ। তিনি মারা যাবার পরে মাদার একটা বছর কায়-ক্লেশে চালিয়েছিলেন, কিন্তু বাপের দিল-দরিয়া মেজাজখানা থাকলেও সে রোজগার কোথায়? পূজো বন্ধ হল। এতদিন পরে এবারের আশ্বিনে সোনা-খড়িতে আবার দুর্গোৎসব।

দলে দলে লোক এসে প্রতিমা দেখছে। ছোটখাট এক মেলা লেগেছে যেন। খবর বাইরেও ছড়িয়েছে, বা'র-গাঁয়ের লোকও আসছে। মাথা সমেত একেবারে ষোলআনা প্রতিমা—শুধু রং পড়েনি এবং সাজসজ্জা নেই। শতকণ্ঠে

সবাই তারিফ করছে। ঠাকুর গড়ানের পটুয়া বিলেত থেকে আসে নি নিশ্চয়। গড়া হয়েছে এই গাঁয়ের কুমোরপাড়ার ভিতরেই, আর নয় তো রাজীবপুরে। কোথায় রেখে গড়া হল, কারা গড়ল—ঘুণাক্ষরে প্রকাশ নেই। নিখুঁত মন্ত্রগুপ্তি।

বিকালবেলা গাঁয়ের মুরুব্বিদের নিয়ে ভবনাথ-দেবনাথ শলাপরামর্শে বসলেন। ভবনাথ দুঃখ করছেন: জোড়া মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার উপর পুকুর কাটিয়ে হাত একেবারে শূন্য। জষ্টিমাসের আম-কাঁঠাল খেয়ে যাবে বলে ভাইকে বাড়ি নিয়ে এলাম, তখন এই শত্রুতা সেধে গেল। আপনাদের নিয়ে বসেছি—কী ভাবে কি করা যায়। ফেলেছেও ঠাকুর দেখুন দিকি—কালী নয়, লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক নয়, দশভুজা দুর্গা। সেকালে শোনা আছে, জব্দ করার জন্য শত্রুপক্ষ এমনি ফেলত—তখন সস্তাগণ্ডার দিন, টাকা পঞ্চাশের মধ্যে খাসা একখান দুর্গোৎসব নেমে যেত। এখন মধ্যে-মধ্যে করেও কি লাগবে, হিসেব করে দেখুন।

বরদাকান্ত আগের প্রসঙ্গে একটু বলে নিচ্ছেন: শত্রুতা করে গেছে তোমাদের সঙ্গে, এমন কথা মনেও জায়গা দিও না ভবনাথ। রাজীবপুরে ছ-সাতখানা দুর্গা তোলে, আমাদের এ-গাঁয়ে তখন একটা ঢাকেও কাঠি পড়ে না। বেটাছেলেরা রাজীবপুর অবধি গিয়ে পুজো দেখে আসে, কিন্তু মেয়েলোকে পারে না—বুড়োরা ছেলেপুলেরাও না। ঘরে বসে মন আনচান করে, বুঝে দেখ তাদের অবস্থা। তা ছাড়া আমাদের সোনাখড়ি গাঁয়ের অপমানও বটে। তোমার রাজা-ভাই দেবনাথ—মহামায়ার ইচ্ছাতেই সে কৃতিপুরুষ হয়েছে। মায়ের বাঞ্ছা হয়েছে, তোমাদের হাতেই পুজো নেবেন তিনি। যারা প্রতিমা ফেলেছে, মহামায়াই তাদের হাত দিয়ে করেছেন—কোন সন্দেহ নেই।

উত্তরবাড়ির যজ্ঞেশ্বর জুড়ে দিলেন: আরও দেখ, সবে বোশেখমাস, পাকা ছ-মাস হাতে দিয়ে নোটিশ ছেড়েছে—সেদিক দিয়ে বলবার কিছু নেই। যোগাড়-যন্তরে এখন থেকে লেগে যাও। গাঁয়ের ছোঁড়ারা রয়েছে, ওরা ডাঙা ভেঙে ডহর করে। আর এর মধ্যে একটা পাল্লাপাল্লির ব্যাপারও আছে রাজীবপুরের সঙ্গে। ভাবনাচিন্তা কোরো না, নির্বিঘ্নে কাজ উঠে যাবে, ছোঁড়ারাই কোমর বেঁধে লাগবে।

পাল্লাপাল্লির কথায় হাক মিত্তির বলল, পুজো যখন হচ্ছে, থিয়েটারও হবে। অতি-অবশ্য ওটা। রাজীবপুরের ওরা তো থিয়েটারেই মাত করে দেয়। গেল-বছর কলকাতার অ্যাক্টর নিয়ে এসেছিল।

অক্ষয় বলে, মণ্ডপে আর কটা লোক? মণ্ডপের সামনের স্টেজের মাঠে

লোকে-লোকারণ্য। কলকাতার অ্যাকটর এবারও হয়তো আসবে। থিয়েটার বিনে শুধো-দুর্গোৎসবে গাঁয়ের লোক কিন্তু ধরে রাখা যাবে না —রাত্রে মণ্ডপ পাহারার ক'টা জোয়ানপুরুষ জোটানোই মুশকিল হবে। তাছাড়া পূজো সোনাখড়িতে হচ্ছে—আর সোনাখড়ির যত মানুষ থিয়েটারের টানে রাজীবপুর গিয়ে জুটছে, আমাদের পক্ষে অপমানও বটে। বলুন তাই কিনা।

বরদাকান্ত বাধা দিয়ে ওঠেন : না হে, আর চাপিও না তোমরা। পুকুর-কাটা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া—মোটা মোটা খরচ করে উঠেছে, তার উপরে আবার মা-দুর্গা ঘাড়ে এসে পড়লেন। যেমন তেমন পূজো নয়—দুর্গোৎসব। অন্য দেবদেবীরা আছে, শুধু-পূজো তাঁদের—সরস্বতীপূজো লক্ষ্মীপূজো বাস্তুপূজো শীতলাপূজো--উৎসব বলতে হয় না। দুর্গার বেলাতেই কেবল দুর্গোৎসব।

হারু সায় দিয়ে বলল, ঠিক বলেছেন মামা। থিয়েটার গাঁওটি -পুববাড়ির কিছু নয়, গ্রামসুদ্ধ চাঁদা তোলা হবে ঐ বাবদে। থিয়েটার সমেত গোটা পূজোই গাঁওটি হবে, আগে তো সেইরকম কথা হচ্ছিল – অর্ধেক তবু ছাড় হয়ে গেল। থিয়েটার সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার—পেরাজেরও তোফা জায়গা রয়েছে, নতুনবাড়ির বৈঠকখানা।

হিমচাঁদ মাঝবয়সি রসিক মানুষ। রসান দিয়ে তিনি বললেন, থিয়েটার তো অহোরাত্রিই ওখানে যার যেমন খুশি করে যায়। এবারে মুখস্থ পার্ট, কার পরে কোন জন হিসেব করে তাদের চলন-বলন, এইমাত্র তফাত।

হারু মিত্তির বলল, এদিককার একপয়সা খরচার জন্যে বলব না, আমরা নিজেরা ব্যবস্থা করে নেবো। শুধ প্লের দিন পূজোর উঠোনটির উপরে সামিয়ানা খাটিয়ে নিচে কয়েকটা মাদুর ফেলে দেবেন, বাস। স্টেজ আমাদের খরচায় আমরাই বেঁধে নেবো, হ্যাজাক ভাড়া আমরা করব। পান-তামাক আর কেরাসিনতেল যা লাগবে, সেই খরচটা গৃহস্থের। নেহাৎ মাকে পালাটা শোনাতে চাই, নয়তো উঠোনও চাইতাম না।

হিমচাঁদা বললেন, ভাল বুদ্ধি করেছ হে। প্লে শুনে লোকজন উঠে যেতে পারে, তবু আসর ফাঁকা হতে পারবে না মা-জননীকে থাকতেই হবে, শেষ অবধি না শুনে গত্যন্তর নেই। একলা তিনি নন—দুই ছেলে কার্তিক-গণেশ দুই মেয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী সমেত। অন্য কেউ না থাকলেও এই পাঁচজন তো পাকা রইলেন। অসুর আর সিংহ ধরলে সাত।

বরদাকান্ত বললেন, গণেশের কলাবউকে বাদ দিচ্ছ যে? শোনার লোক আরও তো একজন বাড়তি আছেন।

কথাবার্তা শেষ করে হাসিখুশিতে যে যার বাড়ি চলে গেল।

ভবনাথ বললেন, কানাপুকুর-পাড়ের বেলগাছটা কেটে ফেলতে হবে। পাট ঐ গাছে। দেরি আছে অবিশ্যি।

মূল পূজার দায় যাঁদের কাঁধে, ইচ্ছে হয় তো তাঁরা দেরি করুন গে। আমাদের এক্ষুনি লেগে পড়তে হবে—কোমর বেঁধে। এক্ষুনি, এক্ষুনি—দলের কাজকর্মে পরমানন্দবরি পাণ্ডা হারু মিত্তির নতুনবাড়ির আড্ডায় ঘোষণা করল।

তালুকদার বলে পশ্চিমবাড়ির খাতির, যেহেতু দেবহাটা তালুকের কিছু অংশের মালিকানা তাঁদের। এক শরিক হারু—ছোট্ট শরিক, তালুকের রকম আধআনা হিস্যার মালিকানা। সোনাখড়ির আদি বাসিন্দা নয় সে, মামাবাড়ির ভাগে হয়ে আসা-যাওয়া করত, মামা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাবার পর পাকা-পাকি এসে উঠেছে। সম্পত্তি ছোট, সংসারও ছোট তেমনি। সাকুল্যে দুটি প্রাণী, দেবা আর দেবী, সে নিজে আর বউ মনোরমা। দলের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া স্বভাব তার : সংসারের ঝামেলা নেই, রোজগারের ভাবনা ভাবতে হয় না—ঘরের খেয়ে হারু মিত্তি অহর্নিশি বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়।

গানবাজনা যাত্রা-থিয়েটারের নামে পাগল। যাত্রা শুনতে মাঘের রাত্রে তুর-তুর করে কাঁপতে কাঁপতে যে তিন-চার ক্রোশ দূর অবধি চলে যায়। (কুলোকে রটায়, ওর মধ্যে অন্য ব্যাপারও নাকি আছে।) এবারে গাঁয়ের সেই জিনিস। যাত্রা নয়, থিয়েটার—যাত্রার যা পিতামহস্বরূপ। বখেড়ার মোটা অংশ পুববাড়ির কর্তারা নিয়ে নিয়েছেন—পুজোআচ্চার ভাবনা হারুদের ভাবতে হবে না। একটা-কিছু বললে নিশ্চয় লেগেপড়ে করবে—কিন্তু দায়িত্বটা ওঁদের। থিয়েটারের ব্যাপারে এরাই সর্বেসর্বা—খ্যাতি-অখ্যাতি ষোলআনা এদের উপর বর্তাবে।

গ্রাম নিয়ে হারুর দেমাক। সোনাখড়ি আয়তনে একফোঁটা, লোকজন যৎসামান্য—তাহলেও রাজীবপুরের মতো গণ্ডগ্রামের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলবার মতো ক্ষমতা রাখি আমরা। সোনাখড়ি খাটো কিসে? মোনছোফ (মুন্সেফ) আছে আমাদের, ইঞ্জিনিয়ার আছে, উকিল আছে, মোক্তার আছে, কলকাতার চাকুরে আছে, কলেজের পড়ুয়া আছে। অধিকন্তু রায়-সাহেব আছে একটি —এ বাবদে রাজীবপুর গো-হারান হেরে রয়েছে। আশ্বিনের দুর্গোৎসবও ছিল—নতুনবাড়ির মাদার ঘোষের পিতা চণ্ডী ঘোষ জাঁকিয়ে পুজো করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে পুজো বন্ধ। থিয়েটার কোনদিনই নেই। উভয় কলঙ্ক মোচন হয়ে যাচ্ছে এবারে।

তড়িঘড়ি কাজ। দত্তবাড়ির কালিদাস কলকাতার হ্যারিসন রোডের মেসে

থাকে, চাকরি করে। কলকাতায় বন্দোবস্ত তার উপর চাপিয়ে হারু জরুরি চিঠি দিল : পত্রপাঠমাত্র নাটক পছন্দ করে পাঠাও। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক—যাতে সাজপোশাক গোঁফদাড়ি যুদ্ধ ও নৃত্যগীতাদি আছে। চরিত্র যত বেশি হয় ততই ভাল—বেশি লোক কাজে পাওয়া যাবে। কিন্তু স্ত্রী-চরিত্র পাঁচ-সাতটির বেশি নয়—গোঁফ কামিয়ে স্ত্রীলোক সাজতে ছেলেরা বড় নারাজ। নাটক ঠিক করে তার মধ্যে তোমার কোন পার্ট হবে জানিও। আর অমুক অমুকের (দু-তিনটে নাম—গাঁয়ের ছেলে তারাও, কলকাতায় থাকে) কি পছন্দ, তা-ও জিজ্ঞাসা করে নিও। এ ছাড়াও খাস-কলকাতার প্লেয়ার গোটা দুই-তিন আনার বন্দোবস্ত করবে। কলকাতার প্লেয়ার না হলে মানুষ ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল হবে। আমাদের আসর খাঁ-খাঁ করছে, সব মানুষ গিয়ে রাজীবপুরে জুটেছে—এমনি অবস্থা ঘটলে গ্রামসুদ্ধ আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কালিদাস ঘোর থিয়েটার-পাগলা, হপ্তার মধ্যে থিয়েটারে একদিন নিদেন পক্ষে যাবেই। মানুষ বুঝেই হারু মাতব্বর কাড়ছে। সোনছোফ ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদির কাছেও মচ্ছবের খবর জানিয়ে চিঠি চলে গেল—এমনও আছেন, তিন-চার পুরুষ আগে পিতামহ-প্রপিতামহের আমলে চাকরি সূত্রে প্রবাসে গিয়ে তথাকার পাকাপাকি বাসিন্দা, সোনাখড়ি নামটা কানে শোনা আছে কি নেই—গ্রামবাসী হিসাবে তাঁরাও হারুর লিস্টি-ভুক্ত, পাল্লাপাল্লির মুখে জাঁক করে সে তাঁদের নামে। পুজোর সময় আসতেই হবে তাঁদে সপরিবারে। আর চাঁদার প্রার্থনাও জানিয়েছে গ্রামের ইতরভদ্র সর্বজনার পক্ষ থেকে।

বিচার-বিবেচনা ও অনেক শলাপরামর্শ অন্তে কালিদাস পালা পছন্দ করে পাঠাল—সিরাজদ্দৌলা। নবাবী সাজপোশাক, জোরদার অ্যাকটিং, ঘনঘন কামান নির্ঘোষ, দরকারে স্টেজের উপরেই লড়াইয়ের সিন ঢোকানো যেতে পারবে। আর আছে ইংরেজদের গালিগালাজ। আতঙ্কের দিনে এ জিনিস না জমে যাবে কোথায়! সৈন্যসামন্ত সভাসদ দূত নাগরিক প্রহরী খোজা দেদার রয়েছে, অতএব কথা মুখে ফুটুক আর না-ই ফুটুক যে চাইবে তাকেই পার্ট দিয়ে খুশি করা যাবে। এসব ছাড়াও সোনাখড়ি-বাসী এক বিশেষ গুণী রয়েছে—নরেন পাল। নাচে গাবে চৌকস—রাজীবপুর থিয়েটারে সখি সেজে এসেছে বরাবর। নামডাক এতদূর বেড়েছে, গেল-বছর সদর থেকে ডাক এসেছিল তার—জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আলিবাবা পালায় মর্জিনা সেজে আসর মাত করে এসেছে। গ্রামেরই থিয়েটার যখন, এবারে সে কোনখানে যাবে না—এখানকার ডান্সিং-মাস্টার। পালার গান তো আছেই, উপরি কিছু বাইরের গানও জুড়ে দেবে। মর্জিনার গান গোটা দুই নাগরিকাগণের মুখে জুড়ে দেবে, বলছে নরেন

অপরাহ্নবেলা নতুনবাড়ির রোয়াকের এ-মুড়ো ও-মুড়ো ঘুরে ঘুরে হারু মিস্তির চং-চং করে কাঁজ বাজায়। লোকজন ডাকছে। থিয়েটার নামানো চাট্টিখানি কথা নয়—নানান রকম কাজ, বিস্তর খাটনি। গাঁ তোলপাড়—মানুষ সব চলেছে। যাদের পার্ট আছে তারা যাচ্ছে, যাদের নেই তারাও যাচ্ছে রিহার্সাল দেখার কৌতূহলে। তিন-চারজনে অহোরাত্রি পার্ট লিখছে—লিখে লিখে দিয়ে দিচ্ছে। আধ-মুখস্থ হয়ে গেলে তখন রিহার্সাল। মনকষাকষি, ঝগড়া—আমার পার্ট ছোট হয়ে গেল, অমুকের পার্ট বড়। হারু বলে, ছোট হোক—এবারের মতন নামিয়ে দাও। ভাল হলে আয়েন্দা সব প্রোমোশান। কখন বা বিরক্ত হয়ে বলে, সামনের বছর খুঁজে পেতে এমন নাটক আনব, ঠিক ঠিক একশ নম্বর করে পার্ট যাতে। মেয়ে পুরুষ দূত সৈনিক সবাই একশ দফা করে বলতে পাবে—একশ'র কম নয়, বেশিও নয়। তা নইলে দেখছি তোমাদের খুশি করা যাবে না, থিয়েটার-পার্টি ভেঙে যাবে।

দিনরাত্রি এখন এই এক উপসর্গ হয়েছে, উচ্চৈঃস্বরে পার্ট মুখস্থ করছে ছোঁড়ারা। প্রবীণও দু-পাঁচটি জুটে গেছেন তার মধ্যে। টাকা মুখস্থ চাই, প্রম্পটারের উপর নির্ভর করলে হবে না—ম্যানেজার হারুর আদেশ। নরেন পালের বুড়ো বাপ হৃদয়নাথ পাল মশায় বলেন, ইস্কুলে পাঠশালে পড়ার সময় এই মনোযোগ কোথায় ছিল বাপধন। তাহলে তো কেষ্ট-বিষ্টু যা-হোক একটা হতিস, গাঁয়ে পড়ে ভেরেণ্ডা ভাজতে হত না।

॥ ছয় ॥

ভবনাথ ও দেবনাথের মাঝে ভগ্নী আছেন মুক্তকেশী। শ্বশুরবাড়ি কুশডাঙায় আছেন তিনি—সোনাখড়ি থেকে ক্রোশ পাঁচেক দূর।

উমাসুন্দরী বললেন, গাড়ি পাঠিয়ে দাও, ঠাকুরঝি চলে আসুন। তিন ভাই-বোন একসঙ্গে হবেন অনেক দিনের পর।

ভবনাথ ঘাড় নাড়লেন: মুক্তর গ্রামজোড়া সংসার—গুছিয়ে আসবে তো। গাড়ি পাঠালে গাড়ি ফেরত আসবে। তার চেয়ে ফটিক চলে যাক—আসার হলে ওখান থেকে গাড়ি করে আসবে।

ফটিক মোড়ল চাকরান খায়, রপ্তানগিরি করে। অর্থাৎ এখানে দাওয়া সেখানে যাওয়া—হাঁটাহাঁটির যাবতীয় দায় তার উপর। মুক্তঠাকরুনের বাড়ি হামেশাই যেতে হয় তাকে। পাকা ইমারত ভেঙেচুরে এক কুঠুরিতে এসে

ঠেকেছে। বেশি আর লাগেই বা কিসে। ছাতে জল যাবার না বলে উপরে খোড়ো চাল। ভাঙাচোরা দেয়ালে গোবরমাটি লেপা। আর আছে চালাঘর দুটো—রান্নাঘর ও গোয়াল। বিশাল কম্পাউণ্ড জুড়ে রকমারি তরকারির ক্ষেত। বড় ফটকটা কিন্তু প্রায় অভগ্ন। ফটকের বাইরে পাঁচ শরিকের এজমালি পুকুর। পুকুর সেকেলে হলেও ঘাসবন কিছু নেই, জল টলটল করছে। এই বাড়িতে একলা মুক্তকেশী—দ্বিতীয় কোন প্রাণী নেই। পড়শি-দের কতজনে প্রস্তাব করেছে, তাদের বাড়ির মেয়েছেলে একজন কেউ গিয়ে রাতের বেলা শুয়ে থাকবে। দিনকাল খারাপ—একলা পড়ে থাকা ঠিক নয়। মুক্তঠাকরুন উড়িয়ে দেন : এদিকে ফণীরা, ওদিকে ভূপতিরা—একলা কিসে হলাম? ডাক দিলে ছুটে এসে পড়বে। দরকারই হবে না—এ্যাদ্দিন তো আছি, দিয়েছি কখনো ডাক?

ফণী ও ভূপতি দুই শরিক—ঠাকরুনের বাড়ির লাগোয়া উত্তরদিকে ও পশ্চিম দিকে তাদের বাড়ি। ফণী সম্পর্কে দেওর, ভূপতি ভাসুরপো। বউঠান বলতে ফণী পাগল, ভূপতিরও তেমনি জেঠিমা বলতে মুখে জল আসে। কে-ই বা নয় এমন। গ্রামসুদ্ধ তাঁর নামে তটস্থ—তাঁর কোনো কাজে লাগতে পারলে বর্তে যায়। মুক্তকেশীর গ্রামজোড়া সংসার ভবনাথ বললেন—সে কিছু বাড়িয়ে বলা নয়।

ফটিক এসে বলল, ছোট বাবুমশায় এসে গেছেন ঠাকরুন। যেতে হবে।

মুক্তকেশী বললেন, বললেই কি আর হুট করে যাওয়া যায় রে বাবা—আমার কি এক রকমের ঝঞ্ঝাট। সে হবে এখন—হেঁটেহেটে এলি, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বোস দিকি এখন তুই।

এতকালের আসা-যাওয়া—ঠাণ্ডা হয়ে বসার অর্থ ফটিক কি আর বোঝে না? ঘাট থেকে হাত-পা ধুয়ে এসেই দেখবে, পিতলের জামবাটি ভরতি চিঁড়া ভিজানো—তার সঙ্গে দুধ আম-কাঁঠাল কলা-পাটালি আরও কোন কোন বস্তু সঠিক আন্দাজে আসছে না। এই দেড় পহর বেলায় চেটেপুঁছে সব শেষ করতে হবে। অনতিপরে দুপুরে আবার দুটো ডুব সেরে আসতে না আসতেই একপাথর ভাত বেড়ে এনে সামনে ধরবেন—খাওয়ানোর ব্যাপারে ঠাকরুন অতিশয় নিষ্ঠুর, দয়াধর্ম নেই কোন রকম।

পা ধুতে ফটিক পুকুরে গেছে, আর এদিকে হন্তদন্ত হয়ে ভূপতি এসে উপস্থিত। কথাবার্তা এক্ষুনি তো হল। এবং ঠাকরুন ও ফটিক দুটি মানুষের মধ্যে—দুই ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না সেখানে। জিনিসটা এরই মধ্যে ভূপতি পর্যন্ত কেমন করে চাউর হয়ে গেল, কে তাকে খবর দিল? পোষা বিড়ালগুলো এবাড়ি-ওবাড়ি করে—তারা গিয়ে বলেছে নাকি? কিম্বা

পাতিকাকটা, জিওলগাছের ডালে যে বসে ছিল? অন্য কিছু তো ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভূপতি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, তোমার এখন নাকি বাপের-বাড়ি যাওয়া লাগল জেঠিমা? স্বচ্ছন্দে চলে যাও। আমিও এক মুখো বেরুই। বিয়ে বন্ধ।

মুক্তঠাকরুন প্রবোধ দিচ্ছেন: দেবনাথ বাড়ি এসেছে, না গেলে হবে না। তা বলে কি এখনই? আক্কেল-বিবেচনা নেই বুঝি আমার। বিয়ের কাজকর্ম মিটিয়ে কনে রওনা করে দিয়ে তারপরে যাব।

ফটিক ঘাট থেকে ফিরেছে। জলখাবার দিতে দিতে মুক্তকেশী বললেন, স্বকর্ণে শুনে যাচ্ছিস—গিয়ে সব বলবি। বিশে তারিখে ভূপতির মেয়ের বিয়ে। তার আগে যেতে দেবে না বলছে। গরুর-গাড়িতে জোর করে উঠে বসি তো চাদির বাঁশ টেনে ধরবে। টেনে হিড়হিড় করে উল্টোমুখো নিয়ে যাবে।

ঠাকরুনের কথা শুনে ফটিক হি-হি করে হাসছে।

মুক্তকেশী বলছেন, বয়স হলে কি হবে. ওটা বিষম ছটকো। বড্ড ভয় করি আমি। দেখে যাচ্ছিস—আমার অবস্থা গিয়ে বলবি।

ভূপতি সদম্ভে বলে, আমি আর কি! বিয়ের কনে টুকি, সে-ও তোমায় ছেড়ে কথা কইবে না।

একগাল হেসে মুক্তঠাকরুন সায় দিলেন: তা সত্যি, সেইখানে আরও ভয় আমার। একফোঁটা বয়স থেকে শাসন করে এসেছে—যাচ্ছি শুনলে পাকাচুল তোলার নাম করে যে ক'টা চুল আছে উপড়ে ফেলে দেবে।

ফটিককে বলেছেন গিয়ে ওদের সব বলবি। তাড়াও কিছু নেই। পুরো জষ্টিমাসটা দেবনাথ থাকবে—জষ্টির গোড়াতেই আমি চলে যাব। তোর আর আসতে হবে না ফটিক! এখান থেকে নিজেই একটা গাড়ি ঠিক করে আমি চলে যাব।

ফিরে যাচ্ছে ফটিক, পা বাড়িয়েছে। ঠাকরুন বললেন, খালি হাতে যাবি কি রে? দেবু বাড়ি এসেছে—বলবে, দিদি কি দিয়েছে দেখি। এই দু'খানা আমসত্ত্ব হাতে করে নিয়ে যা।

বৈশাখের গোড়া। আমে পাকই ধরল না এখনো—ঠাকরুনের আমসত্ত্ব দেওয়া লেগে গেছে। গোটালে নামে গাছটায় কিছু অকালে আম ফলে, খেতে তেমন ভাল না, কিন্তু আমসত্ত্ব অপরূপ। খান কয়েক আমসত্ত্ব ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ঠাকরুন ফটিকের হাতে দিলেন: নিয়ে যা, বাবা।

সামান্য একটু জিনিস—কিন্তু এতেই শোধ যাবে, বিশ্বাস হয় না। এতাবৎ কখনো তো যায়নি। আরম্ভ থেকেই ফটিক আপত্তি জুড়ে দেয়: আমসত্ত্ব

-বয়ে নিতে হবে কেন? আমাদের বট্‌ঠাকরুনই তো দেবেন আর ক'টা দিন পরে।

বট্‌ঠাকরুনের আমসত্ত, আর এই? খেয়ে দেখলি তো। আমারই বাপের বাড়ি—মিছে নিন্দে করতে যাব কেন? উত্তরোয় সেখানে এ জিনিস? বল্‌।

সত্যি, এ আমসত্তের জাত আলাদা। সোনার রং—ঈষৎ মলেন-পাটালির গন্ধ। আশ্চর্য রকম মুচমুচে, ছিঁড়তে হয় না—ভেঙে খেতে হয়। এই আমসত্তের এক টুকরো দুধের সঙ্গে খেতে হয়েছে ফটিককে—দুধে ফেলা মাত্র গলে গেল। গোটাসে আমের গুণ আছে নিশ্চয়—তার সঙ্গে মিশেছে ঠাকরুনের হাতের গুণ।

মুক্তঠাকরুন বললেন, আমসত্ত নিলি, আর পদ্মকোষার কাঁঠালও একটা নিয়ে যা। দাদা বড় ভালবাসে। ঘরে কাঁঠাল আছে একটা, কাল-পরশুর মধ্যে পেকে যাবে। নিয়ে যা বাবা।

এই চলল—পালাতে পারলে যে হয় এখন। একের পর এক মনে পড়ে যাবে। ঠাকরুনকে এমনি তো ভাল লাগে—কথাবার্তা ভাল, 'বাবা' ছাড়া বলেন না। খাওয়ান ভাল, যত্ন আত্তি ভাল। কিন্তু বোঝা চাপানোর বেলা কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

বললেন, ভূপতির মেয়েকে বলেছিলাম, সে চাট্টি কামরাঙা পেড়ে দিয়ে গেল। নিয়ে যা, বউরা কামরাঙা খেতে ভালবাসে।

চাট্টি মানে এক ধামা পুরো। ধৈর্য হারিয়ে ফটিক বলে, ফটকে কি গরুর-গাড়ি পিসিঠাকরুন? মাসটা পরেই তো যাচ্ছ—আস্ত কুশডাঙা গাঁ খান গাড়ি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেও তখন।

সেটা বলে দিতে হবে না। মুক্তকেশীর বাপের-বাড়ি যাওয়া এক দেখবার বস্তু। গরুর-গাড়ির আগাপাস্তলা এটা-সেটায় বোঝাই—তার মধ্যে বাঁশের কোড় লাউয়ের ডগা, হিঞ্চেশাক অবধি বাদ যায় না। মানুষটি তিনি একফোঁটা তাঁর বসার জন্য তবু বিঘতখানেক জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার সোনাখড়ি থেকে যেদিন ফিরবেন, সেদিনও এইরকম। আম-কাঁঠাল নারকেল সুপারি লাউ কুমড়ো বড়ির-হাঁড়ি কাসুন্দির-ভাঁড় ইত্যাদি সাপ্টা জিনিস আছেই, তার উপর হরিবুড়ো আলতাপাত আলুর কথা বলে দিয়েছেন—দেখ দিকি শিবধর, পিত্তিরাজ গাছের এই দিকটা খুঁড়ে। শাঁখা বেচতে এলে প্রথাপমই এক-জোড়া অতি অবশ্যি কিনে রেখো ছোটবউ, সরলাবউকে দেবো। খালি-হাত দুখানা নিয়ে বেড়ায়, দেখতে পারিনে। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ফরমাস—দেবার-থোবার বিস্তর পাত্র-পাত্রী। পেল্লায় সংসার ঠাকরুনের শ্বশুরবাড়ির এবং

বাপেরবাড়িরও—মিছে কথা কি।

অথচ একদিন কী কান্নাকাটি পড়েছিল এই মুক্তকেশীকে নিয়ে। যার কানে গেছে—সে হায়-হায় করেছে, পোড়াকপালী শতেকখাগী বলেছে তাঁর নামে। হরেশ্বর ঘোষ এগারো বছুরে মেয়ে কুশডাঙা রায়বাড়ি পাত্রস্থ করলেন। রায়-দের তখন তালুকমুলুক বিস্তর, দাবরাব প্রচণ্ড। কিন্তু বিয়ের বছরেই বর মারা গেল। তারপর শ্বশুর-শাশুড়ি দেওর-ননদ ইত্যাদি সব পটাপট মরতে লাগল। অরকারিতে গেল বেশিরভাগ, কয়েকটি মা-শীতলার অনুগ্রহে, একটি জলে ডুবে। বছর ছয়-সাতের মধ্যে গমগমে বাড়ি একেবারে পরিষ্কার। সোনাখড়িতে ইতি-মধ্যে হরেশ্বরও গত হয়েছেন, ভবনাথ কর্তা। তিনি বললেন, চলে আয় মুক্ত। একা একা শ্মশান চৌকি দিয়ে কি করবি?

কেমন একা, দেখ গিয়ে এখন। গ্রামসুদ্ধ মানুষ—কারো তিনি ঠাকুমা, কারো জেঠিমা, কারো খুড়িমা। বউঠান বলারও আছেন দু-একটি। গাঁ-গ্রামে সম্পর্ক ধরে ডাকাডাকির চল আছে বটে, কিন্তু সে জিনিস নয়—সকলকে নিয়ে মুক্তঠাকরুন সংসার জমিয়ে আছেন, সবাই আপনজন। অমল বিয়ে করে এলো—বাড়ি ঢুকবার আগে জেঠিমার উঠোনে গিয়ে জোড়ে তাঁকে প্রণাম করল। সৃষ্টিধরের এখন তখন অবস্থা—কবিরাজ শ্বেতআকন্দ পাতার সেঁক দিতে বলছে। বাঁওড়ের ধারে বাঁশবাগানের কোথায় যেন দেখেছিলেন. লণ্ঠন হাতে রাত দুপুরে ঠাকরুন সেই আন্দাজি জায়গায় ছুটলেন—সাথী কেউ পিছন ধরল কিনা, বিপদের মুখে তাঁর খেয়াল নেই। আশপাশের গাঁয়ে মড়ক লেগেছে—কালীতলায় গাঁওঠিপুজো। পুজো গুছিয়ে দিয়ে মুক্তঠাকরুন সামান্য দূরে বসে পর্যবেক্ষণ করেছেন—দশকর্মান্বিত পাকা পুরুত মণীন্দ্র চক্রবর্তীর পূজাবিধি ও মন্ত্রপাঠে ভুল হয়ে যায়, চোখ কটমট করে ঠাকরুন শুধরে দেন। এরই মধ্যে আবার ফণীর তিন বছুরে মা-হারা মেয়েকে খাইয়ে দিতে ছুটলেন একবার। মুক্তঠাকরুনের হাতে না খেলে মেয়ের নাকি পেট ভরে না।

গ্রাম শাসন করে বেড়ান মুক্তঠাকরুন। চেঁচামেচি শুনলেই রে-রে—করে পড়বেন তার মধ্যে। ছেলেপুলে পুকুরে জল ঝাঁপাঝাঁপি করছে. ঠাকরুনের সাড়া পেলেই চুপচাপ ভালমানুষ। সতীশ্বর ও বউয়ের মধ্যে ধুন্ধুমার ঝগড়া লেগেছে, ঘরের মধ্যে ঢুকে ঠাকরুন আচ্ছা করে বকুনি দিলেন, দুজনের মুখে আর কথাটি নেই। তারপরে এ ওকে দুষছে, ঝগড়া করতে গিয়ে গলা উঠে যায় কেন? ফিসফিসিয়ে হলে তো ঠাকরুনের কানে যেত না। রঙ্গলালের শালা কলকাতার কলেজে ঢুকেছে—শহুরে ছেলে বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে রাস্তায় সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে যাচ্ছে। এতটুকু ছেলে সিগারেট খাস কেন রে? ছেলেটা বুঝি অগ্রাহ্য করে হেসেছিল। আর যাবে কোথায়—রেগেমেগে

ঠাকরুন কুটুম্বর ছেলের গালে ঠাস করে চড় কষিয়ে দিলেন। দাবরাব এমনি। আবার পদ্মবালার বর এসেছে শুনে সেই মানুষ ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির। দেখেশুনে বলছেন, নাতজামাই বড় রূপবান রে। আমি ছাড়ব না, এ বর পাবিনে তুই পদ্ম, আমি নিয়ে নিলাম। থান কাপড়ের ঘোমটা টেনে বউ হয়ে ঝুপ করে বরের পাশে বসে পড়লেন। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে পদ্ম হাসে, আর ঘাড়টা অনেক অনেকখানি কাত করে দেয়। অর্থাৎ নাওগে বর, খুশি মনে দিয়ে দিচ্ছি ঠাকুমা—

শুধু মানুষ কেন, পশুপক্ষীরাও ঠাকরুনের সংসারের বাইরে নয়। নীলির সঙ্গে কাকেদের বোংহয় ঝগড়া। বাটিতে চাট্টি মুড়কি দিয়ে বসিয়ে বোন জল আনতে গেছে ঠিক টের পেয়েছে কাকেরা, একটি-দুটি করে দাওয়ায় এসে বসছে। এগিয়ে আসে কাছাকাছি। নীলি ছোট হাত দু-খানিতে বাটি ঢেকে ধরেছে তো কাকে গায়ে ঠোকর মারছে। কেঁদে পড়ে নীলি, পালাতে গিয়ে হাতের বাটি ছিটকে পড়ে। কাকেদের মচ্ছব পড়ে গেল, খুব মুড়কি খাচ্ছে। মুক্ত-ঠাকরুন এমনি সময় উঠানে পা দিলেন।

এইও, ভয় দেখিয়ে বাচ্চার মুড়কি খাওয়া হচ্ছে?

নীলিকে ডাকছেন : আয় রে, কিছু করবে না। কাঁদিস নে, আবার মুড়কি দিচ্ছি। ভয় কিসের, তোকে ক্ষেপাচ্ছে।

এখনো তো কত দূরে মুক্তঠাকরুন—কিন্তু মুড়কি ফেলে কাকগুলো দূরে চলে গেছে। নিপাট ভালমানুষ—মাথা কাত করে ঠোঁটে গা খোঁচাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছে না এদিকে যেন।

তাতে ছাড়াছাড়ি নেই, মুক্তঠাকরুন সমানে বকুনি দিয়ে যাচ্ছেন : হস, হস—ভারি বজ্জাত হয়েছ সব। সাতসকালে এক পেট মুড়ি গিলে আবার এখানে বাচ্চার মুড়কিতে ভাগ বসাতে এসেছ।

সকালবেলা রান্নাঘরের পাশে জিওলতলায় দাঁড়িয়ে ডাক দেবেন : আয় আয় আয়। ডাক চেনে কাকেরা—নানান দিক থেকে উড়ে এসে পড়ে। মুড়ি ছড়িয়ে দেন ঠাকরুন। কাকেরা রা মানে না—নিজে খাচ্ছে আবার অন্যের দিকে ঠোকর মারে। ঠাকরুন তাড়না করেছেন, এইও, সরে যা বলছি, সরে যা বলছি। সরে যা, মারব কিন্তু—

ঠিক এরাই কিনা বলা যায় না—কিন্তু মুক্তঠাকরুনের ধারণা, সকালের সেই দলের কয়েকটি অন্তত এর মধ্যে আছে। একটার দিকে আঙুল দেখান : এই পাজিটা বড্ড শয়তান। নিজের খাবে আবার অন্যের দিকে ঠোক মারবে। নিত্যি সকালে দেখে দেখে চিনেছি।

শিবা-ভোজন করিয়ে থাকেন ঠাকরুন। সন্ধ্যাবেলা পুকুরপাড়ে জঙ্গলে ঢুকে যান। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জোড়হাত করে বলেন, মহারাজেরা আছ তো সব? আজ রাত্রে পঞ্চজন তোমাদের সেবা—কোন্ পাঁচজন ঠিক করে নাও। সামনের শনিবার আবার পাঁচটিকে ডাকব। ঝগড়াঝাটি কাড়াকাড়ি যদি কর, তাহলে ইতি পড়ে যাবে কিন্তু।

সেবারে ঠিক তাই হয়েছিল। হেসে-হেসে ঠাকরুন বৃত্তান্ত বলেন। রেগেমেগে শিবা-ভোজন বন্ধ করলেন। কান্নাকাটি পড়ে গেল কিছুদিন পরে। উঠোনে ঘুরত, রান্নাঘরের কানাচে ধন্না দিত রাত্রিবেলা। পুকুরপাড়ে দলবদ্ধ হয়ে এসে হুক্কা-হুয়া করত। কাণ্ড দেখে মুক্তঠাকরুন হাসতেন খিলখিল করে। শেষটা মাপ করে দিলেন, আর কখনো বজ্জাতি করবিনে, মনে থাকে যেন।

জঙ্গলের ধারে নিমগাছ-তলায় পাতা পড়তে লাগল আবার। লাইনবন্দি পাঁচখানা কলাপাতা—পরিপাটি করে ভাত বাড়া, ভাতের উপর ডাল, পাশে পায়স। মালসায় জল পাশে পাশে—গেলাসে মুখ ঢুকবে না শিয়াল-নিমন্ত্রিতদের। সকালবেলা গিয়ে তীক্ষ্ণ নজরে দেখেন ভদ্রভাবে খেয়ে গেছে কিনা। মুক্তকেশী ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। দেখে প্রসন্ন হলেন তিনি, না এবারে শিক্ষা হয়েছে—আর বাঁদরামি করবে না।

পোষা পায়রা আছে। ফটকের উপর ছাদ থেকে বাঁশের চালি ঝোলানো পায়রাদের আস্তানা সেখানে। উঠানে ধান ছড়িয়ে দেন, খেয়ে আবার চালিতে উঠে বকম-বকম করে। আগে চারটে মাত্র ছিল—ছা-বাচ্চা হয়ে এখন মস্তবড় এক ঝাঁক।

বিড়াল পুষেছেন। বিষম ন্যাওটা, গায়ে গড়ায়। একটা তো এমন আদুরে হয়ে পড়েছে, দুধ দিয়ে ভাত না মাখালে খান না তিনি—বার দুয়েক শুঁকে মুখ তুলে নেন। কুকুরও আছে তিনটি। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, দিনে-রাত্রে কোন সময় পাত্তা পাওয়া যায় না, কোন কাজে আসে না। নিত্যপোষ্য তারা তবু। আ-তু-উ-উ—করে ডাক দিলে অলক্ষ্য জায়গা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে পড়বে, গব-গব করে গিলে তক্ষুনি আবার উধাও। হাঁস পুষেছিলেন ঠাকরুন একজোড়া—পুকুরে জলে ভেসে বেড়াত—চই-চই করে ডাকলে ঘাটে চলে আসত। বেশ ছিল—শিয়ালে ধরে নিয়ে গেল দুটোকেই পর পর। মানকচু-বনে শজারু ঢুকে কুরে কুরে খেয়ে যেত, ভূপতির ছেলে ফাঁদ পেতে একটা ধরে ফেললে—মুক্তঠাকরুন বধ করতে দিলেন না, পুষবেন বলে গোয়ালের বড় ঝুড়িটা চাপা দিয়ে রাখলেন। তার মধ্যে থেকেও কোন কৌশলে পালাল, ঈশ্বর জানেন। শালিক পুষেছিলেন—পাঠশালার গুরু-

মশায়ের মতন সকাল বিকাল নিয়মিত বুলি পড়াতেন। পোড়া শালিক রা কাড়ে না—মাস চারেক ধস্তাধস্তি করে শেষটা রাগ করে একদিন খাঁচার দরজা খুলে দিলেন, শালিক উড়ে চলে গেল। জলের মাছও পুষেছেন ঠাকরুন—পনের বিশটা-পোষা মাছ পুকুরে। খেয়ে খেয়ে ডাগড়াই হয়েছে, দেখে লোকের লালসা জাগে। কিন্তু মুক্তঠাকরুনের পোষা জীবে হাত ঠেকাবে কে। মাছ পোষার আরম্ভ এইভাবে—

ভুপতি বলল, পুকুরে দামজঙ্গল হয়ে যাচ্ছে জেঠিমা। বাঁওড় অনেকটা দূরে। লোকে চান করে, রান্নার জল খাবার জল নিয়ে যায়। পুকুরটা আমাদের সাফসাফাই রাখা উচিত।

বেশ ত, ভালোই তো। খুব উৎসাহ মুক্তঠাকরুনের।

এসবের খরচাও আছে একটা বেশ। বলছি কি জেঠিমা, সব শরিকে মিলে গুঁড়ো-পোনা ছেড়ে দিই এবারে। পুরানো পুকুরে দেখতে দেখতে মাছ বড় হয়ে যাবে।

ঠাকরুন অবাক হয়ে বলেন, বললি কি রে? মাছ বিক্রি করবি শেষটা তোরা? রায়পুকুরের মাছ বেচে খরচা তুলবি?

মতলবটা ছিল নিশ্চয় তাই, বেগতিক বুঝে ভুপতি চেপে গেল। ঘাড় নেড়ে বলল, তা কেন, রুই-কাতলা ধরে ধরে খাবো আমরা। অতিথি-কুটুম্ব এলে খাবে। পেটে খেলে পিঠে সয়। মাছ খেয়ে স্ফূর্তি থাকবে—পুকুর সাফাইয়ের খরচা দিতে কেউ আর কাড়ুং-ফুড়ুং করবে না।

ফণী ছিলেন, তিনি বললেন, বউঠানও তো তিন আনা-চারগণ্ডার শরিক—তাঁর কি?

ভুপতির হাজির-জবাব: ঐ তিন আনা-চারগণ্ডার মতোই খরচা দেবেন জেঠিমা। তাঁর অংশের মাছ, দেওর তুমি আছ, ভাসুরপো আমরা আছি—আমরাই সব ভাগযোগে খাব।

ঠাকরুন হেসে বললেন, খাস তাই। কিন্তু গোটাকতক রুই চাই আমার। পুষব।

বর্ষার মুখে মাছের পোনা বেচতে আসে। দূরঅঞ্চলের মানুষ—কোন একখানে বাসা নিয়ে থাকে। সে বাসা এমন-কিছু ব্যাপার নয়—মাছের জন্য একটুকু খানাখন্দ জায়গা এবং মানুষের জন্য কারো ঘরের দাওয়া। চারাপোনা খানায় ছেড়ে রাখে, সকালবেলা ছাঁকনি দিয়ে কিছু হাঁড়ায় তুলে নিয়ে গাঁয়ে বেরোয়: মাছের পোনা নেবেন নাকি কর্তা? এক খুঁচি দিয়ে যাই পুকুরে ছেড়ে।

শিকে-বাঁকের দু-মুড়োয় দুই হাঁড়া। পোনার হাঁড়া নিয়ে চলনের কায়দা আছে, দুলে দুলে চলতে হবে জল যাতে ছলাৎ-ছলাৎ করে হাঁড়ার গায়ে লাগে

বলেছে যখন, দু-হাত দু-হাঁড়ায় ঢুকিয়ে নাড়ছে, জল স্থির থাকতে দেবে না। চারামাছ তা হলে মারা যাবে।

একদিন ভূপতির কাছে গিয়ে পড়েছে: বাবু, পোনা খুঁজছেন শুনতে পেলাম।

ভূপতি বলল, দেখি, হাতে তোল দিকি চাট্টি। ইঃ, একেবারে গুঁড়ো। দেখে আর কি বুঝব?

লোকটা বলছে, সাচ্চা মাছ। রুই-কাতলাই সব—মৃগেল কালবাওস দু-চারটে হতে পারে।

বলো তোমরা ঐ রকম। যতীনকাকার পুকুরে এমনি লম্বা লম্বা বলে দিয়ে গেল। ছ-মাস পরে জাল নামিয়ে রুই-কাতলা একটাও উঠল না—সমস্ত পুঁটি-চেলা। গুঁড়োমাছ চেনা তো যায় না।

লোকটা দিব্যিদিলেশা করে: সে কাজ-কারবার আমাদের কাছে নয় বাবু। কপোতাক্ষ পার হয়ে ইচ্ছামতীর চাঁচুড়ে-বাঁচুড়ে অবধি চলে যাই বাছাই ডিমের খোঁজে। দামে দু-পয়সা বেশি ধরে নেবো, কিন্তু মালের কারদাজি পাবেন না।

মাস চারেক পরে জাল টেনে দেখা গেল, পোনা আঙুল ভর হয়েছে। মৃগেল আধাআধি, তবে খুচরো মাছের ভেজাল নেই বোধহয়। আরও খানিকটা বড় হলে রুইমাছ কতকগুলো ধরে ঠোঁটে নোলক পরিয়ে জলে ছাড়া হল আবার। ঠাকরুনের নামে রইল এগুলো, পুষবেন তিনি, জালে পড়লে ছেড়ে দেবে। চলছে তাই। আর কী আশ্চর্য! মাছেরা যেন বোঝে সমস্ত, দিব্যি পোষ মেনে গেছে। দুপুরে ও সন্ধ্যায় মুক্তকেশী ঘাটে দাঁড়িয়ে 'আয়' 'আয়' করে ডাকেন—জলে অমনি আলোড়ন ওঠে। ইয়া ইয়া দৈত্যাকার হয়েছে মাছগুলো, পুচ্ছ নেড়ে ঘাটের উপর চক্কোর দিয়ে বেড়ায়। খাবার পড়লে মুখ খুলে টুক টুক করে ধরে নেয়। কাজ সমাধা হলেই জলতলে ডুব। আর ডেকে পাওয়া যাবে না।

বলতে বলতে ঠাকরুন হাসেন: কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি—মানুষের হালচাল বেটারা কেমন খাসা শিখে নিয়েছে। শুধু-হাতে অন্য সময় হাজার 'আয়' 'আয়' ডাকো, পাত্তা মিলবে না।

ফটিক বোড়ল ফিরে গেল অতএব। এত ঝক্কিঝামেলা এত সব আশ্রিত-প্রতিপাল্য ছেড়েছুড়ে ফট করে ডাক্তারের বাড়ি ওঠেন কি করে? মাসের শেষাশেষি যাবেন বলে দিলেন। আর নয়তো জ্যৈষ্ঠমাসের গোড়ায়।

॥ সাত ॥

গাঁ-গ্রামে ছেলেপুলের কী মজা! ছেলেপুলে আর পাখি-পশুদের। ঝোপেঝাড়ে গাছে গুল্মে এত খাবার জিনিস—খুঁজেপেতে নিলেই হল। বৈঁচি-বনে বৈঁচি পেকে আছে—সামাল হয়ে ঢুকতে হবে, বড্ড কাঁটা। ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে, কাঁটা বেঁধে না। আর বিঁধলেই বা কা—পাকা ফলে কোঁচড় ভরতি হয়ে এলো, কাঁটার খোঁচায় এখন আর গায়ে সাড় লাগে না। এক কোঁচড় বৈঁচ নিয়ে পুঁটি মালা গাঁথতে বসেছে। কমল সতৃষ্ণচোখে দিদির কাজ দেখছে। সদয় হয়ে পুঁটি মাঝে মধ্যে একটা দুটো ফল ছুঁড়ে দিচ্ছে ভাইয়ের দিকে, নিজের গালেও ফেলল হয়তো বা। আর সুচসুতো নিয়ে ক্রুতহাতে মালা গেঁথে চলেছে। একজোড়া মালা পরাল কমলের গলায়, একটা নিজের। খেলে বেড়াও, যা ইচ্ছে করো—খাবার ইচ্ছা হল মালা থেকে ছিঁড়ে মুখে ফেলে দাও কাউকে দেবার ইচ্ছা হল ছিঁড়ে একটা দিয়ে দাও। শেষটা দেখা যাবে, শুধু একগাছি সুতো গলায় ঝুলছে, তাতে একটিও ফল নেই।

আশশ্যাওড়ার ফল পাকে—ছেলেপুলের দেওয়া নাম মধুফল। মুক্তাফলও বলতে পারত। গোলাকার লালচে একটি মুক্তা রসে টসটস করছে। সবটাই প্রায় বীচ বলে মালা গাঁথা চলবে না, ঝোপ থেকে ছিঁড়ে মুখে ফেলে, চুষে নিয়ে বীচ ছুঁড়ে দেয়। পাথরকুচির পাতা—দেখতে বড় ভাল, চাপ দিলে মট করে ভেঙে যায়। পুঁটিদের রাঁধাবাড়ি-খেলায় পাথরকুচি পাতার মাছ হয়, হেড়াঞ্চি-ফলের ডাল তেলাকুচো-ফলের পটোল। কচুর পাতার উপর ধুলোর ভাত বেড়ে নারকেল-মালার বাটিতে বাটিতে ডাল ও মাছের ঝোল সাজিয়ে পুঁটি কমলকে ভাত খেতে বসিয়ে দেয়। পাথরকুচি গাছে এখন লম্বা লম্বা ডাঁটা উঠেছে, ডাঁটা ঘিরে নিম্নমুখ অজস্র ফুল। কী সুন্দর দেখতে। আর ফুলের মধ্যে মধুকোষ। ছেলেপুলে সন্ধান জানে, ফুল চিরে মধু খায়। খেজুর কেউ পাড়তে যায় না, টের পেলে বাড়ির লোকে খেতেও দেবে না—খেজুর খেলে নাকি পেট কামড়ায়। গাছে পেকে ঝুরঝুর করে তলায় পড়ে, শিয়ালে খায়। খেজুরতলায় গিয়ে পুঁটি যে ক'টি পায় খুঁটে খুঁটে কোঁচড়ে তুলল। এদিক-ওদিক তাকায় আর মুখে ফেলে।

পিছু পিছু কমলও দেখে এসে গেছে। আমায় দে পুঁটি, আমায় দে—হাত বাড়িয়ে বলছে।

পুঁটি বলে, নাম ধরছিস কেন, 'দিদি' বললে তবে দেব।

এখন কমলকে যা বলবে, খেজুরের লোভে তাতেই সে রাজি। পুঁটি সাবাল করে দেয় : খেয়ে বীচি ফেলে দিবি, গলায় না আটকায়। টপ করে খেয়ে ফেল, জেঠিমা দেখলে রক্ষে রাখবে না। মুখে আঙুল ঢুকিয়ে বের করে ফেলে দেবে।

আর কয়েকটা দিন পরে গাছে গাছে হঠাৎ যেন বান ডেকে গেল। যে গাছের যে ডালে তাকাও—পাকা ফল, ডাঁসা ফল। প্রকৃতি দেবী যেন সেজে এসেছেন, দু-হাতে অফুরন্ত ঢালছেন। জামরুল গাছ দুটো ফলের ভারে নির্ঘাৎ এবারে ভেঙে পড়বে। গুঁড়ি ভেদ করেও থোকা থোকা ফল। কত খাবে, খাও না। ছেলেপুলেরা ঘরবাড়ি ভুলেছে, সারাটা দিন এ-গাছ ও-গাছ করে বেড়ায় কাঠবিড়ালির মতো। যার গাছে হোক উঠে পড়লেই হল। গৃহস্থ বড়জোর বলবে, এই, ডালে ঝাঁকি দিসনে রে—নরম বোঁটা, কুশিগুলোও পড়ে যাবে। কিম্বা বলবে, এই, জোরে দুটো ঝাঁকি দে না। তলায় পড়ুক, ধামা এনে কুড়িয়ে নিই। বলবে এইটুকু—এর অধিক কিছু নয়। খাওয়ার জন্য ভগবান দিয়েছেন। খেয়ে শেষ করা ছাড়া এ ফলে কোন আয় দেয় না। দুদিনে ফুরিয়ে যায়—পুরো বছর তারপর গাছের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাবে না।

আরও কত রকম। গাব পেকেছে, সপেটা পাকছে। জামের দেরি আছে—গোলাপজাম পাকতে লেগেছে দুটো চারটে করে। জল্লাদ মগডালে উঠে পিলপিল করে বেড়ায়। গাছে উঠে ছোঁড়া যেন শোলার মানুষ হয়ে যায়—দেহের ওজন একেবারে শূন্য, এতটুকু ডাল নড়ে না। সপেটার কাঁচা পাকা এমনি দেখে ধরা যায় না, ডালের মাথায় গিয়ে জল্লাদ টিপে টিপে দেখে নরম কিনা। গোলাপজামের বোঁটাসুদ্ধ নাকের কাছে তুলে ধরে শোঁকে।

লিচুতে পাক ধরেছে, এক রাত্রে বাদুড়ে সেটা বলে দিল। পূববাড়ির পাঁচটা লিচুগাছ সারবন্দি। পাখায় অন্ধকার গুলিয়ে ঝাঁক বেঁধে বাদুড় ঝপাস-ঝপাস্ করে গাছের উপর পড়ছে। কিচির-মিচির করে ঝগড়া বাধায় ভিন্ন দলের সঙ্গে। পুঁটি দাওয়ায় এসে চেঁচিয়ে বাদুড়-জব্দ ছড়া পড়ছে : বাদুড় বড় মিঠে, যা খায় তা তিতে। ছড়ার গুণে লিচু তিতো হয়ে যাবে বাদুড়ের মুখে, থুঃ-থুঃ করে পালাবে।

ভবনাথ মাহিন্দারকে বকছেন: চোখ তুলে দেখবি নে তোরা শিস্তবর। রাতের মধ্যে সব শেষ করে যাবে। লিচু খেতে হবে না এবার, খাস ঘোড়ার ডিম।

শিস্তবর চাটকোলের উপর পা ছড়িয়ে বসে পাটটাকুরে কোষ্টা কাটছে।

বলল, থাকে নি লিচু—দেখতে পাবেন কাল সকালবেলা। বাদুড় চালাক হয়ে গেছে, আমাদের বন্দোবস্তের আগেভাগে ফুলো ডাসা যা পায় খেয়ে নিচ্ছে।

বাদুড়দের উপর শাসানি দিচ্ছে: খেয়ে নে যা পারিস। কাল থেকে আর নয়। কত বড় শয়তান হয়েছিস দেখে নেবো।

সকাল হতে শিশুবর সেই ব্যবস্থায় লেগে গেছে। হিরুও এসে যোগ দিল। বলে, বাবা বড় মিছে বলেন নি, কত বীচি আর খোসা ছড়িয়ে আছে দেখ। সিকি আন্দাজ নিকেশ করে গেছে একটা রাতের মধ্যে।

বাড়িতে পাশখেওলা জাল আছে—প্রায় সব বাড়িতে থাকে। পুরানো জাল ছিঁড়ে পচে বাতিল হলে ফেলে দেয় না। এমনি সব কাজে লাগে। গাছের উপরে জাল বিছিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। জালের নিচে লিচুফল—বাদুড়ে আর নাগাল পাবে না। কিন্তু মুশকিল হল, পাঁচ-পাঁচটা গাছ ঢেকে দেবার মতন এত জাল পাই কোথায়?

পরমসুহৃদ ঝন্টুর কাছে হিরু চলে গেল: ছেঁড়াছুটো জাল কি আছে বের কর্—

ঝন্টু ঘাড় নেড়ে দেয়: ইঁদুরে কেটে ফালা-ফালা করেছিল, ফেলে দিয়েছি।

আহা, দেখ্ না কেন চাবির কুঠুরি খুলে। ওর মধ্যে তো গরু হারালে পাওয়া যায়। কোণে-খাজোড়ে থাকলেও থাকতে পারে।

চাবি সংগ্রহ করে খোলা হল ঘর। জানলাহীন অন্ধকার কুঠরি। টেমি জেলে তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। নেই।

ঝন্টু হাত ঘুরিয়ে দেয়: বয়ে গেল। ক্যানেস্তারা পেটাবি।

হিরু বলে, ক্যানেস্তারায় সজারু ভয় পায়, বাদুড়ে আমল দেবে না। বড় শয়তান। বাজাচ্ছিস, বাজাতে বাজাতে হয়তো বা গেছিস একটু থেমে। বাজনা থামলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। রাত জেগে সারাক্ষণ বাজাবেই বা কে?

সারাক্ষণই বাজবে। বন্দোবস্ত করছি দেখ্—

ক্যানেস্তারা, খুঁটো-পোঁতা মুগুর ও দড়ির বণ্ডিল নিয়ে ঝন্টু লিচুগাছের মাথায় উঠে পড়ল। সুকৌশলে মুগুর আর ক্যানেস্তারা ঝুলিয়ে দিল। পাঁচ গাছের উপরেই এক ব্যবস্থা। দড়ির মাথাগুলো একত্র করে বেড়ার ভিতর দিয়ে বাইরের-ঘরে ঢুকিয়ে দিল। গাছ থেকে নেমে এসে ঘরের ভিতরের তক্তাপোশ দেখিয়ে হিরুকে বলে, শুয়ে পড়্—

হিরু অবাক হয়ে বলে, সাতসকাল শুতে যাব কেন রে এখন?

এতক্ষণ ধরে এত খাটলাম, গরম হবে না? শুবি তক্তপোশে, চোখ বুঁজবি, দড়ি ধরে টানবি—টানাপাখা যেমন ধরে টানে।

যেইমাত্র টান দিয়েছে—অদ্ভুত করেছে বটে ঝণ্টু, হতভাগা ইঞ্জিনিয়ার কেন যে হয়নি! দড়ি টানার সঙ্গে সঙ্গে উৎকট বাদ্য লিচুগাছের মাথার উপরে। বাদুড় তো বাদুড়, বাঘ থাকলেও চোঁচাঁ দৌড় দিতে দিশে পাবে না।

ঝণ্টু বললে, ছেড়ে দে দড়ি—টান আবার। পালাবে না বাদুড়? বল্—

শতকণ্ঠে ছিরু তারিফ করছে: বলিহারি ঝণ্টু। বেড়ে বানিয়েছিস—বাহবা, বাহবা!

প্রশংসা পরিপাক করে নিয়ে ঝণ্টু বলল, শিশুবর দরজার কাছে ঐখানটার তো শোয়। আরো ভালো। ঘুমুবে আর দড়ি টানবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাতপাখা নাড়ে তো দড়িটা কেন টানতে পারবে না?

অনেক রাত্রে কমলের ঘুম ভেঙে গেল। লিচুগাছে ধুন্ধুমার। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, জানলা দিয়ে চাঁদ দেখা যায়। ভয়-ভয় করছে, মাকে কমল নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল। তরঙ্গিণীও ঘুমের ঘোরে ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

আম পাকল। একটা দুটো করতে করতে অনেক। এ-গাছ ও গাছ করতে করতে গাছ আর বড় বাকি রইল না। সিঁদুরে-গাছের দিকে চেয়ে চোখ ঝলসে যায়, কাঁচা-পাকা সব আমে সিঁদুর মেখে গেছে যেন—টুকটুক করছে। এ গাছের কাঁচা আমেও পাখি ঠোকরায়। তেমনি আবার বর্ণচোরা আম গোপলাখোপা, কালমেঘা। পেকে তলতল করছে, খোসার রং কালো। টের পাবার জো নেই, আম পেকে গেছে।

বেলতলি খেজুরতলি নারকেলতলি জামতলি বাদামতলি ডুমুরতলি—'তলি' জুড়ে জুড়ে গাছের নাম। সাবেকি আমলের গাছ এইসব। আঁটির গাছ—গোড়ায় বেলগাছ নারকেলগাছ ছিল ঐ ঐ জায়গায়, তলার কাছে আমের আঁটি আপনি পড়ে গাছ হয়েছিল কিম্বা আঁটি পোঁতা হয়েছিল ঐখানটায়। বেল খেজুর কবে মরে নিশ্চিহ্ন হয়েছে—সেই জায়গায় ডালপালা-মেলানো প্রকাণ্ড আমগাছ এখন। নাম তবু রয়ে গেছে যার ছায়াতলে এই গাছ চারা অবস্থায় আশ্রয় নিয়েছিল। আছে আবার কানাইবাঁশী টুয়ে চ্যাটালে চুষি কালমেঘা—ফলের চেহারা থেকে গাছের নামকরণ। এর উপরে কমলের চারা বিস্তর এসে গেল এবার—চারাগুলো বড় হলে বাগের মধ্যে রোদ ঢুকবার পথ খুঁজে পাবে না।

পাকা আম টুপটাপ তলায় ঝরছে সারাদিন, সমস্ত রাত্রি। ছেলেপুলে বাড়ি রাখা যায় না, তলায় তলায় ঘুরছে। ধরে পেড়ে এই এনে ঘরে তুললে—

সুড়ুত করে আবার চলে গেছে। অন্য সময় কে আমতলায় যেতে যায়? তাটি কালকাসুন্দে কাঁটাঝিটকে বিছুটির ঝোপে ছেয়ে থাকে, শুকনো পাতা পড়ে পড়ে পচে। গুটি পড়ার সময় থেকেই অল্পস্বল্প শুধু—এখন নিতি-দিন কত পা পড়ছে তার অবধি নেই। পায়ে পায়ে আমতলা সাফসাফাই হয়ে যাবে। শেষে আর ঘাসটুকুও থাকবে না, বাড়ির উঠানের মতন ধবধব করবে।

কমল ছোট্ট মানুষ, বেশি দূর যেতে ভরসা পায় না—তার দৌড় খেজুরতলি অবধি। বাইরের উঠোনের পরেই মহাবৃদ্ধ গাছটি। খেলা করে গাছ বালকের সঙ্গে, কতরকম মজা করে। আম পেকে হলদে হয়ে ডালের উপর ঝুলছে। দুলছে বাতাসে চোখের উপর, লুব্ধ চোখে কমল আকাশমুখো তাকায়। বাতাস জোরে উঠল—হাত পেতে রয়েছে সে, বলের মতন লুফে নেবে। পড়ে না আম—লোভ বাড়িয়ে পাগল করে দিয়ে থেমে যায় হঠাৎ বাতাস।

কমল খোশামুদি করছে: ও গাছ, লক্ষ্মীসোনা, দাও না ফেলে আমটা। পেকে গেছে, পড়ে তো যাবেই। চারি-দিদি ঘোরাঘুরি করছে, তক্কে তক্কে আছে ওরা—কোন সময় পড়বে, টুক করে নিয়ে নেবে। আমি পাবো না।

গাছ কানে নিচ্ছে না। রোদে ঝিলমিল করে পাতা নড়ছে, রোদের কুচি খেলা করছে কমলের মুখের উপর। বুড়ো আঙুল নাড়ানোর ভঙ্গিতে গাছ যেন পাতা নেড়ে উপহাস করছে: দেবো না, দেবো না।

পায়ে পড়ছি ও গাছ, দাও—আমটা দিয়ে দাও।

গাছ উদাসীন। কমল এত করে বলছে, তা মোটে কানেই যায় না যেন। ডাল-পাতা নাড়ছিল, তা-ও একেবারে বন্ধ করে দিল। রাগে দুঃখে আমতলা ছেড়ে কমল উঠোনের দিকে চলল। যে-ই না পিছন ফিরেছে—টুপটাপ করে একটা নয়, চার-পাঁচটা আম পড়ল। বউদি'দা অলকার কাছে বলেছিল খেজুরতলির বজ্জাতির কথা। অলকা উড়িয়ে দিয়েছিল: গাছ কিছু বোঝে নাকি—গাছ কি মানুষ? বোঝে কি না, চাক্ষুষ দেখে যাও না এইবারে। চলে আসছে, ঠিক সেই মুহূর্ত সশব্দে এতগুলো আম ফেলার মানেটা কি শুনি? আম না কুড়িয়ে রাগে রাগে চলে যাচ্ছ—যাও না দেখি কেমন যেতে পার।

মানে জলাঞ্জলি দিয়ে কমল ফিরে এল গাছতলায়। খানখন মরে ইতিমধ্যেই খানিক খানিক পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেদিকটা যে চোখ তুলেও দেখে না। জানা আছে, খেজুরতলি মরে গেলেও পরিষ্কার জায়গায় ফেলবে না—ঝোপঝাপ-জঙ্গল দেখে ফেলবে, কষ্ট করে যাতে খুঁজে বার করতে হয়।

কাঁটাঝিটকের ঝোপে পাওয়া গেল একটা। আম ছোট্ট, তার জন্যে কাঁটার খোঁচা খেয়ে হাতে রক্ত বেরিয়ে গেল। কতকগুলো যাঁড়গাছের মাথায় তেলাকুচা-লতা জড়িয়ে আছে, টুকটুকে তেলাকচা ফল থাঙুবন আলো করে ঝুলছে। লতার মধ্যে আম—মাটি অবধি পড়তে পায় নি। যাঁড়গাছেই দৈবাৎ যেন আম ফলেছে একটা। এত জায়গা ছেড়ে এইখানটা আপনাআপনি পড়েছে, কে বিশ্বাস করবে? খেজুরগুলিই খুব সম্ভব গদখালি-পেস্তার মতন ডালের লম্বা হাত বের করে ঐখানটা আম রেখে ডাল আবার গুটিয়ে নিয়েছে—কমল যখন পিছন ফিরে বাড়ি যাচ্ছে, সেই সময় কাজটা করেছে। খুঁজে বের করতে পারে কিনা, পিটপিট করে দেখছে এখন পাতার আড়াল থেকে। যাঁড়গাছ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বিস্তর কষ্টে কমল আম ভুঁয়ে ফেলল।

আরও দেখ। সেঁদাল গাছ একটা আমতলায়—তিনটে ডাল তিন দিকে, বেরিয়ে গেছে, সেই তেডালার ফাঁকেও আম। এর পরে কে বলবে ইচ্ছাকৃত নয় এসব। গাছের উপর অভিমান এসে যায় কমলের, অভিমানে চোখ ছলছল করে: তলায় এসেছি একা একা কটা আম কুড়িয়ে পুঁটির কাছে বাহাদুরি নেবো—খেজুরতলায় তাতে শতেক রকম ঝগড়া। দেখা যাচ্ছে, গাছও পুঁটি-চারি-সুরিদের দলে। ওদের বেলা এমন হয় না। আম পাড়ার শব্দে তলায় ছুটে আসে—এসে দেখে, আম একেবারে সামনের উপর পড়ে আছে। ধামাতে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ফিরে চলে যায়।

ডিঙি মেরে কমল হাত বাড়াল—তেডালা অবধি হাত পৌঁছায় না। বাখারির টুকরো পেয়ে খোঁচাচ্ছে—পড়ে না আম, ফাকের মধ্যে সেঁটে আছে। ছোট ডাল কয়েকটা নিচের দিকে—একটায় পা রেখে উপরেরটায় অন্য পা তুলে দিল। গাছে ওঠা হয়ে গেল—যা আগে কখনো হয়নি। বাড়ির কেউ দেখলে রক্ষে রাখবে না। উঠে যাচ্ছে দিব্যি একের পর এক পা তুলে। পেয়েছে, পেয়েছে—আম নাগালে এসে গেছে। কমলের ভারি উল্লাস। গাছে উঠেছিল, কারো কাছে বলবে না এ খবর। আম নিয়ে যেন রণজয় করে বাড়ি ফিরল।

টুপটাপ আম তলায় ঝরছে। ছেলেপুলে তলায় তলায় ঘোরে—তাদের নামে সবাই বলে। কিন্তু বড়রাই বা কী! নিমি আর অলকা নন্দ-ভাজে নতুন পুকুরে চানে যাচ্ছে—চ্যাটালের তলায় পড়ল একটা। কলসি ঘটি রইল পড়ে পথের উপর—গাছতলায় ছুটল। গা হাত পা ছড়ে গেল কাঁটায়, বিছুটির বিষে দাগড়া-দাগড়া হয়ে ফুলে উঠল। যতক্ষণ না পেয়ে যাচ্ছে, সর্বকর্ম ফেলে আম খোঁজা।

দুপুরবেলা রোদ্দুর ঝাঁ-ঝাঁ করে, আগুনের হল্কা বয়ে যায়। চাষ দিতে দিতে

চাষীরা লাঙল-গরু নিয়ে বিল ছেড়ে উঠে পড়েছে। গ্রাম নিঃশব্দ। পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে সবাই, ঘামে সর্বদেহ ভিজে। তক্তাপোশে নয়—মাটির মেঝের উপর পড়েছে। মাদুরও নয়, খালি মাটি। হাতে তালপাতার পাখা। অভ্যাস এমনি, ঘুমের মধ্যেও হাত নড়ছে—হাতের পাখাও চলছে ঠিক। ঘুম গাঢ় হয়ে এলে পাখা হাত থেকে পড়ে যায়, হাতও পড়ে মাটিতে। ক্ষণপরে গরমটা অসহ্য হয়, সম্বিত পেয়ে পাখা তুলে দ্রুত নাড়ে কয়েকবার, গতি পুনশ্চ ক্ষীণ হয়ে আসে।

দেবনাথের আলাদা ব্যবস্থা। নতুন-পুকুরের উত্তরপাড়ে কয়েকটা বড় বড় আমগাছ জামগাছ কাঁঠালগাছ। রোদ ঢোকে না সেখানটা, ঠিক দুপুরেও আবছা অন্ধকার। আর জঙ্গল কেটে পাতা ঝাঁটপাট দিয়ে শিশুবর মাদুর-বালিশ পেতে দিয়েছে সেখানে। এমন কি গড়গড়াও নিয়ে এসেছে। হাতপাখা দিয়েছে, পাখার গরজ যেমন নেই এ জায়গায়। খান দুই তিন ক্ষেতের পর থেকে বিলের আরম্ভ, মুক্ত হাওয়া পুকুরের জলের উপর দিয়ে আরও ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে এসে লাগছে। পত্রঘন ডালপালা মাথার উপরে। দেবনাথ বললেন মাদুর টেনে আমগাছের নিচ থেকে সরিয়ে দিয়ে যা শিশু। ঘুমিয়ে আছি, দুম করে থানইটের মতো পাকা আম গায়ের উপর পড়ল—বলা যায় না কিছু।

কমল-পুঁটি তলায় তলায় ঘুরছে দেখে ডাকলেন: আয় রে, মাদুরে এসে বোস। গল্প বলছি, রামের সেই গল্প। বিশ্বামিত্র মুনি এলেন অযোধ্যায়। অসুরের অত্যাচার, যাগযজ্ঞি নষ্ট করে দিচ্ছে। দশরথকে বললেন, রামকে দাও আমার সঙ্গে। ছেলেমানুষ হলে কি হয়, অসুর-দমন ওকে দিয়েই হবে···

গল্পের নামে কমলের স্ফূর্তি। বোঝে না কিছুই, ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে মিষ্টি রিনরিনে গলায় হুঁ-হাঁ দিয়ে যায়। যেখানে খুশি থামলেই হল। সেখানেই গল্পের শেষ মেনে নিয়ে আবদার ধরবে: আর একটা। বোঝে বরঞ্চ পুঁটি। সীতার বিয়ে রামের সঙ্গে—ভালও লাগে। কিন্তু আজকে কান পড়ে রয়েছে আমতলায়—আম পড়ার শব্দ আসে এদিক সেদিক থেকে। গল্প এর মধ্যে কানে ঢোকে না। আর এদিকে মিথিলায় রামকে নিয়ে পৌঁছানোর আগেই বাপ তো চোখ বুজে পড়েছেন, ফতরফত ফতরফত নিশ্বাস উঠছে।

রান্নাঘরের পাট সেরে কোনোদিকে কেউ নেই দেখে তরঙ্গিণী টিপিটিপি চলে এসেছেন।

উঃ বড্ড মজা—পালিয়ে আসা হয়েছে! ঘুমোস নি এখনো—এর পরে অবেলায় ঘুমিয়ে সন্ধ্যের সময় ওঠা হবে। রাত আড়াই পহর অবধি পায়ে পায়ে ঘুরবি।

স্ত্রীর গলা শুনে দেবনাথ চোখ মেললেন। ডাকছেন : এসো না, বসে যাও একটু। কেমন ঠাণ্ডা জায়গা বেছেছি দেখ এসে।

হেসে তরঙ্গিণী ঘাড় নাড়লেন : ওমা, কখন কে এসে পড়বে—

কমলের হাত ধরে নিয়ে চললেন। পুঁটির গর্ভধারিণী-মা হলেও জোর তার উপরে উমাসুন্দরীর বেশী। তবু কর্তব্যের দায়েই যেন বলেন, তুই আসবি নে?

বাতাস করছি না বাবাকে?

গতিক বুঝে ইতিমধ্যেই পুঁটি পাখাটা হাতে তুলে নিয়েছে। অতএব আর কিছু বলা চলে না। তরঙ্গিণী সতর্ক করে দেন : পুকুরঘাটে নামবিনে, খবরদার। ঠিক দুপুরে গাছতলায় ঘুরবিনে চুল ছেড়ে দিয়ে শাকচুন্নির মতো—চুলের মুঠো ধরে গাছের উপর তুলে নেবে দেখিস। ঘুমিয়ে পড়লেই বাড়ি চলে আসবি। আর নয়তো শুয়ে পড়বি পাশটিতে।

আচ্ছা—বলে পুঁটি বাতাস করছে বাপকে। ঘোর ভক্তিমতী মেয়ে। মা চলে যেতে চারিদিকে ফালুক-ফুলুক তাকায়। শিচুতলায় ফ্রক দেখা দিল। হাত তোলে পুঁটি তার দিকে—অর্থাৎ একটু সবুর কর, বাবার ঘুম এসে গেছে প্রায়। জোরে জোরে বাতাস করছে, বাতাস কামাই দেবে না এখন। কাঁচাঘুমে বাবা জেগে পড়তে পারেন, তা হলে সমস্ত পণ্ড।

ক'দিন থেকেই মেঘ-মেঘ করছে। বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়। আজকেও আয়োজন গুরুতর, ঘোড়ো-কোণ কালো হয়ে গেল। অপরাহ্ণেই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উড়ে যাবার মেঘ নয় আজ—ঝড় এলো বলে।

পুঁটিটাকে নিয়ে সামাল সামাল। লহমার তরে বাড়িতে টিকি দেখবার জো নেই। ছেলেটাকেও নিয়ে বের করেছে। পাড়ার একপাল বাঁদর জুটেছে, তলায় তলায় টহল দিয়ে বেড়ায়। অন্ধকার করে এসেছে, তা বলে একফোঁটা ভয়ডর নেই। দেখে আয় তো মা নিমি—

বলতে বলতে তরঙ্গিণী গর্জন করে ওঠেন : কোন চুলোয় হারামজাদি, দেখে আয়। ছেলেটাকে নিয়ে বের করেছে—দেখতে পেলে চুলের মুঠো ধরে টানতে টানতে আনবি।

হুকুম পেয়ে নিমি সোৎসাহে বেরুচ্ছে। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনা স্বভাব তার—চুলের মুঠো ধরে সত্যিই টানবে সে, চড়টা চাপড়টাও দেবে না এমন মনে হয় না। লেগে যাবে দুই-বোনে। সভয়ে বড়গিন্নি বললেন, চুল-টুল ধরিসনে যে। বোশেখ মাসে আমতলায় গেছে তো কি হয়েছে। মাত্তর এই ক'টা দিন—এর পর কেউ থুতু ফেলতেও ওদিকে যাবে না। সন্ধ্যে হয়ে

এলো—পা-হাত পা ধোবে, চুল বাঁধবে এখন। বড়বোন তুই, ভালো কথায় বুঝিয়েসুঝিয়ে নিয়ে আয়।

বাতাস উঠল। ঝড় দস্তুরমতো। ঘনঘন ঝিলিক দিচ্ছে, জলও চাপবে এইবার। দেখতে দেখতে ঝড় প্রচণ্ড হয়ে উঠল। বাইরের উঠানের একদিকে খেজুরগুলি অন্যদিকে বেলতলি। ফলেছেও তেমনি এবার। কিন্তু গাছে আজ একটি আম রেখে যাবে মনে হচ্ছে না। সবে পাক ধরেছে—টিপটাপ পড়ছে তো পড়ছেই। পাকা ডাঁসা কাঁচা—ডাল ধরে শেষ করে দিয়ে যাচ্ছে। খই ভাজতে খোলার খই যেমন চিড়বিড় করে চতুর্দিকে ছিটকে গিয়ে পড়ে, তেমনি। আম গড়িয়ে উঠান অবধি এসে পড়ছে। সামলে থাকা কঠিন বটে। পুঁটিটা তো ছটফট করছে—রোয়াক থেকে লম্ফ দিয়ে পড়ে আমতলায় চোঁচা-দৌড় দেবে। এইমাত্র বিষম বকুনি খেয়েছে বলে চুপচাপ আছে এখানে। শিশুবর খসর-খসর করে গরুর জন্য পোয়াল কাটছিল, পোয়াল-কাটা বঁটি কাত করে রেখে সে বেরুল। দেবনাথ হেন গণ্যমান্য বয়স্ক ব্যক্তিও থাকতে পারেন না—শিশুর অধম হয়ে খেজুরতলি তলায় চললেন। উমাসুন্দরী চেঁচাচ্ছে : যেও না ঠাকুরপো, গাছগাছালি ভেঙে পড়তে পারে। বাতাস থেমে যাক—যেতে হয় তার পরে যেও।

দেবনাথ বলেন, আম ততক্ষণ তলায় পড়ে থাকবে বুঝি? কুড়াতে এলে কাকে মানা করতে যাবো—করবই বা কেন?

হাসতে হাসতে ধামি হাতে নিয়ে ছুটলেন তিনি। উমাসুন্দরী কি করবেন—যে-মানুষ ধমক দিয়ে হাতের ধামি কেড়ে নিতে পারতেন, তিনি যে এখন বাড়ি নেই।

হাটবার আজ। কতদিন পরে ভাই বাড়ি এসেছে—হিরুকে সঙ্গে নিয়ে ভবনাথ নিজে হাট করতে গেছেন। বেছেগুছে দরদাম করে ভাল মাছটা আর তরকারিটা নিয়ে আসবেন—অন্যকে দিয়ে সে জিনিস হয় না।

হাটে যাবার মুখে বরাবরই ভবনাথ মুখ গোমড়া করে থাকেন। আজকে তা নয়। বরঞ্চ হাসিখুশি ভাব—খরচের মেজাজ। কমলকে সামনে পেয়ে বললেন, কি আনব রে?

বাড়ির মধ্যে কমলের যত আবদার জেঠামশায়ের কাছে। ভবনাথও এলাকাড়ি দেন। চারি-সুরির কাছে নতুন এক হেঁয়ালি শিখেছে কমল—বাহাদুরি দেখিয়ে তাই সে ঝেড়ে দিল :

কাসান্দির সন্ধি বাদে, পাঁঠার বাদে পা,
লবঙ্গর বঙ্গ বাদে, নিয়ে এসো তা।

একগাল হেসে ভবনাথ বললেন, কাসন্দির সন্ধি বাদ দেবো—সে আবার কি রে? আমার কি অত বুদ্ধি আছে, সোজা করে বুঝিয়ে বল।

মিনি শুনছিল, সে বলল কাঁঠাল। কাসন্দির সন্ধি ছাড়লে কা থাকে না? পাঁঠার তেমনি থাকে ঠা, লবনর ল। কমল তোমায় কাঁঠাল আনতে বলেছে।

ভবনাথ বললেন, আমাদের গাছেই কত কাঁঠাল—পাক ধরেনি এখনো। সারা হাট খুঁজে একটা-দুটো মেলে। ছিরু, গিয়েই একটা কাঁঠাল কিনে ফেলো—দেরি করলে পাবে না। দাম নেবে সেইরকম—তা মনুর যখন ফরমাস, কী করা যাবে।

হাট থেকে ভবনাথ ফেরেননি এখনো। দেবনাথ তাই ঝড় জলের মধ্যে ঝিঁঝিয়ে আম কুড়োতে যাচ্ছেন।

আর বাপই চললেন তো মেয়ের কি—পরম অনুগত মেয়েটি হয়ে পুঁটি দেবনাথের পিছন ধরেছে। পিছনে তাকিয়ে নির্ভয়ে দেখে এক একবার মায়ের দিকে—বড়-গাছে বাসা বেঁধেছি, কাকে আর ডরাই? ভাবখানা এই প্রকার। জানালার ওধারে দক্ষিণের-ঘরের ভিতরে ছোটভাইটির করুণ অবস্থা দেখতে পাচ্ছে—বাতাস-বৃষ্টি গায়ে না লাগে—কমলকে মা জুতো-জামা পরিয়ে ঘরের মধ্যে আটক করে ফেলেছেন।

মড়মড় করে জামরুলগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। যা বলেছিলেন উমাসুন্দরী, ঠিক ঠিক তাই। চেঁচাচ্ছেন তিনি—প্রচণ্ড বাতাস-বৃষ্টিও আরম্ভ হয়ে গেল, কথা না বেরুতেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। কেমন বাবা দেবনাথ জানিনে—বাচ্চা মেয়েটাকে অন্তত বাড়পাক্কা দিয়ে বাড়ি পাঠানো উচিত ছিল।

বৃষ্টি টিপটিপ করে হচ্ছিল—ঝেঁপে এলো এবার ঝড়ের সঙ্গে। কাঁচা পাতা ছিঁড়ে ঘূর্ণি-বাতাসে পাক খেতে খেতে এসে পড়ছে। গাছপালা মাথা কাঁড়াকাড়ি করছে, সুপারিগাছ নুয়ে পড়েছে। ভেঙে পাঁচ সাতটা ভূমিশায়ী হল। সামনের কলাঝাড়ে সবে মোচা থেকে কাঁদি বেরিয়েছে—চোখের উপর গাছটা পড়ে গেল।

অলকা-বউ বলে, কাল থোড়-মোচা খাওয়া যাবে খুব।

তরঙ্গিণী বললেন, তুমি খেও—রেঁধে দেবো তোমায়। অন্য কেউ তো মুখে দেবে না।

বিনো হি-হি করে হাসে: তুমি যেন কী বউদি, কিছু বোঝ না। কাঁচকলার থোড়-মোচা বিষম তেতো—খাওয়া যায় না। সবসুদ্ধ কুচিকুচি করে কেটে জাবনায় মেখে দেবে, গরুতে খাবে। গুয়োগাছ পড়েছে—তার বরফ মাখি খাওয়া যাবে। ছোটখুড়িমা মাথির ডালনা রেঁধো না কাল। খি-গরম-

মসলা দিয়ে সেই যে বেঁধেছিল—তোমার মতন কেউ পারে না।

দেবনাথ ফিরলেন। পুঁটিও ফিরেছে বাপের সঙ্গে। কাপড়চোপড় ভিজে গেছে, গা-মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ফিরেছেন সে জন্যে নয়। ছোট ধামি ভরে গেছে আমে। তলায় এখনো বিস্তর। একটা কোন বড় পাত্র চাই। বিনো বলে, আমি যাবো ছোটকাকা। নিমি বলে, আমি যাবো। আম কুড়ানোর নামে নাচছে সবাই। ভবনাথ হাটে চলে গেছেন—রাতের বেলা ঝুপঝুপে এই বৃষ্টির মধ্যে আম কুড়ানোর সুবর্ণসুযোগ। দেবনাথ অতিশয় দরাজ এ ব্যাপারে—বলতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বসে আছেন। অলকা-বউকে নিজে থেকেই আবার জিজ্ঞাসা করেন: তুমি যাবে না বউমা?

ইচ্ছা কি আর হয় না, কিন্তু বউমানুষ যে! অলকা কথা ঠিক বলে না খুড়শ্বশুরের সঙ্গে—দরকার আকারে-ইঙ্গিত বলে। ঈষৎ ঘোমটা টেনে গামছাটা নিয়ে পুঁটির ভিজে চুল মুছতে লাগল সে।

বিনো আর নিমি যায় বুঝি বনে-বাদাড়ে—সভয়ে বড়গিন্নি বলেন, সত্যি সত্যি চললি যে তোরা?

দোষ কি বউঠান, আমি তো সঙ্গে থাকব।

দেবনাথ সম্পূর্ণ ওদের পক্ষে। বলছেন, ছেলেমেয়ে সবাই কুড়িয়ে বেড়াবে বলেই কর্তারা বাড়ির উপরে বাগ বানিয়ে রেখে গেছেন। ষষ্ঠীবাসের দিনে আম খেয়ে সুখ বটে, কিন্তু কুড়ানোয় বেশি সুখ।

উমাসুন্দরী বলেন, তা বলে রাত্তিরে কেন? কুড়োতে হয়, কাল সকাল-বেলা কুড়োবে।

বাগড়া পড়ায় বিনো ক্যার-ক্যার করে উঠল: সকাল অবধি আম পড়ে থাকবে কিনা। কতজনা এরই মধ্যে এসে পড়েছে দেখগে।

ঠেকানো যাবে না এ দুটোকে খোদ ছোটকর্তারই যখন আসকারা। বড়-গিন্নি একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেছেন। বৃথা বাক্যব্যয় না করে পুঁটির হাত ধরে তিনি নিয়ে চললেন। বকতে বকতে যাচ্ছেন: সেদিন জ্বর থেকে উঠে-ছিস, রাত্তিরবেলা নেয়ে এলি আবার। কাঁপিয়ে জ্বর আসবে—মজা টের পাবি তখন। জামাইষষ্ঠীতে কত খাওয়াদাওয়া আমোদ-আহ্লাদ—বুড়ি আসবে জামাই আসবে, তুমি তখন বিছানায় শুয়ে চিঁ-চিঁ করো আর বার্লি গিলো—

দক্ষিণের ঘরে তরঙ্গিণীর হেপাজতে কমল। বড়গিন্নি পুঁটিকে সেখানে এনে ছাড়লেন। বাপের সঙ্গে কমল যেতে পারে নি, সেজন্য মুখ আঁধার। বড়গিন্নি আদর করে বললেন, কমল কেমন লক্ষ্মীসোনা, দেখ তো। রাতের বেলা আমতলায় যায় না—

কমল বিজ্ঞজনোচিতভাবে বলল, দিনমানে যেতে হয়—

কমল জলবিষ্টি লাগায় না—

কমল বলল, জল লাগলে অসুখ করে।

শিশুবর ফিরল। মতুনপুকুরের পুবে বাগের ঐ-মুড়োয় দূরের দিকে গিয়েছিল সে। ঝুড়ির আম হুড়মুড় করে দরদালানে ঢেলে দিল। বিনো যা বলেছিল—সত্যিই তাই। বাদার দিক দিয়ে বিলের দিক দিয়ে মানুষ এসে উঠেছে, বেপরোয়াভাবে আম কুড়োচ্ছে। ছোটবাবু ছোটবাবু—বলে শিশুবর হাঁক পাড়ল, তা মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। তাদের নিজেরই যেন জায়গা।

দেবনাথ শুনে যাচ্ছেন, এত বলাবলিতেও তাঁকে উত্তেজিত করা যায় না। উল্টে তিনি শিশুবরকে দুষছেন: অন্যায় তোমারই তো শিশুবর। কেন তুমি হাঁকাহাঁকি করতে যাও? গাছের তো পাড়ছে না। তলায় দুটো কুড়িয়ে নিচ্ছে—তাতে রাগ করলে হবে কেন?

অলিখিত আইন: গাছের ফল মালিকের। গাছে উঠে আম পাড়াটা বেআইনি—চুরির শামিল। তলার আম যে কুড়িয়ে পাবে তার, মালিকের সেখানে একক অধিকার নেই।

শিশুবর বলল, লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল—চেঁচিয়ে উঠতে নিভিয়ে অন্ধকার করে দিল।

তবু দেবনাথ সে পক্ষের দোষ দেখতে পান না। বললেন, আনবেই তো। তলায় আগাছার জঙ্গল—আলো না হলে দেখতে পাবে কেন?

নাও, হয়ে গেল! তলায় কুড়োনোয় দোষ ধরে না—সে জিনিস হল, একটা-দুটো সামনের মাথায় দেখলাম, তুলে নিলাম। এমনিভাবে লণ্ঠন ধরে হন্যে হয়ে করে কুড়ানো কখনো হতে পারে না। কিন্তু এ যাংলা ও শাসন-নিবারণ ছোটবাবুকে দিয়ে হবার নয়। অথচ জমিদারের ম্যানেজার নাকি উনি—প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। সেই মানুষ বাড়ি এসে ব্যোম-ভোলানাথ হয়ে গেছেন।

বেনকালে ভবনাথ ফিরলেন। ঝড় থেমে গেছে, বৃষ্টি অল্পসল্প টিপটিপ করে পড়ছে। জল কাদা ভেঙে আম কুড়িয়ে বেড়াবে বলে আধময়লা ছেঁড়া কাপড় কাঁথ বেড়ে দিয়ে গাছকোমর বেঁধে নিমি ও বনো তৈরি। হলে হবে কি—আয়োজন পণ্ড ভবনাথ এসে পড়েছেন। তাঁর কাছে কথা পাড়বেই বা কে, যাবেই বা কেমন করে তাঁর সামনে দিয়ে?

আসল মানুষ পেয়ে শিশুবর নালিশটা আবার গড়বড় করে গোড়া থেকে

বলে যায় : এত চেল্লাচেল্লি যোটে কানেই নিল না বড়বাবু। যেন ওদের বাবাতে-গাছ। দেদার কুড়োচ্ছে।

ভবনাথ গর্জে উঠলেন : কুড়ানো বের করে দিচ্ছি। চল্—

জিরান নেই, তক্ষুনি বেরুচ্ছেন আবার। উমাসুন্দরী বাধা দিয়ে বলেন, ওমা, হাট করে এই এসে দাঁড়ালে। শিশুটা হয়েছে কেমন যেন—লহমার সবুর সয় না। উঠোনে পা না ফেলতে আরম্ভ করে দেয়।

ভবনাথ বলেন, হাট অবধি যেতে পারলাম কই? বদন-সা'র তেল কেরাসিনের দোকানে এতক্ষণ। দালানের মধ্যে দিব্যি আছ, বাইরে কী কাণ্ড হয়ে গেল টের পেলে না। হাটঘাট কিছু হয় নি, জলঝড়ের মধ্যে হাট মোটে বসতেই পারে নি আজ। ভাইটি আছে, ভাল দেখে মাছ-শাক আনব ভেবেছিলাম। নাও, কচু কোট বেগুন কোট—কচু-বেগুনের ডালনা রাঁধো। আর কি হবে।

দেবনাথকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, বাতাসে ছটো-একটা পড়ে, কুড়িয়ে নিয়ে যায়—সে এক কথা। তা বলে কালবোশেখিতে গাছ মুড়িয়ে দিয়ে গেল—ধামা ধামা তাই নিয়ে হাটে বিক্রি করবে, সেটা কেমন করে হতে দিই? ছিরুটা আসছিল, গেল কোথায় আবার—ওকে পাঠিয়ে দিও।

চললেন ভবনাথ বীরদর্পে। শিশুবর চলল পিছু পিছু ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে। আম আলো ধরেই কুড়োচ্ছে বটে—আলো নড়ছে। অনেকটা দূরে—বাগের একেবারে শেষপ্রান্তে বিলের কাছাকাছি। ভবনাথ জোর পায়ে যাচ্ছেন, শিশুবর তাঁর সঙ্গে হেঁটে পারে না।

একেবারে কাছে চলে গেলেন। ছটো লোক—স্পষ্ট নজরে আসে। ভবনাথ হুঙ্কার দিলেন : কারা ওখানে?

মাহিন্দারের চেঁচামেচি নয়—ভবনাথের গলা তল্লাটের মধ্যে কে না জানে? লণ্ঠন পিছন দিকে নিয়ে ফুঁ দিয়ে চকিতে নিভিয়ে দিল। মানুষ চেনা গেল না—একছুটে তারা বিলের মধ্যে। রাত্রিবেলা বিলে নামা ঠিক হবে না। ভবনাথ সহাস্যে বললেন, আর আসবে না, মনের সুখে কুড়ো এবারে তুই।

মিছে বলেন নি ভবনাথ—সকলে তাঁকে ডরায়। কথা না শুনলে তিনি কোন ফ্যাসাদে ফেলবেন ঠিক কি। একেবারে কাছাকাছি হাজির হয়ে মানুষগুলোকে চিনে নেবেন—সেই মতলবে আলো আনেন নি, আঁধারে আঁধারে এসেছেন। শিশুবর এবারে বাড়ি থেকে লণ্ঠন নিয়ে এলো। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে ভবনাথ বলেন, উঃ, কী ঝড়টা হয়ে গেল! আম কি আর আছে গাছে—আসবে না কেন মানুষ?

শিশুবর ওদিকে দেবনাথকে ধরেছে : বাবা তো বাগের ঐ-মুড়োয়। চলো

কাকামশায়, এই তলাগুলোয় আমরা কুড়িয়ে আসি। বাবার আগেই ফিরে আসব—টেরও পাবেন না তিনি।

দোনামোনা করছিলেন দেবনাথ—বাড়ির উপর ভবনাথ সশরীরে হাজির, তার মধ্যে এত বড় দুঃসাহসিক কাজ উচিত হবে কিনা। হিরু এই সময়ে দেখা দিল। জবর খবর নিয়ে এসেছে, প্রত্যক্ষ পরিচয় খালুইতে—দুটো কইমাছ। শূন্য খালুই নিয়ে হাট ফেরতা ভবনাথের পিছু পিছু আসছিল, বাড়ির হুড়কোর কাছে এসে মাথায় মতলব এলো : এই নতুন বৃষ্টিতে কইমাছ উঠতে পারে—কানাপুকুরটা একবার ঘুরে এলে হয়। ভবনাথকে কিছু বলল না। বৃষ্টির মধ্যে জলকাদা ঘাসবনের মধ্যে হা-পিত্যেশ বসে থাকা—জলের মধ্যে মাছ খলখল করছে ভেবে সাপ এঁটে ধরাও বিচিত্র নয়। হয়েছিল তাই সেবারে—ভবনাথের হাতে সাপে ঠুকে দিয়েছিল। ভবনাথ টের পেলে যেতে দিতেন না, তাঁর অজ্ঞাতে তাই সরে পড়েছিল। জুত হল না। দেখা গেল, একলা তার নয়—অনেক মাথাতেই মতলব এসেছে। কানাপুকুরের গর্ভে হোগলা-বনের এদিকে-সেদিকে বিস্তর ছায়ামূর্তি। গণ্ডগোল করে মাটি করল—কারোই তেমন-কিছু হল না, হিরণ্ময়ের ভাগ্যে তবু যা-হোক দুটো জুটেছে—একেবারে বেকুব হতে হয়নি।

খালুই থেকে ঢেলে মাছ দেখা হল। মনোরম বটে—কালো-কুঁদ, লম্বায় বিগত-খানেক—হাটেবাজারে কালে-ভদ্রে এ জিনিস মেলে। হলে হবে কি, মাত্র দুটো। এত বড় সংসারে দুটো মাছ কার পাতেই বা দেওয়া যাবে!

হিরণ্ময় বলে দিল, একটা তো কাকার। আর একটা কেটে দু-খণ্ড করে আধখানা বাড়ির ছোট ছেলে কমলবাবুকে, বাকি আধখানা পরের মেয়ে বউ দিদিকে—

অলকার দিকে চেয়ে হাসল সে মুখ টিপে।

দেবনাথ রোখ ধরলেন : চল দিকি—

কোথায় ?

কানাপুকুরটা ঘুরে আসি একবার—

হিরু অবাক হয়ে বলে, বৃষ্টি মাথায় করে জল-কাদা-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা—বড্ড কষ্ট কাকা, আপনি পারবেন না।

না, পারব না, আমি যেন করি নি কখনো!

নেমে পড়লেন রোয়াক থেকে। বললেন, খালুইতে হবে না—বস্তা নিয়ে আয় একটা। কানকো ঠেলে মাছ উঠতে থাকবে—ধরতে গিয়ে হুঁশ থাকে না তখন, খালুই উল্টে পড়তে পারে। বস্তার মধ্যে ফেলে দিলে নিশ্চিন্ত।

আর এক কালের পুরানো দিন সব মনে পড়ছে। তখন রাস্তা—এই ভব-নাথকে সঙ্গে নিয়েই কত হল্লোড়পনা করেছেন। সঙ্গী ছিলেন সীতানাথ, ইন্দির, ভিতে, জেতালে, বিপ্লব—আরও কত, নাম মনে পড়ছে না। বয়স হয়ে ঠাণ্ডা মেরে গেলেন এখন তাঁরা. মরেও গেছেন কতজনা।

কাকামশায় উঠানে দাঁড়িয়ে—না গিয়ে উপায় নেই অতএব। তাড়াতাড়ি হিরণ্ময় সরঞ্জাম সংগ্রহ করে আনল। হিকসের হেরিকেন একটা এবারে কলকাতা থেকে এসেছে, তল্লাটে নতুন জিনিস। সেটা নিয়ে নিল। ছাতা এনেছে, বস্তা তো আছেই। যেতে যেতে হিরু আবার একবার শুনিয়ে দেয়: মিছে যাওয়া কাকামশায়। আজ আর হবে না, যা হবার হয়ে গেছে। হবার হলে আমিই কি মাত্তর দুটো নিয়ে ফিরতাম?

দেবনাথ অন্য কথা তুললেন: ছাতা-আলো নিয়ে তোরা কইমাছ ধরিস নাকি? তবে একটা পিঁড়ি নিলি নে কেন? পিঁড়ি পেতে বাপাস্তোর হয়ে বসতিস।

ঝোপজঙ্গল থানাখন্দ অন্ধকার, মাথার উপর ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে—আলো-ছাতা ছাড়া আপনিই তো পেরে উঠবেন না কাকামশায়।

দূরে—শাখাসঙ্কুল বিশাল মহীরুহ, একেবারে কানাপুকুরের উপরে। ছোট ছোট আম, মধুর মতন মিষ্টি—এমন ফলন ফলেছে, পাতা দেখার জো নেই। নরম বোঁটা, দিবারাত্রি পড়েছে তো পড়ছেই। আম পড়ে পুকুরের খোলে—একফোঁটা জল ছিল না, মাটি ঠনঠন করছিল, সারাদিন আজও ছেলেপুলে ছুটোছুটি করে আম কুড়িয়েছে। সেই আমতলায় এখন জল দাঁড়িয়ে গেছে দস্তুরমতো—বৃষ্টির জল, তার উপর বিলের জল রাস্তার পগার দিয়ে এসে পড়ে। কইমাছ হিরু এইখানটায় ধরেছে।

অতএব ছাতা বন্ধ করে নরম মাটিতে ছাতার মাথা পুঁতে দেওয়া হল, হেরিকেনের জোর কমিয়ে নিভু-নিভু করা হল। খুড়ো-ভাইপো জলের উপর হাঁটু গেড়ে বসলেন—বসে অপেক্ষায় আছেন। পগারের জল ঝির-ঝির করে পড়ছে এখনো। হঠাৎ কোন এক সময় উজান কেটে দাম-চাপা দশা থেকে মুক্তি নিয়ে উল্লাসে ডাঙায় উঠতে যাবে মাছ, মাথা চেপে ধরে অমনি বস্তার মধ্যে ফেলবেন। কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়তো হাত, ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই। ছাড়া পেয়ে মাছ দামের ভিতর যদি ফিরে যেতে পায়, তাহা সর্বনাশ। বলে দেবে সঙ্গীসাথী ইয়ারবন্ধুদের, তারপরে একটাও আর বেরুবে না। হাতেনাতে বহু-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা, কইমাছ ধরার কাজে তাই আনাড়ি লোক আনতে নেই। সেই কাণ্ড সাজও হয়েছে দামের তলে চাউর হয়ে গেছে মানুষ ওৎ পেতে রয়েছে

ধরবার জন্য। আজকে বোধহয় বাছু আর বেরুবে না।

হিরু বলল, কতক্ষণ আর বসবেন কাকা, উঠে পড়ুন। আর একদিন দেখা যাবে।

এদিক সেদিক আরও কিছু ঘোরাঘুরি করে খুড়ো-ভাইপো বাড়ি ফিরে এলেন। ডাহা বেফুর—জলে ভেজা আর কাদা মাখাই সার হল শুধু।

আম কুড়িয়ে শিস্তবর ধামার পর ধামা এনে দালানে ঢালছে। লণ্ঠন হাতে ভবনাথ বাগের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন। দেবনাথ বললেন, উঃ, কম আম! অর্ধেক মেজে ভরে গেল—আর কত আনবি রে?

শিস্তবর বলে, তা আছে ছোটবাবু। আজ পরলা দিনেই গাছ মুড়িয়ে শেষ করে দিয়ে গেছে।

পাকা আম, ডাঁসা আম, একেবারে ফুলো আমও আছে। মেজের পাতিয়ে দিচ্ছে—বাতাস পেয়ে তাড়াতাড়ি পচে উঠবে না। হিরুকে দেবনাথ বললেন, তুই গিয়ে দাঁড়া একটু। দাদা চলে আসুন। হয়েও এসেছে প্রায়, আর কতক্ষণ!

কালবৈশাখী এই প্রথম এবছর। খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে আকাশ পরিষ্কার, তারা ফুটেছে, বৃষ্টিবাদলার চিহ্নমাত্র নেই। সোনাখাড় যেন চান করে উঠেছে, বৃষ্টি ধোওয়া পাতালতা ঝিকঝিক করছে তারার আলোয়। ব্যাঙেরা গ্যাঙর-গ্যাং গ্যাঙর-গ্যাং করে তোলপাড় তুলেছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, জল পড়ার সামান্য শব্দ এদিকে সেদিকে। রান্নাঘরের দাওয়ায় চাঁচপ পিঁড়ি পড়ছে—অর্থাৎ খেতে এসো সব এবারে। এদিকে আর ওদিকে কাঠের দেলকোর উপর দুটো টেমি ধরিয়ে দিয়েছে—চলে এসো শিগগির। বিনো আর অলকা-বউ ভাতের থালা এনে এনে রাখছে।

সুপাকা আম যাকে বলে, তা বড় নেই এই আমের গাদার মধ্যে। ভাল গাছের দুটো-পাঁচটা বেছে ছেলেপুলের হাতে দেওয়া হল। মিষ্টি নয়—পানসা কিম্বা হাড়ে-টক। যেগুলো একেবারে কাঁচা; বঁটিতে সরু সরু ফালি কেটে মাটির উপর মেলে দেওয়া হল—শুকিয়ে আমসি হবে। কচি দানের আম সই ভাল, কিন্তু এ আম ফেলে দেওয়া যাবে না তো। ডাঁসা আম জাঁক দিয়ে রাখা হল, পাকবে না—শুঁটকো হয়ে নরম হোক, কিছু আমসত্বে মিশাল দেওয়া যাবে, বাকি সমস্ত গরুর জাবনায়।

পরের দিন উমাসুন্দরী আমদত্ত্বের তোড়জোড় করে বসলেন। কাজটা বরাবর তিনিই করে আসছেন, প্রধান কারিগর তিনি, তরঙ্গিণী সাথেসঙ্গে আছেন। অলকা-বউকে তরঙ্গিণী ডাকাডাকি করেন: এদিকে এসো বড়মা,

লেগে পড়ে যাও। হেঁসেলে বিনো থাকুক, আম ছেঁচে দিয়ে আমি যাচ্ছি তারপরে।

অলকার দ্বিধা : আমি কি পেরে উঠব ছোটমা, চাকলা কেটে দিয়ে যাচ্ছি বরং।

চাকলা কাটবে, ছেঁচবে, ছাঁকবে, গোলা লেপবে—সমস্ত করবে তুমি। হেসে ধরলেন তরঙ্গিণী : আমি বরঞ্চ রান্নাঘরে যাবো এখন। বল, শক্তটা কি আছে? দেখেশুনে শিখে-পড়ে নাও। সংসার তোমাদের—চিরকাল বেঁচে-বর্তে থেকে আমরা সব করে দেবো নাকি?

বঁটি পেতে তিন চাকলা করে আম কাটে। চাকলাগুলো ধামার মধ্যে ফেলে মুগুরের মাথা দিয়ে খুব একচোট পিষে নেয়—হামানদিস্তায় পান ছেঁচার মতো। পরিমাণ অত্যধিক হলে ঢেঁকিতেও কোটে। পাতলা কাপড়ে গোলা ছেঁকে নেয় তারপর। নরম হাতে আস্তে আস্তে ছেঁকতে হবে, জোর-জবরদস্তিতে কাপড় ছিঁড়ে যাবে, গোলা ভাল উতরাবে না। চিনি একটু মিশালে মিঠা বাড়ে, চুন একটু মিশালে রং খোলে। বড়গিন্নির এতে ঘোরতর আপত্তি—খাঁটি আমসত্ত্বের স্বাদ মিশাল জিনিসে মিলবে না। গোলা তৈরি হল। বারকোশ, পিঁড়ি, খেজুরপাতার পাটি আর আছে পাথুরে ছাঁচ—পাথরের উপর রকমারি খোদাই : মাছ পাখি পরী কলকা ফুল লতাপাতা উল্টো করে লেখা 'জলখাবার' 'আবার খাবো' ইত্যাদ। একগাদা এমনি ছাঁচ সেকালে ভবনাথের মা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন—বাসনের বাক্সে দশ রকম বাসনের সঙ্গে থাকে, দরকারে বেরোয়। যেমন এই আমসত্ত্ব দেবার জন্য বেরিয়েছে, আবার জামাইষষ্ঠীর সময় ক্ষীরের ছাঁচ তৈরির কাজে বেরুবে। আমের গোলা নানান পাত্রে লাগিয়ে শুকোতে দিল—শুকোলে আবার গোলা লাগবে তার উপর। ছেলেপুলেরা পাহারায় আছে কাকে না ঠোকর দেয়। আজ হয়ে গেল, গোলা কাল আবারে লাগাবে, বারম্বার লাগাবে। সম্পূর্ণ শুকোলে ছুরি দিয়ে কিনারা কেটে আমসত্ত্ব তুলে ফেলবে। ছেলেপুলের মজা তখন, তারা ঘিরে এসে বসল। পাহারা দিয়েছে, এইবারে পারিশ্রমিক—ছাঁচের ছোট ছোট কয়েকটা আমসত্ত্ব বিলি হবে। হাত বাড়িয়ে কমল রাচন দিল : মাছখানা আমার।

পুঁটি বলে আমার তবে পাখি।

তরঙ্গিণী বিনুকে জিজ্ঞাসা করেন : তুই কি নিবি রে?

আমার লাগবে না কাকিমা।

আজকালের বড়িবুড়ো হয়ে গেছিস, তোর কিছু লাগে না। বড় এই কলকাখানা দিয়ে দিই, কেমন?

নিমি বলল, ছাড়বে না তো ছোট দেখে যা-হোক একখানা দিয়ে দাও। আমার পছন্দ-অপছন্দ নেই।

পরে শোনা গেল, সে আমসত্তটুকুও ছিঁড়ে কমল-পুঁটির মাঝে ভাগ করে দিয়েছে। এমনিই হয়েছে নিমি আজকাল—সর্বকর্মে নিস্পৃহ ভাব।

আমসত্ত দেওয়া চলল এখন—শুকিয়ে সযত্নে ভাঁজ করে তোলো-বোঝাই সরদালে তুলে রাখবে। আম যতদিন আছে, চলবে আমসত্ত দেওয়ার কাজ। বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে হবে, খরা পেলে রোদে মেলে দেবে। আম তো এই ক'টা দিনের—আমসত্ত বারোমাস দুধের সঙ্গে খাবে, মাঝে মাঝে অম্বল রাঁধবে।

আমে আমে ছয়লাপ, উমাসুন্দরী একটি মুখে দেন না। আম উৎসর্গ না হওয়া অবধি উপায় নেই। ইষ্টদেবতা ও পিতৃপুরুষের নামে আম-দুধ নিবেদন হবে—আগে তাঁদের ভোগ, তারপরে নিজের। সে কাজে পুরুত ও দক্ষিণা লাগবে, নারায়ণ-শিলা আনবেন ভদ্রা-কুলবর্তী সেই বড়েদা গ্রাম থেকে। পুরুত শরৎ চক্রবর্তীর বাড়ি সেখানে।

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। হিরুকে বলেন, ঠাকুরমশায়ের বাড়ি চলে যাও তুমি। সকলে খাচ্ছে, দিদিই কেবল খাবেন না, এ কেমন কথা।

হিরুর সঙ্গে শরৎঠাকুরের নাকি হাটে দেখা হয়েছিল। কথাটা বলেছিল সে তখন। শরৎ বললেন, নারায়ণ নিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এক বাড়ির সামান্য ঐ কাজটুকুর জন্য অত হাঙ্গামা পোষায় না।

হাঙ্গামা বিস্তর বটে। পাকা তিন ক্রোশ পথ—খেয়া-পার আছে তার মধ্যে একটা। নারায়ণ সঙ্গে থাকলে সারাক্ষণ নির্বাক হয়ে যেতে হয়, খুন করে ফেললেও টুঁ-শব্দটি বেরুবে না—কথা বলতে গিয়ে থুতুর কণিকা অঙ্গাঙ্গে ছিটকে পড়তে পারে।—পথের কোনখানে নারায়ণ-শিলা নামানোর জো নেই—অশুচি সংস্পর্শের শঙ্কা। তা তাড়াহুড়ো কিসের, আম তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না এরই মধ্যে।

পুরুত বলে দিয়েছেন, অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন দত্তবাড়ি ব্রতপ্রতিষ্ঠা আছে, একসঙ্গে সব কাজ সেরে দিয়ে যাবেন সেইদিন।

দরদালানের তক্তাপোশ দুটো উঠোনে নামিয়ে দিয়েছে। দুই উদ্দেশ্য। গ্রীষ্মের রাত্রে ঘরে না শুয়ে কেউ কেউ বাইরে শোয়—উঠোনের তক্তাপোশে তারা আরাম করে শুচ্ছে এখন। বৃষ্টি-বাদলার লক্ষণ দেখলে তখন এ-ঘরে সে-ঘরে যেখানে হোক ঢুকে পড়ে। তক্তাপোশ বেরিয়ে গিয়ে মেজে এখন একেবারে ফাঁকা—সমস্ত মেজেটা জুড়ে আম পাতানো। কতক সুপক্ক, কতক

আধপাকা। আমের উপরেও আম, তার উপরে সদ্য ভেঙে-আনা আশশ্যাওড়ার ডাল-পাতা। ওতে নাকি আম ভাল থাকে, আমের জীবনকাল বেশি হয়, ডাঁসা আম পেকে যায়। সকালবেলার এখন বড় কাজ হয়েছে আম বাছাই। কোন আম মিষ্টি, কোন আম টক। কোন আম রসালো—রস নিংড়ে দুধের সঙ্গে জমে ভাল, আবার কোন আমে রস ও আঁশ নেই—সেগুলো কেটে খেতে হয়। টক আম আমসত্ত্বে যাবে, আমে পচন ধরেছে তো গরুর জাবনায় দেবে। জষ্টিমাসে গরুরও মজা। আমের খোসা কাঁঠালের ভুসড়ো খেয়ে খেয়ে কামধেনু হয়ে দাঁড়িয়েছে—দুধের ভারে পালান ফেটে পড়ে, বাঁট টানলেই স্রোতোধারায় দুধ।

বাড়ি বাড়ি আম খাওয়ার নিমন্ত্রণ—এখন আম, আষাঢ় পড়তেই ক্ষীর-কাঁঠাল। পড়শি-মানুষ খাওয়াতে কার না সাধ হয়। গরিবে ভোজ খাওয়ানো পেরে ওঠে না—ভগবান গাছে গাছে দেদার আম কাঁঠাল দিয়েছেন, গাছের ফলে তাদের সাধ মেটায়। সব বাড়িতেই ছয়লাপ, নিমন্ত্রণে গরজ কি? তবু যেতে হয়, নয়তো রাগ দুঃখ অভিমান। এমন কি ঝগড়াঝাটিও।

গিয়ে সব পিঁড়ি পেতে গোল হয়ে বসল, থালা রেকাব বাটি এক একটা হাতে নিয়েছে। বাড়ির গিন্নি বঁটি পেতে ঠিক মাঝখানে বসে ঝুড়ির আম চাকলা কেটে দিচ্ছেন। খাও, খেয়ে বলো কি রকম। গোল গোল আম, নাম হল গোলমা। চুষিপিঠের মতন চেহারা, চুষি নাম, চুষে খেতে ভাল। কালমেঘা—কালো রং বটে, খেয়ে দেখ কী মধুর···। খচ খচ করে কেটে যাচ্ছেন—বঁটিতে ক্ষুরের ধার। আম কেটে কেটে অম্লরসের জন্য হয় এমনধারা—জষ্টিমাসের বঁটিতে, আম তো ছার, মানুষের গলা কাটা যায়।

॥ আট ॥

বৈশাখের বিশে পার হয়ে গেল। ভূপতি রায়ের মেয়ের বিয়ে চুকে গেছে। মুক্তঠাকরুন এসে পড়বেন এইবার। কাল নয়তো পরশু। কিম্বা তার পরের দিন—তার ওদিকে কিছুতে নয়। ফটিকের কাছে আন্দাজ সেই রকম বলেছিলেন।

ঠাকরুন আসছেন, পাড়া পড়ে গেছে। পুঁটি কমলকে ভয় দেখায়: রাগ হল তো ভুঁয়ে আছাড় খেয়ে পড়িস তুই। পিসিমা এসে দেখিস কি করেন।

পুঁটির দিকে বিনো অমনি করকর করে ওঠে : তোর কি করবেন পিসিমা, সেটা ভাবিস ? বাড়ি তো এক লহমা দাঁড়াস নে—পাড়ায় টহল দিয়ে বেড়াস। আর এখন হয়েছে তলায় তলায়—

অলকা-বউকেও বিনো শাসানি দিচ্ছে : তোমার মাথার কাপড় ঘন ঘন পড়ে যায় বউদি। বউ নও তুমি যেন, পুববাড়ির মেয়ে। পিসিমা আসছেন, হুঁশ থাকে যেন। বলছি কি, ঘোমটার কাপড় সেফটিপিন দিয়ে চুলের সঙ্গে সেঁটে রেখো—পড়ে যেতে পারবে না।

তরঙ্গিণী নিমিকে বলছেন, পাগলীর মতন অমন ছন্নছাড়া বেশে ঘুরবিনে তুই। দৃষ্টিকটু লাগে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরফোঁটা, পায়ে আলতা পরে ভব্যসব্য হয়ে থাকবি—নয়তো বকুনি খেয়ে মরবি ঠাকুরঝির কাছে।

পাড়ার মধ্যেও মুক্তঠাকরুনের কথা। ভালোর ভালো তিনি, কিন্তু বেচাল দেখলে রক্ষে রাখবেন না। এই মানুষ হল আপনজন, ঐ মানুষটা পর—এসব ঠাকরুনের কাছে নেই।

দেড় প্রহর বেলা। পদ্ম এসে খবর দিল : আসছেন পিসিমা। হাটখোলার দীঘির পাড়ের উপর আতাগাছ কাটছি, গরুর-গাড়ি দেখতে পেলাম। ভাবলাম, যাই—খবরটা বলে আসিগে।

এত পথ ছুটতে ছুটতে এসেছে, হাঁপাচ্ছে সে। দেবনাথ বললেন, রাস্তা-পথে গাড়ি তো কতই আসে যায়—

পদ্ম বলে, পিসিমার গাড়ি দু-রশি দূর থেকে চেনা যায়—চলনই আলাদা। মালপত্রে ঠাসা—চিকির-চিকির করে আসছে। এত মাল যে গাড়োয়ানের জায়গা হয়নি, হেঁটে হেঁটে আসছে সে। পিসিই গাড়োয়ান হয়ে ডাইন-তাইন করে গরু তাড়াচ্ছেন। হরিতলার কাছাকাছি এসে পড়লেন এতক্ষণে।

খবর দিয়েই পদ্ম ছুটল দীঘির পাড়ের গাছ কাটা শেষ করতে। ব্যাটবল খেলায় একটা ব্যাটের প্রয়োজন পড়েছে, আতাগাছের গুঁড়িতে ভালো ব্যাট হয়।

বট-অশ্বত্থের জোড়াগাছ—হরিতলা। সেকালে, অনেক কাল আগে, পথিকের ছায়াদানের জন্য পুণ্যার্থী কেউ তিন রাস্তার মাথায় দুই গাছ একত্র রোপণ করে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই হরিতলা থেকেই সোনাখড়ির আরম্ভ বলা যায়। বহুদীর্ঘ প্রায় সমান-আকৃতির দুই প্রকাণ্ড ডাল দুদিকে—স্তম্ভের মতো বিশাল দুটো বোয়া দুই প্রান্তে মাটিতে নেমে গেছে, তার উপরে ডালের ভর। নতুন পথিক, দেবস্থান বলে যে জানে না, সে-ও থমকে দাঁড়াবে

এইখানটা এসে। মহাবৃক্ষ দীর্ঘ দৃঢ় বাহুদ্বয় মেলে দুটো দিক আবৃত করে যেন গ্রাম রক্ষা করছেন। নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন জায়গাটা—চলতে চলতে আচমকা যেন ছাতের নিচে এসে পড়লাম, মনে হবে। তাড়া যতই থাক, পালকি গরুর-গাড়ি পথচারী মানুষ হরিতলায় একটুকু না জিরিয়ে নড়বে না, মাথা নুইয়ে বিড়বিড় করে হরিঠাকুরকে মনের কথা জানিয়ে যাবে।

দেবনাথ দিদিকে এগিয়ে আনতে চললেন। শহরে থাকার দরুন তল্লাটে একটু বিশেষ খাতির—অতএব গেঞ্জিটা গায়ে চড়িয়ে চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে নিতে হল। হরিতলায় এসে পড়লেন—কাকস্য পরিবেদনা। ভবনাথ কোন কাজে কোথায় ছিলেন—শুনতে পেয়ে তিনিও চলে এসেছেন। হাটখোলার পথ ধরে চললেন দু-ভাই পাশাপাশি। হাঁ, কুশডাঙার গাড়িই বটে—দাদা ভুল দেখে নি।

মুক্তকেশী চচ্-চচ্ আওয়াজ করে গরু থামাবার চেষ্টা করছেন। গরু আমল দেয় না। গাড়োয়ানকে ডাক দিলেন: এগিয়ে আয় রে নিতাই, গাড়ি ধর্, নামব।

নিতাই এতক্ষণে গাড়ির মাথায় চড়ছে—তিন ভাই-বোনে হেঁটে যাচ্ছেন। পথের উপরেই প্রণামাদি। দেবনাথ মুক্তকেশীর পদধূলি নিলেন, মুক্তকেশী ভবনাথের। তারপর কে কেমন আছে—নাম ধরে ধরে জিজ্ঞাসা: বাড়ির হয়ে গেল তো পাড়ার সকলের। তারপর গ্রামের। গাড়ির দিকে চেয়ে দেবনাথ অবাক হয়ে বললেন, করেছ কি ও দিদি, গোটা কুশডাঙা যে গাড়ি বোঝাই দিয়ে এনেছ।

মুক্তকেশী বলেন, তাই আরো কুলোবে না দেখিস। কতজনের কত রকম দাবি—

আশ্বিনে এবার বাড়িতে মা-দুর্গা আসছেন, ফটিক বলে এসেছে। আয়োজন কতটা কি হল সবিস্তর খবরাখবর নিচ্ছেন। আরও সব রকমারি প্রশ্ন: বউয়ে-শাশুড়িতে বনছে কেমন অমুকের বাড়ি? ছেলেমেয়ে কার কি হল? গোয়ালে আমাদের কটা দোওয়া-গাই এখন? পাড়ার মধ্যে নতুন ঘর কে তুলল? লাউ-কুমড়ো কার বানে কেমন ফলল এবার?

কথাবার্তার মধ্যে পথ এগোয় না। গরুর-গাড়ি এগিয়ে পড়েছে এখন, বোঝার ভারে ক্যাঁচকোচ আওয়াজ দিচ্ছে। মুক্ত-ঠাকরুন আসছেন—আওয়াজ তুলে গাড়ি যেন চারিদিকে জানান দিয়ে যাচ্ছে। হরিতলা পার হয়ে তাঁরা গ্রামে ঢুকে গেলেন।

ঠাকরুন আসছেন, সাড়া পড়ে গেছে। হুড়কোর পাশে দাঁড়িয়ে কেউ

মা বলে, শহরে ভাই বাড়ি এসেছে—ঠাকুরঝির তাই বাপের-বাড়ির কথা মনে পড়ল। আমরা গাঁয়ে পড়ে থাকি—আমাদের কে খোঁজখবর নিতে যায়!

মুক্তকেশী সকাতরে বলেন, মন ছটফট করে সত্যি মেজবউ, কিন্তু পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে—আসি কেমন করে? যা করে এবারের আসা! আমার ভিটের ডাঁটা ভালো খাও তুমি, নিয়ে এসেছি ক'গাছা।

যার দেখা পান, একটা না একটা বলছেন এমনি।

অকালের আনারস ধরেছে ক'টা। বলি, রুগি মানুষ ইন্দির-দাদা আছেন—নিয়ে যাই একটা, খুশি হবেন। আছে গাড়িতে, পাঠিয়ে দেবো।

তোর মেয়েকে নিয়ে আসরে দেনি। রথের বাজারের জন্য হাঁড়িবাঁশি বানাচ্ছে—চলে গেলাম কুমোরবাড়ি। আগ ভেঙে দশ-বারোটা আমায় দিতে হবে পালমশায়। কদ্দিন বাদে যাচ্ছি, ছেলেপুলের হাতে দেবো কি? তা এনেছি বেশ। বাঁশি ছাড়াও ক্ষুদে ক্ষুদে হাঁড়ি-মালসা-সরা—রাঁধাবাড়ি খেলবে সব। পুতুল এনেছি, পাল্কি এনেছি—খাসা বানায়। নিয়ে যাস মেয়েকে, পছন্দ করে নেবে।

মন্তার মাকে ডেকে বলেন, পিঁড়ির উপরে রুটি বেলতে দেখে গিয়েছিলাম—গাজনের মেলায় চাকি-বেলন কিনেছি তোমার জন্য।

গরুর-গাড়ি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ছইয়ের পেছনে বাঁধা প্রকাণ্ড মানকচুটা দেখিয়ে ফুলকে বললেন, এক ফালি নিয়ে এসো দিদি আজ আবশ্যি। আঁশ মরেনি এখনো, তবু খেয়ে দেখো। কাঁচা চিবিয়ে খেলেও গলা ধরবে না।

যাকে দেখছেন, এমনি বলতে বলতে আসছেন। ভবনাথ স্নেহকণ্ঠে বললেন, এতও তোর মনে থাকে মুক্ত। কে কি খেতে ভালবাসে কার কোন অভাব দেখে গিয়েছিলি কোন জিনিসটা পেলে কে খুশি হয় সমস্ত তোর নখদর্পণে।

দেবনাথ বলেন, বাপের-বাড়ি করে আসা হবে—ছ-মাস আগে থেকে দিদি ঘরের জিনিস বাইরের জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব গোছগাছ করে রাখেন।

গরুর-গাড়ি আগে পৌঁছে গেছে। মালপত্র নামিয়ে নিতাই বাইরের রোয়াকে সাজিয়ে রাখছে। হাঁড়ি ভোলো কলসি কচু কলা লাউ চই ঢেলকো বাংকোশ চাটু খুন্তি—নেই কোন জিনিস। ছইয়ের খোল থেকে বের করছে তো করছেই। উমাসুন্দরী বাইরে-বাড়ি এসে অপেক্ষায় আছেন। চোখ বড় বড় করে তিনি বললেন, কত রে বাবা!

হিরু টিপ্পনী কেটে বলে, পিসিমা ভাবেন ওঁর বাপের-বাড়ি মরুভূমির উপর। এত তাই সা জুড়ে-গুছিয়ে আনলেন।

মুক্তকেশী এসে গেছেন, হিরুর কথা কানে গেছে তাঁর। হেসে বললেন, মা

গুছিয়েছিলাম, তার তো অর্ধেকও আনা হল না। আমার জন্য কি এনেছ—বলে কতজনে মুখ ভার করবে দেখিস। আনি কেমন করে? গাড়ির ছই করেছে একেবারে পাখির খাঁচা—একটা মানুষ ভেঙে চুমড়ে সিকিখানা হয়ে কোন রকমে বসে। কদমা বাতাসা ফেনিবাতাসা আর কিছু গুড়ের-সন্দেশ চন্দ্রপুলি বানিয়ে আনলাম—দুখানা চারখানা করে বাড়িতে বাড়িতে দেওয়া যাবে।

গ্রামসুদ্ধ ভেঙে এসে পড়েছে। উমাসুন্দরী বউ মেয়েদের বলছেন, দেখ্ তোরা—একটি মানুষে কত মানুষ এসে জমেছে, চেয়ে দেখ। পিঁড়ি না দিয়ে লম্বা মাদুর পেতে সকলকে বসতে দিচ্ছেন।

ধ্বক করে পুরানো কথাটা ভবনাথের মনে চমক দিল। এককালে শ্বশুরের নির্বংশ ভিটা ছেড়ে আসবার জন্য বোনকে বলেছিলেন, একা একা শ্মশান চৌকি দিয়ে কি করবি? সেই মুক্তর কত আপনমানুষ—গুণতিতে আসে না। যেমন এই সোনাখড়িতে, তেমনি কুশডাঙায়।

বৃষ্টি বাতাস সন্ধ্যার দিকে অল্পসল্প প্রায়ই হচ্ছে। একরাত্রে আবার খুব জোর ঢালা ঢালল। বাতাসও তেমনি। সমস্ত রাত চলেছে—সকাল হয়ে গেল, এখনো জের মেটেনি। মুখ পুড়িয়ে আছে আকাশ। টিপ টিপ করে পড়ছে—হঠাৎ জোর এক এক পশলা। কী কাণ্ড, জ্যৈষ্ঠমাসেই বর্ষাকাল হাজির।

বাইরে বাড়ি রোয়াকের খুঁটি ঠেসান দিয়ে পুঁটি বাগের দিকে তাকিয়ে আছে। তলায় তলায় কত আম এখনো খুঁজে বের করা যায়—কিন্তু বৃষ্টির মাঝে বাইরে বেরুনো বন্ধ। বিশেষ করে মুক্তঠাকরুন রয়েছেন, বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে বেড়ান তিনি, সে চোখে ফাঁকি চলে না। তিনি যখন তাকিয়ে পড়েন বুকের মধ্যে গুর গুর করে ওঠে।

সামনের রাস্তা দিয়ে ছাতার আড়ালে জল ছপছপ করে যাচ্ছে—চলন দেখেই ভবনাথ চিনেছেন। হাঁক দিয়ে উঠলেন: কে যায়, নন্দা না? বৃষ্টি বাধায় কোথায় চললে? শোন—

নন্দ পরমাণিকের কাঁধে ধামিতে চাল। ছাতা ধরেছে মাথায় নয়, ধামির উপরে। নিজে ভেজে ভিজুক, চালে না জল পড়ে। কিন্তু জল ঠেকানোর অবস্থা ছাতার নেই। আদি কালো-কাপড়টা নষ্ট হয়ে গেলে ছাতা সাদা কাপড়ে ছেয়ে নিয়েছিল, তা-ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তার উপরে ঝড়বাতাসে দুটো-তিনটে শিক ভেঙে আছে।

রোয়াকে উঠে নন্দ পরামাণিক বলল, নিজে ভিজেছি, চালও ভিজেছে।

দু-আনা সেরের মাগ্‌গি চাল—বাদলা দেখেছে, রাতারাতি অমনি এক পয়সা দর চড়িয়ে দিয়েছে। ছাতি-সারারা আসে না—শিক দুটো বদলে নেবো, সে আর হয়ে উঠছে না।

ভবনাথ বললেন, শিক বাঁট ছাউনি আগাপাস্তলা সবই বদলাতে হবে। তার চেয়ে বেশি গোলপাতার ছাতা একটা কিনে নাওগে—সস্তা-গণ্ডার মধ্যে হবে, কাপুড়ে-ছাতার চেয়ে অনেক ভাল বাহার হবে না, কিন্তু বৃষ্টি ঠেকাবে।

চালের ধামি নামিয়ে রেখে নন্দ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বলে, এলাম তো কলকে ধরিয়ে দিয়ে যাই। অর্থাৎ তামাক সেজে নিজে টেনে ধরাবে তারপর কলকেটা ভবনাথের হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। গুড়ির আগুনে তামাক খাওয়া—নারকেলের খোসা পাকিয়ে নন্দ গুড়ি বানাচ্ছে।

ভবনাথ বললেন, যে জন্য ডাকলাম নন্দ। বিষ্টিবাদলার মধ্যে ভাল দেখে একটা পাঁঠার জোগাড় দেখ। নয়তো ফুলখাসি। ছোটবাবু বাড়িতে—পারো তো আজকেই লাগিয়ে দাও।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে নন্দ পরামাণিক ছাগল কিনে আনে, দু-একটি সহকারী জুটিয়ে নিয়ে ঘাড়ে কোপ দেয়। নন্দ ছাগল মেরেছে, খবর হয়ে যায়। মাংসের প্রত্যাশীরা নন্দর বাড়ি এসে কেউ বলে চার-আনার ভাগ একটা আমায় দিও, কেউ বলে আট-আনার। মোট মূল্যের হিসাবে মাংসের ভাগ, লাভের ব্যাপার নেই তার মধ্যে। কেউ একজন উদ্যোগী না হলে গ্রামবাসীর মাংস খাওয়া হয় না। নন্দ পরামাণিক কাজটা বরাবর করে আসছে, মাংস খাবার ইচ্ছে হলে তাকে বলতে হয়।

নন্দ বলল, গাঁয়ের ক্ষেতেল মানুষ আজ-কাল সব ত্যাঁদোড় হয়ে গেছে বড়কর্তা। গরজ বুঝে চড়া দাম হাঁকে। হাটের দিন গঞ্জে গিয়ে কিনলে সুবিধা হবে। ক্ষেতেলরা সেখানে নিজেদের গরজে বেচতে আসে। দশটা মাল দেখেশুনে দরদাম করে কেনা যায়।

ভবনাথ বললেন, সামান্যের জন্য তত হাঙ্গামে কাজ নেই। বৃষ্টি নেমেছে, আর তুমি যাচ্ছ—দেখেই কথাটা মনে উঠল। গঞ্জের হাটে গিয়ে কিনতে হবে এর পরে। জামাইষষ্ঠিতে জামাই আসবে, পাঁঠা পড়বে প্রায় নিত্যিদিন, বেশি পাঁঠা লাগবে তখন।

বাড়ির বেংছেলে কালীময় ফুলবেড়ে শ্বশুরবাড়িতে আছে—সোনাখড়ি থেকে ক্রোশখানেক দূর। দেবনাথ বাড়ি আসার পরে সে-ও এসেছিল, থাকছিলও সোনাখড়িতে। কিন্তু অর এসে গেল। অর কালীময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-কুটুম্বর মতন হয়ে গেছে—মাঝে মধ্যে আসবেই, কালীময়ের অদর্শন

সইতে পারে না যেন। আসে জ্বর, নাইতে-খেতে সেরে যায়। জ্বর বলে কালীময়েরও কাজকর্ম কিছু আটকে থাকে না। হাতেম আলি নামে ফকির আছেন কোণা-খোলায়, রোজ সকালে 'ফুল-পানি' অর্থাৎ ফেরোর জলে ফকির মন্ত্রপূত একটা ফুল ফেলে দেন তাই নেবার জন্য শতশত রোগি থাকে এসে ধর্না দেয়। এই ফুলপানি এবং সেই সঙ্গে নাওয়া ও খাওয়া দস্তুরমতো—জ্বর বাপ-বাপ করে পালায়। বড় সর্বনেশে নাওয়া—সামান্য জ্বরে বিশ ভাঁড় জল মাথায় ঢেলে নাইতে হয়, জ্বরের প্রকোপ যত বেশি ভাঁড়ের সংখ্যা বেড়ে যাবে ততই। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, ডাক্তারবাবুরা রায় দিয়েছেন ডবল-নিউমোনিয়া—সেই রোগিকে পুকুর-ঘাটে নিয়ে একজন ধরে আছে ও ভাঁড় গণে যাচ্ছে এবং অপরে ভাঁড় ভরে ভরে মাথায় ঢালছে। অসুখের বাড়াবাড়ি বুঝে ফকির সাড়ে পাঁচ কুড়ি অর্থাৎ একশ দশ ভাঁড় ঢালার ব্যবস্থা দিয়েছেন। ডাক্তারবাবুরা শুনে তো গর্জে ওঠেন: খুনে ফকিরকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।

নাওয়া এই, আর খাওয়া শুনেও আঁতকে ওঠার কথা। ভাত ডাল মাছ কোন কিছুতে বাধা নেই। তেঁতুল-গোলা অতি অবশ্য। এবং গরম ভাতের তুলনায় পান্তা ও কড়োকড়োই প্রশস্ত। অবাক কাণ্ড—কটা দিন পরেই দেখা গেল, ডবল-নিউমোনিয়ার রোগিটি একহাঁটু কাদার মধ্যে লাঙলের মুঠো ধরে হটহট করে চাষ দিচ্ছে, রোগপীড়ার চিহ্নমাত্র নেই।

এক দুপুরে কালীময় ঘরে শুয়ে মৃদুস্বরে গান ধরল। খলকা-বউ কান পেতে শুনে শাশুড়িকে গিয়ে বলল, মেজবাবুর জ্বর আসছে মা। জ্বর আসার লক্ষণ গা শির-শির করা—তেমনি আবার গান ধরা কালীময়ের পক্ষে। এমনি সে গানটান গায় না, শুধুমাত্র জ্বর আসার মুখে এবং রাতবিরেতে ভুতুড়ে জায়গা অতিক্রম করার সময় গায়। দুপুরবেলা কালীময়ের জ্বর এলো, সন্ধ্যা হতে না হতেই সে একেবারে হাওয়া। শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। বউ বাসা-পানিকে তেঁতুলগোলা করতে বলে ভাঁড়ের পর ভাঁড় মাথায় ঢালছে ঘাটের সিঁড়িতে বসে। ফকিরবোলা কালীময়—ফকিরের বিধিমত তার চিকিৎসা। যতকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চা আছে বলে সোনাখড়ির মানুষজন নাস্তিক, ফকিরের একাবিন্দু মান্য নেই। ধনঞ্জয় কবিরাজ এবং এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আছেন গাঁয়ের উপর, যাবতীয় রোগ তাঁদের একচেটিয়া। 'ভাত বন্ধ'—এই একটা বুলি বিশেষভাবে তাঁদের শেখা, নাড়ি দেখবার আগেই বার্লি-সাবুর ব্যবস্থা দিয়ে বসে আছেন। এই চিকিৎসার মধ্যে কালীময় নেই। দায়ে-দরকারে দশ-বিশদিন সোনাখড়ির বাড়ি থাকতে বাধা নেই কিন্তু অসুখ-বিসুখের লক্ষণ মাত্রেই সরাসরি সে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠবে।

দেবনাথের জরুরি চিঠি নিয়ে শিশুবর কালীময়ের কাছে চলে গেল : আজ না হোক, কাল সকালে যতি অবশ্য বাড়ি আসবে—কুটুম্ববাড়ি যাবার প্রয়োজন। দেবনাথ না পাঠালেও শিশুবর যেত—মুক্তঠাকরুন এসে গেছেন, টুক করে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসত। অসুখ যত বড় সাংঘাতিক হোক কালীময় ছুটে এসে পড়বে। ঠাকরুনকে বাঘের মতন ডরায় সে। ক্যাট- ক্যাট করে মুখের উপর তিনি যা-তা বলেন : পূববাড়ির কুলাঙ্গার তুই—মাধব মিত্তিরের বউয়ের কাছে দাসখত দিয়ে তার গোমস্তাগিরি ক'রছিস। তোর বাপের ঘরে যেন অন্ন নেই।

ভবনাথকেও ছাড়েন না : ছেলের টোপ ফেলে সম্পত্তি তুলে আনতে গেলে, মাধব মিত্তিরের বউ তেমনি ঘাগি মেয়েমানুষ—টোপই গিলে খেয়ে আছে। তোমরা খাও কলা এখন।

কুটুম্ববাড়ি যাওয়ার নামে কালীময় একপায়ে খাড়া, খাওয়াটা উপাদেয় বটে। তদুপরি মুক্তকেশী এসে পড়েছেন—তাঁর চোখের উপরে শ্বশুরালয়ে তিলার্ধকাল সে থাকবে না।

দাঁড়া শিশুবর। সকাল-টকাল নয়, এক্ষুনি যাচ্ছি। একটুখানি দাঁড়া—

জামা গায়ে ঢুকিয়ে চাদরটা তার উপর ফেলে জুতোজোড়া হাতে নিয়ে কালীময় বেরিয়ে পড়ল।

দেবনাথ তাকে অন্তরালে নিয়ে বললেন, আজকেই এসে পড়েছ—ভাল হয়েছে রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ো। কানাইডাঙা থেকে অনেক হাটুরে-নৌকো ছাড়বে, তার একটায় উঠে বসো। যাচ্ছ গোঁসাইগঞ্জে, কেউ তা জানবে না—দাদা অবধি না। দাদাকে বলেছি, অম্বুজ দাসের কাছে পাঠাচ্ছি তোমায়—ছিরুর জন্য বনকরের একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন কিনা। দিদি আর আমি পরামর্শ করেছি—দু'জন মাত্র আমরা জানি, আর এই তুমি জানলে। দুলালকে যদি এনে ফেলতে পার, জানাজানি তখনই।

কালীময় ঘাড় নাড়ল। আমার যেতে কি—তবে খোঁতা-মুখ ভোঁতা করে ফিরতে হবে। গেল-বার এমনি ফটিক গিয়েছিল। এলো না, একগাদা কথা শুনিয়ে দিল। বাবা রেগে টং, নিমিটা মুখ চুন করে ঘোরে। পাড়ার লোক মজা দেখে : এলো না বুঝি জামাই?

দেবনাথ বললেন, বাইরের লোক না গিয়ে তুমি যাচ্ছ সেই জন্যে। কাক-পক্ষী টের পাবে না। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি বেয়ানের নামে।

কত সাধ করে একই দিনে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। চঞ্চলার বেলা হয়েছে—বউকে তারা চোখে হারায়। চঞ্চলাও মজে গিয়েছে খুব—মুখে যা-ই বলুক, চিঠিতে যত ধানাই-পানাই করুক, বাপের-বাড়ির জন্য সে

মোটেই বিচলিত নয়। হোক তাই, ভাল থাকলেই ভাল, বাপ-মা আত্মীয়জনে এই তো চায়।

আর নিমির বেলা ঠিক উল্টো। বিয়ের পর বার তিনেক গোঁসাইগঞ্জে গিয়েছিল, তারপর থেকে বাপের-বাড়ি পড়ে আছে। বউ নেবার জন্য দুলালের মা গোমস্তাকে পাঠিয়েছিলেন একবার। উঠানে পালকি। কানাইডাঙার ঘাট অবধি যাবে। পানসি ভাড়া করা আছে সেখানে। হিরুও যাচ্ছে—বোনকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। জামা-জুতো পরে সে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসল মানুষ নিমিরই পাত্তা নেই। কোথায় গেল, কোথায় গেল? খুঁজতে খুঁজতে বিনোই শেষটা আবিষ্কার করল, নাটাবনের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে সে। যাবে না, কিছুতে যাবে না—জোর করে পালকিতে ঢুকিয়ে দেবে তো লাফিয়ে পড়বে পালকি থেকে। অথবা মাঝগাঙে পানসি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। গোঁসাইগঞ্জে নিয়ে তুলতে পারবে না কেউ, দিব্যিদিলেশা করে বলছে। চুপ, চুপ! বাড়ির লোকে নরম হলেন তখন : ঘরে আয় তুই, কেলেঙ্কারি করে লোক হাসাস নে—যেতে হবে না শ্বশুরবাড়ি। পালকিসহ গোমস্তামশায় ফেরত চলে গেলেন—হঠাৎ নাকি মেয়ের সাংঘাতিক রকম পেট নামছে, সুস্থ হলে হিরু নিজে গিয়ে রেখে আসবে। গোমস্তাও ঘাস খান না—যা বোঝবার বুঝে গেলেন তিনি। বউ নেবার প্রস্তাব তার পরে আর গোঁসাই-গঞ্জ থেকে আসে নি। চঞ্চলা শ্বশুরবাড়ি চুটিয়ে সংসারধর্ম করছে, নিমি বাপের-বাড়ি পড়ে থাকে। বিষম জেদি—কথা-কথান্তর ঝগড়াঝাঁটি হলেই অমনি হাতের চুড়ি ভেঙে সিঁথির সিঁদুর মুছে বিধবা সাজবে, খোসামুদি করে তখন চুড়ি ও সিঁদুর পরাতে হয় আবার।

কানাঘুষো আগেই একটু শোনা গিয়েছিল, অলকা-বউ চাপাচাপি করে আরও কিছু বের করল নিমির কাছ থেকে। বাড়ির সবাই ভবনাথকে দোষে। নিজেই গিয়েছিলেন পাত্র পছন্দ করতে—পাটোয়ারি মানুষ, বিষয়সম্পত্তি দেখে মাথা ঘুরে গেল—অন্য খবরাখবর নেবার ফুরসত হল না। নিজের মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে জলে ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। ব্যাপারটা কি হয়েছে, ভবনাথ অদ্যাবধি কিন্তু বুঝতে পারেন না। বেটা-ছেলের একটু-আধটু বাহিরফটকা দোষ থাকেও যদি, বিয়ের পর শুধরে যায়। বউয়েরই কর্তব্য সেটা, কড়া হাতে রাশ টেনে ধরবে সে। ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে বুঝলে বাড়ির কর্তা ডাগরডোগর পাত্রী দেখে তাড়াতাড়ি সেইজন্য বিয়ে দিয়ে ফেলেন। নিমিই তো সৃষ্টিছাড়া—নিজের জিনিস ইঁদুর বাঁদরে শিয়াল-শকুনে খুবলে খুবলে খেয়ে যাবে, মান করে উনি বাপের-বাড়ি পড়ে থেকে নাকিকান্না কাঁদবেন।

দেবনাথ ঠিক করেছেন, ফয়শালা করে যাবেনই এবারে—শ্বশুর বলে চুপ-চাপ থাকার মানে হয় না। দুলালের মাসতুতো বোন সেই সুহাসিনীটাকে নার্সিং-এর কাজে ঢুকিয়ে দেবেন। জমিদারের সেজ বাবু, মনিবের চেয়ে দেবনাথের বান্ধবই তিনি বেশি, এ ব্যাপারে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব, শহরে চলে যাক মেয়েটা, নিজের পায়ে দাঁড়াক—মাসির বাড়ি কেন চিরকাল পড়ে থাকতে যাবে? এই নিয়েও স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বললেন জামাই-য়ের সঙ্গে। জামাইষষ্ঠির আট দিন বাকি—কালীময়কে তাড়াহুড়ো করে পাঠাচ্ছেন। আগেভাগে দুলালকে নিয়ে আসুক। চঞ্চলা সুরেশ না আসতেই কথাবার্তা এঁরা চুকিয়ে বসে থাকবেন।

বলেন, দেশে-ঘরে থাকিনে—বাবাজীকে শুধু চোখের দেখাই দেখছি, ভাল করে আলাপ-সালাপ হবে এবার—ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে দিচ্ছি এইসব। তুমি মুখেও বোলো। তা সত্ত্বেও যদি না আসে, নিজে চলে যাবো তখন—

কালীময়ের ঘোর আপত্তি: না, আপনি যেতে যাবেন কেন? তালুইমশায় মারা গেছেন, চ্যাংড়াটা কর্তা হয়ে বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে শুনতে পাই। আমার মান অপমান নেই—কিন্তু আপনার মুখের উপর উল্টোপাল্টা কথা যদি কিছু বলে বসে?

দেবনাথ শান্ত কণ্ঠে বললেন, বন্দুক থাকবে আমার সঙ্গে—তাহলে শেষ করে আসব দুলাল-সুহাসিনী দুটোকেই। বিধবা হয়েছে নিমি লোকে বলে থাকে। তাই আমি সত্যি সত্যি করে আসব।

॥ নয় ॥

গোঁসাইগঞ্জে কালীময় এই প্রথম। নদী থেকে সামান্য দূরে একতলা পাকা দালান উঠানে পা দিয়েই দু-পাশে গোলা দুটো। ফলশা গাছ চতুর্দিকে ঘিরে আছে। নদী ঘরের দুয়োরে বললেই হয়, আবার বাড়ির পিছনে বিশাল এক পুকুর। বিষয়ী মানুষ ভবনাথ এইসব দেখে মজে যাবেন, সে আর কত বড় কথা। আরও তো দুলালের বাপ বুড়ো কর্তামশাই তখন বর্তমান। দাবরাব প্রচণ্ড ছিল তার। গোটা দুই ভাঁটা নেমে গিয়ে বাঁধবন্দী প্রকাণ্ড চক। হাজা-শুকো নেই ওঁদের জমিতে। ফাল্গুনের গোড়ার দিকে সাতডিঙে নৌকো ধান বোঝাই হয়ে গোঁসাইগঞ্জের ঘাটে লাগে, জনমজুর ঝি মাল্লারা নৌকো থেকে ধান বয়ে বয়ে উঠানে ঢালতে লেগে যায়। ঢালছে তো ঢালছে—ছোটখাট পাহাড় হয়ে ওঠে। তারপর চিটে উড়িয়ে ধামা ভরে সেই ধান গোলায়, ঢুকে

ফেলা। কাজকর্ম সারা হতে কয়েকটা দিন লেগে যায়।

এমনি এক মরশুমের মধ্যেই ভবনাথ পাকা দেখতে এসে পড়েছিলেন। আশীর্বাদের আংটি দুলালকে পরাবেন, সে এসে দাঁড়িয়ে আছে, ভবনাথ তখনও মুগ্ধচোখে উঠানে ধানের গাদার দিকে তাকিয়ে। দুলালের বাপ হেসে বললেন, এ আর কি দেখছেন বেহাই, খোলাট থেকে সবই বেচে দিয়ে এলাম। খোরাকি বাবদ সামান্য কিছু বাড়ি এনেছি—

বাড়ি ফিরে শতকণ্ঠে নতুন কুটুম্বর ঐশ্বর্যের কথা বলতে লাগলেন।

নৌকোর চলাচলে সময়ের মাথামুণ্ডু থাকে না,—কালীময়কে নামিয়ে দিয়ে গেল প্রায় দুপুর তখন। গামছা কাঁধে দুলাল চানে যাচ্ছিল—কুটুম্ব দেখে হৈ-হৈ করে উঠল: আসুন আসুন। রোয়াকের তক্তপোশে নিয়ে বসাল। মাকে ডাকছে: ও মা, সোনাখড়ি থেকে মেজবাবু এসেছেন, দেখ।

দুলালের মা এসে দাঁড়ালেন। কালীময় পায়ের ধুলো নিয়ে দেবনাথের চিঠি হাতে দিল। চিঠি হাতের মুঠোয় মুড়ে নিয়ে বললেন, কুটুম-পাখি ডেকে গেল—বলছিলাম, কুটুম্ব আসবে আজ দেখিস। তা, ভাল তো সব তোমরা?

কালীময় কলকল করে বলে যাচ্ছে জামাইষষ্ঠী সামনে—আপনি অনুমতি করলে দুলালকে নিয়ে যাই। কাকামশায় বাড়ি এসেছেন, তিনি পাঠালেন। সেই বিয়ের সময় সামান্য দেখেশুনো—বললেন, নিয়ে আয় জামাইয়ের সঙ্গে সকলে কয়েকটা দিন আমোদআহ্লাদ করি।

দুলালের মা উদাসকণ্ঠে বললেন, তবু ভাল। ভেবেছিলাম, ভুলেই গেছ তোমরা আমাদের।

দুলালের এক বিধবা বোন বুঁচি তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে। গাড়ুতে জল ভরে সে জলচৌকির পাশে এনে রাখল—গাড়ুর মুখে গামছা। দুলালের মা বললেন, পরের কথা পরে। জামা-জুতো খুলে হাত পা ধুয়ে জিরিয়ে নাও।

মেয়েকে ডেকে বললেন, এত বেলায় এখন আর জলখাবারের ভাবে বাসনে তোরা। দুলালের সঙ্গে পুকুরঘাট থেকে একটা ডুব দিয়ে এসে খেতে বসে যাক।

দু-জনে স্নান করতে গেল। ছোট বোনের বর বলে কালীময় 'তুমি' 'তুমি' করে বলছে. গেল-বার ফাঁকি দিয়েছ—সুরেশ গিয়েছিল ঠিক। কাকামশায় তাই বললেন, চিঠিপত্তোর কিম্বা আজেবাজে মানুষ পাঠানো নয়। তুমি নিজে চলে যাও, আমার কথা বিশেষ করে বলোগে।

দুলাল বলে, কাকামশায় কৃতী পুরুষ—তাঁর সম্বন্ধে অনেক শুনে থাকি। আমারও খুব ইচ্ছে তাঁর কাছে যাবার —

মুহূর্তকাল চুপ থেকে কিছু গম্ভীর হয়ে বলে, অনেক-কিছু আমায় নিয়ে বলাবলি হয় শুনতে পাই। আমার বলায় আছে—কাকামশায়ের কাছে যাওয়ার দরকার।

যাবার জন্যে জামাই তো পা বাড়িয়েই আছে—এত সহজে কর্মসিদ্ধি কে ভেবেছে? পুলকে ডগমগ হয়ে কালীময় বলে, কালকের জোয়ারে রওনা হওয়া যাক তবে দেরি করে কি হবে। ভাড়ার নৌকো এখানে মিলবে, না ডুমুরের বাজার অবধি যেতে হবে এই জন্য?

দুলাল হেসে বলে,আসেন নি তো এবাড়ি কখনো—এই প্রথম এলেন। তা যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছেন। যাকে বলে দেখুন না. টের পাবেন তখন।

উপস্থিত খেতে যাওয়া—কুটুম্বর জন্যে নতুন করে রান্নাবান্নার ফুরসত হয়নি। তাই কত রে! ছোটবাটিতে করে ঘি— বাড়ির সর-বাটা ঘি, পাতে খাবার জন্য। কী তার সুবাস! মাছ দু-রকম, নিরামিষ তরকারি তিন-চার পদ, ভাজাভুজি আছে। প্রকাণ্ড বাটি ভরতি ঘন-আঁটা দুধে চটের মতন সর—তার সঙ্গে আম-কাঁঠাল, বড় সাইজের কদমা। নিত্যিদিনের সাদামাটা খাওয়া এই রাত্রিবেলা ধীরেসুস্থে কুটুম্বর জন্য বিশেষ আয়োজন হবে—ব্যাপারটা আন্দাজ করতে গিয়ে কালীময়ের রোমাঞ্চ জাগল। আসা অবধি ছোঁক-ছোঁক করছে সুবাসিনী মেয়েটাকে দর্শনের জন্য। এক-আধ ঝলক হয়েছেও দেখা। খেতে বসে আর ক্ষোভ রইল না। দরদালানে দুলাল আর কালীময় পাশাপাশি বসেছে, পরিবেশন করছে সুবাসিনী—রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে ভাত-ব্যঞ্জন এনে এনে দিচ্ছে। সম্পর্কে দুলালের মাসতুতো বোন—দুলালেরই সমবয়সি, কিম্বা বড়ও হতে পারে। বর নিরুদ্দেশ, কোনও চুলোয় কেউ নেই বোধহয়—মেয়েটা এ-বাড়ির আশ্রিত। কালীময় আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বারংবার। মাজা-মাজা রং দোহারা গড়ন—আহা-মরি কিছু নয়। কিছু ঠমক দস্তুরমতো। হাতে সোনার চুড়ি, গঙ্গাযমুনা-পাড় রঙিন শাড়ি পরেন, গায়ে কাঁচুলি, সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা মালুম পাওয়া যাচ্ছে না। এদেশ সে-দেশ, ঢি-ঢি পড়েছে— এরা তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে বলে মনে হয় না। কালীময়ের সামনে তাহলে বের হতে যাবে কেন?

সে যাই হোক, খাওয়া অতি উপাদেয় হল। কালীময়ের বাড়ি ফেরবার তাড়া মরে গেছে অনেকখানি। নিজে থেকেই বলল, কালকেই ছাড়তে চাইছ না—তা বেশ, মাঝামাঝি একটা রফা হোক। আট দিন পরে জামাইষষ্ঠী—তার

মধ্যে চারটে দিন আমি এখানে থাকছি, আর তোমারও অন্তত চারটে দিন আগে গিয়ে পড়তে হবে। সুরেশরা এসে পড়বার আগে। কাকামশায় বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

বিড়-বিড় করে সঠিক তারিখের হিসাব করে নিয়ে দুলালও সায় দিল: সেই ভাল। ডুমুরের হাটবার ঐদিন। একগাদা খরচা করে নৌকো ভাড়া করার দরকার নেই—হাটুরে-নৌকোয় হাটে গিয়ে নামব, আবার আপনাদের ওদিককার একটা হাটফেরতা নৌকো ওখান থেকে ধরা যাবে। সামান্য খরচার ব্যাপার—নিয়েও যাবে বাতাসের মতন উড়িয়ে।

পরমোৎসাহে বলল, মাকে বলুনগে তাই। আমিও বলব। আপত্তি হবে না জানি। বুধবার হাটের দিন আমরা রওনা হয়ে পড়ব।

এককথায় রাজি। গেল-বছর ফটিক ফিরে গেলে বলাবলি হয়েছিল, আসবে না তো জানা কথা—কোন লজ্জায় মুখ দেখাবে? কালীময় গিয়ে যাকে এবার বলতে পারবে, এসেছে কিনা দেখ। ফটিককে দিয়ে চিঠি পাঠানোই ভুল। ডাকের চিঠিতে সুরেশ এসে থাকে, কিন্তু সকলের পক্ষে এক জিনিস চলে না—শ্বশুরবাড়ি বাবদে ঘোরতর মানী দুলালরা। আমি গিয়ে এই তো টুক করে নিয়ে চলে এলাম। জাঁক করে সে এই সমস্ত বলবে।

বিকালবেলা ভূরিপ্রমাণ জলযোগে বসে কালীময় কথাটা পাড়ল: কাকার চিঠিটা দেখলেন মাউইমা? জামাইষষ্ঠীতে দুলালের না গেলে হবে না।

বেশ তো, যাবে—

দুলালের মা একেবারে গদ্গদ। বললেন, ষষ্ঠীর পর বেশি দিন কিন্তু আটকে রেখো না বাবা। ফিরে এসেই আবাদে যাবে—আমাদের ভাতভিত্তি যেখানে। ভেড়িতে এইবারে মাটি দেবার সময়। গোমস্তায় নির্ভর হলে কাজে ফাঁকি দেবে, মাটি চুরি করবে। নিজেদের দাঁড়িয়ে থেকে করাতে হয়।

কালীময় পরমানন্দে বলে, আপনার অনুমতি পেলে বুধবার রওনা হয়ে যাব।

তাই যাবে—,

বলে ঠাকরুন চুপ করে রইলেন মুহূর্তকাল। তারপর গম্ভীর আদেশের সুরে বললেন, বউমাকে দুলালের সঙ্গে পাঠিয়ে দিও। অতি অবশ্য পাঠিও। সেবারে পেট নেমেছিল, মাথা-টাতা ধরে না যেন এবার। এখানেও ডাক্তার কবিরাজ আছে—রোগ সত্যি সত্যি হলে তার চিকিচ্ছেপত্তোর হয়। বলি, শ্বশুরবাড়ি পাঠাতেই নারাজ তো মেয়ের বিয়ে দেওয়া কেন—বীজ রাখলে হত, লাউ-কুমড়োর মাচায় একটা-দুটো যেমন রেখে দেয়।

কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে উঠে প্রচণ্ড হল: বউ বাপের-বাড়ি পড়ে থাকবে বলে

ছেলের বিয়ে দিইনি। অজুহাত করে এবারও যদি না পাঠানো হয়, দুলালের আবার বিয়ে দেবো আমি। হ্যাঁ, খোলাখুলি বলে দিচ্ছি—বেয়াই-বেয়ানদের বোলো।

নিঃশব্দে কালীময় খাওয়া শেষ করে উঠল। নিজের বোন মিনির উপরেই রাগটা বেশি করে হচ্ছে। এত মান টাঙানো কিসের জন্যে—সুবাসিনীকে দুলাল যদি বিয়েই করে বসত। করেও তো এমন কতজনা। তাদের দোনা-খড়িতেই একটি জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত কেশব রাহুতমশায়। পাঁচ-পাঁচটা বিয়ে করলেন তিনি বংশলোপ এবং পিতৃপুরুষের পিণ্ডলোপ ঘটে যায়, তাই রোধ করার জন্য। চেষ্টা বিফল—কোন বউয়ের ছেলেপুলে হল না। বড় মেজো গত হয়েছে, শেষ তিন বউ সশরীরে শান্তিতে সংসারধর্ম করছে। রাহুতমশায় পুরুষসিংহ—সতীনদের মধ্যে সামান্য চড়া গলার আওয়াজ পেয়েছেন কি ছুটে গিয়ে সামনে যেটিকে পেলেন চুলের মুঠো ধরে এলো-পাথাড়ি খড়ম-পেটা করবেন। গ্রামবাসী যখন, মিনি সুনিশ্চিত এই দৃশ্য চাক্ষুষ করেছে। ধরে নিলে তো পারে দুলালের আরও একটা বিয়ে। হয়নি সত্যি সত্যি নিতান্ত নিকট-আত্মীয় বলেই। সাক্ষাৎ মাসতুত বোন সুবাসিনী। আরও একটা কারণ, জলজ্যান্ত বর বেটা গা-ঢাকা দিয়ে আছে কোথায়, বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে দুলালের শরিকদের সহায়তায় মামলা ঠুকে দিয়ে ফ্যাসাদে ফেলবে। কাকামশায় এবারে বাড়ি আছেন—ধরে-পেড়ে মিনিকে পাঠাতেই হবে দুলালের সঙ্গে। মেয়ের দু-ফোঁটা চোখের পানি দেখে পিছিয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।

রওনা হল কালীময় আর দুলাল। হাটুরে-নৌকো দ্রুতগামী বটে কিন্তু গাঙখালের পথ কখনো ডাঙার মানুষের সম্পূর্ণ এক্তিয়ারে থাকে না, সময়ের আগ-পাছ হবেই। ডুমুরের হাট জমে গেছে পুরোপুরি। বিশাল হাট, এ-দিগরের মধ্যে সকলের বড়, দূর দূর অঞ্চলের মানুষ এসে জমে। সমুদ্র বলতে যা বুঝি, একেবারে তাই—মানুষের সমুদ্র।

ঘাটে লাগতেই দুলাল টুক করে সকলের আগে নেমে পড়ে। তড়বড় করে কালীময়কে বলে, আপনাদের কানাইডাঙা ঘাটের নৌকো ঐ বটতলার দিকে বাঁধে। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাখুনগে মেজদা। হাটখাট সারা করে তবে তো ছাড়বে, তার মধ্যে আমি একটু কাজ সেরে আসছি। বটতলার ঘাটেই চলে যাব।

বলে চক্ষের পলকে মানুষের ভিতর মিশে গেল। চেনা নৌকো পাওয়া

গেল—কামাইডাঙার হাটুরে তারা। কথাবার্তা সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে কালীময় হাটের মধ্যে ঘোরাঘুরি করল খানিক। জামাই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে—ফুর্তি খানেক বড় কইমাছ কিনে নতুন ভাঁড়ে জীইয়ে নিল। তারপর সহরখানেক রাস্ত হতে চলল। ভাঙা হাট, মানুষজন পাতলা হয়ে গেছে, দুলালের কোন পাত্তা নেই।

মাছের ভাঁড় নৌকোয় রেখে কালীময় ঘুরে দেখে এলো। দুলালের টিকি দেখা যায় না। বিষম মুশকিল। নৌকো তাড়া দিচ্ছে: আসবেন তো উঠে পড়ুন। গোন নষ্ট করতে পারব না, আমরা চলে যাচ্ছি।

যাও তোমরা, কতক্ষণ আর আটকাব।

ভাঁড় হাতে ঝুলিয়ে সারা হাট সে চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। যাদের নৌকোয় গোঁসাইগঞ্জ থেকে এসেছিল, তাদের একটির সঙ্গে দৈবাৎ দেখা: দুলালবাবু? তিনি তো কখন রওনা হয়ে গেছেন। জলযার নৌকো যাচ্ছিল, তাতেই উঠে পড়লেন। বলে যান নি আপনাকে?

নাও, হয়ে গেল বাড়িতে জামাই হাজির করে দিয়ে বাহাদুরি নেওয়া! কী সাংঘাতিক শয়তান—তাকে ঝিঙে তো বলবে পটোল। মতলব গোড়া থেকেই—হাটবার বুঝে আটঘাট বেঁধে তবে রওনা দিয়েছে। সুন্দরবনের ধার ঘেঁসে দুলালদের আবাদ, গাঙ-খাল পাড়ি দিয়ে অনেক কসরত করে পৌঁছুতে হয়। জলযা আবাদ অঞ্চলের মধ্যে এক গঞ্জ মতো জায়গা—কালীময়ের জানা আছে। আবাদে সত্যি সত্যি গেছে, তাতেও ঘোরতর সন্দেহ। মাঝে কোথাও নেমে পড়েছে হয়তো।

হাটুরে-নৌকো ধরা গেল না। খানিকটা পায়ে হেঁটে আর খানিকটা জেলে-ডিঙিতে বিস্তর মেহনতে কালীময় বাড়ি ফিরল।

দেবনাথ সমস্ত শুনলেন। চুপ, চুপ! গোঁসাইগঞ্জে জামাই আনতে গিয়েছিলে—তিনজনে আমরা যা জানলাম, অন্য কারো কানে না যায়। ফরেস্টার অমূল্য দাসের বাড়ির গল্প করো তুমি এখন, দেখা হয়েছে কি হয়নি যেমনটা ইচ্ছে বানিয়ে বলো।

কুসুমপুরের কুটুম্বরা কিন্তু বড় ভালো. সুরেশের বাপ পরেশনাথ রায়ের অতি-মরাজ মন। ভবনাথ গোড়ায় বেয়াইকে একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অমনি জবাব এসে গেল:

চাকরির জন্য বেশি আগে যাওয়া শ্রীমানের পক্ষে সম্ভব হইবে না। জামাইষষ্ঠীর আগের দিন দুপুর নাগাদ আপনার মেয়ে-জামাই রওনা

করিয়া দিব, সাব্যস্ত করিলাম। তাহারা সন্ধ্যার পূর্বেই পৌঁছিয়া যাইবে। ছেলে যা, জামাইও তাই—আমি এইরূপ বিবেচনা করি। উঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য ঘটা করিয়া কাহাকেও পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। নাগরজোলে কেবলমাত্র একখানা গরুর-গাড়ির ব্যবস্থা রাখিবেন। শ্রীমান একলা হইলে ঐ পথটুকু সে হাঁটিয়া যাইত। বধূমাতা সঙ্গে থাকিবেন বলিয়াই গাড়ির আবশ্যক……

রাজীবপুর পোস্টাপিসের এলাকার মধ্যে এই গ্রাম, সপ্তাহের মধ্যে দুটো হাটবারে পিওন এসে চিঠি বিলি করে যান। চিঠির বয়ান ভবনাথ ডেকে ডেকে সকলকে শোনাচ্ছেন : ভদ্দরলোক ছোটলোক গায়ে লেখা থাকে না. ভদ্দোর কারে কয় দেখ—

দেবনাথ অগ্রজকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন, চিঠি নিয়ে হৈ-চৈ করা ঠিক হচ্ছে না দাদা।

কেন করব না। পাশাপাশি আর এক কুটুম্বর ব্যাভারটা দেখ মিলিয়ে। ডাকের চিঠি নয়, ফটিকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছিলাম—মা মাগি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্যাট-ক্যাট করে একগাদা কথা শুনিয়ে দিল। আমার নামও করিনে আর সেই থেকে। যত গোলমাল, বুঝলে, সমস্তর মূলে ঐ মাগি। ঝাঁটা মেরে বোনঝিটাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিক, সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়ে যাবে।

দেবনাথ বলেন, নিমির কথাটা ভাবো দাদা। সুরেশকে নিয়ে সকলে আমোদ-আহ্লাদ করবে, নিমিও করবে—কিন্তু মনের মধ্যে তখন কি রকমটা হবে তার। আমার তাই একবার মনে হয়েছিল, জামাই দু-জনকে যখন পাচ্ছিনে কোনো জামাই এনে কাজ নেই। জামাইয়ের তত্ত্ব লোক মারফত পাঠিয়ে দেবো।

ভবনাথ চমক খেয়ে বললেন, সে কি কথা। জামাইষষ্ঠিতে জামাই ডাকব না—বলি, সুরেশের কি দোষটা হল?

দেবনাথ বললেন, দোষগুণ এখন ভেবে ফল নেই। হাতের ঢিল ছুঁড়েই তো দিয়েছ, চিঠির জবাব পর্যন্ত এসে গেছে। কিন্তু নতুন-জামাই নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না দাদা, নিমি ব্যথা পাবে।

গরুর-গাড়ি নয়। বাড়ির মানুষ দেবনাথের জন্যে পালকি গিয়েছিল—জামাই-মেয়ের জন্যেও অতএব নিশ্চিত পালকি।

পালকি একজোড়া। সর্দার-বেহারা কেষ্ট ঘরের লোকের মতন। বাহিন্দার শিবুবরও সঙ্গে যাচ্ছে। দুই পালকির বাবদে বারোটি বেহারার দরকার – বৃষ্টি হয়ে ক্ষেতে বড় গোল, লাঙল ছেড়ে কেউ এখন সোয়ারি বইতে চায় না। কেষ্ট এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে ধরাধরি করে কোন গতিকে দশটি জোগাড় করেছে, তারাও

এক জায়গায় হয়ে পালকি যাতে তুলতে, বেশ খানিকটা দেরি করে ফেলল। হরিহরের পুলের উপর এসেছে, সেই সময় পাকারাস্তার মোটরের আওয়াজ। এখনো অন্তত আধক্রোশ পথ। নাঃ, কলকব্জার সঙ্গে পারা কঠিন—ওদের হল ঘড়ি-ধরা কাজ, কেও বেহারা ঘড়ি পাবে কোথায়?

শিতবর প্রবোধ দিল: দেরি তা কি করা যাবে। নেমে পড়ে বসে থাকবে ওখানে। বটতলা, পুকুরঘাটে বাঁধানো-চাতাল—আরামে গড়াতেও পারে। আমরা গিয়ে পালকিতে তুলে নিয়ে আসব।

গিয়ে দেখা গেল, কাকস্য পরিবেদনা। জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে তখনো—কোন দিকে জনমানব নেই। 'বুড়ি-দিদি' 'বুড়ি-দিদি' করে শিতবর চঞ্চলাকে ডাকল। ঘোরাঘুরি করে দেখল চারিদিক। বলে, আসেনি—এলে ঠিক নেমে পড়ত, মোটরের লোককে বললে তারাই নামিয়ে দিত। বারোটার মোটর ধরতে পারেনি। খাওয়াদাওয়া সেরে দেড়ক্রোশ পথ ঠেঙিয়ে বারোটার মধ্যে গাড়ি ধরা চাট্টিখানি কথা। পরের গাড়িতে আসছে তারা।

পাকারাস্তার পাশে সারি সারি পালকি দুটো রেখে সকলে বটতলায় বসল। পরের বাসে যখন আসবে, পালকি দেখে জায়গা চিনে নেমে পড়বে। পুকুরঘাটে নেমে আঁজলা ভরে জল খেয়ে এলো ক'জন, মুখে মাথায় থাবড়ে দিল। কান পেতে আছে, মোটর ইঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া যায় কখন।

পাওয়া যাচ্ছে আওয়াজ। সব ক'জন উঠে পালকির ধারে পাকারাস্তার উপর দাঁড়াল। হাঁ, ঐ ওয়াজই যেন। কিন্তু বিস্তর ক্ষণ হয়ে গেল, কাছাকাছি আসে কই গাড়ি? অবশেষে মালুম হল, উত্তরের মাঠের শেষে তালবন—বাতাসে বাগড়ো নড়ে আওয়াজ উঠছে। যা চলে।

এর পর এলো সত্যি সত্যি মোটরের আওয়াজ—এলো উল্টো দিক থেকে। বাস একটা নাগরগোপ অতিক্রম করে সদরের দিকে ছুটে বেরুল। বেলা ডুবু ডুবু। শ্যামকুড়ের হাট, রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে—ধামা ঝুড়ি বাঁকে ও মাথায়, তেলের বোতল হাতে ঝোলানো, হাটুরে মানুষ যাচ্ছে। নিদারুণ রকমের কাঠাল বোঝাই দুটো গরুর-গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ করতে করতে চলে গেল। বসেই আছে এরা।

বসে বসে বেহারারা বেজার হয়ে উঠেছে। বলে, সন্ধ্যের আগে সোয়ারি বাড়ি পৌঁছে যাবে, কথা ছিল। আমরা কিন্তু রাত করতে পারব না। গোনের মুখে একবেলা আজ কামাই গেল, রাত থাকতে লাঙল জুড়ে খানিক তার পুষিয়ে নিতে হবে।

মোটরবাস আসে এবার সত্যি সত্যি—শহরের দিক থেকেই আসে। কিন্তু

থামার গতিক নয়। শিশুবর চেঁচাচ্ছে : এই যে, সোনাখড়ি থেকে আমরা পালকি নিয়ে আছি। নেমে পড়ুন জামাইবাবু। বাসও বেগ কমালে, কিন্তু কোন প্যাসেঞ্জারের নামবার গতিক নয়। বাস বেরিয়ে গেল।

তবে? ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়। আকাশে মেঘ, মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠেছে। বৃষ্টি হতে পারে আকাশের যা চেহারা। কড়ও। বিকালে এসে পৌঁছানোর কথা—কোন কারণে যাত্রা ভণ্ডুল হয়ে গেছে। অথবা এসে গেছে সেই গোড়ার বাসেই—কাউকে না দেখতে পেয়ে মেয়েলোক নিয়ে পথের মধ্যে নামেনি, পথের শেষ গঞ্জ অবধি চলে গেছে। সেখান থেকে পালকি গরুর-গাড়ি যা-হোক কিছু নিয়ে এতক্ষণে তারা বাড়ি গিয়ে উঠেছে।

পঞ্চমীর জ্যোৎস্না ডুবে গেল। ক'টা শিয়াল হোক-হোক করে এদিক-সেদিক বেড়াচ্ছে। কেহ বেহারার দল আর রাখা যায় না : সারা রাত্তির হা-পিত্যেশ বসে থাকব নাকি? উঠলাম আমরা—

পালকি-বেহারা ফিরে গেল। শিশুবর হেস্তনেস্ত না দেখে যাচ্ছে না। বেহারাদের পিছন পিছন অদূরের গাঁয়ের দিকে চলল সে। বাগপাড়ায় এককড়ির বাড়ি গেল : গাড়ি আছে তোমার এককড়ি, গরুও আছে। ছই-টই বাঁধতে হবে না রাত্তিরবেলা। আসে যদি তো টুক করে তাদের সোনাখড়ি নামিয়ে দিয়ে আসবে। এই বলা রইল কিন্তু। রাত্তিরবেলা পড়ে-পাওয়া এই টাকাটা ছাড়তে যাবে কেন? আর যদি না আসে, খাওয়াদাওয়া-রাত অবধি দেখে তোমার ঐ দাওয়ায় এসে শুয়ে পড়ব।

আবার এসে শিশুবর রাস্তার ধারে মাঠের চাতালে বসেছে। একেবারে একলা। এবারের আওয়াজে সত্যিই ভুল নেই—উত্তর দিক থেকেই। পাকারাস্তায় এসে শিশুবর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চৌমাটোলার বাঁক ঘুরে হেডলাইটের আলো দেখা দিল। আলো বড় হচ্ছে ক্রমশ। বাস এসে দাঁড়াল। ইঞ্জিনের চাপা গর্জন, থরথর কাঁপছে সামনেটা।

নামল সুরেশ। চঞ্চলা নামল দেখেশুনে সতর্কভাবে। ছাতের উপর থেকে টিনের পোর্টম্যান্টোটা নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল। এই একটুক্ষণ কিছু আলো হয়েছিল, আবার অন্ধকার। তিন ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

শিশুবর বলল, রাত করে ফেলেছ জামাইবাবু। দু-দুখানা পালকি—দেখে দেখে তারা ফিরে গেল। জেদ ধরে আমিই কেবল বসে রইলাম।

ঝিরিয়ে আসছিল বাস বেলাবেলি নির্ঘাৎ পৌঁছে যেত—সতীঘাটের কাছাকাছি এসে ইঞ্জিন বিগড়াল। ড্রাইভার নিজে হেস্তনেস্ত দেখে তারপর একটা সাইকেল জোগাড় করে সদরে ছুটল। একগাদা প্যাসেঞ্জার নিয়ে গাড়ি সেই-

খাবে পড়ে রথল। সহর থেকে মিস্ত্রি জুটিয়ে নিয়ে এবং কিছু সরঞ্জাম কিনে ড্রাইভার ফেরত এলো, সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে তখন। আলো ধরে ঘণ্টা দুই-তিন ঠুকঠাক করার পর তবে গাড়ি চালু হয়েছে।

বিষম ক্লান্ত তারা। গামছার বাড়ি দিয়ে চাতালটা ঝেড়েঝুড়ে শিবুধর বলল, বসো এখানে। দাসপাড়া থেকে একছুটে গাড়ি ডেকে আনি। বলা রয়েছে, দেরি হবে না।

সুরেশ বসে পড়ল, একগলা ঘোমটা টেনে চঞ্চলা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তা ঠিক, বসবে কেমন করে বরের কাছাকাছি?

চুড়ি নেড়ে শিবুধরকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে চঞ্চলা বলল, যেও না শিবুদা। দাঁড়িয়ে পড়ল শিবুধর। ভয় পেয়ে গেছে মেয়েটা। কৌতুক লাগে। বুড়ির প্রতাপে বাড়ি চৌচির—সেই বুড়ির ও-বছর মাত্র বিয়ে হয়ে এখন সে আলাদা একজন। জবুথবু হয়ে আলগোছে দাঁড়িয়েছ কেমন, দেখ। এমন আস্তে করে বলছে, কথা শোনা যায় কি না-যায়—

প্রবোধ দিয়ে শিবুধর বলে, ভয় কিসের? মাঠখানা ছেড়েই দাসপাড়া। গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে গরু জুড়ে বেরিয়ে আসবে। বোসো না তুমি—না-হয় ও-পাশের ঐ চাতালে গিয়ে বোসোগে।

চঞ্চলা বলে, আমরাও যাই না কেন শিবু-দা। পথ তো ঐ—আবার উল্টো কেন গাড়ি এই অবধি আসতে যাবে?

অতএব, পোর্টম্যান্টো মাথায় শিবুধর আগে আগে চলল, পিছনে অন্য দু-জন। খুক করে একটুকু হাসি—ধরনটা চঞ্চলার মতন। মাথায় বোঝা নিয়ে শিবুধর ঘাড় ঘোরাতে পারছে না। তা হলেও চঞ্চলা কদাপি নয়—ঘোমটা-ঢাকা বউমানুষ খামোকা অমন বেহায়ার হাসি হাসতে যাবে কেন?

আরও রাত হল। গরুর-গাড়ি চলেছে। কিন্তু ওরা কেউ উঠল না, পোর্টম্যান্টো তুলে দিয়েছে শুধু। বাসের মধ্যে অতক্ষণ বসে পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে, খানিকটা হেঁটে পা ছাড়িয়ে নিচ্ছে তাই। গাড়ির আগায় এককড়ি তা-তা-তা-তা করে খুব একচোট গরু তাড়িয়ে নিল। হেরিকেন এনেছে শিবুধর, হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে গাড়োয়ানের পাশাপাশি যাচ্ছে। নিচু গলায় গল্প করছে দু-জনে। হঠাৎ খেয়াল হল, বড্ড ওরা পিছিয়ে পড়েছে। হেঁটে আর পারছে না বেচারিরা—অভ্যাস নেই তো তেমন।

শিবুধর ডাক দিল: কি হল, অত পেছনে কেন বুড়ি দিদি? হাঁটা অনেক হয়েছে, গাড়িতে উঠে পড়ো এবার।

আমলেই আনল না তারা, কে যেন অন্য কাকে বলছে। অন্ধকারের মধ্যে

বেশ খানিকটা দূরে দুই ছায়ামূর্তি। উঁচু-নিচু কাঁচারাস্তা—খানাখন্দ এদিক-সেদিক। হাতে আলো, তা সত্ত্বেও শিশুবর একটা বিষম হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁক দেয়: এগিয়ে এসো, আলোয় এসো। পড়েটড়ে যাও যদি, বুঝবে মজা তখন।

জোর বাড়িয়ে আলো তুলে ধরল তাদের দিকে। হরি, হরি! অন্ধকার বলে কাপড়টুকুও আর মাথায় নেই। ভয়ে তখন যে কথা সরছিল না মেয়ের, লজ্জায় একেবারে কলাবউটি হয়ে ছিল! দেখাদেখি গরুর-গাড়িও থেমে পড়েছে। উল্টে ধমক দেয় চঞ্চলা: আবার দাঁড়িয়ে পড়লে কেন, রাত হচ্ছে না?

শিশুবর বলে সারাপথ হাঁটবে তো গাড়ি নিতে গেলাম কেন? উঠে পড়ো। হেঁটে যাচ্ছ বলে ভাড়া কিছু কম নেবে না।

সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলা একেবারে ধোয়া-তুলসিপাতা: বলো তোমাদের জামাইকে। একরোখা কী রকম দেখছ না। গর্তে পা মচকে গেলে 'জামাই খোঁড়া' লোকে বলবে।

হেঁটে আর পারছেও না বোধহয়। গাড়িতে উঠল, চঞ্চলার মাথায় ঘোমটা উঠল অমনি। আলগোছে একটু তফাত হয়ে বসেছে। ঠোঁটে কুলুপ এঁটেছে—দু-জনেই। নিতান্ত প্রয়োজনে চঞ্চলা হাত নেড়ে শিশুবরকে ডেকে যা বলবার তাকেই চুপি চুপি বলছে। হরিতলা ছাড়াল। গ্রাম নিশুতি। বাইরে-বাড়ির হুড়কো খুলে গাড়ি একেবারে রোয়াকের পাশে এনে নামাল। খাওয়া-দাওয়া সেরে এ-বাড়িতেও সব শুয়ে পড়েছে। ভবনাথের বড় সজাগ ঘুম, গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ঘুমের মধ্যে হাঁক পাড়লেন: কে ওখানে—কে? এসে গেছ? ওঠো তোমরা সব, আলো আলো। সুরেশরা এসেছে।

দরজা খুলে তাড়াতাড়ি রোয়াকে বেরিয়ে এলেন: এত রাত্তির কেন বাবা?

সুরেশ তাড়াতাড়ি প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিল। পদতলে রুপোর টাকা চকচক করছে। টাকা দিয়ে প্রণাম করছে গুরুজনদের।

॥ দশ ॥

বিকাল থেকে পথ তাকিয়েছে, নিরাশ হয়ে সব শুয়ে পড়েছিল। ঘুম-টুম গেল সকলের চোখ থেকে। ঐটুকু কমল, সে পর্যন্ত শয্যা ছেড়ে বাইরে এসেছে। লহমার মধ্যে বাড়ি জমজমাট।

দুধ থেকে ক্ষীর বানিয়ে জামাইয়ের জন্য রকমারি খাবার হচ্ছে আজ ক'দিন। এ ব্যাপারে মুক্তঠাকরুনের জুড়ি নেই—উপলক্ষ্য পেলেই লেগে যান। এক-একটা আছে—রীতিমত শিল্পকর্ম, এ কালের অনেক মেয়ে চোখে দেখেনি, নামও জানে না। সাগরেদি কর্মে অলকা-বউয়ের বড় উৎসাহ। বলে, ক্ষীরপদ্ম হোক পিসিমা, পাপড়ি বসানোর কায়দাটা শিখে নেবো ভাল করে, কিছুতে আমার হতে চায় না।

মুক্তঠাকরুন খুশি খুব। বলেন, খাটনির কাজ বউমা, ঠাণ্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে করতে হয়। চেষ্টা করলে কেন হবে না? রেকাবির উপর শতদল-পদ্ম ফুটে আছে—ঠিক যেমনি মনে হবে। শিখে নাও সমস্ত তোমরা, আমি তো চিরকাল বেঁচে থেকে এ সমস্ত করে খাওয়াবো না। আজকের লোকে সোজা-পথ দেখেছে—ময়রার দোকানে পয়সা ফেলে সন্দেশ-রসগোল্লা খাজা-গজা কিনে আনে। সে তো নিজেরাও খেয়ে থাকে। জামাইকে এমনি জিনিস খাওয়াবো, যা অন্য কেউ খাওয়াতে পারবে না।

তিন-চার দিন ধরে খাবার তৈরি হয়েছে—হাঁড়ির উপর হাঁড়ি রেখে শিকায় ঝুলানো। অলকা-বউ পাড়তে যাচ্ছিল, মুক্তকেশী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। এসব জিনিস শুধু, কেবল খাওয়ার নয়—পাতের কোলে থরে থরে সাজিয়ে দেবে, ভোক্তা এবং আরও দশজনে অবাক হয়ে দেখবে। নিশিরাত্রে কে এখন দেখতে আসছে?

বললেন, ক্ষেপেছ বউমা। তাড়াতাড়ি দু'খানা লুচি ভেজে খাইয়ে দাও ওদের—পথের ধকলে আধখানা হয়ে এসেছে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুক। আদর-আপ্যায়ন যাচ্ছে কোথা, কাল থেকে কোরো।

এক গেলাস জল চাইল জামাই। খেজুর-চিনি এক খাবলা জলে ফেলে কাগজিলেবুর রস দিয়ে মিনি ছুটোছুটি করে এনে দিল। বিয়ের পরে সুরেশ আরও দুবার এসেছে—নানান রকম অভিজ্ঞতা আছে। গেলাস সে মুখে তোলে না, নেড়েচেড়ে দেখছে।

কী হল, খাচ্ছেন না যে?

সুরেশ বলে, সরবত নয়—এমনি জল একটু এনে দিন।

উমাসুন্দরীর কোন দিক দিয়ে আবির্ভাব। মিনির হাত থেকে গেলাস কেড়ে নিয়ে রোয়াকের নিচে ঢেলে দিলেন। বললেন, আমি এনে দিচ্ছি বাবা।

মিনি বলে, কষ্ট করে করলাম—ফেলে দিলে কেন মা?

মুখ ফিরিয়ে উমাসুন্দরী হাসতে হাসতে বললেন, তোদের বিশ্বাস করছে না, চিনিপানা আমি নিজের হাতে করে দিচ্ছি।

দক্ষিণের ঘর, পাকা দেওয়ালের মস্তবড় ঘর—তারই খাওয়ার ঠাঁই করল। কাঁঠাল-কাঠের কয়খানেলি বড় পিঁড়ি পড়েছে, তার উপরে নিমির নিজ হাতে রকমারি নকশা-তোলা উলের আসন। চাপবাক্স থেকে প্রকাণ্ড থালাখানা বের করে তেঁতুলে-আমরুলে ঘসে ঘসে চকচকে করে রেখেছে এবং ডজন খানেক বাটি—ছোট ঘিয়ের-বাটি থেকে বিশাল দুধের-বাটি। মাছ-তরকারি সবই রান্না করা আছে, ক'খানা লুচি শুধু ভেজে দেওয়া। তরঙ্গিণী ও অলকা শাশুড়ি-বউ ওঁরা লেগে গেছেন সেই কর্মে। লুচি বেলা শেষ করে দিয়ে অলকা-বউ বাইরে চলে এলো দেওয়া-থোওয়ার ব্যবস্থা দেখতে। বিনো আর নিমির মধ্যে কি নিয়ে চোখ-টেপাটেপি—বিনো পুঁটিকে সামাল করে দিচ্ছে: যে ক'দিন জামাই আছে, আমাদের কোন কথা বুড়িকেও বলবিনে তুই। এখন সে ভিন্ন দলের—ওদেরই লোক।

অলকা-বউ বলে, বুড়ি ঠাকুরঝিকে দেখছিনে তো মোটে—

নিমি বলল, আহ্লাদি মেয়ে আসা ইস্তক কাকামশায়ের কাছে বসে ভিটির-ভিটির করছে। হাত-পা ধোওয়ার ফুরসতটুকুও নেই।

সুরেশ বাইরের ঘরে ভবনাথের সঙ্গে। থালা-বাটি সাজিয়ে অলকা-বউ পুঁটিকে ডাকতে পাঠাল। বিনো দলী বলে দিল, একটুও হাসবি নে কিন্তু পুঁটি। খবরদার।

সুরেশের হাতে হাত জড়িয়ে পুঁটি বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলো। বয়সে এক-ফোঁটা, কিন্তু পরিপক্ক মেয়ে। যেমন বলে দিয়েছে, ঠিক ঠিক তাই—মুখে হাসির লেশমাত্র নেই নিপাট ভালোমানুষটি।

পুঁটি বলল, বসুন দাদাবাবু—

পিঁড়িতে পা দিয়েছে সুরেশ, পিড়ি অমনি গড়গড় করে চলল। আছাড় খেতে খেতে কোন গতিকে সামলে নিল। 'কোথা যাও' 'পালিয়ে যাচ্ছ কোথা' বলছে ওরা, আর হি-হি হা-হা হাসিতে ফেটে পড়ছে সব। বেকুব জামাই পা দিয়ে পিড়ি-ঢাকা আসনটা সরিয়ে দিয়ে দেখে পিড়ির নিচে সুপারি দিয়ে রেখেছে। একেবারে বসবার পিড়ি থেকেই কারসাজি—আরও কত দিকে কী সব কাণ্ড করে রেখেছে, ঠিক কি! অলকা-বউ সদ্য-ভাজা ক'খানা লুচি থালায় এনে দিল, তারই আধখানা ছিড়ে সুরেশ আনমনে দাঁতে কাটছে। খিদের পেট চোঁ-চোঁ করছে, কিন্তু এগুতে ভরসায় কুলোচ্ছে না তার।

গিরস্ত জাগো—চৌকিদার সেঁদে বেরিয়ে হাঁক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে। বুড়ো-কর্তা স্বগত-ভাবেই জবাব দিলেন: ঘুমিয়েছি কে, যে জাগতে বলিস?

দেবনাথ ও চঞ্চলার কাছে তিনিও গিয়ে বসেছিলেন। খাওয়ার জন্য চঞ্চল

এবার রান্নাঘরে ঢুকল। মুক্তঠাকরুন সুরেশের কাছে এসে অবাক হয়ে বললেন, খাচ্ছ না যে বাবা, সামনে বসে শুধু নাড়াচাড়া করছ ?

শালাজ ও শ্যালিকার দখল দেখে ব্যাপার বুঝতে বাকি রইল না। বললেন, দুপুর রাত হয়ে গেছে, এখন আর ঢিক করিস নে। যা-হোক কিছু মুখে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে দে তোরা। ঠাট্টা-বটকেরার সময় আছে।

আসনটা টেনে নিয়ে সামনের উপর জাপটে বসলেন: খাও বাবা, নির্ভাবনায় খেয়ে যাও, শেষ না হলে আমি উঠছি নে।

সেই মহূর্তে এক কাণ্ড। মুড়িঘণ্ট, মাছের তরকারি—দু'হাতে দুটো বাটি অলকা-বউ চিলের মতন ছোঁ মেরে পাতের কোল থেকে তুলে নিল। ঠাকরুন বলছেন, দেখি দেখি, কী করেছিলি তোরা—দেখিয়ে যা। অমন জাঁদরেল মুক্তকেশীর-তা মোটে কানেই নিল না তাঁর কথা, একছুটে রান্নাঘরে ঢুকে গেল ক্ষণপরে আর দুটো বাটি এনে হাসতে হাসতে থালার পাশে রাখল।

মাঝের-কোঠায় শোওয়া। কুলুঙ্গিতে কাঠের দেলকোর উপর রেড়ির-তেলের প্রদীপ। সুরেশ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে, চঞ্চলার দেখা নেই। বাপ সোহাগি মেয়ে খাওয়ার পরে আবার হয়তো বাপের কাছে গিয়ে বসেছে। ক্লান্তিতে সত্যি একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, খুট করে কপাট নড়তে সজাগ হল প্রদীপ আছে, তা সত্ত্বেও হেরিকেন ধরে অলকা-বউ সঙ্গে করে আনল— একজনে হয় নি, বিনোও সঙ্গে। সামান্য কিছুকাল শ্বশুরঘর করে চঞ্চলা যেন ঘরে আসার পথ ভুলে মেরে দিয়েছে—একজনে হল না, দু-পাশে দু-জন লাগছে পথ দেখানোর জন্য। টিপে টিপে পা ফেলছে—ব্যথা লাগে যেন মাটির গায়ে পা পড়লে।

তক্তাপোশের দিকে অলকা হেরিকেন তুলে ধরল: কই গো, শব্দসাড়া নেই কেন ভাই, ঘুমিয়ে গেলে নাকি?

ঘুমটুকু উড়ে গেছে, তবু সুরেশ চোখ খোলে না। অবহেলা দেখাতে হয়— গ্রাহ্য করিনে আপনাদের মেয়ে এলো কি এলো-না। দেখুন, কেমন ঘুমিয়ে আছে। ভাবখানা এই প্রকার।

বিনো বলে, তাড়াতাড়ি চাট্টি নাকে-মুখে গুজে বেরিয়েছে। পথে এই রাত্তির অবধি। কষ্টটা কম হয় নি তো।

বিনোর কথায় মধ্যে দরদ, কিন্তু অলকা-বউ একেবারে উড়িয়ে দেয়: ঘুম-টুম নয়—ঠাকুরজামাই মান করেছেন দেরি হয়েছে বলে। আমাদের কি। ঘুম হোক রাগ হোক, বুড়ি ঠাকুরঝি বুঝবে। আমরা তো আর দেরি করিয়ে দিই নি।

কুলুঙ্গির প্রদীপ নিভিয়ে হেরিকেনটা এক পাশে রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দু'জনে চলে গেল।

হেরিকেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চঞ্চলা অন্ধিসন্ধি দেখছে। তক্তাপোশের তলা দেখল, আলমারির পিছনটা। আলনার কাপড়চোপড় নেড়ে দেখল কাছে গিয়ে। বিয়ের পরেই জোড়ে এসে পরলা রাত্রে ঘোর বিপাকে পড়েছিল তারা। পুঁটির দলের বেউলো কাপড়ের আস্তিনের মধ্যে ঐখানটা চুপটি করে বসে ছিল, আরও একগণ্ডা ছিল তক্তাপোশের নিচে। চঞ্চল অত শত বুঝত না তখন, আলো নিভিয়ে সরল মনে শুয়ে পড়েছে। তাবাদা করে কি-একটা বলে ডেকেছে বরকে—মুখের কথা মুখে থাকতে আঁধার ঘরের চতুর্দিকে খল-খল করে হাসির ধ্বনি। ভুতুড়ে ব্যাপারের মতন গা কেঁপে উঠেছিল গোড়ায়। হাসতে হাসতে দড়াম করে দোর খুলে হুড়দাড় মেয়েগুলো বেরিয়ে গেল। কেলেঙ্কারির বেহদ্দ—জেঠামশায় ভবনাথ অবধি জেনে গেলেন। রাত্রেই শেষ হয়ে গেল না. জের চলল পরের দিন—তার পরের দিন। সেই যা ফিসফিস করে বরকে বলেছিল, চঞ্চলাকে দেখলেই বিচ্ছু মেয়েগুলো তাই বলে নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি করে। কত রকম ঘুস দিয়েছে—তরল আলতা, পুঁথির মালা পুতুলের জন্য, চুলের ফিতে, তাম্বুল-বিহার। ঘুস দিয়ে তবে মুখ বন্ধ করতে হল। এবারে তাই এত সাবধান। ঘরের মধ্যে কেউ নেই, নিঃসংশয় হয়েছে। রাত বেশি হয়ে গেছে বলেই কথা দিল বোধহয় আজ।

জলের বালতি ও ঘটি রোয়াকের ধারে। চঞ্চলা রগড়ে রগড়ে পা ধুয়ে দরজা দিল। সুরেশ এইবারে চোখ খুলেছে, চোখ পিটপিট করে দেখছে। জানলা বন্ধ করল চঞ্চলা। হেরিকেনের জোর কমিয়ে তক্তাপোশের নিচে সরিয়ে দিল। পায়ের গুজরি ঝুন-ঝুন করে বাজে—খুলে সেটা কুলুঙ্গিতে রাখল, গলার হার ও বাহুর অনন্ত বালিশের নিচে। হাতের চুড়ি-বালা ঠেলে ঠেলে কনুই অবধি তুলে দিল। তক্তাপোশে উঠল সে এইবার, বরের পাশে শুয়ে পড়ল। বিড়ালের চলাচলের মতন—এতটুকু আওয়াজ নেই।

সুরেশ ফিসফিসিয়ে বলল, দরজায় খিল দিলে না যে?

মুখে না বলে চঞ্চল হাত চাপা দিল সুরেশের মুখে। অর্থাৎ ফিসফিসানিও নয় এখন।

জ্যৈষ্ঠমাসের গরম, তার চারিদিক আটেঘাটে বন্ধ করে ফেলেছে। চঞ্চলা পাখা করছিল, খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ পাখা বন্ধ। নড়ে উঠেছিল সুরেশ, কানের উপর মুখ এনে বলল, চুপ! তারপর উঠে পড়ল নিঃসাড়ে, পা টিপে টিপে গিয়ে দরজা খুলল। রহস্যময় চালচলন, সুরেশও যাবে কিনা বুঝতে পারছে না। খাড়ি ওদের—সঙ্গে যাবার হলে চঞ্চলা উঠবার মুখে হাতখানা টেনে ইশারায় বলত।

এই সমস্ত ভাবছে সুরেশ, হেনকালে হুড়াস করে জল পড়ার শব্দ বাইরে। চঞ্চলার-গলা শোনা গেল : আরে সর্বনাশ. পিসিমা নাকি ? জানলার গোড়ায় পিসিমা দাঁড়িয়ে—কেমন করে বুঝব ? গরমে ঘুম হচ্ছে না বলে মাথায় জল থাবড়াতে এসেছিলাম। মানুষ দেখে ভাবলাম, চোর এসেছে। এঃ পিসিমা, রাতদুপুরে নাইয়ে দিলাম—কেমন করে জানব বলো।

ঘরের ভিতর ফিরে এসে খটাখট জানলা খুলে দেয়। রণ জয় করে এসেছে ভাবখানা এই রকম। সুরেশকে বলছে—ফিসফিসানির গরজ নেই আর এখন—। কিন্তু বলবে কি, হেসেই তো খুন। বলে, পিসিমাই নাস্তানাবুদ—কেউ আর এদিকে আসবে না, নিশ্চিন্ত। কান খাড়া ছিল—বুঝতে পারলাম, জানলার ওদিকে মানুষ। দুয়োরে কেন খিল দিই নি, বোঝ এইবারে—খিল খুলতে আওয়াজ হত। ঘটিতে জল পর্যন্ত ভরে রেখেছিলাম। মানুষ আসবেই জানি, তা সেই মানুষ যে হি-হি-হি—পিসিমা দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন, লোকে চোখে দেখেও তো বিশ্বাস করবে না। ছুঁড়িগুলোকে তাড়াতে এসেছিলেন নাকি। তাই নিশ্চয়। ছুঁড়িদের তাড়িয়ে দিয়ে বুড়োমানুষ নিজে শেষটা লোভে পড়ে গেলেন।

মুখে কাপড় দিয়ে চঞ্চলা খুব খানিকটা হেসে নিল। বলে, বিয়ের দিন পুঁটিকে দিয়ে একটা মাছভাজা আনিয়ে খাচ্ছিলাম। মুখ নড়ছে দেখে পিসিমা ধরে ফেললেন। হাঁ করিয়ে সবটুকু মাছ বের করে ফেলে তবে ছাড়লেন। কাজের বাড়ি মানুষ গিজ গিজ করছে—সকলের মধ্যে কী বকুনি-টাই দিলেন উপোসের নিয়ম ভেঙেছি বলে। সম্পর্কে পিসি হয়ে তিনিই বা কোন নিয়মে পাহারা দিচ্ছিলেন শুনি। এদ্দিনে আজ উচিত মতো শোধ দিয়ে নিলাম।

ভোর থাকতেই চঞ্চলা সুরেশকে তুলে দিয়েছে। জামাই হওয়ার কী ঝঞ্ঝাট রে বাবা। চোখে যত ঘুমই থাকুক, সাত সকালে সকলের আগে উঠে প্রমাণ করতে হবে, সারা রাত বেহুশ হয়ে ঘুমিয়েছি বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি। চঞ্চলারও ঠিক এই জিনিস—উঠতে দেরি হলে ঠাট্টা মটকেরায় অতিষ্ঠ করে মারবে।

ভবনাথ বাইরের রোয়াকে বসেছেন, মুক্তকেশীও আছেন। জামাই প্রণাম করতে বেরুবে, হিরু সঙ্গে নিয়ে যাবে—সেই সব কথা হচ্ছে। আগেও সুরেশ বার দুয়েক এসে গেছে বটে, কিন্তু থাকতে পারে নি—একদিন দু-দিনে ফেরত চলে গেছে। তাতে প্রণাম হয় না। যাদের প্রণাম করবে, তাদের তরফেও করণীয় রয়েছে—তার জন্য সময় দিতে হবে বই কি। এবারে এতদিনে আট-দশ দিন হাতে নিয়ে এসেছে—বাড়ি বাড়ি জামাইয়ের সেই মুলতুবি প্রণামী

চঞ্চলা তামাক সেজে কলকের ফু দিতে দিতে ভবনাথের কাছে এসেছে।

তামাক সাজার এই কাজটা দিদি আর বুড়ি দুই বোনে বরাবর করে এসেছে। বুড়ি ছিল না এদ্দিন, বাপের-বাড়ি পা দিয়েই আবার লেগে গেছে। শত কণ্ঠে ভবনাথ জামাইয়ের গুণ-ব্যাখ্যান করেছেন: ভারি চটপটে ছেলে, যেমন আমি পছন্দ করি। অত রাত্রে এসেছে, তবু উঠে পড়েছে আমার আগে। পুকুরঘাটে দাঁতন সেরে বাড়ি ফিরছে, দেখতে পেলাম। আর আমাদের বাবুরা আছেন—কখন থেকে ডাকাডাকি করছি, তা আড়মোড়াই ভাঙছেন এই পহর বেলা অবধি।

বাপের ডাক পেয়ে হিরণ্ময় আসছিল—নিন্দেমন্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আপন মনে গজর গজর করছে: শ্বশুরবাড়ি দু-দিনের তরে এসে সবাই ও-বাহাদুরি দেখায়। রাত থাকতে উঠে পড়ে এখন তোগাচ্ছি—বিছানায় ঘুমোয় নি তো বসে ঘুমিয়ে তার শোধ নিচ্ছে।

কথা মিছা নয়, একটা চেয়ারে বসে সুরেশ ঢুলছে। অবস্থা দেখে করুণা হয়। তা-ও কি রেহাই আছে! বাইরের ঘর থেকে ভবনাথের ডাক, হিরু ডাকতে এসেছে। বলে, ছোটকর্তা বরদাকান্ত এসেছেন। যাও, ভ্যানর-ভ্যানর করো গে এখন সারা বেলাভর। চিনেজোঁক কাঁঠালের-আঠা আর ছোটকর্তা-মশাই ধরলে আর ছাড়াছাড়ি নেই, বলে থাকে সকলে।

বরদাকান্ত গ্রামের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। মানুষ পেলে ছাড়তে চান না। এ-গল্প সে-গল্পে বেলা কাবার করে করে দেন। সেই ভয়ে কেউ বড় কাছ ঘেঁষে না। সকাল বিকাল লাঠি ঠুক ঠুক করে বরদাকান্ত নিজেই এখন এ-পাড়া ও-পাড়া খবরাখবর নিয়ে বেড়ান।

জামাই দেখতে এলাম ভবনাথ। উঠেছে?

কখন! সগর্বে ভবনাথ বলেন, বাড়ির মধ্যে আমার ঘুম সকলের আগে ভাঙে। বাবাজি আমায় পর্যন্ত হারিয়ে দিয়েছে।

নামের ফর্দ হচ্ছে—ভবনাথ বলে যাচ্ছেন, পাশে বসে হিরণ্ময় কাগজে টুকছে। নাম বলছেন আর সঙ্গে এক টাকা দু টাকা এমনি একটা অঙ্ক। নতুন জামাই নিয়ে প্রণামে বেরুবে হিরু—কাকে কাকে প্রণাম করবে এবং পদতলে কি পড়বে ভুলভ্রান্তি না হয়, লিস্টি করে দিচ্ছেন ভবনাথ। সুরেশ এলে বললেন, সেই পশ্চিমবাড়ি থেকে নাতজামাই দেখতে এসেছেন ছোটকর্তা-খুড়ো। আমার খুড়ো, তোমার হলেন দাদাশ্বশুর—

চোখাচোখ তাকিয়ে মৃদু ঘাড় নাড়লেন। অর্থাৎ প্রণাম অবশ্যই—তবে টাকাকড়ি নয়, শুধো-প্রণাম আপাতত।

বলছেন, বিকেল বেলা বাড়ি গিয়ে ভাল করে প্রণাম করে আসবে। এবেলা

ষষ্ঠীর বাটা দেওয়ার ব্যাপার আছে, এবেলা বেশি তো পেরে উঠবে না—

বরদাকান্ত থাকতে থাকতে হারিক পাল এলেন, বকু আর ভুলো এলো। জামাই প্রণামের পর প্রণাম করে যাচ্ছে। হিরন্ময় মজা দেখছে। কানে কানে একবার বলল, এখনো হয়েছে কি। পাড়ায় নিয়ে বেরুব, সারা গ্রাম মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়াবে—পহর রাত অবধি চলবে।

ভিতর-বাড়ি থেকে পুঁটি এসে পড়ল : চলো দাদাবাবু, জেঠিমা ডাকছে।

হিরু জিজ্ঞাসা করে : ওদিকেও এসেছেন বুঝি ?

পুঁটি বলল. এক-আধ জন ? রাঙাঠাকুমা বৈদপিসি, পালবাড়ির বুড়িমা, গৌরদাসের মা—দাওয়া ভরে গেছে।

হাত ঘুরিয়ে নৈরাশ্যের ভঙ্গিতে হিরু সুরেশকে বলে, জামাই হয়েছ, ভেবে আর কি করবে। যাও—

রাঙাঠাকুরমার রং কিন্তু কটকটে কালো। ফোকলা দাঁত,মাথা পক্কে গেছে, কালো বলেই প্রথম বয়সে উল্টো বিশেষণ দিয়েছিল কেউ—রাঙাবউ। বয়স বেড়েছে—রাঙাবউদি রাঙাখুড়িমা রাঙাজেঠিমা ইত্যাদি সহ রাঙাঠাকুরমা অবধি পৌঁছেছে। সুরেশকে দেখে বৃদ্ধা তারিফ করে উঠলেন : বাঃ বাঃ, খাসা বর, বড় পছন্দের বর গো। ওলো বুড়ি, বর পাবি দে—আমি নিয়ে নিলাম। বলো বর এই পাশটিতে। শাঁখ বাজা রে ছুঁড়িগুলো, উলু দে।

হাত ধরে টেনে পাশে বসালেন। গ্রাম সুবাদে চঞ্চলার ঠাকুরমা, সুরেশের অতএব দিদিশাশুড়ি—ঠাট্টাতামাশার সম্পর্ক। থানকাপড়ে ঘোমটা টেনে রাঙাঠাকুরমা গুটিসুটি হয়ে বউটি হয়ে বসেছেন। হাসির লহর বয়ে যাচ্ছে।

ভগ্নদূত হিরু এসে হাজির এমনি সময় : চলো, যজ্ঞেশ্বর-কাকা এলেন আবার এখন। রাঙাঠাকুরমার দিকে চেয়ে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে বলল, ওটা কি হল ? বউ তুমি তো আমার। বরাবর তাই হয়ে আছে।

তালাক দিলাম, যাঃ—

বিনো বলে উঠল. হিরুই কিন্তু ভাল ছিল রাঙাঠাকুরমা। বেওয়ারিশ আছে, কারো কিছু বলবার নেই। বুড়ি দেখো কি করে তোমায়। বরের দখল কিছুতে ছাড়বে না, ধুন্ধুমার লেগে যাবে দু'জনায় মধ্যে—

সুরেশ বাইরের ঘরে চলল আবার। যেতে যেতে বলে, এতখানি বয়স, রসে তবু টইটম্বুর একেবারে।

ঘাড় কাত করে হিরু সায় দিয়ে বলে মজার। সমস্ত দিয়ে শেষ নাতি একটা ছিল, গেল-শ্রাবণে সেটিও সর্পাঘাতে মারা গেল। তবু যেখানে মেলা-মেশা আমোদ আহ্লাদ, রাঙাঠাকুমা বসবেনই গিয়ে তার মধ্যে।

অনতিপরেই পুঁটি আবার বাইরের ঘরে এসে হাজির : চলে আসুন—

হিরু বলল, তাঁতের মাকু—একবার বাইরের ঘর, একবার ভিতর-বাড়ি। যাও, উপায় কি?

প্রণম্যদের ফর্দটা হিরুর হাতে দিয়ে ভবনাথ বললেন, বেরিয়ে পড় এবারে, পাড়াটা সেরে আয়। রোদ চড়ে যাচ্ছে। পাড়ার বাইরে যাসনে এখন। ফিরে এসে আসল যে-কাণ্ড—ষষ্ঠীর বাটা দেওয়া আছে। বিকেলে বেরিয়ে বাকি সব সেরে আসবি। যত রাত্তির হয়, হবে।

বাড়ুয্য নয়, জলখাবার সাজিয়ে দিয়েছে—এবারের ডাক সেই জন্য। শ্বেত-পাথরের থালায় রকমারি মিষ্টান্ন—ক'দিন ধরে সন্ধ্যা থেকে রাত দুপুর অবধি মুক্তকেশী আর অলকা-বউ বসে বসে যা-সমস্ত বানাল। ঘিরে বসে সবাই খাও খাও—করছে। পাতের কোণে চুপচাপ বসে—লজ্জা করছে? ওমা, মেয়েমানুষের অধম হলে যে ভাই। তোমাদের বয়সে লোহার কলাই দিলেও তো মটমট করে চিবিয়ে খাবার কথা।

খাবে কি, এমন শিল্পকর্ম ভেঙে ভেঙে মুখ ভরতে কষ্ট লাগে। বসে বসে খালি তাকাতে ইচ্ছে করে। হিরুকে দেখে সালিশ মানল : দেখুন তো সেজদা, জন দশেকের খাবার এক-পাতে দিয়ে বলছেন, বসে আছ কেন? আপনি রক্ষে করুন—সিকির সিকি আমায় দিয়ে বসে যান আপনি পাশটিতে।

হিরু বলে, ক্ষেপেছ? প্রণামে বেরুচ্ছি—যে বাড়ি যাবো, কিছু না কিছু খেবেই। না খেলে ছাড়বে না। একটু-আধটু দাঁতে কাটতে কাটতেই পেট ভরে যাবে। বাড়ির জিনিস যাচ্ছে কোথা? এসব এখন না।

ফর্দটার উপর চোখ বুলিয়ে বলল, টাকা কুড়ির মতো দিয়ে নাও। এবেলার কাজ তাতেই হবে। আর নয়তো এক পয়সাও দিও না, প্রণামীর বক্ট্রাটি আমায় দাও, আশীর্বাদের সিকি ভাগ আমার। বেকার বসে আছি, কাঁকতালে কিছু রোজগার করে নিই।

অলকা-বউ বলে, পরের পাওনার উপর দৃষ্টি কেন? নিজে বিয়ে করলেই তো হয়। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সিকি কেন ষোলআনা আশীর্বাদই নিজের তখন।

নতুন জামাই আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শির বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে প্রণাম করবে। পদতলে টাকা রাখার নিয়ম প্রণামের সময়—খালিহাতের শুধো-প্রণামও যে নেই এমন নয়। লোক বিশেষে ব্যবস্থা—এতক্ষণ ধরে বিচার-বিবেচনা করে ভবনাথ ফর্দে তুলে দিয়েছেন। প্রণাম সেরে চলে আসবে—কাল থেকেই আশীর্বাদ কুড়ানোর পালা। বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্ন—অবস্থা অনুযায়ী আয়োজন। যেমন, নতুনবাড়িরা পোলাও খাওয়ান, উত্তরবাড়িরা ঘিয়ের লুচি।

সাদা-ভাত অনেকেই খাওয়ান। সব বাড়িতে পুরো খাওয়ানোর বহর অত-গুলো দুপুর ও রাত্রিবেলা কোথা—বেশির ভাগ তাই সকালে বিকালে ডেকে চন্দ্রপুলি ক্ষীরের-ছাঁচ পিঠে-পায়স খাইয়ে দেন। আর সেই সঙ্গে আশীর্বাদ। প্রণামী সূত্রে যা এই দিয়ে আসছে, আশীর্বাদী অন্ততপক্ষে তার ডবল। এবং তদুপরি জামাইয়ের ধুতি কোন কোন বাড়িতে।

ফর্দ মেলে ধরে হিরু বলল, এই কালা দত্ত, দৈবঠাকরুন—এঁদের সব কচ প্রণামী—এক টাকা করে। আধুলি দিলেই ঠিক হত, বাবা বলছিলেন। কিন্তু বিশ্রী দেখায়। দু-ট্যাকা আশীর্বাদী দিতেই জান বেরিয়ে যাবে ওঁদের। যাক প্রাণ রোক ম'ন—দেবেনই তবু।

দুই জায়ে ঠেলাঠেলি। তরঙ্গিণী উমাসুন্দরীকে বলছেন, তুমি বাটা দাও দিদি। আমি ছোট—তুমি থাকতে আমি কেন দিতে যাব?

উমাসুন্দরী বোঝাচ্ছেন: বাটা আপন-শাশুড়িকে দিতে হয়—

তুমি পর-শাশুড়ি নাকি?

আমি যে জেঠ-শাশুড়ি। রীতিকর্ম না মানলে হবে কেন?

কিন্তু অবুঝ কিছুতে শুনবে না। তখন উমাসুন্দরী বললেন, আচ্ছা, আমিও দেবো। আগে তুমি ছোটবউ—আসল-শাশুড়ি যে। ফলের বাটাই আসল বাটা—তাই আমি আর একটা দেবো।

হিরু বলল, মজা সুরেশের—ডবল-বাটা পেয়ে যাচ্ছে।

উমাসুন্দরী বলেন, তার জন্যে দুঃখ কি। তোমরাও পাবে ডবল। জঙ্গি-বাসে ফলের অভাব নেই—আমি দেবো, ছোটবউ দেবে।

জামাইষষ্ঠী হলেও শুধু জামাই নয়—পুত্রস্থানীয়রাও বাটার অধিকারী। তার মধ্যে কালীময় বাদ। ফুলবেড়ের শাশুড়ির বাটা নিচ্ছে সে।

ভবা হয়ে সুরেশ আসনে বসেছে। দীপ জ্বলে, শঙ্খ বাজে। কোঁচানো-ধুতি সিল্কের জামা-চাদর-রুমাল ছাতা-জুতো একদিকে সাজানো। আর এক দিকে ফল ছয় রকম—আম জামরুল গোলাপজাম লিচু সপেটা এবং কাঁঠাল। নতুন ধুতি পরতে হয় আজকের দিনে, জামাটা গায়ে দিয়ে নিতে হয়—

কমল বায়না ধরে: আমার কাপড়-জামা কই? দাদাবাবু পরেছে, আমি কি পরে বাটা নিই এখন?

উমাসুন্দরী দেবনাথের কাছে অনুযোগ করেন: সত্যিই তো, বড় অন্যায়। জামাইয়ের নতুন কাপড় নতুন জামা—কমলের নয় কেন?

দেবনাথ হেসে বললেন, এবারে হয় নি—আচ্ছা, বছরের মধ্যেই বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। আসছে বার জামাইষষ্ঠীতে পাবে।

উষাসুন্দরী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, শুনলে তো কমল। বাবা বিয়ে দিয়ে রেখে—আর ভাবনা রইল না। শাশুড়ি জামা-জুতো-কাপড় সমস্ত সাজিয়ে রেখে তোমার।

সুরেশ ও হিরু পাশাপাশি খেতে বসল। মাথা-সরু মোচার মতন করে জামাইয়ের ভাত বেড়েছে, থালা ঘিরে রকমারি তরকারির বাটি। জামাইকে দিয়ে তারপর অলকা-বউ হিরুর থালা নিয়ে এলো। ভাত ভেঙে সুরেশ ইতিমধ্যে খেতে লেগে গেছে। মুখে তেমন উঠছে না। নাড়াচাড়াই করছে কেবল।

বিনোর সঙ্গে অলকা-বউ মুখ তাকাতাকি করে: কী ব্যাপার?

নিমি এসে সুরেশকে বলল, খাচ্ছ না যে?

খুব খাচ্ছি—

গল্পই তো শুধু। মুখে ভাত ওঠে কই?

উষাসুন্দরী ও মুক্তকেশী ননদ-ভাজে আমসত্ত দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত। নিমি গিয়ে বলল, জামাই খাচ্ছে না মোটে। কিসে কোন কারসাজি—সন্দেহ করে খাচ্ছে না। তোমরা কেউ যাও।

আগের দিনের মতো মুক্তকেশী গেলেন: খাও বাবা। খাবার জিনিস নিয়ে ঠাট্টাতামাসা কি—ওদের আমি মানা করে দিয়েছি, নির্ভাবনায় খাও।

সুরেশ সকাতরে বলে, সে জন্য নয়। জলখাবার খেয়েছি, তারপর প্রণামে বেরিয়ে এতগুলো বাড়িতে অল্পবিস্তর খেতে হল। ভাত মুখে তুলতেই গুলিয়ে আসছে এখন।

মুক্তঠাকরুন সঙ্গে সঙ্গে রায় দিলেন: তবে থাক জোরজবরদস্তির দরকার নেই। যা পারো খেয়ে খানিক গড়িয়ে নাওগে।

আমের গোলা ছাঁকতে ছাঁকতে চলে এসেছেন, আবার গিয়ে কাজে বসলেন। হিরু ফিক ফিক করে হাসে: রাত থাকতে উঠে বাহবা নিয়েছিলে —তারই জের। ঘুম ধরেছে। না খাবে তো হাত কোলে করে বসে থাকা গরজ নেই, উঠে পড়ো।

ওদিকে রান্নাঘরে অলকা-বউ বলল, ভাত তুমি বেড়েছিলে ঠাকুরঝি। ভুলে যাওনি তো?

বিনো বলল, আসল জিনিস ভুলি কখনো?

তবে?

লজ্জার মাথা খেয়ে অলকা তখন খাওয়ার জায়গায় গিয়ে প্রশ্ন করে: গেলাস কোথা ভাই?

কাঁসের গেলাসটা দেখিয়ে সুরেশ বলল, এই তো—

ও গেলাস নয়। কমলের ছোট রুপোর গেলাস ভাতের মধ্যে ছিল।

ছিল নাকি?

ভাত ভাঙতে গিয়ে গেলাস উল্টে পড়বে, জামাইকে বেকুব করে হাসাহাসি হবে খুব। কিন্তু ন্যাকা সেজে সুরেশ বলে, ভাতের মধ্যে গেলাস কি করে বউদি?

কী বলা যায় আর তখন। যা মুখে এলো জবাব দিয়ে দেয়: ভুল করে দিয়েছিল ঠাকুরঝি—

মুখ চুন করে ভালমানুষের মতন সুরেশ বলে, আমি তা জানব কেমন করে! সেজদা-র সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক ভাবে খেয়েই ফেলেছি তবে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে খোঁজার ভান করে সুরেশ বলল, পাওয়া যাবে না—খেয়ে ফেলেছি ঠিক।

জামাই ঠকাতে গিয়ে নিজেরা ঠকেছে—পারা খেলাস্থ এবারে এই নিয়ে খেলাবে। কিন্তু এ মাল এক্ষুনি পাচার করে ফেলা আবশ্যক। উঠতে যাচ্ছে সুরেশ—হায়, হিরুও শত্রু। খপ করে সে পাঞ্জাবির বুক-পকেট এঁটে ধরে চেঁচাচ্ছে: চোর, চোর—

রুপোর গেলাস পকেটে। বাড়া-ভাতের ভিতর থেকে নিয়ে গেলাস কখন পকেটে ফেলেছে—ঠিক পাশটিতে বসেও হিরু ঘুণাক্ষরে টের পায় নি: এমন সাফাই হাত তোমার, পেশা বাছাইয়ে ভুল করলে কেন ভাই? লাইনে থাকলে চোরের রাজা চোরচক্রবর্তী হয়ে যেতে নির্ঘাত।

ঘরে গিয়ে সুরেশ শোবার উদ্যোগে আছে। ডিবে ভরতি করে পুঁটি পানের খিলি নিয়ে এলো। দেখি, দেখি—খিলি একটা খুলে ফেলল সুরেশ। তারিফ করে বলছে, কী সুন্দর! জিরে-জিরে করে কুচিয়েছে—কিন্তু খেজুর কখনো-সখনো খেয়ে থাক, খেজুর-বীচি তো খাইনে। পান খাওয়াবে তো খেজুরবীচি ফেলে খিলির মধ্যে সুপারি দিয়ে নিয়ে এসো।

বেকুব হয়ে পুঁটি পানের ডিবে ফেরত নিয়ে এলো। চঞ্চলাকে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। দুম-দুম করে পিঠে কিল মারছে। বলে, তুই বলে দিয়েছিস, তুই ছাড়া অন্য কেউ নয়—তুই, তুই—

নিরীহ মুখে চঞ্চলা বলে, কি বললাম রে?

কিছু যেন আর জানেন না! ভাতের মধ্যে গেলাসের কথা, পানের মধ্যে খেজুরবীচির কথা—সমস্ত পুটপুট করে লাগিয়েছিস। এখন তুই ন দাবাবুর দলে, বুঝতে পেরেছি। আড়ি তোর সঙ্গে। খবরদার, কখনো রান্নাঘরে তুই আর পা দিবি নে।

তিন কি চার দিন থাকবে সুরেশ ব্যবস্থা করে এসেছিল। সেখানে পুরো হপ্তা কেটে গেছে। টেরই পায়নি কেমন করে গেল—দিনগুলো পাখনা মেলে উড়ে পালাল যেন।

এতেও সন্তোষ নেই। সকালে উঠে সুরেশ দেখল, জুতো পাওয়া যাচ্ছে না এবং আলনায় টাঙানো সিল্কের পাঞ্জাবিও উধাও। পুঁটি মুখ টিপে টিপে হাসছিল—সুরেশ গিয়ে হাত এঁটে ধরল: চোর তুমি। কোথায় আছে বের করে দাও।

পুঁটি চেঁচিয়ে ওঠে: দেখ, দাদাবাবু আমায় চোর বলছে।

সুরেশ বলল, জুতোচোর।

এখন আর সংশয় নেই, পুঁটি একলা নয়, আরও সব দলে আছে। পুঁটিকে দিয়ে করিয়েছে। দেবনাথ কোনদিকে যাচ্ছিলেন—এগিয়ে এসে ধমক দিলেন: বের কর্ শিগগির। ভেবেছিস কি তোরা শুনি? চাকরি করে—সরকারি চাকরি। আমাদের মতন দেশি মনিবের চাকরি নয়—মাথার উপরে লালমুখো সাহেব। মাস দুই-তিন পরে পুজোর সময় আবার তো আসছে।

জামাইকে ডেকে তরঙ্গিণী ওদিকে আর এক ব্যবস্থায় আছেন। বললেন, বুড়িকে রেখে যাও না কেন। আশ্বিনে পুজোটুজো দেখে যখন ফিরে যাবে, এক সঙ্গে যেও তখন। মোটে তো মাস আড়াই—থাকুক এই ক'টা দিন এখানে।

সুরেশ গঙ্গাজল: থাকে থাক। আপনাদের মেয়ে যদি না পাঠাতে চান, বলবার কি আছে।

তরঙ্গিণী বললেন, বেহাই সদাশিব মানুষ। বেয়ানের সুখ্যাতিও তোমার শ্বশুরের মুখে ধরে না। মায়ের বুকের ভিতরের কথা ও রা ঠিক বুঝে নেবেন। তাই বলছিলাম, পুজোয় যখন আসতেই হবে এই ক'টা দিনের জন্য মেয়েটাকে টানাটানি না-ই বা করলে।

সে তো ঠিক। বলে সুরেশ মিনমিন করে আবার একটু উল্টো কথাও বলে, আমার মামাতো বোনের বিয়ে এই মাসের তিরিশে। ওকে মা বিয়ের নিয়ে যেতে চান। সে আর কি হবে—ও থেকে যাচ্ছে তো মা একলাই যাবেন। আপনি ভাল করে একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে দিন।

পরের ছেলে হয়ে সুরেশ মোটামুটি রাজি, কিন্তু নিজের মেয়েই ভণ্ডুল করে দিল। বাপের কাছে গিয়ে চঞ্চলা পুট-পুট করে সব কথা বলছে। বলল, শাশুড়ি মানুষ ভাল নয় বাবা, বিষম রাগী। আসার সময়টা হুকুম দিলেন: ফিরতে মোটেই যেন দেরি না হয়—

দেবনাথ ধমকে উঠলেন: শাশুড়ির নিন্দে মুখে তো নয়ই মনেও আনবিনে

বুড়ি। আগের জন্মের সুকৃতি ছিল, তাই অমন শাশুড়ি পেয়েছিস। তোকে তিনি চোখে হারান।

চঞ্চলা বলে, বলছি তো তাই বাবা। দু-মিনিট থিতু হয়ে থাকার জো নেই—'বউমা' 'বউমা' হাঁক পাড়বেন। ভাল মাছখানা খেয়ে যাও বউমা, শিগগির ক্ষীরটুকু খাও। মহাভারত পড়ো একটু বউমা, আমি শুনি। রান্না-ঘরের কালি ঝুলির মধ্যে গিয়ে বসতে কে বলেছে? লেগেই আছে বাবা—হাড় কালি-কালি হয়ে গেল। ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে—তা তিনি যাবেন বাপের-বাড়ি, আমাকেও সঙ্গে করে নেবেন—নিজের বাপের-বাড়ি থাকতে পাবো না। জুলুম নয়, বলো?

কন্যার সকাতর অভিযোগে বাপ মিটি-মিটি হাসছেন: তুই জানিস কি বুড়ি, বেয়ানের মনের কথা—আমি জেনেবুঝে এসেছি। বউ নিয়ে তাঁর বড্ড জাঁক—বিয়েবাড়ি আত্মীয়-কুটুম্ব মেলা আসবে, তাঁদের কাছে নিজের বউটি দেখিয়ে আনবেন। সেই তাঁর মতলব।

চঞ্চলা বলে, আরও এক কাণ্ড হয়েছে। ওদের উঠোনে সন্তানে-আমের চারা দেখেছ—এবারে সেই গাছে প্রথম ফল ধরেছে। মোটমাট দশটা কি বারোটা। পাকো-পাকো হয়েছে, দেখে এসেছি। তাই বলে দিলেন, শিগগির এসো বউমা। তুমি এলে নতুন গাছের আম পাড়াব। মুখের কথা নয়, আমি জানি। এখন যদি না যাই, ঐ আম পেকে পাখপাখালিতে খেয়ে পচে গলে নষ্ট পাবে—কেউ তা ধরে তুলতে সাহস পাবে না। শাশুড়ির যেমন রাগ, তেমনি জেদ। তোমাদের জামাই তো ঘাড় নেড়ে দিয়ে ভালমানুষ হল—কিন্তু আমাকে ঝক্কি পোহাতে হবে, কথা শুনতে হবে।

দেবনাথ রায় দিলেন: না না, এখন কেন থাকতে যাবি—বেয়ান যেমন যেমন বলে দিয়েছেন, তাই হবে। সুরেশের সঙ্গে চলে যা তুই। পুজোর সময় আসবি।

স্ত্রীকে বললেন, সুরেশ আর বুড়ি চলে যাক—তুমি বাগড়া দিও না। মহা-ষষ্ঠীর দিন জোড়ে আসবে, ঠিক হয়ে রইল। মেয়ে না পাঠালে বেয়ান যে রাগ করবেন, তা নয়। কিন্তু দুঃখ পাবেন। আমাদের বুড়ির তাতে কল্যাণ হবে না

কমল মনে করিয়ে দেয়: ও সেজদি আনবি কিন্তু তখন—

চঞ্চলা ঘাড় কাত করে বলল, আনব।

ভুলে যাস নে—

না—ভুলব কেন, ঠিক আনব।

দাদাবাবু কিনে দেবেন, বলেছেন। বড়-দোকানে পাওয়া যায়। তুই মনে করিয়ে দিস।

তরঙ্গিণী হেসেছিলেন, সেই থেকে কমল নাম ধরে বলে না। খেলনা নয়, জামা-জুতো নয়—ছোটছেলের ফরমাস একটা কলমের। যেমন-তেমন কলম নয়, বড় আশ্চর্য জিনিস—শুধু-কলমে লেখা হয়ে যায়, কালি লাগে না। নতুন-বাড়ির বাবার-কাকা কসবায় থাকেন, তার আছে একটা ঐ কলম। বাড়ি এসে ঐ কলমে লেখেন, কমল তখন একনজরে তাকিয়ে দেখে। লিখতে লিখতে একদিন বাবার কলম ফেলে একটু উঠে গিয়েছিলেন—কমল চুপিচুপি কলমটা হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কালো কুচকুচে গোলাকার, মাথার দিকে সরু হতে হতে বাবলার কাঁটার মতো সুঁচাল হয়ে গেছে। এ কলম দোয়াতে ডুবিয়ে লিখতে হয় না—কাগজের উপর টেনে গেলে ফুটে ফুটে কালো পিঁপড়ের সারির মতন লেখা হয়ে যায়। কমলের চাই এ জিনিস—জনে জনের কাছে দরবার করে বেড়াচ্ছে।

জেঠামশায় ভবনাথের কাছে চেয়েছিল। বিনি-কালিতে লেখা হয়—জিনিসটা তাঁর মাথায় এলো না। উডপেন্সিল নাকি রে? না, উডপেন্সিল এক কুড়ি কমলের সংগ্রহেও আছে। উডপেন্সিল চাচ্ছে না সে।

আচ্ছা, বাবার এলে জিজ্ঞাসা করে দেখব। বলে ভবনাথ চাপা দিয়ে দিলেন।

দেবনাথ বাড়ি এলে কমল তাঁকে ধরল। তিনি বুঝলেন। স্টাইলো-পেন নতুন উঠেছে। কি কাণ্ড দেখ—পাড়াগাঁ জায়গায় একফোঁটা শিশু অবধি ফ্যাশান চালু হয়ে যাচ্ছে।

তরঙ্গিণীকে বললেন, সব ফেলে তবু কলমের ফরমাস—ভাল বলতে হবে বই কি। লেখাপড়ায় ছেলে খুব ভাল হবে, দেখে নিও তুমি।

তরঙ্গিণী হাসলেন খুব: খাগের কলম বুলোচ্ছে খোকন—তার পরে পাখনার কলম, তারও কত পরে নিবের কলম। আস্পা দেখ ছেলের—কেঁচো ধরতে পারে না, কেউটে ধরার শখ।

কমল অধ্যবসায় ছাড়ে নি। চঞ্চলা এলে বলল। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে সে সুরেশকে জিজ্ঞাসা করল। সুরেশ বলল, কসবার বড় কয়েকটা দোকানে স্টাইলো-কলম এসেছে। পূজোর সময় নিয়ে আসবে একটা।

সুরেশ আর চঞ্চলা যাচ্ছে। আগুপিছু দুই পালকি ও হো এ হে ডাক ধরে গ্রাম তোলপাড় করে চলল। ভবনাথ পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে দেখেই বেহারারা আরও গলা কাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

॥ এগারো ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ না হতেই গাছের আম ফুরিয়েছে। গাছে উঠে শিশুবর কাঠবিড়ালির মতন ডালে ডালে বেড়ায়—একটা আম নেই। এখানে এই—আর দেবনাথ বললেন, ল্যাংড়া-ফজলি ভাল ভাল জাতের আম ওঠেনি এখনো কলকাতার বাজারে। আমাদেরও হবে তাই। কলমের চারা পোঁতা হল—ফলন শুরু হলে আম চ শ্রাবণেও কত আম খাবে, দেখ তখন।

তা যেন হল। কিন্তু একটা-দুটো আম নিতান্তই যে আবশ্যক। দশহরার দিনে আম খাওয়ার বিধি—না খেলে বছরের মধ্যে নানা উৎপাত ঘটে, সাপের কবলে পড়াও বিচিত্র নয়।

মুক্তঠাকুরুন বিধান দিলেন: আমসত্ত খাও, তাতেই হবে। আমের রস কিছু পেটে পড়লে হল।

সকাল থেকে সেদিন ঘন ঘন সকলে উপর-মুখো তাকাচ্ছে—মেঘ ওঠে কই আকাশে, মেঘ না ডাকলে তো সর্বনাশ। সাপের ডিম ফেটে কিলবিল করে বাচ্চা বেরুনোর দিন আজ—মেঘ ডাকলে ডিম নষ্ট হয়ে যাবে, সাপ হতে পারবে না। গঙ্গাপুজো এই দিনে। ষষ্ঠীর বাটায় ছয় রকম ফল জোটাতেই গলদঘর্ম, দশহরায় আবার দশ রকম ফল। তার মধ্যে আম তো অমিল হয়ে গেছে। কাঁঠালগাছে উঠল শিশুবর, গরুর দড়ি কোমরে জড়ানো। কাঁঠালে টোকা মেরে মেরে দেখছে—বাতি হলে আওয়াজে ধরা পড়বে। বাতি-কাঁঠালে আচ্ছা করে দড়ি বেড় দিয়ে দড়ির অন্য প্রান্ত ডালে বেঁধে বোঁটা কেটে দেয়। বিশালায়তন কাঁঠাল ফাটল না মাটিতে পড়ে, শূন্যে ঝুলছে। ভুঁয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে তখন নামিয়ে নেয়।

এক রকমের হল। জাম পেকেছে এত দিনে—জাম গোলাপজাম আঁশফল কামরাঙা করমচা লেবু কাঁকুড়—কতগুলো হল, হিসাব করে দেখ। অভাবে গাবফল এবং হলুদ-বরণ ডাঁসা-খেজুরও নিতে পার। খাওয়ার অবস্থায় এসেছে কিনা ভাবতে গেলে হবে না। দেবতা হলেন গঙ্গাদেবী—খাবার প্রয়োজনে পাকিয়ে নেবেন তিনি। অথবা কাঁচাই খাবেন। গুণতিতে দশ ফল ভজিয়ে দেওয়া নিয়ে কথা।

গঙ্গা বিহনে পুজোটা অন্তত গাঙের ধারে হওয়া উচিত। সোনাখড়িতে গাঙ নেই খালও প্রায় শুকনো এখন। গাঁয়ের মানুষ পুকুরঘাটে গঙ্গা পুজো সারছে।

আষাঢ়ের গোড়ায় দেবনাথ কর্মস্থলে চলে গেলেন। কাঁধের উপর পুজোর

ঘাড় এসে চাপল—লোকের প্রত্যাশা অনেক, দেবনাথ যা সব শুনলে তাই ভাবে তাঁর সম্বন্ধে। দাদাকে বলে করে রওনা হয়ে গেলেন। স্থানীয় ব্যবস্থায় ভবনাথ রইলেন—দেবনাথ বাইরের কেনাকাটা যতদূর সম্ভব সারা করে জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে আসবেন।

দায়দায়িত্ব দু-ভাগ হয়ে গেছে। দুর্গোৎসব পূববাড়ির। এ প্রবাসীর সেদিকে আপাতত মাথা দিতে হচ্ছে না, যা করবার ওঁরাই করছেন। ওঁরা বলতে ভবনাথ—একাই তিনি এক সহস্র। বাইরে-বাড়ি উত্তরের পোতায় খড়ের দোচালা মণ্ডপ তোলা হয়েছে। কৃপাময়ী জননী প্রতি বছরই যদি আসেন, পোতার উপর পাকা দেয়াল উঠবে—নতুনবাড়িতে যেমন আছে। পাট কাটা হয়ে গেছে, নতুন মণ্ডপের উত্তরের বেড়া ঘেঁসে পাট স্থাপনা হয়েছে। তল্লাটের ভিতর রাজীবপুরের পালেরাই প্রতিমা গড়ে—এক রাজীবপুরেই ছয় বাড়িতে ছোট-বড় ছয়খানি দুর্গা—পালেরাই গড়ে তাঁদের সব। এবারে নতুন একখানা সোনাখড়িতে। সময় থাকতে গিয়ে ভবনাথ পালপাড়ায় বায়নার টাকা চাপিয়ে দিয়ে এসেছেন।

পুজো পূববাড়ির, কিন্তু থিয়েটার গ্রামবাসী সর্বজনার। হারু মিস্তির পুরো দমে লেগে গেছে, চেলাচামুণ্ডারা আছে সব সঙ্গে। রাজীবপুরের প্রতিমা ছয়-খানা বটে, কিন্তু থিয়েটার এক জায়গায় একটিমাত্র আসরে। সপ্তমী অষ্টমী নবমী পুজোর তিন দিন তিন পালা পর পর। চালু জিনিস ওদের, বছরের পর বছর হয়ে আসছে—তিনটে নাটক যেমন খুশি রিহার্শালে চড়িয়ে দিল, উতরে মোটামুটি যাবেই। সোনাখড়ির পক্ষে পয়লা বছর ঐ সিরাজদ্দৌলা ছাড়া অধিক আর সম্ভব নয়। সপ্তমীর দিন নামানো হবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণ-ভরসা—ঠাকুরের দয়ায় লেগে যায় তো নবমীর দিন 'বিশেষ অনুরোধে' পুনশ্চ দ্বিতীয় দফায়।

সিন-সিনারি সাজ-পোশাক এবং অন্য যাবতীয় সরঞ্জাম সদর থেকে ভাড়া হয়ে আসবে। মাদার ঘোষের সদরে প্রতিপত্তি, তাঁর উপরে সম্পূর্ণ ভার। কালিদাসের চিঠিতে মস্তবড় সংবাদ. কলকাতার প্লেয়ার ঠিক হয়ে গেছে—এক জোড়া একেবারে। কালিদাসের পরম বন্ধু তারা—একটি তার মধ্যে পাবলিক স্টেজেও নেমেছে মাঝে-মধ্যে। দুই বগলদাবায় দু-জনকে নিয়ে মহালয়ার দিন কালিদাস এসে পৌঁছবে। একজন সিরাজদ্দৌলা সাজবে, অপরে করিম-চাচা। আর কালিদাস নিজে ক্লাইভ। পার্ট বড় নয়—তাতেই সে খুশি। ঠাকুরের দয়া থাকলে ওর মধ্যেই কিছু খেল দেখিয়ে দেবে। এই বাবদে ইতিমধ্যে পাবলিক স্টেজের সিরাজদ্দৌলা তিন বার দেখা হয়ে গেছে—সুযোগ পেলে আরও দেখবে। মোটের উপর সোনাখড়িতে যা নামবে, হুবহু তা কলকাতার মাল—

চন্দন-বদনে একচুল এদিক ওদিক হবে না।

এতবড় খবরে হারু মিস্তিরির কিন্তু মুখ অন্ধকার। বামুনপাড়ার গোবরা বিশেষ অন্তরঙ্গ তার—একসঙ্গে ইস্কুলে যেতো আবার একসঙ্গে ইস্তফা দিয়েছে। ক্ষিপ্ত হয়ে গোবরার কাছে বলল, এত খাটনি খাটছি সিরাজের পার্টের লোভে। চুলোয় যাকগে, পার্ট ই করব না আমি মোটে—গ্রামের কাজে খেটেখুটে দেবো।

গোবরা সান্ত্বনা দেয়: সিরাজ না হলি তো সিরাজের বেগম হয়ে যা—লুৎফউন্নিসা। সে-ও কিছু কম যায় না।

গান রয়েছে যে। হেঁড়ে গলায় গান ধরলে লোকে তেড়ে আসবে।

গোবরা বলে, লুৎফর গান তো বাদ। তুমি ম্যানেজার হয়েও জান না। নরেন পাল বলে দিয়েছে, যত কিছু গান বন্দী আর নর্তকীর মুখে।

হারুর ইতস্তত ভাব: গোঁফ কামাতে হবে—হুস। মোচার মতন এমন খাসা গোঁফ জোড়া আমার—

গোবরা বলে, ভাবিস কেন, গোঁফ আবার গজাবে। পাঠ কিছু ছোট হতে পারে—কিন্তু আমার মনে হয়, সিরাজের চেয়েও লুৎফ জমবে বেশি। শেষ মারটা পুরোপুরি তার হাতে—কবরে ফুল ছড়ানো আর করুণরসের অ্যাকটিং। কাঁদতে কাঁদতে লোকে ঘরে যাবে। আগেকার সব-কিছু বিলকুল ভুলে গিয়ে তোর অ্যাকটিংটাই কানে বাজবে শুধু।

তবু হারু মন-মরা। মহাবিপদ। গোবরা বোঝাচ্ছে: নিজের ভাবলে তো হবে না—কলকাতার প্লেয়ার নামছে, চাট্টিখানি কথা! ভিতরে বস্তু থাকলে মৃত-সৈনিকের পার্টেও তাজ্জব দেখানো যায়। মুখোমুখি প্লে করবি—সিরাজ তো এলেম বুঝে ফেলবে তোর। ফিরে গিয়ে গল্প করবে, কলকাতার স্টেজেই ডাক পড়তে পারে তখন।

হৈ হৈ পড়ে গেল। সোনাখড়ি পুজোর সময় নির্ঘাত এক কাণ্ড ঘটবে। পিওনঠাকুর যাদব বাড়ুয্যে হাটবারে এসে চিঠি বিলি করেন, সবিস্তর শুনে গেলেন তিনি। তাঁর মুখে বৃত্তান্ত রাজীবপুর পৌঁছে গেল। সকলের মুখ চুন। এই যদি হয়, একটা মানুষও রাজীবপুর আসরে বসবে না—কলকাতার প্লেয়ারের নামে ঝেঁটিয়ে সব সোনাখড়ি জমবে। পুববাড়ির ঐটুকু উঠানে কি হবে—দক্ষিণের বেড়া ভেঙে বেগুনক্ষেত সাফ করে পোড়োভিটে কেটে চৌরস করে জায়গা বাড়িয়ে নাও। দক্ষিণের একেবারে শেষ মুড়োয় স্টেজ বাঁধা হবে মণ্ডপের সামনাসামনি। দেবীর চোখের সামনে, দেবীকে দেখিয়ে অভিনয়—

হাত-মুখ নেড়ে মহোৎসাহে হারু শোনাচ্ছিল, হিমচাঁদ 'কক্ষনো না'

"কক্ষনো না"—তুমুল কলরব করে উঠলেন।

কথার মধ্যে খামোকা ভণ্ডুল দিয়ে নিজের কথা শোনানো স্বভাব তাঁর। কিন্তু সেই বস্তু রসিয়ে উপভোগ করার লোকও যথেষ্ট। তারা বলে কী ব্যাপার? না না—করে উঠলেন কেন হিমে-দা?

মতলব করেছে, দুর্গাঠাকরুনকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে থিয়েটার শোনাবে। ঠাকরুন মুখ ঘোরাবেন কিন্তু বলে দিচ্ছি। সেকালে চাঁপাঘাটে যা একবার হয়েছিল, এখানেও তাই হবে দেখো। কিম্বা আরও সাংঘাতিক—

চাঁপাঘাটে সে উপাখ্যান সবাই জানে। মা-কালীর পাষাণ-বিগ্রহ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। হিমচাঁদ বললে রসিয়ে বিস্তর মজাদার করে বলবেন। পুরানো গল্প ছেলেরা তাঁর মুখে আর একবার শুনতে চায়: কি হয়েছিল হিমে-দা?

হিমচাঁদ আমল না দিয়ে বলে যাচ্ছেন, হারু হল লুৎফউন্নিসা তোমাদের—সাংঘাতিক কাণ্ড হবে বলে দিচ্ছি। সিরাজের বদলে লুৎফউন্নিসাকেই চাক-চাক করে কেটে হাঁড়িতে চড়াবে। মা জগদম্বাও হারুর অ্যাকটো শুনে অসুরের বুকের বল্লম উপড়ে লুৎফকে ছুঁড়ে মারবেন দেখো।

একলা হিমচাঁদ নন, নানাজনের নানান মন্তব্য। হারু মিস্ত্রির কানেও যায় না। পার্ট বিলি হয়ে গেছে, তারপর থেকে লোকের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে খানিকটা যেন। নাটকে যত পার্টই থাকুক, গ্রামসুদ্ধ মানুষকে খুশি করা সম্ভব নয়। পার্ট যারা পায় নি, রিহার্শালের ধারে কাছেও আসে না আর তারা। 'দূত' 'সৈনিক' 'নগরবাসী' জাতীয় ছোট পার্ট যাদের, তারাও আসতে চায় না: বলব তো আধখানা কথা, তার জন্যে নিত্যি নিত্যি যাবার কি আছে? কিন্তু হারুও ছাড়নপাত্র নয়। ঝাঁজ বাজাচ্ছে নতুনবাড়ির রোয়াকের এ-মুড়ো ও-মুড়ো দ্রুত পদচারণা করে। পুজোর আরতিতে যে-জাতীয় ঘণ্টা বাজায় তা-ও একটা সংগ্রহ করেছে। চং-চুং করে বেশ খানিকটা ঝাঁজ বাজাল। ঝাঁজ রেখে দিয়ে তারপর ঘণ্টা: ঠুন-ঠুন ঠুন-ঠুন ঠুন-ঠুন—

কারা কারা এসেছে দেখে নিয়ে হারু পাড়ায় বেরিয়ে পড়ল: কী হল তোমার আবার, যাচ্ছ না যে? জ্বর হয়েছে, হাত দেখি। কিচ্ছু হয়নি, একটু-আধটু জ্বরে পার্ট বলা আটকায় না। রাজীবপুরদের গো-হারান হারাব এবারে—পুজোয় না পারি, থিয়েটারে। ওঠো—

থিয়েটারের নামে নানান গুণীলোকে এসে হানা দেয় মাঝেমধ্যে। মরশুমের পাখি। রোজগার যৎকিঞ্চিৎ হয়তো হবে, কিন্তু সেটা আসল নয়—গুণের বোঝা নিয়ে চুপচাপ থাকা অসহ। দূরদূরান্তর থেকে মাঠ-ঘাট জঙ্গল-জাঙাল ভেঙে হাজির হয়। স্থানীয় মুরুব্বি হারু মিস্ত্রির সঙ্গে কথাবার্তা বলে

তারপর চুন হয়ে খানিকটা রিহার্শাল শুনে শুকমুখে ফিরে চলে যায়। এর মধ্যে যুগল আর সুধাময় নামে দুটো নাচের ছেলে ড্যান্সিং-মাস্টার নরেন পাকড়ে রাখল—দুটো তৈরি মাল হাতে থাকুক, আর যা লাগে বানিয়ে নেবে। আর একজন নিতান্ত নাছোড়বান্দা, আর্টিস্ট জটাধর সরকার, গড়মণ্ডলে বাড়ি। সিন-উইংস আঁকবার জন্যে এসেছে। বলছে খুব লম্বা-লম্বা কথা। আর্ট-ইস্কুলে সামান্য দিন পড়েছিল। আঁকজোক দেখে মাস্টার তাজ্জব হয়ে বললেন, তোমার স্বভাব-দত্ত ক্ষমতা—কতটুকু জানি আমরা, আর কি শেখাব। ইস্কুলে সময় নষ্ট করে কি হবে, দেশে ফিরে রুজিরোজগারে লেগে যাও। গুরুবাক্য মেনে ফিরে এসেছে আর্টিস্ট এবং রুজিরোজগারে লেগেও গেছে। পাড়াগাঁয়ে ছবির কদর নেই বলে অগত্যা পানের বরোজ করেছে—হাটবারে পান তুলে গোছে গোছে সাজিয়ে হাটে নিয়ে যায়। তা হলেও শিল্প মানুষ, জাত-শিল্পী—যাত্রার জন্য হাত সুড় সুড় করে, খবরটা কানে শুনেই ছুটতে ছুটতে এসেছে।

হাকুর হাত জড়িয়ে ধরল: যত কিছু ক্ষমতা চর্চার অভাবে মরচে ধরে গেল মশাই। কাপড় আর রং কিনে দিন, খেয়ে খেয়ে কাজ করব। গোটা আর্ট-ইস্কুল তাজ্জব বনেছিল, তল্লাট জুড়ে এবারে সেই কাণ্ড করব। বানির কথা এখন বলছি নে, কাজ হয়ে যাক—পাইতকে এতাবৎ সিন-সিনারি যত হয়েছে জানীম নারা দেখবেন তুলনা করে, কলকাতা থেকে প্লেয়ার আসছেন তাঁরাও সব দেখবেন। ধর্মে-ধর্মের বিচারে যা হবে, হাসিমুখে তাই আমি হাত পেতে নেবো।

প্রস্তাব চমৎকার, হাকুর বেশ ভাল লাগল। কিন্তু হলে হবে কি, সিনের ভার মাদার ঘোষের উপর। তিনি ভিন্ন কারো কিছু করার এক্তিয়ার নেই। মদার ঘোষের ঠিকানা নিয়ে আর্টিস্ট সেই সদর অবধি ধাওয়া করল। উত্তম যোগাযোগ বেরিয়ে গেল—বাজারের মুহুরি সুরেন বিশ্বাস জটাধরের সাক্ষাৎ ভগ্নীপতি। সুরেন জোর সুপারিশ করল: জটাধর খাঁটি মানুষ। দিয়ে দেখুন, ক্ষত-লোকসান কিছু হবে না—জটা সে মানুষই নয়। আমি জামিন রইলাম।

মদার হিসাব করে দেখলেন। ভাড়া না নিয়ে সিন এঁকে দিয়ে করালে অনেক সস্তায় হবে, এবং গ্রামবাসীর সম্পত্তি হয়ে থাকবে। আপাতত চারখানা সিন—দরবার-কক্ষ, শিবির, পথ ও কুটির। এবং আনুষঙ্গিক উইংস ইত্যাদি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এতেই চালাতে হবে, জরুরি আবশ্যক বিধায় এক-আধখানা ভাড়া-করা যাবে। এ-বছর এমনি চলল, সামনের বার ভেবেচিন্তে আরও চারটে বানানো হবে। তারপরের বছর আরও কিছু। পোশাকও ঐ সঙ্গে

একটা ছুটো করে। ক'টা বছর যেতে দাও, সোনাখড়ি ম্যাট্রিক-ক্লাব কারো কাছে হাতে পাতড়ে যাবে না, সবই নিজস্ব তাদের তখন।

জটাধরকে নিয়ে বাজার চলে গেলেন। চালাও হুকুম: কাপড়ের থান পছন্দ করে কিনে নাও। রং কেনো যেমন তোমার অভিরুচি। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ধীরেসুস্থে মনের মতন করে বানাওগে। মুখে তড়পাচ্ছে, কাজে সেটা দেখাতে হবে। দিন দেখে রাজীবপুর মাথায় হাত দিয়ে পড়বে, তেমন জিনিস চাই।

জটাধর সদম্ভে বলল, দেখবেন—

॥ বারো ॥

আষাঢ় মাস। ঘাস সবুজ। গাছপালা বৃষ্টির জলে স্নান করে স্নিগ্ধ পবিত্র। কাঁচামিঠের চারাটায় কিছু লালচে পাতা এখনো। পুকুরপাড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছ ফুলে ভরতি।

ডালে ডালে পাখির কিচির-মিচির। শালিখেরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাইরের উঠোনে পড়েছে। কেঁচোয় মুখ বাড়িয়েছে, নানা রং-এর পোকা বেরিয়ে পড়েছে গর্তে জল ঢুকে গিয়ে। মচ্ছব লেগেছে পাখিদের। জল ভরা পাটকিলে রঙের মেঘ আকাশে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝুপ ঝুপ করে এক পশলা হয়ে গিয়ে কখনো-বা মেঘশূন্য ঝিকমিকে আকাশ বেরিয়ে পড়ল একটু ক্ষণের জন্য। গাছের পাতা থেকে টপ টপ করে জল ঝরছে। খানিক বিরাম দিয়ে টিপটিপে বৃষ্টি এবার।

বেলা হয়েছে, কিন্তু চারিদিকে কুয়াসার ভাব। মানুষজন একটা ছুটো করে বেরুচ্ছে—পথ ঘাটে জল ছপছপ করে ছিটিয়ে যাচ্ছে। কইমাছ একটা কানকোয় হেঁটে হাঁটতে যাচ্ছিল, রাস্তার পাশে ঘাসবনে আটকে গেল। একটা যখন দেখা গেল, আরও আছে ঠিক। খোঁজ করলে মিলে যাবে।

ক'দিন পরে দেবরাজ আরও এক নতুন খেলা ধরলেন। থমথমে আকাশ, হঠাৎ তার মধ্যে ছির-ছির করে এক-এক পশলা বৃষ্টি আসে—দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়ে যেন পাকা সওয়ার। আর সেই সময়টা রোদে হাসছে বিলের মধ্যে ধানক্ষেতগুলো। নতুনপুকুরের নালার ধারে কমল আর পুঁটি— তেপান্তরের বিল চোখের সামনে, মাঝবিলে ভুতুড়ে বটগাছটা, অনেক অনেক দূরে বিল-পারের ঝাপসা গাছগাছালি, ঘোড়ো ঘর। বিল ভরতি ধান রুয়ে দিয়েছে। কচি ধান চারাদের কতক কতক হলদে, বেশির ভাগই কালো-বরণ হয়েছে। তাদের উপর দিয়ে এই রোদ এই মেঘছায়া এই বৃষ্টি ছুটোছুটি-খেলা করছে সারাক্ষণ। হাততালি করে ভাইবোন কচি গলায় একসুরে ছড়া কাটে:

রোদ হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে
শিয়াল-কুকুরের বিয়ে হচ্ছে ।

খড়ুনপুকুর ও বিলের মধ্যে সরু এক নালার যোগাযোগ। কোদাল-মালশা নিয়ে ছিরু আর অটল এসেছে ফোকটে কিছু মাছ ধরে নেবার জন্য । পুঁটি চাঁদা মৌরলা বাজি-ট্যাংরা ডারাবান এইসব ছোট ছোট মাছ । মাটি ফেলে নালার মুখ বন্ধ-করা—সেই মাটি একটুকু কেটে দিল। ঝিরঝির করে বিলের জল পুকুরে পড়ছে আর বর্ষার স্ফূর্তিতে উজিয়ে মাছ নালায় ঢুকে যাচ্ছে। দু-কোদাল মাটি এদিকে তাড়াতাড়ি ফেলে নালার দু-মুখ বন্ধ করে দিল। মাছ আটকা পড়েছে—জলটুকু সেঁচে ফেলে মালসা ভরে তুলে নিলেই হল । দেবরাজের বজ্জাতি—দেখতে দেবেন এই মাছ ধরা। বৃষ্টি ঝেঁপে আসে, আকাশ চেরে চিকুর, কড়-কড় শব্দে বাজ তোলপাড় করে তোলে। জেঠামশায় খোঁজ-খোঁজ লাগিয়েছেন এতক্ষণে ঠিক।

আর থাকা চলে না। দেরি হলে রাগে রাগে নিজেই চলে আসবেন। ছুটল ভাই-বোনে—বুড়িচ্ছু খেলায় দম ধরে ছোটে যেমন—ছ-চালা বড়ঘরের দাওয়ার উপর উঠে পড়ল। জোর বৃষ্টি। বড় বেশি জোর দিল তো ছড়া কাটছে :

লেবুর পাতার করমচা,
যা বৃষ্টি ধরে যা—

তাই শুনে দেবরাজ জোর কমালেন তো তখন আবার উল্টো ছড়া :

আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগল দেবো মেনে—

খড়ের চাল বেয়ে অসংখ্য ধারায় ছাঁচতলায় জল পড়ছে। খুঁটি ধরে দাওয়া থেকে ঝুঁকে পড়ে জলের ধারা হাতে ধরছে। এই এক খেলা। জেঠামশায় দালানের রোয়াকে, মেজদা পুকুরপাড়ে, মা জেঠাইমা বিনো-দি সব রান্নাঘরের দিকে। কেউ নেই এদিকটা। আকাশে দেবরাজ আছেন শুধু—তিনিই মাঝে মাঝে গুম-গুম তাড়া দিচ্ছেন।

উঠোন জলে ভরে গেল দেখতে দেখতে। ছাতের জল নল দিয়ে ছড়ছড় করে প্রবল বেগে রোয়াকের উপর পড়ছে। ভাঙাচোরা পুরানো রোয়াক। যেখানটা নলের জল এসে পড়ে, সেখানে আটখানা করে টালি আঁটা—সানের উপর জল পড়ে রোয়াক যাতে জখম না হয়।

ছাঁচতলা দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে জল সোঁতায় গিয়ে পড়ছে। সোঁতা থেকে রাস্তায়—রাস্তার পগারে। পগারের জল এঁকে-বেঁকে শেষ তক বিলের জলে

মিশে যায়। কমল তাড়াতাড়ি কাগজের নৌকো বানিয়ে ফেলল। বিদ্যেটা হিমচাঁদের শেখানো—পুঁটি-কমলের তিনি হিমে-কাকা। ছেলেবুড়ো সব বয়সের সকলে হিমচাঁদের এয়ারবন্ধু এবং সাগরেদ—রসরসিকতা তাঁর সকলের সঙ্গে। গায়ে হাত দিয়ে 'তুমি' করে কথা বলে হিমচাঁদের সঙ্গে কি পাঁচ-বছুরে ছেলেটা কি পঞ্চাশ-বছুরে বুড়োমানুষটা। ক্ষমতার অন্ত নেই, চট করে আহামরি জিনিস সব বানিয়ে উপহার দেন। শিমুলের কাঁটা ঘষে ঘষে পালিশ করে তার উপরে নরুন দিয়ে উল্টা-অক্ষরে নাম খোদাই করে দেবেন—হুবহু রবারস্ট্যাম্পের মতো ছাপ পড়বে। ঘুড়ি বানিয়ে দেন, গাঁইগুঁয়ের ভিতর কেউ অমন পারবে না। সাপঘুড়িগুলো আকাশে ওড়ে—রোদভরা আকাশে রকমারি সাপ কিল-বিল করে বেড়াচ্ছে, মনে হবে। চাউস 'বঙ্গবাসী' কাগজ নিয়ে বাঁশের শলা ও জিওলের আঠায় বিস্তর যত্নে হিমচাঁদ দোঘুড়ি বানান—মাঝারি সাইজের একখানা ঝাঁপের দরজা অবিকল। নিজ হাতে কোষ্টা কেটে ঘুড়ির জন্য শক্ত সুতালি পাকালেন। সেই ঘুড়ি আকাশ তুলে খেজুরগাছের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। চৈত্রের খর-দুপুরে মিষ্টি সুরে মাতিয়ে ঘুড়ি উড়তে লাগল।

হিমে-কাকার কাছ থেকে কমল নৌকো বানানো শিখেছে। কাগজের নৌকো আর কলার খোলার আহা-মরি সব নৌকো। কাগজের নৌকো বানানো কিছুই নয়—দেদার বানিয়ে দিচ্ছে, আর পুঁটি ছাঁচতলার গাঙে নিয়ে ছাড়ছে। বৃষ্টি অবিরাম। জলের টানে নৌকো যাচ্ছে, চালের জল সুতোর ধারে পড়ছে নৌকোর উপর—কতক্ষণ আর ভাসবে, জল ভরতি হয়ে ডুবে যায়। এক নাগাড়ে বানিয়ে যাচ্ছে কমল, দিদিও জলে ছাড়ছে। কিন্তু নৌকোডুবি মারাত্মক রকমের—পাঁচ-দশ হাত যেতে না যেতে ভিজে ন্যাকড়ার মতন নৌকো নেতিয়ে পড়ে।

পুঁটি বলল, রোসো, এক কাজ করছি। এদিক-ওদিক দেখে নিল ভাল করে, আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই মানকচু-বনে ছুটে গেল। বড় দেখে দুটো মানকচুর পাতা ভেঙে একটা কমলকে দিল, একটা নিজে রাখল। কমল ইতিমধ্যে আস্ত একখানা খবরের কাগজ দিয়ে মস্তবড় নৌকো বানিয়ে ফেলেছে। দুই কড়েপুতুল নৌকোর উপর—একটি মাঝি, অপরে বউমানুষ শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। বর্ষার সময় বিলের শয়াল বেয়ে যেমন সব আসা যাওয়া করে। এ নৌকো ছাঁচতলার জন্য নয়—মানকচু-পাতা মাথায় দিয়ে উঠোন পার হয়ে তারা সোঁতার জলে ভাসিয়ে দিল।

কী বেগে চলল রে নৌকো, ভাইবোনে পাশে পাশে চলেছে। সোঁতার পাশে গিয়ে পড়ে তো ঠেলে মাঝখানে সরিয়ে দেয়। তরতর করে ছুটেছে। পড়বে এইবারে রাস্তার পগারে, তারপর বিলে—জলের তুফান খেলছে ঐ যেখানে।

খলখল করে সোঁতার সামান্য জল ঠেলে উঠান মুখো উজান চলেছে—কী আবার, কইমাছ। নতুনপুকুরে হোক কিম্বা মজা-পুকুরে হোক, আজকে মাছ উঠেছে। কেউ ঠাহর পায়নি। কানকো বেয়ে এতখানি পথ চলে এসেছে—বাড়ির মধ্যে উঠানে ঢুকছে, উঠান থেকে ছাঁচতলায়, ছাঁচতলা থেকে রান্নাঘরেই বুঝি। রান্নাঘরে গিয়ে একেবারে গরম তেলের কড়াইয়ের ভিতর নেমে পড়বে? করবে কি, কেউ তোমরা গেলে না—দলছাড়া হয়ে একা একা চলে এসেছে বেচারি।

ওমা, কই ফিরে চলল যে চকিতে মুখ ফিরিয়ে। নতুন বর্ষার স্ফূর্তিতে ঘাসের তলা থেকে উঠে দেখে-শুনে বেড়াচ্ছিল, গতিক মন্দ বুঝে পিঠটান দিচ্ছে। ধর্ ধর্—মাথার কচুপাতা ফেলে পুঁটি ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অত সহজ নয়—স্রোতের সঙ্গে মাছ পগারের দিকে ছুটেছে—একবার পগারে পড়তে পারলে আর তখন পায় কে! তবু পুঁটি একবার ধরেছিল, কাঁটা মেরে হাত ছাড়িয়ে কই পালিয়ে গেল। ভাইয়ের উপর সে খিঁচিয়ে ওঠে: পাতা মাথায় দিয়ে ঘটকপূর হয়ে কি দেখিস? আগে গিয়ে বেড় দিয়ে দাঁড়া। হাতের ক্ষত অগ্রাহ্য করে পুঁটি হাতড়া দিচ্ছে। দু-জোড়া পা আর দু-জোড়া হাত ঐটুকু সোঁতার মধ্যে—আঁচলে হাত মুড়ে মাছ চেপে ধরল পুঁটি, আঁচলে জড়িয়ে তুলে নিল। কাঁটা মারবার জো নেই—আর যাবে কোথা বজ্জাত কইমাছ?

বিকালটা থামা গেল। বৃষ্টি নেই, হালকা মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি ঝুঁকি দিল কয়েক বার। সন্ধ্যাবেলা আবার আয়োজন করে আসে। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়েছে, নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ঝিলিক দিচ্ছে—কালো-বাসুকি আকাশে যেন জিভ মেলছে বারংবার। অন্ধকারে চরাচর ডুবিয়ে দিয়েছে—ঘর-বাড়ি গাছপালা পথ-ঘাট কিছুই নজরে আসে না। নিজের হাত-পাগুলো পর্যন্ত। ঝিঁঝিঁ ডাকছে স্ফূর্তিতে চারদিকে ঝিমঝিম আওয়াজ তুলে। ব্যাঙে উলু দিচ্ছে। তারপর বৃষ্টি নামল। কলকল শব্দে উঁচু জায়গা থেকে জল গড়াচ্ছে কোথায়। তালের বাগড়ো পড়ল বুঝি খড়-খড় শব্দে। আর আছে অবিরাম বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বেশ লাগে।

কমল মায়ের সঙ্গে এক কাঁথার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে শুয়েছে। পুঁটি শোয় দরদালানে জেঠিমার সঙ্গে—জেঠিমার বড় পেয়ারের সে। কমলের জন্মের সময় উঠানের উপর যথারীতি নারকেলপাতার ছাউনি দরমার বেড়ায় বাগলো বাঁধা হল, শিশু ভূমিষ্ঠ হল সেখানে। পুঁটি সেই সময়টা জেঠিমার কাছে শুত। তারপর কমল এত বড়টা হয়ে গেছে, সেই শোওয়া চলছে বরাবর। উমাসুন্দরী দৈবে-সৈবে বাপের বাড়ি যাবেন তো পুঁটিও নাছোড়বান্দা হয়ে যাবে তাঁর সঙ্গে।

অনেক রাত্রি। প্রচণ্ড আওয়াজে যন যন বাজ পড়ছে। কমল শিউরে কেঁপে—ঘুমের মধ্যে উঠে বসে ডুকরে কেঁদে উঠল। 'ভয় কি' 'ভয় কি' বলে তরঙ্গিণী টেনে শুইয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে নিলেন, কাঁথাটা ভাল করে গায়ে টেনে দিলেন। বাইরে ঝমঝম করে প্রবল ধারায় বৃষ্টি—কী ঢালা ঢালছে যে আজ, থামাথামি নেই, সৃষ্টি সংসার ভাসিয়ে দেবে। ভয় তরঙ্গিণীও পেয়েছেন, কমলকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছেন। খাসা ঘুম লাগে তখন, আরামে আবার কমল ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালবেলা বৃষ্টি ধরে গেছে। ঘোলাটে আকাশ, চিকচিকানি রোদ দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। ভাই-বোনে পথে বেরুল বৃষ্টিবাদলায় চারিদিককার চেহারা কেমন পালটেছে দেখ। যেন আর এক জগৎ। মজা-পুকুরের খোলে খটখটে মাটির উপর ক'টা দিন আগেও দুরে ও কালমেঘার কত আম কুড়িয়েছে, আজকে হাঁটুভর জল সেখানে। আগাছা ধাসবন একটা দিনের মধ্যে যাবে আর কোথায়—যেমন ছিল তেমনি আছে, জলতলে ডুবে রয়েছে, চোখ তাকিয়ে সমস্ত নজরে আসে। গুঁড়িকচুর বনে জল ঢুকেছে—কচুপাতা জলের উপর নৌকোর মতন ভাসছে, মাথার উপর চোখ-বসানো কেঁয়ামাছ ভেসে বেড়াচ্ছে এদিকে-সেদিকে। জলের নিচে গাছগাছালির মধ্যে লুকানো আরও কত রকমের কত মাছ। পরশু-তরশু যা ছিল সাদামাটা নিতান্তই ডাঙা জায়গা, একটা দিনের মধ্যে সে জায়গা অজ্ঞাত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মধু মণ্ডল, দেখ, সাত-সকালে ঐ কচুবনে এসে মোটা বড়শিতে ব্যাং গেঁথে খোবা নাচিয়ে বেড়াচ্ছে—কোনখান থেকে শোলমাছ বেরিয়ে খপ করে টোপ গিলে খাবে।

বাড়ির পূবে বিল—সোনাখড়ি গ্রামের পূব সীমানা। বিলের চেহারাও পালটেছে। ডাঙার কাছাকাছি চটজমিতে আউশধান রুয়েছিল, হরিদ্রাভ খাটো ধান-চারা, সমস্ত এখন জলের নিচে। যতদূর নজর চলে, জল আর জল—ঘোলা জলের অকূল-পাথার। বাতাসে ঢেউ উঠছে, আমবাগানের নিচে ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউ এসে ঘা দিচ্ছে।

বাড়ি এসে দেবনাথ খুব গল্প করেন ছেলেমেয়ের সঙ্গে। পৃথিবী নিয়েও কত গল্প। সোনাখড়ি এই একটা গ্রাম, বিল তার সামনে—পৃথিবীর উপর এমনি লক্ষকোটি গ্রাম আছে, শহর আছে, সমুদ্র আছে, হ্রদ আছে, দ্বীপ আছে, মরুভূমি আছে। আছে বরফে-ঢাকা মেরুপ্রদেশ। ভারি আশ্চর্য পৃথিবী। বড় হয়ে ভাল করে জানবে, দেশ বিদেশ ঘুরে পৃথিবীর কত রকম রূপ দেখতে পাবে।

দেবনাথ বলেন এইসব। কিন্তু বড় হওয়া পর্যন্ত সবুর করতে হয় না।

রাত্রের মধ্যে কখন যে সময়টা মায়ের কাছে কাঁথার নিচে ঘুমিয়ে ছিল, বাড়ির নিচের চেনা-বিল তার মধ্যে সমুদ্র হয়ে গেছে। মহাসমুদ্র—জল থই থই করছে, ঢেউ খেলছে, পুব মুখো তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেললেও পার দেখা যাবে না। জলরাশির মাঝখানে বিশাল বটগাছটা দেখা যাচ্ছে ঠিক। আরও কিছু দূরে খড়ের ঘর কয়েকটা। অর্থাৎ ন্যাড়া সমুদ্র নয়—সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপও রয়েছে দস্তুরমতো। সমুদ্রে জাহাজের চলাচল—আমাদের এই গেঁয়ো-সমুদ্রে তালের ডোঙা। কালো কালো তালের ঠোঙা—তালের গুঁড়ির শাঁস খুঁড়ে ফেলে ডোঙা বানানো—শীতকালে ও চৈত্রের খরায় খানাখন্দে জল-কাদার মধ্যে ডোবানো ছিল। ভিজে থাকে যাতে, ফাটল না ধরে পাঁচ-ছ'মাস আত্মগোপনের পর অফুরন্ত জল পেয়ে গা-ভাসান দিয়েছে তারা সব। খটখট খটখট লগি বাইতে গিয়ে ডোঙার গায়ে ঘা পড়ছে। বিষম স্ফূর্তি আজ—মাথা দুলিয়ে অবাধে বিলের উপর সাঁ-সাঁ শব্দে ডোঙারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

আর স্ফূর্তি মাছুড়েদের। বিল ফুঁড়ে রাজীবপুরের রাস্তা—এদিকে আসান নগরের বিল, ওদিকে চাতরার বিল। রাস্তার দুধারে পঞ্চাশ-ষাটজন ছিপ নিয়ে বসে গেছে। এ-বিলে ও-বিলে জল চলাচলের জন্য পাকা গাঁথনির প্রাচীন মরগা। ভেঙেচুরে গেছে এখন—ইট খুলে খুলে রাস্তার কাদার উপর দিয়ে পথিকজন সন্তর্পণে পা ফেলে চলে যায়। শুকনোর সময় পাশের খটখটে বিলে গরু-ছাগল বাঁধে, মরগার ইট খুলে ঘা মেরে মেরে খুঁটো পোতে তখন। এদিকে-ওদিকে পাকা-মরগার সামান্য নিশানা, বর্ষাকালে পারাপারের জন্য মাঝখানটায় বাঁশের সাঁকো বেঁধে নেয়। বর্ষান্তে সাঁকোর কাজ থাকে না, লোকে ভেঙেচুরে নিয়ে উনুনে পোড়ায়। বছর বছর নতুন সাঁকো বাঁধতে হয়, এবারও লেগে যাবে বাঁধতে। রাস্তার এপারে-ওপারে সারি-সারি মাছুড়েরা নির্বাক, নিশ্চল। নালশো অর্থাৎ লাল-পিঁপড়ের ডিম ছোটবড়শির আগায় গেঁথে নয়ানজুলিতে ফেলে, আর টান দেয়। টানে টানে পুঁটিমাছ। রোদের মধ্যে চাঁদিরুপোর টুকরোর মতন ঝিকঝিক করে জল থেকে উঠে আসে। খালুইতে ছুঁড়ে দিয়ে আবার ফেলল। মাছেরা লুকিয়ে আছে, সবুর সয় না। জলে পড়তে-না-পড়তে এসে টোপ ধরে—অমনি টান। যেন মেশিনের কাজ। এদিকে-ওদিকে পাশাপাশি সবগুলো ছিপ তুলেছে। খালুই ভরে ওঠে দেখতে দেখতে।

ডোঙা নয়ানজুলিতে এসে পড়লে হাঁ-হাঁ করে ওঠে নানাদিক থেকে: মাছ ঘাঁটা দিও না, হাত নরম করে দূরে দূরে লগি মারো। চারো-ঘুনি-ঘুনসি মাছ ধরার নানান সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়েছে, জায়গা বুঝে পেতে আসবে। মানুষজন এদিগের এইবার খোঁড়া হয়ে পড়ল। ডোঙায় চড়ে যাবতীয় কাজকর্ম। আর

কিছুদিন পরে জল আরও বাড়লে ডোঙার দোসর ডিঙিও বিস্তর এসে পড়বে। মানুষের পা নামক অঙ্গ এই চার-পাঁচ মাস একেবারে না থাকলেই বা কি!

জল দেখে বুধোর বউর বাপের-বাড়ি যাবার শখ হল। মা বুড়ি ভুগছে অনেক দিন, মেয়ের জন্য পথ তাকাচ্ছে। এদ্দিন যেতে হলে গরুর-গাড়ি ছাড়া উপায় ছিল না—তিন টাকা নিদেন পক্ষে ভাড়া। দিচ্ছে কে থোক টাকা? অসুখ মায়ের জন্য এটা-সেটা গুছিয়ে পেঁটরা ভরেছে। ভবনাথের ভিটে-বাড়ির প্রথা—সন্ধ্যাবেলা বউ মনিব-বাড়ি গিয়ে বড়গিন্নি ছোটগিন্নি উভয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বলে-কয়ে এলো। ঘাটে ডোঙা এনে রেখেছে—শেষরাত্রে চাঁদ উঠে গেলে পেঁটরা মাথায় নিয়ে বুধো আগে আগে চলল, পিছনে বউটা হাতে বোঁচকা ঝুলিয়ে নিয়েছে, ছোট একটা পিঁড়িও নিয়েছে আরামে বসবার জন্য। ডোঙা বেয়ে নিয়ে যাবে বুধো, এই মওকায় তারও অনেকদিন পরে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হচ্ছে।

॥ তেরো ॥

গড়মণ্ডলের রথের মেলার নামডাক খুব। গ্রামটা হরিহর গাঙের উপরে, সোনাখড়ি থেকে ক্রোশ চারেক দূর। নাম শুনে মনে হবে মস্ত এক জায়গা, গড়-টড় অনেক কিছু আছে। ছিল হয়তো কোন এক কালে—পরিত্যক্ত ভাঙা দালানকোঠা আছেও দু-চারটে। গ্রাম জুড়ে এখন কেবল বেতবন বাঁশঝাড় কসাড় জঙ্গল আর মজা-পুকুর। বসতি যৎসামান্য। ব্রাহ্মণ ও বারুজীবী আছেন কয়েক ঘর, বাকি সব জেলে। আর আছে তিনটে নাম—সরখেলবাড়ি সরকার বাড়ি মুস্তোফি-বাড়ি—জঙ্গলে-ঢাকা ইটের স্তূপ, সাপ আর বুনো-শুয়োরের আস্তানা। লোকে তবু সম্ভ্রম করে তিন বাড়ির কথা বলে থাকে।

এমন ভগ্নস্তূপ, একদা অনেক ছিল। রথের আড়ং সেই পুরানো কালের সাক্ষি। তল্লাটের মধ্যে এত বড় মেলা দ্বিতীয় নেই। মেলার মালিক বারুজীবী সরকারমশায়রা। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটে, সারা বছর মেলার জন্য মুকিয়ে থাকেন। দোকানপাট ও মানুষজনে হপ্তাখানেক ধরে গ্রাম গমগম করে, মালিকদের রীতিমত দু-পয়সা লভ্য হয়। দীর্ঘ রাস্তা গ্রামের এ সীমানা থেকে ও-সীমানা পর্যন্ত। চওড়াও যথেষ্ট। অন্য সময় আগাছা ও বাসবনে ঢেকে যায়, পায়ে-চলা একটুকু সুঁড়িপথ নিশানা থাকে শুধু। আড়ঙের সময় দোকানিরা জঙ্গল সাফসাফাই করে নিয়ে চালাঘর তোলে। খুঁটি পুঁততে গিয়ে ইট বেরোয়। বোঝা যায়, সমস্তটা ইটে বাঁধানো

পাকারাস্তা ছিল—উপরে এখন মাটির আস্তরণ পড়ে গেছে। সরকারবাড়িতে যদুপতি নামে বিশেষ এক ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরই কীর্তি এ-সমস্ত।

রথের উপরে জগন্নাথ-দর্শন হলে মুক্তি মুঠোয় এসে গেল, বারম্বার জন্ম নিয়ে সংসারের দুঃখ-ধান্দা ভুগতে হবে না। রথযাত্রার মুখে যদুপতি পুরী চলেছেন—অনাথ দরিদ্র ক্ষেন্তি-বুড়ি এসে পথ আটকাল: তোমার বাবা কতটুকু আর বয়স, পয়সা আছে বলেই যেতে পারছ। আমি বুড়োমানুষ, আজ বাদে মরে যাব, দর্শনে আমারই গরজ বেশি। ছাড়ব না তোমায়, আমি সঙ্গে যাব।

বুড়ির ধরাধরি কান্নাকাটিতে যদুপতি দোমনা হলেন। রটনা হয়ে গেল, যদুপতি ক্ষেন্তি-বুড়িকে শ্রীক্ষেত্র নিয়ে যাচ্ছেন, জগন্নাথের রথ দেখাবেন। সাড়া পড়ল চতুর্দিকে—জাতিগোষ্ঠি আত্মীয়কুটুম্ব সকলে তখন দাবিদার। ক্ষেন্তি-বুড়ি যেতে পারে, আমরাই বা কি দোষ করলাম? আমাদেরও নিয়ে যেতে হবে।

ওরে বাবা, কী কাণ্ড। গ্রাম কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সঙ্গে নিতে হয় যে! যদুপতি সকাতরে বললেন, মা-সকল বাবা-সকল আমায় একলাই যেতে দাও। তন্নতন্ন করে দেখে বুঝে আসব। তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে তীর্থসিদ্ধি করে সুভালাভালি যদি ঘরে ফিরতে পারি—কথা দিয়ে যাচ্ছি, এই গড়মণ্ডলেই আগামী সন রথযাত্রা হবে। পুরীধামে যেমন যেমন হয়, ঠিক তেমনটি। কথায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দাও আমায়, পথে বেরিয়ে পড়ি।

পুরী যাওয়া বড় কষ্টকর তখন। চাল-চিঁড়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে যেত লোকে, এক-মাসের উপর লাগত। যদুপতি বুঝিয়ে বললেন, সবসুদ্ধ কষ্ট করার কি দরকার। কষ্ট একলা আমার উপর দিয়েই যাক। সামনের আষাঢ়ে আমাদের এখানেই জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম রথে চড়ে মাসির বাড়ি যাবেন।

যে কথা, সেই কাজ। সেই কত দূরের শ্রীক্ষেত্র থেকে যদুপতি জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের বিগ্রহ কাঁধে করে গ্রামে নিয়ে এলেন। প্রশস্ত পথ বানানো হল গ্রামের মাঝখান দিয়ে, দৈর্ঘ্যে আধক্রোশ। পথের দু'মাথায় দুই মন্দির——একটি ঠাকুরবাড়ি, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত যেখানে। অপরটি মাসির বাড়ি, রথযাত্রার দিন বিগ্রহেরা যেখানে গিয়ে উঠবেন। মন্দিরের চিহ্নমাত্র নেই এখন, মেলাক্ষেত্রের এদিকে আর ওদিকে জঙ্গলে-ঢাকা ইটের স্তূপ দুটো। রথও নেই—প্রাচীনদের মুখে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাঁদের আমলের প্রাচীনদের মুখে তাঁরা গল্প শুনেছিলেন। দৈত্যাকার রথ—চল্লিশ হাত উঁচু। চাকা ষোলখানা, ঘাড়-বাঁকানো তেজীয়ান কাঠের ঘোড়া ছয়টা। অ্যাবড়ো অ্যাবড়ো দুই-চোখ, বিঘত-মাপের গোঁফ, কাঠের সারথি। মুণ্ডটা কি ভাবে সংগ্রহ করে আর্টিস্ট জটাধর বাড়িতে এনে রেখেছে—পুরো সারথির তাই থেকে আন্দাজ পাওয়া

যাবে। পাঁচটি থাক রথের, পাঁচটি বড় চূড়া—তা ছাড়া খুচরা চূড়াও বিস্তর। উঁচুতে পনের হাত। আর বাড়ানো গেল না—বড় বড় ডাল কেটে ফেলতে হয়, মালিকদের আপত্তি। শত শত মানুষ রথ টানতে আসে, পথ চওড়া করতে গিয়ে গণ্ডগোল। জমি কেউ ছাড়বে না, মূল্য দিলেও না। যদুপতিও জেদি মানুষ, হার মেনে পিছিয়ে আসবেন না কিছুতে। ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা ফৌজদারি। সর্বস্বান্ত হয়ে যদুপতি অসুখে শেষটা পঙ্গু হয়ে পড়লেন। রথটানা বন্ধ। অচল রথের পূজো হল কিছু দিন, যদুপতি মারা যাবার পরে তা ও বন্ধ। রথের কাঠকুটো লোকে ইচ্ছা মতন ভেঙেচুরে নিয়ে গেল। পরবর্তীকালে রীতি-রক্ষার মতন রথ-টানা আবার চালু হয়েছে। গাঁওটি-রথ—গ্রামের দশজনে চাঁদা তুলে চালায়। নিতান্তই ছেলেখেলা সেকালের তুলনায়। দরিদ্র গ্রামবাসী—বিশ-পঁচিশের বেশী চাঁদা ওঠে না, ভাল রথ কেমন করে হবে? কিন্তু মেলার জাঁকজমক ঠিকই আছে—বেড়েছে বই কমেনি।

এবারে রথের সঙ্গে ইদ ও রবিবার জুড়ে গিয়ে কাছারি তিন দিন বন্ধ। মাদার ঘোষ বাড়ি এসে হারুকে প্রস্তাব দিলেন: রথের মেলায় যাই চলো। দু-তিন বছর যাওয়া হয়নি।

হারু বলে, শুধু রথ দেখা?

হেসে মাদার বলেন, ঠিক ধরেছ, কলা বেচাও আছে। রং-কাপড় কিনে দিলাম, সিনের কদ্দুর কি করল দেখে আসা যাবে। কাজ দেখে তোমাদের যেমন মনে হয় বলবে।

গরুর-গাড়ি ভাড়া হল। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে না কেউ অবশ্য—থাক তবু সঙ্গে। খাট-চেয়ার পিঁড়ি-বেলকো থেকে সেলতুক-রামদা ইত্যাদি কাঠের ও লোহার ভাল ভাল জিনিস মেলায় আমদানি হয়। স্থানীয় কারিগরদের গড়া, দামেও সুবিধা। অল্পবিস্তর নিশ্চয় কেনাকাটা হবে, ফিরতি বেলা গাড়ি বোঝাই হবে সেই সব।

শেষরাত্রে বেরিয়ে পড়লেন। চারজন—মাদার হারু ঝন্টু ও হিমচাঁদ। পোহাতি-তারা আকাশে জ্বলজ্বল করছে। চারিদিকে আঁধার-আঁধার ভাব। শিউলি-তলায় ফুলের খই ছড়িয়ে আছে, এখনো পড়ছে ফুল। বকুলতলাতেও তাই নতুনবাড়ির বড়পুকুর-ঘাটের দু-দিকে বিশাল দুই কামিনীগাছ—ঘাটের রানায়ের উপর সাদা কামিনীফুল সন্ধ্যা থেকে পড়ে গাদা হয়ে গেছে। গ্রাম ছাড়িয়ে হাটের রাস্তায় এইবার। বিলের ধারে ধারে চলেছেন। ভোরের হাওয়া দিয়েছে—গা শিরশির করে, তবু বেশ আরাম।

গাছে গাছে পাখির কলরব। খানাখন্দ জলে টইটম্বুর, শাপলাফুল হাজারে

হাজারে হাল মেলে আছে। আউশক্ষেতের চেহারা গাঢ় শ্যাম, উপর দিয়ে শনশন করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, থানবনে ঢেউ উঠছে। পূবের আকাশ ডগমগে-লাল হয়ে উঠল, বিলের উপরে রক্তিম আভা। ডোঙা নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে মানুষ চারো-ঘুনসি তুলে তুলে মাছ ঝেড়ে নিচ্ছে। আষাঢ়ের দিনেও সারা আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই—বড় সুন্দর সকালবেলা।

পথের মাঝখানটা পায়ে পায়ে কাদা হয়ে গেছে, কাদা এড়িয়ে পাশে পাশে ঘাসের উপর দিয়ে যাচ্ছেন। পা হড়কে বঙ্কু ধপাস করে আছাড় খেয়ে পড়ল—কাদায় জলে মাখামাখি। পাশের নয়ানজুলিতে গা-মাথা ও কাপড়-জামার কাদা ধুয়ে গরুর-গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো কাপড় বোঁচকায় বাঁধা, গাড়িতে আসছে। গাড়ি বেশ খানিকটা পিছনে, দাঁড়িয়েই আছে তারা। গাড়োয়ানের উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে উঠল: কই, কি হল তোমার? গরু যেন শুয়ে শুয়ে আসছে।

অপমানে হল বুঝি গরুর নিন্দায়। লেজ মলে ডা-ডা ডা-ডা করে তাড়িয়ে অল্প সময়ে গাড়ি এসে পড়ল, গরুর ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিল।

চারজনে উঠে বসলেন গাড়িতে। ছই নেই। চড়া রোদ্দুর, তবে হাওয়াটা ঠাণ্ডা। চলেছে, চলেছে। মাছনা নামে এক গণ্ডগ্রামে এসে পড়ল। জমিদার-কাছারির সামনে দিয়ে পথ। চারিদিকে গাছপালা—আম জাম কাঁঠাল নারকেল সুপারি। ছায়া-ছায়া জায়গা। চার-পাঁচ খানা ঘর ইতস্তত—কাচনির বেড়া, খড়ের ছাউনি। চালের উপর কুমড়া ফলে আছে, উঠানের মাচায় ঝিঙে পোল্লা ব বটি উচ্ছে। কেন্দ্রস্থলে মূল-কাছারির একটু বিশেষ কৌলিন্য—ইট-দেয়ালের আটচালা ঘর। রান্নাঘরের পাশে ছাই-গাদা এই উঁচু হয়ে উঠেছে, নেঁকিকুকুর একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে আরামে তার উপর শুয়ে আছে। গরুর-গাড়ি দেখে গায়ের ছাই ঝেড়ে ঘেউ-ঘেউ করে তেড়ে আসে। গাড়ির উপর থেকে ছাতি উঁচাল তো সোঁচা দৌড়। ঘেউ-ঘেউ তিলেকের তরে ছাড়ে না, খানিকটা গিয়ে ফিরে দাঁড়ায় আবার কুকুর।

তহশিলদার নিশি বোস ডোবার ঘাট থেকে রাস্তা পার হয়ে কাছারির উঠোনে ঢুকছিলেন, 'এইও' 'এইও' হাঁক পেড়ে কুকুর সামলাচ্ছেন তিনি। কাছে এসে অবাক হয়ে বললেন, হিমে মামা না? কোথায় চললে তোমরা সব? তা আর এগোচ্ছ কেন, গাড়ির মুখ ঘোরাও গাড়োয়ান।

হিমচাঁদের সঙ্গে নিশিকান্ত কি রকমের মামা-ভাগনে সম্পর্ক—ঠিকঠাক বুঝতে গেলে কাগজ-কলম লাগবে, এমনি-এমনি হবে না। কিস্তির মুখে সোনাখড়িতে যখন আদায়-তহশিলে যান, হিমচাঁদের বাইরের ঘরে অষ্টপ্রহর-

কাছারি বসে। সেই অবস্থায় নিশিকান্ত চৌধুরি—এমনি কিন্তু মানুষটি সামাজিক খুব। খেতে ও খাওয়াতে জুড়ি মেলা ভার।

ছুটে এসে গাড়ির মুখোমুখি হয়ে নিশিকান্ত জোয়াল এঁটে ধরলেন। বলেন আড়ঙে যাচ্ছ—এখন কি তার? সে তো বিকেলবেলা। খেয়েদেয়ে নাক ডেকে ঘুমোও পড়ে পড়ে—ঠিক সময়ে আমি রওনা করে দেবো। আমাদের বরকন্দাজ আর মতীন মুহুরিও যাবে বলছিল, দল বেঁধে সব যেতে পারবে।

মাধব আপত্তি করে বলেন, আড়ঙে যাওয়া আসল নয়। শুনেছেন বোধহয়, এবারের আশ্বিনে পূজো-থিয়েটার দুই রকম হচ্ছে আমাদের সোনাখড়িতে। থিয়েটারের সিন আঁকছে ওখানে। কেমন হল, দেখতে যাচ্ছি।

ওখানে মানে গড়মণ্ডলে আপনাদের সিন আঁকছে? বিস্ময়ে নিশি বোস প্রশ্ন করলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আর্টিস্ট জটাধর সরকার আঁকছেন।

হিমচাঁদ বললেন, জাঁদরেল আর্টিস্ট—এঁদের দেখে আর্ট-ইস্কুল তাজ্জব মেনেছে।

ঝট্ জুড়ে দেন: হাতে সময় নিয়ে বেরিয়েছি সেই জন্যে। ডাল-ভাত চাট্টি ওখানেই খেয়ে নেওয়া যাবে।

খেতে দিলে তবে তো!

শেষের কথাগুলো নিশি আমলেই নিলেন না, খিড়-খিড় করে আর্টিস্ট জটাধর মানুষটির হদিস খুঁজছেন। চিনেও ফেললেন। অবাক হয়ে বলেন, বলো কি হে, এত গুণের মানুষ? হাটে হাটে তবে পান বেচে বেড়ায় কেন?

মাধব একটু মুসড়ে গেলেন: পান বেচে নাকি?

হাঁক সামলে দেবার চেষ্টা করে বলে, পানের খদ্দের যে-না সেই - সিনের খদ্দের ক'টা আছে বলুন?

তা বটে, তা বটে—

নিশি প্রণিধান করলেন। এবং মাধবও। ইতিমধ্যে জোয়াল থেকে গরু খুলে কাঁঠালগাছের ছায়ায় বেঁধে দিয়েছে। পোয়ালগাদা দেখিয়ে গাড়োয়ানকে নিশি বললেন, চাট্টি চাট্টি পোয়াল এনে গরুর মুখে দাও। আর গাছে উঠে কাঁদি দুই-তিন ডাব পেড়ে ফেল। ডাকের দেরি আছে, শাঁসে জলে পেটে ভর দিয়ে যাও খানিক।

হুলুস্থুল হৈ চৈ লাগালেন তিনি। মুহুরি মতীনকে বললেন, ঘাটে যাও কুঁড়োর চার দিয়ে খেপলাজাল ফেল দিকি। বড় রুইটা যদি বেড়ে ফেলানো যায়।

মাধব বললেন, বেলা হয়ে গেছে—এখন আর ওসব ঝঞ্ঝাটে যাবেন না

বায়েবমশায়। উপস্থিত মতন যা আছে, তাতেই হয়ে যাবে।

শিশি ঘাড় নাড়লেন : তাই কখনো হয়! ছিমে-বাবার কথা না-ই ধরলাম—আউনাদের এতজনকে আর কবে পাচ্ছি বলুন।

বরকন্দাজ ডাকাডাকি লাগিয়েছেন : কাঁহা গিয়া হরি সিং—হরি সিং গেল কোথা? কুটুম্বলোক আয়া—কুটুম্বরা সব এসেছেন। পাড়ায় এখন সব গাই দুইছে, কলসি নেকে বেরিয়ে পড়ো। চার সের পাঁচ সের যদ্দুর পাও, নিয়ে এসো।

খাওয়াদাওয়ার অল্প পরেই রওনা। সিনের জন্য উদ্‌গ্রীব—তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়া দরকার। ঘোর হয়ে গেলে কিম্বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে, রঙের জৌলুষ ঠিকমতো ধরা যাবে না। পথে ভিড়, আড়ঙে চলেছে সব—বুড়ো যুবা বাচ্চা, নানান বয়সের। হাতে বাঁশের লাঠি, লাল গামছা কোমরে বাঁধা, নিতান্ত বাচ্চাগুলোকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে। শৌখিন কারো বা এক-হাতে ছাতা, এক-হাতে বার্নিশ-চটি, অঙ্গে ফুল-কাটা কামিজ। বাহারে টেড়ি কেটেছে তেল-জবজবে চুলের মাঝামাঝি চিরে।

মেয়েরাও সঙ্গে। পাছাপেড়ে শাড়ি পরনে, হাতে রুপোর বালা, একগোছা বেলোয়ারি চুড়ি, কোমরে গোট, কানে ইয়ারিং বা ইহুদি-মাকড়ি, নাকে নথ, গলায় দানা, কপালে টিপ, চোখে কাজল, কপালে ঢ্যাবড়ো সিঁদুরফোঁটা—বয়সকেলে যারা, মোটামুটি এমনিতরো সাজগোজ তাদের।

চড়চড়ে রোদ, মেঠো রাস্তা। থোলো থোলো কালো জাম পেকে আছে। তেষ্টা মেটাতে গাছে উঠে পড়েছে ক-জন, তলায় ঘিরে দাঁড়িয়ে কাকুতিমিনতি করছে কেউ কেউ। জাম ফেলছে না গাছের মানুষ, খেয়ে আঁটি ছুঁড়ে মারছে।

আড়ঙে অনেক গরুর-গাড়িতেও যাচ্ছে, হারুদের আগে পিছে আট-দশখানা হয়ে গেল। পাল্লাপাল্লি চলছে কে আগে গিয়ে উঠতে পারে, গরু ঘোড়ায় কান মলে দিচ্ছে দৌড়ানোর বাবদে। মাঠ ছাড়িয়ে কয়েকটা বাঁশবন ও ধবধবির খাল পার হয়ে গঁড়মণ্ডল। এবং অনতিপরেই রথতলা—আড়ঙ যেখানে বসেছে।

কত দূর-দূরন্তর থেকে লোক আসছে। দোকানদারই বা কত? জঙ্গল সাফ-সাফাই করে সারি সারি চাপড়া বেঁধে নিয়েছে। দোকানের মালপত্র গরুর-গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে, হরিহরের উপর দিয়ে জলপথেও এসেছে। কাপড়ে দোকান, লোহার দোকান, কাঠের দোকান, পিতল-কাঁসার দোকান, পাথরের দোকান—দোকানের অবধি নেই।

মেলার মধ্যে গাড়ি ঢোকে না, গাঙ-কিনারে উলুবনে নিয়ে রাখছে। গাড়িতে গাড়িতে জায়গা ভরে গেল। সামান্য দূরে কীর্তিমান যদুপতি সরকারের

অট্টালিকার অবশেষ। রাস্তার সামনে ছিল ঠাকুরবাড়ি, তারই গায়ে দেউড়ির চিহ্ন। ভিতর দিকে এগিয়ে যাও—দু-পাশে কুঠুরি আত্মীয়-কুটুম্ব ও বাইরের লোকের জন্য। কয়েকটার আচ্ছাদন আছে, মেলা উপলক্ষে সাফসাফাই হয়েছে সেগুলো। ছাতে বারোমাস চামচিকে ঝোলে—চামচিকে তাড়ানো হলেও একটা উৎকট গন্ধ কিছুতে ছাড়ায় না। তাহলেও মোটামুটি বাসযোগ্য হয়েছে — বৃষ্টিবাদলা হলে মানুষজন আশ্রয় নিতে পারবে, রাঁধাবাড়া করে খেতেও পারবে।

গরুর-গাড়ি ছেড়ে মাদার ঘোষের দল মেলার রাস্তায় এগিয়ে চলল।

মিঠাইয়ের দোকানে তেলেভাজা জিলিপি এক পয়সায় চারখানা। মুড়ি পাহাড়ের চুড়োর আকৃতিতে ডালির উপর উঁচু হয়ে রয়েছে। যত মুড়ি দেখা যায়, আসলে তার সিকির সিকিও নয়। উপুড়-করা পালির উপরে মুড়ি ঢেলে রেখেছে, অত উঁচু দেখাচ্ছে তাই। মুড়ি আর চিনির-রথ দু-আনার মতো কিনে চার জন চিবোতে চিবোতে চলল।

নগরকীর্তন বেরিয়েছে। হেলতে দুলতে অতি মন্থর যাচ্ছে। বধীয়সীরা চিব চিব করে পায় পড়ে পদধূলি নিচ্ছেন। ইচ্ছে হলেও ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি এগোবার জো নেই। কুমোরের দোকান—মাটির খেলনা, কত ছাই। হাঁড়ি বাঁশি—ছোট্ট হাঁড়ি দাগচোক-আঁকা, একদিকে নল, নলে ফুঁ দিলে মিষ্টি সুর বেরোয়। মাটির জাঁতা-হাঁড়ি-কলসি-তাওয়া-শিলনোড়া। নাড়ুগোপাল—নীল পুতুল হামাগুড়ি দিয়ে আছে, ডান হাতে বলের মতন বস্তু—মাখনের ডেলা বলে ধরে নিতে হবে। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, কলসি-মাথায় রমণী, হাতির শুঁড়ওয়ালা গণেশ।

রকমারি শোলার জিনিস এসেছে। দাঁড়ে টিয়াপাখি, পালকিতে বর। দড়ির টানে হনুমান কলাগাছে ওঠে আর নামে। সাপ ছোবল মারে, আবার ঘাড় নুইয়ে পড়ে। কামারের জিনিস: ছুরি বঁটি কোরন কাটারি—

থাক, কেনাকাটা পরে হবে—ফিরতি বেলা। বরঞ্চ পান খেয়ে নেওয়া যাক।

নাগরদোলা'র কাঠের ঘোড়া বনবন করে পাক খাচ্ছে। অল্প দূরে বাঁশে-ঘেরা মাল-লাগার জায়গা। ঢোল বাজছে। এ তল্লাটের বিখ্যাত মাল কেতুচালি এসেছে—দৈত্যসম চেহারা, গায়ের জোর ছাড়াও গুণজ্ঞান বিস্তর। ধুলো পড়ে গায়ে ঘষে নেয়, তারপর দা দিয়ে কোপালেও গায়ে বসবে না। বেশি কোপাকোপি করলে দায়েরই ধার পড়ে যাবে, কেতুর কিছু হবে না। কেতু কিন্তু নিজে এখন নামছে না, যোগ্য প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় আছে। কৌতুকদৃষ্টি মেলে হালের ছোকরাদের কাজকর্ম দেখছে।

পানের দোকানে, সরবত-লেমনেড নয়, রঙিন জল বোতলে ভরে মিছামিছি

সাজিয়ে দিয়েছে। দোকানের বাহার। ভবন-ঘিঘি মেতে দিচ্ছে—তাকিয়ে তাকিয়ে চতুর্দিকে দেখছে এরা। মেলার মালিক সরকারমশায়রা বেরিয়ে পড়েছেন, মুটে সঙ্গে নিয়ে তোলা তুলছেন। জিজ্ঞাসাবাদ নেই—ধামায় ডালায় হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে তুলে নিয়ে মুটের মাথায় ঝুড়ির মধ্যে ফেলছেন। দিও না, অত নিলে বাঁচব না কর্তা—বলছে দোকানি, কাকুতিমিনতি করছে। দয়া হল তো মুঠো থেকে কিছু পরিমাণ রাখলেন আবার ডালায়।

জয় জগন্নাথ, হরিবোল, হরি হরিবোল—তুমুল রোল ওদিকে। রথ বেরিয়েছে। কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, ঢোল-কাঁসিও আছে একজোড়া। চারদিক থেকে পানের-বিড়ে সুপারি পাকাকলা বাতাসা পয়সাকড়ি পড়ছে রথের উপর। যদুপতি সরকারের রথ একদিন চলতে এখানে—এই রাস্তার উপর দিয়ে, মহাবৃক্ষ ঐ আমগাছের বড় ডালখানা ছুঁয়ে যেত। আর এখানকার এই রথ এক-মানুষের সমান বড় জোর। আয়তন যাই হোক, বিষম হল্লোড়। ভক্তজনেরা পাগল হয়ে উঠেছে—রথের উপরের ঠাকুর দেখবে, রথের রশি একটুকু ছোঁবে। মেয়েরা একদিকে গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়েছে, রথ কাছাকাছি হলে গলায় আঁচল দিয়ে যুক্তকরে প্রণাম করছে, উলু দিয়ে উঠছে কলকল করে।…

আড়ং ছাড়িয়ে আরও পোয়াটাক গিয়ে আর্টিস্ট জটাধরের বাড়ি। সাতচালা ঘর একখানা—এ পাশে কামরায় স্টুডিও, মাঝের বড়ঘরে বউ ছেলেপুলেরা থাকে। মুহুরি সুরেন বিশ্বাসকে দিয়ে সদরের চিঠি লিখিয়ে দিয়েছেন, রথের সময় গিয়ে সিনের কাজকর্ম দেখবেন। জটাধরও তৈরি—ধোপদুরস্ত কামিজ গায়ে দিয়ে চুলে টেড়ি বাগিয়ে দুপুর থেকে ঘর-বার করছে। একখানা সিন পুরোপুরি শেষ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে, হাত লাগালে গুণিজনের ক'দিন লাগে। সিন শেষ করে তলতাবাঁশে পরিপাটি করে জড়িয়ে রেখেছে।

গড়বগুলের মানুষ গোড়ায় বিশ্বাস করেনি—জটাধর ধাপ্পা দিয়ে খাতির বাড়াচ্ছে ভেবেছিল। কিন্তু সোনাখড়ির চার মাতব্বর গরুর-গাড়ি করে কাজ দেখতে এসেছেন, এর পরে মানুষটাকে হেলা-ফেলা করা যায় না। গাঁয়ের মানুষও একপাল জুটে গেছে—কাজ তারাও দেখবে, রথের মেলা ফেলে সঙ্গে সঙ্গে চলল।

সিন বের করে জটাধর উঠানে নিয়ে এলো। উজ্জ্বল আলো উঠানে, দিব্যি খুঁটিয়ে দেখা চলবে। দুই ছোকরা বাঁশের দুই মুড়ো ধরে আছে, আর্টিস্ট নিজে অতি সন্তর্পণে গুটানো সিন খুলে দিচ্ছে। একটু একটু করে খুলে আসছে—আশ্চর্য এক রহস্যের উন্মোচন যেন—আর জটাধর তাকাচ্ছে ঘন ঘন মাতব্বরদের মুখের দিকে।

চোখ বড় হয়ে গেছে বাঘারের। সগর্বে জটাধর গ্রামবাসীদের দিকে তাকায়—কী হে বড় যে আমায় হেনস্থা করতে! ভাবখানা এই প্রকার। হাকর কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। এমনিধারা চোখ বড়-বড় করা দেখা আছে ইতিপূর্বে। বাঘার ঘোষের অনেক গুণ, কিন্তু বিষম বদরাগি। রেগে গেলে স্থান-কাল বিস্মরণ হয়ে যান। সিঁধের মুখে একবার চোর ধরা পড়ে ছল। বাঘার ঘোষ গিয়ে বললেন, সে তো বুঝলাম ধোওয়া-তুলসিপাতা তুই, কিন্তু কুলবেড়ের মানুষ হয়ে সোনাখড়ির মণ্ডলবাড়ি কেমন করে এসে পড়লি বুঝিয়ে দে তো শুনি। চোরের কৈফিয়ত: মাঠ ভেঙে কুটুম্ববাড়ি যাচ্ছিল বেচারি, আচমকা একটা খারাপ বাতাস উঠে এখানে উড়িয়ে এনে ফেলেছে (খারাপ বাতাস মানে অপদেবতা)। সেই বাতাসই বুঝি সিঁধকাঠি তোর হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে? বাঘার ঘোষ প্রশ্ন করলেন। আর পাশে-দাঁড়ানো হাকু সেই সময় ঠাহর করেছিল, বাঘার ঘোষ চোরের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে-ছিলেন অবিকল এই আজকের মতন। আর্টিস্ট দু-পাটি দাঁত মেলে হেসে হেসে পড়শিদের কাছে বাহাদুরি নিচ্ছে, কিন্তু বহুদর্শী হাকর মুখ শুকাল। গ্রামের উপর যেমন খুশি চোর পেটানো যায়, এখানে ভিন্ন এলাকায় বেকায়দা সামলালে চোরের মার নিজেদেরই খেয়ে যেতে হবে।

তা বাঘার ঘোষ বুঝেছেন বোধহয় সেটা। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপন চালাচ্ছেন: অরণ্যের সিন বুঝি?

অবোধের মতন কথা শুনে জটাধর একগাল হেসে বলল, দরবার-কক্ষ।

ঝণ্টু বলে, এদিক-সেদিক মস্ত মস্ত গাছ—কক্ষের ভিতরে এত গাছ গজাল কেমন করে?

জটাধর বুঝিয়ে দিল: কক্ষের থাম্বা এগুলো।

হিমচাঁদ বললেন, থামে যেন কাঁঠাল ফলে আছে—

কাঁঠাল নয়, ঝাড়লণ্ঠন।

বুঝেছি—ধমক দিয়ে বাঘার আর্টিস্টকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, গাঙের ঘাটে চলো আমার সঙ্গে।

এই রে:, ধরে গাঙে চুবানোর বোধহয় মতলব। বিচিত্র নয় ঐ রাগি মানুষের পক্ষে। বাঘার নিজে পা বাড়ালেন গাঙের দিকে, আদেশ করলেন: চলে এসো।

ছোকরাদের উদ্দেশ করে বললেন, বাঁশ খুলে ফেলে সিনটাও আনো।

হতভম্ব হয়ে জটাধর প্রশ্ন করে: গাঙে কি?

আর্টিস্ট বলে ভাঁওতা দিয়েছিলে। রং মেখে একটা কাপড় নষ্ট করেছ—রং ধুয়ে সাফসাফাই করে দিতে হবে।

জোর দিয়ে দাদার আবার বলেন, তুমি বাধিয়েছ—নিজের হাতে তোমাকেই ধুতে হবে।

হারু বলল, সদর থেকে সিন ভাড়া করে আনব—আগে যা কথা হয়েছিল। তা ছাড়া উপায় নেই। সিনের নামে থানকাপড় কেনা হয়েছে—সেলাই করে সামিয়ানা বানাব। সামিয়ানারও তো দরকার।

জেদি মানুষ দাদার ঘোষ, যা বলছেন তাই করিয়ে তবে ছাড়লেন। গতিক বুঝে জটাধরও প্রতিবাদের সাহস পেল না। গাঙের একহাঁটু জলে দাঁড়িয়ে সিন কাচছে। গাঁয়ের ছোকরাগুলো ফ্যা-ফ্যা করে হাসছিল, তারপর আড়ঙে চলে গেল।

ভিজে থানের জল নিংড়াতে নিংড়াতে জটাধর উঠে এসে বলে, আমার বিশটা দিনের খাটনি, তার কিছু পাওনা হবে না?

দিনচাঁদ হারুকে ফিস-ফিস করে বলেন, এই মরেছে, পাওনার কথা বলছে যে। দাদার-দা এবারে তো পাওনা শোধে লেগে যাবেন—আমি চললাম। ছোট মেয়েটার জন্য একপ্রস্থ কুমোর-সজ্জা কিনতে হবে। কেনাকাটা করে আমি গরুর-গাড়ির কাছে থাকব, এসো তোমরা।

বলে হন হন করে মুহূর্তে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

দাদার জিজ্ঞাসা করলেন, পাওনা চাচ্ছ?

সবিনয়ে ঘাড় কাত করে জটাধর বলল, আজ্ঞে—

পাওনাগণ্ডা এই হল যে রঙের দামটা তোমার কাছ থেকে আদায় করলাম না। তোমার ভগ্নিপতি সুরেন আমার মুহুরি, সেই খাতিরে ওটা আমি নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেবো।

যাবতীয় কাপড় এবং রং-তুলি যা বাড়তি ছিল, গরুর-গাড়িতে তুলে নিয়ে সন্ধ্যার মুখে সকলে সোনাখড়ি ফেরত চললেন।

সোনাখড়িতে রথের দিনে আজ ছোটখাট মচ্ছব পুববাড়ির সদ্যসমাপ্ত খোড়ো চণ্ডীমণ্ডপে। নতুন ঘর বাঁধতে ভবনাথের জুড়ি নেই। বাঁশঝাড় বিস্তর আছে এবং উলুখড়ের জমিও অনেক। ইচ্ছে হলেই চট করে ঘর তুলতে পারেন। তোলেনও তাই। বাড়ির এদিকে-সেদিকে বাঁশের খুঁটি কাচনির বেড়া খোড়ো-চালের কত যে ঘর, হিসাবে আনা মুশকিল। লোকে বলে, জনমজুরের টাকাটা নগদ যদি না গুণতে হত, পুববাড়ির বড়কর্তা নিত্যিদিন একটা করে ঘর তুলতেন।

প্রতিমার কাঠাম দেওয়া হয় এই রথের দিন থেকে। বেলগাছ চিরে পাট

বানিয়েছে—পাটাতন, প্রতিমা যার উপরে দাঁড়াবেন। রাজীবপুরের পাল-কারিগরমশায়দের জনা দুই আজ এসেছেন, মণ্ডপের উত্তরের বেড়া ঘেঁসে পাট বসিয়েছেন। ঢাকে কাঠি পড়ে এইবার—ছেলেপুলে ছুটে এসে পড়ল, বড়রাও আছেন কিছু কিছু। হরির লুঠ: মা-দুর্গার প্রীতে হরি হরি বলো। লুঠের বাতাসা কাড়াকাড়ি করে সকলে কুড়ায়।

বাঁশ-বাখারি খড়-দড়ি নিয়ে কারিগরে কাজ ধরলেন। প্রতিমার কাঠাম আকৃতিগুলির মূল। আরম্ভটা করে দিয়েই একুনি ওঁরা অন্যত্র ছুটবেন, সেখানেও আজ আরম্ভ। ভাদ্রমাসের আগেই কাঠামের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে, মাটি উঠবে জন্মাষ্টমীর দিন। খড়ের কাঠামের গায়ে মাটি লেপা। পুজো-পুজো ভাব সেইদিন থেকে। একমেটে চলল ক'দিন ধরে। সেটা হয়ে গেল তো দিন দশেক কামাই—শুকানোর জন্য। তারপর দোমেটে। দোমেটের পরে দিন পাঁচেক বন্ধ রাখলেই যথেষ্ট। দোমেটের পর খড়ি দেওয়া, তারপরে রং-তুলির কাজ। এখন তো দিব্যি গতর এলিয়ে কাজকর্ম—শেষ মুখে তখন কারিগরদের আহার-নিদ্রা লোপ পেয়ে যাবে।

॥ চোদ্দ ॥

দোচালা বাংলাঘর, মন্তার-মা'র বাড়ি। বিধবা মেয়ে মন্তা আর তিনি—দুটি প্রাণী থাকেন। প্রহরখানেক-রাত, মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না। মন্তার-মা লাঠি ঠুক ঠুক করে উঠানের এদিক-সেদিক চক্কোর মারেন, খানিক আবার দাওয়ায় এসে বসেন। মানুষ দেখতে পেয়ে হাঁক পাড়েন: কে রে, কে ওখানে?

আমি—

নতুনবাড়ির রাখাল। থাকে নতুনবাড়ি, বাড়ি বিল-পারের মনোহরপুর গাঁয়ে। মেজঠাকরুন বিরজাবালার কনিষ্ঠ ভাই। ভাইকে তিনি চোখে হারান—লোকে বলে, কাজের গরজে। ছাটফাট করে রাখাল, গাইটা দেখে, রান্নার কাঠকুটোর জোগাড় দেয়। গাঁয়ের মানুষেরও করে, পারতপক্ষে কোন কাজে 'না' বলে না, সকলের সঙ্গে ভাবসাব। সোনাখড়িতেই পড়ে থাকে সে, বাড়ি কালেভদ্রে কদাচিৎ যায়। সেই যাওয়াটুকুও মেজঠাকরুন বন্ধ করবার তালে আছেন। নতুনবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা—বিদ্যের আবার বয়স আছে নাকি?—ভাইকে ঠাকরুন পাঠশালা জুড়ে দিতে চান। রাখালের মা-ভাইদেরও সেই ইচ্ছা: ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয়। বাংলা হস্তাক্ষর যদি খানিকটা রপ্ত করতে পারে, মুহুরিগিরি একটা ঠেকায় কে?

রাখাল বলল, হাটবেসাতি দিতে এসেছি মাউইমা।

এক পয়সার পান আর দু-পয়সার মতিহারি তামাক—এই হল মোটমাট বেসাতি। হাটের আগে মন্তার-মা তিনটে পয়সা দিয়ে এসেছিলেন। যেহেতু মেজঠাকরুনের শাশুড়ি সম্পর্কীয়, মন্তার-মাকে রাখাল মাউইমা বলে। বলছে, ছেঁচা-পান একটু মুখে না পড়লে মাউইমার ঘুম হবে না জানি। সাত তাড়া-তাড়ি তাই দিতে এলাম। যা ভেবেছি, তাই। এতক্ষণে তোমার তো এক ঘুম কাবার হবার কথা—আজকে জেগে বসে আছ।

পানের জন্যে বুঝি? সারা রাত আজ এইভাবে কাটবে, শোওয়াশুয়ি নেই।

রাখাল একেবারে ভিজে-বেরালটি। বলে, কেন—কেন?

চোরের পাহারায় আছি। মাচায় মিঠেকুমড়ো ফলে আছে, ঘরের চালে শশা। শুতে গেলে সমস্ত ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে যাবে।

এতক্ষণে যেন রাখালের খেয়াল এল। বলে, ও, নষ্টচন্দোর বুঝি আজ? তা চোর বললে কেন মাউইমা? খা-নার চুরি বলে একাহার নিতে যাও, নেবে না। নষ্টচন্দ্রে চুরি হয় না।

ভাদ্রের শুক্ল চতুর্থীর রাত্রে নষ্টচন্দ্র। শাস্ত্রীয় খবর, পাঁজিতে রয়েছে। আকাশের চাঁদ এ দিনে নষ্ট হয়ে যায়, দর্শন নিষেধ। দেখে যদি ফেলে, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত আছে—মজার প্রায়শ্চিত্ত। চুরি করতে হবে। ঘরের জিনিস কিছু নয়—বাইরের জিনিস, ফলটা পাকুড়টা, যা-সমস্ত ক্ষেতে ফলেছে। কাঁকুড় শশা, ফুটি, বাতাবিলেবু, কুমড়ো, আখ, ডাব ইত্যাদি। রাতের মধ্যেই খাওয়া সেরে ফেলবে, যে গৃহস্থর জিনিস তাকেও ভাগ দেবে। আর অজান্তে তাকে যদি একটু খাইয়ে দিতে পার সব পাপ কেটে গিয়ে উপরি পুণ্যার্জন।

রাখাল মন্তাকে ডাকছে: ওঠো মন্তাদিদি, মাউইমার পান ছেঁচে দাও।

ঘুমকাতুরে মন্তাকে ছুটো-পাঁচটা ডাকে তোলা যায় না। হামানদিস্তা নিয়ে রাখাল নিজেই তখন ছেঁচতে লেগে গেল।

মন্তার মা প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, তুই আবার কেন রে?

কারই না। হাত ক্ষয়ে যাবে না আমার—

প্রশ্ন করে: এ বাড়ির কর্তা চাঁদুবাবুর নামে তো সিঁথি পড়ত শুনেছি। তিনি নাকি বড় ছাড়া ছোট জিনিস রাখতেন না। হামানদিস্তা তবে ছোট কেন এমন?

মন্তার-মা বলেন, তোমার আমলের নাকি? সাড়ে-তিন কুড়ি বছর বয়স কাটিয়ে চলে গেলেন, একটা দাঁত পড়ে নি। ছোলা-ভাজা মটর-ভাজা কটর-মটর করে চিবিয়ে খেতেন। হামানদিস্তে ও-বছর ছেলের বাজারে আমিই

দিন আজ। বৃষ্টির কখনো ঝিরঝিরানি, কখনো ধারাবর্ষণ। আর জোর বাতাস। ডোবা-পুকুর সমস্ত ভেসে গেছে। পগার ছাপিয়ে জল রাস্তার উপর উঠেছে। হেড়াঞ্চি-বন জলতলে, উপর দিয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে—যে ডালটুকু জেগে আছে, গুড়িপি*পড়ে খিক-খিক করছে তার মাথায়। ধানক্ষেত ছিল ঘন সবুজ, জল চকচক করছে সেখানটা এখন।

লোকে তিতিবিরক্ত, আকাশের পানে চেয়ে কাতরাচ্ছে: দেবরাজ ক্ষমা দাও এবারে, সৃষ্টি-সংসার রসাতলে যাবার দাখিল। ছেলেপুলে ছড়া বলছে: লেবুর পাতায় করমচা, যা বিষ্টি ধরে যা।

জল্লাদ ঘোর থাকতে এসে দালানের দরজায় ঘা পাড়ছে, 'জেঠিমা' 'জেঠিমা' করে ডাকছে। ধড়মড় করে উমাসুন্দরী উঠে পড়লেন: কী রে? কি হয়েছে ও জল্লাদ?

বেরিয়ে দেখ জেঠিমা। ঠাকুর ধুয়ে গিয়ে খড় বেরিয়ে পড়েছেন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সোয়াস্তি নেই তোর জল্লাদ, মণ্ডপের মধ্যে মন পড়ে থাকে।

বৃষ্টিটা সামান্য বন্ধ হয়েছে তখন। বড়গিন্নি মণ্ডপে চললেন। পুঁটি জেগে পড়েছে চোখ মুছতে মুছতে সে-ও জেঠিমার পিছন ধরল। তারপরে নিমি এবং খোদ বড়কর্তা ভবনাথ। প্রতিমার দোমেটে সারা হয়ে বিরাম চলছে আজ ক'দিন, তারই মধ্যে দুর্যোগ। মণ্ডপের ভিতরে যাওয়া হল না—আগল বেঁধে ভিতরের পথ বন্ধ, শিয়ার-কুকুর না ঢুকে পড়তে পারে। জল্লাদ ঠিক বলেছে, বৃষ্টির ছাঁট লেগে প্রতিমার খানিক খানিক ধুয়ে গেছে। আজই পালমশায়দের খবর পাঠাতে হবে দাগরাজি করে দেবার জন্য। জলের ছাট আর না আসতে পারে—পূবদিকটা বিশেষভাবে চেঁচা-বাঁশের বেড়ায় ঘিরে দিতে হবে।

বড়গিন্নি বললেন, রাত থাকতে বেরিয়ে পড়েছিস জল্লাদ, পুজো-পুজো করে ক্ষেপে উঠলি যে একেবারে।

সকৌতুকে তাকিয়ে পড়ে জল্লাদ বলে, কোন তারিখ আজ খেয়াল আছে জেঠিমা? উঠতে দেরি করলে ভাদ্দুরে কিল খেয়ে মরতে হবে যে।

তা বটে। ভাদ্রমাসের শেষদিন আজ। ছোঁড়ার সর্ববিষয়ে হুঁশ আছে কেবল লেখাপড়াটা ছাড়া। আজ যারা সকালবেলা শুয়ে পড়বে ভাদ্রমাস যাবার মুখে বেদম কিলিয়ে সর্বাঙ্গ তাদের ব্যথা-ব্যথা করে দিয়ে যাবে।

কমলের কথা পুটি'র মনে পড়ে যায়। আহা, ভাইটি ঘুমুচ্ছে—খবর রাখে না ভাদ্র-সংক্রান্তি আজ। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে, ঘুম ভেঙে গায়ের ব্যথায় আর উঠতে পারবে না।

দক্ষিণের ঘরে পুঁটি ছুটল : ওঠ রে কমল, তাড়ুয়ে-কিল না খেতে চাস তো উঠে পড়্।

উঠতে চায় না তো টেনে তুলে ধরল। ঘুমঘোরে কমল ঝিমছি কাটছে, কিল-চড় মারছে দিদিকে।

পুঁটি বলে মারিস কেন রে? তোর ভালোর জন্যেই তুলে দিলাম। মাকে জিজ্ঞাস করে দেখ্।

মার খেয়েও হাসে পুঁটি। জল্লাদ উঠানে আছে, চোখ ইসারায় পুঁটিকে ডেকে নিয়ে সে বাইরের দিকে চলে গেল। হঠাৎ আজ বড় সদয় পুঁটির উপর। নিভৃতে গিয়ে বলে, তাল কুড়িয়ে আনিগে চল্ যাই।

পুঁটি বলে, তাল তো ফুরিয়ে গেল। এক-আধটা দৈবে-সৈবে পড়ে যদি, সে কি এতক্ষণ তলায় রয়েছে?

আছে রে আছে—

রহস্যময় হাসি হাসে জল্লাদ : গাঁয়ে থাকিস তোরা, কোথায় কি আছে তাকিয়েও দেখিস না। সে যা জায়গা—একজনে হবে না, দু'জন লাগে। সেই জন্যে ডাকছি। ফাঁকি দেবো না, অর্ধেক ভাগ—তাল দশটা পেলে পাঁচটা তোর পাঁচটা আমার। না যাস, লোকের অভাব কি—অন্য কাউকে ডেকে নেবো।

এক সঙ্গে দু'জনে গেলে বাড়ির লোকে সন্দেহ করবে, জল্লাদ একলা বেরিয়ে গেল। বাগের শেষপ্রান্তে কলাবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে সামান্য দূরে ডোঙা, তড়াক করে ডোঙায় লাফ দিয়ে পড়ল। পুঁটিকে ডাকে : আয়—

হাতে ধরে পুঁটিকে ডোঙায় তুলে নিল। ধবজি মেরে চলেছে। পুঁটির শাড়ির আঁচল কোমরে দিয়ে কোমরে বাঁধা—ধানক্ষেত ভেসে গেছে, অবাধে তার উপর দিয়ে ডোঙা বাইছে। বেশ খানিকটা গিয়ে উঁচু চটের জমি—ছোটখাট এক দ্বীপের মতন।

কাঁটাঝিটকে, বৈঁচি ও ন্যাড়াগেঁজির জঙ্গল, তার মধ্যে খেজুর ও তালগাছ কয়েকটা। বড়োসড়ো কুয়ো একটা পাশে—হিঞে-কলমির দামে ঢাকা। বিস্তর কসরতে জল্লাদ কুয়োর মধ্যে ডোঙা এনে ফেলল। কাঁটার জঙ্গলে তাল পড়ে আছে। কুয়োর জলেও ভাসছে কয়েকটা। জল্লাদ এত সব সন্ধান রাখে, তার অগোচর কিছু নেই। ডোঙা টলমল করছে, তার মধ্য থেকে হাত বাড়িয়ে তাল কুড়োতে হবে। কুড়োচ্ছে পুঁটি তাই। একটু এদিক-ওদিক হলেই ডোঙা কুয়োর তলে যাবে।

॥ পনের ॥

বৃষ্টিবাদলায় বড় বেশি জোর দিয়েছে। আকাশের মেঘ বিলখালার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। রোদ যে ওঠে না, তা নয়—মেঘে-মেঘে খেলা চলে তখন। দলমলে সূর্যটাকে গ্রাস করে যেন কালো কম্বলে ঢেকে দেয়—জগৎ অন্ধকার। কিন্তু কতক্ষণ! চঞ্চল মেঘেরা কি এক জায়গায় পড়ে থাকবার বান্দা? সূর্য আবার মুখ বাড়ালেন—মুখ বাড়িয়ে যেন বলেন, এই দেখ, এই যে আমি। চারিদিক থেকে অমনি মেঘপুঞ্জ ধেয়ে আসে—সূর্য ঢাকা পড়ে যান। তক্কে তক্কে আছেন সূর্য—আবার কখন একটু ফাঁক পাবেন, মুখ বের করে হেসে উঠবেন।

ধানক্ষেত ডুবিয়ে জলের সাগর হয়ে ছিল, জলকে তলিয়ে ধানেরা এবার উল্লাসে মাথা তুলে উঠেছে। একঢালা হরিৎ—বিলের একেবারে ঐ শেষ অবধি। ডোঙা-নৌকোর সরান অথবা খাল চলে গেছে যেখান দিয়ে, সেই-খানে সামান্য একটু জলরেখা নজরে আসে। বিল ধরে পুব মুখো ক্রোশ তিনেক গেলে বড় গাঙ। গাঙে বুঝি এখন ভাটা লেগেছে—ঠাহর করে দেখলে এত-দূরে এখানেও ভাটার টান কিঞ্চিৎ মালুম পাওয়া যায়। জোরে হাওয়া দেয় এক একবার—পুকুর-কিনারে জামতলি আমগাছের শিকড়বাকড়ের মধ্যে বিলের জল ঢুকে পড়ে খল-খল করে। কয়েকটা বড় ডাল বিলের দিকে লম্বা হয়ে গেছে ছায়ায় ঢাকা বলে সেই জায়গাটুকুতে চাষবাস হয় না। শাপ-লার ঝাড়—থালার মতন বড় বড় পাতা বোঁটার উপর খাড়া-দাঁড়ানো। অজস্র শাপলাফুল। ধানবনের রং, মেঘের ছায়া পড়ে, এক এক জায়গায় ঘন কালো। ঘুরে বেড়ায় মেঘ, ধানবনের রং বদলায়—কালো ধানবন সোনার মতন ঝিকমিক করে মেঘ সরে রোদ এসে পড়ে যখন।

জামতলির একটা ডালের উপর জলদ চুপচাপ লম্বা হয়ে আছে। আমের সময় নয়, আমের জন্য গাছে ওঠেনি—পাঠশালা ভাল লাগে না, চুপচাপ তাই পড়ে আছে। হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ধানপাতার উপর দিয়ে—নুয়ে পড়ে ধানপাতা, আবার খাড়া হয়ে জলের ঢেউ ভাঙার মতন। দেখে তাই জলদ চোখ মেলে। ঝির ঝির করে জল পড়ছে, কানে সামান্য আওয়াজ পায়। নতুন পুকুর আর বিলে নালার যোগাযোগ—নালার মুখে মাটির বাঁধ চুঁইয়ে কিছু কিছু জল তবু নালার ভিতরে পড়ছে। ধানবনের ভিতরেও আলে আলে ক্ষেত ভাগ করা—ধানগাছ বড় হয়ে চারিদিক একশা হয়ে গেছে বলে বাইরে থেকে আল বোঝা যাচ্ছে-না।

আ'ল কেটে দেয় এ-ক্ষেতের বাড়তি জল ও-ক্ষেতে চালান করবার জন্ত। সেই জল চলাচলের ক্ষীণ শব্দও কান পেতে শোনা যায়। ঘুনসি পাতে ঐ সব জায়গায়, ঘুনসিতে মাছও পড়ে। জল্লাদ আচমকা ডাল থেকে লম্ফ দিয়ে বিলের জলে পড়ে, পরের আলাজ কাটা আলের কাছে গিয়ে ঘুনসি উঁচু করে তুলে দেখে। খলখল করে মাছ ঘুনসির ভিতরে বেরুবার জো নেই। দেখেও সুখ। যেমনটি ছিল আবার সে তেমনটি পেতে রেখে দেয়।

পুকুরের পাড় ধরে সারবন্দি নারকেল-গাছ। কাঠবিড়ালির অত্যাচার—বাগড়োর মধ্যে ঢুকে ডাব-কচি কুরিয়ে কুরিয়ে খায়। খাওয়ার মুখে বোঁটাও কাটা পড়ে যায়, আওয়াজ তুলে জলের মধ্যে ডাব পড়ে, জলতলে কাদায় বসে যায়। ছেলেপুলে ডুব দিয়ে দিয়ে খোঁজে, কাদা হাঁটকে দেখে। ঝুপঝুপ করে হয়তো বা এক পশলা বৃষ্টি—সামান্ত দূরেই রোদ, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই সেখানে।

বৃষ্টি পেয়ে ছেলেপুলের মজা। আর মাছেদের মত ছেলেপুলে আছে, মজা তাদেরও। বিলের জল বাঁধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে নালায় পড়ে—মীন-শিশুরা ঐখানে এসে জমেছে। পুকুরের চার পাড়ের আটকানো জলে থাকে তারা—কেমন করে টের পেয়ে গেছে, বাঁধের ওধারে বিলের সীমাহীন জলাধার। বিলে যারা সব আছে—চলো, পরিচয় করিগে তাদের সঙ্গে। খানিকক্ষণ খেলা করে আসি। এমনি সব ভেবেই বুঝি সঙ্কীর্ণ নালায় ঝাঁকে ঝাঁকে ভিড় করেছে, কালো কালো শিরদাঁড়া ভাসান দিয়ে নালার জল ঢেকে ফেলেছে প্রায়।

মাথার উপরে চিল চক্কোর দিচ্ছে, কী জানি কেমন করে তারা টের পেয়ে গেছে। জলে-পোঁতা বাঁশের আগায় একটা মাছরাঙা নিস্পৃহ উদাসীনের মতো বসে রয়েছে। পানকৌড়ি ঘন ঘন ডুব দিচ্ছে—ডুব দিয়ে অদৃশ্য হল, অল্প পরে ভেসে উঠে গলা অনেকক্ষণ উঁচু করে তুলে সগর্বে বুঝি সকলকে শিকার দেখাচ্ছে দুই ঠোঁটে চাপা ছোটমাছ একটা। মাছরাঙাও টুপ করে জলে পড়ে মাছ নিয়ে যথাপূর্ব উদাসীনভাবে আবার এসে বসেছে। ডালে শুয়ে শুয়ে জল্লাদ বেশ খানিকক্ষণ দেখল তারপর তরতর করে নেমে গাতকোদাল নিয়ে এলো। পুববাড়ির কোথায় কি থাকে সমস্ত জানা—পুববাড়ি বলে কি, গাঁয়ের সব বাড়ির সকল জিনিস নখদর্পণে তার। ঝপাঝপ কোদাল মেরে নালার অল্প মুখ বন্ধ করে দিল সে। মাছেরা আটকা পড়ে গেছে। ডাব খোঁজা ছেড়ে ছেলেরা ছুটে এসে পড়ল। জল্লাদের হুকুম: নালার জল সেঁচে ফেল্। আস্তাকুড়ের ভাঙা হাঁড়ি-কলসি কুড়িয়ে গেল সব জল সেঁচতে। জল্লাদ নিজেও লাগল। জল উঠে গিয়ে কাদায় মাছ লাফাচ্ছে—মৌরলা পুঁটি চাঁদা কেঁটিট্যাংরা। নিয়ে নে সমস্ত খুঁটে খুঁটে—

তুমি ?

বেজার মুখে জল্লাদ বলল, বাবা বাড়ি এসেছে।

পাঠশালা পালিয়ে মাছ মেরে বেড়াচ্ছে, টের পেলে যজ্ঞেশ্বর রক্ষে রাখবেন না। মাছ খাওয়া নয়, ঠেঙানি খেতে হবে। খাওয়ার মধ্যে কি, মাছ ধরাতেই তো সুখ—এই সমস্ত বলে জল্লাদ মনকে বোঝায়। নয়ণার ধারে বাঁকা তালগাছওয়ালা রাস্তার এধারে-ওধারে বিস্তর লোক ছিপ নিয়ে বসে। কোনো এক বিকালে পায়ে পায়ে জল্লাদ ঐখানে চলে যায়, খুশি মতন একজনের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ছিপ ছেড়ে লোকটা তৎক্ষণাৎ সরে গিয়ে বসবে, বিনাবাক্যে জল্লাদ ছিপ তুলে নেবে। তার মতন মাছুড়ে কে ? টানে টানে পুঁটিমাছ। দেখতে দেখতে ঘটির কানা অবধি ভরতি। ওদিক থেকে টুলু সর্দার ডাকছে : ও জল্লাদ, আমার এ কী হল ? ছিপ এখনো খাশ করতে পারলাম না। বুড়ো-হালদারের নাম করে তুমি একবার ছুঁয়ে যাও দিকি।

মাছ ধরতে ধরতে একদিন জল্লাদ সাপ ধরে ফেলল। কালকেউটে। বঁড়শি গেঁথে মাছ তোলে, সাপও তুলল অবিকল সেই কায়দায়।

শশধর দত্তের ভাঙা মণ্ডপে মস্তবড় বটগাছ, শিকড়-বাকড়ে সারা মেঝে চৌচির হয়ে আছে। সাপের আড্ডা বলে লোকে ও-মুখো হয় না। সাপদের মধ্যে একটি অবশ্য ভাল। বাস্তসাপ তিনি, বাস্তদেবতা। কারো ক্ষতি করেন না, দত্তদের বাস্তবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ করেন। দত্তগিন্নি তাঁর নামে মাঝেমধ্যে দুধ কলা দেন। সন্ধ্যাবেলা কলার খোলায় করে দিয়ে যান—সকালে এসে দেখা যায়, খোলা শূন্য, চেটে-মুছে উনি সেবা নিয়ে গেছেন। বাস্ত দেবতাটি ভাল, কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গ জাত-কেউটে-কালাজগুলো অতিশয় বদ—শিবের অনুচর ভূত-প্রেত-পিশাচদের মতন। তেড়েফুঁড়ে তারা আধার ধরে বেড়ায়, মানুষও কাটে।

জল্লাদ বলে, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

ব্যাঙের করতালি শুনে মাথায় মতলব এলো। আওয়াজটা মণ্ডপের পাশের হেলাঞ্চিবন থেকে আসছে। সাপে ব্যাঙ ধরে গেলার চেষ্টায় আছে। আহা, টেনে টেনে বহুক্ষণ ধরে কী কান্নাটাই কাঁদল। অবশেষে চুপ। তার মানে ব্যাঙ পুরোপুরি সাপের গর্ভগত হয়ে গেল। এমন তো হামেশাই ঘটে। জল্লাদ কিন্তু রেগে টং : সাপ তুমি দাঁড়াও না, ব্যাঙ খাওয়ার সুখ টের পাইয়ে দেবো।

আরশুলা কিম্বা ক্ষুদে ব্যাঙ গেঁথে ছিপ নাচিয়ে নাচিয়ে শোলমাছ ধরে—জল্লাদ ব্যাঙ গাঁথল বঁড়শিতে নয়—সাযাস্ত বঁড়শি সাপ গিলেই খেয়ে নেবে।

কাঁটাওয়ালা লম্বা বেতের শীষ কেটে তার আগায় সে নিপুণভাবে ব্যাঙ বাঁধল। ভাঙা মণ্ডপে গিয়ে সন্দেহজনক ফাটল পেলেই তার ভিতরে শীষ সহ ব্যাঙ ঢোকাচ্ছে। ব্যাঙ মরে যায়, বদল করতে তখন জীবন্ত ব্যাঙ আবার একটা বাঁধে। অবিরাম অধ্যবসায় তিন-চার দিন ধরে, ফল হয় না। নতুন কি কৌশল খাটানো যায়, জল্লাদ ভাবছে। হেনকালে টোপ গিলল। টেনে টেনে জল্লাদ বেতের শীষের সঙ্গে সাপও বের করে ফেলল গর্ত থেকে। বিঘত-খানেক কাঁটা ভেতরে গিয়ে বিঁধে আছে। সাপ তবু করাল মূর্তিতে ফণা তুলে গর্জাচ্ছে। পড়ে যায়, আবার উঠে তাড়া করে। চেঁচামেচিতে বাড়ির জন এসে লাঠি-পেটা করে সাপ মারল।

যজ্ঞেশ্বর এসে থ হয়েছিলেন। এতক্ষণে জল্লাদের দিকে যাচ্ছেন। শান্তিময় কোমলকণ্ঠে ডাকছেন: আয় রে, কাছে আয়। জল্লাদ সতর্কদৃষ্টিতে তাকায় বাপের দিকে, আর পায়ে পায়ে এগোয়। কঞ্চির গাদা—সেইদিকে যেন যাবার ঝোঁক। অতএব জল্লাদও দাঁড়িয়ে পড়ে।

ভাবছিস কি রে হারামজাদা? টুক করে এক কঞ্চি তুলে যজ্ঞেশ্বর ছেলের পানে ছুটলেন। জল্লাদেরও চোঁচা-দৌড়। লোকে দু-চক্ষু মেলে বাপ-ছেলের দৌড়ানো দেখছে। বাপ হোন আর যা-ই হোন, পারবেন কেন উনি ছেলের সঙ্গে। অনেকটা দূরে নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে জল্লাদ দাঁড়িয়ে পড়ল। যজ্ঞেশ্বর হাঁপাচ্ছেন, আর শাসাচ্ছেন: বাড়ি আসতে হবে না? তখন দেখে নেব। এই কঞ্চি তোর পিঠে না ভাঙি তো আমি বাপের বেজন্মা পুত্তুর।

হিমচাঁদ বলেন, দিব্যিদিলেশা কেন? সাপের ছোবল থেকে প্রাণে বেঁচে গেছে—মাপ করে দেন।

যজ্ঞেশ্বর বলেন, ক'বার বাঁচবে? বাঁচা ওর কপালে নেই। মাথা নয় ওর—দুষ্টুবুদ্ধির হাঁড়ি। পলকে পলকে বজ্জাতি গজায় ওর মাথায়।

হিমচাঁদ বললেন, হাঁড়িটাই তবে চুরমার করে দেন—আপদ চুকে যাক। তাহলে বাঁচতে পারে। কঞ্চিতে হবে না, বড় লাঠি ধরুন—

জল্লাদ ফৌত। কঞ্চি নাচিয়ে যজ্ঞেশ্বর গর্জে বেড়াচ্ছেন। ছেলের পিঠখানা হাতের নাগালে না পাওয়ার দরুন সপাং-সপাং করে কখনো ঘরের বেড়ায়, কখনো দাওয়ার তক্তাপোশে, কখনো বা ঝোপেঝোপে বাড়ি মেরে রাগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করছেন। খবর পাওয়া গেল, হেলাতলায় বড়বোন ফেকাসির শ্বশুরবাড়ি একরাত কাটিয়ে গেছে। না রাত্রিটা পুরোপুরি নয়। কুটুম্বরা খুব আদরযত্ন করছেন, এবং দুটো দিন না হোক একটা দিন অন্তত থেকে যাবার জন্ম জেদাজেদি করছেন—এর পর জল্লাদ আর দেরি করে। দিদি চর্বচোষ্য খাওয়াবেন, আর

ওদিকে খবর নিয়ে লোক ছুটবে সোনাখড়িতে। শেষরাতে দুয়োর খুলে অতএব জল্লাদ হাওয়া। বিস্তর খোঁজখবর করেও আর হদিশ মেলে না।

যজ্ঞেশ্বর কাঁহাতক কর্কি বয়ে বেড়াবেন—কর্কি ফেলে দিয়ে মুখের তড়পানি এখন শুধু। জল্লাদের মা, বড়মেয়ে ফেকসির নামে ফেকসির মা বলে যাঁর পরিচয়, তিনিও কম যান না। পেলে একবার হয়, ছেলের হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় করব—রাত্রে শুয়ে পড়েও গজর-গজর করছেন। এত সামান্যে যজ্ঞেশ্বরের মনঃপুত নয়—গর্জে উঠলেন তিনি ওদিক থেকে ঃ ধরতে পারলে মুণ্ডু কাটব। কাটব ছাইগাদার উপরে—রক্ত একফোঁটা মাটিতে না পড়ে। পড়লে সেখানে বজ্জাতির গাছ গজাবে। সে গাছের ফল খেয়ে ছেলেপুলে কেউ আর ভাল থাকবে না।

ঘুমিয়ে পড়লেন উভয়ে। রাত দুপুর। বাড়ির সব—পাড়ার সব ঘুমিয়ে গেছে। চারিদিক নিঃসাড়। খোলা জানালার ধারে হেরিকেন একটা টিপ-টিপ করে জ্বলছে।

এক ঘুমের পর যজ্ঞেশ্বর চোখ মেলে খিঁচিয়ে উঠলেন ঃ চেরাগ জ্বালিয়ে নবাবি হচ্ছে—বলি কেরাসিন সস্তা? আমি তো ধরে নিয়েছি, চার ছেলের মধ্যে এক ছেলে আমার নেই। সেজন্যও বলছি, আলো চোখে লাগছে।

ফেকসির মা আলো নিভিয়ে নিঃশব্দে আবার শুয়ে পড়লেন। যজ্ঞেশ্বরের নাসাগর্জন বন্ধ হয়েছিল—ধমকি দিয়ে কর্তব্য-সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে গর্জন আবার শুরু হয়ে গেল।

চুপচাপ আছেন ফেকসির মা। ঘুম আসছে না আর। কু-পুত্র যদিও হয়, কুমাতা কখনো নয়। অন্তত তিরিশটি বছর কর্তার পাশে শুয়ে আসছেন—নাকের আওয়াজ থেকে মালুম পান, কখন ঘুম গাঢ় কখন লঘু। এক এক সময় ফরাৎ ফর ফরাৎ ফর করে নিশ্বাসের যেন ঝড় বইতে থাকে। সেই সময়ে যজ্ঞেশ্বরের একখানা অঙ্গ কেটে নিলে কিম্বা তারও বেশী—কোমরের গাঁটরা কেটে টাকাপয়সা বের করে নিলেও তাঁর হুঁশ হবে না। কান পেতে অমনি ধরনের কিছু আন্দাজ নিয়ে ফেকসির মা উঠে আবার হেরিকেন ধরালেন। হেরিকেন এবারে ঘরের মধ্যে নয়, রান্নাঘরের দাওয়ায় খুঁটির গায়ে একটা পিড়ি ঠেসান দিয়ে একটু আড়াল করে রেখে এলেন। এবং চোখ মেলে জানালার পথে তাকিয়ে আছেন—চোরে বজ্জাত হাঁটাহাঁটি লাগিয়েছে, হেরিকেন নিয়ে পিঠটান না দেয়। রান্নাঘরে দাওয়ায় আলো থাকায় ব্যাপারটা প্রাঞ্জল হয়ে গেল। হতভাগা ক্ষুধার্ত জল্লাদ কি অর্থ বুঝবেন না? কোন বুদ্ধি নিয়ে ঘর উৎপাত করে বেড়ায়?

চোখে দেখার পরে তবে তো অর্থ বুঝবে। কিন্তু জল্লাদ যে সোনাখড়িতেই নেই। অস্ত্র যে বুঝলে কাজ দেবে, তার নজরে এসে গেল একদিন দু-দিনের মধ্যে। পদ্দা জল্লাদের পয়লা-নম্বুরি সাকরেদ এবং চর—পাশাপাশি বাড়ি। রাত্রে উঠেছিল পদ্দা, সেই সময় উত্তরবাড়ির আলো দেখল এবং ঘুরে ফিরে কারণও খানিক বুঝে এলো। পরের দিন রাজীবপুরের এক আখক্ষেতে গিয়ে জল্লাদকে ধরল : রান্নাঘরের হাঁড়িতে তোমার ভাত-ব্যঞ্জন পচে, দাওয়ায় রাত-ভোর আলো জ্বলে, আর হতচ্ছাড়া তুমি এখানে ফুলো-আখ চিবিয়ে মরছ। শোওয়ারও তোফা জায়গা দেখে এসেছি।

নিশিরাত্রে অতএব জল্লাদ বাড়ি ফিরল। গোয়ালে আড়ার উপর বাঁশ বিছিয়ে শুকনো কাঠকুটো রাখে। রান্নাঘরে ভাত খাওয়া সেরে আড়ার উপর উঠে অনেকদিন পরে আরামে ঘুমাল সে। নিজের বাড়িতে খাচ্ছে শুচ্ছে—জানে শুধু পদ্দা এবং গোয়ালের চারটে গরু ও ছুলেবাছুরটা। পরের দিনও অমনি আরামের লোভে এসেছে, খাওয়া শেষ করে শুতে যাচ্ছে—কেকসির মা ওৎ পেতে ছিলেন, হাঁড়ির ভাত কাল খেয়ে গেছে তো আজও আসবে এই বুঝে। আচমকা হাত এঁটে ধরলেন তিনি পিছন থেকে : ঘরে আয়—

হাতে-নাতে ধরা পড়েছে, রক্ষে নেই, যজ্ঞেশ্বর-এক্ষুনি উঠে ঘুমচোখে পেটাতে শুরু করবেন। জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে জল্লাদ—বুকের ভিতরে বাতাস বোঝাই থাকলে পিঠে নাকি কম লাগে। ঘরে পা দিতেই যজ্ঞেশ্বর পিটপিট করে তাকিয়ে পড়লেন। এইবার, এইবার! জল্লাদও তৈরি। কিন্তু আশ্চর্য নিরাসক্তভাবে চোখ বুজলেন আবার যজ্ঞেশ্বর, নাক-ডাকা শুরু হয়ে গেল। সকালে ঘুম ভেঙে উঠলেন, জল্লাদ মায়ের কাছে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে—তা যেন চিনতে পারলেন না ছেলেকে, গাড়ু নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরুলেন।

কিসের হিতাহিত ভাবেনি, মায়ের পাতা ফাঁদে ধরা দিয়েছিল—পরে এই নিয়ে জল্লাদ হেসেছে খুব। কী বোকা আমি রে! পুকুরের মাছ চার ফেলে ঘাটে নিয়ে আসে, তারপর বঁড়শিতে গাঁথে। এ জিনিসও তাই। ভাত রেঁধে রেখে জল্লাদকে রান্নাঘরে টেনে আনলেন, সেখান থেকে একখানে শোবার ঘরে।

বৃষ্টি বাদলায় যত জোর দেয়, থিয়েটারের স্ফূর্তি ওদিকে অত ঠাণ্ডা মেরে আসে। রিহার্শালে লোক হয় না। ঘণ্টার ঠুনঠুনিতে হচ্ছে না দেখে হারু মিস্তির বড় কাঁসর একটা সংগ্রহ করল। ঠিক দুপুর থেকে ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করে পেটায় নতুন বাড়ির বাইরের রোয়াকের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো ঘুরে ঘুরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেটাচ্ছে। কারুর পরিবেদনা। ছুতোর—বলে তখন কাঁসর

ফেলে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে বেড়ায় : কি হে, শুনতে পাচ্ছ না কেউ তোমরা ? আর তো এসে গেল—চলে যাও, পেরাজে বোলো গিয়ে। পার্ট খবর সকলের —কার কদ্দুর মুখস্থ হয়েছে। আমাদের থিয়েটারে প্রম্পটার থাকবে না রাজীবপুরের মতন।

মুখফোঁড় একজন বলে, তোমার নিজের কদ্দুর হারু ? তোমার পার্টও খবর কিন্তু।

হারু আস্ফালন করে বলে, খোবো তাই। টরটরে মুখস্থ—শুরাই নাকি ? সিন খাটিয়ে কালই নামাও না—আমার লুৎফ ঠিক আমি করে যাবো।

মুখের বড়াই, পার্ট একবর্ণও মুখস্থ হয়নি। স্মরণশক্তির সুখ্যাতি হারুর কোনকালে নেই। তার উপরে দু দণ্ড স্থির হয়ে যে মুখস্থে বসবে, ফুরসত কই তার ? থিয়েটারের ভার নেওয়া ইস্তক খাটাখাটনি ও ভাবনা চিন্তায় পাগল হবার শামিল। চারিদিকে এখন বিষম জল কাদা—চলাচলের রাস্তার উপরেও কাদা কোথাও এক-হাঁটু কোথাও বা এক-কোমর। কাদা বলতে সাধারণভাবে যা বুঝি তা নয়, রীতিমত আঠালো কাদা—প্রেম-কাদা যার অন্য নাম। পুরো কলসি জল ঢেলেও যে কাদা ছাড়ানো যায় না। হেন অবস্থার মাঝেও হারু মিস্ত্রিরের পা দুটোর জিরান নেই। সারা বিকালবেলাটা মানুষ ডেকে ডেকে অবিরত চক্কোর মেরে বেড়াচ্ছে। নেহাৎপক্ষে আটখানা সখীর কমে আসর জমে না। যুগল ও সুধাময় ভাড়াটে সখীদ্বয় ছাড়াও নতুন ছ-ছ'টা সখী বানিয়ে নিতে হচ্ছে। যদুনাথ মণ্ডলের ছেলে বলাই তার মধ্যে সকলের সেরা। নাচের পা চমৎকার, গলাখানিও খাসা। ড্যান্সিং-মাস্টার নরেন পাল খুব তারিফ করে, কালক্রমে বলাই যে যুগল-সুধাময়ের ধান কেটে নেবে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ সে। ফলে বলাই এবং বলাইয়ের বাপ যদুনাথের লেজ ফুলে আকাশে উঠেছে। হারুকে যদু সাফ জবাব দিয়ে দেয় : যাবে না বাপু। মা মরা ছেলে—পেটের ধান্দায় আমি তো সামালে সামালে ঘুরি, জল-কাদা ভেঙে নিউমোনিয়ায় যদি ধরে, তখন বলাইকে কে দেখবে ?

হারু নিরুপায় হয়ে বলল, জল যাতে না ভাঙতে হয় তাই আমি করব। নিউমোনিয়া হলে ডাক্তার-কবিরাজের দায়ও আমাদের। তুমি আর আপত্তি কোরো না যদু।

হারুর দুর্গতি বাড়ল। ডাক পেয়ে বলাই ঘরের দাওয়ায় এসে বসে, সেখান থেকে হারু আলগোছে তাকে কাঁধে তুলে নতুন বাড়ির রোয়াকে এনে নামিয়ে দেয়। কাজ অন্তে কাঁধে করে আবার বাড়ির দাওয়ায় পৌঁছে দিয়ে আসে। বউ গত হবার পর থেকে যদুর ছেলে-অন্ত প্রাণ—আপাদমস্তক ঠাহর করে করে

দেখে, যেমনটি গিয়েছিল ঠিক ঠিক তেমনি অবস্থায় ফিরেছে কিনা। তারপর ঘরে ঢুকিয়ে নেয় ছেলেকে। হারুরও ছুটি।

কিন্তু বলাই ছাড়াও সখী আরও পাঁচটি। বয়সে ছেলেমানুষ তারাও— বলাইয়ের নিউমোনিয়া ধরতে পারে তো তাদেরই বা ধরবে না কেন, তারা এত খেলো হল কিসে? দেখাদেখি তারাও গাঁট হয়ে নিজ জায়গায় বসে থাকে: কাঁধে করে নাও, তবে যাবো।

হারু গোবরাকে বলে, একলা আমি কাঁহাতক বয়ে বেড়াই। গোবরাকে সখী তুই বয়ে দে ভাই।

আপত্তি নেই, বওয়া তো উচিতই। কিন্তু—

গোবরা ধাঁ করে পৈতে বের করে ফেলল: ঐটুকু এক এক ছোঁড়া কতই বা ভার। স্বচ্ছন্দে এনে দিতাম। কিন্তু ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতে পা লেগে ওদের যে মুখে রক্ত উঠবে ম্যাও ধরবে কে তখন?

এর পরে হারু আর কাউকে বলতে যায় নি। কাজ চাপাতে গেলে ডুব দেবে হয়তো মানুষ ডেকে ডেকে তখন আর ত্রিহার্শীসেও পাওয়া যাবে না। ঢং-ঢং ঢং ঢং কাঁসর বাজায় হারু। কাঁসর রেখে নাচের ছেলে আনতে ছুটল। তাদের পৌঁছে দিয়ে এবারে প্রেয়ার ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে: কই গো, বেরিয়ে পড়ো। তামাকের ব্যবস্থা ওখানেই তো আছে—ওখানে গিয়ে খেও। আর দেরি কোরো না।

এক বাড়ি সেরে হারু মিস্তির আর এক বাড়ি ছোটে।

॥ ষোল ॥

পুজো পুববাড়ির, থিয়েটারটা গ্রামবাসী সর্বসাধারণের—এইরকম কথা হয়েছিল। হয় কখনো তাই? কালীপুজো শীতলাপুজো নারায়ণপুজো— সকলের ক্ষেত্রে পুজো, আর দুর্গার বেলা উৎসব—দুর্গোৎসব। উৎসব একজনের এক বাড়ি নিয়ে হয় না। পুববাড়ি খরচখরচা করছে, প্রতিমাও বসেছেন পুববাড়ির বাইরের উঠোনের মণ্ডপে, কি উৎসব সারা গ্রামের—তা কেন, গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরেও হাওয়া গিয়ে লেগেছে।

আত্মীয় কুটুম্বর ফর্দ হচ্ছে। ছোটকর্তা বরদাকান্ত জলচৌকিতে উবু হয়ে বসে হুঁকো টানছেন, আর ফর্দের ছাড়ছুট ধরিয়ে দিচ্ছেন। সতর্ক মনোযোগে শুনতে শুনতে হুঁকো টানা ভুল হয়ে যাচ্ছে, কলকে নিভে যাবার গতিক। হঠাৎ যেন হুঁশ ফিরে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে জোর জোর টেনে নিভন্ত কলকে চাঙ্গা করে

তুলছেন। গাঁয়ের মধ্যে সকলের বড় বরদাকান্ত, তাঁর নিচে উকিলবাড়ির যজ্ঞেশ্বরের মা বুড়ি। কার কোথায় আত্মীয়-কুটুম্ব, সমস্ত বরদাকান্তর নখদর্পণে। বয়স্ক বহুদর্শী ভবনাথ নিজেও, তিনি পর্যন্ত অবাক হয়ে যাচ্ছেন : বাগদার মেঘনাথ বিশ্বাস আমাদের কুটুম্ব— বলেন কি খুড়ো ?

ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব। তোমার ঠাকুরদার ভাইয়ের সাক্ষাৎ নাতিন। তোমার সঙ্গে তাহলে ভাই সম্পর্ক দাঁড়াল।

ভবনাথ আঁতকে ওঠেন : কী সর্বনাশ ! দু-দুটো মেয়ের বিয়ে দিলাম—এসব কুটুম্ব একদম নাড়া দেওয়া হয়নি। খবরই রাখতাম না।

তাই তো আগ বাড়িয়ে এসে বললাম। বলি, ভবনাথ চিরকাল তো মামলা মোকর্দমা বিষয় আশয় নিয়ে আছে, সমাজ-সামাজিকতা নিয়ে মাথা ঘামাল কবে ? যতদূর জানি মোটামুটি জুড়ে গেঁথে দিয়ে যাচ্ছি। যত্ন করে রেখে দিও বাবাজি। আমি চোখ বুঁজলে এসবের হদিস পাবে না আর কেউ।

মণ্ডপের সামনাসামনি বেগুনক্ষেত সাফ করে জায়গা চৌরস করা হয়েছে—স্টেজ ঐখানটা। ভবনাথ বললেন, বাঁশ-কুটোর মন্বন্তর নেই—একজোড়া চাল তুলে নাও না কেন মাথার উপরে, বৃষ্টিবাদলা হলে ভাড়া করা সিন-পোশাক লাট হতে পারবে না। বুদ্ধিটা ভালো—স্টেজ দোচালায় নিচে আর বসবার জায়গা খানিক সামিয়ানা খাটালো, খানিকটার উপর লাউ-কুমড়োর মাচার মতো বানিয়ে উপরে নারকেলপাতা বিছিয়ে দিয়েছে।

মা-দুর্গা আসছেন—গ্রামবাসী বাইরে যারা আছে তারাও সব বাড়ি আসছে মোনসেফ ও ইঞ্জিনিয়ার মশায়রা কতকাল দেশঘরে আসেন নি, হারু মিস্তিরের মোক্ষম চিঠি গেল : চাঁদা দেন খুব ভালো, না দিলেও ভালো—বাড়ি আসা কিন্তু চাই-ই চাই। রাজীবপুরের কুচ্ছো করে, সোনাখড়ির মানুষ বলে মানেন না নাকি আপনারা। পুজোর কদিন চেয়ার পেতে আপনাদের মণ্ডপে বসিয়ে দেবো—আসতে যেতে লোকে দেখবে। তারপরে দেখি কী বলে ওরা…

মুন্সেফের মন ,চঞ্চল, গিন্নিকে বললেন, এত করে লিখেছে—চলো আমার বাপের ভিটেয়, মুখ বদলানো হবে। গিয়ে পড়লে এক পয়সাও আর খরচা নেই। খুড়তুতো ভাইরা আছে—কী যত্নটা করবে দেখো।

সদর কসবা থেকে নাগরগোপ প্রায় দশ ক্রোশ। রাস্তা পাকা। আগে ঘোড়ার গাড়িতে চলাচল হত—মাঝপথে ঘোড়া-বদল, এক জোড়ায় অত পথ পেরে ওঠে না। ঝামেলা ছিল না, তবে সময় লাগত বেশি। এখন ঘোড়ার গাড়ি গিয়ে মোটরবাস। সময় কম লাগার কথা, ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে লাগেও তাই—

সেটা কালেভদ্রে কদাচিৎ। যখন-তখন মোটর ভাল হয়ে যায়। তাগুা না বলে লোকে 'ভাল হওয়া' বলে মোটরবাসের সম্পর্কে। মটরকলাই যাঁতায় ভেঙে ডাল বানায়, সেই তুলনা আর কি। লাইনের জন্ম বেছে বেছে এমন সব শব্দ, ঝড় বাস কোথা থেকে সংগ্রহ করে, কে জানে। নাগরগোপে নেমে ঘুরে ফিরে সর্বাঙ্গে মোচড় দিয়ে পরখ করে নেবেন, ঝাঁকুনির চোট খেয়ে হাড় পাঁজরার জোড় ঠিক আছে কিনা। অতঃপর পালকি গরুর-গাড়ি কিম্বা ঈশ্বরদত্ত নিখরচার পদযুগল। সোনাখড়ি যাবার বারোমেসে পথ এই।

বর্ষাকালে এক নতুন পথ খুলে যায়—বিলের উপর দিয়ে ডিঙির চলাচল। আর ডোঙা তো আছেই। নপাড়া স্টেশন থেকে বিল ফুঁড়ে এসে সোজাসুজি রাজীবপুরের রাস্তায় মগরার পাশে জোড়া তালতলার ঘাটে এসে লাগে, ওঘাটের মাছুড়েদের ট্যাংরা-পুঁটি আড্ডা যেখানটা।

দেবনাথ বাড়ি আসছেন। সঙ্গে বিস্তর মালপত্তর—কলকাতা থেকে কেনাকাটা করে নিয়ে আসছেন। সেবারের সেই বরকন্দাজ দুটিও আছে। পুজোর খাটাখাটনির জন্ম বহু লোকের আবশ্যক—এই দু-জনকে সর্বক্ষণ পাওয়া যাবে। এত লটবহর ট্রেন মোটরবাস গরুর-গাড়িতে বারম্বার ওঠানো-নামানোর বিস্তর হাঙ্গামা। বিলের পথ নিয়ে নিলেন সেইজন্ম। সময় বেশি লাগবে—নপাড়া স্টেশন থেকে প্রায় পুরো দিন একটা। লাগুককে, কিন্তু আরামের পথ—একটানা একেবারে সোনাখড়িতে গিয়ে নামা।

আকাশে মেঘের খেলা। একটা গাঁটরি ঠেস দিয়ে নৌকোর মাচুরে দেবনাথ গড়িয়ে পড়লেন। মাথার উপরে ধোঁয়া-ধোঁয়া মেঘ ভাসতে ভাসতে এক জায়গায় হঠাৎ ঠাসাঠাসি হয়ে কালীবর্ণ হয়ে যায়। আর অমনি ঝুপঝাপ বৃষ্টি। হবি তো এখনই ভাল করে হয়ে যা রে বাপু। পুজোর মধ্যে কিছু করিস নে। এত আয়োজন বরবাদ হবে, গ্রামসুদ্ধ মানুষের মনোকষ্ট।

খাল থেকে সয়াল বেরিয়ে ধানবনে ঢুকে গেছে—নৌকো সেই সয়াল ধরল তেপান্তরের বিল, ধানগাছে উথল-পাথাল হাওয়া। দূরে—অনেক দূরে, যে দিকে তাকানো যায়, গাঁ-গ্রামের সবুজ গাছপালা। খেজুরবনই বেশি, মাঝে মাঝে বড়গাছ—আম, জাম, বট, শিমুল। গাছপালার ভিতর থেকে খোড়োঘরের চালও নজরে পড়ে—দালানকোঠা কালেভদ্রে কদাচিৎ।

দেবনাথের যোমাক লাগে—তরা বিলে কতকাল পরে নেমেছেন। এঁদের ছোকরা বয়সে এই পথটাই বেশি চালু—বিল ভেঙে খাল পাড়ি দিয়ে নপাড়া স্টেশনে ট্রেন ধরা, আবার ট্রেন থেকে নপাড়ায় নেমে বাড়ি যাওয়া। শুকনোর সময় হাঁটতে হাঁটতে পায়ের নলি ছিঁড়ে যেত। বর্ষায় সময়টা মজা—এই

আজকের মতন। যত ডোঙা পুকুর ও খানাখন্দে ডুবানো ছিল—খরার মরশুমে শীতল জলতলে কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছে। তারপরে ঘনঘটা আকাশে—দিন নেই রাত নেই, বৃষ্টি। বিল কাল দেখেছি মরুভূমির মতন, রাত পোহালে চেয়ে দেখি মহাসমুদ্র—জল টইটম্বুর। সে জল দিনকে দিন অদৃশ্য হয়ে যায়, সমুদ্র কিন্তু তখনও—সবুজ সমুদ্র। জল বড় নজরে আসে না, যেদিকে তাকাই ধান-চারা দিগন্তের শেষসীমা অবধি। ডোঙা যেখানে যত ছিল, ভেসে উঠে ছুটো-ছুটি লাগিয়েছে ধানবনের অলিগলি জুড়ে। গাঙ-খাল থেকে ডিঙি এসে পড়ছে অনেক। এবং ছোটখাট দু-দশটা পানসিও। হাট-করা মাছ-মারা ঘাস-কাটা সমস্ত ডিঙি-ডোঙায় চড়ে। গাড়ি-ঘোড়ায় চড়া শহরে বাবুভেয়ের মতন গেঁয়ো মানুষেরাও এখন মাটিতে পা ঠেকায় না। অব্যবহারে পায়ে মরচে ধরার গতিক।

এই অকূল সমুদ্রে লাইটহাউস বানিয়ে দিয়েছিলেন সোনাখড়িরই চাঁদবাবু, মন্তার-মা বুড়ি আছেন—তাঁর স্বামী। পোশাকি নাম চন্দ্রকান্ত ঘোষ। উদ্ভট খেয়ালের মানুষ চাঁদবাবু—কাজকর্ম ধরন-ধারণ অন্য দশজনের সঙ্গে মেলে না। দেখা গেল, তালকোবাঁশের ঝাড় থেকে বাছা বাছা বাঁশ কেটে জাঁই করা হয়েছে। বাঁশ চেঁচে-ছুলে একটার সঙ্গে আর একটি জুড়ে জুড়ে বিস্তর লম্বা করা হল। বাঁওড়ের ধারে এক প্রাচীন তালগাছ—একজনকে চাঁদুবাবু তালগাছের মাথায় তুলে দিলেন দড়ির বাণ্ডিল হাতে দিয়ে। বাগড়োয় বসে লোকটা দড়ি ছেড়ে দিল, মাপ পাওয়া গেল তালগাছের। বাঁশের গায়ে গায়ে দড়ি ধরে দেখলেন জোড়-বাঁশ ঐ উঁচু তালগাছও ছাড়িয়ে গেছে। তবে আর কি—বিলের কিনারে নিয়ে বাঁশ পুঁতে ফেললেন। বাঁশের মাথায় কপিকল খাটানো। কাচের বিশাল চৌখুপি-লণ্ঠন ফরমাস দিয়ে বানানো হয়েছে। লণ্ঠনের ভিতরে মেটে-প্রদীপ—সে-ও ফরমাসি জিনিস। প্রদীপ দোতলা—নিচের খোপে জল, উপরে রেড়ির তেল। ঐ প্রক্রিয়ায় জল রাখলে তেল নাকি কম পোড়ে। দেড়পো তেল ধরত সেই প্রদীপে, কড়ে আঙুলের মতন মোটা মোটা সলতে।

কার্তিকের পয়লা তারিখ সন্ধ্যাবেলা চাঁদুবাবু নিজ হাতে দড়ি টেনে প্রদীপ আকাশে তুলে দিলেন। সারা রাত জ্বলল। রাতে উঠে উঠে বিলের ধারে এসে চন্দ্রকান্ত দেখে যায়। চাঁদুবাবুর আকাশপ্রদীপ।

কিন্তু মুশকিল হতে লাগল। বিলের উথলপাথাল বাতাস, মাঝেমধ্যে এ-সময়টা ঝড়ও ওঠে—চৌখুপি থাকা সত্ত্বেও প্রদীপ নিভে হঠাৎ কখনো-বা অন্ধকার হয়ে যায়। প্রতিবিধান কি হতে পারে চন্দ্রকান্ত ভেবে পান না। বিজ্ঞজনেরা উপদেশ দেন: আয়েন্দা সন পিদ্দিম অত উঁচুতে তুলো না। একটা বাঁশই যথেষ্ট। আর সে বাঁশ বিলের সামনে ফাঁকার মধ্যেই বা পুঁতবে থাকে

কেন, ঘরের কানাচে যেখানটা কচুবন ঐখানে পুঁতে দাও। আড়াল পড়বে, অত বেশি বাতাসের ঝাপটা লাগবে না।

পরামর্শ চন্দ্রকান্তের মনে ধরল না। নতুনবাড়ির দোতলা দালানের চিলে-কোঠার ছাত হল গ্রামের মধ্যে উঁচু। তার চেয়েও উঁচু বাঁওড়ের ধারের তাল-গাছটা। আকাশপ্রদীপ সে তালগাছ ছাড়িয়ে আরও উপরে আলো দিচ্ছে। আলো বিল-কিনারে বলেই বিশখানা গ্রাম থেকে নজরে আসে। কার আলো? লোকে আঙুল দেখিয়ে বলাবলি করে: সোনাখড়ির চাঁদুবাবুর—কোন ব্যাপারে কারো চেয়ে যিনি খাটো হন না।

বিজ্ঞদের পরামর্শ বাতিল করে চন্দ্রকান্ত জবাব দেন: ঘর-কানাচেই বা কেন, পিদিম ঘরের মধ্যে আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। চৌখুপি না থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।

আরও এক কাণ্ড। চাঁদুবাবুরই জামাই মজার বয় ডিঙিতে বিল পাড়ি দিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসছে। আজকের এই দেবনাথের মতো শ্রাবণ মাস, বিষম বৃষ্টিবাদলা, কালীবর্ণ আকাশ। সন্ধ্যা হতে না হতে নিশ্ছিদ্র আঁধারে চতুর্দিক ঢেকে গেল। তেপান্তর বিলে পথ হারিয়ে রাতদুপুরে বাবাজি সোনাখড়ি ভেবে সাগরদত্তকাটি সর্দারপাড়ার ঘাটে নেমে পড়ল। কী কষ্ট তারপরে। বৃষ্টিতে ভিজে-কাদা ভেঙে পিছল পথে আছাড় খেয়ে শেষরাত্রে শ্বশুরবাড়ির দরজায় উপস্থিত। দরজা খুলে চন্দ্রকান্ত স্তম্ভিত হলেন জামাইয়ের অবস্থা দেখে। রাতটুকু পোহানোর অপেক্ষা—সকাল থেকেই মাহিন্দার সহ কোমর বেঁধে লাগলেন। সাঁঝের বেলা বাঁশের আগায় আকাশপ্রদীপ।

আজব কাণ্ড চাউর হয়ে গেছে। গোপাল ভটচাজের পিতা শ্রীধর ভটচাজ লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এসে শুধালেন: আকাশপ্রদীপ শ্রাবণ মাসেই তুলে দিলে হে?

চন্দ্রকান্ত সংক্ষেপে বললেন, আগামী সন আষাঢ়ে তুলব ভটচাজ্জিখুড়ো।

শ্রীধর বললেন, আকাশপ্রদীপ কার্তিক মাসে দিতে হয়। খুশিমত দিলে হয় না। হেতুটা বোঝ?

চন্দ্রকান্তের তুড়ুক-জবাব: জামাপোকার উৎপাত এড়াতে। জোরালো আলোর টানে পোকা সব উপরে উঠে যায়, ঘরবাড়িতে ঝামেলা করে না।

তোমার মাথা! শ্রীধর চটেমটে বলে উঠলেন: ব্যাপারটা হল পিতৃপুরুষদের আলো দেখানো। মহালয়ার তর্পণের পর তাঁরা পিতৃলোক থেকে নামেন। ছেলেপুলের তর্পণের টানেই নেমে পড়েন, বলতে পারো। তাঁদের চলাচলের সুবিধের জন্য কার্তিক মাসে আকাশে আলো দেখায়।

আমি নরলোকেও আলো দেখাব ভটচাজ্জিখুড়ো।

দিগ্‌ব্যাপ্ত বিলের দিকে বিশালদেহ চন্দ্রকান্ত দীর্ঘ হাতখানা ঘুরিয়ে দিলেন। ধানগাছের সমুদ্র—তার ভিতরে হাজার হাজার ডিঙি ডোঙার চলাচল। রাত্রিবেলা পথ ভুল করে লোকে গ্রাম কোনদিকে ঠাহর পায় না, ধানবনে ঘুরে ঘুরে মরে। আলো দেখে এবারে সোনাখড়ির হদিস পেয়ে যাবে। এবং সেই থেকে সাগরদত্তকাটি, হন্তে রাজীপুর, মাদারডাঙা— বিলকিনারে সবগুলো গ্রামের আন্দাজ পাবে।

হেসে উঠে আবার বললেন, তা বলে পিতৃপুরুষদেরও বঞ্চিত করছিনে। আলো কার্তিক অবধি জ্বলবে। ধরে নিন শেষের মাসটা সেকেলে মুরুব্বিদের জন্য।

চাঁদুবাবুর আকাশপ্রদীপ খুবই কাজে আসত, রাত্রিবেলা মাঝ-বিলে লোকে আলো দেখে দিক ঠিক করত। দেবনাথের তরুণ বয়স—গ্রামবাসীদের মধ্যে বাইরের খবরাখবর তিনিই সকলের বেশি রাখতেন। 'বঙ্গবাসী' কাগজ আসত তাঁর নামে, আর 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকা। চাঁদুবাবুর লাইটহাউস—কথাটা তিনিই চালু করলেন। শুনে শুনে আরও দশ বিশ জনে ঐ নাম বলত। সোনাখড়ির লাইটহাউস।

আরও এক অনাচার। হেরিকেন লণ্ঠন চালু হল এই সময়। সদরে খুঁজে খুঁজে চন্দ্রকান্ত হিংকস-মার্কা এক ঢাউস হেরিকেন কিনে কেরোসিন ভরে ঐ লণ্ঠন তুলে দিলেন বাঁশের মাথায়। এই আলো ঝড় জলে নেভার ভয় নেই, নির্বিঘ্নে সারারাত জ্বলবে। আরও সতর্কতা, প্রকাণ্ড এক ধামা ঝুলিয়ে দিলেন হেরিকেনের উপর দিকটায়। বৃষ্টির জল ধামা গড়িয়ে পড়বে, লণ্ঠন স্পর্শ করবে না।

ভটচাজমশায় ক্ষিপ্ত। কেরোসিনের আকাশপ্রদীপ—দিনকে-দিন আরম্ভ হল কী? চন্দ্রকান্ত বোঝানোর প্রয়াস পান: শাস্ত্রে কেরোসিন লেখে না, যেহেতু শাস্ত্র বানানোর আমলে কেরোসিনের চল হয় নি। আলো দেওয়া নিয়ে কথা—রেড়ির তেল না সর্ষের তেল না কেরোসিন তেল কোন বস্তু পোড়ানো হচ্ছে সেটা আদৌ ধর্তব্য নয়।

কিছুতে কিছু নয়। শেষটা চন্দ্রকান্ত সন্ধিস্থাপনা করলেন। কার্তিক মাসেই যখন আসল আকাশপ্রদীপ এবং বাকিটা ভুয়ো, কার্তিক মাসটা শুদ্ধাচারে তেলের প্রদীপ জ্বালানো হবে, অন্য মাসগুলোয় কেরোসিনের হেরিকেন।

চলল তাই। চন্দ্রকান্ত তারপরে মারা গেলেন, চাঁদুবাবুর লাইটহাউস সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার। পাঁচ মেয়ের বিয়ের এবং নানারকম আজব খেয়ালে পয়সা খরচা করে একেবারে ফতুর তিনি, মারার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের অবস্থা প্রকাশ পেল। অমন দাবরাবের মানুষটার বাস্তুভিটের একখানা দোচালা ঘর টিমটিম

করে এখন। বিধবা মেয়ে মন্তাকে নিয়ে মন্তার-মা কষ্টেস্টে থাকেন। আর মাছুক পেলে বেকেলে লখীমন্ত গৃহস্থালী ও খাদ্যীয় কাণ্ডখাও নিয়ে গল্প ফেঁদে বসল।

বেলা পড়ে আসে। আসাননগরের বিলে এসে গেল—এখান থেকে কোণাকুণি পাড়ি মেরে সোনাখড়ি। একটা জায়গায় সমাল হঠাৎ চওড়া হয়ে খালের মতো হয়েছে, খালের মুখে পাটা দিয়ে মাছ আটকানো। খস্‌খস্‌ আওয়াজ তুলে নৌকো পাটার উপর দিয়ে খালের ভিতর পড়ল। পাটার একদিকে টোঙ। মাঝবিলে জলের মধ্যে খুঁটি পুঁতে একটা ছোটো লোকের শোওয়া-বসার উপযোগী মাচা, বেড়া নেই, উপর থেকে ছুটো চাল নেমে মাচার সংলগ্ন হয়েছে—টোঙ এই বস্তুর নাম। দিবারাত্রি টোঙে মানুষ থাকে—জাল ফেলে তারা, ঘুনি-আটস-চারো পাতে। পাটায়-ঘেরা জলের মাছ চুরি চামারি না হয়ে যায়, সদাসর্বদা কড়া নজর রাখে।

নৌকো থামিয়ে দেবনাথ জিজ্ঞাসা করেন: ও পাড়ুয়ের পো, মাছটাছ পেলে কিছু?

কই আর পেলাম। চুনোচানা চাট্টি—

ঝোড়াটা তোলো না কর্তা। দেখা যাক।

টোঙের লোক কলকে ধরানোয় ব্যস্ত। বোঁদা ভেঙে খানিকটা কলকের উপর ঠেসে দিয়ে জোরে জোরে টানে। গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া উদ্গীরণ করল খানিকটা। হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে এগিয়ে ধরল: খাও—

দেবনাথ বললেন, কলকের খাওয়া আমার অভ্যেস নেই। তামাক খাইও না আমি বেশি।

ধরজি চেপে কাদায় পুঁতে ডিঙির মাঝি দ্রুত এসে কলকে ধরল। টোঙের মানুষ ঝোড়া তুলে ধরল জল থেকে। মাছ খলবল করে উঠল—লাফাচ্ছে!

নেবা নাকি?

দেবনাথ বললেন, দাও চাট্টি—

নয়না, পুঁটি, তারাবাইন, টোয়া-কই—হরকরলা মাছ। বরকন্দাজ পাত্রের অভাবে গামছা পেতে ধরল—শানকিতে মাছ তুলে এক শানকি ঢেলে দিল গামছায়। আরও দিতে যাচ্ছে দেবনাথ আপত্তি করে উঠলেন: উঁহু, আর নয়। কুচোমাছ কোটা বাছা করবে কে এত? পৌঁছুতে সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে—ঘরে কি আছে না আছে, তাই কিছু সম্বল করে যাওয়া। কত দিতে হবে, বলো।

দাও যা হয়। হাটবাজার নয়, টোঙে এসে মাছ চাইলে—দরদাম কি করতে যাব? যেমন খুশি দিয়ে দাও।

দেবনাথ বললেন, আমি বাইরে থাকি, দরদাম কিছু জানি নে। মাঝি, তুমিই বলে দাও উচিত-দাম কি হতে পারে।

গামছার মাছ মাঝি একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখল। বলে, সিকি একটা দিয়ে দেন বাবু—

গেঁজে খুলে দেবনাথ বললেন, টাকায় ভাঙানি হবে তো?

টোঙের মানুষ ঘাড় নাড়ল: উঁহু, বিলের মধ্যে কেনাবেচা কোথা? তা ছাড়া পয়সাকড়ি কিছু এলে সঙ্গে সঙ্গে অমনি বাড়ি রেখে আসি।

দেবনাথ বললেন, খুচরো চার আনা তো হচ্ছে না—আনা দুই হতে পারে। এক কাজ করো, অর্ধেকগুলো মাছ তুলে নাও তুমি।

যা দেওয়া হয়েছে, আবার তা তুলতে যাব কেন? যা আছে দিয়ে যাও। বাকি পয়সা যে দিন হয় দিয়ে যেও। না দিলেই বা কী?

॥ সতেরো ॥

ঘাটে ডিঙি লাগল। ভর সন্ধ্যাবেলা। বাড়ির লাগোয়া উলুক্ষেত ইটখোলা ও আমবাগান দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সামান্য কয়েকখানা ধানক্ষেত পার হয়ে গিয়ে। শুকনোর সময় একদৌড়ে গিয়ে ওঠা যায়। এখন ডাঙা-পথে অনেকখানি ঘুরে প্রায় অর্ধেক গ্রাম চক্কোর মেরে বাড়ি পৌঁছতে হবে। দেবনাথ চললেন, বরকন্দাজ দু-জন নৌকো আগলে রইল।

নতুন মণ্ডপে ছেলেপুলের ভিড়। প্রতিমা চিত্তির হচ্ছে। দু-পাশে দুই জ্বলন্ত-লণ্ঠন, আলোর অনেক দূর অবধি উদ্ভাসিত হয়েছে। কমল, পুঁটিও সেখানে—সকলের আগে কমল দেখেছে, 'বাবা' 'বাবা' করে ছুটতে ছুটতে এসে সে বাপের হাত ধরল। মণ্ডপের সামনে এসে দেবনাথ মুহূর্তকাল দাঁড়ালেন। চার কারিগর কাজে লেগে আছে—রাজীবপুরের পালেদের চারজন।

দেবনাথ বললেন, এখনো সারা হয়নি? চালচিত্তির ধরোই নি, দেখতে পাচ্ছি।

মাতব্বর কারিগর বলে, যত রাতেই হোক হাতের কাজ সারা করে বেরুব। দি-মানের কাজ আমাদের গাঁয়ে ভট্টচাজ্জি-বাড়িতে। কাল সন্ধ্যায় আবার আসব, এসে চালচিত্তির ধরব। চার হাতে কাজ—ক'দিন লাগবে? হয়ে যাবে সময়ের মধ্যে। এক বাড়ি তো নয়, সব বাড়ি সমানভাবে সামাল দিয়ে বেড়াচ্ছি।

হাটবার আজ। কৃষ্ণময় আর ম্যাহিন্দার অটলকে নিয়ে ভবনাথ হাটে চলে গেছেন। রীতিমতো ওজনদার কেনাকাটা—সেই কারণে শিকে-বাঁক ধামা-ঝুড়ি গেছে। বাড়িতে মানুষ কিলবিল করছে। আত্মীয় কুটুম্ব অনেক এসেছেন, আরও কেউ কেউ আসবেন। দেখে দেবনাথ বড় খুশি—এমন নইলে বজিবাড়ি কিসের? পায়ের গোড়ায় টিবঢাব প্রণাম করছে—অধিকাংশই দেবনাথ চেনেন না। বিদেশে পড়ে থাকেন—না-চেনা আশ্চর্য নয়। কিন্তু ভবনাথ চিরকাল দেশেঘরে থেকেও তো চিনতেন না—ছোটকর্তার ফর্দ অনুযায়ী নেমন্তন্ন পাঠিয়েছিলেন, আসবার পরে চেনা-জানা হয়েছে। উমাসুন্দরী দেবনাথের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন: অমুকের অমুক ইনি। আর দেবনাথ বয়স বুঝে প্রণাম করছেন। না করলে ফিরে গিয়ে নিন্দেমন্দ করবে: দেখ, দুটো পয়সা রোজগার করে বলে ঘাড় নিচু হয় না মোটে। এক বৃদ্ধার পায়ের ধুলো নিতে গেলে ফোকলা মুখ নাচিয়ে না-না করতে করতে তিড়িং করে তিনি পিছিয়ে গেলেন: কী সর্বনাশ, পায়ে হাত পড়লে পাপ হবে, হিসাব মতন তুমি যে খুড়ো আমার।

উমাসুন্দরী বললেন, বয়েসে তবু তো কত ছোট—

ওটা কি বললে কেষ্টর মা, সাপটা ছোট বলে বিষ তার কিছু কম হয়ে থাকে?

হিরণ্ময় শিশুবরকে নিয়ে নৌকোয় মালপত্র আনতে ছুটল। দু'জনে কি হবে—চাষাপাড়া থেকে শিকে বাঁক সহ আরও কটিকে জুটিয়ে নিল সঙ্গে। তিনটে কাপড়ের বাণ্ডিল দুমদাম করে রোয়াকে এনে ফেলল। কপালের ঘাম মুছে হিরণ্ময় বলে কলকাতার দোকানের যত কাপড়—কাকা সমস্ত তুলে এনেছেন।

দেবনাথ হাসতে হাসতে বললেন, নতুন কাপড় পরে পুজো না দেখলে পুজো কিসের? কিন্তু সকলের জন্য তো হয়ে উঠল না—বাছাই বিবেচনা করে দিতে হবে। অগ্নিমূল্য হয়েছে—শাড়ি ধুতি এই সেদিন চোদ্দ-পনের আনা জোড়া ছিল—পাঁচ সিকের কমে তা ছাড়তে চায় না। বেশি মাল নিচ্ছি বলে শেষটা তিন আনা রফা হল। এত দুর হলে লোকে তো কাপড় পরা ছেড়ে সেকালের মতন বাকল পরবে।

তরঙ্গিণী ঘরে ঘরে ডেকে বেড়ান: ওঠো, ঢেঁকশালে চলো। চিঁড়ে কোটা হবে আর কখন? এখন তো পর পরই আসতে থাকবে। গোলমালে ঘরে উঠবে না। কলসি কলসি ধান ভেজানো হল নামাতে হবে তো সেগুলো।

তরঙ্গিণীর মাথায় জট নড়ে। রাতের এখন কী হয়েছে—ঢেমি ধরে ঘরে ঘরে ডেকে তুলছেন। শীত-শীত লাগছে বেশ, আঁচলের মুড়ো ভাল করে জড়িয়ে নিলেন। এখন শীত—ভানা-কোটা শুরু হয়ে গেলে এ শীত উড়ে পালাবে।

ষষ্ঠীর দিন থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো অবধি ঢেঁকির পাড় পাড়তে নেই। কত লোক আসবে, কাজকর্ম করবে—খই—চিঁড়ের বিস্তর খরচ। পা এলিয়ে শুয়ে পড়ে থাকলে হবে কেন?

ওঠ রে বিনি, ওঠো বড়বউ, উঠে এসো বসন্তর মা। বলি তিন কলসি ধান ভিজিয়েছ কাল, মনে আছে সে কথা?

শুধু ওই এক বাড়ি নয়, বাড়ি বাড়ি এমনি। ঢ্যা-কুচকুচ ঢ্যা-কুচকুচ—সব ঢেঁকিশালে, শোন, শেষরাত্রি থেকে পাড় পড়ছে।

গ্রাম গুলজার। নিতিদিন মানুষ এসে পড়ছে। পুজোর সময় বরাবরই আসে এমনি। কাজকর্মে বাইরে থাকে, ছুটি পেয়ে তারা বাড়ি আসে। অন্যান্য বছর পুজো ছিল না, তবু এসেছে—পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, সেটা বড় কম কথা নয়। গ্রামের পুজো বলে এবারে অতিরিক্ত ভিড়। গ্রামবাসী ছাড়াও ভিন্ন জায়গার মানুষ পুজো দেখবার ইচ্ছায় কুটুম্ববাড়ি আসছে। জোড়া তালতলার ঘাটে যখন তখন ডিঙি ডোঙা এসে লাগে, জুতো হাতে নিয়ে নেমে পড়ে মানুষ। আবার নাগোরগোপ থেকে দেড় ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটেও আসছে সব। চিঠি লেখা আছে, অমুক দিন যাচ্ছি। সময় আন্দাজ করে পাকারাস্তার উপর লোক বসে থাকে। খালি হাতে কেউ আসে না, কাপড়চোপড় মিষ্টিমিঠাই ফরমাসের টুকিটাকি থাকবেই—সেই সমস্ত মাল বয়ে নিয়ে যাবে। বাড়ির ছেলেপুলে ঘন ঘন হরিতলা অবধি চলে যায়। ফিরে এসে বলে, নাঃ, এলো না আজকে। হঠাৎ মোড় ঘুরে মানুষটি দেখা দিল পিছনের লোকের মাথায় বোঁচকাবুচকি। এসেছে, এসেছে—করতে করতে খুচরো এটা-ওটা মানুষটির হাত থেকে নিয়ে ছেলেপুলেরা দৌড় দিল, বাড়িতে আগে আগে গিয়ে খবরটা দেবে। উনুনের আগুন নেভে না আজকাল আর—এক খাওয়া মিটতে না মিটতে আবার চড়ে যায়। বউগুলো খেটে খেটে সুখ করে নিচ্ছে। গ্রামের দিন আজকাল ফুড়ুত করে যেন উড়ে চলে যায়, টেরই পাওয়া না। রাত্রে ঘুমে যখন চোখ বড্ড জড়িয়ে আসে, যেখানে হোক একটা মাদুর নিয়ে গড়িয়ে পড়ে। পলকে রাত কাবার হয়ে যায়।

হাটে কেনাকাটার খুব ধুম। সব বাড়ি থেকে হাট করতে যাচ্ছে, ভাল মাছটা শাকটা কেনার জন্য কাড়াকাড়ি। নিতান্ত গরিব মানুষটাও ট্যাঁকের অবস্থা ভুলে বসে আছে: আহা, দেশে ঘরে থাকে না, কদিনের তরে এসেছে—নিজেরা খাই না খাই ওদের পাতে কিছু ভালমন্দ যাতে পড়ে, দেখতে হবে বইকি।

এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় চলাতে-ফিরতে কত রকম টানের কথা কানে এসে

চোকে। দত্তবাড়ির বউটা খাস কলকাতার মেয়ে—এলুম-গেলুম-হলুম বলে কথা বলে। চাষি ঘরের বউ-ঝি মেয়েগুলো হেসে কূল পায় না। ওরা আরও জুড়ে দেয়ঃ গেলুম-হলুম হালুম-হলুম। হালুম-হলুম করে গলায় বাঘের আওয়াজ তোলে, আর হেসে লুটোপুটি খায়। তেমনি এসেছেন উত্তরবাড়িতে যজ্ঞেশ্বরের শালা—ঢাকার বাসিন্দা তিনি। বললেন, ওয়ান থনে আইতে বড় কষ্ট। জল্লাদটা পাড়ায় এসে সেই টানের অনুকরণ করে, আর লোক হাসিয়ে মারে।

নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ লেগেই আছে, কোন বাড়ি কোনদিন বাদ নেই। তোমার জামাইর নেমন্তন্ন পশ্চিমবাড়ি, আবার তোমার বাড়িতেই ঐদিন, ভাগিনা-ভাগনি ছুটো বারান্দি থেকে এসেছে, তাদের নেমন্তন্ন দিয়ে বসে আছে। চিরদিন তো থাকতে আসে নি, পুজো কাটিয়ে টেনেটুনে আরও হয়তো পাঁচ-সাতটা দিন রাখা যাবে। অতএব দেরি করে রয়ে-সয়ে খাওয়ানোর জো নেই, সময়ে বেড় পাবে না। তাড়াহুড়ো না করলে হাতনেয় বসিয়ে দুটো ভাত খাওয়ানো আর ঘটে উঠবে না।

আহ্লাদ বৈরাগীর গলা পাওয়া যায় ভোরবেলা এক-একদিন। মায়ের পিছন পিছন মায়ের দু-কাঁধে দু-হাত রেখে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে। পুববাড়িতে এসেছে, বাড়ির সকলে এখনো ওঠে নি। উঠানে দাঁড়িয়ে বৈরাগী আগমনী ধরেছেঃ

ওঠো গো মা গিরিরাণী
ঐ এলো নন্দিনী তোর—
(ও মা) বেহুঁশ হয়ে রইলি পড়ে
এমনি বিষম ঘুম-ঘোর।

তরঙ্গিণী রান্নাঘরে গোবর দিচ্ছিলেন। ন্যাতা হাতে দ্রুত বেরিয়ে দাওয়ায় দাঁড়ালেন। শুনতে শুনতে দু-চোখে জল টলমল করে ওঠে। মর পোড়ারমুখী গিরিরাণী মেনকা-মা, মেয়ে এসে উঠানে দাঁড়িয়ে আছে, ঘুম তবু দু-চক্ষু ছাড়ে না।

বাইরের উঠানের ওদিকটায় উঁকিঝুঁকি দিলেন একবার। ষষ্ঠীর দিন চঞ্চলা আসবে, সুরেশ নিয়ে আসবে—দুটো দিন বাকি তার এখনো। হিসাবের বাইরেও তো সংসারে কত জিনিস ঘটে! কোন কারণে, ধরো, সুরেশের অফিস আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ গিয়ে পড়ে অবাক করে দেবে—সেই জন্য, ধরো, আজকে এখনই যুগলে এসে হাজির।

গান শেষ করে বৈরাগী চাল-কাঁচকলা-পয়সা বিদায় নিয়ে আর এক বাড়ি গেল। তরঙ্গিণী নিশ্বাস ফেলে আবার গোবর-লেপার কাজে গিয়ে লাগলেন।

দেবেন চক্রবর্তী এসে উপস্থিত—দেবনাথ যাকে দিক্তে-দিক্তে করেন, কালের গুরুর পাঠশালায় যার সঙ্গে পড়তেন। সেখানে দেখা হয় নি। মেয়ের বাড়ি ছিল সে তখন। মাঝে এসে খবর দিয়ে গেছে, ঘাড়ে এঁদের পুজো চেপে পড়েছে—পুজোর সময় দেবনাথের না এলে পরিত্রাণ নেই। হিসাব করে দেবীচতুর্থীর দিন সে পুববাড়ি এসে হাজির। কালো রোগা লম্বা আকৃতি—সব মিলিয়ে প্রায় এক তালগাছ। হেঁটে আসছে—পা একখানা এখানে, পরের খানা কেবল হাত পাঁচ-ছয় এগিয়ে। মানুষের পা এত দীর্ঘ কী করে হয়—সন্দেহ জাগে, দুই পায়ে দুই রণপা লাগিয়ে ছুটছে। ছুটুক আর যা-ই করুক, হুড়ুপ-গুড়ুপ আওয়াজ তুলে হুঁকো টানার বিরাম নেই। কষে এক-একটা দম দিয়ে যাবতীয় ধোঁয়া মুখাভ্যন্তরে পুরে ফেলছে, ছেড়ে দিচ্ছে ক্ষণ পরে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে আগ্নেয়-গিরির ধূম-উদগীরণের মতো। ঠোঁটের উপরে গোঁফ আছে এবং নিচে সামান্য দাড়ি—সেগুলোর কালো রঙ তামাকের ধোঁয়ায় জ্বলে জ্বলে কটা হয়ে গেছে। হুঁকোই বা কী! আয়তনে বিপুল—ডাবা খোলের নিচের দিকটা সূক্ষ্ম হতে হতে একেবারে সূচিমুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালোকুঁদ আবলুসকাঠের নলচে নিয়মিত তেল মাখানোর গুণে আদন্ত ঝিকমিক করে, হাত থেকে পিছলে যাবে শঙ্কা হয়। নলচের গলায় বাঁধা রয়েছে হুক আর ঝাঁঝরি-কাটা টিনের চাকতি। হুক থাকায় যত্রতত্র টাঙিয়ে রাখা চলে। আর কলকের আগুন ঝাঁঝরি চাপা দিয়ে দেয় ফলে আগুন উড়ে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে না।

দেবেন চলল তো তার শখের হুকোও চলল সঙ্গে সঙ্গে। এক কলকে শেষ হয়ে গেলে পথের মাঝেই উবু হয়ে বসে নতুন এক ছিলিম সেজে নেবে। যতক্ষণ জাগ্রত আছে, হুকো টানা লহমার তরে কামাই না যায়। রাতের বেলা ঘুমানোর সময় চাল কি বেড়ার সঙ্গে হুকো টাঙিয়ে রাখে—কিন্তু ঘুম আছে নাকি পোড়া চোখে? তামাকের পিপাসায় তড়িঘড়ি উঠে পড়ে। কুটুম্ববাড়ি গিয়ে সাজা তামাক সঙ্গে সঙ্গে পেলে তো ভাল, নয়তো নিজেই সাজতে লেগে যাবে—মান টাঙিয়ে ভদ্র হয়ে বসে থাকার ধকল সইবে না। মোকদ্দমায় সাক্ষি দিতে কাঠগোড়ায় উঠেছে—হুঁকো বাঁ-হাতে ঝুলানো। মাঠেঘাটে বনেবাদাড়ে যেখানেই যাক, হুঁকো ছাড়া দেবেন নেই। রথের বাজারে পোড়ামাটির খেলনা-হুকো পাওয়া যায়—লোকে গল্প রটিয়েছে জন্মের সময় দেবেন নাকি অমনি এক সেট হুঁকো কলকে মুঠোয় নিয়ে মাতৃগর্ভ থেকে পড়েছিল। এবং যেদিন সে শ্মশানের মহাযাত্রায় যাবে, পড়শি-স্বজনেরা ঠিক করে রেখেছে জ্বলন্ত চিতায় মড়ার সঙ্গে শখের হুঁকো-কলকে এবং কিছু তামাক-টিকে দিয়ে দেবে। অচেনা পরলোকে গিয়ে তামাকের অভাবে গোড়াতেই সে

চোখে অন্ধকার না দেখে।

যাকগে, যা বলছিলেন। সেন্দাখড়ির পুরবাড়ি দেবেন এসে উপস্থিত। তাঁর যথারীতি ক্যাম্বিশের ব্যাগ, হাতে চটি, গলায় চাদর, মুখে হুঁকো। ব্যাগ খুলে পুঁটুলিতে বাঁধা পাশার সরঞ্জাম বের করতে করতে ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, বোশেখ মাসে এসেছিল—তখন আমি বেণুর বাড়ি গোঁসাইগঞ্জে। ন'মাস-ছ'মাসের পথ নয়—কাকপক্ষীর মুখে একটু খবর পেলে হামলা দিয়ে এসে পড়তাম।

সভয়ে তাকিয়ে দেবনাথ বলেন, ও কি মিতে, ছক পাতছ সকালবেলা এখন—

দেবেন বলে, এখনই ভাল হে। কাজের বাড়ি জমে উঠতে উঠতে আমাদের এক-বাজি দু-বাজি সারা হয়ে যাবে তার মধ্যে।

দেবনাথ হেসে বলেন, এক বাজিতে সানায় না—দু-বাজি! আহা বলিহারি যাই।

দেবেন বলছে, উঃ তোমার সঙ্গে কত দিন বসি নি! তখন তো পাশা তোমার হুকুমের গোলাম। হাঁক পেড়ে বললে ছ-তিন-নয়—তাই পড়ল। বললে, কচ্চে-বারো—ঠিক তাই। এখন কি রকম?

ভাব চটে গেছে মিতে, পাশা আমায় ভুলে গেছে। ছুঁই নি পাশা কত দিন। সময় নেই।

সকালের দুই পরম সুহৃদ—পাশা এবং দেবেন চক্রবর্তী। তাদের সামনে পেয়ে, কাজের দায়িত্ব যতই থাক দেবনাথ না বলতে পারলেন না। পাশা তিনটে তুলে দু-হাতে রগড়ে নিলেন একবার। হাত শুড়শুড় করছে দান ফেলবার জন্য। বললেন, দুজনে কি হবে? খেড়ি কই?

এসে পড়বে। সাজিয়ে নিই আগে—কাতার দিয়ে আসবে। ঠেলে কুল পাবে না।

সত্যি তাই। একে দুয়ে বেশ কিছু মানুষ। হারু মিস্তির কোন দিকে ছিল—সরো সরো করতে করতে মানুষজন ঠেলে দেবনাথের খেড়ি হয়ে বিপরীতে বসে গেল। দেবেনের সঙ্গে বসে বললেন।' কণ্ট, অক্ষয় ভুলো নিধুরাও খেলে ভাল, কিন্তু হিরন্ময়ের জুড়ি ও সমবয়সি হয়ে কাকামশায়ের সঙ্গে খেলা চলে না। খেলা দেখছে তারা—চতুর্দিকে ঘিরে জুত দিচ্ছে, কলহ ও কথা-কাটাকাটি করছে, সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছে মাঝে মধ্যে।

দেবনাথ সুবিধা করতে পারছেন না। চর্চা নেই তো বটেই, তার উপর লোকজন মিনিটে মিনিটে এসে মনোযোগে বাধা ঘটাচ্ছে। হাজু ময়রার ফর্দটা কার কাছে? চণ্ডীপাঠের কথা পাকা হয়ে গেছে তো? হাজাকের ম্যান্টাল

না থাকে তো গঞ্জে লোক যাচ্ছে—নিয়ে আসুক। ইত্যাকার হুকুম আসে ভবনাথের। অক্ষক্রীড়া ব্যসন বিশেষ—অগ্রজ [illegible] হয়ে গিয়ে তিনি এই আসরে আসতে পারেন না, লোকমুখে ঘন ঘন প্রশ্ন পাঠাচ্ছেন।

ঘাড় তুলে দেবনাথ একবার নজর ঘুরিয়ে দেখে আঁতকে উঠলেন : আরে সর্বনাশ, কাজের মানুষ সব ক'টি যে এখানে! তাড়াতাড়ি সারো মিত্তে। দাদা গরম হচ্ছেন—ঘন ঘন লোক পাঠানোর মানেটা তাই।

এতক্ষণ যজ্ঞিবাড়ির হুঁকোয় চলছিল, এইবারে দেবেন নিজের হুঁকো নামিয়ে নিয়ে সাজতে বসল। কলকেও কমমায়েসি—কলকে নয়, ভাতের-হাঁড়ির সরা একখানা যেন উল্টো করে বসানো। সেই কলকের কানায় কানায় তামাকে ভরতি করল। অতএব বলে দিতে হয় না, দেবেন চক্কোত্তিও এইবার বেরিয়ে পড়বে—পথ হাঁটবে।

দেবনাথ বললেন, এক্ষুনি কেন মিত্তে? পাকাশাক করো এখানে, ও-বেলা যেও।

মালসা থেকে ঘুঁটের আগুন কলকের উপর তুলে ভুড়ুক-ভুড়ুক কয়েকটা টান দিয়ে দেবেন বলল, খাজনার তিনটে টাকা দেবো-দেবো করে হরিশ কুণ্ডু আজ চার-পাঁচ মাস ঘোরাচ্ছে—তার বাড়ি হয়ে যাবো এখন। দেবীর ঘটস্থাপনা হয়ে গেলে তারপরে আর টাকা বের করবে না—ছুতো পেয়ে যাবে।

ছক-গুঁটি-পাশা ব্যাগে ভরতে ভরতে বলল, আজ কিছু হল না, তাড়াহুড়োর জিনিস নয়। মচ্ছব মিটেমেটে যাক—

দেবনাথ সোৎসাহে বলেন, কোজাগরী রাত্রে পঞ্জিকার বিধান রয়েছে—

থাকবে সেই অবধি?

দেবনাথ বললেন, কালীপুজোর পরেও আছি। ভাইদ্বিতীয়ায় দিদির হাতের ফোঁটা নিতে হবে এবছর, ঐজন্যে তিনি থেকে যাবেন।

একগাল হেসে দেবেন বলল, পাকা হয়ে রইল কিন্তু মিত্তে। নিশি-জাগরণ অক্ষক্রীড়া চিপিটক-নারিকেলোদক ভক্ষণ—শাস্ত্রের বিধান অক্ষরে অক্ষরে মানব আমরা। আমার খেড়ি আমি নিয়ে আসব, তোমার খেড়ি ঠিকঠাক করে ফেল এর মধ্যে। কেমন?

দুর্গাপুজো সকলের সেরা। পুজো মাত্র নয়, উৎসব—দুর্গোৎসব। এদিকে-সেদিকে কিছু খুচরো পরবও আছেন। দুর্গোপুজো দেরিতে—কার্তিক মাসে। খুচরোরা এবারে আগে এসে যাচ্ছেন।

ত্রিশে আশ্বিন, সংক্রান্তির দিন। মণ্ডপে প্রতিমা রং-চিত্তির হচ্ছে, ওদিকে

বিলের ধানবনের মধ্যেও একটুকুও ব্যাপার। এক ধরনের পুজোই—ধানবনকে সাধ-খাওয়ানো। হাঁটুর কাদা ভেঙে বুড়োমানুষ ভবনাথ নিজেই বিলে চলে গেলেন, সঙ্গে শিশুবর। এ পুজোয় পুরুত বলতে হবে শিশুবরকেই।

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে,
মা-লক্ষ্মী গর্ভে বসে,
সাধ খাও মা, সাধ খাও—

—এই হল মন্তোর। মন্তোর বলে শিশুবর ক্ষেতের ধারে এক ফোঁটা দুধ ঢেলে দেবে। ধানের ভেতরের দুধ, শস্যের যা আদি অবস্থা সেটা যেন খুব ভাল হয়—এই কামনা। দুধ দিয়ে তারপর বাতাসা ছড়িয়ে দেবে, অর্থাৎ চালের স্বাদ যেন মিষ্টিও হয়। শিশুবর চাষবাসও করে—অতএব ক্ষেত হল তার মেয়ে। গর্ভবতী মেয়েকে আপনজনেরা সাধ খাওয়ায় না—ক্ষেতকে মা ডেকে শিশুবর সাধ খাওয়াচ্ছে, দেখুন।

আবার সেই সংক্রান্তির রাতটা ভাল করে না পোহাতেই ভিন্ন এক পরব। গারসি। পোহাতি-তারা আকাশে। বাদুড়ের ঝাঁক কালো কালো ছায়া ফেলে বাসায় ফিরছে। তরঙ্গিণী উঠে ডাকাডাকি করছেন: ওঠো সব। কমলকে তুলে বসিয়ে দিলেন: ওঠ্ রে, গারসি করবি নে?

সবাই উঠেছে—সধবা-বিধবা ছেলে-বুড়ো বলে বাছাবাছি নেই। শরিক বংশীধরের বাড়িতেও উঠে গেছে, শুধুমাত্র সিধু বাদ। দক্ষিণের ঘর ও দালানের মাঝে খানিকটা উঁচু ফাঁকা জায়গা—'বারাণ্ডা' নামে জায়গাটুকুর পরিচয়। আপনা-আপনি একটা কাঁঠালচারা জন্মেছে যেখানে, আর কয়েকটা কৃষ্ণকলি ফুলের গাছ। গারসি করতে এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি থেকে ঐ একটা জায়গায় এসে সব জমল।

আশ্বিনে রেঁধে কার্তিকে খায়,
যে বর মাগে সেই বর পায়—

ছড়া কেটে বিনো পুকুরঘাটে দৌড়ল ঘটি নিয়ে। রীতকর্মে জলটা শুধু টাটকা লাগে, আর সমস্ত বাসি। রাতটুকু পোহালেই যে দিন, তার মধ্যে উনুনে আগুন দেওয়া যাবে না—চিঁড়ে-মুড়ি বাসি-পান্তা খেয়ে সব থাকবে। বিলের উপরে গ্রাম বলে এরই মধ্যে বেশ শীত-শীত ভাব। এক-আঁটি পাটকাঠি নিয়ে মাহিন্দার অটল এসে গেল—খালি গা-হাত-পা, আবরণ বলতে হাঁটুর উপরে তোলা এক চিলতে কাপড়। তুর-তুর করে কাঁপছে সে। বড়গিন্নি বললেন, জড়িয়ে আয় রে গায়ে একটা-কিছু—

অটল অবহেলায় উড়িয়ে দিল: কিছু লাগবেনে মা ঠাকরুন। জাড় আর কতক্ষণ?

কমল পুঁটিকে বলে, সিগারেট খাব আমি দেখিস।

পুঁটি বলে, আমিও—

কমল অবাক হয়ে বলে, সে কী রে, তুই যে মেয়েছেলে।

আজকে অত মেয়েছেলে-বেটাছেলে নেই। গেল-বছর খাইনি অসুখ ছিল বলে। জানলার উপরে চুপচাপ বসে বসে দেখলাম।

কমলের স্ফূর্তি মিইয়ে গেল। দিদিটাও খাবে—তবে আর পুরুষমানুষ হয়ে কী হল, ধুস!

বিনো জল নিয়ে ফিরেছে। হলুদ-বাটা সর্ষে-বাটা মেথি-বাটা তেল ঘি বাটিতে-বাটিতে। কুলগাছের নতুন পাতা একটা বাটিতে বেটে রেখেছে। কাজলপাতায় কাজল পাড়ানো। মুঠোখানেক কাঁচা তেঁতুল। থরে-থরে সমস্ত কুলোয় সাজিয়ে নিমি কাঁঠালতলার ঐখানটা এনে রাখল।

পাটকাঠির কাঁড়ুতে আগুন ধরিয়ে দিল। ঘটির জলে হাত ধুয়ে নিয়ে আগুনে হাত সেঁকছে সবাই, পা সেঁকছে। পাটকাঠির আগুনে কাঁচাতেঁতুল পোড়াল—খোলার নিচে তেঁতুল ক্ষীরের মতন হয়ে গেছে। এবারে তেলে-হলুদ-বাটায় মিশিয়ে রগড়ে রগড়ে গায়ে মাখে, মেথি তেঁতুলপোড়া ইত্যাদি মাখে। ঘি-ও মাখে ঈষৎ। মাথার চুলে কিন্তু ঘি মেখো না, খবরদার। চুল সাদা হয়ে যাবে। একফোঁটা এই যে কমলবাবু, রাতারাতি সে পাকাচুলো বুড়ো হয়ে গেছে দেখবে।

পাটকাঠির এক-এক টুকরো ভেঙে সকলকে দিচ্ছে—এক মুখে তার আগুন ফকফক করে টানছে—কমল যাকে বলছিল সিগারেট খাওয়া। খেতে হয় এই রকম—গারসির বিধি। সর্বসমক্ষে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করা—কী মজা, কী মজা! কিন্তু কাশি পেয়ে যায় যে বড্ড।

ভোর হতেই আহ্লাদ বৈরাগীর গলা। পয়লা কার্তিক আজ—আহ্লাদ ও মা বগলা আজ থেকে টহলদারি ধরলেন। বৈশাখ আর কার্তিক বছরের মধ্যে এই দুটো মাস প্রভাতী গাইতে হয়। গাইছেন আজ আগমনী-গান। ক'দিন পরে বিসর্জনী—মানুষ কাঁদাবেন বিসর্জন গেয়ে গেয়ে। দুর্গোৎসব চুকেবুকে যাওয়ার পর হরিকথা, কৃষ্ণকথা—বরাবরকার যে সমস্ত গান। কিৎ-কিৎ-কিৎ-কিৎ, ডু-উ-রে ল্যাং-চাং সোনা দিয়ে বাঁধাবো ঠ্যাং—ইত্যাকার দম ধরেছে, আওয়াজ আসে নতুনবাড়ির ওদিক থেকে। এই সকালে জনাদের দল হা-ডু-ডু খেলায় নেমেছে। ভোরের খেলাধুলা গারসিরই অঙ্গ—গারসির দিন এমনি দৌড়ঝাঁপের খেলা খেলে শীতকাল আসছে—গারসি করলে হাত-পা ফাটার ভয় থাকে না।

আজই আবার সন্ধ্যাবেলা ও-পাড়ায় শশধর দত্ত মহাশয়ের উঠানে আকাশ-প্রদীপ আকাশে চড়ে বসবেন, প্রতি সকালে ভুঁয়ে নামবেন। পুরো কার্তিক জুড়ে প্রদীপের এই ওঠা-নামা। আগে চাঁদুবাবু করতেন, তিনি গত হবার পরে আজ ক'বছর শশধর ধরেছেন।

কলকাতায় থাকার দরুন কালিদাস খানিক নাস্তিক হয়ে পড়েছে—জিনিসটা বাপের উদ্ভট খেয়াল বলে মনে করে সে। দু-ভায়ে হাসি-তামাসা চলে—কালিদাস বলে, সারারাত ধরে এক-পদ্দিম তেল পুড়িয়ে গুচ্ছের মরা-পোকা আকাশ থেকে নামিয়ে আনা। এছাড়া আর কোন মুনাফা নেই।

আছে রে আছে। হিসাবি মানুষ বাবা—হুট করে কিছু করেন না, পিছনে গভীর মতলব থাকে। এই আমাদের ভাইদের নামের ব্যাপার দেখ্। দাদার নাম ছিল হরিদাস, আমার নাম নারায়ণদাস, তোর নাম কালিদাস। সেই কতকাল আগে ভেবে চিন্তে বাবা নামকরণ করেছেন।

নামকরণের গূঢ় তাৎপর্য নারায়ণদাস শুনেছে, ভাইকে সে বুঝিয়ে দিল: ওহে হরি, ওরে নারায়ণ, ওরে কালী—ছেলেদের শশধর হরবকত তো ডাকবেন, ভগবানকেও অমনি ডাকা হয়ে যাবে। বিনি খাটনিতে আপনা আপনি পুণ্যলাভ। এতদূর অবধি তলিয়ে দেখেন উনি—ইহলোক-পরলোক কোন দিকে দৃষ্টি এড়ায় না। আকাশ প্রদীপ চালু করার মধ্যেও পারলৌকিক তদ্বির। মহালয়ার পার্বণশ্রাদ্ধ নিতে স্বর্গীয় কর্তারা পিতৃলোক থেকে ভূলোকে নেমে পড়েছেন—বুড়োমানুষরা অনভ্যাসে হোঁচট না খান, সেই জন্যে তেল পুড়িয়ে আলো দেখানো। বয়স হয়েছে শশধরের—অচিরে উনিও ঐ স্বর্গীয়দের দলে গিয়ে পড়বেন। আলো-টালো দেখিয়ে ওঁদের সঙ্গে যথাসম্ভব খাতির জমিয়ে রাখছেন।

॥ আঠারো ॥

প্রতিমা চিত্তির সারা হতে চতুর্থী অবধি লেগে গেল। চালচিত্রে এখনো হাত পড়েনি—দুই কারিগর দুই পাশ দিয়ে ঘোর বেগে লেগে গেল। রাজার শিরে রাজছত্র ধরে—সেই রকম খানিকটা। আধেক গোলাকার জায়গাটুকুতে নানান পৌরাণিক ছবি—ঠিক মাঝখানে দেবী দুর্গার মাথার উপরে মহেশ্বর, ডাইনে-বাঁয়ে পর পর ব্রহ্মা বিষ্ণু রামরাজা দেবর্ষি-নারদ সমুদ্রমন্থন দক্ষযজ্ঞ দশমহাবিদ্যা। সর্বশেষ দুই প্রান্তে দেবী রক্তবীজ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করছেন।

নাগাল পায় না বলে প্রতিমার সামনে তারা বেঁধে নিয়েছে, সেখানে বসে কাজ করে।

বেলগাছের গোড়ায় মাটির বেদী—বোধনতলা। কাঁচাবেদীতে এবারের ঘটস্থাপনা। মা যদি করুণা করে বছর বছর এমনি আসেন, ইটে-গাঁথা পাকা-বেদী হতে পারে।

ঢাক বাজে, ঢোল বাজে। বড়-পালমশাই নিশিরাত্রে কখন প্রতিমার মুখে ঘামতেল মাখিয়ে গেছেন—ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি এসে পার্বতীর মুখখানা হাসিতে ঝিকমিক করছে। কলাবউকে স্নান করিয়ে আনল নতুন পুকুর থেকে—পুকুর কাটা সার্থক। শুধু এক পুববাড়ির পুজো কে বলে—গ্রাম জুড়ে পুজো লেগে গেছে। বাড়ি বাড়ি আলপনা, চৌকাঠের মাথায় সিঁদুর। সন্ধ্যা হলে ধূপ জ্বালিয়ে দেয় প্রতিটি ঘরে, সন্ধ্যা দেখায়, গাল ফুলিয়ে শঙ্খ বাজায় মেয়ে-বউরা। কত মানুষ এসে পড়েছে ছোট গ্রামে, মানুষ কিলবিল করছে। আসার তবু কামাই নেই এখনো। এ-হে ও-হো—হাঁক পেড়ে পালকি আসে, ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে গরুর-গাড়ি আসে, ধ্বজি ঠকঠকিয়ে জোড়া-তালগাছতলায় ডোঙা-ডিঙি এসে লাগে। কাজকর্ম ফেলে তরঙ্গিণী ক্ষণে ক্ষণে বাইরের উঠানের হুড়কোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। না, সুরেশ-চঞ্চলা নয়—ষষ্ঠী পার হয়ে যায়, মেয়ে-জামাই চিঠিপত্র অবধি বন্ধ করে আছে।

ফুল—অনেক তো ফুল চাই। ফুলের শখ আর ক'জনের। সব ফুলের আবার পুজোও হয় না। গাঁদা দোপাটি টগর কৃষ্ণকলি অপরাজিতা জবা ঝুমকোজবা পদ্ম স্থলপদ্ম—কার বাড়ি কী আছে, দেখে রাখো। তিন-চার দিনের পুজো, তার উপরে এত মানুষের অঞ্জলি—গাঁয়ের ফুলে কুলোবে না, গড়ভাঙা মাদারডাঙা সাগরদত্তকাটি অবধি ফুল খুঁজে বেড়াতে হবে।

হিরু বলে, জল্লাদকে বলো মা। পাইতকের কোথায় কি, সমস্ত তার জানা। মিষ্টি-মুখে বললে জান কবুল করবে—অমনটি আর কাউকে দিয়ে হবে না।

সে-কথা সত্যি, তবু উমাসুন্দরী ঈষৎ ইতস্তত করেন: দায়িত্বের কাজ। যতই হোক, একফোঁটা বালক ছাড়া কিছুই নয়।

হিরণ্ময় নিজেই জল্লাদকে ডাকিয়ে বলে, ভোরবেলা ফুল তুলে আনতে হবে। বুঝলি রে জল্লাদ, ভারটা তুই নে।

জল্লাদ বিনে প্রশ্নে ঘাড় নেড়ে দিল: আচ্ছা।

বড় দায়িত্বের কাজ রে। গ্রামসুদ্ধ মানুষ পুষ্পাঞ্জলি দেবে, আর পুজোও একনাগাড়ে চারদিন ধরে। ফুল বিস্তর লাগবে।

বুক চিতিয়ে জল্লাদ বলল, লাগবে না—

তোর দলবল সব রয়েছে—বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসুক, কাউকে ফুল তুলতে না দেয়। একটা ফুলও নষ্ট না হয় যেন। তোর উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকছি তা হলে।

কথা জল্লাদ মনে গেঁথে নিয়েছে, হুঁ—বলে অন্যমনস্ক ভাবে সে জবাব দিয়ে দিল।

প্রহর রাত হতে চলল, নতুন বাড়িতে তবু সে মগ্ন হয়ে বসে থিয়েটারের মহলা দেখছে। কোলকাতার প্লেয়ারমশায়রা এসে গেছেন—তাজ্জব ব্যাপার! মণ্ডপের প্রতিমার চেয়ে এঁরাই আপাতত বড় আকর্ষণ।

কমলও আছে। বছরের এই ক'দিন বাধাবন্ধ নেই, এই রাত্রি অবধি বাড়ির বাইরে আছে তাই। অনভ্যাসে অস্বস্তি লাগছে, চুপিচুপি একবার সে বলল, উঠবে, না জল্লাদ-দা?

আজকেও পড়বি নাকি?

ক্ষুরধার ব্যঙ্গের হাসি জল্লাদের মুখে। বলে, যা, যা, আছিস কেন এতক্ষণ? ভাল ছেলে তুই, বাড়ি গিয়ে বই নিয়ে বোসগে। একলা যেতে পারবি নে বুঝি, পদা গিয়ে পথ দেখিয়ে আসছে।

কমল মরমে মরে যায়। ভাল ছেলে বলে রব উঠে গেছে, এর চেয়ে লজ্জার কাণ্ড সংসারে আর হতে পারে না। তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বলে, বাড়ি যেতে কে চাচ্ছে? ফুল নষ্ট না হয়, পাড়ায় ঘুরে বলে আসতে হবে না? গড়ভাঙা মাদারডাঙাতেও তো যেতে হবে।

জল্লাদ বলল, আমি ভার নিয়েছি, পুজোর ফুল ঠিক পৌঁছে দেবো। তা বলে ফকির-বোষ্টমের মতন বাড়ি বাড়ি ফুল ভিক্ষে করতে যাচ্ছি নে।

মাথায় কোনো মতলব নিয়েছে ঠিক, খুলে বলছে না। নিত্যসঙ্গী পদা মনে করিয়ে দিল: ফুলের কিন্তু অনেক দরকার—

অনেক ফুলই আসবে।

নিঃসংশয় জবাব দিয়ে একটুখানি ভেবে জল্লাদ বলল, হরিবোল দিয়ে কচ্ছপ জড় করব না। বেশি লোকের গরজ নেই। তুই যাবি, আমি তো আছিই। আর জোয়ান-মরদ একটা-দুটো, ভাল ধ্বজি মারতে পারবে যারা। ফড়ুকে দেখছি নে তো—ফড়ু গেল কোন চুলোয়?

ফড়ু বসে ছিল না, কলাপাতা-কাটার দলের মধ্যে সে। লগির মাথায় কাস্তে বেঁধে সারা দিনমান তারা পাতা কেটে বেড়িয়েছে। হাত-পা ধুয়ে খানিকটা ভদ্র হয়ে এবারে নতুন বাড়ি রিহার্শালের জায়গায় যাচ্ছে। পথে দেখা।

জল্লাদ বলে, পাতা কাটছিস—বেশ করছিস। ফুল তোলার কাজেও ছুটো তিনটে দিন আয় দিকি। তোর পাতারও তাতে অনেকখানি আসান হয়ে যাবে। পোহাতি তারা উঠলে তেমাথার ডুমুরতলায় এসে দাঁড়াবি, পদ্ম ডেকে ডুকে আরও সব হাজির করবে। ওখান থেকে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।

ফড়ু ইতস্তত করে বলে দিনমানে খোঁজ পড়ে না—রাত্রে বেরুনো তো মুশকিল। আজামশায় এক লহমা ঘুমোয় না। আওয়াজ একটু পেয়েছে কি, হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠবে।

পদ্ম বলল, বেরুতে কোনো-মশায়ই দিতে চায় না যে। তবু বেরুই। দুয়োর খুলেই চোঁচা-দৌড়—তখন আর কে পাত্তা পাচ্ছে? ফিরে এসে গণ্ডগোল—

জল্লাদ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, গণ্ডগোল আর কি! দুটো কথায় বকাবকি—খুব বেশি তো দু-ঘা ঠেঙানি।

ফড়ু বলে, মোটে দু-ঘা? তেমনি পাত্তোরই বটে।

না হয়, দশ ঘা'ই হল। মেরে ফেলবে না তো! পেল্লাদ মাস্টারমশাইর হাতে-পায়ে নিত্যি দু-বেলা খাচ্ছি—ঘরের মারই বা ভয় করতে যাব কেন?

জল্লাদ তা করে না বটে। মুখের মিছা বাগাড়ম্বর নয়, এ বাবদে তার ভুরি-প্রমাণ অভিজ্ঞতা। পাঠশালায় ও ঘরে উঠতে পেটায় তাকে, বসতে পেটায়। সে দৃকপাত করে না।

ফড়ু দেখেছে সে জিনিস। প্রসঙ্গ যখন উঠে গেল, অন্তরঙ্গ সুরে সে বলে, গায়ে তোমার মোটে সাড় লাগে না জল্লাদ-দা। দেখেছি, দেখে অবাক হয়ে যাই।

নেই বললে সাপের বিষ থাকে না রে, মনে করলেই হল লাগছে না। আরও কায়দা আছে, শোঁ-ও-ও করে নিশ্বাস টেনে বুকের মধ্যে বাতাস ভরে নিবি। মারতে আসছে—না-হক ছুটোছুটি করে হাঁফিয়ে পড়ে অনেকে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শান্তভাবে ততক্ষণ নিশ্বাস টেনে যাবি তুই। ভিতরে বাতাস ঢুকে গেলে ব্যথা লাগে না। ফুটবল দেখিস নে, এত লাথি মারছে—ভিতরে বাতাস বলে লাথি গায়ে বসতে পারে না।

নিজের বেলা জল্লাদ এই কৌশলই নিয়ে থাকে সকলে চাক্ষুষ দেখে। মার-গুতোন খাবার সময় একেবারে চুপচাপ থাকে—চেঁচায় না, কাঁদে না, পালাতে যায় না। প্রহারকর্তা ক্লান্ত হয়ে এক সময় মার বন্ধ করে, জল্লাদও নিশ্চিন্তে পূর্বকর্মে লেগে যায় তখন।

বারবার এই রকম হয়ে আসছে। ছোঁড়াটাকে মেরে শাসন করা যাবে না, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলে বুঝে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও মারে—মেরে বেশ হাতের সুখ পাওয়া যায়। খাসা একখানা ক্ষেত্র পাওয়া গেছে, যত খুশি সেখানে

নির্বিবাদে কার্য চালানো যায়—হেঁপোকেল্লায় তেমন জিনিস ফেলে রাখতে যাবে কেন ?

ভালছেলে ইত্যাদি গালি খাওয়ার পরেও কমল এ যাবৎ সঙ্গ ছাড়ে নি, পিছু পিছু চলেছে। অধ্যবসায়ে প্রীত হয়ে জল্লাদ হঠাৎ সদয় কণ্ঠে বলল, যাবি তুই সত্যি সত্যি ?

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল, সেই জল্লাদই আবার এখন ভরসা দিচ্ছে : ভালছেলে তা কি হয়েছে, ভাল বলে বুঝি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে। ভাবিস নে তুই—এই বেড়াল বনে গিয়ে বনবেড়াল হয়। তেমাথার ডুমুরতলায় চলে যাবি, আমরা সব থাকব।

নিজেই আবার খেয়াল করে বলছে, একলা যেতে ভয় করবে তোর—অভ্যেস তো নেই। বাড়ি থেকেই নিয়ে আসব। টুরের আমতলায় দাঁড়িয়ে শেয়াল ডাকব, টিপি-টিপি বেরিয়ে আসিস।

ভালছেলে হলেই অপদার্থ হয় না, কায়দা পেয়েছে তো কমলও সেটা প্রমাণ করে ছাড়বে। তরঙ্গিণীকে বলে রাখল, পুজোর ফুল তুলতে যাবে সে। পুজোর নামে যা কিছু বলবে না, জানে। জল্লাদের নামগন্ধ করল না। ঘরে মেয়েলোক ঠাসা, মেজেয় ঢালা-বিছানা পড়েছে। মেয়েরা থাকলেই কুচোকাচা কিছু থাকবে—শেষরাত্রি থেকে ট্যা-ভ্যা লেগে যায়। এসো জন বসো-জন আত্মীয়-কুটুম্বে পুজো-বাড়ি গিজ-গিজ করছে। বাইরে-বাড়ি পুরুষেরা যে যেখানে পারে মাদুর বিছিয়ে গড়িয়ে পড়ে, মেয়েরা ভিতর-বাড়িতে। পোহাতি তারার সঙ্গে তরঙ্গিণী উঠে পড়েন, বারোমেসে অভ্যাস। পুজোয় উদ্বেগে এখন তো চোখের ঘুম একেবারে হরে গেছে। উঠে তরঙ্গিণী দরজা খুলে বাইরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কমলও উঠে বসে শেয়াল-ডাকের প্রতীক্ষা করছে।

ডাক পেয়ে বেরিয়ে এলো।

আকাশে তারা, রাত্রি আছে এখনো। পাখপাখালি ডাকছে। ডুমুরতলায় আঁধারে আরও চারজন—কাঁধে ধরজি, হাতে ঝুড়ি। ঝুড়ি ভরে ফুল নিয়ে আসবে। জল্লাদ ও কমল এসে যোগ দিল। জল্লাদ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে—কোঁসা-দা, কাস্তে।

গ্রামপথে সকলে চলেছে। রাতের বেলা বেরুনো কমলের এই প্রথম—পুজোর নামে এতদূর হতে পারল। পড়তে শিখেছে এখন কমল, পড়ার বড় ঝোঁক। হাতের কাছে যা পায় পড়ার চেষ্টা করে। শব্দ করে না, চোখ দিয়ে পড়ে যায়। নিতান্তই যদি না বোঝে, মনে মনে কষ্ট পায়—ভাণ্ডারে কত কি জিনিস, তাকে যেন ধরতে ছুঁতে দিচ্ছে না। গল্প একটা পড়ে ফেলে

নিজেকে সেই গল্পের মধ্যে দাঁড় করায়। এই যেমন মনে হচ্ছে, আলেকজান্দারের মতো দেশ বিজয়ে চলেছে তারা। অথবা শিবাজীর মতন দুর্গ-অভিযানে। ডানদিকে বাঁ-দিকে ক্ষেতের বেড়া—বেড়ার জিওল ও ভেরেণ্ডার কচাগুলো সৈন্যদলের মতন সেলাম ঠুকে সারিবন্দি অ্যাটেনসন দাঁড়িয়ে আছে যেন। নতুনবাড়ি ছাড়িয়ে গিয়ে সমুদ্দুর-পুকুরের পাড় (সমুদ্র নয়, স্বমুখছয়ায় থেকে সমুদ্দুর হয়েছে। প্রহ্লাদ মাষ্টার-মশায় একদিন বলেছিলেন)। পুকুর-পাড় ধরে যাচ্ছে তারা। হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে—গাছের পাতা নড়ছে, পুকুরের জল কাঁপছে। পথ সংক্ষেপে হবে বলে এরা উঠান ও কানাচ ধরে যাচ্ছে এক এক সময়। মানুষজন বেহুশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, ঘরবাড়িগুলোও যেন। পাখিরাই কেবল জেগেছে—উড়ছে না, কেমন কিচিমিচি করছে। আম-কাঁঠালের বাগান তরিতরকারির ক্ষেত, খেজুর বাগান একটা। খড়বন আড়াআড়ি পার হয়ে সুঁড়িপথে পড়ল। আশশ্যাওড়া ভাঁট কালকাসুন্দে আর যাবতীয় [illegible] দু'ধার দিয়ে এঁটে ধরেছে। বিশাল বাঁশবাগান—অন্ধকার বাঁশতলা দিয়ে পথ। বাঁশের পাতায় আওয়াজ তুলে শিয়াল চলে গেল রাস্তার এধার থেকে ওধারে। হেই, হেইও, কেডা তুমি? কনে যাবে?—জল্লাদ অকারণ হাঁক পাড়ছে। জন্তু-জানোয়ার সাপখোপ যা থাকে, মানুষের গলা পেয়ে সরে যাবে। ফড়ু এর মাঝে গান ধরল হঠাৎ। গানে ভয় কাটে। নাথ, রাম কি বস্তু সাধারণ, ভূতার হরিতে অবনীতে অবতীর্ণ সে ভবতারণ—গানের ভিতরে রামের নাম। রাম-নামের বিশেষ সুবিধা, ভূতও ত্রিসীমানায় থাকবে না। এক ফাঁকতালে খানিকটা পুণ্যার্জনও হয়ে যাচ্ছে।

ফড়ু এবারে বলে উঠল, এখনও রাত পোহানোর নাম নেই, কত রাত থাকতে আনলি পদা?

পদা কিছু বলল না, জবাব জল্লাদ দিল: রাত যেমন আছে, রাতের কাজও রয়েছে। পা চালিয়ে চল।

আগে আগে জল্লাদই জোর পায়ে চলল। মতলবটা পদাও পুরোপুরি জানে না প্রশ্ন করে: যাচ্ছি কোথায় রে?

চৈতন মোড়লের বাড়ি।

যেতে যেতে জল্লাদ বিশদ করে বলল, মোড়লবাড়ির নিচে ডোঙা রেখেছে। আনকোরা নতুন ডোঙা, এই বছরের বানানো। ঘাস কেটে এনে টেমি ধরে খুয়েছে অনেকক্ষণ ধরে। চাইলে তো দেবে না, না চেয়ে নিয়ে বেরুব।

নতুনবাড়ি রিহার্শাল থেকে বেরিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল—তারপরেও জল্লাদ একাকী গ্রাম চক্কোর দিয়েছে। চৈতনের ডোঙাটা পছন্দ করেছে সেই

সবর, ঐ ডোঙা বাঁধে নেবে। বিল-কিনারায় উত্তমের বাড়ি, বিলের মাটি তুলে বাড়ির জমি উঁচু করেছে—চতুর্দিকে বেশ একটা পরিখার মতন হয়েছে। ডোঙা সেখানে।

কড়ু বলল, এতজন আমরা উঠলে ডোঙা তো ডুবে যাবে।

জল্লাদ বিরক্ত হয়ে বলে, উঠতে কে বলছে। ডোঙায় চড়ে নবাবি করবি, সেই জন্যে বুঝি এসেছিস? ডাঙায় তোল ডোঙা, উপুড় করে মাথায় নিয়ে নে। এতজনে সেই জন্যে আমরা।

মাথার দিকটা ভারী বলে জল্লাদ নিজে সেই দিকে মাথা ঢুকিয়েছে, পিছনে অন্যেরা। পদা সকৌতুকে বলল, মানুষে ডোঙায় চড়ে যায়, সেই ডোঙা আজ আমাদের উপর চড়ে চলেছে।

সকলের আগে জল্লাদ—ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে বাঁক নিচ্ছে, যেতে হবে সকলকে। অধীর কণ্ঠে কড়ু বলে, নিয়ে চললি কোথা বল্ দিকি?

রহস্য ভাঙে না জল্লাদ। সংক্ষেপে বলে, চল্ না—

নিঃশব্দ পথ। সোনাখড়ি ছেড়ে মাদারডাঙায় ঢুকছে। ঢিবির উঁচুতে উঠল, নেমে গিয়ে এক্তার-বক্তারের দীঘি। রাতও শেষ হয়ে এসেছে, ফিকে অন্ধকার। তারারা নিভে আসছে, ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া। দীঘির কিছু নেই, নামেই শুধু দীঘি। কারা এক্তার-বক্তার, কেউ জানে না। নলখাগড়া হোগলা, টেঁচো, ঘন সতেজ সবুজ কচুরিপানা আর ঘালিঘাস। হঠাৎ মনে হবে উর্বর ফসলের ক্ষেত একটা। নজর দূরে ফেললে, পদ্মবন চোখে পড়বে। বড় বড় পদ্মপাতা, জলের খানিকটা উপরে উল্টোনো ছাতার মতন, জায়গাটা একেবারে ঢেকে দিয়েছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে পদ্ম—এখন পাপড়ি বন্ধ, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শতদল হয়ে ফুটবে।

জল্লাদ দেমাক করে বলে, এক জায়গা থেকেই আমাদের কাজ হয়ে যাবে।

সঙ্গীরা শিউরে উঠে: পদ্ম তুলবি এই দীঘির?

জল্লাদ বলে, দীঘি আর কোথা, শুধুই পদ্মবন। যত খুশি তুলে নাও। ফকিরের ভিক্ষের মতন এর কানাচে ওর ছাঁচতলায় ফুল তুলে তুলে ঘুরব কেন রে? একখানে ঝুড়ি বোঝাই। শুধু ফুল কেন, পাতাও নেবো। বৃহৎকর্মে পদ্মপাতেও লোকে খেতে পারবে। গোড়া থেকেই আমি ভেবে রেখেছি—ঘাবড়ে যাবি তোরা সেই জন্য বলিনি। আর বাবার কানে গিয়ে পড়লে তো আমাকে আচ্ছা একচোট পিটুনি দিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে আটকাত।

ক্যা-ক্যা করে হেসে নিল খানিক। হাত তুলে জায়গা দেখিয়ে দেয়: উই যে টেঁচোবন, ঐখানে ডোঙা ফেলব। গরু ঘোড়া নেমে নেমে ঘাস খায়—

ঘাসের মধ্যে সড়কের মতন হয়েছে। কাল আমি হেঁটে দেখে এসেছি, ঝাঁঝি সেরে ডোঙা বেশ চালানো যাবে।

যথাস্থানে নিয়ে মাথার ডোঙা ফেলল। বর্ষার জল যৎসামান্য আছে, পাঁকই বেশি। জল্লাদ বলে, পয়লা খেপে তিনজন। আর সব দাঁড়িয়ে থাক্, পরের খেপে যাবি। ডোঙায় ভার বেশি হলে পাঁকে কামড়ে ধরবে, ঠেলে কূল পাওয়া যাবে না। আমি যাচ্ছি, ফড়ু আসুক, আর কে আসবি রে? রাখাল, তুই বরং আয়।

পদা বলল, সাপটাপ আছে, নজর ফেলে সামাল হয়ে এগোবি।

একার-বক্কারের দীঘির সাপের কথা সবাই জানে, বলে দিতে হয় না। শরবনের ধারে ভাঙা-শামুকের গাদা—শামুক-ভাঙা কেউটেমশায়রা আহারাদি সেরে উচ্ছিষ্ট ফেলে গেছেন। গরু-ঘোড়া ঘাস খেতে নেমে প্রতি বছরই দুটো-পাঁচটা কাটিঘায়ে ঘায়েল হয়।

জল্লাদ বলল, ভালোয় ভালোয় ফিরে মা-মনসার দুধ-কলা দেবো, মানত করেছি। মনে মনে সকলে তোরা 'আস্তিকস্ত' পড়ে নে, সাপে কিছু করতে পারবে না।

হেঁসো-দা হাতে জল্লাদ ডোঙার ঠিক মাথার উপরে হাঁটু গেড়ে বসেছে, ডাইনে বাঁয়ে হেঁসো চালিয়ে জঙ্গল ও দাম কেটে পথ করে দিচ্ছে। সাপ পড়লেও হেঁসোর মুখে কচাত করে দু-খণ্ড হয়ে যাবে। দু-পাশে দু-জন, ফড়ু আর রাখাল ধবজি মেরে প্রাণপণ বলে এগুচ্ছে। একটু গিয়েই হুঁশ হল জল্লাদের: রাখ্ রাখ্ আরও একজন চাই। পদ্মবনে গিয়ে ফুল তুলবার মানুষ কই? ধবজি ফেলে তোরা পারবি নে, হেঁসো ছেড়ে আমিও না।

ফড়ু বলল, তিন মানুষের বোঝা এমনিই বেশি, এর উপর আবার তো পদ্ম-ফুল পদ্মপাতার চাপান পড়বে।

জল্লাদ ডাঙার তাকিয়ে দেখছিল। বলল, কমলটা আসুক,—এক-ফোঁটা মানুষ—ওর আর ওজন কি। ওদের বাড়ির পুজো—ভালই হবে, নিজের হাতে ফুল তুলবে।

কাস্তে দিল কমলের হাতে: টুক-টুক করে কেটে যাবি, কেটে সঙ্গে সঙ্গে ডোঙায় তুলে ফেলবি।

কী মজা কমলের। না কেটে ফুল-পাতা উপড়ে তোলাও যায়—উঁহু, উপড়াতে গিয়ে সরু হাল্কা ডোঙা কাত হয়ে ডুবে যেতে পারে। ডুববে জলে নয়, পাঁকের ভিতর। এক-মানুষ সমান পাঁক এখানটা। জলে ডুবলে জেলে ডেকে আন্দাজ করে দেহটা অন্তত পাওয়া যায়—এখানে সেটুকুও নয়, পাকা-পাকি কবর। সেই এক যুগে একার-বক্কারের আমলে নিখুঁত জল ছিল নিশ্চয়—

লোকে স্নান করত, সাঁতার কাটত, কলসি কলসি জল নিয়ে যেত বউ-ঝিরা, ছেলেপুলেরা জল ঝাঁপাত। তারপরে কখন দীঘি মজে হেজে গিয়ে জঙ্গল জেগে উঠল, সাপের ভয়ে কেউ আর এ-মুখো হয় না। বিশাল পদ্মবন গ্রীষ্মে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, বর্ষার জল পড়লে পাতা গজিয়ে ওঠে। তারপরে কলি-ফুটতে শুরু হয়, পরিত্যক্ত দীঘি তারপর পদ্মে পদ্মে আলো হয়ে থাকে সারা দিনমান—দূর থেকে পথিকজন দেখে যায়। আজকেই প্রথম পূজা উপলক্ষ করে দুঃসাহসী কয়েকটা গ্রামবালক পদ্মবনে ঢুকে লগি ঠেলছে, ফুল তুলছে।

আর ক্ষণে ক্ষণে জল্লাদ সামাল দিচ্ছে কমলকে: ভালছেলে তুই, তা খাসা তো বোঁটা কাটছিস। ডুবে না মরিস, সেই খেয়ালটা যেন থাকে। মুখ কাঁচুমাচু করতে লাগলি, মায়া হল, তাই নিয়ে এলাম। সুভালাভালি ভাণ্ডার ফেরত নিয়ে তুলতে পারলে যে হয়।

॥ উনিশ ॥

কাল ষষ্ঠীর বোধন হয়ে গেছে। চারটে ঢাক ছিল, তার উপর হাঁসাডাঙা থেকে এইমাত্র ঢোল-সানাই এসে পৌঁছল। মণ্ডপ জমজমাট। ছেলেপুলের ছুটোছুটি কলরবে তোলপাড় পড়ে গেছে। বড়গিন্নি উমাসুন্দরী নেয়েধুয়ে মাথার চুল চুড়া করে সামনের দিকে বেঁধে হেসে হেসে আদর-আপ্যায়ন করছেন সকলকে। নতুন পুকুরে কলাবউকে স্নান করিয়ে আনল। উমাসুন্দরী বলেন, সার্থক পুকুর-কাটা, সার্থক পুকুর-প্রতিষ্ঠা।

ভিতর-বাড়িতেও ছুটোছুটি হাঁকডাক। তরঙ্গিণী ওদিকে। রান্নাঘরের সামনের উঠোনটুকু তকতকে গোবর-নিকানো, সিঁদুর পড়লে প্রতিটি কণিকা তুলে নেওয়া যায়। আলু পটোল মিঠেকুমড়ো কাঁচকলা এনে ঢালল সেখানে, খান পাঁচেক বঁটি এনে ফেলল। মেয়েলোক বিস্তর জমেছে, তাদেরই কতক বঁটি পেতে বসল। তরকারি-কোটা ও গল্পগাছা। কুটনো কুটে বড় বড় ঝুড়ি-চাঙারিতে রাখছে, ধুয়ে আনছে সে সব পুকুরঘাট থেকে। আর একদিকে কেঠো-বারকোশ চাকি-বেলন হাতা-ঝাঁঝরি কড়াই-গামলা মেজে ঘষে সাফ-সাফাই করে গাদা দিয়ে রাখছে। জল ঝরে গেলে ঘরে তুলে নেবে এরপর।

এ দিকের ব্যবস্থা সেরে তরঙ্গিণী রান্নার দিকে ছুটলেন। অনেক মানুষ খাবে, ছেলেপুলে বিস্তর তার মধ্যে। বাজনা খানিকটা নরম হলে খাই-খাই রোল উঠে যাবে, তখন আর দিশা করতে দেবে না। বাঁশে খড়ে ঘর তুলতে ভবনাথের আলস্য নেই—রান্নাঘরের গায়েই এক চালাঘর উঠে গেছে ইতিমধ্যে

—অস্থায়ী ব্যবস্থা। চার উনুন সেখানে—রাবণের চুল্লি। এ ক'দিন দিনে ও রাত্রে কোন না কোন উনুন জ্বলছেই। কখনো বা চার উনুন একসঙ্গে। গাঁয়ের ঝি-বউ একটিও বোধহয় বাড়িতে নেই—কাপড়চোপড় গয়নাগাটি পরে পুজো দেখতে এসেছে। বাড়ি থাকায় গরজও নেই—খাওয়া সবসুদ্ধ আজ এখানে।

ফড়ুর মা কি কাজে এদিকে একবার এসেছেন, চেয়ে চেয়ে তরঙ্গিণীর ছুটোছুটি দেখছেন। বললেন, পুজোর এত সোরগোল—ছোটবউ সেই রাঁধা-বাড়া নিয়ে রান্নাঘরেই পড়ে আছ।

তরঙ্গিণী বললেন, কলাবউ নিয়ে যাচ্ছে তখন একবার গড় করে এসেছি। অঞ্জলির সময় আবার গিয়ে বসব। কি করব দিদি, এদিকে না থাকলেও তো চলে না।

ফড়ুর মা খোশামুদি সুরে বলেন, তোমারই সার্থক পুজো ছোটবউ, মা জগদম্বা হাত পেতে তোমার অঞ্জলি নেবেন। যেমন মন, তেমনি ধন। এই মনের গুণেই ছোটঠাকুরপোর এতখানি সুসার-পসার।

কাজের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গিণীর বুকের ভিতরে টনটন করে ওঠে, কাজ ফেলে মুহূর্তকাল পাঁচিলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান। পঞ্চমী ষষ্ঠী গিয়ে মহাসপ্তমী এসে গেল, মা-দুর্গা ছেলেমেয়ে এপাশে ওপাশে নিয়ে মণ্ডপ আলো করে আছেন, তাঁর মেয়ে এলো না বোধহয় আর। চঞ্চলা-সুরেশ আসার হলে এদ্দিনে এসে পড়ত—আর কবে আসবে? শাশুড়ির চক্রান্ত, সে আর বলে দিতে হবে না। বউকে চোখে হারান—বাড়ির বার হতে দিতে বুক চড়-চড় করে। স্বার্থপর—নিজেরটাই দেখেন শুধু, অন্তদের কেমন হচ্ছে সেটা একবার ভাবেন না। দিয়ে দেবেন শেষে একটা অজুহাত—বাসের সিট পাওয়া গেল না। বলে দিলেই হল। বিয়ে দেওয়ার পর চঞ্চলা তো ওঁদেরই হয়ে গেছে—'পাঠাব না' স্পষ্টা-স্পষ্টি না বলে ঘুরিয়ে বলে দেওয়া। লোকজনের ভিড় আর কাজকর্মের চাপে এক দণ্ড তরঙ্গিণী নিরিবিলি হতে পারছেন না। দেবনাথকেও একটু কাছাকাছি পাচ্ছেন না যে মেয়ের কথা বলে মন কিছু হাল্কা করবেন।

চড়া রোদ। মণ্ডপে বেলোয়ারি-ঝাড় ঝুলানো। ঝাড়ের গায়ে রোদ ঠিকরে পড়ছে। ঠাকুরমশায় গম্ভীর সুরে চণ্ডীপাঠ করছেন—সেদিকে সামান্ত লোক, বুড়োবুড়ি গোণাগুণতি কয়েকজন। বলির বাজনা বেজে উঠতে সকলে রে-রে করে ছুটল। মণ্ডপের ভিতরে-বাইরে উঠানে সামিয়ানার নিচে লোকে লোকারণ্য। সন্ধিপূজায় পাঁচ-কুড়ি-পাঁচ পদ্ম লাগে—জোটানোর ভাবনা হয়েছিল। আর এখন দেখ, পদ্মের পাহাড়—অঞ্জলি দিচ্ছে আস্ত এক এক পদ্ম নিয়ে। নিমন্ত্রিত অভ্যাগত গ্রামবাসী সকলে প্রসাদ পাবেন, পুবোদক্ষর পাতা পেতে

খাওয়ানো—লুচি তরকারি মিষ্টিমিঠাই। মণ্ডপের সামনে সামিয়ানার নিচে পুরুষরা, মেয়েরা ভিতরবাড়ি। সোনাখড়ি গাঁয়ের মধ্যে আজ উনুন জ্বলবে না—উমাসুন্দরী বিনোকে পাঠিয়েছিলেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সে বলে এসেছে।

সন্ধ্যা হতে না হতেই আলো। চতুর্দিকে আলো—আলোয় আলোয় দিনমান করে ফেলেছে। প্রতিমার দু-পাশে বাতিদানে চারটে করে বাতি, মাথার উপর কাচের হাঁড়িতে বাতি জ্বলছে। হ্যাজিং-লণ্ঠন ও হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে এখানে ওখানে। কারবাইডের আলো। আর আছে মশার আলো। কলার তেউড়ের মাথায় মশা বসিয়ে তুষে-কেরোসিনে ধরিয়ে দিয়েছে, দাউদাউ করে জ্বলছে। দিনমান কোথায় লাগে! আরতির সময় চার চারটে ঢাকে তোলপাড়। মানুষজন ভেঙে এসে পড়েছে। ঢাক থামলে ঢোল আর মিষ্টি-মধুর সানাই। কাঁসর বাজছে ঢং-ঢঙা-ঢং। ধূপের ধোঁয়ায় মণ্ডপ আচ্ছন্ন। এক হাতে পুরুত পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাচ্ছেন। আর হাতে ঘণ্টা নাড়ছেন—

কলকাতার প্লেয়ার দুটি, সিরাজ ও করিম চাচা, মহালয়ার দিনে নয়—তার পরের দিন পৌঁছে গেছে। কালিদাস নিয়ে এসেছে। এসে আর দেরি নয়—ফুল-রিহার্শাল সেই দিন থেকে। এবং সপ্তমীতে চুল-দাড়ি-গোঁফ পরে স্টেজে মা-বাবা পর্যন্ত প্রতিদিনই চলবে। বলে, সড়গড় করে নিই সকলের সঙ্গে—সকলকে বাজিয়ে দেখব, দূত-সৈনিকও বাদ থাকবে না। অতদূর থেকে কষ্ট করে এসে ধাষ্টামো হতে দিচ্ছি নে।

মাদার ঘোষ হারু ছিপ্তিরকে বলেন, কি বলছে শুনেছ ?

হারু বড়াই করে : ডরাই নে, হবে তাই। চার মাস একনাগাড় ঘোড়ারঘাস কাটিনি আমরা।

ঢংঢং ঢংঢং নতুনবাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে যথারীতি সে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। বৈঠকখানা ভরে গেছে। যাদের পার্ট নেই, তারাও অনেকে এসেছে কলকাতার প্লেয়ারের নামে। ফরাসের ঠিক মাঝখানটিতে সিরাজ জেঁকে বসেছে। দাগ-চোক কাটা রংবেরঙের জামা গায়ে, জুলপি ও গোঁফ মুখে, কথাবার্তায় বাঁকা টান। করিম-চাচা তার গা ঘেঁসে পাশে বসেছে, সে মানুষটি একবারে নিঃশব্দ—ঘাড় নাড়ছে একটু আধটু, কদাচিৎ ফিসফাস করছে একেবারে সিরাজের কানের উপর মুখ নিয়ে।

সিরাজ বলল, লুৎফউন্নিসা কে মশায়? তিনি উঠুন। তাঁর সঙ্গে কয়েকটা ভাল ভাল কাজ আমার। একটু দেখেশুনে বাজিয়ে নিতে চাই।

ওঠো হারু—

বলে গায়েধাক্কা দিয়ে মাদার তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। চার মাস ধরে সকলের খবরদারি করে এসেছে, সময় কালে এখন তার নিজেরই বুক ঢিবঢিব করছে।

সিরাজ বলে, ধরুন—দানসা-ফকিরের দরগার সিন। উম্মৎ কই! মেয়ে কোলে জড়িয়ে নিন।

উম্মৎ জহুরা হবে বলাই। সে এসে হারুর গায়ে গড়িয়ে পড়ল। হারু নির্বাক।

সিরাজ হাঁক পাড়ে ' হল কি মশায়? আরম্ভ করে দিন—'আহা, বাছা আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়েছে, নবাব-দুহিতা ভিখারিনীর অধম। যে সুবাসিত সুশীতল জল দেখে মুখ ফিরিয়েছে—'প্রম্পটার কোথায়, ধরিয়ে দিন না।

মাদার সগর্বে বলেন, প্রম্পটারের ধার ধারিনে, টনটনে মুখস্থ। প্রম্পটার লাগবে না আমাদের।

সিরাজ সহাস্যে বলে, আমার কিন্তু লাগবে-ব্যবস্থা রাখবেন। প্লে নিত্যি দিন লেগেই আছে, পালারও অন্ত নেই। আপনাদের মতন একটা-দুটো নয়—কাঁহাতক মুখস্থ করে বেড়াই?

কিন্তু এ কী হল, হারুর একটি কথাও যে মনে পড়ে না। ঘেমে উঠল সে। গোঁফ-ঝুলপি সহ বড় বড় চোখ মেলে সিরাজ তাকিয়ে আছে, তাতে যেন আরও ভয় লাগে।

বিরক্ত স্বরে মাদার বলেন, বোবা হয়ে গেলে একেবারে, হল কি তোমার।

হারু সকাতরে বলল, জল—

চকচক করে পুরো গেলাস জল খেয়েও অবস্থার ইতর-বিশেষ হল না। বোঁ বোঁ করে মাথা ঘুরছে। সকলকে পাঠ শিখিয়েছে, সকলের উপর তম্বি করে এসেছে, নিজের বেলা সব ডঙ্কা। লুৎফ'র পাঠ একবর্ণও মনে আসে না। বই খুলে সিরাজ নিজেই তখন লেগে গেল। গোড়া ধরিয়ে দিলেও হয় না, সম্পূর্ণ পড়ে যেতে হয়। শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠের মতন হারু কোন রকমে আবৃত্তি করে যায় কথাগুলো।

মাদার দেমাক করেছিলেন, লজ্জায় এখন মাথা তুলতে পারেন না। হারুর পানে চোখ-কটমট করে বললেন, ছিঃ—

হারু কৈফিয়ৎ দিচ্ছে: জোড়া গোঁফ নিয়ে বেগমের পাঠ আসে না মাদার দা। সকালে উঠে কাল সকলের আগে পরামাণিক ডাকব।

অন্যদেরও মুখ শুকিয়েছে। বল্টু মীরজাফর সাজবে—ফিসফিসিয়ে অক্ষরকে বলল, ম্যানেজারের এই হাল—না-জানি আমাদের কপালে কী আছে!

এর মধ্যে আনকোরা-নতুন হলেও বাহাদুর বলতে হবে বলাই মণ্ডলকে। নর্তকী বলে নেওয়া হয়েছিল—আট নর্তকীর একজন। সমস্ত বর্ষাকালটা হারু মিত্তির কাঁধে কাঁধে বয়েছে। তা কাঁধে বওয়ার ছেলেই বটে—চেহারাটা যেমন, নাচগানেও তেমনি উতরেছে। ড্রিলিংমাষ্টার নরেন পাল বলে, আস্ত প্রতিভা একখানা। কিন্তু নরেন পালের হাতেও রইল না পুরোপুরি—নর্তকী থেকে উন্মৎ জহরায় প্রমোশন। দেখতে সুন্দর, বয়সটাও কাঁচা—মানিয়েছে তাকে চমৎকার। উন্মত্তের গান আছে, এবং গানের সঙ্গে মুখচোখের ভঙ্গিমা আছে রীতিমত। কয়েকটা দিনের পেয়াজের পরে ছুটো জিনিসই বলাই এমন দেখান দেখাল, ঝানু থিয়েটার-দর্শক কালিদাসের চোখে জল এসে যায়। হুবহু পাবলিক থিয়েটারের উন্মৎ জহরার ছবি। বলিহারি বটে! বলে মহোল্লাসে পিঠ ঠুকে দিল সে বলাইর।

বলে, কলকাতায় যাবি তো বল্। আমাদের অফিস ক্লাবের ড্রামায় তোকে নিয়ে নেবো। আমিই ক্লাবের সেক্রেটারি। এই বয়সে এমন—আরো যে কদ্দুর উঠবি ঠিকঠিকানা নেই। এখানকার হাঙ্গামা চুকে-বুকে যাক, কলকাতায় নিয়ে যাব তোকে, অফিসে যাতে ঢোকানো যায় দেখব। লেখাপড়া কদ্দুর করেছিস রে?

হিমচাঁদের সর্বব্যাপারে রংতামাসা। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এম-এ পাশ দিয়েছে।

হেসে কালিদাস বলে, এম-এ কে চাইছে, এম-এ'রাই বরঞ্চ চাকরি বিনে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়ায়। বলি, ইংরেজি-বাংলা পড়তে-টড়তে পারিস?

বলাই বলে, বাংলা পারি—

হিমচাঁদ টিপ্পনী কাটলেন: আমাদের হারু যদি বই ধরে বসে। উন্মত্তের পাঠ পড়ানোর সময় কম বেগ দিয়েছে! ওকে কলকাতা নাও তো হারুকেও ওর সঙ্গে নিতে হবে।

কালিদাস বলে, বাংলা আর ইংরেজি একটু একটু শিখে নে, অফিসের বেয়ারা হতে পারবি। বেশি কিছু নয়—নামটা-আসটা পড়তে পারলেই হবে।

গাওনা সপ্তমীর দিন—মাঝের ক'টা দিন ঘোর বেগে রিহার্শাল চলল। সকাল সন্ধ্যা দুইবার কোন কোন দিন। বিচিত্র কুর্তাধারী সিরাজ ফরাসের কেন্দ্রস্থলে, বাক্যহীন করিম চাচা পাশটিতে বসে। পাঠ বলা ছাড়া করিমের ঠোঁট নড়ে না, পাঠও বলে মিনমিন করে—নিজে ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না।

মাদার ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন: আসরেও এইভাবে নাকি?

নিরাজ অভয় দিয়ে সহাস্যে বলে, গগন কাটাবে, শুনবেন তখন। অকারণে ফুসফুস খাটাতে যাবে কেন, কথাবার্তাতেও তাই বলুন। শক্ত করে রাখছে ফেটে গিয়ে ছাড়বে।

প্রতিমার ঠিক সামনাসামনি উঠান সম্পূর্ণ পার হয়ে আশফল গাছটার ধারে স্টেজ বেঁধেছে। প্রকাণ্ড উঠান, দেড়শ মানুষ বসতে পারবে। তাতেও না কুলায়, রাস্তা অবধি ঝাঁটপাট দেওয়া রইল—পাটি মাদুর নারকেলপাতা যা পাওয়া যায় নিয়ে সব বসে পড়বে।

সন্ধ্যা হতে না হতে লোক আসা শুরু হল। নাম এতদূর ছড়িয়েছে, নিজেদের অমন চালু থিয়েটার সত্ত্বেও রাজীবপুর থেকে এই পথ ঠেঙিয়ে হারাণ পূর্ণশশী এবং আরও পাঁচ-সাত জন এসে পড়ল। তার মধ্যে দূরগ্রামের—কপোতাক্ষ-পারেরও একজন, পূর্ণশশীর শালা কুটুম্ববাড়ি পুজো দেখতে এসে কলকাতার প্লেয়ারের টানে সোনাখড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

আসুন, আসুন—বলে হিরু পথ অবধি এগিয়ে আপ্যায়ন করে। চোখ টিপে দেয়—সপ সতরঞ্চ মাদুর কিছু কিছু এ বাবে পেতে দিক।

বলে, বসুন, পান-তামাক খান। প্লের অনেক দেরি, সেই রাত দশটা। হাটে হাটে কাড়া দেওয়া হয়েছে, শোনেননি? আপনাদের ওখানেও তো তাই নইলে হয় না, খাইয়ে-দাইয়ে ছেলেদের পাট চুকিয়ে মেয়েলোকে এসে বসবেন। তাঁদের নিয়েই তো থিয়েটার।

বসা তো সারারাত্তির ধরেই আছে। ঘটকপূর্ব হয়ে এক্ষুনি কেন বসতে যাব?

বসল না রাজীবপুরে দল, চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে দেখছে। মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হারাণ টিপ্পনী কাটে: মা-দুর্গা যে কচি খুকি—মুখ টিপলে দুধ বেরোবে। সিংহি কই গো, এ তো একটা হলোবেড়াল।

পূর্ণশশীও জুড়ে দেয়: গণেশের কেবল শুঁড়েই বাহার—ভুঁড়ি কই? গণেশ কারে কয়, আমাদের মুৎসুদ্দি-বাড়ি গিয়ে দেখে আসুক।

প্রতিপক্ষ রাজীবপুরেরা কী না-জানি কাণ্ড-উাজর মারছে—সোনাখড়ির জন কয়েক আশেপাশে এসে পড়ল। হিমচাঁদ শুধালেন: কি বলছেন?

হারাণ বলল, সারা সোনাখড়ির মধ্যে এই তো দেবেধন-নীলমণি—তা নজর ধরে কই? রাজীবপুরে আমাদের সাত-আটখানা পুজো। সামান্য লোক ভূষণ দাস, বাজারখোলায় দোকান করে খায়—তার বাড়ির ঠাকুরখানাই দেখে দেখগে। অন্ততপক্ষে এর দেড়া।

পূর্ণশশী বলে, আর মুৎসুদ্দি-বাড়ির ঠাকুর দেখলে তো ভিরমি লেগে যাবে।

তোমাদের গণেশ ভুঁড়ি-শূন্য, হাত-ধরাধরি করেও ওঁদের গণেশের ভুঁড়ি বেড় দিতে পারবে না। দশ বছর ধরে গরুকে জাবনা খাওয়ায় না—সেই নাদা আস্ত একখানা কাঠামোর সঙ্গে বেঁধে তার উপরে মাটি লেপে ভুঁড়ি বানিয়েছে।

হারাণ বলে, তোমাদের দুর্গা দেখতে পাচ্ছি, এক ফচকে ছুঁড়ি। দশহাতে দশ প্রহরণ ধরে অসুর নিধন করবেন—এই দুর্গা দেখে কেউ ভরসা পাবে না। হাঁ মা দুর্গা কাকে বলে দেখে এসো মুৎসুদ্দি-বাড়ি। লম্বা-চওড়া পেল্লায় মূর্তি—মাথার মুকুট চণ্ডীমণ্ডপের ছাতে গিয়ে ঠেকেছে।

পূর্ণশশী বলল, দালানকোঠা বানানোর সময় মিস্ত্রিরা ভারা বেঁধে কাজ করে। এ দুর্গা গড়তেও তেমনি ভারা বাঁধতে হয়েছিল। সাজপত্তোর পরিয়ে কাজ সম্পূর্ণ করে পশ্চাতের দিক ভারা খুলে দিয়েছি। না খুললে লোকে ঠাকুর দেখতে পায় না।

দত্তবাড়ির নারায়ণদাস বলল: ভারা তো খুললেন—কিন্তু আরত্তির ভাবনা ভেবেছেন? ঠাকরুনের মুখের উপর পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাতে হয়। তার কোন্ উপায়?

খুব সোজা—। উপায় হিমচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে বাতলে দেন: প্রতিমার সামনে একটা বাঁশ পুঁতে বাঁশের মাথায় কপিকল খাটিয়ে নাও গে। পুরুতের কোমরে দড়ি-বাঁধা—আরত্তির কপিকলে দড়ি টেনে পুরুতকে ছাত অবধি টেনে তুলবে। পঞ্চপ্রদীপ ঘোরানো হয়ে গেলে নামিয়ে দেবেন।

কালিদাসও এসে পড়েছে—সে বলল, সে না-হয় হল—বিসর্জনে কি হবে? মণ্ডপ-এর ছাতে মাথা ঠেকেছে, মাকে তো আস্ত বের করা যাবে না। টুকরো করতে হবে।

পূর্ণশশীর বিদেশী শ্যালকটি বলল, তাতে দোষ হয় না। বিসর্জনের মন্তোর পড়া হয়ে গেলে প্রতিমা তখন আর দেবী থাকেন না, পুতুল হয়ে যান।

কালিদাস বলল, আমাদের কলকাতাতেও একবার ঠিক এমনি হয়েছিল। চুনোপুকুর আর বেনেপাড়ায় পাল্লাপাল্লি। চুনোপুকুর ঐ মুৎসুদ্দি-বাড়ির মতোই ঠাকুর গড়ে বেনেপাড়াকে গো-হারান হারিয়ে দিল। প্রতিমাকে দুই খণ্ড করে তবে বিসর্জন হল। তাই নিয়ে বেনেপাড়া এমন শোধ তুলল, চুনোপুকুর আর মুখ দেখাতে পারে না।

হিমচাঁদের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে প্রশ্ন করে: বলো তো হিমেদা, কী হতে পারে?

হিমচাঁদ বললেন, আমার মাথায় আসছে না, খুলে বলো। আমাদেরও তো

করতে হবে তাই।

গণেশের বিসর্জনটা বাদ রেখে বেনেপাড়া তাকে কাচা পরাল, গলায় ধড়া ঝুলাল—গুরুদশায় লোকে যেমন সাজ নেয়। চুনোপুকুরের বাড়ি বাড়ি সেই গণেশ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। কী ব্যাপার? গণেশের মা অপঘাতে গেছেন প্রাচিত্তিরের (প্রায়শ্চিত্ত) জন্য কিছু কিছু ভিক্ষে দিন আপনারা।

আসরে সপ পড়েছে—কিন্তু ভদ্রলোকে বসবেন কি, ছেলেপুলে যেখানে যত ছিল ধুপধাপ করে বসে পড়ল। মাথার উপর সামিয়ানা ছাতের মতন, নিচের মাদুর চাপা দিয়ে সপ পেতেছে—বেশ কেমন ঘর-ঘর লাগে। বসেও সুখ হয় না, গড়িয়ে পড়া—পাক খেতে খেতে গাড়ির চাকার মতন এদিক সেদিক গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জায়গা নিয়ে কলরব, ধাকাধাকি। ভদ্রলোক এর মধ্যে বসেন কোথা, দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিশেষ রাজীবপুর থেকে এই যে ক'টি এসেছেন।

হিরু এসে রে-রে করে পড়ল: কি হচ্ছে—আসর পাতা হল তোদের জন্য নাকি? থিয়েটার তো রাত-দুপুরে। খেয়েদেয়ে কায়েমি হয়ে বসবি, তা নয় এখন থেকেই উঠোনে জোড়-গোড় লাগিয়েছে দেখ।

সিরাজ-করিম কলকাতার প্লেয়ার—পুজোবাড়ির ধুমধাড়াক্কার মধ্যে নেই, তারা স্বতন্ত্র। সমুদ্দুরপুকুরের বাঁধানো চাতালে কামিনীফুল-তলায় চুপচাপ বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে। আকাশে চাঁদ, জোৎস্নায় চারিদিক ভরে গেছে, ফুলের গন্ধ বাতাসে ভুর ভুর করছে।

বংদার খোঁজ যাচ্ছিলেন—দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বলেন, আপনারা এখানে? ভদ্রলোকেরা আসছেন, সবাই আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন। কথাবার্তা বলবেন চলুন।

সিরাজ ঘাড় নাড়ল: উঁহু, বলুন গিয়ে খুঁজে পাচ্ছিনে। কথাবার্তা যত-কিছু স্টেজের উপর থেকে। ঐ ভয়েই তো পালিয়ে আছি। এখনই কথাবার্তায় লেগে যাই তো স্টেজের কথা শুনতে যাবে কেন লোকে?

লোকে লোকারণ্য। রোয়াকে চিক টাঙানো, মেয়েদের জায়গা সেখানে; তাতে কুলোয়নি, উঠানের সামিয়ানার নিচে একদিকে বৃদ্ধা ও ছোট মেয়েদের আলাদা ভাবে বসানো হয়েছে। বসে বসে পারে না আর লোকে। সামনে গ্রীণরুমে অংশা-পাহাড়—সে পাহাড় অচল অনড় হয়ে রয়েছে।

জলাদ বলল, দশটা বাজুক, তবে তো নড়বে।

দশটা আর কখন বাজবে শুনি? সকাল হতে চলল, এখনো এদের দশটা

থাকে না।

বক্তা রাজীবপুরের এক ভদ্রজন। কালো কারে বাঁধা ট্যাকঘড়ি ঝুলিয়ে এসেছেন। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেশলাই জেলে দেখে নিয়ে বললেন, এগারো বাজতে চলল—দশ মিনিট বাকি।

গ্রামের উপর শ্লেষ-বিদ্রূপ পড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজীবপুর দলের মধ্যে থেকে—জল্লাদের আর ধৈর্য থাকে না। বলল, ঘড়ি নয়—আপনার ওটা ঘোড়া। লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। কালিদ দাদা কলকাতা থেকে তোপের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে এনেছেন, চালাকি নয়। সেজেগুজে তৈরি আছে সব, দশটা বাজা মাত্তোর পাহাড় সড়-সড় করে উপরে উঠে যাবে, রাজদরবার বেরুবে।

বলে তো দিল—কিন্তু মনের মধ্যে বিষম উদ্বেগ, সাজঘরে কী কাণ্ড হচ্ছে না জানি! রাজীবপুরেরা দলবদ্ধ হয়ে খুঁত ধরতে এসেছে, ক্রমশ সেটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ড্রপ তুলতে সত্যি সত্যি সকাল করে না ফেলে। এখন সাজঘরে ঢুকতে দেবে না, সিংহজের ঘোরতর আপত্তি, বাজে লোক ঢুকে গেল গোঁফ চুল ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, স্পষ্ট বলে দিয়েছে!

শুনতে পেয়ে জল্লাদ আগেভাগে উপায় করে রেখেছে। সাজঘরের বেড়া ফুটো করে রাখবে, গোড়ায় ভেবেছিল। তাতে কারো না কারো নজরে পড়ে যাবে, গরু-ছাগলের মতন তাড়িয়ে তুলবে। চালের উপরে উলুর ছাউনি—ভেবেচিন্তে তারই খানিকটা সে ছিঁড়ে-খুঁড়ে রাখল। বৃষ্টি-বাদলা না হলে উপর দিকে কেউ নজর দিতে যায় না। আশফল-গাছের ডালে বসে অধীর উৎকণ্ঠায় জল্লাদ সাজঘরের ভিতরটা একনজরে দেখছে, আর গজরাচ্ছে ওদের গয়ংগচ্ছ কাজকর্মের জন্য।

ধড়াক করে একসময় গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

কি রে, কি পড়ল ওখানে?

খোড়েল-টোড়েল হবে। কে একজন বলল।

উইংস-এর পাশে এক হাতে পেটাঘড়ি আর হাতে হাতুড়ি নিয়ে একজনে দাঁড়িয়েছে। ড্রপসিনের দড়ি ধরে আছে একজন—ঘন্টা দিয়েছে কি সিন উঠে যাবে। এইবার, এইবার—আহ্লাদে লাফাতে লাফাতে জল্লাদ আসরে ছুটল। আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে: সাপ, সাপ—

লোকজনে ঠাসাঠাসি, সাপের আতঙ্কে সব উঠে পড়েছে।

উঁহু, সাপ তো নয়—লতাপাতা দেখে সাপ ভেবেছিলাম।

খিলখিল করে হেসে জল্লাদ মনের মতন জায়গা নিয়ে বসে পড়ল।

বাদার ঘোষ বলেন, শয়তান, কি রকম দেখ। জায়গা পাচ্ছিল না, চালাকি করে জায়গা নিয়ে নিল। এতও মাথায় আসে ওর।

থিয়েটার চলছে। লোকে সাংঘাতিক রকম নিয়েছে, খানিক এক্ষুণিই বোঝা যাচ্ছে। বিশেষ করে করিম-চাচা আর মীরজাফর যখন স্টেজে আসেন। ঝন্টু মীরজাফর সেজেছে। করিম-চাচা এতদিন যে মুখ খোলেনি—ওস্তাদের মার শেষরাত্রে, সেই খেল দেখাবে বলেই বোধহয়। মুখের কথা না ফুটতেই হেসে লোক লুটোপুটি খাচ্ছে।

বাদার ঘোষ আসরে বসেননি, ঘুরে ঘুরে তদারক করেছেন। উত্তেজিত-ভাবে তিনি সাজঘরে ঢুকে কালিদাসকে ধরলেন: দেখেশুনে খরচ-খরচা করে তোতলা প্লেয়ার নিয়ে এলে তুমি?

কালিদাস বলে, আমি আর দেখলাম কোথা? অজিতবাবুর মতন অতবড় প্লেয়ার সার্টিফিকেট দিলেন, তার পরে স্কুলের ছেলের মতন আমি কি আর পাঠ ধরতে যাব? খালি সার্টিফিকেটই নয়, বলে দিলেন, করিম-চাচা না নিয়ে আমিও সিরাজ হয়ে প্লে করতে যাচ্ছিনে।

কথাবার্তার মধ্যে সিরাজ এগিয়ে এসে পড়ল: কি হয়েছে?

মানে ঐ করিম-চাচা ভদ্রলোক একটুখানি—

তোতলা। একটু নয় অনেকখানি। কিন্তু দোষ কি হল তাতে? করিম-চাচা ইতিহাসের কেউ নয়, কল্পনায় বানানো। কল্পনা আরও একটু খেলিয়ে নিন না, যে মানুষটা ছিল তোতলা। সিরিও-কমিক পার্টে কমিকের ভোজটা কিছু বেশি করে দিচ্ছি। ভালই সেটা, লোকে বেশী মজা পাচ্ছে।

অগত্যা বাদার ঘোষ করিমকে ছেড়ে মজাদবাজী ঝন্টুকে নিয়ে পড়লেন: তোর মীরজাফর দেখে লোকে হেসে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। বলি, অমন কূটকৌশলী সেনাপতি তাকে একেবারে ভাঁড় বানিয়ে ছাড়লি?

ঝন্টু কাতর কণ্ঠে বলে, লোকে হাসলে আমি কি করব? তোতলামি করছি নে, পাঠও টনটনে মুখস্থ আমার।

মুখ ভেংচে উঠিস কথায় কথায়—ও কি রে?

আমি নই বাদার-দা, দাড়িতে করাচ্ছে। ওর মধ্যে ছারপোকা না কি—মুখে লাগালে কুটকুট করে। বদলে দিতে বলছি, সে নাকি হবার জো নেই। গোড়ায় যেমনটি নিয়ে বেরিয়েছি, সারাক্ষণ তাই চালাতে হবে।

গজর গজর করছে: দুনিয়া সুদ্ধ মানুষ চুল-দাড়ি ছাঁটে, গরজে কামিয়েও ফেলে, মীরজাফর যদি হেঁটেছুটে দাড়িখানা একটু অদল-বদল করে নেয় তাকে

মহাভারত একেবারে অশুদ্ধ হবে নাকি।

সপ্তমী অষ্টমী নবমী তিনদিন কাটল। বিজয়াদশমী, মজুমদের মহেশান আজ, প্রতিমা-বিসর্জন। ভোর হয় নি, শুয়ে শুয়ে আহ্লাদ বৈরাগির গান শোনা যাচ্ছে, বৈরাগির মা বগলা খঞ্জনি বাজাচ্ছেন:

মা তোরে আর পাঠাবো না।
বলে বলবে লোকে মন্দ
কারু কথা শুনবো না।
আসে যদি জামাই করব ঝগড়া
জামাই বলে মানব না।

লাফ দিয়ে কমল উঠে পড়ে মণ্ডপে ছুটল। শেষ দিন। সোনামণি বারোমাস নিত্যি দিন যেমন, আজকের দিনটা বাদ দিয়ে কাল থেকে আবার তেমনিধারা হয়ে যাবে। মাঝের এই দিনগুলোয় আমোদের জোয়ার এসেছিল।

আকাশ প্রসন্ন আজ। মন্দ বাতাসে পাতা কাঁপছে, পাতার শিশির টপটপ করে ঝরে পড়ছে। পুঁটি আগেই উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। আরও সব এসেছে। প্রতিমার আঙুল দেখিয়ে কমল বলে, দেখ্ দিকি, মা যেন কাঁদছেন। ভাল করে দেখ—তাই না?

ঠিক তাই। ভিজে চোখ মা-দুর্গার—কেঁদেছেন খুব, মুখের উপরেও যেন অশ্রু-চিহ্ন। কার্তিক গণেশ লক্ষ্মীরও তাই। সরস্বতীর নয় কেবল।

বিনো বলল, সরস্বতী-ঠাকরুন বাপ-সোহাগী মেয়ে—মামার বাড়ির চেয়ে বাপের কাছে, মহাদেবের কাছে ওঁর বেশি পছন্দ।

ঘোড়ার ডিম!

প্রতিমার কাছে মাটির মেজের জল্লাদ পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল, জেগে উঠে সে কথা বলে উঠল। প্রতিমার পাহারায় সে, পুজোআচ্চা মিটে লোকজন সমস্ত বিদায় হয়ে গেলে আরও ক'জনের সঙ্গে পালা করে সারা রাত জাগে ঘুমোবোর সময় এখানে ঘুমোয়। পুজোর ক'দিন একদম বাড়ি যায় নি। অহোরাত্রি বাইরে থাকার মওকা জুটেছে, বাড়ি আর যেতে যাবে কেন? মা-দুর্গার সেবায় দেবীর পদাশ্রয়ে পড়ে আছে—বাপ মজেশ্বরও এ বাবদে জোরজার করতে সাহস পান না। দেবী চটে যাবেন।

জল্লাদ বলে উঠল, কান্না না কচু। ঠাকুরমশায় কাল রাত্রে চুপিসারে গর্জন-তেল মাখিয়ে গেছেন। আমরা ক'জনেই জানি কেবল।

গর্জনতেল মাখিয়ে থাকেন, বেশ করেছেন। না মাখালেও কাঁদতেন ঠাকরুন ঠিক। এত জনের চোখ ছলছল, ওঁর চোখ কতক্ষণ আর শুকনো থাকতে পারে বিশেষ করে মেয়েছেলে যখন।

ফুলের আজও খুব দরকার—ফুল আর বেলপাতা। বেলপাতায় দুর্গানাম লিখবে—সেই বেলপাতা ও ফুলে অঞ্জলি দেবে মা দুর্গার কাছে। দুর্গার পতিগৃহে যাত্রা—যারা অঞ্জলি দিচ্ছে, তাদেরও বছরের যাত্রা সারা হয়ে থাকল আজকে এই একদিনে। পাঁজিতে দিনক্ষণ খুঁজে বেড়াতে হবে না—অদিনে-কুদিনে যেমন খুশি যাতায়াত চলবে। আজ যাত্রা করে নিলে অতঃপর সর্বক্ষণই মহেন্দ্রযোগ-অমৃতযোগ।

রাত থাকতেই তাই ফুল তোলা লেগে গেছে। সাজি নিয়েছে কেউ, কেউ ডালা, কেউ-বা পথের পাশের মানকচু-পাতাই ছিঁড়ে নিয়েছে। স্বর্ণচাপা-গাছের মাথায় জল্লাদ। শিশিরে-ভেজা ডালপালার উপর পা সরে সরে যাচ্ছে—মগডাল অবধি বেয়ে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে, কোঁচড ভরতি করছে। স্থলপদ্ম বেলা ফুটেছে—দেখতে দেখতে সকল পাড়ার সবগুলো গাছ ন্যাড়া হয়ে গেল। গাঁদা টগর বেলা যুঁই গন্ধরাজও অল্পবিস্তর মিলল। এবং শিউলি—

শিউলিতলায় ছোট ছোট মেয়ে—পায়ে মল, নাকে নোলক, কর্মকারপাড়ার এরা সব। জনা দুই-তিন গাছ ঝাঁকাচ্ছে, ঝুরঝুর করে ফুল পড়ছে খুঁটে খুঁটে আঁচলে তুলছে মেয়েরা। ফুল ছিঁড়ে শিউলির বোঁটায় কাপড় ছোপাবে। এমনি সময় জল্লাদের দঙ্গল এসে পড়ল। মেয়েগুলো তো দৌড়—দে-দৌড়। মল বাজে ঝুন ঝুন করে—শজারু পালানোর সময় যেমন হয়।

শানাই বাজে শেষরাত থেকে। এক শানাইদার পোঁ ধরে আছে, অপরে সুর খেলাচ্ছে। কান্নার সুর—কথা নেই, কিন্তু একটু শুনলেই চোখে জল বেরিয়ে আসে। গিরিকন্যা বাপের-বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সে বড় দুঃখকষ্টের সংসার—জামাই ভিখারি বাউণ্ডুলে গেঁজেল। মা মেনকার মনে বড় ব্যথা। সেই ব্যথা শানাই-এর সুর হয়ে মানুষের কলজে নিংড়ে কান্না বের করে আনে।

দেড় প্রহর বেলার মধ্যে যাত্রা সারা করতে হবে, দেবেন্দ্র চক্রবর্তী পাঁজি দেখে বলে গিয়েছেন। তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। পূজা অন্তে পুরুতঠাকুর শান্তি জল ছিটোবেন এইবার। শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়-লেখা বেলপাতা কোঁচায় খুঁটে শাড়ির আঁচলে বেঁধে এসেছে সব। কাপড়চোপড়ে সর্বশরীর পরিপাটিরূপে ঢাকা—শান্তিজলের ছিটে পায়ে না লাগে।

শাস্ত্রীয় কাজকর্ম শেষ। এই ক'দিন দেবী হয়ে ছিলেন। ছোঁয়া চলত না

—ভক্তিভরে প্রণাম করে দেবীকে জোড়হাতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকত। সেই গৌরবের বিসর্জন হয়ে গিয়ে এখন যিনি মণ্ডপে আছেন, নিতান্তই ঘরের মেয়ে ছাড়া তিনি কিছু নন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সংস্কৃত মন্ত্রপাঠের ইতি—ঘরোয়া বাংলা কথাবার্তা সেই মেয়েটির সঙ্গে। অপরাহ্নবেলা ঢাক-ঢোল-শানাইয়ে পুজোবাড়ি তোলপাড়। গাঁয়ের মধ্যে যত মেয়ে আর বউ আছে, আসতে কারো বাকি নেই। বিদায়ের বরণ—সধবা ও কুমারীরা একের পর এক প্রতিমার সামনে এসে হাতের কারুকৌশল দেখাচ্ছে।

ঢোল-কাঁসি বাজছে, সানাই বাজছে। সধবা-কুমারীরাই শুধু এর মধ্যে, বিধবারা বাদ। হয়ে গেলে বড়গিন্নি উমাসুন্দরী একটা রেকাবিতে সন্দেশ নিয়ে এলেন—ভেঙে একটু একটু দুর্গা ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের মুখে দিলেন। পানের খিলি এনেছেন—মুখে ছুঁইয়ে মুখশুদ্ধি করালেন তাঁদের। বলেন, সম্বৎসর ভালো রেখো মা সকলকে। অসুখ অনটন কারো যেন না হয়। সামনের বছর আবার এসো কিন্তু—আসবে তো?

প্রতিমার মুখে তাকিয়ে রইলেন একটুখানি—হাঁ-না কি জবাব পেলেন তিনিই জানেন। সিঁদুরকৌটা এনেছে মেয়েরা—মা-দুর্গার কপালে সিঁদুর পরিয়ে সেই সিঁদুর একটু নিজের কৌটায় তুলে নিয়ে তারপর এ ওকে সিঁদুর পরাচ্ছে। মনের কথা চেঁচিয়ে তো বলা যায় না, মা-দুর্গার কানের উপর মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলছে। হারু মিস্তিরের বউ মনোরমা মরাকে পোয়াতি—মরে তার বিষম কষ্ট, অকালে রক্তের দলা পড়ে পেট থেকে। বার তিন-চার এমনি হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে দূরস্থান—হাত-পা মাথা সমন্বিত চেহারাই নেয় না তখনো। মা-দুর্গার কানে ফিসফিসিয়ে মনোরমা দেয়ালপাটের মতন খোকা চাইল একটি। উত্তরবাড়ির ফেন্সি মেয়েটার আরও কোন বেশি গোপন কথা—মুখে বলতেই লজ্জা, গোটা কাঁচা-অক্ষরে কাগজে লিখে এনেছে সে। পাকিয়ে দলা করে কাগজটুকু দুর্গার আঁচলে বেঁধে দিল। কানে কানে বলে, লেখা রইল সব, এক সময়ে দেখো। ডামাডোলের ভিতর এখন হবে না—শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ধীরে-সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় দেবী পড়ে দেখবেন, এই অভিপ্রায়।

এরই মধ্যে যজ্ঞেশ্বরের থুনথুনে মা বাচ্চা কোলে নিয়ে উপস্থিত। বুড়ির মাজা বাঁকা—কিন্তু কী আশ্চর্য, বাচ্চা কাঁধে তুললেই লাঠির মতন টনটনে খাড়া হয়ে যায়। বুড়োমানুষ দেখে সকলে পথ করে দিল। বলে, নিজে চলতে পারে না বুড়ি, আবার এক বাচ্চা ঘাড়ে করে এসেছে দেখ। পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে নি সে-ই ঢের। বাচ্চা যারা দিয়েছে, তাদেরও বলিহারি আক্কেল।

মন্তব্য শুনে এক ঝলক তাকিয়ে বুড়ি কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছড়াল। গোরা প্রতিমার কাছে গিয়ে বলছে, হাসে মা, আমাদের অক্ষয়ের খোকা হয়েছে। যাচ্ছিস চলে, তাই এটু দেখাতে নিয়ে এলাম। চার মাস উতরে পাঁচে পা দিয়েছে—তা কী রকম বজ্জাত হয়েছে, সে যদি দেখিস মা। আশীর্বাদ করে যা আমাদের খোকাকে।

নতুনপুকুরে বিসর্জন হবে, একবার কথা হয়েছিল। ভবনাথের কাছে ছোঁড়ারা আড় হয়ে পড়ল: গাঁয়ে কতকাল পরে দুর্গা উঠলেন—আমোদ-আহ্লাদেরও কোন অঙ্গে কসুর পড়ে নি, বাড়ির পুকুরে চুপিসারে ডোবাতে যাবো কেন? বাঁওড়ে নিয়ে যাবো সব—আমরাই বা কম হলাম কিসে? আমরাও যাবো।

ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তল্লাট জুড়ে জানান দিয়ে যাওয়া—ভবনাথও চান তাই। পাশাপাশি দুটো ডিঙিতে বাঁশ ফেলে তার উপরে প্রতিমা তুলতে হয়—কিন্তু বিলের ভিতর ধানবনের শয়াল ধরে সে বস্তু নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাটাখালি পড়তে পারলে তখন টানা খাল—তারপরে আর অসুবিধা নেই। কিন্তু অতটা পথ নিয়ে যায় কে?

আমরা, আমরা—

তেজি ঘোড়ার মতো ছোঁড়াগুলো টগবগ করে লাফাচ্ছে। বুকে থাবা মেরে বলে, গতর বাগিয়েছি কুমড়ো-কচু আর্জে খাবার জন্যে নয়। প্রতিমা ঘাড়ে নিয়ে আমরা কাটাখালির ঘাটে পৌঁছে দেবো।

সেই বন্দোবস্ত পাকা। কাটাখালির ঘাটে জোড়াডিঙি তৈরি হয়ে আছে, প্রতিমা বয়ে নিয়ে ডিঙিতে তুলে দেবার অপেক্ষা।

হাঁকডাক হৈ-হল্লোড়ে ভবনাথেরই পুলক বেশি, কিন্তু সময়কালে তাঁর পাত্তা পাওয়া যায় না। লোকজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে দক্ষিণের দালানে ঝিম হয়ে তিনি বসে আছেন।

দেবনাথ এসে বললেন, তুমি এখানে দাদা? রওনা হচ্ছে এবার, তোমায় সব খোঁজাখুঁজি করছে।

ভবনাথ ক্লান্তস্বরে বললেন, শরীর বেজুত লাগছে। কি বলে, তুমি গিয়ে শোন গে।

শরীর নয়, মন—দেবনাথ বোঝেন সেটা। বাইরে দাদা কড়ামানুষ, ভিতরে ভিতরে অতিশয় নরম। প্রতিমা বিদায় হয়ে গিয়ে শূন্য মণ্ডপ খাঁ-খাঁ করবে, এ জিনিস চোখের উপর দেখতে পারবেন না, সেই জন্যে এড়িয়ে আছেন।

ভবনাথ আবার বলেন, করবার কিছু নেই। গিয়ে দাঁড়াওগে একটু,

তাতেই হবে।

দাঁড়ালে হবে না দাদা। জেদ ধরেছে, প্রতিমার সঙ্গে যেতে হবে। তুমি, নয়তো আমি। হাঁটতে না চাও, ডোঙায় বিল পাড়ি দিয়ে কাটাখালি গিয়ে উঠবে। সেখান থেকে ওরা ডিঙিতে তুলে নেবে।

ভবনাথকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না : তুমিই যাও তবে। আমি পারব না।

বাঁশে বেঁধে প্রতিমা কাঁধে তুলে নিল। মুখ বাড়ির দিকে—যতক্ষণ দৃষ্টিগোচর থাকবে, মুখ কদাপি না ঘোরে—খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিমার মাথার কাছে প্রকাণ্ড ছাতা তুলে ধরে একজনে আগে আগে চলেছে। ঢাক-ঢোলের তুমুল বাজনা।

গ্রাম ছেড়ে দলটা ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল। তেল-চকচকে প্রতিমা-মুখের উপর পড়ন্ত সূর্যের আলো। এ ওকে দেখায় : বাপের-বাড়ি ছেড়ে যেতে কি কান্নাটা কাঁদছেন দেখ। ঠিক তাই—যারা দেখছে, তাদেরও চোখ ভরে জল আসে। কাটাখালির ঘাটে জোড়া-ডিঙি—কয়েকটা মোটা বাঁশ আড়াআড়ি ফেলে শক্ত করে বাঁধা, বাঁশের উপর প্রতিমা। যারা বয়ে নিয়ে এসেছে দু-পাশের দুই ডিঙিতে ভাগাভাগি হয়ে উঠল। বাজনদাররাও উঠেছে। পিছনে আরও কত নৌকো—তামাসা দেখতে বিস্তর লোক যাচ্ছে। গানবাজনা করে আচ্ছা রকম জমিয়ে যাচ্ছে সব।

বাঁওড়ে এ-দিগরের সাতখানা ঠাকুর এসে গেছেন, কিনারা ধরে আছেন আপাতত। সোনাখড়ির ঠাকরুন গিয়ে পড়ে আটে দাঁড়াল। ভাসানের বেলা—মাথার কালো সমুদ্র অনেক আগে থেকে নজর পড়ে, কলরব কানে আসে। নৌকা-বাইচ, এই উপলক্ষে বিস্তর কাল থেকে হয়ে আসছে। লম্বাধিড়িঙ্গে ছিপনৌকো বাইচের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। পিতলে-মোড়া গলুইয়ে রোদ পড়ে ঝিকঝিক করছে। এদিকে ওদিকে দুই সারি দাঁড়িরা বসেছে, পাছনৌকোয় মাঝি। মালকোঁচা-সাঁটা সকলে, মাঝি তার উপর মাথায় রঙিন গামছার পাগড়ি বেঁধে নিয়েছে। আর একজন মাঝির দিকে মুখ করে পাটার উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে, আসল মানুষ সে-ই—মোড়ল। বাইচের নৌকো তার হুকুমে ছাড়বে, হাত তুলে সে-ই নৌকো থামিয়ে দেবে। পাশাপাশি ছিপগুলো—তোড়জোড় সম্পূর্ণ হয়ে যেতে ঝপাস করে সব নৌকোর সবগুলো দাঁড় একসঙ্গে জলে পড়ল। ছুটেছে নৌকো। মোড়ল সামনে পিছনে দোলাচ্ছে নিজ দেহ, সেই তালে তালে দাঁড় পড়ছে। নৌকো-বাইচে সব চাইতে বেশি মেহনত বুঝি মোড়লের। দর-দর করে ঘাম পড়ছে।

নাচ পড়ে গেছে বাঁওড়ের ভাসান ও আনুষঙ্গিক নৌকো-বাইচের। জনারণ্য। ওল্লাটের কোন বাড়িতে বুঝি আধখানা মানুষ নেই। ভাল দেখতে পাবে বলে বাচ্চাগুলোকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। পাড়ের গাছগাছালির ডালে ডালে মানুষ। দশমীর জ্যোৎস্না উঠেছে, জ্যোৎস্না ডালপালার উপর পড়েছে। ডালে ডালে কত মানুষ-ফল ধরে আছে, দেখ তাকিয়ে। জকার উঠছে, আকাশ ফেটে যাবার গতিক। তীরের বেগে নৌকো পাল্লা দিয়ে ছুটেছে।

কদমতলার ঘাটে গিয়ে দৌড়ের শেষ। বালুচর খানিকটা—ছিপগুলো চরের পাশে লাগবে। সেই চরের উপরে ছুটো বেঞ্চি পেতে দিয়েছে—কর্মকর্তারা তার উপরে বসে দূরের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। কানায় দড়ি বেঁধে প্রকাণ্ড এক পিতলের-কলসি কদমের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বেঞ্চির ধারে এক বাণ্ডিল চাদর। যে-ছিপ জিতবে, তার মোড়লের হাতে কলসি তুলে দেবে। আর দাঁড়ি-মাঝি সকলকে সারবন্দি দাঁড় করিয়ে চাদর জড়িয়ে দেবে গলায়।

ফচকে ছোঁড়া কতগুলো আছে, তিন-চার কাঁদি কাঁচকলা এনে বকুল গাছে ঝুলিয়েছে। যারা হারবে কাঁচকলা উপহার দেবে তাদের নাকি। পরাজিতেরা আসছে হাত পেতে তোমাদের কাছ থেকে কাঁচকলা নিতে। বয়ে গেছে!

নৌকোয় নৌকোয় মশাল, মানুষের হাতে হাতে হাতে মশাল। হাওয়া দিয়েছে, মশালের আলো জলের উপর কাঁপছে। রাত্রিকাল কে বলবে—আলোয় আলোয় দিনমান। বাঁশের উপর থেকে প্রতিমা এইবার জলে নামিয়ে দিচ্ছে। হরি- হরিবোল রোল উঠছে চতুর্দিকে। প্রতিমার সঙ্গে মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠেলে ধরে প্রতিমা জলতলে ডুবিয়ে দিল। জায়গায় নিরিখ রইল—আমাদের প্রতিমা বাঁশবনের কাছ বরাবর, ওদেরটা বাবলাগাছের পূবে। থাকুন ঠাকরুনরা জলতলে এখন কিছুকাল—পরে এক সময়ে পাট-কাঠাম তুলে নিয়ে বাড়ি রেখে দেবে সামনের বছরের জন্য।

হরি-হরিবোল! এ ওর গায়ে জল ছিটোচ্ছে, সাঁতার কাটছে ডুব দিয়ে প্রতিমার গায়ের রাংতা কুড়োচ্ছে। হুড়োহুড়ি, এ-ওকে জড়িয়ে ধরছে—ভিজে কাপড়েই আলিঙ্গন, শত্রু-মিত্র বিচার নেই।

তারপরে বাড়ি ফেরা। ডোঙা-ডিঙি, সামনের মাথায় যে যেমন পেলো, উঠে পড়েছে। না-পেলো তো হাঁটনা। আড়ঙের মেলা শেষ, বাঁওড় নির্জন। বছর ঘুরে ভাসানের দিন এলে আবার তখন মেলা-মজুব, নৌকো-বাইচ, অগণ্য মানুষের আনাগোনা।

নিরঞ্জন-অন্তে সকলে ঘরে ফিরে এসেছে। পায়ে গড় করছে, বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করছে—যার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক। উমাসুন্দরী আশীর্বাদের ধান-দূর্বা নিয়ে দক্ষিণের দাওয়ায় বসেছেন। অলকা নিমি পুঁটি ছুটোছুটি করে রেকাবিতে মিষ্টি এনে দিচ্ছে—মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়াছাড়ি নেই। হিম-চাঁদের বাড়িতে পাথরের খোরায় সিদ্ধি ঘুঁটছে—ইয়ার-বন্ধুদের দিচ্ছেন তিনি: খেতেই হবে আজকের দিনে।

অলকা গলায় আঁচল বেড় দিয়ে শাশুড়ির পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করল। উমাসুন্দরী বললেন, জন্মএয়োস্ত্রী হও মা, পাকাচুলে সিঁদুর পরো।

দেবনাথ এসে পায়ের ধুলো নিলেন। উমাসুন্দরী বললেন, ধনে-পুত্রে লক্ষীশ্বর হও।

বাপের পিছু পিছু এসে কমলও ঢিপ করে প্রণাম করল। উমাসুন্দরী বললেন, সোনার দোয়াত-কলম হোক। মাথার যত চুল, তত পরমায়ু হোক।

বউঠান তো হলেন, দাদা কোথায়?

প্রণাম করবেন বলে দেবনাথ জ্যেষ্ঠের খোঁজাখুঁজি করছেন। বাড়ির মধ্যে এই দুই প্রণম্য তাঁর। দিদি মুক্তঠাকরুন এলে আর একজন হতেন। তিনি এলেন না—আসতে দিল না গ্রামসম্পর্কীয় ভাসুরপোরা। উঠানে দাঁড়িয়ে ভূপতি মেজাজ দেখাতে লাগল: পুজো বন্ধ এবারে। কেমন করে হবে—এক হাতে যিনি গোছগাছ করে আসছেন, নিজের পুজো ছেড়ে তাঁর এখন ভাইয়ের বাড়ি যাওয়া লাগল। ফটিক সর্দার যথারীতি আনতে গিয়েছিল। মুক্ত-ঠাকরুন অসহায় কণ্ঠে বললেন, রাগারাগি করছে ওরা সব, গাড়িতে উঠলে পিছন থেকে টেনে ধরে রাখবে। চোখে দেখে যাচ্ছিস, দাদাকে বলিস সব।

'দাদা' 'দাদা' করে দেবনাথ ভিতর-বাড়ি বাইরে-বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন—কে-একজন বলে দিল, মণ্ডপের মধ্যে আছেন—দেখুন গে যান।

শূন্য মণ্ডপ—আলো নেই, বাজনা নেই, একটা মানুষের চিহ্ন দেখা যায় না কোন দিকে। এ কয়দিনের সমারোহের পর অন্ধকার বড় উৎকট লাগে। একলা বসে দাদা কি করছেন এখানে?

দেবনাথ পায়ে হাত দিতেই ভবনাথ তাঁকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন: সর্বনাশ হয়ে গেছে, বুড়ি-মা নেই। ষষ্ঠীর দিন এসে পড়বে—যাবার সময় জনে জনের কাছে বলেছিল। ডুমুরতলা অবধি গিয়েও পালকি থেকে মুখ বাড়িয়ে হাসিমুখখানা মা একবার দেখিয়ে গেল। আর সে আসবে না। সকালবেলা কুসুমপুরের লোক এসে খবর দিল, সোনার প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেছে। সেই থেকে আড়ালে-আবডালে বেড়াচ্ছি।

জর হয়েছে বউয়ের—অন্নপথ্য করেই সুরেশের সঙ্গে চলে যাবে—ঠিক ষষ্ঠীর দিনে হয় কি না-হয়, তবে যাবে নিশ্চয় পুজোর ভিতর—এই রকম খবর ছিল। সেই জর সান্নিপাতিক বিকারে দাঁড়াল। বাপের বড় আহ্লাদী মেয়ে শ্বশুরবাড়ির সোহাগিনী বউ বারো দিনের দিন সকলকে কাঁদিয়ে চোখ বুঁজেছে।

॥ কুড়ি ॥

চঞ্চলা নেই, তারপর তিন তিনটে বছর কেটে গেছে। এক ঘুমের পর এখনো এক এক রাত্রে দক্ষিণের-ঘর থেকে কান্না ওঠে। অতি ক্ষীণ—কান্না বলে হঠাৎ কেউ বুঝবে না। মনে হবে গান—গানের মতোই সুরেলা। কান পেতে থাকলে কথাগুলো একটু একটু পরিষ্কার হয়ে আসবে: কোথায় গেলি মা আমার, ফিরে আয়। আমি যেতে দিতে চাইনি, মন আমার ডেকে বলেছিল, জেদ করে তুই চলে গেলি—

কোলের মধ্যে কমল কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয়—বিন্দুবিসর্গ সে টের পায় না। পুবের-কোঠায় ভবনাথ চমকে জেগে দরদালানে উমাসুন্দরীর গা ধরে নাড়া দেন: কী ঘুম ঘুমোচ্ছ বড়বউ, শুনতে পাও না? ওঠো শিগগির, দেখ গিয়ে—

উমাসুন্দরী ছুটে গিয়ে দক্ষিণের-ঘরের দরজা ঝাঁকাচ্ছেন, আর 'ও ছোট-বউ' 'ও ছোটবউ' করে ডাকছেন। সুর অনেক আগেই থেমেছে, ঘরের মধ্যে চুপচাপ। ডাকাডাকিতে তরঙ্গিণী সাড়া দিলেন—যেন কিছুই জানেন না এমনিভাবে সহজ কণ্ঠে বললেন, কি দিদি, কি হয়েছে? কান্না বেকবুল যান। কিম্বা হতে পারে সম্পূর্ণ ঘুমের ভিতরের কান্না—জেনেবুঝে তিনি কাঁদেন নি।

কমলের গায়ে হাত পড়ে চমক লাগল—একি, গা ছাঁৎ-ছাঁৎ করে যে! চঞ্চলার চলে যাওয়া থেকে এদের নিয়ে সদা-উদ্বেগ। পুঁটিকে তত নয়—তার খাওয়া শোওয়া আবদার-অভিমান উমাসুন্দরীর সঙ্গে। কিন্তু কমলের জন্য সামান্যে উতলা হয়ে পড়েন। শত্রুরা পেটে এসে একের পর এক দাগা দিয়ে বিদায় নিচ্ছে। গোড়ায় বিমলা, তারপরে চঞ্চলা: মায়াবিনী চঞ্চলা—সামান্য কয়েকটা দিন পরের ঘরে গিয়েও সেখানে সকলকে মায়ায় বেঁধে ফেলেছিল। সুরেশের আবার বিয়ে হয়ে নতুন বউ এসেছে—তবু এখনো শাশুড়ি নাকি চঞ্চলার জন্য বুক ছেড়ে কাঁদেন। কসবায় একদিন কৃষ্ণময়ের সঙ্গে সুরেশের দেখা হয়েছিল—সে-ও খুব দুঃখ করল: বাইরে সবই করে যেতে হচ্ছে বড়দা, কিন্তু মনের ঘা এ জীবনে শুকোবে না।

কমলের জর হল নাকি? ছটফট করছেন তরঙ্গিণী, রাতটুকু কতক্ষণে পোহাবে। প্রত্যূষের নিয়মিত ছড়ার্ঘটি বাদ গেল – অলকা-বউ ও বিনোকে ডেকে বললেন, তোরা যা পারিস কর্। খোকার জর হয়েছে, ওকে ছেড়ে ওঠা যাবে না। বিনো গিয়ে ভবনাথকে বলল, সর্বকর্ম ফেলে তিনি চলে এলেন। উমাসুন্দরীও তাঁর পিছু পিছু। হাতের উল্টোপিঠ কপালের উপর রেখে তাপের আন্দাজ নিলেন ভবনাথ, তারপর নাড়ি দেখছেন। ভবনাথ বলে কেন, সব বাড়িতেই মুরুব্বিরা অল্পবিস্তর নাড়ি দেখতে পারেন। ভাসুরের সামনে থেকে দাওয়ায় বেরিয়ে তরঙ্গিণী কবাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছেন। অভয় দিয়ে ভবনাথ বলেন, নাড়িতে সামান্য বেগ। বৃষ্টিবাদলায় ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। চিন্তার কিছু নেই। ধনঞ্জয় আসুক, সে কি বলে শুনি।

নিজেই চলে গেলেন ধনঞ্জয়ের বাড়ি। কবিরাজ ধনঞ্জয়নাথ নাথ— বেঁটেখাটো দোহারা মানুষটা, পাকা চুল, পাকা গোঁফ। বয়স ষাটের কাছাকাছি। ঘেটেঘরের দাওয়ায় বসে রোগী দেখছেন—ভবনাথকে দেখে সসম্ভ্রমে তালপাতার চাটকোল এগিয়ে দিলেন: বসুন বড়কর্তা। সকালবেলা কি মনে করে?

শেষরাত্রেও বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডার মধ্যে বেরুনো বলে কবিরাজ খালি গায়ে একটা হাত-কাটা পিরান পরে নিলেন। খালি পা, গলায় যথারীতি চাদর জড়ানো। চাদর সব ঋতুতেই—চাদরের মুড়োয় অষুধ বাঁধা। টুকরো টুকরো কাগজে রকমারি অষুধ মোড়ক-করা, মোড়কের উপর অষুধের নাম। সবগুলো মোড়ক একটা মোটা কাগজে বলের সাইজে জড়ানো—তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দড়ির বাঁধন।

দাওয়ার উপর পিঁড়ি পড়ল কবিরাজের জন্য। এই নিয়ম। আপাতত না বসে ধনঞ্জয় ঘরে ঢুকে গেলেন। তক্তাপোষের উপর কমল শুয়ে আছে। গোড়ায় কিছু মৌখিক প্রশ্ন। জলতৃষ্ণা পাচ্ছে কিনা, কাঁপুনি হয়েছিল কিনা, জর আসার মুখে মাথার যন্ত্রণা ছিল কিনা। পেটে টোকা দিয়ে দেখলেন। তারপরে নাড়ি দেখা— রোগির মণিবন্ধের উপর আঙুল রেখে নিবিষ্ট হয়ে আছেন কবিরাজ। ধ্যানে ডুবে গেছেন এমনিতরো ভাব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হচ্ছে এসব। বসবেন না—রোগীর তক্তাপোশে নয়, আলাদা টুল-চেয়ার আনিয়ে দিলেও নয়। ধনঞ্জয়ের নাড়িজ্ঞান ভাল, লোকে বলে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি দেখে 'হু' বলে তারপর বাইরে এসে পিঁড়িতে বসলেন। চাদরের প্রান্ত থেকে অষুধ খোলা হচ্ছে এইবার।

ভবনাথ শুধালেন: লালবড়ি?

হাঁ। সহাস্যে ধনঞ্জয় বললেন, মৃত্যুঞ্জয় রস—মৃত্যুকে করিতে জয় নাম হইল

মৃত্যুঞ্জয়। অনুপান তুলসীরপাতার রস, পিপুলের গুঁড়ো আর মধু। বাড়ি গিয়ে গোটাতিনেক পাঁচন বেঁধে পাঠাব, আধসের জলে সিদ্ধ হয়ে আধপোয়া থাকতে নামাবেন। তিনদিন সকালে এই পাঁচন একটা করে।

কানে গিয়ে কমল ঘরের মধ্য থেকে কেঁদে উঠল: পাঁচন আমি খাবো না জেঠামশায়।

কবিরাজ লোভ দেখাচ্ছেন: তিন পাঁচনের পরেই অন্নপথ্য।

রাজি নয় কমল, আওয়াজ তুলছে: ওয়াক-থু:—

উৎকট স্বাদ পাঁচনের—বিশেষ করে ধনঞ্জয়ের-বাঁধা যে-সব পাঁচন। গুলঞ্চ ভাদলার-মুখো ভুঁয়িকুষ্মাণ্ড বামনহাটি বাসক বচ কণ্টিকারি—জঙ্গল খুঁজে খুঁজে যেখানে যেটি পান কবিরাজ নিয়ে আসেন, গঞ্জ থেকেও দুষ্প্রাপ্য রকমারি বকাল কেনাকাটা করেন। সমস্ত মিলিয়ে বাড়িতে বিপুল সংগ্রহ। যে রোগ যেমন খাটে, নিক্তিতে মেপে মেপে প্যাকেট বাঁধেন—পাঁচন বাঁধা তাকে বলে। জলে সিদ্ধ করে ক্বাথ বের করে—সেই বস্তু একবার যে খেয়েছে, দ্বিতীয়বার তাকে খাওয়ানো দুঃসাধ্য। এবং ধনঞ্জয় গরব করে বলেন, রোগের ক্ষেত্রেও হুবহু তাই—একবার সেবনের পরে আবার দ্বিতীয়বার সেবন হবে, সেই ভয়ে রোগ পাঁই-পাঁই করে পালায়।

বাড়ির উপর ধনঞ্জয়ের আগমন—হেন ক্ষেত্রে কেবল একটি রোগী দেখেই ছুটি হয় না। এবং রোগী ছাড়া নীরোগদেরও দেখতে হয়। দাওয়ার উপরে স্ত্রীলোক অনেকে ঘিরে বসেছে কবিরাজকে। ও-বাড়ির সিদুর মা এবং নতুন-বাড়ির মেজবউও এসেছেন। বদ্যি দেখলে নানা রোগ মনে এসে উদয় হয়—কারো হজম ভালো হচ্ছে না, অম্বলের ঢেকুর ওঠে, কারো ঘুম হয়নি কাল রাত্রে, কারো বা গলা খুসখুস করছে। কবিরাজ পুঁটলি খুলে কাউকে ওষুধ দিলেন, কাউকে বা এটা কোরো সেটা কোরো বলে মুষ্টিযোগে সারছেন। রোগের ব্যবস্থা একরকম চুকলো তো হাত চিত করে এবারে সব সামনে এনে এনে ধরছে। নাড়ি দেখা শুধু নয়, ধনঞ্জয় হাত দেখতেও পারেন। এবং এই ব্যাপারে তিনি কল্পতরু-বিশেষ—যার যে রকম বাঞ্ছা, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ করে দেন, কাউকে নিরাশ করেন না। বন্ধ্যা মেয়েটার বাঁ-হাতে অনা মিকার নিচে পাশাপাশি তিনটে রেখা দেখিয়ে বলে দিলেন, একটা নয়—তিন তিনটে সন্তানের মা হবে সে, হাতে বাধা। পালেদের বেউলোকে বললেন, বছরের মধ্যে বিয়ে হবে তার—সুন্দর সুপুরুষ বর, অবস্থা মধ্যম রকমের। নতুনবাড়ির মেজবউয়ের সাত বছুরে ছেলে ফণীর সম্বন্ধে বললেন, দিকপাল বিদ্বান হবে এ। ছেলেটাকে কবিরাজ-বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বললেন, হাতখানা নিরিবিলি

আরও খুঁটিয়ে দেখবেন। এমন একখানি হস্ত যন্ত্রতন্ত্র মেলে না।

পাঁচন একটার বেশি লাগল না। পরের দিনই কম্প জর জর-ত্যাগ। আরও হল — কপাল গুণে দীননন্দন গ্রামের উপর উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বরের বাক্স পেট ফুলে ঢাক — জল উদরি না কি হয়েছে। এতদিনে এইবারে বুড়ি যাবেন ঠেকছে। বয়সের কোন গাছপাথর নেই। যজ্ঞেশ্বরের গর্ভধারিণী — সেই যজ্ঞেশ্বরই ঘাটের কোঠায় পৌঁছে গেছেন। তবু মাতৃভক্ত যজ্ঞেশ্বর দীননন্দনকে দিয়ে একবার দেখিয়ে দিচ্ছেন। দীননন্দনের দেখা মানে চিকিৎসার চরম হয়ে গেল — তার উপরে যদি কিছু থাকে, সে হল গঙ্গাজল ও হরিতলার মাটি।

ডাক্তার দীননাথ নন্দন, জাতে কাংসবণিক, দীননন্দন নামেই খ্যাত। ঘোড়ায় চেপে রোগীর বাড়ি আসেন, সঙ্গে স্তেথেসকোপ থাকে। আর থাকে ভারি ওজনের অষুধের বাক্স সহিসের মাথায়। বাক্স-মাথায় ঘোড়ার পাশে-পাশে পাল্লা দিয়ে দৌড়য়। তাই পারে কখনো, পিছিয়ে পড়ে বেশ খানিকটা। রোগীর বাড়ি তক্তাপোশের উপর তোষক-চাদর পাতা আছে, থাকবেই অতি-নিশ্চিত — ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে ক্লান্ত দীননন্দন কোট-প্যান্ট সুদ্ধ গড়িয়ে পড়লেন বিছানার উপরে। ঘোড়া এদিক সেদিক চরে বেড়াচ্ছে — সহিস এসে বাক্স নামিয়ে দিয়ে ঘোড়ার তদ্বিরে লেগে গেল। দীননন্দনও বিশ্রাম নেবার পর এবারে রোগী দেখতে গিয়ে বসলেন। স্তেথেসকোপের একদিকে নল — নলের মাথা কানে ঢুকিয়ে নিয়েছেন অন্য কলের ফুটো বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলে চেপে ধরে রোগীর বুক পরীক্ষা হচ্ছে।

ডাক্তারের ফী দুই টাকা। আর সহিস ঐ যে অষুধের বাক্স বয়ে আনল এবং পুনশ্চ ফেরত নিয়ে যাবে, তার প্রাপ্য এক সিকি। রোগী দেখে ব্যবস্থা দিয়ে ভিজিটের টাকা পকেটে ফেলে ডাক্তার অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে দেবেন — পাড়া-গাঁয়ের সে নিয়ম নয়। ভিন্ন গ্রামে এসেছেন, না খাইয়ে ছাড়বেই না কিছুতে। আর যজ্ঞেশ্বরের বাড়ির খাওয়া — সর্বনেশে খাওয়া রে বাবা। পুরোপুরি শয্যাশ্রয়ী করে ছাড়েন এঁরা।

দিবানিদ্রার পরেও রওনা হতে দেরি হয়। ভবনাথ এসে পড়লেন -- গাঁয়ের উপর এত বড় ডাক্তার তো ছাড়বেন কেন? — চলুন ডাক্তারবাবু, আমাদের মনুকে একটু দেখবেন।

দেখেশুনে দীননন্দন বললেন, অর না ঘোড়ার ডিম! বাতিক আপনাদের — ভাত বন্ধ করে সুস্থ ছেলে শুইয়ে রেখেছেন।

গ্রামের উপর এক বাড়ি থেকে ভিন্ন বাড়ি এক টাকা ফী। দীননন্দন টাকা নেবেন না: না মশায়, রোগ না পীড়ে না — ফী কিসের?

ভবনাথ বললেন, হয়েছিল জর—সত্যি সত্যি হয়েছিল। ধনঞ্জয়ের বাড়াবাড়ি আর পাঁচনে পালিয়ে গেছে।

তবু দীননন্দন অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়লেন। বলেন, চাকরে ভাই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠাচ্ছেন—কিসে খরচা করা যায়, ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ান। তখন এমনি সব ফন্দি মাথায় আসে—নীরোগকে রোগা বানিয়ে দশ-বিশ টাকা খরচ করে ফেলা।

মিত্তিরবাড়ির ঘরজামাই অম্বিক হল একপাল ছেলেপুলের বাপ। আবাদে গুরুগিরি করে, ছুটির মরশুম চলছে বলে গ্রামে আছে। দুটো টাকা হাওলাত নেবে বলে সকাল থেকে ভবনাথের পাছে পাছে ঘুরছে। অম্বিক টিপ্পনী কাটে: উল্টোটি দেখবেন আমাদের বাড়ি গিয়ে। আসে রোগ, যায় রোগ—এটা জ্বরে ধুঁকছে, গাছ থেকে পড়ে ওটা খোঁড়া হয়ে আছে, সেটার পেট নামছে। হার ঘোষের গোয়াল—কে কার খবর রাখে। বউ ঐ অবস্থায় পুকুরে চুবিয়ে চুবিয়ে রান্নাঘরে ঠেলে দেয়। পচা পান্তা যা পায়, গব-গব করে খেয়ে নিল। রোগ দেখে, কেউ কোন আমল দেয় না, তারি অবহেলা—একবেলা আধবেলা থেকে আপনা-আপনি সরে পড়ে।

তিরিশে আশ্বিন জাতীয় রাখিবন্ধন ও অরন্ধন। নতুন পরব—আগে ছিল না, এই বছর কয়েক ধরে চলছে। পাঁজিতে পর্যন্ত উঠে গেছে। পুববাড়ি পুজোর মধ্যে সেই যে সেবার অঘটন ঘটল। তারপরেও পুজো আর দু-বার হয়ে গেছে। নিতান্তই নমো-নমো করে। ভবনাথ বলতেন, ধর্মকর্ম আমাদের বংশে সয় না, মা-দুর্গাকে আনতে গিয়ে আমার বুড়ি-মাকে হারালাম। না করে তবু উপায় নেই। দুর্গোৎসব একবার আরম্ভ করলে তিন বছরের কমে ছাড়া যায় না। নীতরক্ষে করে যেতে হল সেই কারণে।

কিন্তু দেবনাথ আসেন নি—পুজোর সময় বাড়ি আসা সেই থেকে ছেড়েছেন। পরের বছরেই অবশ্য আসতে হয়েছিল—সেটা বিজয়া-দশমী কেটে যাওয়ার পরেই। এসেছিলেন আসলে কুশডাঙায় দিদি মুক্তেশ্বরীর বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পেয়ে। ভাল হয়ে গেলেন মুক্তঠাকরুন। তখন একবারটি দেবনাথ সোনাখড়ি ঘুরে যাচ্ছেন। রাখিবন্ধন পড়ে গেল সেই সময়। শহরে খুব হৈ-চৈ—গ্রামে, বিশেষ করে সোনাখড়িতে কী রকমটা এরা করে, দেখবেন।

গ্রামে এসে ইদানীং চুপচাপ থাকেন তিনি, গাঁয়ের আমোদে মজবে বড় একটা মেশেন না। কিন্তু রাখিবন্ধন হল আলাদা জিনিস। বলেন,

আমোদ নয়—আমাদের শোক। এবং সঙ্কল্প। মাতৃঅঙ্গ ছেদ করেছে—বঙ্গভঙ্গ দুই টুকরো। সেই সর্বনাশ আমরা স্মরণ করি, মায়ের দুঃখ ঘোচানোর সঙ্কল্প নিই।

'একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি'—আহ্লাদ বৈরাগীর গান। করতাল বাজিয়ে মা বগলা আগে আগে যাচ্ছেন। ভাল করে ভোর হয় নি, মুখ-আঁধারি এখনো। গাইতে গাইতে মা-ছেলে সোনাখড়ি এসে উঠলেন।

বউ্‌ দলবল ডেকে বেড়াচ্ছে। মেলা কাজ আজকে, এই প্রত্যুষেই পুকুরে নেমে স্নান সেরে নিতে হবে। আহ্লাদকে বলল, একদিন আগে কেন ঠাকুর? কার্তিক মাস তো কাল পড়বে।

নিত্যি সকালের সে সব গান নয়। স্বদেশি গান, শোনেন্‌ ভাল করে—। বলে বৈরাগী গাইতে গাইতে চললেন: একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী।

উত্তর-বাড়ির ফেক্সির মা শুনেই ধরে ফেলেছেন: ঠাকুর-দেবতার গান কই? এ তো ভিন্ন গান বৈরাগীঠাকুর।

আহ্লাদ বলেন, এঁরাও মা ঠাকুর-দেবতার চেয়ে কম যান না।

উদ্দেশে বৈরাগী যুক্তকরে নমস্কার করলে। মা বগলাও করতাল দুটো কপালে ঠেকালেন।

গান শুনে নতুনবাড়ির বিরজাবালার প্রাণে মোচড় দিয়ে ওঠে। দু-চোখে জল। আপন মনে বলে উঠলেন, পোড়াকপালী মা! ঘুরে আসবে না আরো কিছু! আসবে না—আসবে না আর ও-ছেলে.

পুঁটি আর কমল ভাই-বোনে বাইরে-বাড়ি ছুটে এসে হুড়কো ধরে দাঁড়িয়েছে। আহ্লাদ বৈরাগী গাইছেন: অভিরামের দ্বীপান্তর মা ক্ষুদি-রামের ফাঁসি, বিদায় দাও মা ঘুরে আসি—

ভবনাথ আশশ্যাওড়ার দাঁতন ভেঙে নিয়ে ফিরছেন। পুঁটি শুধায়: অভিরাম ক্ষুদিরাম কারা জেঠামশায়?

সাহেবদের উপর ক্ষুদিরাম বোমা মেরেছিল, ভবনাথের জানা আছে। সাহেবরাও ছাড়নপাত্র নয়—চারিদিকে ধুন্দুমার লাগিয়েছে। এমন হয়েছে, তরঙ্গিনী কিম্বা অলকা-বউয়ের উদ্দেশে বউমা বলে ডাকতে অনেক সময় ভবনাথের ভয় লাগে—হতে পারে, ঘর-কানাচে টিকটিকি অলক্ষ্যে ওত পেতে আছে। 'বউমা' শুনতে সে 'বোমা' শুনে ফেলল। তারপরে আর দেখতে হবে না—হাতকড়া এঁটে টানতে টানতে নিয়ে চলল। হুবহু এই নাকি হয়েছে কোথায়, ভবনাথের একজন অন্তরঙ্গ বলেছে। বিপদ হয়েছে, দেবনাথ এই সবে

আস্কারা দেন। অথচ মুখ ফুটে কিছু বলবার জো নেই। যার কাছে বলতে যাবেন—আঁা, আপনার মুখে এই কথা! এর চেয়ে নেংরা অসভ্য কথা যেন হয় না। অগত্যা নির্বাক থাকেন তিনি—মনে মনে ঘোরতর বিরক্ত।

দিদির দেখাদেখি একফোঁটা কমলও বলল, জেঠামশায়, ক্ষুদিরাম কে?

দেবনাথকে জিজ্ঞাসা করগে, যা বলবার সে বলবে—। বলে মুখ বেজার করে ভবনাথ রোয়াকে উঠে গেলেন।

এই ভবনাথেরই ভিতর বাড়িতে বন্দেমাতরম ধ্বনি। দিব্যি একটা দল বেরিয়ে আসে—দেবনাথ অগ্রবর্তী। টুকরো টুকরো হলদে সুতো, যার নাম রাখি, পুরানো হিতবাদী কাগজে জড়ানো। রাখির প্যাকেট দেবনাথ নিজে নিয়ে আসছেন। পিছু পিছু আসে হিরু অটল শিতবর আর শরিকদের সিধু ও তাদের ভৃত্য নন্দ প্রধান। বংশীধর ঘোষের ছেলে সিধু অর্থাৎ সিদ্ধিনাথ এদের সঙ্গে এক দল হয়ে বেরুচ্ছে—সদর আদালতে যে বংশীধর ও ভবনাথে ফৌজদারি-দেওয়ানি দুই এক নম্বর লেগেই আছে সর্বদা। জন পাঁচ-সাত নিয়ে বল্টুও এসে গেছে নতুনপুকুরের ঘাটে। ভুচুত ভুচুত করে ডুব দিয়ে সব শুচি হয়ে উঠল। হিমচাঁদ-নারায়ণদাসের দল, পশ্চিমবাড়ির হরু-বলাই-অশ্বিনীর দল, উত্তর বাড়ির যজ্ঞেশ্বর-অক্ষয় জল্লাদ পদার দলও এসে পড়ল। বাড়ি থেকে চানটান সেরে এসেছে তারা। জল্লাদের উপর নিশানের দায়িত্ব—সরু সরু কঞ্চির মাথায় রঙিন কাগজের উপর বড় বড় অক্ষরে বন্দেমাতরম্ লেখা। এ-ওর হাতে রাখি বেঁধে দিচ্ছে: বঙ্গভঙ্গ হলে কি হয়—ম হুব আমরা আরও বেশি করে ঐক্যবন্ধনে বাঁধা পড়ে যাচ্ছি, দেখ। তুমুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনি—আকাশ ফেটে যায় বুঝি-বা! কোনো বাড়ি বুঝি আর মানুষ রইল না—পুব-বাড়ির পুকুরঘাটে সব ছুটেছে। শশধর দত্ত লাঠি ঠুক ঠুক করতে করতে এসে বললেন, হয়ে গেল নাকি তোমাদের? আমার হাতে দাও একটা পরিয়ে।

সকলে মিলে-মিশে এখন একটা দল। হাতে হাতে নিশান তুলে ধরেছে, বাতাসে নিশান পত-পত করছে রং-বেরংয়ের পাখির পাখনা-উড়ানের মতো। গ্রামপথ ধরে চলেছে। কোন রান্নাঘরে আজ উনুন জ্বলবে না। দুঃখের দিন বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়েছে এই দিনে। বন্দেমাতরম্ আর স্বদেশী গান—গানের পর গান। অশ্বিনী খোল বাজাচ্ছে—পাথরঘাটার গাইয়ে মতিলাল এসে পড়েছেন, ধরতা দিচ্ছেন তিনি। 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে মাতঙ্গী মেতেছেন আজ সমররঙ্গে'। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।' 'ভেঙে দাও কাচের চুড়ি বঙ্গনারী।' বিলাতি শাড়ি-ধুতি যেগুলো সব বেঁধে রেখেছে—বিকালের সভায় পোড়ানোর জন্য পাঠাবে।

কাচের চুড়ি ভেঙে চুরমার—হাতে রয়েছে কেবল শাঁখা। বাড়ি ঢোকবার মুখে দেখে-শুনে পা ফেলো হে—চুড়ির টুকরো পায়ে না বেঁধে।

সভা হাটখোলায়। কমল বায়না ধরল, সে-ও যাবে। পুঁটি বাগড়া দিচ্ছে—যেহেতু নিজে সে যেতে পারবে না, মেয়েলোক কেউ যায় না। তরঙ্গিণীর কানে তুলে দিল—ভালমানুষ হয়ে বলে, মা, খোকন নাকি সভায় যাবে? তরঙ্গিণী এক-কথায় কেটে দিলেন: যাবে না আরো-কিছু! ছেলেপুলেরা যায় না। আমি আজ একলবোর গল্প বলব। সে দিন বলতে বলতে হল না—অতিথি এসে পড়ল রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। গল্পটা আজ শেষ করব।

গল্পের উপর যত টানই থাকুক—সে জিনিস আজ আর নয়। সভায় যাওয়ার ঝোঁক চেপেছে। গুম হয়ে আছে কমল। হিরুর গলা পেয়ে তার কাছে ছুটে গেল। তাকে সুপারিশ ধরল।

হিরুও বসিয়ে দিল একেবারে। বলে, সভায় গিয়ে কি করবি তুই? বক্তৃতা হবে—উঠে দাঁড়িয়ে একনাগাড়ে বক-বক করবে। একজন থামল আর একজনে। একটা দুটো স্বদেশি গান—সকালে তো দেদার শুনেছিস।

হেনকালে দেবনাথ এসে পড়লেন: কি বলছেন কমলবাবু?

হিরু বলে, সভায় যেতে চাচ্ছে—

দেবনাথ গম্ভীর: যাবে। তার জন্য কি—

হিরু বলছে, গিয়ে শুধু বসে থাকে। কিছু তো বুঝবে না।

বড় হয়ে বুঝবে—অন্তত এটুকু বুঝবে, একরত্তি বয়সেও দেশের ডাকে গিয়েছিলাম। সে-ই তো অনেক।

হিরু মিন-মিন করে তবু একটু বলে, হাটখোলা অবধি পারবে যেতে?

দেবনাথ বললেন, হেঁটে যেতে পারবে না। দরকার কি? অটল যাবে, শিবু যাবে—ওরা কেউ নিয়ে যাবে কাঁধে করে। বলে দিচ্ছি।

মানুষজন ভালই আসছে। আগের হাটে ঢেঁড়া দিয়েছিল। ঢোল আর কে আনতে যাচ্ছে—দোকান থেকে কেরোসিনের এক খালি-কেনেস্তারা চেয়ে নিল হারু মিস্তির, এদিক-ওদিক তাকাতে কেতু খবি নজরে পড়ে গেল কেতুর হাতে কেনেস্তারা দিয়ে হারু বলল, ঢেঁড়ি দাও। অর্থাৎ টিন বাজাও। হাটের ভিতর দিয়ে কেতু টিন বাজাতে বাজাতে চলল। লোকে জিজ্ঞাসা করে: কি ব্যাপার? হারু পিছন থেকে বলে যাচ্ছে, পরশুদিন তিরিশ তারিখে ঐ বটতলায় স্বদেশি-সভা—সভার শেষে বিলাতি নুন-কাপড় নষ্ট করা হবে, আসবেন সকলে।

পাইতক্কের যাবতীয় গাঁ-গ্রামে খবর গিয়ে পৌঁছেছে, দুপুর থেকে লোক আসতে লেগেছে।

কমল অটলের কাঁধে। বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় একটি কথাও বলে নি সে—প্রথমভাগের গোপাল নামক বালকটির মতন সুশীল, সুবোধ। শক্ত অনেক বাড়িতে—কিছু বলতে গেলে যাওয়াটাই বা পণ্ড হয়ে যায়। বেশ খানিকটা চলে আসার পর কমল গোঁ ধরল, কাঁধে চড়ে সে যাবে না। হাট-খোলার কাছাকাছি তখন। দলে দলে মানুষ সভায় যাচ্ছে। পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সবাই—শুধুমাত্র কমল কাঁধের উপর। আকুলি-বিকুলি করছে নেমে পড়বার জন্য। দেরি করলে হয়ত লাফিয়ে পড়বে—গতিক সেই রকম। বেটাছেলে হয়ে কাঁধে চেপেছে, রাস্তার লোক সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—ছি:!

ছেলে একফোঁটা, জেদ পাহাড়-প্রমাণ। নামাতে হল কাঁধে থেকে। গুটি-গুটি হাঁটছে কমল। অটল একখানা হাতে ধরেছে—পড়ে-টড়ে না যায়। তা-ও হবে না—হাত ছাড়ানোর জন্য ঝুলোঝুলি। রেগেমেগে অটল বলল, ভারি পা হয়েছে তোমার! অমন করো তো জোর করে কাঁধে তুলব, কাঁধে করে বাড়ি ফেরত নিয়ে যাব।

ধমক খেয়ে কমল চুপ। সভায় ভিড় খুব—ফুলবেড়ে কোণাখোলা পাথরঘাটা গড়ভাঙা থেকেও এসেছে। একখানা মাত্র চেয়ার সভাপতির জন্য—হাতেম আলি ফকিরকে সেখানে বসানো হয়েছে। অন্য সকলে ভুঁয়ের উপর। চেয়ারের পাশে গাদা-করা নুন ও কাপড়। সভা অন্তে বিলাতি কাপড়ে আগুন দেবে, বিলাতি নুন অদূরবর্তী পুকুরের জলে ফেলবে। বক্তৃতার জন্য ঠিক করা হয়েছে সোনাখড়ি থেকে দেবনাথ ও সকল নাটের গুরুমশায় হারু মিস্তিরকে। যাদার ঘোষ আসতে পারেন নি—সদরেও এই মচ্ছব, সেখানে আটকে ফেলেছে। থাকলে তিনিও নিশ্চয় বলতেন। ফুলবেড়ে ইত্যাদি গ্রাম থেকে একজন করে বাছাই হয়েছে। তাই তো অনেক হয়ে গেল।

হিমচাঁদ কী কাজে গড়ভাঙায় গিয়ে পড়েছিলেন। ছুটতে ছুটতে এলেন, সভার কাজ তখন আধাআধি সারা। এসে অক্ষয়কে চুপি চুপি বললেন, গঞ্জ থেকে ছোট-দারোগা রমজান খাঁর বাড়ির চুরির তদারকে এসেছে। অক্ষয়ের কানে ফিসফিসিয়ে বলা আর হাটে-বাজারে জয়ঢাক পিটিয়ে বলা—উভয়ের ফল একই প্রকার। ঐ জনারণ্যের মধ্যে খবর জানতে কারো বাকি রইল না। চুরি হয়ে গেছে চারদিন আগে, থানার টনক এদ্দিনে নড়ল। বেছে বেছে আজকেই বা কেন—হাটখোলায় বদেশি-সভা যে তারিখটায়?

এমনি সন্দেহ হিমচাঁদের মনেও উঠেছিল। বিকের কাজ সেরে তিনি রমজানের বাড়ি চলে গেলেন যদি কোন পাকা হদিশ মিলে যায়। সেখানে এক আচ্ছা মজা জমে উঠল—ছেড়ে আসা সহজ নয়। সভায় পৌঁছুতে সেই জন্য দেরি।

তদারক সারা করে ছোট-দারোগা এবারে রওনা দেবে। গঞ্জ থেকে পালকি করে এসেছে। বলে, চলে যাবো এবারে মিঞাসাব—পালকি-ভাড়ার ব্যবস্থা করো।

রমজান রগচটা মানুষ, দেশশুদ্ধ সবাই জানে। তার উপরে সর্বস্ব চুরি হয়ে গিয়ে মেজাজ সুনিশ্চিত তিরিক্ষি। জমবে এইবারে—হিমচাঁদ নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসলেন।

কিন্তু বিপরীত। রমজান সাতিশয় শিষ্ট। সবিনয় বলল, হচ্ছে ব্যবস্থা। একটুখানি সবুর করতে হবে হুজুর।

দলিচঘরের দাওয়ায় সকলে জমিয়ে বসেছে। ভুড়ুক-ভুড়ুক করে দারোগা হুঁকো টানছে, চপর-চপর করে পান চিবোচ্ছে। গোয়াল থেকে গরু খুলে নিয়ে রমজান চলল।

কোথায় চললে হে? দারোগা বলে, এদিককার মিটিয়ে-মাটিয়ে তারপরে যেও।

রমজান বলল, গরু নিয়ে সেই জন্যে তো যাচ্ছি। দুখান একটা গরু কিনবেন, আখের-ভাই বলছিলেন—

এমন গরুটা বেচে দেবে? —হিমচাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন।

না বেচে উপায় কি? চোরে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। ভাঙা-থালাখানা ফুটো-ঘটিটা অবধি রেখে যায়নি। কলার-পাতা কেটে ভাত খাচ্ছি। চুরির পরদিন ভোরবেলা থানায় এজাহার দিয়ে এসেছি। এদ্দিনের পর তো এলেন—এসে পালকি-ভাড়া চাচ্ছেন। গরু না বেচে দাবি কেমন করে মেটাই?

হিমচাঁদ বললেন, এর পরে কি হল সঠিক বলতে পারব না। হাসি সামলাতে পারছিনে—আর দেরি করলে ফটাস করে দম ফেটে ওখানেই পড়ে যেতাম। রাস্তায় এসে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে হেসে নিলাম। তার পরে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

খবর এলো, গড়ভাঙা থেকে দারোগা বেরিয়ে পড়েছে। পালকি এই হাটখোলার দিকেই আসছে। দক্ষযজ্ঞ অতএব আসন্ন। সরছে মানুষ পাঁচটা দশটা করে, ভিড় পাতলা হচ্ছে। পালকি সত্যি সত্যি দেখা গেল, পালকির এপাশে-ওপাশে বন্দুক হাতে কনস্টেবল। সভার অদূরে থেমে গেল পালকি—

ছুঁয়ে নামে নি, বেহারার কাঁধের উপর আছে। লোকে দুড়দাড় পালাচ্ছে ; দরজার ফাঁকে ঘাড় লম্বা করে দারোগা তাকিয়ে দেখল। গণ্ডগোল কিছু নয়— আবার চলল পালকি।

রাত পোহাবার আগে থেকেই যেন বান ডেকেছিল। মানুষের বন্যা— তরঙ্গের পর তরঙ্গ। সন্ধ্যায় সব শান্ত—প্রবল জোয়ার শেষ হয়ে গিয়ে ঝিরি-ঝিরি ভাঁটা নেমে যাবার মতন। সভার শেষে ক্লান্ত দেবনাথ দক্ষিণের দাওয়ায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়াচ্ছেন। কমলকে ডাকলেন, সে এসে বসল। বললেন, আমার বক্তৃতার সময় এক-নজরে কমলবাবু মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন— আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। কতই তো বললাম—বুঝেছ কিছু ?

বুঝেছে কমল ঘোড়ার-ডিম—ভারী ভারী কথা বোঝার বয়স কি এখন ? সপ্রতিভভাবে তবু ঘাড় নেড়ে টানা-সুরে বলে দিল, হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

দেবনাথও নাছোড়বান্দা : কী বুঝেছ, বলো একটু শুনি।

একটু-আধটু তখনও কমলের মনে ছিল—বিশেষ করে ক্ষুদিরামের কথা-গুলো। মুখস্থর মতো গড়গড় করে সে বলে গেল।

ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে দেবনাথ উঠে বসলেন। গল্পে পেয়ে বসল তাঁকে— ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লচাকি কানাই-সত্যেন যত স্বদেশি ছেলের গল্প। 'আমায় বেত মেরে কি মা ভোলাবি'—সভায় যে গান হয়েছিল, তারও মানে বোঝালেন। ইংরেজ বেত মারছে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ করলে—যে কথার মানে হল 'মাকে বন্দনা করি'। মা বলতে বঙ্গমাতা—যাঁকে খণ্ডবিখণ্ড করেছে ওরা। ভয় মানে না আমাদের ছেলেরা—হাসতে হাসতে তারা জেলে যাচ্ছে, ফাঁসিতে যাচ্ছে···

কারা ইংরেজ, কমল সঠিক জানে না। কে যেন বলেছিল, ধবধবে ফর্সা তারা—দেখতে ভারি সুন্দর। তা চেহারা যত সুন্দরই হোক, মানুষ তারা ভাল নয়। কাজকর্ম শুনে কমলের ঘেন্না হয়ে হয়ে গেল। হঠাৎ কমলকে টেনে দেবনাথ বুকের ভিতর নিলেন। কণ্ঠস্বর আর এক রকম। বললেন, ঐ ছেলে-দের মতন হয়ে তুমিও জেলে যেও কমল, দরকারে ফাঁসিতে যেও। আমি যদি বেঁচে না থাকি, যেখানেই থাকি তোমায় আশীর্বাদ করব।

পরবর্তীকালে, বাবার স্মৃতি কুয়াশাচ্ছন্ন, বাবার চেহারাটা অবধি কমল মনে আনতে পারে না—কিন্তু এই দিনটা হঠাৎ কখনো কুয়াশা ভেদ করে জ্বলে ওঠে। বাবার এই কোলের মধ্যে নিবিড় করে টেনে-নেওয়া। দেবতোর

প্রত্যাদেশের মতন বাবার এই আশ্চর্য কণ্ঠধ্বনি। মৃত্যুর পরে পাবে আবার বাবাকে—তখন আচ্ছা রকম ধমক দেবেন মনে হয়: শুধুমাত্র মুখের বুকনি আর কাগজের কলমবাজিতে দাঁইক মেরে এলি রে খোকন, গায়ে একটা আঁচড় তো দেখতে পাচ্ছিনে—ছি-ছি।

॥ একুশ ॥

কামাররা বুঝি ঘুমোয় না। ঠনঠন ঠনাঠন আওয়াজ আসে। শুনতে শুনতে কমল ঘুমিয়ে যায়। ভোররাত্রে আবার সে জাগে, তরঙ্গিণী তখন বাইরে নিয়ে যান একবার। চারিদিকে ফরসা-ফরসা ভাব, গাছে গাছে পাখি ডেকে উঠছে দিনমান ভেবে। গরুবাছুরদের গলা শুকিয়েছে ডাকছে গোয়ালের ভিতর। এ-বাড়ির ও-বাড়ির ছেলেপুলে কেঁদে কেঁদে উঠছে। তখনও কামার বাড়ি থেকে লোহা পেটানোর আওয়াজ।

ওরা ঘুমোয় না, মা?

তরঙ্গিণী বলেন, একটুখানি চোখ বুজে নেয় এক ফাঁকে। ঘুমুতে দিলে তো! গাছম'লের মরশুম—খেজুরগাছ কেটে রস বের করবে সেজন্য দা গড়ানোর হিড়িক লেগে গেছে।

ভটচাজ বাড়ি ছাড়িয়ে খানিক ঘুরে কামারশালা। খিঞ্জি বসতি—একই উঠান ঘিরে ছ-তিন ঘর গৃহস্থ। এর হয়তো পশ্চিম-পোতার ঘর, ওর উত্তর-পোতা আর-একজনের পূবের-পোতা। কামারশালাগুলো পাড়ার বাইরে বাঁশবনের ছায়ায় রাস্তার এদিকে আর ওদিকে। কমল একদিন কোথায় যেন যাচ্ছিল—হাপর চালিয়ে কামারশালায় তখন পুরোদমে কাজ চলেছে। দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হিরু ছিল সঙ্গে, সে হাঁক পেড়ে উঠল: হাঁ করে কি দেখিস? আয়, চলে আয়।

দেখারই বস্তু—সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হিরুর তাড়ায় [illegible] বেশি দাঁড়াতে পারে নি।

গাছ-কাটা দা গড়ে কুল পাচ্ছে না—তার উপরে আবার ধান কাটা লেগে গেছে, কাস্তে গড়ার ফরমাস। সাধ্যে কুলোয় না—কামারের দোষ কি? খদ্দেরের কাছে পালিয়ে বেড়ায়—'আজ দেবো' 'কাল দেবো' বলে ভাঁওতা মারে।

প্রহরখানেক রাতে ভবনাথ হাটখোলা থেকে হাট করে ফিরছেন। ধামা ঘাড়ে অটল মাহিন্দার পিছনে। খেদা কর্মকারের সঙ্গে দেখা। ঘাটের

মানুষের হাটঘাট সারা, হাট ভাঙো-ভাঙো—মেধা সেই সময় ধামা-ধামুই নিয়ে চলেছে।

ভবনাথ বললেন, এখন যাচ্ছ মেধনাদ—হু'টে কি আর আছে কিছু? মাছের মধ্যে ঘুসোচিংড়ি, তরকারির মধ্যে শাকের ডাঁটা।

মেধা বলল, খাটনির গুঁতোয় ফুরসত করতে পারিনে বড়কর্তা। তা-ও তো লোকের গালমন্দ খেয়ে মরি।

মরশুমের মুখে এখন হয়তো কথাটা খুবই সত্যি। কিন্তু কর্মকারপাড়ার বারমেসে নিয়ম এই। বিশেষ করে মেধার। হাট ভাঙে'-ভাঙো অবস্থায় জিনিসপত্র কিছু সস্তায় মেলে। কেতেন পারতপক্ষে ফেরত নিয়ে যেতে চায় না, লোকসান করেও দিয়ে যায়। মেধা কর্মকার সেই সস্তাগণ্ডার খদ্দের।

মুখোমুখি পেয়ে গেছেন তো ভবনাথই বা ছাড়বেন কেন! সেই কবে থেকে একজোড়া কাস্তের কথা বলছেন—গড়ে দেবে কি ধান-কাটা কাবার হয়ে যাবার পর? বললেন, গালমন্দ লোকে এমনি-এমনি দেয় না। এই সামান্য কাস্তে দুটোর জন্য কত আর ঘোরাবি বল্ দিকি?

মেধার তুড়ুক-জবাব: সে তো কবে হয়ে আছে।

পিছন থেকে অটল বলল, হয়ে আছে—তা একটু বলে পাঠাতে পারো নি? সকালে কাল গিয়ে নিয়ে আসব।

মেধা বলে, কাল নয়। ধার কেটে উকো ঘসে দেবো—কালকের দিনটা বাদ দিয়ে পরশু যেও—

বলে আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়ায় না, হন হন করে পলক দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

অটল বলল, বেটা কিচ্ছু করে নি। ভাব দেখলেন না? ধরেই নি এখন জুক। নেহাৎপক্ষে দশ বার এর মধ্যে তাগিদ হয়ে গেছে।

ভবনাথ বললেন, তাগিদ দিয়ে লাভ নেই—সামনে বসে কাজ ধরাতে হবে। তোকে দিয়ে হবে না—নিজে আমি কাল চলে যাবো। 'ধোপার বাসি, কামারের আসি'—বলে না?—ওটা জাতের ধর্ম।

ধোপার বাড়ি বাসি কাচাতে দিলে সে কাপড় কবে পাবে, ঠিকঠিকানা নেই। তেমনি কামারেও যদি 'আসি' বলে একবার সরে পড়তে পেরেছে, আর নিশানা পাবে না। ছড়াটা সেইজন্য চলিত হয়েছে।

সকালে উঠে ভবনাথ কাজকর্মের বিলিব্যবস্থা করছেন। শিশুবর সাগর-বড়কাটি পাঁচু সর্দারের বাড়ি চলে যাবে—নিজেদের ধানই কাটছে তারা, বর্গা-জমি বলে নাকিরবন্দে আজও কাস্তে ছোঁয়াল না। ঠিকরি-কদাই পেকে

গেছে বন্ধির-ভুঁইয়ে—গিয়ে অটল তুলতে বসে যাক। আর তিনি নিজে চললেন কামারবাড়ি—

কামারবাড়ির নাম কানে যেতে কমল বায়না ধরল: আমি যাবো জেঠামশাই, আ ম যাবো—

তুই যাবি কেন রে?

ঠং-ঠং ঠনাঠন লোহা পেটানো তখনই শুরু হয়ে গেছে। নাচন দিল কমল কয়েক বার: যাবো—

অন্যেরা ভবনাথের বড়-একটা কাছ ঘেঁষে না—একটুতে একটু হলেই খিঁচুনি দিয়ে ওঠেন তিনি। সে বড় বিষম জিনিস—হাতে মারা খিঁচুনির চেয়ে অনেক ভালো। সেই মানুষ কমলের বাবদে একেবারে ভোলা-মহেশ্বর। 'হবে না' 'হবে না' করে এই ছেলে, কনিষ্ঠ দেবনাথের একমাত্র বংশধর। আদর দিয়ে দিয়ে তাই তিনি মাথায় তুলেছেন, লোকে বলে। পিতার বেশি জোরজুলুম জেঠামশায়ের কাছে। যাবো—করতে করতে চোখ বড় বড় করে দীর্ঘ টানা-সুরে সে বলে উঠল, আমি যাবো-ও-ও—

হুঁ—বলে ভবনাথ চাদরটা কাঁধে তুলে নিলেন।

চলল কমল তবে তো! পুঁটির ভাল লাগে না—বাগড়া দিয়ে এসে পড়ে: তোর পাঠশালা আছে না কমল?

কমল বলে, মাস্টারমশায় কাল বাড়ি গেলেন না—আজ পাঠশালা দেরিতে বসবে।

ভবনাথ নিজেই অমনি সমাধান করে দিলেন: আসবার সময় মণুকে আমি নতুনবাড়ি বসিয়ে দিয়ে আসব। পুঁটি তুই পাতা-দোয়াত বইপত্তর পৌঁছে দিয়ে আয়।

যাচ্ছেন ভবনাথ—কমল তাঁর আগে আগে। পুঁটির পানে হাসিমুখে তাকিয়ে পড়ল সে যেন—পুঁটির অন্তত মনে হল তাই। ছোট ভাই হয়ে দিদিকে দেমাক দেখাচ্ছে। গজর-গজর করে: উনি চললেন কামারবাড়ি, আমার পাঠশালার বই-খাতা বয়ে নিতে হবে—

বলছে খুবই মনেমনে—জেঠামশায়ের কথার উপরে কথা শব্দ করে বলা যায় না!

কামারশালা চারটে—পথের এধারে-ওধারে মাথামাথি ঘুরে ঘুরে। প্রথমেই মেধা কর্মকার। দোচালা ঘরে মানুষে মানুষে হৈরলাপ। খদ্দেরই বেশি, বাজে লোকও জমেছে কিছু। চাঁচতলায় বাখারির বেঞ্চি বানানো, সারবন্দি সেখানে বসেছে। আবার চালের নিচে ঘরের মধ্যেও বসেছে—কেউ চাটকোলে, কেউ বা তক্তার টুকরো-টাকরা টেনে নিয়ে। দাঁড়িয়ে আছে কতক কতক।

ভবনাথ গিয়ে বললেন, কই, দেখি আমার কাস্তে। ধার-কাটা তবুবাত্তোর বাকি — বের করো দেখব।

ঘাড় তুলে দেখে মেধা তটস্থ হল: আসেন বড়কর্তা, বসেন—

মুরুব্বি লোকদের জন্য জলচৌকি আছে একটা। কারা বসেছিল, ভবনাথকে দেখে শশব্যস্তে উঠে হাত দিয়ে চৌকিটা ছেড়ে দিল। ভবনাথ বসলেন।

পাশের জায়গা দেখিয়ে কমলকে মেধা বলে, বোসো খোকা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

বসবে কি—কমলের চোখের মণি তো ঠিকরে বেরুনোর গতিক। কী কাণ্ড রে বাবা! হিমাংশুর সঙ্গে যেতে যেতে রাস্তা থেকে সেই পলক মাত্র দেখেছিল— আজ সামনের উপর একেবারে হাত পাঁচ-সাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছে। দু-চোখ ভরে দেখছে। হাপরের দড়ি মেধা পা দিয়ে টানছে—ফোঁস-ফোঁস করছে হাপর কেউটেসাপের মতন, টানে টানে কাঠ-কয়লার আগুন দপদপ করে উঠছে। লোহা সেই আগুনের মধ্যে—জ্বলেপুড়ে লোহা রক্তবরণ ধরেছে। সাঁড়াশি দিয়ে লোহাখানা নেহাই-এর উপর নিয়ে কর্মকার হাতুড়ি ঠুকছে। সেটা ছোট হাতুড়ি। আর দশাসই এক মদ্দ— মেটে-মেটে রং, হাপরের আগুন ও লোহার জল আভা গায়ের উপর ঠিকরে পড়ে দৈত্যের মতন দেখাচ্ছে তাকে—দাঁড়িয়ে পড়ে সেই লোক দুহাতে প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা মারছে লোহার উপর। মেধা কর্মকার প্রয়োজন মতো সাঁড়াশি দিয়ে এদিকে সেদিকে ঘোরাচ্ছে গনগনে গরম লোহা। নিজে ঠুকঠাক করে মারছে—আর বড়হাতুড়ি ঠন-ঠন ঠনাঠন অবিরত এসে পড়ছে। দা কি কাস্তে কুড়ুল—পিণ্ড লোহা দেখতে দেখতে জিনিসের আদল এসে যায়। নেহাই-এর পাশটিতে মেজের নাদা পোঁতা, নাদার মধ্যে জল। খেজুরডাঁটার গোড়ার দিকটা পিটিয়ে ফেস্টো-ফেস্টো করে জলে ডোবানো—সেই বস্তু মেধা ঘন ঘন তুলে জল ছিটিয়ে দেয় গরম লোহার উপর। আবার হাপরের আগুনে ঢোকায়, তুলে এনে আবার পেটায়। জোড়া হাতুড়ির ঘায়ে ফুলকি ছিটকে পড়ছে চারিদিকে তারাবাজির মতো। শঙ্কিত কমল তিড়িং করে লাফ দিয়ে সরে যায়।

মেধা হেসে বলল, পালাও কেন খোকা? তোমা অবধি যাবে না। আর গেলেই বা কি—ওতে পোড়ে না, পড়তে না পড়তে নিভে যায়।

হাপরে কাঠকয়লার আগুন—কলকে এগিয়ে ধরলে মেধা সাঁড়াশি দিয়ে তার উপরে আগুন তুলে দিচ্ছে। হাতে হাতে কলকে চলে। আর নানান গল্পগাছা—পাঁচখানা গাঁয়ের সুখ দুঃখ অনাচার-অবিচার রং-তামাশা ফষ্টিনষ্টি শোন এই কামারদোকানগুলোয় বসে।

একখানা কাছকাটা-দা গড়াবোর দরকারে কুঞ্জ ঢালি অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। কমলকে পেলেই ঠাট্টা-বটকেরা করে সে, আবার খেয়েও দেয় রস-পাটালি ফলপাকড়—চাষার বাড়িতে যখনকার যে জিনিস। কমলকে সে শুধায়: এত সমস্ত সরঞ্জাম দেখছ—বলো দিকিন খোকা, কোন্ জিনিস বিনে কামারের দোকান একেবারে কানা? তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ ভাল করে, দেখে তারপর জবাব দাও।

আরও বিশদ করে বুঝিয়ে বলে, দেখো কর্মকার আমায় আজ চার মাস ঘোরাচ্ছে। রেগেমেগে হয়ে আজ মতলব করে এসেছি, দোকানের এমন এক জিনিস নিয়ে দৌড় দেবো যাতে তার কাজকর্ম বন্ধ হবে, কর্মকার বেকায়দায় পড়ে যাবে। কোন সে জিনিস?

ছোট্ট মানুষ কমলকে উদ্দেশ্য করে বলা—উপস্থিত সকলের সবগুলো চোখ তাকিয়ে পড়ে জবাব খুঁজছে। কিন্তু জবাব চায় নি কুঞ্জ ঢালি—গল্প ফাঁদছে তারই এটা ভূমিকা। কামার বায়না নিয়ে বসে আছে—জিনিস গড়ে দেয় না, বায়নার টাকাও ফেরত দেয় না। মানুষটা বুদ্ধিতে রীতিমত খাটো কর্মকারকে জব্দ করবে মতলব নিয়ে আজ কামারশালে এসে বসেছে। দু পাঁচটা ঘা মেরেই হাতুড়ি রেখে খেজুর-ডাঁটা দিয়ে জল ছিটায়—বিস্তর ক্ষণ থেকে ঠাহর করছে সে। কামারের কাজে খেজুর-ডাঁটাই অতএব সবচেয়ে দরকারি—তড়াক করে উঠে সেই খেজুর-ডাঁটা তুলে নিয়ে একলম্ফে পথের উপর পড়ে দৌড়।

'কী করো' 'কী করো'—হাসি চেপে কর্মকার চেঁচাচ্ছে। বোকা মানুষটা বলে, আমার বাড়ি এসে বায়নার টাকা কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিয়ে দিলে তবে জিনিস ফেরত পাবে। ছুটে বেরিয়ে গেল সে। কর্মকার তো হেসেই কূল পায় না। খেজুর-ডাঁটার অভাব কি—চাঁচ দেবার পর গাদা গাদা তলায় পড়ে থাকে—একটা কুড়িয়ে আনল তখনই।

কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় রোগা মানুষটি, বগলে পুঁটলি গায়ে ফতুয়া হাঁটু অবধি কাপড় তোলা, বিল পাড়ি দিয়ে কামারদের সর্ষে ক্ষেতে এসে উঠলেন। পর ক্ষণে অদৃশ্য। হাত-পা ধুতে ডোবার ঘাটে নেমেছেন। ফটিক মোড়ল বংশের চিনেছে। বলে, গুরুঠাকুর মশাই—

ভবনাথ বললেন, বিল শুকিয়ে উঠল—পায়ের ধুলো একবার হরহামেশা পড়বে।

হরিসেবক ভট্টাচার্য, নিবাস পাড়ালা-ঘুঘুদহ—সোনাখড়ির সাত-আট ক্রোশ দূরবর্তী, বড় বড় কয়েকটা বিল মাঝে পড়ে। সেজন্য বর্ষা পড়লে গুরুঠাকুরের

যাতায়াত বন্ধ। বুড়োমানুষ জলকাদা বেশি ভাঙতে পারেন না। এখন এই আরম্ভ হল—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ অবধি চলতে থাকবে।

ডোবার ঘাট থেকে উঠে ঠাকুরমশায় আবার দৃষ্টিগম্য হলেন। বিজে হাঁটার সেই চাষাড়ে চেহারা আর নেই। পুঁটলি খুঁলে খড়ম বের করে পায়ে পরেছেন, নামাবলী বের করে গায়ে জড়িয়েছেন। সাত্ত্বিক মানুষের সাজসজ্জা যেমন হতে হয়। সোনাখড়িতে বিস্তর শিষ্যসেবক—ভবনাথ উমাসুন্দরী তরঙ্গিণী একেবারে সাক্ষাৎ-শিষ্য, হরিসেবক ঠাকুরের কাছে এঁরা মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন।

খড়ম খটখট করে ঠাকুরমশায় এমুখো আসছেন। ভবনাথ পথে নেমে পড়লেন, পিছনে কমল। খট করে ঠাকুরমশায় দাঁড়িয়ে পড়েন। প্রণামের পর পায়ের আঙুল ঈষৎ উঁচু করে দিলেন—পদধুলি নিতে অসুবিধা না হয়। ভবনাথের হয়ে গেল তো কমল। প্রণাম করল সে—কিন্তু খড়মের উপর বুড়ো-আঙুল তোলাই আছে।

ভবনাথ বললেন, পায়ের ধুলো নেওয়া হয়নি রে মনু।

ফটিক দেখেছে, সে বলল, নিলেন তো খোকাবাবু।

ভবনাথ হেসে বলেন, ডানপায়ের ধুলো নিয়েছে, বাঁ-পা বাকি। বাঁ-পায়ের আঙুল তোলা দেখছিস নে। ছেলেমানুষ বুঝতে পারে নি।

বেকুব হয়ে কমল তাড়াতাড়ি বাঁ-পায়ের তলা স্পর্শ করল।

পদধুলি নিতে আরও ক'জন জমেছে। হাতুড়ি ফেলে মেঘা কর্মকারও এলো। হয়ে গেছে, ঠাকুরমশায় তবু নড়েন না। মেঘা-ই ঠাহর করল। প্রণামের ঘটা দেখে জল্লাদ সকৌতুকে খদূরের গাবতলায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাকল তাকে: এসো না জল্লাদ। ঠাকুরমশায় তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে।

জল্লাদ কানেই নেয় না। আশশ্যাওড়া-বনের শুঁড়িপথ ধরে সে পা চালিয়ে দিল।

কামার-দোকান থেকে কার মুখের একটা মন্তব্য এলো: দেবদ্বিজে ভক্তি শেখায় না —পাঠশালে কী শেখায় যে ঘোড়ার-ডিম!

হরিসেবক পাড়ায় ঢুকে গেলেন। মেলা কাজ। শিষ্যবাড়িতে বার্ষিক প্রণামী বরাদ্দ আছে—চারআনা আটআনা এমন কি টাকাও—যার যেমন অবস্থা। ঘুরে ঘুরে প্রণামী আদায় করে বেড়াবেন। বর্ষার দরুন চার-পাঁচটা মাস আনাগোনা একেবারে বন্ধ ছিল, তার মধ্যে বিয়েথাওয়া এবং আরও পাঁচ রকম শুভকর্ম হওয়া সম্ভব। তেমন ক্ষেত্রে গুরুপ্রণামী তোলা থাকে। এসবের খোঁজখবর নিতে হবে। সরাসরি খাজনা আদায়ও আছে—নিশি বোস নায়েবের মতোই খানিকটা। জমির খাজনা নয় ঠাকুরমশায়ের এককৌটা

জমিও নেই গাঁয়ের মধ্যে—নারকেলগাছের বাবদ খাজনা। হতে হতে হরি-সেবক ঠাকুরমশায় অন্তত পঞ্চাশটা নারকেলগাছের মালিক হয়ে পড়েছেন। শিষ্যসেবকদের কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধের সময় গুরুঠাকুরকে নারকেলগাছ দানের বিধি। ভাল গাছ দেয়, আবার বুড়ো গাছ যাতে ফল ধরা বন্ধ হয়ে গেছে তেমন গাছও ছ্যাঁচড়া শিষ্য কেউ কেউ দিয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের বৃক্ষমূর্তি হলেন নারকেলগাছ—কুড়াল পেড়ে কাটা চলবে না, ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে। গাছের ডাব-ঝুনো সুদূর পাড়ালায় বসে রক্ষে হয় না, গাছ বেচে দেবো—খদ্দেরে কেটেকুটে উনুনে পোড়াবে, তা-ও হবে না। অতএব বার্ষিক খাজনায় জমা দিয়ে দিয়েছেন—গাছ প্রতি আট আনা। সেই খাজনা আদায় করাও ঠাকুরমশায়ের কাজ একটা।

মানুষটি সাদাসিধে, কোন বায়নাক্কা নেই। গাঁয়ের আধাআধি লোক শিষ্য। সেবা নেবেন—যে-কোন বাড়ি উঠে পড়লেই হল। পাড়ায় একটা চক্কোর দিয়ে সকলের যথাসম্ভব খবরাখবর নিয়ে পুববাড়ি এসে পড়লেন আজ। ভবনাথ ফেরেনি এখনো। কমল ঐ খাবার-দোকান থেকে অমনি পাঠশালায় গেছে, ভবনাথও হয়তো সঙ্গে গিয়ে প্রহ্লাদমাস্টারের ওখানে গল্পে বসেছেন। কড়ি-বাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকোয় স্বহস্তে জল ফিরিয়ে নিয়ে গুরুঠাকুর মশায় রোয়াকের উপর জলচৌকিতে বসে পড়লেন, অতল কমলকে ধরিয়ে ফু দিতে দিতে নিয়ে এলো। নলচের মাথায় কলকে বসিয়ে হরিসেবক ধূম-উদ্গীরণ করছেন।

বিনো এসে গলায় আঁচল জড়িয়ে পায়ের ধুলো নিল। আশীর্বাদ বিস্মরণ হয়ে হরিসেবক হুকুম ছাড়লেন: ভাতে-ভাত। অর্থাৎ এতখানি পথ হেঁটে এসে বুড়োমানুষের সবিশেষ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে।

উমাসুন্দরী প্রণাম করে বললেন, ক্ষেতের সোনামুগ, ক্ষেতের মানকচু—কচু দিয়ে মুগের ডাল রেঁধে নিন ঠাকুরমশায়, অমৃত লাগবে।

উঁহু, ভাতে-ভাত। ভাতে-ভাত।

রান্নায় ঠাকুরমশায়ের বড় আলস্য। অথচ শিষ্যবাড়ি ঘুরতে হয়, সবাই তারা অব্রাহ্মণ—স্বপাক ভিন্ন উপায় কি তখন? তবে ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছেন। আলাদা তরকারী রান্না নয়—কাঁচকলা বেটেআলু কচু ঝিঙে ন্যাকড়ায়-বাঁধা ডাল বা শিম-বরবটি ভাতের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, একসঙ্গে সব সিদ্ধ হয়ে গেল। তারপর তেল-নুন-লঙ্কা মেখে খাওয়া। উনুনে ভাত চাপানো ও নামানো—তাও নিজের হাতে নয়। বিনোকে বলেন, নেয়েধুয়ে শুচি হয়ে এসে.—বাস বাস, ভাত তুমিই নামাবে। অনাচার হবে না—ও ভাত এটো নয়, নুন না পড়া পর্যন্ত এঁটো হয় না।

সোনাখড়ি পোস্টপিস নেই—চিঠিপত্র রাজীবপুর পোস্টাপিসে আসে। বিষ্যুৎবার আজ। পিওন যাদব বাঁড়ুয্যে চিঠি বিলি করতে এসেছেন। রবিবার আর বিষ্যুৎবার হপ্তার এই দুটো দিন আসেন তিনি সোনাখড়িতে। তাঁর ধরণ-ধারণ হরিসেবকের একেবারে বিপরীত। ভোজনবিলাসী মানুষ—রাঁধাবাড়ার কাজে অতিশয় উৎসাহী। রাঁধেনও চমৎকার—খেয়ে মুখ ফেরে না। দত্তবাড়ি গিয়ে সর্বাগ্রে চিঠিপত্র যা দেবার দিলেন। তারপর খবরাখবর নিচ্ছেন, দুধ হয় ঘরে কেমন, তরিতরকারি কি মজুত আছে, মাছের ব্যবস্থা হতে পারবে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। শশধর দত্ত পুলকিত। বাড়িতে ব্রাহ্মণের পাত পড়বে সে জন্যে তো বটেই, তা ছাড়া রাঁধাবাড়া পিওনঠাকুর শুধু নিজের যতন করেন না—সবাইকে খাইয়ে তাঁর আনন্দ, বাড়িসুদ্ধ সবাই প্রসাদ পেতে পারবে। খাওয়াটা উপাদেয় হবে।

দত্তগিন্নি বলেন, বেলা তো বেশ হয়েছে। স্নান-আহ্নিক সেরে জলটল মুখে দিয়ে লেগে যান, উনুনে ধরিয়ে দিচ্ছি আমি।

কিন্তু উপকরণ তেমন জুতের নয়, পিওনঠাকুর দ্বিধান্বিত। বললেন, বোসো মা। পাড়ার কিছু চিঠি আছে, সেইগুলো সেরে আসি। তার পরে।

নাছোড়বান্দা গিন্নি বললেন, সিধেপত্তোর গোছাচ্ছি আমি কিন্তু।

তাড়া কিসের? ফিরে আসি আমি, তখন।

এই মক্কেল একেবারে বাতিল করে যেতে চান না—অন্য বাড়ির অবস্থা চেয়েও যদি খারাপ হয়?

নতুনবাড়ি ঢুকলেন। হ্যাঁ, সার্থক হল এ বাড়ির চিঠি বিলি করা। বড় রুই ও শোলমাছ জিয়ানো আছে, গঞ্জের, বাজারে নতুন গোলআলু উঠেছে—তা-ও নিয়ে এসেছে কাল। বলেন-পাটালি আর গোবিন্দভোগ চাল আছে—দিব্যি পায়েস হতে পারবে। তার উপরে মাদার ঘোষ বাড়ি এসেছেন, পুকুরে মাছ গিজগিজ করছে—তাঁর প্রস্তাব: পাশখেওলা ফেলে এক্ষুনি একটা কাতলামাছ তুলে দিচ্ছে, কৃপা করে একখানা মুড়িঘন্টের তরকারি পাক করতে হবে।

এর উপরে কথা কি! কাঁধের চিঠির ব্যাগ নামিয়ে পিওনঠাকুর আসন নিলেন। পাড়া-বেড়ানি পুঁটি এসে দাঁড়াল—তাদের বাড়ির চিঠি থাকে তো নিয়ে যাবে। পিওনঠাকুর বললেন, দত্তবাড়ি খবরটা দিয়ে যাস তো মা। মাদার ছাড়ছেন না, পাকশাক এইখানে করতে হচ্ছে।

পূববাড়ি এদিকে হরিসেবকের স্নানাদি সারা। রোয়াকের উপর আহ্নিকে বসেছেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় ভাত ফুটছে টগবগ করে—দেখা যাচ্ছে রোয়াক থেকে। নাক টিপে বিড়বিড় করে মন্তোর পড়তে পড়তে গুরুঠাকুর আঙুলের

ইশারায় বিনোকে উনুনের জাল ঠেলে দিতে বললেন। এমনি সময় পুঁটি ফিরে এসে অলকা-বউকে বলছে, চিঠি নেই—জিজ্ঞাসা করে এসেছি। থাকলে উনি নিজেই তো দিয়ে যেতেন।

তারপর কলকল করে বলছে, রান্নায় বসেছেন পিওনজেঠা। মাদারকাকা পুকুরে জাল ফেলাচ্ছেন। মস্তবড় এক মাছ দড়াম করে উঠোনে এনে ফেলল—

হরিসেবক উৎকর্ণ। সোনাখড়িতে কত কালের আসা-যাওয়া—পিওন-ঠাকুরকে জানেন তিনি, খুব জানেন। রান্নাও তাঁর কতবার খেয়েছেন। আহ্নিক সম্ভবত সারা হয়ে গেছে, তড়াক করে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। উমাসুন্দরীকে ডেকে বলেন, কেষ্টর মা শোন। মাদার এসেছেন, অনেকবার উনি খাবার কথা বলেন। আমি নতুনবাড়ি চললাম। ঐ ভাত নামিয়ে তোমরা রান্নাঘরে নিয়ে যাও। রাত্তের বেলা তোমাদের এখানে খাব। শোবও এই বাড়ি।

বাইরে-বাড়ি দোচালা বাংলাঘরে তক্তপোশের উপর গুরুঠাকুর মশায়ের বিছানা। অটল নিচে মাদুর পেতে পড়েছে।

রাতদুপুরে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড—অটল চেঁচামেচি করছে, কাঁদছে। ঘুম ভেঙে ভবনাথ ছুটলেন। হিরুও বাপের পিছু পিছু।

কি রে অটলা, কাঁদিস কেন? কি হয়েছে?

অটল ঘরের বাইরে এলো: ঠাকুরমশায় মেরেছেন।

হরিসেবকও বেরুলেন। আকাশ থেকে পড়লেন তিনি: সে কী কথা! দোষঘাট করিস নি, আমি কেন মারতে যাব মিছামিছি?

অটল গরম হয়ে বলে, মারেন নি লাথি? ঠাকুর-মানুষ হয়ে মিছেকথা বলছেন। পৈতে ছুঁয়ে বলুন তবে।

হাল আমলের ছোঁড়া হিরু—গুরু-পুরুত গো-ব্রাহ্মণ সম্পর্কে এরা তেমন ভক্তিমান নয়। অটলের পক্ষ নিয়ে সে বলে, সারাদিন খেটেখুটে বেহুশ হয়ে ঘুমুচ্ছিল। রাতদুপুরে উঠে আপনার নামে মিথ্যে বানিয়ে বলছে, তাই বলতে চান?

হরিসেবক আমতা-আমতা করে বলেন, মিথ্যেটা ইচ্ছে করে না বলুক, পাকেচক্রে তাই তো হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাবা। পা লেগেছে ওর গায়ে—সেটা মিথ্যে নয়। তা বলে লাথি মারি নি। বিনি দোষে লাথি কেন মারতে যাব?

তবে?

রাতে দু-তিন বার আমায় উঠতে হয়। অন্ধকারে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে

আছে—পা বেধে বুড়োমানুষ আছাড় খেয়ে মরব? ঠিক কোন খানটায় খুঁজে দেখছিলাম, লেগে গেল দৈবাৎ।

হিরণ্ময় জেরা করছে: খোঁজার কথা তো হাত দিয়ে।

আমি পা দিয়ে খুঁজেছি। সেটা ওরই মঙ্গলের জন্য।

কৌতূহলী হয়ে ভবনাথ বলেন, কি রকম—কি রকম?

হরিসেবক বলেন, হাতে খুঁজতে গিয়ে অন্ধকারে যদি দৈবাৎ হাত ওর পায়ে গিয়ে লাগত? ব্রাহ্মণের অঙ্গে শূদ্রের পা পড়া—কি সর্বনাশ হত, ভাবো দিকি। সে পাতকের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত। পাতক বাঁচাতে গিয়েই এই গণ্ডগোল। আমার পা-দিয়ে খোঁজা ও ভেবে নিয়েছে পায়ের লাথি।

অটলের কান্না একেবারে বন্ধ হয় নি তখনো। ফোঁপাচ্ছে। ভবনাথ বুঝিয়ে বলেন, শুনলি তো সব। মারেন নি—পা এমনি লেগে গেছে। দোষ-ঘাট ক'রল নি, লাথি কি জন্যে মারতে যাবেন?

বিরক্ত হয়ে তেড়ে উঠলেন: গায়ে পা ছুঁয়েছে কি না-ছুঁয়েছে—ব্যথা কি এখনো লেগে আছে? ভারি কুলীন হয়েছিস, উঁ—টনটনে অপমানবোধ।

কান্নার কারণ অপমান নয়—হাত ঘুরিয়ে অটল পিঠের দিকে দেখিয়ে দিল। ফোঁড়া হয়েছে, ক'দিন থেকে বলছিল বটে। পায়ের ঘা লেগে ফোড়া ফেটে গেছে, টাটাচ্ছে খুব।

বেশ তো, ভালই তো। হরিসেবক এবারে বলার জুত পেয়ে গেলেন: ফেটে গিয়ে তো ভালই হয়েছে রে। ফোড়া হারে-মুক্তোর অলঙ্কার নয় যে গায়ে পরে থেকে শোভা বাড়াবি, দায়ে-বেদায়ে বন্ধক দিবি, বিক্রি করবি। ডাক্তার-বদ্যি লাগল না, এমনি এমনি ফোড়া ফাটিয়ে আমি তো উপকারই করেছি তোর।

বাইশ

ডুগডুগি বেজে উঠল একদিন দেড়প্রহর বেলা। কানাপুকুর-পাড়ের ওদিক থেকে। জঙ্গলের আড়াল বলে এখনো নজরে আসছে না। তারপর ফাঁকায় এসে গেল। দু'জন মানুষ। পিছনের জনের মাথায় টিনে-বানানো বেঢপ আকারের বাক্স—টিনের উপর রংবেরঙের ফুল-লতা আঁকা। চার গোলাকার মুখ—মুখ চারটে কালো কাপড়ে ঢাকা। আগের-জন বেশ খানিকটা বাবু-মানুষ—গায়ে কামিজ পায়ে জুতো মাথায় টেরি। এই লোকের হাতে ডুগডুগি, কাঁধে বাঁশের তেপায়া। ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে আসছে, আর চেঁচাচ্ছে: বাক্সকল

—পেল্লায় পেল্লায় ছবি—বত্রিশ দফা। সস্তায় যাচ্ছে—মাত্তোর দু-পয়সা। চলে এসো, চলে এসো সব। সস্তায় যাচ্ছে—দু'পয়সায় বত্রিশ মজা—

গানের মতন সুর ধরে লোক জমাচ্ছে: কলকাতার শহর দেখ, চিড়েখানার হাতি দেখ—

অটল বলে, সোনাখড়িতে কলকাতা এনে দেখাচ্ছে?

দুটো পয়সা ফেলে কাচে চোখ দাও। কলকাতা দেখা থাকে তো রাস্তা-ঘাট ট্রামগাড়ি ঘরবাড়ি মিলিয়ে নাও।

পুববাড়ির হুড়কোর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। ভবনাথ বাড়িতে না—এক কাঁঠালগাছ নিয়ে শরিক বংশীধরের সঙ্গে জেদাজেদির মামলা, সেই বাবদে তিনি সদরে গেছেন। পুঁটি কোনদিকে ছিল—ছুটে এসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে সে। পাঁচিলের দরজায় বিনির আর নিমির মুখ দেখা যায়। বাক্সকলের সঙ্গে অটল দরদস্তুর করছে: দু-পয়সা কম হল নাকি? বিশ হাত মাটি খুঁড়ে দেখ, খুঁই কেন আধেলা পয়সাও উঠবে না। যতই চেঁচাও আর ডুগডুগি বাজাও, দু-পয়সায় কেউ তোমার ছবি দেখবে না। কম-সম করে নাও—বেলা খন্দের হবে।

চাউর হয়ে গেল, পুববাড়ি বাক্সকল এনে রকমারি ছবি দেখাচ্ছে। প্রহ্লাদের পাঠশালায় সুর করে নামতা হচ্ছে তখন—বঙ্কু এসে বলল, যাবেন না মাস্টারমশায়? প্রহ্লাদ উড়িয়ে দেন: দূর, ছবি আবার পয়সা দিয়ে ঘটা করে কী দেখতে যাব?

কিন্তু নামতায় তারপরে আর জুত হয় না—সর্দার-পোড়া অবধি অন্যমনস্ক, এটা বলতে ওটা বলে উঠছে। ছুটি দিয়ে দিলেন প্রহ্লাদ—ছেলের দল ছুটল। কমলও আছে। আর দেখা যায়, স্বয়ং প্রহ্লাদ-মাস্টার গুটিগুটি পা ফেলে চলেছেন সকলের পিছনে—কৌতূহল সামলাতে পারেন নি।

এক পয়সায় রফা করে লোকটা ইতিমধ্যে ছবি দেখাতে লেগে গেছে। লতাপাতা-আঁকা রহস্যময় বাক্সকলে পাশাপাশি চারটে ছিদ্র—চারজনে সেখানে চোখ রেখেছে—পুঁটি বিনি নিমি আর অলকা-বউ। হাতল ঘোরাচ্ছে লোকটা আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে: লাটসাহেবের বাড়ি দেখ, চিড়েখানার হাতি দেখ, গড়ের মাঠ দেখ, হাওড়ার পুল দেখ—

পাঠশালার ছেলের দল হৈ-হৈ করে এসে পড়ল। বাইরের লোকও জুটেছে। বউমানুষ অলকা এতক্ষণ যা দেখে নিয়েছে—আর এখন দেখা সম্ভব নয়। ঘোমটা টেনে সে পাঁচিলের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। কমল আর দেরি করে— এক ছুটে গিয়ে বউদাদার সেই জায়গায় চোখ রাখল। বাক্সকলের

লোকটা বিবেচক, গলা উঁচু করে ভিতরবাড়ির দিকে চেয়ে প্রবোধ দিচ্ছে : এদের সব হয়ে যাক—কল আমি ভিতরে নিয়ে যাব মায়েরা। এসেছি যখন, সকলকে দেখাব। যতবার দেখতে চান, দেখিয়ে যাব।

সুর ধরল সঙ্গে সঙ্গে : হাওড়ার পুল দেখ, খিদিরপুরের জাহাজ দেখ, পরেশনাথের বাগান দেখ, ফাঁসির ক্ষুদিরামকে দেখ, সুরেনবাবুর সভা দেখ, লাটসাহেবের বাড়ি দেখ—

ক্ষুদিরামের গল্প দেবনাথ বলেছিলেন—ধ্বক করে তাই কমলের মনে এসে গেল। আর আহ্লাদ বৈরাগী গেয়েছিলেন : একবার বিদায় দাও মা—। ঐ গান পরে কমল অন্যের মুখেও শুনেছে, নিজেও একটু-আধটু গায় কখনো-সখনো। ক্ষুদিরামকে জানে সে, আজকে তার চেহারা দেখল : কোঁকড়া-চুল রোগা রোগা চেহারার খাসা ছেলেটি। একরকম মন্ত্র পড়ে নাকি অদৃশ্য হওয়া যায়। কমল যেন তাই হয়েছে! প্রহ্লাদ মাস্টারমশায়ের জোড়া-বেত হাতে না নিয়ে অদৃশ্য-কমল লাটসাহেবের বাড়ি ঢুকে গেছে। সপাং সপাং করে বেত মারছে—'বাবা রে' 'মলাম রে' করছে লাটসাহেব। অথচ কে মারছে দেখা যায় না। বন্দেমাতরম্ বলার জন্য বেত মেরেছিলে—তারই শোধ তুলে আসবে, কমলকে কেউ যদি অদৃশ্য হবার মন্ত্রটা শিখিয়ে দেয়।

লোকটা বলে চলেছে, লাটসাহেবের বাড়ি দেখ, কালীঘাটের মন্দির দেখ, জগন্নাথের রথ দেখ, আগ্রার তাজমহল দেখ, গয়া দেখ, কাশী দেখ—

উমাসুন্দরী তারিফ করে বলেন, গয়া কাশী শ্রীক্ষেত্র সমস্ত দেখাচ্ছ তুমি ?

লোকটা হাসিতে দাঁত বের করে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত দেখতে পাচ্ছেন। খরচা একটা পয়সা মাত্তোর—

কমলের ছবি দেখা হয়ে গেছে, বাক্সকলটা এবারে ঠাহর করে করে দেখছে। আয়তনে এত ছোট—এর মধ্যে লাটসাহেবের বাড়ি হাওড়ার পুল গয়া কাশী ইত্যাদি বড় বড় জিনিস অবলীলাক্রমে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি—তারও চেয়ে তো অনেক বেশি তাজ্জব।

বর্ষার সময়টা বাড়ির উঠানে জঙ্গল ঢেকে ওঠে, একেবারেই সাফসাফাই লেপাপোঁছার ধুম পড়ে গেল। আগাছা ও ঘাসবন উপড়ে ফেলছে, একটা দুর্বাঘাস অবধি থাকতে দিচ্ছে না। উঁচু জায়গা চেঁচে চৌরস করল, গর্ত থাকলে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিল। তারপরে গোবরমাটি লেপে পরিপাটি করে নিকায়। একদিন দু'দিন নিকিয়ে হয় না, নিত্যিদিন। ঝাঁটপাট দিচ্ছে, ধুলোর কণিকাও থাকতে দেবে না এমনি যেন পণ। ঝকঝক তকতক করছে।

ইচ্ছাসুখে উঠোনে এখন গড়াগড়ি খেতে ইচ্ছে করে। শুধু এই পুববাড়ি বলে নয়, যে বাড়ি পা ফেলছ এইরকম। গৃহবাড়ি ঠাকুরদেবতার মন্দির বানিয়ে তুলেছে।

কে যেন বলছিল কথাটা। উমাসুন্দরী অমনি বলে উঠলেন, মন্দিরই তো। মা-লক্ষ্মী মাঠ থেকে বাস্তুর উপর উঠছেন, মন্দির ছাড়া তাঁকে কি যেখানে সেখানে রাখা যায় ?

এক-আধ বাড়ি কেবল বাদ—ধনসম্পত্তি যা-ই থাকুক, অভাগা তারা। যেমন মস্তার-মা'র বাড়ি। এক-কাঠা ধানজমি নেই, এক আঁটিও ধান ওঠে না। প্রজা-বিলি গাঁতিজমি আছে কিছু, আদায়পত্র করে সংসার মোটামুটি চলে যায়। তাহলেও অঘ্রাণ-পৌষে বুড়ি ও তাঁর বিধবা মেয়ে মস্তার ভাল ঠেকে না, প্রাণ হু-হু করে ফাঁকা উঠানের দিকে তাকিয়ে।

ধান পাকতে লেগেছে। কাটাও শুরু হয়ে গেল। লক্ষ্মীঠাকরুন বিল ছেড়ে গৃহস্থর উঠোনে উঠে গুটি গুটি আসন নিচ্ছেন। গোড়ায় অল্পসল্প—এই পাঁচ-দশ আঁটি করে। ক্রমশ যত পাকছে, কাটারও জোর বাড়ছে তত‌ই। জনমজুরের দুনো দর। আরও উঠবে—তেদুনা, এমন কি টাকা অবধি উঠে যায় কোন কোন বারের মরশুমে। ধান কেটে কেটে আঁটি বাঁধে। ঘোর হয়ে গিয়ে যখন আর নজর চলে না, সেই সব আঁটি উঠানে বয়ে বয়ে এনে ফেলে। বোঝার ভারে বাঁকের নাচুনি—মজা লাগে কমলের দেখতে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস জলরাজ্যে কাটিয়ে এসে আঁটির গায়ে সোঁদা-সোঁদা গন্ধ—শুফ-শুফ করে কমল নাক টানে, গন্ধ নিতে বেশ ভাল লাগে।

দেখতে দেখতে সব ধান পেকে গেল। তেপান্তরের বিলে সবুজের একটা গোছাও পাবে না কোন দিকে কোথাও। সোনা চতুর্দিকে—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে নজর যত দূর চলে, পাকা ধানের সোনা ঢেলে দিয়েছে। সারাটা দিন, এবং চাঁদনি রাত হলে রাত্রিবেলাতে চাষা ক্ষেতে পড়ে আছে—ভাতের গ্রাসটা, মুখে দেবার ফুরসত পায় না। আঁটি বওয়া বাঁকে কুলোয় না আর এখন, গরুর-গাড়ি বোঝাই হয়ে আসে। মাঝবিলের কাদা-জলে গাড়ির চাকা বসে যায়, গরুতে পারে না বলে মানুষেই টেনে নিয়ে আসে তখন। বোঝার ভারে চাকা-দুটো কাঁচ-কোঁচ কান্নার সুর তুলে বাড়ি এসে ঢোকে। আঁটি উঠোনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল। গাড়ি খালাস, কমলও মনে মনে সোয়াস্তি পেয়ে যায়।

বারান্দার চারা-কাঁঠালগাছ ঠেসান দিয়ে সে একনজরে দেখছে। একলা কমল। পুঁটির হাত ধরে টেনেছিল :.আখসে দিদি। 'দিদি' বলা সত্ত্বেও পুঁটি ভেজেনি। তাচ্ছিল্য করে বলেছিল, আঁটি এনে ফেলছে দেখব কি রে তার? সে তো আর ছেলেমানুষ নয় কমল কিংবা টুকটুকির মতন—তার বলে কত

কাজ। প্রদীপের সামনে পা ছড়িয়ে পুতুলের বাক্স খুলে বসেছে—ছেলে-মেয়েগুলো শোবে এবার। মাথার-বালিশ পাশের-বালিশ নিমিকে দিয়ে বানিয়ে নিয়েছে। অল্প অল্প শীত পড়েছে, গায়ের উপর চাদর চাপা দিতে হবে—নয়তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে পুতুলদের। পুঁটির এখন কত কাজ—বসে বসে তার কি ধানের পালা-দেওয়া দেখার সময় আছে।

কমল দেখছে মগ্ন হয়ে। অন্ধকার—আবছা-আবছা। জোনাকি উড়ছে, উঠানময় চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। আঁটি এনে এনে ফেললেই হল না—আঁটির উপর আঁটি সাজিয়ে পালা দিচ্ছে। যত রাত্রিই হোক, পালা সাজানো শেষ করে বাড়ি যাবে। ভবনাথ কোন দিক দিয়ে এসে পড়লেন। হাঁক পেড়ে বলছেন, শোন হে, কী ক্ষেতের আলাদা পালা। এর আঁটির সঙ্গে ওর আঁটি মিশে না যায়। কার ক্ষেতের কি ফলন, পৃথক পৃথক হিসেব থাকবে। গোলে-হরিবোল হবে হবে না। ফলনের পরিচায়তে—ফল বুঝে সামনে বছরের বিলিব্যবস্থা।

হচ্ছে তাই। একসঙ্গে তিন-চারটে পালা এদিকে-সেদিকে। পালা খানিকটা উঁচু হলে উপরে গিয়ে উঠছে একজনে, আর একজনে নিচে থেকে আঁটি তুলে দিচ্ছে। গোল করে সাজিয়ে যাচ্ছে উপরের সেই মানুষ। ক্ষেতের নামে পালা—বড়বন্দের পালা, তেলির চকের পালা, নাজিরবন্দের পালা ইত্যাদি। বিলের ভিতর পুববাড়ির যেসব ধান-জমি, শুনে শুনে কমলের অনেকগুলো মুখস্থ হয়ে গেল: বড়বন্দ, ছোটবন্দ, তেলির চক, মণির চক, বোড়লের চক, নাজিরবন্দ, মেছের ভুঁই আরও কত। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়েছে। মানুষ-গুলোর মুখ দেখা যায় না আর তেমন। মানুষই নয় যেন, একপাল দত্যিদানো উঠানের উপর নেমে এসেছে।

এরই মধ্যে শিশুবর কলকে টানতে টানতে এলো। হাত বাড়িয়ে কলকে একজনের হাতে দিয়ে বলে, খাও। টানছে লোকটা ফক-ফক করে—আরও সব এসে ঘিরে ধরেছে, চারিদিকে হাত বাড়ানো। দু-চারবার টেনে লোকটা অন্য হাতে কলকে দিয়ে দেয়। সে-লোক দিল আবার অন্য হাতে। কলকে টেনে কিছু চাঙ্গা হয়ে তক্ষুনি আবার কাজে লেগে যায়। কাজ সারা করে তারপর বাড়ি যাওয়া। সকাল হতে না হতে আবার ক্ষেতে গিয়ে পড়বে। চাষার এখন নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই।

কমলের হাই উঠছে, জোর করে তবু বসে ছিল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তরঙ্গিণী দক্ষিণের-ঘরে যাচ্ছেন, দেখে তিনি শিউরে উঠলেন: অ্যাঁ খোকন, তুই এখানে? আমি জানি, ঘরের মধ্যে পুঁটির সঙ্গে আছে। ঘরে আয়, ঘরে আয়। শুয়ে পড়্ এবারে, রাত হয়েছে।

ঘরে গিয়ে কমল শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে খসখসানি আওয়াজ পায়, মাঝে-মধ্যে কথা এক-আধটা। উঠানে কাজ চলছে। সকালবেলা বাইরে এসে তো অবাক। নিচু পালা দেখে শুয়েছিল, মাথার উপর আঁটি উঠে উঠে উঠে তারা অনেক উঁচু হয়ে গেছে। নতুন পালাও উঠেছে। পুঁটিকে আঙুল দেখিয়ে গম্ভীর সুরে কমল বলে, সমতলভূমির উপর রাত্রের মধ্যে কত পাহাড় উঠে গেছে, দেখ।

কায়দা পেলেই কমল আজকাল ভূগোলের ভাষায় কথা বলে। প্রহ্লাদের ইস্কুলে যাওয়া এমনি-এমনি নয়।

॥ তেইশ ॥

আরও ক'দিন গেল। উঠানের জায়গা দিন-কে দিন আঁটো হয়ে গোলকধাঁধা এখন। বাড়ি ঢুকে সাঁ করে দাওয়ায় উঠে পড়বে—তা পথ পাবে কোথা? পালা বেড় দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠতে হয়। অতিথিকুটুম্ব এসে তাল রাখতে পারে না—এ-ঘরে যেতে ও-ঘরে উঠে পড়ে। আমার মা-লক্ষ্মী যেহেতু উঠোনের উপর—জুতো পায়ে কেউ এদিকে না আসে। বড়রা তো নয়ই—বাচ্চাদেরও পায়ে জুতো আঁটা থাকলে হাঁটা নিষেধ, কোলে তুলে নিয়ে যাও। পূববাড়ি এই—নতুনবাড়ি পশ্চিমবাড়ি পালের-বাড়ি উত্তরবাড়ি সর্বত্র এই। মণ্ডার-মা'র মতন ক'জনই বা সোনাখড়ি গাঁয়ের মধ্যে!

খেলার বড্ড জুত। দিনমানে তো খেলেই, রাতের বেলাও ছাড়ে না—চাঁদনি রাত যদি পেয়ে যায়। সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলেপেলেরা এসে জোটে—কেউ চোর হয়, কেউ বা চৌকিদার—পালা বেড় দিয়ে ছুটে বেড়ায়। চোর চোর খেলা না বলে শিয়ালঘুল্লি বলাই ঠিক। চালাক-পণ্ডিত শিয়াল—মাথায় তার নানান ফন্দি-ফিকির, তাড়া খেয়ে বনের গাছগাছালির মধ্যে পিছলে পিছলে বেড়ায়। এদের খেলাও তাই—এই পালা থেকে ও-পালার আড়ালে ঝুপ করে বসে পড়ছে।

উমাসুন্দরী বকাবকি লাগিয়েছেন: হ্যাদড়া-হেবড়ি তোরা সব বাড়ি চলে যা। নতুন হিম লাগাস নে, অসুখ করবে। পুঁটি খোকন তোরা ঘরে আয়—

বড়গিন্নির কথা কেউ কানে নেয় না। ক'টা দিন তো মোটে—তার

পরেই একটা একটা করে পালা ভাঙবে, পালা ভেঙে মলন মলবে। সারা উঠোন ফাঁকা—আগে যেমনটা ছিল অবিকল তাই।

কত ইঁদুর যে জুটেছে—গর্ত খুঁড়ে উঠোন চালা-চালা করছে। আঁটি থেকে ধান কুটুর-কুটুর করে দাঁতে কেটে গর্তের ভাণ্ডারে তোলে, ধীরেসুস্থে তারপর ভিতরের চাল খেয়ে চিটে করে রাখে।

ভবনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ক্ষেতেলদের তাগিদ দেন: কষ্টের ফসল সবই যে ইঁদুরের গর্তে চলে গেল। মলে ডলে ফেল্ বাপসকল—তোদের অংশ মেপেজুপে ঘরে নিয়ে যা, আমাদেরটা গোলায় তুলে ফেলি।

সেটা জরুরি বটে, কিন্তু ক্ষেতেলেরই অবসর কই? ধান দাওয়া, আঁটি খলেনে তোলা, বয়ে বয়ে গৃহস্থের উঠানে আনা, কলাই-মুসুরি তোলা, এ-সবের উপরে আছে গাছ-ম'ল—খেজুরগাছ কেটে ভাঁড় পাতা, রস পাড়া ইত্যাদি। সারা দিনমান এবং প্রহর রাত অবধি খেটেও কুলিয়ে উঠতে পারেন না। তা সত্ত্বেও ধান-মলাটা ঐ সঙ্গে ধরতে হবে, ফেলে রাখলে আর চলে না। বিস্তর ধান বরবাদ হচ্ছে।

হাত তিনেক মাপের চাঁচা ছোলা টুকরো বাঁশ—যাকে মলে মেইকাঠ—ঘিরে খুব ভাল করে আবার লেপা-পোঁছা হল। সিঁদুরটুকু পড়লে কণিকা হিসাব করে তুলে নেওয়া চলে। চার গরু নিয়ে মলন মলতে এসেছে। ধানের আঁটি খুলে খুলে মেইকাঠ ঘিরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। এক দড়িতে পাশাপাশি চার-গরু জুড়ে দিল—দড়ির প্রান্তে মেইকাঠে বাঁধা। মেইকাঠের চতুর্দিকে গরুরা ঘোরে, খুরের চাপে পোয়াল থেকে ধান খুলে খুলে পড়ছে। গরুর মুখে ঠুলি-আঁটা—নয়তো চলার সময় ধানসুদ্ধ পোয়াল খেয়ে দফা সারবে। তা-ও ছাড়ে নাকি—ঠুলি-ঢাকা মুখ পোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে জিভ বের করে এক-আধ গোছা টেনে নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নড়ির ঘা পড়ে পিঠের উপর। লেজ মলে হেই-হেই আওয়াজ তুলে গরু ছুটিয়ে দেয়। ছুটছে তবু গ্রাস ফেলে না—চিবোতে চিবোতে দৌড়য়।

শীত পড়েছে বেশ। কমল আর পুঁটি ভাই-বোন মুড়ি-সুড়ি দিয়ে দাওয়ায় বসে মলন-মলা দেখছে। আগ-বাঁশের মাথায় সামান্য কঞ্চি রেখে আঁকুশি বানিয়ে নিয়েছে—মলনের মধ্যে আঁকুশি ঢুকিয়ে উল্টেপাল্টে নিচ্ছে। ধান নিচে পড়ে গিয়ে উপরটায় এখন শুধুমাত্র পোয়াল। গরু এবারে মেইকাঠ থেকে খুলে গোয়ালের খুঁটির সঙ্গে বাঁধল, ঠুলি খুলে দিয়ে চাট্টি চাট্টি পোয়াল দিল মুখে। আহা, অনেক খেটেছে, খেটে কাজ তুলে দিয়েছে—খাবে বইকি এবার। আঁকুশি দিয়ে যাবতীয় পোয়াল একদিকে সরিয়ে গাদা

করে ফেলল। পড়ে আছে গোবর-নিকানো পরিশুদ্ধ উঠোনে উপর মা-লক্ষ্মীর দেওয়া নতুন ধান। ঝিকমিক করছে। ভক্তিযুক্ত হয়ে উমাসুন্দরী কুড়িয়ে এক জায়গায় করলেন। জুতো পায়ে ইদিকে কেন রে—যা, যা—। বড়রা বোঝে, তারা আসবে না—পশ্চিমবাড়ির বাচ্চা একটাকে তাড়া দিয়ে উঠলেন। কাঁচাধান ঝট করে গোলায় তোলা যাবে না—কাল দিনমানে উঠোনে মেলে দিয়ে পুরো খাইয়ে নিতে হবে। একদিনের একটা রোদে যদি না হয়, পরশু দিনও। শিশুবরকে ডেকে লাগিয়ে দিলেন, কুলোয় তুলে তুলে ধান উড়োক। চিটে একেবারে সমস্ত বাদ দেবে না—অল্পসল্প থাকবে। চিটের মিশাল থাকলে ধানটা থাকে ভাল।

মলন-মলা এখন এক খেলা হয়ে গেছে কমলদের। কমল যতীনরা সব গরু, পুঁটি চাষা। মেইকাঠ কমল বাঁ-হাতে জড়িয়ে ধরেছে, ডান-হাতটা ধরল যতীন। যতীনের ডান-হাত পটলা এসে ধরে, পটলার ডান-হাত নিমু। হেঠ্ হেঠ্ করছে পুঁটি, নড়ি উঁচিয়ে তাড়া দিচ্ছে—গরুরূপী এরা চারজন দৌড়চ্ছে ততই। মেইকাঠ বেড় দিয়ে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কেমন হয়ে যায়—চারি দিককার ঘরবাড়ি গাছগাছালিও ঘুরছে, মনে হয়। ধপ করে বসে পড়ল গরুরা। পুঁটি বলল, ঘুলি লেগেছে। জল খেয়ে নে এট্টু, সেরে যাবে। কাঁচা সুপুরি খেয়ে দেখ্ তাতেও ঠিক এমনি হবে।

ধান তুলে-পেড়ে রাখা এর পর উঠোনের গোলায়, ঘরের ভিতরের আউড়িতে কুনকে মেপে মেপে ধান তোলা হচ্ছে—ভবনাথ নিজে সামনে দাঁড়িয়ে কোন জমির দরুন কত ধান উঠল, খাতায় টুকে নিচ্ছেন। ধানের নামেই তো প্রাণ কেড়ে নেয় : কাজলা, অগ্নিশাল, নারিকেলফুল, গজমুক্তা, সীতাশাল, গিন্নি-পাগলা, শিবজটা, সোনাখড়কে, সূর্যমণি, পায়রাউড়ি, বাদশাপছন্দ। আরও কত। মিহিজাতের ধান লক্ষ্মীপুজো ধান খয়েধান—এই সমস্ত আলাদা আলাদা থাকবে, মিলেমিশে গোলে-হরিবোল হলে হবে না। বীরপালা-কুমড়োগোড় নামক মোটা ধানটারই ফলন বেশি—বারোমাসের নিত্যিদিনের খোরাকি ঐ ধানে চকের-খাহিন্দার জন-কিষাণ যত আছে, সরু চালের ফুরফুরে ভাতে তাদের ঘোর আপত্তি : ও দেখতে শুনতেই ভাল—পেটে থাকে না, পলকে হজম হয়ে গিয়ে পেট চোঁ-চোঁ করে। এবং আকণ্ঠ গিলেও পেটে কিছুমাত্র ভর পাওয়া যায় না। দূর দূর—ও ভাত শহুরে বাবুভেয়েরা এসে খাবেন, এক গ্রাস মুখে ফেলেই যাঁরা অম্বলের ঢেকুর তোলেন। সরু ধান আউড়িতে উঠুক—কুটুম্ব এলে কিম্বা ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারে কালেভদ্রে বেরুবে। খয়ে-ধান, যা ফুটিয়ে খই হবে, তা-ও আউড়িতে। আর থাকবে লক্ষ্মীপুজোর

ধান আউড়ির মধ্যে কলসি ও হাঁড়া বোঝাই হয়ে। কুমির-ডাঙা বলে একটু-করো জমি আছে ভুবন ঘোড়লের হেপাজতে। নিষ্ঠাবান চাষী ভুবোন—তার ধানই বরাবর মা-লক্ষ্মীর নামে থাকে। রোদে নিয়ে ধরলে সোনার মতন ঝিক্‌মিক করে সে ধান। একটি কালো ধান নেই তার মধ্যে—কালো ধান থাকলে পুজো হয় না। লক্ষ্মীপুজো পুববাড়িতে তিনবার—পৌষমাসে পৌষলক্ষ্মী, আশ্বিনের কোজাগরী এবং শ্যামাপুজোর দিন শ্যামাপুজো নিশি-রাত্তিরে—সন্ধ্যাবেলা আগেভাগে জাঁকিয়ে লক্ষ্মীপুজো হয়ে যায়।

হিরণ্ময় বলল, ক্ষেতের ধান বাড়ি উঠছে। ভেনে-কুটে আজই চাট্টি চাল বানিয়ে ফেল। নতুন চালের ফ্যানসা ভাত চাই কাল।

সকালবেলা বাড়ির লোকে ফ্যানসা ভাত খায়, প্রবীণেরা শুধু খায়। নতুন চালের ফ্যানসা-ভাত অতি উপাদেয়—ভাত এবং তৎ-সহ বীচেকলা-ভাতে। হিরু তাই চাচ্ছে। সামান্য কথা—বিশেষ করে বাড়ি ছেড়ে যে ছেলে বিদেশ চাকরি করতে যাচ্ছে, তারই একটা আবদার। তা বলে কাল কেমন করে হবে—'ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' হয় কি কখনো?

উমাসুন্দরী বলেন, নবান্ন হয়নি যে বাবা। ঠাকুরদেবতারা খেলেন না—আগেভাগে তোরা খাবি কি করে?

হিরণ্ময় বলল, সামনের বিষ্যুদের হাট অবধি দেখব। ঠাকুরদেবতা তার মধ্যে খেলেন তো ভাল—না খেলে নাচার আমি। একটা দিনও আর সবুর মানব না।

ভবনাথের তিন ছেলের মধ্যে হিরু সৃষ্টিছাড়া—ঠাকুরদেবতা নিয়ে তাচ্ছিল্যের কথা তার মুখে বাধে না। কম বয়সে কলকাতায় থেকে এই রকম হয়েছে। লেখাপড়া শিখিয়ে বিদ্বান বানাবেন, এই মতলবে দেবনাথ তাকে নিজের কাছে নিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।—লেখাপড়া লবডঙ্কা। দেবনাথের ভাল গুণ একটাও পায় নি—জেদটা পেয়েছে। আর পেয়েছে ব্রহ্মজ্ঞানীর মতন আলাপ-আচরণ।

হিরু জোর দিয়ে আবার বলে, তোমরা কেউ রেঁধেবেড়ে না দিতে চাও—বলে যাচ্ছি, উঠোনের উপর ঐ উনুনে নিজে আমি চাল ফুটিয়ে খাব। ঠেকিও তোমরা।

বলে জবাবের অপেক্ষা না রেখে হনহন করে বেরিয়ে পড়ল।

উমাসুন্দরী ভয় পেয়ে গেলেন। একরোখা ছেলে—যা বলল ঠিক ঠিক তাই করবে। ভবনাথের সঙ্গে এই নিয়ে লেগে যাওয়া বিচিত্র নয়। অতএব আহিন্দারকে ডেকে উমাসুন্দরী চুপি চুপি বলেন, সর্বকর্ম ফেলে তুই বাবা

বড়েজার পুরুতঠাকুর মশায়ের বাড়ি চলে যা। এখন না, সন্ধ্যের পর যাস—ঠাকুরমশায়কে বাড়ি পেয়ে যাবি। মঙ্গলবার এসে অতি অবশ্য যেন নবান্নের কাজ করে দিয়ে যান। মঙ্গলবার নিতান্ত না পেরে ওঠেন তো বুধবার—তার ওদিকে নয়। কর্তার কানে না যায় দেখিস—কোথায় যাচ্ছিস, জিজ্ঞাসা করলে যা হোক বলে কাটান দিয়ে দিবি।

নতুন ধান চাট্টি রোয়াকের উপর মেলে দেওয়া হল। বাড়ির আশেপাশে কয়েকটি খেজুরগাছ—কুঞ্জ গাছি সেগুলো ভাগে কাটছে। চার ভাঁড় রস দিয়েছে সে আজ, রস জালিয়ে গুড় বানানো হচ্ছে ঘরের উনুনে। সন্ধ্যাবেলা বিনো আর অলকা-বউ ননদ-ভাজে ঢেঁকিশালে গেল—ক্ষেতের নতুন ধান এখন এই লোটের মুখে পড়ল। চ্যা-কুচকুচ চ্যা-কুচকুচ—অলকা পাড় দিচ্ছে, বিনো এলে দিচ্ছে। কতক্ষণের কাজ! দেখতে দেখতে হয়ে গেল। সেই নতুন চাল শিলে বেটে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে রাখল। নবান্নের উপকরণ।

পুরুত মঙ্গলবারেই আসবেন—বড়েজা থেকে অটল খবর নিয়ে এলো। সকাল সকাল কাজ সেরে দিয়ে চলে যাবেন—তাঁর নিজ গ্রামেই আরও দু-বাড়ি নবান্ন আছে।

রান্নাঘরের কানাচে আদার ঝাড়। ঝাড়ের গোড়ায় ফাটলে এখন নতুন আদা নেমেছে। বড়গিন্নী ও তরঙ্গিণী টেমি ধরে কিছু আদা তুলে আনলেন। চালের গুঁড়োয় আদায় মিশাল লাগে।

আয়োজন সারা। সকালে কাপড়চোপড় ছেড়ে তরঙ্গিণী শুদ্ধাচারে গোটা দুই ঝুনোনারকেল কুরিয়ে ফেললেন। ঠোঁটেকলা ঘরেই আছে। নতুন চালের গুঁড়ো, নতুন গুড়, নতুন আদা, নারকেলকোরা এবং ঠোঁটেকলায় আচ্ছা করে চটকে মাখা হল। পাতলা করার জন্য জলের আবশ্যক—এমনি জল চলবে না ডাবের জল। দেবভোগ্য উপাদেয় বস্তু। তা বলে এখন জিভে ঠেকানোর জো নেই। পুজোআচ্চা হয়ে যাক—পরে।

পুজো অধিক-কিছু নয়। পুরুত এসে মন্তোর পড়ে নিবেদন করলেন—বাস্তুদেবতা পিতৃপুরুষ গুরুপুরুতের নামে নামে দেওয়া হল। গরুবাছুরের মুখে দেওয়া হল। তারপর কাকেদের মুখে। সকলের হয়ে গেল—পরিজনদের মুখে পড়তে আর বাধা নেই। সামান্য সময়ের ব্যাপার। দক্ষিণা ও নৈবেদ্য নিয়ে পুরুতঠাকুর বাড়িমুখো হন হন করে ছুটলেন।

হিরণ্ময় খুশি হয়ে তরঙ্গিণীকে বলল, কাল এই চালের ফ্যানসা-ভাত কোরো খুড়িমা। বাঁচেকলা-ভাত মেটেআলু-ভাতে আর একটু সর-বাটা ঘি সেই সঙ্গে। খাওয়াটা যা হবে।

যা বলছে হবে তাই। বাড়িছাড়া গ্রামছাড়া অঞ্চল-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে সে। দেবনাথ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—বাদাবনে চলে যাচ্ছে, বনকরের কাজে ঢুকবে।

॥ চব্বিশ ॥

বড়ি দেওয়া কাল। আয়োজন সন্ধ্যেরাত থেকেই। রান্নাঘরের চালের উপর পাকা পাকা জাতকুমড়ো চুন-মাখানো চেহারা নিয়ে পড়ে আছে—একটা নামিয়ে এনে তাড়াতাড়ি চিরে বিনো হাতকুরুনি দিয়ে কোরাচ্ছে। ছাই-গাদার উপরের প্রকাণ্ড এক মানকচু তোলা হয়েছে। তলার দিকটা খাওয়া যায় না, গাল দুরে—বড়ির মধ্যে চালিয়ে দেওয়া ভাল। কচুর এঠে তরঙ্গিণী কুচি কুচি করে কাটছেন। সকালবেলা এক সঙ্গে সব ঢেঁকিতে কোটা হবে।

টেমি জলছে কাঠের দেলকোর উপর, গল-গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। কমল ওত পেতে আছে—কুমড়োর শাঁস সবখানি বেরিয়ে আসার পর খোলা ছুটো নিয়ে নেবে। খাসা তু'খানা নৌকো।

পুঁটি বলে, একটা কিন্তু আমার। মেয়ে শ্বশুড়বাড়ি পাঠাতে পারছিনে নৌকোর অভাবে।

কমল বলে, আমার নৌকো ভাড়া করবি—আমি পৌঁছে দিয়ে আসব। নিজের নৌকো লাগছে কিসে?

বিনো কমলের দিকে মুখ তুলে বলল, তুই তোকারি করছিস খোকন, দিদি হয় না? বড় হয়ে গেছিস এখন, লোকে নিন্দে করবে।

তা বড় বইকি—পাঠশালার দ্বিতীয় মানে পড়ে কমল, তার উপর কাকা হয়ে গেছে। অলক-বউয়ের মেয়ে হয়েছে—টুকটুকি নাম। আরও কিছু বড় হয়েই তো সে, কাকাবাবু বলে ডাকবে কমলকে। দেবনাথ যেমন হিরু-মিনিদের কাকা।

দরদালানে মিমি হামানদিস্তায় ঠনঠন করে পান সেঁচছে ভবনাথের জন্য। জামরুলগাছটা জোনাকিতে ভরে গেছে—আরও কত চারিদিকে ঝিকমিকিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। অলকার মিহিগলায় ঘুমপাড়ানি-গান আসে পশ্চিমের-ঘর থেকে: ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ি এসো, আমার বাড়ি পিঁড়ি নেই টুকটুকির চোখে বোসো—

ঘুমুতে টুকটুকির বয়ে গেছে। অলকা অবিরত থাবা দিচ্ছে চোখের উপর।

যখন থাবা পড়ে পাতা বুজে যায়, হাত ওঠানোর সঙ্গে সঙ্গে পিটপিট করে আবার সে তাকিয়ে পড়ে।

এই হঁদোল, দেখ টুকুরানী বজ্জাতি করছে—ঘুমুচ্ছে না। ধরে নিয়ে যাও। এই যে এসে গেছে হঁদোল—

এবং হঁদোলের উপস্থিতির প্রমাণস্বরূপ অলকা গলা চেপে আওয়াজ বের করে—হঁদোলই ডাক ছাড়ছে যেন। মেয়ে ভয় পাবে কি, উল্টো উৎপত্তি। যেটুকু ঘুমের আবিল এসেছিল, সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে টুকটুকিও দেখি মায়ের স্বরের অনুকরণ করে। ফিক করে অলকা হেসে পড়ল: নাঃ, তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই। বজ্জাত মেয়ে কোথাকার। দু'বছর বয়সে এই, বড় হয়ে তুমি তো সবসুদ্ধ চোখে তুলে নাচাবে—

ডিবে ভরতি সেঁচা-পান ভবনাথের শয্যার পাশে রেখে নিমি বারান্দায় এলো। অলকাকে ডাকছে: ঘুম পাড়াতে গিয়ে তুমিও ঘুমুলে নাকি বউদি? ডালে জল দিয়ে যাবে, এসো।

এই ডাল ভেজানোর ব্যাপারে এক-একজন বড় অপয়া। অলকা-বউও বোধ-হয় তাই। গেল-বছর পরখ হয়ে গেছে। রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে সারাটা দিন, দেখেশুনে বউকে দিয়ে ডাল ভেজানো হল। পরের দিন আকাশ মুখ পুড়িয়ে থাকল, বড়ি শুকাল না। সন্ধ্যেবেলা ফোঁটা ফোঁটা পড়তে লাগল, তার পরের দিন বৃষ্টি দস্তুরমতো। ফাল্গুনে এই কাণ্ড। বড়ির কাই সামান্য কিছু বড়া ভেজে খেয়ে বাকি সব ফেলে দিতে হল। আরও একদিন এমনি নাকি হয়েছিল।

ব্যাপারটা সেই থেকে ঠাট্টার বিষয় দাঁড়িয়েছে। বিষম খরা যাচ্ছে—খাল-বিল শুকনো, মাটি ফেটে চৌচির, 'জল' 'জল' করছে লোকে চাতক-পাখির মতো, নিমি তখন টিপ্পনী কাটে: আমাদের বউদি ইচ্ছে করলেই হয়। চাট্টি ঠিকরির-ডাল ভেঙে বউদিকে দিয়ে ভিজিয়ে দাও। হুড়হুড় করে বৃষ্টি নামবে।

লজ্জায় অলকা আর সে-দিগরে নেই। আজ অলকা নিমিকে বলল, বড় ফুক্‌ড়ি তোমার ঠাকুরঝি। আজ তুমি জল ঢালবে। তোমারও পরখ হোক।

নির্মলার মুখ চকিতে কালো হয়ে গেল। বলে, পরখের কি আছে? আমি তো হেরেই আছি। সকল দিক দিয়ে আমি পোড়াকপালি। আমায় হারিয়ে দিয়ে আর কী লাভ বলো।

অলকা মরমে মরে যায়। হচ্ছে হালকা হাসি-তামাসা, তার মধ্যে বড় ব্যথার জিনিস টেনে আনে কেন? এই বড় দোষ ঠাকুরঝির—সকলের পিছনে লাগবে, তাকে ছুঁয়ে কিছু বলবার জো নেই।

তরঙ্গিণী মীমাংসা করে দিলেন : ঠেলাঠেলি কোরো না তোমরা। কারো জল ঢালতে হবে না, জল আমি ঢালছি। সুনাম হোক দুর্নাম হোক, আমার হবে।

খাওয়াদাওয়ার রাতে ডালে তিনি জল দিলেন। ভোরে বড়ি কোটা, রোদ্দুর উঠলে বড়ি দেওয়া।

চঞ্চলার মৃত্যু থেকে তরঙ্গিণীর ঘুম একেবারে কমে গেছে। তার উপর কাজের দায় থাকলে আর রক্ষে নেই। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, পাখপাখালি ডেকে উঠছে এক-একবার। রাত পোহালে বড়ি কোটা—তরঙ্গিণীর মাথায় গেঁথে আছে। দরজা খুলে বাইরে এলেন তিনি। ওমা, মাথার ওপরে চাঁদ, রাত ঝিমঝিম করছে। আবার দরজা দিলেন।

বার দুই-তিন এমনি। পোড়া রাত আর পোহাতে চায় না। পশ্চিমের-ঘরের কাছে গিয়ে অলকা-বউকে ডাকাডাকি করছেন। ওঠো বড়বউমা। বড়ি দেওয়া আছে না? ছড়াঝাঁটিগুলো সেরে ফেলি, এসো এইবার।

খসর খসর আওয়াজে উঠোনে মুড়োঝাঁটা পড়ছে। ঝাঁটপাটের পর গোবর জলের ছড়া। বা.স ঘরবাড়ি পরিশুদ্ধ হয়ে থাকবে মানুষজন উঠে পড়ার আগে। চোখ মুছতে মুছতে অলকাও উঠে পড়েছে, গোবরজল গুলে ছড়াৎ-ছড়াৎ করে উঠোনময় ছড়াচ্ছে।

উত্তর-দক্ষিণে লম্বা উঠোন দুই শরিকের মধ্যে ভাগাভাগি। বেড়া নেই, একটা নালি উঠোনের ঠিক মাঝখান দিয়ে। বৃষ্টির জল ঐ পথে বেরিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে পড়ে। উত্তরে অংশ বংশীধর ঘোষের। বংশীধরের ছোট ছেলে সিধু নতুনবাড়ি আড্ডা সেরে রাতদুপুরে বাড়ি ফেরে। বাড়ির লোকে ঘোরে ঘুমোয় তখন। রান্নাঘরে ভাত ঢাকা থাকে, খেয়ে দেয়ে—উত্তরের-ঘরের দাওয়ায় খাট পাতা রয়েছে—খাটের বিছানায় সে শুয়ে পড়ে। নিত্যিদিনের এই নিয়ম। রোদে চারিদিক ভরে যায়, গৃহস্থালী কাজকর্ম পুরোদমে চলে। সিধু কিন্তু নিঃসাড়ে চোখ বুঁজে পড়ে আছে তখনো।

এসবে কিছু নয়, কিন্তু ঝাঁটার আওয়াজটা সিধুর কাছে অসহ্য— হয়তো বা শরিকি উঠোনের ঝাঁটা বলেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে কলহ করে : কী লাগালে ছোট-খুড়িমা, অর্ধেক রাত্রে এখনই উঠে পড়েছ? তোমার চোখে ঘুম নেই, তার জন্যে বাড়িসুদ্ধ আমরা যে না ঘুমিয়ে মরি।

পুবের-কোঠা থেকে ভবনাথের ডাক এলো : মনু—

তরঙ্গিণী উঠে গেছেন, আর অভ্যাস বশে কমলেরও অমনি ঘুম ভেঙেছে।

জেঠামশায়ের 'মনু' ডাকের জন্য উসখুস করেছিল সে, কাঁথা ফেলে তড়াক করে উঠে একছুটে পুবের-কোঠায় চলে যায়। একেবারে ভবনাথের লেপের মধ্যে।

বুড়ো হয়ে ভবনাথ শীতকাতুরে হয়ে পড়েছেন, অঘ্রাণেই লেপ নামাতে হয়েছে। কমল জেঠামশায়ের গায়ে গা ঠেকিয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে। ব্রহ্মামুরারিস্ত্রি- পুরান্তকারী—' ভবনাথ স্তব পড়ছেন। সেকি একটা দুটো—একের পর এক পড়ে যাচ্ছেন: 'প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ম্ আপদস্তস্য নশ্যন্তি—'। কমলের সব মুখস্থ, সুরে সুর মিলিয়ে সে-ও পড়ে যায়। সব পড়ার পর কৃষ্ণের শতনাম, দাতাকর্ণ, গঙ্গাবন্দনা—এক একদিন এক এক রকম।

সকলের শেষে প্রশ্নোত্তর: মনু, তোমার নাম কি?

শ্রীযুক্ত বাবু—

এই বুঝি! নিজের নামের সঙ্গে বাবু চলে না। শুধু 'শ্রী' বলতে হয়।

কমল সংশোধন করে বলল, শ্রীকমললোচন ঘোষ।

ব্যস, হয়ে গেল? বড্ড তুই ভুলে যাস মনু। নাম জিজ্ঞাসা করলে নিজের নামের সঙ্গে বাপের নামও বলতে হয়। শ্রীকমললোচন ঘোষ, আমার ঠাকুর হলেন গে—

কমল পূরণ করে দিল: শ্রীযুক্ত বাবু দেবনাথ ঘোষ।

বেশ হয়েছে। পিতামহের নাম কি বলো এবারে—

শ্রীযুক্ত বাবু

উঁ-ঁ-হুঁ—করে উঠলেন ভবনাথ: তিনি যে স্বর্গে গেছেন। শ্রীযুক্ত নয়, বলতে হবে ঈশ্বর। ঈশ্বর হরেশ্বর ঘোষ।

তারপর, প্রপিতামহের নাম? বৃদ্ধ-প্রপিতামহ? অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ? কোন গোত্র তোমাদের। আহা, ঘোষ মাত্রেই সৌকালিন—এ নিয়ে ভাবা-ভাবির কিছু নেই। কোন গাঁই? কার সন্তান?

ঢেঁকিশালে পাড় পড়ছে—ধাপর-ধুপর ধাপর-ধুপর। আওয়াজ পেয়ে উমাসুন্দরী চলে গেলেন সেখানে? সরো, আমি একটু এলে দিই।

তরঙ্গিণীর ঘোর আপত্তি: দিদি, কক্ষনো না। একবারের সেই আঙুল ভেঙে আছে। একটুকু বাড় কোটা—এলেই বা কি দেবার আছে? তুমি নিজের কাজে যাও।

দাঁড়াতেই দিল না ঢেঁকিশালে। এই এক কাণ্ড—বড়গিন্নি কাজ করতে এলে বাড়সুদ্ধ আড় হয়ে পড়ে। বলে, বয়স হয়েছে—তার উপর বাতের ঘোর। চিরকাল খেটেছ, শুয়ে বসে আরাম করো এবার।

যেন শোওয়া এবং বসার মধ্যেই যত কিছু আরাম। কাজ না করে বড়গিন্নি থাকতে পারেন না। উঠানের উনুনে সকালের ফ্যানসা-ভাত রান্না হয়— সেই কাজটা তিনি নিয়ে নিয়েছেন। ঢেঁকিশালে তাড়া খেয়ে উমাসুন্দরী এইবার উনুন ধরানোর উদ্যোগে গেলেন।

পুবের-কোঠায় এতক্ষণে প্রশ্নোত্তর সারা। ভবনাথ শ্যামাসঙ্গীত ধরলেন: 'আমায় দাও মা তবিলদারি, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী—'। সুরজ্ঞান আছে, ঊষাকালে খালি গলায় নেহাত মন্দ শোনায় না। গান ধরার মানেই বাকি তামাক সাজার হুকুম—নিমি সেইরকম জেনে বুঝে আছে। গায়ে আঁচল জড়িয়ে টেমি ধরিয়ে নিয়ে শীতে ভুরভুর করতে করতে সে এলো।

ভবনাথ বলেন, উনুন ধরে নি?

ঘাড় নেড়ে নিমি ধরলে কি হবে? বাঁশের-চেলার আগুন কলকেয় তুললেই নিভে যায়। নুড়ি ধরিয়ে দিচ্ছি।

তামাক সাজল, নারকেলের ছোবড়া পাকিয়ে গোল করে নুড়ি বানাল। টেমিতে নুড়ি ধরিয়ে কলকের ফুঁ দিতে দিতে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে নিমি বাপের হাতে দিল। বিছানা ছেড়ে উঠলেন ভবনাথ। গায়ে বালাপোষ জড়িয়ে জলচৌকিতে উবু হয়ে বসে ভুড়ুক-ভুড়ুক হুঁকো টানছেন।

পুঁটি মেয়েটা তরঙ্গিণীর বটে কিন্তু মায়ের চেয়ে জেঠির সে বেশি ন্যাওটা। কমল হবার সময় তরঙ্গিণী আঁতুড়-ঘরে গেলেন, মেয়ের খাওয়া-শোওয়া আর মান-অভিমান সমস্ত সেই থেকে উমাসুন্দরীর কাছে। দরদালানে জেঠির কাছে সে শোয়। কমলকে এসে ডাকছে: উঠে পড়্ কমল, রস নিয়ে আসিগে।

রবিবার আজ। প্রহ্লাদ মাস্টারমশায় বাড়ি চলে গেছেন। পাঠশালার ঝামেলা নেই। বুঝেসুঝেই পুঁটি এসেছে। ডুরে-শাড়িটা পরে তৈরি সে। লোপাইখানা কমলের গায়ে ভাল করে জড়িয়ে ভাই-বোনে বেরিয়ে চলল।

সুমুখ-উঠানে ধানের পালা, পা ফেলবার জায়গা নেই। পাছ-দুয়ারের আধেকখানি জুড়ে লাউ-কুমড়ো ঝিঙে-বরবটির মাচা। নিচেটা পরিপাটি করে নিকানো, সিঁদুরটুকু পড়লে তুলে নেওয়া যায়। বেশ ঝিঝি ঝর-ঝর লাগে। মাচার বাইরে উনুন—আগুনের আঁচে গাছের যাতে ক্ষতি না হয়। বড়গিন্নি কড়াইতে ফ্যানসা-ভাত চাপিয়েছেন—ভাত টগ-বগ করে ফুটছে। বড়ি কোটা সেরে অলকা-বউ রান্নাঘরে গোবরমাটি দিতে লেগেছে। শীতের সকালে জল-কাদা ছেনে আঙুলের চামড়া ঠরসে গেছে, উনুনের ধারে এসে হাত সেঁকে যাচ্ছে এক একবার।

পুঁটি-কমলের দিকে বড়গিন্নি হাঁক দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি আসিস রে। দেরি হলে ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে কিন্তু।

কালু গাছি রসের ভাঁড় বাঁকে করে এনে বাইনশালায় নামাল।

রস দাও কালু-চাচা—

কালু বলল, জ্বর এয়েছিল—গণ্ডা চারেক মাত্র গাছ কেটেছিলাম কাল। মোটে এই ছ-ভাঁড় রস। পরশু-তরশু এসো একদিন, রস দিয়ে দেব।

অতএব অন্য বাড়ি যাচ্ছে। কালুর-মা বুড়ি—কুঁজো হয়ে টা কোমর থেকে ভেঙে মাটির প্রায় সমান্তরাল—অবিরত মাথা নাড়ে, লাঠি ঠুকঠুক করে বেড়ায়। কোন দিক দিয়ে বুড়ি এসে সামনে পড়ল। মুখের সামনে লাঠি তুলে ধরে আবার মাটিতে ফেলে। খোনা-খোনা গলায় বলে, আহা, শুধু-মুখে যাচ্ছ তোমরা? বাইনশালে এসে পড়েছ—নিদেন পেটে খেয়ে তো যাবে! বোসো আমার যাদুরা।

দু-খানা চাটকোল ফেলে দিল তাদের দিকে। দুটো খালি-ভাঁড়ে কিছু রস ঢেলে পাটকাঠি হাতে দিয়ে বলল, খাও। পাঠকাঠির নলে চোঁ-চোঁ করে টানে ভাই-বোন। রস খেয়ে তবে ছুটি।

আর এক বাড়ি—কুঞ্জ ঢালির বাড়ি। বটকেরা করে কুঞ্জ বলে, রস দেবখন—তার জন্যে কি। দোলাইখানা একবার তোল দিকিনি খোকনবাবু। কী-পেড়ে ধুতি পরে এয়েছ, দেখি।

বছর দুই আগে কমল বড্ড বেকুব হয়েছিল এই কুঞ্জর কাছে—তা মনে আছে? এখন বড় হয়ে গেছে না। বলা মাত্রই সে দেমাক ভরে দোলাই তুলে ধরল। সত্যিই ধুতি পরনে—পাকা পাঁচ-হাত ফুলপেড়ে ধুতি। দোলাইয়ে যখন পা পর্যন্ত ঢাকা, নিষ্প্রয়োজনে ধুতি পরার ঝামেলায় যেতে যাবে কেন?—এই অভ্যাস কমলের ছিল, এবং কুঞ্জ সেটা জানত। দোলাই তোলার কথা তাই বলেছিল সেবারে। শোনা মাত্র কমলের চোঁচা-দৌড় দোলাই চেপে ধরে। ধর্ ধর্—করে কয়েক পা পিছনে ছুটে কুঞ্জ ঢালি হাসিতে ফেটে পড়েছিল। কিন্তু সেবারে যা হয়েছিল, এখন তা কেন হতে যাবে। বড় হয়ে গেছে কমল এখন।

চোর, চোর—কলরব উঠেছে দুটো-গুণীদের বাড়ি। একেবারে লাগোয়া বাড়ি—এ-উঠোন আর ঐ-উঠোন। চোর দেখতে পুঁটি-কমল ছুটেছে, কুঞ্জও গেল। চোর ধরা পড়েছে—তা হাসাহাসি কিসের অত?

চোর কবে? কুঞ্জ ঢালি জিজ্ঞাসা করল। রস জ্বাল-দেওয়া বাইনের পাশে দোচালা খোড়োঘর। হাসতে হাসতে দুটো সেদিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,

বড্ড বেকায়দায় পড়ে গেছে—পালাবার জো নেই।

পাড়ার আরও ক'জন এসেছে—চোর দেখে হেসে কুটি-কুটি। গাছ থেকে সন্ধ্যাবেলা ওলার-রস পাড়ল, রাত-দুপুর অবধি জ্বালিয়ে দুটো ভাঁড়ে ঢেলেছে, আজকের হাটে গুড় দু-খানা বেচবে। গন্ধে গন্ধে পাগল হয়ে সিঁধ খুঁড়ে চোর ঘরে ঢুকে পড়েছে। সিঁধের কী বাহার দেখ—

দেখাচ্ছে দুটো। কাচনির বেড়ার নিচে বাঁশের গবরাট। তারই ঠিক নিচে গর্ত খুঁড়েছে সিঁধকাঠি বিহনে নখ দিয়ে। এদিক-সেদিক নখের বেলা দাগ। ঘরে গিয়ে ভাঁড়ে মুখে আটকেছে। মুখ বের করে আনতে পারে না, দেখতেও পাচ্ছে না চোখে। এই এখনই দোর খুলে দুর্গতি দেখতে পেলাম চোরের—

ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে অন্যেরাও দেখছে—হরি হরি। চোর হল শিয়াল একটা।

ক্যাবশা-ভাত নামি য় থালায় থালায় ঢালা—বীচেকলা-ভাতে এক এক দলা তার উপর। ভাটিয়াল-চালের মিষ্টি ভাত লোহার কড়াইয়ে রান্না হয়ে সবুজের আভা ধরেছে। ভাত তাতে আরও মিষ্টি হয়েছে যেন। শিশুবয় ও অটলের ভাত মাচার নিচে কলাপাতায় দেওয়া হয়েছে। অন্য সকলে উনুনের ধারে গোল হয়ে বসল—কালীবর, নি য এবং মাঝের-পাড়ার ভুলোর ছেলে-মেয়ে দুটো। ভুলোর সম্পর্কীয় দৈবঠাকরুন—খুনখুনে বুড়ো—রোজ সকালে একটাকে কাঁখে তুলে নিয়ে আসেন, আর একটা তাঁর পাশে পাশে আসে। দৈববুড়িও তাদের মাঝখানে বসেছেন, একবার এর পাতে একবার ওর পাতে ভাত তুলে তুলে দিচ্ছেন। কালীবর দেওর হলেও একা তার সামনে খাবে না, নিজের ভাত নিয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকল।

রসের ভাঁড় নিয়ে পুঁটি-কমল দেখা দিল। তাদের থালা দুটো দেখিয়ে কালীবর বলল, এত দেরি করলি কেন? বসে পড়্।

পুঁটি মুখ করে বলল, রস না খেয়ে বসে গেছ যে তোমরা? বসে গেলাম রস আনতে যাচ্ছি।

কালীবর বলে, ভাতের পর খাব। খালি পেটে পেট কনকন করে।

বড়গিন্নি রান্নাঘরের দাওয়ায় কুরুনি পেতে নারকেল কোরাচ্ছেন, উঠানের দিকে উনুনে তরাজিনী খোলা-ই ভিজে চিঁড়ে ভাজছেন।

দৈবঠাকরুন জিজ্ঞাসা করলেন: আজ সকালে চিঁড়ে ভাজা কে খাবে?

বড়গিন্নী জবাব দিলেন: বিদেশ যাবেন উনি এখন। খাল-ঠেলাঠেলি চলেছে—রাতারাতি খাল পার হয়ে সদরমুখো নাও ছেড়ে দিচ্ছে। তাই

বললাম বাগ্নিমুখে যেও না—চাষ্ণি চিঁড়েভাজা মুখে দিয়ে যাও। বিলের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়লে কি হবে।

একটু থেমে বেজার মুখে আবার বলেন, কপাল—বুঝলে ঠাকুরঝি? সমর্থ ছেলেপুলে থেকেও জমাজমির ঝামেলায় কেউ মাথা দেবে না, বুড়োমানুষকে জলকাদা ভেঙে খালে-বিলে ছুটোছুটি করতে হয়। উপায় কি—নয়তো মুখে যে ভাত উঠবে না।

তিন ভাইয়ের মধ্যে অন্ত দু-জন বাড়ি-ছাড়া। কৃষ্ণময় এখন কাকার সঙ্গে থাকে। চঞ্চলা যেবারে মারা যায়, কৃষ্ণময়-ও বেরিয়ে পড়েছিল। এস্টেটের সদর-কাছারিতে বুড়ো খাজাঞ্চির সহকারী রূপে দেবনাথ তাকে বসিয়ে দিয়েছেন। হিরুও নেই—নিষ্কর্মা ভাত মারবে ও নতুনবাড়ির আড্ডাখানায় তাস পেটাবে—দেবনাথের কাছে অসহ্য হয়েছিল। ফরেস্টার অমুক দাসের হেপাজতে হিরুকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন, ভদ্রলোক বনকরের চাকরিতে হিরুকে ঢুকিয়ে দেবেন কথা দিয়েছেন। ছেলেদের মধ্যে কালীময়ই এখন একা রয়েছে। ঠেঁশটা অতএব তার উপর। ঝাঁঝালো কণ্ঠে সে বলে, জলকাদা ভাঙেন বুড়োমানুষ নিজের দোষে। জমাজমি ওঁর প্রাণ—কাউকে ছুঁতে দেবেন না। আমি না থাকি, আরও দুইভাই এতকাল পড়ে ছিল তো বাড়িতে, পড়ে পড়ে তেরেণ্ডা ভাজত। তিতবিরক্ত হয়ে তারা বেরিয়েছে।

কালীময় যথারীতি শ্বশুরবাড়ি ফুলবেড়ের ছিল। ভবনাথ সকালবেলা হন্যের যাবেন আ'ল-ঠেলাঠেলির ব্যাপারে—শিশুবর হাটঘাট সেরে কাল রাত্রে খবরটা দিল। শুনেই কালীময় চলে এসেছে। দৈব-ঠাকরুনকে সালিশ ধরে সেইসব বলছে: ভোর থাকতে রওনা হয়েছি। বলি, হাঙ্গামা না হোক, বচসা কথা-কথান্তরের ভয় আছে—বাবার একলা যাওয়া ঠিক হবে না। বাড়ির সব না উঠতেই এসে হাজিরা দিয়েছি। আর কী করতে পারি বলো পিশি।

রোয়াকের উপর রোদ পিঠ করে বসে সবাই বড়ি দিচ্ছে। দৈবঠাকরুনও এসে বসলেন। হাঁ-হাঁ করে ওঠেন তিনি: কী হচ্ছে ছোটবউ, এক্ষুনি কেন? আরও ফেনাও, না ফেনালে বড়ি মুচমুচে হয় না।

তরঙ্গিণী হেসে বলেন, ফাঁপা-বড়িতে তেলের খরচ কত! :তেলের -ভাঁড় তেলের-বোতল এমনি তো আছড়ে আছড়ে ভাঙেন—ফাঁপা-বড়ির তেল জোগাতে বট্‌ঠাকুর ঠিক লাঠি-ঠেঙা নিয়ে তেড়ে বসবেন।

টুকটুকি এসে পড়েছে, বড়ি সে-ও দেবে। এদিকে হাত বাড়ায়, খাকা দিয়ে ধরে। তরঙ্গিণী আরও এলাকাড়ি দেন: বটেই তো! বাড়ির মেয়ে হয়ে সে-ই বা কেন বাদ থাকবে? একটুখানি কাই নিয়ে বাচ্চার হাতে,

দিলেন : যাও, ঐ পিঁড়িখানার উপর বড়ি দাওগে তুমি। টুকটুকির বড়ি সকলের চেয়ে ভাল হবে দেখো।

কিন্তু ভবী ভোলে না। আলাদা পিঁড়ি সে নেবে না—সকলের মধ্যে বসে একসঙ্গে বড়ি দেবে। বড়ি দেবার নামে লেপটে নয়-ছয় করে দিচ্ছে। অলকা টেনে সরিয়ে নিতে গেল তো কেঁদে পা-দাপিয়ে অনর্থ করে।

তরঙ্গিণী বললেন, বাড়ির মধ্যে একজন এই হয়েছেন—আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে সকলে তোমরা মাথায় তুলেছ।

পুঁটিকে বললেন, ওঠ তুই পুঁটি, বড়ি দিতে হবে না। নিয়ে যা ওকে, ভুলিয়েতালিয়ে রাখ—

জোর করে পুঁটি বাচ্চাকে কোলে তুলে নিল। টুকটুকি দারুণ চেঁচাচ্ছে। পুঁটি মিছামিছি আঙুল দেখাচ্ছে : আমগাছে কেমন ঐ ক্যাঁকোলা পাখি দেখ্। —আয় রে ক্যাঁকোলা, টুকিকে নিয়ে করোসে খেলা—

ছড়া বকছে আর নেড়ে নাচাচ্ছে।

এক স্ত্রীলোক এসে দর্শন দিল। শতচ্ছিন্ন ময়লা কাপড়ে আধেক-দেহ জড়ানো। বিড়-বিড় করে আপন মনে সব বকছে। কারো পানে তাকায় না, কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে না, ঘরবাড়ি যেন। কাটারি-খানা প্রায়ই চালের বাতায় গোঁজা থাকে—ঘাড় কাত করে সেখানটা সে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। তরঙ্গিণী দেখতে পেয়ে ঘরের মধ্যে থেকে কাটারি ছুঁড়ে দিলেন। হাসি-হাসি মুখে বলেন, যাক, গুণমণির মতি হল। নারকেলের গাবড়াগুলো শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে আছে, রান্না করে সুখ হবে আজকে।

গোয়ালগাদায় আড়ালে স্তূপীকৃত নারকেলের গাবড়া—গুণমণি তলায় তলায় কুড়িয়ে ঐখানে জড় করে রেখেছে। এক-একটা টেনে কাটারি দিয়ে চিরছে, মুখে অবিশ্রান্ত গালি। যত পরিশ্রান্ত হবে, গালির জোর তত বাড়বে। যখন কাজ করবে না, তখন বিড়-বিড় করে গালি।

মাথায় ছিট আছে। তা সত্ত্বেও কাজকর্ম ভারি পরিষ্কার। গাঁয়ের সব বাড়িতে গুণোর আদর-খাতির সেইজন্য। ডাকাডাকি করে আনা যাবে না, বরঞ্চ যখন হঠাৎ এসে পড়ে। এসেই কাজে লাগবে, বলে দিতে হবে না। বললেও সেই জিনিস যে করবে, তার মানে নেই। বঁটি পেতে হয়তো বসে গেল নারকেল পাতা চিকিয়ে কাঁটার শলা বের করতে। অথবা, চিঁড়ের ধান ভিজানো আছে—ধানের কলসি কাঁখে নিয়ে গুণো ঢেঁকিশালে চলল চিঁড়ে কুটতে। অতএব অন্য কেউ তাড়াতাড়ি যাও এসে দেবার জন্য। চিঁড়ের পাড় দেওয়া বড় কষ্টের কাজ, দু'জনের একসঙ্গে দু'খানা পা লাগে। কিন্তু গুণমণির লিকলিকে দেহ হলে কি হয়, একলাই সে পুরো কলসি ধানের

চঁড়ে নাবিয়ে রেখে। তবে গাজির কথা বইয়ে লেখে সেই সময়টা কোন্ অলক্ষ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে।

কাঁধে চাদর ফেলে ছাতা ও লাঠি হাতে ভবনাথ হন-হন করে বিল মুখো চললেন। কালীময় পিছনে। খোয়ামমুখো ছেলে বুড়ো বাপের সঙ্গে হেঁটে পারে না। এক-গোয়াল গরুর মধ্যে তিনেট গাই এখন দুধাল। দোওয়ার সময় হয়ে গেছে, খোয়াড়ে আটকানো ক্ষুধার্ত মুলেবাছুর হাম্বা-হাম্বা করছে। রমণী দাসী দু-বেলা গাই দুয়ে দিয়ে যায়। বড্ড দেরি করল আজ। এসে পড়তে উমাসুন্দরী রে-রে করে উঠলেন: বলি, আক্কেলটা কি রমণী? বাছুর মেরে ফেলবি নাকি? আমার বড়বউমারও দিব্যি বাঁটে হাত চলে। বিকাল থেকে আর তোকে আসতে হবে না, বড়বউমা যেটুকু পারে তাতেই হবে।

অপরাধী রমণী দাসী ছুটোছুটি করে খোয়াড়ের বাছুর খুলে দেয়। মিন-মিন করে দেরির কৈফিয়ত দিচ্ছে। ধান কাটার সময় ধান কিছু কিছু ঝরে পড়ে। ঝরা-ধান অনেকে ক্ষেতে কুড়িয়ে বেড়ায়, কপালে থাকলে এক-পালি দেড়-পালি হওয়াও বিচিত্র নয়। সেই কর্মে গিয়ে আজকে রমণী দাসীর—

বলে, পা তুলে দেখাই কেমন করে ঠাকরুন। ডান পায়ের তলা শামুকে কেটে অর হয়েছে। রক্ত থামেই না মোটে, . . করি।

কিন্তু দুধে যে বিভ্রাট। বুধি-শুঁটকি ঠিক আছে—তারা যেমন দেয়, তেমনি দিল। পুণ্যর কি হয়েছে—ঘটির কানা অবধি দুধে ভরে যায়, আজকে তলার দিকে একটু খানি—পোয়াটাক হবে বড় জোর। মুলেবাছুরে পিইয়ে খেয়েছে, তা-ও নয়—বাছুর ঠিকমতো আটকানো ছিল, বড়গিন্নি নিজে খোয়াড়ে ঢুকিয়ে ছিলেন, সকাল থেকে কতবার দেখে এসেছেন।

রমণী দাসী প্রণিধান করে বলল, বুঝেছি, দাঁড়াস-সাপের কম্ম, বাঁট কানা করে গেছে। হচ্ছে এই রকম আজকাল। ফুটো গুণীন আসুক—সে ছাড়া হবে না।

দাঁড়াস-সাপ ভারী চতুর। মাঠে গরু বাঁধা, গরুতে ঘাস খাচ্ছে—দাঁড়াস গড়াতে গড়াতে এসে পিছনের দুই পায়ে জড়িয়ে যায় দড়ি দিয়ে পা বেঁধে ফেলার মতন। গরুর আর চাটি মারার উপায় রইল না। সাপ তারপরে মাথা তুলে বাঁটে মুখ লাগিয়ে টেনে টেনে মজা করে দুধ খেতে লাগল। খেয়ে চলে যায়। এমন টানা টেনে গেছে, দুধ আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই বাঁটে। বাঁট-কানা বলে একে। ঝাড়ফুঁকের ওস্তাদ ফুটোর শরণ না নিয়ে তখন উপায় থাকে না।

রমণী বলে, গুণীন এসে জল পড়ে দেবে। ক্যানের সঙ্গে জল-পড়া খাইয়ে দিলে বাঁটে ফের দুধ আসবে। মণ্ডলপাড়ার মধুর গাইয়ের ঠিক এই হয়েছিল।

পুণ্যাকে আশফল-তলায় বেঁধে শিশুধর বুধি-ভুঁটকিকে নিয়ে মাঠে চলল। গাইয়ের পিছনে বাছুর। ধান কেটে-নেওয়া ফেলার মাঠ। খুঁটো পুঁতে পুঁতে সকালবেলা সেখানে অন্যগুলোকে বেঁধে এসেছে, দুধাল এই তিনটে কেবল বাকি ছিল। গোয়াল খালি এবার, বড়গিন্নি গোয়াল-বাড়াতে ঢুকলেন। খালি গোয়াল বলা ঠিক হল না—ঘোড়ারা রয়েছে। কমলের ঘোড়া—গুণতিতে দশটা-বারোটা হবে। ঘোড়া বের করে কমল বোধনতলায় রাখল।

গোয়ালে গরুর সঙ্গে ঘোড়া মিশাল—একটি-দুটি নয়, ডজনের কাছাকাছি। তা বলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। ঘোড়ারা নির্জীব—খেজুর-ডেগোর দু-হাত আড়াই-হাত মাপের এক এক খণ্ড। ডেগোর মাথার দিকটা চওড়া, এবং বাঁকাও বটে—কাটারি দিয়ে সামান্য সুচাল করে নিলেই ঘোড়ার মুখের আদল এসে যায়। এক জোড়া কলার ছোটার এক মাথা ঘোড়ার মুখের সঙ্গে, অন্য মাথা পিছন দিকে বাঁধা। দুই কাঁধের উপর দিয়ে দুই ছোটা তুলে দিলেই ঘোড়ায় চড়া হয়ে গেল। ঘোড়ার আর সওয়ারে সেঁটে রইল—পড়ে যাবার বিপদ নেই। আস্তাবলের ঘোড়া আপাতত বোধনতলায় এসে রইল—ঘাস নেই ওখানটা, ভুঁইচাঁপার ঝাড়। খায় তো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঐ ভুঁইচাঁপা ফুলই খেয়ে নিক।

বেলা হয়ে গেছে। দোওয়া দুধ বাটিখানেক অলকা বউ তাড়াতাড়ি বলক দিয়ে নিল। এইবারে সবচেয়ে যা কঠিন কাজ—দুধ খাওয়ানো টুকটুকিকে। আস্ত একখানি কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার। আসনপিঁড়ি হয়ে কোলের উপর মেয়েকে শুইয়ে ফেলেছে। তারপর জোরজার করে পিতলের ঝিনুকে গলার ভিতর দুধ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ফেলার কায়দা না পেয়ে বিচ্ছু মেয়ে গ্যাড়-গ্যাড় করে আওয়াজ তোলে গলার ভিতর। কিছুতেই গিলবে না তো নাক চেপে ধরতে হয়। নিশ্বাস নেবার জন্য তখন হাঁ করে, দুধ ঢুকে যায় অমনি।

দুধ খাইয়ে অলকা আঁচলে মেয়ের মুখ পরিপাটি করে মুছে পুঁটির কোলে তুলে দিল। পুঁটি বলে, চলো টুকি, পাড়া বেড়িয়ে আসি আমরা। কাচ-পোকা ধরে টিপ কেটে কেটে রেখেছে—ঘরে নিয়ে বড় একটা টিপ এঁটে দিল টুকির কপালে। পুঁটে বুলচে—টিপ বড় না হলে নজরে আসবে না। রুপোর নিমফলটা খোলা ছিল—কোমর বেড় দিয়ে পরিয়ে দিল সেটা। পায়ে আলতা পরাল। একফোঁটা মেয়ে কতই যেন বোঝে—সারাক্ষণ চুপ করে

আছে। গাজনশলা সমাপন করে মেয়ে নিয়ে পুঁটি পাড়ায় বেরুল।

বাড়িতে কাকে এসে ঠোকা না দেয়, নিমি পাহারায় আছে। রোয়াকে চাটকোল পেতে কাঁথার ডালা নিয়ে বসেছে—কাঁথা সেলাই ও বাড়ির পাহারা একসঙ্গে হচ্ছে। সেলাই করতে করতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, আঙুলে সুঁচও বেঁধে কখনো-সখনো। এই বাড়ির উপর একই রাতে দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল—গরবিনী বুড়ি ড্যাং-ড্যাং করে চলে গেল, তার নামে সকলে আজও নিশ্বাস ফেলে। আর পোড়া নিমির মরণ নেই—বাপের-বাড়ি দাসীবৃত্তি চেড়ীবৃত্তির জন্য বেঁচেবর্তে রয়েছে। আজ না হোক, মা-বাপের অন্তে হবে ঠিক সেই জিনিস—বিনোর মতন হয়ে থাকতে হবে। এই সমস্ত ভাবে নিমি—ভেবে ভেবে খ্যাপাটে হয়ে যাচ্ছে, একটুখানি ছুঁয়ে কথা বলার জো নেই। হাতের চুড়ি-খাড়ু কথায় কথায় ভেঙে ফেলে। বলে, বিনো-দিদি যা, আমিও তাই। পাতের মাছ বিড়ালের মুখে ছুঁড়ে দেয়। ব্যাধিও ঢুকছে—মাঝেমধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মৃগী রোগের লক্ষণ মিলে যায়। কলকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভ সেনের সঙ্গে দেবনাথের কিছু ঘনিষ্ঠতা আছে। দেবনাথ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিমির রোগের লক্ষণাদি তাঁকে বলেছিলেন। তিনি কিন্তু গা করলেন না। বললেন, শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও, অষুধপত্তোর যত-কিছু সেখানে। পদ্মনাভ কবিরাজের রোগনির্ণয়ে কখনো ভুল হয় না। কিন্তু জামাই দুলালচন্দ্রের ঐ দশা—কেটে কুচি কুচি করে ফেললেও নিমি শ্বশুরবাড়ি মুখো হবে না।

একজোড়া কাঁথা সেলাই করছে সে—টুকটুকিকে দেবে। বউদির কোলের প্রথম সন্তান—গয়না জামা জুতো খেলনা কত জনে কত কি দিচ্ছে। দামের জিনিস নির্মলা কোথায় পাবে—ছেঁড়া-কাপড় জোগাড় করে তার উপরে নানা রংয়ের সুতোর কল্কা ফুল পাখি গাছ ঘোড়া মানুষ ইত্যাদি তুলছে। শিল্পকাজে নিমির জুড়ি নেই—কাঁথা সেলাই দাঁড়িয়ে পড়ে দেখতে হয়, পলক ফেলতে মনে থাকে না। লেখাও তুলবে, কয়লা দিয়ে কাপড়ের উপর ছকে নিয়েছে: আদরের টুকুরাণীকে অভাগিনী পিশিমার উপহার। দেখে অলকা রাগ করে: কক্ষনো না। 'অভাগিনী' মুছে দাও—ও আমি লিখতে দেবো না। তোমার জিনিস সকলের সেরা। কাঁথায় আমি মেয়ে শোয়াবো না, পাট করে তুলে রেখে দেবো। মেয়ে বড় হয়ে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাবে, সকলকে দেখাবে: পিশিমা এই জিনিসটা দিয়েছিল আমায়।

বোতলের নারকেলতেল গলানোর জন্য রোয়াকে রেখেছে। চুল খুলে দিয়ে অলকা খানিকটা তেল থাবড়ে চুলের উপর দিল। চানে যাবে, চান

করে এসে হেঁসেলে ঢুকবে।

তরঙ্গিণী বললেন, মেঘের মতন ঘন একপিঠ চুল তোমার বড়বউমা। কিন্তু বিধাতা দিলে তো হল নাই, পাটসাট করে রাখতে হয়। শাকগোকের বরন তোমাদের—তা তোমার সে সব কিছু নেই, উদাসিনী যোগিনীর মতন বেড়াও। চুল ছাড়িয়ে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি—ছটফট কোরো না, ঠাণ্ডা হয়ে বোসো।

কবলে পড়ে গিয়ে বড়বউর ঠাণ্ডা হয়ে না বসে উপায় কি। চুল জটা-জটা হয়ে গেছে, তার ভিতর দিয়ে তরঙ্গিণী তৈলাক্ত আঙ্ুল চালাচ্ছেন। চুলে টান পড়ে আঃ-আঃ করছে সে, আর যন্ত্রণায় হাসছে। বলে, :কাঁচাচুল ছিঁড়ে যাচ্ছে ছোটমা।

নিঠুর তরঙ্গিণী বললেন, যাক। যত্ন করবে না তো কি দরকার চুল রেখে? চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাথায় টাক করে দেবো। এয়োস্ত্রীর মাথায় ক্ষুর ঠেকানো যায় না, নয়তো নন্দ পরামাণিককে দিয়ে মাথা ন্যাড়া করে দিতাম।

বলে হেসে পড়লেন তিনি।

কাঁখে ভরা-কলসি ভিজে-কাপড় সপসপ করতে করতে বিনো পুকুরঘাট থেকে ফিরল। এঁরা চানে যাচ্ছেন, তারই তোড়জোড় হচ্ছে—একলা সে ইতিমধ্যে কখন গিয়ে পড়েছিল, সেরেসুরে ফিরে এলো।

রান্নাঘরের দাওয়ায় কলসি নামিয়ে বিনো গামছায় মাথা মুছছে। তরঙ্গিণী বললেন, পাথরের গেলাসে রস রেখেছি। পেঁপে কলা মুগের-অঙ্কুর বাতাসা আছে। খেয়ে নে আগে। আমরা চান করতে চললাম। ততক্ষণ তুই লাউটা কুটে রাখিস। বেশ জিরজিরে করে কুটবি, ঘণ্ট রাঁধব।

যা ভাবা গিয়েছিল—বিনো বলল, রাঁধব তো আমি।

তা বই কি!:কাল একাদশীর কাঠ-কাঠ উপোস গেছে—সাত তাড়াতাড়ি সেরে-ধুয়ে এসে উনি এখন উনুনের ধারে চললেন। আমরা যেন কেউ নেই, কাজে যেন কুড়িকুষ্ঠ আমাদের—

বিনো বলে, একদিনের উপোসে মানুষ মরে না। তা-ও জলপানের তো গন্ধমাদন গুছিয়ে রেখেছ।

তরঙ্গিণী অধীর কণ্ঠে বললেন, ওসব জানিনে। কথার অবাধ্য হবি তো—আমি বলে যাচ্ছি বিনো, ফিরে এসে তোর এ-কলসি সুদ্ধ জল উনুনে উপুড় করব। বুঝবি তখন।

বিনো কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, নিত্যিদিন তোমার একটা করে অছুহাত ছোটখুড়িমা—

তরঙ্গিণী কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হয়ে বললেন, আচ্ছা, রাতে রাঁধিবি আজ তোরা—তুই আর দিদি দু'জনে। দিদিটাও প্যান-প্যান করে। কথা হয়ে রইল, ব্যস। এখন গোলমাল করতে যাবিনে।

একই রান্নাঘরের একদিকটা আঁশ-হেঁসেল, ওদিকটা নিরামিষ। আঁশে-নিরামিষে কদাপি না ছোঁয়াছুঁয়ি হয়—খুব সামাল। মুক্তকেশী রান্নাঘরে আসেন—এ ব্যাপারে বড় কঠিন পাত্র তিনি। আঁশের ছোঁয়া লাগলে নিরামিষ হেঁসেলের উনুন পর্যন্ত শুদ্ধ হবে যাবে, ঐ উনুনের রান্না ইহজন্মে তিনি মুখে তুলবেন না। আর ঐ যে লেদিবকার মেয়েটি বিনো—দিদির চেয়ে সামান্য পাঁচটা সাতটা বছরের বড়—মুক্তঠাকরুনের উপর দিয়ে যায় সে। তিলেক অনাচারে রেগে কেঁদে অনর্থ করবে। তরঙ্গিণী নিজে তাই নিরামিষ হেঁসেলে থাকেন, আঁশ দিকটার বড়বউ অলকা।

এক পাঁজা চেরা-কাঠ গুণমণি রান্নাঘরের দাওয়ায় ঝপ করে এনে ফেলল। গোয়াল-কাড়ানো গোবরে ঝুড়ি ভরতি করে তক্ষুনি আবার বেড়ার ধারে চলে গেল সে। কঞ্চির গায়ে মশালের মতন গোবর চেপে চেপে বেড়ার গায়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। শুকনো মশাল পোড়াতে বড় ভাল। কোনটার পরে কি করবে, গুণমণিকে বলে দিতে হয় না। বললে হয়তো করবেই না আর-কিছু, ফরফরিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। যতক্ষণ আছে, হাত-দু-খানা চলছেই। উপর ওয়ালা কোথায় যেন চোখ পাকিয়ে রয়েছে—তিলার্ধ জিরান দিলে সে রক্ষে রাখবে না।

॥ পঁচিশ ॥

ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে গ্রামপথে—সামাল, সামাল। বড়বড় দল—বিজু পটলা বস্তিনাথ যতীন ইত্যাদি, এবং কমল তো আছেই। আগে পিছে লাইন-বন্দী হয়ে জঙ্গলে সুড়িপথে দুরন্ত বেগে ছুটছে। পথ ছাড়ো—পাশে গিয়ে দাঁড়াও না। সওয়ারের দল চকিতে ছুটে বেরিয়ে যাবে, আবার তখন পথ চলবে।

আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে চাবুক করে নিয়েছে—নির্দয়ভাবে চাবুক মারছে জোর ছুটানোর জন্য। ঘোড়া যেহেতু খেজুরডেগো, যতই মারো ক্ষেপে যাবার শঙ্কা নেই। মানুষজন সামনে পড়লে হাসতে হাসতে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। তারিপ করে বাঃ, ঘোড়া তোমাদের খাসা কদম-চালে ছুটেছে। একদিক

কোন দরকারে থানা থেকে দারোগা এসেছিলেন। ঘোড়সওয়ার কমল চৌর পায়নি—ছুটতে ছুটতে একেবারে সামনে পড়ে গেল। দারোগাও ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। বললেন, ঘোড়া একটুখানি দাঁড় করাও খোকা, দেখি। বাঃ, লাগাম-টাগাম সবই তো ষোলআনা আছে। আমার ঘোড়ায় তোমার ঘোড়ায় বদলা বদলি করি এসো। আমার ঘোড়া দু-আনার দানা খায় নিত্যিদিন, তোমার ঘোড়ায় একটি পয়সা খরচা নেই। রাজি থাকো তো বলো। কমল আর নেই সেখানে। জোর ছুটিয়ে ঘোড়া সহ পালিয়ে গেল।

জোর কদমে চলবার মুখে মাঝেমধ্যে ঘোড়া চি-হিহি ডাক ছাড়ে। ক্লান্ত ঘোড়ার পক্ষে না করা উচিত। ডাকটা বেরোয় অবশ্য সওয়ারের মুখ দিয়ে। নতুনবাড়ির বাঁধাঘাটের সামনে কামিনীফুল-তলায় সওয়ারের কাঁধের ছোটা নামিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। জল খাইয়ে নিচ্ছে ঘোড়াগুলোকে—ডেগোর মাথা সিঁড়ি দিয়ে জলে নামিয়ে দিয়েছে। দূরের পথ—বিশ্রামের সময় নেই, তক্ষুনি আবার রওনা। তেলির-ভিটে হরিতলা চৈপুর-মাঠ ভারি ভারি দুর্গম জায়গা পার হতে হবে। তারপর আক্রমণ লুঠপাট—'বর্গি এলো দেশে' বর্গিদের গল্প শুনেছে সে প্রহ্লাদ-মাস্টারমশায়ের কাছে—সেই বর্গিদের মতন।

তীব্রবেগে ছুটেছে। লক্ষ্যভূমে পৌঁছে গেল অবশেষে। সকলকে সবুজ মটরলতা—শুঁটি সাবাস্থাই ধরেছে, অফুরন্ত বেগুনি ফুল। অতশত কে দেখতে যাচ্ছে—ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্বারোহী দল। দু-এক গোছা সবে উপড়ে নিয়েছে—

ক্ষেতের মধ্যে কারা?

তাজু গাছি পাশের খেজুরবনে মানুষ, কে ভাবতে পেরেছে। ভাঁড় পোড়াচ্ছে তাজু। খেজুররস ঢেলে নেবার পর খালি ভাঁড়গুলো এমুখ-ওমুখ করে সাজিয়ে দিয়েছে—বিচালির লম্বা বোঁদা মাঝখানটায়। বোঁদার দুই প্রান্তে আগুন ধরানো—ধিকি-ধিকি জলতে জলতে আগুন এগুচ্ছে, ধোঁয়া প্রচুর। ধোঁয়া ভাঁড়ের ভিতর ঢুকে যায়। ভাঁড় পোড়ানো এর নাম। ভাঁড়ে ধোঁয়া দেওয়া না হলে রস গেঁজে ওঠে।

ঝিউতপাল (ঝি-পুতের পাল?) কারা এসে পড়লি—দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা—

মুখের তড়পানি মাত্র নয়—কাজ ফেলে তাজু সর্দার মটরক্ষেতে লাফ দিয়ে পড়ল, হাতে বাঁক। এ হেন গোলমেলে জায়গায় তিলার্ধ কাল থাকতে নেই। যে যা তুলতে পেরেছে, লুঠের মাল নিয়ে বর্গিদল ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আবার। ঘোড়ার সঙ্গে মানুষ কি করে ছুটতে পারবে—তাজু সর্দার ক্ষেতের উপর দাঁড়িয়ে আছে, বিজয়ীরা এক-একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে নেয়। পরাজিত সর্দার হি-হি

করে হাসছে : উৎপাত তো আছেই—গরু-ছাগল এসে পড়ে, শজারু-খরগোশ আসে রাত্তিরবেলা, সেই একবার পঙ্গপাল পড়েছিল। আর আছে তল্লাটের এইসব ছেলেপুলে। এই তো আর ক'টা দিন—কালই খোলাটে উঠে গেলে কেউ আর খেতে আসবে না।

ছুটছিল—ধুপ করে কমলরা ঘোড়া থামিয়ে দিল। মজার পর মজা—পাখি-ধরা এসেছে : গাছে গাছে বেলা পাখি—আজকে ঘুঘু ধরবে, যেহেতু খাঁচার মধ্যে ঘুঘুপাখি দেখা যাচ্ছে।

পাখি-ধরার এক হাতে সাতনলা, আর এক হাতে খাঁচা। সাতখণ্ড বাঁশের নল দিয়ে সাতনলা হয়। একেবারে সরু, তার চেয়ে সামান্য মোটা, তারও চেয়ে মোটা—এমনি সাতখানা। এক নলের গর্তে অন্য নল ঢুকিয়ে শেষবেশ একখানা লম্বা লাঠি হয়ে দাঁড়ায়। আর বাঁশের গলায় বাঁধানো ছোট্ট খাঁচা—খাঁচার মধ্যে মাঝামাঝি দাঁড়ের উপর তালিম-দেওয়া পোষা ঘুঘু। দাঁড়ের খানিকটা বেরিয়ে আছে খাঁচার বাইরে—অতিথি-পাখির আসন হবে ওখানে।

এ-ডালে ও ডালে ঘুঘু ডাকছে। পাখি-ধরা পা টিপে টিপে গাছের তলায় যাচ্ছে। কমলরা, দেখা যায়, এখানেও মাতব্বর। হাত তুলল—অর্থাৎ নিঃশব্দ আদেশ : এগোবি নে কেউ এদিকে। ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল—অর্থাৎ : মুখ দিয়ে একটুকু শব্দ না বেরোয়, পাখি না ওড়ে। পাখি-ধরার হয়ে কমলের কেন খবরদারি এত? পরে জানা গেল, সাগরেদ হয়ে পাখি-ধরা বিদ্যেটাও ষোল-আনা রপ্ত করে নিতে চায় সে। এই বিদ্যের এখন অবধি কিছুটা সে কবজায় আছে।

কর্মারম্ভ। সরু নলের মাথায় ঘুঘুর খাঁচা বাঁধা। পর্যায়ক্রমে নল একের পর এক জোড়ায় আসছে—খাঁচা উঁচুতে উঠছে ক্রমশ। উঠতে উঠতে উঁচু ডাল একটা ছুঁয়ে ফেলল। ব্যস, স্থির। খাঁচার পাখি ঘু-ঘুউউ-ঘু—ডাকছে ডাকের ভিতর ভিতর আহ্বান পদে পদে পড়ছে বেশ বোঝা যায়। ডেকেই চলেছে। বৃথা হয় না—বনের ঘুঘু উড়ে এসেছে। একটা চক্কোর দিল, তারপর বেরিয়ে থাকা দাঁড়ের উপর বসে পড়ল। তখন খাঁচার জন ডাকছে, বনের জনও ডাকছে অবশ্য। ক্রমশ আরও নিবিড়—খাঁচার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে পোষা জনের মুখে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে বনের জন। সাতনলা ওদিকে দ্রুত গুটিয়ে নিচ্ছে—নলের মধ্যে নল ঢুকিয়ে। বনের ঘুঘু পাখি-ধরার একেবারে নাগালে এসে গেল। দাঁড়ে আঠা মাখানো, কাঁটায় পা এঁটে গেছে—উড়ে পালাবে সে উপায় নেই। আরও আছে। খাঁচার গায়ে ফাঁস ঝুলানো—আদর করার মুখে সেই ফাঁসের মধ্যে গলা ঢুকে গেছে। যত টানছে ফাঁস এঁটে যাচ্ছে।

জন্মায় পাখি-ধরার সমস্ত কায়দা জানে, তবু আঠা-মাখানো শিখে বিদ্ধেই হয়ে যায়। সেই রকমারেই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে।

গ্রাম সোনাখড়ি রাজীবপুর পোস্টাপিসের এলাকাভুক্ত। পিওনঠাকুর যাদব বাঁড়ুয্যে রবিবার আর বিষ্যুৎবার গ্রামে এসে চিঠি বিলি করেন। হাট-বার এই দু-দিন—হাটেও কিছু চিঠি বিলি হয়। সারাদিন কাটিয়ে ফিরে হাটের মাছ তরকারি কিনে প্রহর খানেক রাত্রে হাটুরে দলের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যান। পররেশু আজ তাঁর পুববাড়িতে পড়ল। বাইরের উঠান থেকে সাড়া দিচ্ছেন: কই গো, কোথায় সব?

রান্নাঘরে অলকা-বউ উসখুস করছে। এ-বাড়ির চিঠি এসেছে—চিঠি না থাকলে পিওনঠাকুর আসতে যাবেন কেন? কলকাতার চিঠি: বিস্তর কাল আসেনি—হতে পারে, চিঠি সেখানকার। টুকটুকির বাপই হয়তো বা লিখেছে টুকটুকির মাকে। মানুষটার বিচিত্র স্বভাব। বাড়ি এসে আর নড়তে চায় না। দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করে বাইরের-ঘরে উঠল, কোন-এক ছলছুতোয় যাত্রা ভেঙে নিজের পশ্চিমঘরে ঢুকে পড়ল আবার। বারম্বার এমনি যাত্রা-করা এবং যাত্রা-ভাঙা চলতে থাকে। শেষটা হুড়ো আসে কাকামশায় দেবনাথের কাছ থেকে। চিঠি পাঠান: এই হপ্তার ভিতরে হাজির না পেলে বরখাস্ত করব। নিজের ভাইপোকে চাকরি দিয়ে বদনামের ভাগী হয়েছি, এর উপরে কাজের গাফিলতি একটুও সহ্য করব না। তখন যেতে হয়। আর গিয়ে পৌঁছল তো বাড়ির কথা সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। চিঠির পর চিঠি দিয়ে এক ছত্র জবাব মেলে না। অলকার কথা ছেড়ে দাও—কিন্তু ননীর পুতুল একফোঁটা এই টুকটুকি আধো-আধো বুলিতে বা-বা বা-বা করে—এর কথাও কি এক লহমা মনে উঠতে নেই? এই সমস্ত ভাবে অলকা, ভেবে ভেবে নিশ্বাস ফেলে।

সেই যে সেবার দুর্গোৎসবের মধ্যে হরিষে-বিষাদ ঘটে গেল। কান্নায় কান্নায় বাড়ি তোলপাড়—একটি মানুষের চোখেই কেবল জল নেই। তিনি দেবনাথ। নিজে তো কাঁদেন না, অধিকন্তু তরঙ্গিনীকে বোঝাচ্ছেন: ও মেয়ে আমাদের নয়। আমাদের হলে নিশ্চয় থাকত। অতিথি হয়ে দু-দিনের জন্য এসেছিল।

ভাবগতিক দেখে ভবনাথ ভয় পেয়ে যান। বলেন, ভাই আমার ভিতরে ভিতরে কাঁদে। এ বড় সর্বনেশে জিনিস। ডাক ছেড়ে কান্না অনেক ভাল, বুক তাতে অনেকখানি হালকা হয়ে যায়।

কালীপুজোর পর ভাইদ্বিতীয়া অবধি দেবনাথ বাড়ি থাকবেন—কোজাগরীর

সন্ধ্যাবেলা নিতে দেবেন চকোত্তি খেড়ি সহ এসে পাশায় বসবেন, চিপিটক-নারিকেলোদক খেয়ে সারা রাত অক্ষক্রীড়া চলবে—পঞ্জিকা মতে কোজাগরী নিশি-জাগরণের যে বিধি। এত সব কথাবার্তা হয়ে আছে। কিন্তু মা-কালীর মাথায় থাকুন—কোজাগরীরও দু-দিন আগে ত্রয়োদশীর দিন, সর্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী, কোন সিদ্ধির তল্লাসে দেবনাথ যাচ্ছেন কে জানে—কিছুতে আর তাঁকে বাড়ি আটকানো গেল না।

উমাসুন্দরী ভবনাথের কাছে নালিশ জানালেন : ঠাকুরপো চলে যাচ্ছে।

ভবনাথ বললেন, তাড়িয়ে দিচ্ছ তোমরা, না গিয়ে করবে কি?

'তোমরা' ধরে বললেন—কিন্তু আর সবাই চুপ হয়ে গেছেন, এখন একলা তরঙ্গিণী। কাজ করতে করতে আচমকা থেমে সুর করে কেঁদে ওঠেন : ও মা বুড়ি, কোথায় গেলি রে—পুজোর আসবি কত করে তুই বলে গেলি, ক্ষণে ক্ষণে আমি যে বাদামতলার পথে গিয়ে দাঁড়াতাম—

উমাসুন্দরী ছুটে এসে পড়েন : চুপ করো ছোটবউ। কেঁদে কি করবে, সে তো ফিরে আসবে না। কত জন্মের শত্তুর ছিল—বুকের মধ্যে ছ্যাঁকা দিতে এসেছিল, কাজ সেরে বিদায় হয়ে গেছে।

অলকা-বউও বলে, চুপ করো ছোটমা, কমল কী রকম চোর হয়ে আছে দেখ।

ভুলিয়েভালিয়ে কমলকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বলে, সাপ-ঘুড়ি বানিয়ে দেবো তোমায়। ঝাঁটার-শলা আছে, বঙ্গবাসী-কাগজ আছে, পিতম্বরকে দিয়ে দুটো বেল পাড়িয়ে বেলের আঠা নিয়ে নেবো—ব্যস।

ভবনাথ সভয়ে ভাইয়ের পানে চেয়ে চেয়ে দেখেন। আদরের মেয়ের জন্ত এ ক'দিনের মধ্যে একটা নিশ্বাস ফেলতে কেউ দেখল না। এখনও তিনি নিরাসক্ত তৃতীয় পক্ষের মতন চুপচাপ দেখে যাচ্ছেন—সন্দেহ হয়, একটু সূক্ষ্ম হাসিও যেন মুখের উপর।

ভবনাথ উমাসুন্দরীকে বলেন, শুধু বউমাকে বলো কেন, দেবও কি কম যায়! জায়গা থাকলে আমিও কোনখানে চলে যেতাম।

রওনা হবার খানিক আগে কৃষ্ণময় বলল, কাকা আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

দেবনাথ ভেবেছেন, নাগরগোপ অবধি গিয়ে বাসে তুলে দিয়ে আসবে। দাদার কাণ্ড—ভাইকে একলা ছাড়তে চান না, সঙ্গে ছেলে পাঠাচ্ছেন। এ জিনিস আগেও হয়েছে।

কৃষ্ণময় আরও বিশদ করে বলল, কলকাতায় যাচ্ছি কাকামশায়।

কেন কলকাতায় কি ?

বাড়ি বসে বসে ভাল লাগে না। কোন-একটা কাজকর্মে লাগিয়ে দেবেন।

দেবনাথ সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়লেন। এমন সুবুদ্ধি হঠাৎ? তিনিই কতবার এমনি প্রস্তাব তুলেছেন। ক্ষেতের ধান বিল-পুকুরের মাছ প্রজাপাটকের বাড়ি ঘুরে ঘুরে টাকাটা-সিকেটা আদায়—খেয়ে-পরে মানসম্ভ্রম নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে বেশ একরকম কেটে যায়। ধানী-মানী গৃহস্থ বলে এদের। জোয়ানমর্দ ছেলেগুলো গ্রামে পড়ে থেকে গজালি পেটে। দিনকাল দ্রুত পালটাচ্ছে—নিষ্কর্মার পেটে ভাত জুটবে না, তাদের দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদবে। কৃষ্ণময়কে দেবনাথ কতবার এসব বলেছেন—হুঁ-হাঁ দিয়ে সে সামনে থেকে সরে পড়ে। সেই মানুষই এবারে উপযাচক!

সাবস্ময়ে তাকিয়ে দেবনাথ বললেন, ব্যাপারখানা কি বল তো।

কৃষ্ণময় থতমত খেয়ে বলল, বাবা বলছিলেন বাসায় আপনি তো একলা থাকেন—আমি থাকলে তবু একটু দেখাশুনো করতে পারব।

দেবনাথ নিজের মতন অর্থ করে নিলেন: দাদা ভেবেছেন, মনের এই অবস্থায় আমি যদি কোন কাণ্ড করে বসি। তোকে তাই পাহারাদার পাঠাচ্ছেন।

আসল ব্যাপারটুকু কৃষ্ণময় চেপে গেছে। দেবনাথের সঙ্গে যাবার কথা ভবনাথ একবার দু বার বলতে পারেন—যেমন বরাবর বলে আসছেন: গিয়ে পড়লে কোন-একটা ব্যবস্থা দেবনাথ নিশ্চয় করবে, কিন্তু তুই যে উঠোন-সমুদ্দুর পার হতে একেবারে নারাজ।

বংশাকান্ত থাকলে তিনি ঐ সঙ্গে টিপ্পনী কাটেন: যা বললে ভবনাথ। সাত সমুদ্দুর আছে—তাদের সকলের বাড়া এক-চিলতে এই বাড়ির উঠোন। এ উঠোন পার হয়ে বিদেশবিভুঁই বেরুনো যার তার কর্ম নয়। মস্তবড়ো সাহস-হিম্মত লাগে।

প্রায়ই তো ভবনাথ বকাবকি করেন—বিশেষ করে হাটবারে হাটে যাবার মুখটায়। জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। দেখ নাকেন, সর্ষের-তেলের সের একেবারে পুরো সিকেতে উঠে গেছে—আর ফি হাটে তেল কিনতেই হবে, তেলের ভাঁড় এনে হাজির করবে। ভবনাথ দুম করে ভাঁড় ছুঁড়ে দেন—বাটির ভাত আলুনি হয়ে যায়। ফল এই হল, হাটে গিয়ে তেল তো কিনলেনই—সেই সঙ্গে নতুন তেলের ভাঁড়। ভাঁড় এত বং কত যে ভাঙলেন আর কিনলেন, লেখাজোখা নেই। কী করবেন, মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। সেই সময়টা

কৃষ্ণময় সামনে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই : একলা তাইটি কত দিকে কত সামলাবে। মাসে দশটা টাকা রোজগার করলেও তো বিস্তর আসান। গায়ে বালি মেখে কাঠবিড়ালিও সেতুবন্ধনের কাজে লেগেছিল।

কৃষ্ণময় সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া, সে দিগরের মধ্যে আর নেই। বেশ খানিকক্ষণ গজর গজর করে ভবনাথ শিশুবরকে নিয়ে হাঠে চলে যান।

বাপের বকাবকি অতএব নতুন কিছু নয়, গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। তারপর অলকা-বউ ঘাড়ে লাগল : বেরিয়ে পড়ো, চাকরি বাকরি করোগে। যেমন-তেমন চাকরি দুধ-ভাত, কথা চলতি আছে। চাকরে-মানুষের বউয়ের মেয়েমহলে আলাদা খাতির—অলকার বড় ইচ্ছে, সকলে তাকে চাকরের-বউ বলবে। এই একঘেয়ে গাঁয়ে পড়ে থাকা নয়—মাঝেমধ্যে বাড়ি আসবে কৃষ্ণময়। গরুর-গাড়ি নাগরগোপে—পাকারাস্তার পাশে। বাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামছে তো নামছেই। যতদিন সে বাড়ি আছে, সকাল-বিকাল লোকের ভিড়ের অন্ত নেই—এ আসছে সে আসছে, নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ লেগেই আছে, দেবনাথ বাড়ি এলে যেমনটি হয়। অলকা-বউ ভাবে এ সব আর অতিষ্ঠ করে তোলে কৃষ্ণময়কে। একদিন রাত-দুপুরে অন্ধকার ঘরে কানে কানে কথাটা বলেই ফেলল, মা হতে যাচ্ছি—একটা পয়সার জন্যে শ্বশুর-শাশুড়ির হাত-তোলা হয়ে থাকা এখন আর চলে নাকি? তুমি যাও।

অলকার তাড়নার কথা কাকামশায়ের কাছে বলা যায় না, কৃষ্ণময় সম্পূর্ণ বাপের দোহাই পাড়ল। দেবনাথের দেখাশুনা হবে মনে করে ভবনাথই যেন পাঠাচ্ছেন।

পুজো তারপরে আরও দু-বছর হয়ে গেছে। নামেই দুর্গোৎসব—উৎসব কিছু নেই। ধর্মকর্ম বংশে সয় না ভবনাথ বলছিলেন। দুর্গোৎসব একবার ঠাকুরদাদার আমলেও হয়েছিল পুণ্যশীলা ঠাকুরমার ইচ্ছায়। বোধনের বেলগাছটা সেই সময়ের পোঁতা। দোল-দোল-দুর্গোৎসব তিন পার্বণই বরাবর করে যাবেন, ঠাকুরমার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বছরের মধ্যেই সাপে কাটল তাঁকে। ঠাকুরদাদা বললেন, যার জন্যে পুজো—দুর্গাঠাকরুন তাকেই নিয়ে নিলেন। ও ঠাকরুনের মুখদর্শন করব না আর আমি। সে তো হয় না—নিয়ম আছে, দুর্গোৎসব একবার করলে নিদেনপক্ষে তিনটে বছর পর পর চালিয়ে যেতে হবে। তা ঠাকুরদাদারও তেমনি জেদ—বাড়িতে প্রতিমা কিছুতে তোলা হবে না। পুরুতঠাকুরকে টাকা দিয়ে দিতেন। যজমানের হয়ে তিনি নিজের বাড়িতে পুজো সারতেন। দুটো বছর এইভাবে পুজো চালিয়ে দায়মুক্ত হয়েছিলেন ঠাকুরদাদা। এতকাল বাদে রাতবিরেতে

প্রতিমা ফেলে কারা পূজো চাপিয়ে দিল,—পূজোর ফলও মা হাতে-হাতে দিয়েছেন—

ভবনাথ রায় দেবার আগে উমাসুন্দরী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, প্রতিমা-বরণের সময় মণ্ডপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি বলে দিয়েছি, আবার এসো মা। আনতে হবে. পুরুত বাড়ি-টাড়ি নয়, আমাদেরই মণ্ডপে। মায়ের যা ইচ্ছে তাই হবে, আমাদের কাজ আমরা করে যাব।

পূজো হল আরও দু-বছর। দেবনাথ আসেন নি, টাকা সহ কৃষ্ণময়কে পাঠাতেন। নিতান্ত রীতরক্ষের মতন নমো-নমো করে পূজো।

পিওনঠাকুর ভিতর-উঠানে এসেন এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, নেই বুঝি ঘোষমশায়—সদরে গেছেন? উঃ, পারেনও বটে! আমার তো এই দেড় ক্রোশ পথ হাঁটতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। আর উনি সদরের দশ ক্রোশ পথ হরবখত যাচ্ছেন আর আসছেন। অথচ বয়সে আমার চেয়ে সাত-আট বছরের বড় তো হবেনই। দেবনাথবাবু আর আমি প্রায় একবয়সি।

রান্নাঘরের কানাচে ক'টা উখোঝালের গাছ। উমাসুন্দরী লঙ্কা তুলছিলেন সেখানে গিয়ে, লাল লাল লঙ্কায় আঁচল ভর্তি করে এই সময় এসে দাঁড়ালেন। যাদব চাটুয্যের কথায় সায় দিয়ে বললেন, যা বলেছেন ঠাকুরপো। কী নেশায় ওঁকে পেয়ে বসেছে—পনেরটা দিন যদি নালিশ-মোকদ্দমা না থাকে, হাঁসফাঁস করতে থাকেন। গায়ে যেন-জল-বিছুটি মারে।

হাসিমুখে পিওনঠাকুরকে আহ্বান করলেন: বসুন আপনি, হাত-পা ধোন। আছেন উনি। ধান-কাটা লেগেছে, কালীকে নিয়ে বিলে গেলেন। আজকের সেবা এইখানে কিন্তু। খাল-সেঁচা বড় বড় কইমাছ দিয়ে গেছে, জিয়ানো আছে। পায়ের ধুলো যখন পড়ল, পাক শাক আপনার হাতেই হবে।

রন্ধনকর্মে যাদব বাঁড়ুয্যে এক-পায়ে খাড়া। আজ কিন্তু ইতস্তত করে বলেন, দীনু চক্কোত্তি মশায় আগাম নেমতন্ন দিয়ে রেখেছেন যে—

বিনো বলে উঠল, চক্কোত্তিবাড়ির তো বাঁধা নেমতন্ন। হবে, খাওয়াদাওয়া সেরে একপিঠে হয়ে বসে যাবেন।

না হে, খেলা নয়—খাবার নেমতন্ন আজ। চক্কোত্তিমশায় সেদিন বলে দিলেন, অথর্ব হয়ে পড়েছি—ক'দিন আর বাঁচব। সকাল সকাল চলে এসো, দুপুরবেলা একত্তর দুটো শাক-ভাত খাওয়া যাবে।

বিনো হেসে বলল, তার মনে রাঁধাবাড়ার সময়টুকুও মিছে নষ্ট হতে দেবেন না। গেলেই অমনি হাত ধরে দাবায় নিয়ে বসাবেন।

পিওনঠাকুর ভ্রূভঙ্গি করলেন : চক্কোত্তিমশায়ের সঙ্গে দাবাখেলা—খেলা না ঘোড়ার ডিম। আগে যা-ও বা খেলতেন, বিছানায় পড়ে থেকে থেকে মাথা এখন ফোঁপরা হয়ে গেছে। ভুল চাল দেবেন, আর চাল ফেরত নেবেন। তবু বলতে হয়,—আতুর মানুষের কথা ঠেলতে পারিনে, কি করব।

দু-হাতে এক জলচৌকি তুলে নিমি রোয়াকে এনে রাখল। বলে, বসুন কাকা—

উমাসুন্দরীর দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে যাদব বলছেন, দাবাড়ে বটে একজন—আপনাদের দেবনাথবাবু। কত খেলেছি—সে এক দিন গিয়েছে। বলতেন, বাইশ চালে মাত করব। মুখে যা বললেন, কাজেও ঠিক তাই করে ছাড়তেন। পাশাতেও তেমনি, হাড়ের পাশা যেন ডাক শুনতে পায়। কচ্চে-বারো, ছ-তিন নয়, পঞ্জুড়ি—চোখ তাকিয়ে দেখ, দানেও ঠিক তাই পড়েছে। অনভ্যাসে এখন নাকি সব বরবাদ হয়ে গেছে—বললেন তো তাই সেবারে।

ছুটোছুটি করে নিমি গাড়ু-গামছা এনে জলচৌকির পাশে রাখল। বলে, বসুন কাকা, হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন।

হাত পা ধুয়ে কি হবে মা, চক্কোত্তিবাড়ি যাব এক্ষুনি।

বিনো বলল, চক্কোত্তি-খুড়িমা বেঁধেবেড়ে পাতের কোলে বাটি সাজিয়ে দেবেন, আর এখানে হলে নিজে রান্না করবেন। কোনটা ভাল, বিচার করে দেখুন পিওনকাকা।

প্রলোভন বিষম বটে। যাদব জলচৌকিতে বসলেন, গলার ঝুলন্ত ব্যাগ নামিয়ে পাশে রেখে দিলেন।

মিথ্যে করে উমাসুন্দরী আরও জুড়ে দিলেন : বেগুন দিয়ে কই-তেল রান্না হবে—বউমা ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। আপনার গলা শুনে বলল, ঠাকুরমশায় এসে গেছেন—আর ভাবনা কি। ছাড়বে না ওরা, আপনার কাছে প্রসাদ পাবে বলে নাচানাচি করছে।

যাদব বাঁড়ুয্যে জল হয়ে গেলেন। বললেন, চিঠি ক'খানা বিলি করে আসি তবে। ঝঞ্ঝাট সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে বসব।

কিন্তু বাড়ির মধ্যে পেয়ে ছাড়তে এরা রাজি নয়। ভাল মাছ অন্য বাড়িতেও থাকতে পারে। পারে কেন, আছেই। অঘ্রাণে বিলের জলে টান ধরেছে, কুয়ো সেঁচা হচ্ছে—শোল কই মাগুর সিঙ্গি সব বাড়িতে। যাদবকে পেলে হাতের রান্না না খাইয়ে কেউ ছাড়তে চাইবে না—নানান অজুহাতে করে ঠিক আটকাবে।

নিমি আবদারের সুরে বলল, এখন যাওয়া হবে না পিওন-কাকা। ছাড়ছে

কে, যে যাবেন? চিঠি বিলি বিকেলের দিকে হবে। না-হয় হাটে গিয়ে করবেন। যদি কেউ এখন এসে পড়ে, হাতে হাতে নিয়ে যাবে।

উমাসুন্দরী বিনোকে বললেন, দাঁড়িয়ে থাকিসনে মা, বেলা কম হয় নি—সিধেপত্তর গোছা গিয়ে এবার।

যাদবকে বললেন যান, একটা ডুব দিয়ে আসুন। আমরা উনুন ধরাতে লাগি।

বড়গিন্নি উনুন ধরানোর ব্যবস্থায় গেলেন। পুঁটি এসে বলে, চিঠিপত্তোর আছে পিওন-কাকা?

রাঁধাবাড়ার প্রসঙ্গে মত্ত হয়ে পিওনঠাকুর আসল কথাই ভুলে ছিলেন। এইবারে যেন মনে পড়ল। বললেন, থাকবে না মানে? তবে আর এসেছি কেন?

দেমাকের সুরে আবার বলেন, শুধু চিঠি কেন—চিঠি মনিঅর্ডার দুই রকম—

হাসিমুখে নিমি পুঁটিকে ধমক দিয়ে উঠল: চিঠিতে তোর কি দরকার রে? কে পাঠিয়েছে?

রান্নাঘরের অলকা-বউয়ের উদ্দেশে আড়চোখে তাকিয়ে নিমি নিম্নকণ্ঠে বলল, বড়দার চিঠি অনেক দিন আসে নি, বউদি তাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বিষম চাপা, মুখে কিছু বলে না। বেড়ার ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল আপনার গলা পেয়ে।

ব্যাগ হাতড়ে যাদব খামের চিঠি ও মনিঅর্ডার বের করলেন। নজর বুলিয়ে বললেন, ঘোষমশায়ের নামে দুটোই। মামলার জরুরি কথাবার্তা থাকে বলে ওঁর চিঠিপত্তোর অন্যের হাতে দেওয়া মানা। মনিঅর্ডার কলকাতার—জ্যেষ্ঠকে দেবনাথবাবু তিরিশ টাকা পাঠিয়েছেন। কুপনে খবরাখবর আছে। কুপন পড়তে বাধা নেই—

একটুকু পড়ে উল্লাসে বললেন, এই তো, কুশলে আছেন ওঁরা সকলে। তবে আর ব্যস্ত হবার কি?

বুড়োমানুষের কত আর বুদ্ধি হবে। কুশল-খবর জানলেই হয়ে গেল যেন সব। এর বাইরে মানুষের আর যেন উদ্বেগ থাকতে নেই। গোঁসাইগঞ্জের কুশল-খবর তো হামেসাই কানে আসে—রীতিমত কুশলে আছে দুলাল। ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে নির্মলা বলল, খামের চিঠি কোথা থেকে আসছে, দেখুন তো পিওন কাকা।

ঠাহর করে দেখে পিওনঠাকুর বললেন, জ্যাবড়া শিলমোহর—দেখে কিছু

বোঝবার উপায় নেই। আঁট-চিঠি ভবনাথ ঘোষের নামে—তাঁর হাতে দেবো, তিনি খুলবেন। মনিঅর্ডারের কুপনে লুকোছাপা নেই, তাই বরঞ্চ পড়ে দেখ—

গোটা গোটা সুস্পষ্ট হস্তাক্ষর দেবনাথের। শুধুমাত্র অক্ষর-পরিচয় থাকলেই আটকানোর কথা নয়। বিড়বিড় করে নির্মলা খানিক বানান করে নেয়। তারপর শব্দসাড়া করে পড়ে ওঠে, রান্নাঘরে অলকা-বউয়ের কান অবধি যাতে গিয়ে পৌঁছয়।

সর্দিকাশি ও জর হইয়া আমায় একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছি। শ্রীমান কৃষ্ণময় কুশলে আছে। আমাদের জন্য চিন্তা করিবেন না। অত্র তিরিশ টাকা পাঠাইলাম, ইহার অধিক সম্প্রতি সম্ভব হইল না। সংসার-খরচ দশ টাকার মধ্যে কুলাইয়া গেলে মামলা-খরচ বিশ টাকা হইতে পারিবে। আপাতত এইভাবে চালাইয়া লউন, মাসখানেক পরে আবার পাঠাইতে পারিব বলিয়া মনে করি।

যাদব হো-হো করে উচ্চহাসি হেসে উঠলেন : পেটে খাওয়ার যা খরচ, তার ডবল হল মামলার খরচ। দুই ভাই ওঁরা এক ছাঁচের। বিষয় না বিষ—সম্পত্তি থাকলেই ওই রকম হবে। নেই বিষয়, কসবার পথঘাটও তাই আমি চিনি নে। মাইনে যে ক'টা টাকা পাই, পেটে খেয়ে শেষ করি। দিব্যি আছি নির্ঝঞ্ঝাটে আছি।

আচমকা রাজির প্রবেশ। দত্তবাড়ির রাজবালা (বিয়ের আগের নাম রাজলক্ষ্মী), শশধর দত্তের নাতনী। শশধরের বড়ছেলে হরিদাস বহুদিন মারা গেছে তার মেয়ে। এ-বাড়ির নিমির সঙ্গে বড্ড ভাব—ডাকাডাকি কিন্তু 'চক্ষুশূল' বলে। বলে, সই পাতাইনি আমরা—সইয়ের বদলে 'চক্ষুশূল' পাতিয়েছি।

রাজিকে দেখে নিমি কলরব করে উঠল : পিওন-কাকা আসতে না আসতেই টনক নড়েছে। চিঠি নেই—কাকাকে আমি জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি।

রাজি লজ্জা পেয়ে বলে, সেই জন্যে বুঝি। জলপাই পাড়তে যাবার কথা না এখন ?

পিওনঠাকুর ওদিকে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন : আছে মা তোমার চিঠি। আছে—

ব্যাগের মধ্যে হাতড়াচ্ছেন তিনি।

নিমি বলে, নাঃ, পিওন-কাকা একটু চেপে থাকতে পারেন না। মুখের চেহারা কি হত, দেখতেন।

হাসতে হাসতে তার মধ্যে নিমি নিজেও একটা নিশ্বাস চেপে নিল।

বয়স হলেও বিনো চুপ থাকতে পারে না. এদের মধ্যে ফোড়ন কেটে ওঠে : চিঠি নেই, রাজি বিশ্বাসই করত না। জামাই বড্ড লিখিয়ে-পড়িয়ে—পিওন-কাকার একটা ক্ষেপও বাদ যায় না।

এই যে—। ব্যাগের ভিতর থেকে চিঠি বের করে চশমাটা নাকের উপর তুলে যাদব বাঁড়ুয্যে ঠিকানা পড়ে যাচ্ছেন : শ্রীমতী রাজবালা বসু, শ্রীযুক্ত বাবু শশধর দত্ত মহাশয়ের বাটি পৌঁছে। নাও তোমারই চিঠি।

সবুজ রংয়ের আটা-খাম, ফুল-লতা-পাতার উপর দিয়ে চিঠি মুখে একটা পাখি উড়ছে—তার ছবি খামের উপরে, এবং পাখির পাশে ছাপার অক্ষরে লেখা 'যাও পাখি বলো তারে—'। দিব্যিদিশেলা আছে খামের আঁটা-মুখের উপর : মালিক ভিন্ন খুলিবেন না—সাড়ে-চুয়াত্তর। এত ব্যাপারের পরেও সশব্দে ঠিকানা পড়ার কি আছে, সোনাখড়ি গ্রামের মধ্যে এমন চিঠি রাজি ছাড়া কার নামে আর আসতে পারে ?

চিঠি এগিয়ে ধরলেন পিওনঠাকুর। রাজির লজ্জা—বরের-চিঠি হাত পেতে নেয় কী করে ? মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

বিরক্ত হয়ে পিওনঠাকুর বললেন, সেদিনও এমনি করেছিলে। আমি ছুঁড়ে দিলাম, চিলের মতন ছোঁ মেরে নিয়ে ছুঁড়িগুলো পালাল। নিত্যি নিত্যি ও-রকম তো ভাল নয়। আজও ঐ দেখ কতকগুলো এসে পড়ল।

খবর হয়ে গেছে—চারি সুরি ফেন্সি বেউলো সমবয়সিরা সব আসছে। চোখ তুলে রাজি দেখল একবার—পিওনঠাকুরের দিকে তবু এগোয় না, নতমুখে আঙুলে আঁচল জড়ায়।

রাজির সই—সেই দাবিতে নিমি এসে হাত পাতল : আমায় দিন কাকা, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

বেড়ালের উপর মাছের ভার—নইলে জুত হবে কেন ? যাদব বাঁড়ুয্যে উচ্চহাসি হেসে উঠলেন। অলকা-বউ ওদিকে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে—না, তার হাতেও নয়। বিনোর ভারিক্কি বয়স, এবং ভক্তিমতীও বটে। দু-খানা মাত্র হাতে দশভুজা হয়ে সে রান্নাবান্নার ব্যবস্থায় আছে। এত সমস্ত সত্ত্বেও ফচকেমি আছে ষোলআনা—কাজকর্ম ভুলে দুই চক্ষু মেলে সে রঙ্গ দেখছে। ইতস্তত করেছেন পিওনঠাকুর। রোয়াকের উপর তরঙ্গিণী ফুলবড়ি কতটা শুকাল আঙুল টিপে টিপে পরখ করছিলেন, নেমে এসে বললেন, চিঠি আমায় দিন ঠাকুরমশায়—

মেয়েগুলোর দিকে দৃষ্টি হেনে বললেন, আমার কাছে কাড়তে আসবে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে দেখি।

খাম নিয়ে তরঙ্গিণী রাজির হাতে দিলেন। একেবারেই কাঠের-পুতুল—চিঠি দিয়ে হাতের মুঠো সজোরে বন্ধ করে দিতে হল। দক্ষিণের-ঘরে ঢুকে গেছেন—পটপরিবর্তন অমনি সঙ্গে সঙ্গে। রাজির উপর সবগুলো মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তুমুল হুড়োহুড়ি—কেড়ে নেবে চিঠি, খুলবে পড়বে। রাজিও আর সে-রাজি নয়—বরের চিঠি মুঠোয় এঁটে কাঠের-পুতুল এখন ঘোরতর লড়নেওয়ালী। ধাক্কাধাক্কি করে একে ঠেলে ওকে চড় কাবরে দিয়ে চোঁচাদৌড়। মেয়েরাও ছুটছে। বাড়ি ছেড়ে পথে এসে। ধরবে রাজিকে—ধরবেই। সহজ নয় সেটা। দৌড়চ্ছে রাজবালা—মেয়ে সাত-আটটায় পৌঁছেছে, পিছন পিছন তারা। শিয়ালখুল্লি দিচ্ছে রাজি—অর্থাৎ পালাচ্ছে একবার এদিক একবার সেদিক, শিয়ালে যে কৌশলে পালায়। পথ ছেড়ে হেড়াঞ্চিবনে ঢুকল। তারপর আম-বাগিচায়—চষা-ক্ষেতে পুকুরপাড়ে। ছুটতে ছুটতে প্রায় তো দত্তবাড়ি, নিজেদের বাড়ি, এসে পড়ল। রণে ভঙ্গ দিয়ে ওদিকে এখন মাত্র তিনে ঠেকেছে—চারি, ফেল্পি আর বেউলো। ফেল্পি কাতরাচ্ছে: চিঠি না দেখাবি, কি কি পাঠ দিয়েছে তাই শুধু বলে যা—

কী ভেবে রাজি দাঁড়িয়ে পড়ল। খাম না ছিঁড়ে পাঠের কথা কি করে বলবে। চারজনে তারপর পুকুরপাড়ে জামতলায় গোল হয়ে বসল। ছুটো-ছুটির মধ্যে নিমি নেই, দলছুট একা সে চিঠি দেখবে। দেখাতেই হবে তাকে, না দেখিয়ে উপায় নেই। চিঠির যথোচিত জবাব দিতে হবে না—সে মুশা-বিদা গাঁয়ের মধ্যে এক নিমি ছাড়া অন্য কারো সাধ্য নেই।

মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চারজনে পাঠোদ্ধারে মগ্ন। পাশ-করা বর হয়ে মুশকিল হয়েছে, শক্ত শক্ত কথা লেখে, বানান করে পড়তে হয়, বারো-আনা কথার মানেই ধরা যায় না। সাদামাটা 'হৃদয়েশ্বরী' 'চন্দ্রমুখী' 'প্রাণপ্রতিমা' পাঠ লিখে সুখ পায় না—ফলাও করে লেখে, 'হৃৎপিণ্ডেশ্বরী' লেখে 'অরবিন্দাননা'। বাপরে বাপ, উচ্চারণে দাঁত ভাঙে, জল তেষ্টা পেয়ে যায়। নতুন বউয়ের বিদ্যা কতদূর, প্রাজ্ঞ বর সঠিক হদিস পায়নি এখনো। এবং রাজলক্ষ্মী স্থলে রাজবালা—নব-নামকরণের ইতিহাসও সম্যক অবগত নয়। কনে দেখতে এসে পাত্রপক্ষ এতাবৎ গায়ের রং ও নাক-চোখ-মুখের গড়ন দেখত, বিনুনি খুলে মাথার চুল দেখত, হাঁটিয়ে চলন দেখত। এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করে কণ্ঠস্বর শুনত। মোচার ঘন্ট কোন প্রণালীতে রাঁধতে হয়, চালের উপরে ক' আঙুল জল দিলে আর ফ্যান-গালার প্রয়োজন থাকে না—অর্থাৎ সারাজন্ম যা করতে হবে, তার উপরে আজামোজা পরীক্ষা। পরবর্তী-কালে আরও এক প্রশ্ন - মেয়ে কি কি শিল্পকর্ম জানে—আসন থঞ্জিপোশ

বোনা, কার্পেটের উপর উল দিয়ে রাধাকৃষ্ণের ছবি তোলা, এসমস্ত পারে কিনা? অসুবিধা নেই—এর-ওর কাছ থেকে দু-চারটে চেয়েচিন্তে এনে রেখেছে, বলে দিল যেয়ে সব নিজের হাতে বুনেছে। সামনে বসিয়ে দিনের পর দিন পরখ করবে কেমন করে?

এ পর্যন্ত ভালই। হাল-ফিল এক ধুয়ো উঠেছে, কনের লেখাপড়া কদ্দূর? বউ নিয়ে গিয়ে সেরেস্তায় বসিয়ে দাখলে লেখাব, ভাবখানা এই প্রকার। কাগজ-কলম নিতে বলবে : নমটা লেখো দিকি মা--। ঠাকুরদাদা শশধরও তেমনি শত্রুতা সেধেছেন--দুনিয়ায় আর নাম খুঁজে পান'ন, সোহাগ করে নাতনির গাল-ভরা জাঁকালো নাম দিয়েছিলেন- রাজলক্ষ্মী। লাও ঠ্যালা। নাম নিয়েও দায়ে পড়তে হয়, তখন ওঁদের ধারণায় ছিল না। অ-আ ক-খ বাদ বাটা অক্ষরগুলো কায়ক্লেশে যদি-ই বা সাজানো যায়, যুক্তাক্ষর রাক্ষি কিছুতেই বাগাতে পারে না। অথচ নিজ নামেরই শেষে ক্ষ্মী--'ক'য়ে 'ষ'য়ে ক্ষ, তার নিচে একটা ম-ফলা এবং মাথায় দীর্ঘ ঈ-কার। অমন যে প্রহ্লাদ মাস্টারমশায়--উঁকে দিলেও সম্ভবত গুলিয়ে ফেলবেন। দু-দুটো ভাল সম্বন্ধ ফেঁসে গেল শুধু ঐ নাম লেখার গণ্ডগোলে। নিজের ভুল বুঝে শশধর তখন 'রাজলক্ষ্মী' পাল্টে 'রাজবালা' নাম দিলেন। এবং একমাস ধরে সকাল-বিকাল মকসো করালেন। তবে বিয়ে গাঁথল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় আলাদা একটা উনুন। অতিথ-অভ্যাগতের স্বপাক-ভোজনের গরজ পড়লে তখন এই উনুন জ্বলে। সকালের ফ্যানসা-ভাতটাও বর্ষাকালে উঠানে না হয়ে এই উনুনে হয়। বিনো সিধেপত্তোর গুছিয়ে যাদবকে ডাক দিল : আসুন পিওনকাকা--

উনুনের উপর পিতলের কড়াই। জলচৌকির উপর চেপে বসে খুন্তিটা সবে তুলে নিয়েছেন--যাদব চমক খেলেন : কানাচের দিকে কে যেন শাপ-শাপান্ত করছে কাকে?

ও গুণো. কাজকর্মে লেগেছে!--বিনো হেসে বলল, এখন এই। খেটে খেটে আরও কাতর হোক, তখন শুনবেন।

গোপাল নাথের বউ গুণমণি। গোপাল বসন্তরোগের চিকিৎসা করত, টিকা দিত। এখানকার চলতি গোবীজের টিকা নয়--বাংলা-টিকা। মানুষের মধ্যে কারো বসন্ত হলে (বসন্ত নয়, বলতে হয় 'মা-শীতলার অনুগ্রহ') তাই থেকে বীজ নিয়ে টিকা দিত। বড় সাইজের টিকা--গোলাকার রুপোর টাকার মতন। এই টিকা একবার নিলে সারা জন্ম আর বসন্তর ভয় থাকে না। বছর বছর

টিকা নিতে হয় না এখনকার মতো। তবে বাংলা-টিকায় হিতে-বিপরীত হত কখনো-সখনো আনাড়ি টিকাদারদের হাতে পড়ে, নীরোগ মানুষকে সাংঘাতিক বসন্তরোগে ধরত, সে-রোগের চিকিৎসা ছিল না—শেষমেশ রোগীকে চিতায় উঠতে হত। কিন্তু গোপাল নাথের হাতে এমন একটা-দুটোর বেশি ঘটেনি। সে-ও গোড়ার দিকে—হাত পোক্ত হয়নি তখন। নৌকো-দুর্ঘটনায় নির্বংশ হয়ে যাবার পর গুণমণি পাগল হল, গোপালও তারপরে আর নরুণ ধরে টিকা দিতে যায় নি কোথাও। শত অনুরোধ-উপরোধেও না।

গুণমণি সর্বক্ষণ এমনি বিড়বিড় করে। কাজে বসলে অলক্ষ্যে কার সঙ্গে যেন কথাবার্তা শুরু করে দেয়। ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রমশ গালিগালাজ—শেষটা চিলের মত চেঁচাবে। ভবনাথ কি উষাসুন্দরী তখন গিয়ে কাজ থেকে তুলে আনবেন, অন্য কেউ সে মূর্তির সামনে এগোয় না। গলায় জোর ক্রমশ নরম হয়ে শেষটা আবার বিড়-বিড় করে গালি।

যাদব শুধান: গালি দেয় কাকে?

তা কে জানে? যমরাজকেই বোধহয়। তিন তিনটে ছেলে ডুবিয়ে লহমার মধ্যে যিনি নির্বংশ করে দিলেন। গোপাল নাথকেও হতে পারে—দু'কুড়ি বয়স পার হয়ে গিয়ে কেশোরুগি এই গুণমণিকে বিয়ে করেছিল।

তাই বা কেমন করে? গোপালের উপর গুণমণির টান বিষম। গোপালের বাড়ি এ গ্রামে নয়, পাঁচারই—বুড়িভদ্রা গাঙের উপর। এই মাস কতক আগে সোনাখড়ি এসে ঘর বেঁধেছে। নৌকোডুবিতে তিন তিনটে ছেলে মারা গেল—দহের মুখে পড়েছিল নৌকো। ছেলেদের সঙ্গে গুণমণিও ছিল, ঢেউয়ের মুখে কোনরকমে সে ডাঙায় গিয়ে পড়ে। মাথা খারাপ সেই থেকে। বাড়ি ছিল একেবারে গাঙের উপরে। পাগলের এক বাতিক হল, যখন তখন গাঙে ঝাঁপ দিতে যায়—বলে, ছেলেদের ডেকে নিয়ে আসি। গোপালের বয়স হয়েছে—তার উপর রোগে শোকে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। বিয়েয় কন্যাপক্ষকে ওদের মোটা পণ দিতে হয়—এই পণের সংগ্রহে বর বুড়ো হয়ে যায় অনেক সময়, বুড়ো বরে কচি মেয়ের বিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেইজন্য কথা চলিত আছে: 'খুড়ি লায়েক হতে হতে খুড়ো চিতেয় ওঠে।' গোপালের সেই অবস্থা।

মামাতো-ভাই ভগবান দুঃসময়ে দেখতে এসে প্রস্তাব করল: পড়ুটে মানুষ তুমি পাগল-বউ কাঁহাতক চোখে চোখে রাখবে? গাঙের ধারে থাকাও ঠিক হচ্ছে না। চলো আমার বাড়ি। ধরে পেড়ে-সোনাখড়িতে তাদের নিয়ে এলো। নিজের বাস্তুভিটের পাশে আলাদা একটা চালা তুলে দিয়েছে।

এখানে এসে পাগলীর এক নতুন রোগ-লক্ষণ দেখা দিল। গোপালকে সে

চোখে হারায়। এক একদিন চাল বাড়ন্ত থাকে—সে দিন গুণমণি বাড়িতে না রেঁধে ভাত রোজগারে বেরোয়। একটানা খেটে যাবে দুপুর অবধি, তারপর কাঁসর পেতে ধরবে। গৃহস্থ ভাত দেয়। ভাত গুণমণি সেখানে বসে খাবে না, বাড়ি নিয়ে আসবে। একজনের ভাত দিলেও হবে না—দুজনের মতো। বাড়ি এসে গোপালকে ভাত বেড়ে দিয়ে নিজে সামনে বসে। বেশ করে না খেলে ঝগড়া করে। এমন কি সময় বিশেষে চড়টা-চাপড়টাও দেয় নাকি। ঠিক যেমন মরা ছেলেদের উপর করত।

বিনো আছে পিওনঠাকুরের কাছে। আচমকা এই কাজটা পেয়ে বর্তে গেছে সে। বাটনা বাটছে, জল এনে দিচ্ছে পুকুরঘাট থেকে। এটা দাও ওটা আনো—ফাইফরমাস খাটছে। ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, সদাসতর্ক।

পাড়ার মধ্যে খবর হয়ে গেছে, পিওনঠাকুর গাঁয়ে এসেছেন। এবং পাড়ার বাইরেও কোন কোন বাড়ি। চিঠিপত্তোর এলো কিনা খোঁজ নিতে সব আসছে এমনিটাই হয়ে থাকে—জানা আছে যাদবের। রাঁধতে রাঁধতে চামড়ার ব্যাগ ছোঁবেন না—চিঠি বের করে শাক-খোওয়া ডালায় রেখেছেন, চিঠির মালিক এসে পড়লে বাঁ-হাতের দু-আঙুলে তুলে আলগোছে সেই লোকের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন।

লাঠি ঠুক-ঠুক করতে করতে গৌরদাসের মা-বুড়ি পাঁচিলের দরজায় এসে দেখা দিল। সর্বনাশ, পিওন আসার খবর অদ্দুর ঐ মেঠোপাড়া অবধি পৌঁছে দিতে গেল কে? ফিচেলের অভাব নেই—মজা দেখবার অভিপ্রায়ে নিশ্চয় কেউ খবর দিয়ে এসেছে। তোবড়ানো মুখ বুড়ির—গালে একটি দাঁত নেই, কোনো এক কালের ফর্সা রং জলেপুড়ে তামাটে হয়ে হয়ে গেছে। চোখ দুটো কোটরের মধ্যে তলিয়ে রয়েছে। তবু সে চোখের দৃষ্টি বাঘের দৃষ্টি। দৃষ্টিটা যাদব বাঁড়ুয্যে বড্ড ডরান। বাঘ সত্যি সত্যি একবার বাঁড়ুয্যে মশায় দেখেছিলেন, বাঘের একেবারে মুখোমুখি পড়েছিলেন। বাদার বাঘ মাঝে মাঝে তল্লাটে ঢুকে পড়ে, তেমনি একটা হবে। হাটুরে মানুষ দশ-বারোজন হাট-ফেরতা বাড়ি যাচ্ছে—যাদব বাঁড়ুয্যেও তাদের মধ্যে। জ্যোৎস্না রাত—পথের ধারে বেতঝোপের পাশে বাঘ তাকিয়ে রয়েছে। এতগুলো গলায় হাঁক পেড়ে উঠতে—যেন কিছুই নয় এমনি একটা অবহেলার ভাব নিয়ে বাঘ বনজঙ্গলে ঢুকে পড়ল। চকিত হলেও যাদব বাঘের দৃষ্টি দেখেছিলেন—সে-ও কিন্তু গৌরদাসের মা-বুড়ির মতন এমন ভয়ঙ্কর নয়।

এমনি তো ত্রিভঙ্গ-দেহ—রান্নাঘরের ছাঁচতলায় এসে লাঠির উপর ভর দিয়ে

কী আশ্চর্য! বুড়ি টান-টান হয়ে দাঁড়াল। মাথায় কড়াত করে আওয়াজও হল যেন। ভূমিলগ্ন সাপ ফণা তুলে হঠাৎ যেন খাড়া হয়ে ওঠে।

খোনা গলায় বুড়ি বলে উঠল, খোল ফুটছে কড়াইয়ের মধ্যে—তা অত কি দেখছ ঠাকুর? তাকাও ইদিকে। এলো আমার গৌরদাসের চিঠি?

যাদব ঘাড় নাড়লেন।

আজও নয়? চিঠি তুমি কতকাল দাওনি বলো তো ঠাকুর?

বিপন্ন যাদব বলেন, ভাল রে ভাল। ডাকে না এলে আমি দিই কেমন করে?

বিনোর দিকে চেয়ে অসহায় কণ্ঠে বললেন, অবুঝকে কী করে বোঝাই। তুমি মা বিনোদিনী চেষ্টা করে দেখ। ছেলে চিঠি দেবে না, তার চিঠি আমি লিখে আনব নাকি?

বুড়ি চোখ পাকিয়ে পড়ে: বটে! গৌরদাস আমার তেমন ছেলে নয়। চিঠি সে ঠিক লিখে যাচ্ছে, তুমি গাপ করে ফেল। বড়লোকের পা চাটা তুমি ঠাকুরমশায়। বাগ ভরতি করে তাদের চিঠি গাদা গাদা আনতে পারো, আমার গৌরের একখানা চিঠি নিয়ে আসতে হাত কুড়িকুষ্ঠ ধরে তোমার। উচ্ছন্নে যাবে, খানেখরাপে যাবে, ভিটেয় তোমার ঘুঘু চরবে—

নারদ, নারদ!

কানাচে কাণ্ড খলখল করে হেসে উঠল। কলহের দেবতা নারদ—অলক্ষ্যে আবির্ভূত হয়ে জিনিসটা তিনি আরও জোরদার করবেন, এই জন্য ডাকাডাকি। ডেকেই দৌড়।

আঙুল মটকে মটকে বুড়ি গালি পাড়ছে। পিওনঠাকুর একেবারে চুপ। অপরাধী বটে তিনি, চিঠি সত্যিই গাপ করেছিলেন। আক্রোশ মিটিয়ে বাকাশেল নিক্ষেপ করে বুড়ি অবশেষে ফিরে চলল। পূর্ববৎ কুঁজো হয়ে গেছে—মাটি থেকে মাথা হাত দেড়েক মাত্র উঁচুতে।' লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে গৌরদাসের মা বাড়ির বার হয়ে গেল।

মাথা নিচু করে আছেন যাদব বাঁড়ুয্যে। উনুনে কাঠ ঠেলে দেওয়া হয়নি—নিভে যাবার গতিক।

বিনো বলে, কি হল পিওনকাকা? বুড়ির কথা কানে নেবেন না। মাথার ঠিক নেই ওর।

হঠাৎ যেন সম্বিত পেয়ে যাদব উনুনে খান দুই গামড়া গুঁজে দিলেন। চিঠি গাপ করেছেন সন্দেহে বুড়ি শাপশাপান্ত করে গেল। ব্যাপারটা সর্বাংশে সত্য। সরকারি লোকের পক্ষে অতিশয় গর্হিত কাজ—কোন দিন কাউকে জানতে

দেবেন না। মাস তিনেক আগে এই গাঁয়ের নতুনবাড়িতে এমনিধারা একদিন রান্না চাপিয়ে বসে ছিলেন। 'হাঁ' এবং 'না' এর মধ্যে মন দুলছিল—হঠাৎ এক সময় পোস্টকার্ডের চিঠিখানা উনুনে ঢুকিয়ে দিলেন। পেটের দায়ে গৌরদাস জব্বলপুর নামে কোন এক সুদূর অঞ্চলে রেলের কাজ নিয়ে গিয়েছিল। ত্রিসংসারে ঐ ছেলে ছাড়া বুড়ির কেউ নেই। নতুনবাড়িতে আয়োজনও গুরুতর—প্রকাণ্ড রুইমাছ ধরেছে, সোনামুগের সঙ্গে মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘন্টা পাক হচ্ছে। হাটবার বলে বুড়ি তো তক্কে তক্কে আছে, এক্ষুনি এসে পড়বে। চিঠিও এসেছে আজ—জব্বলপুরের চিঠি। পিওনঠাকুর ব্যাগ থেকে চিঠিখানা বের করে আলাদা করে রাখছেন। এমনি সময় নজরে পড়ে গেল গৌরদাসের মৃত্যুসংবাদ। গৌরেরই কোন বন্ধু পোস্টকার্ড লিখে মাকে খবর জানিয়ে দিয়েছে। এ চিঠি বুড়ির হাতে পৌঁছালে এক্ষুনি তো মড়াকান্না পড়ে যাবে। মুড়িঘন্ট মাটি। শোকের আঘাতে বুড়ি নিজেই হয়তো মারা পড়বে।

যাদব বাঁড়ুয্যের বিস্তর দিনের চাকরি, চিরকাল নিষ্কলঙ্ক কাজকর্ম করে এসেছেন। অবসর নেবার মুখে দুষ্কার্য করে বসলেন, পোস্টম্যানের পক্ষে যার চেয়ে বড় অপরাধ হয় না। চিঠিখানা জলন্ত উনুনে ঢুকিয়ে দিলেন। ছেলে বেঁচে নেই, গৌরদাসের মা আজও জানে না। কিন্তু মনে পাপ আছে বলে পিওনঠাকুর তাকে এড়িয়ে চলেন। বিট বদলে ফেলে এই সোনাখড়িমুখোই আর হবেন না, অনেকবার মতলব করেছেন। কিন্তু পোস্টমাস্টারকে বলতে গিয়েও বলেন নি। গৌরদাসের মায়ের আতঙ্ক সত্ত্বেও এই গাঁয়ের দুটো দুর্বার আকর্ষণ—কয়েকটি উৎকৃষ্ট আড্ডা আছে, চিঠি বিলি উপলক্ষ্যে এসে সারা বিকালটা জমিয়ে দাবা পাশা খেলে যান। এবং যাবার মুখে হাটঘাট করে বাড়ি ফেরেন। সোনাখড়ির হাটে ভাল মাছ-তরকারির আমদানি হয় এবং দামে কিছু সস্তা। বিটের বার সে জন্য হাটবার দেখে ঠিক করেছেন।

দিগ্বিজয় অন্তে অশ্বারোহীরা যে যার বাড়ি যাচ্ছে। দল ভেঙে গিয়ে কমল একা এখন। টুকটুকিকে নিয়ে পুঁটিও পাড়া বেড়িয়ে ফিরল। সুপারিবনে খোলা পড়ল একটা—ছুটে গিয়ে কমল কুড়িয়ে আনে। এক খেলা সারা করে এলো তো আর এক খেলা মাথায় এসেছে। পুঁটিকে বলে, গাড়িতে চড়ি আয়। টুকটুকিকে ঘাড় দিয়ে আয় আগে। তুই টানবি, আমি বসব। তারপরে তোর বসার পালা।

ঘাড় বাঁকিয়ে পুঁটি আপত্তি জানায়: এই এতক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে এলি, চড়ে চড়ে তোর আশ মেটে না খোকা। তুই নোস, আমি নই—আমরা কেউ

না, টুকটুকি চড়বে। ওর বুঝি গাড়ি চড়তে ইচ্ছা হয় না। তুই টান, আমি ওকে ধরে থাকব—ধরে ধরে চলে যাব। জোরে টানবি নে কিন্তু, গড়িয়ে পড়বে।

খোলার উপর বসিয়ে দিয়েছে। ইঁদুরের মতন চিকচিকে দাঁত কটি মেলে হাসছে কেমন টুকটুকি—মজা পেয়ে গেছে। পাতার আগা ধরে যেই না কমল টান দিয়েছে—দিব্যি তো হাসছিল, মুখখার কেমনধারা হয়ে গেল, কেঁদে পড়ে বুঝি এইবার। কাঁদল না, সামলে নিল। খোলায় বসে সামনের দিকটা কেমন শক্ত করে ধরেছে দেখ—একেবারে বড়দের মতন। পুঁটিরা হলেও ঠিক এই করত।

উঠানে এসে পুঁটি চেঁচাচ্ছে: ও বউদি, গাড়ি চড়ে তোমার মেয়ে বাড়ি এসেছে কেমন দেখ।

বেড়ার ফাঁকে অলকা এক নজর তাকিয়ে দেখল। দাওয়ায় পিওনঠাকুর, চেঁচিয়ে কথা বলতে পারে না। উঠে দাঁড়িয়ে টুকটুকির গাড়ি চড়ে আসা ভাল করে দেখবে, তা-ও সম্ভব নয়। ছোটশাশুড়ি নিরামিষ হেঁসেলে—তিনি ভাববেন, দেখ, রান্নাবান্না ফেলে হাঁ করে মেয়ে দেখছে। সে বড় লজ্জা।

উমাসুন্দরী কোন দিক দিয়ে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: দেখ, উদভট্টি কাণ্ড দেখ একবার, বাচ্চা নিয়ে খোলার উপর বসিয়েছে। মুখ থুবড়ে পড়বে এক্ষুনি। নামা বলছি, নামিয়ে কোলে করে আন। দুধ খাবার সময় হল, মায়ের কাছে এনে দে।

গুণমণির কাজ শেষ। আর এখন মাথা খুঁড়ে মরলেও কিছু করবে না। রান্নাঘরের পিছন দিকে এক দরজা—সেইখানে গিয়ে কাঁসর পাতল। বুড়ো গোপাল বাড়িতে চান-টান করে পথ তাকাচ্ছে। পেট চনচন করছে, অন্য কিছু না পেয়ে কলকের পর কলকে তামাকই টেনে যাচ্ছে শুধু। গুণমণি ঐ যে কাঁসর পেতে ধরেছে, সেখানে ভাত পড়বে দু-জনের মতন, প্রতিটি তরকারি সমান দুই ভাগে। হেরফের হলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুণমণি গালির চোটে পাড়া তোলপাড় করবে।

ভাতের কাঁসর নিয়ে গুণমণি সুপারিবাগানের সুঁড়িপথ ধরে নাথপাড়ায় চলল।

পাথরের থালায় ভাত, বাটিতে বাটিতে তরকারি, প্রকাণ্ড দুধ-খাওয়া বাটিতে ঘন-আঁটা দুধ আমসত্ত ও নলেন-পাটালি। যাদব বাঁড়ুয্যে ডাকসাইটে রাঁধুনি, ভোজের রান্নায় ডাক পড়ে, তাঁর হাতের সাধারণ সামান্য ব্যঞ্জনেও অপরূপ এক তার—অন্য কারো রান্নায় সে জিনিস পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র

ভাত আর মাছের কোলটা নামিয়ে নিয়ে ভোজনের পাট তাড়াতাড়ি সেরে দাবায় বসবেন, এই মতলব করেছিলেন। নিমি বলল, পিওনকাকা, যেদিন আপনার পাত পড়ে পাঁচ রকম ভালমন্দ প্রসাদ পেয়ে থাকি আমরা। আজকে কেন তা হবে না? নিমি বলে যাচ্ছে, আর মাথার কাপড় একটু তুলে দিয়ে তরঙ্গিণী হাসছেন। নিমির কথা ছোটগিন্নিরও কথা এবং বাড়িসুদ্ধ সকলের কথা, বোঝা যাচ্ছে। গৃহস্থের ইচ্ছায় এতগুলো পদ রাঁধতে হল পিওনঠাকুরকে।

রেঁধেবেড়ে এইবার খেতে বসবেন,—কালীময় ভবনাথ বিল থেকে উঠে বাড়ি ঢুকলেন। কালীময় গজর-গজর করছে: বয়স হয়েছে তা মানবেন না। অন্যের উপর ভরসা পান না, সব কাজে আগে বাড়িয়ে গিয়ে পড়বেন। শামুকে কেটে পায়ের তলা ফালা-ফালা হয়েছে, শামুকের কুঁচি বিঁধেও আছে দু-চার গণ্ডা। আ'লে পা হড়কে পড়েছিলেন—আমি না ধরে ফেললে হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যেত আজ।

এ সমস্ত ভবনাথের কানে যাচ্ছে না, পিওনঠাকুরকে বাড়ির উপর দেখে পরমাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন: চিঠিপত্তোর আছে আমার?

যাদব সহাস্যে বললেন, চিঠি আছে। আর সকলের বড় যা তা-ও আছে। মনিঅর্ডার?

দু-হাতের দশ আঙুল পাশাপাশি বিস্তার করে যাদব বললেন, তিনখানা।

অর্থাৎ দশ টাকার নোট তিনখানা মনিঅর্ডার এসেছে। বললেন, বসুন, টাকাটা দিয়ে দিই আগে, তারপরে খেতে বসব। পরের কড়ি যতক্ষণ আছে, ভারবোঝা হয়ে থাকে।

রান্না হচ্ছে বলে চামড়ার ব্যাগ যাদব চালের নিচে আনেন নি, উঠোনের সেইকাঠের গায়ে সর্বচক্ষুর সামনে ঝুলিয়ে রেখেছেন। সই করার জন্য ফরম হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, সংসার-খরচা হল দশ টাকা মামলা-খরচা তার দুনো—

ভবনাথ লুফে নিয়ে বলেন, দশ-ই বা লাগে কিসে সংসারে? খাওয়ার কুল্যে জনা বারো, না হয় পনেরোই হল। ধানচাল ডালকলাই তরিতরকারি সবই ক্ষেতের, গোয়ালে দুধাল গাই তিনটে, শুকনোর মাস ক'টা বাদ দিয়ে খালের মাছও নিখরচায় অল্পবিস্তর আসে। মামলার পক্ষে বিশ টাকায় অবশ্য কুলানো মুশকিল। সংসার-খরচা থেকে কিছু টানতে হবে ইদিকে।

কুপনে চোখ বুলিয়ে চিন্তিতভাবে বলে উঠলেন, দেবনাথের শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। ব্যস্ত হব বলে আমায় কিছু জানায় না। কাকার বানা শুনে কেষ্টাটাও চাপা দিয়ে যায়। এত করে লিখছি, বাড়ি এসে মাস-তিন

ভাব থেকে যাও। ডাক্তার-কবিরাজ কিছু লাগবে না, এমনিতেই চাঙ্গা হয়ে যাবে।

খামের-আঁটা চিঠি। পিওনঠাকুর বললেন, পোটোয়ারি মানুষের নামে রকম-বেরকমের চিঠিপত্তোর আসে—এ চিঠি তাই কারো হাতে দিই নি।

ভাল করেছেন—

ঠিকানার লেখা ভবনাথ ঠাউরে ঠাউরে দেখেন। এমনি হল তো ঘরে গিয়ে চশমা-জোড়া নিয়ে এলেন। হাতের লেখা থেকে হদিস হল না। খামটা রোদে ধরে আন্দাজ নিলেন ভিতরের চিঠি কোন দিকটায়। ছুরি নিয়ে এসে সন্তর্পণে খামের মুখ কেটে চিঠি বের করলেন।

দু-দুটো পয়সা খরচা করে খামের চিঠি কে আবার লিখতে গেল—বড়গিন্নি এক নজরে তাকিয়ে আছেন। মুখ তুলে ভবনাথ বললেন, তোমার ছোটছেলের বিয়ে গো—

উমাসুন্দরীর বোধগম্য হয় না: কার বিয়ে বললে?

হিরুর বিয়ে এ মাসের তেইশে। তোমার ভাই নেমন্তন্ন পাঠিয়েছেন, সর্বারম্ভে গিয়ে পড়ে শুভকর্ম তুলে দিয়ে এসোগে।

উমাসুন্দরী অবাক হয়ে বলেন, বনকরের চাকরি করছে না সে?

চাকরি না ঘোড়ার-ডিম। বনকরে যেতে বয়ে গেছে তার। দেবনাথের টাকা সস্তা—চাকরির নামে এককাঁড়ি টাকা খসিয়ে মামার-বাড়ি বিয়ের বর-পাত্তোর হয়ে বসেছে।

ভবনাথ রাগে গরগর করছেন। বড়গিন্নিও দুঃখ হয়েছে—পেটের ছেলের বিয়ের পরের মতন নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়েছে। তার মধ্যে ভরসাও যৎকিঞ্চিৎ: বিয়েথাওয়া হয়ে ঘরসংসারে মতি হয় যদি এবারে। বাড়িসুদ্ধ জ্বালাতন-পোড়াতন এই ছেলে নিয়ে। রাজীবপুর হাইইস্কুলে চেষ্টা হয়েছিল গোড়ায়। সুবিধা হয় না দেখে দেবনাথ নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে শহরের ইস্কুলে ভরতি করে দিলেন। পড়াশুনো হিরুর কাছে বাঘ—এক নিশিরাত্রে টিপিটিপি দুয়োর খুলে সে লম্বা দিল। ছেলেমানুষ একা একা রেল-স্টিমার করে এবং ক্রোশের পর ক্রোশ পায়ে হেঁটে বিস্তর ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে বাড়ি এসে উঠল। আছে বাড়িতে—বয়সও হচ্ছে, সংসারের কুটোগাছটি নাড়বে না। খায় দায় আর সমবয়সি নিষ্কর্মা কতকগুলোর সঙ্গে তল্লাট জুড়ে উৎপাত করে বেড়ায়। নতুনবাড়িতে নিশিদিনের আস্তানা—তিনবেলা শুধু খাওয়ার সময়টা মিনিট কয়েকের জন্য বাড়ি আসে।

এমনি চলছিল। দেবনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে বইকি।

জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার হওয়ায় বহু জনের সঙ্গে তাঁর জানাশোনা দহরম-মহরম। বাড়ির বড়ছেলে কৃষ্ণময়কে নিজ এস্টেটে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। মেজো জন শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আছে—শ্বশুর যা রেখে গেছেন, নেড়ে চেড়ে দিব্যি কেটে যাচ্ছে। ছোট হিরণ্ময় মাথা ঠাণ্ডা করে একটা কিছুতে লেগে গেলে আর ভাবনা থাকে না। অনেক রকম করে দেখেছেন দেবনাথ—গোড়ায় ঠিকাদারি কার্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পরে উকিলের সেরেস্তায়, তারপরে মার্চেন্ট অফিসে এবং শেষে কাঠের গোলায়। কোথাও বনিয়ে থাকতে পারে না, ঝগড়াঝাঁটি করে চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে বেরোয়। এইবার এত দিনে ঠিক হয়েছে। ফরেস্টার অম্বুজাক্ষ দাস—খুঁজলে দেবনাথদের সঙ্গে বোধহয় একটু আত্মীয়-সম্বন্ধও বেরিয়ে যাবে—একটা চকের বন্দোবস্ত নেবেন বলে কিছু দিন ধরে খুব হাঁটাহাঁটি করছেন। বনকরের শিক্ষানবিশী কাজে দেবনাথ হিরুকে দাস-মশায়ের হেপাজত করে দিলেন। এইবারে ঠিক হয়েছে—বাড়ির সবাই নিশ্চিন্ত, বাদার জঙ্গলই হিরুর উপযুক্ত জায়গা। জঙ্গলে সঙ্গীসাথী ইয়ারবন্ধু নেই, মন বসিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে কাজকর্ম করতে পারবে। যেমন-তেমন চাকরি নাকি দুধ ভাত—বনকরের চাকরি তা হলে সেই নিরিখে দুধে-চান করা, আঁচানো। ফরেস্টার অম্বুজই তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত—চকের পর চক কিনে যাচ্ছেন।

হরি, হরি! কোন কৌশলে কবে যে হিরণ্ময় অম্বুজ দাসের চোখ এড়িয়ে বাদাবন ছেড়ে মামার-বাড়ি গিয়ে উঠেছে, অন্তর্যামী ঈশ্বর বলতে পারেন। আর পারেন খানিকটা বোধহয় মাতুল ভূদেব মজুমদার। চাকরিবাকরি বাতিল করে সে বিয়ে করতে চলল। দিন দশেক মাত্র বাকি সে বিয়ের।

॥ ছাব্বিশ ॥

বিয়েয় ভবনাথ যাবেন না, যেতে পারেন না। বাপ-মা খুড়োখুড়ি এবং চারি চরণে সমস্ত বর্তমান থাকতে মামার-বাড়িতে মামার ব্যবস্থায় বিয়ে হতে যাচ্ছে —কোন মুখ নিয়ে ভবনাথ কাজের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবেন? লোকে শুধায়: বিয়ে কোথায় হচ্ছে বড়কর্তা? কালো মুখ করে ভবনাথ জবাব দেন: আমি কিছু জানি নে, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞাসা করো গে।

বাড়ির মধ্যে অর্থাৎ উমাসুন্দরীর সঙ্গে মন-কষাকষি এই ব্যাপারে। বিয়েয় যাবেনই তিনি। অন্যায় তো ওদেরই—অত রাগের কি আছে, ছেলেয় ভাগনেয় কি তফাত? দাদার ছেলে নেই, পুত্তুর-বউর স্থলে ভাগনে-বউ এনে

সাধ মেটাবেন। আগের দু-ছেলের বিয়ে তোমরা দিয়েছে—দাদা-বউঠান দু'-জনে এসে পড়ে কাজ তুলে দিয়েছেন। হিরুর বিয়েটা এবারে তাঁরাই না-হয় দিলেন।

উমাসুন্দরী যাচ্ছেন। নেমন্তন্ন পেলে কাশীময় দাংপক্ষে কখনো ছাড়ে না—বাকে নিয়ে সে যাচ্ছে। কনিষ্ঠের বিয়ের বরযাত্রী হয়েও যাবে। এবং বুড়োমানুষ মামা কন্যাপক্ষের বাড়ি সশরীরে যদি না যেতে পারেন, কাশীময়ই তখন বরকর্তা।

পুঁটি লাফাতে লাফাতে এসে বলল, আমিও যাচ্ছি রে। জেঠিমা বলেছে।

কমল বলে, আমি?

তোকে নেবে না। তুই যে মা ছেড়ে থাকতে পারিস নে। আমি পারি—তুই-ই তো জেঠিমার কাছে।

চুপচাপ ভবনাথ হুঁকো টানছেন। কলকে নিভে গেছে, নলের মুখে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। ঠাহর পান নি ভবনাথ—টেনেই চলেছেন। বেহুঁশ।

দ্বারিক এসেছেন। কড়চায় কয়েকটা উশুল দেবার আছে, দপ্তর খুলে কাজে লেগে গেলেন। তাঁর নজরে পড়ল। অটল তামাকের ক্ষেতে। ভবনাথকে কিছু না বলে অটলকে হাঁক দিয়ে বললেন, কলকে বদলে দিয়ে যা রে অটল, একদম নিভে গেছে।

দ্বারিক আশ্রিত অনুগত, এ বাড়ির ভাল-মন্দ সব ব্যাপারে আছেন। হিরুর হয়ে তিনি বলছেন, দশচক্রে ভগবান ভূত। মাতুল গুরুজন—তাঁর কথার উপর বেচারি না বলতে পারে নি।

ভবনাথ স্বগতোক্তির মতো বললেন, নেমন্তন্নর চিঠি সরাসরি বাপ-খুড়োর নামে। বাপকে আমল না-ই 'দল—অমন বাঘের মতন খুড়ো তাকে হেলা করে কোন সাহসে?

দ্বারিক বলেন, দিনকাল বদলে যাচ্ছে দাদা। মানিয়েগুছিয়ে নিতে হবে—উপায় কি? কত সব কাণ্ডবাণ্ড কানে আসে—এ তবু পদে আছে।

প্রবোধবাক্য কানের মধ্যে বিষের মতো জ্বালা করে। ভবনাথ উঠে পড়লেন। বাইরের উঠানের এক পাশে কাঠা পাঁচেক ভুঁইয়ে তামাকের ক্ষেত। চারা পোঁতা হয়েছে—দিনমানটা কলার খোলায় ঢাকা ছিল, এখন আসন্ন সন্ধ্যায় অটল খোলা সরিয়ে গোড়ায় জল দিয়ে যাচ্ছে। সারা রাত্রি শিশির খাবে—সকালবেলা রোদের ভয়ে আবার খোলা মুড়ে দেবে। কিছুকাল চলবে এমনি—যত দিন না চারাদের শক্তিসামর্থ্য হচ্ছে।

ভবনাথ এসে ক্ষেতের পাশে দাঁড়ালেন। অটলকে এটা করো সেটা করো নির্দেশ দিচ্ছেন নিতান্তই অভ্যাসক্রমে—হিরুর বিয়ে মন জুড়ে রয়েছে। দিনকাল বদলাচ্ছে, সন্দেহ কি। বড় ছেলে কালীময়ের বিয়ে একলা ভবনাথের ব্যবস্থায় হয়েছিল। মেয়ে কালো, রোগা—দৃষ্টিশুভ নয়। ভবনাথ চোখ মেলেও তা দেখেন নি, দেখা আবশ্যক মনে করেন নি। আত্মীয়-পড়শি হয়তো মুখ বাঁকিয়ে ছিল, কিন্তু ভবনাথের সামনাসামনি নয়—সে তাগত ছিল না কারো। কালীময়ও কোনদিন মুখ ভার করে নি—বাপ পছন্দ করছেন, তার উপরে আবার কথা কি! ইয়ারবন্ধুরা কিছু বলতে গেলে কালীময়ের জবাব ছিল, দিনমানে বউ তো কাছে আসছে না, রাত্রে আসবে আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে—কালো ধলো তখন সব একাকার।

দেখতে শুনতে যেমনই হোক, ফুলবেড়ের মাধব মিস্ত্রির মেয়ে বীণাপাণি—একমাত্র মেয়ে, ষোলআনা ভূসম্পত্তির ওয়ারিশান। ভবনাথ তন্নতন্ন করে খোঁজখবর নিলেন—মেয়ের নয়, মাধবের ভূসম্পত্তির। তারপরে পাকাকথা দিয়ে দিলেন।

মাধব প্রশ্ন করেন: মেয়ে দেখলেন না?

ভদ্রলোকের মেয়ে, কানা নয়, খোঁড়া নয়—ঘটা করে দেখবার কি আছে?

তারপর মনে পড়ে গেল: মেয়ে তো দেখাই আছে বেহাইমশায়। রাতের বেলা আপনার বাড়ি খেতে বসেছিলাম, পাঁচ-সাতটা বেড়াল এসে পড়ল। মা-লক্ষ্মী বাঁশের চেলা নিয়ে বেড়াল তাড়া'চ্ছিল।

মাধব মিস্ত্রির সঙ্গে মুখ-চেনা ছিল, সেই প্রথম ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। বিবাদি গরহাজির বলে মামলা হতে পারল না, কসবা থেকে ভবনাথ পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। মণিরামপুর গঞ্জে হাজরা মশায়ের চালায় রান্না-খাওয়া ও বিশ্রাম। মাধবও মহাল থেকে ফিরছেন, এখানে আগে এসে উঠেছেন। মাধবই রাঁধাবাড়া করলেন—এক সঙ্গে দু'জনের খাওয়া-দাওয়া। তারপর বেশ খানিকটা গড়িয়ে নিয়ে একত্র রওনা। নাগরগোপের কাছাকাছি এসে আকাশ অন্ধকার করে এলো—দুর্যোগ আসন্ন। ফুলবেড়ে ওখানে থেকে সামান্য দূর। ভবনাথকে না নিয়ে মাধব ছাড়বেন না—বললেন, আপনাকে এই অবস্থায় পথের উপর ছেড়ে গেলে লোকে আমার গায়ে থুতু দেবে। গরিবের বাড়ি চলুন, রাত-টুকু কাটিয়ে সকালে চলে যাবেন। তুললেন নিয়ে বাড়িতে। তুমুল ঝড়বৃষ্টি—তার ভিতরেও পাঁঠা মারা হল। আদর-আপ্যায়নের অবধি নেই। খাওয়ার সময়টা ছোট্ট খুকী বীণাপাণি থোপা থোপা চুল নাচিয়ে বাঁশের চেলা হাতে বিড়াল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল—

কলে-দেখা তাতেই চুকবুকে গেছে, তারই জোরে ভবনাথ পাকাকথা দিয়ে দিলেন। নির্গোল বিয়ে হয়ে গেল। বরাবর এমনিই হয়ে এসেছে—এবারেই ব্যতিক্রম।

চমক খেয়ে ভাবনা হঠাৎ ছিঁড়েখুড়ে গেল। ডা-ডা-ডাডা—আওয়াজ। দালানের কানাচ দিয়ে পথ—উঁচু নিচু, এবড়ো খেবড়ো। পুকুর কাটার সময় মাটি পড়েছিল—কোদাল ধরে কে আবার তা সমান করতে গেছে? ডা-ডা-ডা উড়ে চল্ পক্ষীরাজ আমার—গাড়োয়ান গরু তাড়াচ্ছে। ঘট-ঘট ঘট-ঘট বদখত আওয়াজ তুলে ছুটছে গরুর গাড়ি।

অসহ্য, অসহ্য! হাঁক পাড়লেন ভবনাথ: এইও, কে রে—কে যায়?

গাড়ির মাথার দিকটা দেখা যাচ্ছে। শিশুবর হায় হায়—করে উঠল। শয়তান গরু সুপারি-চারা মুখে তুলে নিয়েছে। চিবোচ্ছে, আর ঝুলছে খানিকটা মুখের বাইরে। 'তিন নাড়ায় গুয়ো, কাঁঠাল নাড়ায় ভুয়ো'—চাষীর শাস্ত্রে বলে। গুয়ো অর্থাৎ সুপারির চারা তিনবার তুলে পুঁততে হবে। গোড়ায় একফালি জমিতে ঠাসাঠাসি করে। চারা উঠল, বিঘত খানেক বড় হল—তুলে তুলে তখন সামান্য ফাঁক করে পুঁতে দাও। চারা আরও বড় হলে আবার তুলে পাকাপাকি ভাবে পোঁত। তবেই সুপারি ফলবে। কিন্তু কাঁঠালের বেলা বিপরীত। যেখানে চারা জন্মাবে, সেখানেই আমরণ থাকবে। তুলে অন্যত্র পুঁতলে ভুয়ো কাঁঠাল ফলবে—কাঁঠালে কোয়া থাকবে না, শুধুই ভুসড়ো। দালানের কানাচে বাখারির বেড়ায় ঘেরা সুপারির খাদা। বেড়ার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে গরুতে চারা উপড়ে নিয়েছে। ভবনাথ দূর থেকে রে-রে করে উঠলেন। "কে রে? নবনে না তুই?

কালোকোলো ছোঁড়া গাড়ির মাথায়—নাম বলল, শ্রীনবীনচন্দ্র মণ্ডল।

ফটকের ছেলে তো তুই। ফটকের ছেলে নবনে, তাই তো জানি—নবীনচন্দ্র হলি আবার কবে? যাচ্ছেতাই হ গিয়ে—গরুতে আমার গুয়োর চারা খায় কেন?

নবীন বলে, গরু কি বোঝে?

দিচ্ছি বুঝিয়ে—

এমনিই ভবনাথের আজ মেজাজ খারাপ—ছোটমুখের পাকা-কথায় ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে উঠল। একটানে একটা জিওলের ডাল ভেঙে গরুকে দমাদম পিটুনি।

নবীন আর্তনাদ করে ওঠে, ডালের বাড়ি যেন তারই গায়ে পড়ছে। এঁটে

ধরল ভবনাথের হাতের ডাল। এত বড় আস্পর্ধা! ক্ষেপে গেলেন ভবনাথ—সেই ডালে এবার ছোঁড়াকেই পেটাচ্ছেন। পেটাতে পেটাতে ডাল দু-খণ্ড হয়ে গেল। হাঁ-হাঁ করে দ্বারিক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। গর্জাচ্ছেন ভবনাথ : ভিটেবাড়ির প্রজা, তিন পুরুষ ধরে চাকরান খাচ্ছে। পুববাড়ির মালপত্তর বয়ে বয়ে ওর বাপ কটকের মাথায় টাক পড়ে গেল। পাত চড়ে সে রা কাড়ে না, আর ঐ ডেপো ছোঁড়া কিনা আমার দালান কাঁপিয়ে গরুর-গাড়ি চালায়, চ্যাটাং-চ্যাটাং বুলি ছাড়ে মুখে, হাতের লাঠি চেপে ধরতে আসে। ঘরের চাল কেটে বসত তুলে দেবো, বুঝবে সেদিন—

ভবনাথকে নিয়ে দ্বারিক রোয়াকে উঠে গেলেন। শিশুবর তামাক সেজে আনল। গরুর-গাড়ি খুব আস্তে যাচ্ছে এখন। নবীন গাড়িতেই ওঠে নি, পাশে পাশে হাঁটছে।

বড়গিন্নি বাপের-বাড়ি চললেন। গরুর-গাড়িতে যাওয়া কাঁথা দুমড়ে উপরে পাটি ফেলে ছই বানিয়ে নিল। পুঁটি আগেভাগে উঠে বসে আছে। সবাই গাড়ির কাছে এসেছে—ভবনাথই কেবল আহারান্তে বাইরের-কোঠায় যথারীতি শুয়ে পড়েছেন। কিছুই জানেন না এমনিতরো ভাব। কালীময়ের গায়ে কড়কড়ে ইস্ত্রি করা ডবলব্রেস্ট কামিজ, হাতে বার্নিশ-জুতো। জুতোর ফিতের ফিতেয় গেরো দিয়ে সে গাড়ির ভিতর ঢুকিয়ে দিল। বলে, জুতো পড়ে না যায় দেখো মা! ওঠো তুমি এবার, দেরি করলে ওদিকে রাত হয়ে যাবে।

বড়গিন্নির গাড়িতে ওঠা সে বড় চাট্টিখানি কথা নয়। উঠতে যাচ্ছেন—কয়েক পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। তরঙ্গিণীকে সতর্ক করে দিচ্ছেন : নতুন হিম পড়ছে বউ, খোকন ঠাণ্ডা না লাগায় নজর রেখো। কাঁচা জলে চান না করে নিত্যি নিত্যি চানেরই বা কি দরকার? টুকটুকিকে কাঁচাঘুম থেকে তুলে অলকা এসে দাঁড়াল। মেয়ে কেঁদে খুন হচ্ছে। দু-হাত পেতে আড়কোলা করে উমাসুন্দরী নিয়ে নিলেন। জোরে জোরে দোলাচ্ছেন, আর আগডম-বাগডম বকছেন মুখে। শান্ত হয় না কিছুতে।

কালীময় ওদিকে হাঁক দিচ্ছে : উঠবে গাড়িতে না সারা বেলাস্ত এই চলবে? না যাবে তো বলো, আমি পথ দেখি—

মেয়ের কচি আঙুলে ঈষৎ কামড় দিয়ে উমাসুন্দরী মায়ের কোলে দিয়ে দিলেন। মায়া কাটানো হল এই প্রক্রিয়ায়—বাচ্চা হত্তোলকড়া হবে না।

গাড়িতে উঠে বসেছেন এবার। তরঙ্গিণীকে কাছে ডেকে হাতে হাত দিয়ে

ছলছল চোখে বললেন, রইল সব। সামলানো কি সোজা—তোমার উপর বড্ড ধকল যাবে ছোটবউ। চিঠিপত্তোর দিও।

গলা ভারী, মুখে আঁচল দিলেন তিনি।

অলকা হাসছে : যাওয়া তো বাপের-বাড়ি—চোখে জল কেন মা? আমাদের বললে তো নাচতে নাচতে চলে যাই।

বিনো বলল, শুভকর্ম চোখের জল কেন খুড়িমা? ইচ্ছে না হলে যাবে না। মাথার দিব্যি তো নেই। গাড়ি ফেরত দিয়ে দাও।

উমাসুন্দরী রাগ করে বললেন, মনের ইচ্ছে তো তাই তোদের সকলের। একজনের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আপদ-বালাই মানুষটা চলে যাচ্ছে, তা যেন চোখে দেখতেও মানা।

কমল মুখ চুন করে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ দেখে, আহা, বুকের মধ্যে আনচান করে ওঠে। হাত ধরে বড়গিন্নি তাকে কাছে নিয়ে এলেন। একটুকু ম্লানহাসি হেসে বললেন, যেতে ইচ্ছে করছে বুঝি? মা ছেড়ে থাকতে পারবে তো?

সত্যি সত্যি যেন খোকনকে তুলে নিয়ে চললেন, গিয়ে সে পুঁটির একাধিপত্যে ভাগ বসাবে। হি-হি করে হেসে, হাসির ধাক্কায় পুঁটি মতলবটা একেবারে উড়িয়ে দিতে চায় : নিও না জেঠিমা—কক্ষনো না। থাকতে পারবে না, রাত দুপুরে 'মা' 'মা' করে কেঁদে ভাসবে।

কমলের অপমান লাগে, রাগ হয়ে যায় পুঁটির মুখে এই সব শুনে। 'দিদি' আর বলবে না তো, এবার থেকে নাম ধরে ডাকবে। জেঠিমা বউদাদা বিনোদিদি সবাই হাসছে। এমন কি মা পর্যন্ত। নাকি মাকে ছেড়ে থাকা অসম্ভব তার পক্ষে।

জেদ ধরল সে : আমি যাবো, আমি যাবো। তিড়িং-মিড়িং করে লাফাচ্ছে।

এবং মুখের কথামাত্রই নয়, গাড়িতে ওঠার জন্য একটা পা উঁচু করে তুলছে। কিন্তু উমাসুন্দরী তো জুড়ে বসে আছেন—পা কমল ফেলবে কোথা, বসবেই বা কোনখানে? ছইয়ের বাইরে একেবারে সামনেটা অবশ্য ফাঁকা গাড়োয়ানের জন্য। কিন্তু গরু—ওরে বাবা দু-দুটো দৈত্যাকার গরু সেই-খানটা জোয়ালের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। পা অতএব মাটিতে নামাতে হল। তা বলে রোখ ছাড়ে না : যাবো আমি জেঠিমা। থাকতে পারব, তুমি দেখো। কাঁদব না।

উমাসুন্দরী কোমল কণ্ঠে বুঝিয়ে বলেন, বেটাছেলে তুমি কত কত জায়গায় যাবে—এইটুকু পথ গুয়োতলি গিয়ে কেন আর থাকতে পারবে না? কিন্তু

পুঁটি চলে যাচ্ছে—তার উপর তুমিও যদি যাও, ছোটবউ একলা হয়ে যাবে, কাকে নিয়ে থাকবে সে তখন? কাঁদবে তো সে-ই—তুমি আর কি জন্যে কাঁদতে যাবে?

কমল বলে, একলা কেন, রাঙাদিদি বউদাদা সবাই তো রইল।

বড়দিদি হল বিনো, রাঙাদিদি নিমি আর বউদাদা অলকা। ছোটরা বড়দের কারো নাম ধরবে না। এমন কি বিনোদিদিও মঞ্জুর নয়—বিনো নাম তো বলাই হল, তার উপরে একটা দিদি জুড়ে দিয়ে দোষ খণ্ডাবে না। নিমির ফর্সা রং, সেই জন্যে রাঙাদিদি। আর অলকার বেলা বউদিদি না হয়ে বউদাদা—

পোড়ামুখি বিনোর কাণ্ড। একরত্তি ছেলেকে চুপিসারে শিখিয়েছে। বারো বছরে মেয়ে অলকা শ্বশুরঘর করতে এলো, কিন্তু বাপের-বাড়ি থেকে যথোচিত তালিম নিয়ে আসে নি। সন্ধ্যাবেলা ক্ষারে কাপড় সিদ্ধ হবে—উঠানের উনুনে জালা চাপানো হয়েছে। খানকয়েক ভিজে কাঠ দিয়ে মাহিন্দার কর্তার সঙ্গে হাটে চলে গেছে। ফুঁ দিতে দিতে বড়গিন্নি নাজেহাল, কাঠ কিছুতে ধরে না, খালি ধোঁয়াচ্ছে। গোলার নিচে আঁটি-বাঁধা নারকেল-পাতা রয়েছে, সেইগুলো টানাটানি করছেন, আর গজর-গজর করে মাহিন্দাকে গালি দিচ্ছেন। হেনকালে কুড়াল পড়ছে—আওয়াজ আসে বাইরের দিক থেকে।

পুরানো পোয়ালগাদা ভেঙে দিয়েছে। ধান মলা সারা হলে নতুন পোয়াল-গাদা দেবার প্রয়োজন হবে, তখন নতুন মাচা বাঁধবে। পুরানো বাতিল মাচার বাঁশ তেঁতুলতলায় ছড়ানো—ঘুনে-খাওয়া, কিন্তু শুকনো মড়মড়ে। এই বাঁশ উনুনে দেওয়া যায়, পুড়বেও ভাল, কিন্তু ফেড়ে না দিলে দুড়ুম-দাড়াম করে গেরো ফুটবে বোমা ফাটার মতো আওয়াজ করে। একটু খুঁজে কুড়ালও পাওয়া গেল পেটা-কাটা ঘরের দাওয়ায়। অলকা ভেবেছে বাহাদুরি কাজ—চেলা বাঁশের বোঝা উনুনের ধারে ফেলে শাশুড়িকে অবাক করে দেবে। কোমরে আঁচল ফেরতা দিয়ে কুড়াল ধরেছে বারো বছুরে বউ—

কে রে বাঁশ ফাড়ে ওখানে?

সন্দেহ করে উষাসুন্দরী তেঁতুলতলায় গিয়ে পড়লেন। চক্ষু কপালে উঠল—গলা সঙ্গে সঙ্গে খাদে নেমে গেল: কী সর্বনাশ! কেমনধারা বউ গো তুমি? বড় রক্ষে হাটবার আজ, পুরুষরা বাড়ি নেই।

চাপা গলায় ধমকানি চলেছে: বাপের-বাড়ি এই সমস্ত করে বেড়াতে বুঝি? বাড়গেঁয়ে মেয়ে আনলে এমনি হবে, বলেছিলাম আমি। কেউ কানে নিল না। এ-বাড়ি ওসব মদ্দানি চলবে না, খেয়াল রেখো। বেয়ানঠাকরুনই বা কী রকম—মেয়ে পাঠালেন, তা একটু সমঝে দিতে পারেন নি।

অলকা তো বয়মে মরে গেল। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। বাহাদুরি নিতে গিয়ে কি বিপদ! তরঙ্গিণী কোন দিক দিয়ে এসে বউয়ের হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আঁচলে চোখ মুছিয়ে দিলেন। ঘেটের বাছা, আহা রে! তাঁর বড় মেয়ে বিমলা বিয়েথাওয়ার আগে প্রায় তো এই বয়সেই চলে গেল। কী বুঝত সে তখন?

বকাঝকার পরে উমাসুন্দরীও এবারে চুপ-চুপ করে বেড়াচ্ছেন। বুদ্ধির ভুলে করে বসেছে—ঢাক পিটিয়ে বেড়াবিনে কেউ তোরা, বাড়ির বাইরে কথা না যায়, বেটাছেলেরা না শোনে। সকলকে সতর্ক করলেন। কার দায় পড়েছে, কে আর বলতে যাচ্ছে—ভয় বিনোকে নিয়ে। এঁদেরই জ্ঞাতি এক-জনদের মেয়ে বাল-বিধবা। বাপের-বাড়ি শ্বশুরবাড়ি কোন কুলে কেউ নেই—মরেছেড়ে গেছে সব। বাপের-ভিটেয় সর্বেবন এখন। শ্বশুরবাড়িতে দোচালা বাংলাঘর একটা আছে—সেখানে ভাগনে সম্পর্কের একজন বউ ছেলেপুলে নিয়ে উঠেছে। পুববাড়ির সংসারে বিনো রয়ে গেছে—এ বাড়িরই মেয়ে সে যেন। এই তো অবস্থা, আর বয়সের দিক দিয়েও তরঙ্গিণীর প্রায় সমতুল্য। কিন্তু ফচকেমি আছে ষোলআনা। তাছাড়া অলকার ননদিনী যখন, সম্পর্ক ঠাট্টাতামাসার। বিনোকে তাই পই-পই করে মানা করা হল: হাসবে পাড়ার লোকে, ছেলেমানুষ-বউ লজ্জা পাবে, বাড়িরও নিন্দে। খবরদার, খবরদার!

পেট-পাতলা মানুষ বিনো, কথা পেটের মধ্যে ফুটতে থাকে—খালাস না পাওয়া পর্যন্ত সে সোয়াস্তি পায় না। তা সত্ত্বেও প্রাণপণে মুখ বন্ধ করে রইল। পুঁটি-কমলের জন্ম হল, তারপর অলকা-বউ নিজেও মেয়ের মা হল। বাপের বাড়িতে কুমারী বয়সের ডাংপিটেমি তা বলে একেবারে ছাড়েনি। মাঝে মাঝে মনের ভুলে এক-একটা কাজ করে বসে। সিঁদুরেগাছে আম পেকে টুকটুক করছে। বউ আর সামলাতে পারে না—এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, মানুষ-জন নেই। দেখে টুক করে ডালে উঠে এক ঝাঁকিতে আম ক'টা পেড়ে আনল। বিলের জল ঝিরঝির করে পুকুরে পড়ছে। চান করতে গিয়ে বউ দেখল, মৌরলামাছের ঝাঁক নালার মধ্যে উজান উঠে পড়ছে। এক মুখে তাড়াতাড়ি কাদার বাঁধ দিয়ে গামছা ছেঁকে মাছ তুলে নিয়ে এলো। কেমন যেন হয়ে যায় তখন। বাড়ি এসে তারপরে খোশামুদি: বোলো না ঠাকুরঝি, ঘুণাক্ষরে কেউ যেন টের না পায়। বিনো বলেনি কাউকে, তবে একটুকু শিক্ষা দিয়েছে। বড় হয়ে কমলের কথা ফুটল—বউদিদি স্থলে বউদাদা বলতে শিখিয়েছে তাকে। দিদি নয় দাদা—অলকাকে কমল বউদাদা বলে।

একলা বিনোই বা কেন, এক দঙ্গল ননদিনী সংসারে—কেউ বড় কম যায়

না। অলকাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ত। ভাল ঘর-বর পেয়ে বাবা-মা এক-ফোঁটা মেয়ে পর-হরি করে দিলেন—হেসে হেসে আজও অলকা তখনকার কথা বলে, ছ'ভাইয়ের পর সকলের ছোট এক মেয়ে আমি বাড়ির মধ্যে—হাসলে মাণিক ঝরে, কাঁদলে মুক্তো পড়ে। পুতুলখেলা আর রাঁধাবাড়ি-খেলা ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছি—তা বলে রেহাই করেছ তোমরা ঠাকুরঝি?

অলকা ছিল বড় ঘুমকাতুরে। নতুন বউকে কাজকর্ম করতে দিত না, কোন-কিছুতে হাত দিলে সকলে হাঁ-হাঁ করে এসে পড়ত: আহা, তুমি কেন গো? বসে বসে অলকা কি করে—ঘুমিয়ে পড়ত যখন-তখন। তাই নিয়ে হাসিতামাসা, ফষ্টিনষ্টি। রাত্তিরে ঘুমোয় না ওরা, দিনে তারই শোধ তুলে নেয়—ফিসফিসিয়ে ননদিনীরা বলাবলি করত। একেবারে মিথ্যেও নয় সেটা। অলকা লজ্জায় মরে যায়, তবু ঘুম এসে পড়ে। হাজার চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারে না, কি করবে।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর শুতে শুতেই অলকার ঘুম। বিনো, বুড়ি, নিমি—তিন ননদে মিলে একদিন ঘোর ষড়যন্ত্র করল। পাহারায় আছে, কেউ সে ঘরে না ঢোকে—অলকাকে ডেকে না তোলে। তরঙ্গিণী ও উমাসুন্দরীকে আগে থাকতে বলে রেখেছে। দেখবে আজ হদ্দমুদ্দ, নতুনবউ কতক্ষণ ধরে ঘুমোতে পারে।

সন্ধ্যা হল, রাত হল, রাতের রান্নাবান্না সারা—অলকা বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। পিঁড়ি পাতল ননদিনীরা খাটের পাশে ঘরের মেজেয়, দেলকোর উপর প্রদীপ জ্বালল। কাঞ্চনগরী থালায় পরিপাটি করে ভাত বেড়ে পিঁড়ির সামনে দিল। বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন, গেলাসে জল। বাটার উপর পানের খিলি, ঘটিতে আঁচানোর জল অবধি রাখল। আঁচানোর সময় দাঁত খোঁচার প্রয়োজন হতে পারে তার জন্য খড়কে-কাঠিও আছে। সমস্ত সাজানো-গোজানোর পর বিনো অলকার পা ঝাঁকাচ্ছে: ওঠো বউ, একটু কষ্ট করে দুটো খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়বে।

ধড়ফড় করে অলকা উঠে পড়ল—খুকখুক খিলখিল এদিকে-সেদিকে হাসির ফোয়ারা। শাশুড়ি হওয়া সত্ত্বেও তরঙ্গিণীর সায় রয়েছে, সন্দেহ হয়। মেয়ে-মানুষের এত ঘুম কি ভাল? প্রদীপে সলতে বাড়ানোর অছিলায় এ-ঘরে তিনি এক পাক ঘুরে দেখে গেলেন। ঘুম উড়ে গিয়ে লজ্জায় নতুনবউ কেঁদে ফেলল।

আর একবার। কৃষ্ণময় তখন কলকাতার চাকরিতে ঢুকেছে, বাড়ি এসেছে মাস সাতেক পরে। অলকা বউয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয়েছে একবার দু-বার,

কিন্তু কাছাকাছি হতে পারেনি। লোক গিজগিজ করছে—দিনমানে কাছাকাছি হওয়া অসম্ভব, রাত্রের আগে হবে না। এবারের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দেওর ছিরুও। হাটে ভবনাথ যান, সঙ্গে ছিরু থাকে। কোনদিন ছিরু একলাই হাট করে আনে। হাটে যাবার সময় বিনো ছিরুকে বলে দিল, তাড়াতাড়ি ফিরবি রে। সারারাত বড়দা কাল রেলগাড়িতে কাটিয়ে এসেছে, সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়বে। বলে হাসিমুখে চোখ টিপল একবার অলকার দিকে। লজ্জা পেয়ে অলকা পালিয়ে যায়। চোখ বিনো আরও টিপেছিল ছিরুর দিকে, অলকা সেটা দেখেনি—পরে মালুম পাওয়া গেল। হাট করে ছিরু বেশ সকাল সকাল ফিরল। ভালমানুষি ভাবে বিনো বলে, মাছ ক'টা তাড়াতাড়ি কেটে নাও বউদি আমি একসম্বরা ঝোল চাপিয়ে তোমাদের বসিয়ে দিচ্ছি। অলকা বউ খালুইয়ের মাছ সব ঢেলে ফেলল। কুচো মাছ—মৌরলা আর তিতপুঁটি—আট আনায় খালুই একেবারে বোঝাই। কোট এখন বঁটি পেতে একটা একটা করে ঐ মাছ। রাত কাবার হয়ে ভোরের পাখপাখলি ডেকে উঠবে, মাছ কোটা তখনো সারা হবে না। কৃষ্ণময়কে খাইয়ে দিল, পথের ক্লান্তিতে ঘুম ধরেছে তার। অলকা কুটছে কুটেই যাচ্ছে—চোখে তার জল এসে গেল। শোওয়া আজ কপালে নেই। মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে চোখ মুছল একবার। ইচ্ছে করে, মাছ-কোটা বঁটির ঘায়ে পোড়া-জীবনের অবসান ঘটায়। তারপরে বুঝি দয়া হল ননদিনীদ্বয়ের। নিমি এসে বলল, ওমা, এখনো যে অনেক বাকি। সেজদাদার যেমন কাণ্ড—গুঁড়োমাছ এনেছে এক ঝুড়ি। অনেক হয়েছে, ওঠো এবারে, হাত ধুয়ে হেঁসেলে যাও, খুড়িমা ডাকছে। হাতাহাতি আমরা এগুলো সেরে দিচ্ছি। অলকাকে সরিয়ে নিমি লেগে গেল মাছ কুটতে, আলাদা এক বঁটি নিয়ে বিনোও এসে পড়ল। খুড়িমা অর্থাৎ তরঙ্গিণী হেঁসেলে ডাকছেন—তার মানে আলাদা করে খাইয়ে তাকে ঘরে পাঠাবেন। তাই হয় কখনো, লজ্জা করে না বুঝি! কথা কানে না গিয়ে অলকা গড়িমসি করে। কোটা-মাছ ডালায় ফেলে রগড়ে রগড়ে ধোয়া, নুন-হলুদ মাখায়। ইতিমধ্যে দক্ষ হাতে ঐ দু'জন কোটার কাজ শেষ করে ফেলেছে। নিমি-তরঙ্গিণীর পাশাপাশি অলকা-বউ খেতে বসল—অনেক রাত্রি তখন।

চিওল ও ভেরেণ্ডা-গাছের বেড়া। বেড়ার গায়ে ঝিঙে বরবটি উচ্ছেলতা জড়িয়ে উঠেছে। অন্য দিকে পোড়োভিটায় ভাঁট-কালকাসুন্দে-আশশ্যাওড়ার জঙ্গল। মাঝখানের পথ দিয়ে গরুর-গাড়ি ক্যাঁচকোচ আওয়াজ তুলে চলল।

কমল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। বাদামতলায় গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল, আর তখন গাড়ি নজরে আসে না। আওয়াজ আসছে শুধু। বড়গিন্নি চোখ মুছছিলেন—ক্যাঁচ-কোঁচ কুঁউ-কুঁউ, গাড়ি না বড়গিন্নি, কার এই বুক ছেড়ে কান্নাকাটি?

কালীময় আগে আগে যাচ্ছে। মালকোচা-আঁটা ধুতি, রাস্তার ধুলো-কাদা থেকে যতদূর বাঁচানো যায়। গলার চাদর কামিজের উপর দিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছে। ঘাড় নামিয়ে ঘন ঘন কামিজের দিকে দেখছে—জুতোর মতন কামিজটাও খুলে মায়ের কাছে দিলে কেমন হয়? হবে তাই, এখন নয়—পর পর কয়েকটা গ্রাম এখন। মানুষজন বলবে, দেখ, পুববাড়ির মেজোবাবু চাষা ভুখোর মতন খালি-গায়ে কুটুমবাড়ি যাচ্ছে। গ্রাম ছাড়িয়ে বিলের-রাস্তায় পড়বে—মানুষজন বলতে একটি-ছুটি চাষীলোক, সোনাখড়ির বাবু বলে চিনবে না, জামা খুলে তখনই হালকা হওয়া চলবে।

গাড়ি কোয়ানে যাবে? বেগুনক্ষেত নিড়াচ্ছে, ঘাড় না তুলে চাষী হাঁক পেড়ে উঠল।

গাড়োয়ান জবাব দিল: গুয়োতলি—

আসতিছ কোয়ান তে?

বিলেত মুলুক থেকে—

খিক-খিক করে গাড়োয়ান হেসে উঠল। বলে, আমি কোদা মোড়ল, গলা শুনে ঠাহর পাও না?

এমনি পরিচয় করার রীতি। আমার গায়ের উপর দিয়ে ঘরের পাছদুয়ার দিয়ে যাচ্ছ—মানুষটা তুমি কে, কী প্রয়োজনে কোথায় চলেছ, খবরবাদ নেবো না? এর পরেই, তামুক খেয়ে যাও ভাই—ডাকাডাকি করে বসবে, কলকে এগিয়ে দেবে। কোদা মোড়ল নিতান্তই প্রতিবেশী মানুষ—গাড়ির আওয়াজ কানে পেয়ে ডাকাডাকি করছিল, চোখ তাকিয়ে দেখে সামান্যে তার ছাড় হয়ে গেল।

কালীময় বলে, গাড়ির ধুরোয় কদিন তেল দাওনি কোদা? ডাকে যে ত্রিভুবন জানান দিয়ে চলেছ।

কোদা মোড়ল বলে, কাটা-ঝাড়ার মরশুমে ফুরসত কখন যে তেল দিই? ধান বয়ে বয়ে গাড়িও তো জিরান পাচ্ছে না।

হুড়কোর খুঁটি ধরে কমল সেই থেকে একদৃষ্টে পথের পানে চেয়ে আছে। চড়ুই কতকগুলো কিচিমিচি করেছে, বেশ একটা ছন্দোময়ভাবে মাটিতে ঠোক দিয়ে দিয়ে কি যেন তুলে নিচ্ছে। কাঁচাঘুমে তুলে টুকটুকিকে বড়গিন্নির কাছে নিয়ে গিয়েছিল, শুইয়ে দুটো থাবা দিতে আবার সে ঘুমিয়ে গেল। অল্প শীতে

গা শিরশির করে—অবেলায় ঘুমুতে আর মন নেই। বাইরে এসে কমলকে ঐভাবে দেখে অলকা-বউ কাছে এলো : দাঁড়িয়ে আছ কেন খোকন? ঘরে চলো।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কমল গোঁজ হয়ে রইল।

অলকা বলে, চলো তবে কানাইবাঁশির তলায় গিয়ে দাঁড়াই গে। গরুর-গাড়ি আবার দেখতে পাবে।

বাইরের উঠানের পর রাস্তা, রাস্তা পার হয়ে আমবাগিচা। তারপরেই বিল। বাগিচার শেষ প্রান্তে বিলের কিনারায় বিশাল আমগাছ, যার নাম কানাইবাঁশি। অর্ধেক ডালপালাই তার বিলের উপর। কমলের হাত ধরে অলকা-বউ কানাইবাঁশির তলায় এসে দাঁড়াল।

ধান-কাটা হয়েছে, বিল এখন শুকনো খটখটে। বিল ভেদ করে রাস্তা চলে গেছে। এদিকে সেই গ্রাম সোনাখড়ি আর অদিকে ঐ গ্রাম পাথরঘাটা—রাস্তা সেতুর মতন গ্রাম দুটো জুড়ে দিয়েছে। পাকা গাঁথনির মরগা-রাস্তা-টুকুর মাঝামাঝি, এ-বিলে ও-বিলে জল-চলাচলের পথ। পাশেই বাঁকা তাল-গাছ একটা, বিলের বিস্তর দূর থেকে নজর পড়ে। তেপান্তরের মাঝে ঐ তাল-গাছ নিশানা। বর্ষার সময় রাস্তা ভেসে গিয়েছিল—হাঁটুজল কোমরজল ভেঙে লোকের যাতায়াত। শীতকালে এখন মাটি ফেলে মেরামত হচ্ছে। রাস্তার ধারের নয়ানজুলি থেকে ঝুড়ি মাথায় কালো কালো মূর্তি পিল পিল করে উঠে মাটি ফেলছে। নেমে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্ষণপরে উঠে আসে আবার। আবার নেমে যায়। চলেছে অবিরাম। কানাইবাঁশি তলা থেকে আবছা রকম দেখা যাচ্ছে।

বেশ খানিকটা পরে গরুর-গাড়ি দেখা দিল। রাস্তা এমন-কিছু দূর নয় এখান থেকে। কিন্তু ডাঙায়-ডাঙায় প্রায় অর্ধেক গ্রাম চক্কোর মেরে গাড়ি এসেছে—সেইজন্যে দেরি। গ্রাম ছেড়ে বিল পার হয়ে যাচ্ছে এবার। আগে আগে মেজদাদা কালীময় ঐ যে। পিছনে গাড়ির উপর জেঠিমা পুঁটি আর কোদা-গাড়োয়ান।

যাচ্ছে গাড়ি, যাচ্ছে। ফাঁকা রাস্তাটুকু পার হয়ে পাথরঘাটার গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর নজরে আসে না। যাচ্ছে, তবু গাড়ি যাচ্ছে বাঁশঝাড়ের নিচে দিয়ে ঘরের কানাচ দিয়ে পুকুরপাড় দিয়ে তেঁতুলতলার নিরালা কবরটার পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে। জ্ঞাতজিদের সেই এক বাড়ির উঠানে আটচালা ঘরের সামনে কোদা-গাড়োয়ান শ্‌চ্‌-শ্‌চ্‌-শ্‌চ্‌—আওয়াজ তুলে থামিয়ে দেবে গরু, সকলে নেমে পড়বে। ততক্ষণ অবধি ক্রমাগত চলবে গাড়ি—

জেঠিমা আর পুঁটি কত মজার চলেছে—কমলকে নিয়ে গেল না। চোখের পল্লব ঘন ঘন হঠাৎ কয়েকবার নাচল, মুখের ভাব কেমন-কেমন—

অলকা প্রবোধ দিয়ে বলে. ওমা, কাঁদছ তুমি খোকন, কান্না কিসের? বেটাছেলে তোমাদেরই তো মজা। বড় হয়ে নাও—কত জায়গায় যাবে, কত দেশবিদেশ দেখবে।

মাঝবিল দিয়ে হুশ হুশ করে এক-ঝাঁক বক উড়ে গেল। অলকা বলে, পুরুষমানুষ আর পাখি। কত মজা তোমাদের—ইচ্ছে মতন যেখানে খুশি চলে যাবে। মেয়েছেলে আমাদের পায়ে শিকল। বাপের-বাড়ি মা-বাপের কাছে যাবো—তার জন্যেও জনে জনের কাছে মত চেয়ে বেড়াও। তারপর পালকি রে গাড়ি রে—শতেক বায়নাক্কা।

টুকটুকির কান্না পাওয়া যাচ্ছে বিলের ধারে এই এত দূরেও। পিছনে তাকিয়ে দেখল, বিনো কোলে নিয়ে এদিক আসছে। বলে. তুমি এখানে—মেয়ে জেগে পড়ে ওদিকে বাড়ি মাথায় করছে। যা একখানা তৈরি করেছ—তুমি ছাড়া কেউ ঠাণ্ডা করতে পারবে না।

অলকা বলে, পোড়ারমুখির দু'চোখে একটু যদি ঘুম থাকে। কত করে এই ঘুম পাড়ালাম—বলি একলা খোকন মুখ চুন করে বেড়াচ্ছে, বুঝিয়ে শান্ত করে আসি। উঠে এই ক'পা এসেছি, অমনি টনক পড়ে উঠল।

মেয়েকে অলকা বুকে তুলে নিল। ক্ষিধে পেয়েছিল, আহা চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। একটুক্ষণ খেয়ে হাসে ঘাড় তুলে। ইঁদুরের মতন কুচি-কুচি দাঁত—হাসলে ভারি সুন্দর দেখায়। কে বলবে, এই মেয়ে একটু আগে ধুন্দুমার লাগিয়েছিল, ঠাণ্ডা করতে বাড়ির লোক হিমশিম খেয়েছে। বিনোকে দিয়ে শেষটা মায়ের কাছে পাঠাতে হল।

বিকাল। দুপুরে সবাই যে ঘুমায়, তা নয়। কাঁথার ডালা নিয়ে বসে, রামায়ণ পড়ে—কত কি। তবে আজকের আসল ভাব একটা। এইবারে এখন হুড়োহুড়ি লেগে যাবে। নতুনবাড়ির মেজগিন্নি বেড়াতে এলেন, তরঙ্গিণী পিঁড়ি পেতে দিয়ে নিজে সামনে আঁচল পেতে বসলেন। অলকা-বউ পান সেজে এনে দিল।

মেজগিন্নি বললেন, কেষ্টর-মা গেলেন রওনা হয়ে? আসব ভেবেছিলাম—তা কোটা-বাছা রাঁধাবাড়া সবই তো দু'খানা হাতে। ও-বেলা নিশ্বাস ফেলার ফুরসত থাকে না। নতুনবউ বাড়ি আসবে, না ওখান থেকেই অমনি বাপের-বাড়ি চলে যাবে?

চুল বেঁধে পাছাপেড়ে শাড়িটা পরে কপালে বড় করে সিঁদুরের কোঁটা

দিয়ে নিমি চলল। তরঙ্গিণীকে জানান দিয়ে যাচ্ছে: যাচ্ছি ছোটমা। যায় শশধর দত্তের বাড়ি, রাজির কাছে। রাজি এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। নিমির হাত ধরে টেনে দরজার খিল এঁটে দেবে - গুটুর-গুটুর চলবে সন্ধ্যা অবধি। রাজির গল্প শুনে শুনে নিমি বোধহয় বরের সাধ খানিকটা করে মেটায়।

কমল আজ একা। পুঁটি থাকলে কত খেলুড়ে আসে - চারি পটলি ফুল্টি টুনি পালেদের বেউলো উত্তরবাড়ির ফোক্লা আরও কত। রাঁধাবাড়ি পুতুল-খেলা নাটাখেলা কড়িখেলা কানামাছি কুমির-কুমির - খেলা কত রকমের। আজকে কারো দেখা নেই। আসে পুঁটির কাছে—ছোট বলে কমলকে তাচ্ছিল্য করে। একবার গিয়ে তরঙ্গিণীর কাছে জিজ্ঞাসা করে এলো —না, এখনো পুঁটিরা পৌঁছে যায় নি, গুয়াতলি কম দূর নয়। যাচ্ছে গরুর-গাড়ি—মনের কল্পনায় কমল গাড়ি দেখতে পাচ্ছে— মাঠ-বিল খেজুরের বাঁশবন জঙ্গল-জাঙাল পার হয়ে কত গাঁ গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সূর্যি পাটে যাবেন, বেলা ডুবে সন্ধ্যা হবে, রাত হবে, পহর রাতে শিয়াল ডাকবে, জোনাকি উড়ে বেড়াবে, আকাশে তারা ফুটবে, হাট করে হাটুরে মানুষ সব বাড়ি ফিরে যাবে—গ্রামপথে কাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে গাড়ি তখনো যাচ্ছে। তখনো যাচ্ছে। গুয়াতলি মজুমদার-বাড় যাওয়া সহজ কথা নয়।

একা-একা লাগে বড্ড। এক ছুটে কমল কানাইবাঁশির তলায় চলে এলো। বিলের এইটুকু পার হয়েই বাঁকা তালগাছ, মরগার রাস্তা— পুঁটিরা যে রাস্তায় গরুর-গাড়ির আওয়াজ তুলে সোনাখড়ির এইসব গাছপালা বাগবাগিচা ঘরবাড়ির দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে চলে গেছে। মাটি ফেলার কাজ বন্ধ এখন - সে সব মানুষ বাড়ি চলে গেছে। বিল থেকে ক'জনে গরু-ছাগল তাড়িয়ে তুলে রাস্তাটা পার হয়ে ওদিকে নেমে নজরের বাইরে চলে গেল। একলা কমল। একা হওয়ার সুবিধাও এক দিক দিয়ে - যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়, যা ইচ্ছে করা যায়, মায়ের কাছে জেঠামশায়ের কাছে পুটপুট করে লাগাতে যাবে না কেউ। মরগার রাস্তায় যেতে ইচ্ছে করছে, যার উপর দিয়ে ওই খানিক আগে গরুর-গাড়ি চলে গেল। সাঁ করে তীরের বেগে চলে যাবে - গিয়ে আজকের তোলা এক চাংড়া কালো মাটি নিয়ে তক্ষুনি আবার ফিরবে। তুম মাছ নিয়ে যাচ্ছে —চিল আচমকা যেমন ঝাপটা মেরে একটা মাছ নিয়েই আবার আমের ডালের উপর বসে। মাটির চাংড়া বীরত্বের নিদর্শন - যত্ন করে রেখে দেবে

কমল, পুঁটি ফিরে এলে দেখাবে : চেয়ে দেখ, একা-একা মরগার রাস্তা অবধি চলে গিয়েছিলাম। এমনি যেতে যেতে গুয়াতলি অবধি চলে যাব একদিন। গুয়াতলি কি – আরও অনেক অনেক দূরের জায়গা, সাতসমুদ্র তেরোনদীর পার। কলকাতার শহরে যাব – আজব জায়গা, কল ঘোরালে জল পড়ে যেখানে। গরুর-গাড়ি ঘোড়ার-গাড়ি রেলগাড়ি – গাড়ি চড়ার বাকি থাকবে নাকি কিছু ?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেমে পড়ল ধান-কেটে-নেওয়া শুকনো বিলে। বড়রা যাত্রামুখে দুর্গা-দুর্গা করে, কমলও তাই দুর্গা-নাম করল। বেলপাতা কাছেপিঠে নেই, কি করবে – থাকলে হয়ত নিয়ে নিত। রাস্তার উপরে বাঁকা-তালগাছ তাক করে চলেছে।

কোনো দিকে একটা মানুষ নেই। খানিক দূর গিয়ে ভয়-ভয় করছে। তালগাছের অনেক তো বাকি। গ্রামের এ-মুড়ো ও-মুড়ো একা-একা কতই তো চলাচল করে – তখন ভয় করে না। মানুষ যদি না-ও থাকে – চারিদিকে গাছ গাছালি থাকে গরু ছাগল ঘুরে বেড়ায়, তাতে সাহস পাওয়া যায়। এই বিল বর্ষাকালের মতন যদি সবুজ ধানগাছে ভরা হত, তাহলে বোধহয় ফাঁকা লাগত না, গা ছমছম করত না এমন।

আরও গোলমাল হাওয়ায় করছে। নজরে পড়ে না—দূর দুরান্তর থেকে এসে ঝাপটা মারে গায়ে। চুল উড়ছে, গা শিরশির করে। একলা পেয়ে নিঃসীম বিল থেকে অদৃশ্য রূপে এসে ছাট মারছে গায়ের উপর। ছোট পেয়ে শাসন করছে যেন : উঠে পড়, বিলের মধ্যে কি ? গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে গিয়ে ওঠ। প্রহ্লাদ মাস্টারমশায় জল্লাদকে যেমন ছাট মেরে শাসন করেন।

অদৃশ্য এই হাওয়া হঠাৎ যদি দৈত্যের মূর্তি ধরে সামনে দাঁড়ায়। আসন্ন সন্ধ্যায় নিরালা এই বিলের মধ্যে – সোনাখড়ি গ্রাম ঐ দূরে পড়ে রইল, মরগার রাস্তাও কাছে এগিয়ে আসে না – এখানে কী হতে পারে, আর কোন বস্তু অসম্ভব, সঠিক কিছু জানা নেই। মরগা অভিযান আজ বরঞ্চ মুলতবি থাক – দিদি ফিরে আসুক। পুঁটি কানাইবাঁশির গাছতলায় দাঁড়িয়ে দেখবে, একদৌড়ে আমি মরগার রাস্তায় চলে যাবো। কালো মাটির চাংড়া এনে দিদির হাতে দিয়ে দেবো, ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যাবে সে।

কমল ডানহাতি ঘুরল। আ'লের পথ। আ'ল ধরে সোজা উলুক্ষেতে উঠে পড়ল। এই উলুক্ষেত পার হয়েই খেজুরবন। চেনা জায়গা – উলুক্ষেতের পাশ দিয়ে কতবার সদলবলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে। কিন্তু মানুষের

পতিগম্য একটি যে দেখা যায় না কোনো দিকে। রাক্ষসে খেয়ে শেষ করে গেছে নাকি পাতালকন্যার দেশের মতো? উলু কেটে নিয়ে গেছে, উলুর গোড়া লক্ষকোটি সূচ হয়ে আছে। দেখে শুনে ধীরে-সুস্থে পা ফেলতে হয় —বড় কষ্টের পথ চলা।

কষ্ট কাটিয়ে তার পরে এইবার সোয়াস্তি। বিস্তর সঙ্গীসাথী পেয়ে গেল চারিদিকে—এই যত খেজুরগাছ। দেড়ে-গাছেরা আছেন—বয়সে বৃদ্ধ, বিষম ঢ্যাঙা, আকাশ ছুঁই-ছুঁই করছেন। গলার কাছে, উই সে আকাশ-রাজ্যে, রসের ভাঁড়। একটা কাক ভাঁড়ের উপর বসে গাছের ঐখানটা ঠোকর দিচ্ছে মিষ্টি রসের লোভে। এদিকে-সেদিকে গাট্টাগোট্টা মাঝবয়সি অনেক সব গাছ—মাথা জুড়ে সতেজ সবুজ পাতার ঝোপ, মরদজোয়ানের একমাথা বাবরি চুলের মতন। আর বাচ্চা-গাছই বা কত! একেবারে বাচ্চা মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে আছে—গুঁড়ি বলতে কিছু নেই, মাটির ভিতর থেকেই যেন ডালপালা উঠছে। আর কতক আছে—খানিকটা বড় তারা, এবারে চাঁচ দিয়েছে, কেটে রস আদায় করছে। কাঁটায় বাগড়োয় ঝাঁকড়ামাকড়া হয়ে ছিল—চাঁচ দেবার পর গোঁফদাড়ি কামানো মানুষের মতন পরিচ্ছন্ন হয়েছে। গায়েগতরেও, বোঝা যাচ্ছে, তারা এখন আর নিতান্ত ভূমিলগ্ন নয়। ভাঁড় পেতে পেতে গেছে এসব গাছে, দড়ি দিয়ে ভাঁড় ঝোলানোর আবশ্যক হয় নি—মাটির উপর ভাঁড় বসানো। নলি বেয়ে ভাঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে। কমল দেখছে ঠিক উল্টোটি—গাছের রস ভাঁড়ে পড়ছে না—ভাঁড়ের রসই বাচ্চা-গাছ নির্জন খেজুরবনে বসে চোঁ-চো করে খেয়ে নিচ্ছে। যেমন সেদিন কালু গাছির বাইনশালে কমল আর পুঁটি রস খেয়েছিল পাটকাঠির মুখে। পাটকাঠির বদলে বাঁশের নলি এই গাছদের। ক্যাড়াসেজি ও বাবলাকাঁটা দিয়ে ভাঁড় ঘিরে দিয়েছে শিয়াল বেজিতে কিম্বা ছেলেপুলেরা রস খেয়ে না যেতে পারে। ও গাছি, সব রস তোমার চুপিসারে গাছেই যে খেয়ে নিল! কাল সকালে গাছ পাড়তে এসে দেখবে খালি ভাঁড় ঢন-ঢন করছে।

হিরণ্ময়ের যেদিন বিয়ের তারিখ, সেই সকালে খবর নেই বাদ নেই কৃষ্ণময় এসে উপস্থিত।

হঠাৎ কি মনে করে? খবর ভাল তোমাদের? দেবনাথ কোথা?

ভবনাথ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। বাড়ির সবাই ভিড় করেছে। কৃষ্ণময় বলল, কাকামশায় পাখি-শিকারে গেছেন সেজবাবুর সঙ্গে।

বাঁ-হাতে ঝোলানো একগণ্ডা ফুলকপি, ডানহাতে ভারী-সারি বোঁচকা। বোঁচকার কাপড়চোপড় ও কমলালেবু। লেবু ও কপি এ অঞ্চলে দুর্লভ, শীতকালে যারা কলকাতা থেকে আসে এই দুই বস্তু আনবেই। জিনিসপত্র রোয়াকে নামিয়ে রেখে কৃষ্ণময় বলল, আমার সেজবাবু জোরজার করে পাঠালেন। বললেন, ম্যানেজারকে আটক করলাম। তোমার বুড়োমানুষ বাবা একলা পেরে উঠবেন না, তুমি গিয়ে কাজকর্মে সাহায্য করোগে।

তারপর সবিস্তারে শোনা গেল। ভূদেব মজুমদার দেবনাথকেও চিঠি পাঠিয়েছিলেন, বয়ান একই। যাবার জন্য বিশেষ করে লিখেছেন। চিঠি পেয়ে দেবনাথ ক্ষেপে গেলেন: যাবো আমি—যাবোই তো। ঠেকানো দুঃসাধ্য তাঁকে। স্বাভাবিকও বটে। হবে-না হবে-না করে কমল হয়েছে এইতো সেদিন মাত্র—ছিরুই বরাবর ছেলের আদর পেয়ে এসেছে দেবনাথের কাছে। বন্দুক আছে দেবনাথের—সুন্দরবনের লাটে হামেশাই চলাচল, বন্দুক সেই সময় সাথেসঙ্গে রাখতে হয়। বন্দুক আর বাধা বাধা ছ'জন বরকন্দাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন আর কি দেবনাথ। বাড়ি যাবেন না, ঝিকরগাছা স্টেশনে নেমে ওত পেতে থাকবেন। বরযাত্রীরা রেলগাড়িতে ঝিকরগাছা এসে নামবে, সেখান থেকে স্টিমার। ছিরুকে স্টেশন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, বাড়ি-টাড়ি নয়, সোজা একেবারে কলকাতায় নিয়ে তুলবেন। লাঠি খাবে বরপক্ষ যদি বাধা দেয়। প্রয়োজনে বন্দুক ছোড়া হবে।

আয়োজন চলছে—কথাটা কিভাবে সেজবাবুর কানে উঠল। মনিব হলেও দেবনাথকে তিনি বন্ধুর মতো দেখেন। বিভূতি নিয়ে খুব খানিকটা ধমক দিলেন: ছিঃ, বুদ্ধিমান বিবেচক হয়ে এটা আপনি কি করছেন? বর কেড়ে নিয়ে আসবেন—তার পরে কন্যাপক্ষের অবস্থাটা ভেবে দেখেছেন? তাঁদের কি অপরাধ?

দেবনাথ বললেন, ছেলের বাপ বর্তমান, তাঁকে বাদ দিয়ে মামার সঙ্গে কথা বলতে যান কেন ওঁরা।

ভয়ে। সে তো বোঝাই যাচ্ছে। পাহাড় না সমুদ্দুর—আপনারা কোনটা চেয়ে বসেন, কুটুম্ব তাই চোরাপথে কাজ সারলেন।

হেসে সেজবাবু ব্যাপার লঘু করে দিলেন। বললেন, এসব বোঝাপড়া পরে—গণ্ডগোল ঘটানো এখন ঠিক হবে না। তার চেয়ে আমি বলি, গয়ানডাঙার বিস্তর পাখি পড়েছে, পাখি মারতে চলুন আমার সঙ্গে।

কলকাতায় রেখে ভরসা হল না। উত্তেজনার বশে কখন কি করে বসবেন—পাখি-শিকারের নামে সেজবাবু তাঁকে আবাদে নিয়ে বের করলেন।

॥ সাতাশ ॥

সকালবেলা পুণ্য গাইয়ের বাছুর হল। বাছুর উঠতে পারে না, পুণ্য জিভ বাড়িয়ে ক্রমাগত বাছুরের পা চাটছে। এতেই বলশালী হচ্ছে বাছুর। ওঠার চেষ্টা করে, পড়ে যায়। চেষ্টা আবার করে, হয় না। করতে করতে শেষটা দাঁড়িয়ে পড়ল। একেবারে চোখের উপর। ভারি মজা তো! কমল হাঁ করে দেখছে। দেখছে আরও কত জনা। কাছে যাবার জো নেই, পুণ্য ঢুঁ মারতে আসে। পুণ্য হেন শিষ্টশান্ত গরু—মা হয়ে গিয়ে আজ মেজাজ তিরিক্ষি। বিকালে দেখা যায়, ফুলেবাছুর দিব্যি লম্ফঝম্প লাগিয়েছে।

মাসখানেক পরে একদিন গাই দোওয়ার পর ফুলেবাছুরকে গাইয়ের কাছে দিয়ে রমণী দাসী চলে গেছে। বাছুর পালাল। হুড়কো খোলা পেয়ে চলল বাছুর সোজা বিলের দিকে। কমল দেখতে পেয়েছে, সে-ও ছুটল। প্রাণী তো একফোঁটা, কায়দা কত দৌড়ানোর! ধরে ফেলল কমল, দু-হাত গলায় বেড় দিয়েছে—পাঁকাল মাছের মতন সড়াক করে বেরিয়ে বাছুর লাফাতে লাফাতে দৌড়য়। দেখতে মজা—পিছনে ছুটবে কি, দৌড়ের রকম দেখে সে হেসেই খুন। তিড়িং তিড়িং লাফ দিয়ে এক-একবার উল্টোমুখো ঘুরে যেন নাচ দেখিয়ে যায়।

বিলে পড়েছে, সামনের দিক দিয়ে অটল আসছে। বলে, ছুটছ কেন খোকন, আল বেধে পড়ে যাবে। বাছুর আমি ধরে দিচ্ছি।

তাতে কমলের ঘোর অপমান। এক-মাসের বাছুরের কাছে পরাজয় মানবে—না, কিছুতেই নয়। জোর গলায় সে নিষেধ করে: ও অটল-দা, ধরতে হবে না তোমায়। আগলে দাঁড়িও না—সরে যাও, ছুটতে দাও ওকে। আমি তেড়ে ধরব।

পথ ছেড়ে দিয়ে অটল হাসিমুখে চেয়ে রইল। মানুষ-খোকা আর গরু-খোকায় পাল্লাপাল্লি—কে হারে কে জেতে, দেখা যাক।

বিল এখানটা কয়েক পা মাত্র। বাছুর ওদিককার উঁচু জায়গাটায় উঠে গেল, যার নাম গোয়ালবাথান। কসাড় বাঁশবন একদিকে—তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পিছন পিছন কমলও। কত ঝাড় কতদিকে—ঝাড়ের যেন গোলকধাঁধা। ফুলেবাছুর ঘুরপাক দিচ্ছে এ-ঝাড় বেড় দিয়ে ও-ঝাড়ের পাশ কাটিয়ে। কমল তাড়া করেছে। বাঁশপাতা পড়ে পড়ে এক বিঘত অন্তত উঁচু—ছুটছে যেন সে গদির উপর দিয়ে। এত পাতার একটি থাকবে না,

কুমোররা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে তাদের রাক্কুসে-জোড়া যোগাই করে। হাঁড়ি-কুড়ি পোড়ানোর পক্ষে বাঁশের পাতা বড় ভাল। আর, রস জাল-দেওয়া বাইনে কাঠের যখন টান পড়ে যাবে,কঞ্চির ঝাড়ু বানিয়ে ম'লদাররাও বাঁশপাতা কুড়োবে। পাতা এখন জমতে দিয়েছে, গাদা হয়ে জমে থাকুক।

ছুটছে কমল বাঁশবনের ভিতরে। বাঁশপাতা পায়ে পায়ে ছড়িয়ে যায়, উপরমুখো ওঠে। ক্যা-ক্যা কট-কট-কট কটর-কটর—বাঁশেরা কথা বলছে। মানুষে যেমন কথা বলে—চারিদিকে অন্য যারা রয়েছে, কুকুর-বিড়াল গরু-বাছুর গাছগাছালি, তারাও সব কথা বলে। কথা বলে, ঝগড়া করে, হাসে, ঠাট্টা-বটকেরা করে, ভয় দেখায়। এক রাজপুত্তুর পাখির কথা বুঝতে পারত, রূপ-কথায় আছে। কমল পারে বোধহয় খুব অনেকক্ষণ যদি কান পেতে থাকে। অগুন্তি বাঁশঝাড়—আকাশের তারা পাতালের বালি গণা যায় না, তেমনি এরা ভালকো-বাঁশ তলতা-বাঁশ বাঁশনি-বাঁশ—সব রকমের আছে, চেহারা দেখে কমল বাঁশের জাত বলতে পারে। ঝাড়ের গোড়ায় এদিক-সেদিক কোঁড়া বেরিয়েছে—মাথায় টুপি কাচ্চাব'চ্চাগুলো লম্বাধিড়িঙ্গে বড়দের পায়ের গোড়ায় গুটিসুটি হয়ে আছে মনে হবে, রোদ পাচ্ছে না বলে শীতে তুরতুর করে কাঁপছে —আহা, কোঁড়াদের দশা দেখে কষ্ট লাগে। বাঁশ কেটে নেওয়ার পরে মুড়ো-গুলো রয়ে গেছে—মাটির উপরে প্রায় হাতখানেক। মরে নি ওদের বেশির ভাগ—ছিটেকঞ্চি ও এক-আধটা নতুন পাতাও গজিয়েছে। জরদ্গব বুড়ো-মানুষের টেকো মাথার উপর দু-দশ গাছি চুলের মতো।

বাতাস উঠল—এমন কিছু নয়, সামান্য রকম। তাতেই কী কাণ্ড—ওরে বাবা! সকল দিকে সবগুলো ঝাড় একসঙ্গে মাতামাতি লাগাল। দৌড় দিল কমল বেরিয়ে পড়বার জন্য। এদিক থেকে ওদিক থেকে সপাং সপাং করে বাঁশেরা কঞ্চির বাড়ি মারছে, সামনের উপর নুয়ে নুয়ে পড়ছে—কায়দায় পেলে হয়তো-বা টুঁটি ধরে আকাশে তুলে নেবে। কত গভীর এসে পড়েছে না-জানি, বাঁশবনের কোন মুড়োদাঁড়া পায় না। কষ্ট হচ্ছে—এবারে হয়তো গড়িয়ে পড়বে বাঁশতলায় বাঁশপাতার গদির উপরে। আর, কাছের বাঁশ দূরের বাঁশ মাটিতে আবদ্ধ গোড়াগুলো হেঁচকা টানে উপড়ে নিয়ে হুড়মুড় করে ঘাড়ে চেপে পড়বে—

গলা দিয়ে কোন রকমে স্বর বের করে কমল ডেকে উঠল: অটলদা—

এইতো—। হাজির-জবাব সামান্য দূরে, একটামাত্র ঝাড়ের ওদিক থেকে। দুলেবাছুরের কান ধরে আটক করে ফেলেছে অটল, হাসছে খুব কমলের অভিমান দেখে।

ক্যানসা- ভাত খেয়ে ছেলেরা সব পাঠশালা যায়। বিদ্যোৎসাহী কেউ কেউ ছেলের সঙ্গে নাকে-নোলক পায়ে-মল বাচ্চা মেয়েটাও পাঠিয়ে দেন। বেশি নয়, সারা সোনাখড়ি কুড়িয়ে পাঁচটা সাতটা এমনি। ছাত্রীদের নাম হাজিরাখাতায় কিন্তু ওঠেনি। মেয়েছেলে পাঠশালায়—ইনস্পেক্টর কী বলে না বলে, লেখাজোখার মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

পাঠশালা নতুনবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে। পাকা দেয়াল, খড়ের ছাউনি। দুটো কামরা মণ্ডপের দুই দিকে—একটায় চুন-সুরকি, অন্যটায় তক্তা-কাঠকুটো। বাংলা সাতানব্বুই সালে পাকাবাড়ির ভিত পত্তন, দোতলা চকমিলানো বাড়ির মতলব ছিল তখন। ততদূর হয়ে ওঠে নি, সে মুরুব্বিরাও গত হয়েছেন। উত্তরপুরুষরা কিন্তু আশা ছাড়েন নি। দুই কামরা ভরতি মালপত্র মজুত। এবং বিনামূল্যের বালি তুলে উঠানের শিউলিতলায় গাদা করা আছে।

ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং—

চণ্ডীমণ্ডপের উত্তরের দেয়ালে মোটা আংটা বসানো। নতুনবাড়ি যখন দুর্গোৎসব হত, ঐ দেওয়ালের ধারে প্রতিমা বসাত। একবার প্রতিমা উল্টে পড়ার গতিক হয়েছিল, বাঁশ ঠেকনো দিয়ে বিস্তর কষ্টে খাড়া রাখে। মাদার ঘোষের বাপ চণ্ডীচরণ ঘোষ তখন নতুনবাড়ির কর্তা। পরের বছর তিনি দেয়াল খুঁড়ে মোটা আংটা বসিয়ে দিলেন। আংটার সঙ্গে দড়ি দিয়ে প্রতিমার পিছনের বাঁশ বেঁধে দিল, প্রতিমার আর নড়নচড়নের উপায় নেই। পুজো তার পরে তো বন্ধই হয়ে গেল। পাঠশালার ছোঁড়ারা আংটা এখন জোরে জোরে দেয়ালের গায়ে ঠোকে, আংটা বাজিয়ে বড়-ইস্কুলের ঘণ্টা বাজানোর সুখ করে নেয়। আংটার ঘা পড়ে পড়ে ইট ক্ষয়ে বৃত্তাকার গর্ত হয়ে গেছে উত্তরের দেয়ালের উপর।

ঠুং-ঠুং ঠুং-ঠুং—। ছেলেপুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে, মাস্টার পুকুরপাড়ে দেখা দিলেন বুঝি। কুমোরবাড়ির মেটে-দোয়াতে তিন ছিদ্র তিন দিকে, তাতে দড়ি পরিয়ে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে। খাগের কলম। দাসেদের বিজয় ভাল কলম কাটতে পারে, সবাই তাকে ধরে। বিজয়েরও আপত্তি নেই। মেধা কামারকে দিয়ে একটা ধারালো ছুরি এই বাবদে দু-আনা মূল্যে বানিয়ে রেখেছে। বইদপ্তর—বড় কমালের সাইজের কাঁথা, একটা কোণে পাড় ঝুলছে, বইখাতা কলম রেখে কাঁথার চার কোণে মুড়ে পাড় দিয়ে জড়িয়ে দপ্তর বাঁধে। বগলে সেই জিনিস। তালপাতার চাটকোল অথবা গোল করে জড়ানো খেজুরপাতার পাটি নিয়ে চলেছে। জায়গা নির্দিষ্ট আছে, পাটি-চাটকোল পেতে নিলেই হল।

তিন-গাঁ রাজীবপুরের লোক গুরুমশায়। এই দেখুন, গুরু বলে ফেলেছি—পাঠশালা হলেও প্রহ্লাদকে গুরু বলা ঠিক হবে না। যেহেতু ইংরেজি ফার্স্ট বুকও পড়িয়ে থাকেন, মাস্টার তিনি। প্রহ্লাদ-মাস্টার বলে সকলে। শনিবার পাঠশালার পরে তিনি বাড়ি চলে যান, সোমবার সকালে আসেন আবার—দরকারে হপ্তার মাঝেও যান কখনো-সখনো। আজ সোমবার এখনো এসে পৌঁছন নি। এক একটা দিন এমনি দেরি হয়ে যায়। হট্টগোল। চোর-চোর খেলছে ছেলেরা। উঠোনে কোর্ট কাটা আছে—জন কয়েক সেখানে নুন-দাঁড়ি খেলছে। কমল আর পাঁচু শিউলিতলার বালির গাদায় বুড়িপোকা ধরতে বসেছে। বালির উপর ছোট ছোট গর্ত—সুতোয় পিঁপড়ে বেঁধে সেই গর্তে ফেলে। ছিপে মাছ ধরার কায়দা। একটু পরে দেখা যায়, বালি নড়ছে—নিচে থেকে বুড়িপোকা বেরিয়ে পিঁপড়ে আঁকড়ে ধরে। খোকন ধরা ধরেছে। আস্তে আস্তে সুতো টেনে তোলে—বুড়িপোকাও উঠে আসবে। পোকা কোন কাজে আসে না, ধরার পরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—তবু মাছ ধরার মজা পাওয়া যায় খানিকটা। এই সব চলছে, তার মধ্যে মন দিয়ে সকলে সমুদ্দুর-পুকুরের পাড়ে তাকায়। পুকুরপাড় দিয়ে রাজীবপুরের পথ, প্রহ্লাদমাস্টার ঐ পথে আসবেন। আসার সময় হয়ে গেছে—ঠুং-ঠুং আংটা বাজিয়ে মাঝে মাঝে জল্লাদ জানান দিয়ে দিচ্ছে।

কমল বাড়িতে পড়ত দ্বারিক পালের কাছে। পাঠশালায় অল্পদিন আসছে—প্রহ্লাদমাস্টার নতুন আবার যোগ দিয়েছেন, সেই সময় থেকে। দু-বছর আগে শ্রীপঞ্চমীর দিন কমলের হাতে খড়ি হল। পাথরের থালার উপর পুরুত-ঠাকুর সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ—সরস্বতী-স্তবের একটা লাইন খড়িতে লিখে বললেন, এর উপরে যেমন ইচ্ছে আঁকাজোক কেটে যা, দোষত্রুটি দেবী নিজে সেরে নেবেন। এতাবৎ তরঙ্গিণী সদাসতর্ক ছিলেন, হাতে-খড়ির আগে কোনো কাগজের উপর কালি-কলম না ঠেকায়। হাটখোলা থেকে দুই পয়সায় দুটো বই কিনে রাখা হয়েছে—বর্ণবোধ ও ধারাপাত। নতুন বইয়ে কমল চুপিসাড়ে হাত বুলিয়ে দেখেছে—মসৃণ কোমল হাত পিছলে বেরিয়ে যায়। নাকের কাছে এনে শুঁকেছে—সোঁদা-সোঁদা গন্ধ একটা। কিন্তু ঐ অবধি—কালো অক্ষরগুলো কোন বই ছেড়ে সরে আছে। হাতে-খড়ি হয়ে যাবার পর বই-শ্লেট-কলম-কাগজে অবাধ অধিকার তার।

দ্বারিক পাল পুববাড়ি ও নতুনবাড়ি গোমস্তাগিরি করেন। তাঁকে বলা ছিল, হাতে-খড়ির পর একটা নতুন কাজ চাপবে—কমলকে পড়ানো। অতিরিক্ত

বেতনও সেই বাবদ। বাইরের-কোঠায় তিনি অপেক্ষা করছিলেন, বই স্লেট নিয়ে কমল গুটি গুটি সেখানে চলল। নিমি পুঁটি অলকা-বউ পিছু পিছু যাচ্ছে। দরজা অবধি গেল তারা সব, কমল ভিতরে ঢুকল। বসেছিলেন অম্বিক, হাত বাড়িয়ে কমলকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। বর্ণবোধ খুলে পড়াচ্ছেন: অ আ ই ঈ। কমল পড়ে যাচ্ছে।

পুরুতের দক্ষিণা, সরস্বতীপূজা ও কমলের হাতে-খড়ি দুই কাজের দরুন, রোক দুই সিকি। আধুলি বের করতে ভবনাথ ক্ষণ পরে বাইরের-কোঠায় ঢুকেছেন—দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়া শুনছেন। এক-ফোঁটা ছেলে কেমন টর-টর করে যাচ্ছে, শোন। অম্বিকের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে। কর্তার সামনে অম্বিক একটু বাহাদুরি দেখিয়ে দিলেন— পড়ানো হতে না হতেই পরীক্ষা: এটা কি বলো দিকি কমলবাবু? কমল বলল, অ—। পারবে না কেন? বই না পড়ুক, অ আ ইত্যাদি কত জনের কাছে কত শতবার শোনা। দক্ষিণার কথা ভুলে ভবনাথ চোখ বড়-বড় করে তাকালেন। অম্বিক তারিপ করে ওঠেন: ভারি পরিষ্কার মাথা। বড় হয়ে কমলবাবু জজ-ম্যাজিস্টর হবে এই বলে দিলাম। একটা মহাবীরত্বের কাজ করেছে, কমলের ভাবখানাও তেমনি। দুলে দুলে প্রচণ্ড শব্দ করে সে পড়ছে।

প্রহ্লাদ এ সময়টা পাঠশালার কাজে নেই—অম্বিক দত্ত পণ্ডিত হয়ে পাঠশালা চালাচ্ছেন। ঘরজামাই তিনি, মিস্তিরপাড়ার প্রিয়নাথ মিস্তিরের বড়মেয়ে দুর্গাকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ি কায়েমি হয়ে বসবাস করেন। প্রিয়-নাথের ছেলে নেই, পর পর আট মেয়ে। ঝাড়ফুঁক কত রকম হল, মেয়ে হওয়া ঠেকায় না। শেষের দিকে নাম রাখতে লাগলেন আন্না (আর না), ঘেন্না—নামের মধ্য দিয়ে ষষ্ঠীঠাকরুনের কাছে আপত্তি জানানো। আট মেয়ের মধ্যে যমকে দিয়ে-থুয়েও পাঁচ পাঁচটি বর্তমান এখনো। বিয়ের প্রস্তাব তুলে প্রিয়নাথ অম্বিককে বলেছিলেন ছেলে হয়ে তুমি বাড়িতে থাকবে। যা আমার আছে—পায়ের উপর পা দিয়ে নির্ভাবনায় জীবন কেটে যাবে, নড়ে বসতে হবে না। প্রিয়নাথ যতদিন ছিলেন তেমনি কেটেছিল বটে—মারা যাবার পর থেকেই গণ্ডগোল। শাশুড়ি এবং ধর্মপত্নীর সঙ্গে তিলার্ধ বনে না—ঝগড়াঝাটি অকথা-কুকথা অহরহ। শ্যালিকারা স্বামী সহ এক এক সময় হামলা দিয়ে এসে পড়ে। পিতৃসম্পত্তির হকদার তারাও—গাছের আম-কাঁঠাল পাড়ে, গোলার চাবি খুলে দেদার ধান বিক্রি করে। ছেলেপুলেও ইতিমধ্যে দেড় গণ্ডা পুরে গেছে। নড়ে বসতে হবে না, প্রিয়নাথ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— তিনি নেই, কার কাছে এখন কৈফিয়ৎ নিতে যাবেন?

দায়ে পড়ে অম্বিককে রোজগারে নামতে হল। গুরুগিরি ছাড়া অন্য পন্থা চোখে পড়ে না। সে গুরুগিরি আবাদঅঞ্চলে। ধান-কাটা অন্তে মাদার মাদার পাঠশালা বসানোর ধুম পড়ে যায়। বিদ্যার কমজোরি বলে ঐ সব খানে পণ্ডিতি কর্মে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। পাওনাগণ্ডাও উত্তম। মরশুমে অম্বিক অতএব ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়েন।

আরও আছে। স্ত্রী তুলি ঘোর শুচিবেয়ে হয়ে পড়েছে। নাইয়ে নাইয়ে মারে অম্বিককে এবং ছেলেপুলেগুলোকে—নাওয়ার ঠেলায় ডবল-নিমোনিয়ার কবলে পড়ে পটল-তোলাও বিচিত্র নয়। ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ হাঁটে সে—দুনিয়ার সর্ববস্তু ও সমস্ত জায়গা অশুচি, পা কোথায় ফেলে জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না যেন। পবিত্র শুধুমাত্র দুটি জিনিস—জল ও গোবর। আবার জলের সেরা গঙ্গাজল—এই পোড়া দেশে গঙ্গাজল দুর্লভ বলে অনুকল্প নিয়েছে তুলসী-জল।

সাঁজের বেলা ছয় সন্তানকে লাইনবন্দি পুকুরঘাটে বসিয়ে পাইকারি ভাবে তাদের শৌচের কাজ সারে। বাচ্চা ছেলেপুলে সব সময় হুঁশ করে বলতে পারে না। আর যথাসময়ে শৌচ যদি হয়েও থাকে, বাড়তি আর একবার হলে দোষের কিছু নেই। বরঞ্চ ভাল, আরও বেশি পরিমাণে শুচি হয়ে গেল। পুকুরঘাট সেরে তারপর ছেলেপুলের। ঘরের বাইরে কাপড়চোপড় ছেড়ে দিগম্বর হয়ে দাঁড়াবে, সর্বাঙ্গে তুলসী-জল ছিটিয়ে তুলি ঘরে ঢুকিয়ে নেবে তাদের। অম্বিকের ব্যাপারেও এমনি। সারাদিন অম্বিক বাইরে বাইরে ঘোরেন, ঘরের ধারে-কাছে আসেন না। রাত্রে না এসে চলে না। তৎপূর্বে পুকুরের জলে ঝুপুস-ঝুপুস করে অবগাহন স্নান। হোক না শ্রাবণের বৃষ্টি-বাদলা, কিম্বা মাঘের কনকনে হিমেল রাত্রি। স্নান করে ভিজে-গামছা পরে ঘরের দরজায় অম্বিক ঠুর-ঠুর করে কাঁপছেন। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ না তুলি ঘুম থেকে উঠে আপাদমস্তকে তুলসী-জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। পুকুরঘাট থেকে বাড়ি আসতে যা অশুচিস্পর্শ ঘটেছে, এইরূপে তার শোধন হয়ে গেল। দুটো গাইগরু আছে অম্বিকের, আর গোটা চারেক ছাগল। সন্ধ্যাবেলা তাদের তুলি তাড়িয়ে-তুড়িয়ে পুকুরে নামায়, কলসি কলসি জল ঢেলে স্নান করিয়ে তবে গোয়ালে তোলে। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে—স্নান না করে রেহাই নেই, অবোলা জীব হয়েও বোঝে তারা। তাড়না করে আর জলে নামতে হয় না, মাঠ থেকে সোজা পুকুরে নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তুলি এসে কলসি কতক জল ঢেলে দিলে উঠে তখন গুটি গুটি গোয়ালে ঢুকে যায়।

হেন অবস্থায় গুরুগিরির নামে আবাদে আশ্রয় নিয়ে অম্বিক হস্ত রক্ষা পেয়ে যান। কিন্তু পাঠশালার আয়ুষ্কাল মোটামুটি ছয় মাস—পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ।

আষাঢ়ে চাষের মরশুম আসে, গোলায় ধানও তত দিনে তলায় এসে ঠেকেছে, পাঠশালা অতএব বন্ধ। অম্বিক অগত্যা শ্বশুরবাড়ি এসে ওঠেন। মাস ছয়েক আবার ঢুলির খপ্পরে।

সোনাখড়ির পাঠশালা নিয়ে কিছুদিন খুব ঝামেলা যাচ্ছে। প্রহ্লাদ-মাস্টার ছিলেন—মাথায় তাঁর বেশি পয়সার লোভ ঢুকেছে, গুরুগিরি ছেড়ে তিনি আদায়কারী-পঞ্চায়েতের কাজ নিয়েছেন। আলতাপোল গাঁ থেকে বহুদর্শী কাজেম আলি পণ্ডিতকে আনা হল। বয়স সত্তর ছাড়িয়ে গেছে—পড়ান তিনি ভাল, কিন্তু পড়াতে পড়াতে ঘুমিয়ে পড়েন। শীতকালে একদিন নতুনবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় জলচৌকির উপর খুঁটি ঠেশ দিয়ে রোদ পোহাতে পোহাতে পড়াচ্ছেন—ঘুম এসে গিয়ে গড়িয়ে একেবারে উঠানে। মাজায় বিষম চোট লাগল, জীবনে আবার যে কোন দিন বসে পড়াতে পারবেন, মনে হয় না। কাজেম-গুরুর পর আরও তিন-চারজন আনা হয়েছে, জুত হল না। তখন অম্বিক দত্তকে সবাই ধরে পড়ল: গাঁয়ের জামাই আপনি—সোনাখড়ি থেকে আবাদে কেন পড়ে থাকবেন, গাঁয়ের পাঠশালার ভার আপনি নিয়ে নিন।

মাদার ঘোষ উকিল-মানুষ, সদরে রীতিমত প্রতিপত্তি। সেই কারণে বাড়ির পাঠশালা, যেখানে গুরুর সাকিন থাকে না বছরের অর্ধেক দিন, সেখানেও সরকারি সাহায্য মাসিক দুই টাকা। ছাত্রের মাইনে আসুক না-আসুক, দুই টাকা বাঁধা আছে—দেয় যদিও একসঙ্গে তিন মাস অন্তর। উপরে ধরা-চায়া না হলেও এজিনিস সম্ভবে না।

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে, দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে' —কবির উক্তি। কমল আছে তো কাঁটাও আছে। দুই টাকা সাহায্যের দরুন ইন্সপেক্টরের ঝুঁকি সামলাতে হয় মাঝেমধ্যে। আবাদের মরশুমি পাঠশালায় ইন্সপেক্টরের ঝঞ্ঝাট নেই।

দেশভুঁইয়ের উপর মাদার ঘোষের টান খুব, কাছারি বন্ধ থাকলেই বাড়ি চলে আসেন। বড়দিনের মুখে এসেছেন অমনি। সদর-উঠানে পা দিয়েই চমক খেলেন। হারু মিত্তির মাতব্বরি করে বেড়ায়, তাকে শুধালেন: অম্বিক দত্তকে যেন চণ্ডীমণ্ডপে দেখলাম। ওখানে কি?

হারু বলল, উনিই তো পড়াচ্ছেন আজকাল।

কি সর্বনাশ!

হারু বলে, ভাল গুরু পাচ্ছেন কোথা! তা-হদ্দ চেষ্টা করেছি। প্রহ্লাদ-মাস্টারের বাড়ি গিয়ে পায়ে ধরতে বাকি রেখেছি কেবল। গুরু-ট্রেনিং পাশ করে হালের ছোকরা-গুরু সব বেরুচ্ছে—খাই শুনলে পিলে চমকে যায়।

তাদের দিয়ে পোষায় না।

অম্বিক নিজেই কি ইস্কুলে-পাঠশালে পড়েছে কোন দিন? ও কী পারবে?

হারু প্রবোধ দিয়ে বলে, পড়াচ্ছেন তো আজ পাঁচ-সাত বছর। পয়সা-কড়িও রোজগার করে আনেন। ঘষতে ঘষতে পাথর ক্ষয়। ইস্কুলে পড়ে না শিখুন, পড়াতে পড়াতে এখন শিখে গেছেন।

বাদার ঘোষ তবু মুখ বাঁকালেন: অম্বিক পাথরও নয়, নিরেট ইস্পাত। সারা জন্ম ঘষেও হ্রাস বৃদ্ধি হবে না।

বললেন, গুরু বদলাও। সাহায্য বাড়ানোর তদ্বিরে আছি আমি। জানুয়ারির মধ্যে পরিদর্শনে আসবে। রিপোর্ট-টা যাতে ভাল হয় দেখো। তারপরে আমি তো আছিই।

হারু ঘাবড়ায় না। বলে, গুরু হঠাৎ পাচ্ছি কোথা? রিপোর্টের ভালমন্দ কি গুরু বিবেচনায় হয়ে থাকে? তারও তদ্বির আছে। ভাববেন না দাদা। আপনি যেমন ওদিকে, এদিকেও আছি আমরা সব। দেখা যাক।

কোর্ট খুলতে বাদার ঘোষ চলে গেলেন। চণ্ডীমণ্ডপ ও চতুষ্পার্শে ঘোর বেগে ঝাঁটপাট পড়ছে, শিউলি তলার বালির গাদা সরিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে কানাচে অন্তরালে নিয়ে রাখা হল। পথের দু-ধারে জিওলগাছের ডালপালা ছাঁটা হচ্ছে। পাঠশালার ছেলেপুলের সঙ্গে কাটারি হাতে অম্বিক নিজেই লেগে গেছেন।

নতুনবাড়ির ফিটফাট চেহারা পথ-চলতি নিতান্ত অন্যমনস্ক মানুষেরও নজরে পড়ে যায়। ছোটকর্তা বরদাকান্ত বলেন, ইন্সপেক্টর আসছে বুঝি? কবে?

জবাবটা হারু দিয়ে দেয়: তারিখ দিয়েছে বাইশে মঙ্গলবার। ওদের কথা! না আঁচালে বিশ্বাস নেই মামা। গেল বোশেখে অমনি আসবে-আসবে বলেছিল, তারিখও দিয়েছিল। প্রকাণ্ড কাতলামাছ তোলা হল পালের-পুকুর থেকে, রাজীবপুরে লোক পাঠিয়ে সন্দেশ-রসগোল্লা আনা হল। আপনার বউমাকে দিয়ে ক্ষীর বানিয়ে রাখলাম—আর বাড়ীর আম আর ক্ষীরকাঁঠাল। ফুসফাস। ছোঁড়াগুলোর কপালে ছিল, মাছ আর রসগোল্লা তারাই সব সাপটে দিল। আসবার কথা আবার লিখছে—বাদার-দাদাও বলে গেলেন, আসবে নির্ঘাৎ এবারে। জোগাড়যন্তোর করে যাচ্ছি—কার ভোগে লাগে, দেখা যাক।

না, এলেন এবারে সত্যি সত্যি। আসল ইন্সপেক্টর নন—তাঁরা পাঠশালায় আসেন না, হাইইংলিশ-ইস্কুলে যান। এসেছেন ইন্সপেক্টিং-পণ্ডিত, নাম পরেশ দাস। বয়সে বৃদ্ধ। কোন তদ্বিরে এখনো চাকরি করে যাচ্ছেন,

কেউ জানে না। দেহে বস্তুরমতো জরা নেমেছে, এটা-ওটা লেগেই আছে। পা দুটো হঠাৎ ফুলে উঠেছিল বলে তারিখ দিয়েও বোশেখে আসতে পারেন নি—কথা প্রসঙ্গে পরেশ বললেন। তা বলে ছাড়াছাড়ি নেই। মরতে মরতেও দেখে যাবেন এবারে, সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। দেমাক করে বলেন, ইন্সপেক্টরের চেয়ে খাতির-সম্মান ঢের ঢের বেশি পাই আমরা। তাঁদের দশা দেখুন গিয়ে। দশটায় গিয়ে পড়েছেন তো উঠোনে রোদ্দুরের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। খাতির করে কেউ দশটা মিনিট আগে অফিসের দরজা খুলে বসাবে না। এ বয়সেও আমার এই যে তাগত দেখছেন, এ-গাঁয়ে সে-গাঁয়ে ভালমন্দ খেয়ে বেড়ানোর চাকরিটা আছে বলেই।

নতুনবাড়ির ফরাসে সতরঞ্চির উপর তোষক পড়েছে, তদুপরি ধবধবে ফর্সা চাদর ও তাকিয়া। পথের ধকলে বুড়োমানুষ বেশ খানিকটা কাবু হয়েছেন। হাত-পা ধুয়ে কিঞ্চিৎ জিরিয়ে লুচি-মোহনভোগ, চার রকম পিঠা, ক্ষীর-সন্দেশ ও ডাবের জলে পরম তৃপ্তির জলযোগ সেরে পাশবালিশ আঁকড়ে তোষকে গড়িয়ে পড়লেন।

পাঠশালা ছেলেপুলের ভরে গেছে। অন্যদিন যা আসে, তার ডবল তে-ডবল এসেছে আজ। তোড়জোড় হপ্তা দুই ধরে চলেছে। ক্ষারে কাচা ফর্সা কাপড় সকলের পরনে। গায়ে জামা উঠেছে। এবং কারো কারো পায়ে জুতো। একেবারে চুপচাপ। সূচীপতন শ্রুতিগম্য হওয়ার একটা যে কথা আছে, সেই জিনিস। অম্বিক মাঝে মাঝে আঙুল তুলে চতুর্দিক ঘুরিয়ে নিঃশব্দে আস্ফালন করেছেন। বেত নেই—ইনস্পেক্টরের নজরে বেত না পড়ে সেজন্য সেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থা বজায় রাখতে অম্বিক হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন—বেশিক্ষণ আর পারা যাবে না। গুটিগুটি এসে ফরাসের ধারে যুক্তকরে দাঁড়ালেন: পাঠশালা এখন কি পরিদর্শন হবে?

হাই তুলে দুটো তুড়ি দিয়ে পরেশ বললেন, এখন নয়। খাতাটাতাগুলো নিয়ে আসুন বরং এখানে, সরেজমিনে বিকেলে যাব। ছেলেদের ছেড়ে দেন। সকাল সকাল যেন আসে, বলে দেবেন।

অম্বিক ক্ষুণ্ণ হলেন। অনেক করে তালিম দেওয়া—সেই জন্য এতক্ষণ ঠাণ্ডা রাখা গেছে। একবার ছাড়া পেলে রক্ষে রাখবে? ধুলোমাটি কালি-ঝুলি মেখে কাপড়-জামা লাট করে এক-একটা হনুমান হয়ে বিকেলে আসবে। মুখস্থ করিয়ে দিয়েছি যত সব জিনিস—নিজ নিজ নামগুলো পর্যন্ত। দেরি হলে ভুলে যাবে।

রাজ বিত্তির খিঁচিয়ে উঠল অম্বিকের উপর: উল্টো দিকটা ভাবছেন?

পরেশ দাসও কম নয়। সবই তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলে—জেরায় গড়বড় করে ফেলে যদি?

ইনস্পেক্টরের শুভাগমন নিয়ে দশবারো দিন আজ ভারি ধকল যাচ্ছে। হাজিরা বইয়ে নতুন নতুন নাম ঢোকানো হয়েছে বিস্তর—মাদার বলে গিয়েছিলেন। ছাত্রসংখ্যা বেশি হলে সরকারি সাহায্য বাড়ানো যেতে পারবে—দুই থেকে পাঁচে তোলাও অসম্ভব নয়! তিন মাস অন্তর যবলগ টাকা—গুরুর জন্য হড্ড-হড্ড করে বেড়াতে হবে না আর তখন, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়বে। উকিল মাদার ঘোষ কায়দাটা বাতলে দিয়ে গেছেন এবার। এক শিশু শ্রেণীতেই এর মধ্যে আঠারোটা নতুন নাম ঢুকেছে। প্রথম মান এবং দ্বিতীয় মানেও আছে। কোন পুরুষে কেউ পাঠশালা মুখো হয়নি—গায়ে বোঁটকা গন্ধ বুনো খরগোসের মতন। এমন কি ভদ্রসমাজের উপযুক্ত নামও একটা বাপ মা রাখেনি—হাবলা বোঁচা বাঁকা চ্যাড়শ পটোল উচ্ছে এমনি সব বলে ডাকে। নতুন নতুন নাম দিয়ে মুখস্থ করানো হয়েছে ক'দিন ধরে। ঝামেলা এক রকম! নামকরণের পর সে নাম বাতিল করে আবার যুক্তাক্ষর বর্জিত নাম দিতে হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। নয়তো জিভে আসে না।

হারু বলে, পরেশ দাস মশায় ঘড়েল লোক—এই কর্মে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। এই সমস্ত মালের মুখোমুখি না হন তো সব চেয়ে ভাল হয়। সেই চেষ্টা দেখুন। চিরটা কাল পরের খেয়ে খেয়ে নোলা প্রচণ্ড। কিন্তু খেয়ে এখন সামাল দিতে পারেন না। জলখাবারের ক'খানা লুচি চিবিয়েই গড়িয়ে পড়েছেন—

সমস্যার সমাধান পেয়ে গিয়ে হারু খল খল করে হেসে উঠল: বৈঠকখানা ওই, আর চণ্ডীমণ্ডপ এই—এক মিনিটের পথও নয়। পা উঠোনে না ছুঁইয়েও রোয়াকে রোয়াকে চলে আসা যায়—তা-ও পেরে উঠলেন না। ভাল হয়েছে—অশুভস্য কালহরণম্। মাধ্যাহ্নিকটা সাংঘাতিক যাতে হয়, দেখুন। সামনে বসে ঠেসে ঠেসে খাওয়াতে হবে—খাওয়ার পর উঠে বসবার তাগত না থাকে। যাওয়ার সময় পরিদর্শন বইয়ের পাতা মেলে ধরব। 'উৎকৃষ্ট'—লিখে দস্তখত মেরে গরুর গাড়িতে উঠে পড়বেন।

খাওয়া নতুনবাড়িতে। গলদাচিংড়ি সোল আর কই—তিন রকমের মাছ। মাংসের ব্যবস্থা আগে ছিল না—শলাপরামর্শ করে অবেলায় ঐ অম্বিককেই পাঠানো হল, পাড়া খুঁজে পাঁঠা একটা টানতে টানতে তিনি নিজে এনেছেন। একুনে পদের খানি পদ দাঁড়াল—থালা ঘিরে পদের বাটির জায়গা হয় না। আয়োজন ফেলা যাবে শঙ্কা হয়েছিল—কোথায়! চেটে মুছে খেলেন

পরেশ, উপরন্তু পায়স ও সন্দেশ তিন তিনবার চেয়ে নিলেন। বরদাকান্ত একটু এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বাইরে গিয়ে হারুকে ধমকান : কী সর্বনাশ, খাইয়ে পুঁতে ফেলবি নাকি? নরহত্যার দায়ে পড়ে যাবি যে!

হারু মিত্তির খুশিতে ডগমগ, অষুধ ঠিকমতো ধরেছে। দুয়োর-জানলা বন্ধ করে বৈঠকখানা-ঘর অন্ধকার করে দিল। সামাল করে দিল, কেউ ঢুকে না পড়ে—ঘরে কোন রকম শব্দসাড়া না হয়। নিদ্রা নির্বিঘ্নে চলতে থাকুক। কান পেতে শোনা গেল, নাসাও ডাকছে বেশ।

বিকাল হল। ছেলেপুলে জমেছে, তবে সকালবেলার মতো ঠাসাঠাসি নয়। সুপারিবনের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে উঠোনে পড়েছে। চারিদিক চুপচাপ —ইন্সপেক্টরের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত না হয়। ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল, অম্বিক ভাবছেন। কড়া চোখে তাকিয়ে নিঃশব্দে ছেলেপুলে শাসনে রেখেছেন—হঠাৎ তারা সব দাঁড়িয়ে পড়ল। অম্বিক পিছনে তাকালেন—কী সর্বনাশ, পৈঠা বেয়ে পরেশ উঠে আসছেন। ডাকেন নি কাউকে, শব্দসাড়া করেন নি। ছেলেদের ভাল করে মহলা দেওয়া ছিল—ঠিক ঠিক উঠে দাঁড়িয়েছে।

অম্বিকও দাঁড়িয়ে পড়লেন। হারু কোন দিকে ছিল, বিপদ বুঝি ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল। মুরুব্বি দু-পাঁচজন এলেন। দেখতে দেখতে জমে উঠল।

বোস, বোস তোমরা সব—

সকলকে বসিয়ে দিয়ে পরেশ চতুর্দিক একপাক ঘুরে এলেন। চ্যাঙা মতন একটা ছেলেকে বললেন, নাম কি তোমার?

কী-যেন নতুন নাম হয়েছে, প্রয়োজনের সময় গুলিয়ে যাচ্ছে। করুণ চোখে ছেলেটা অম্বিকের দিকে তাকায়। কিন্তু ইন্সপেক্টরের চোখের উপরে অম্বিক কি বলবেন এখন। একটুখানি ভেবে সে বলে শ্রীঅনিল কুমার— না না, অনিল নয়, সলিলকুমার ধর।

পরেশ হাসলেন : কোন শ্রেণীতে পড়ো তুমি?

এবারে নির্ভুল জবাব : দ্বিতীয় মান—

দিবারাত্রি কেন হয় বলো।

আরও সহজ ব্যাখ্যা করে পরেশ বলে দিচ্ছেন, রাত্তির গিয়ে সকাল হয়েছিল। তার পরে দুপুর। এখন তো বিকেলবেলা। এক্ষুনি আবার সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তারপরে রাত। কেন হয় এসব?

সর্বরক্ষে। জলের মতন প্রশ্ন পড়েছে—যে না সে-ই বলতে পারে। হাঁপ ছেড়ে সলিলকুমার জবাব দিল : সূর্য উঠলে দিনমান। আকাশ ঘুরে সন্ধ্যে-বেলা ডুবে যান, তখন রাত্রি।

জাঁ, কী সর্বনাশ!

চমক খেয়ে পরেশ আজব কথা বললেন, ওঠে না সূর্য। ডুবেও যায় না।

অম্বিকের দিকে চেয়ে কঠিন সুরে বললেন, দ্বিতীয় বাবে ভূগোল পড়ান না পণ্ডিতমশায়?

তটস্থ হয়ে অম্বিক বললেন, আজ্ঞে হাঁ। পড়াই বইকি।

কোন ভূগোল পড়ান শুনি? কোথায় আছে সূর্য আকাশে ঘুরে বেড়ায়?

অম্বিক নিরীহ কণ্ঠে বলেন, চোখেই তো নিত্যিদিন দেখছি। পূবে উঠল, আকাশে চক্কোর মেরে সাঁজের বেলা পশ্চিমে ডুবে গেল। সূর্যোদয় সূর্যাস্ত পাঁজিতেও রয়েছে।

পরেশ গর্জন করে উঠলেন: সমস্ত ভুল। কী সর্বনাশ, ছেলেদের এই জিনিস পড়িয়ে আসছেন? সূর্যের নড়াচড়া নেই—এক জায়গায় আছে, পৃথিবীটা ঘুরছে তার চারদিকে।

এক প্রশ্নেই বুঝে নিয়েছেন, অম্বিক খুঁটিনাটির দরকার নেই। খাইয়েছে বড় ভাল, ঢেকুরের সঙ্গে এখনো মাংসের সুবাস বেরিয়ে আসছে। পরেশ নিমকের অমর্যাদা করলেন না। বললেন, যদ্দুর পারি চেপেচুপে লিখে যাচ্ছি। কিন্তু পণ্ডিত বদলান। পৃথিবী দাঁড় করিয়ে রেখে উনি সূর্য ঘোরাচ্ছেন— সাহায্য বাড়ানো দূরস্থান, যে দুটাকা আছে তা-ও রাখা চলে না।

ইন্সপেক্টর বিদায় হতে অম্বিকও ফেটে পড়লেন: আসতে চাইনি আমি ছ্যাচড়া কাজকারবারের মধ্যে। হরশঙ্কর ধরে পেড়ে আনলেন। দু-টাকা সাহায্য দিয়ে মাথা কিনে বসেছে ওরা! হাজরে-খাতা বানিয়ে নতুন নতুন নামপত্তন করতে হবে, চড়চড়ে রোদের মধ্যে পাঁঠা খুঁজে বেড়াতে হবে পাড়ায় পাড়ায়, এতবড় পৃথিবীটা লাট্টুর মতন ঘোরাতে হবে। কাজ নেই, আমার আবাদের পাঠশালাই ভাল। কী পড়াব কী না-পড়াব, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাধীন। ধান মেপে মাইনে—গোলায় ধান থাকলে তিন পালির জায়গায় চারটে নিলেও কেউ তাকিয়ে দেখবে না। আমার ইস্তফা—কার্তিকমাস পড়লেই আবাদ মুখো রওনা দেবো।

॥ আঠাশ ॥

প্রথম-ভাগ ছাড়িয়ে কমল দ্বিতীয় ভাগ ধরেছে। দ্বারিক পালকে দিয়ে আর সুবিধা হচ্ছে না। গোমস্তা মানুষ জমাখরচের ব্যাপারে অতি উত্তম, কিন্তু বানানে বেপরোয়া। ই কার উ-কার, দুটো ন, তিনটে স নিয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র নেই—কলমের মাথায় যেটা এসে যায়, অবাধে তাই লিখে যান। দ্বিতীয়-ভাগের কড়া কড়া বানানে পদে পদে এবার ঠোক্কর খাচ্ছেন। কিন্তু এক ভস্ম আর ছার—অধিক দস্তো হতেও তো দেওয়া চলে না। সে অধিকও থাকছেন না সোনাখড়িতে, মরশুম পড়লেই অবাধে স্বস্থানে গিয়ে উঠবেন।

প্রহ্লাদমাস্টার আবার এসে পাঠশালার ভার নিচ্ছেন, কানাঘুষো শোনা যায়। না, কানাঘুষো নেহাত নয়, খবর পাকাই বটে—ভবনাথ সঠিক জেনে এলেন। মাদার ঘোষও প্রহ্লাদের ছাত্র। বাড়ি এসে তিনি দেড় ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে ধূলিধূসরিত অবস্থায় হারু ইত্যাদি সহ রাজীবপুরে সোজা প্রহ্লাদের আটচালায় গিয়ে উঠলেন। প্রহ্লাদের খোড়োঘর, কিন্তু আশে-পাশে সব চকমিলানো পাকাবাড়ি। ভারি ভারি লোক তাঁরা—সম্পর্কে প্রহ্লাদের খুড়া, খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই। পরগণার একআনা অংশের মালিকানা আছে বলে আইনত জমিদার বলাও চলে। এতবড় বনেদি পরিবারের হয়েও প্রহ্লাদ নিজে নিঃস্ব মানুষ—ভদ্রাসন বাগ-বাগিচা ও সামান্য জমাজমি ছাড়া আর কিছু নেই। খেটেখুটে বাইরে থেকে দু'পয়সা না আনলে দিন চলে না।

মাদার ঘোষ ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, অ দরকারী-পঞ্চায়েত হয়ে হাটে হাটে চৌকিদারি-ট্যাক্স আদায় করে বেড়ানো—এ কি আপনাকে মানায়? অঞ্চল জুড়ে এত ছাত্র আম। অ কি—দারোগা-জমাদার এসে আপনার উপর হুকুম ঝাড়ে, বড্ড খারাপ লাগে তখন আমাদের।

প্রহ্লাদ সায় দিয়ে বললেন, আমার খুড়তুতো ভাইরাও তাই বলছে। তাদেরও লাগে। এ কী ভালোলোকের কাজ। কিন্তু পেট মানে না যে বাবা, কী করব?

মাদার বললেন, আমি সেটা দেখব—আমার উপর ভার রইল। যা আপনার নিজস্ব জায়গা, সেইখানে চেপে বসে বিদ্যাদানে কায়েম হয়ে লেগে

যান। ডিষ্ট্রিক্ট-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে, সাহায্য পাঁচ টাকায়: তুলে দেবো। বাঁধা এই পাঁচ টাকা রইল, তার উপরে ক্লাসের বেতন এবার থেকে ডবল। আরও পাঁচ টাকা সেদিক দিয়ে আসবে।

দশের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভরসা করা মুশকিল, পূর্ব অভিজ্ঞতা যথেষ্ট রয়েছে। প্রহ্লাদ চুপচাপ আছেন।

মাদার বললেন, খোতামুখ ভোঁতা করে ফিরে যাব—তেমন পাত্র আমি নই মাস্টারমশায়। যতক্ষণ না 'হাঁ' পাচ্ছি, পা ধরে পড়ে থাকব।

গাঁয়ে ফিরে দশজনকে ডাকিয়ে বললেন, প্রহ্লাদ মাস্টারমশায়কে আবার নিয়ে আসছি। মাইনে কিন্তু ডবল হয়ে গেল। দু-আনার জায়গায় চার-আনা, চার আনার জায়গায় আটআনা।

কেউ রাজি কেউ গররাজি, আবার কেউ-বা বলে একেবারে দুনো হয়ে গেলে পারব কেন? মাঝামাঝি কিছু রফা হয়ে যাক।

কলরবের মধ্যে ভবনাথ বলে উঠলেন, আমার একটা কথা আছে মাদার—

মাদার জোড়হাত করে বললেন, যে করে মাস্টারমশায়কে রাজি করিয়ে এসেছি—আপনি আর কথা বলবেন না খুড়োমশায়। কমল শিশুশ্রেণীতে পড়বে—মাইনে দু-আনা লাগত, সেখানে চারআনা।

ভবনাথ বললেন, পুরো এক টাকা দেবো আমি, সকলের মুকাবেলা বলছি। মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার পড়েছে। সংসারই যদি না চলে, ঘরবাড়ি ছেড়ে মুখে রক্ত তুলে খাটতে যাবে কেন মাস্টার?

প্রহ্লাদ এলেন। পয়লা দিন আজ খালি দেখাশোনা করে যাচ্ছেন। বিদ্যারম্ভে গুরুবার—সামনে বিষ্যুৎ থেকে পাকাপাকি ভাবে লেগে যাবেন। সোনাখড়ি ছোট গ্রাম—এ-মুড়ো ও-মুড়ো সাড়া পড়ে গেল, সকলে দেখতে আসছে। গোঁফে পাক ধরেছে তেমন মানুষও গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিচ্ছে। তারাও সব ছাত্র। কর্তাকে পড়িয়েছেন ছেলেকে পড়িয়েছেন এবারে নাতি পড়বে—এমন পরিবারও আছে অনেক। তিন পুরুষের পণ্ডিত প্রহ্লাদমাস্টার। একমাস এক এক বাড়ি খাবেন, এই বন্দোবস্ত হল। শোওয়া আগে যে নিয়মে ছিল—নতুনবাড়ির বিশাল বৈঠকখানা-ঘরে। চার তক্তাপোশ-জোড়া ফরাস—পাঁচ-ছয়টি নিয়মিত শোয় সেখানে—সময় বিশেষ দশেও ওঠে একটা প্রান্ত প্রহ্লাদের জন্য আলাদা করা। শোওয়ার সময় আলমারির মাথা থেকে তোষক বালিশ ও মশারি নামানো হবে। এ হেন রাজকীয় ব্যবস্থা শুধুমাত্র মস্টারমশায়ের—অন্য কারো নয়।

পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষে তিনটে আলমারি পাশাপাশি। মাদাররা তখন

তরুণ-যুবা—বয়সের দোষে কিছু মাত্রায় সাহিত্য চাড়া দিয়ে উঠছিল। তিনটে আলমারি সংগ্রহ করে তাঁরা লাইব্রেরি স্থাপন করলেন। আলমারিতে বইও ছিল। এবং গিয়ে-টিয়ে এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে, মাদার ঘোষ বলে থাকেন। বই থাক না থাক আরশুলা আছে বিস্তর। হালকা শিমুলকাঠের আলমারিতে শতেক ছিদ্র বানিয়ে অহোরাত্রি কিলবিল করে বেড়ায়! বয়স হয়ে গিয়ে মাদারের দলটা কাজকর্ম নিয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। গাঁয়ে যে ক'টি পড়ে আছে, সংসারের ঘানি টানতে টানতে নাজেহাল তারা—বই পড়ার বাতিক সম্পূর্ণ শীতল হয়ে গেছে। এর পরে যে দলটা উঠল—ছিরু ঝণ্টু অক্রুর সিধু ভুলো ইত্যাদি সে দলের চাঁই—দশ রকম হুজুগের সঙ্গে লাইব্রেরিও ঢুকেছিল তাদের মাথায়। বরের শয্যা-উত্থানের টাকা প্রথা মতো মেয়েদের না দিয়ে লাইব্রেরি-ফাণ্ডে নিয়ে নেওয়া হত। রবারস্ট্যাম্প নতুন করে তৈরি হল। বই কেনা হবে, লিস্টি তৈরি হচ্ছে—তৎপূর্বে বদ্ধ আলমারিতে মজুত বই যা আছে, তার লেনদেন শুরু হয়ে যাক না। কিন্তু আলমারির চাবির হদিস হচ্ছে না। গ্রামের লোকনাথ চক্রবর্তী এখন হুঁদে উকিল হয়ে হাইকোর্টে পশার জমিয়ে বসেছেন, লাইব্রেরির আদি-সেক্রেটারি হিসাবে চাবি তাঁর হেপাজতে আছে। এরা চিঠির পর চিঠি লিখল—চাবি পড়ে মরুক, ভদ্রতা করে এক ছত্র জবাব পর্যন্ত উকিল মশায় দিলেন না। হুটকো ছোঁড়ারা ভাঙতে যাচ্ছিল, মুরুব্বিরা নিষেধ করেন। তার মধ্যে মাদার ঘোষও: খবরদার, খবরদার! অমন কাজও কোর না। লোকনাথ কিচেল লোক। তালা ভেঙে হয়তো ঝুড়ি তিনেক আরশুলা বের করলে, হাইকোর্টে লোকনাথ মামলা ঠুকে দিল হীরে-জহরত ঠাসা ছিল আলমারি, লুঠ করে নিয়েছে। পাবলিক-কাজ আরও তো কত আছে—অন্য কিছু বেছে নিয়ে লেগে পড়ো। বই না কিনে তখন এরা কোদাল কিনে রাস্তা বাঁধতে লেগে গেল। বর্ষায় কাজ বন্ধ হল। রাস্তায় কাঁচা মাটিও বর্ষার জলে ধুয়ে সাফাই হয়ে গেল। চলছে বেশ—খরায় মাটি তোলে, বর্ষায় ধুয়ে যায়—কোনদিন কাজ ফুরোবার শঙ্কা নেই।

সে যাই হোক, উদরগহ্বরে বই ও আরশুলা নিয়ে আলমারি তালাবদ্ধ—তবে আলমারির উপরটা বেশ কাজে লেগে যাচ্ছে। প্রহ্লাদের বিছানাপত্র গোটানো থাকে একটার মাথায়, ডুগি তবলা থাকে মাঝেরটায়, তৃতীয়টার উপর লম্বা-চেপ্টা-গোল নানা আকারের বালিশ কতকগুলো। চার তক্তাপোষ জুড়ে মলিন সতরঞ্চির ফরাস—রাতদুপুরে ধুপধাপ বালিশ নামিয়ে ফেলে ছোঁড়ারা যেমন ইচ্ছা শুয়ে পড়ে।

মজরফি পাতাই আছে দিবারাত্রি। আসছে বসছে মানুষ, গল্পগাছা করছে, তামাক খাচ্ছে। গোমস্তা ধাত্রিক পাল এসে দরজার উপরের দরদালান থেকে হাতবাক্স নাবিয়ে নিয়ে ফরাসের একপাশে সেরেস্তা সাজিয়ে বসেন। চাষী প্রজাপাট আসে—খাজনাকড়ি বুঝে নিয়ে দাখিলে কাটেন ধাত্রিক, কড়ায় উশুল যেন। আর একদিকে দাবাখেলা চলছে তখন, খেলুড়ে দু'জন ছাড়াও আরও সব ঘিরে বসে জুড় দিচ্ছে। 'কিস্তি' 'কিস্তি' করে চেঁচিয়ে ওঠে কখনো-বা। কলহ বেধে যায় চাল দেওয়া নিয়ে, কলহ থেকে মারামারি। লম্ফ দিয়ে এক খেলুড়ে অপরের টুঁটি চেপে ধরে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ধাত্রিক পাল বললেন, কী হচ্ছে? ছেলেপুলের অংম হলে যে তেমন্যা। প্রজাখাতক এরাই বা কি ভাবছে। এসব হিতবাক্য এখন কারো কানে যায় না। বেগতিক বুঝে ধাত্রিক হাতবাক্স তুলে রোয়াকে মাদুর পেতে সেখানে সেরেস্তা বানিয়ে বসলেন।

দুপুরের দিকে আরও জোরদার। ধাত্রিকের সেরেস্তা নেই, ফরাসের এ-মুড়ায় পাশা পড়েছে, ও-মুড়ায় তাস। আর সন্ধ্যা থেকে, তো রীতিমতো জমজমাট। ডুগি-তবলা নেমেছে আলমারির মাথা থেকে, দেয়ালের আংটা থেকে ন্যাকড়ায়-ঢাকা খোল নেমেছে, সরদালের উপর থেকে করতাল আর খঞ্জনী নেমেছে। পাথরঘাটা থেকে গাইয়ে মতিলাল হারমোনিয়াম ঘাড়ে করে এলেন। পচা ঝন্টু বিজয় শ্যামাপদ সিধু এবং আরও অনেকে এসে জুটেছে। হারু মিস্ত্রিও এই আসরে। তুমুল গানবাজনা আর এই এত কাণ্ডর ভিতরেও হেরিকেনের গায়ে একটা পুরোনো পোস্টকার্ড গুঁজে আলোর জোর কমিয়ে দিয়ে একটা কোণে দিগম্বর ও অম্বিকা দাবায় বসে গেছে।

রাত গভীর হয়। কাচে-ঘেরা চৌখুপি-গড়ন একটা-দুটো পথের উপর। বিল-পারের ব্যাপারিরা হাট করে ফিরে যাচ্ছে—আরও কিছু ওদিকে গিয়ে বেলে নেমে পড়বে। নীহার পড়েছে, পথ পিছল। বিলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত-শীত করছে—কাঁধের গামছা খুলে গায়ে জড়িয়ে নিল তাদের কেউ কেউ।

হারু এরই মধ্যে কখন এক ফাঁকে সরে পড়েছে। ঝন্টুর দিকে সিধু চোখ টিপল। ঝন্টু মৃদুস্বরে বলে, না হে, সব কিছু নয়। বাড়িতে একলা বউ, সকাল সকাল না ফিরলে হবে কেন?

হুঁ, বউ! সিধু টিপে টিপে হাসে।

হিরু বলল, রাত হয়েছে—ওঠা যাক।

অম্বিকা হেরে যাচ্ছিল। উত্তেজিত হয়ে বলে, রাত—কত রাত?

ঘুলঘুলির দিকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে হিরু বলল, এগারোটা—

অশ্বিনী বলল, তোমার ঘড়িতে সন্ধ্যে না হতেই এগারো বেজে বসে থাকে। নয়ের এখন এক সেকেণ্ডও বেশি নয়।

ঘড়ি কারো নেই, যে বেশি চেঁচাতে পারবে তার জিত। সে বাবদে অশ্বিনী আপাতত অজেয়। পর পর দুটো বাজি হেরে মেজাজ উত্তপ্ত হয়ে আছে। হিরণ্ময়কে নরম হয়ে নতুন এক বাজির বড়ে সাজিয়ে নিতে হল।

আরো কিছুক্ষণ চলল। মতিলালের গলা ফ্যাস-ফ্যাস করছে, দুটো গান গেয়ে তিনি চুপ করে গেলেন। ভুলো ধরেছে তারপর। মতিলাল বললেন, ওঠা যাক এবারে। হারমোনিয়াম দাও। উঠব।

ঝণ্টু বলে, আপনার গলা ভাঙা বলে আমাদের তো ভাঙেনি। আমরা চালাব আরও খানিক।

হারমোনিয়াম ছেড়ে দিয়ে সারা রাত্তির চালাতে না। আমার কি। মানুষের গলা ভাঙে, হারমোনিয়ামেরও রীড ভাঙে। রীড ভাঙলে ফিরিঙ্গি— ঘাড়ে করে সেই কসবা অবধি নিয়ে যেতে হবে। এককাঁড়ি খরচা। ঝামেলাও বটে। হারমোনিয়াম আমি রেখে যাব না বাপু।

নিয়ে গেলেন হারমোনিয়াম তো বয়ে গেল। এরাও ছাড়নপাত্র নয়— বিনি হারমোনিয়ামে চালাচ্ছে। প্রহ্লাদ ইতিমধ্যে খেয়ে এসেছেন—রোয়াকের বেঞ্চিতে বসে চুপচাপ তামাক টানছেন, আর চটাশ চটাশ করে মশা মারছেন। উঁকি দিয়ে কে-একজন ডাকল: একা একা বাইরে কেন মাস্টারমশায়, ভিতরে এসে বসুন। প্রহ্লাদ কানে নিলেন না, যেমন ছিলেন রইলেন। গুরু কারণ আছে। ভিতরে আসার জো নেই। যারা এখন ঘরের ভিতর, অনেকেই তাঁর ছাত্র। গানবাজনা করা, দাবা-পাশা খেলা—যেদিন পাঠশালায় পড়ত, সম্ভব ছিল কি এদের পক্ষে? বয়স হয়ে এখন পড়াশুনো চুকিয়ে দিয়েছে বলেই করে যাচ্ছে। কিন্তু পিতামাতা ও মাস্টারপণ্ডিতের কাছে মানুষের বয়স হয় না। প্রহ্লাদ-মাস্টার ফরাসে ঘট হয়ে গিয়ে বসলে তাঁর চোখের উপরে আমোদ-স্ফূর্তিতে জুত হবে না। তা ছাড়া হুঁকো ঘুরছে ওদের হাতে হাতে—প্রহ্লাদ ঢুকলে পলকে বন্ধ হয়ে যাবে। এমন জমাটি আড্ডার রসভঙ্গ তিনি কেমন করে হতে দেবেন? মাস্টারমশায় একটেরে তাই পৃথক হয়ে রয়েছেন।

ওদিকে তাই তাড়া পড়ে গেল: শেষ করো হে এইবার। খেয়েদেয়ে এসে মাস্টারমশায় ঠায় বসে রয়েছেন। তোমরা উঠে গেলে তবে তাঁর বিছানা পড়বে।

আড্ডায় ইতি দিয়ে অতএব সব উঠে পড়ল। ছিলিমটা শেষ করে

প্রহ্লা ধীরেসুস্থে আলমারির মাথা থেকে তোষক-বালিশ নামালেন। এতজনে শোয়—মশারি শুধুমাত্র প্রহ্লাদের। অতি-অবশ্য চাই ওটা। মশা দু-চারটে আছে বটে, মশারি কিন্তু সে কারণে নয়। পাড়াগাঁয়ের মানুষ সাপের কামড় অগ্রাহ্য করে, সামান্য মশার কামড়ে কি করবে। প্রহ্লাদ-মাস্টারের তবু কিন্তু মশারি একটা চাই-ই। অঘোরে ঘুমুচ্ছেন তিনি—একঘুম প্রায় কাবার। আড্ডা ভেঙে যে যার বাড়িতে খেতে গিয়েছিল—খাওয়া-দাওয়া সেরে ছোকরাগুলো জঙ্গলে পথে হাই-হুই শব্দসাড়া করে একে-দুয়ে আবার ফিরে আসছে। শোওয়া এই নতুনবাড়িতেই ফরাসের শতরঞ্চির উপর। নিতান্ত যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, সেই ক'টি বাদ। তা-ও শোনে নাকি? বউকে ঘুমন্ত ফেলে রেখে পালিয়ে এলো হয়তো কোনদিন। ধরা পড়ে পরের দিন বকুনি খায়।

হবে, হবে। ও-বাড়ির গিন্নি এসে ছেলের মা'কে প্রবোধ দেন : শিঙে দড়ি নিতে চাচ্ছে না গরু। হয় এমনি—গোড়ায় গোড়ায় পাকছাট মারে, শেষ অবধি ঠিক পোষ মেনে যায়। সবাই পোষ মানে, তোমার ছেলে কেন মানবে না?

প্রহ্লাদ অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, দরজা ভেজানো। আলো নেই, ঘর অন্ধকার। আলোর গরজও নেই—আলমারির উপরের বালিশগুলো ফরাসে ফেলে যার যেটা নাগালের মধ্যে এলো মাথা চাপিয়ে শুয়ে পড়ে। বালিশের একাদন না ও যদি নাগাল মেলেও, শোওয়া ও ঘুমের কিছুমাত্র হানি হবে না।

পহরে পহরে প্রহ্লাদ ঘুম ভেঙে ওঠেন। চিরকালের অভ্যাস। হুঁকো-কলকে তামাক কাঠকয়লা টেমি দেশলাই সমস্ত জানলার উপর মজুত। নেমে এসে তামাক সাজতে বসে যান তিনি। টেমি জেলে কাঠকয়লা ধরান। হুঁকো-কলকে সহ তারপর মশারির মধ্যে ঢুকে পড়েন। ভুড়ুক ভুড়ুক করে টানছেন। মশারির বাইরের সব ক'টি তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্র, বাজে কেউ নয়। হুঁকো টানার আওয়াজ পেয়ে তারা এপাশ ওপাশ করে, মশা মারতে চাপড় মারে গায়ে। ছাত্রগণ জেগে পড়েছে—মশারির অন্তবর্তী প্রহ্লাদ-মাস্টারের অবিদিত থাকে না। টেনেই যাচ্ছেন তিনি হুঁকো, মুখে মোলায়েম হাসি।

হঠাৎ বাৎসল্য জাগে মাস্টারমশায়ের অন্তরে। টেমিটা জলছিল—মশারির বাইরে বাঁ-হাত বাড়িয়ে ঝাপ্টা মেরে টেমি নিভিয়ে দিলেন। এবং উল্টো দিকে ডান-হাতে হুঁকো বাড়িয়ে ধরলেন। ডবল আবরু—আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার ঘর, এবং মশারির ব্যবধান। মশারি টাঙানোর উদ্দেশ্যও এই ব্যবধান-রচনা। মাস্টারমশায় প্রসাদ দিচ্ছেন, ভক্তিমান ছাত্রেরা সে

বড় হেলা করে না। হাত বাড়িয়ে কেউ একজন হুঁকো নিয়ে নেয়। ভুড়ুক ভুড়ুক শাইয়ে এবার হুঁকো টানার আওয়াজ—যা এতক্ষণ মশারির ভিতরে ছিল। হুঁকো এ হাত থেকে ও-হাতে ঘুরছে, টানের চোটে কলকের মাথায় আগুন জ্বলে আঁধার আলোকিত করে তুলছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে হুকো ঘুরে মশারির কাছে এসে থেমে যায়। ইঙ্গিত বুঝে প্রহ্লাদ হাত বাড়িয়ে হুঁকো ভিতরে নিয়ে নেন। শেষ কয়েকটা মোক্ষম সুখটান দেবেন, গুরুভক্ত-ছাত্রেরা সে জন্য কলকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ছিলিম শেষ করে প্রহ্লাদ হুঁকো-কলকে রেখে শুয়ে পড়লেন। আবার উঠবেন তিনি। স্বহস্তে তামাক সেজে নিজে খাবেন, প্রত্যাশীদের খাওয়াবেন। এই সদ্বিবেচনার জন্য ছাত্রেরা যৎ-পরোনাস্তি গুরুভক্ত, ঘরবাড়ি ছেড়ে গুরুর পাশাপাশি এসে শোয়। কষ্ট করে উঠতে হয় না, তৈরি তামাক ঘুমের মধ্যে আপনাআপনি মুখের কাছে এসে পড়ে। এত সুখ অন্য কোথা? ঘরবাড়ি, এমন কি, বউ ফেলে এখানে শুই শুতে আসে।

রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে এই সব। এবং প্রাক্তন ছাত্রদের ক্ষেত্রে। দিনমানে আর এক রকম। সোনাখড়ির পুরানো ঠাঁইয়ে প্রহ্লাদ আবার এসে বসেছেন, সাড়া পড়ে গেছে। আশপাশে নতুন নতুন পাঠশালা গজিয়ে উঠেছিল, সমস্ত কানা। ছেলেপুলের ঠাসাঠাসি এখন, চতুর্দিক থেকে আসে। জঙ্গলে-ভরা আঁকাবাঁকা সুঁড়িপথ ধরে আসে, জলকাদাল ভেঙে আসে, ধানবনের আ'ল ধরে বিল-পারের ছেলেরা এসে ওঠে। আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে সমুদ্দুর-পুকুরের চাতালের উপর পা ঝুলিয়ে বসে প্রহ্লাদ দাঁতন করেন, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। আসছে তো আসছেই—বগলে বইদপ্তর, আর জড়ানো পাটি-চাটকোল। হাতে-ঝুলানো দোয়াত। শিশুশ্রেণীতে তালপাতা লেখে, পাততাড়ি সেই বাবদ। কার কোন জায়গা মোটামুটি ঠিক আছে, এসেই পাটি বা চাটকোল বিছিয়ে জায়গা নিয়ে নেবে।

মাস্টারমশায়, আমার জায়গায় পেঁচো বসে আছে।

এইও—

ফ্যানসা-ভাত খেয়ে প্রহ্লাদ চৌকিতে এসে বসেছেন। তামাক সেজে দিয়েছে, হুঁকো টানছেন। পাঠশালা বসেছে, নালিশ শুরু হয়ে গেছে।

মাস্টারমশায়, শ্যামের পাটি আমার চাটকোলের উপর দিয়ে পেতেছে, দেখুন।

এই শ্যাম, পিটিয়ে তক্তা করব। শিগগির সরিয়ে নে।

বই কাড়াকাড়ি ওদিকে। মাণিক আর শ্রীপতিতে লেগে গেছে। পাটিগণিত দেখে মাণিক সেলেটে অঙ্ক তুলে নিচ্ছে, পাটিগণিত বই তার নিজেরও বটে।

শ্রীপতি জোর করে সেটা কেড়ে নেবে। নেবেই। মাণিকও তেমনি—ডাইনে বাঁয়ে, শেষটা হাত বড় করে পিছন দিকে ধরল। জায়গায় বসে হাতের নাগালে পাওয়ার আশা নেই দেখে হামাগুড়ি দিয়ে শ্রীপতি বাঘের মতন থাবা মারল বইয়ে। এতখানির পর নজরে না পড়ে পারে না, প্রহ্লাদ গর্জন ছাড়লেন : এই ছিপে, কি হচ্ছে রে?

মাণিক করকর করে নালিশ করে : দেখুন না মাস্টারমশায়, অঙ্ক কষছি—ছিপেটা পাটিগণিত নিয়ে নেবে।

মাটিতে শোয়ানো ফুলোকঞ্চির ছাট। তুলে নিয়ে প্রহ্লাদ সপাং করে একবার মাটির গায়ে মারলেন : কাছে আয় ছিপে, হাত পেতে এসে দাঁড়া।

আদেশ-পালনে শ্রীপতির কিছুমাত্র গরজ দেখা গেল না। বলে, নিচ্ছি না তো মাস্টারমশায়। মিছে কথা। পাবা দেবো। তা মাণকে কিছুতে হাত ছোঁয়াতে দেবে না, পাপী করে রাখবে।

বিচার ঘুরে গিয়ে এবার শ্রীপতির স্বপক্ষে : বড় বাড় বেড়েছে মাণকে, অঙ্কের অনিষ্ট-চিন্তা। বই তোর খেয়ে ফেলবে নাকি? দিয়ে দে।

অপরাধ মাণিকেরই বটে। সাংঘাতিক অপরাধ। পাটিগণিত বইয়ে দৈবাৎ শ্রীপতির পা লেগে গেছে। বই হলেন মা-সরস্বতী—সরস্বতীর গায়ে পা লাগিয়ে পাপ করে বসেছে সে, প্রমাণ করে পাপমুক্ত হবে। সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়—বইয়ে একবার হাত ঠেকিয়ে সেই হাত নিজের কপালে ঠেকানো। কায়দায় পেয়ে গেছে বলে মাণিক তা হতে দেবে না, জব্দ করছে শ্রীপতিকে। অঙ্ক কষায় বড্ড মন পড়ে গেল, পাটিগণিত যক্ষের ধনের মতন আগলে আছে।

বই দে মণকে—

মামলার বিজয়ী শ্রীপতি একঘর পড়ুয়ার দিকে গর্বিত দৃষ্টি ঘুরিয়ে পাটিগণিত হাতে তুলে নিয়ে কপালে ঠেকাল।

লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে ছোটকর্তা উঠানে দেখা দিলেন। ছোটকর্তা অর্থাৎ বরদাকান্ত। নব্বুই ধরো ধরো করছে বয়স—এতকাল তালগাছের মতন খাড়া ছিলেন, ইদানীং সামান্য একটু নুয়েছেন। এক-মাথা সাদা চুল, পুষ্ট পাকা গোঁফ, ফর্সা রং। প্রহ্লাদের কাছে প্রায়ই আসেন, বসেন, তামাক খান, গল্পগাছা করেন। পৈঠায় পা ছোঁয়াবার আগেই উঠান থেকে বলতে থাকেন, তামাক খাওয়াও দিকি মাস্টার। তোমার তামাকটা বেশ ভলোক, তোমার ছেলেগুলো পাজেও বেশ ভাল। সেই জন্যে আসি।

আসবেন বই কি! শতকণ্ঠে তাই তো বলে বেড়াই, এই বয়সে

ছোটকর্তামশায় কী রকম গ্রাম দেখাশুনো করে বেড়ান—সোনাখড়ি গিয়ে দেখে এসো সকলে।

আপ্যায়ন করে প্রহ্লাদ নিজের চৌকি ছেড়ে ছেলেদের একটা চাটকোল টেনে নিয়ে বসলেন। চৌকি জুড়ে বরদাকান্ত আয়েস করে বসছেন। তামাক-সাজা কর্মে সবচেয়ে বড় রাখাল, আর জল্লাদ। পড়ুয়াদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে রাখাল সকলের বড়, চেহারা তাগড়াই। তামাক সাজার প্রশংসা পাইকারি সব ছেলের নামে হলেও কৃতিত্ব রাখাল ও জল্লাদের।

রাখাল হাতের লেখা লিখছিল। চলা করে দিয়েছেন প্রহ্লাদ, মুক্তোর মতন লেখা: 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ—'। বালির-কাগজ বাদামি রংয়ের, পাতাটায় ষোল ভাঁজ করেছে, চলা সকলের উপরে। চলা দেখে নিচের বাকি পনেরো ঘরে পরিচ্ছন্ন স্পষ্ট হস্তাক্ষরে ঠিক ঐ রকম লিখতে হবে। এই কর্মটি রাখাল চমৎকার পারে। শুধুমাত্র লেখার ব্যাপারেই তার যত কিছু মনোযোগ। একমনে রত ছিল, হেনকালে বরদাকান্তর গলা: তামাক খাওয়াও দিকি মাস্টার—

লেখা পড়ে রইল, রাখাল তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। হলে হবে কি, কলকে তার আগেই সম্পূর্ণ জল্লাদের দখলে। কলকের তামাক ঠেসে গুড়গুড় করে জল্লাদ বাড়ির ভিতর আগুন আনতে ছুটল। ধরতে যাচ্ছিল রাখাল, ছাড়ত না—তামাক সাজায় তারই হকের দাবি। কিন্তু ছোটকর্তা ও প্রহ্লাদ মাস্টার দু-জন প্রবীণ মুরুব্বির একেবারে চোখের উপর কলকে নিয়ে টানাহেঁচড়া ভাল দেখায় না। অপসৃয়মান জল্লাদের দিকে কটমট চোখে সে তাকিয়ে রইল।

প্রহ্লাদ বুঝেছেন। উচিত দাবি রাখালেরই বটে। মনোহরপুরে রাখাল-দের বাড়ি, বিল-পারে অনেক দূরের গ্রাম। নতুনবাড়ি এক দুর্বল শরিক মেজবউ বিরাজবালা—তাঁর ছোট ভাই। গায়ে-গতরে কিছু ভারী, সেই লজ্জায় লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বাড়িতে ছিল সে। খেত, বেড়াত। প্রহ্লাদ-মাস্টারের ক্ষমতার বিষয়ে বলে পাঠালেন মেজবউ—গাধা পিটিয়ে এযাবৎ যিনি বিস্তর ঘোড়া বানিয়েছেন। নিজের গাঁ-গ্রাম নয়, এখানে কিসের লজ্জা? তোর চেয়েও ধেড়ে ধেড়ে ছাত্তোর পাঠশালায় আছে। পড়া তেমন হোক না হোক, হাতের লেখাটা দুরস্ত করে নিবি, নড়ালবাবুদের কোন একটা মহালের তহশিল-দার করে নেবেন ওঁরা। নিদেনপক্ষে তহশিলদারের মুহুরি। রাখালের তিন দাদাও প্রস্তাবে সায় দিয়ে কনিষ্ঠকে জোরজার করে বোনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এসে কিন্তু লাগছে ভালই, দিদির বাড়ি পছন্দ হয়েছে তার। বিধবা দিদি ও তাঁর সাত বছুরে ছেলে ফণীকে নিয়ে সংসার। খুঁজে খুঁজে সব লবাটে

খোলের পছন্দসই হুঁকো কিনে ফেলেছে একটা, রাখালের নিজস্ব জিনিষ। প্রকাশ্যভাবে দাদির সামনে হুঁকো টানায় বাধা নেই। দা দিয়ে তামাক কাটে, নিজ হাতে তরিবত করে তামাক মাখে। কালও মেখেছে, জিনিসটা বড় ভাল উতরেছে। গুরুপ্রণামী স্বরূপ সেই তামাক একদলা আজ প্রহ্লাদের জন্য নিয়ে এসেছে। আর সাজার ভার পড়ল কিনা জল্লাদের উপর। রাখালকে দেখিয়ে দেখিয়ে কলকে নিয়ে সে আগুন তুলতে গেল।

অবিচার হয়েছে, প্রহ্লাদ বুঝতে পারলেন। বললেন, হুঁকোর জল ফিরিয়ে নিয়ে আয় রাখাল। ক-দিন ফেরানো হয়নি, জল কটু হয়ে গেছে। পরের তামাক তুই সাজবি, বলা রইল।

মন্দের ভালো। বাইরে এক পাক ঘুরে আসা যাচ্ছে, আর পরের বারের জন্যে তো পাকা হুকুম হয়ে রইল। হুঁকো উপুড় করে জল ফেলতে ফেলতে রাখাল ঘাট-মুখো ছুটেছে। ঘাট ছাড়িয়েই বকুলগাছ—পাকা বকুলফল তলায় পড়ে আছে, পাখিতে ঠোকর মেরে ফেলে দিয়েছে। বকুলে ঠোঁটের দাগ। একটা বড় ডালে পাকা বকুল গাঢ় হলুদ রং ধরে আছে। বরদাকান্তর সঙ্গে প্রহ্লাদ কথাবার্তায় মগ্ন—গাছে উঠে বকুল দু-চারটে পেড়ে নেওয়া যেতে পারে, প্রহ্লাদ ঠাহর পাবেন না। জল্লাদকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাবে, বিচিও কাজে লাগানো যাবে—টুক-টুক করে ছুঁড়ে মেরে প্রতিহিংসা নেবে।

সেকালের কথা বলছেন বরদাকান্ত। একেবারে কালকের ব্যাপার মনে হয়। এই নতুনবাড়িতে তখন আড়াইখানা খোড়োঘর মাত্র—যত রবরবা পশ্চিমবাড়ি, বংশীকান্তের বাড়ি। মাদার ঘোষের বাপ চণ্ডী ঘোষ মশায় নলভাঙা এস্টেটে বাঁকাবড়শি কাছারির নায়েব হয়ে বসলেন, নতুনবাড়ির বাড়বাড়ন্ত তখন থেকে। মাসমাইনে তিন টাকা। বছর তিনেক চাকরির পর বাড়িতে পাকাদালান দিলেন, পাকা চণ্ডীমণ্ডপ বানিয়ে দুর্গা তুললেন—যেখানে এখন এই পাঠশালা রয়েছে। মাইনে মোটমাট ঐ তিন টাকাই কিন্তু। সে মাইনেও মাসে মাসে নিতেন না—সারা বছর পড়ে থাকত, পুজোর আগে একসঙ্গে তিন-বারোং ছত্রিশ—বছরের মাইনের টাকা হিসেব করে নিতেন। সম্পূর্ণ টাকাটা দুর্গোৎসবে ব্যয় করতেন। এক পয়সাও মাইনে নেন না, অথচ রাজার হালে সংসার চলছে, নতুন নতুন ভূসম্পত্তি খরিদ করছেন—বোঝ তবে উপরির ঠ্যালাটা। জমিদারবাবুরাও না বুঝতেন এমন নয়। মাইনেপত্তোর এস্টেটে জমা থেকে যায়—সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদন তবে চলে কিসে? বুঝেসুঝেও তাঁরা উচ্চবাচ্য করেন না। মালেকের মাল-খাজনা ও যাবতীয় পাওনাগণ্ডায় কিছুমাত্র তঞ্চকতা নেই—তার উপরে বুদ্ধিবলে নিজ ব্যবস্থা করে নিলে নায়েবের

পক্ষে সেটা বাহাদুরিই বটে। পশ্চিমবাড়ির শরিকি আটচালা থেকে পাঠশালা তারপরে এই পাকা চণ্ডীমণ্ডপে এলো।

পাঠশালার পণ্ডিত তখন সর্বেশ্বর পাল—দ্বারিক পালের পিতামহ তিনি। ম্যাজা-ভাঙা কোল কুঁজো বুড়োমানুষ—হস্তাক্ষরে ছাপার অক্ষর হার মেনে যায়। নানা জায়গা থেকে ফরমাস আসত—পুরানো পুঁথি তালপাতার নকল করে দিতেন। তাঁর প্রধান উপজীবিকা এই। আবার ওদিকে ফারসিনাবিশ—কথায় কথায় বয়েৎ আওড়াতেন, মামলার রায় ফারসি থেকে তরজমা করে বুঝিয়ে দিতেন। মহাভারত-রামায়ণ পাঠ করতেন—তাতেও দু-চার পয়সা দক্ষিণা মিলত। আর পাঠশালার পণ্ডিতি তো আছেই।

বাচ্চা ছেলে সর্বপ্রথমে পাঠশালায় এসেছে। গুরুপ্রণামী এক টাকা এবং আস্ত একখানা সিধে পায়ের কাছে রাখল। বাচ্চাকে সর্বেশ্বর কোলে তুলে নিলেন, খড়ি দিয়ে তালপাতায় হাঁড়ি-কলসি এঁকে দিলেন। আঁকুক বাচ্চা যেমন তার খুশি। লেখাপড়া আরম্ভ হয়ে গেল। গুরুমশায় জলচৌকিতে বসেছেন। চাল থেকে সিকা ঝুলছে মাথার উপর—সিকার হাঁড়িতে চিনির-পুতুল চিনির রথ বীরখণ্ডি কদমা। হাত উঁচু হয়ে হাঁড়িতে ঢুকে যায়। একটা কদমা এনে বাচ্চাকে দেন। বনের পাখি বেশ বশ মানাচ্ছেন সর্বেশ্বর গুরুমশায়।

হাঁড়ি-কলসি চলল কয়েকটা দিন। তালপাতায় ন্যাড়াসেজির আঠা দিয়ে পণ্ডিতমশায় অ-আ ক-খ যাবতীয় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ লিখে দিলেন। শুকিয়ে তার উপর কাঠকয়লার গুঁড়ো ছড়ানো হল। অক্ষরগুলো জলজল করছে। কলম বুলাবে ছেলে এর উপর দিয়ে, অক্ষরের ছাঁদ রপ্ত করবে। সে কলম নলখাগড়া কেটে বানানো। কলমে বেশ খানিকটা হাত এসে যাবার পর সামনে পৃথক তালপাতা রেখে মিলিয়ে মিলিয়ে সেই পাতায় অ আ ক-খ লিখবে।

তালপাতা হয়ে গিয়ে কলাপাতা। কোমল মাঝপাতা কেটে এনেছে লেখার জন্য। সেই শুভদিনটিতে গুরুমশায়ের কাপড়-প্রণামী। কাগজে লেখা আর শেলেটে লেখা এই তো সেদিন মাত্র এসেছে। বরদাকান্তর শৈশবে এ-সবের চলন ছিল না।

সর্বেশ্বর মারা গেলের, এলেন কাসেমগুরু। মাথায় তাজ, একগাল বড় দাড়ি। চৌকির উপর বসে বসে মেরজাই সেলাই করেন আর হাঁক পাড়েন মাঝে মাঝে: পড়ে পড়ে লেখ—

এক একদিন ছোটকর্তা বাজার দরের কথা তোলেন। কী সস্তাগণ্ডার দিন ছিল তখন। খাওয়া-দাওয়ার সুখ ছিল, শখও ছিল লোকের। সমস্ত উড়েপুড়ে গেল একেবারে। ফুরফুরে চাল হাওয়ায় উড়ে যায়—দেড় টাকা মণ। তার চেয়ে

অনেক নিরেশ এখন চার সাড়ে-চার টাকায় বিকোচ্ছে। খাবে কি মানুষ—ভাত নয়, টাকা চিবিয়ে খাওয়া এখনকার দিনে।

শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি—গল্পটা শোন মাস্টার, যেন কালকের কথা। যেতে যেতে খেয়াল হল, কিছু তো হাতে করে যাওয়া উচিত। বিষ্যুৎবার কাটাখালির হাট—মাঝিকে বললাম, হাট হয়ে যাই চলো। ঘুর হবে খানিকটা, কী করা যাবে—শুধু হাতে যাওয়া যায় না।

ইলিশের মরশুম, ভৈরবে পড়ছে খুব। মুঠো-হাত চওড়া চকচকে চাঁদি-রূপোয় গড়া যেন। দাও এক টাকার—বলে টাকা ছুঁড়ে দিলাম ডালির উপর। জেলে হাসছে। দু'পয়সা করে ইলিশ—বত্রিশটা এক টাকায়। ইলিশের ঝাঁকা নিয়ে শ্বশুরবাড়ি উঠি কেমন করে? কমিয়ে তখন আটআনার নিলাম। তা-ও ষোলটা, আর একটা ফাউ।

কলকেয় আগুন নিতে জল্লাদ ভিতর-বাড়ি ঢুকেছে। চার শরিকের এজমালি রান্নাঘর—ঘরের মধ্যে দুই তরফ, আর দুই হাতনের দুই তরফ বেড়া ঘিরে নিয়েছেন। কোন তরফের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সকাল আছে এখনো—চানে-টানে গিয়েছে বউরা সব। কেবল রাখালের বোন বিরাজবালা বঁটি পেতে কচি-লাউ ভিরে ভিরে করে কুটছেন, ঘণ্ট হবে। কাছে এসে জল্লাদ বলল, মেজখুড়িমা, উনুন ধরানো হয় নি বুঝি তোমাদের? আমি যে আগুন নিতে এলাম। টেমি জেলে কয়লা ধরানো—বড্ড ঝামেলা তাতে।

মেজবউ বললেন, দুলিদের ঢেঁকশালে যা। চিঁড়ে কুটছে, পাড় পড়ছে, শুনতে পাস না? ঐখানে আগুন পাবি।

দুটো বাড়ির পর দুলি অর্থাৎ অম্বিক দত্তর বাড়ি। আগুনের তল্লাসে সেইখানে যেতে হল। আঁটোসাঁটো জওয়ানী দুলি পাড় দিচ্ছে, দুলির বোন মেয়াও সাথেসঙ্গে আছে। চিঁড়ের পাড় খুচ-খুচ করে হয় না, জোর লাগে দস্তুরমতো। তবেই ধান চেপ্টা হয়ে চিঁড়ে হয়ে দাঁড়ায়। দু-বোনে পাড় দিচ্ছে, আর বুড়োমানুষ হয়ে দুলির মা অপরূপ খেল দেখাচ্ছেন লোটের ধারে এলে দিতে বসে। কোলে দুলির দু-মেসে বাচ্চা চুক-চুক বুকের শুকনো চামড়া চুষছে অভ্যাস বশে। হামাগুড়ি দিয়ে লোটের উপর গড়িয়ে এসে পড়বে সেই ভয়ে বুকের মধ্যে রাখতে হয়েছে। লোটের ভিতরের চিঁড়ে এলে দিচ্ছেন তিনি। বিপজ্জনক কাজ—তিলেক অসাবধানে আঙুল ছেঁচে যাবে। এমন আছে পাড়ার মধ্যেই পুববাড়ির বড়গিন্নি। ঢেঁকিতে আঙুল-থেঁতো—অসাড় বাঁকা আঙুলে কোন কিছু করতে পারেন না। এলে দিচ্ছেন ডানহাতে দুলির মা, আর বাঁ হাতে নাংকেলের শলায় নেড়ে নেড়ে খোলাইাঁড়িতে ধান সেঁকছেন

—সেই থাবে পাড় দিয়ে চিঁড়ে হচ্ছে। এর উপরেও আছে। লোভী ছেলেপুলে এসে ভিড় জমায় 'ঠাম্মা, দাও—' 'ঠাম্মা, দাও—' করে। এলে দেবার ফাঁকে কোটের ভিতর থেকে চিঁড়ের দলা তুলে দিতে হয়—কাড়াকাড়ি করে খায় তাই। সদ্য-কোটা চিঁড়ের দলা—গায়ের গরম কাটেনি, ও-জিনিসের তুলনা নেই।

কলকে হাতে জল্লাদ এসে পড়ল : ঠাম্মা, আগুন দাও—

ফুলির মা বিপন্নভাবে বললেন, বাঁশের চেলায় আগুন থাকবে না দাদা। ক'খানা আমের ডালাও ছিল—সে আগুন নিচে পড়ে গেছে।

রোসো, চিমটে নিয়ে আসি।

কলকে রেখে জল্লাদ ছুটল। বৈঠকখানা-ঘরে তামাকের সরঞ্জামের ভিতর চিমটেও থাকে। চিমটের আগুন তুলে কলকের মাথায় বসিয়ে প্রাণপণে ফুঁ দিচ্ছে। ধরে গেছে তামাক, গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কলকের তলার ছিদ্র দিয়ে। খাসা তামাক—মনোরম একটা গন্ধ বেরিয়েছে। রাখাল জিনিস চেনে। কেনে সে সকলেই হাট থেকে। রাখালের তামাকের স্বাদ আলাদা।

প্রহ্লাদ-মাস্টারের হাতে মুখে চলে। ছোটকর্তার গল্পে হুঁ-হাঁ দিচ্ছেন, মাঝেমধ্যে ফোড়নও কাটেন এক-আধটা। ডানহাত ওদিকে ব্যস্ত খুব তালপাতা, শেলেট, খাতা নিয়ে ছেলেরা ঘিরে ধরেছে—দ্রুতহাতে একটার পর একটা ছলা করে দিচ্ছেন—মিলিয়ে লিখবে। শেলেটে বর্ণমালা লেখাচ্ছেন—মুখে বলে বলে দেখিয়ে দিচ্ছেন হাতে ধরে—অ-আ ক-খ নিরলঙ্কার শুকনো নাম বলে হয় না—জবর জবর বিশেষণ : আঁকুড়ে-ক, মাথায় পাগড়ি-ঙ, ছেলে কাঁকালে-ঝ, বোঁচকা-পিঠে ঞ, পেট কাটা ব—এমনি সব।

বরদাকান্ত হি-হি করে হাসেন : বেশ মজা! ভাল বলেছে মাস্টার—খাসা, খাসা! ঙ র মাথায় পাগড়ি, ঞ র পিঠে বোঁচকা—ঠিক বটে।

প্রহ্লাদও হাসছেন : বলেন কেন। তেতো ওষুধ এমনি কি গিলতে চায়? মধু দিয়ে মেড়ে খাইয়ে দিই।

রাখাল ফিরল। জল-ফেরানো হুঁকো এগিয়ে এনে ধরেছে। প্রহ্লাদ বললেন, কোথায়। ফেরেনি জল্লাদটা এখনো। হুঁকো রেখে দে।

বরদাকান্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, আজও গেছে কালও গেছে! কলকে ফুঁকে একেবারে শেষ করে আনবে। ছেলেপুলেগুলো যা আজকাল হয়েছে—গুরুজন বলে মান্য নেই। বাজ পেল্লাদের তামাকটা বড় ভাল—যাই, একটান টেনে আসি। হা-পিত্যেশ বসে আছি তখন থেকে।

প্রহ্লাদের মনোভাবও ঠিক এই। কিন্তু একেবারে প্রত্যক্ষ ছাত্র জল্লাদ—সে তামাক খায়, চোখে দেখেও ছোটকর্তার মতো স্পষ্ট করে বলার জো

নেই। কিল খেয়ে কিল চুরি করা। বরদাকান্তর এত সব কথা শুনেও শুনছেন না তিনি। কাজে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তালপাতা আর শেলেটে লিখে লিখে এনেছে—মনোযোগে দেখছেন। ভুল সংশোধন করে দিচ্ছেন, ক্ষেত্র বিশেষে থাবড়াও একটা-দুটো।

মাস্টারমশায়, ধুয়ে নিয়ে আসি—

বলেই বুধো এক লাফে পৈঠা পার হয়ে দৌড়। 'আসি' বলে কথাটুকু পরিপূর্ণ করবার সবুর সয় না। শেলেটে বা তালপাতার লেখা উঁচু করে প্রহ্লাদকে একটুকু দেখিয়ে পুকুরঘাটে ছুটল। ভিজে ন্যাকড়া থাকে হাতের কাছে, লিখে লিখে অনেকবার ন্যাকড়া ঘষে মুছেছে। শেষটা আবছা দাগ-দাগ হয়ে যায়—পুকুর-ঘাটে না গেলে আর হয় না।

সমুদ্দুর-পুকুরের পাকাঘাটে জলে নেমে রগড়ে রগড়ে তালপাতা ধুচ্ছে। আঘাটার দিকে ঝুঁকে-পড়া কামিনী ফুলগাছ-তলায় তেঁতুল-খেটের উপর বউঝিরা সকালবেলা বাসন মেজে গেছে—মাজুনি পড়ে রয়েছে। শেলেট-ওয়ালারা সেই মাজুনি নিয়ে শেলেট মাজতে বসল। অস্পষ্ট আঁকচোক যত পড়েছে, তুলে ফেলে ঝকঝকে করবে।

জল্লাদ অবশেষে দেখা দিল। কলকের ফুঁ দিতে দিতে সন্তর্পণে পৈঠা বেয়ে উঠল।

এত দেরি কেন রে?

ছোটকর্তা হেসে বললেন, বললে হবে কেন। গুরুজনদের মুখে নিয়ে ধরবে—তিতে না মিঠে, বিষ না অমৃত—পরখ না করে দেয় কি করে?

জল্লাদ কলরব করে বুদ্ধের কথা ডুবিয়ে আগুনের বাবদ কত ঝঞ্ঝাট তাকে পোহাতে হয়েছে—সবিস্তারে বলতে লাগল। হাত বাড়িয়ে ইতিমধ্যে কলকে নিয়ে বরদা হুঁকোয় বসিয়ে টানতে লেগেছে। আরামে চোখ বুজে টেনেই যাচ্ছেন। প্রহ্লাদ যে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, বন্ধ চোখে দেখতে পাচ্ছেন না।

একটা ছেলে অঙ্ক দেখাতে এলো। সুযোগ পেয়ে প্রহ্লাদ হাঁক পেড়ে উঠলেন: একটুখানি দাঁড়া। সামনের উপর সাজা-তামাক—একটান টেনে নিয়ে তার পরে দেখব।

বরদা চোখ মেলে তাকালেন। মুখ থেকে হুঁকো তুলে ছিদ্রমুখ হাত বুলিয়ে মুছে দিয়ে বললেন, খাও হে মাস্টার। রেখেছে ঘাডার-ডিম, খাও ভাই।

প্রহ্লাদ মাস্টার একটান টেনেই ঠক করে মাটিতে কলকে উপুড় করলেন। মেজাজ হারিয়ে ফেলে শিক্ষক-ছাত্র আবরু আর রইল না। চোখ পাকিয়ে

জল্লাদকে কাছে ডাকছেন: আয় ইদিকে লক্ষীছাড়া পাজির পা-ঝাড়া। গব খানি তামাক ছাই করে ঠিকরি অবধি পুড়িয়ে কলকের মাথায় তোর প্রসাদ এনে দিলি উল্লুক। ছোটকর্তার কি—হুঁকা পেলেন তো টানতে লেগে গেলেন।

চুলের মুঠো ধরে মাথা নুইয়ে ধরেছেন। দু-চার ঘা পড়বে পিঠে। হেন-কালে রাখালের দিকে নজর পড়ল। এক টান টেনেই কলকে ঢালতে হল—গুরুর মনোকষ্টে তারও লেগেছে। উসখুস করছিল, স্পষ্ট করে তারপর বলেই ফেলল, আমি এক ছিলিম সেজে এনে দিই মাস্টারমশায়।

যা। যাবি আর আসবি। থুতু ফেলে যা দুব্বোঘাসের উপর, থুতু না শুকোতে সেজে এনে দিবি। কলকে যদি সাবাড় হয়, তোকেও সাবাড় করব—এই বলে রাখলাম।

জিভ কেটে খুশির আনন্দে এক-গাল হেসে একছুটে রাখাল বেরিয়ে গেল।

প্রহ্লাদ-মাস্টারের মুষ্টি তোলা আছে। এবং ঘাড়ে হাত চেপে পিঠখানা নাগালের মধ্যে আনা হয়েছে। চিব-চাব পড়লেই হয়। কিন্তু মারের চেয়ে কঠিন শাস্তি মনে এসে গেল। ঘাড় ছেড়ে দিয়ে বললেন, তিন দিন তোর তামাক সাজা বন্ধ। বলতে গিয়েছিলেন 'কোন দিন'—নিজ স্বার্থেই সামলে নিয়ে 'তিন দিন' করলেন। তামাক সাজে ছোঁড়া বড্ড ভাল—অতি সাধারণ ক্যাকসা তামাকও সাজার গুণে অমৃত হয়ে দাঁড়ায়।

লঘুপাপে গুরুদণ্ড হল হে মাস্টার—

বরদাকান্ত খুব হাসতে লাগলেন: তিন তিনটে দিন কলকে ছোঁবে না, এর চেয়ে অন্নজল বন্ধ করে দিলেই তো ভাল ছিল। এ তিন দিন তোমার জল্লাদ পাঠশালেই আসবে না দেখো।

নালিশ এলো: বুধো লিখতে দিচ্ছে না মাস্টারমশায়—

প্রহ্লাদ তাকিয়ে পড়লেন। কোথায় বুধো—চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যেই তো নেই। বদ্যিনাথ নিচু হয়ে বসে হাতের লেখা করছে। বুধো শেলেট ধুতে সেই ঘাটে গিয়েছিল—ফেরে নি।

বদ্যিনাথ বলে, মুখে রোদ ফেলছে মাস্টারমশায়, লিখতে দিচ্ছে না।

তাই বটে। বুধো অনেক দূরে বেড়ার ধারে—উঠোনে সবে পা ঠেকিয়েছে। বজ্জাতি ওখানে থেকেই। মেজে ঘষে শেলেট চকচকে হয়েছে, রোদ ঠিকরে পড়ছে শেলেটের উপর। ডাইনে-বাঁয়ে সরিয়ে ঘুরিয়ে এক কুচি রোদ চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে এনে ফেলে। আরও ঘুরিয়ে অনেক চেষ্টায় তার-

পর বঙ্কিনাথের মুখে। চমক খেয়ে উঠানের দিকে তাকিয়ে বঙ্কিনাথ বুধোর কাণ্ড দেখল।

প্রহ্লাদকে দেখিয়ে দেয় : ঐ দেখুন মাস্টারমশায়—

ফুলো কাঞ্চ তুলে মাটির উপর সপাং করে এক বাড়ি : এই বুধো, বড্ড চেটো হয়েছে তোর, মার খাবার জন্য কুটকুট করছে, উঁ ?

বুধো পৈঠার ধারে এসে পড়েছে তখন। বলল, না মাস্টারমশায়, ইচ্ছে করে নয়। শেলেট ঝুলিয়ে আনছিলাম, কখন ঝিলিক এসে পড়ল—

ঠিক একেবারে মুখের উপর পড়ল, এত থুয়ে বঙ্কিনাথের মুখে ? উঠে আয়—

কমল এতদিন দ্বারিকের কাছে একা একা পড়েছে, এইবার সে পাঠশালে চলল। প্রথম-ভাগ সারা হয়ে দ্বিতীয়-ভাগ চলছে। কড়া কড়া অত সমস্ত বানান দ্বারিককে দিয়ে হয় না। পুরো একটাকা মাইনে দ্বিতীয় ভাগ-পড়া একফোঁটা ঐ বালকের জন্য—বলাবলি হচ্ছে : দেবে না কেন ? চাকরি করে অঢেল টাকা আনছে। হবে-না হবে-না করে তিনি মেয়ের পিঠে মেটের বাচা ছেলে। পেহ্লাদ মাস্টারের লোভ বাড়িয়ে দিল। পড়াবে ঐ ছেলে, আর আমাদের ছেলেপুলেগুলো পেটাবে।

উমাসুন্দরীর ইচ্ছা নয়, ছোটছেলে রোজ দু'বেলা চন চন করে পাঠশালায় যাওয়া-আসা করবে। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ সকলের বিপক্ষে কাঁহাতক লড়ে বেড়ান ? প্রহ্লাদকে আনার মূলে যাঁরা, এ-বাড়ির কর্তাটিও তাঁদের একজন। তাঁকে বলে কিছু হবে না।

তরঙ্গিনীকে শুধান : অদ্দুর যেতে পারবে ছেলে ?

গর্ভধারিণী মা হয়ে কিছুমাত্র উদ্বেগ নেই। হেসে তরঙ্গিণী বলেন, অদ্দুর—নতুনবাড়ি ন-মাস ছ-মাসের পথ নাকি ?

তা হলেও বর্ষায় জলকাদা হবে পথে—

হাসতে হাসতে তরঙ্গিণী আরও জুড়ে দেন : বর্ষায় জলকাদা শীতকালে হিম চোত-বোশেখে খরা—ছেলে তবে তুলোর বাক্সে রেখে দাও, কোন-কিছু গায়ে লাগবে না।

উমাসুন্দরী রাগ করে বললেন, থাইয়ো তোমরা হিম, কাদার মধ্যে ফেলে রেখে দিও. যত ইচ্ছে হেনস্তা কোরো—কিছু বলতে যাব না। মুখ টিপলে এখনো দুধ বেরোয়—বড় হোক একটু, তিনটে চারটে বছর সবুর করো, লেখাপড়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না।

দুরন্ত লোকের তৃণখণ্ড ধরার মতন মেজছেলে কালীময়কেও বললেন।

সে ব্যবস্থা ছিল : এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি—ভাবনার কি আছে মা? পুঁটি কি নিমি একজন-কেউ সঙ্গে গিয়ে রেখে আসবে।

ভাবনা তো নয়ই, উল্টে আরও যেন স্ফূর্তি লেগে গেছে সকলের। নিমি চমৎকার ফুল-লতাপাতা-পাখি তুলে রুমালের সাইজের কাঁথা সেলাই করে দিল —দ্বিতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা ধারাপাত তিনখানা পাঠ্যবই, খাকের কলম, টিনের পাখনার কলম এই সমস্ত দপ্তরে বেঁধে নিয়ে যাবে। বালির-কাগজের খাতা বেঁধে দেওয়া হল—পাঠশালে গিয়ে কাগজেও লিখবে। এমনি তো ভবনাথ খরচের নামে তেরিয়া—কমল আবদার ধরেছিল, হাটখোলা থেকে জলছবি কিনে এনে দিয়েছেন তিনি—বীণাপাণি সরস্বতী, গজলক্ষ্মী, সাহেব-ঘোড়সওয়ার। জলছবি মেরে বই ও খাতার বাহার করেছে। কাগজে লিখবে তো এবার —সেজন্য ভাল কালি, সী'র কালি, তরঙ্গিণী বানিয়ে দিলেন। চাল ভেজে ভেজে প্রায় পুড়িয়ে জল মেশায়, যার নাম সী'র জল। খোলাহাঁড়ির তলা থেকে ভুষোকালি চেঁচে সী'র জলে গুলে দিলেই কালি হয়ে গেল। শিল্পীমানুষ নিমি—কালির সঙ্গে আবার বাবলার আঠা মিশিয়ে দিল, লেখা ঝিকমিক করবে। কুমোরবাড়ির মেটে দোয়াতের গায়ে তিনটে ছিদ্র—ছিদ্রে সুতো পরানো—সুতো ধরে দোয়াত হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবে। কালির মধ্যে একটুকু ন্যাকড়া—দোয়াত দৈবাৎ উল্টে গেলেও কালি সমস্ত পড়ে যাবে না, ন্যাকড়ায় আটকে থাকবে।

বগলে বইদপ্তর, ডানহাতে ঝুলানো দোয়াত—। কমল শেলেট খাতা আর গুটানো পাটি দেখিয়ে বলে, দাও ওসব, বাঁহাতে নিয়ে নিচ্ছি।

তরঙ্গিণী বলেন, পুঁটি নেবে। পাটি পেতে একেবারে তোকে জায়গায় বসিয়ে আসবে।

না, দিদি যাবে না। কেউ না।

একলা যে-মানুষ বিল ভেঙে মরগার রাস্তার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, নতুনবাড়ির তো তার কাছে ডাল ভাত। গুপ্ত অভিযানের কথা অবশ্য এঁদের কাছে খুলে বলা যায় না। নড়েচড়ে মাটিতে দুম করে এক লাথি মেরে বলল, কেউ যাবে না, আমি একলা।

হাত তো দু'খানা মাত্তোর, একলা তুই অত সমস্ত নিবি কেমন করে?

নেবো—

গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল, এক পা এগোবে না। বিরক্ত হয়ে তরঙ্গিণী বলেন, দিয়ে দে পুঁটি। এই বয়সে এমন জেদি—অনেক দুঃখ আছে ওর কপালে।

উমাসুন্দরী কোথায় ছিলেন, কর-কর করে পড়লেন : আজকের একটা দিন—এমন কথাটা বললে তুমি বউ। কোন কথা কেমন ক্ষণে পড়ে, কেউ

জানে না। বলি, একটু আধটু জেদ হবে না তো বেটাছেলে হয়েছে কেন। মিনমিনে মেনিমুখো হলেই বুঝি ভাল হত।

তরঙ্গিণী এতটুকু হয়ে গেছেন। বকুনি খেয়ে আর তিনি রা কাড়লেন না। একদিকে জিওল-ভেরেণ্ডা-মাদ্‌ গাছের বেড়া, রাধেশ্যাম পোদ্দারের জঙ্গল-ভরা পোড়োবাড়ি অন্যদিকে। মাঝে পথ, দু'দিক থেকে বাসবনে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। পথ ধরে কমলবাবু একা পাঠশালা যায়। পিছনে তাকানো হচ্ছে মাঝে মাঝে—বিশ্বাসঘাতকতা করে কেউ পিছু নিল কিনা। তাই বটে—দূরে দূরে আসছে তো একজন। মাদুবনের আড়াল করে দাঁড়াল কমল—আর খানিকটা এগিয়ে আসতে, এক ছুটে সামনে গিয়ে পড়ল। পুঁটি নয়, বিনো—পুঁটি হলে রক্ষে ছিল না। মেরে, খিমচি কেটে—দেখে নিত একবার।

বিনোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে: তুমি আসছ কেন বড়দি?

বা রে, আমি কেন যেতে যাব। আমার কাজে আমি যাচ্ছি—কচুশাক তুলতে।

তাই যাও। এদিকে আসতে পারবে না কিছুতে।

পাঠশালার পৈঠার ধারে এসে যত বীরত্ব উপে গেল, থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রহ্লাদকে জানে, বাড়িতে এসে ক'দিন আদর-টাদর করে গেছেন। পাঠশালাও দেখা আছে—পুতুল খেলতে পুঁটি নতুনবাড়ি আসে, দিদির সঙ্গে কমলও দু-এক দিন এসেছে—দূর থেকে তখন পাঠশালা দেখে গেছে। নিজে আজ পড়ুয়া হয়ে ঢুকতে ভয়-ভয় করছে। এবং লজ্জাও।

প্রহ্লাদ মিষ্টি করে ডাকলেন: এসো খোকন। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, উঠে এসো। আমার এই পাশটিতে বসবে। ভাল মাথা তোমার শুনেছি—অনেক বিদ্যে শিখবে, বিদ্যের সাগর হবে তুমি।

প্রথম-ভাগ ও দ্বিতীয়-ভাগ দুটো বইয়ের সঙ্গে যাঁর নাম, তিনিও বিদ্যের সাগর—কমলের মনে পড়ে গেল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কমলও সেই রকম হবে—কমললোচন বিদ্যাসাগর।

খেজুরপাতার পাটি বিছিয়ে নিয়ে কমল প্রহ্লাদের পাশটিতে বসেছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন প্রহ্লাদ একবার। পড়া দিন আর কিছু নয়, অন্যদের নিয়ে পড়লেন। কমল তো বলে ছাড়ে না—সকলের দেখাদেখি বইদপ্তর খুলে আপন মনে দ্বিতীয়-ভাগ পড়ে যাচ্ছে।

স্লেটে অঙ্ক কষে এনেছে জল্লাদ। এক নজর দেখেই প্রহ্লাদ জ্বলে উঠলেন: মুণ্ডু হয়েছে! ধামড়া ছেলে সামান্য বিয়োগফলটাও পারিস নে? এদ্দিনে

শিখলি কেবল তামাক সাজাতে—সেটা ভাল মতোই শিখেছিস। বলি, আর্যা, মুখস্থ আছে?

হ্যাঁ, আছে। প্রহ্লাদের তুড়ুক-জবাব: বলব?

মুখস্থ না ঘোড়ার ডিম! আঁ-আঁ করে—আর ক্রমাগত বলে, বলব? প্রহ্লাদ ধমক দিয়ে উঠলেন: বল্ না রে হতভাগা। একটা আর্যা বলাব, তার জন্য পাঁজি খুলে দিনক্ষণ দেখতে হবে নাকি?

বিনো এসে উপস্থিত। কমল গোছগাছ করে দিব্যি বসে গেছে, দেখে বেশ ভাল লাগল। হাসতে হাসতে প্রহ্লাদকে বলে, কমল কিন্তু একা একা এসেছে মাস্টারমশায়, আমি ওর সঙ্গে আসি নি। আমি কচুশাক তুলে বেড়াচ্ছি।

প্রহ্লাদও হেসে চোখ টিপে বলেন, বেশ করছ। মেলা কচুগাছ আমাদের মণ্ডপের কানাচে। কমললোচন একা এসেছে জানি। পুরুষছেলে একা একা কত দেশদেশান্তর বেড়াবে, পাঠশালায় আসা তো সামান্য জিনিস।

ছাট তুলে সপাং করে মাটিতে একটা বাড়ি দিয়ে প্রহ্লাদ কানখাড়া করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসলেন। সুর করে মাখন আগে পড়ছে, জল্লাদ ও কয়েকটি ছেলে শুনে শুনে একসুরে পড়ে যাচ্ছে। বড় বড় চোখ মেলে কমল অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বেশ তো চমৎকার!

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে
কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্জে।
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ
বিশ গণ্ডায় হয় কাঠার প্রমাণ—

আহা, কি সুন্দর! কেমন বাজনা বেজে কানের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। একবার মাত্র শুনেই তো কমলের আধা-মুখস্থ হয়ে গেল।

॥ উনত্রিশ ॥

শুভকর্ম সারা করে সকলে গুয়াতলি থেকে ফিরছেন। গরুর-গাড়ির ছইয়ের মধ্যে উমাসুন্দরী ও পুঁটি। ধান কেটে-নেওয়া বিলে চাকার দাগে লই পড়েছে—লই ধরে গাড়ি রাস্তার উপর উঠল। চলেছে, চলেছে। আগে আগে কালীময়—গলাবন্ধ কোট গায়ে, মাথায় আলোয়ান বাঁধা, বগলে ছাতি, হাতে জুতো। শীতকালে এখন জল-কাদা নেই, চারিদিক শুকনো-খাকনা—

জুতো পায়ে পথ চলা অসাধ্য নয়। কিন্তু কাদা না হলেও জুতোয় ধুলো-ময়লা লাগে, জুতোর তলা কমবেশি কিছু ক্ষয়েও যায়। তা ছাড়া পা টনটন করে অনভ্যাসের দরুন। ভদ্রসমাজের মধ্যে জুতোর আবশ্যক, কায়ক্লেশে পায়ে রাখতেই হয়—কিন্তু পথ চলতি অবস্থায় এখন কেন অকারণ কষ্ট স্বীকার করা। জুতাজোড়া যথারীতি বাঁ-হাতে ঝুলিয়ে কালীময় হনহন করে গাড়ির আগে আগে চলেছে।

উমাসুন্দরীর ইচ্ছা ছিল, ভাইয়ের বাড়ি আরও কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবেন। ভূদেবও বারম্বার বলেছিলেন, কাজ চুকলেই চলে যেতে হবে তার কোন মানে আছে? জলে পড়েনি তো। কতকাল পরে বাপের ভিটেয় এলে—ভাইবোনে এক জায়গায় হলাম আমরা। বুড়ো হয়েছি, কবে চোখ বুজব, আর হয়তো দেখা হবে না।

কিন্তু কালীময় নাছোড়বান্দা—যাবেই। এখন ধান কাটার পুরো মরশুম। ফুলবেড়ে শ্বশুরবাড়ি জমাজমি সে ছাড়া দেখবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। বর্গাজমির ধান—আহার-নিদ্রা ছেড়ে এই সময়টা জমিতে ঘোরাঘুরি করা দরকার। বর্গাদারে নয়তো পুকুর-চুরি করবে।

মামামশায়কে বলল এই। এ ছাড়া আরও আছে। সেটা মনের ভিতরের কথা, মুখে বলার নয়। পাকস্পর্শ অন্তে নতুনবউ গুয়াতলি থেকে বাপের-বাড়ি ফিরে গেছে। হিরুও নতুন শ্বশুরবাড়ি গেছে। ভূদেবের বাড়ি এখন আর কী আছে খালের চেলা-পুঁটি-মৌরলা ক্ষেতের নতুন ঠিকরি-কলাই আর খানাখন্দের কচুশাক ছাড়া? সে জিনিস বাড়িতেও আছে। ফুলবেড়েতেও আছে। তার জন্য মাতুলালয়ে কেন পড়ে থাকতে হবে? বলল, মা-ই বরঞ্চ থেকে যান, লোক-সুযোগে পাঠিয়ে দেবেন। নয়তো একটা চিঠি দেবেন মামা, আমাদের ফটিক মোড়ল এসে ব্যবস্থা করে নিয়ে যাবে।

শুনেটুনে উমাসুন্দরীর মতি-পরিবর্তন হল। ধান উঠেছে তাঁর উঠোনের উপরেও—উঠোন ভরে গেছে। তার উপরে কলাই-মুসুরি আছে। বউ মেয়েরা কি সামাল দিয়ে পারে? একলাটি ছোটবউ চোখে অন্ধকার দেখছে। এখন যাই দাদা, ষষ্ঠীতে এসে বাপের-বাড়ির আম-কাঁঠাল খেয়ে যাব।

গ্রামে ঢুকে হরিতলা। গরুর-গাড়ি থামিয়ে উমাসুন্দরী নেমে বৃক্ষদেবতার পায়ে গড় করলেন, তলার মাটি মাথায় মুখে দিলেন। কালীময় জোর হেঁটে অদৃশ্য। পূববাড়ি ধরো ধরো করল সে এতক্ষণ। পুঁটিও নেমে পড়েছে। চেনা এলাকার ভিতর এসে বয়ে গেছে আর গাড়ির চালার উপর ঘটের

যতক্ষণ বসে থাকতে। দৌড়—দৌড় দিয়ে এতক্ষণে বাঁচল রে বাবা, শেষরাত্রি থেকে গাড়িতে বসে বসে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেছে। পশ্চিমবাড়ি, পরামাণিক-বাড়ি, দাসেদের বাড়ি ছাড়িয়ে বকুলতলা চাঁপাতলা হয়ে পুকুর-পাড় ধরে তীরবেগে দৌড়চ্ছে সে, ঝুঁটিবাঁধা চুল খুলে গিয়ে বাতাসে উড়ছে।

নতুনবাড়ির পাঠশালায় ছুটির আগের নামতা পড়ানো হচ্ছে। সর্দার-পোড়োর গৌরব আজ কমলের উপর বর্তেছে—পড়াচ্ছে সে-ই। পুঁটিকে দেখল একনজর। দৈঠা লাফিয়ে উঠানে পড়ে একছুটে দিদিকে জড়িয়ে ধরবে—কিন্তু কর্তব্য বিষম—মনে যাই থাক, যথানিয়মে সুর করে পড়িয়ে যাচ্ছে: আট উনিশং একশ-বাহান্ন ন-উনিশং একশ-একাত্তর -। এবং বারম্বার দৃষ্টি যাচ্ছে আশশ্যাওড়া-ভাঁটবনের শুঁড়িপথটার দিকে পুঁটি যার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নামতা শেষ। ছুটি। সামনের রাস্তার গরুর গাড়ি দেখা দিয়েছে। ছইয়ের নিচে উমাসুন্দরী পিছন দিকে মুখ করে আছেন। কমলকে ডাকলেন: এসো। ছুটি হয়ে গেল? কাছে এসো খোকন।

কমল ঘাড় নেড়ে দিল— আসবে না সে। পায়ে পায়ে তবু এসে পড়ল। উমাসুন্দরী বলেন, গাড়ি থামাচ্ছে—উঠে আয় পাশটিতে।

জোরে জোরে কমল অনেক বার ঘাড় নেড়ে দিল। উঠবে না সে কিছুতে। চোখ ভরে যায়: গাড়িতে তখন তো নিয়ে গেলে না। পুঁটি গেল, আমি বাদ। এইটুকুর জন্যে এখন ওঠার কথা বলছেন।

তরঙ্গিণী আর বিনোকে দেখা গেল। পুঁটির কাছে শুনে পথ অবধি এগিয়ে পড়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, খবরাখবর বলছেন। বাইরে বাড়ির উঠোনে গাড়ি থামিয়ে গরু দুটো খুলে গাড়োয়ান সুপারিগাছে বাঁধল। অটলের হাত থেকে কলকেটা নিয়ে ফক-ফক করে টানছে। দেখতে দেখতে বেশ একটু ভিড় জমে উঠল, এবাড়ি ওবাড়ি থেকে দু-পাঁচজন এসে পড়লেন। বউ কেমন হল, ও কেষ্টর মা? দিয়েছে-থুয়েছে কি? নতুন বউ বাপের বাড়ি রওনা করে দিয়ে এলে, আমাদের একটু দেখালে না?

উঠানে এত লোক—ভবনাথকে কেবল দেখা যায় না। বাড়িতেই আছেন তিনি—দক্ষিণের-কোঠার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে জমাখরচের হিসাব দেখছেন। হিসাব বোধকরি সাতিশয় জরুরি—নয়তো উঠোনে এত লোকের কথাবার্তা, একটিও তাঁর কানে ঢোকে না?

উমাসুন্দরী একটা নিশ্বাস চেপে নিলেন। দুর্গোৎসবের ব্যাপারে সেবারে সারাটা গ্রাম নিয়ে কী মাতামাতি—আর বাড়ির ছেলে হিরু, ছোটবাবু যাকে চোখে হারাতেন—ছেলেটার বিয়ে হল, কুটুম্বর পাতে একমুঠো ভাত পড়ল

না। বাড়িতে একটা ঢোলের কাঠি পড়ল না। কপাল—তা ছাড়া আর কি বলা যায়।

কৈফিয়তের মতন সকলকে বলছেন, একফোঁটা কনে—বাপ-মা, ভাই-বোন ছেড়ে কদ্দিন থাকবে, সেইজন্য পাঠিয়ে দিয়ে এলাম। ঠাকুরপো বোশেখমাসে বাড়ি আসবে। নতুন বউ তখন নিয়ে আসব। নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ আমোদ-আহ্লাদ সমস্ত তখন।

কমলের সবুর সয় না, বীরত্বের খবরটা পুঁটিকে সকলের আগে দিচ্ছে: তুই ছিলি নে দিদি—একা একা আমি কোথায় চলে গিয়েছিলাম।

চোখ বড় বড় করে পুঁটি বলে, কোথায় রে? বল্ না কোথায়।

অনেক দূর। বলবি নে কাউকে?

না, কক্ষনো না। দিব্যিদিলেশা করছে পুঁটি: ঘরের মধ্যে এই বন্ধন-তলায় বসে বলছি, বলব না।

তখন কমল সন্তর্পণে গুপ্তকথা ব্যক্ত করে। বাঁকা-তালগাছ ছাড়িয়ে মরগার উপর দিয়ে পুঁটিদের গরুর-গাড়ি গিয়েছিল—একলা কমল আড়াআড়ি বিল ভেঙে একদিন সেই অবধি গিয়ে পড়েছিল আর কি, প্রায় রাস্তা অবধি।

পুঁটি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে: ঐ বুঝি অনেক দূর হল। রাস্তা অবধিও যাসনি, তাই আবার জাঁক করে বলছিস? খোকন যেন কী—আমি ভাবলাম, না-জানি কোন দূর-দূরন্তর জায়গা।

হাসির তোড়ে কমল দিশা করতে পারে না। বলে, উঠতাম ঠিক রাস্তায় গিয়ে। তা ভাবলাম, তোকে না নিয়ে একা-একা গেলে ফিরে এসে তুই দুঃখ করবি।

পুঁটি তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, দুঃখ করব? আমি বলে কত কত গাঁ-গ্রামের কত শত রাস্তা ঘুরে এলাম—

কমল বলে, গরুর-গাড়িতে বসে সবাই অমন ঘুরতে পারে। হেঁটে তো যাসনি।

পুঁটি হাত-মুখ নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে বলে যাচ্ছে, মরগার ঐ রাস্তা তো ঘরের দুয়োরে। সে কত দূর! যাচ্ছি, যাচ্ছি যাচ্ছি—গুয়োতলি আর আসে না। সূর্যি ডুবে গেল, চাঁদ উঠল—গুয়োতলি আসে না। কত ঘরবাড়ি গরু-বাছুর বিল মাঠ—গুয়োতলি আসেই না মোটে।

কমলও বুঝি মনে মনে গরুর গাড়ি চেপে দিদির সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে বসে গুয়োতলি যাচ্ছে। যাচ্ছে যাচ্ছে—কতক্ষণ ধরে যাচ্ছে, যাওয়ার শেষ হয় না। পৃথিবীর একেবারে শেষ মুড়োয় গুয়োতলি—আশ্চর্য সে জায়গা।

আশ্চর্য, সন্দেহ কি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কমল জিজ্ঞাসা করে। দিনের পর দিন শুনে যাচ্ছে—গুয়াতলির গল্পের তবু শেষ নেই। একদিকে গাঙ—সেই গাঙ থেকে খাল বেরিয়ে গাঁখানার মাঝ বরাবর চিরে দু'খণ্ড করেছে। গাঙ যেমন, খালও তেমনি—হোগলাবন কচুরিপানা আর হিঞ্চে-কলমির দামে জল দেখবার উপায় নেই। কচুরিপানা বলে, আবার কেউটেফণাও বলে—কেউটেসাপে যেন ফণা তুলে উঠেছে, দেখতে সেইরকম। ফণার মতন সতেজ সবুজ পাতা, ফুল ফুটে তার মধ্যে শোভা করে থাকে।

কমল গাঙ দেখেনি। বিলের মধ্যে খাল আছে কয়েকটা—মণির-খাল হন্যের খাল, আশাননগরের-খাল—হামেশাই নাম শোনা যায়। বাড়ির নিচে বিল হলেও এত খালের একটাও তার চোখে দেখা নেই। গুয়াতলি গিয়ে পুঁটি তো বহুদর্শিনী হয়ে গিয়েছে—অবোধ শিশু-ভাইটিকে সে গাঙ-খালের বিষয়ে জ্ঞানদান করে। গাঙ-খালের মুড়োদাঁড়া নেই—খানিকটা গিয়ে যে একেবারে শেষ হয়ে গেল, শেষ অবধি পায়ে হেঁটে তুমি উল্টো পাড়ে চলে গেলে, যে জিনিষ হবার জো নেই।

তবে?

সাঁতার কেটে পার হয় লোকে। গুয়োতলিতে তা-ও মুশকিল—শেওলা ও জঙ্গলের ভিতরে সাঁতরানো চাট্টিখানি কথা নয়। মাঝমধ্যে সাঁকো আছে—মানে এপারে-ওপারে বাঁশ ফেলা। বাঁশের উপরে পা টিপেটিপে মানুষে চলাচল করে—পা সরে গেছে কি ঝুপ করে নিচে গিয়ে পড়বে।

কমল সভয়ে বলল, ওরে বাবা!

খালের এপারে আর ওপারে খানিক খানিক জায়গায় দাম কেটে সাফ-সাফাই করে ঘাট বানিয়ে নিয়েছে। চান করে লোকে, বাসন মাজে, কলসি ভরে জল নিয়ে যায়। এপারের ঘাটে ওপারের ঘাটে কথাবার্তা গল্পসল্প কথা-কাটাকাটি এমন কি ঝগড়াঝাটিও হয় কখনো-সখনো। কিন্তু যা হবার দূরে দূরেই হল—কাছাকাছি হতে পারছে না বলে ঝগড়ার খুব একটা জোর বাঁধে না।

কমল হেসেই খুন। একজন এখানে এই পারে, আর একজন ওই সেখানে—কাছে যেতে পারে না, হাঁক পেড়ে তাই গল্প করছে। ভারি মজা তো!

গড় বলে এক জলা জায়গা—দীর্ঘ, দূরব্যাপ্ত। কোন এক রাজার রাজ-বাড়ি ছিল, রাজবাড়ি ঘিরে গড়। গড়ের পাশে উঁচু ঢিবি ও জঙ্গল—লোকে রাজবাড়ি বলে দেখায়। মেলা মাছ পড়ে ঐ গড়ে, খাল-বিল থেকে এসে জমে। ভূদেব মজুমদারের জায়গা ওটা, জেলেরা জমা নিয়েছে। মজুমদার-

বাড়ি নিত্যিদিন খাবার মাছ দেবার চুক্তি। খালুই নিয়ে গোমস্তামশাই যান, সেই সঙ্গে পুঁটিও যেত। হাপরে মাছ জিয়ানো—হাপর ডাঙায় তুলে ধরলে মাছ খলবল করত, সে বড় দেখতে মজা। জেলে বলত, কি মাছ খাবা খুকি-ঠাকরুন? পুঁটি আঙুল দেখিয়ে বলত, ঐটা, ঐটা—উঁহু, চ্যাংমাছ কে খাবে, ওদিককার উই বড় কইটা—

মেলা টিয়াপাখি, বিশেষ করে রাজবাড়ির জঙ্গলে গাছপালায়। এখানে যেমন কোয়েল-শালিক, গুয়াতলিতে টিয়াপাখি তেমনি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়, গাছে বসে, মাটির উপরেও বসে। গড়ের ধারে বেদেরা এসে টোল ফেলেছিল। মেলা ভুবুভুবু—মেয়েমদ্দ ছেলেপুলে ঘোড়া-খচ্চর ছাগল-মুরগি এক-পাল এসে পড়ল। মানুষরা এলো কতক পায়ে হেঁটে, কতক-বা ঘোড়ার পিঠে। গৃহস্থালীর জিনিসপত্র সঙ্গে এনেছে—যায় ঘর-ছাওয়া হোগলা অবধি। সকালবেলা দেখা গেল, হোগলার এক এক কুঁড়ি তুলে পুরোদস্তুর পাড়া জমিয়ে নিয়েছে। গাছতলায় উনুন ধরাচ্চে, নাওয়া-ধোওয়া করছে গড়ের জলে। আরও বেলায় মেয়েরা পাড়ায় ঢুকে 'বাত ভালো-ও-ও—' বলে হাঁক পাড়ছে: বাত ভাল করতে পারি, দাঁতের পোকা বের করতে পারি। হরেক ব্যাধির চিকিৎসা পুরোনো কাপড় কিম্বা দুটো-চারটে পয়সার বিনিময়ে। পুরুষরাও বেরিয়ে 'ভানুমতীর খেলা' অর্থাৎ ম্যাজিক দেখাচ্ছে। আর পাখি ধরছে নলের মুখে আঠা লাগিয়ে। টিয়াপাখি ধরে ধরে তারের খাঁচায় পুরছে। কত যে ধরল, লেখাজোখা নেই। টিয়া ধরার মতলব নিয়েই বেছে বেছে এইখানেই আস্তানা নিয়েছে—গুয়াতলির মানুষ বলাবলি করে।

না গিয়েও কমল গুয়াতলি গ্রামটা চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে—এমনি-ধারা পুঁটির গল্পের গুণ। গাঙের কিনারে প্রাচীন বটগাছ—ঝুরিগুলো হুবহু মুনি-ঋষির জটাজালের মতো। কালীমন্দির সেখানে। মন্দিরের পাকা চাতালে ভস্মমাখা ত্রিশূলধারী লম্বাচওড়া দশাসই এক সাধুপুরুষ থাকেন। লাল-টকটকে বড় বড় চোখ। নিশিরাত্রে মা-কালীর বিগ্রহ নাকি কথাবার্তা বলেন তাঁর সঙ্গে। বাড়িসুদ্ধ একদিন সবাই সাধুর কাছে গিয়েছিলেন—নতুন বউ ছিল, পুঁটিও ছিল। পুঁটির দিকে সাধু তাকিয়ে পড়লেন, ভয় পেয়ে পুঁটি ছিটকে সকলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

কমল তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, ধুস, কী তুই, আমি হলে সাধুর একেবারে কাছে চলে গিয়ে বর চাইতাম।

পুঁটি প্রশ্ন করে: কী বর চাইতিস?

মুহূর্তমাত্র না ভেবে কমল বলল, একটা টিয়াপাখি চাইতাম—দিদি খাঁচায়

যে গায়ের উপর বসে থাকবে, উড়ে পালাবে না।

পুঁটি এক তাজ্জব বস্তু দেখেছে, যার নাম রেলগাড়ি। চোখে ঠিক না দেখলেও নতুন বউয়ের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত শুনেছে যে, সে একরকম দেখা-ই। গুয়াতলি থেকে ক্রোশ দুই দূরে রূপদিয়া নামে স্টেশন। সেখানে লোহার পাটির উপর দিয়ে রেলগাড়ি আসে আর যায় দিনে-রাত্রে অনেক বার। আওয়াজ গুয়াতলির বাড়ি থেকেই স্পষ্ট কানে পাওয়া যায়। তাই-বা কেন, হৃদয় মামাদের ছাতে উঠে ধোঁয়ার কুণ্ডলীও দেখে এসেছে—এই এখানটা ধোঁয়া, কতদূর গিয়ে আবার ধোঁয়া, আরও খানিকটা গিয়ে আবার। রাত-দুপুরে একটা গাড়ি আসে। জেঠিমার কোলের মধ্যে শুয়ে পুঁটির ঘুম ভেঙে যেত এক-এক রাত্রে। যেন এক দঙ্গল দৈত্য রেগে বেরিয়ে পড়ে চতুর্দিক লণ্ড-ভণ্ড করে বেড়াচ্ছে। সে কী ভয়ানক আওয়াজ রে খোকন! কাঁপুনি লাগত, জেঠিমাকে এঁটেসেঁটে ধরতাম। কলের ব্যাপার তো কিছু বলবার জো নেই। হয়তো বা ইস্ক্রুপ-টুরুপ খুলে লাইন ভেঙে মজুমদার-বাড়ি এসে পড়ে সবসুদ্ধ চুরমার করে দিয়ে গেল। রক্ষা এই, আওয়াজটা বেশিক্ষণ থাকত না। গাড়ি চলে গিয়ে আবার সব ঝিমিয়ে পড়ে। ঝিঁঝিঁ ডাকে, তক্ষক ডাকে।

রেলগাড়ি বস্তুটা কমলও জানে। 'পদ্যপাঠে' পড়েছে। 'ছয় দণ্ডে চলে যায় ছ'মাসের পথ—'। কিন্তু বইয়ে পড়াই শুধু, তার অধিক কিছু নয়। নতুন বউ, সেজবৌদি হয়েছেন যিনি, তাঁর কী কপাল-জোর! রেলগাড়ি চক্ষের পলকে তাঁকে রূপদিয়া স্টেশনে এনে নামিয়ে দিয়েছিল। আর দিদিটাও খুব যে কম যায়, তা নয়—আস্ত রেলগাড়ি চোখে না দেখুক, ধোঁয়া দেখেছে, দিনমানে ও রাত্রে গাড়ির গর্জন শুনেছে।

পুঁটি বলল, সেজবৌদির নাম সরসীবালা। খাসা নাম—না রে? মানুষটাও খুব ভাল। খুব আস্তে আস্তে বলে ফিসফিস করে। গায়ের উপর বসেও সব কথা শুনতে পাইনে, জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়। তোর কথা জিজ্ঞাসা করত, এ-বাড়ির সকলের কথা জিজ্ঞাসা করত। তোকে বলত ঠাকুরপো—হি-হি-হি, তুই খোকন ঠাকুরপো হয়ে গেছিস।

এতগুলো দিন শ্বশুরবাড়ি ছাড়া। এসে পড়েছে তো আর দেরি করে! ফুলবেড়ে আজই যাবে, কালীময় ধরল। ফসল ওঠার সময় জামাই বিনে একলা শাশুড়িঠাকরুন চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। বর্গাদার পুকুরচুরি করছে।

উমাসুন্দরী বলেন, পথঘাট ভাল না। যাবি তো পড়ে পড়ে ঘুমোলি কেন সন্ধ্যে অবধি?

ভোর থাকতে বেরিয়েছি, ঘুমের কি দোষ মা ?

কথা কানে না নিয়ে ম্যাচ-ম্যাচ করে সে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গীও জুটে গেল—অম্বিক দত্ত। অম্বিকের আদিবাড়ি ফুলবেড়ে—জ্ঞাতিভাইরা আছে এবং সামান্য জমাজমি। বাদাবনে এইবার পাঠশালা খোলার মরশুম—ছ-সাত মাসের মতো অম্বিক চাকরিতে বেরুবেন, তৎপূর্বে জমাজমি সম্পর্কে ভাইদের কিছু বলে যেতে চান।

সুমুখ-আঁধার রাত্রি, বাদবনে আচ্ছন্ন সুঁড়িপথ। হেন অবস্থায় হাতে লাঠি চাই, এবং অপর হাতে লণ্ঠন যদি থাকে তো খুবই ভাল—এই বিলাসিতা অবশ্য সকলের ট্যাঁকে কুলোয় না। আর চাই মুখের সশব্দ কথাবার্তা। আজকে মূর্তিমান একটি দোসর রয়েছে। কিছু সঙ্গী না থাকলেও একা একা মুখ চালাতে হবে—সাপটাপ সরে যাবে পথ থেকে, ঘাড়ে পা পড়ার সম্ভাবনা কমবে।

কথাবার্তা চলছে। হিরুর বিয়েই আজকের বড় কথা। অম্বিকের অনুযোগ : ভাইয়ের বিয়ের নিজে গিয়ে তো সেঁটে এলে, গ্রামের কেউ জানতে পারল না। একমুঠো ভাত পড়ল না কারো পাতে।

ঘোড়ার ডিম। সেঁটেছি না আরো-কিছু ?

কালীময়ের ব্যথাটা ঠিক এখানে। বিয়ের সব অনুষ্ঠান নিখুঁত হল, খাওয়ার ব্যাপারে গণ্ডগোল। শুরু থেকেই। বর যাচ্ছে বরযাত্রীর দল সঙ্গে নিয়ে—সেই পথের উপর থেকেই। সবিস্তারে কালীময় বলতে বলতে যাচ্ছে :

গুয়াতলি থেকে দু'ক্রোশ গিয়ে রেলস্টেশন। ঝঞ্ঝাটের পথ। বরের কিছু নয়—সে তো পালকির মধ্যে গ্যাঁট হয়ে পড়ে আছে। মরতে মরণ বরযাত্রীগুলোর—খানাখন্দ বনজঙ্গল আর মাঠ ভেঙে চলেছে। বুড়োমানুষ ছেলেমানুষ জনা দশেক দলের মধ্যে—টিগটিগ করে যাচ্ছে তারা, যাচ্ছে কি যাচ্ছে-না—তাদের ফেলে এগোনো যায় না। স্টেশনে এসে দেখা গেল, পয়লা ঘণ্টা পড়ে গেছে—পান-টানের উপরে সেখানে কিছু হয়ে উঠল না। এতগুলো নিয়ে গাড়িতে ওঠা, আবার ঝিকরগাছা-ঘাট স্টেশনে দেখেশুনে গোণাগুণতি করে নামিয়ে নেওয়া—গায়ে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। ঝিকরগাছা থেকে নৌকো—নৌকোর ব্যবস্থা মেয়েওয়ালাদের। মাঝি তাড়াচ্ছে তাড়াতাড়ি উঠে পড়বার জন্য। সন্ধ্যার মুখে বর-বরযাত্রী গ্রামের ঘাটে হাজির করে দেবার কথা—গড়িমসি করলে সেটা সম্ভব হবে না। এমন কি লগ্ন ফসকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ভাবা গিয়েছিল, রেঁধেবেড়ে মজা করে খাওয়া যাবে ঝিকরগাছায়। সেখানকার দোকানে দোকানে ব্যবস্থা আছে, উনুন রান্নার-কাঠ কোন-কিছুর

অসুবিধা নেই, বাসনকোসন ভাড়া পাওয়া যায়, বাটনা-বাটা জল তোলার বাবদে ঝি-ও প্রচুর মেলে। কিন্তু সময়ে কুলোচ্ছে কই? অগত্যা কালীময় অন্নপূর্ণা হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলল। বত্রিশ জনে খাবে, ফাস্টো-ক্লাসের খাওয়া দিতে হবে—রেট বাড়িয়ে জন-প্রতি সিকি সিকি, বত্রিশজনে আট টাকা।

বলতে বলতে কালীময় যেন ক্ষেপে যায়। হোটেলের সেই দুর্ভোগ মনে উঠে অন্তরাত্মা জ্বালা করে। নরভক্ষী রাক্ষস পুরো একগণ্ডা জুটেছিল তাদের বরযাত্রিদলে। সেকেলের ডাকসাইটে খাইয়ে রঘুবর—মুগকে-রঘুবর যাঁকে বলত—ভাতব্যঞ্জনে দৈনিক যিনি মণের কাছাকাছি টানতেন—তাঁরই সাক্ষাৎ-নাতি ঋষিবর যাচ্ছে। এবং ঋষিবরের স্যাঙাত আরও তিনটে। কেউ কম যায় না—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। হোটেল-ওয়ালার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে—ক্ষিধেয় ওদিকে ঋষিবরের নাকি মাথা ঘুরতে লেগেছে। চারটে পিঁড়ি পাশাপাশি নিজেরাই ফেলে—অমন কবুতরের চোখের মতন কপোতাক্ষের জল, তাতে একটা ডুব দিয়ে আসারও সবুর সইল না—পিঁড়িতে বসে হাঁক পাড়তে লেগেছে: ভাত নিয়ে এসো ও ঠাকুর—

ঋষিবরের ঠাকুরদা রঘুবর। রঘুবরের নামে লোকে আজও ধন্য-ধন্য করে। খাওয়া দেখিয়ে রাজগঞ্জের জমিদারমশায়ের কাছ থেকে মোটা পারিতোষিক আদায় করেছিলেন তিনি। বাড়ি এসে সেই টাকায় জাঁকিয়ে দুর্গোৎসব করলেন। দেনার দায়ে একবার রঘুবরের দেওয়ানি-জেল হল। দেওয়ানি-জেলের নিয়ম—থাকে বটে সরকারি জেলখানায়, কিন্তু খোরাকি-খরচা বাদীকে দিতে হয়। একআনা করে সাধারণ একবেলার বরাদ্দ। রঘুবর আপত্তি করে জানালেন, এক আনায় কি হবে—বিদেনপক্ষে এক টাকা। সাহেব-কালেক্টর অবাক হয়ে বললেন, মাত্র দু'বেলায় পারবে একা টাকা খেতে? রঘুবর বললেন, দিয়ে দেখুন। দারোগা নিজে সঙ্গে গেলেন রঘুবরের বাজার করার সময়। চাল কেনা হল পাঁচ সের, দু-সের ডাল, দুটো রুইমাছ—ওজন সের পাঁচেক করে দাঁড়াবে—

সাহেব খাওয়া দেখতে এসেছেন—কড়মড় করে রুইয়ের মুড়ো চিবানোর ভঙ্গি দেখে তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে পালালেন। ডিক্রিদার গতিক বুঝে মামলা তুলে নিল—এই পরিমাণ খোরাকি দিয়ে নিজেই সে ফতুর হয়ে যাবে। রঘুবর মুক্ত।

এ হেন ঠাকুরদাদার উপযুক্ত নাতি ঝিকরগাছার অন্নপূর্ণা হোটেলে আহারে বসে গেছে। রসুইঠাকুর ভাত ঢালতেই পাতা খালি। হোটেলের লোকজন

কাজকর্ম ফেলে হাঁ করে দেখছে। মালিক যথারীতি ছোট-তক্তাপোশে হাত-বাক্সের সামনে বসে খদ্দেরদের পানের খিলি দেওয়া ও পয়সা-কড়ি গুণে নেওয়ার কাজে ছিলেন। ঝি ছুটে এসে বলল, খাবার-ঘরে আসুন একবার কর্তা, দেখে যান।

মালিক বলে, দেখব আবার কি? কেউ কম খায়, কেউ চাট্টি বেশি খায়। পেট চাড়া তো ঢাকাই-জালা নয়—কত আর খাবে? পেট চুক্তি যখন, দিয়ে যেতে হবে। ওসব নিয়ে বলবিনে কিছু তোরা, হোটেলের নিন্দে হবে।

ঝি বলল, ঢাকাই-জালাই ঠিক—একটুও কম নয়। চারজনে পাশাপাশি বসে গেছে। দেখবারই জিনিস—চোখ মেলে একবার দেখে যান, তারপর বলবেন। হাঁড়িতে ষোলজনের ভাত—পুরো হাঁড়ি কাবার করে এখনো 'দাও' 'দাও' করছে।

সর্বনেশে কথা। মালিক ছুটল। ফিরে এসে কালীময়ের কাছে হাতজোড় করে: রক্ষে করুন মশায়। যা হবার হয়েছে—আর কেউ খাবেন না আমার অন্নপূর্ণা হোটেলে: আরও আঠাশজন বসলে ব্যবসা গনেশ উলটাবে—ছা-পোষা মানুষ মারা পড়ব একেবারে। ঐ চারজনের পয়সা দিতে হবে না। ভালয় ভালয় বিদেয় হয়ে যান। তবু জানব, ভস্মের উপর দিয়ে গেল।

কালীময় বিস্তর বোঝানোর চেষ্টা করে: ঘাবড়াচ্ছেন কেন, সবাই কি আর ঋষিবর? রেট চার আনার জায়গায় না-হয় ছ-আনা হিসাবে দেওয়া যাবে।

কোন প্রস্তাব হোটেলওয়ালা কানে নেবে না। হাত জড়িয়ে ধরেছে, হাত ছেড়ে দিয়ে পা ধরতে যায়। কালীময় অগত্যা অন্য হোটেলের খোঁজে ছুটল। কিন্তু ছোট গঞ্জ ঝিকরগাছা—ভোজনের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যে সর্বত্র চাউর হয়ে গেছে। কোনো হোটেল রাজি নয়। বিস্তর সময় ক্ষেপ হয়ে গেছে—রাঁধাবাড়া আগে যদিই বা সম্ভব ছিল, এখন আর উপায় নেই: কিছু চিঁড়ে-বাতাসা কিনে নৌকোয় উঠে পড়ল, সারা দিনমান ঐ চিঁড়ে চিবিয়ে ও নদীর জল খেয়ে কাটল। সবাই ঋষিবরকে দোষে, এদেরই জন্যে এতগুলো লোক উপোসি যাচ্ছে। মুখপাতে কেন ওরা বসতে যায়, উচিত ছিল সকলের খাওয়াদাওয়া চুকে যাবার পর সর্বশেষে বসা। হোটেলওয়ালার তখন আর প্রতিহিংসা নেবার উপায় থাকত না।

সন্ধ্যাবেলা নৌকো গিয়ে পৌঁছল। মেয়েওয়ালারা পালকি-বেহারা বাজি-বাজনা মজুত রেখেছে। ঘাটে নামতে না নামতেই তোলপাড় পড়ে যায়। বিয়েবাড়ি সামান্য দূর, দালানকোঠা নজরে আসছে। কিন্তু টুক করে যে উঠে পড়বে, সেটি হচ্ছে না। সারাটা দিন বলতে গেলে কাঠ-কাঠ

উপোস গেছে। ক্ষিধের নাড়ি পট-পট করছে—তাহলেও জন্নাটের মানুষকে দেখানোর জন্য আয়োজন, বাড়ি উঠলেন তো ইজ্জি পড়ে গেল। তিন তিনটে গ্রাম পুরোদস্তুর চক্কোর দেওয়াল ঘন্টা তিনেক ধরে—ঢোল-কাঁশি-সানাই বাজিয়ে, গেঁটেবন্দুক ফুটিয়ে, হাউইবাজি আকাশে তুলে। নারকেল-তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে মশাল বানানো—বরযাত্রী, কন্যাযাত্রীদের হাতে হাতে সেই মশাল। চতুর্দিক একেবারে দিনমান করে ফেলল।

কমল এতদিন একলা ছিল, সন্ধ্যার দিকে বড় কাউকে পাওয়া যেত না। মেয়েগুলো বলত, একফোঁটা ছেলে—তোর সঙ্গে আবার খেলা! সমবয়সি ছেলেদের মধ্যেও ভালছেলে বলে কমলের বদনাম। উপর থেকেও নিষেধ—পটলার বাপ একদিন তো ছেলের কান টেনে ঠাঁই-ঠাঁই করে চড়: গাছবাঁদর তোর কিছু হবে না—কিন্তু যার হবে, তার ঘাড়ে কি জন্য গিয়ে লাগিস?

পুঁটি আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই আগেকার মতো চারি সুরি বেউলো ফুন্টি, টুনি সবাই আসতে লেগেছে। সন্ধ্যার আগে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসে। মেয়েই প্রায় সব—নিরীহ ছোটছেলে দু-একটা নেওয়া যেতে পারে। পদা-জল্লাদ-রাখাল ইত্যাদির মতো দুরন্ত ও ধেড়ে ছেলে কদাপি নয়। ধান উঠেছে বলে উঠোন লেপেপুঁছে দেবমন্দিরের মতো করেছে, ঘাসের একটুকু অঙ্কুর দেখলে খুঁটে তুলে ফেলে দেয়।

খেলার তাই বড্ড জুত। পুববাড়ির দুই শরিক—উত্তরের অংশ বংশীধরের, দক্ষিণের অংশ ভবনাথের। খেলার ব্যাপারে কিন্তু শরিকি ভাগাভাগি নেই। কুমীর-কুমীর খেলা। দুই উঠোন জুড়েই জল। চারিদিককার ঘর-দুয়োর দাওয়া-পৈঠা সমস্ত ডাঙা। কুমীর হয়ে একজন সারা উঠোনে চক্কোর দিচ্ছে। অন্য সবাই মানুষ। এ-ঘরের দাওয়া থেকে ও-ঘরের দাওয়ায় যাবে উঠোন-রূপ গাঙ পার হয়ে। সেই উঠোন-গাঙে শিকার ধরবার জন্য কুমীর হন্তদন্ত হয়ে ঘুরছে। যাচ্ছে মানুষ মাঝ-উঠোন দিয়ে দু-হাত নেড়ে সাঁতারের ভঙ্গিতে—গাঙের এপারের ঘাট থেকে ওপারের ঘাটে যাচ্ছে যেন। মাঝেমধ্যে মুখে মুখে বলছে ঝাপুস-ঝুপুস, অর্থাৎ গাঙের গভীর স্রোতে মনের সুখে ডুব দিচ্ছে। কুমীরও আছে তক্কে তক্কে—ওকে খানিক তাড়া করল, কিন্তু আসল তাক একটার উপরে—আড়চোখে লক্ষ্য রাখছে। একদৌড়ে হঠাৎ তার কাছে গিয়ে চড়াৎ করে পিঠে এক থাপ্পড়। কুমীর যে ছিল সঙ্গে সঙ্গে সে মানুষ, আর যাকে মারল সে কুমীর হয়ে গেল।

কোনদিন বা কানামাছি-খেলা। কাপড়ের মুড়োয় আচ্ছা করে চোখ

বেঁধে একজনকে উঠানে ছেড়ে দিল। চোখ-ঢাকা কানামাছি সে। কাছাকাছিই সব—দূরে কেউ যাবে না। নিয়ম তাই। আন্দাজে একমুখো দৌড়ে কোন একজনকে ধরেই কানামাছি নাম বলে দেবে। বলা ঠিক হল তো তারই এবার চোখ বাঁধবে। আগের জন চোখের বাঁধন খুলে ফেলল।

বাপের-বাড়ি যাবার সময়ে উমাসুন্দরী সুমুখ-উঠানে কিছু ধানের পালা দেখে গিয়েছিলেন। আগাম ফলন সে-সব ধানের। এবার সুমুখ পিছন সব উঠানেই ধান এসে পড়ছে। কি বছরই আসে এই রকম—শুয়াতলিতে ভাইয়ের কাছে এই জন্য তাঁর সোয়াস্তি ছিল না। মাঠ ছেড়ে আঙিনার উপর মা লক্ষ্মীর শুভ আগমন—হেন সময় বাড়ির গিন্নি গরহাজির কেমন করে থাকবেন?

ধান কাটার পুরো মরশুম। জনমজুরের দুনো তেদুনো দাম—কোন কোন অঞ্চলে এমন কি পুরো টাকা অবধি উঠে গেছে। ঝাঁটপাট দেওয়া নিত্যি সকালে গোবরমাটি-নিকানো ঝকঝকে তকতকে উঠান। উঠানে তিলার্ধ জায়গা আর খালি থাকছে না। সারা দিনমান বিলে মাঠে ধান কাটে, সন্ধ্যাবেলা বাঁকে বয়ে আঁটি এনে ফেলে। আদুরে ছেলেপুলে কাঁধে তুলে নাচায় না—তেমনি ঢঙে বাঁকের এ-মাথায় আর ও-মাথায় আঁটিগুলো নাচাতে নাচাতে নিয়ে আসে। কাঁচাধানের সোঁদা-সোঁদা গন্ধ—গ্রামের সুঁড়িপথ ধরে আসে, চারিদিক গন্ধে আমোদ করে দেয়, নাক টেনে টেনে সেই গন্ধ বেশি করে নিতে ইচ্ছে করে।

ধান কাটার আরও জোর এবারে। পাকাধান ক্ষেতের কাদামাটিতে ঝরে লোকসান না ঘটে। লোক লাগানো হল বেশি—অনেক বেশি। আঁটি বওয়া এখন আর বাঁকে কুলোয় না, গরুর-গাড়ি বোঝাই হয়ে বিল থেকে আসছে। মাঝবিলে এখনও জল। কাদায় পড়লে চাকা বসে যায়, গরুতে টেনে পারে না তো মানুষ টেনে আনে ধানের গাড়ি। গ্রামপথে বোঝাই গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ—পারিনে আর বোঝা বয়ে, আর পারিনে, আর পারিনে—এমনিতরো যেন আর্তনাদ। উঠোনের উপরে এসে বোঝা খালাস। আঁটির পর আঁটি পড়ে একদিকে গাদা হয়ে যায়। এর পরে পালা সাজানো। গোল করে সাজিয়ে যাচ্ছে, মাটি থেকে উঁচু হয়ে উঠছে ক্রমশ। একজন পালার উপর, আর, একজন ধানের আঁটি সেখানে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

বেশ রাত হয়েছে। টেমি জ্বলছে দাওয়ায়। গল-গল করে ধোঁয়াই উঠছে, আলো আছে কি নেই। জোনাকি উড়ছে, আকাশে তারা। বিলের হাওয়া আসছে, হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। ভাই-বোনে এক পিঁড়িতে—কম্বলের দোলাইখানা

ছু'কলেই গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। খাসা ওম লাগছে। হাট করে রান্নাঘরের দাওয়ায় হাটবেসাতি এনে নামল। কাজকর্মের বড় ধুম—মাছ কোটা-বাছা, তরিতরকারি কোটা। আর ভাই-বোনে এদিকে দোলাই গায়ে জড়িয়ে মগ্ন হয়ে ধানের পালা দেওয়া দেখছে। সন্ধ্যায় নিজেরা খেলাধুলা করবে—এ যেন চাষীদের আলাদা খেলা। খেলা দেখতেও মজা। শিশুবর কি অটল তামাক খেতে খেতে এসে কলকে বাড়িয়ে ধরছে: দু-টান টেনে নাও গো, জাড়ের ভাবটা কেটে যাবে। কলকে টানতে টানতে গগন সর্দার বলে, গায়ের ঘাম মরে গেছে, তা বলে জাড় তো পাচ্ছিনে। অটল বলে, কাজে আছ বলে টের পাচ্ছ না। বাড়ি যাবার সময় ঠেলা বুঝবে।

হাই উঠছে ভাই-বোনের। তারপরে এক সময় গিয়ে বিছানায় পড়ে। তরঙ্গিণীর বিছানায় ঘুমিয়ে জড়াজড়ি হয়ে আছে। রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে সবাই শুতে এলেন—ঘুমন্ত পুঁটিকে খানিকটা জাগিয়ে তুলে দুই ডানা ধরে উমাসুন্দরী নিজের ঘরে নিয়ে যাবেন। কোন দিন হয়তো পুঁটির বড় বেশী ঘুম ধরেছে—তুলে ধরছেন, গড়িয়ে পড়ছে আবার সঙ্গে সঙ্গে। উমাসুন্দরীর করুণা হল: মেয়ে আজ তোমার এখানে থাক ছোটবউ। ছোটবউ তরঙ্গিণীর কিছু আপত্তি: আমার এখানে কেন আবার দিদি? খোকার শোওয়া খারাপ। ঘাড়ের উপর ঠ্যাং চাপিয়ে দেবে, রাত দুপুরে শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ বেধে যাবে।

ঘুমন্ত মেয়ের এলিয়ে-পড়া অসহায় করুণ মুখের দিকে চেয়ে উমাসুন্দরী চটেমটে উঠলেন: কেটে দিচ্ছ কেন? এই অবস্থায় টেনে নিয়ে যাই কেমন করে? পেটে জায়গা দিয়েছ, একটা রাত পাশে একটু জায়গা দিতে পারবে না?

কিন্তু আরও যে আছে। উমাসুন্দরী নিজেই সারারাত এপাশ-ওপাশ করবেন, কোল খালি-খালি ঠেকবে। তরঙ্গিণীর সেটা ভাল-মতন জানা। হাসলেন তিনি, জায়ের কথার উপরে সেদিন কিছু বললেন না। সরে-টরে রইলেনও উমাসুন্দরী—কিন্তু মেয়ে ঘুমের মধ্যে ঠাহর পেয়েছে, জেঠিমা নেই। বায়না ধরল: দিয়ে এসো জেঠিমার কাছে। হবেই দিতে, নয়তো কেঁদেকেটে অনর্থ করবে। তরঙ্গিণী তখনকার বকুনির শোধ নিলেন: বলেছিলাম না দিদি?

মেয়ের রকম-সকম দেখে উমাসুন্দরী হাসেন। তরঙ্গিণী বললেন, ঘুমিয়ে পড়ুক আর যাই হোক, তোমার সোহাগী মেয়ে তুমি নিজের কাছে নিয়ে রেখে। রাত দুপুরে আমি ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারব না।

॥ ত্রিশ ॥

অম্বিক দত্ত চাকরিতে চললেন। ধান-চাল উঠেছে—সারা অঞ্চলের লোকের হাতে-গাঁটে পয়সা, মনে স্ফূর্তি। ভদ্রসমাজে যা চলে, সে সমস্ত তাদেরও অল্পবিস্তর চাই বইকি। তার মধ্যে এক জিনিস হল পাঠশালা। যত্রতত্র এখন পাঠশালা বসাচ্ছে। মরশুমি পাঠশালা—জ্যৈষ্ঠ অবধি খাসা চলবে। বর্ষার সঙ্গে চাষবাসের তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে। গোলাআউড়ির ধানও ওদিকে তলায় এসে ঠেকেছে—পাঠশালা এবং ভদ্রজনোচিত অন্যান্য ব্যাপারগুলো মুলতুবি আপাতত। মা-লক্ষ্মী মেনে নেন তো সামনের শীতে আবার দেখা যাবে। সেই শীত এসে গেছে, ছাতা ও পুঁটলি বগলদাবায় নিয়ে অম্বিক রওনা দিলেন।

বয়স হয়েছে, বাদা অঞ্চলে গড়ে পড়ে নোনাজল খাবার মোটেই আর ইচ্ছে ছিল না। গ্রামে থেকে বউ-ছেলেপুলে নিয়ে সংসার-ধর্ম করবেন ভেবে-ছিলেন। সোনাখড়ি পাঠশালায় কাজটাও জুটে গিয়েছিল। দিব্যি চলছিল—নচ্ছার ইন্‌স্পেক্টর এসে সমস্ত গড়বড় করে দিল। যেতে হবে অতএব, না গেলে পেট চলবে কিসে? ছাতা ও চটিজোড়া ইতিমধ্যে তালিতুলি দিয়ে ঠিক করে নিয়েছেন। পাঁজিতে যাত্রাশুভ দেখে নিয়ে দুর্গা-দুর্গা বলে প্রহর রাতে অম্বিক ঘর থেকে যাত্রা করে বেরুলেন। মন ভারী, পা দু'টা আর চলতে চাইছে না। পা'কে এখন চলতে বলছেও না কেউ। পুবপোতার পাঁচচালা ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তরপোতার দোচালা ঘরে ওঠা—বুড়ি শাশুড়ির যে ঘরে স্থিতি। শাশুড়ি আজকের রাতের মতন পাঁচচালা ঘরে মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে শোবেন। ভোরে অম্বিক চলে যাবার পর নিজস্থানে ফিরবেন আবার।

ভোরবেলা বড় কুয়াসা। এক-হাত দূরের মানুষটাও নজরে আসে না। বুড়োথুথ্‌ড়ে শাশুড়ি কাঁপতে কাঁপতে তারই মধ্যে কোলের মেয়েটা এনে তুলে ধরলেন। এই একফোঁটা বাচ্চা বাপের বড় ন্যাওটা। সবে কথা ফুটেছে, বা-বা-বা-বা করে, অম্বিককে দেখলেই হাত বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ কোলে তুলে নাও। শাশুড়ি বাচ্চার একটি হাত অম্বিকের দিকে বাড়িয়ে দিলেন, অম্বিক একটা আঙুল মুখের ভিতর নিয়ে আলগোছে দাঁতে ঠেকালেন। দাঁতের কামড়ে মায়ার বন্ধন কেটে দিলেন যেন। এই প্রক্রিয়ার

পর বাপের আদর্শনে মেয়ের শক্ত রোগপীড়া হবার ভয়টা গেল। শীত করছে বলে অম্বিক মোটা সুতি-চাদরটা পিরহানের উপর জড়ালেন, পুঁটলি আর ছাতা বগলদাবায় নিয়ে নিলেন। পুঁটলির মধ্যে গামছা, হাতচিরুনি, অতিরিক্ত কাপড় একখানা এবং চটিজোড়া। পরনে আছে কাপড়, ফতুয়া ও পিরহান। পিরহানের পকেটে খুচরো আটআনা পয়সা। সর্ব-সাকুল্যে এই নিয়ে যাচ্ছেন। অধিক আর কিসে লাগবে, দিচ্ছেই বা কে? এই সম্বলেই, কপালে থাকলে, আষাঢ়ের গোড়ায় ফিরে আসবেন ডিঙির খোল ধানে বোঝাই করে, পিরহান ও ফতুয়ার পকেট টাকায় বোঝাই করে। নতুন নয়, এর আগেও ফিরেছেন রণজয় করে আসার মতন। তবে বয়স খানিকটা বেড়ে গেছে, এই যা। শাশুড়ির পায়ের ধুলো নিয়ে দুর্গা-দুর্গা করে অন্ধক উঠোন পার হলেন। রাস্তায় পড়ে হনহন করে চললেন। ছেলেপুলেগুলো ঘুম থেকে ওঠেনি। বউ বেড়ার উপর চোখ দিয়ে রয়েছে, না দেখেও বুঝতে পারছেন। চারক্রোশ দূরে কানাইডাঙার ঘাটে হাজির হবেন জোয়ারের জল থমথমা হবার আগেই।

এসে গেছেন ঠিকঠাক, দেরি হয়নি। বাদা অঞ্চলে সকলের বড় হাট কুমিরমারি। হাটবার কাল—সকাল থেকে সমস্ত দিন হাট চলবে। খান পনেরো হাটুরে ডিঙি ছাড়ি-ছাড়ি করছে। একহাঁটু কাদা-মাটি মেখে অম্বিক ঘাটে এসে পড়লেন: আমি যাব—

এই কানাইডাঙার ঘাট থেকে হাটুরে-নৌকোয় আরও কতবার উঠেছেন। গুরুমশায় বলে অনেকেই চেনে অম্বিককে। ডিঙিতে উঠবেন, জিজ্ঞাসাবাদের কিছু নেই—যেটায় খুশি উঠে পড়লেই হল।

হাটুরে-নৌকোয় ভাড়া বলে কিছু নেই। মালপত্র বিক্রি হয়ে যাক, একটা কিছু তখন ধরে দিও। নানান সওদা নিয়ে ব্যাপারিরা হাটে যায়—যখনকার যে জিনিস। এই এখন যেমন নিয়ে যাচ্ছে খেজুরগুড় ডালকলাই তরিতরকারি আখ তামাক ইত্যাদি। কিনে আনবে ধান। অম্বিকের মালই নেই, অতএব কিছুই লাগবে না, একেবারে মুফতে যাওয়া। তবে একটা নিয়ম, চওন্দারকে বোঠে বেয়ে দিতে হয়। অম্বিক পিছপাও নন—চাদর পিরহান ফতুয়া খুলে বোঠে হাত দিলেন। দিয়েছেনও দুটো-চারটে টান—মাঝি হয়ে পাড়ানে বসেছে, সেই লোক হাঁ-হাঁ করে উঠল: আপনি কেন? বসুন ভাল হয়ে। বিদ্বান গুরুমশায় মানুষ—বোটে মারা কি আপনার কাজ?

গলুই থেকে এক ব্যাপারি রসান দিয়ে উঠল: জানো না ভাই। বোটে মারারও গুরুমশায় উনি। এ-বিদ্যেও হাতে ধরে শিখিয়ে দিতে পারেন।

মাঝি জেদ ধরে বলছে, বোটে কেন ধরবেন আপনি গুরুমশায়—তামাক

ধরান। নিজে খান, আমাদের সকলকে একটু একটু প্রসাদ দেন।

অর্থাৎ, তামাক সাজার দায়টা অম্বিকের উপর। গাঙের কনকনে হাওয়ায় শীত ধরেছে দস্তুরমতো, চাদরে কুলোচ্ছে না। অতঃপর যতবার ইচ্ছে, খুশিমতন তামাক সেজে নেওয়া যাবে। এদের তামাক দা-কাটা—অতিশয় তলোক, গাঁজার দোসর। এ-তামাকের ধোঁয়ায়, শীত তো শীত, বাদাবনের বাঘ অবধি পালাতে দিশা পায় না। ছোট্ট ডিঙির দু-পাশ দিয়ে দশ বাবোখানা বোঠে পড়ছে সমতালে। জলে আলোড়ন। গাঙ ক্রমশ ভয়াল হয়ে উঠল। এপার-ওপার দেখা যায় না। হাটুরে-ডিঙিগুলো এক ঝাঁক পানকৌড়ির মতন জলের উপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে।

ডিঙি অনেক রাতে কুমিরমারি পৌঁছল। পূবে আর দক্ষিণে অকূল গাঙ, আর দুই দিকে আদিগন্ত আবাদ। উত্তর নদীর পাড় ঘেঁষে উঁচু ফালি জমির উপর অগণ্য চালাঘর। হপ্তার মধ্যে একটা দিন শুধু হাট। হাটের আগের রাত্রি থেকে লোক জমে। লোক চলাচলের একমাত্র উপায় নৌকো-ডিঙি— পায়ে হাঁটার পথ যৎসামান্য। গাঙের ঘাটে অতএব নৌকোয় নৌকোয় ছয়লাপ—সে এমন, একহাত জায়গা কোথাও ফাঁকা পড়ে নেই। এক নৌকোর গা ঘেঁষে অন্য নৌকো। তারপরে নৌকো আর মাটিতেই কাছি করতে পারে না, অন্য নৌকোর গুড়োয় সঙ্গে বেঁধে রাখে। সেই নৌকোর সঙ্গেও আবার অন্য নৌকো। এমনি করে করে প্রায় মাঝগাঙ অবধি নৌকোয় নৌকোয় এঁটে যায়। নামবার সময় এ-নৌকো থেকে সে-নৌকো, সেখান থেকে ও-নৌকো— নৌকো পালটে পালটে এগোয়। হাটের দিনটা এইরকম। হাট অন্তে সন্ধ্যা থেকে নৌকোরা সব ঘরমুখো ফেরে, ভিড় পাতলা হতে থাকে। পরের সকাল থেকে ঘাট শূন্য, বিশাল প্রান্তরের মধ্যে চালাগুলো খাঁ-খাঁ করে। পরের হাট না আসা অবধি একনাগাড় এইরকম রইল।

হাটুরে-ডিঙিতে ছই থাকে না—যেহেতু ছইয়ে বাতাস বেধে গতি বাধা পায়। চতুর্দিক ফাঁকা, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অম্বিকের হাড়ে হাড়ে ঠকঠকি লাগে। এক-চাদরে শীত মানায় না। অমাবস্যার কাছাকাছি সময়, কিন্তু অন্ধকার হলেও ঝাপসা ঝাপসা সবই নজরে আসে। তোলা-উনুন নৌকো থেকে উপরে তুলে নিয়ে এসেছে অনেকে, অথবা শুধুমাত্র তিনটে গোঁজা পুঁতে উনুন বানিয়েছে। উনুন ঘিরে আহারার্থীরা গোল হয়ে বসে আছে, চালটা খানিক ফুটে গেলেই পাতে পাতে ঢেলে দেবে। অম্বিকও ঘোরাঘুরি করছেন উনুনের ধারে ধারে। ভাতের জন্য নয়—গামছার মুড়োয় বেঁধে কিছু চিঁড়ে এনেছেন, নৌকোয় বসে তাই চাট্টি জলে ভিজিয়ে খেয়ে নিয়েছেন। উনুনের ধারে-

কাছে একটু গরম জায়গা খুঁজছেন তিনি। কিন্তু সূচাগ্র জায়গা কেউ দেবে না। উনুনে ভাত রাঁধবে এবং উনুন ঘিরে শুয়ে পড়বে—হাটখোলায় যত্রতত্র উনুন ধরিয়েছে এইজন্য। হাঁটছেন এ-উনুনের কাছ থেকে সে-উনুনে—জোর হাঁটনায় শীত কম লাগে। সম্ভব হলে শীতের রাত্রি এমনি হাঁটাহাঁটি করে পুইয়ে দেবেন। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে—ক্লান্ত হয়ে একসময় কেওড়াগাছের গোড়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে পড়লেন। সকালবেলা হাটের হৈ-চৈ-এর মধ্যে ধড়-মড় করে উঠে দেখেন, একটা কুকুর তাঁরই মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে পায়ের দিকে।

বেলা বাড়ল। দোকানপাট। পিপঁড়েখালির মাতব্বরটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—কী নাম যেন—গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। পর পর মাশুম অম্বিক ঐ গ্রামে পাঠশালা করে এসেছেন। মাতব্বর কলরব করে উঠল: এই যে গুরুমশায়। ধান-চাল উঠে গেল—কত গরু কত ডাক্তার-বদ্যি হাটের এ-মুড়ো ও মুড়ো চক্কোর মারতে লেগেছেন, আমাদের অম্বিক গুরুমশায়ের দেখা নেই। ভাবলাম, ভুলেই গেছেন-বা।

সে কী কথা! অম্বিক গদগদ হয়ে বলেন, গাঁয়ে-ঘরে ছিলাম—প্রাণটা মাতব্বরমশায় সর্বক্ষণ কিন্তু আপনাদের কাছে পড়ে ছিল।

মাতব্বর বলে, এমনি ডুব মারলেন—খোঁজখবর কত করেছি, এ-দিগরেই আর পদধূলি পড়েনি।

আসতে দিল না যে! চেষ্টার কসুর করিনি। গ্রামবাসী সব আটকে ফেলল। বলে, গাঁয়ের ছেলেপিলে মুখ্য হয়ে থাকবে, আর তুমি কাঁহা কাঁহা মুল্লুক বিদ্যে দান করে বেড়াবে—কিছুতে সেটা হবে না। এক রকম নজরবন্দি করে রাখা—কী করব বলো। মণ্ডপে বসে বসে পাঠশালা করি, আর তোমাদের কথা ভাবি।

ইতিমধ্যে এ-গ্রাম সেগ্রামের আরও চার-পাঁচটি চতুর্দিকে জড় হয়েছে। অম্বিক পসার-বাড়ানো কথা বলছেন, আর তাকিয়ে তাকিয়ে আন্দাজ নিচ্ছেন শ্রোতাদের মনোভাব কি প্রকার?

বলছেন, এবারে আটঘাট বেঁধে কাজ করছি। মনের মতলব ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হতে দিই নি। রাত দুপুরে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছি।

পিঁপড়েখালির মাতব্বর বলে, খাসা করেছেন। চলেন আমাদের নৌকায়। গোলঝাড়ের ঐ খানটা নৌকো।

তালভাঙা ধরাধরি করছে: সেই একবার গিয়েছিলেন গুরুমশাই, আবার ক্ষেতের কালজিরে-ধান দিয়েলাম, বয়েধান দিয়েলাম, মনে পড়ে না? আয়েন্দা সন আসবানে, জনে জনেরে কয়ে আইলেন—তা ও-মুখো মোটে আর হলেন

না। ধরিছি আজ, ছাড়াছাড়ি নেই।

গোকুলগঞ্জের লোকটিও নাছোড়বান্দা। বলে, উঠতি গঞ্জ আমাদের। নতুন পাঠশালার পাকা মেঝে, টিনের ছাউনি—আরামে কাজ করবেন। ভারি ভারি মহাজনরা আছে, পয়সাকড়ি ভালই দেবে তারা। মাইনে ধাকে পাবেন, নগদ পয়সাতেও পাবেন। চলুন—

বলে লোকটা অম্বিকের হাত চেপে ধরল। পিঁপড়েমারির মাতব্বর ওদিক থেকে রে-রে করে ওঠে: হাটের মধ্যে জুলুমবাজি—আমি আগে ধরি নি। কথাবার্তা আমার সঙ্গে আগে হয়ে গেছে। এ গুরুর আশা ছাড়ো, অন্য গুরু খোঁজো গে।

অম্বিকেরও ঐ পিঁপড়েমারি পছন্দ। পুরানো চেনা জায়গা। গুরুর প্রতি গ্রামের মানুষগুলো সাতিশয় ভক্তিমান। নিত্যিদিন সিধা পাঠাত। সিধা নিয়ে আবার এ-গৃহস্থে ও-গৃহস্থে পাল্লাপাল্লি—আয়োজনে কে কাকে ছাড়াতে পারে। হাটের মধ্যে সোনাখড়ির কেউ যদি হাজির থাকত—অম্বিক ভাবছেন। হেনস্থা করে অম্বিককে সরিয়েছে—থাকলে সেই অম্বিকের আজ খাতিরটা দেখতে পেত।

পিঁপড়েমারির মাতব্বর অদূরে এক ছোকরাকে দেখে ডাকাডাকি করছে: ও কিরণ, ইদিকে এসো। আমাদের পুরানো গুরুমশায়ের ধরা পেয়েছি। নিয়ে যাচ্ছি। সাবা দাও।

কিরণ ছোকরা সসম্ভ্রমে গড় হয়ে প্রণাম করল।

মাতব্বর অম্বিকের কাছে কিরণের পরিচয় দিচ্ছে: গাঁড়াপোতার অবিনাশ মণ্ডলের পোতা। মেজো মেয়ে সরলার সঙ্গে গেল-বোশেখে কিরণের বিয়ে দিয়েছি, ছেলের মতন হয়ে আমার সংসারে আছে—

সগর্বে বলে, খুব এলেমদার ছেলে। একটা পাশ দিয়েছে।

অম্বিক স্তম্ভিত। কথা বেরুতে চায় না, জড়িত কণ্ঠে কোন রকমে বললেন, কি পাশ?

কিরণ বলল, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি এবার পাইকগাছা হাই-ইস্কুল থেকে।

কী সর্বনাশ, পাশের উপসর্গ এই নোনা বাদা অবধি এসে হাজির হয়েছে! তবে আর সোয়াস্তি কোথা? পাশ-করা জামাতা বাবাজীও তবে তো পৃথিবীকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরপাক খাওয়াবে সূর্যকে বেড় দিয়ে। আরও কত রকম হয়কে নয় করবে, ঠিক কি! অম্বিক মুহূর্তে মতি পরিবর্তন করে ফেললেন। উঠতি জায়গায় নতুন পাঠশালাই ভাল। পাশের ঢেউ পৌঁছতে পৌঁছতেও পাঁচ-সাত বছর কেটে যাবে। ততদিন তো নিরাপদ।

গোকুলগঞ্জের লোকটাকে এগোতে বলে তিনি তার পিছন পিছন চললেন

ধারিক সংবাদ নিয়ে এলেন : চাল কেটে বসত ওঠাব—রাগের মাথায় সেই যে বলেছিলেন, নিজে থেকেই সত্যি সত্যি বসত উঠিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়ী মানুষের কতজনের সঙ্গে কত রকমের বিরোধ—ভবনাথের তত মনে পড়ছে না। বললেন, কার কথা বলছ?

ধারিক ছড়া কাটলেন : কচুর বেটা ঘেচু, বড় বাড়েন তো মান। কটিক আমাদের গুড়িকচু, তার বেটা নবনে হয়েছে মহানামী মানকচু। মানে বা পড়েছে—আপনাদের উত্তর-ঘরের বংশীধর কোণাখোলায় কিছু সর্দারের দরুন জমিটা জিয়ে দিলেন, সেইখানে সে ঘর তুলবে।

ভবনাথ অবাক হয়ে বলেন, বলো কি হে। মামলায় মামলায় অঢেল খরচা করে অনেক কষ্টে জমি খাস করে নিয়েছে, খাসা ফলসা জমি, আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারি—দিয়ে দিল সেই জমি?

বিনি সেলামিতে, আধেলা পয়সাটি না নিয়ে।

ভবনাথ বললেন, আমি তো কিছু জানিনে—

কেউ জানত না, চুপিসাড়ে কাজ হয়েছে। বাঁশ কিনে এনে জমির উপর ফেলল, তখনই জানাজানি হয়ে গেল।

ভবনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধারিক আবার বলেন, বাঁশও বোধহয় বংশীধর কিনে দিয়েছেন। শরিক জব্দ করতে ও-মানুষ সব পারেন।

ভবনাথ শুধান : ওর বাপ কটিক কি বলে? কথাবার্তা হয়েছে তার সঙ্গে?

ধারিক বলেন, তার তো কেঁদে ফেলার গতিক। হুটকো-গোঁয়ার বলে ছেলেকে গালিগালাজ করতে লাগল। বলে, বংশীবাবু এসে রাতদিন ফিসির-ফিসির করেন—

ভবনাথ বিরস কণ্ঠে বলেন, দিনকাল বদলাচ্ছে বলছিলে না ধারিক, সত্যি সত্যি তাই। নইলে তিন পুরুষে চাকরান-প্রজা ভিটে ছেড়ে বংশীর জমিতে ঘর তুলছে—

ধারিক বলেন, খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে। বংশীধর ওদের খুঁটো হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

সে তো হবেই। ওরা আমাদের জব্দ করার ফিকির খুঁজে বেড়ায়, আমিও খুঁজি। নতুন-কিছু নয়। কিন্তু নবনে টক্কর দিয়ে বাস ওঠাবে—

আটে তা হলে মুখ দেখাতে পারব না। আমাকেও সোনাখড়ির খাল ওঠাতে হবে।

নিভু-নিভু-লণ্ঠনের আলোয় দু'জনের মাথায় মাথায় বসে উপায়-চিন্তা হল। পাঁচ-সাত কলকে তামাক পুড়ল। তারপর রাত দুপুরে একলা খাঁরিক চুপিসারে বেরুলেন। চলে গেলেন কোণাখোলায় কিছু সর্দারের দরুন সেই জমিতে। জমির উপর বাঁশ ফেলে রেখেছে। বাঁশ গণলেন খাঁরিক—এককুড়ি তিনটা। দু-তিনবার গণে নিঃসংশয় হয়ে এলেন।

পুববাড়ির অনেক বাঁশঝাড়। গাঁয়ের বাইরে গোয়ালবাথান নামে বাঁশের মতন একটা জায়গা—কতক জমিতে পাট ও আউশ ধান আবাদ। তা ছাড়া আছে খেজুর বাগান, পাঁচ-সাতটা ডোবা এবং ঠাসা বাঁশবন। দিনমানে খাঁরিক সেই বাঁশ বনে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখলেন। রাত্রে শিত্তবর অটল আর একজোড়া কুড়াল নিয়ে ঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ঝাড় থেকে বাঁশ কাটার সময় গোড়ার দিকে খানিক খানিক পড়ে থাকে। কবে বাঁশ কেটে নিয়ে গেছে—খাঁরিক তার ভিতর থেকে গোড়া পছন্দ করে দিচ্ছেন, শিত্তবর আর অটল দু-আঙুল আট-আঙুল এক-বিঘত কখনো বা এক হাত নিচে কেটে ফেলেছে। ফাঁকা বিলে জ্যোৎস্না ফুটফুট করে—ঝাড়ের মধ্যেও জ্যোৎস্নার কালি এসে পড়ায় কাজের পক্ষে জুত হল খুব। কিন্তু এত ছোট ছোট বাঁশের টুকরো কোন কাজে লাগবে, মাহিন্দারদের বোধে আসে না। বাড়িতেই নেওয়া হল না ঐসব টুকরো, যে উনুনে পোড়ানোর কাজ হবে। ডোবার জলে সমস্ত ছুঁড়ে দিয়ে খালি-হাতে সকলে ফিরে গেল।

বুঝল পরের দিন, ভবনাথের কর্মচারী হিসাবে খাঁরিক যখন গঞ্জের থানায় গিয়ে এজাহার দিলেন: নবীন মোড়ল কোণাখোলায় ঘর তুলবে, তার যাবতীয় বাঁশ রাত্রিবেলা ভবনাথের গোয়ালবাথানের ঝাড় থেকে চুরি করে কেটেছে। দারোগা এসে পড়ল, কোণাখোলায় গিয়ে জমির উপর বাঁশ দেখল। গোয়ালবাথানের ঝাড়েও গেল—সদ্য বাঁশ কেটেছে, গোড়া দেখে যে-না সে-ই বলবে। গণতিতে ভজে গেল—ঠিক ঠিক তেইশ। এর চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কি হবে? যদিই বা কিছু হতে হয়, ভবনাথ চোরাগোপ্তা সেটুকু সেরে দিয়েছেন। চুরির দায়ে নবীনের কোমরে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে থানায় নিয়ে তুলল। নবীন কাকুতি-মিনতি করে, দু-চোখে জলের ধারা বয়—ভবনাথ দেখতে পান না, কানেও শোনেন না।

পরের দিন নবীনের কচি বউ এসে বড়গিন্নির পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। পাছে এলো বাবুমণিরা! ভবনাথ শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তোমাদের দোষ নেই

মা-জননী—তোমরা কোন রকম কষ্ট না পাও, আমি দেখব। নবনেটা মাস কতক জেলের ঘানি ঘুরিয়ে আসুক। গায়ে বড্ড তেল হয়েছে, তেল কিছু শুকোনোর দরকার।

তার পরের দিন খোদ কটিক এলো। নবীনকে সদরে চালান দেয়নি, এখন অবধি সে থানায়। বাপে-ছেলের সামান্য সাক্ষাৎও হল। ছোঁড়াটা খুব ঘাবড়ে গেছে। ইহজন্মে আর গোঁয়ার্তুমি করবে না, মানীর মান রেখে চলবে—

ভবনাথ পরিতৃপ্তির সঙ্গে শুনছেন। বললেন, ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা দেখি তবে—কি বলো? সর্বদা শাসনে রাখবে, কথা দাও কটিক।

কটিক বলে, কাউকে আর লাগবে না কর্তা। দুটো দিনেই শিক্ষা হয়েছে খুব। চেহারা সিকিখানা। কান মলছে, নাক মলছে—কক্ষনো আর বংশীবাবুর কথায় নাচবে না।

কিসে কি হল—থানা থেকে ছাড়া পেয়ে রাত্রিবেলা নবীন বাড়ি এসে উঠল। কয়েকটা দিন তারপরে বেরুলই না ঘর থেকে।

কৃষ্ণময়ের নামে চিঠি এসে গেছে—একজোড়া—একটা এস্টেটের তরফ থেকে, একটা দেবনাথ নিজে লিখছেন। কলকাতায় ফেরবার জোর তাগাদা।

ভবনাথ বললেন, পড়লে তো চিঠি?

কৃষ্ণময় বলল, পড়তে হয় না—কি আছে, না পড়লেও বলা যায়। বাড়ি আসার কথা যখন উঠল, সেরেস্তার ভিতরে তখন থেকেই এ চিঠির বয়ান তৈরি হচ্ছে। দুর্গা-দুর্গা—বলে আমি বেরুলাম, চিঠিও সঙ্গে সঙ্গে ডাকবাক্সে পড়ল। বাড়ির উঠোনে পা ঠেকাতে-না-ঠেকাতেই চিঠি এসে হাজির।

বেজার মুখে সে বলে, আসা মাত্তোর খোঁচাখুঁচি জুড়ে দেবেন তো ঠেলেঠুলে পাঠানো কেন বুঝিনে। দিব্যি তো ছিলাম সেখানে।

ছিল বটে তাই—মিছা নয়। কৃষ্ণময়ের স্বভাব এই। গেল কলকাতায় তো 'দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার—'এই গোছের ভাব তখন। একখানা এনভেলপ কিনে কাউকে চিঠি লিখবার পিত্যেশ নেই। বলে, কাকামশায়ের হরদম চিঠি যাচ্ছে, তাতেই তো টের পাচ্ছে বেঁচেবর্তে রয়েছি আমরা। ঘটা করে আলাদা আবার কি লিখতে যাব? বয়সকেলে ছেলের কথা শুনুন একবার। বলে, এক পয়সায় তিনখানা কচুরি আর এক পয়সায় হালুয়ায় একটা বিকেল ভরপেট হয়ে যায়, সে পয়সা খামোকা কেন গবর্ণমেণ্টের ঘরে দিতে যাই?—বুঝুন।

আবার সেই মানুষ বাড়ি যদি এসে গেল, নড়ানো আর সহজ কর্ম হবে

না। পাড়ার এবাড়ি-ওবাড়িতেও নড়তে চায় না। দিনরাত ঘরের মধ্যে—লোকে বলে, বউয়ের আঁচল ধরে থাকে। চিঠি সবে তো দু-খানা এসেছে—হয়েছে কি এখনো, গাদা গাদা আসবে। এক নজর চোখ বুলিয়ে কুঞ্জময় কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাস উড়িয়ে দেয়, ভিড় জমতে দেয় না। চিঠির মেজাজ চড়া হতে থাকবে ক্রমশ, শেষটা খোদ বড় মনিবের সইযুক্ত নোটিশ আসবে: অমুক তারিখের মধ্যে হাজির না হলে নতুন লোক নিয়ে নেওয়া হবে, আদায়-তহশিলের এত ক্ষতি বরদাস্ত করা যাচ্ছে না।

অলকা-বউ ঘাবড়ে গেছে। বলে, দেরি নয়—চলে যাও তুমি।

তাড়িয়ে দিচ্ছ?

চাকরি গেলে আমাকেই লোকে দুষবে।

কুঞ্জময় অভয় দিয়ে বলে, চাকরি কেন যাবে রে পাগলি? যেতে পারে না।

কিন্তু একে স্ত্রীলোক, তায় কমবয়সি—সহজে সে প্রবোধ মানে না। বলে, জমিদারবাবু নিজে লিখেছেন—

লিখুন গে যে বাবু হোন। আমারও কাকামশায় রয়েছেন।

যাইহোক, পাঁজি দেখানো উচিত এবারে। ভটচাযিবাড়ি বৃদ্ধ গোপাল ভটচাযের কাছে গিয়ে বলল, একটা ভাল দিন দেখে দিন জ্যেঠামশায়। কলকাতা হল পশ্চিম দিক এখান থেকে—

উহুঁ, পশ্চিম ঠিক নয়—দক্ষিণ ঘেঁসে গেছে। নৈঋতকোণ মোটামুটি।

ডাঁটি-ভাঙা চশমা নাকের উপর তুলে গোপাল পাঁজির পাতা উল্টাতে লাগলেন। ক্ষণ পরে চোখ তুলে বললেন, মঙ্গলবার ঘন্টা এগারোটা তেইশ মিনিট পঁচিশ সেকেণ্ড গতে। উত্তরে নাস্তি—তা কলকাতা বরং দক্ষিণই ঘেঁসে যাচ্ছে।

তিথি নক্ষত্র কেমন?

অষ্টমী তিথি, পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। মন্দ হবে না।

যোগিনী?

ঈশানে। খারাপ নয়।

মাহেন্দ্রযোগ?

নেই। অমৃতযোগও নেই। সিদ্ধিযোগ আছে—চলে যাবে মোটামুটি।

পাঁজি কুঞ্জময় নিজ হাতে টেনে নিল। বলে, যাত্রামধ্যম দেখছি জ্যেঠামশায়।

যাত্রানাস্তি তো নয়—ঘাবড়াচ্ছ কেন?

না জ্যেঠামশায়। বিদেশ বিভুঁয়ে যাওয়া—দিনটা সর্বাংশে যাতে উৎকৃষ্ট হয়, আপনি তাই দেখুন।

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলে ফেললেন, অত খুঁতখুঁতুনির এখন কি। গরজ— এই গোড়ায় দিকে? কতবার যাত্রা ভাঙবে, তার লেখাজোখা নেই। পেট কামড়াবে, জ্বরভাব হবে, মেয়েটা হাঁচবে হয়তো একবার-দু'বার—কত রকমের কত ভণ্ডুল ঘটে যাবে। যাত্রা করে আলাদা ঘরে কাটিয়ে যাত্রা ভেঙে আবার আপন-ঘরে ফিরে আসবে। জানি তো তোমার বাবা—

স্পষ্টভাষী গোপাল মিথ্যে বলেননি। এমনি ব্যাপার বরাবর হয়ে আসছে, এবারও হবে, সন্দেহ কি। কৃষ্ণময়ের বিদেশযাত্রা চাট্টিখানি কথা নয়।

রাগ করে কৃষ্ণময় বলে, মিথ্যে খবর কেমন করে যে রটে যায় বুঝিনে। আপনি একটা ভাল-দিন দেখে দিন, যাই না-যাই তখন দেখতে পাবেন।

কলকাতার চাকুরে বলে কৃষ্ণময়ের জন্ম উঠানের পশ্চিম দিকে পৃথক একটা ঘর—তাই শেষটা কেলেঙ্কারির কারণ হয়ে উঠল। দুপুরবেলা খাওয়ার পাট সেরে তরঙ্গিণী তাকের উপর থেকে মহাভারত নামাতে যাচ্ছেন, বিনো এসে খুলখাস করে বৃত্তান্ত বলল: কাণ্ড দেখগে ছোটখুড়িমা—দুয়োরে খিল এঁটে দিয়েছে।

গোড়ায় তরঙ্গিণী ধরতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলেন: কে খিল আঁটল? আবার কে! তোমাদের চাকরে ছেলে আর তার বউ।

তরঙ্গিণী এক মুহূর্ত অবাক হয়ে রইলেন। বিনো হাত ধরে টানে: সত্যি না মিথ্যে, আখসে এসে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তরঙ্গিণী বলেন, ছাড়ান দে বিনো। ওদিকে না গেলাম আমরা, চোখে না-ই বা দেখলাম।

বিনো বলছে, তোমার শাশুড়ি—আমাদের বুড়োঠানদিদি গো—বলতেন, তিন পোয়ার মা হয়ে গিয়েও ভাতারকে কোনদিন মুখ দেখতে দিইনি। রাত দুপুরে আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে তবে ঘোমটা খুলতেন। সেই পুরবাড়িতে ভরদুপুরে এই বেলেল্লাপনা—সর্বচক্ষুর সামনে দড়াম করে হুড়কো এঁটে দিল।

তরঙ্গিণী আমল দেন না: ওদের কথা ধরতে নেই। কেউ বিদেশবিভুঁই-এ পড়ে থাকে। ক'দিনই বা একসঙ্গে থাকতে পায়। গাঁয়ের বারোমেসে মানুষের বেলা যে নিয়ম ওদের উপর সে নিয়ম খাটাতে গেলে হবে না।

বিনো করকর করে উঠল: বিদেশবিভুঁয়ে কাকামশায়ও তো থাকেন। ওদের যা, তোমাদেরও ঠিক তাই। কই, তোমাদের তো কেউ কখনো বেল্লাপনা দেখেনি।

আমরা বলে বুড়ো হয়ে মরতে গেলাম—আমরা আর ওরা!

বিনো ছাড়ে না: আজ না-হয় বুড়ো, চিরদিন তো বুড়ো ছিলে না? তোমাদের নিয়ে কোনদিন তো কথা ওঠেনি।

তরঙ্গিণী বললেন, দিনকাল বদলেছে যে বিনো, এদের কাল আলাদা। অসহ্য ঠেকে তো তোরাই চোখ বুঁজে থাকবি।

খানিকটা কড়কেও দিলেন: বাড়ির কথা বাইরে না যায়। নিমিকেও ভাল করে সমঝে দিবি তুই।

॥ একত্রিশ ॥

একটা রাস্তা বিল থেকে সোজা গাঁয়ে এসে উঠেছে। রাস্তা মানে বর্ষাকালে হাঁটুজল, কোথাও বা কোমরজল, বর্ষা অন্তে কাদা। সেই কাদা কার্তিক অবধি। তারপরে শুকনো। কাদায় জলে বরঞ্চ চলতে ভাল, শুকনো পথ সমান-পথ নয়। কাদার মধ্য দিয়ে মানুষ হেঁটেছে, গরু হেঁটেছে, ধান-বওয়া গরুর-গাড়ি আসা-যাওয়া করছে—কাদা শুকিয়ে সারা পথ গর্ত-গর্ত হয়ে আছে এখন। পা ফেলে সুখ নেই, পায়ের তলায় খোঁচা লাগে, গর্তের মধ্যে পড়ে পা মচকায়। কাদা-জলের পথ দাও—লোকে হেলতে-দুলতে দশ ক্রোশ পথ চলে যাবে, কিন্তু শুকনোর দিনে বিল থেকে গ্রাম অবধি এইটুকু আসতে-যেতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

তা প্রাণ থাকল কি গেল, এখন দেখতে গেলে হবে না। বছর-খোরাকি ধান গোলায় উঠে যাক, গ্যাঁট হয়ে বসে প্রাণ ও মানসম্মানের কদ্দুর কি বজায় আছে, বিবেচনা করা যাবে। পুববাড়ির বড়কর্তা ভবনাথকে সকাল-বিকাল ঐ বিলের পথ ভাঙতে হচ্ছে। ধান কাটতে বাকি আছে কিনা, কাটা ধান ক্ষেতে পড়ে আছে কিনা, আ'ল ঠেলে আধ-হাত জমি কেউ নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছে কিনা—বিলের এদিক-সেদিক তদারক করে বেড়ান। বসতে পিঁড়ি দিল কিনা, দৃকপাত নেই—উঠোনে দাঁড়িয়ে কাকুতিমিনতি: আর্জানো ফসল ইঁদুরে-বাঁদরে খাওয়াবে নাকি ও কুঞ্জ? নড়াচড়া দাও একটু তাড়াতাড়ি—

বিলের রাস্তা গ্রামে পৌঁছেই দু-দিকে দুই মুখ হয়ে গেছে। তেমাথায় উপর বিশাল কাঠবাদাম গাছ। বড় বড় পাতা। সবুজ পাতা থেকে লাল হয়ে যায়, লাল টুকটুক করে, যেন আলতায় চুবিয়ে দিয়েছে। দিবারাত্রি পাতা ঝরে। এ-পাতা ভাল পোড়ে না বলে কুমোর অথবা ময়রাদের

কুড়োতে আসে না। তলায় কাঁড়ি হয়ে পড়ে থাকে। বিল ভাঙতে পায়ের তলায় ব্যথা হয়ে গেছে—পথিকজন সেই সময়টা বাদামতলা পেয়ে বর্তে যায়—আচমকা যেন গদির উপর উঠে পড়েছে। পাতার গাদায় পা বসে বসে যাচ্ছে—ইচ্ছাসুখে দু-পায়ে ছড়িয়ে দেয়, টুকটুকে পাতা তুবড়ি বাজির মতো চতুর্দিকে উঁচু হয়ে ওঠে।

ছেলেপুলেরা এক একসময় গিয়ে বাদামতলা হাতড়ায়, পাতার গাদার ভিতরে দুটো-চারটে বাদামও মিলে যায়। আম, জাম, জামরুলের মতন গাছে চড়ে কষ্ট করে পাড়বার বস্তু হয়। কঠিন পুরু খোলা, শাঁস যৎসামান্য—খোলা ভেঙে সে-অবধি পৌঁছানোর সাধ্য পাখি-পশুর নেই। মানুষের পক্ষেও সহজ নয়, কাটারি কুপিয়ে কুপিয়ে তবে খোলা ভাঙে। কাকে বাদুড়ে উপরের ছাল ঠুকরে ঠুকরে খায়, বোঁটা ভেঙে তখন টুপ করে ফল পড়ে পাতার মধ্যে ঢোকে।

হন্তদন্ত হয়ে ভবনাথ বাড়ি ফিরছেন—বাদামতলায় দেখতে পেলেন, কমল আর পুঁটি গাদা গাদা বাদামতলার পাতায় গাদা দু-হাতে তুলে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ ঠিক দুপুরে কেউ কোথাও নেই দেখে বাদাম খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুঁটিরই মাথায় আসে এসব—তাড়া দিতে দুটিতে দুড়-দুড় করে পালাল।

কয়েকটা দিন পরে ভীষণ ব্যাপার। বাদামগাছের লাগোয়া গো-ভাগাড়—মরা-গরু ফেলে যায়, শিয়াল-শকুনে খুবলে খুবলে খায়। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, বাদামতলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেদিনও ভবনাথ বিলের দিক থেকে ফিরছেন—দেখলেন, একটা লোক পাশের পগারের মধ্যে কি যেন করছে। চোর-টোর ভেবেছেন উনি— বিল অঞ্চল থেকে গ্রামে উঠে আত্মগোপন করে আছে, খানিকটা রাত্রি হলে পাড়ার মধ্যে ঢুকবে।

কে ওখানে? উঠে আয় বলছি।

আসে না, শব্দসাড়াও দেয় না। ভবনাথ কাছে চলে গেলেন। তড়াক সেই লোক উঠে দাঁড়াল। ওরে বাবা—লম্বায় হাত দশেক, গাট্টাগোট্টা চেহারা, রস-জ্বালানো জালুয়ার মতন বিশাল মাথা। বাতাবিলেবুর সাইজের চোখের মণি অবিরত পাক খাচ্ছে অক্ষি-গোলকের ভিতর। পগারের মধ্যে গো-ভাগাড়ের হাড়গোড়—নরাকার ঐ জীব মজা করে হাড় চিবোচ্ছিল সজনেডাঁটার মতো।

বুঝে ফেলেছেন ভবনাথ, উচ্চৈস্বরে রাম-রাম করছেন। চর্বণ ছেড়ে তক্ষুণি সে চোঁচা-দৌড়। পলকে অদৃশ্য।

বাড়ি ফিরে ভবনাথ হৈ-চৈ লাগলেন: ছুটে যা শিশুবর, বাঁকাবড়শি হেমন্ত ঠাকুরের কাছে। আমার নাম করে বলবি। ঘোয়ায় আর খোলকত্তাল

নিয়ে যে অবস্থায় থাকেন চলে আসুন। একপালা গাইতে হবে আমার উঠানে।

কি হল কি হঠাৎ ?

ভবনাথ বললেন, ভাগাড়ে আজ গরু পড়েছে। মুচিতে চামড়া খুলে নিয়ে গেছে, শিয়াল-শকুনে খেয়েছে সারাদিন ধরে। গোভূত সন্ধান পেয়ে হাড় চিবোতে বসেছিল। আমি একেবারে মুখোমুখি পড়েছিলাম। কষে রামনাম চালাও এখন, তবে ভূত অঞ্চল ছেড়ে পালাবে।

নিমি ও রাজি দুই চক্ষুশূল এরা। মেয়েরা সই পাতায়, এরা নতুন কিছু করেছে—সইয়ের বদলে চক্ষুশূল পাতিয়েছে। ও ভাই চক্ষুশূল—বলে এ-ওকে ডাকে। দু'জনে ওরা মাঝের কোঠায় ভুটুর-ভুটুর করছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে রাজি সদ্য এসেছে—শ্বশুর-শাশুড়ি ভাসুর-দেওর জা-ননদের কথা এবং বরের কথা। কথা অফুরান—ফুরোলে ছাড়ছে কে ? রাজি ছাড়লেও শ্রোতা নিমি তো ছাড়বে না।

ধানের পালার অধিকাংশ মলা-ঝাড়া হয়ে গেছে, উঠোন প্রায় ফাঁকা। এক-দিকে তাড়াতাড়ি গোটাকয়েক মাদুর শতরঞ্চি পেতে ফেলল, মেইকাঠের মুখে একফালি বাঁশ বেঁধে তার গায়ে লণ্ঠন ঝুলাল। ঘরের চালে আর আড়ের খুঁটিতে চারকোণা বেঁধে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিল—মাথার উপরের চন্দ্রাতপ। আর কি চাই—পুরোদস্তুর আসর। হেমন্ত ঠাকুরও এসে পৌঁছলেন। খুব একচোট খোল পেটাচ্ছেন, লোক যাতে জমে যায়।

রাজি বলে, উঠি ভাই চক্ষুশূল—

নিমি টেনে বসাল। বলে তাড়া কিসের ? সবে তো সন্ধ্যে। দু-দিনের তরে বাপের-বাড়ি এসেছিস, তোকে কেউ কুটোগাছটিও ভাঙতে বলবে না।

রাজি বলে সে জন্যে নয়। রাত্রিবেলা জঙ্গলে পথ ভেঙে যাওয়া, তার উপর কী সব দেখে এলেন জ্যেঠামশায়—

তুইও যেমন ! কী দেখতে কি দেখেছেন, হয়তো বা ভয় দেখানো কথা।

উঠানে গান। আরম্ভে আসর-বন্দনা। চামর দুলিয়ে হেমন্ত ঠাকুর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম-চতুর্দিকে চক্কোর মারছেন। নিমি বলল, একটুকু শুনে তো যাবি। আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

রান্নাঘরের দাওয়ার অন্ধকারে দু-জনে গিয়ে বসল। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা। নিমি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। কান্না আসে কেবলই। রাজিকেই বলে, যাবি তো এক্ষুনি ওঠ। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়ে গেলে কাঁদানো—বেঁচে না ওঠা পর্যন্ত আসর ছেড়ে ওঠা যাবে না।

উঠোন-ভরা লোক। দু'জনে টিপিটিপি বেরিয়ে পড়ল। রামলক্ষ্মণ মাথায় থাকুন—তাঁদের পুণ্যকথা হেলা করে এরা নিজেদের সামান্য কথায় মশগুল। কথা যত-কিছু রাজিরই—নিমি কান বাড়িয়ে শুনে যায়। বড়দিনের সময় বাড়ি এসে বর এক কাণ্ড করেছিল—সে কারণে কথা বন্ধ সারা বিকাল এবং রাত্রের শেষযাম পর্যন্ত। শেষকালে—কাউকে বলিস নে ভাই চক্ষুশূল, আমার পা জড়িয়ে ধরতে চায়—তখন মাপ করে দিই। রাতে তো ঘুমানোর জো নেই—কিছু উশুল করে নিচ্ছিলাম দুপুরে ঘুমিয়ে। শাশুড়ি উঠোনে মাদুর পেতে রোদ পোহাচ্ছেন। ঐ তো বাঘের মতন শাশুড়ি—তাঁরই পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে এসে ঘরে ঢুকেছে। জাগানোর চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য—অথচ তিল পরিমাণ শব্দসাড়া করবার জো নেই। এতে রাজি জাগতে যাবে কেন? দোয়াতে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে বর তখন সারা মুখে চিত্রকর্ম করল। সুপুষ্ট একজোড়া গোঁফ দিয়েছে ঠোঁটের উপর, থুতনিতে চাপদাড়ি। দু-পাশের গাল দু-খানাও বাদ রেখে যায় নি। এত সমস্ত করে চোরের মতন বেরিয়ে গেছে। বড়-জা'র সকলের আগে নজরে পড়ল, তাই খানিকটা রক্ষা: ওরে ছোট, গোঁফ-দাড়ি উঠে গেছে যে তোর। আয়না ধরে হাসি কি কাঁদি, ভেবে পাইনে।

শ্বশুরবাড়ির সামনে এসে পড়েছে। গল্প থামিয়ে রাজি বলে, আসি তবে ভাই—

নিমি বলল, বাঃ রে, আমি বুঝি একলা যাব?

তবে?

তোকে এগিয়ে দিলাম, তুই দে আমায়। পুরো না দিস, খানিকটা দে।

চলল আবার। রাজির মুখে খই ফুটছে। বর হয়ে গিয়ে তারপর শাশুড়ি নিয়ে পড়ল। এবং বড় জা। শাশুড়ি দজ্জাল। বড়বউ কিন্তু সোনার বউ—জগদ্ধাত্রীর মতন রূপ। বাপ-মা তুলে শাশুড়ির এত গালিগালাজ, বড় বউ রা কাড়ে না, চুপচাপ কাজ করে যায়। এক কাঠি নাকি বাজে না—কথাটা কত বড় মিথ্যা, শুনে-এসো একবার রাজির শ্বশুরবাড়ি গিয়ে। কাঠির মতন রোগা শাশুড়িঠাকরুণ একখানি মাত্র মুখে একলাটি অবিশ্রান্ত নবর রকম বাজিয়ে যাচ্ছেন—সে এমন, ঘরের চালে কাক বসতে ভরসা পায় না। বড়বউয়ের সুখ্যাতি সকলের মুখে, কেবল শাশুড়ি ছাড়া। শাশুড়ির দলে সম্প্রতি আর একটি জুটেছে—বলতে পার কে? বলো দিকি। আমি, রাজবালা, বাড়ির নতুনবউ কেননা কাণ্ডখাণ্ড আমি এক সকালবেলা দেখে ফেলেছিলাম। বড়দিদি গো, খুরে তোমার শতেক নমস্কার।

মুখে আর কথা বেরোয় না, হাসিতে ফেটে পড়েছে। হাসে আর রাজবার

নত হয়ে মুখবর্তিনী বড় জায়ের উদ্দেশে মাটিতে হাত ঠেকায়। বলে, ধন্তি বউ রে বাবা! খুরে নমস্কার।

এসে গেছে তারা পুববাড়ি। হেমন্ত ঠাকুর ঘোর বেগে চালিয়েছেন। নিমি বলে, বাড়ি এলাম।

তা তো এলেছিস। আমি এখন একলা ফিরব নাকি?

নিমি বলে, চল্, দিয়ে আসি তোকে।

অতএব নিমি চলল আবার রাজিকে পৌঁছতে। গল্পের সেই মোক্ষম জায়গা এবারে, যার জন্য রাজি পরম শান্ত বড় বউকে ধন্য-ধন্য করে টিটকারি দিচ্ছে। জানলায় হঠাৎ চোখ পড়ে গিয়ে উঠোনের কায়দাটা দেখে ফেলেছিল রাজি। শাশুড়ি রান্নাঘরের দাওয়ায় গোবরমাটি লেপছেন। বড় বউয়ের ঘর থেকে বেরুতে আজ কিছু বেলা হয়ে গেছে—তা নিয়ে শাশুড়ি কলিযুগ ধরে গালিগালাজ করছেন, শোলোক পড়ছেন: কলিকালের বউগুলো কলি-অবতার—রাত নেই দিন নেই, ভাতার ভাতার!

অপরাধী বড় বউ জবাব দেয় না, ঝাঁটা হাতে নিঃশব্দে উঠান ঝাট দিচ্ছে। নতুন বউ দেখতে পাচ্ছে জানালা দিয়ে। বকতে বকতে বুড়ো শাশুড়ি ক্রমশ ঝিমিয়ে এলেন, থেমে যাবার গতিক। হঠাৎ সব ক্লান্তি ঝেড়েফেলে তুমুল কণ্ঠে বড় বউয়ের মৃত চৌদ্দপুরুষের নামে এই দিনের প্রারম্ভে বিবিধ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে লাগলেন, বিশদিন নিরন্ন থেকেও মানুষে যা মুখে তুলতে নারাজ। বড় বউয়ের দৃকপাত নেই—না-রাম না-গঙ্গা রা কাড়ে না। বাক্য বিনা কাজ হচ্ছে তো কোন দুঃখে গলাবাজি করতে যাবে? নতুন বউ জানালার পথে সমস্ত দেখে নিয়েছে। ঝাঁট দিতে দিতে একবার-বাঁ ঝাঁটা তুলে শাশুড়ির পানে ঈষৎ নাচিয়ে দিল। অধর দু-পাটি দাঁত মেলে মুখভঙ্গিমা করল রান্নাঘরের দিকে চেয়ে। ব্যস, আর রক্ষা নেই। নিপাট ভালমানুষ বড় বউ দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দিয়ে পরম মনোযোগে আবার নিজ কর্ম করে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দত্তবাড়ি পৌঁছে গেছে তারা। নিমি বলল, ঘরে উঠলে হবে না চন্দ্রমুখী, আমার সঙ্গে চল্।

নিমি রাজিকে দত্তবাড়ি পৌঁছে দেয়, দত্তবাড়ি থেকে রাজি আবার নিমিকে পুববাড়ি নিয়ে আসে। কতবার যাতায়াত—গণতে গেছে কে? অবশেষে পালা শেষ—শক্তিশেলে নিহত লক্ষ্মণ বিশল্যকরণীর গুণে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। হরিবোল দিয়ে আসরের মানুষও উঠে পড়ল। যে যার বাড়ি যাচ্ছে। রাজি তাদের মধ্যে ভিড়ে পড়ল।

ভবনাথের উল্লাসটা এবার দেখবার মতো। লোভী গোভূত নরা-গরুর

খোঁজে খোঁজে গ্রাম অবধি ঢু মেরেছিল, তার দুর্গতি মনের চোখে যেন স্পষ্ট দেখছেন। রাম-নাম তাড়া করেছে—শালের খুঁটির মতন বড় বড় পায়ে বিল ভেঙে ধুপধাপ করে ভূত পালিয়ে যাচ্ছে। নাস্তিক অবিশ্বাসী কেউ কেউ আছে—তারা বলে, বড়কর্তার ভয়-দেখানো কথা। ছেলেপুলে যখন তখন গিয়ে পড়ত—এমনি কায়দা—করলেন, ইতরভদ্র কেউ বাদামতলা মুখো হবে না।

সে যাই হোক, পুঁটি-কমল ও তাদের সঙ্গিসাথীদের সত্যিই বাদাম-সংগ্রহ বন্ধ। নিতান্ত যদি লোভ ঠেকাতে না পারে, যাবে দিনমানে দস্তুরমতো দলবল জুটিয়ে। জল্লাদ ছেলেটাই শুধু ভ্রূভঙ্গি করে উড়িয়ে দেয়ঃ বাজি রাখো, আমি যাব। ভাদ্দাড়ে যেদিন গরু পড়বে, একলা রাতদুপুরে গিয়ে আমি বাদাম কুড়িয়ে আনব। যদি বলো সে বাদাম দিনের বেলা কুড়ানো, রাত্রিবেলা গাছের গায়ে গোটাকয়েক দায়ের কোপ দিয়ে আসব, সকালে গিয়ে দেখতে পাবে।

তা পাবে হয়তো জল্লাদ—দুনিয়ার মধ্যে ও-ছেলের অসাধ্য কিছু নেই শুধুমাত্র পড়া ও লেখা ছাড়া।

॥ বত্রিশ ॥

ধান-কাটা সারা। বিল শুকিয়েছে। বাড়িতে বাড়িতে মলনের কাজও শেষ। উঠানের মাঝখানে মেইকাঠখানা রয়ে গেছে এখনো। যদ্দিন থাকে থাকুক না। সন্ধ্যাবেলা জ্যাব খাওয়াতে গরু ভিতর-উঠানে নিয়ে আসে—মেইকাঠে বাঁধা যায় তখন। কমল-পুঁটিদেরও কাজে লাগে—মলনের গরুর মেইকাঠ ধরে ওরা গোল হয়ে ঘোরে। খাসা মজা।

উঠোন জুড়ে ইঁদুরে কি করেছে, দেখ। গর্ত, গর্ত, গর্ত—মাটি তুলে তুলে ডাঁই করেছে। ধানের পালায় ঢাকা ছিল বলে তেমন নজরে পড়ত না। পালা উঠে গিয়ে ফাঁকা-উঠোন—তো গুণমণি এসে পড়ল পাতকোদাল হাতে নিয়ে। ইঁদুরের গোষ্ঠীকে বাপান্ত করে, আর জোরে জোরে কোপ ঝাড়ে গর্তের উপর। কোপ কি ইঁদুরের ঘাড়ে? যমের ঘাড়েই বা নয় কেন, গুণোর ছেলেগুলো কেড়ে নিয়েছেন যিনি? ইঁদুরে ধান নিয়ে তুলেছে গর্তের ভিতরে—খেয়ে কতক ভুষ করেছে, কতক-বা ভাণ্ডারে সঞ্চয় করেছে। গর্তের জায়গা জায়গা কুপিয়ে গুণমণি ধান-মাটিতে ঝুড়ি বোঝাই করে পুকুরঘাটে নিয়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ধোয়। মাটি ধুয়ে গিয়ে ধান ঝিকমিক করে ওঠে। পুরো এক ঝুড়ি মাটি ধুয়ে মুঠো দুই ধান। সমস্তটা দিন ধরে গুণমণি

এই করছে—ধান এনে এনে রোদে দিচ্ছে উঠোনের উপর। শেষ পর্যন্ত পরিমাণে নেহাৎ মন্দ হল না—দু-তিন খুঁচি তো বটেই। গুণমণি হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: ধান পড়ে রইল, তোলাপাড়ার নাম নেই। খুব যে ঠ্যাকার হয়েছে ঠাকরুন।

উমাসুন্দরী বলেন, ইঁদুরের মুখ থেকে কেড়েকুড়ে বের করেছিস, ও ধান তোর। তুই নিয়ে যা শুনো।

তা গুণমণি এমনি-এমনি নেবার লোক নাকি? উঠান পিটিয়ে দুরমুশ করে গোবর-মাটি লেপলোক-দিন ধরে। ধান দিয়েছে, তার মূল্যশোধ।

বিল আর এখন জলা-জায়গা নয়, শুকনো ডাঙা। ডোঙার পথ গিয়ে পায়ে হাঁটার পথ। বিল-পারের মানুষ, বলতে গেলে, জলচর জীব—হাঁটাহাঁটি তেমন পেরে ওঠে না। হাটহাট করতে বারোমাসেই তারা ডাঙা অঞ্চলে আসে। ইদানীং হাঁটতে হচ্ছে। বিল ভেঙে আড়াআড়ি উঠে পুববাড়ির ঢেঁকিশালের সামনে দিয়ে মন্তার-মা'র ঘরের কানাচ ঘুরে সোজাসুজি হাটে চলে যায়। কৃষ্ণময় শহরে থাকে, এ জিনিস তার ঘোর অপছন্দ। ঢেঁকিশালে মেয়ে-বউরা ভানা-কোটা করে, কানাপুকুরের তালের ঘেটের উপর বাসনের কাঁড়ি মাজতে বসে যায়—হাটুরে পথ মাঝখান দিয়ে গেলে আবরু রক্ষে হয় কেমন করে?

বংশী ঘোষের ছেলে সিধু বলে উল্টো কথা: ক'টা মাসের তো ব্যাপার! বর্ষায় ডোঙার চলতে লাগলে এ পথ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। পাড়ায় তখন ওরা ইয়ে করতেও আসবে না। বলি মন্দটা কি হয়েছে? ঘরের দাওয়ায় বসে দিব্যি ধানচাল হাঁসের-ডিম কেনা যাচ্ছে! নিকারির মাছের ডালি নামিয়ে মাছও কেনা যায়। হাটখোলা অবধি না গিয়েও হাটবেসাতি করি।

কৃষ্ণময়কে ঠেস দিয়ে বলে, ক্ষেতের ছাগল তাড়ানোর মতন মানুষজন তাড়াহুড়ো না করে ফরসা বউ ঘরের সিন্দুকে তালাচাবি বন্ধ করে রাখলেই তো হয়।

খানিকটা তেমনি ব্যাপারই বটে। অবিরত ঝগড়াঝাঁটি হাটুরে মানুষের সঙ্গে: তোমাদের আক্কেলটা কি শুনি? পাছদুয়ারের উঠোন কি সরকারি রাস্তা পেয়ে গেছ?

যার সঙ্গে হচ্ছে, সে হয়তো ঘুরপথে গেল তখনকার মতো। কিন্তু কে কখন আসছে, লেখাজোখা নেই। লাঠি হাতে তবে তো হুড়কোর ধারে খাড়া পাহারায় থাকতে হয়। এ যেন বালির বাঁধ দিয়ে স্রোতের জল ঠেকানো। হয় না, গাঁ-গ্রামের চাষাভুষো মানুষ অতশত আবরুর মহিমা বোঝে না—তিরিমিরি কৃষ্ণময়ের লেগেই আছে।

ভবনাথ মতলব ঠাউরিয়ে ফেললেন। উমাসুন্দরীকে বললেন, বড়বাবুকে মানা করে দাও, লোকের সঙ্গে অকারণ বিবাদবিসম্বাদ না করে। ব্যবস্থা আমিই করছি।

ঘর বাঁধতে ভবনাথের জুড়ি নেই। এ বাবদে খরচও যৎসামান্য। অজস্র খড়ের ভুঁই—বিনি চাষে উলুখড় আপনাআপনি জন্মে, কেটে আঁটি বেঁধে চালায় গাদা দেবার অপেক্ষা? বাঁশ ঝাড়ও বিস্তর। বাঁশের খুঁটি, বাঁশের সাজপত্তোর, বাঁশের চাল—উপরে খড়ের ছাউনি। কানাপুকুর থেকে কোদাল কতক মাটি তুলে ভিটে বানিয়ে নেওয়া। ব্যস, হয়ে গেল ঘর। পুববাড়ির বড় কর্তার ঘর তুলতে ছ'চার দিনের বেশি লাগে না। ঢেঁকিশাল দক্ষিণের পোঁতায়—পুব ও পশ্চিম উভয় পোঁতায় ঘর উঠে যাওয়ায় বাইরের এদিকটাও এখন ঘেরা বাড়ি, আঁটো উঠোন। এত ঘর কোন কর্মে লাগবে, সেটা এর পর ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখা যাবে। তবে হাটুরে পথ পাকাপাকি রকম বন্ধ, বিলপারের মানুষের গোটা কানাপুকুর বেড় দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

হঠাৎ বড্ড বেশি শীত পড়ে গেল।

শীত করে রে বুড়োদাদা, গায়ে দেবো রে কি?
কাছত খানেক কড়ি আছে, দোলাই কিনে দি।

দোলাইয়ে যাবার শীত নয়, দাঁতে দাঁতে ঠকঠকি। গা-হাত-পা কন কন করে। লেপ আর ক'টাই বা লোকের বাড়িতে—বুড়োহাবড়া মানুষ সন্ধ্যে না হতেই কাঁথা-মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলীকুণ্ডলী হয়ে পড়ে। তবে লেপ না থাক, আগুনের মন্বন্তর নেই। বাড়ি বাড়ি অনেক রাত্রি অবধি মানুষে আগুন পোহায়।

পুববাড়িতে নতুন দুই চালাঘর উঠে দক্ষিণের উঠোনে ঘের পড়ে গেছে, চকমিলানো বাড়ির মতন হয়েছে। উটকো লোকের চলাচল বন্ধ, তা বলে পড়শিদের ওঠা-বসার বাধা নেই। ঢেঁকিশালের সামনে জামরুল গাছটার নিচে আগুন পোহানোর খাসা এক আড্ডা জমে উঠল। উদ্যোক্তা রমণী দাসী। গাছতলায় কুড়িয়ে কুড়িয়ে শুকনো ডালপালা আনে। খানা-ডোবায় যত্রতত্র এমন পাটকাটি—এনে রাখে তার কয়েক বোঝা। বাঁশতলায় শুকনো বাঁশপাতাও ডাঁই হয়ে আছে—কয়েকটা কঞ্চি একত্র বেঁধে ঝেঁটিয়ে আনলেই হল। দিনমানে এইসব জুটিয়ে-পুটিয়ে আনে, সন্ধ্যার পর আগুন দেয়। আঁটো জায়গা বলে হাওয়ার উৎপাত নেই—আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে, মানুষ এসে জমতে থাকে।

রমণী দাসী মাঝবয়সী বিধবা। আঁটোসাঁটো গড়ন, অদ্ভুত রকমের সাহসী। সোনাখড়ি ও চতুষ্পার্শ্বের পাঁচ-সাতখানা গ্রাম এবং বিলগুলো তার পায়ের

তলায়। সাপ যথেষ্ট, সময় সময় এই শীতকালে কেঁদোবাঘের আবির্ভাব ঘটে। প্রয়োজনের মুখে তবু রাতবিরেতে বেরুতে রমণীর আটকায় না। নষ্ট মেয়েমানুষ—বলে নাকি ভৈরব পালোয়ান। গরুর-গাড়িতে সোয়ারি বয় নিতাই ঘোড়ল—তারই বাপ ভৈরব। এখন বুড়োমানুষ, কিন্তু বয়সকালে বলশক্তি দৈত্যদানবের মতো ছিল। তখনকার অনেক গল্প লোকের মুখে মুখে ফেরে। নামের সঙ্গে 'পালোয়ান' বিশেষণও সেই আমলের। ভৈরব নাকি রমণী দাসীর চালচলন পছন্দ করে না, যা-তা বলে বেড়ায়। প্রহর বেলায় একদিন ভৈরব কুটুম্ববাড়ি থেকে ফিরছে—মাঝবিলে ভুতুড়ে-বটতলার কাছে রমণীর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। আর যাবে কোথা পালোয়ান-টালোয়ান রমণী দাসী গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না—ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘিনীর মতন ভৈরবের উপর। বাবরি চুল, দুধের মতন সাদা, থরে থরে মাথার চৌদিকে ঝুলছে। সেই চুল মুঠোয় ধরে ধাক্কা মেরে বৃদ্ধকে চষা-ভুঁয়ের উপর ফেলল। চেঁচাচ্ছে : ভেবেছিস কি ওরে বুড়ো, নষ্টামি আজ তোর সঙ্গেই করব—কত বড় বাপের বেটা দেখি। এক হাতে চুল মুঠো করে ধরেছে, কিল-চড়-ঘুষি ঝাড়ছে অন্য হাতে। লাঙল ফেলে চাষারা হৈ-হৈ করে এসে পড়ল।

এত দাপটের মানুষ ছিল ভৈরব—বুড়ো হয়ে রাগ-টাগ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। মিছে কথা রমণী, ডাহা মিথ্যে, মিছামিছি তুই ক্ষেপে গেলি—এইসব বলে মুষ্টিবদ্ধ চুল ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। ছাড়া পেয়ে তারপরেও কিন্তু নড়ে না, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে—স্ত্রীলোকের পরাক্রমে মুগ্ধ হয়ে গেছে সে। ভৈরব হেন পালোয়ানেরও দুর্গতি দেখে রমণী দাসীর চরিত্র নিয়ে বলাবলি সেই থেকে একেবারে চুপ হয়ে গেছে।

গল্প বলতে রমণীর জুড়ি নেই। সন্ধ্যার পর আগুন ধরিয়ে দিয়ে যেদিকটা কাঠ-পাতা গাদা করে রেখেছে, সেইখানে সে বসে যায়। আগুন না নেভে—সমানে কাঠ পাতা দিয়ে যাচ্ছে। আর মুখে মুখে গল্প। গোড়ার দিকে ছেলেপুলেরা সব শ্রোতা। বাড়ির কমল-পুঁটি তো আছেই, পাড়া থেকে সব এসেছে। বুড়ো ভৈরবের কাজ-কর্ম নেই, এক একদিন সে-ও চলে আসে। গল্প শোনে বাচ্চাদের ভিতর একজন হয়ে। ঠেঙানি খেয়ে রমণীর উপর আক্রোশ দূরস্থান, ভাবসাব যেন বেশি করে জমেছে। আগুন ঘিরে গোল হয়ে সব বসে যায়। এই সাঁঝের বেলা শুককথাই (রূপকথা) বেশির ভাগ এখন—রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর পাতালবাসিনী-রাজকন্যা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী গোবর-চাপা দেওয়া সাপের মাথার মাণিক—এইসব গল্প। মেলা শুককথা জানে রমণী।

মাঝে-মাঝে ভৈরব পালোয়ানের জোয়ান বয়সের কথাও উঠে পড়ে, সে সব গল্পও রমণীয়. অনেক শোনা আছে—ওকথারই সমান মজাদার। উল্টোপাল্টা হয়ে গেলে জোতা ভৈরব ফোড়ন কেটে ওঠে, কোন অংশ বাদ চলে গেলে ভৈরবই জুড়েগেঁথে ঠিক করে দেয়।

ছেলে নিতাইয়ের মতন ভৈরবও গরুর-গাড়ি চালাত। ঝড় হয়ে গেছে আগের দিন। কামার-দোকানের সামনের রাস্তায় ভৈরব গাড়ি দাবড়ে বিলের দিকে যাচ্ছে। ডালপালা সমেত বিশাল এক আমগাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ। কৈলেস কামার চেঁচাচ্ছে: গাড়ি ঘোরাও পালোয়ান। সেই হক্কের-খাল ঘুরে যেতে হবে।

ভৈরব নেমে পড়ল। গতিক সেই রকমই—গাড়ি পিছিয়ে নিয়ে খালের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিলে গিয়ে পড়া। বিস্তর ঘুরপথ, সময় অনেক লাগবে। তারও বড়—গাছ দেখে পরাজয় মেনে পিছানো পালোয়ানের পক্ষে ঘোরতর অপমানের ব্যাপার।

কৈলেস বলছে, ভেবে কি করবে? ডালাপালা ছেঁটে গুঁড়ি উপড়ে ফেলে তবে পথ বেরুবে। পাঁচ-সাত দিনের ধাক্কা।

সহাস্যে ভৈরব বলে, আর বুঝি উপায় নেই কর্মকারমশায়?

আর, ঐ হক্কের-খালের পাশে পাশে ঘোরা।

ভৈরব সর্দার ছুটে গিয়ে আমগাছে পড়ল। গুঁড়ি বেড়ের মধ্যে আসে না তো মাথার দিক ধরে টানাটানি। একলা—শুধুমাত্র এই একটি মানুষ। অত বড় গাছ এক-মানুষের টানেই গড়িয়ে পাশে গিয়ে পড়ল। রাস্তা পরিষ্কার। ভৈরব বলে, যাদের গাছ তারা এসে ধীরে-সুস্থে ডালপালা ছাঁটুক, গুঁড়ি ফেঁড়ে তক্তা বানাক—পথ বন্ধ হয়ে লোকের কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটাবে না।

একবার কোন কাজে ভৈরব সর্দার ডুমুরের হাটে যাচ্ছে। হাটুরে-ডিঙির যা নিয়ম, চড়ন্দারে পালা করে বোঠে বাইবে। ভৈরব বোঠে ধরেছে এবার। কী পালোয়ানি বাওয়া রে বাবা—মাঝি সামাল করছে: আস্তে রে ভাই, আস্তে। বলতে বলতে চড়াৎ করে বোঠে ভেঙে দুই খণ্ড। ডিঙি ঘুরে যায়। মাঝি গালি পাড়ছে। অন্য বোঠে নিতে গেলে সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে: কখনো না! বোঠে ধরা হটকো লোকের কর্ম নয়, বুদ্ধিশুদ্ধি লাগে। ভৈরবের অতএব হাত-পা কোলে করে চুপচাপ বসে থাকা এবং দু-কানে অবিশ্রাম গালি শোনা। সারা পথ এমনি চলল। ঘাটে পৌঁছে গিয়ে মাঝি বলল, খুব কৃতার্থ করেছ আমাদের, গা তুলে এইবারে নেমে পড়। অপমানে ভৈরব গুম হয়ে বলেছিল,

লম্ফ দিয়ে নামল। নেমে ডিঙির গলুই ধরে হড়-হড় করে টান। টানের চোটে ডাঙায় উঠে গেল ডিঙি তবু ছাড়ে না—ডাঙার উপরে টেনে নিয়ে চলেছে মানুষজন ও মালপত্র সমেত। হাটের সীমানা ছাড়িয়ে তারপরেও চলল। হাট ভেঙে এসে লোকে আজব কাণ্ড দেখছে। কাড়ালের উপর মাঝি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে—পারে না, পড়ে যায়। জোড়হাত করছে সে: ঘাট হয়েছে, ক্ষেমা দে ভৈরব-ভাই। যেলা দূর এনে ফেলেছিল, জলে ফিরিয়ে দে আমার ডিঙি। বয়ে গেছে, ডিঙি ছেড়ে দিয়ে ভৈরব লহমার মধ্যে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। মাঝি কপাল চাপড়ায়: ডিঙি এখন গাঙে নিয়ে ফেলবার কি উপায়?

হাটঘাট সেরে ফিরতি বেলা ভৈরব আর নৌকোর ঝামেলায় গেল না। পথ কতটুকুই বা—ক্রোশ পনেরোর মতো হতে পারে। অর্থাৎ তিরিশ মাইল—যা বললে সবাই বুঝে যাবেন। সামান্য পথ সে হেঁটেই মারল, রাত না পোহাতেই বাড়ি পৌঁছে গেল।

আর একদিনের ব্যাপার। ভৈরব পালোয়ানের নাম যে-না সেই জানে। দক্ষিণ অঞ্চলে তেমনি আর একজন আছে, তার নাম পালান কয়াল। পালানের পাটের কারবার—মরশুমে পাট কিনবার জন্য লোক-নৌকো নিয়ে এই দিগের এসে পড়েছে। এসেছেই যখন, খোঁজে খোঁজে সোনাখাড়ি গিয়ে হাজির। বড় বাঞ্ছা, ভৈরব পালোয়ানের সঙ্গে একহাত লড়ে যাবে।

ভৈরবের গাইগরুটা মাঠে বাঁধা—ছেলে সকালবেলা বেঁধে গেছে। জল খাওয়াতে গিয়ে ভৈরব দেখে, চিটেপানা পেট—ঘাস নেই, কি খাবে? সারা বেলাই নির্জলা উপোস করে আছে, বলা যায়। কি খাইয়ে গরুর পেট ভরানো যায় এখন? সামনে তালকো-বাঁশের ঝাড়, তাছাড়া আর-কিছু নজরে আসে না। বাঁশ তো বাঁশই সই—ভৈরব প্রকাণ্ড একটা বাঁশ নুইয়ে গরুর মুখে ধরল। মহানন্দে গরু বাঁশের পাতা খাচ্ছে—

হেনকালে রাস্তার উপর থেকে পালানের প্রশ্ন: পালোয়ান ভৈরব সর্দার মশায়ের বাড়ি তো ঐ। বাড়ি আছেন তিনি?

ভৈরব ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল: কি দরকার তাঁর কাছে?

কাছে এসে পালান বিনয় করে বলে, পালোয়ান মশায়ের ভুবন-জোড়া নামডাক—ছুটো জেলা পার হয়ে আমাদের তল্লাট অবধি গেছে। আমারও অমনধারা সুখ্যাতি আছে। লোভ হয়েছে, একহাত লেগে দেখব পালোয়ান মশায়ের সঙ্গে। সেইজন্যে এসেছি।

ভৈরব জ্রকুটিদৃষ্টিতে পালানের আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে। লোকটা বলে

যাচ্ছে, আমার কি! ও-মানুষের সঙ্গে হারলে অপযশ নেই, কপাল গুণে যদি জিতে যাই তবে তো পাথরে-পাঁচকিল। আছেন তিনি বাড়িতে?

ভৈরব বলে, আছেন। আপনি গরুটাকে বাঁশের পাতা খাওয়াতে লাগুন, ডেকে এনে দিচ্ছি। বাঁশ ছাড়বেন না কিন্তু, টেনে ধরে থাকবেন। ছেড়ে দিলে খাড়া উঠে যাবে। গরুর এখনো পেট ভরেনি, আরও কিছু পাতা খাবে।

রাজি হয়ে পালান বাঁশের মাথা টেনে ধরল। যেই-না ভৈরব ছেড়ে দিয়েছে, বাঁশ সঙ্গে সঙ্গে অমনি টনটনে খাড়া। পালান ছাড়েনি, এঁটে সেঁটে ধরে রয়েছে, বাঁশের সঙ্গে শূন্যে উঠে গেছে সে, ঝুলছে। নিচে দাঁড়িয়ে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে ভৈরব। বলে, আমি—আমিই ভৈরব সর্দার। মাল লাগার সাধ আছে এখনো? নেমে পড় তা হলে।

লাফ দিয়ে পালান বাঁশতলায় পড়ল। মুখে আর কথাটি নেই। ভৈরবের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। তারপরে দৌড়। দৌড়—দৌড়—চক্ষের পলকে অদৃশ্য।

সেই ভৈরব বুড়ো হয়ে গিয়ে রমনী দাসের হাতে নাস্তানাবুদ। সন্ধ্যেবেলা আগুন ঘিরে গোল হয়ে বসে বাচ্চাদেরই একজন হয়ে সে এখন রূপকথা শোনে। তার নিজের গল্প হয়—সে-ও অলীক রূপকথা, রমনী যেন অচীনদেশের কোন দৈত্যদানবের কথা বলে যাচ্ছে।

রাত বাড়ে। শেয়ালের কান্না আসে আমবাগানের ওদিক থেকে। কুয়োপাখি ডাকে। কচুবনে সজারু ঝুম-ঝুম ঝুম-ঝুম করে জলতরঙ্গ যেন বাজিয়ে ছুটে যায়। রমনী দাসের মুখ সমানে চলেছে—সেই সাঁঝেরবেলা থেকে তিলার্ধ জিরান নেই। শ্রোতার বদল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে একজন দু'জন করে। কমল ছিল, পুঁটি ছিল, এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছিল। হয়তো-বা বুড়ো ভৈরব ছিল। এখনি বয়স্ক আর যে কেউ ছিল না, এমনও নয়। ছোটরা সব এখন ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে, গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে। গল্প এখন বড়রা শুনছে। গল্পও আলাদা। রমনী কবে কেউটে-সাপের মুখে পড়েছিল, চৈত্রের দুপুরে চালকহীন ঘোড়া ভারী খুরের আওয়াজ তুলে আসান-নগরের বিলের মধ্য দিয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল—এই সমস্ত গল্প। মামলা-মোকদ্দমার গল্পও হয়। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রমনী নাকি কোমরে আঁচল বেঁধে উকিলের সঙ্গে কোন্দল করেছিল, হাকিম একেবারে থ বনে গিয়েছিলেন।

গল্পের মধ্যে এক সময় উদাত্তকণ্ঠীর গলা পাওয়া যায়। উঁচু গলায় তিনি

সাবধান করে দিচ্ছেন : ওরে মন্দী, যাবার সময় জল ঢেলে ভাল করে আগুন নিভিয়ে যাস মা।

টকটকে চেহারা, দীর্ঘদেহ, গায়ে জবড়জং জোব্বা, দু-পায়ে সের দশেক ওজনের জুতো, হাতে লাঠি, কাঁধে বিপুল বোঁচকা—মূর্তিগুলো গ্রামপথে ঘোরা-ঘুরি করছে। কাবুলিয়ালা—বরকত খাঁ, বাদশা খাঁ, আকবর খাঁ এমনি সব নাম। অত কে নামের হিসাব রাখতে যায়—লোকে খাঁ-সাহেব ডেকে খালাস। শীতকালে আসে শাল-আলোয়ান-কম্বল বিক্রি করতে, পেস্তা-বাদাম-কিসমিসও আনে কোন কোন বার। চৈত্রমাস পড়তে না পড়তে চলে যায়।

এক খাঁ-সাহেব পুববাড়ি ঢুকে পড়ল। শিস্তবর কাবুলিওয়ালার মক্কেল, একেবারে সে সামনাসামনি পড়ে গেল। শশব্যস্তে খাতির করে বলে, এসো এসো খাঁ-সাহেব। কবে আসা হল?

খাঁ-সাহেবটির প্রতীক্ষায় পথ তাকাচ্ছিল সে এতদিন—এমনিতরো ভাব। বলে, খবর ভাল তোমার?

হ্যাঁ ভাল। রুপেয়া নিকলাও।

নিকলাব বই কি। দশ কাঠা ভুঁয়ের কোটা ঐ জন্যে আলাদা করে রাখা আছে। আর একটু দর উঠলে ছেড়ে দেব। আছ তো তিন-চার মাস এখন—তাড়া কিসের? আমিই ফকিরবাড়ি গিয়ে মিটিয়ে দিয়ে আসব, তাগাদা করতে হবে না।

গেল-বছর শিস্তবর শখ করে বউয়ের জন্য পশমের আলোয়ান কিনেছিল। নগদ দাম লাগে না বলে অনেকেই কেনে এমন। ধারে পেলে হাতি কিনতেও রাজি পাড়াগাঁয়ের লোক, দরকারে লাগবে কিনা সে বিবেচনা অবান্তর। কাবুলিওয়ালার ব্যবসা এই জন্যেই চালু। এসে এখন আগের পাওনা আদায় করছে, নতুন আবার ধার দিচ্ছে। জনমজুর খেটে দিন আনে দিন খায়, নড়বড়ে কুঁড়েঘরে থাকে, আপনি আমি ভরসা করে আটগণ্ডা পয়সা হাওলাত দিইনে, সেই মানুষকে কাবুলিওয়ালা বচ্ছন্দে পাঁচ-সাত-দশ টাকার জিনিস দিয়ে কত সব পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে স্বদেশে চলে গেল। আগামী শীতে শোধ হবে—এ শীতে যেমন আগের পাওনা শোধ হচ্ছে। হতেই হবে, অন্যথা নেই—বংশ সুদ্ধ মরে লোপাট হয়ে যায় তো আলাদা কথা, নয়তো কাবুলি-ওয়ালার টাকা কেউ মারতে পারবে না। দৈত্য-সম মানুষটা যখন 'লাও রুপেয়া' বলে উঠোনে লাঠি ঠুকবে, টাকা তখন দিতেই হবে যেমন করে পারো।

কৃষ্ণময় পশ্চিমের-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, তোমার বোঁচকা একবার খোল দিকি খাঁ-সাহেব, নতুন কি সব মাল আনলে দেখি। চোখের দেখাই শুধু—কেনাকাটা পেরে উঠব না। যা দাম হাঁকো তোমরা। কলকাতার দরের সঙ্গে আকাশ-পাতাল তফাত।

কাবুলিওয়ালা বাংলা কথা বলে—তাতে আড়ষ্ট ভাব। কিন্তু অন্যের কথা দিব্যি বুঝে নেয়। এমন কি হাসি-মস্করাটুকুও। বলল, রুপেয়া নগদা কেলো না—পচা করে দিবো।

তামাক সেজে শিশুবর টানতে টানতে এল। হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে কাবুলিওয়ালার দিকে এগিয়ে ধরে: খাও—

বাংলা মুলুকে কতকাল ধরে আসা-যাওয়া, কিন্তু দু-হাতের চেটোয় কলকে টানা অদ্যাপি রপ্ত হয়নি। কলাপাতার ঠোঙা বানিয়ে ভিতরে কলকে বসিয়ে শিশুবর হাতে দিল। কাবুলিওয়ালা টানছেও বটে, কিন্তু মুখে ধোঁয়া যায় না। হাসে সবাই হি-হি করে: ও খাঁ-সাহেব, হচ্ছে কই? দেখে নাও আমরা কি করি, কোন কায়দায় টানি।

কৃষ্ণময় বলল, তুলে পেড়ে রাখ খাঁ-সাহেব। ফকিরবাড়ি যাব কাল-পরশুর মধ্যে, তোমাদের কার কি মাল আছে দেখব। বাবার বালাপোষ ছিঁড়ে গেছে, তুষ একটা কিনতে পারি যদি অবিশ্যি গলা-কাটা দাম না হাঁকো।

ফকিরবাড়ি তল্লাটের মধ্যে সুবিদিত—পাশের কোশাখোলা গ্রামে হাতেম আলি ফকিরের বাড়ি। আল্লার বান্দা, সত্যনিষ্ঠ মানুষ তিনি। মুখ ফসকে দৈবাৎ কোন কথা যদি বেরিয়ে যায়, তা-ও তিনি সত্য করে ছাড়বেন। একটা গল্প খুব চালু—পোষা গরু দড়ি ছিঁড়ে পড়শির ক্ষেতে পড়েছিল, পড়শি এসে নালিশ করে গেছে। ফকির তাই নিয়ে চাকরকে ধমকাচ্ছেন: ঘরে কোটা থাকতে নতুন দড়ি পাকিয়ে কেন গরু বাঁধা হয় না? চাকর বলল, কোটা রয়েছে উড়োদড়ির জন্য। ফকির চটেমটে বললেন, হবে না উড়োদড়ি। ফকিরের অন্তত দশকুড়ি খেজুরগাছ, গাছ-ঝ'লের দরুন মোটা রোজগার। খেজুরগাছ কেটে ভাঁড় ঝুলিয়ে দেয়, টপ টপ করে রস পড়ে ভাঁড় ভর্তি হয়। যে দড়িতে ভাঁড় টাঙায় তাকে বলে উড়োদড়ি। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, উড়োদড়ি হবে না—তো কোনক্রমেই হবে না। অতএব গাছঝ'ল বন্ধ। উড়োদড়ি দিয়ে ভাঁড় বাঁধা চলবে না, খেজুরগাছ কাটিতে যাবে তবে কিসের জন্য? একগাদা টাকা লোকসান একটা বেফাঁস কথার জন্য। এতদূর সত্যবাক্ বলেই বোধহয় লোকের রোগপীড়া নিয়ে যা বলেন, তা-ও খেটে যায়। শুক্রবারে ফকির থানে বসেন না—ঐ দিনটা বাদ দিয়ে দেখতে পারেন, ঘটি হাতে

কাতারে কাতারে মানুষ ফকিরবাড়ি চলেছে ফুল-পানি নিয়ে নেবার জন্ম।

পশ্চিম-দুয়ারি ঘরে থান। সামনে বিশাল পুকুর—পুকুর না বলে দীঘি বলাই ঠিক। চার পাড়েই ঘাট-বাঁধানো। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ের উপর লম্বা চালাঘর। যারা পাগলবাবার (পাগলবাবারই সেবাইত ফকির) মানত শোধ করতে আসে, উত্তর দক্ষিণের চালা দুটো তাদের জন্ম। উত্তরেরটা মুসলমানদের—মানতের মুরগি জবাইয়ের পর রাঁধাবাড়া-খাওয়া ও বিশ্রাম ওখানে। দক্ষিণপাড় হিন্দুদের—মানতের পাঁঠা বলি দিয়ে ঐ চালাঘরে প্রসাদ পায় তারা। পশ্চিমপাড়ের চালা খোপে খোপে ভাগ করা—বাইরের লোক এসে ঐসব আস্তানা নেয়। যে-কেউ এসে থাকতে পারে। দায় জানলে খোরাকি পাবে ফকিরবাড়ি থেকে—ফকিরের বড়বিবি মানুষ হিসাব করে চাল মেপে দেবেন। যেমন এসে উঠেছে কাবুলিওয়ালা—প্রতিবারই এসে এখানে আস্তানা নেয়। এমন জুত আর কোথা?

অমনি আসে তবলদারের দল। চার-পাঁচ দল এবারও এসেছে। উড়িষ্যা অঞ্চলের বাসিন্দা—দু'জনে এক-এক-দল। ভারী ওজনের কুড়াল ঘাড়ে নিয়ে আসে তারা—মুখের দিকটা সরু, ঐ ধরনের কুড়াল আমাদের কামারে গড়ে না। গাছি'লের এই মরশুমে খেজুররস জাল দেবার জন্ম নিত্যিদিন বিস্তর কাঠের প্রয়োজন। আগাম টাকা দিয়ে ম'লদারে আম জাম তেঁতুল বাবলা ইত্যাদি কিনে রাখে। কেনা গাছ সঙ্গে সঙ্গে কাটে না, যেমন আছে রেখে দেয়। কাটা ও চেলা করা এইবারে—পোড়ানোর এই প্রয়োজনের সময়। সে কাজ তবলদারে করে জনমজুর দিয়ে এত তাড়াতাড়ি এমন পরিপাটি ভাবে হয় না।

আরও কত রকমের সব এসে আস্তানা গাড়ে! বর্ষা-অন্তে লক্ষীমন্ত গৃহস্থরা এইবারে ইট কাটবে, দালান-কোঠার ভিত কাটবে—সুদূর পশ্চিম অঞ্চল থেকে ইট-কাটা কুলিরা এসে ফকিরবাড়ির দাওয়ায় গাছতলায় ঘাটের পাকা-চাতালে যে যেখানে পারে ঠাঁই নিয়ে নেয়। রাজঘাটের রাজমিস্ত্রিরা পাটা-কর্নিক নিয়ে এসে পড়ে। কপোতাক্ষ-পারের করাতিদের দল আসে মস্তবড় করাত দু-তিন জনে কাঁধের উপর নিয়ে। ভরা মরশুমে চাষী এখন তো পয়সার স্রোতে ভাসছে, নানারকমের মতলব মাথার মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। কোন একটা মতলব কেঁদেছে—ফকিরবাড়ি গিয়ে দেখবে, সেই কাজের কারিগর এসেছে কিনা। না এসেও এসে যাবে দু-পাঁচ দিনের মধ্যে—বরাবরই আসে, ভাবনা নেই।

গঞ্জে সাহামশায়ের গুদামে দু-গাড়ি পাট তুলে দেওয়া ইস্তক চৈতন ঘোড়লের

মনে অস্বস্তি হয়েছে—মেঝের মাটির উপর শোওয়া ঠিক হচ্ছে না। ঠাণ্ডা লাগে, তা ছাড়া সাপখোপের ভয় তো আছেই। বুড়ো কাঁঠাল গাছটায় কাঁঠাল ধরা অনেক কাল বন্ধ—গাছটা চেরাই-ফাড়াই করে তক্তপোষ বানানো যাক। গেল সে ফকির বাড়ি—করাতি এসে লাগিয়ে দিল। গাঁ-গ্রামে গাছ কেঁড়ে তক্তা বানানোও মজুব বিশেষ, দেখায় অনেক লোক আসে। খবর শুনে কমল বিকেলের পাঠশালা সেরে বইদপ্তর ছুঁড়ে দিয়ে মোড়ল পাড়া ছুটল।

উপরের মানুষটা, দেখ দেখ, করাত টেনে উপরে নিয়ে তুলছে, নিচের মানুষ-দুটো টেনে আবার নিচে নামাচ্ছে। আবার উপরে তোলে, আবার নিচে নামায়। পেটের ভিতরে সেঁধিয়ে গেছে করাত, বিতিকিচ্ছি টানা-হেঁচড়া চলছে—আহা, বুড়ো গাছের কী দুর্গতি! টানে টানে কাঠের গুঁড়োর বৃষ্টি হচ্ছে, গুঁড়ির গায়ে তক্তাগুলো সব হাঁ হয়ে পড়ছে। করাতিদের দিব্যি নাচের তাল। করাত উপরে ওঠার সঙ্গে নিচের মানুষজোড়া এগোচ্ছে, উপরের মানুষের হাতজোড়া মাথার দু-দিক দিয়ে উঠে যাচ্ছে। তারপর নামে করাত নিচে, মাটির লোক দুটো পায়ে পায়ে পিছিয়ে যায়।

উপরের করাতি কাতর হয়ে পড়েছে, জিরিয়ে নেবে বলে নেমে পড়ল। করাত টেনে টেনে হাতের তালু খালি লেগেছে, শীতকালে ঘাম দেখা দিয়েছে, ঘামের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ো সর্বাঙ্গে লেপটে গেছে—এই সমস্ত বলছে। অনতিদূরে পুকুর, পুকুরে নেমে অঞ্জলি ভরে খুব খানিকটা জল খেয়ে নিল। গামছায় বাড়ি দিয়ে গা ঝাড়ছে। কমলের মজা—কাজ বন্ধ তো কোমরের কাপড়ে কোঁচড় বানিয়ে দেদার কাঠের গুঁড়ো তুলে নিচ্ছে। গুঁড়োর কতক হলদে, কতক বা রাঙা। দুর্লভ ঐশ্বর্য—পুঁটি ও অন্তদের তাক লাগিয়ে দেবে।

বিনো এসে পড়ল এতদূর অবধি। বিষম ডাকাডাকি: চলে এসো খোকন। ইস্কুল থেকে গিয়ে খাওয়া নেই দাওয়া নেই—এত কি দেখবার এখানে?

কী দেখবার আছে, উনি ভেবে পান না। কমল তো চোখ ফেরাতে পারে না। ঘসর-ঘসর ঘ্যাস-ঘ্যাস করে করাত পুরোদমে লেগে গেল আবার। পোঁচে পোঁচে গুঁড়ো ছিটকে পড়ছে। কাঁঠালগাছ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছে। আশপাশের গাছপালা সব স্তম্ভিত হয়ে আছে। না-জানি কখন ওদের পালা আসে—ভয় হচ্ছে নিশ্চয় খুব। একটা ডালে কাঠবিড়ালি ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে পড়ল—বুড়ো কাঁঠাল গাছের দুর্গতি দেখছে?

॥ তেত্রিশ ॥

বিষ্যুৎবার আজ, হাটবার—খেয়াল আছে? রবি মঙ্গল বিষ্যুৎ—হপ্তায় তিনদিন হাট। খেয়াল না থাকলে অন্যেরাই খেয়াল করিয়ে দেবে। হাট শুধু কেনা-বেচার জন্য নয়—পাওনা আদায়, ধার-দেনা শোধ, দশ গ্রামের লোকের দেখা সাক্ষাতের জায়গা। বিষ্যুতের হাটকে বলে চায়ের হাট, এর পরের হাট যেহেতু চারদিনের মাথায়—রবিবারে। চায়ের হাট বলেই কদরটা বেশি। পয়সায় খাঁকতি যতই থাক, একেবার ঢুঁ মেরে আসতেই হবে— আজকের হাট কামাই দেওয়া চলবে না।

সন্ধ্যার সামান্য বাকি। দাওয়া থেকে শশধর দত্ত হাটের পথে তাকিয়ে লোক-চলাচল দেখছেন, আর ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকো টানছেন। নিশি ঘরামি ঘরের মটকা সেরে দিয়েছিল—

এরাই কেবল আসে, দুপুর থেকে চার-পাঁচজন হয়ে গেল। যাদের কাছে শশধর পাবেন, নজর এড়িয়ে তারা জঙ্গল ভেঙে হাটে চলে যায়।

নিশিকে শশধর বলে দিলেন, হাটে যাও ঘরামি। সেখানে পাবে।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে নিশি বলল, আপনি আবার সকল হাটে যাও না দত্তমশায়—

শশধর খিঁচিয়ে উঠলেন: আমি না যাই, নারাণ তো যাবে। তোর পাওনা আটকাচ্ছে কিসে?

এন্তেম মোড়ল বেগুন ক্ষেতের বেড়া দিয়েছিল, একবেলার জোনের দাম পাবে। তাকেও হাটের কথা বলে দিলেন। যতীননাথের ক্ষেতের দু-সের হলুদ এসেছে—তাকে বললেন, আজ হবে না বাপু, সামনের হাটে। কালু গাছি এক কলসি খেজুর গুড় দিয়েছিল—শশধর বললেন, ঢেঁকি গড়তে তুমিও আমার বাবলা গাছ নিয়েছ কালু। দাম সাব্যস্ত হয়ে কাটাকাটি হবে, তবে তো। আর একদিন এসো নিরিবিলি সময়ে।

কালু বলে, কবে?

এসো দিন পাঁচ-সাত পরে। ভিটে ছেড়ে পালাব না রে বাপু, ভয় কিসের?

উত্তর-বাড়ির যজ্ঞেশ্বরকে দেখতে পেয়ে: কে যায়—যজ্ঞি না? কবে বাড়ি এয়েছ, দেখতে পাইনি তো।

এতক্ষণে এই একজন—শশধর যাঁর কাছে টাকা পাবেন। সমাদরে আহ্বান করেছেন : উঠে এসো যজ্ঞি, তামাক খাওসে এসে।

হুঁকো হাতে নিয়ে আসল কথাটা যজ্ঞেশ্বর নিজেই তুলে দিলেন : ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপের ইঁট নিয়েছিলাম, কিছু দাম বাকি রয়ে গেছে। এবারে শোধবোধ করে দিয়ে যাব। আর যা বলতে এসেছি দত্তজা মশাই, থাউকো একটা দর ঠিক করে ভাঙা মণ্ডপ সম্পূর্ণ দিয়ে দাও আমায়। ইঁটগুলো নিয়ে গিয়ে পাকা দেয়ালের একটা ঘর তুলব। তোমারও অতখানি জায়গা জঙ্গল হয়ে সাপ-পোকের বাতান হয়ে পড়ে আছে, সাফসাফাই হয়ে যাবে। কিছু না হোক, কলা-কচু রুয়ে দিলেও সংসারের কত আসান।

কথার মধ্যে মেঘা কর্মকার এসে পড়ল। নাছোড়বান্দা তাগিদদার। আবার দত্তমশায়ও যেমনি—যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল—মেঘার ব্যাপারে তিনি যেন বেশি রকম কঞ্জুষ। সেই কবে আষাঢ় মাসে পোয়াল-কাটা বঁটি গড়ে দিয়েছিল—তিন কিস্তিতে খানিক খানিক শোধ হয়ে অদ্যাপি ছয় আনার পয়সা বাকি; এসে দাঁড়াতেই শশধর মাথা নেড়ে দিলেন : আজ কিছু হবে না মেঘনাথ, মেলা জনকে দিতে হল। রবিবারের হাটেও না। মঙ্গলবারে আসিস—দেখব।

মেঘা প্রায় হাহাকার করে উঠল : হাতে-গাঁটে সিকিপয়সা নেই দত্তমশায়। চারে হাট কামাই গেলে সগোষ্ঠি খাব কি?

শশধর অবিশ্বাসের সুরে বললেন, হ্যাঁ তোর আবার পয়সার অভাব! বছরভর এত যে লোহা পেটাসি—পয়সা যায় কোথা?

মেঘা বলে, খরচাও যে তেমনি। চারগণ্ডা মুখ সংসারে—মানুষ বলি নে দত্তমশায়, মুখ ধরে ধরে আমার হিসেব। তিন বেলায় ধরুন তিন-চারে বারো-গণ্ডা মুখ আমায় ভরে যেতে হয়। আর, সে কি আপনাদের ঘরের মুখ? এক একজনে যা ভাত টানে—চোখ দিতে নেই দত্তমশায়, কিন্তু আপনার চারকুড়ি বয়স হতে চলল—আমার চার বছরে মেয়েটার সঙ্গেও আপনি ভাত খেয়ে পারবেন না।

অনেক টানাহেঁচড়ার পর চার আনা আদায় নিয়ে মেঘা কর্মকার বিদায় হল। শশধরের ছোটছেলে নারায়ণদাস এসে পড়েছিল, দাঁড়িয়ে গেছে। হাটে যেতে হবে তাকেই। এদের সামনে শশধর কদাপি হাটের পয়সা বের করে তার হাতে দেবেন না। বিরক্ত হয়ে সে ঘড়ি দেখে এল। একলা মেঘার সঙ্গেই সময় লেগেছে ঠিক বাইশ মিনিট। শেষ পর্যন্ত দুই আনার জন্য যেন মরণ-বাঁচন। শশধর দেবেন না, মেঘা কর্মকারও না নিয়ে যাবে না। কে

কতদূর কাতরোক্তি করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা। বৃদ্ধ শশধরেরই জিত, ছ-আনা বাকি রেখে মেধাকে চলে যেতে হল।

নারায়ণদাস কিছুটা রগচটা। গজর গজর করছেঃ পাওনাগণ্ডা সেই সেই দিতে হবে—ফেলে দিলেই চুকে যায়। মানুষকে অকারণ ঘোরানো আমি পছন্দ করি নে।

শশধর বলেন, তুমি হলে কি করতে?

ছ-আনার পয়সা ফেলে দিতাম সঙ্গে সঙ্গে। আধ মিনিটে কাজ হয়ে যেত।

তবেই হয়েছে। শশধর বক্রহাসি হাসলেনঃ মানুষ হল লক্ষ্মী। গৃহস্থবাড়ি মানুষজন আসবে, যাবে, বসবে গল্পগাছা করবে,—তামাক খাবে—আসা মাত্তোর উনি কাজ চুকিয়ে বিদেয় করে দিলেন! বলি, টাকাপয়সা শোধ হলে লেনদেন চুকেবুকে গেলে মানুষ আর আসবে তোমার বাড়ি?

আসবে না-ই তো। হাতে টাকা না থাকত, আলাদা কথা। কলকাতা থেকে পরশুদিন দাদার টাকা এসেছে—ন্যায্য পাওনা আটকে রেখে মানুষকে হয়রান করার আমি মানে বুঝতে পারি নে।

শশধর রেগে যান। যজ্ঞেশ্বরকে বললেন, মানে বোঝে না—বুঝিয়ে দাও হে যজ্ঞি। এমনি করে বাবুরা সংসারধর্ম করবেন। মানুষজন ওদের উঠোনে ইয়ে করতেও আসবে না, জঙ্গল ভেকে উঠবে। থাকিস সেই জঙ্গলের পশুপক্ষী হয়ে। আমি যে ক'টা দিন আছি, সে জিনিস হতে দিচ্ছি নে।

বাপের বকুনি খেয়ে নারায়ণদাস যজ্ঞেশ্বরকে মধ্যস্থ মানেঃ দেখুন না কাকা, পয়সা রয়েছে—লোকটাকে শুধু মিছামিছি ঘোরানো। ওর হয়তো বড্ড দরকার আজকে। আমি তো জানি, গরজের মুখে পেলে যাতায়াত ভালবাসা-বাসি বেশি করে বাড়ে। বাবা তা বোঝেন না।

না রে বাবা, না—

যজ্ঞেশও বোঝেন না, দেখা যাচ্ছে। তিনি শশধরের দলে। উদাস-পারা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, সংসারে কেউ কারো নয়, সবাই পাকসাট মায়ার তালে আছে—আপন বউ-ছেলে পর্যন্ত, অন্যে পরে কা কথা। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি। খাতির-ভালবাসা আদায় করবে তো বাঁধন-কষন ঢিলা হতে দিও না। ফাঁক পেয়েছে কি, দড়ি-ছেঁড়া গরুর মতো মানুষেরও পাত্তা মিলবে না।

—

অটলকে নিয়ে ভবনাথ নিজেই হাটে চলে গেছেন। কৃষ্ণময় আছে, তাকে

পাঠাতে ভবনাথ নারাজ, তার কেনাকাটা পছন্দ নয়। শহরে থাকে, ওদের মেজাজ আলাদা। কই মাছের কুড়ি চার আনা চাইল তো দরদাম নেই—টুক করে আস্ত সিকিটা ছুঁড়ে দিল ডালির ওপর—যে মাছের কুড়ি দু-আনা দশ পয়সার বেশি কিছুতেই হয় না। কুড়ি যে চব্বিশটায় এবং তদুপরি দুটো ফাউ—এই সামান্য ব্যাপারটাও জানা নেই ওদের। কুড়ির বেশি একুশ দিতে গেলেই হাঁ-হাঁ করে ওঠে: কুড়ি পুরে গেছে পাড়ুইমশায়। জেলে পর্যন্ত অবাক হয়ে যায়। কৃষ্ণময় তাই যেতে চাইলেও ভবনাথ না-না—করে নিজে বেরিয়ে পড়লেন।

ভটচায্যি-বাড়ির গোবরা এলো কৃষ্ণময়ের কাছে। প্রায়ই সে আসে, এসে ভুটুর-ভুটুর করে। গোপাল ভটচায ছেলের একটা চাকরির জন্ত কেইকে বড্ড ধরেছেন। দুর্মূল্যের বাজার—যজন-যাজন এবং পিতৃপুরুষের রেখে-যাওয়া সামান্ত সম্পত্তিতে আর চলবার উপায় নেই। গোবরার হস্তাক্ষরটি খাসা। কিছু না হোক, একটা মুহুরির কাজ জুটিয়ে দাও বাবাজি। জমিদারি এস্টেটের মুহুরি কিংবা আদালতে উকিল বা মোক্তারের মুহুরি। টেবিলের সামনে হোক কিংবা হাতবাক্সের সামনে হোক, কোন এক জায়গায় বসতে পারলে হল। দেবনাথ বাড়ি আসবে শুনছি—এলে তাকেও বলব।

কৃষ্ণময়ই বা গ্রামবাসীর কাছে কেন খাটো হতে যাবে? অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, মুহুরিগিরির জন্ত কাকামশায় অবধি যেতে হবে কেন? আপনাদের আশীর্বাদে ওটুকু আমার দ্বারাই হবে। যাচ্ছিই তো, গিয়ে খবরাখবর নিয়ে পত্তর লিখব, গোবরাকে পাঠিয়ে দেবেন।

যাওয়ার কথাটা গোপালের তত প্রত্যয়ে আসছে না—সন্দেহ বুঝে কৃষ্ণময় জোর দিয়ে আবার বলল, খুব তাড়াতাড়ি যাব। এদ্দিন কবে চলে যেতাম, তা যেন নানান বাগড়া পড়ে যাচ্ছে।

গোপাল টিপে দিয়ে থাকবেন, গোবরা ইদানীং যখন তখন আসে। জমিয়ে ফেলেছে কৃষ্ণময়ের সঙ্গে। জমিদারি সেরেস্তার কথা, এবং কলকাতা শহরের কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে শোনে।

শীতকালে এখন লোকের হাতে-পাটে পয়সা—বিশেষ করে গোলায় আউড়িতে কলসিতে যজ্ঞভঞ্জ ধান। গামালে বেরুনোর এই হল প্রশস্ত সময়। দীর্ঘদিন গামালের কাজ করে করে যদুনাথ ঘাগি হয়ে গেছে। যদুনাথ মণ্ডল, বলাইয়ের বাপ—থিয়েটারে নিয়তির পার্টে নাম করেছিল যে বলাই। যদুনাথ খাটছে খুব, এই ক'টা মাসে বছরের গুছিয়ে নিতে পারে। কাঁধে শিকে-বাঁক

ঝুলিয়ে ঝুড়ি ও বস্তা নিয়ে বেরোয়। ঝাঁকায় গিন্নিপছন্দ বউপছন্দ বাচ্চাপছন্দ রকমারি জিনিসপত্র, যথা—তরল আলতা, গন্ধতেল, আয়না, চিরুনি, চুলের কাঁটা-ফিতে, ঠাকুর-দেবতার পট, সিঁদুর, কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা, কন্যে-পুতুল, বাঁশী, জলছবি ইত্যাদি। মতিহারি-তামাক এবং পান-সুপারি অতিঅবশ্য। চাষী-বাড়ি গিয়ে ওঠে, মরদরা যে সময়টা বাড়ি থাকে না—মাঠে অথবা গঞ্জে চলে গেছে। মেয়েলোক খদ্দের। তাদের নিয়ে ঝামেলা বেশি, মজাও বেশি। অনেক বাছাবাছির পর জিনিস পছন্দ হল তো তখন দরদাম নিয়ে কথাকথি। ধৈর্য হারালে হবে না—খুব খানিকটা দরাদরির পর 'মরে গেলাম' 'বিষম ক্ষতি হয়ে গেল' ইত্যাদি কাতরোক্তি শোনাতে শোনাতে রাজি হয়ে যায় যদুনাথ। সত্যিই যে দামে মাল যাচ্ছে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের কোথাও ঐ দামে কেউ দেবে না। কিন্তু যদুনাথ দিচ্ছে—যেহেতু দাম-শোধ নগদ পয়সায় নয়। চাষী-পাড়ায় ক'টাই বা রানী-রাজকন্যা আছে, গড়াক করে যারা নগদ বের করবার ক্ষমতা রাখে। ধান দিয়ে শোধ করবে। আর, ধানের যে কোন দাম আছে, মেয়েলোকের হুঁশ থাকে না এই ধান-কাটার মরশুমে। ছ-আনা দাম সাব্যস্ত হয়েছে—যদু মণ্ডল পালি ভরা ধান বস্তার মধ্যে ঢেলে দিল। বাড়ির গিন্নি সতর্ক করে দেয়: দেয্য যা, তার বেশি নিও না কিন্তু মোড়ল। পাছ-দুয়োর দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো বাড়ির মানুষ এসে পড়বার আগে।

স্ফূর্তিতে যদুনাথ বাড়ির পর বাড়ি ঘুরছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আজ এই পর্যন্ত থাক—এবারে বাড়ি ফেরা। বিক্রি ঢের হয়েছে—জিনিস যা ফেরত যাচ্ছে, নিতান্ত নগণ্য। বাঁকের দু'দিকেই বস্তা এখন ধানে বোঝাই। ধানের ভারে বাঁকের দুই মাথা ধনুকের মতো নুয়ে পড়েছে। এই বিপুল বোঝা আসাননগরেরও আগে থেকে শুকনো বিল ভেঙে বয়ে আনছে। বুড়ো হয়ে পড়েছে, সেটা বেশ মালুম হচ্ছে যদুনাথের। পা চলতে চায় না—মনের স্ফূর্তিই যেন চাবুক মারতে মারতে ক্রোশের পর ক্রোশ নিয়ে আসছে।

বাড়িতে বলাই রান্নাবান্না করে। বেঁধে ঢাকা দিয়ে রাখে, বাপ এলে দু'জনে পাশাপাশি বসে খায়। বেলা পড়ে আসে, এখনও দেখা নেই আজ। খিদের পেট চোঁ-চোঁ করছে। সামান্ত দূরে বিল—বিলের ধারে চলে গেল বলাই। শুকনোর সময় এখন পায়ে পায়ে পথ পড়েছে ঐ-ই বটগাছ অবধি। সেখান থেকে ডাইনে মোড় নিয়ে আরও খানিকটা গিয়ে আসাননগর।

যদুনাথকে দেখা যায় না। বলাই বিলে নেমে পড়ল। তিন-চারটে মানুষ—হাটুরে মানুষ তারা—গঞ্জে হাটে যাচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে এসে তারা খবর দিল, যদুনাথ অজ্ঞান হয়ে বিলের মাঝে পড়ে আছে, বাঁকের বোঝা পাশে গড়াচ্ছে।

রোদ্দুরে ঝিমঝিমি লেগেছে—অত বোঝা বয়ে আনা যদুনাথের মতো মানুষের পক্ষে কঠিন বটে।

বলাই পাগল হয়ে ছুটল। পাড়াপড়শি আরও সব যাচ্ছে। আসাননগরের দিক থেকেও লোক এসে পড়েছে। নাড়ি ধুক-ধুক করছে, সম্বিৎ নেই, ডাকলে সাড়া দেয় না। কী করে এখন বাড়ি অবধি নেওয়া যায়? গরুর গাড়ি একটা ঠেলতে ঠেলতে এনে যদুনাথকে তার উপরে শোয়াল। গাড়ি নিজেরাই টানে। টানছে সতর্ক ভাবে, তা হলেও বিলের পথে ধাক্কাধুক্কি ঠেকানো যায় না। ধনঞ্জয় কবিরাজ যদুনাথের উঠানে দাঁড়িয়ে আছেন, নাড়িতে আঙুল ঠেকিয়ে তিনি মুখ বাঁকালেন। কিছুই করবার নেই, প্রাণপাখী খাঁচা-ছাড়া।

বাপের উপর বলাইয়ের অতিমাত্রায় ভালবাসা—সংসারে বাপ ছাড়া কে-ই বা ছিল? চলে গেলেন তিনি—রোগ না পীড়া না, একরকম অপঘাতেই যাওয়া। কান্নাকাটি করছে বলাই খুব।

সেই সঙ্গে আবার বাপের শ্রাদ্ধশান্তি নিয়ে উদ্বেগ। ভটচায্যি-বাড়ির গোপাল ভটচায্যিমশায়কে ধরল: ইহলোকে যা হবার হল—পরলোকে বাবা যাতে ভাল থাকেন, তার উচিত ব্যবস্থা দেন ঠাকুরমশায়। তা-ই আমি করব, বাবার কাজে খুঁত থাকতে দেব না। বৃষোৎসর্গ বিধেয়, গোপাল বললেন। চিরকুটের উপর লাল কালিতে লিখেও দিলেন ব্যবস্থা: মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ববিমুক্তি-পূর্বক স্বর্গলোক গমন-কামনায় সমর্থ পক্ষে বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধ আবশ্যক। বৃষোৎসর্গ চারিটি বৎসতরীর সহিত কর্তব্য। অপ্রাপ্তিতে দুইটি, অন্ততপক্ষে একটিতেও হইতে পারে। পুরুষের উদ্দেশ্যে বৃষোৎসর্গ হইলে দক্ষিণা স্বরূপ বৃষ দেয়···

দাও ঠেলা। কিন্তু বলাই দমে নি, চিরকুট জনে-জনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই বলাইকে ভালবাসে—বিশেষ করে সেই সেবারে নিয়তি লাগার পর থেকে। অশৌচদশার বেশে সুদর্শন কিশোর ছেলে, হাতে কঞ্চির নড়ি—গ্রামবাসীর কাছে গিয়ে বলছে, গলায় ধড়া যাতে নামাতে পারি সেই ব্যবস্থা আপনারা দশজনে করে দিন। লোকে দিচ্ছেও দু-আনা, চার-আনা করে, তার বেশি সামর্থ্য কোথায়? হারু মিস্তির কাঁধে বয়ে হিহারশালে নিয়ে যেত, তার অঙ্কে বেশি খাতির। হারুর কাছে মনোদুঃখে বলল, পাড়া ঘুরে চষে ফেললাম হারুদা, টাকা চারেকের বেশি উঠল কই? অথচ করতে হবে বৃষোৎসর্গ, ভটচায্যি মশায়ের ব্যবস্থা—

হারু তো অবাক: আদা খেয়ে বাঁচিনে তোর বলাই। বৃষোৎসর্গে যা খরচ, তাতে একজোড়া মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ক'জনে পারে—তিনকাহন শ্রাদ্ধই পেরে ওঠে না এ-বাজারে—

বলাই নাছোড়বান্দা : বাবা আমার নিত্যিদিন মরতে যাবেন না, শ্রাদ্ধ একবারই করছি। প্রেতলোক পাশ কাটিয়ে সোজা স্বর্গধামে চলে যাবেন তিনি। গোপাল ভটচায্যি যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, অক্ষরে অক্ষরে আমি তাই করব। নিজের গাঁয়ে না হলে ধড়া-গলায় বাইরের দশটা গাঁয়ে ভিক্ষে করে বেড়াব—

তার পরে মোক্ষম ঘা দেবার অভিপ্রায়ে বলল, দশ গাঁ লাগবে না, রাজীবপুর যাব। ঐ এক জায়গা থেকেই সব যোগাড় হয়ে যাবে।

হারু মিত্তির স্তম্ভিত হয়ে বলে, সোনাখড়ির মানুষ হয়ে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে রাজীবপুর যাবি—পারবি যেতে?

বলাই বলে, বাবার কাজে দরকার হলে নরকেও যেতে পারি। থিয়েটারে পার্ট নেবার জন্ম রাজীবপুরের ওরা কতবার ঝুলোঝুলি করেছিল—বাবা হাঁকিয়ে দিত।

মাদার ঘোষ কোন দরকারে বাড়ি এসেছেন একদিন-দু'দিনের জন্ম। বলাইকে নিয়ে হারু তাঁর কাছে গেল। মাদার বললেন, খবর পেয়েছি সব, বাপ-বেটায় ছিলি তো বেশ ভাল—আচমকা যদু এই রকম ভাবে চলে গেল। তারপর, শ্রাদ্ধশান্তির কি হচ্ছে?

হারু বলল, সেই জন্তেই তো আপনার কাছে আসা।

মাদার ঘোষ বিনাবাক্যে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে দিলেন। বলাইকে বললেন, পিতৃদায় সকলকে বল গিয়ে, সবাই তোকে ভালবাসে।

হারু বলল, গিয়েছিল ক'জায়গায়। দু'আনা চারআনা করে দেয়, তাতে আর কত এগোবে। অন্নজল কি তিলকাঞ্চন নয়—গোপালঠাকুর মশায়ের কাছ থেকে ব্যবস্থা এনেছে, বৃষোৎসর্গ।

করবে তাই। মাদার ঘোষ এককথায় রায় দিয়ে দিলেন : মনে যখন ইচ্ছে জেগেছে, আলবৎ করবে। কত যোগাড় হল রে?

বলাই বলল, বারো-তেরো টাকার মতো হয়েছে আপনার এই পাঁচ টাকা ধরে।

মাদার পুনশ্চ পাঁচ টাকা বের করে দিলেন। হারু বলে, মবলগ টাকার দরকার—বিশ-পঁচিশ-ত্রিশে কি হবে?

হবে, হবে—। মাদার বললেন। যাদের টাকা-পয়সা নেই, তাদের বাপ-মায়ের কাজ হবে না বুঝি? ব্যবস্থা সব রকমের আছে—আমিরি ব্যবস্থা আছে, ফকিরি ব্যবস্থাও আছে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কলকাতায় চলে যা বলাই; কালিঘাটে গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ করবি। মহাতীর্থ কালীঘাট—একান্ন পীঠস্থানের

একটা। আদি গঙ্গা মানে আসল যে গঙ্গা, তার উপরে। বৃষোৎসর্গই হবে—সোনাখড়ির চেয়ে অনেক ভাল হবে। দত্তবাড়ির কালিদাস আছে, স-ই সব বন্দোবস্ত করে দেবে। থিয়েটারপাগলা মানুষ, তোর কথা মনে আছে তার। আমিও না-হয় একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটা হারুরও খুব মনে ধরল: সেই ভাল, চলে যা কলকাতায়। কালিঘাটে খরচা কম, কাজের দিক দিয়ে একেবারে ফার্স্টোকেলাস।

বলাই রাজি, খুব রাজি। কিন্তু যাবে কার সঙ্গে? গাঁয়ের বার হয়নি কোনদিন—বড় শহরে একা একা যাওয়া ভরসা কুলোয় না। পুববাড়ির কৃষ্ণময় যাবে শোনা যাচ্ছে, গোপাল ঠাকুরমশায় দিনক্ষণও নাকি দেখে নিয়েছেন।

বলাই বলল, যাই তারিখটা তবে সঠিক জেনে আসি।

মাদার বললেন, তারিখ জানলেই হবে না রে। এর আগে কতবার যাত্রা ভেঙেছে, তা-জেনে আসবি।

বোকা বোকা মুখে বলাই তাকিয়ে পড়ল। হারু বুঝিয়ে দেয়: বার চারেক অন্তত যাত্রা না ভেঙে কেষ্টদার যাওয়া হয় না। ওটা এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে, সবাই জানে।

মাদার বললেন, কেষ্ট কলকাতায় যেতে যেতে তোর বাপের শ্রাদ্ধের মেয়াদ পার হয়ে যাবে। বছর পুরলে সপিণ্ডিকরণ—কেষ্টর সঙ্গে যদি যাস, সেই কাজটাই হতে পারবে।

সমাধান মাদারই করে দিলেন: কাল না হলেও পরশুদিন সদরে নিশ্চয় ফিরব। আমার সঙ্গে চল। ওখান থেকে লোকে হরবখত কলকাতা যাচ্ছে—হাইকোর্টে মামলা করতে যায়, বাজার সওদা করতে যায়। তাদেরই একজনের সঙ্গে জুটিয়ে দেব। শিয়ালদহে নেমে হ্যারিসন রোডের মুখেই কালিদাসের মেস—তোকে তুলে দিয়ে আসে, তেমনি ব্যবস্থা করে দেব।

॥ চৌত্রিশ ॥

ঝাঁকড়া-মাকড়া চুল, খালি পা, হাতে কঞ্চির নড়ি, পরনে খাটো থান, গায়ে কম্বল জড়ানো—বলাই কালিদাসের মেসের ঘরে ঢুকল। যে লোকটা বাসা চিনিয়ে এনেছে, পৌঁছে দিয়ে সে চলে গেল। কালিদাস তেল মাখছে—স্নান করে খেয়ে অফিসে যাবে।

কিছু বিস্মিত হয়ে সে বলল, কি খবর বলাই, কোত্থেকে ?

মুখে কিছু না বলে বলাই কম্বল মোচন করল। কাঁধের ধড়া বেরিয়ে পড়ল। গুরুদশার মধ্যে নাকি অপদেবতার উৎপাতের আশঙ্কা। উৎপাত এড়াতে লোহা অঙ্গে রাখতে হয়। ধড়ায় সেজন্য একটা লোহার চাবি বাঁধা।

কালিদাস বলে, খবর পাইনি তো। কবে গেলেন তোর বাবা, কি হয়েছিল ?

বলাই দাদার ঘোষের চিঠি বের করে দিল। আদ্যোপান্ত পড়া শেষ করে কালিদাস বলল, হুঁ। তা দাঁড়িয়ে কেন, বোস। গুরুদশায় বুঝি কাঠের উপর বসা চলবে না, কুশাসন চাই। মেসে কি আর কুশাসন আছে দেখি—

'রঘু' 'রঘু' করে ভৃত্যকে ডাকতে লাগল। বলাই বলে, আসন কি হবে ? ঝকেঝকে পাকা মেঝে—এখানেই বসে পড়ি। নতুনবাড়ির বাবু আপনার কাছে পাঠালেন, ধড়া নামিয়ে দিতে হবে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। ধড়া কিছু চিরকাল কাঁধে রাখবার জিনিস নয়—সকলে নামায়, তুইও নামাবি ঠিক।

চিঠিখানায় আর একবার চোখ বুলিয়ে কালিদাস বলল, বৃষোৎসর্গ করতে চাস, নইলে তৃপ্তি হবে না। তা যোগাড় করলি কত ?

সলজ্জে বলাই বলে, টাকা কুড়ির মত জুটিয়েছিলাম অনেক কষ্টে, তার থেকেও তো রাহা-খরচ আড়াই টাকা গেল।

কালিদাস বলে, ফেরত যাবার খরচা আছে। তাছাড়া কলকাতা থেকে একেবারে শুধু-হাতে ফিরতে পারবিনে, এটা-ওটা কিনতে হবে। তার জন্যেও ধরে রাখ চার-পাঁচ টাকা।

মুহূর্তে বলাইয়ের মনে এল, ফেরত যাবার কথা কেন ? বাবা গেছেন—সোনাখড়িতে কোন্ বন্ধন আছে যে ফেরত আমাকে যেতেই হবে ? সেবারে তো মেলা লম্বা লম্বা কথা—আপিসের বেয়ারা করে নেবেন, আপিসের থিয়েটারে পার্ট দেবেন—

কথাগুলো চকিতে বলাইয়ের মনে খেলে গেল। থাক সেসব। কালিদাস চুপচাপ, কী যেন ভাবছে। টাকার অঙ্ক শুনে মুখ না ফেরায়। সকাতরে বলাই বলে, ওর বেশি আর যোগাড় হল না বাবু। বড্ড আশা নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

কালিদাস বলে, এসে ভালই তো করেছিস। গ্রামবাসী হিসেবে আমিও কিছু দেব। হয়ে দরে টাকা পনেরো নিট থাকছে। পনের টাকায় বৃষোৎসর্গ কি বলিস, দানসাগর পর্যন্ত করিয়ে দিতে পারি। মহারাজ নবকৃষ্ণর মায়ের

বেলা হালদার হয়েছিল, আবার সোনাখড়ির যদুনাথের বেলাও হালদার। এর নাম কলকাতা শহর, বন্দোবস্ত এখানে কি না হয়? আপিসের তিনজন আসে কালীঘাট থেকে—মুরুব্বি কাকে ধরবি, আমি ভাবছিলাম।

মেসের খাওয়া বলাই খাবে না, হঁশ হল সেটা। বলে, হবিষ্যি করবি তো তুই—মালসা পোড়াবি?

অশৌচের সময় নতুন মালসায় স্বপাকে শুদ্ধাচারে আতপ-ভাত রেঁধে একবেলা খাওয়ার বিধি। খাওয়ার পরে মালসা ফেলে দেয়। একে মালসা-পোড়ানো বলে। বলাই বলল, মালসা না পোড়ালেও হবে। বিদেশে অতশত লাগে না—ভটচাযি্য ঠাকুরমশায় বলে দিয়েছেন। আতপ চালের চাড্ডি আতপ-ভাত হলেই চলে যাবে।

কী জন্যে? আমাদের কলকাতায় কোনটা মেলে না শুনি? নিয়মমাফিক মালসাই পোড়াবি তুই। রঘুকে বলে যাচ্ছি, মালসা সৈন্ধবনুন আতপ চাল কাঁচকলা—যা যা লাগে সমস্ত এনে গুছিয়ে দেবে। বারান্দায় ঐখানে তিনখানা ইট পেতে উনুন করে চাট্টি ঘুঁটে নিবি, ব্যস। হবিষ্যির পর, কম্বল বের করে দিয়ে যাচ্ছি—টান টান শুয়ে পড়বি—আপিস থেকে সকাল সকাল ফিরব, ফিরে এসে তোকে কালীঘাট নিয়ে যাব।

অফিসের ইন্দু হালদারকে কালিদাস বলে রেখেছিল—সন্ধ্যার পর বলাইকে নিয়ে হালদার পাড়া রোডে তার বাড়িতে গেল। ইন্দু তৈরি হয়ে আছে, চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ঘাটে নিয়ে চলল।

যেতে যেতে একবার জিজ্ঞাসা করে: খরচ-খরচা কি পরিমাণ?

বলাইয়ের আগেই কালিদাস জবাব দিয়ে দেয়। সম্বল সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে কিছু হাতে রেখেই বলে, দশ টাকা—বড্ড বেশি তো বারো। তার উপরে কেটে ফেললেও উপায় নেই।

ইন্দু হালদার চুক-চুক করে: তাই তো হে, বাজারখানা যা পড়েছে—জিনিসপত্তোর সব মাগ্‌গি। এত কমে রাজি হবে, মনে তো হয় না।

কালিদাস বলে, হবে না তো তোমায় নিয়ে যাচ্ছি কেন? যাতে হয় তাই করবে। না হবার কি আছে, বুঝিনে। জিনিস মাগ্‌গি হোক যা-হোক, তাতে ঠাকুরমশায়দের কি? সবই তো ওঁদের কায়েমি ব্যবস্থা—গাঁটের একটি পয়সাও বের করতে হচ্ছে না। যা পাচ্ছেন ষোল আনা মুনাফা। দশ টাকায় চুক্তি হলে মুনাফা পুরোপুরি ঐ দশ টাকাই।

খিঞ্জি গলি দিয়ে চলেছে—এমন সঙ্কীর্ণ, দুটো মানুষ পাশাপাশি যাওয়া মুশকিল। ইন্দু এক খোলার-বাড়িতে নিয়ে তুলল। টানা লম্বা চালা সামনের

দিকে, ভিতরে উঠোন। এমনি বাড়ির ভিতরে এতখানি ফাঁকা জায়গা ধারণাতে আসে না। জায়গা ফাঁকা রেখেছে শোভা-সৌন্দর্য স্বাস্থ্যের কারণে নয়—কাজের গরজে। শ্রাদ্ধ-কার্যালয়। আদি গঙ্গার ধারে ধারে আরও কয়েকটা কার্যালয় আছে এইরকম। উঠোনের ওদিকে পাশাপাশি চার বেদি—শ্রাদ্ধকর্মে বেদি লাগে, মাটি তুলে পাকাপাকি বেদি বানিয়ে রেখেছে। ব্যবস্থা পাইকারি—একই দিনের জন্য চার মক্কেল এলেও ফেরত যাবে না—পাশাপাশি চার শ্রাদ্ধকর্ম স্বচ্ছন্দে চলবে। উঠানের যজ্ঞডুমুর গাছে অনেকগুলো বাছুর বাঁধা—বৎসতরী, বৃষোৎসর্গের জন্য আবশ্যক। মোটের উপর উপকরণের কোন অঙ্গে খুঁত নেই। নির্ভাবনায় অতএব দেহত্যাগ করতে পারেন—এই বাড়ির ঠিকানাটা শ্রাদ্ধকারীদের দিয়ে যাবেন অতিঅবশ্য, আজেবাজে ঠগ-জোচ্চোরের খপ্পরে যাতে না পড়তে হয়। কথাবার্তা পাকা হবার পর, জরুরি ক্ষেত্রে দশ মিনিটে এখানে কর্মারম্ভ হতে পারবে—সর্বাংশে নিখুঁত, ষোল আনা শাস্ত্রসম্মত শ্রাদ্ধ। অবিশ্বাস করেন তো মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এনে আসরে বসিয়ে দিন। মন্ত্রপাঠ স্বকর্ণে শুনবেন তিনি, কাজকর্ম দেখবেন, নির্ঘাৎ তার পরে শতকণ্ঠে সাধুবাদ করবেন।

ইন্দু হালদার উঠানে দাঁড়িয়ে ডাক দিল: জনার্দন ঠাকুরমশায় আছেন?

মাথায় টাক, গলায় মোটা যজ্ঞোপবীত নগ্নগাত্র জনার্দন শশব্যস্তে এসে বসবার আসন দিলেন। বলাইকে এক নজর দেখে নিয়ে সরাসরি তিনি কাজের কথায় এলেন: কবে? অন্নজল তিলকাঞ্চন বৃষোৎসর্গ দানসাগর সবরকম ব্যবস্থা আছে—চাই কোন্‌টা?

ইন্দুকে দেখিয়ে জনার্দন একেবারে গদগদ হলেন: এই হালদার মশায়দের আশ্রয়ে আছি। ওঁরা জানেন আমার কাজকর্ম। এত জায়গা ফেলে আমার ঘরেই তাই পদধূলি পড়ে।

বলাইয়ের দিকে চোখ ঠেরে হেসে ইন্দু বলল, ঠাকুরমশায় দানসাগরের কথা শুধালেন। সাজপোশাকে চেহারায় ছোকরাকে রাজরাজড়ার মতো মালুম হচ্ছে—তাই না?

জনার্দন ঠাকুর বলেন, পোশাকে আর চেহারায় মানুষ ধরা যায় না হালদার-মশায়। বিশেষ, এই কালীঘাটের মতো জায়গায়। চুনোট-করা ধুতি পরে আতরের গন্ধে মাতিয়ে ঘুরছে ফিরছে—পকেটমার পকেট হাতড়ে পেল সাকুল্যে দু-গণ্ডা পয়সা, রাগ সামলাতে না পেরে থাপ্পড় কষিয়ে দিল বাবু-লোকটার মুখে। আবার ভিক্ষে-করা কাঙালি একটা মরল, তার ছেঁড়া কাঁথার ভাঁজে পাচ্ছে তিন হাজার টাকার নোট।

ইন্দু হালদার কবিদের ঢঙে বলল, হাজার-টাকা নয়—ব্যাজার হবেন না:

ঠাকুরমশায়, মূল্যে দশটি টাকা। বৃষোৎসর্গ করে দিতে হবে। অনেক দূরে মফস্বল জায়গা থেকে বড্ড আশা করে এসেছে।

জনার্দন ঠাকুর তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন: বলেন কি মশায়, দশ টাকায় বৃষোৎসর্গ? আর সব বাদ দিয়ে বৃষ আর বৎসতরীতেই কত পড়ে যায়, খবর নিয়ে আসুন।

ইন্দু বলে, বাজারের খবরে গরজ কি শুনি? বেওয়ারিশ ধর্মের ষাঁড় রাস্তায় ঘুরছে—সময় কালে তারই একটা তো তাড়িয়ে এনে তুলবেন।

উঠানের বাছুরগুলো দেখিয়ে বলল, আর বৎসতরী দেদার তো মজুত করে রেখেছেন। দাম ধরে কিনে নেব, কাজ অন্তে আপনার জিনিস আপনারই হবে আবার। নতুন যজমানের কাছে আবার বেচবেন, ফের তখনই ফেরত আসবে। এক এক কৌটা বাছুর এরই মধ্যে দু-তিন'শ বার বেচা হয়ে গেছে। বলুন, তাই কি না।

সম্মুখের চালার দিকে উঁকি দিয়ে কালিদাস বলল, সব উপকরণই ঘরের মধ্যে থরে থরে সাজানো। ঐ একই ব্যাপার—ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসবে, কর্ম অন্তে ঘরের জিনিস আবার ঘরে ঢুকে পড়বে। বাজার-দর দিয়ে কি হবে—কত নিয়ে মালামাল আপনি উঠোনে নামাবেন, তারই কথাবার্তা।

জনার্দন ঠাকুর এবারে অন্ত দিক দিয়ে যান: মালামাল ছাড়াও তো আছে। ক্রিয়াকর্ম, মন্ত্রপাঠ—একখানা বৃষোৎসর্গ নামানো সহজ কথা নয়। তিন প্রহর জুড়ে চলবে। কড়া কড়া সংস্কৃত মন্ত্র—পড়তে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

ইন্দু হালদার বলল, বেশ তো, এক আধুলি ধরে নেবেন দক্ষিণা বাবদে।

জনার্দন ঠাকুর বললেন, আধুলিতে সংস্কৃত হয় না। ষষ্ঠীপুজোয় অং-বং হতে পারে বড় জোর।

ইন্দু রেগে গেল, হেসে হেসে হচ্ছিল—কণ্ঠস্বর এবার কঠিন। বলে, এরা না-হয় মফস্বলের লোক, পাঁচপুরুষ ধরে আমরা মোকামের উপর আছি। মায়ের সেবাইত—একদিনের পুজো আমাদের অংশে। মন্তর আপনাদের কেমন সংস্কৃত, ভাল মতন জানা আছে। জোঁকের গায়ে জোঁক লাগাতে আসবেন না ঠাকুরমশায়।

থতমত খেয়ে জনার্দন চুপ করে যান। তারপর ঘরের মধ্যে গিয়ে লম্বা এক ফ্যাঙ্গি কাগজ নিয়ে এলেন। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে যা যা লাগবে, তার পরিপূর্ণ ফর্দ। ইন্দুর হাতে দিয়ে বললেন, জিনিসের পাশে পাশে দাম ফেলুন। যেমন ইচ্ছে ফেলে যান, আমি কিছু বলব না।

শক্ত কাজ—পাঁচটা সাতটা দাম ফেলতেই ইন্দু হালদারের মালুম হয়ে গেল।

বৃষের দাম ধরল আট আনা, শাড়ি কাপড় চার আনা হিসেবে। গণতিতে প্রায় দেড়শ দফা হবে। জনার্দন ঠাকুর প্যাঁচ খেলেছেন, ইন্দু বুঝতে পারল—প্যাঁচে পড়ে যাচ্ছে সে। দাম যত কমিয়ে ধরুক দশ টাকার মধ্যে রাখা অসম্ভব। ফর্দ ফেরত দিয়ে বলে, দাম-টাম যা ফেলতে হয় আপনি ফেলে নিন ঠাকুরমশায়। আমাদের থাউকো চুক্তি—দশ টাকা। না পোষায় বলে দিন। শতেক ফুরোয় জানা আছে আমার।

বলে সে উঠে দাঁড়াল। জনার্দন বলেন, বসুন, বসুন—চটলে কাজ হবে কেমন করে? বেশ, দশ টাকাতেই বৃষোৎসর্গ সেরে দিচ্ছি। ছোটখাটো একটু দরবার আছে। দ্বাদশটি ব্রাহ্মণভোজন করাতে হয়—সেটা এই দশের মধ্যে ঢোকাবেন না।

বারো টাকা মজুতই আছে। এইসব বুঝেই দু-টাকা হাতে রেখে দরদস্তুর করেছে। ইন্দু হালদার দরাজ ভাবে বলে দিল, আরো দু-টাকা ব্রাহ্মণ-ভোজন বাবদ।

জনার্দন বললে, বারো জনে দু-টাকার মধ্যে কি খাবে বলুন তো। তার উপর, ব্রাহ্মণের খাওয়া—

ইন্দু তর্ক করেঃ চিঁড়ে-গুড় খাওয়ানো যায়, ছানা-চিনি খাওয়ানো যায়, বড়লোকেরা ইদানীং আবার ঘি-ভাত খাওয়ানো ধরেছেন। ফলের তাতে ইতর বিশেষ নেই।

তা দু-টাকার বারো জনের চিঁড়ে-গুড়ও কি হয়? বলুন।

কালিদাস মাঝে পড়ে মীমাংসা করে দিলঃ থাকগে থাক। ভাল করে খাওয়াবেন ব্রাহ্মণদের, পাঁচ টাকা দেব। টাকাটা আমি-ই দিয়ে দেব। খুশি এবারে?

জনার্দনের মুখে হাসি ধরে না। বলেন, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময়টা থাকতে হবে আপনাদের। এই দাওয়ার উপরে বসাব। এক এক ব্রাহ্মণে কী পরিমাণ টানবেন, আর কত আমোদ করে খাবেন, দেখতে পাবেন।

বাপের কাজকর্ম মনের মতন সমাধা হয়ে যাবার পরেও বলাই কয়েকটা দিন কলকাতায় রয়ে গেল। মেসে থাকে, আর আজ জ্যান্ত-চিড়িয়াখানা কাল মরা চিড়িয়াখানা (মিউজিয়াম) পরশু হাওড়ার-পুল তরশু পরেশনাথের-মন্দির তার পরের দিন হাইকোর্ট ইত্যাদি দেখে বেড়ায়। গান শুনিয়ে মধুর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে, দুপুরে মেসের কাজকর্ম চুকে গেলে মধুকে নিয়ে সে বেরোয়। খাসা কাটল দশ-বারোটা দিন। তারপর মন উতলা হয়ে ওঠে, নিজেই বলছে বাড়ি যাবার কথা, বাড়িতে কেউ নেই, কিন্তু গ্রামের জন্য বড্ড প্রাণ পোড়ে।

কালিদাস বলে, মেসে আমার ফ্রেণ্ড হয়ে আছিস—ভালই তো আছিল রে। আমাদের আপিসে বেয়ারা করে ঢোকানো যায় কিনা, সেই চেষ্টায় আছি। বাড়ি গিয়ে কোন লাটসাহেব হবি, শুনি?

কিন্তু কলকাতা জল-বিছুটি মারছে বলাইকে। যেদিকে তাকায় ইট আর ইট—কাঁচা মাটি পায়ে ঠেকাতে পায় না কখনো। মাটি এখানে ঝুড়িতে ঢুকে ফেরিওয়ালার মাথায় চড়েছে—'মাটি চাই' 'মাটি চাই' হেঁকে রাস্তায় রাস্তায় মাটি বিক্রি করে বেড়ায়। কলকাতায় থাকা আর পাখিদের খাঁচায় থাকা এক রকমের।

কালিদাসের কাছে বলল, গামালের বিস্তর মালপত্র বাড়িতে পড়ে পড়ে পচছে। মরশুম এখনো চলছে, সেইগুলো বেচে আসিগে। বর্ষা পড়লে গামালের কাজ বন্ধ। তখন এসে যাব। কাজ জুটিয়ে দেন তো তাই করব কলকাতায় থেকে।

খানাই-পানাই বলে তো বাড়ি এসে উঠল। বাপের কাজ ধরেছে। কলকাতা ভাল না। শান-বাঁধানো শহর—গাছগাছালি নেই, মাটি পর্যন্ত নেই। মানুষে কি করে থাকে, কে জানে। বলাই আর যাচ্ছে না সেখানে। কালিদাস ধমকেছিল: লাটসাহেব হবি সোনাখাড়ি গিয়ে? তা খানিকটা লাটসাহেব বই কি—বলাই এখন কলকাতা-বিশেষজ্ঞ—ভদ্রপাড়ায় যেমন দত্তবাড়ির বৃদ্ধ শশধর আছেন। এবং পুববাড়িতে দেবনাথ ও কৃষ্ণময়। কতজনে এসে বলাইয়ের দাওয়ায় বসে কলকাতার আজব আজব গল্প শোনার জন্য। কল ঘোরালে-জল পড়ে সেখানে, কল টিপলে আলো জ্বলে। রথের মেলা এ-দিগরে হয় বছরের মধ্যে ছুটো দিন, আর মেলা সেখানে নিত্যিদিন লেগেই আছে। খুব আকাশে তোলে কলকাতাকে, তা—বলে নিজে সে যাচ্ছে না।

ঠকঠক ঠকাঠক—সকালবেলা সজোরে কুড়াল পড়ছে পশ্চিমপাড়ার দিকে। কমল দৌড়ল। অটলকে পেয়ে শুধায়: কি হচ্ছে অটলদা?

পালমশায়ের তেঁতুলগাছ মারবে। তবলদার এসে পড়েছে।

গাছ মারা—পাড়াগাঁয়ে তা-ও একটা ঘটনা। গাছ ঘিরে লোক জমেছে মন্দ নয়। কমল-পুঁটি তো আছেই, মাঝবয়সি ও বুড়ো আড়াও কতক এসে জুটেছেন। গাঁয়ের এক প্রাচীন বাসিন্দা চিরবিদায় নিচ্ছে, শেষদেখাটা দেখে যাই—ভাবখানা এই প্রকার। থারিক পালের সময়টা খারাপ যাচ্ছে, পুরানো তেঁতুলগাছটা বেচে দিয়েছেন, ম'লদার কৃষ্ণ ঢালি কিনেছে তেইশ টাকায়। খেজুরগাছ কাটার ধুম চারিদিকে। গাছ কেটে রস আদায় করে, রস জ্বালিয়ে গুড় বানায়, গুড়ের উপর পাটাশেওলা চাপা দিয়ে চিনি। রস জ্বাল দেবার

জন্ম কাঠের গুরুজ—কাঠকুটোর বাজার এখন বড্ড চড়া। তাই বলে তেইশ টাকা দামের ? কথা শুনে লোকের চক্ষু কপালে ওঠে।

হিমচাঁদ বলেন, কিসের গাছ হে—তেঁতুল না হয়ে রুপোর গাছে সোনার ফল হলেও তো তার দাম তেইশে ওঠে না।

তবলদারদের খারিক পাল দেখিয়ে দিচ্ছেন : দক্ষিণের এই মুড়ো দিয়ে কেটে নাও, গাছ ঐ মেঠো জায়গায় পড়বে। উত্তর পুবে পড়ে তো সর্বনাশ—আমার হাজারি-কাঁঠালগাছ কাগোসোনা-আমগাছ জখম করে দেবে।

বরদাকান্ত বললেন, তোমার টাকার গরজ, বুঝি সেটা খারিক। বেচলে তো বেচলে এই গাছ। এমন তেঁতুল এ-দিগের আছে কোথাও ? শুনতেই তেঁতুল—তেঁতুল খাচ্ছি না আখ খাচ্ছি, তফাত করা যায় না।

খারিক কৈফিয়তের ভাবে বলেন, হলে হবে কি—বাঁদরে খেয়েই শেষ করে, মানুষের ভোগে তো লাগে না।

ঘোর বেগে জল্লাদ প্রতিবাদ করে উঠল : অমন কথাও বলবেন না। জেঠামশায়, বাঁদরের বদনাম দেবেন না। কষ্ট করে কেউ তো গাছেও উঠলেন না—তারাই পেড়েকেড়ে দিল, ঝুড়ি ভরে আপনি বাড়ি নিয়ে নিয়ে গেলেন।

কথা সত্যি। যারা দেখেছে, খুব হাসছে তারা। গেল ফল্গুনের ঘটনা। তেঁতুল এমনি ফলন ফলেছে যে ডাল-পাতা দেখা যায় না। ছোট ছোট ফল, উজ্জ্বল-বাদামি রঙের। আর ছোটকর্তা বরদাকান্ত যে কথা বললেন—খারিকের গাছের তেঁতুল খেয়ে কে বলবে, তেঁতুলফল টক ? সেই পাকাফলের লোভে একদঙ্গল বাঁদর গাছের উপর আস্তানা গেড়েছে, তেঁতুল খেয়ে দফা সারছে। অতিশয় মোটা গাছ, ডালও অনেক উপরে। গাছে ওঠা সহজ নয়—ডালের উপর গেরো বাঁশ ফেলে অনেক কায়দা করতে হয়। কিন্তু বাঁদরে এমন দাঁত খিঁচোয়, ধারে-কাছে যেতে কেউ ভরসা পায় না—নিরাপদ দূরে দাঁড়িয়ে ঈর্ষার দৃষ্টিতে বাঁদরের তেঁতুল-ভোজন দেখে।

একমাত্র জল্লাদই বাঁদরকে গ্রাহ্য করে না। বলে, বাবাকেই করিনে, তা বাঁদর ! ধুপধাপ পা ফেলে চলে যায় সে তেঁতুলগাছের তলায়। পিছনে সব চেঁচাচ্ছে : যাসনে ও জল্লাদ, খিমচে চোখ তুলে নেবে। নাক খ্যাবড়া করে দেবে। জল্লাদ কানেও নেয় না—হাতে লাঠি, একটা পা শিকড়ের উপর দিয়ে বীরমূর্তিতে দাঁড়ায়।

ভাবভঙ্গি দেখে বাঁদরেও খানিকটা বুঝি ঘাবড়ে গেছে। লম্ফঝম্ফ করে না। তারা—এক একটা ডালের উপর বসে উৎকট রকম মুখ খিঁচোচ্ছে। নিচে থেকে জল্লাদও যথাসাধ্য মুখ খুঁচিয়ে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। নর-বানরের মুখ খিঁচুনির যুদ্ধ। যুদ্ধ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে ক্রমশ। উত্তেজনায় জল্লাদ হাতের লাঠি

দিয়ে ঘা মেরে বসল গাছের গুঁড়িতে। আর যাবে কোথা—বাঁদরেরাও পাল্টা শোধ নিচ্ছে ডালে ঝাঁকিয়ে, ডালের উপর লাথি মেরে। পাকা-তেঁতুলের বোঁটা রোদে মড়মড়ে হয়ে আছে, ঝাঁকি লেগে ঝুর ঝুর করে তলায় পড়ে। বেশ খানিকক্ষণ চলল। সন্ধ্যার পর বাঁদর নিশ্চুপ। রাত্রিক অন্ধকারের মধ্যে ঝুঁড়ি বোঝাই করেন, আর বাড়ি নিয়ে নিয়ে ঢালেন। তেঁতুল পাড়ার কাজ বাঁদরেই করে দিল।

এখন ডালে ডালে কচি তেঁতুল—আহা রে, এবারও তেমনি হত—বাঁদরে পাকা-তেঁতুল পেড়ে দিত। তবলদারে গুঁড়িতে কোপ ঝাড়ছে, গাছে উঠে বড় ডাল কয়েকটা কেটে দিল—

সকাতরে কমল বলে গাছের বড় কষ্ট হচ্ছে—না রে দিদি? ডাল কাটে কেন ওরা?

বলাই দর্শকদের মধ্যে। সে বুঝিয়ে দেয়: কেটে-ছেঁটে পরিষ্কার করে নিচ্ছে। পাড়ার সময় অন্য গাছে না লাগে। আগে কাটলে কাটবে, পরে কাটলেও কাটবে—একই কথা।

কমল বলে, মাংস-টাংস কাটে তো পাঁঠাবলির পরে। জ্যান্ত পাঁঠার মাংস কাটা কি ভাল?

জোরে জোরে কুড়াল মারছে। মারের পর মার। বেশ শীত, তলবদারদের গায়ে তবু ঘাম। অতিকায় কুড়ালগুলো গাছের গায়ে পড়ছে উঠছে, ধারালো ফলার উপরে রোদ পড়ে যেন বিদ্যুৎ খেলছে। ভাই-বোনে বাড়ি চলল—কমলের পাঠশালা আছে। পাঠশালা না হলেও থাকত না—থাকা যায় না, কষ্ট হয়। কোপের ঘায়ে প্রাচীন বৃক্ষরাজ যন্ত্রণায় ওঃ-ওঃ—করে উঠছে, কমলের স্পষ্ট রকম কানে আসে, ডালে ডালে কত পাখি—ভয়ে সব কিচির-মিচির করছে, উড়ে গিয়ে এ-গাছে ও-গাছে বসছে।

দুপুরে পাঠশালা থেকে ফেরার সময় ঘুরে একটুকু তেঁতুলগাছের কাছে এসে দাঁড়ায়। জল্লাদও এসেছে। তলবদাররা খানিকটা কেটে অন্যত্র চলে গেছে। সব ম'লদার জ্বালানির জন্য এখন হন্যে হয়ে উঠেছে—তলবদারে এ-কাজের ও-কাজের খানিক খানিক করে বহুজনের মন রাখে।

গুঁড়িতে মস্তবড় হাঁ হয়ে গেছে, কাঠের কুচি চারিদিকে স্তূপাকার। আঠার মতো বেরিয়েছে কাটা জায়গা থেকে—কান্নাকাটির পর চোখের জল শুকিয়ে থাকলে যেমনটা দেখায়। জল্লাদকে কমল আঙুল দিয়ে দেখাল, গাছ কেঁদেছে জল্লাদ-দা, ঐ দেখ।

কাঁদে নাকি আবার গাছ? হি-হি-হি, তোর যেমন কথা।

জলাদ হেসে কূল পায় না। বলে, কান্নার হয়েছে কি! শুধু গোড়া কেটেই ছেড়ে দেবে না। কুড়ুল মেরে টুকরো টুকরো করবে, চেলা-চেলা করে ফেলবে।

কাঠ চেলা করা কমল তো কতই দেখে। এই বিরাট বিপুল সুপ্রাচীন তেঁতুল গাছের ভাগ্যেও তাই? গাছ কি মনে মনে ভাবছে তার আসন্ন দশা? ভয় পেয়েছে?

জলাদের কথা শেষ হয়নি: সেই চেলা-কাঠ নিয়ে কুঞ্জ ঢালি বাইনের আগুনে ঢুকিয়ে দেবে—পোড়াবে। তারপরে দেখবি, অত কাঠের একখানাও নেই, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব। পালের-বাড়ির মিঠে তেঁতুলের গাছ কোনদিন কেউ আর দেখতে পাবে না।

গাছ কাটা আর কমল দেখতে যায়নি। পরের দিন হুড়মুড় করে পাড়া কাঁপিয়ে তেঁতুলগাছ পড়ল—তখন সে পাঠশালায়। বাড়ি ফেরার সময় জন্মের শোধ একটি বার দেখতে গেল। দশমুণ্ড কুড়িহস্ত মহাবলী রাবণরাজা ভূতলশায়ী হয়ে আছেন। দু-চোখ ভরে জল আসে, এদিক-ওদিক চেয়ে তাড়াতাড়ি জল মুছে ফেলে দেয়। মানুষের বেলা কান্নাকাটি—মেজদিদি চঞ্চলা কবে চলে গেছে, তার নামে এখনো মা বুক ছেড়ে কাঁদে। আর এই বুড়ো তেঁতুল গাছ কতকাল ধরে গ্রামেরই একজন হয়ে ছিল, কুড়ালের ঘায়ে ঘায়ে কষ্ট দিয়ে তাকে মারল, তার জন্ত দু-ফোঁটা চোখের জল পড়েছে তো—কী লজ্জা, কী লজ্জা! পুঁটি দেখতে পায় তো হেসে লুটোপুটি খাবে, মুছে ফেল্ শিগ্‌গির!

পিঠে-পরব—গ্রামের সব বাড়িতেের সর্বজনার পিঠে খাবার নেমতন্ন। বড় এক কাঁদি বাতি কলা কাটা হয়েছে—পৌষসংক্রান্তি নাগাত পেকে যাবে, সেই আন্দাজে কেটেছে। পৌষ মাসে এখন নতুন গুড়ের অভাব নেই। গোয়ালে দুধাল গাই। ঝুনো নারকেলও মজুত। আর যা সব লাগবে—যথা, কচিপাতা পিঠে সেঁকবার মুচি, মিঠে আলু, সর্ষের তেল ইত্যাদি বিষ্যুদের হাটে কিনবে।

উমাসুন্দরী হুঁশ করিয়ে দেন: চাল ভেজা যে বিনো, গুঁড়ো কুটে ফেল্। এর পরে ভিড় লাগবে। এ-বাড়ি, সে-বাড়ি থেকে ঢেঁকশেলে এসে পড়বে সব। গরজ সকলের—আমি তখন কাকে মানা করতে যাব। করলেও শুনবে না, মিছে ঝগড়াঝাঁটির বাতান।

ঢ্যা-কুচকুচ, ঢ্যা-কুচকুচ—ঢেঁকিশালে চাল কোটার ধুম। অলকা-বউ আর নিমি পাড় দিচ্ছে, তরঙ্গিণী এলে দিতে বসে গেছেন। এলে দিতে হয় খুব সামাল হয়ে, সামান্ত এদিক-ওদিক হলে সর্বনাশ। উমাসুন্দরী হেন গিন্নিবান্নি মানুষেরও আঙুলের উপর একবার ঢেকির ছেচা পড়েছিল—ডান হাতের দুটো আঙুল চিরজন্মের মতো বেঁকে রয়েছে। তরঙ্গিণী সেই থেকে অন্ত কাউকে

লোটের দিকে হাত বাড়াতে দেন না। এই নিয়ে কত মান-অভিমান, কত কোন্দল। অলকা-বউ বলে, মা'র আঙুল খেতো হয়েছে বলে কি সকলের হবে? করতে করতেই তো শিখব—বলি আপনি যখন আর প'রবেন না, সংসারের ভানা-কোটা কে করে দেবে?

তরঙ্গিণী কিছুতে আমল দেন না। বলেন, কাঁটার মুখ ঘষে ঘষে সুচাল করতে হয় না রে। যে দিন দায়ে পড়বে, সব কাজ আপনা-আপনি শেখা হয়ে যাবে। আমার বেলাই বা কি হল? ন-বছুরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছিলাম—কাজকর্মে শাশুড়ি হাত ছোঁয়াতে দিতেন না। শেষ-মেশ কিছুই তো আটকে রইল না। যদ্দিন পারি করে যাচ্ছি, তারপরে তোমরাই তো সব।

ঢ্যা-কুচকুচ, ঢ্যা-কুচকুচ—। ঢেঁকির ছেয়া তালে তালে উঠছে পড়ছে লোটের গর্তের ভিতর। ঐ উঠা-নামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তরঙ্গিণী চাল নেড়ে দিচ্ছেন। যেন কলের কাজ—ছেয়া উঠছে-নামছে, হাত ঢুকছে-বেরুচ্ছে, হাতের চুড়ি বাজছে। দেখতে মজা, কানে শুনতেও মজা। হাতের বের হতে তিলেক পরিমাণ দেরি হলে লোহার গুলো-আঁটা ছেয়া হাত ঠুঁটো করে দেবে বড়গিন্নির মতন।

তরঙ্গিণী লোট থেকে চালের গুঁড়ো তুলে দেন। বিনো কুলোয় নিয়ে নেয়, কুলো দুলিয়ে দুলিয়ে গুঁড়ো টেঁকে। আভাঙা-ক্ষুদ কিছু রয়ে গেছে, সেটা আবার লোটের গর্তে ফেলে দেয়। ঢ্যা-কুচকুচ, ঢ্যা-কুচকুচ—পিঠের চাল কোটা হচ্ছে।

পুলিপিঠে, ভাজাপিঠে ভাপাপিঠে। মুখসামালি গোকুল পাটিসাপটা রসবড়া—এই সমস্ত ভাজাপিঠে, তেলে বা ঘিয়ে ভেজে নিতে হয়। কচিপোড়া-পিঠে চিতলপিঠে ভাপাপিঠেরই রকমফের। পৌষপার্বণের মুখে কুমোরে কাচিপোড়ার মুচি বানায়। এমন কিছু নয়, মেটে কড়াইয়ের তলদেশে পিঠের সাইজে গোলাকার গর্ত। চালের গোলা ঢেলে দিলে সেখানে গিয়ে পড়ে, সেই ভাবে সেঁকা হয়ে যায়। ঝোঝোলা গুড় মাখিয়ে কাচিপোড়া-পিঠে খেয়ে দেখবেন পাঠক, আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।

তরঙ্গিণী পিঠে ভাজছেন। প্রথম পিঠে ব্রহ্মার নামে উনুনের আগুনে দিলেন। পরের পিঠেখানা আলাদা করে রাখা হল, বাঁশবাগানে রেখে আসবেন, শিয়ালের ভোগে যাবে। তারপরে ছেলেপুলে ও অন্যান্য সকলের। শুধু কমল-পুঁটি নয়, অনেকে পাড়া থেকে এসেছে। উনুনের ধারে ভিড় করেছে। আগুন পোহানো আর সেই সঙ্গে পিঠে খাওয়া—এক এক খোলা নামে, অমনি সবাই হাত বাড়িয়ে দেয়। হাত না দিয়ে তরঙ্গিণী ডালায় ফেলেন। বলেন, ব্যস্ত কেন? জুড়োতে দে একটুখানি। নয়তো হাত পুড়বে, জিভ পুড়বে।

বেড়ার কাছে কাঠের সেলকোয় টেমি জ্বলছে। গল গল করে ধোঁয়া

বেরুচ্ছে। আলো আর কতটুকু, ধোঁয়াই সব। ছেলেপুলে না থাকলে পিঠে বানিয়ে সুখ ?—তরঙ্গিণী ভাবছেন। ভিড় জমিয়ে ঐ যে সব হাত পেতে আছে। সব কষ্ট আমার সার্থক হয়ে গেল। চকিতে ভিড়ের পানে একবার নজর ফেললেন। মুখ দেখা যায় না স্পষ্টভাবে—ঝাপসা রকম দেখা যাচ্ছে। শুধালেন : সত্যি বল, ছেলে-পুলে সবাই তোরা তো বটে—বাড়তি কেউ ভিড়ে বসে হাত বাড়াসনি ?

গল্প ফাঁদলেন। তখন আর পিঠের জন্য তাড়াহুড়ো নেই। গল্পে সবাই মজে গিয়েছে। পিঠের লোভে পড়ে কোন বাড়িতে এক ভূত এসেছিল বাচ্চা ছেলের রূপ ধরে, ভিড়ের ভিতর এসে হাত বাড়িয়েছিল। পিঠে-ভাজুনি চালাক খুব, টের পেয়ে গেছে। নে, ধর—বলে ভূতের হাতে পিঠে না দিয়ে কড়াই থেকে পুরো হাতা গরম তেল ঢেলে দিল। পুঁড়ে গেল, জ্বলে গেল (ভূতের কথা নাকি সুরে কিনা) বলতে বলতে বাচ্চা-ভূত এক লাফে পাঁচিল টপকে বিল ভেঙে দৌড়।

তরঙ্গিণী হাসছেন। ছেলেপুলেরাও হেসে খুন। হাসে, আবার আধ-অন্ধকারের মধ্যে এ ওর মুখে তাকায়। পিঠের জন্য যারা এসেছে, সবাই ঠিক ঠিক মানুষ তো বটে ? ভূত কেউ মূর্তি ধরে আসেনি ?

কমলের খুব ভাব জমে গেছে—মানুষ নয়, পশুপাখি নয়—একটা গাছের সঙ্গে। বেঁটেখাটো যবডুমুর গাছ—খসখসে পাতা, এবড়ো-খেবড়ো গায়ে বুঝি কুষ্ঠরোগ ধরেছে। হাটখোলার আমবাগানে সেবার কোথাকার এক কুষ্ঠরোগী ফেলে গিয়েছিল, নড়তে চড়তে পারে না। রাত্রিবেলা শিয়ালের দল জ্যান্ত-মানুষ খুবলে খেত, আর গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করত সে। জল্লাদ চোরাগোপ্তা তাকে দত্তদের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে এনে তুলেছিল, তারপরে অবশ্য জানাজানি হয়ে গেল। কমল সেই কুষ্ঠরোগী দেখেছিল। বক্সির-ভুঁইয়ের যবডুমুর গাছের সর্বাঙ্গেও ডুমো-ডুমো ঠিক সেই রকম।

একেবারে বিলের লাগোয়া বক্সির-ভুঁই। কোন বক্সিদের নাম জুড়ে আছে, বরদাকান্তও হদিস দিতে পারেন না। ভুঁইখানা বিল থেকে সামান্য উঁচু—পাট ও আউশধান ফলে। একদিকে খানিকটা নাবাল জায়গা বিলের চেয়েও নিচু, ইটখোলা ঐটুকুরও নাম। পুববাড়ির কোঠাঘরের ইট কেটেছিল এখানে। তার পাশে উঁচু টিলা—ইটের জন্য বোধহয় মাটি কেটে কেটে ডাঁই করেছিল—বাড়তি মাটি কাজে লাগে নি, পাহাড় হয়ে পড়ে আছে। যবডুমুর গাছ পাহাড়ের মাঝখানটায়, পাহাড়ের বয়স যা, মনে হয় গাছেরও বয়স তাই।

যবডুমুর গাছের সঙ্গে কমলের বন্ধুত্ব। বক্সির-ভুঁই এবং ইটখোলার সঙ্গেও। ওরা যেতে পারে না কমলের কাছে, কমলই আসে যখন তখন। একদিকে গ্রাম আর একদিকে বিল। খরদুপুর নিশিরাত্রে বর্ষার মধ্যে শীতের মধ্যে বাসন্তী

জ্যোৎস্নায় বেঁটে যবডুমুর গাছ একলাটি দাঁড়িয়ে থাকে। বর্ষার জলে সবুজ ধানে বিল এঁটে যায়, বক্সির-ভুঁয়েও তখন ধান অথবা পাট। চারিদিকের অপার সবুজ সমুদ্রের মধ্যে ইটখোলাটুকুতেই কেবল ধান নেই। ধানবন না থাক, জল দেখবারও উপায় নেই তা বলে। শাপলা বড় বড় পাতা বিছিয়ে জল ঢেকে দিয়েছে—পাতার মাঝ দিয়ে অগণ্য শাপলাফুল মাথা তুলেছে। সকালবেলা এসে দেখতে অপরূপ—সব ফুল দল মেলে আছে তখন, ফুলে ফুলে জল আলো। সারারাত জেগে মনের মতো সাজ করেছে যেন। রোদ উঠলে এরূপ আর দেখাবে না, আস্তে আস্তে দল গুটিয়ে ফেলবে। উৎসবের শেষে গায়ের গয়না তুলে পেড়ে যেমন বাক্স-পেটরায় রাখে। এই শাপলা মাত্র নয়—সকলকে কলমিডগা পেঁচিয়ে জড়িয়ে জাল বুনে আছে, গাঁটে গাঁটে তার কলকের আকারের ভায়োলেট রঙের ফুল। একেবারে পাড়ের দিকে নীলাভ চেঁচোঘাস ও মা'লেঘাস।

জল বেশি বলে ইটখোলায় ঐখানটা বিলের মাঝ কিছু কিছু এসে জমে। কমলের অনেক ক্ষমতা—মাছ-মারাটাও শিখে ফেলেছে। জেঠামশাইকে ধরে গঞ্জ থেকে আধ পয়সায় বঁড়শি ও দু-পয়সার সুতো আনিয়ে নিয়েছে, তল্তবাঁশের সরু-আগায় সুতো-বঁড়শি বেঁধে এখন তার নিজস্ব ছিপ। বঁড়শি কেমন করে পুঁটে করতে হয়, জগাই দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে—নইলে এমন সুন্দর হত না। পটলা আর বক্সিনাথ লগির মাথায় খুঁচি বেঁধে তলায় তলায় নালশের (লালপিঁপড়ে) বাসা খুঁজে বেড়ায়। সরু চালের ফুরফুরে ভাতের চেয়েও নালশোর ডিম—কই-জিওল-পুঁটিমাছদের বড় পছন্দ, পেলে কপ করে গিলে ফেলে—তিলার্ধ দেরি করে না। কমলও ওদের সঙ্গে জুটেছে—নালশোর কামড় খায়, ডিমেরও ভাগ পায়। সরু সরু ডিম কোন কায়দায় বঁড়শিতে গাঁথে, তা-ও শিখে নিয়েছে। ছিপ হাতে সন্তর্পণে বক্সির-ভুঁয়ের আ'ল ধরে বাড়ির কেউ না দেখে এমনিভাবে চলে গেল সে ইটখোলায়।

জানে সব কায়দাকৌশল, কিন্তু ছিপ ধরে কাঠের-পুতুল হয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো অসম্ভব। আরও মুশকিল—তেপান্তর অবধি ধানবন, তার মাঝে প্রাচীন বটগাছটাও দেখা যায়—ডালে ডালে যার ভূত-পেত্নী ব্রহ্মদৈত্যদের বাস। আবার ডাঙার ওদিকে ফাঁকার মধ্যে কয়েকটা খেজুরগাছ, মাথায় বাবরি-চুল দন্তহীন ভুসড়ো মেসে কমলের দিকে হাসছে যেন নিঃশব্দে ফ্যা-ফ্যা করে। এ হেন জায়গায় একা একা দাঁড়িয়ে মাছ মারা চাট্টিখানি কথা নয়। ফিরে গিয়ে অতএব দুর্ধর্ষ দিদিকে সঙ্গে নিয়ে নিল। বলে ছিপ ফেল্ দিদি।

দূর, মেয়েমানুষ যে আমি—

মুখে আপত্তি পুঁটির, লোভ কিন্তু ষোলআনা। কমল বলে, এখানে কে দেখছে? কাদাজল ভেঙে এতদূর কেউ আসতে যাবে না।

নালশোর কামড় খেয়ে ডিম ভেঙে আনলি তুই। ছিপ-সুতো-বঁড়শি গোছগাছ করলি—

কমল বলে, ছিপ আমার যাচ্ছে কোথা? তুই দিদি মাছুড়ে খুব। কাপড়-ছোকনা দিলে তোর কাপড়ে কোঁয়া-পুঁটি ওঠে, আমার কাপড়ে শামুক-গুগলি। গোড়ায় দিনটায় কিছু না পেলে মন খারাপ হয়ে যাবে।

পুঁটি কাছে থাকলে কমলের ভয় লাগে না। বিল তো সামান্য স্থান, সাত সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে কলম্বাসের মতন। সামনের অকূল ধানক্ষেতের দিকে চেয়ে মনে হল, এখানেও সমুদ্র—সবুজ রঙের সমুদ্র-কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সে। এ হেন সমুদ্র না-দেখে একনজরে তাকে তাক করে থাকবে হবে ছিপের ফাতনার পানে—মাছের ঠোকে ঐ বুঝি ফাতনা একটু নড়ে উঠল—ছিঃ।

যবডুমুরের গাছে হেলান দিয়ে কমল বিল দেখছে। বর্ষার বিলে কতরকমের মজা। কত ডোঙা-ডিঙি, কতরকম মাছের চলাচল ধানবনের ভিতরে। অলক্ষ্য কোথায় আল ছাপিয়ে ঝিরঝির করে জল পড়ছে। এক-পা দু'পা করে কমল এগোয়, উঁকিঝুঁকি দেয় আওয়াজের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কারের আশায়। মাঝবিলে হঠাৎ মানুষ দেখা গেল—পুরোপুরি নয়, মাথা বুক অবধি, বাকিটা ধান-বনের মধ্যে তলিয়ে আছে। সেই অবস্থায় সাঁ-সাঁ করে ছুটছে। ঐ একমাত্র মানুষেই শেষ নয়—পর পর আরও কয়েকটি। কী ছোটা ছুটছে ধানবন ভেঙে। ছুটছে তো বটেই—কিন্তু মানুষগুলোর পা ছোটে না, কমল তা জানে। ডোঙা ছোটে, যে ডোঙার উপরে চড়ে লগি মারছে। ডোঙা চক্ষুর গোচরে নেই।

পুঁটি ভেবেছিল, তারাই প্রথম—ইটখোলার মাছের খবর অন্য কেউ জানে না। কিন্তু ঠাহর হল, এদিক-সেদিক ফুট কাটা রয়েছে। ফুট হল দাম-সরানো যৎসামান্য ফাঁকা জায়গা, বঁড়শি যে ফাঁকে জলতলে যেতে পারে। ফুট কেটেছে অতএব ছিপ নিয়ে আসে নিশ্চয়ই মানুষ। কইমাছ মারার উৎকৃষ্ট সময় ভোরবেলা রোদ ওঠার আগ পর্যন্ত। ভোরে অতএব সেই মানুষ এসে রোদ না উঠতে ফিরে যায়।

যবডুমুর গাছের গুঁড়ি বেশ মোটা, সামান্য উঁচু থেকেই ডাল বেরিয়েছে। এ গাছের ছাল কবিরাজি ওষুধে লাগে। ছাল কেটে কেটে নিয়ে যায়—নতুন ছাল বেরিয়ে ডুমো-ডুমো হয়ে আছে। এমনি করে করে গুঁড়ি কুষ্ঠে-রুগীর চেহারা নিয়েছে। ডালের উপর আরও খানিক উঁচুতে উঠে কমল ভাল করে বিল দেখছে। পায়ের চাপে শুকনো ডাল একটু ভেঙে গেল। পুঁটি ছুটেছ

দিকে এক নজরে ছিল—চকিতে চোখ তুলে বলল, গাছের উপর কি করিস?

কমল বলে, আছি বসে। বেশ তো আছি।

পুঁটি আর কিছু বলে না। কাতনার দিকে পলকহীন নজর। ভাই-বোনে তারা বাড়ি ফিরে যাবে, যজ্ঞডুমুর গাছ আবার তখন একা—কমল ভাবছে এই-সব। গাছের জন্ম কষ্ট হচ্ছে খুব। ভরদুপুরে কিংবা নিশিরাত্রে তেপান্তরের বিলের পাশে একলা একটা প্রাণী দাঁড়িয়ে থাকে—কথা বলতে পারে না বেচারী, নড়তে চড়তে পারে না।—আহা, কী কষ্ট গাছের!

চমক লাগল হঠাৎ। বলছে যেন কথা—যজ্ঞডুমুর গাছ বোবা মুখে কী যেন বলতে চাইছে। গাছের গায়ের উপর কান রাখল কমল। শুনতে পায়, কিন্তু একবর্ণ বুঝতে পারে না। বিলের হাওয়ায় পাতা নড়ছে, তারই সঙ্গে হড়বড় করে গাছ একসঙ্গে কত কি বলে যাচ্ছে।

আস্তে রে, বুঝতে পারিনে।

গাছের গায়ে কমল আদরের চাপড় মারল। পাতা আস্তে নড়লে কথা-বার্তা সে যেন বুঝতে পারবে। প্রবোধ দিচ্ছে গাছকে—। পুঁটি অদূরে, শব্দ করে কিছু বলতে গেলে হেসে গড়িয়ে পড়বে সে, ঠাট্টা করবে, পাগল বলবে কমলকে। অতএব নিঃশব্দ ভাষায় মনে মনে সে গাছকে বোঝাচ্ছে: যাই বলো গাছ, এখন এই ভরভরন্ত বর্ষায় মোটেই তুমি একা নও। অজস্র ধান-গাছেরা রয়েছে, ওদিকে পাটগাছ—ছোট হোক, যাই হোক—গাছই তো এরা সব। তবে আর একলা কিসের? সে বটে বলতে পারো চোত-বোশেখে—

চোত-বোশেখে ফাঁকা মাঠ ধু-ধু করে। শুকনো-খটখটে ইটখোলা। মাছ যা এসেছিল, জল সেঁচে মানুষে ধরে নিয়ে গেছে—চিল-কুলো্য-মাছরাঙায় ছোঁ মেরে মেরে নিয়েছে। শাপলা শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন। লকলকে কলমির ডগাও নেই, নিস্তেজ দু-চার গাছা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ধুঁকছে। ফুল ফুটিয়ে স্ফূর্তি করার দিন তখন নয়। যজ্ঞডুমুর গাছ সেই সময়টা একেবারে একলা। মন টানে—গাছকে কমল তখনও মাঝে মাঝে দেখতে আসে। কড়া রোদ, জনপ্রাণী নেই কোনদিকে। বাড়ির লোক নিদ্রামগ্ন। সেই হল সুলগ্ন—পুঁটিকেও বলে না, একলা বেরিয়ে আসে।

বক্সির ভুঁয়ে তখন চাষ দিয়েছে—জেলাবন। পার হয়ে আসতে পায়ের তলায় ব্যথা করে। ইটখোলার মাটি কেটে চৌচির—দৈত্যের হাঁ বুঝি গ্রাস করে ফেলবে। সত্যি সত্যি তাই একদিন হল। ঘোরঘুঁড়ি আকাশে—ভারি মিষ্টি সুর বেরোয় ঘোরঘুঁড়ি ওড়ার সময়। কমল আকাশের ঘুঁড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে হাঁটছে, ফাটলের মধ্যে পা ঢুকে গেল। এত টানাটানি, পা কিছুতে

ওঠে না। মাটি যেন শিকল পরিয়ে আটকাল। ভয় হয়ে গেল হস্তরমতো। দূরের আ'লপথে ফটিক মোড়লকে দেখা যায়, কোন কাজে হন হন করে চলেছে। কমল ব্যাকুল হয়ে ফটিকদা ফটিকদা—করে ডাকছে। এমনি সময় পা উঠে গেল হঠাৎ। পা টেনে ধরে মাটি মস্করা করছিল—নিশ্চয় ঠাট্টামস্করার ব্যাপার, ইচ্ছে করেই করেছিল—ফটিকের এসে পড়ার সম্ভাবনায় ছেড়ে দিল। ভাগ্যিস ফটিক ডাক শুনতে পায়নি, মান রক্ষে হয়ে গেল তাই।

যবডুমুর ফলনের সময় এখন। গাছে চড়ে কমল কচি কচি দেখে কিছু পাড়ল। কচু-পাতায় মুড়ে বাড়ি নিয়ে তরঙ্গিণীকে বলল, কী ফলন ফলেছে মা। এই ক'টা নিয়ে এসেছি। চাও তো আরো আনতে পারি।

তরঙ্গিণী ছেলেকে বললেন, এই ডুমুর খায় নাকি ?

মানুষে খায় না, ওষুধ-পত্তরে কিছু লাগে। তাই বা ক'টা ! বিল-কিনারে নিঃসঙ্গ যবডুমুর গাছ। গুঁড়ির গোড়া থেকে মগডাল অবধি ডুমুর ফলতে কোনখানে বাকি থাকে না। বড় হয় ফল, পাকে, কাক-কুলিতে খেয়ে যায়। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, যবডুমুর গাছ একলা প্রাণী বিলের কিনারে কাল কাটায়।

গাছটার জন্ম কমলের কষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যা হল, সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। এই রাত্তিরে যবডুমুর গাছের নিশ্চয় ভয় করছে। হাঁটতে পারে না, অচল অথর্ব হাটখোলার সেই কুঠেরুগীর মতো—পারলে পালিয়ে আসত ঠিক। বোবা বলে ডাকতেও তো পারছে না—আহা, গাছের বড় কষ্ট ! কমলকে কেউ গাছের মতন যদি বিলের ধারে দাঁড় করিয়ে দেয়—পা-দুটো শিকড়ের মত পোঁতা ? আর খুব খানিকটা বেলেসিঁদুর খাইয়ে কথা বন্ধ করে দিয়েছে—কষ্টে-সৃষ্টে মুখ দিয়ে একটুকু ফ্যাসফেসে আওয়াজ বেরোয় শুধু। জোর হাওয়া-এলে যবডুমুরের পাতায়-পাতায় যে ধরণের আওয়াজ ওঠে। ওমা, মাগো, ছেলে তোমার গাছ হয়ে গেছে—দেখে যাও এসে।

হত যদি তাই সত্যি সত্যি। সাতভাই-চম্পার মতো—ভাইরা সব চাঁপাফুল, বোনটি পারুল। যেই না মাকে পেয়েছে, ফুলেরা ছেলে হয়ে গিয়ে ঝুপঝাপ কোলে-কাঁখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কমলেরও তাই—বিলের ধারে সে এক যবডুমুর গাছ। কেমনটা হয় তাহলে—ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মা তো আলুথালু হয়ে 'ওরে খোকন, কোথায় গেলি'—বলতে বলতে বিলের পানে ছুটল। গিয়ে জড়িয়ে ধরতেই গাছ সঙ্গে সঙ্গে আবার খোকন। খোকন হয়ে মিটিমিটি হাসছে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে, কতক্ষণের মধ্যে মা টেরই পেলো না।

—শেষ—

'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ'

সম্পর্কে

কয়েকটি আলোচনা

গ্রামীণ জীবনযাত্রার
'সাগা'-গ্রন্থ

ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু মহাশয়ের 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' উপন্যাসখানি একাসনে বসে পড়ে ফেলায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। মন যখন রসানন্দে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে, তখন সেই মানসিক অবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কেমন তার হদিশ দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তখন ভালোমন্দ বিচারের বোধ ও প্রবৃত্তি ক্ষণকালের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। প্রখর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তির ঘুমন্ত অবস্থার

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. পি-এইচ. ডি.: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের প্রধান, সঙ্গীত ও ললিত-কলা বিষয়ের ডীন; বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বহুখ্যাত গবেষক ও ইতিহাস-লেখক।

মানসিক মানচিত্র অঙ্কন সম্ভব নয়। তবে সুপ্তিভঙ্গের পর লোকে বুঝতে পারে সুনিদ্রা হয়েছিল। রসসাহিত্যে মন মাতোয়ারা হয়ে গেলে চিত্তবৃত্তি ক্ষণেকের জন্য নিজ রাজ্যপাট ত্যাগ করে। এই উপন্যাসখানি পড়তে বসে আমার মনের অবস্থা কতকটা সেই রকমই হয়েছে। এটি শ্রীযুক্ত বসুর সর্বাধুনিক উপন্যাস, এবং আমার মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। শুধু তাঁরই বা কেন, সাম্প্রতিক উপন্যাসের পসরা সাজির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, মনোজ

বসু মহাশয় প্রবীণ ও নবীন—সকলকে ম্লান করে দিয়েছেন। এই কথাগ্রন্থখানি বিলীয়মান গ্রামীণ জীবনযাত্রার একখানি 'সাগা'-গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। যশোহর-খুলনা-চব্বিশ পরগণার পটভূমি ও জনজীবনের এতটা ব্যাপ্তি ও বিশালতা একালের উপন্যাসে বড়ো একটা পাওয়া যায় না। বিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর এর কালের সীমা। এই দেশ-কালের মধ্যে কতকগুলি গ্রামীণ মানুষের সুখদুঃখের জীবন আবর্তিত হয়েছে। সোনাখড়ি গ্রামের ভবনাথ ঘোষ এর কেন্দ্রীয় চরিত্র, কিন্তু তাঁকে ঘিরেই সমস্ত ঘটনা এগিয়ে চলেনি। বস্তুতঃ বাঁধাধরা উপন্যাসের মতো এর বিশেষ কোন কেন্দ্রীয় কাহিনী নেই, কোনও একজন চরিত্রের ওপরও এর ভারকেন্দ্র নির্ভর করছে না। সমগ্র গ্রামটিই যেন একটা চরিত্র রূপে দেখা দিয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করেই নর-নারীর চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের আঙ্গিকও কিছু অভিনব। কাহিনী বা চরিত্র, বিশেষ কোন একটির একক প্রাধান্য এর মধ্যে নেই। ছোট-বড়ো চরিত্র, ঘটনা, গ্রাম্য পরিবেশ—সব কিছু শোভাযাত্রায় এগিয়ে চলেছে। যূথবদ্ধ জীবনচিত্রই এ কাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য। বহু চরিত্র ও কাহিনীগুলিকে এমনভাবে পরিচালিত করা, কোনও একটিকে প্রাধান্য না দিয়ে সবগুলিকে সমান গুরুত্ব সহ চিত্রিত করা একটা বিশেষ ধরণের সৃষ্টিক্ষমতা বলেই পাঠকেরা স্বীকার করবেন। প্রবীণ বয়সে পৌঁছেও লেখক যে কতটা দক্ষতা দেখাতে পারেন, এই উপন্যাসেই তার প্রমাণ মিলবে। সম্প্রতি বাংলা কথাসাহিত্যে নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। গল্প-উপন্যাসে আদৌ আখ্যান থাকবে কিনা, চরিত্র বিকাশই উপন্যাসের একমাত্র লক্ষ্য কিনা, অথবা ব্যক্তিজীবনের বিচ্ছিন্নতাই উপন্যাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করবে কিনা—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ও সমস্যা একালের শিল্পী ও পাঠকের মনে নানা তরঙ্গ তুলেছে। শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় সেসব জটিল ও অ্যাকাডেমিক জল্পনার মধ্যে না-গিয়ে যে সমস্ত মানুষ স্মৃতির পটে হারিয়ে গেছে, অথবা 'স্বার্থপর রাজনীতির কবলে পড়ে যারা সাতপুরুষের বাস্তুভিটে ছেড়ে নগরীর পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে, এই উপন্যাসে তাদের স্মৃতি তর্পণ করেছেন। তারা আর কোনও দিন দেশ-কালে বিচরণ করবে না, কিন্তু তারা অমর হয়ে রইল লেখকের মনে এবং মন থেকে গ্রন্থের মধ্যে অবতরণ করে। আমরা এই গ্রামজীবনের একদা শরিক ছিলাম, তারপর জীবিকার তাড়নায় সে সমস্ত গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম পাষাণপুরীতে। স্মৃতির পটে ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত ছায়াছবি ম্লান হয়ে গেল। হঠাৎ এই উপন্যাসখানি পড়তে পড়তে আবার যেন অর্ধ-শতাব্দীর পূর্বেকার নদীনালা, বাড়োড়,

হাতের হাতছানির ইঙ্গিত পেলাম, দেখলাম, কখন যেন নিজেই জাতিস্মর হয়ে উঠেছি, বালক কমলকে আমারই মধ্যে আবিষ্কার করলাম। হয়তো অনেকেই আমার অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছেন। অনেক দিন কোন গল্প-উপন্যাস পড়ে এত তৃপ্তি পাইনি, এত আনন্দ বোধ করিনি, এত ব্যথাও পাইনি। কোন্ মুহূর্তে লেখক যে আমার একান্ত আপনজন হয়ে পড়েছেন, তাও বুঝতে পারিনি।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস নানা সমস্যার ভারে কুব্জ হয়ে পড়েছে। রাজনীতি সমাজতত্ত্ব, মনোবিকার—সমাজের কানাগলি ও চোরাপথের বিষাক্ত অন্ধকারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষগুলোও হারিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, দেহমনের বিকৃত দুঃস্বপ্নই বুঝি জাগরণের চেয়েও সত্য ও যথার্থ। লেখকের নিজস্ব মনোবিকার অথবা সাগরপারের কেতাবি বিদ্যা থেকে থেকে 'কুন্তিলক'-বৃত্তিজাত অপচ্ছায়াগুলি যখন আমাদের চারিদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তখনই 'সেই গ্রাম, সেইসব মানুষ' হাতে এল। এতদিন যেন অন্ধকূপের মধ্যে ছিলাম, এবার বহতা ধারার মধ্যে এলাম। মানসিক রুচির স্বাদ ফেরাবার জন্য শ্রীযুক্ত বসুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই উপন্যাস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একালের বাংলা কথাসাহিত্যে একক মহিমায় বিরাজ করবে এবং অল্পকালের মধ্যেই এটি চিরায়ত সাহিত্যের মর্যাদা পাবে।

আশ্চর্য বই

ডক্টর অমলেন্দু বসু

"এমনি হাজার ছবি, হাজার মুখ, মন ধরে রেখে দেয়…দরকার মতো বের করে দেয়,"—একথা বলেছিলেন অবন ঠাকুর। ধরে' রাখে তো মনই, কিন্তু সবারই মন ধরতে পারে না, কিম্বা সব জিনিসই ধরে' রাখারমতো নয়। মনোজ বসুর মনে ধরে' রাখার শক্তি আছে, যে-স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছে তা' অবশ্যই ধরে রাখার মতো। হাজার মুখ, হাজার ছবি ধরে' রাখার মতো অসামান্য সংবেদনা ও নিপুণতার মালিক মনোজ বসু। "সেইগ্রাম, সেই সব মানুষ"—এই শিরোনামাতেই ব্যঞ্জিত হয়েছে একটা বিমথিত বেদনাবোধ এমন এক সমাজের জন্য যাকে আজ আর আমরা খুঁজে পাচ্ছি না (খুঁজে পাওয়া সম্ভবই নয়), যাকে আর পাওয়া যাবে না, কিন্তু হায়, যার জন্য মনোজ বসুর ও আমাদের যে-কোনো বাঙালীর স্মৃতিদীর্ণ চিত্তের অন্তস্থলে ছড়িয়ে আছে অহর্নিশি একটা হতাশক্লিষ্ট অথচ সংগুপ্ত বেদনাবোধ।

মনোজ বসুর এই আশ্চর্য বইয়ে চিত্রিত হয়েছে একটি প্রায়-বিস্মৃত জীবন-পরিবেশ। বিস্মৃত হয় তো সব কিছুই। "কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন

অমলেন্দু বসু, এম. এ., ডি. লিট (অক্সফোর্ড) আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান। দেশে ও বিদেশে খ্যাতিমান সাহিত্যরসবেত্তা ও সমালোচক।

যৌবন ধনবান।" সেই ভেসে-যাওয়া জীবনকে শিল্পকলার শক্তিতে ফিরিয়ে আনতে পারেন শিল্পী।…………

কাহিনী আছে যে তিনি যে কালে একের পরে এক ছবি এঁকে যেতেন সূর্যাস্তের তখন জনৈক মহিলা-দর্শক বলেছিলেন, "মিঃ টার্নার, ছবিগুলির রং, সুন্দর, কিন্তু এরকম সূর্যাস্ত তো আমি কোনোদিন বাস্তবে দেখিনি।" টার্নার জবাব দিয়েছিলেন, "দেখেননি হয়তো, কিন্তু দেখতে পারলে কি সুখী হতেন না?" মনোজ বসুর সোনাখড়ি তেমনিই এক গ্রাম, ভবনাথ-দেবনাথ-উমাসুন্দরী-অলকাবউ তেমনই নরনারী যাঁদেরকে পাঠকেরা দেখেননি, লেখকও সম্ভবত হুবহু তাঁদের দেখেননি। দেখবেন কি করে? বস্তুত এই সব নরনারী রক্ত-মাংসের নরনারী ছিলেন না। তাঁরা, তাঁদের নিবাস, তাঁদের রীতিনীতি আচারব্যবহার, ধ্যানধারণা, তাঁদের স্বপ্ন, তাঁদের কর্ম কোনো লৌকিক জগতের ঠিকানায় মিলবে না, মিলবে আমাদের কল্পনার জগতে। কিন্তু তবুও এ সবই আমাদের অসংখ্য লৌকিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়া এবং সে জন্যই এদের একটা অনবদ্য প্রাকৃত সত্তাও ধরা পড়েছে এই কল্পনাসমৃদ্ধ রচনাকুশলী লেখকের কাহিনীতে। সোনাখড়ি নামের কোন গ্রাম থাক না থাক, পৃথিবীর যে-অঞ্চল সেদিন অবধি পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল, প্রাচীন ইতিহাসে সমতট, বঙ্গ, বঙ্গাল নামে অভিহিত হত, যে-অঞ্চল ভারতীয় ইতিহাসের তিক্ততম বেদনাবিধুর অধ্যায়ে ভারত বা ইণ্ডিয়া থেকে বিযুক্ত হয়ে গেল, সেই পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামীণ জীবন নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন মনোজ বসু এমন অপরিসীম সমানুভূতি নিয়ে, এমন নিপুণ চিত্রশিল্পের অবিস্মরণীয় বর্ণালীতে, এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্যসম্ভার দিয়ে যাঁরা সেই পূর্বঙ্গের গ্রামে বাস করেছেন অথবা যাঁরা পূর্ববঙ্গে না গিয়ে থাকলেও সেখানকার কথা জানেন, যাঁরা রাজনৈতিক রূঢ়তা সত্ত্বেও দুই বাংলার অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বিশ্বাস রাখেন, তাঁদের সকলের কাছে সোনাখড়ি হবে একটি প্রতীক, ভবনাথ-দেবনাথ-উমাসুন্দরী-অলকা কমলের জীবন হবে সেই চিরন্তন বাংলার অবিনশ্বর সংস্কৃতির নিদর্শন, যে বাংলা সম্বন্ধে জীবনানন্দ লিখেছিলেন, "বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে চাহি না আর।" নিষ্কম্প প্রত্যয়-গভীর বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল;—এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।" এই গ্রাম, এই সব মানুষদের উদ্দেশ্য করে মনোজ বসু উৎসর্গপত্রে লিখেছেন:

> তোমরা ছিলে। ত্রিভঙ্গ-স্বাধীনতার তাড়নায় বড় তাড়াতাড়ি
> শেষ হয়ে গেলে। আমার এই দীর্ঘশ্বাসে তোমাদের অন্তিম তর্পণ।

তোমরা ছিলে...শেষ হয়ে গেলে...অন্তিম তর্পণ—প্রতিটি কথায়

নিঃশেষিত-আয়ু আপনজনকে স্মরণ করা হয়েছে এবং এই প্রতীকী স্মরণের বেদনার্ত সংক্ষিপ্ত বাণীতে উদ্দিষ্ট হয়েছে সমগ্র পূর্ববঙ্গের হারিয়ে-যাওয়া জীবন।

মনোজ বসুর এই নিবিড় প্রেমসিক্ত চিত্রণে কিন্তু কোনো হাল্কা ভাবালুতা নেই। তাঁর চিত্রকর্মে তথ্যবস্তুর অসাধারণ ঐশ্বর্য। কত যে গ্রামীণ প্রথা ও বিশ্বাস তিনি ধরে রেখেছেন এই বইয়ে! তিনি উল্লেখ করেছেন কত সব গ্রাম্য প্রত্যয় ও সংস্কারের বিষয় যেগুলি আজকের নাগরিক জীবনে আর প্রবহমান নেই, গ্রাম অঞ্চলেও স্তিমিত হয়ে এসেছে, আজকের বিপর্যস্ত জীবন-সংগ্রামে যার বিলোপ ঘটেছে। তিনি বলেছেন নষ্টচন্দ্রের কথা ("আকাশের চাঁদ ঐ দিনে নষ্ট হয়ে যায়, দর্শন নিষেধ" পৃঃ ১২৩), তাম্রসংক্রান্তির কথা ("আজ যারা সকালবেলা শুয়ে গড়াবে, তাম্রমাস যাবার মুখে বেদম কিলিয়ে সর্বাঙ্গ তাদের ব্যথা-ব্যথা করে দিয়ে যাবে" : পৃঃ ১২৬), কেন আকাশে প্রদীপ দিতে হয় মহালয়ার তর্পণের পর থেকে (পৃঃ ১৩৯—১৪০), ষষ্ঠীর দিন থেকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা অবধি ঢেঁকির পাড় পড়তে নেই (পৃঃ ১৪৪) কোজাগরীতে "নিশিজাগরণ-অক্ষক্রীড়া-চিপিটক-নারিকেলোদকভক্ষণ" : (পৃঃ ১৪৮), তিরিশে আশ্বিন সংক্রান্তির দিনে ধানবনকে সাধ খাওয়ানো—অর্থাৎ ধানের ক্ষেতকে মা ভেবে, যাকে গর্ভবতী কল্পনা করে মায়ের সুসন্তান জন্মাবে এই কল্পনায় মা'কে সাধ খাওয়ানো (১৪৯ পৃঃ), গারসির রীতিকর্ম (পৃঃ ১৪৯—১৫০)। নিরবচ্ছিন্ন নিপুণতায় মণ্ডিত করে, ভাব-জনোচিত সহানুভূতির সঞ্চারে, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক চেতনার প্রাচুর্য মিলিয়েছেন এই সংস্কারগুলির ব্যাখ্যায়, মূল কাহিনীর সঙ্গে এদের অন্তর্গ্রন্থনে। গ্রামে তো বাস করেছেন কত লেখক, কিন্তু মনোজ বসুর মতো এমন নিবিড় একাত্মতায় সেই গ্রাম্য সংস্কৃতির জ্ঞান ধারণ করে রেখেছেন আর ক'জন? গাছের নামই দিয়েছেন কত!—বেলতলি খেজুরতলি নারকেলতলি জামতলি বাদামতলি ডুমুরতলি (পৃঃ ৫৩)। আম আছে নানা জাতের—গোপালভোগ, কালমেঘ, কানাবাঁশী, টুরে, চ্যাটাজে, চুষি, কালমেঘা। তেমনি আবার ধানের নাম : "ধানের নামেই তো প্রাণ কেড়ে নেয়!" (পৃঃ ২০৩)—কাজলা, অমৃতশাল, নারকেলফুল, গজমুক্তা, সীতাশাল, গিন্নিপাগলা, শিবজটা, সোনা-খড়কে, সূর্যমণি, পায়রাউড়ি, বাদশাপছন্দ। মনোজ বসুর কাহিনীতে একটি চরিত্র আছে—রমনী দাসী—সে বলে ওক কথা, অর্থাৎ রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর পাতালবাসিনী-রাজকন্যা ব্যাঙমা-ব্যাঙমী গোবর-চাপা দেওয়া সাপের-মাথার মাণিক—এই সব গল্প।

এবং এসব পূর্ববিস্মৃত অথবা প্রায়-বিস্মৃত গ্রামীণ ধ্যানধারণা রীতিনীতি ও

কাহিনী পাঠকের কাছে তুলে ধরার সময় মনোজ বসু প্রয়োগ করছেন অজস্র শব্দ, যেগুলি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে মূল্যবান সম্পদ : ব্যাগোতা করছি, লকপকে ডাল, হাতনের বসিয়ে, হ্যাগড়া-হেমতি, হত্তোশ-কাক্তা, হাতাবিতি, পাইতকে, খাঁইখাই, তালিচুলি, মুকোধাড়া, আগভিছ কোয়াসতে ; ইত্যাদি।

মনোজ বসুর এই বইয়ের নাম সর্বাঙ্গসার্থক এবং সুধীগুণসম্পন্ন : সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ। "তোমরা ছিলে"—এই জীবনকাহিনী কোনো অপ্রাকৃত কাহিনী নয়, কোনান্ ডয়েল-এর "লস্ট্ ওয়ার্ল্ড্" নয় যদিও অন্য অর্থে বাঙালী সংস্কৃতি থেকে এই 'বাঙালা' সংস্কৃতির ধারা আজ প্রায় লোপ পেয়েই গেছে। মনোজ বসুর কাহিনীতে শুধু যে বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃতি বিধৃত হচ্ছে তা-ই নয়, এ-কাহিনীতে একটা মহাকাব্যোচিত, এপিকসঙ্গত বিশালতা, গভীরতা, সূক্ষ্মতা, ব্যাপকতার রূপ ধরা পড়ছে। এ-কাহিনীতে একই কালে সংহত ও উচ্ছলিত, মায়াবী আলোর স্নিগ্ধ রহস্যময় এবং রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের সর্বপ্রকটি প্রকাশ্যতা।

কিন্তু আমার সংবেদনায়, মনোজ বসুর কাহিনী মহাকাব্যোচিত হলেও তাঁর কাহিনীকথনের করণ কৌশল মহাকাব্যপ্রকরণের চেয়ে অনেক বেশি জটিল, বিচিত্র এবং (স্বভাবতই) আধুনিক। এই কাহিনীতে বহু বিচিত্র শিল্পের প্রকরণ আশ্চর্য নম্রতায় সম্মিলিত হয়েছে : কাব্য, গদ্যরীতি, নাটক, চিত্রশিল্প, সঙ্গীতশিল্প—সবই যেন মনোজ বসুর সৃজনী কল্পনায় জড়িয়ে গেছে হয়তো তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতসারে (কেননা সৃজনী কল্পনা এবং লৌকিক বিচক্ষণতা সমমূল্যের নয়)। মনোজ বসু তাঁর কাহিনীকথন শুরু করেছেন এই ভাবে :—

যবনিকা তুলছি।

এই শতকের প্রথম পাদ। মানুষেরা সেই সময়ের। গ্রামের চেহারা ভিন্ন।

ছোট ছোট চারটি বাক্য, দীর্ঘতম বাক্যটিতে চারটি শব্দ, শেষের তিনটি বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য। 'যবনিকা তুলছি' অর্থাৎ একটা নাটক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আমাদের (প্রেক্ষাগৃহস্থ দর্শকদের) চোখের সামনে। এই কাহিনীর বিধাতা-স্রষ্টা-কথাকার রঙ্গমঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছেন, 'যবনিকা তুলছি'। এ যেন কবি-নাট্যকার ডিলান্ টমাসের 'আণ্ডার মিল্ক্ উড্' নাটকের শুরুতে একটি কণ্ঠস্বর ঘোষণা করছে, 'To begin at the beginning', আমার কাহিনী শুরু হল।

মনোজ বসুর এই নাটকীয় ঢংয়ের কাহিনীকথন-সূচনা তাঁর সমগ্র করণ-

কৌশলের মহামূল্যবান আঙ্গিক বলে আমার মনে হয়। এই নাটকীয়তার প্রচ্ছদে লেখকের একান্তিক আপন ব্যক্তিত্ব লীন হয়ে গেছে একটি ব্যাপক বহুশক্তিমান ব্যক্তিত্বে, অর্থাৎ ব্যক্তি মনোজ বসু রূপান্তরিত হয়ে গেছেন শিল্প-স্রষ্টা মনোজ বসুতে। এই রূপায়ণের ফলে যে সব মানুষ, যে-জীবন, যে-ধ্যানধারণা তিনি পেশ করেছেন এই গ্রন্থে, সেগুলি একটি বিশেষ মানুষের আত্মকথন থাকছে না – সেগুলির রূপান্তর হয়েছে চিরস্থায়ী সত্যে। সুতরাং সম্পূর্ণ কাহিনীটি উজ্জ্বল হয়েছে পবিত্র প্রতীকের মূর্তিতে।

কিন্তু নাটকীয় সূত্রপাত থেকে আমরা এগিয়ে চলি গল্পকথনের আঙ্গিকে। এবার গল্প বলা শুরু হল ; সোনাখড়ির দেবনাথ ঘোষ আট বেহারার পাল্‌কি চড়ে এসেছেন স্বগ্রামে : এই টুকুন বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের কল্পনা বিশ শতকের চতুর্থ পাদ ছেড়ে ফিরে চলে যায় প্রথম পাদে। বাস্তবে যা সম্ভব নয়, তাই হল, অর্থাৎ সময়ের নদীপ্রবাহ না এগিয়ে গেল পিছিয়ে, (গল্পের আঙ্গিকে এমনটি হয়)। নাট্যধর্ম থেকে আমরা এসেছি গল্পকথনে, আবার কয়েক পৃষ্ঠা পরে (১৩ '৪ পৃষ্ঠায়) এগিয়ে গেলাম কাব্যে, বর্ণনাধর্মী কাব্যে। এর পরে সঙ্গীতশিল্পে, চিত্রশিল্পে। কত না শিল্পের সমাবেশ ! মনোজ বসুর নাট্যান্বিত ব্যক্তিত্বে বহু শিল্প মিশেছে। সেই যে দুশো বছর আগে জার্মান দার্শনিক গট্-হোল্ড্ লেসিং বলেছিলেন যে শিল্পরূপগুলি বিভিন্ন নয়, শিল্পত্বের একান্ত কেন্দ্রীয় ধর্মে তারা সবাই সমান, তারা একে অন্যে পরিবর্তিত হতে পারে, সেই বিনিময়-রূপান্তরণ-সমীকরণের কৌশল বিশশতকী শিল্পের উজ্জ্বলতম কীর্তি। এই শতকের কাব্যে-উপন্যাসে নাটকে এই রূপান্তরণ সমীকরণ সতত লক্ষ্য করা যায়। কবিতায় নাটকীয়তা চলে আসে, একটা সম্পূর্ণ কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠব (যেমন এলিয়টের 'ওয়েইস্‌ট্ ল্যাণ্ড্' কাব্যে) চতুর ভাবে একটা সিম্‌ফনির অঙ্গসৌষ্ঠবে মিশে যেতে পারে। এক শিল্পরূপ থেকে অন্য শিল্পরূপে উত্তরণ সব চেয়ে প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে সিনেমা জগতে। সিনেমা নিয়েছে চিত্রশিল্পের ও ধ্বনিশিল্পের ব্যঞ্জনা, কিন্তু নেওয়ার পরে উত্তমর্ণ শিল্পগুলিকে সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিয়েছে মহার্ঘতর আঙ্গিক দান করে। সিনেমা-শিল্পের দৃশ্য-প্রতিমা (ভিস্যুয়াল্ ইমেজারি) মনোজ বসুর এই গ্রন্থের সমৃদ্ধতম আঙ্গিক। একের পরে আরেক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে কল্পনার সামনে এসে দাঁড়ায়, মিলিয়ে যায়, আবার মিলেও যায় পরবর্তী অন্য একটি দৃশ্যের সাথে। সতত সঞ্চরমাণ দৃশ্যাবলীর পারম্পর্য এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যেন যে কোন দৃশ্য তার পূর্ববর্তী দৃশ্যের জঠর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। সিনেমা শিল্পের অধুনা-সুপরিচিত আঙ্গিকগুলি—মন্‌তাজ, কোলাজ, ফেড্-আউট, ক্লোজ আপ্ প্রভৃতি

আঙ্গিক—বলোক বসুর এই গ্রন্থে অতীব নিপুণভাবে প্রযুক্ত হয়ে কাহিনী-কথনের ঐশ্বর্য বাড়িয়েছে।

বইখানা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, এই বইখানা লেখকের বিস্তীর্ণ গল্প-জগতের অংশমাত্র। "তোমরা ছিলে।" এই সব নরনারী একদা ছিলেন। কিন্তু তাঁদের জীবনে যে বিচিত্র বহমানতা ছিল সেই প্রবাহ প্রদর্শন করতে হলে, কাহিনীকে এগোতে হবে আরো। এগোতে হবে সেই ধাপে যেখানে "বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল", লেখকের এই বেদনাবিধুর উক্তিটি সার্থক হয়ে যায়, আরো অনেক নরনারীর, অনেক ঘটনার, অনেক আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশার আবর্তের মধ্যে দিয়ে চলে, সর্বধ্বংসী নিষ্ঠুর বজ্রপাতের তুল্য দেশবিভাগের ফলে। সেই শেষের দিন যে অবধি তারই প্রতীক্ষায় বসে থাকবেন রুদ্ধবাক্ পাঠক।

মহাকালের প্রাসাদ-দ্বারে স্তুতিপাঠক ভট্টনায়ক

ডক্টর ভূদেব চৌধুরী

সাহিত্য জীবন-সম্ভব। শুধু তাই নয়, সার্থক সাহিত্য জীবনের চলমান চরিত্রকে অমরতা দান করে। জীবনের আর একটা অংশ ধরা থাকে ইতিহাসের পাত্রে, বাসিফুলের মালা যদি সে না হয়, তবু স্রোতের সীমানা জোড়া বালুচরের মত পড়ে থাকে, প্রাণের শস্যশ্যামল শোভাটি তার কোথাও গজিয়ে তোলার প্রত্যাশা নেই। কিন্তু যদি পাই পলিমাটির চর!—পদ্মা-মেঘনা-সুরমায় যেমন দেখেছি, গঙ্গা-ভাগীরথীকেও দেখি!—তাহলে জীবনের বহতা স্রোতকে মুঠোর মধ্যে পাই কেবল মূর্তিমান কাঠিন্যের ধমতায় নয়, প্রাণ-তরঙ্গিত শ্যামশোভাময় দীপ্তিতে।

তেমনি পাওয়া যেত পূর্ববাংলায় ভাটের গানে একদা, সেই স্মৃতি মথিত হয়ে এল আশ্চর্য এক কাহিনী পড়ায় অনুভব,—মনোজ বসু লিখেছেন,—'সেই

ভূদেব চৌধুরী, এম. এ., পি-এইচ. ডি. : বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) বাংলা-বিভাগের প্রধান , বাংলা-সাহিত্য, বিশেষত বাংলা ছোটগল্প সম্বন্ধে স্মরণীয় গ্রন্থের লেখক।

গ্রাম, সেই সব মানুষ' পড়েছি, আর মনে মনে ভেবেছি,—পূর্ববাংলা ছিল ভূম্যধিকারী ছোটবড় রাজ-রাজড়া জমিদার-জোতদারের বিচরণভূমি। পুজোর সময়ে, এবং পুণ্যাহের মাসগুলিতে ভট্ট ব্রাহ্মণেরা আসতেন, প্রতি গ্রাম-ঘরের সম্পন্ন বংশাবলির ইতি   তাঁদের নখদর্পণে। তাই কবিতার মত সাজিয়ে সমবেত ক্রুতকণ্ঠে সুর করে আবৃত্তি করে যেতেন—যেন উচ্চকণ্ঠ বাণীর ঝলমলে সুতোয় অফুরন্ত তথ্যের মালা গাঁথা।

কোন বাদ্যভাণ্ড অথবা তাল-লয় সমন্বিত রীতিপদ্ধতির সঙ্গে মিলিত না কখনো—তবু তার সহজ প্রবহমান ঝঙ্কার এক স্বতন্ত্র আবেশ তৈরি করত। রূপকথা-কথকতার পাশে ভাটের গান ছিল আমাদের গ্রামীণ সাহিত্যের আর এক অপরূপ সম্পদ, সরস্বতীর সুরমন্দিরে ভাটেরা ছিলেন ইতিহাসের মালাকার।

'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' পড়তে পড়তে শিল্পী মনোজ বসুর ব্যক্তিসত্তার উত্তাপ খুব কাছে থেকে অনুভব করছিলাম। একালের পরিশীলিত বিচার-সচেতন চোখের কাছে সঠিক উপন্যাস তিনি ক'খানা লিখেছেন জানা নেই ;—কতদিন, কতভাবে মনে হয়েছে, 'যশোরের জলজঙ্গলাশ্রয়ী গ্রামীন জীবনের মরমিয়া গাথাশিল্পী' তিনি ; বাদাবন-ধানবনের বাণী যাঁর চেতনার সুরে লেখনীর মুখে গান হয়ে ঝরে। আজ মনে হল, চোখের 'পরে ঘনীভূত হয়ে এল সেই শিল্পিসত্তার পরিণাম-ঘন অক্ষয় মূর্তি :—মহাকালের প্রাসাদ-মাঝে স্তুতিপাঠক এক ভট্টচারক !

মহাসমুদ্রের মতই অতলস্পর্শ, অপারপাথার—এবং চল্লোচ্ছল মহাকালও ; সেই সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক নির্মম আত্মাপহারক। অনাগতের অভিমুখে অন্তহীন যাত্রার বেগে বর্তমান এবং অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে যায় বিস্মৃতির অথৈ জলে। মহাকাব্য সেই মহাকালের অবাধ বিচরণভূমি। 'মহাভারত' মহাকাব্য, না মহা-ভারতের অমর ইতিহাস সে নিয়ে তর্ক রয়েইছে, কারণ 'মহাভারত' ঐ দুই-ই। নিরন্তর প্রবহমান নির্মায়িক মহাকালস্রোতের দেশ-কালাতিশায়ী চরিত্র 'মহাভারতে' মুদ্রিত রয়েছে। সে মূর্তি প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড, এবং 'ধীরোদাত্তগুণান্বিত'।

কিন্তু ইতিহাসের আরো এক রূপ আছে, দেশকালের বিশেষিত পাত্রে তার প্রতিচ্ছবি মধুময়। প্রতি মুহূর্তে তা চূর্ণিত হচ্ছে মহাসমুদ্রের ঢেউ-এর মত—অন্তহীন মহাস্রোতের পুষ্টিসাধনে পদে পদে তার অস্তিম আত্মবিলয়। ভোরবেলাকার প্রথম রক্তিম আলোর কণিকাটি যে ফেনায়িত ঢেউয়ের মাথায় চিক্‌চিক্ করে—পরমুহূর্তে সে নিজেকে ভেঙেচুরে কুটিকুটি করে ফেলে। মধুবিহ্বল মন মুহূর্তে আক্ষিপ্ত হয়ে উঠে—'হায় কি হারিয়ে গেল !'—ভাটের গানে সেই মায়ামোহ-বিজড়িত মধুরূপটিই আক্ষেপ-আলোড়িত স্মৃতির আভায় ঝক্‌মক্ করে ওঠে ; বহমান ক্ষণকাল চিরকালীনতার গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েও অমরতার দাবি নিয়ে হাত বাড়ায় করুণ-মেদুর সহৃদয়ের আকাশে।

একেই বলি ঐতিহ্য, শ্রদ্ধা এবং মমতার স্রোতে নিস্নাত হয়ে পুরাজীবন-কথা যখন পুরোবর্তী জীবন-চেতনার ঘাটে এসে ঢেউ-এর পর ঢেউয়ের হিল্লোল তুলে যায়। ইতিহাস কেবল নির্জীব প্রত্নতথ্যের পঞ্জী নয়—ঐখানে তার প্রাণময় অক্ষয় অধিষ্ঠান। ইতিহাস আর কাব্যের সঙ্গমতীর্থ ভাটের গান, তথ্য সেখানে মগ্ন হয়ে মনকে দুলিয়ে দিয়ে যায়।

শুধু তাই নয়, ভাটের গানের সুর আর ভঙ্গিমাটুকুও কত নিপাট। উচ্চারণ-

শৈলীতে বুকভরা নিশ্বাসের জোর ঊর্ধ্বশ্বাস দ্রুততায় ছুটত ; প্রতি দুই চরণে একটি সম্পূর্ণ পদ, পরবর্তী পদের আরম্ভে পূর্ববর্তী পদান্তের শেষ পর্ব পুনরুচ্চারিত হয়ে হয়ে অপরূপ এক আবহের সৃষ্টি করত। ঐটুকুই ছিল যেন ধুয়ো—আলাদা করে কোনো ধ্রুবপদ ছিল না।

হঠাৎ অতদিন পরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখি,—সেই বুকভরা আবেগের নিশ্বাস, সেই পুনঃপুনঃ আবর্তিত পুরা-প্রসঙ্গের পুনরুচ্চারণ—সেই ঊর্ধ্বশ্বাস ত্বরিতগতি, সব কিছু জড়িয়ে চলচ্ছবির মত ধেয়ে চলেছে নিটোল-নিপাট নিবিড় প্রেম ও প্রাণোদ্দীপ্ত একখণ্ড জীবন—ব্যক্তির—সমাজের—দেশকালের ; কালসমুদ্রে যা সম্ভনিমজ্জিত। তারই নাম 'সেই সব মানুষ'।

সকল সার্থক সৃষ্টিই স্রষ্টার আত্মরচনা। পড়তে পড়তে পদে পদেই মনে হয়—আজীবন স্বপ্নিল ভালোবাসার অঞ্জলিপুটে ধরে হারিয়ে-যাওয়া গ্রামীণ জীবন-মহিমার বেদীতলে শিল্পী মনোজ বসু যেন নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারলেন,—মুক্তির নিশ্বাস নিলেন এই মহাগ্রন্থে।

মহাগ্রন্থ বলছি আকার ও প্রকারের কথা ভেবে নয়, নিভৃত অন্তরঙ্গ জীবন-মহিমার স্পর্শে অভিভূত হয়ে থাকতে হয় বইটি পড়ার পর। মনে হয়, পরতে পরতে যেন মনোজ বসুর ব্যক্তিত্ব—তাঁর স্বপ্ন জড়ানো রয়েছে। নিজের জীবনকথা সম্পর্কে শিল্পী স্বল্প-ভাষী। তবু অন্যত্র এ-কথা ভাবতে বাধে নি, মনোজ বসুর শিল্পি-প্রতিভা আসলে কৈশোর-স্বপ্নবদ্ধ ; কিশোরের আকাঙ্খার উত্তাপ, স্বপ্নের দীপ্তি, হতাশার কারুণ্য সবটুকু নিলে তাঁর শিল্পি-ব্যক্তিত্ব ; আর তার পুরো গঠন সম্ভাবিত হয়েছিল পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধ লালনে। সেখানে বাধাও কম ছিল। পিতার হাত ধরে অতি শৈশবে স্বদেশী সভায় যাবার স্মৃতি আজও তাঁর মনকে বিভোর করে,—পিতার সান্নিধ্যই তাঁকে লেখার স্বপ্নে দীক্ষা দিয়েছিল ; তার পরে অকালে পিতার তিরোধান ঘটল, নানা সূত্রে কৈশোর-স্বপ্ন হয়ে গেল ছিন্নভিন্ন ; এ-সব তথ্য আছে তরুণ লেখক দীপক চন্দ্র'র 'মনোজ বসুর জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে। পরে দেখেছি সেই আক্ষেপ আর আকাঙ্খা ভরেই এগিয়েছিল সাহিত্যের পথে মনোজ বসুর পথ চলা।

সেই জীবন—সেই পথ অমর হয়ে রইল 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ'-এর মধ্যে। অনেকটা আক্ষরিক অর্থেই এ-বই শিল্পীর আত্মরচনা। গল্পের শরীরে কমলের সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে থেকে থেকেই শিশু মনোজ বসুকে চোখে পড়ে, স্বদেশী সভায় দেবনাথের হাত ধরে চলা কমলের মধ্যে পিতা রামলাল বসুর হাত ধরে চলা চার-পাঁচ বছরের মনোজ বসুকে গোপন রাখা সম্ভব হয়নি—যিনি স্বদেশী সভায় গিয়ে 'বন্দেমাতরম্' গান শুনে এসেছিলেন। তাছাড়া ভব-

নাথ-দেবনাথকে ঘিরে যে পারিবারিক পরিমণ্ডল, তার পেছনে ডোঙাঘাটা গ্রামের (মনোজ বসুর জন্মগ্রাম) বসু পরিবারের স্মৃতিই কেবল উঁকি-ঝুঁকি দেয় নি ; সে-সব রচনার মধ্যে বিন্দু বিন্দু রক্ত যেন সুধা হয়ে ঝরেছে শিল্পীর মনের গহন হতে। রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক, 'ঘটে যা তা সব সত্য নহে।'

যে জীবনের মাটি পায়ের তলা থেকে খসে গিয়েছিল সদ্য-উদিত কৈশোর-অনুভবের সীমায়—তার স্মৃতি-পাথেয় নিয়ে সত্তর বছরের দিগন্ত পর্যন্ত পথ চলায় যত আক্ষেপ, যত লুব্ধতা, যত কল্পনা এবং কামনা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে জমা হয়ে চলেছিল চেতনার গভীরে—বাঁধ-ভাঙা বন্যস্রোতের মত তাই উদ্বেলিত হয়ে পড়েছে এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। সেই সঙ্গে জমেছে কারুণ্যের অনতিস্ফুট রক্তিমাভা ;—হারিয়ে গিয়েও ফিরে পাবার স্বপ্নে হৃদয়কে যা বিভোর করে রেখেছিল দীর্ঘদিন সেই শেষ আশ্রয়টুকুও হারিয়ে গেল বলে রাজনীতির পাশা খেলায়! একসঙ্গে আজীবন স্বপ্নের বিহ্বলতা এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে একই সুতোয় গেঁথে 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' শিল্পীর সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত পরিপূর্ণ আত্মরচনা।

এই গ্রন্থের মুখ্য আবেদন ঐখানেই। জেনে না জেনে শিল্পীকে, শিল্পীর জীবনস্বপ্নকে—এবং তারই গভীরে হারিয়ে-যাওয়া বাঙালি-জীবনের একটি অধ্যায়কে স্রষ্টার আবক্ষমথিত দীর্ঘশ্বাসের পাত্রে ধরে এক নিশ্বাসে পান করতে পারার অনুভব এবং আস্বাদন।

কালের হিসেবটা হয়ত আরো একটু উজিয়ে যাবে ; 'এই শতকের প্রথম পাদ'টুকু কমলের জীবনের দিক দিয়ে উপন্যাসের কালসীমা,—কিংবা আরো স্পষ্টত ১৯০১—১৯১৪-১৫ মনোজ বসুর প্রত্যক্ষ স্বগ্রাম-বাস-অভিজ্ঞতার সীমারেখা। বস্তুত কমলের চিত্ত-দর্পণেই তো মনোজ বসুর আত্ম-উৎসার গল্পের বেয়ে-চলা স্রোতোধারায়! তা না হলে, দেবনাথের চতুর্থ সন্তান কমল যখন স্বদেশী আন্দোলনের কালে (১৯০৫-১১) সভায় গিয়ে 'বন্দেমাতরম'-এর উচ্ছ্বাস বুক ভরে নিয়ে ফেরে—তখন ভবনাথ-দেবনাথের কালকে নিয়ে উনিশ শতকের উপান্তে পৌঁছে যাওয়া যায় অনায়াসে। কাল নিয়ে এ বিতর্ক আমার শিল্পীর সঙ্গে নয়—সেই পুরো জীবনের ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে জন্মাতে হয়েছে যে ইতিহাস-প্রহত তরুণতর পাঠককে, তার কাছে ইতিহাসে চৌহদ্দিটুকু এ-তে প্রাঞ্জলতর হতে পারে। সন্দেহ নেই, মৃত এ অধ্যায়কে প্রাণ দিয়েছে কৈশোর-ব্যথাহত শিল্পীর উচ্ছ্বাসিত কল্পনা ; কিন্তু সে আকাশকুসুম নয়,—উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের পাটে খোদাই করা আছে সে স্বপ্ন বিকশিত কল্পনা

তরণীর মূল। হারানো ইতিহাস কবির ছন্দে গাঁথা হয়ে অমর তটু-সংগীত হয়ে ফুটেছে, এইখানেই এ বই-এর অনন্যতা।

তার আবেদনেও বৈচিত্র্য আছে, গুণ এবং পরিমাণে। অর্থাৎ রচনার আসল বাহুতা তো কাব্যকলার প্রযুক্তিগত নয়,—জীবনকে আহরণ এবং আত্মস্থ করতে পারার সঙ্গতি ও সার্থকতার। আজকের বাঙালি পাঠকসমাজে সেই ক্ষমতার স্তরগত তফাত রয়েছে। শিল্পীর আপন কালের পাঠকের অন্তরের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তিনি নিজে, স্রষ্টাই আপন রচনার প্রথম সমঝদারও। বর্তমান পাঠক শিল্পীর প্রায় আড়াই দশক পরে পৃথিবীতে এসেছিলেন—'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ'কে প্রথম বুঝতে শুরু করেছিলেন ত্রিশের দশকের কোন সময় হতে। তবু সমানুভূতির মাথালুণ্ঠিত আবেগে ক্ষণে ক্ষণেই বিকম্পিত হতে হয়েছে। তারও পরে—অনেক পরে যাঁরা এসেছেন জীবনের দেহলিতে—'যাঁরা ত্রিভঙ্গ স্বাধীনতার' পরে এই পৃথিবীতে প্রথম চোখ মেলেছেন,— সেই তরুণ এবং নবীনতম পাঠকের চিত্ত পুনঃপুনঃ আক্ষেপের সঙ্গে ভাববে—কি করে, কেন হারিয়ে গেল আজ 'সে স্বপ্নলোকের চাবি!'

কিন্তু হারিয়ে সে যাবই, মহাকালের ঐটুকু অমোঘ বিধান। রাজনীতির পাশাখেলা এমন মর্মান্তিক না হলেও, তার বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়ত। ভবনাথের অনুভবে তার নিষ্ঠুরতম স্বাক্ষর:—হিরন্ময়ের বিয়ে তাঁর জীবনের মর্মমূলে অগ্নি-আখরে লেখা!—তাছাড়াও কৃষ্ণময় ও অলকাবউ-এর দিন দুপুরে দরজা খিল দেবার খবর দিনো এনে দিয়েছিল তরঙ্গিণীকে, কিংবা ভব-নাথের পোষ্য প্রজার ছেলে কেমন বেয়াড়াপনা করেছিল! এ-জীবন ভাঙছিল —ভাঙতোই। আসলে ভাটের গানের ঐটুকুই চরম আবেদন, মহিমার সঙ্গে বেদনা; গৌরব-বোধের সঙ্গে হারিয়ে ফেলার দীর্ঘশ্বাস এক সুতোয় একত্র গাঁথা।

তবু 'ত্রিভঙ্গ-স্বাধীনতার তাড়নার' বিরুদ্ধে নালিশ কিছু থাকে বৈ কী! আমরা যাঁরা একটু কাছে—লেখার জগৎ আর লেখক দুয়েরই—বিশেষ করে আমাদের। 'সেই গ্রাম, সেইসব মানুষ' নিয়ে গল্প কিছুতেই এগোতে পারল না চার-চ'বছরের সীমানা পেরিয়ে। কমলের বড় হওয়ার—বড় হয়ে ইতি-উতি ভাবনার একটা ছুটো সঙ্কেত আছে—কিন্তু কমলের কৈশোর-সীমায় বাইরে এই জীবন-অভিজ্ঞতার বলয়রেখা প্রসারিত হতে পারনি। কমল—কিশোর মনোজ বসু—'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' হতে আকৈশোর ভাগ্য-নির্বাসিত; মর্ম-সংযোগের সুতাটুকুও ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিলে ঐ 'ত্রিভঙ্গ-তাড়না'। তা না

হলে গল্প কি মহাকাব্যের রাজপথে ধীর মন্থর পদপাতে এগোত?

এটুকু উত্তরহীন জিজ্ঞাসা। তার অভাবে ক্ষতি কিছু হয়নি, অন্তর্সংগীতে কারুণ্যের সুরটুকু বাঁধা হয়েছে আরো জমাট করে। 'সেই গ্রাম, সেই সব মানুষ' অতীতের ঐতিহ্য, স্বপ্ন ও গরিমা-বোধকে হারিয়ে-ফেলার বেদনার সূত্রে গেঁথে মন্থিত আবেগের ধারায় বলয়াবর্তিত করে ফিরেছে। এই স্বপ্ন, এই আক্ষেপ, এই মন্থন এবং আবর্তনাই চিরকালের পাঠকের চেতনায় তার শাশ্বত আবেদন।

আনন্দবাজার পত্রিকা

ওপার বাঙলা, সেকালের সেই পূর্ববাঙলা, অনেকের কাছেই আজ এক স্মৃতির দেশ। মনোজ বসুর নস্ট্যালজিক কল্পনা বার বার সেই স্মৃতিগন্ধী-বিত জগৎটির চার পাশে পরিক্রমা করে, সেই জগৎটিকে নতুন করে গড়ে বার বার ফিরিয়ে দেয় আমাদের কাছে। সেই হারানো দিন, পুরনো দিনের জন্য তাঁর বেদনামিশ্রিত অনুরাগ আর তিক্ত ক্ষোভ, কিছুই অগোচর থাকেনি তাঁর এই সাম্প্রতিক উপন্যাসটির মধ্যেও। উৎসর্গপত্রেই তার প্রমাণ দেখি। 'আমার এই দীর্ঘশ্বাসে তোমাদের অন্তিম তর্পণ।' কাদের জন্য তাঁর এই দীর্ঘশ্বসিত স্মৃতিতর্পণ? নিপুণ সূত্রধারের মত বাঙলাদেশের ইতিহাসের একটি পূর্বপট তুলেছেন এই কাহিনীর নেপথ্য বিধাতা: 'যবনিকা তুলছি। এই শতকের প্রথম পাদ। মানুষের সেই সময়ের। গ্রামের চেহারা ভিন্ন!' এমনি করে স্মৃতির উজানে পাঠককে সঙ্গে নিয়ে বাঙলাদেশের যে গ্রামে প্রবেশ করেন লেখক, সেখানে পূর্ববাঙলার সোনাখড়ি গ্রামের জমিদারি সেরেস্তার সদর নায়েব 'ধনীমানী' গৃহস্থ দেবনাথ ঘোষ, তাঁর দাদা ভবনাথ, স্ত্রী তরঙ্গিণী, বৌদি উমাসুন্দরী, দিদি মুক্তকেশী, ছেলে কমল, মেয়ে চঞ্চলা—এদের পাশা-পাশি পরিবারের অন্যান্য মানুষজন, গ্রামের নানা বৃত্তিজীবী মানুষের বিচিত্র মুখের

মেলা, গ্রাম বাঙলার ঋতুচক্রের আবর্তন, গ্রামীণ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রকরণ, সংস্কার, বিশ্বাস সব কিছুর মধ্যে দিয়ে তিনি সেই বিগত দিনের একটি বিশ্বাসযোগ্য ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের সামনে। কালবৈশাখীর ঝড়ে আম কুড়োনোর ধুম, দুর্গাপুজোর বাজনা, শীতকাল, গ্রাম্য থিয়েটার, আভিচারিক নানা তুকতাকের চিকিৎসা, আশ্বিনের সংক্রান্তির দিনে ধানকে সাধ খাওয়ানো, 'গারসি'-র নিয়মকানুন, ষষ্টিচন্দ্রের রাত, কাসন্দি তৈরী করা, বড়ি দেওয়া, পিঠে পরবের অনুষ্ঠান, গড়মণ্ডলের রথের মেলা, গ্রাম্য পাঠশালা, নানা শ্রেণীর গাছপালা, ধান, আম আর অন্যান্য প্রসঙ্গের বিচিত্র বর্ণনার ভিতর দিয়ে আবহমান বাঙলাদেশ আর বাঙালী সংস্কৃতির একটি চলচ্চিত্র ও স্মৃতিআলেখ্য রচনা করেছেন তিনি এখানে। এখনকার বাঙলা উপন্যাসে এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

আজকের উনিশশো ছিয়াত্তরে দুই প্রজন্মের মানুষের কাছে এই বইয়ের একটি দ্বিমুখী মূল্য রয়েছে। এই শতাব্দীর সমানবয়সী যাঁরা, অথবা একটু আগে পিছে যাঁদের বয়স, তাঁরা বেশ স্মৃতিভারাতুর হয়ে যাবেন এই বই পড়ে, অতীতের পুনর্নির্মাণ ঘটবে তাঁদের কল্পলোকে, পুরনো সেই দিনগুলো জীবন্ত হয়ে উঠবে তাঁদের বর্তমানে; আর একালের নব্য মানুষের দল ঈষৎ সংশয়ী বিশ্বাস আর অবিশ্বাস মেশানো চোখে ডুব দেবেন মোমালের ঘোর-লাগা অনতি-সুদূর ঐ অতীতের জগতে। এসব কিছুর বাইরে, একালের পাঠকদের চারপাশে একটি চণ্ডীমণ্ডপ গড়ে দিয়েছেন মনোজ বসু, হাতে সেই জাদুদণ্ডে, স্মৃতি যার অন্য নাম—সেই জাদুর ছোঁয়ায় এই শতকের গোড়ার দিককার কপোতাক্ষ নদীসন্নিহিত এক সোনাখড়ি গ্রাম, তার মানুষজন, আচার ব্যবহার প্রতিদিনের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবন সবকিছু ছবির মত একে একে ভেসে যায় আমাদের সামনে দিয়ে।